"বই মনের খাদ্য।
বেশি বেশি বই পড়ুন,
মনকে সুস্থ রাখুন।।"

মোঃ কবিরুল ইসলাম
(DMC K-69)

www.facebook.com/kabiruldmc
kabirul.dmc@gmail.com

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত সচিত্র মাসিকপত্র

সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

প্রথম ষাণ্মাসিক সূচীপত্র
1971

চতুর্বিংশ বর্ষ : জানুয়ারী—জুন

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ
পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা-6
'পরিষদ ভবন'
ফোন : 55-0660

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

বর্ণানুক্রমিক ষাণ্মাসিক বিষয়সূচী

জানুয়ারী হইতে জুন—1971

8

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

ষাণ্মাসিক লেখক সূচী

জানুয়ারী হইতে জুন—1971

চিত্র-সূচী

বিবিধ

সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

শ্রীমিহিরকুমার ভট্টাচার্য কর্তৃক পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-6 হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ 37/7 বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত।

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত সচিত্র মাসিকপত্র

দ্বিতীয় ষাণ্মাসিক সূচীপত্র
1971

চতুর্বিংশ বর্ষ ঃ জুলাই—ডিসেম্বর

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

পি 23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-6
'পরিষদ ভবন'
ফোন ঃ 55-0660

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

বর্ণানুক্রমিক ষাণ্মাসিক বিষয়সূচী

জুলাই হইতে ডিসেম্বর—1971

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

ষাণ্মাসিক লেখকসূচী

জুলাই হইতে ডিসেম্বর—1971

চিত্রসূচী

বিবিধ

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

চতুর্বিংশ বর্ষ | জানুয়ারী, 1971 | প্রথম সংখ্যা

নববর্ষের নিবেদন

জানুয়ারী, 1971—'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' 24 বৎসরে পদার্পণ করিল। 23 বৎসরের দীর্ঘ জীবনে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান'কে বিস্তর বাধা-বিঘ্নের সম্মুখীন হইতে হইলেও জনসাধারণের সহানুভূতি ও আনুকূল্য এবং পশ্চিম বঙ্গ সরকার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, শিল্প ও বিজ্ঞান গবেষণা পর্ষৎ (CSIR), শিক্ষাবিষয়ক গবেষণা ও শিক্ষণের জাতীয় পর্ষৎ (NCERT) প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকতায় সেই সকল বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' তাহার অগ্রগতি অব্যাহত রাখিয়াছে। বিশুদ্ধ বিজ্ঞানবিষয়ক একটি বাংলা পত্রিকার পক্ষে 23 বৎসরের জীবনকাল যে বহুলাংশে অক্লান্ত কর্মপ্রচেষ্টা ও অবিচল নিষ্ঠার পরিচায়ক—এই কথা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। আমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে আমরা অবহিত আছি এবং ত্রুটি-বিচ্যুতি মুক্ত হইয়া 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' যাহাতে উত্তরোত্তর আদর্শ স্থানীয় হইতে পারে, সেই বিষয়ে সর্বদাই আমাদের চেষ্টা ও লক্ষ্য রহিয়াছে। কিন্তু অর্থাভাব একটি প্রবল অন্তরায়। যদিও পত্রিকার পাঠক ও গ্রাহক-সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে, তথাপি সর্বক্ষেত্রে মূল্যবৃদ্ধি ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের অনিশ্চয়তাহেতু বিজ্ঞাপন হ্রাসের ফলে ব্যয়ের অঙ্ক আয়ের অঙ্ককে ক্রমশঃ অতিক্রম করিয়া যাইতেছে। অবস্থা বিবেচনায় নানা বিষয়ে ব্যয়সঙ্কোচ করিয়াও আয়-ব্যয়ের সামঞ্জস্য বিধান করা সম্ভব হইতেছে না। পত্রিকাটিকে অধিকতর চিত্তাকর্ষক করিবার জন্য উন্নত মানের চিত্র, ব্লক, কাগজ ও মুদ্রণ প্রভৃতির জন্য অধিক পরিমাণে অর্থব্যয় করা আবশ্যক। যাহা হউক, আমাদের এই ভরসা আছে যে, উদ্দেশ্যের গুরুত্ব বিবেচনায় এবং প্রবন্ধাদির জনপ্রিয়তার গুণে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান'

সুদীর্ঘ কাল তাহার সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখিতে সক্ষম হইবে।

এতক্ষণ প্রকাশন সম্পর্কিত অভাব-অভিযোগের কথাই বলা হইয়াছে, কিন্তু 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান'-এর প্রাণ তাহার প্রবন্ধসমূহ। বিজ্ঞানবিষয়ক প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে বর্তমানে নানা রীতি অনুসৃত হইতে দেখা যায়। কেহ কেহ গল্পচ্ছলে বিজ্ঞানের তত্ত্ব পরিবেশন করেন, কেহ বা কাব্য সৃষ্টি করেন; ফলে অনেক সময়ই দেখা যায়—আসল বস্তুটি ভাষ্যের ভারে চাপা পড়িয়া যায়। ভাষা ও উপমার অপপ্রয়োগের ফলে বক্তব্য বিষয় অনেক ক্ষেত্রেই ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করে। বিজ্ঞানের প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে এই রীতি বর্জনীয়। সাধারণের মধ্যে বিজ্ঞান-প্রচারই যেখানে উদ্দেশ্য, সেখানে সহজ ও সরল ভাষায় রূপক, অলঙ্কার প্রভৃতি যথাসম্ভব বর্জন করিয়া প্রবন্ধ রচনাই বাঞ্ছনীয়। বিদেশী প্রবন্ধাদির বাংলা অনুবাদ করিলেই একটি বাংলা বিজ্ঞান-প্রবন্ধ রচিত হইল বলা যায় না। দেখিতে হইবে, যাঁহাদের উদ্দেশ্যে এই রচনা, তাঁহারা তাহা সঠিক বুঝিতে পরিবেন কিনা। এই কষ্টিপাথরেই 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে' প্রকাশিতব্য প্রবন্ধগুলি নির্বাচিত হওয়া প্রয়োজন। 23 বৎসর পূর্বে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান লেখকের সংখ্যা যাহা ছিল—আজ তাহা অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহার জন্য 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' কিছু কৃতিত্ব দাবী করিতে পারে। সাধারণ পাঠক-সমাজ যে বহুল পরিমাণে বিজ্ঞানমুখী হইয়াছেন, তাহা আর একটি ঘটনায় প্রকাশ। বর্তমানে প্রায় সমস্ত সাময়িক পত্রিকাতেই নিয়মিত বিজ্ঞান-বিষয়ক প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে। কলিকাতার আকাশবাণীর কর্তৃপক্ষও বিজ্ঞানবিষয়ক অনুষ্ঠানের প্রবর্তন করিয়াছেন। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় যাঁহারা বিজ্ঞানবিষয়ক প্রবন্ধাদি লেখেন, তাঁহারা যদি একটি সুনির্দিষ্ট রচনারীতি অনুসরণ করেন, তবে সাধারণ পাঠকসমাজের পক্ষে খুবই সুবিধা হইবে বলিয়া আশা করা যায়। রচনারীতি বলিতে ষ্টাইলের কথা হইতেছে না, কারণ ষ্টাইল লেখকমাত্রেরই স্বতন্ত্র। আমরা এই কথাই বলিতে চাই যে, একই পরিভাষা, একই বানান সকলের ব্যবহার করা উচিত এবং সাধারণ শিক্ষিত মানুষও যাহাতে বিষয়টি বুঝিতে পারেন—সেইরূপ ভাবে সুষ্ঠু পদবিন্যাস করাই সমীচীন। 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' যথাসম্ভব এই রীতি অনুসরণ করিয়া চলিতেছে।

বিজ্ঞানের দুরূহ তত্ত্ব অবশ্যই জ্ঞানান্বেষীর পক্ষে মূল্যবান। কিন্তু সাধারণ মানুষের আগ্রহ সেই সকল বিষয়ে, যাহা তাহাদের জীবনযাত্রার সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কৃষি, সেচ, মৎস্য, পশু-পক্ষী পালন ও প্রজনন, ব্যাধি ও তাহার প্রতিকার, খাদ্য, বিভিন্ন শিল্প-বিজ্ঞান ইত্যাদি সংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও তথ্যের প্রচার জন-সাধারণের মধ্যে যথেষ্ট আগ্রহের সঞ্চার করিবে। এই সকল বিষয়ে যাঁহারা অভিজ্ঞ, তাঁহাদের নিকট হইতে প্রবন্ধাদি পাইবার জন্য আমরা সাদর আমন্ত্রণ জানাইতেছি। এতদ্ব্যতীত ভ্রমণকাহিনী, প্রকৃতি-পর্যবেক্ষণ এবং কলকারখানা ও শিল্প-প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির পরিদর্শনলব্ধ বিবরণাদি প্রকাশে আমরা সততই আগ্রহশীল। এই সকল বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ যদি আকর্ষণীয় চিত্র ও নক্সার সাহায্যে প্রবন্ধাদি পরিবেশনে অধিকতর মনোযোগী হন, তাহা হইলে পত্রিকাটির গুরুত্ব যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইবে।

কিশোর বয়স হইতেই যাহাতে ছেলেমেয়েরা বিজ্ঞানের প্রতি অনুরক্ত হয়, সেই উদ্দেশ্যে প্রায় প্রথম হইতেই 'কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর' খোলা হইয়াছে। এই বিভাগে প্রকাশিত প্রবন্ধাদি কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে অত্যন্ত আগ্রহের সৃষ্টি করিয়াছে জানিয়া আমরা উৎসাহ বোধ করিতেছি। ছোটদের উপযোগী করিয়া বিজ্ঞানের নানা বিষয়ে প্রবন্ধাদি এই বিভাগে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ছোটদের জন্য লেখা বলিয়াই

কাজটির গুরুত্ব সুদূরপ্রসারী। ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে ছোটদের জন্য যাঁহারা বিজ্ঞানের পুস্তক লেখেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেক খ্যাত-নামা বিজ্ঞানীও রহিয়াছেন। আমাদের দেশে এই দৃষ্টান্ত যতই অনুসৃত হইবে, ততই আমাদের কল্যাণ হইবে।

'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার উন্নতিকল্পে পাঠক-গণের সুচিন্তিত অভিমত জানিতে পারিলে আমরা বাধিত হইব।

পরিশেষে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানের' শুভার্থীদের আনুকূল্য ও উদার পৃষ্ঠপোষকতায় পত্রিকাটির অব্যাহত জয়যাত্রা কামনা করি।

অযৌন প্রজনন—ক্লোনিং

পার্থসারথি চক্রবর্তী*

সাধারণতঃ নিম্নস্তরের প্রাণী, যেমন—অ্যামিবা, হাইড্রা ও বিভিন্ন জীবাণু প্রভৃতি অযৌন প্রজননের সাহায্যে বংশবৃদ্ধি করে থাকে। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে নিম্নস্তরের প্রাণীরা যৌন ও অযৌন উভয় রকমেই বংশবৃদ্ধি করে। উন্নত ধরনের প্রাণীরা সর্বদা যৌন প্রজননের দ্বারাই সন্তান সৃষ্টি করে। এক্ষেত্রে স্ত্রী-পুরুষের মিলন অপরিহার্য এবং সৃষ্টির আদিম কাল থেকে আজ পর্যন্ত তারা যৌন মিলনের সহায়তায়ই বংশবৃদ্ধি করে আসছে।

সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা দীর্ঘ দিনের গবেষণার ফলে এক নতুন চমকপ্রদ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। তাঁরা মনে করেন যে, কয়েক বছরের মধ্যেই অযৌন প্রজননের সাহায্যে মানুষ তৈরি করতে পারবেন। এই প্রক্রিয়ায় কোনও নারী নিজেই তার সন্তান সৃষ্টি করতে পারবে এবং এর জন্যে পুরুষের কোন প্রয়োজন হবে না। অযৌন প্রজননের দ্বারা বংশবৃদ্ধির নাম দিয়েছেন তাঁরা ক্লোনিং (Cloning)।

যৌন প্রজনন—নারীর ডিম্বাণুর নিউক্লিয়াসের সঙ্গে পুরুষের শুক্রাণুর নিউক্লিয়াসের সংযোগের ফলে যে নতুন প্রাণের সঞ্চার হয়, তাকেই আমরা যৌন প্রজনন বলে থাকি। বিভিন্ন যৌনাঙ্গ নারীর ডিম্বাণু এবং পুরুষের শুক্রাণু উৎপন্ন করে। মানুষ এবং অন্যান্য জীব-জন্তু এই যৌন উপায়েই সন্তান সৃষ্টি করে থাকে। একই জীবের ভিতর যখন নারীর ডিম্বাণু এবং পুরুষের শুক্রাণু সৃষ্টির যৌনাঙ্গ থাকে, তখন তাকে বলা হয় হার্মাফ্রোডাইট। হার্মাফ্রোডাইট কেঁচো প্রভৃতি নিম্নস্তরের প্রাণীর মধ্যে দেখা যায়। শুক্রাণু এবং ডিম্বাণু যথাক্রমে বিভিন্ন পুরুষ এবং নারীর দেহে অথবা একই জীবের মধ্যে অবস্থান করুক না কেন, সব সময়ে তাদের মিলনকে আমরা যৌন প্রজনন বলি। টেস্ট টিউবে যে মানব-সন্তান জন্মগ্রহণ করতে চলেছে, সেটিও যৌন প্রজনন অর্থাৎ শুক্রাণু এবং ডিম্বাণুর মিলনের ফল।

অযৌন প্রজনন—অযৌন প্রজননের ক্ষেত্রে নতুন প্রাণ সৃষ্টির জন্যে দুটি নিউক্লিয়াসের সংযোগের প্রয়োজন হয় না। অযৌন প্রজননের প্রধান উদাহরণ হলো অ্যামিবা। অ্যামিবার দেহে আছে কেবলমাত্র একটি নিউক্লিয়াস। প্রজননের সময় এই নিউক্লিয়াসটি দু-ভাগে ভাগ হয়ে দুটি নতুন

* রসায়ন বিভাগ, কৃষ্ণনগর সরকারী কলেজ; কৃষ্ণনগর, নদীয়া

কোষের সৃষ্টি করে। যমজ সন্তান জন্মগ্রহণের ব্যাপারটিকেও আমরা অযৌন প্রজনন বলতে পারি। পুরুষের শুক্রাণু এবং নারীর ডিম্বাণুর মিলনের ফলে যে নতুন Zygote-এর সৃষ্টি হয়, সেটি আবার দু-ভাগে বিভক্ত হয়ে দুটি কোষ উৎপন্ন করে। ঘটনাটি অনেকটা অ্যামিবার প্রজনন-প্রক্রিয়ার মত। এই কোষ দুটি নিজেরা আবার আলাদা আলাদাভাবে বিভাজিত হতে থাকে এবং তার ফলেই দুটি নতুন প্রাণের উৎপত্তি হয়। যমজ সন্তানের সৃষ্টিকে অযৌন প্রজনন বললেও এর মূলে কিন্তু রয়েছে যৌন প্রজনন; অর্থাৎ এর প্রথমেই হয়েছে পুরুষের শুক্রাণু এবং নারীর ডিম্বাণুর মিলন। শুক্রাণু এবং ডিম্বাণুর মিলন ছাড়া মানব-শিশুর জন্ম সম্ভব কিনা, সে বিষয়ে বিজ্ঞানীরা বহুদিন ধরে চিন্তা করে আসছেন। সম্প্রতি তাঁরা বলেছেন যে, ভবিষ্যতে এমন মানব-শিশু তৈরি করা সম্ভব হবে, যার মা-বাবা হবে মাত্র একজন; অর্থাৎ কোনও পুরুষ অথবা নারীর সাহায্যে সন্তান সৃষ্টি করা যাবে এবংসেই সন্তান হবে তার মা অথবা বাবার অনুরূপ যমজ। এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় ক্লোনিং। ক্লোনিং প্রক্রিয়ায় একজন নারী ডিম্বাণু এবং শুক্রাণুর মিলন ছাড়াই গর্ভে সন্তান ধারণ করতে পারবে। বিখ্যাত মাইক্রোবায়োলজিষ্ট অধ্যাপক কিথল আটুড মনে করেন যে, ক্লোনিং-এর সাহায্যে মানব-সন্তান সৃষ্টির ঘটনা যে কোনও মুহূর্তেই ঘটতে পারে।

অযৌন প্রজনন বা ক্লোনিং—আমরা জানি, দেহে সাধারণতঃ দু-রকমের কোষ থাকে। এরা হচ্ছে দেহকোষ ও যৌনকোষ। দেহকোষের মধ্যে থাকে ছেচল্লিশটি ক্রোমোসোম। আর যৌনকোষের মধ্যে থাকে তেইশটি ক্রোমসোম অর্থাৎ দেহকোষের ক্রোমোসোমের ঠিক অর্ধেক। ক্রোমোসোম হলো বংশানুক্রমিক চরিত্র সংবাহক। যৌন মিলনের সময় শুক্রাণুর তেইশটি ক্রোমোসোম এবং ডিম্বাণুর তেইশটি ক্রোমোসোম মিলে যে নতুন দেহকোষ গঠন করে, তার মধ্যে তখন ছেচল্লিশটি ক্রোমোসোমই থাকে।

মানুষের ডিম্বকোষ দেখতে খুব ছোট। এর আকার প্রায় 0.25 সেন্টিমিটার। এই ডিম্বকোষের সঙ্গে মুরগীর ডিমের সাদৃশ্য দেখা যায়। ডিম্বকোষের নিউক্লিয়াসটি দেখতে অনেকটা মুরগীর ডিমের কুসুমের মত। নিউক্লিয়াসের চারদিকের পরিষ্কার বস্তুটিকে বলা হয় সাইটোপ্লাজম। সাইটোপ্লাজমকে মুরগীর ডিমের সাদা অংশের সঙ্গে তুলনা করা যায়। জীনগুলি ক্রোমোসোমের মধ্যে থাকায় সাইটোপ্লাজম জীনের গঠন-প্রণালীতে (Make-up) কোন সাহায্যই করে না। এর কাজ হলো শুধুমাত্র নিউক্লিয়াসকে রক্ষা ও পরিপুষ্ট করা।

বর্তমানে সাইটোপ্লাজমের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজের কথা জানা গেছে। সাইটোপ্লাজম কোষের নিয়ন্ত্রণ-স্থান হিসাবে কাজ করে এবং নিউক্লিয়াসকে বলে দেয় কখন বিভাজিত হতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত ডিম্বকোষে তেইশটি ক্রোমোসোম থাকে, ততক্ষণ সাইটোপ্লাজম কিছুই করে না। কিন্তু যেই মাত্র শুক্রাণু ডিম্বকোষের সাইটোপ্লাজমের ভিতর দিয়ে সাঁতরে গিয়ে নিউক্লিয়াসে প্রবেশ করে—সঙ্গে সঙ্গে সাইটোপ্লাজম ডিম্বাণুর নিউক্লিয়াসকে বার্তা পাঠিয়ে বিভাজিত হবার জন্যে সচেতন করে দেয়। সাইটোপ্লাজমের বার্তাটি কতকটা এই রকম: "তুমি এখন নিষিক্ত ডিম্বকোষ, আর তোমার মধ্যেও রয়েছে এখন ছেচল্লিশটি ক্রোমোসোম। অতএব তুমি এক্ষুনি বিভাজিত হয়ে নতুন জীবনের সৃষ্টি কর।" আশ্চর্যের বিষয়, সঙ্গে সঙ্গে নিষিক্ত ডিম্বকোষটি কোটি কোটি ভাগে বিভাজিত হতে আরম্ভ করে। এইভাবে বিভাজিত হবার ফলে আরও নতুন নতুন কোষের সৃষ্টি হতে থাকে এবং ক্রমে পরিপূর্ণ মানব সন্তানের জন্ম হয়।

মানুষের শরীরের এই অগণিত দেহকোষগুলিতে বংশপরম্পরায় সমানভাবে একটি জিনিষ থাকে। সেটা হচ্ছে জননশীল ডিম্বকোষ। দেহকোষগুলির সৃজন-ক্ষমতা কিছুটা সীমিত। এদের কেউ কেউ যকৃৎ, কেউ কেউ দাঁত আবার কেউ কেউ চুল ইত্যাদি তৈরি করতে লেগে যায়। প্রত্যেক দেহকোষের ভিতর নতুন সৃষ্টির জন্যে প্রয়োজনীয় পূর্ণসংখ্যক ক্রোমোসোম রয়েছে—কিন্তু জীবন সৃষ্টির জন্যে এদের সবটাই কাজে লাগে না। ত্বকের কোষের ছেচল্লিশটি ক্রোমোসোমের উপকরণগুলি একমাত্র ত্বক সৃষ্টি ছাড়া অন্য কোনও কাজেই আসে না। সুতরাং বেশীর ভাগ কোষই এক হিসাবে নষ্ট হয় বলা যেতে পারে।

বহুদিন ধরে বিজ্ঞানীরা চিন্তা করছিলেন যে, শরীরের কোনও অংশ থেকে একটি দেহকোষকে তুলে নিয়ে সেই কোষটিকে যদি বিভাজিত করতে পারা যায়, তাহলে যৌন মিলনের আর দরকারই হবে না—কেন না, দেহকোষের ভিতর প্রয়োজনীয় ছেচল্লিশটি ক্রোমোসোমই রয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে এটা অবাস্তব বলে মনে হলেও তত্ত্বের দিক থেকে মোটেই অবাস্তব নয়। কিছুদিন আগে কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ষ্টুয়ার্ড এটা সম্ভব করেছেন। তিনি একটি গাজর গাছের দেহ থেকে অনিষিক্ত একটি দেহকোষ তুলে নিয়ে সেটিকে নারিকেল দুধের দ্রবণের মধ্যে পরিপুষ্ট করাতে লাগলেন। এই দ্রবণের ভিতর পরাগ-সংযোগ হয়েছে মনে করে কোষটি বিভাজিত হতে থাকে। এই ভাবে কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা গাজর গাছের সামান্য একটি দেহকোষ থেকে ফুল, শিকড় ও বীজসমেত সম্পূর্ণ একটি গাজর গাছ উৎপাদনে সক্ষম হন।

সম্প্রতি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর জে. বি. গার্ডন জীব-জগতে ক্লোনিং-এর প্রচলন করে যুগান্তর এনেছেন। ডক্টর গার্ডন অযৌন প্রজননের সাহায্যে একটি আফ্রিকান ব্যাং তৈরি করেছেন। তাঁর পদ্ধতিটা মোটামুটি এই রকম: তিনি ব্যাঙের শরীর থেকে একটি অনিষিক্ত ডিম্বকোষ সংগ্রহ করে তার নিউক্লিয়াসকে আলট্রাভায়োলেট রশ্মির সাহায্যে নষ্ট করে দেন। তারপর অন্য একটি ব্যাঙের দেহ থেকে সংগ্রহ করেন একটি দেহকোষ। এটির নিউক্লিয়াসকেও শক্তিশালী মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে অস্ত্রোপচারে বের করে নেন। এবারে তিনি অস্ত্রোপচার করে বের-করা দেহকোষের নিউক্লিয়াসটিকে (যার ভিতর 46টি ক্রোমোসোম রয়েছে) ডিম্বকোষের মধ্যে রোপণ করেন।

এই ভাবে ডিম্বকোষের সাইটোপ্লাজমকে খানিকটা যেন বিভ্রান্ত করে দেওয়া হলো এবং তার নিউক্লিয়াসে 46টি ক্রোমোসোম দেখে সম্ভবতঃ সে মনে করলো ভ্রূণ সৃষ্টি হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে সে বিভাজিত হতে আরম্ভ করলো এবং অবশেষে একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ নিল। ডক্টর গার্ডন লক্ষ্য করেন যে, ক্লোনিং-এর সাহায্যে উৎপন্ন প্রাণীটির চেহারা, যার কাছ থেকে দেহকোষ নেওয়া হয়েছে, তার অনুরূপ হয়েছে। ডিম্বকোষ নেওয়া হয়েছে যার নিকট থেকে, তার বংশধারা এবং আকৃতির কোনও কিছুই সে পায় নি। ডিম্বকোষের সাইটোপ্লাজম কেবলমাত্র ভ্রূণের পরিপুষ্টির সহায়তা করে থাকে।

ক্লোনিং—মানুষের ক্ষেত্রে—যদিও মানব সৃষ্টির ক্ষেত্রে ক্লোনিং-এর প্রচলন করা কষ্টসাধ্য ব্যাপার, তথাপি এর ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। উন্নত ধরণের গরুর শরীর থেকে ডিম্বকোষ বের করে নিয়ে সেই ডিম্বকোষকে অনুন্নত ধরণের গরুর জরায়ুর মধ্যে প্রবেশ করিয়ে কৃত্রিম উপায়ে ভাল জাতের শুক্রাণুর সঙ্গে সেই ডিম্বকোষের মিলন ঘটিয়ে অনেক উন্নত ধরণের গরু তৈরি করা সম্ভব। বর্তমানে এই পদ্ধতি মানুষের ক্ষেত্রে প্রচলন করবার চেষ্টা চলেছে, যাতে বন্ধ্যা নারীরা সন্তান লাভ করতে পারেন।

আগেই বলা হয়েছে, ক্লোনিং-এর সাহায্যে মানব সৃষ্টি হলে তার চেহারা হবে পুরুষ অথবা স্ত্রীর অবিকল যমজের মত। একজন অতি বড় দার্শনিক, বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক অথবা রাজনীতিক—যে কোনও মানুষের শরীর থেকে 100টি দেহকোষ নেওয়া হলো, যার প্রত্যেকটির মধ্যে 46টি ক্রোমোসোম আছে। ধরা যাক, বাহু থেকে এই দেহকোষ এমনভাবে নেওয়া হলো যে, তিনি সামান্য আঁচড়টিও টের পেলেন না। এর পর যথারীতি অস্ত্রোপচার করে নিউক্লিয়াসকে সরিয়ে নেওয়া হলো। এবার 100টি ডিম্বকোষ একই স্ত্রীলোক অথবা 100টি বিভিন্ন স্ত্রীলোকের কাছ থেকে নিয়ে তাদের নিউক্লিয়াসকে আলট্রাভায়োলেট রশ্মি দিয়ে নষ্ট করে তার মধ্যে দেহকোষের নিউক্লিয়াসকে প্রবেশ করানো হলো। পরে কৃত্রিম inovaluation-এর দ্বারা এই নতুন 100টি কোষকে 100টি বিভিন্ন স্ত্রীলোকের শরীরে প্রবেশ করানো গেল। এক্ষেত্রে যে স্ত্রীলোকটির দেহ থেকে ডিম্বকোষ নেওয়া হয়েছে inovaluation-এর নতুন কোষটি অথবা অন্য নতুন কোষ তার শরীরের মধ্যে দেওয়া যেতে পারে। ক্লোনিং-এর সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে এই যে, দেহকোষ কেবলমাত্র পুরুষের শরীর থেকেই নয়, স্ত্রীলোকও দেহকোষ দান করতে পারেন—সেই সঙ্গে ডিম্বকোষও। এখানে Clonal offspring হবে দেহকোষ দানকারী অর্থাৎ নারীর হুবহু যমজ। তাই যদি হয়, তবে প্রজননের জন্যে পুরুষের আর প্রয়োজনই হবে না। ব্যাপারটা কেবল মজারই নয়—ভাববারও বটে। ক্লোনিং-এর সাহায্যে একজন খোরানা থেকে ভবিষ্যতে হাজার হাজার খোরানার সৃষ্টি হবে। একজন জেরোম অথবা চ্যাপলিন থেকে হাজার হাজার জেরোম অথবা চ্যাপলিনের সৃষ্টি হবে।

বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদন কেন্দ্র—ওবরা

শ্রীকমল নন্দী

দশ বছর আগেও উত্তর প্রদেশে মীর্জাপুর জেলার ওবরা ছিল একটা অখ্যাত গণ্ডগ্রাম। কে ভেবেছিল যে, ঐ গণ্ডগ্রামে আজ প্রায় 25000 লোকের একটা কর্মব্যস্ত শহর হয়ে উঠবে। শহরের এই প্রাণচাঞ্চল্য কিন্তু সদ্যনির্মিত একটি তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্রকে ঘিরে। সেই তাপ-বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র সম্বন্ধে দু-একটা কথা বলছি।

তৃতীয় পাঁচশালা পরিকল্পনায় ওবরাতে তিনটি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপনের কথা ছিল। পরিকল্পনা অনুযায়ী মূল তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্রে 250 মেগাওয়াট, তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্র সম্প্রসারণ প্রকল্পে আরও 300 মেগাওয়াট ও জল-বিদ্যুৎ কেন্দ্রে 99 মেগাওয়াট বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপন্ন হবার কথা। এদের মধ্যে মূল তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গত দু-বছর ধরে বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদন সুরু হয়েছে। এখানে পাঁচটি 50 মেগাওয়াট শক্তিসম্পন্ন ইউনিটের মধ্যে চারটি পুরাদমে কাজ করছে। আশা করা যায়, এই বছরে পঞ্চম ইউনিটটিও চালু হবে। এই পাঁচটি ইউনিট চালু হলে বছরে প্রায় 1533 মিলিয়ন কিলোওয়াট-ঘণ্টা বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদন সম্ভব হবে। এই পরিমাণ বিদ্যুৎ-শক্তি দিয়ে কানপুরের মত দুটি বড় শহরের চাহিদা মেটানো সম্ভব। স্বাধীনতা প্রাপ্তির সময়ে উত্তর প্রদেশে উৎপন্ন মোট বিদ্যুৎ-শক্তির এটা দ্বিগুণ।

1959 সালের সেপ্টেম্বরে রাশিয়া থেকে এই প্রকল্পের জন্যে 178·58 কোটি টাকা ঋণ পাওয়া গেলে প্রাথমিক কার্যে হস্তক্ষেপ করা হয়। পাঁচ বছরের মধ্যে 1964 সালেই প্রয়োজনীয় নতুন রেলপথ, সেতু ও সড়ক নির্মাণের কাজ সম্পূর্ণ হয়। উত্তর প্রদেশ বিদ্যুৎ-সংস্থা ও সোভিয়েট বাণিজ্য-সংস্থা 'Technoprom export'-এর সঙ্গে 1964 সালে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের যন্ত্রপাতি ও কারিগরী শিক্ষা আদান-প্রদান সম্পর্কিত 13·6 কোটি টাকার এক চুক্তি সম্পাদিত হয় এবং 1966 সালের মাঝামাঝি কাজ সুরু হয়। 1967 সালের জুন মাসে 50 মেগাওয়াট বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন প্রথম ইউনিটটি চালু হয়। দ্বিতীয় ইউনিটটি চালু হয় 1968 সালের ফেব্রুয়ারী মাসে এবং তৃতীয়টি চালু হয় সেই বছরের অগাষ্ট মাসে। উত্তর প্রদেশের রাজ্যপাল ডক্টর বি. গোপাল রেড্ডি সেই বছরের ডিসেম্বর মাসে আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করবার ছয় মাস পরে (জুন, 1969 সালে) চতুর্থ ইউনিটটিও চালু হয়। আশা করা যাচ্ছে, আনুমানিক 41 কোটি টাকার এই প্রকল্পটি এই বছরের শেষে সম্পূর্ণ হবে এবং পাঁচটি ইউনিটই একযোগে বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদন সুরু করবে।

ইউনিটগুলি বেশ ভাল ভাবেই কাজ করছে। প্রথম ইউনিটটি প্রায় 14,000 ঘণ্টা কাজ করবার পর প্রথম মেরামতির প্রয়োজন হয়। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ইউনিটটিতেও প্রায় 7,000 ঘণ্টা কাজ চলবার পর প্রথম মেরামতিতে হাত দেওয়া হয়। সাধারণতঃ 6,000 ঘণ্টা একনাগাড়ে বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদনের পর একবার করে সমস্ত যন্ত্রপাতি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজন হয়। এত ঘণ্টা ধরে নির্বিঘ্নে চলবার কারণ শুধু উন্নত মানের যন্ত্রপাতিই নয়, ইঞ্জিনীয়ার ও কারিগরদের নিষ্ঠা ও নৈপুণ্যও অনেকাংশে কৃতিত্বের দাবী রাখে।

শুনলে অবাক হতে হয় যে, এই প্রকল্প চালু রাখবার জন্যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় ও কর্মকুশলতা (Technical know-how) শিক্ষার তাগিদে কোন ভারতীয় বিশেষজ্ঞকে বিদেশে যেতে হয় নি। সোভিয়েট সাহায্য-প্রাপ্ত নেভেলি তাপ-বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে ভারতীয় বিশেষজ্ঞ ও ইঞ্জিনীয়ারেরা সোভিয়েট বিশেষজ্ঞদের তত্ত্বাবধানে বিশেষ কারিগরী শিক্ষা গ্রহণ করেন। প্রকল্পটি রূপায়ণের সময় 50 জন সোভিয়েট বিশেষজ্ঞ কাজ করেছেন। এখন আছেন মাত্র 27 জন। তাঁদের মতে, নিজেদের প্রচেষ্টায় ভারত আরও বেশী উৎপাদন-ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপনে সক্ষম। ওবরা বিদ্যুৎ-কেন্দ্রে নিত্যকার জ্বালানী হিসাবে কয়লা খরচ হয় 5000 টন এবং এই কয়লা আসে পার্শ্ববর্তী মধ্যপ্রদেশের সিংগ্রাউলী কয়লা খনি থেকে।

ওবরা তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্রের 300 মেগাওয়াট সম্প্রসারণ প্রকল্পে টারবাইন ও জেনারেটর সরবরাহ হবে সোভিয়েট আনুকূল্যে নির্মিত হরিদ্বারে ভারী বিদ্যুৎ-যন্ত্রপাতির কারখানা থেকে। এই প্রকল্প রূপায়ণের কাজ যখন পুরাদমে চলবে, তখন প্রতিদিন প্রায় 8000 থেকে 10000 শ্রমিকের প্রয়োজন হবে। সম্প্রসারণের দ্বিতীয় পর্যায়ে 200 মেগাওয়াট উৎপাদন শক্তিসম্পন্ন তিনটি ইউনিট ও চূড়ান্ত পর্যায়ে 200 মেগাওয়াট উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন পাঁচটি ইউনিট স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে।

কর্মসংস্থানের দিক থেকেও এই প্রকল্পটি বিশেষভাবে সার্থক হয়েছে। যখন দ্রুততম গতিতে এই বিদ্যুৎ-উৎপাদন কেন্দ্রটিতে কাজ চলছিল, তখন দৈনিক প্রায় 8,000 লোক কাজে নিযুক্ত ছিল। আর এই বিদ্যুৎ-কেন্দ্রে এখন প্রায় 2000 লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে। তাছাড়া এই নতুন বিদ্যুৎ-উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপনের ফলে প্রচুর শিল্প ও বাণিজ্য সংস্থা গড়ে উঠেছে এবং সেখানেও কয়েক হাজার লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে।

উত্তর প্রদেশের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে প্রভূত শিল্পোন্নয়নের দ্বার খুলে দিয়েছে এই ওবরা বিদ্যুৎ-কেন্দ্র। এখানে প্রতি কিলোওয়াট-ঘণ্টা বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদনে ব্যয় হয় 7 পয়সা এবং বিক্রয় করা হয় 8 পয়সায়। এত সস্তায় বিদ্যুৎ-শক্তি সরবরাহের ব্যবস্থা থাকায় ওবরার নিকটবর্তী ডাল্লা অঞ্চলে একটি নতুন সিমেন্ট কারখানাও গড়ে উঠেছে। আশা করা যায়, এই বছরেই সেখানে সিমেন্ট উৎপাদন সুরু হবে।

ওবরা বিদ্যুৎ-উৎপাদন কেন্দ্রের সম্প্রসারণ প্রকল্পের সব কাজ সম্পূর্ণ হলে এটি ভারতের অন্যতম বৃহত্তম বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্র হিসাবে পরিগণিত হবে। উত্তর-পূর্ব ভারতে বিদ্যুৎ-শক্তির ঘাটতি পূরণে ওবরার অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শিল্প-বাণিজ্য ছাড়া সবুজ বিপ্লবের কাজও এতে ত্বরান্বিত হবে। ওবরা হয়তো শীঘ্রই উত্তর-প্রদেশে ক্ষুধার হাত থেকে মুক্তি পাবার উপায় হিসাবে গণ্য হবে।

ভারতীয় গ্রীক ও কুষাণ যুগের নগর-বিন্যাস

অবনীকুমার দে*

মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের এক-শ' বছরেরও পর ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে ভারতীয় গ্রীকদের যে সব উপনিবেশ গড়ে উঠেছিল, সেগুলি থেকে তদানীন্তন ভারতীয় গ্রীকদের নগর-বিন্যাসের রীতির বিষয় জানা যায়।

তক্ষশীলা—মহাভারতে বর্ণিত আছে—রাজা জনমেজয় এখানে সর্পযজ্ঞ করেছিলেন। মৌর্য যুগে তক্ষশীলা মৌর্য সাম্রাজ্যের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের রাজধানী ছিল। জাতকের যুগে অথবা মৌর্যদের অধিকারে আসবার পরেই বিশ্ববিদ্যালয় নগরী হিসাবে তক্ষশীলা প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে গান্ধার রাজ্যে অবস্থিত ছিল বলে তক্ষশীলার বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রীস, পারস্য, চীন প্রভৃতি দেশ থেকে বিদ্যার্থীরা অধ্যয়নের জন্যে আসতেন। প্রাচীন ভারতবর্ষের অনেক রাজা ও রাজকুমারেরা এই বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্যাশিক্ষা করেছিলেন।

খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের শেষের দিকে তক্ষশীলা ভারতীয় গ্রীক রাজাদের প্রশাসনিক কেন্দ্র ছিল। প্রত্নতাত্ত্বিকেরা এখানে যে কয়েকটি নগরী ও কীর্তি-স্তম্ভের ধ্বংসাবশেষের নিদর্শন পেয়েছেন, তাথেকে ভারতীয় গ্রীক রাজাদের নগর-বিন্যাসে কুশলতার পরিচয় পাওয়া যায়।

হিন্দুস্থান এবং মধ্য ও পশ্চিম এশিয়ার সংযোগকারী প্রধান বাণিজ্য-পথের ধারে তক্ষশীলা ছিল অবস্থিত। চারদিক পাহাড়ে বেষ্টিত থাকায় স্থানটি ছিল সুরক্ষিত। কাছেই নদী থাকায় সর্বদাই ভাল জল পাওয়া যেত। এখানকার মাটিও ছিল খুব উর্বর। এই সব কারণেই প্রাচীন কালে তক্ষশীলা খুব প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। বিশ্ববিদ্যালয় নগরীকে তখন বিদ্যাস্থান, মঠ বা বিহার বলা হতো। ছাত্র, আচার্য, পণ্ডিত ও পরিব্রাজকেরা এখানে বাস করতেন।

এই মনোরম উপত্যকায় 3½ মাইলের মধ্যে তিনটি প্রাচীন নগরীর ধ্বংসাবশেষ আছে। এগুলির মধ্যে সবচেয়ে দক্ষিণ দিকের নগরীটি 'ভীর ঢিবি' নামে উঁচু জায়গায় অবস্থিত ছিল।

---

* নগর ও আঞ্চলিক পরিকল্পনা বিভাগ, বেঙ্গল ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ, শিবপুর।

এই টিবিটি 60 থেকে 70 ফুট উঁচু এবং রেল স্টেশন ও তাম্রনালার মাঝামাঝি জায়গায় অবস্থিত। এখন কেবলমাত্র প্রাচীন নগরীর প্রাচীরের নিদর্শন পাওয়া যায়, তাছাড়া নগরীর অন্য কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। খনন-কার্যের ফলে যে সব রাস্তার নিদর্শন পাওয়া গেছে, তাথেকে মনে হয় নাম শিরকাপ ও তৃতীয় নগরীটির নাম শিরসুখ। শেষের নগরীটি এই উপত্যকার উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম দিকের মাঝামাঝি জায়গায় অবস্থিত ছিল। এই তিনটি নগরী কাছাকাছি হলেও বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিত ছিল। এথেকে মনে হয়—বিভিন্ন সময়ে রাজারা এই স্থানে নিজেদের সুরক্ষিত বাসস্থান
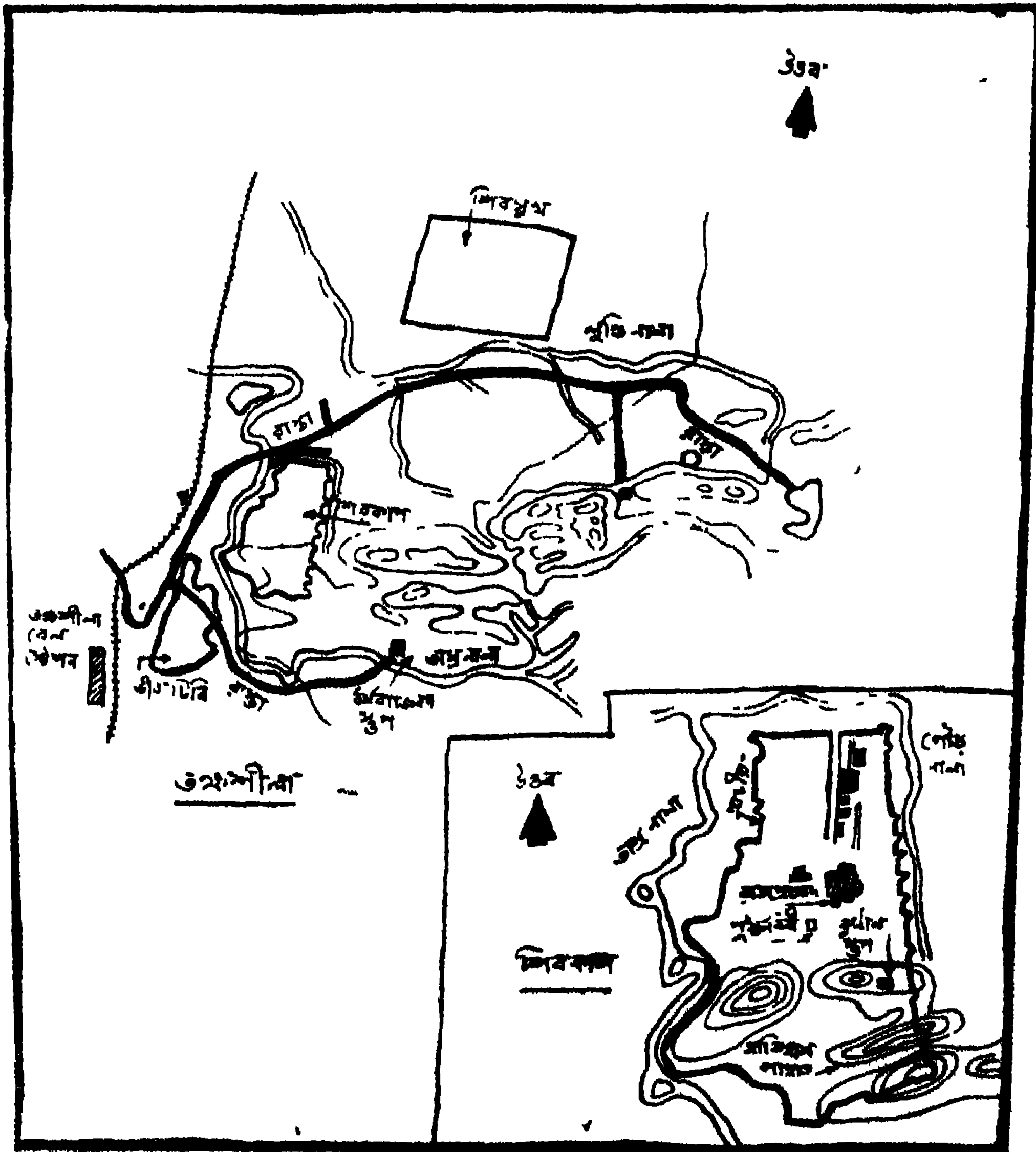
তক্ষশীলা, শিরকাপ ও শিরসুখ-এর নগর-বিন্যাসের মানচিত্র

যে, এই প্রাচীন নগরীর রাস্তাঘাটগুলি অনিয়মিত-ভাবে বিস্তৃত ছিল। খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে ভীর টিবির আরও উত্তর দিকে রাজধানী স্থানান্তরিত হয়েছিল। এখানকার দ্বিতীয় নগরীটির তৈরি করেছিলেন। রাজার নিরাপত্তা ও শত্রুর আক্রমণ থেকে নগরী রক্ষার ব্যবস্থা, প্রধানতঃ এই দুটি বিষয় চিন্তা করেই নগর-বিন্যাসের ব্যবস্থা অনুসৃত হয়েছিল। মনে হয়, ভারতীয় গ্রীক

রাজারা ভারতীয় জনসাধারণের কাছে বিশেষ প্রিয় ছিলেন না। সে জন্যে তাঁরা ছোট ছোট সুরক্ষিত নগরী তৈরি করে জনসাধারণের কাছ থেকে দূরে বাস করতেন। বাইরে থেকে শত্রুর আক্রমণ হলে জনসাধারণ অবশ্য এই নগরীগুলিতেই আত্ম-রক্ষার জন্যে আশ্রয় গ্রহণ করতো।

শিরকাপ—এই নগরীর প্রাচীর প্রায় 18000 ফুট লম্বা এবং 15 ফুট থেকে 21 ফুট 6 ইঞ্চি পর্যন্ত চওড়া ছিল। এই প্রাচীরের দেয়ালগুলির ভিতর ও বাইরের দিক ছোট ছোট পাথর দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল। দেয়াল গাঁথবার জন্যে কোনও রকম মশলা ব্যবহার করা হয় নি। প্রাচীরের বাইরের দিকে অসমান দূরত্বে অবস্থিত ও প্রাচীর থেকে ঠেলে বের করা আয়তাকার ঠেক্‌না (Sloping buttress) দেওয়া ছিল। উত্তর-দক্ষিণ অভিমুখী একটি প্রধান রাস্তা নগরীর কেন্দ্র-স্থল দিয়ে উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত ছিল। এই রাস্তার শেষে উত্তর দিকের প্রাচীরে একটিমাত্র দ্বার ছিল। মনে হয়, দক্ষিণ দিকের প্রাচীরে কোনও দ্বার ছিল না। খুব সম্ভব পূর্ব ও পশ্চিম দিকের প্রাচীরেও একটি করে দ্বার ছিল।

শহরের রাস্তাঘাট দাবার ছকের আকৃতিতে বিন্যস্ত ছিল। নগরীর চারদিক দিয়ে একটি ও প্রাচীরের ভিতর দিকে একটি রাস্তা ছিল। আরও কয়েকটি প্রধান রাস্তা উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে অবস্থিত ছিল। উত্তর দিকের প্রাচীরের প্রধান দ্বার থেকে যে রাস্তা সুরু হয়েছিল, তার কাছে দ্বারের পশ্চিম দিকে ও প্রাচীরের ভিতর দিকে রাস্তার ধারে রক্ষীদের বাসের জন্যে একটানা অনেকগুলি ঘর ছিল। এরই কাছে ও রাস্তার অপর দিকে একটি ঢালু রাস্তার ধ্বংসাবশেষ আছে। এই ঢালু রাস্তা দিয়ে নগররক্ষীরা প্রাচীরের উপর ওঠা-নামা করতো।

খনন-কার্য থেকে দেখা গেছে—প্রধান রাস্তা-গুলি 7 থেকে 10 গজ পর্যন্ত চওড়া ছিল এবং 35 থেকে 45 গজ অন্তর অন্তর অন্যান্য ছোট ছোট রাস্তা সুসমঞ্জসভাবে বিস্তৃত ছিল।

উত্তর-দক্ষিণমুখী প্রধান রাস্তার দুই ধারে গৃহ-গুলি অবস্থিত ছিল। শহরের কেন্দ্রস্থলের কাছে দুটি প্রধান রাস্তার সংযোগস্থলে ঘনসন্নিবিষ্ট সুবৃহৎ অট্টালিকাশ্রেণী দেখে মনে হয়—এটিই ছিল রাজপ্রাসাদ। প্রাসাদের পশ্চিম দিক দিয়ে উত্তর-দক্ষিণমুখী প্রধান রাস্তা ও দক্ষিণ দিক দিয়ে পূর্ব-পশ্চিমমুখী প্রধান রাস্তা চলে গিয়েছিল। পূর্ব-পশ্চিমে রাজপ্রাসাদ ছিল 352 ফুট দীর্ঘ আর উত্তর-দক্ষিণে এর প্রশস্ততা ছিল 250 ফুট। শহরের কেন্দ্রস্থলে আকর্ষণীয় স্থান হিসাবে রাজ-প্রাসাদ ও পৌর অট্টালিকাগুলি অবস্থিত ছিল।

রাজপ্রাসাদ—রাজপ্রাসাদের প্রধান প্রবেশ-দ্বার ছিল পশ্চিম দিকে চওড়া উত্তর-দক্ষিণাভিমুখী প্রধান রাস্তার ধারে। প্রাসাদের উত্তর দিকের অংশ মহিলাদের ব্যবহারের জন্যে নির্দিষ্ট ছিল। দক্ষিণ দিকের অংশে ছিল রাজার নিজস্ব বাসস্থান, খাস দরবার, হল ইত্যাদি এবং এরও দক্ষিণ দিকে ছিল প্রাঙ্গণ-বেষ্টিত রক্ষীদের ঘর। পূর্ব-পশ্চিমাভি-মুখী প্রধান রাস্তার ধারে ছিল প্রাসাদের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব অংশের প্রবেশ-দ্বার। এই অংশে ছিল সুবৃহৎ প্রাঙ্গণ ও জনসাধারণের জন্যে দরবার হল। এই অংশের উত্তরে ছিল উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ-বেষ্টিত অতিথিশালা। প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ থেকে স্নানঘরের নালা ও জলনিকাশের নর্দমার নিদর্শন পাওয়া গেছে।

গৃহ-বিন্যাস—উত্তর-দক্ষিণাভিমুখী প্রধান রাস্তার দুই ধারে অবস্থিত বাড়ীগুলির মাঝে মাঝে ছিল আড়াআড়িভাবে বিন্যস্ত কয়েকটি সঙ্কীর্ণ গলি। খনন-কার্য থেকে কয়েকটি বড় বাড়ীর নিদর্শন পাওয়া গেছে। এই বাড়ীগুলি যদিও ভিন্ন আকারে বিস্তৃত ছিল, তথাপি তাদের বিন্যাস-রীতি অনুবিস্তর একই রকমের ছিল। বিন্যাসের একক ছিল উন্মুক্ত ও চতুষ্কোণ চত্বর বেষ্টিত ঘরগুলি

(চতুঃশালা)। গৃহবাসীদের প্রয়োজনমত এককক্ষে দুই, তিন, চার বা আরও বেশী বার পুনঃ পুনঃ সন্নিবেশ করা হতো। রাস্তার ধারের ছোট ছোট ঘরগুলি সাধারণতঃ দোকানঘর হিসাবে ব্যবহৃত হতো। বাড়ীগুলির বিন্যাস থেকে মনে হয় যে, তখনকার দিনে একটি সাধারণ পরিবারের প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশী বাসস্থান এই সব বাড়ীতে ছিল। সুতরাং এই থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে, এখনকার দিনের ফ্ল্যাট বাড়ীর (Apartment house) মত একটি বাড়ীতে কয়েকটি পরিবার বাস করতো। সাধারণ বাড়ী-গুলি সম্ভবতঃ একতলা ছিল।

নগর ও গৃহ-নির্মাণের রীতি—প্রত্নতাত্ত্বিক খনন-কার্য থেকে দেখা যায় যে, তাম্রনালার পূর্ব দিকে শিরকাপ নগরী নির্মাণের আগে ভীরঢিবির উপরে নির্মিত নগরী তিন বার ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল এবং তিন বার ক্রমশঃ উঁচু স্তরে আবার নির্মিত হয়েছিল। দ্বিতীয় নগরীর ভিৎ জমির চার ফুট থেকে ছয় ফুট নীচে ছিল। তৃতীয় ও চতুর্থ নগরীর ভিৎ যথাক্রমে জমির নয় ফুট থেকে দশ ফুট এবং চৌদ্দ ফুট থেকে ষোল ফুট নীচে ছিল।

ভীর ঢিবির নগরীর বাড়ীর দেয়াল কাঁচা ইট অথবা কাদা ও কাঠ দিয়ে তৈরি হয়েছিল। এগুলির এখন আর কোন চিহ্নই নেই। অন্যান্য দেয়াল বেশীর ভাগই চুনাপাথর ও কাঁকর দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল। পাথরের তৈরি এই সব দেয়ালের উপর ভিতর ও বাইরের দিকে পুরু কাদার প্লাষ্টার করা থাকতো। প্লাষ্টারের উপর কখনও কখনও চুনকাম করা হতো। অবশ্য চুনের প্লাষ্টারের কোন নিদর্শন মেলে না।

এই নগরীর প্রধান রাস্তা ছিল বরাবর উত্তর-দক্ষিণমুখী 'প্রথম রাস্তা'। এটি গড়ে 22 ফুট চওড়া ছিল। দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ রাস্তা-গুলি ছিল আঁকাবাঁকা এবং 9 থেকে 17 ফুট চওড়া। দুই সারি বাড়ীর মাঝামাঝি গলি অত্যন্ত সরু ছিল। এই সব গলি দিয়ে কোনও রকমে দু-জন লোক পাশাপাশি চলতে পারতো। নগরীর মাঝে মাঝে ছোট ছোট খোলা জায়গা ছেড়ে রাখা ছিল। প্রথম রাস্তার নীচে পূর্ববর্তী কালের কোনও রকম বাড়ীর সন্ধান মেলে না। প্রধান রাস্তার চেয়ে পাশের ছোট ছোট রাস্তা, গলি ও বাড়ীগুলি আরও উঁচুতে অবস্থিত ছিল। এই থেকে মনে হয় যে, বাড়ীগুলি ধ্বংস হয়ে যাবার পর আবার যখন তৈরি করা হতো, তখন আগেকার ধ্বংসপ্রাপ্ত বাড়ীর মাটির তৈরি সমতল ছাদ ও পাথরের দেয়ালের রাবিশ এবং পোড়া কাঠ ইত্যাদি অন্য জায়গায় না সরিয়ে সেগুলি পিটিয়ে সমতল করে তার উপর নতুন বাড়ীর ভিৎ তৈরি করা অপেক্ষাকৃত সহজ হতো। প্রধান রাস্তাটি নগরীর সকল অংশের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল বলে এটিকে উঁচু করা হয় নি। ফলে প্রধান রাস্তার আড়াআড়িভাবে বিন্যস্ত অন্যান্য ছোট রাস্তা ও গলিগুলি পূর্ব ও পশ্চিম দিকে ক্রমশঃ খাড়াভাবে উঁচু হয়ে চলে যেত। এতে এক রকম সুবিধাও ছিল। বর্ষাকালে বাড়ী ও গলি থেকে বৃষ্টির জল ঢালু দিয়ে নেমে এসে প্রধান রাস্তায় নিষ্কাশিত হতো। মনে হয়, প্রধান রাস্তাটিকে উঁচু না করবার এটাও একটা কারণ। রাস্তার মাঝে মাঝে ও নগরীর খোলা জায়গায় বাড়ীর জঞ্জাল ফেলবার জন্যে বড় বড় পাত্র রাখা ছিল। নিয়মিতভাবে এই জঞ্জাল অপসরণ করবার বন্দোবস্ত ছিল।

যে সব রাস্তা দিয়ে চক্রযান চলাচল করতো, সেই সব রাস্তার ধারে অবস্থিত বাড়ীর কোণে পাথরের পিল্লা বসানো থাকতো। চলমান শকট ও রথের চাকা বাড়ীর কোণে লেগে যাতে কোনও ক্ষতি না করতে পারে, সে জন্যেই এই রকম ব্যবস্থা করা ছিল।

রাস্তাঘাটের মত ভীর ঢিবির নগরীর

বাড়ীগুলিও অনিয়মিতভাবে বিন্যস্ত ছিল। পরবর্তী কালের শিরকাপ নগরীর বাড়ীগুলি কিন্তু আরও সুনিয়মিতভাবে বিন্যস্ত ছিল। খোলা উঠানের এক বা আরও বেশী দিকে ঘরগুলিকে সন্নিবেশিত করা হতো। অপেক্ষাকৃত ধনী লোকদের বাড়ীর নীচের তলার ঘরগুলি উপরের তলার ঘর থেকে অপেক্ষাকৃত ছোট ছিল। মনে হয় উপরের তলার অপেক্ষাকৃত বড় ঘরগুলিতে পরিবারের সকলে বাস করতো এবং নীচের তলার অপেক্ষাকৃত ছোট ঘরগুলি ক্রীতদাস ও পরিবারের পোষ্যবর্গের জন্যে নির্দিষ্ট ছিল।

প্রত্যেক বাড়ীর উঠানে একটি করে মলকুণ্ড বা soak-well ছিল। এই কুণ্ডে মল, মূত্র ইত্যাদি জমা হতো। মনে হয়, এই রকম বৃত্তাকার কুণ্ডের ব্যাস ছিল 2 ফুট 6 ইঞ্চি থেকে 3 ফুট এবং মাটির নীচে সেগুলির গভীরতা ছিল 15 থেকে 25 ফুট। কুণ্ডের ভিতরে দেয়াল ছিল না, তবে যাতে মাটি ধ্বসে ভিতরে না পড়ে, তার জন্যে ভিতরে মাটির তৈরি পাত্র উবুড় করে রেখে কুণ্ডের ভিতরটা ভর্তি করা হতো। এই পাত্রগুলির মধ্য দিয়ে ময়লা জল চুঁইয়ে পড়তো এবং নীচের মাটিতে শোষিত হতো। মাটির তৈরি মণ্ডলাকার অংশ দিয়ে তৈরি এই রকম কুণ্ডেরও নিদর্শন পাওয়া গেছে। বাড়ীর খোলা উঠান থেকে বৃষ্টির জল রাস্তায় বেরিয়ে যাবার জন্যে খোলা ড্রেন তৈরি করা ছিল। দ্বিতীয় স্তরের নগরীর ধ্বংসাবশেষ থেকে দেখা যায় যে, কখনও কখনও স্নানঘরের মেঝে ও নর্দমার ধার বাঁধাবার জন্যে শ্লেট পাথর ব্যবহার করা হয়েছে।

শিরকাপ নগরীর গৃহ নির্মাণের জন্যে প্রধানতঃ ইট ও পাথর ব্যবহার করা হতো। বাড়ীর দেয়াল এলোমেলোভাবে বসানো পাথর দিয়ে তৈরি। ত্রিকোণাকার পাথরও দেয়াল নির্মাণে ব্যবহার করা হতো। দেয়ালের বাইরে ও ভিতর দিকে কাদা বা চুনের প্লাষ্টার করা থাকতো। প্লাষ্টারের উপর কখনও কখনও রং করা হতো। জানালা ও দরজা তৈরি করবার জন্যে কাঠ ব্যবহার করা হতো। কাদার তৈরি সমতল ছাদের ভার বহন করবার জন্যে কাঠের খুঁটি ব্যবহার করা হতো।

বাবরখানা—শিরকাপ নগরীর উত্তর দিকের প্রাচীরের বাইরে ছিল একটি শহরতলী। এখন এটির নাম দেওয়া হয়েছে বাবরখানা। এর চারদিকে কেবলমাত্র মাটির প্রাচীর ছিল। এই শহরতলীর পরিধি ছিল সওয়া এক মাইলেরও বেশী। এর পশ্চিম দিক ঘিরে ছিল তাম্রনালার বাঁক। প্রাচীরের উচ্চতা ছিল প্রায় 40 ফুট। চাকর প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর লোকেরা এখানে বাস করতো। সে সময়ে সাধারণতঃ নিম্নশ্রেণীর লোকদের জন্যে শহরের বাইরে আলাদা বাসস্থান নির্দিষ্ট করা হতো।

শিরসুখ—তক্ষশীলার তিনটি নগরীর মধ্যে সবচেয়ে পরবর্তী সময়ের নগরী ছিল শিরসুখ। কুষাণ যুগের এই নগরীটি সম্ভবতঃ রাজা কণিষ্কের রাজত্বের সময় তৈরি হয়েছিল। শিরকাপের আরও উত্তর দিকে খোলা উপত্যকায় এই নগরীটি অবস্থিত ছিল। সরু লুণ্ডিনালার পাশাপাশি নগরীর দক্ষিণ ও পূর্ব দিকের বপ্রের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। নগরীটি খোলা জায়গায় অবস্থিত ছিল বলে এবং পাহাড়ের মত কোন রকম প্রাকৃতিক বাধা না থাকায় এই নগরীর নির্মাতারা নগরীটিকে বাইরের আক্রমণ থেকে রক্ষা করবার জন্যে কৃত্রিম উপায়ের উপর আরও বেশী নির্ভরশীল হয়েছিলেন।

নগরীটির চারদিকে ছিল মজবুতভাবে তৈরি প্রাচীর। তীর ছোঁড়বার জন্যে প্রাচীরে অনেক ছোট ছোট ছিদ্র ছিল এবং প্রাচীরের মধ্যে 90 ফুট অন্তর অন্তর ফাঁপা ও অর্ধবৃত্তাকার বহুতল-বিশিষ্ট বুরুজ ছিল। এই নগরীর প্রাচীরে আরও বেশী নির্মাণ-কুশলতার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রাচীর প্রায় 20 ফুট চওড়া ছিল। দেয়ালের ভিতরের দিক এলোমেলোভাবে বসানো পাথর

দিয়ে তৈরি ছিল এবং বাইরের দিকে সুন্দরভাবে বসানো ত্রিকোণাকার চুনাপাথর ব্যবহার করা হয়েছিল। প্রত্নতাত্ত্বিক খনন-কার্য থেকে এই নগরীর বিন্যাস ভাল ভাবে বোঝা যায় না, তবে মনে হয় নগরীটি ছিল আয়তাকার।

এই নগরীর গৃহ-বিন্যাসের রীতি অন্য নগরী দুটির মত একই রকমের ছিল। উন্মুক্ত চত্বরের চারদিকে ঘরগুলি বিন্যস্ত থাকতো। খনন-কার্য থেকে যে কয়টি বাড়ীর সন্ধান পাওয়া গেছে, তাথেকে দেখা যায় যে, চত্বরসংলগ্ন এই ঘরগুলিতে কোন দরজা ছিল না। হয়তো এই ঘরগুলি মাটির নীচে ছিল এবং গরমকালে থাকবার জন্যে ব্যবহৃত হতো। এই ধারণা খুব যুক্তিসঙ্গত নাও হতে পারে। গ্রীষ্মকালে ব্যবহারের জন্যে যখন দু-একটি ঘর মাটির নীচে থাকলেই যথেষ্ট হতে পারে, তখন সবগুলি ঘরসমেত সারা বাড়ীটি মাটির নীচে তৈরি করবার কোনও সঙ্গত কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না।

তক্ষশীলার ঐতিহাসিক বিবরণ—বহু প্রাচীন কাল থেকেই তক্ষশীলা ঐশ্বর্যশালী নগরী ছিল। যুগ যুগ ধরে বালি ও পলিমাটি পড়ায়, খরস্রোতা ছোট ছোট নদীগুলি তাদের তীর ভেঙ্গে দেওয়ায় এবং এখানে ছোট ছোট গ্রাম গড়ে ওঠবার জন্যে এই অঞ্চলে খনন করে প্রাচীন নগরীর স্থানগুলি উদ্ধার করবার কাজ প্রত্নতাত্ত্বিকদের পক্ষে খুবই কঠিন হয়েছে। খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের পরবর্তী অংশে হিন্দুকুশ দিয়ে পেশোয়ারের সমতলভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত পারস্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল তক্ষশীলা। প্রথম দরায়ুস এই রাজ্যকে গান্ধার নামে অভিহিত করেছিলেন। এই অঞ্চলের নদীগুলি এখন যে পথে প্রবাহিত হচ্ছে, তখনকার সময়ে সেগুলির গতিপথ সম্পূর্ণ আলাদা ছিল এবং এটা অনুমান করা খুবই যুক্তিসঙ্গত হবে যে, এখন এই অঞ্চলে যেখানে বিস্তীর্ণ মরুভূমি রয়েছে, সেই সময়ে সেই অঞ্চল জনবহুল ও ঐশ্বর্যশালী ছিল। ঠিক কোন্ কোন্ সময় পর্যন্ত এই অঞ্চল পারস্যের কর্তৃত্বাধীনে ছিল, তা জানা যায় না। প্রায় 326 খৃষ্টপূর্বাব্দে আলেকজাণ্ডার সসৈন্যে এই অঞ্চলে অভিযান চালিয়ে তক্ষশীলা অধিকার করেন। সেই সময়েও সিন্ধুনদ ছিল পারস্য সাম্রাজ্য ও ভারতবর্ষের মধ্যের সীমারেখা এবং রাজা অম্ভীর অধীনে তক্ষশীলা ছিল এক ঐশ্বর্যশালী নগরী। এই অভিযানের ফলে পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চলের স্বাতন্ত্র্যের অবসান হলো। জলপথে একটি ও স্থলপথে তিনটি যাতায়াতের পথ স্থাপিত হলো। এগুলির মধ্যে একটি পথ পশ্চিম এশিয়া থেকে ব্যাক্‌ট্রিয়া ও পুষ্কলাবতী হয়ে সিন্ধু নদ পেরিয়ে তক্ষশীলা পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। এই পথ দিয়ে ভারতবর্ষের সঙ্গে মধ্য ও পশ্চিম এশিয়ার ব্যবসায়-বাণিজ্য চলতো। এর ফলে কৃষ্টির আদান-প্রদান হতে লাগলো এবং নগরীর নির্মাণ রীতিতেও এর ছাপ পড়লো। এই গুরুত্বপূর্ণ পথের ধারে অবস্থিত ছিল বলে তক্ষশীলা গড়ে ওঠবার পর খুব সমৃদ্ধিশালী নগরীতে পরিণত হয়েছিল।

317 খৃষ্টপূর্বাব্দে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য এই নগরী অধিকার করে একে মৌর্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। 231 খৃষ্টপূর্বাব্দে সম্রাট অশোকের মৃত্যুর পর মগধ সাম্রাজ্য ভাঙ্গতে সুরু করে এবং তক্ষশীলা আবার স্বাধীন হতে চেষ্টা করে, কিন্তু শীঘ্রই 190 খৃষ্টপূর্বাব্দে ডিমিট্রিয়াসের নেতৃত্বে আবার ব্যাক্‌ট্রিয়ার গ্রীকরা অভিযান চালিয়ে তক্ষশীলা অধিকার করে। ক্রমে এই অঞ্চল ভারতীয় গ্রীক রাজাদের দ্বারা শাসিত হতে থাকে। নতুন প্রশাসনিক কেন্দ্রগুলিতে নগরীসমূহের উন্নতি সাধিত হয়। এই নগরীগুলির নির্মাণ-পদ্ধতিতে হেলেনিস্টিক (Hellenistic) রীতি অনুসৃত হয়েছিল।

এক শতাব্দীর কিছু বেশী কাল গ্রীকদের দ্বারা শাসিত হবার পর তক্ষশীলা শকদের দ্বারা অধিকৃত হয়। সম্ভবতঃ 50 অথবা 60 খৃষ্টাব্দে কুষাণরা শকদের কাছ থেকে তক্ষশীলা অধিকার করেন।

কুষাণদের স্থায়ী রাজত্বের সময়ে তক্ষশীলা সমৃদ্ধিশালী নগরী হয়ে ওঠে এবং কণিষ্কের রাজত্বের সময়ে গৌরবের শিখরে উন্নীত হয়। কুষাণদের তৈরি নগরসমূহের মধ্যে মথুরা, পুরুষপুর ও তক্ষশীলার শিরসুখ নগরী ছিল প্রধান। এই অঞ্চলের মধ্য দিয়ে এই উপমহাদেশের সঙ্গে আফগানিস্থান ও পারস্যের ব্যবসায়-বাণিজ্যের যে সহজ পথ ছিল, কুষাণরা সেই পথটির খুব উন্নতি সাধন করেন। তাঁদের সময়ে এই পথ দিয়ে ব্যবসায়-বাণিজ্য খুব বৃদ্ধি পেয়েছিল। ফলে এই পথের ধারে ছোট ছোট নগরীকে সম্প্রসারিত করে অথবা নতুন নগরী তৈরি করে কতকগুলি প্রাদেশিক রাজধানী গড়ে উঠেছিল। ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের এই অঞ্চলেও রাজধানী ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের কেন্দ্র হিসাবে কয়েকটি নগরী গড়ে উঠেছিল, কিন্তু প্রত্নতাত্ত্বিক খনন-কার্য থেকে পেশোয়ারের উত্তর-পূর্বে পুষ্কলাবতী ও রাওয়ালপিণ্ডির উত্তর-পশ্চিমে তক্ষশীলায় এই রকম দুটি মাত্র নগরীর সন্ধান পাওয়া গেছে। কুষাণদের শক্তি ক্ষীণ হয়ে আসবার সঙ্গে সঙ্গে তক্ষশীলার গৌরবও অস্তমিত হলো এবং অবশেষে 455 খৃষ্টাব্দের পর শ্বেত হূনেরা কুষাণদের রাজ্য জয় করে এবং তক্ষশীলার সব কিছুই নির্মমভাবে বিনষ্ট করে।

সামাজিক, অর্থ নৈতিক ও ধর্মীয় প্রভাব—চারদিকে পাহাড়ে ঘেরা উপত্যকায় অবস্থিত থাকবার ফলে তক্ষশীলা খুব সুরক্ষিত ছিল। তখনকার সময়ে নগরীকে সুরক্ষিত রাখা খুবই প্রয়োজনীয় ছিল বলে প্রাকৃতিক পরিবেশে সুরক্ষিত জায়গায় এই নগরীটি গড়ে ওঠবার খুবই সুবিধা হয়েছিল। কয়েকটি পাহাড়ী নদী থাকায় সব সময়ে প্রচুর পরিমাণে জল পাওয়া যেত। এখানকার মাটি খুব উর্বর থাকায় জায়গাটি ছিল শস্যশ্যামলা। এই সব কারণে তক্ষশীলা জনবহুল ও সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠেছিল। কৃষিকার্য ও ব্যবসায়-বাণিজ্য ছিল এই জায়গার লোকদের প্রধান উপজীবিকা। ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রধান পথের ধারে অবস্থিত থাকায় এই জায়গায় ব্যবসায়-বাণিজ্য খুব প্রসার লাভ করেছিল। তক্ষশীলার সমৃদ্ধি লাভের এটিও একটি বিশেষ কারণ। রাজা দেশ শাসন করতেন। তিনি ও রাজপুরুষেরা ভিন্ন গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। জনসাধারণের কাছ থেকে তাঁরা আলাদা থাকতেন। এই জন্যে রাজপ্রাসাদ ও আনুষঙ্গিক সৌধ ও বাড়ীগুলির চারদিক প্রাচীর দিয়ে ঘিরে রাখা হতো। সম্ভবতঃ শাসক গোষ্ঠী জনসাধারণের বিশেষ প্রিয় ছিলেন না। সে জন্যে বাইরের প্রাচীর ছাড়া ভিতরে আর একটি প্রাচীরেরও প্রয়োজন হয়ে ছিল।

অন্যান্য ভারতীয় নগরীর মত এখানেও নগরী-বিন্যাসে যথেষ্ট ধর্মীয় প্রভাব বিদ্যমান ছিল। দুর্গ, রাজপ্রাসাদ ছাড়াও মন্দির, স্তূপ ও বিহারও তৈরী হয়েছিল। তক্ষশীলা অঞ্চলের খনন-কার্য থেকে ধর্মরাজিকা স্তূপ, কুণাল স্তূপ এবং কয়েকটি মন্দির ও বিহারের সন্ধান পাওয়া গেছে। বেশীর ভাগ জায়গায় এগুলি নগরীর বাইরে তৈরি করা হয়েছিল এবং জনসাধারণের জীবনযাত্রার উপর এগুলির যথেষ্ট প্রভাব ছিল।

পুষ্কলাবতী—প্রাচীন পুষ্কলাবতী নগরী (পদ্ম নগর) গান্ধার রাজ্যের আগেকার রাজধানী হিসাবে তৈরি করা হয়েছিল। রামায়ণের উত্তর কাণ্ডে বর্ণিত আছে যে, কৈকেয়ীর পুত্র ভরত গান্ধার রাজ্যে (পশ্চিম পাঞ্জাব ও পূর্ব আফগানিস্থান নিয়ে এই রাজ্য বিস্তৃত ছিল) তক্ষশীলা ও পুষ্কল—এই দুটি নগরী স্থাপন করেন। এই দুটি নগরী খুব ঐশ্বর্যশালী ছিল। নানা রকমের বাগান এই দুটি নগরীর শোভা বর্ধন করতো। নগরী দুটি জনবহুল ও সমৃদ্ধিশালী ছিল। প্রধান রাস্তাগুলির দু-পাশে দোকানগুলি সারিবদ্ধ ও সুশৃঙ্খলভাবে বিন্যস্ত ছিল। বহু চমৎকার মন্দির ও পবিত্র স্থান এবং তাল, তমাল, বকুল প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বৃক্ষ এই নগরী দুটির দৃশ্য খুব মনোমুগ্ধকর করে

তুলেছিল। নগর দুটির ভিত্তি গড়বার কাজে পাঁচ বছর লেগেছিল।

বর্তমান পেশোয়ারের কিছু দূরে উত্তর-পূর্ব দিকে ভারতবর্ষ ও পশ্চিম এশিয়ার মধ্যে সংযোগকারী প্রাচীন ব্যবসায়-বাণিজ্যের পথের ধারে পুষ্কলাবতী নগরী অবস্থিত ছিল। রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কেন্দ্র এবং ব্যবসায়-বাণিজ্যের স্থান হিসাবে নগরীটি খুব প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। এই স্থানে বড় বিস্তীর্ণ ঢিবি ও সেগুলির মধ্যে মধ্যে নীচু জায়গা দেখতে পাওয়া যায়। এথেকে অনুমান করা যায় যে, বিভিন্ন রাজারা সময়ে সময়ে নতুন নতুন জায়গায় তাদের রাজধানী স্থানান্তরিত করেছিলেন। খনন করে আধ মাইলের মধ্যে এই রকম দুটি নগরীর সন্ধান পাওয়া গেছে।

এগুলির মধ্যে প্রথম নগরীর দুর্গটি 65 ফুট উঁচু ছিল। দুটি নদীর সঙ্গম স্থলে প্রায় 15 একর জায়গা জুড়ে এই নগরীটি বিস্তৃত ছিল। দ্বিতীয়টি প্রথমটির তিন ফার্লং উত্তর-পূর্বে নির্মিত হয়েছিল। এটির আয়তন সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় নি। খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে ভারতীয় গ্রীকেরা এই নগরীটি স্থাপন করেন। এই নগরীর বিন্যাস-রীতি দাবার ছকের মত ছিল। সম্ভবতঃ পাশ্চাত্যের হেলেনিস্টিক রীতির অনুকরণে এটি বিন্যস্ত হয়েছিল। নগরীর প্রধান রাস্তাগুলি 40 গজ অন্তর অন্তর সরলরেখায় বিন্যস্ত ছিল।

নগরীর বিন্যাসের সময় তার নিরাপত্তার কথা বিশেষভাবে বিবেচনা করা হতো। যুদ্ধ, বিদ্রোহ ইত্যাদি অনবরতই লেগে থাকতো বলে সুরক্ষিত আশ্রয়স্থল হিসাবে নগরী নির্মাণ করা হতো। উপরিউক্ত প্রথম নগরীটির চারদিকে মাটির তৈরি বপ্র ও তার উপর কাঁচা ইটের দেয়াল ছিল। নগরীটিকে আরো ভালভাবে রক্ষা করবার জন্যে দেয়ালের বাইরের চারদিকে পরিখাও তৈরি করা হয়েছিল।

লণ্ডনের রয়েল সোসাইটির ভারতীয় সদস্যগণ

শ্রীঅমলকান্তি ঘোষ

লণ্ডনের রয়েল সোসাইটি স্থাপিত হয় 1660 সালে। এটি একটি বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান। সোসাইটির পুরা নাম—The Royal Society of London for the Advancement of Science। গত তিন-শ' বছর যাবৎ ইংল্যাণ্ডে যত বৃহৎ বৈজ্ঞানিক অভিযান, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা ও আবিষ্কার হয়েছে, তার মূলে ছিল রয়েল সোসাইটির সহযোগিতা। হাতে-কলমে পরীক্ষার ব্যবস্থা সোসাইটির নেই, তবে বার্ষিক অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথিরা তাঁদের উল্লেখযোগ্য বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার প্রদর্শনের সুযোগ পান। এই সোসাইটি বহু মূল্যবান পদক পুরস্কার দিয়ে বিজ্ঞান-সাধনায় উৎসাহ প্রদান করে। এক কথায় বলতে গেলে রয়েল সোসাইটি ইংল্যাণ্ডে সর্বপ্রকার বিজ্ঞান-চর্চার মস্তিষ্কস্বরূপ। রয়েল সোসাইটির সদস্যদের বলা হয় এফ. আর. এস. অর্থাৎ ফেলো অব দি রয়েল সোসাইটি। এফ. আর. এস. মনোনীত হওয়া ইংল্যাণ্ডে বৈজ্ঞানিকদের পক্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান। বিশ্বের যে কোন দেশের বৈজ্ঞানিক এই ফেলো হতে পারেন। নির্বাচনের কঠোরতার জন্যে শুধু প্রতিভাবান বৈজ্ঞানিকেরা, যাঁদের বিজ্ঞানের যে কোন শাখায় মৌলিক অবদান আছে, তাঁরাই ফেলো নির্বাচিত হতে পারেন। রয়েল সোসাইটি আজ পর্যন্ত যে 17 জন ভারতীয়

বৈজ্ঞানিককে ফেলো নির্বাচিত করে সম্মানিত করেছে, তাঁদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এখানে দেওয়া হলো। সর্ব প্রথম ভারতীয় এফ. আর. এস. হলেন বোম্বাইয়ের ইঞ্জিনীয়ার এ. কারসেট্‌জী ওয়াদিয়া।

এ. কারসেট্‌জী ওয়াদিয়াঃ বোম্বাইয়ের বিখ্যাত জাহাজ-নির্মাতা পার্শী সম্প্রদায়ভুক্ত লওজী ওয়াদিয়ার পরিবারে আরদাসীর কারসেট্‌জী ওয়াদিয়া 1808 সালে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাথমিক শিক্ষার পর মাত্র 14 বছর বয়সে শিক্ষানবীশ হিসাবে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। কারসেট্‌জী বোম্বাইয়ের ডক ইয়ার্ডে বিশেষ উৎসাহের সঙ্গে জাহাজ-নির্মাণ ও মেরিন ইঞ্জিনীয়ারিং-এর কাজ শেখবার সময় ষ্টীম ইঞ্জিন সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান লাভ করেন। 1833 সালে তিনি স্বনির্মিত ষ্টীম-বোট "ইণ্ডাস" জলে ভাসান। তিনি বোম্বাইয়ে সর্বপ্রথম ষ্টীম পাম্প ও গ্যাস লাইটের প্রবর্তন করেন। কারসেট্‌জী কিছুদিনের জন্যে বোম্বাইয়ের এলফিন্‌ষ্টোন ইনস্টিটিউসনের মিকানিক্যাল ও কেমিক্যাল সায়েন্সের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি 1839 সালে উচ্চশিক্ষার জন্যে ইংল্যাণ্ডে যান। ইংল্যাণ্ডে অবস্থানের সময় রয়েল সোসাইটির সভাপতি মারকুইস অব নর্দাম্পটন ও সোসাইটির অন্যান্য বিশিষ্ট সদস্যদের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়। জাহাজ চালনায় ষ্টীম ইঞ্জিনের প্রয়োগ সম্বন্ধে তাঁর গভীর জ্ঞান ও নিজ দেশে বিজ্ঞানের উন্নতির জন্যে তাঁর অক্লান্ত প্রচেষ্টার স্বীকৃতিস্বরূপ 1841 সালে কারসেট্‌জী এফ. আর. এস. নির্বাচিত হন। ইংল্যাণ্ড থেকে স্বদেশে ফিরে এসে কারসেট্‌জী বোম্বাইয়ের ষ্টীম ফ্যাক্টরির চীফ ইঞ্জিনীয়ার ও ইন্সপেক্টর অব মেসিনারির পদে যোগদান করেন। 1857 সালে ঐ পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। শেষ জীবনে তিনি ইংল্যাণ্ডের রীচমণ্ডে গিয়ে বসবাস করেন এবং 1877 সালে সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়।

এস রামানুজনঃ 1887 সালে মাদ্রাজে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে শ্রীনিবাস রামানুজনের জন্ম হয়। তিনি কুম্ভকোণমের স্কুল ও কলেজে শিক্ষালাভ করেন। বিদ্যালয়ে অধ্যয়নের সময় অঙ্কশাস্ত্রে রামানুজনের প্রবল অনুরাগ দেখা যায়। এই সময় তিনি প্রায়ই কঠিন অঙ্কের সমাধানে ব্যাপৃত থাকতেন। উচ্চতর গণিত নিয়ে তিনি এমন মেতে ওঠেন যে, কলেজে পড়বার সময় ইংরেজী, দর্শন ও সাহিত্য ভাল না জানায় সরকারী বৃত্তি বন্ধ হয়ে যায় এবং 1907 সালে এফ. এ. পরীক্ষায় অকৃতকার্য হন। ব্যর্থতা রামানুজনকে গণিতের গবেষণা থেকে নিবৃত্ত করতে পারে নি। 1907-1911 সাল পর্যন্ত বাহ্যিক জগৎ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে তিনি উচ্চতর গণিতের নতুন নতুন সমস্যা সমাধানে নিবিষ্ট হয়ে থাকতেন এবং গবেষণার ফলাফল তিনি একটি নোট বইয়ে লিখে রাখতেন। অর্থাভাব ও দারিদ্র্যের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যে 1912 সালে তিনি মাদ্রাজ পোর্ট ট্রাষ্টে মাসিক 35 টাকা বেতনের একটি কেরাণীর পদ গ্রহণ করেন। রামানুজনের গণিত-প্রতিভা মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 1913 সালে তিনি মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে মাসিক 75 টাকার একটি রিসার্চ স্কলারশিপ পান এবং পূর্ণোদ্যমে গবেষণা চালাতে থাকেন। রামানুজন তাঁর গবেষণার প্রবন্ধ কেম্ব্রিজের বিখ্যাত গণিত-বিজ্ঞানী অধ্যাপক হার্ডির কাছে পাঠান। অধ্যাপক হার্ডি রামানুজনের অসাধারণ মৌলিক গবেষণা-কার্যে মুগ্ধ হন এবং রামানুজনকে ইংল্যাণ্ডে এসে উচ্চতর গবেষণা করবার জন্যে অনুরোধ করেন। অধ্যাপক হার্ডির চেষ্টা ও সহযোগিতায় মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক 250 পাউণ্ড বৃত্তি নিয়ে রামানুজন 1914 সালে ইংল্যাণ্ডে যান এবং কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজে অধ্যাপক হার্ডির পরিচালনায় গবেষণার কাজ শুরু করেন। এক-

টানা তিন বছর ধরে কাজ করবার পর তিনি চার-শ' পাতায় তাঁর মৌলিক গবেষণার ফলাফল প্রকাশ করেন। তাঁর বেশীর ভাগ গবেষণার কাজ ছিল বিশুদ্ধ গণিতের থিওরি অব নাম্বার, থিওরি অব পার্টিসনস্, এবং থিওরি অব কন্টিনিউড ফ্র্যাকসন্স্-এর উপর। গণিতশাস্ত্রে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ও প্রতিভার জন্যে 1918 সালে তিনি এফ. আর. এস. নির্বাচিত হন এবং সেই বছরেই কেম্ব্রিজের ট্রিনিটি কলেজের ফেলোশিপ পান। ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাস—রামানুজন এই সময়ে যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হন এবং 1919 সালে ভারতে ফিরে আসেন সে যুগের সম্ভাব্য সকল রকম চিকিৎসা করেও তাঁকে বাঁচানো গেল না। 1920 সালের 26শে এপ্রিল মাত্র 33 বছর বয়সে বর্তমান জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গণিতবিদ্ কুম্ভকোণমে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

জগদীশচন্দ্র বসু : জন্ম 1858 সালে, মৃত্যু 1937 সালে। জগদীশচন্দ্র কেম্ব্রিজ থেকে বিজ্ঞানে অনার্স সহ বি. এ. ও লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি. এস্-সি. পাশ করেন। 1896 সালে ডি. এস্-সি. উপাধি লাভ করেন। তিনি 1885 সালে কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপক হিসাবে যোগদান করেন এবং 1915 সালে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি ভারতে মৌলিক গবেষণা-কার্যের প্রসারের জন্যে 1917 সালে কলিকাতায় 'বসু বিজ্ঞান মন্দির' প্রতিষ্ঠা করেন। জগদীশচন্দ্রই বর্তমান যুগে সর্বপ্রথম ভারতীয় বিজ্ঞানী, যিনি তাঁর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের জন্যে আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি 1895-99 সালে বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ সম্বন্ধে গবেষণা করেন। 1900-1902 সালে জৈব ও অজৈব পদার্থে কৃত্রিম ও প্রাকৃতিক উত্তেজনার ফলে সাড়ার সমতা বিষয়ে গবেষণা করেন। এই সাড়ার সমতা লক্ষ্য করবার পর তিনি জড় ও প্রাণীর মধ্যবর্তী উদ্ভিদের সাড়া সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ অনুসন্ধান আরম্ভ করেন। এই গবেষণার কাজ 1902 সাল থেকে 1932 সাল পর্যন্ত চলে। 1917 সালে বসু বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠিত হবার পর সেইখানেই সব গবেষণা পরিচালিত হয়। জগদীশচন্দ্র বহুবার ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন দেশে বক্তৃতা প্রদান করবার জন্যে আমন্ত্রিত হন। 1920 সালে তিনি এফ. আর. এস. নির্বাচিত হন। 1927 সালে তিনি ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলী : Response in the Living and Non-Living ; Plant Response ; The Motor Mechanisms of Plant ; Comparative Electrophysiology ; অব্যক্ত ইত্যাদি।

সি. ভি. রামন : জন্ম 1888 সালে 7ই নভেম্বর ত্রিচিনাপল্লীতে। পদার্থ-বিজ্ঞানী। অধ্যাপক রামন 1907 সালে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর কয়েক বছর সরকারী চাকুরীতে নিযুক্ত ছিলেন। অতঃপর স্যার আশুতোষের আহ্বানে 1917 সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক হিসাবে যোগদান করেন। আলোক-বিজ্ঞান ও শব্দ-বিজ্ঞানে তাঁর বহু মৌলিক গবেষণা আছে। 1924 সালে তিনি এফ. আর. এস. নির্বাচিত হন। আলোক-বিজ্ঞানে 'রামন এফেক্ট' নামে এক মৌলিক আবিষ্কারের স্বীকৃতি স্বরূপ 1930 সালে তিনি নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। 1929 সালে তিনি ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন। অধ্যাপক রামন 1933 সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর গ্রহণ করে ব্যাঙ্গালোরে ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব সায়েন্সের ডিরেক্টর হন। 1943 সাল থেকে তিনি ব্যাঙ্গালোরে স্বপ্রতিষ্ঠিত রামন রিসার্চ ইনস্টিটিউটে বিভিন্ন গবেষণায় ব্যাপৃত ছিলেন। 1949 সালে তিনি জাতীয় অধ্যাপক পদের গৌরব লাভ করেন। গত 21শে নভেম্বর, 1970 তিনি পরলোক গমন করেছেন। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলী :

Molecular Diffraction of Light; Mechanical Theory of Bowed Strings and Diffraction of X-rays; Theory of Musical Instruments; Physics of Crystals. ইত্যাদি।

মেঘনাদ সাহা: জন্ম 6ই অক্টোবর 1893 সালে, মৃত্যু 16ই ফেব্রুয়ারী 1956 সালে। পদার্থ-বিজ্ঞানী। 1915 সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মিশ্র গণিতে এম. এস-সি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি. এস-সি। ডক্টর সাহা লণ্ডন ও বার্লিনে গণিত ও পদার্থ-বিজ্ঞানে গবেষণা করেন। তিনি 1921 সাল থেকে 1956 সাল পর্যন্ত এলাহাবাদ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। অ্যাস্ট্রো-ফিজিক্স ও পদার্থ-বিজ্ঞানে তিনি বহু মৌলিক তথ্য আবিষ্কার করেছেন। তিনি তাপীয় আয়নন তত্ত্বের (Theory of thermal ionization) প্রবর্তক। এই তত্ত্ব আবিষ্কারের জন্যে তিনি 1927 সালে এফ. আর. এস. নির্বাচিত হন। তিনি 1934 সালে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন। ডক্টর সাহা 1955 সালে কলিকাতায় ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের প্রতিষ্ঠা করেন (বর্তমানে সাহা ইনষ্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স) এবং তিনিই এর প্রথম ডিরেক্টর ছিলেন। তিনি ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অব সায়েন্স-এর ডিরেক্টর পদেও অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি স্বয়ং বা অন্যের সহযোগিতায় যে গ্রন্থগুলি রচনা করেছেন, তা হলো—A Treatise on the Theory of Relativity; On a Physical Theory of the Solar Corona; A Treatise on Heat: A Treatise on Modern Physics, My Experience in Russia ইত্যাদি।

বীরবল সাহানী: জন্ম 1891 সালে পাঞ্জাবে, মৃত্যু 1949 সালে। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি. এস্-সি.। ডক্টর সাহানী স্বদেশে ফিরে যান এক বছর পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। 1921 সাল থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিদ্যা ও ভূতত্ত্বের অধ্যাপক ছিলেন। উদ্ভিদ-বিজ্ঞানে ডক্টর সাহানীর বহু গুরুত্বপূর্ণ অবদান আছে। উদ্ভিদের বিবর্তনবাদ সম্পর্কিত গবেষণায় তিনি আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করেন। ডক্টর সাহানী 1936 সালে এফ. আর. এস. নির্বাচিত হন এবং 1940 সালে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতি হন। শেষ জীবনে তিনি লক্ষ্ণৌ শহরে প্রাচীন কালের উদ্ভিদ সম্পর্কিত গবেষণার জন্যে প্যালিওবটানি ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করেন। ইনস্টিটিউট স্থাপনে তিনি তাঁর সঞ্চিত সমস্ত সম্পদ দান করে গেছেন।

কে. এস. কৃষ্ণান: জন্ম 1898 সালে, মৃত্যু 1961 সালে। পদার্থ-বিজ্ঞানী। মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি.এস-সি.। ডক্টর কৃষ্ণান কলিকাতার ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কাল্টিভেশন অব সায়েন্সে প্রোফেঃ সি. ভি. রামনের অধীনে যাঁরা গবেষণার কাজ করছিলেন, 1923 সালে তাঁদের সঙ্গে যোগদান করেন। তিনি রামন এফেক্ট প্রদর্শনের কাজে প্রোফেঃ রামনের মুখ্য সহযোগী ছিলেন। ডক্টর কৃষ্ণান 1928 সাল থেকে 1947 সাল পর্যন্ত ঢাকা, কলিকাতা ও এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপনা করেন। 1937 সালে তিনি লণ্ডনের রয়েল ইনস্টিটিউশনে, কেম্ব্রিজের ক্যাভেণ্ডিশ লেবরেটরিতে এবং আরও অনেক গবেষণা-কেন্দ্রে বক্তৃতা প্রদান করেন। পদার্থ বিজ্ঞানে তিনি বহু মৌলিক তথ্য আবিষ্কার করেছেন। আলোক-বিজ্ঞান এবং কেলাসে (ক্রিষ্টাল) চৌম্বকত্ব সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক গবেষণার স্বীকৃতি হিসাবে তিনি 1940 সালে এফ. আর. এস. নির্বাচিত হন। 1947 সালে তিনি ন্যাশন্যাল ফিজিক্যাল লেবরেটরির ডিরেক্টর

নিযুক্ত হন। ডক্টর কৃষ্ণান ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের 1949 সালের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। 1958 সালে তিনি জাতীয় অধ্যাপক পদের মর্যাদা লাভ করেন।

এইচ. জে. ভাবা: 1966 সালের 24শে জানুয়ারী ইউরোপে একটি যাত্রীবাহী বিমান-দুর্ঘটনায় ভারত সরকারের পারমাণবিক শক্তি কমিশনের চেয়ারম্যান ডক্টর হোমী জাহাঙ্গীর ভাবার মৃত্যু হয়। তাঁর এই আকস্মিক মৃত্যুতে পারমাণবিক বিজ্ঞানের গবেষণার ক্ষেত্রে ভারতের অপূরণীয় ক্ষতি হয়। বোম্বাইয়ের এক পার্শী পরিবারে 1909 সালে ডক্টর ভাবা জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মেকানিক্যাল সায়েন্সে ট্রাইপোস সহ বি. এ. পাশ করেন এবং 1934 সালে পি-এইচ. ডি. ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি রোমে অধ্যাপক এনরিকো ফের্মি এবং কোপেনহেগেনে অধ্যাপক নীল বোরের অধীনে গবেষণা করেন। ডক্টর ভাবার কস্‌মিক রেডিয়েসন, থিওরি অব এলিমেন্টারি পার্টিকলস্‌ ও কোয়ান্টাম থিওরির উপর গবেষণায় মৌলিক অবদান আছে। এই মৌলিক অবদানের জন্যে 1941 সালে তিনি এফ. আর. এস. নির্বাচিত হন। তিনি বোম্বাইয়ের টাটা ইনস্টিটিউট গবেষণাগারের ডিরেক্টর ছিলেন এবং 1948 সালে ভারত সরকারের পারমাণবিক শক্তি কমিশনের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। 1951 সালে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন। 1955 সালে জেনিভায় মানবজাতির কল্যাণে পারমাণবিক শক্তির ব্যবহার সম্পর্কে বিশ্বের পরমাণু-বিজ্ঞানীদের যে মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, ডক্টর ভাবা তার সভাপতি ছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলী: Quantum Theory; Cosmic Radiation; Elementary Physical Particles ইত্যাদি।

শান্তিস্বরূপ ভাটনগর: জন্ম 1895 সালে পাঞ্জাবে, মৃত্যু 1955 সালে। রসায়ন-বিজ্ঞানী ডক্টর ভাটনগর লাহোর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এস্-সি. এবং 1921 সালে লণ্ডনের ডি. এস্-সি. উপাধি লাভ করে কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপক হিসাবে যোগদান করেন। 1923 সালে লণ্ডনে বৃটিশ সাম্রাজ্য বিজ্ঞান সম্মেলনে তিনি ভারতীয় দলের নেতৃত্ব করেন। 1924-40 সাল পর্যন্ত তিনি লাহোর বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। এই সময় চৌম্বক রসায়ন সম্বন্ধে গবেষণা করে তিনি বিশ্বখ্যাতি অর্জন করেন। 1943 সালে তিনি এফ. আর. এস. নির্বাচিত হন এবং 1945 সালে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসে সভাপতিত্ব করেন। ডক্টর ভাটনগর ভারত সরকারের বিজ্ঞান ও শিল্প-গবেষণা বিভাগের ডিরেক্টর এবং প্রাকৃতিক সম্পদ ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা দপ্তরের সেক্রেটারী ছিলেন। তাঁর জীবনের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো—ভারতে 15টি জাতীয় গবেষণাগার প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা ও তাদের রূপায়ণ। ভারতে বৈজ্ঞানিক গবেষণার অগ্রগতিতে তাঁর এই অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

এস. চন্দ্রশেখর: জন্ম 1910 সালে। নভো-পদার্থ-বিজ্ঞানী ও গণিতবিদ্। মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ. এবং কেম্ব্রিজের ডি. এস-সি.। কেম্ব্রিজের ট্রিনিটি কলেজের ফেলো 1933-36 সাল পর্যন্ত। ডক্টর চন্দ্রশেখর 1936 সালে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের ইয়েরকিজ মানমন্দিরে বক্তৃতা দিতে যান। সেই থেকে তিনি শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা ও অধ্যাপনা করছেন। জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁর গবেষণামূলক মূল্যবান প্রবন্ধাবলী প্রকাশিত হয়েছে। তিনি 1944 সালে এফ. আর. এস. নির্বাচিত হন। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলী: Introduction to the Study of Stelier Structure; Principles of Steller Dynamics; Relative

Transfer; Hydrodynamic and Hydromagnetic Stability ইত্যাদি।

প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ: জন্ম 1893 সালে; পরিসংখ্যানবিদ্ ও পদার্থ-বিজ্ঞানী, কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ.। অধ্যাপক মহলানবীশ 1915 সাল থেকে 1945 সাল পর্যন্ত প্রেসিডেন্সি কলেজে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপনা করেন। 1945-'48 সাল পর্যন্ত তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। তাঁর প্রধান কীর্তি হলো, ভারতে তিনি সর্বপ্রথম পরিসংখ্যান ইনস্টিটিউট স্থাপন করেন। তিনি এই ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টর। তাঁরই প্রচেষ্টায় ভারতে পরিসংখ্যান সম্বন্ধে উচ্চ স্তরের গবেষণা ও অনুশীলন সুরু হয়। পরিসংখ্যান-বিজ্ঞানে তাঁর দান অসামান্য। তিনি 1945 সালে এফ. আর. এস. নির্বাচিত হন এবং 1950 সালে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসে সভাপতিত্ব করেন। অধ্যাপক মহলানবীশ ভারত সরকারের পরিসংখ্যান বিষয়ক উপদেষ্টা।

ডি. এন. ওয়াদিয়া: জন্ম 23শে অক্টোবর 1883 সালে, মৃত্যু 1969 সালের 15ই জুন। ভূতত্ত্ববিদ্। শিক্ষা—বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের বরোদা কলেজে। ছাত্রজীবন শেষ হবার পর তিনি জম্মুর প্রিন্স অব ওয়েল্‌স্ কলেজের ভূতত্ত্ব বিভাগে অধ্যাপক হিসাবে যোগদান করেন। 1921-'39 সাল পর্যন্ত তিনি ভারতের ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং পিরপাঞ্জাল, হাজারা, কাশ্মীর, হিমালয় ও অন্যান্য অঞ্চলে গুরুত্বপূর্ণ ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষার কার্য পরিচালনা করেন। তিনি Geology of India নামক গ্রন্থের লেখক। ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের 1942 সালের অধিবেশনে তিনি সভাপতিত্ব করেন। হিমালয়ের ভূতাত্ত্বিক স্তর সম্পর্কে অধ্যাপক ওয়াদিয়া যেসব মূল্যবান গবেষণা করেছেন, তার জন্যে তিনি 1957 সালে এফ. আর. এস. নির্বাচিত হন। 1960 সালে তিনি জাতীয় অধ্যাপক পদের গৌরব লাভ করেন।

সত্যেন্দ্রনাথ বসু: জন্ম 1লা জানুয়ারী, 1894 সালে। গণিত-বিজ্ঞানী ও পদার্থবিদ্। সত্যেন্দ্রনাথ 1915 সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মিশ্র গণিতে এম. এস-সি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। 1916-1956 সাল পর্যন্ত ঢাকা ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক ছিলেন। 1924-26 সালে উচ্চশিক্ষার জন্যে তিনি ইউরোপে যান। সেখানে ম্যাডাম কুরী ও আইনষ্টাইনের সহকর্মী হিসাবে গবেষণার কাজ করেন। 1956 সালে বিশ্বভারতীর উপাচার্যের পদ গ্রহণ করেন। 1958 সালে সত্যেন্দ্রনাথ এফ. আর. এস. নির্বাচিত হন। ওই বছরেই তিনি জাতীয় অধ্যাপক পদের গৌরব লাভ করেন। কোয়ান্টাম স্ট্যাটিস্টিক্সের প্রবর্তকরূপে সত্যেন্দ্রনাথের নাম সর্বত্র পরিচিত। আইনষ্টাইন কর্তৃক বোস-স্ট্যাটিস্টিক্সের উপযোগিতা স্বীকৃত এবং তা সম্প্রসারিত হয়। যে সকল মৌলিক কণিকা বোস-স্ট্যাটিস্টিক্সের নিয়ম মেনে চলে, সত্যেন্দ্রনাথের নাম অনুসারে তাদের নাম হয়েছে—বোসন। আইনষ্টাইনের একীকৃত ক্ষেত্র তত্ত্বেও (Unified FieldTheory) তাঁর অবদান আছে। সত্যেন্দ্রনাথ 1944 সালে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন।

শিশিরকুমার মিত্র: জন্ম 24শে অক্টোবর 1890 সালে। মৃত্যু 13ই অগাষ্ট, 1963 সালে। পদার্থ-বিজ্ঞানী। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 1912 সালে এম. এস-সি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং 1919 সালে ডি. এস-সি. উপাধি পান। শিশিরকুমার ফ্রান্সে গিয়ে সর্বোন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক ফ্যাব্রির অধীনে গবেষণা করে ডক্টরেট উপাধি পান। তিনি ন্যান্সির ইনস্টিটিউট অব ফিজিক্সে রেডিও সম্বন্ধে উচ্চ পর্যায়ের গবেষণা করেন। 1923 সালে স্বদেশে ফিরে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক হিসাবে যোগদান করেন। শিশিরকুমার এই দেশের রেডিও-রিসার্চের পথ-

প্রদর্শক। তাঁরই ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রেডিও-ফিজিক্স ও ইলেকট্রনিক্সের প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয় এবং তিনি এই প্রতিষ্ঠানের প্রথম ডিরেক্টর হন। শিশিরকুমার ও তাঁর সহকর্মীরা আয়নমণ্ডল সম্পর্কে যে গবেষণা চালান, তারই ফলে বেতার তরঙ্গ ও বেতার জগৎ সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানা গেছে। তিনি 'Upper Atmosphere' নামে এক বৃহৎ প্রামাণিক গ্রন্থ রচনা করেছেন। শিশিরকুমার 1955 সালে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসে সভাপতিত্ব করেন এবং 1958 সালে এফ. আর. এস. নির্বাচিত হন। 1962 সালে তিনি জাতীয় অধ্যাপক পদের মর্যাদা লাভ করেন।

টি. আর. শেষাদ্রি : রসায়ন-বিজ্ঞানী। 1922 সালে অধ্যাপক শেষাদ্রি মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং 1929 সালে ম্যাঞ্চেষ্টার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি-এইচ. ডি. ডিগ্রি লাভ করেন। 1930 সালে ভারতে ফিরে এসে তিনি কোয়েম্বাটুরের কৃষি-গবেষণা পরিষদে তিন বছর গবেষণার পর অন্ধ্র ও দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়ন বিভাগে অধ্যাপনা করেন। তিনি 1965 সাল থেকে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে এমেরিটাস অধ্যাপক হিসাবে নিযুক্ত আছেন। অধ্যাপক শেষাদ্রি বহু মৌলিক গবেষণা-নিবন্ধ প্রকাশ করেছেন। তাঁর গবেষণা প্রধানতঃ জৈব রসায়ন সম্পর্কিত ; যেমন—প্রাকৃতিক পদার্থ থেকে উৎপন্ন, যা ওষুধ, রং, কীটঘ্ন এবং অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট হিসাবে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। কাঠ ও ফল সম্বন্ধেও তিনি গবেষণা করেছেন। বহু সংখ্যক নতুন যৌগের পৃথকীকরণ, উপাদান নির্ধারণ এবং তাদের সংশ্লেষণও সম্ভব হয়েছে। তিনি এদের শারীরতাত্ত্বিক গুণাবলী, জৈব সংশ্লেষণ এবং ব্যবহার সম্পর্কিত গবেষণায়ও বিশেষ উৎসাহী। অধ্যাপক শেষাদ্রি 1960 সালে এফ. আর. এস. নির্বাচিত হন এবং 1967 সালে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসে সভাপতিত্ব করেন।

পঞ্চানন মাহেশ্বরী : জন্ম 1904 সালে, মৃত্যু 18ই মে 1966 সালে। রাজস্থানের অধিবাসী। উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি. এস-সি.। অধ্যাপক মাহেশ্বরীর অধ্যাপনা-জীবনের সূচনা হয় এলাহাবাদে এবং তারপর আগ্রা, লক্ষ্ণৌ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। 1949 সালে তিনি দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে উদ্ভিদবিদ্যার প্রধান অধ্যাপক হিসাবে যোগদান করেন। অধ্যাপক মাহেশ্বরী উদ্ভিদের অঙ্গসংস্থান ও ভ্রূণতত্ত্ব সম্বন্ধে বহু মৌলিক গবেষণা-পত্র প্রকাশ করেছেন। উদ্ভিদের শ্রেণীবিভাগের তথ্য নির্ধারণ, ভ্রূণ-তত্ত্বের উন্নতিবিধান এবং কৃত্রিম উপায়ে বীজ ও ফল উৎপাদন সংক্রান্ত তাঁর পরীক্ষাসমূহ বিশ্বের বিজ্ঞানীমহলের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 1954 সালে প্যারিসে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক উদ্ভিদ-বিজ্ঞান কংগ্রেসে ভ্রূণতত্ত্ব শাখায় তিনি সভাপতিত্ব করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থ 'An Introduction to the Embryology of Angiosperms' ইউরোপ ও আমেরিকার সর্বত্র বিজ্ঞানীমহলে খুব সমাদর লাভ করেছে। অধ্যাপক মাহেশ্বরী 1965 সালে এফ. আর. এস. নির্বাচিত হন।

সি. আর. রাও : পরিসংখ্যানবিদ্। জন্ম 1920 সালে। অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতে এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যানের এম. এ.। কেম্ব্রিজের পি-এইচ. ডি.। ডক্টর রাও 1951 সালে ইন্টার-ন্যাশন্যাল স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটের সদস্য নির্বাচিত হন। 1953-54 সালে ইউ. এস. এর ইলিনয়েস্ বিশ্ববিদ্যালয়ে ম্যাথেম্যাটিক্যাল স্ট্যাটিস্টিক্সের ভিজিটিং রিসার্চ প্রোফেসর হিসাবে কাজ করেন। 1961 সালে তিনি যুক্তরাজ্যে যান এবং বিভিন্ন বিশ্ব-বিদ্যালয় ও রয়েল স্ট্যাটিস্টিক্যাল সোসাইটিতে বক্তৃতা প্রদান করেন। ডক্টর রাও বর্তমানে ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টি-ক্যাল ইনস্টিটিউটের রিসার্চ অ্যাণ্ড ট্রেনিং স্কুলের ডিরেক্টর। তিনি পরিসংখ্যান সংক্রান্ত প্রায় 100টি গবেষণা-পত্র প্রকাশ করেছেন। ডক্টর রাও 1967 সালে এফ. আর. এস. নির্বাচিত হন। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলী : Advanced Statistical Methods in Biometric Research ; Linear Statistical Inference and its Application।

বাংলা ভাষায় ছোটদের জন্যে বিজ্ঞান-রচনা

শ্রীকুঞ্জবিহারী পাল

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান-চর্চার সুরু এখন থেকে প্রায়-দেড়'শ বছর আগে। শ্রীরামপুর মিশন, হিন্দু কলেজ এবং কলিকাতা বুক সোসাইটি—এই তিনটি প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করেই বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান-গ্রন্থ রচনার সূত্রপাত হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে ছোটদের জন্যে বিজ্ঞান-গ্রন্থ রচনার কাজ আরও পরের ঘটনা। শ্রীরামপুর মিশনের উদ্যোগে 1818 সালের এপ্রিল মাসে দিগ্‌দর্শন নামক পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকাটিতে নানা ধরণের বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রীতিমত প্রকাশিত হতো। 1817 সালে হিন্দু কলেজে নিয়মিতভাবে বিজ্ঞানের অনুশীলন হতো। যদিও এখানে শিক্ষার মাধ্যম ছিল ইংরেজী, কিন্তু সাধারণ লোকের মধ্যে ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করবার কাজে হিন্দু কলেজের দান অসামান্য। হিন্দু কলেজ কর্তৃপক্ষের অনুরোধে কলিকাতা বুক সোসাইটি বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান-গ্রন্থ রচনার কাজে এগিয়ে এলেন। চুঁচুড়া অঞ্চলের বিদ্যালয়গুলির প্রধান পরিদর্শক মিঃ মে প্রথম বাংলা ভাষায় একখানা অঙ্কের বই রচনা করেন। বইটির রচনাকাল 1817 সাল। বইটির নাম অঙ্ক পুস্তকম। বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল 1819 সালে। সেই বছরেই গণিতাঙ্ক নামে আরও একখানা অঙ্কের বই প্রকাশিত হয়। বইটির লেখক জন হার্লে। কবিতার মাধ্যমে নানা গাণিতিক সমস্যার সমাধান এই বইটির অন্যতম আকর্ষণ। এর পর বাংলা 1246 সালে হলধর সেন ইংরেজী ভাষায় অনভিজ্ঞদের জন্যেই আর একখানা অঙ্কের বই লেখেন। এই বছরেই হিন্দু কলেজ থেকে প্রকাশ করা হয় শিশু-সেবধি গণিতাঙ্ক। তাছাড়া ইউরোপের একখানা নাম করা জ্যোতির্বিজ্ঞানের বই বাংলা ভাষায় অনূদিত হয়েছিল। অনুবাদ কার্যের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন মিঃ ইয়েট্‌স, রাজা রামমোহন রায়, রাধাকান্ত দেব, বীর্যমোহন দত্ত, মহেশচন্দ্র পালিত, হরুচন্দ্র পালিত এবং মিঃ গর্ডন। 1824 সালে ইয়েট্‌স্-এর পদার্থবিদ্যা-সার প্রকাশিত হয়। মধ্যযুগের ইউরোপের জ্ঞান-বিজ্ঞানের গ্রন্থ রচনার রীতি অনুসরণ করে ইয়েট্‌স্ গুরু-শিষ্যের কথোপকথনের মাধ্যমে এই বইখানা রচনা করেছিলেন।

বাংলা ভাষায় ভূগোলের বই রচনার গোড়াপত্তন করেন জন ক্লার্ক মার্শম্যান এবং ফ্লেক্স পিয়ার্স। 1824 সালে কলিকাতা বুক সোসাইটি পিয়ার্সনের ভূগোল ও জ্যোতিষ ইত্যাদি বিষয়ক কথোপকথন প্রকাশ করেন।

সে যুগে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের বই রচনার ক্ষেত্রে বিশেষ কৃতিত্ব দেখান উইলিয়াম কেরীর পুত্র ফেলিক্স কেরী। তিনি 16 খণ্ডে বিদ্যাহারাবলী রচনা করেন। বইখানা প্রকাশ করেন কলিকাতা বুক সোসাইটি 1820 সালে। সাধারণ লোকের উপযোগী করে বিজ্ঞানের বহু বিষয়ে এই গ্রন্থে আলোচনা করা হয়েছে।

1828 সালে প্রকাশিত হয় প্রাণী-বিজ্ঞান সম্বন্ধে 'পশ্বাবলী'। গ্রন্থখানা সঙ্কলন করেন মিঃ লোসন এবং অনুবাদকার্য করেন মিঃ পিয়ার্স। 1852 সালে প্রকাশিত পশ্বাবলীর দ্বিতীয় সংস্করণের মূলে ছিলেন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং পণ্ডিত তারাশঙ্কর বিদ্যালঙ্কার। এর পর ইয়েট্‌স্-এর পদার্থবিদ্যাসার, জন ম্যাকের কিমিয়াবিদ্যাসার এবং আরও দু-একখানা বিজ্ঞান পুস্তক রচনা করা হয়। এখানে উল্লেখ করা

যেতে পারে যে, এই সময়ে কয়েকখানা শিশুপাঠ্য গ্রন্থে নানা ধরণের বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। বলা যেতে পারে যে, ছোটদের জন্যে বিজ্ঞান রচনার সূত্রপাত এখান থেকেই।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে কয়েকখানা সাময়িক পত্রও বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান-চর্চার মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। এর মধ্যে দিগ্‌দর্শন (1818 সাল), জ্ঞানান্বেষণ (1831 সাল), জ্ঞানোদয় (1831 সাল), বিজ্ঞান সেবধি (1832 সাল), বিজ্ঞান সার সংগ্রহ (1833 সাল), বিদ্যাদর্শন (1842 সাল) প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যেতে পারে।

উপরের আলোচনা থেকে একটা ব্যাপার বেশ স্পষ্ট বুঝা যায় যে, বিজ্ঞান রচনার দুটি ধারা আজকের মত সেকালেও প্রচলিত ছিল। এক—পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে বিজ্ঞান-চর্চা; দুই—বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা এবং গ্রন্থের মাধ্যমে সাধারণের মধ্যে বিজ্ঞান-চর্চা। প্রথম ধারাটিকে আমরা পাঠ্য-পুস্তক বিজ্ঞান এবং দ্বিতীয়টিকে সার্বজনীন বিজ্ঞান বা পপুলার সায়েন্স বলে নামকরণ করতে পারি। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান-চর্চার এই সার্বজনীন ধারাটিই উপযুক্ত কারিগরের হাতে পড়লে বিজ্ঞান-সাহিত্য হয়ে ওঠে, পাঠ্য-পুস্তক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যার সম্ভাবনা খুবই কম। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান-চর্চার প্রথম যুগে অবশ্য প্রথম ধারাটিরই প্রাধান্য ছিল। বর্তমান কালে অবশ্য দ্বিতীয় ধারাটিরও বহুল প্রচলন হয়েছে বটে, কিন্তু দুটি ধারার মধ্যে সীমারেখা বেশ স্পষ্ট। পাঠ্যপুস্তকের বিজ্ঞানের ভাষা কোন দিনই বিজ্ঞান-সাহিত্য হয়ে ওঠে নি; তেমনি আবার সার্বজনীন বিজ্ঞানও পাঠ্যপুস্তক-বিজ্ঞান হয় নি। এমন কি, পাঠ্যপুস্তকের বিজ্ঞানে সার্বজনীন বিজ্ঞান-ধারার একটু-আধটু স্পর্শ লাগাতে গিয়ে কোন কোন বিজ্ঞান পুস্তক পাঠ্য হিসাবে সাফল্য অর্জন করতে পারে নি।

সে যাই হোক, বিজ্ঞান-সাহিত্য বলতে যা বোঝায়, তার চর্চা সুরু হয় অক্ষয়কুমার দত্তের সময় থেকে। তাঁর প্রথম বিজ্ঞান-গ্রন্থ প্রকাশিত হয় 1841 সালে। অবশ্য এর আগেই রাজা রামমোহন রায় ভূগোল, জ্যোতির্বিদ্যা সম্বন্ধে কয়েকখানা গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। যদিও অক্ষয়কুমারের প্রথম গ্রন্থখানাও ভূগোল সম্বন্ধে, কিন্তু ছোটদের জন্যে বিজ্ঞান রচনার গোড়াপত্তনই করেছিলেন অক্ষয়কুমার। চারুপাঠের বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধগুলিই এর সাক্ষ্য বহন করে। বৈজ্ঞানিক শব্দের যে বাংলা পরিভাষা তিনি তৈরি করে গেছেন, তার অনেকগুলি আজও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তাছাড়া তিনি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন বারো বছর ধরে। এই পত্রিকা-টিতেও বহু বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ বেরিয়েছে এবং এর অধিকাংশেরই লেখক ছিলেন অক্ষয়কুমার নিজে। পত্রিকাটি সে সময়ে বেশ জনপ্রিয় ছিল।

অক্ষয়কুমারের সমসাময়িক যাঁরা বিজ্ঞান রচনায় হাত দিয়েছিলেন, তাঁরা হলেন রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র এবং ভূদেব মুখোপাধ্যায়। এঁদের লেখায় বিজ্ঞান বিষয়ক রচনা সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিল, তবে এঁদের লেখাকে কোনক্রমেই ছোটদের জন্যে বিজ্ঞান রচনা বলা যায় না। এর পর বঙ্গদর্শন, আর্যদর্শন, ভারতীয় বিবিধার্থ সংগ্রহ, রহস্য সন্দর্ভ প্রভৃতি পত্রিকার মাধ্যমে বিজ্ঞান-সাহিত্য আরও উন্নত স্তরে উঠলো। বলা-বাহুল্য, রাজেন্দ্রলালই বিবিধার্থ সংগ্রহ এবং রহস্য সন্দর্ভের বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধগুলির লেখক। বঙ্গদর্শনের বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ-গুলি লিখতেন স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র। ভারতীতে গণিত সম্বন্ধে যে সব লেখা প্রকাশিত হয়েছে, তার লেখক ছিলেন কালীবর বেদান্তবাগীশ, উদ্ভিদ সম্বন্ধে লিখতেন শ্রীপতিচরণ রায়।

এরই কাছাকাছি সময়ে বালকদের জন্যে দুটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। সেগুলি হলো অবোধবন্ধু ও

জ্যোতিরিঙ্গন। এই পত্রিকা দুটিতে ছোটদের উপযোগী নানাবিধ প্রবন্ধ প্রকাশিত হতো। এসব রচনা ছোটদের উপযোগী এবং তাদের কাছে সরল করবার জন্যে নানা কাহিনীর অবতারণা করা হতো। তাছাড়া বালকবন্ধু, সখা প্রভৃতি পত্রিকায়ও অনেক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হতো। এসব লিখতেন মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, ভুবনমোহন রায়, দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী প্রভৃতি। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে অর্থাৎ বাংলা 1291 সালে প্রকাশিত হয় নবজীবন। নবজীবনে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখতেন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। এই সময়ে ছোটদের জন্যে রচিত একখানা বিজ্ঞানের বই, নাম শিশু-বিজ্ঞান বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছিল। বইটির লেখক ছিলেন বীরেশ্বর পাঁড়ে।

রামেন্দ্রসুন্দর ছিলেন একাধারে সাহিত্যিক, দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিক। বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধাদি ছাড়া তিনি যে কয়েকখানা পাঠ্যপুস্তক রচনা করেছেন, তার মধ্যে পদার্থবিদ্যা পুস্তকখানা ছোটদের জন্যে রচিত। পরিভাষা সম্বন্ধে রামেন্দ্রসুন্দরের মত ছিল এই যে, পদার্থ-বিজ্ঞান, রসায়নশাস্ত্র প্রভৃতিতে যে সব ইংরেজী বৈজ্ঞানিক শব্দ ব্যবহৃত হয়ে আসছে, তা অবিকৃত রেখে শুধু বাংলা হরফে ব্যবহার করা চলবে না। অবশ্য কিঞ্চিৎ পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথ নিজে কিন্তু বহু ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক শব্দের নতুন পরিভাষা সৃষ্টি না করবারই পক্ষপাতী ছিলেন।

এর পর সাহিত্য, সাধনা, সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা প্রভৃতির মাধ্যমে বহু বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ-লেখকের আবির্ভাব ঘটে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, বলেন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথ—এঁরা সকলেই অল্পবয় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচনা করে গেছেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে বালক, সাথী, সখা ও সাথী, মুকুল প্রভৃতি ছোটদের পত্রিকায় অনেক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ বেরিয়েছে। এই সব লেখাকে সত্যকারের ছোটদের জন্যে লেখাই বলা চলে। বালক পত্রিকাটিতে কখনো কখনো বিজ্ঞান সংবাদ পরিবেশন করতেন রবীন্দ্রনাথ নিজে। অন্যান্য লেখকদের মধ্যে ছিলেন উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু, জগদানন্দ রায়, ভুবনমোহন রায়, আচার্য জগদীশচন্দ্র, যোগীন্দ্রনাথ সরকার প্রভৃতি। আরও পরবর্তী কালের সন্দেশ, শিশুসাথী, রামধনু, খোকাখুকু প্রভৃতি পত্রিকার মাধ্যমে ছোটদের জন্যে বিজ্ঞান বিষয়ক রচনা উৎকর্ষ লাভ করেছে।

ছোটদের জন্যে বিজ্ঞান রচনার ক্ষেত্রে জগদানন্দ রায়ই সম্ভবতঃ শ্রেষ্ঠ আসনের অধিকারী। তাঁর গাছপালা, গ্রহ-নক্ষত্র, নক্ষত্র চেনা, ছুটির বই, বিজ্ঞানের গল্প প্রভৃতি বইগুলি ছোটদের উদ্দেশ্যেই লেখা। তাছাড়া আলো, তাপ, চুম্বক, স্থির-বিদ্যুৎ, চল-বিদ্যুৎ, পাখীর কথা, শব্দ প্রভৃতি বইগুলি প্রমাণ দেয় যে, কত সুন্দর এবং সরলভাবে বিজ্ঞান রচনা সম্ভব। আধুনিক বিজ্ঞান রচনার সূত্রপাতই করেন জগদানন্দ।

আগেই উল্লেখ করেছি, ছোটদের জন্যে বিজ্ঞান রচনার দুটি ধারা বর্তমান। পাঠ্যপুস্তক বিজ্ঞান এবং সার্বজনীন বিজ্ঞান বা পপুলার সায়েন্স। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান-চর্চার সুরু থেকেই এই দুটি ধারার মধ্যে সীমারেখা বেশ স্পষ্ট। অন্য ভাষার কথা তেমন জানা নেই, তবে ইংরেজী ভাষায়ও যে অজস্র বিজ্ঞান পুস্তক রয়েছে, তার মধ্যেও দুটি ভাগ রয়েছে Text books এবং Books on popular science। ইংরেজী ভাষায় আর একটি ধারা হলো গবেষণামূলক প্রবন্ধ। নানা কারণে বাংলা ভাষায় ঐ জাতীয় তেমন কোন রচনা প্রকাশিত হয় না। বর্তমানে গবেষণামূলক প্রবন্ধাদি দিয়ে একটি বাংলা সাময়িক পত্র চলছে। তবে এই দিকটায় সাফল্য লাভের সম্ভাবনা কম বলেই মনে হয়।

পাঠ্যপুস্তকের সঙ্গে বিজ্ঞান-সাহিত্য রচনায়

প্রভেদ এইখানে যে, পাঠ্যপুস্তক রচনার জন্যে একটা নির্দিষ্ট পাঠ্যক্রম বা সিলেবাস মেনে চলতে হয় এবং কাজটি করতে হয় সীমাবদ্ধ পরিধির মধ্যে। লেখকের স্বাধীনতা পাঠ্যপুস্তক রচনার ক্ষেত্রে তাই খুবই কম। কিন্তু বিজ্ঞান-সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে এই ধরনের বাধাবাধি অনেকটা কম। দ্বিতীয়তঃ ভাষার দিক দিয়ে, বাংলা পাঠ্যপুস্তক যাঁরা পড়ান, তাঁরা বিশেষভাবে গোড়ামির পরিচয় দেন—বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তো বটেই। লেখক ও প্রকাশক তাঁদের মুখ চেয়েই বই লেখেন বা প্রকাশ করেন। তৃতীয়তঃ পাঠ্যক্রম বা সিলেবাস যে সব ক্ষেত্রেই সঙ্গতিপূর্ণ হয়, এমন কথা বলা চলে না। এর ফলে পাঠ্যপুস্তকের আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে ধারাবাহিকতা ব্যাহত হয়। পাঠ্যপুস্তকে কখনো কখনো যে অসঙ্গতিপূর্ণ আলোচনা দেখা যায়, তার কারণ এখানেই।

ছোটদের জন্যে বিজ্ঞান-সাহিত্য বা সার্বজনীন বিজ্ঞান রচনা করতে লেখককে কয়েকটি বিষয়ের প্রতি বিশেষ নজর দিতে হবে—(1) বিষয়বস্তু, (2) ভাষা ও বানান, (3) পরিভাষা এবং (4) উপস্থাপন।

বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে বলতে গেলে বলতে হয় যে, বিজ্ঞানের যে কোন বিষয়ই ছোটদের কাছে পরিবেশণ করা চলে। তবে সেটা নির্ভর করে পরিবেশন-পদ্ধতির উপর। অযথা গুরুভার আরোপ করতে গিয়ে অনেক ক্ষেত্রে ছোটরা বিজ্ঞানের প্রতি তেমন আকর্ষণ অনুভব করে না। গল্পের আকারে বিজ্ঞানের কোন জটিল তথ্যও পরিবেশিত হলে ছোটরা তাতে মুগ্ধ হয়। কিন্তু এখানেও মাত্রাবোধ থাকা দরকার। অন্যত্র প্রযোজ্য হলেও ছোটদের জন্যে লেখার মধ্যে লেখক যেন তাঁর বুদ্ধিমত্তা প্রকাশের চেষ্টা না করেন। তবে তথ্য কিছু থাকবে না, শুধু গল্প করলে, সে রচনা বিজ্ঞান-রচনা হবে না। "বিশ্ব পরিচয়ে"র ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ বলেন, এই বইখানিতে একটি কথা লক্ষ্য করবে—"এর নৌকাটা অর্থাৎ এর ভাষাটা যাতে সহজে চলে, সে চেষ্টা এতে আছে। কিন্তু মাল কমিয়ে দিয়ে একে হাল্কা করা কর্তব্য মনে করি নি।"

যতটা সম্ভব সহজ এবং সরল ভাষায় ছোটদের জন্যে লেখা উচিত। তবে ভুল তথ্য যেন কোনক্রমেই পরিবেশন করা না হয়। রবীন্দ্রনাথ বলেন, "তথ্যের যাথার্থ্যে এবং সেটাকে প্রকাশ করার যাথাযাথ্যে বিজ্ঞান অল্পমাত্রও স্খলন ক্ষমা করে না"। বানান সম্বন্ধেও বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। বর্তমানে বাংলা ভাষার বানান-পদ্ধতি র‍্যাশন্যালাইজ করবার বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়েছে—বিশেষ করে ছোটদের জন্যে বিজ্ঞান রচনার ক্ষেত্রে তো বটেই। পরিভাষা সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, যে সব বৈজ্ঞানিক শব্দ আন্তর্জাতিক রূপ পেয়েছে, তার জন্যে কষ্টকল্পিত পরিভাষা ব্যবহারের প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। এই জাতীয় শব্দ বাংলা হরফে লিখলেই নানা দিক দিয়ে সুবিধা হবে। রবীন্দ্রনাথের কথায়—"বিজ্ঞানের সম্পূর্ণ শিক্ষার জন্যে পারিভাষিকের প্রয়োজন আছে। কিন্তু পারিভাষিক চর্ব্য জাতের জিনিষ। দাঁত ওঠার পর সেটা পথ্য। সেই কথা মনে করেই যতদূর পারি পরিভাষা এড়িয়ে সহজ ভাষার দিকে মন দিয়েছি।"

বিজ্ঞানের কোন একটি বিষয় কি ভাবে উপস্থাপিত করতে হবে ছোটদের সামনে, তা একটা আর্ট। উপস্থাপন পদ্ধতির উপরই নির্ভর করে, বিজ্ঞান-রচনা সাহিত্য পর্যায়ে উন্নীত হলো কি না। এর জন্যে ভাষা, বিষয়বস্তু, তথ্য —সবার উপরই চাই অসামান্য দখল।

বর্তমান কালে বাংলা ভাষায় অনেক বিজ্ঞান-সাহিত্যের বই রচিত হচ্ছে। এর মধ্যে বহু বই আবার ছোটদের জন্যেই রচিত। সুখের কথা, খুব সুন্দর বইও—কি বিষয়বস্তু, কি

উপস্থাপন-পদ্ধতি—সব দিক দিয়ে বিচার করে —এর মধ্যে অনেক রয়েছে। অনেকে কথায় কথায় বিদেশে, বিশেষ করে ইংরেজী ভাষায় এই জাতীয় বইয়ের প্রাচুর্যের কথা উল্লেখ করে থাকেন। কথাটা যে সব সময়ে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বলা হয়, তা মনে হয় না। কারণ আমার মনে হয়েছে, তাঁরা সম্ভবতঃ দু-দিকের খবর পুরাপুরি রাখেন না। অবশ্য এমন কথা বলা চলে না যে, বাংলা ভাষায় ব্যাপকভাবে ছোটদের জন্যে বিজ্ঞান-সাহিত্য রচিত হচ্ছে। এর অন্যতম কারণ এই যে, সাধারণভাবে আমাদের দেশের মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান-লেখকদের মধ্যে নিষ্ঠার অভাব। এ ছাড়া অন্যান্য বহু কারণও যে রয়েছে, তা বলাই বাহুল্য।

নানা সমস্যা থাকা সত্ত্বেও বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ছোটদের জন্যে বহু গ্রন্থ রচনা করা হচ্ছে এবং দ্বিধাহীনভাবে বলা যায় যে, এই সব বইয়ের অনেকগুলি সত্যই রসোত্তীর্ণ। তাছাড়া বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়ও বহু রচনা প্রকাশিত হচ্ছে, যা পড়ে ছোটরা বাস্তবিকই উপকৃত হয়। তবে উৎপাদিত মালের পরিমাণ বেশী হলে তার মধ্যে কিছু কিছু ভুষিমালও যে থাকবে না, এমন কথা বলা যায় না।

ছোটদের জন্যে বিজ্ঞান রচনার ক্ষেত্রে কয়েকটি সমস্যার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এই জাতীয় রচনার ক্ষেত্রে অংশীদার হলেন তিন পক্ষ—(1) লেখক, (2) প্রকাশক ও (3) পাঠক। ধরা যাক, লেখক একটি সার্থক বিজ্ঞান-রচনা করলেন, কিন্তু প্রকাশককে তা প্রকাশ করবার আগে প্রথমেই ভাবতে হবে, এই বইটি প্রকাশ করে তিনি কতটা লাভবান হবেন। মনে রাখতে হবে, তিনি ব্যবসায় করতে বসেছেন; দেশের ছোটদের মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রচারের প্রাথমিক দায়িত্ব তাঁর নিশ্চয়ই হতে পারে না। তিনি ভাববেন, এই বিজ্ঞান বইটির পাঠক-সংখ্যা কোন রোমাঞ্চকর উপন্যাসের চেয়ে নিশ্চয়ই কম হবে। সমগ্র পৃথিবীতে বিজ্ঞানের যতই অগ্রগতি হোক না কেন, আমরা, বিশেষ করে আমাদের ছোটরা তার কতটুকু অংশীদার? এই তো সেদিন মানুষের পদচিহ্ন পড়লো চাঁদের মাটিতে। সঙ্গে সঙ্গে এই সম্বন্ধে কয়েকখানা বইও বেরিয়ে গেল বাংলা ভাষায়। কিন্তু তার বিক্রি হলো ক'খানা? খবর নিলে আশাহত হতে হবে। ছোটদের জন্যে কোন বিজ্ঞান-সাহিত্য এক হাজারের বেশী ছাপা হয়, এমন খবর বিরল, ততোধিক বিরল এই জাতীয় বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণ হবার খবর। কাজেই নিছক অ্যাডভেঞ্চারের মোহ ছাড়া কোন প্রকাশকই এগিয়ে আসতে চাইবেন না এরকম লাভহীন ব্যবসায়ে। যদি আসেন, তবে তার প্রাথমিক কর্তব্যই হবে লেখককে কি করে সামান্য কিছু দক্ষিণা দিয়ে বা একদম কিছু না দিয়ে পারা যায়। এরকম ঘটনার ক্ষেত্রে লেখকের নিরুৎসাহিত হওয়া ছাড়া গত্যন্তর আছে কি? তৃতীয় পক্ষ হলো পাঠকসমাজ। বালক এবং কিশোর পাঠকসমাজে বই পড়বার প্রবণতা যে আগেকার দিনের চেয়ে বর্তমানে বেশী; তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু তাদের মধ্যে কজন বিজ্ঞান-সাহিত্য পড়ে? সংখ্যাটি যে নিতান্তই নগণ্য, তা একটু লক্ষ্য করলেই যে কোন লোকের নজরে পড়বে। কয়েক বছর আগে ছোটদের জন্যে নতুন ধরণের কয়েকখানা বিজ্ঞান-সাহিত্য প্রকাশিত হয়েছিল। কলকাতার একটি প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক পত্রিকা মন্তব্য করেছিল—বাংলার ঘরে ঘরে এই গ্রন্থের প্রচলন হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু গ্রন্থ কয়-খানার প্রথম সংস্করণের এক হাজার বই কাটতেই বছর দশ-পনেরো লাগবে বলে মনে হচ্ছে—বলেন বইটির প্রকাশক। এই-ই যখন ছোটদের জন্যে বিজ্ঞান-সাহিত্যের স্বাভাবিক চিত্র, তখন আশার আলো কতটুকু—তা তিন পক্ষই ভেবে দেখতে পারেন। তবে ছোটদের জন্যে এই ধরণের সাহিত্য যাঁরা রচনা করেন, তাঁরা কি হাত গুটিয়ে নেবেন? নিশ্চয়ই নয়। কারণ তাঁদের বিশ্বাস করতে অনুরোধ জানাই—Every dark cloud is not without silver lining.

[শিশু সাহিত্য পরিষদ আয়োজিত সাহিত্য সভায় পঠিত প্রবন্ধের সংক্ষিপ্তসার। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান-চর্চার ইতিহাস লিখতে মূলতঃ শ্রীবুদ্ধদেব ভট্টাচার্য প্রণীত 'বঙ্গ সাহিত্যে বিজ্ঞান' বইটির সাহায্য নেওয়া হয়েছে।]

সঞ্চয়ন

ট্রিবোলজি

যখন কোন চাকা বা দরজা থেকে ক্যাঁচকোচ শব্দ ওঠে, আমরা তখন তাতে তেল দেই। সেই তেল দুটি অংশের গা বেয়ে নীচে নেমে গিয়ে পরস্পরের ঘর্ষণ রোধ করে।

কিন্তু বিজ্ঞানীরা ক্রমেই জানতে পারছেন যে, তেল বা তেলজাতীয় পদার্থগুলি ঘর্ষণ প্রতিরোধের ব্যাপারে সব সময় যথেষ্ট নয়। কাজেই তাঁরা ঘর্ষণজনিত ক্ষয়ক্ষতি নিবারণে নতুন নতুন পদ্ধতি আবিষ্কারের চেষ্টা করে চলছেন।

তাঁদের গবেষণার এই নতুন বিষয়ের নাম দিয়েছেন ট্রিবোলজি, অর্থাৎ ঘর্ষণ-সমীক্ষা। বৃটিশ ফার্ম ও ফ্যাক্টরিগুলিকে সাহায্যের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞানীরা ন্যাশন্যাল সেন্টার অব ট্রিবোলজিও গড়ে তুলেছেন।

বৃটেনের বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, বিভিন্ন কারখানায় চাকা, অ্যাক্সল, বিয়ারিং, পিষ্টন প্রভৃতি বদল করতে বছরে যে ব্যয় হয়ে থাকে, তার মোট পরিমাণ 50 কোটি পাউণ্ড।

মাত্র দু-বছর আগে ন্যাশন্যাল সেন্টার অব ট্রিবোলজির জন্ম হয়। এরই মধ্যে এই সংস্থা 70টি ফার্মের টাকা বাঁচাতে সাহায্য করেছে। কখনো কখনো সমস্যা তেমন দুরূহ নয়। কোন্ বিশেষ তেল বা গ্রীজের সাহায্যে কলকব্জা সবচেয়ে মসৃণভাবে চলবে, সেটি বের করতে পারলেই হলো। আবার অনেক সময় সেটা বের করাই যথেষ্ট নয়।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, অনেক খাদ্যোৎপাদক যন্ত্রেই তেল দেওয়া নিরাপদ নয়—তেল গড়িয়ে খাদ্য নষ্ট করতে পারে, এজন্যে বিজ্ঞানীরা এসব যন্ত্রপাতিতে তেল ব্যবহার না করে এক ধরণের প্লাষ্টিক ব্যবহার করছেন, যা যন্ত্রগুলিকে মসৃণভাবে চালু রাখে।

কলকব্জার সঙ্গে জড়িত আর একটি সাধারণ সমস্যা হলো—লরি বা মোটর গাড়ীর কলকব্জার সন্ধিস্থল থেকে তরল পদার্থ বেরিয়ে আসা বা লিক্ করবার ব্যাপার।

অনুরূপভাবে কলকব্জার সন্ধিস্থল থেকে বিপজ্জনক গ্যাস বা রাসায়নিক দ্রব্যও বেরিয়ে আসতে পারে। যন্ত্রের দুটি অংশের মধ্যে কিছু ফাঁক থাকা আবশ্যক। অবশ্য এই ফাঁকের ভিতর দিয়ে লিক্ করবার সমস্যাও থেকে যায়।

ট্রিবোলজিস্টরা এজন্যে এক ধরণের ধাতুর তৈরি আঁশ উদ্ভাবন করেছেন, যা এই ফাঁক বন্ধ করে দেয় অথচ যন্ত্রের দুটি অংশকে চলতে বাধা দেয় না। বস্তুতঃ এই ধরণের গবেষণার কথা মনে রেখেই বৃটেনের পারমাণবিক শক্তি কর্তৃপক্ষের সহায়তায় ন্যাশন্যাল সেণ্টার অব ট্রিবোলজি গড়ে ওঠে।

বৃটিশ বিজ্ঞানীরা অন্য আর এক ভাবেও কলকব্জার ক্ষয়ক্ষতি নিবারণের পথ দেখিয়ে দিয়েছেন। যন্ত্রাংশ নির্মাণে অনেক সময় ভুল উপাদান ব্যবহার করবার ফলে কলকব্জার বেশী ক্ষতি হয়। তাঁরা সেগুলি নানা রকম বিচিত্র পদ্ধতিতে বের করে থাকেন।

ল্যাঙ্কাশায়ারের রিস্লীতে অবস্থিত ন্যাশন্যাল সেন্টারে বর্তমানে প্রায় 30 জন ট্রিবোলজিস্ট কাজ করছেন। তবে তরুণ বিজ্ঞানীরা এই বিষয়ে পড়াশুনা করবার সুযোগ পান উত্তর ইংল্যাণ্ডের দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ে। এই দুটি বিশ্ববিদ্যালয় হলো লীডস্ ও স্যালফোর্ড।

অঙ্কের যাদুকর

অমিতোষ ভট্টাচার্য*

গণিতশাস্ত্রের উপর অসামান্য দখল বা তীক্ষ্ণ বুদ্ধি থাকলেই অতি দ্রুত গাণিতিক হিসাব করা সম্ভব, এমন কোন সহজ সিদ্ধান্ত করা যায় না। তাই যদি হতো, তাহলে আর্কিমিডিস, নিউটন বা আইনষ্টাইন সবাইকে চমকে দিয়ে অসামান্য দ্রুততার সঙ্গে মানসাঙ্ক করতে পারতেন। বিশ্ব-বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকদের অনেকেরই এই জাতীয় ক্ষমতার কোন পরিচয় নেই, যদিও গণিতশাস্ত্রে তাঁদের জ্ঞান ছিল অসামান্য। আবার বিপরীত চিত্রেরও অভাব নেই। বিজ্ঞান-জগতে কার্ল ফ্রেডারিক গসের অবদান অসীম। তিনি তো মাঝে মাঝে গর্ব করেই বলতেন—কথা বলার চেয়েও তাড়াতাড়ি তিনি অঙ্ক কষতে পারেন। শোনা যায়, তাঁর পিতা যখন শ্রমিকদের সাপ্তাহিক বেতনের হিসাব করছিলেন, তখন নিতান্ত শিশু এই গস পিতাকে একেবারে হতবাক্ করে দিয়ে হিসাবের ভুল দেখিয়ে দিয়েছিলেন। পরে আবার গুণে দেখা গেল, বালক গসের উত্তরটিই নির্ভুল! গস তখন লিখতে-পড়তে জানতেন না।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জন্ নয়ম্যান, এনরিকো ফের্মি আর রিচার্ড ফেম্যান এক সঙ্গে গবেষণা করতেন। এঁরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ বিষয়ে অত্যন্ত ধুরন্ধর বিজ্ঞানী ছিলেন। গণিত সংক্রান্ত কোন হিসাবের সমস্যা দেখা দিলেই এই তিন বৈজ্ঞানিক তৎপর হয়ে উঠতেন। ফের্মি এক-খানা স্লাইড রুলে মন দিতেন। ফেম্যান ডেস্ক ক্যালকুলেটর পছন্দ করতেন। নয়ম্যান সে সবের ধারে-কাছেও যেতেন না। তিনি চুপচাপ বসে মনে মনে হিসাব করতেন। আশ্চর্যের বিষয় হলো, নয়ম্যানের কাছ থেকে উত্তরটি আসতো সবার আগে। এই তিন জন বৈজ্ঞানিকের উত্তর সব সময়েই প্রায় এক হতো এবং এভাবে তাঁরা নিজেদের অঙ্কের শুদ্ধতা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হতেন।

নয়ম্যান, গস বা লিউনার্ড অয়লারের মত গণিতশাস্ত্রের রথী-মহারথীদের এই তাৎক্ষণিক অঙ্ক কষবার ক্ষমতাকে এক কথায় অলৌকিক বলা যেতে পারে। তবে তাঁরা কখনো লোকসমক্ষে তা প্রকাশ করেন নি বলে তাঁদের এই অভূতপূর্ব ক্ষমতার কথা বিশেষ একটা ছোট গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। কাজেই সাধারণ মানুষের কাছে এই সকল বৈজ্ঞানিকদের প্রতিভার আর একটি দিক একেবারে অজানা রয়ে গেছে। কিন্তু এঁদের চেয়েও দ্রুততার সঙ্গে হিসাব করতে পারেন এমন লোকও দেখা দিল। ক্ষমতাটিকে তাঁরা পেশা হিসাবে গ্রহণ করলেন এবং উনবিংশ শতকে ইংল্যাণ্ড, ইউরোপ আর আমেরিকার রঙ্গমঞ্চে দাঁড়িয়ে অঙ্কের যাদুকরেরা এই অলৌকিক শক্তির পরিচয় দিয়ে বেড়াতে লাগলেন। অঙ্ক কষবার ম্যাজিক তাঁদের রাতারাতি খ্যাতি আর অর্থের প্রথম পর্যায়ে নিয়ে এল। লোকে দারুণ শক্ত শক্ত অঙ্ক কষতে দিত আর তাঁরা অবলীলাক্রমে সে সব কষে ফেলতেন। এঁদের মধ্যে অনেকেই নিতান্ত শিশু অবস্থায় এই দ্রুত হিসাবে পোক্ত হয়ে উঠে-ছিলেন। তাঁদের কেউ কেউ নিজেদের অঙ্ক কষবার পদ্ধতি সম্পর্কে কিছু কিছু বিবৃতি দিয়েছেন এবং এই সব বিবৃতিকে ভিত্তি করে মনো-বিজ্ঞানীরা এই রহস্যময় ক্ষমতার উৎস-সন্ধানে

---

* ডিফেন্স ইলেকট্রনিক্স রিসার্চ লেবরেটরী, হায়দরাবাদ-5।

বিস্তর গবেষণা করেছেন। গবেষকদের ধারণা, যাঁরা এইরূপ দ্রুত অঙ্ক কষেন, তাঁদের অনেকেই হয়তো আসল পদ্ধতিগুলি বেমালুম চেপে গেছেন, নয়তো তাঁরা কিভাবে হিসাব করেন, নিজেরাও তা ভাল করে জানতে বা বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করেন নি। বরং ক্ষেত্রবিশেষে উল্টো একটা মানসিকতা লক্ষ্য করা গেছে—কেউ কেউ এই ক্ষমতার সঙ্গে একটা অলৌকিক ভাব মিশিয়ে দিয়ে সাধারণ মানুষের চোখে অসাধারণ ব্যাখ্যা পেতে চেষ্টা করেছেন।

এই ক্ষমতার সঙ্গে ঐশ্বরিক শক্তির কোন সম্পর্ক আছে কিনা, সেটা তর্কের ব্যাপার। কিন্তু জগতে যত মানুষ দেখা যায়, তাদের সকলেই সমান গুণী, জ্ঞানী বা কীর্তিমান হয় না। মানুষ মাত্রেরই প্রকৃতিদত্ত কিছু কিছু গুণ আছে; কারোর বেশী, কারোর কম। সচরাচর অদৃশ্য, এমন গুণ বা ক্ষমতা থাকে যে মানুষটির, আমরা তাকে চট করে আলাদা করে চিনে নিতে পারি আর তার প্রতিভার স্বীকৃতি দেই। অঙ্কের যাদুকরদের বেলায়ও হয়তো একই কথা খাটে। সাধারণভাবে প্রতিভা বলতে আমরা যা বুঝি, অধিকাংশ যাদু-করদের মধ্যে সে রকম কিছু একটা দেখা যায় নি। কেউ কেউ অত্যন্ত নিম্নস্তরের বুদ্ধিবৃত্তি নিয়েও অসামান্য গাণিতিক শক্তির পরিচয় দিয়েছে এবং অনেক চেষ্টা করেও এই শক্তির কোন যুক্তি-সঙ্গত ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব হয় নি।

সম্প্রতি 28 বছর বয়স্ক এক আমেরিকান যমজ সম্পর্কে আশ্চর্য সব খবর পাওয়া গেছে (Scientific American, August, 65, P. 42)। এদের নাম চার্লস ও জর্জ। বিগত 15টি বছরের 13টি বছর তারা একটা মানসিক হাসপাতালে কাটিয়েছে এবং বছর দুয়েক আগে তাদের নিউইয়র্ক ষ্টেট সাইকিয়াট্রিক ইনস্টিটিউটে স্থানা-ন্তরিত করা হয়েছে। ইনস্টিটিউটের বিশেষজ্ঞদের রিপোর্ট এই যমজের প্রতিভা সম্পর্কে অনেক আলোকপাত করেছে। সাল-তারিখ গণনায় এদের জুড়ি নেই বলা যেতে পারে। অথচ এদের I. Q. (Intelligent quotient) হলো 60 থেকে 80-র মধ্যে—অর্থাৎ প্রায় নির্বোধ। তারা খুব সহজ ও সাধারণ যোগ-বিয়োগও করতে পারে না। কিন্তু 2002 খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারীর 15 তারিখ শুক্রবার কিংবা 1599 খৃষ্টাব্দের 28শে অগাষ্ট বুধবার—ইত্যাদি তারা বেশ সাবলীলভাবেই বলতে পারে। যখন জিজ্ঞেস করা হলো, কোন্ কোন্ বছরে 21শে এপ্রিল বুধবার? দু'ভাই তৎক্ষণাৎ জবাব দিল 1968, 1957, 1953, 1946 ...। প্রায় 6 বছর বয়সেই জর্জ এই শক্তির পরিচয় দিতে আরম্ভ করে। আর 9 বছর বয়সে চার্লসের মধ্যে এই শক্তি সংক্রামিত হয়। প্রথম প্রথম চার্লস হিসাব করতে যথেষ্ট ভুল করতো, কিন্তু জর্জ কোন দিন ভুল করে নি।

এই যমজের সাল-তারিখ গণনার ক্ষমতা 200 বা 400 বছরের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। জানা গেছে, 6000 বছরের ক্যালেণ্ডার জর্জের নখদর্পণে। কাজেই তারা যে সব মুখস্ত রেখে স্মৃতিমন্থন করে উত্তর দেবে, তা প্রায় অসম্ভব এবং উত্তরের অসামান্য দ্রুততা যে কোন ফর্মুলা আশ্রয়ের সিদ্ধান্তকেও বাতিল করে দিয়েছে। বিশেষজ্ঞেরা এই ব্যাপারের কোন যুক্তিসঙ্গত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিতে পারেন নি বরং যমজের উত্তরটিই তাঁদের কাছে অনেক বেশী লজিক্যাল মনে হয়েছে। সাল-তারিখ গণনার এই অসামান্য দক্ষতার কারণ সম্পর্কে তাদের প্রশ্ন করা হলে তারা জবাব দিয়েছে—আমি জানতাম, কিংবা আমার মনের মধ্যে ছিল।

যে সব অতি নিম্ন-বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন লোক ক্ষেত্র-বিশেষে মানুষকে ভেল্কি দেখাতে পারে, তাদের বলা হয় Idiot Savant—সোজা বাংলায় বোকা বিজ্ঞলোক। জর্জ, চার্লস আর বাক্সটন নামে একজন ইংরেজ কৃষককে এই দলে ফেলা যেতে পারে। বাক্সটন সারা জীবন চাষ-আবাদ করে

কাটিয়েছে আর কোন দিন অঙ্ক কষবার পারদর্শিতা নিয়ে লোকের সামনে দাঁড়ায় নি। কিন্তু স্থানীয় সুনাম অবশেষে তাকে রয়েল সোসাইটিতে টেনে নিয়ে এল। একদিন তাকে 'রিচার্ড থ্রী' নাটকের অভিনয় দেখানো হলো। লণ্ডনের মঞ্চে ডেভিড গেরিকের তখন যথেষ্ট নামডাক। নাটক দেখা শেষ হলে বাক্সটন নাটকের ভালমন্দের ধারে-কাছেও গেল না, শুধু মন্তব্য করলো—অভিনেতা গেরিক মোট 14,445টি শব্দ উচ্চারণ করেছে এবং মঞ্চের উপর 5202 বার পা ফেলেছে। সব ব্যাপারে হিসাব করবার একটা অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ বাক্সটনের অঙ্ক কষবার ক্ষমতাকে প্রায় পাগলামির পর্যায়ে নিয়ে এসেছিল। শোনা যায়, যে কোন ক্ষেতের উপর একবার হেঁটে গিয়ে তার ক্ষেত্রফল আসন্ন বর্গইঞ্চিতে অদ্ভুত দক্ষতার সঙ্গে বলতে পারতো। কিন্তু সে কোন দিন লিখতে, পড়তে বা অঙ্ক কষতে জানতো না।

জনসমক্ষে এই ধরণের অলৌকিক অঙ্ক কষবার পরিচয় দেন জারা কলবার্ন। ইনি 1804 সালে এক গরীব কৃষকের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। কলবার্নের পিতা, প্রপিতামহী আর তাঁর এক ভাইয়ের দু-হাতে ছ'টা করে আঙুল ছিল। জারা কলবার্নও দু-হাতে একটা করে বাড়্তি আঙুল থাকবার পারিবারিক ঐতিহ্য এড়াতে পারেন নি। কলবার্নের দশ বছর বয়সে অস্ত্রোপচার করে এই আঙুল দুটি বাদ দেওয়া হয়। জীবনের প্রথম অধ্যায়ে এই বাড়্তি আঙুল দুটিই তাঁর এই অদৃষ্টপূর্ব গণনাশক্তির জন্ম দিয়েছিল বলে অনেকে কল্পনা করেন। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এই কল্পনার কোন ভিত্তি নেই। আমাদের দশমিক প্রণালীর সঙ্গে দু-হাতে দশটা করে আঙুলের যতটা নিকট সম্পর্ক আর গণনা-পদ্ধতির যে লজিক পাওয়া যায়, বর্তমান ক্ষেত্রে তা পাওয়া যায় না। তাছাড়া অনেক মানুষের হাতে এই রকম বেশী আঙুল থাকে, কিন্তু তারা সবাই দ্রুত গতিতে অঙ্কের খেলা দেখাতে পারে না। কলবার্ন লেখা-পড়া শেখবার অনেক আগে থেকেই গুণতে পারতেন। তাঁর বাবা এই গণনাশক্তির ব্যবসায়িক ভবিষ্যৎটি চট করে কল্পনা করে নিলেন। তাই আর দেরী না করে ছেলেকে নিয়ে লম্বা এক ভ্রমণে বের হলেন। আট বছর বয়সে কলবার্নের নাম সারা ইংল্যাণ্ডে ছড়িয়ে পড়লো। সেই বয়সে যে কোন চার অঙ্কের দুটি সংখ্যার গুণফল তিনি প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই করে দিতে পারতেন। একবার তাঁকে 21734-কে 543 দিয়ে গুণ করতে বলায় সামান্য ভেবে তিনি বলে দিলেন 11,801,562! কি করে গুণফলটি পেলেন জানতে চাইলে তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, 543 হলো 181 আর 3-এর গুণফল। 543 দিয়ে গুণ না করে 181 আর 3 দিয়ে মূল সংখ্যাটিকে গুণ করা অনেক সোজা। তাই তিনি 21734-কে প্রথমে 3 এবং পরে 181 দিয়ে গুণ করেছেন।

ওয়াশিংটন আর্ভিং নামে কলবার্নের এক শুভানুধ্যায়ী কিছু টাকা-পয়সার ব্যবস্থা করে তাঁকে স্কুলে পাঠালেন। শিক্ষার প্রথম পর্ব শেষ হলো প্যারিসে, দ্বিতীয় পর্ব ইংল্যাণ্ডে। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে কলবার্ন অঙ্কের ম্যাজিক দেখানো ছেড়ে দিলেন। স্কুল-কলেজের শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মন অন্য সব পাঠ্যবস্তুর দিকে আকৃষ্ট হবার ফলেই তিনি মানসাঙ্ক কষা ছেড়ে দিয়েছিলেন কিনা জানা যায় না কিংবা এমনও হতে পারে যে, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সেই ক্ষমতা অন্তর্হিত হয়েছিল। 35 বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হবার আগে পর্যন্ত কলবার্ন নরউইক বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদেশী ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন।

কলবার্নের সমসাময়িক জর্জ পার্কার বিডার ইংল্যাণ্ডে অঙ্ক কষবার ভেল্কি দেখিয়ে সবাইকে অবাক করে দিয়েছিলেন। বিডারের জন্ম 1805 সালে, জন্মস্থান ডেভনশায়ার। বিডারের বাবা

পাথরের কাজকর্ম করতেন আর বালক বিডারকে মোটামুটিভাবে সংখ্যা গণনার বিদ্যা শিখিয়ে ছিলেন, আর্থিক কারণে এর বাইরে কোন রকম উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা আর সম্ভব হয় নি। অথচ কেবল খেলাচ্ছলে বিডার মার্বেল আর বোতাম দিয়ে অঙ্ক কষায় বেশ পোক্ত হয়ে গেলেন। 3 বছর বয়সে তিনি পিতার সঙ্গে দেশভ্রমণে বের হয়ে যত্রতত্র অঙ্কের ম্যাজিক দেখিয়ে বেড়াতে লাগলেন। কেউ এক জন প্রশ্ন করেছিলেন—পৃথিবী যদি চাঁদ থেকে 123,256 মাইল দূরে হয় এবং শব্দের গতি মিনিটে চার মাইল হলে পৃথিবী থেকে চাঁদে শব্দ যেতে কতক্ষণ লাগবে? এক মিনিটেরও কম সময়ে বিডার উত্তর দিয়েছিলেন 21 দিন 9 ঘণ্টা 34 মিনিট। দশ বছর বয়সে তাঁকে 119, 550, 669, 121-এর বর্গমূল নির্ণয় করতে বলা হলে বিডার মাত্র 30 সেকেণ্ডে জবাব দেন 345, 761।

এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকেরা বিডারের শিক্ষাদীক্ষার ভার নেন। পরবর্তী কালে তিনি পড়াশুনায় দিব্যি নাম করে ফেলেন এবং যথাসময়ে ইংল্যাণ্ডের একজন প্রথম শ্রেণীর ইঞ্জিনীয়াররূপে সুনাম অর্জন করেন। ইংল্যাণ্ডের রেলপথ প্রসারণে তাঁর জীবনের অনেকাংশ ব্যয়িত হলেও তাঁর নাম অমর হয়ে আছে লণ্ডনের ভিক্টোরিয়া ডক নির্মাণের জন্যে। ভিক্টোরিয়া ডক নির্মাণের কলাকৌশল তাঁরই কল্পনাপ্রসূত এবং তাঁরই কর্তৃত্বাধীনে ডকটি নির্মিত হয়েছিল। কলবার্নের সঙ্গে বিডারের তুলনা করলে দেখা যায়, বয়সের সঙ্গে বিডার দ্রুত অঙ্ক কষবার শক্তি হারিয়ে ফেলেন নি। যদিও পরবর্তী কালে যন্ত্রবিদের বৃত্তি নেবার পর তিনি কচিৎ কখনো অঙ্কের ম্যাজিক দেখিয়েছেন।

কলবার্ণ আর বিডার দু-জনেই গুণ করবার সময় বড় বড় সংখ্যাগুলিকে কয়েকটা ভিন্ন ভিন্ন সুবিধাজনক অংশে ভাগ করে নিতেন। তারপর বীজগণিতের বজ্রগুণনের মত একটা বিশেষ প্রক্রিয়ায় গুণফল বের করে নিতেন। আজকাল অনেক স্কুলেও এই পদ্ধতিতে অঙ্ক শেখানো হয়ে থাকে। উদাহরণ হিসেবে 586 আর 79-এর গুণফল বিডারের নিয়মে নির্ণয় করতে হলে:—

$$586 \times 79$$
$$586 = 500 + 80 + 6$$
$$79 = \quad 70 + 9$$

500 + 80 + 6

70 + 9
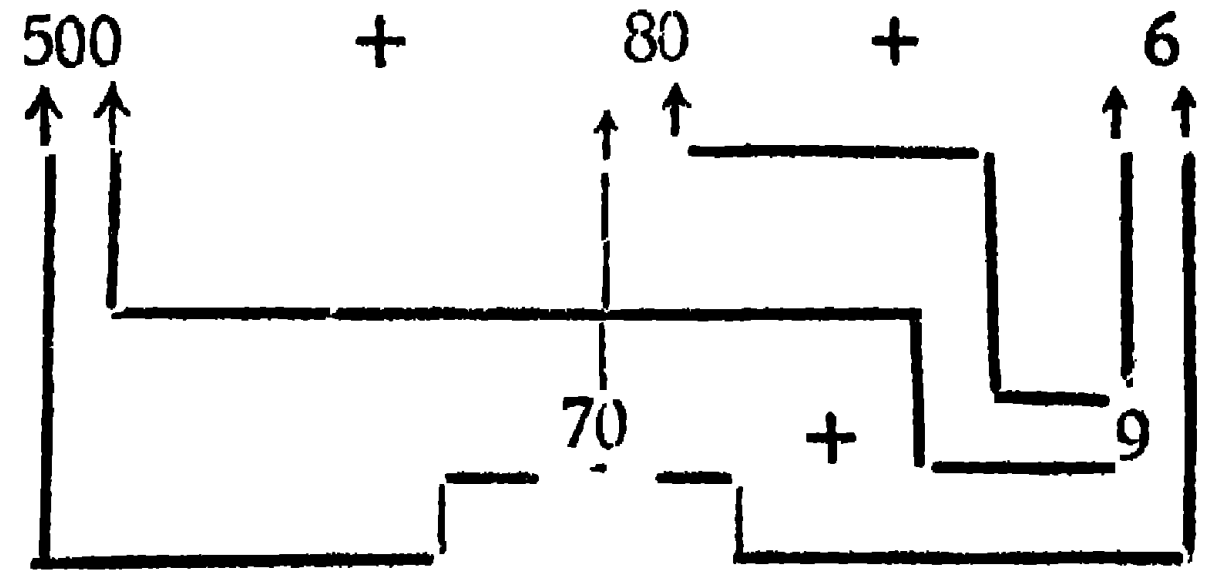
1ম ধাপ $= 500 \times 70 = 35000$

2য় ধাপ $= 35000 + (70 \times 80) = 40600$

3য় ধাপ $= 40600 + (70 \times 6) = 41020$

4র্থ ধাপ $= 41020 + (9 \times 500) = 45520$

5ম ধাপ $= 45520 + (9 \times 80) = 46240$

6ষ্ঠ ধাপ $= 46240 + (9 \times 6) = 46294$

অর্থাৎ $586 \times 79 = 46,294$।

আপাতদৃষ্টিতে এই পদ্ধতিটি বেশ জটিল মনে হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু প্রচলিত ডান দিক থেকে বাঁ দিকে গুণনের প্রক্রিয়া থেকে এটা যে অনেক সহজ, সেটা গুণনের ছকটা মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করলেই স্পষ্ট হবে। তবে এই পদ্ধতিটি নিঃসন্দেহে অভ্যাস-সাপেক্ষ এবং চেষ্টা করলে যে কেউ এই নিয়মে মনে মনে অঙ্ক কষতে পারবেন। প্রশ্ন উঠতে পারে, প্রচলিত নিয়ম থেকে এটি সহজ কেন? প্রশ্নটির উত্তর বিডার নিজেই দিয়েছেন। লণ্ডনের ইনস্টিটিউট

অব সিভিল ইঞ্জিনীয়ার্সে তিনি একটা মূল্যবান বক্তৃতা দেন। বক্তৃতাটি 1856 সালে ইনস্টিটিউটের জার্নালে ছাপা হয়। বিডারের মতে, একটা ধাপ অঙ্ক কষা হয়ে গেলে শুধু গুণফলটি ছাড়া আর কিছু মনে রাখবার দরকার নেই। দ্বিতীয় ধাপের গুণফলের সঙ্গে মনে-রাখা পূর্বের গুণফলটি যোগ করে যোগফলটি মনে রাখলেই হবে। এই ভাবে পরবর্তী ধাপগুলিও খুব সহজে করা যাবে।

এই শতকের একটি বিস্ময় হলেন ভারতের শ্রীশকুন্তলা দেবী। ইনিও খুব অল্প বয়স থেকে অঙ্ক কষায় অদ্ভুত ক্ষমতার পরিচয় দেন। শকুন্তলা দেবী 15 বছর বয়সে ইংল্যাণ্ডে যান এবং বি. বি. সি-র টেলিভিশন প্রোগ্রাম করে আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করেছেন।

একজন চৈনিক অধ্যাপক 2^{197}-এর মান নির্ণয় করতে দেন শকুন্তলা দেবীকে আর সঙ্গে সঙ্গে একটি কম্পিউটারও একই অঙ্ক কষতে আরম্ভ করে দেয়। কোন কাগজ-কলম না নিয়ে 31 বছরের এই কর্ণাটকী মহিলা মাত্র 30 সেকেণ্ডে জবাব দেন: 170141183460469231731687303715884105-728 আর যন্ত্রটির লাগলো পুরা দু-মিনিট। চৈনিক অধ্যাপক মন্তব্য করেছিলেন, এর চেয়ে কঠিনতর কোন অঙ্কের কথা তিনি ভাবতেই পারেন না। 1966 সালে তিনি দক্ষিণ কোরিয়া, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর এবং হংকং-এর বিভিন্ন জায়গা ঘুরে আসবার পর বোম্বাইয়ে তিনি বলেছেন যে, জীবনের সবচেয়ে শক্ত অঙ্কটি কষতে তিনি সময় নিয়েছেন মাত্র 52 সেকেণ্ড। অঙ্কটি ছিল একটি 31-অঙ্কের সংখ্যার সঙ্গে 17 অঙ্কের সংখ্যার গুণ। তাঁর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নেমেছিল একটি যান্ত্রিক মস্তিষ্ক। কিন্তু যন্ত্রটি শকুন্তলা দেবীর সঙ্গে পাল্লা দেওয়া তো দূরের কথা, অঙ্কটি শেষই করতে পারলো না (The Indian Express, Oct. 11, 1967)।

সাল-তারিখ গণনা শকুন্তলা দেবীর সবচেয়ে প্রিয় খেলা। যে কোন সালের কোন্ তারিখ কি বার ছিল—ইত্যাদি তিনি অসামান্য দক্ষতার সঙ্গে মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই বলে দিতে পারেন।

ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে অটোমেশন নিয়ে জল্পনা-কল্পনা আর আন্দোলনের শেষ নেই। অনেক বিদেশী মুদ্রা খরচ করে যখন দামী দামী সব যন্ত্রপাতি আমদানী করবার ব্যবস্থা হচ্ছে, ঠিক সেই সময় দিল্লীর I. I. T. একটি কম্পিউটারের বিকল্প হিসাবে শকুন্তলা দেবীর কাছে একটি প্রস্তাব দিয়েছিল। তিনি রহস্য করে বলেছেন —কারণ আমার জন্যে তো আর বিদেশী মুদ্রা খরচ করতে হবে না!

শকুন্তলা দেবী তাঁর মাতৃভাষা কানাড়ী ছাড়াও তামিল, স্প্যানিস, ইংরেজী প্রভৃতি ভাষা জানেন। তাঁর সাহিত্যপ্রীতিও অসামান্য। এপর্যন্ত তিনি 11-টি ইংরেজী ছোট গল্প লিখেছেন এবং সব কয়টি গল্পই বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। কানাড়ী ভাষায় তাঁর লেখা একটি নাটকও আছে।

কিভাবে তিনি এত দ্রুতগতিতে এত জটিল অঙ্ক কষতে পারেন, সে সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হলে প্রশস্ত ললাটে একবার হাত বুলিয়ে জবাব দিয়েছিলেন—এটা হয়তো ভগবানের দেওয়া একটি আশীর্বাদ। জন্মের এক মাস আগে বাবা আর এক ঘণ্টা পরে মা মারা যাবার পর একমাত্র ভগবান ছাড়া তাঁর সহায় আর কেউ ছিল না।

দ্রুত অঙ্ক কষার রাজ্যে জীবিত বিস্ময়দের মধ্যে আলেকজাণ্ডার ক্রেইগ এইটকিন অন্যতম। ইনি এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত শাখার এমেরিটাস অধ্যাপক। 1895 সালে নিউজিল্যাণ্ডে তাঁর জন্ম। অন্যান্য অঙ্কের যাদুকরদের মত নিতান্ত অল্প বয়স থেকে মনে মনে তিনি অঙ্ক কষা আরম্ভ করেন নি বরং গোড়ার দিকে তিনি অঙ্কে মোটেই চৌকশ ছিলেন না।

কিন্তু যেদিন অঙ্কের ক্লাসে মাষ্টার মশাই $a^2-b^2=(a+b)(a-b)$ সূত্রটি দিয়ে কত সহজে অঙ্ক কষা সম্ভব দেখালেন, সেদিন দ্রুত অঙ্ক কষায় তাঁর হাতেখড়ি হয় (Science Journal, August, 1967, P. 32)। বিডারের ঐতিহাসিক বক্তৃতার প্রায় এক-শ' বছর পরে এট্‌কিন লণ্ডনের সোসাইটি অব ইঞ্জিনীয়ার্সে 1954 সালে একটি চমকপ্রদ বক্তৃতা দেন। বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল: The Art of Mental Calculation with Demonstration। বক্তৃতাটি সোসাইটির জার্নালে প্রকাশিত হয় (December, 1954)। এট্‌কিনের মূল্যবান বক্তৃতাটি একটি সম্পূর্ণ অজানা-অচেনা জগতের উপর আলোকপাত করেছে। দ্রুত অঙ্ক কষতে গেলে মানুষটির মনে কি প্রতিক্রিয়া ঘটে, মন কোথায় কিভাবে চিন্তা করে, কেমন করে হিসাব করে—ইত্যাদি অনেক স্বাভাবিক কৌতূহল আর প্রশ্ন নিয়ে এট্‌কিনের আগে কেউ জনসমক্ষে বিশ্লেষণ করে বলেন নি।

অঙ্কের যাদুকররা যখন বড় বড় হিসাব প্রায় চোখের পলকে করে দেন, তখন কি অঙ্কটির প্রতিটি ধাপ মনের পর্দায় ছায়াছবির মত দেখতে পান? কেউ কেউ পান, কেউ কেউ পান না। আবার কেউ কেউ জানেনই না যে, তাঁরা দেখেন, কি দেখেন না। এট্‌কিন বলেছেন যে, তিনি চেষ্টা করলেই দেখতে পান। "অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অঙ্কটির উত্তর মনের কোন এক আড়ালে যেন লুকিয়ে থাকে। আসলে মনের এই অবস্থাটি শ্রুতি বা দৃষ্টির বাইরে একটি অভিনব জগৎ, যার সঠিক বর্ণনা আমি দিতে পারবো না। আমি অনেক ক্ষেত্রে দেখেছি, অঙ্ক কষবার আগেই আমি উত্তর পেয়ে গেছি। অঙ্ক কষা হয়ে গেলে উত্তর মেলাতে গিয়ে আমি নিজেই অবাক হয়ে গেছি।"

এট্‌কিনের বক্তৃতা থেকে জানা যায় দ্রুত হিসাব কষবার জন্যে চাই অসামান্য স্মৃতিশক্তি আর সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির একটি মানসিকতা। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই অনেক বড় বড় সংখ্যাকে মনের মধ্যে ধরে রাখতে হয়। কারণ মানসাঙ্ক করতে গেলে নানা রকমের সর্টকাট, চার্ট ফর্মুলা আর হিসাবের অসংখ্য গোলকধাঁধা একেবারে নখদর্পণে থাকা চাই। মনে রাখতে পারবার অসামান্য এই ক্ষমতা আর ঐকান্তিক আগ্রহই এই সব মানুষদের অন্য মানুষ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা করে রেখেছে। বিডারের বয়স যখন দশ, তখন তিনি কাউকে দিয়ে বোর্ডে 40টি অঙ্কের একটি রাশি লিখিয়ে নিয়ে দর্শকদের দিকে মুখ রেখে সংখ্যাটি গড় গড় করে পড়ে দিতেন। অনেক অঙ্কের যাদুকর প্রোগ্রামের শেষে প্রোগ্রামের প্রতিটি সংখ্যাই মুখস্ত বলে দিতে পারেন। এই ভাবে সংখ্যা মনে রাখবার নানা কায়দা আছে এবং ব্যক্তিবিশেষের মনে রাখবার এই টেকনিক আলাদা আলাদা হয়ে থাকে। সংখ্যাগুলিকে অনেকে ছন্দে বা কথায় গেঁথে রাখেন আর দর্শকদের অবাক করে দেবার পক্ষে এই পদ্ধতিটি একেবারে মোক্ষম বলা যেতে পারে। আসলে এই ছন্দ বুনে যাওয়ার উপর নির্ভর করছে কে কত তাড়াতাড়ি সংখ্যাগুলিকে মুখস্ত বলে দিতে পারবে। প্রসঙ্গতঃ এট্‌কিন তাঁর সমসাময়িক মার্কুইস স্রবেঁয়র নামে একজন ফরাসী যাদুকরের নাম উল্লেখ করেন। তিনি পাই-এর (π = বৃত্তের পরিধি ÷ বৃত্তের ব্যাস) মান দশমিক স্থানের পর 707 অঙ্ক পর্যন্ত মুখস্ত করে রেখেছিলেন। তোতাপাখীর মত মুখস্ত করে রাখবার ব্যাপারটিকে তিনি সময় আর শক্তির অপচয় বলে মনে করতেন। অথচ স্রবেঁয়রের কয়েক বছর আগেই এই কর্মটি করেছিলেন। কিন্তু তাঁর মনে রাখবার ধরণটি সম্পূর্ণ পৃথক আর অভিনব ছিল বলে তাঁর কাছে মুখস্ত করাটা সময় আর শক্তির অপব্যবহার বলে মনে হয় নি। π-এর মানকে

তিনি 50 অঙ্কের কয়েকটা সারিতে ভাগ করে রাখলেন। এই 50টি অঙ্ককে আবার পাঁচটা-পাঁচটা করে দশটা ভাগে ভাগ করে একটা ছন্দের আকারে মনে রেখে দিলেন। π-এর মান 1000 অঙ্ক পর্যন্ত নির্ণয় করা হলে দেখা গেল 1873 সালে মানক্স 707 অঙ্ক পর্যন্ত যে মানটি নির্ণয় করেছিলেন, তার শেষের 150টি অঙ্ক ভুল; অর্থাৎ এট্কিন আর দ্রবেরয়ের মনে-রাখা মানটি একেবারে মাঠে মারা গেল! কিন্তু এট্কিন হার মানলেন না। তিনি মানক্সের অশুদ্ধ জায়গাটি থেকে ছন্দটিকে একটু নতুন করে ঢেলে সাজালেন। এবারও কোন অসুবিধা হলো না। তিনি 1000 দশমিক স্থান পর্যন্ত π-এর মানকে মনের মধ্যে গেঁথে রেখে দিলেন। তারপর বক্তৃতা বন্ধ করে π-এর মান সাবলীল ভঙ্গীতে 250 অঙ্ক পর্যন্ত লিখলেন। দর্শকদের মধ্যে একজন পরবর্তী 50টি অঙ্ক বাদ দিয়ে লিখতে অনুরোধ করতেই তিনি প্রায় না থেমেই 301-তম অঙ্ক থেকে লিখতে সুরু করলেন। 50টি অঙ্ক লেখা হয়ে গেলে আবার অনুরোধ এল 501-তম স্থান থেকে যেন আর 105টি অঙ্ক লেখা হয়। এট্কিন শ্রোতাদের অনুরোধ রাখলেন। তারপর π-এর একটি টেবিল থেকে মিলিয়ে দেখা গেল, এট্কিনের মানে কোন ভুল নেই। শুধু তাই নয়, 1000 স্থান পর্যন্ত π-এর মান তিনি উল্টো দিক থেকেও অনায়াস ভঙ্গীতে লিখতে পারেন।

এট্কিনের বক্তৃতা থেকে জানা যায়, তাঁর মগজে ঠাসা রয়েছে অসংখ্য বর্গমূল, ঘনমূল ও লগারিদমের টেবিল। তাছাড়া এক বছরে কত সেকেণ্ড, কত আউন্সে এক টন ইত্যাদি অতিকায় জনপ্রিয় সংখ্যা তাঁর কণ্ঠস্থ। 97 হলো 100-এর নিকটতম সর্ববৃহৎ মৌলিক সংখ্যা। দর্শকদের কাছ থেকে কচিৎ কখনো $\frac{1}{97}$-এর দশমিক মান নির্ণয়ের প্রশ্ন আসতে পারবার সম্ভাবনায় এট্কিন তা সম্বন্ধে স্মৃতিবদ্ধ করে রেখেছেন। তাছাড়া রয়েছে নানা সর্টকাটের কলাকৌশল। এসব কায়দা কিছু কিছু শিক্ষার দ্বারা আয়ত্ত আর বাকী সব নিজস্ব আবিষ্কারের ফল। যে কোন জটিল অঙ্ক কষতে গেলে সবার আগে যা দরকার, তা হলো চকিতে সবচেয়ে মোক্ষম ষ্ট্রাটেজী নির্ধারণ করা। এই তাৎক্ষণিক ষ্ট্র্যাটেজীর বৈশিষ্ট্য বোঝাতে গিয়ে তিনি একটা উদাহরণ দিয়েছেন—আপনাকে কেউ 9-অঙ্কটি দিয়ে শেষ হয়েছে এমন কোন ভগ্নাংশের দশমিক মান নির্ণয় করতে দিয়েছেন। ধরুণ, ভগ্নাংশটি হলো $\frac{1}{59}$। সরাসরি ভাগ না করে 59-এর জায়গায় মনে মনে লিখুন 60 এবং 0·1-কে 6 দিয়ে ভাগ করুন। এট্কিনের ভাগ করবার পদ্ধতিটি এক কথায় অভিনব আর চিত্তাকর্ষক।

```
          0·01694915
   6 ) 0·10169491......(
          6
          41
          36
           56
           54
            29
            24
             54
             54
               9
               6
              31
              30
               1......ইত্যাদি।
```

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, প্রতি ধাপে ভাগফলে যে অঙ্কটি এসেছে, সেটাকে ভাজ্যের পরবর্তী অঙ্কে বসানো হয়েছে। সাধারণ দশমিক ভাগ প্রক্রিয়ার যতক্ষণ অঙ্ক না মেলে বা পৌনঃপুনিক না আসে, ততক্ষণ আমরা সচরাচর শূন্য (0) বসিয়ে থাকি। কিন্তু এট্কিন তা করেন নি এবং এভাবে হিসাব করে গেলে 9 দিয়ে শেষ

হয়েছে, এমন সব ভগ্নাংশের দশমিক মান নির্ণয় অতি সহজে করা সম্ভব। আর একটি উদাহরণ নেওয়া যাক—$\frac{5}{33}$। আমাদের যতদূর সম্ভব লক্ষ্য করতে হবে, নীচের সংখ্যাটির প্রথম অঙ্কে যেন 9 আসে। তাহলে উপরে আর নীচে 3 দিয়ে গুণ করে $\frac{15}{99}$ পাওয়া গেল। এখন 99-এর সঙ্গে 1 যোগ করে 1·5-কে 10 দিয়ে ভাগ করলেই হলো।

বীজগণিতের বহু প্রচলিত একটি সূত্র প্রয়োগ করে এট্কিন বর্গনির্ণয়ের সমস্যাটিকে নিতান্ত সহজ করে এনেছেন। এইভাবে অঙ্ক কষবার অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন স্কুলজীবনে তাঁর অঙ্কের শিক্ষকের কাছ থেকে। এট্কিনের বর্গনির্ণয়ের পদ্ধতি অবলম্বন করে 623-এর বর্গ নির্ণয় করা যাক।

প্রশ্ন : 623×623

ষ্ট্র্যাটেজী : $a^2 = (a+b)(a-b)+b^2$

$$623 \times 623 = (623+23)(623-23)+23^2$$
$$= 646 \times 600 + 529$$
$$= 388129$$

এখানে b-এর এমন একটি মান নিতে হবে, যা হবে আকারে ছোট এবং এক বা একাধিক শূন্যসমেত (a+b) অথবা (a−b)-এর মান প্রকাশ করে। বলা বাহুল্য b-এর বর্গের মানটি অবশ্যই আপনার মুখস্ত থাকা চাই। যদি দুই অঙ্কের কোন সংখ্যার একক স্থানে 5 থাকে, তাহলে এট্কিনের ফর্মুলা দিয়ে একনিমেষে তার বর্গ নির্ণয় করা সম্ভব। উদাহরণ হিসাবে সংখ্যাটি যদি 75 হয়, তাহলে 7-এর পরবর্তী অঙ্ক 8 দিয়ে 7-কে গুণ করুন। পেলেন 56। এখন 5-এর বর্গ হলো 25। তাহলে 75^2 হবে 5625। একই-ভাবে $55^2 = 3025$, $95^2 = 9025$ ইত্যাদি।

শোনা যায় গ্লাসগোর একজন গণিতের অধ্যাপকের সঙ্গে এট্কিন একবার ডেস্ক ক্যাল-কুলেটরের একটি প্রদর্শনী দেখতে যান। প্রদর্শনীর একটি ষ্টলে একজন ভদ্রলোক যন্ত্র সম্পর্কে একটি মনোরম বক্তৃতা দিয়ে বেশ নাটকীয় ভঙ্গীতে ঘোষণা করলেন—এবার আমরা 23,586কে 71,243 দিয়ে গুণ করবো। ভদ্রলোকের মুখের কথা প্রায় কেড়ে নিয়ে এট্কিন জবাব দিয়েছিলেন—আপনি পাবেন 162,12,80,838! ষ্টলের ম্যানেজার ব্যাপারটিকে নিছক ঠাট্টা ভেবে স্বয়ং এগিয়ে এসে যন্ত্রের সাহায্যে যথারীতি গুণটি করলেন এবং অতিমাত্রায় অবাক হয়ে গম্ভীরভাবে আর দ্বিতীয় কথাটি না বলে নিজের জায়গায় চলে এসেছিলেন।

কয়েকটি বিশেষ ব্যতিক্রম বাদ দিলে দ্রুত অঙ্ক কষার ক্ষেত্রে যন্ত্র মানুষকে নিঃসন্দেহে ছাড়িয়ে গেছে। আজকাল সব ব্যাপারে হিসাব করতে বসে মানুষ সময়ের অপচয় করে না। বিজ্ঞানের বিস্ময়কর অগ্রগতির আর সমস্যা সমাধানের শুদ্ধতার মান বজায় রাখতে হলে যন্ত্রের সাহায্য ছাড়া আর উপায় নেই। তাছাড়া চাহিদা মত কোন দেশেই অঙ্কের যাদুকর পাওয়া যায় না—যাতে যন্ত্রের বদলে মানুষ বসিয়ে দিলেই কাজ চালানো যেতে পারে! যতই বিজ্ঞানের উন্নতি হতে থাকবে, ততই মানুষ আরও বেশী যন্ত্রনির্ভর হয়ে পড়বে; ফলে এমন দিন হয়তো আসবে যখন এট্কিন বা শকুন্তলা দেবীর মত প্রতিভা আর দেখা যাবে না। এট্কিন নিজেই স্বীকার করেছেন যে, যেদিন তিনি প্রথম ডেস্ক ক্যালকুলেটর পেলেন, সেদিন থেকেই মনে মনে অঙ্ক কষবার আর প্রেরণা পেতেন না। তিনি তাঁর ঐতিহাসিক বক্তৃতার শেষে মন্তব্য করলেন—...কাজেই... ভবিষ্যতে মানুষ কম্পিউটার নামক স্পেসিমেন খুঁজে বেড়াবে আর আমি স্বচ্ছন্দ্যে কল্পনা করে নিতে পারি যে, আমার এই শ্রোতাদের মধ্যে কেউ না কেউ 2000 খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বেঁচে থাকবেন আর হয়তো উদাসীনভাবে মন্তব্য করবেন...হঁ্যা, আমি এ রকম একজনকে জানতাম বৈকি!

বিজ্ঞান-সংবাদ

চাঁদের মাটি থেকে জল

মার্কিন মহাকাশ-বিজ্ঞানীরা চাঁদের মাটি থেকে অক্সিজেন ও জল উৎপাদনের একটি সহজ ও কার্যকর পন্থা খুঁজে পেয়েছেন। এতে চাঁদে গিয়ে মানুষের বসবাস করবার সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। তাছাড়া গ্রহান্তরে যাবার জন্যে বিরাটকায় মহাকাশযানসমূহের চাঁদে এসে ইন্ধন নিয়ে যাবার সম্ভাবনাও দেখা দিয়েছে। অক্সিজেন মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে, শ্বাস-প্রশ্বাসে মানুষ অক্সিজেন নেয়। এই অক্সিজেনই আবার মহাকাশযানেও চলনশক্তি জোগায়।

আমেরিকার মনুষ্যবাহী মহাকাশযান কেন্দ্রের দশজন বিজ্ঞানী জানিয়েছেন যে, এক শত পাউণ্ড চান্দ্রশিলা থেকে এক পাউণ্ড জল উৎপাদন করা যেতে পারে। তবে ঐ মাটিকে চুম্বক শক্তির সাহায্যে জমাট ও ঘনীভূত করতে পারলে প্রতি এক শত পাউণ্ড শিলা থেকে 14 পাউণ্ড পর্যন্ত জল পাওয়াও সম্ভব। ঐ পদ্ধতিতে একটি পাত্রে চান্দ্রমৃত্তিকা ও শিলা রাখা হয় এবং আতসী কাচের মাধ্যমে কেন্দ্রীভূত সূর্যরশ্মির সাহায্যে এই শিলা ও মাটিকে 6 শত থেকে 13 শত ডিগ্রী কা: পর্যন্ত উত্তপ্ত করা হয়। অতঃপর ঐ পাত্রে হাইড্রোজেন মিশে এক ধরণের বাষ্প তৈরি হয়। এই বাষ্পকে শীতল করেই জল পাওয়া যায়। আর অক্সিজেন পাবার পন্থা হলো, এই বাষ্পকে ইলেকট্রোলাইসিস সেলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত করালেই হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন পৃথক হয়ে যায়।

চাঁদের মাটিতে ইলমেনাইট নামে যে পদার্থ প্রচুর পরিমাণে রয়েছে, তা আসলে আয়রন টিটেনিয়াম অক্সাইড। অ্যাপোলো-11-এর, অ্যাপোলো-12-এর মহাকাশচারীরা চাঁদ থেকে যে সকল মৃত্তিকা ও শিলা পৃথিবীতে নিয়ে এসেছিলেন। সে সকল বস্তু পরীক্ষা ও বিশ্লেষণ করেই এই কথা শোনা গেছে।

তবে এই নূতন পদ্ধতিতে জল বা অক্সিজেন উৎপাদনের জন্যে চাঁদ থেকে আনা এই সকল উপাদান ব্যবহার করা হয় নি। বিজ্ঞানীরা কৃত্রিম উপায়ে চান্দ্র মৃত্তিকা তৈরি করে সেই সকল মৃত্তিকার উপর এই পরীক্ষা চালিয়েছিলেন। ইলমেনাইট নিয়ে আসা হয়েছিল ক্যানাডা থেকে, আর সপ্টরক বা লবণজাতীয় পাথর হাওয়াই থেকে। এই দুটি উপকরণ উপযুক্ত পরিমাণে মিশিয়ে তাঁরা চাঁদের মৃত্তিকার অনুরূপ মৃত্তিকা তৈরি করেন। চাঁদে জল উৎপাদনের জন্যে হাইড্রোজেন অবশ্য পৃথিবী থেকে বয়ে নিয়ে যেতে হবে। সুবিধা এই যে, একই হাইড্রোজেন বহুবার ব্যবহার করা যাবে।

মনুষ্যবাহী মহাকাশযান কেন্দ্রের গবেষণাগারে এই পদ্ধতি পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। বিজ্ঞানীরা যে সকল সাজসরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতির সাহায্যে এই পরীক্ষা চালিয়েছিলেন, সেগুলির ব্যবহার সম্পর্কে পেটেন্ট বা বিশেষ অধিকার লাভের জন্যে তাঁরা আবেদন করেছেন।

নতুন ধরণের পাঁউরুটি

বিজ্ঞানীরা নতুন এক ধরণের পাঁউরুটি তৈরি করতে পেরেছেন, যাতে অনেক কম পরিমাণ গম লাগে।

21টি উন্নয়নশীল দেশ থেকে এই নতুন ধরণের রুটি সম্পর্কে বৃটেনের বৈদেশিক উন্নয়ন দপ্তরের ট্রপিক্যাল প্রোডাক্টস ইনস্টিটিউটের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছে।

সাধারণভাবে রুটি তৈরি হয়ে থাকে গম থেকে, যা গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ও আধা-গ্রীষ্মমণ্ডলীয় দেশ-

গুলিতে অনায়াসলভ্য নয়। নব-উদ্ভাবিত রুটিতে গমের পরিমাণ অনেক কম থাকে এবং পরিবর্তে যব, ভুট্টা বা তণ্ডুল ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া যে দেশে তণ্ডুলজাতীয় খাদ্য মেলে, এই পাঁউরুটিতে তাই উপাদান হিসাবে ব্যবহার করা চলে।

দক্ষিণ ইংল্যাণ্ডের কালহ্যামে পরীক্ষামূলকভাবে যে বেকারীটি খোলা হয়েছে, তার কাজ যথেষ্ট উৎসাহব্যঞ্জক। এই বেকারীতে প্রস্তুত একটি পাঁউরুটিতে মাত্র 60 শতাংশ গম এবং বাকী অংশ ক্যাসাভা ষ্টার্চ ও সয়াবীনের ময়দা।

আবর্জনা থেকে বিশুদ্ধ জল

নানা আবর্জনাযুক্ত ময়লা জলকে বিশুদ্ধ পানীয় জলে পরিণত করবার একটি অভিনব যন্ত্রের কার্যকারিতা ও গুণাগুণ গত তিন বছর যাবৎ পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। এই বিষয়ে অন্যান্য যে সকল যন্ত্র রয়েছে, সেগুলির তুলনায় এই যন্ত্রটির সাহায্যে ময়লা জলকে নির্মল জলে পরিণত করবার খরচ অনেক কম। নিউইয়র্ক সহরের একাংশে লং-আয়ল্যাণ্ডের জামাইকাতে এই যন্ত্রটি স্থাপন করা হয়েছে। কারখানার বৃহৎ আধারে আবর্জনা ও ময়লা জল জমা রাখা হয় এবং পর পর বিদ্যুচ্চালিত ঘূর্ণায়মান পাত্রের মাধ্যমে এই সকল আবর্জনা কারখানায় সরবরাহ করা হয়। এই সকল পাত্রে বিভিন্ন রকম জীবাণু জন্মায় এবং জলের নোংরা পদার্থ খেয়েই এই সকল জীবাণু বেঁচে থাকে। এই ব্যবস্থার সর্বশেষ পর্যায়ে দেখা যায়, ঐ সকল জীবাণু জলের সব নোংরা পদার্থ ই খেয়ে শেষ করে দিয়েছে। ঐ সময়ে ঐ জলকে কার্বন ফিল্টারের মাধ্যমে পরিস্রুত করা হয়।

এই পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্যে আভ্যন্তরীণ দপ্তর প্রায় সাড়ে সাত লক্ষ ডলার দিয়ে সাহায্য করেছেন। নিউজার্সির নিউব্রান্সউইকস্থিত রাট-জারস বিশ্ববিদ্যালয়ে এই প্রক্রিয়াটি উদ্ভাবিত হয়েছে। ডক্টর জোয়েল ক্যাপলভস্কি এবং উইলবার. এ. টরপীর তথ্যানুসন্ধান ও গবেষণার ফলেই এই নূতন প্রক্রিয়া ও যন্ত্রটি উদ্ভাবিত হয়েছে। মিঃ টরপী নিউইয়র্ক সহরের জঞ্জাল অপসারণ বিভাগের প্রাক্তন ডেপুটি ডিরেক্টর।

এই প্রক্রিয়ায় আরও একটি বিশেষ সুবিধা আছে। এর শেষের পাত্রটিতে এক প্রকার শ্যাওলাজাতীয় উদ্ভিদ জন্মানো হয়। ঐ শ্যাওলাকে পশুখাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে কিনা—সে বিষয়েও পরীক্ষা চলেছে।

নোংরা জলকে সাধারণভাবে নির্মল করবার প্রক্রিয়া হচ্ছে—ময়লাসমূহকে থিতোতে দেওয়া, তাতে ময়লাসমূহ পাত্রের তলায় এসে জমা হয়। নদীগর্ভে যেমন ময়লাসমূহের বিভিন্ন উপাদানের বিয়োজন ঘটে, তেমনি এই নূতন প্রক্রিয়ায়ও আবর্জনাসমূহের বিয়োজন ঘটানো হয়। নদী-গর্ভে এগুলির জারিত হতে প্রায় এক মাস লাগে, কিন্তু এতে লাগে মাত্র এক ঘণ্টা।

উন্মত্তদের গাড়ীচালনা থেকে নিবৃত্ত করার যান্ত্রিক ব্যবস্থা

মদ, অন্য কোন মাদকদ্রব্য বা ভেষজ গ্রহণের জন্যে অথবা শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে বিষাক্ত গ্যাস গ্রহণের ফলে যারা গাড়ী চালনার শক্তি হারিয়ে ফেলেন, তাদের ঐ কাজ থেকে নিবৃত্ত করবার একটি অভিনব যান্ত্রিক ব্যবস্থা আমেরিকায় উদ্ভাবিত হয়েছে। উন্মত্ত অবস্থায় গাড়ী চালনার ফলে বহু দুর্ঘটনা ও মৃত্যু ঘটে থাকে। বর্তমানে এই ব্যবস্থা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে।

মোটর গাড়ীর যন্ত্রপাতি রাখবার স্থান ড্যাশ-বোর্ডে এটি স্থাপন করা হবে। ঐ ব্যবস্থায় গাড়ী চালাবার চাবি ঘোরাবার সঙ্গে সঙ্গে একটি ক্ষুদ্র পর্দার উপর পাঁচটি সংখ্যা ভেসে উঠবে এবং কিছুক্ষণ পরেই ঐ সকল সংখ্যা অদৃশ্য হয়ে যাবে। মোটর চালক কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে ঐ সকল সংখ্যা সঠিকভাবে পাঞ্চ করে কী বোর্ডে

লাগালেই গাড়ীটি আবার চলতে সুরু করবে। সঠিকভাবে পাঞ্চ করতে না পারলে গাড়ী চলবে না। তবে তাকে আরও দু-বার সুযোগ দেওয়া হবে। আরও দুবার ঐ পর্দায় আবার পাঁচটি সংখ্যা ভেসে উঠবে। তখনও সঠিকভাবে পাঞ্চ করতে সক্ষম না হলে গাড়ীটি আর চলবে না, সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকবে।

জেনারেল মোটরস কর্পোরেশনের ইলেকট্রনিক বিভাগ কর্তৃক এই অভিনব যান্ত্রিক ব্যবস্থা উদ্ভাবিত হয়েছে। যারা খুব সচেতন ও সুস্থির, তাদের এতে কোন অসুবিধাই হবে না বলে বিজ্ঞানীদের ধারণা।

শুক্রগ্রহের অঞ্চলবিশেষের মানচিত্র

শুক্রগ্রহের আবহমণ্ডল সর্বদাই ঘন মেঘে আচ্ছন্ন থাকে। পৃথিবী থেকে সাধারণ দূরবীক্ষণ-যন্ত্রের সাহায্যে ঐ গ্রহের পৃষ্ঠদেশ দৃষ্টিগোচর হয় না। আমেরিকার ক্যালিফোর্ণিয়া ইনস্টিটিউট অব টেকনোলোজীর জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এই বাধা দূর করবার একটি অভিনব প্রক্রিয়ার উদ্ভাবন করেছেন এবং এই প্রক্রিয়ায় ঐ গ্রহের একটি অঞ্চলের মানচিত্র তৈয়ার করাও সম্ভব হয়েছে। ঐ অঞ্চলটির আয়তন সমগ্র এশিয়ার চেয়েও বৃহৎ।

এই প্রক্রিয়ায় 85 ফুট বা 25·5 সেন্টিমিটার ব্যাসের 'ডিশ' দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে 450000 ওয়াটের 12·5 সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্যের বেতার-তরঙ্গ বা রেডার রশ্মি ঐ গ্রহাভিমুখে প্রেরণ করা হয়। ঐ সকল রশ্মি ঐ গ্রহে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে এলে সে সকল 210 ফুট ব্যাসের রেডিও-দূরবীক্ষণ যন্ত্রে গৃহীত হয়।

শুক্রপৃষ্ঠের গঠন অনুসারে ঐ রশ্মির কতক অংশ কোন কোন অঞ্চল আত্মসাৎ করে নেয়, অথবা বিশেষ ধরণে ছড়িয়ে পড়ে কিংবা ঐ রশ্মির শুক্রপৃষ্ঠ থেকে প্রতিফলিত হয়ে পৃথিবীতে ফিরে আসতে কিছুটা বিলম্ব ঘটে। ঐ প্রতিফলিত রশ্মি বিজ্ঞানীরা বিশ্লেষণ করে শুক্রপৃষ্ঠের ঐ অঞ্চলের আকৃতি নির্ধারণ করেছেন।

বিজ্ঞানীরা ঐ প্রক্রিয়ায় ঐ গ্রহের যে অঞ্চলের মানচিত্র নির্মাণ করেছেন, তা প্রস্থে 4600 মাইল এবং দৈর্ঘ্যে 8500 মাইল। ঐ এলাকা সমতল বলেই তাঁদের কাছে মনে হয়েছে। ঐ পরিকল্পনার ডিরেক্টর ডক্টর রিচার্ড. এম. গোল্ডস্টিন বলেছেন যে, ঐ অঞ্চলের 1000 মাইল বিস্তৃত এলাকাটির সন্ধান সুস্পষ্টভাবে পাওয়া গেছে—এতে বৃহৎ প্রস্তর খণ্ড ছড়ানো থাকতে পারে। ঐ এলাকার নামকরণ করা হয়েছে অ্যালফা।

দেহ অবশ করবার অভিনব ভেষজ

দেহকে বা বিশেষ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে ভেষজের সাহায্যে অবশ করে রোগীর দেহে অস্ত্রোপচার করা হয় অথবা রোগীকে রোগ-যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দেওয়া হয়। আমেরিকায় এক নতুন ধরণের অ্যানিসথেটিক্স বা অবশ করবার ভেষজ উদ্ভাবিত হয়েছে। ঐ সকল ভেষজ প্রয়োগ করলে রোগীর অঙ্গবিশেষ যেমন অবশ হয়ে যায়, তেমনি সে কানেও কিছুই শুনতে পায় না। চলতি অর্থে তার দেহচৈতন্য অক্ষুণ্ণই থাকে।

আমেরিকার মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের অ্যানিসথেশিয়া বিষয়ে অধিবেশনে ক্যালিফোর্ণিয়ার পালো আল্টোর ডাঃ জন. ডব্লিউ. পেনডার বলেছেন যে, এই নতুন ভেষজ প্রয়োগ করে দেখা গেছে—অস্ত্রোপচারের পর এর আদৌ কোন ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া হয় না এবং প্রয়োগ করবার এক মিনিটের মধ্যেই এর ক্রিয়া হয়ে থাকে। আর একটি বিশেষ সুবিধা এই যে, কোন রকম সাহায্য ছাড়াই রোগী নিয়মিত ভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে পারে। প্রচলিত ভেষজে কিন্তু তা হয় না। তিনি এই নতুন ভেষজের নামকরণ করেছেন ডিসোসিয়েটিভ অ্যানিসথেটিক্স।

ব্যাঙ্গালোরে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের 58তম অধিবেশন

মূল সভাপতি ও শাখা সভাপতিদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

ডক্টর বি. পি. পাল
মূল সভাপতি

1906 সালে মুকুন্দপুরে ডক্টর বি. পি. পাল জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বার্মায় শিক্ষালাভ করেন এবং রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম শ্রেণীর অনার্স-সহ উদ্ভিদবিদ্যায় এম. এস-সি. ডিগ্রি লাভ করেন।

1929 সালে রাষ্ট্রীয় বৃত্তি লাভ করে তিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন এবং বিখ্যাত গম-প্রজননবিদ্ স্যার রাউল্যাণ্ড বিফেন এবং স্যার ফ্রাঙ্ক এঙ্গলেডো-এর তত্ত্বাবধানে ডক্টরেট ডিগ্রীর জন্যে কাজ করেন। 1933 সালে তিনি বার্মায় প্রত্যাবর্তন করেন এবং Hmawbi-র কেন্দ্রীয় চাল গবেষণা কেন্দ্রের সহকারী চাল গবেষণা আধিকারিক নিযুক্ত হন। পরবর্তী সময়ে তিনি পুসা (বিহার) ইম্পিরিয়্যাল এগ্রিকাল-চার্যাল রিসার্চ ইনস্টিটিউটের (বর্তমানে ইণ্ডিয়ান এগ্রিকালচার্যাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট) দ্বিতীয় ইকোনোমিক বোটানিষ্টের পদে নিযুক্ত হন। 1937 সালে ডক্টর পাল ইম্পিরিয়াল ইকনমিক বোটানিষ্টের পদে (পরে এটির নামকরণ হয় বোটানী ডিভিসনের প্রধান) নিযুক্ত হন। 1950 সালে ইনষ্টিটিউটের ডিরেক্টর নিযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত তিনি ঐ পদে বহাল ছিলেন। পরবর্তী সময়ে তিনি পুনর্গঠিত ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব এগ্রিকালচার্যাল রিসার্চের প্রথম ডিরেক্টর জেনারেল নিযুক্ত হন।

ডক্টর পালের গবেষণার ক্ষেত্র ছিল জেনেটিক্স এবং প্ল্যান্ট ব্রীডিং, তবে তিনি গম সম্বন্ধেই বেশী গবেষণা করছেন। গমের রোগ প্রতিরোধের সমস্যা নিয়েও তিনি কাজ করেছেন। বিভিন্ন ধরণের উৎকৃষ্ট গমও (যথা—NP 710, NP 718, NP 761, NP 770, NP 809) তিনি উৎপাদন করেছেন। এই জাতীয় গমসমূহ প্রচুর ফলনশীল এবং ভারতীয় কৃষকদের কাছে এর অর্থ-নৈতিক মূল্যও যথেষ্ট।

ইণ্ডিয়ান এগ্রিকালচার্যাল রিসার্চ ইনষ্টিটিউটে গবেষণা ছাড়া শিক্ষাদান ও করা হয়। ডক্টর পাল সেখানে স্নাতকোত্তর ছাত্রদের শিক্ষাদানও করেন। 1958 সালে তিনি ইনস্টিটিউটের স্নাতকোত্তর শিক্ষা-ব্যবস্থার পুনর্গঠনের জন্যে প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন করেন এবং বর্তমানে এই ইনস্টিটিউটের মর্যাদা প্রখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের সমতুল্য।

অষ্ট্রেলিয়া, চীন, ফ্রান্স, গ্রেট বৃটেন, ইটালী, জাপান, আমেরিকা, রাশিয়ায় বৈজ্ঞানিক সভা-সম্মিলনে একাধিকবার ডক্টর পাল ভারতের প্রতি-নিধিত্ব করেছেন। 1967-'70 সালের মধ্যে আন্তর্জাতিক চাউল গবেষণা কেন্দ্রের বোর্ড অব ট্র্যাষ্টির সদস্য হিসাবে তিনি কয়েকবার ফিলিপাইনস গিয়েছেন।

ডক্টর পাল লণ্ডনের লিনিয়ান সোসাইটি, বৃটেনের রয়্যাল হর্টিকালচার্যাল সোসাইটি, ইণ্ডিয়ান বোটানিক্যাল সোসাইটি, ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব জেনেটিক্স অ্যাণ্ড প্ল্যান্ট ব্রীডিং, সাইকোলজিক্যাল সোসাইটি অব ইণ্ডিয়া, ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল সায়েন্স অ্যাকাডেমী প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের ফেলো। তিনি জেনেটিক্স সোসাইটি অব জাপান এবং জাপান অ্যাকাডেমীর অনারেরী মেম্বার এবং সোভিয়েট রাশিয়ার অল ইউনিয়ন লেনিন অ্যাকাডেমি অব এগ্রিকালচার্যাল সায়েন্স-এর করেন মেম্বার।

তিনি ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের কৃষি ও

উদ্ভিদতত্ত্ব শাখা, বোটানিক্যাল সোসাইটি অব ইণ্ডিয়া, ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব জেনেটিক্স অ্যাণ্ড প্ল্যাণ্ট ব্রীডিং, হর্টিকালচার্যাল সোসাইটি অব ইণ্ডিয়া, দিল্লীর এগ্রি-হর্টিকালচার্যাল সোসাইটির সভাপতি এবং ন্যাশান্যাল ইনস্টিটিউট অব সায়েন্সেস অব ইণ্ডিয়া এবং দ্বাদশ আন্তর্জাতিক জেনেটিক্স কংগ্রেসের (জাপান, 1968) সহ-সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। ডক্টর পাল রোজ সোসাইটি অব ইণ্ডিয়ার সভাপতি এবং সৌখীন চিত্রকর। তিনি অল ইণ্ডিয়া ফাইন আর্টস অ্যাণ্ড ক্র্যাফ্‌ট্‌স-এর বর্তমান চেয়ারম্যান। 1957 সালে তিনি রফি আহমেদ কিদোয়াই পুরস্কার, 1962 সালে বীরবল সাহানি পদক, 1964 সালে শ্রীনিবাস রামানুজন পদক লাভ করেন। তিনি 1958 সালে পদ্মশ্রী এবং 1968 সালে পদ্মভূষণ উপাধিতে ভূষিত হন।

ডক্টর ভি. জি. ভীদে

সভাপতি—পদার্থবিদ্যা শাখা

ডক্টর ভীদে 1925 সালের 8ই অগাষ্ট জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নাগপুর ও লণ্ডনে শিক্ষালাভ করেন। 1947 সালে নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থবিদ্যায় প্রথম স্থান অধিকার করে তিনি এম. এস-সি ডিগ্রী লাভ করেন। এর পর তিনি নাগপুরের কলেজ অব সায়েন্সে যোগদান করেন এবং বৈদ্যুতিক মোক্ষণ বা ইলেক্‌ট্রিক্যাল ডিসচার্জ সম্বন্ধে গবেষণা স্থুরু করেন। গ্যাসের মাধ্যমে বৈদ্যুতিক মোক্ষণের সূচনা ও সংরক্ষণের উপর শক্তিশালী চৌম্বক ক্ষেত্রের ফলাফলের বিষয়ে গবেষণা করে তিনি নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি-এইচ. ডি. ডিগ্রি লাভ করেন।

1948 সালে ট্রানজিষ্টর আবিষ্কৃত হওয়ায় ডক্টর ভীদে সলিড ষ্টেট ফিজিক্স এবং বাইনারী কম্পাউণ্ডের (যেমন Pbs) অর্ধপরিবাহিতার গুণাগুণ সম্বন্ধে গবেষণায় মনোযোগী হন। তাঁর গবেষণার গুরুত্ব অনুধাবন করে ভারত সরকার এবং তৎকালীন মধ্যপ্রদেশ সরকার সলিড ষ্টেট ফিজিক্স সম্বন্ধে আরও উন্নত গবেষণার জন্যে তাঁকে একটি বৈদেশিক বৃত্তি মঞ্জুর করেন। কেলাসের বৃদ্ধির সম্বন্ধে তখন যারা পৃথিবীতে কয়েক জন বিখ্যাত পদার্থ-বিজ্ঞানী কাজ করছিলেন। প্রোফেঃ টোলানস্কির তত্ত্বাবধানে তিনি ঐ গবেষক-মণ্ডলীতে যোগদান করেন। মাল্‌টিপল্‌ বীম ইণ্টার-ফেরোমেট্রি, এক্স-রে ডিফ্র্যাকশন, ইলেকট্রন মাইক্রস্কোপি ব্যবহার করে তিনি কেলাসের বৃদ্ধি এবং পলিটিপিজম্‌ সম্বন্ধীয় কয়েকটি সমস্যার সমাধানে সক্ষম হন। এর জন্যে তিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি-এইচ.-ডি. ডিগ্রি লাভ করেন।

বিদেশ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর ডক্টর ভীদে বোম্বাইয়ের ইনষ্টিটিউট অব সায়েন্স-এর পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এখানে তিনি ফেরো-ইলেক্‌ট্রিক ক্রিষ্ট্যাল সম্বন্ধে কাজ করেন। টাইটেনেট প্রভৃতির উপর মোসবাওয়ার এফেক্ট সম্পর্কিত তাঁর গবেষণা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মোসবাওয়ার এফেক্ট এবং তার প্রয়োগ সম্বন্ধে তাঁর রচিত পুস্তকটি শীঘ্রই প্রকাশিত হবার সম্ভাবনা।

ডক্টর ভীদে বহু বার বৈজ্ঞানিক সম্মেলন উপলক্ষে বিদেশ পরিভ্রমণ করেছেন। ফেরো-ইলেকা ট্রসিটি সম্বন্ধীয় দ্বিতীয় সম্মিলনে তিনি আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। 1956 সালে প্যারিসে অনুষ্ঠিত থিন-ফিল্ম সম্বন্ধীয় দ্বিতীয় সম্মিলন এবং 1963 সালে ওয়াশিংটনে অনুষ্ঠিত সেমিকণ্ডাক্টর সারফেস সংক্রান্ত সম্মিলনে তিনি যোগদান করেন। 1965 সালে সোভিয়েট রাশিয়ায় এবং 1968 সালে আমেরিকায় তিনি তাঁর গবেষণা সম্বন্ধে কয়েকটি বক্তৃতা প্রদান করেন। 1955 সালে লণ্ডনের রয়্যাল অ্যাষ্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটি এবং 1968 সালে ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অব সায়েন্সস-এর তিনি ফেলো নির্বাচিত হন।

তিনিই প্রথম বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের

এম. এস-সি. পর্যায়ে সলিড ষ্টেট ফিজিক্স-এর বিশেষীকরণ সুরু করেন এবং তা এখন প্রায় সব বিশ্ববিদ্যালয়েই চালু হয়েছে। ন্যাশন্যাল কাউন্সিল অব সায়েন্স এডুকেশনের পদার্থবিদ্যা শিক্ষাবিষয়ক ন্যাশন্যাল অ্যাডভাইসরী প্যানেলের এবং শিক্ষা-মন্ত্রক কর্তৃক বিদ্যালয়ের পাঠ্য বিষয়ের উন্নতি-বিধানকল্পে গঠিত ষ্টাডি গ্রুপ-এর তিনি আহ্বায়ক। ইণ্ডিয়ান জার্নাল অব ফিজিক্স এডুকেশনের তিনি সহযোগী সম্পাদক।

অধ্যাপক আর. ডি. তেওয়ারী
সভাপতি—রসায়ন শাখা

উত্তর প্রদেশের ফতেপুর জেলার আমাউলি গ্রামে 1917 সালের 17ই জানুয়ারী অধ্যাপক তেওয়ারী জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জি. এন. কে. হাই স্কুল (বর্তমানে ইন্টার কলেজ) এবং বি. এন. এস. ডি. ইন্টার কলেজে (কানপুর) শিক্ষা গ্রহণ করে 1937 সালে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক এবং 1939 সালে এম. এস-সি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ঐ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 1943 সালে ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করেন। তাঁর শিক্ষাজীবন বরাবরই কৃতিত্বপূর্ণ।

1943 সালে তিনি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের উপাধ্যায় নিযুক্ত হন এবং 1966 সালে ঐ বিভাগের অধ্যাপক পদে উন্নীত হন।

ডক্টর তেওয়ারীর গবেষণার প্রধান ক্ষেত্র হচ্ছে —ন্যাচার্যাল প্রোডাক্টস্ কেমিষ্ট্রি—বিশেষতঃ জটিল পলিস্যাকারাইড, ফ্যাট, লিপিড, পলিফেনল, কুইনোন রঞ্জক এবং স্পেক্ট্রোফটোমেট্রি, আয়ন-এক্সচেঞ্জারস, ইলেক্ট্রোফোরেসিস, ক্রোম্যাটোগ্রাফির প্রয়োগসহ অরগ্যানিক ফাংসন্যাল গ্রুপের অ্যানালিটিক্যাল কেমিষ্ট্রি। তিনি একক ভাবে এবং তাঁর ছাত্রদের সহযোগিতায় মোট আশীটিরও বেশী গবেষণা-পত্র প্রকাশ করেছেন। তিনি একক এবং যৌথভাবে বারোটি পুস্তক রচনা করেছেন। সেগুলির মধ্যে সাম্প্রতিকতম হচ্ছে— The Determination of carboxylic functional group।

1941 সালে তিনি ই. জি. হিল স্মৃতি পুরস্কার এবং 1943 সালে এস. এ. হিল পুরস্কার লাভ করেন। 1964 সালে তিনি ন্যাশন্যাল অ্যাকাডেমি অব সায়েন্স থেকে শিক্ষামন্ত্রীর স্বর্ণপদক লাভ করেন। তিনি ন্যাশন্যাল অ্যাকাডেমী অব সায়েন্সেস-এর ফেলো এবং সদস্য। ইণ্ডিয়ান কেমিক্যাল সোসাইটি এবং অয়েল টেক্‌নোলজিষ্টস অ্যাসোসিয়েসন অব ইণ্ডিয়ার তিনি ফেলো। তিনি উত্তর প্রদেশের বোর্ড অব হাই স্কুল ও ইন্টারমিডিয়েট এডুকেশন ও পরীক্ষা কমিটির সদস্য এবং গত আট বছর যাবৎ রসায়ন কমিটির আহ্বায়ক। তিনি উত্তর প্রদেশের শিল্প ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা পর্ষৎ এবং তার সাহায্য মঞ্জুরী কমিটি এবং কেমিষ্ট্রি ও কেমিক্যাল টেক্‌নোলজি সংক্রান্ত কমিটির সদস্য।

কলম্বো পরিকল্পনানুসারে ডক্টর তেওয়ারী 1957 সালে বার্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ে মাইক্রো-অ্যানালিটিক্যাল টেক্‌নিক্স, সেপারেশন টেক্‌নিক্স এবং ষ্ট্রাকচার্যাল ষ্টাডিজ অব স্পেক্ট্রোফটোমেট্রিক মেথড সম্বন্ধে গবেষণা করেন। ইটালী, সুইজার-ল্যাণ্ড, জার্মেনী, ফ্রান্স এবং যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এবং রাসায়নিক গবেষণাগার তিনি পরিদর্শন করেন। জার্মান অ্যাকাডেমি এক্সচেঞ্জ সার্ভিসের আমন্ত্রণে তিনি 1964 সালে জার্মেনী গমন করেন। 1968 সালের জুলাই মাসে লণ্ডনে অনুষ্ঠিত কেমিষ্ট্রি অব ন্যাচার্যাল প্রোডাক্টস্ সংক্রান্ত 5ম আন্তর্জাতিক আলোচনা সভায় যোগদান করেন। 1969 সালে জুন মাসে শ্রীনগরে অনুষ্ঠিত রাসায়নিক শিক্ষা সংক্রান্ত ভারত-আমেরিকা সম্মিলন এবং 1970 সালে ফেব্রুয়ারীতে অনুষ্ঠিত কেমিষ্ট্রি অব ন্যাচার্যাল প্রোডাক্টস সম্পর্কিত দ্বিতীয়

ভারত-সোভিয়েট আলোচনা-চক্রে তিনি যোগদান করেন।

ডক্টর রাম বল্লভ

সভাপতি—গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞান শাখা

1918 সালের 11ই জুলাই উত্তর প্রদেশের মোরাদাবাদে ডক্টর রাম বল্লভ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর শিক্ষাজীবন অসাধারণ কৃতিত্বপূর্ণ। 1943 সালে লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গণিতে তিনিই প্রথম ডক্টর অব ফিলসফি ডিগ্রী লাভ করেন। 1941 সালে গণিতে লেক্‌চারার, 1950 সালে রীডার এবং 1954 সালে প্রোফেসর নিযুক্ত হন। তিনি 18 মাসের জন্য ডেপুটেশনে ভারত সরকারের ম্যাথামেটিক্যাল রিসার্চ অফিসার হিসাবে কাজ করেন। তাঁর শিক্ষাজীবনে তিনি নানা পুরস্কার, স্বর্ণপদক, মেধা বৃত্তি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলোশিপ লাভ করেন।

ডক্টর বল্লভ ফ্লুইড ডিনামিক্সে 'সুপারপোসাবিলিটি' সম্বন্ধে এক নতুন তত্ত্বের প্রবক্তা এবং সক্রিয়ভাবে তিনি গবেষণা ও গবেষণার তত্ত্বাবধানে নিয়োজিত আছেন। প্রাচীন ভারতে গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের উন্নতি সংক্রান্ত যে সব হিন্দু জ্যোতির্বিজ্ঞান ও গণিত সংক্রান্ত পাঠ্যপুস্তক প্রকাশিত হয়েছে—তিনি সেগুলির সাধারণ সম্পাদক। তিনি 'গণিত' নামক পত্রিকার সম্পাদক। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাথামেটিক্যাল রিভিউ-এর এক জন পর্যালোচক এবং ভারতের ন্যাশন্যাল অ্যাকাডেমি অব সায়েন্স-এর ফেলো এবং অনেক বৈজ্ঞানিক সংস্থার সদস্য। 1952-'53 সালে তিনি প্রোফেঃ এম. জে. লাইটহিল এফ. আর. এস-এর সহযোগিতায় লণ্ডনে এবং 1957 সালে নরওয়েতে Prof. Oddvar Bjorgum-এর সহযোগিতায় গবেষণা করেন। 1964-'65 সালে ফুলব্রাইট বিনিময় কর্মসূচী অনুযায়ী তিনি যুগোশ্লাভিয়ার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করেন। ডক্টর বল্লভের দেশে-বিদেশে গণিত শিক্ষা সম্বন্ধে প্রভূত অভিজ্ঞতা আছে। যদিও তিনি বিশুদ্ধ ও ফলিত গণিত—এই দুই বিষয়েই শিক্ষাদান করছেন, কিন্তু তিনি প্রধানতঃ ফলিত গণিত সম্বন্ধেই অনুরাগী।

অধ্যাপক বি. এম. জোহরী

সভাপতি—উদ্ভিদবিদ্যা শাখা

অধ্যাপক ব্রীজমোহন জোহরী 1909 সালের 11ই সেপ্টেম্বর উত্তর প্রদেশের বিজনোরে জন্মগ্রহণ করেন। আগ্রার দয়ালবাগের রাধাস্বোয়ামী এডুকেশন ইনস্টিটিউটে তিনি শিক্ষালাভ করেন। 1929 সালে মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আগ্রা কলেজ থেকে 1931 সালে বি. এস-সি পরীক্ষা এবং আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 1933 সালে এম. এস-সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। 1932 সালে তিনি ডক্টর পি. মাহেশ্বরীর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁর অধীনে গবেষণা করে 1936 সালে ডি. এস-সি ডিগ্রী লাভ করেন।

ডক্টরেটের জন্যে তাঁর থীসিসের বিষয়বস্তু ছিল Alismaceae ও Butomaceae-এর সম্পর্ক, ভ্রূণতত্ত্ব ও অঙ্গসংস্থানবিদ্যা। তাঁর আর একটি গবেষণার ক্ষেত্র ছিল মরফোজেনেসিস ও এক্সপেরিমেণ্টাল এম্‌ব্রায়োলজী—নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় বিভিন্ন গুপ্তবীজীয় উদ্ভিদের বীজ, ভ্রূণ, এণ্ডোস্পার্ম, ফুল, ডিম্বাশয় ও ডিম্বাণুর বৃদ্ধি, বিকাশ ও পৃথকীভবন প্রভৃতি বিষয়ে অনুশীলন। 1932 সাল থেকে এযাবৎ অধ্যাপক জোহরী প্রায় 100টি গবেষণা-পত্র প্রকাশ করেছেন। এছাড়া দেশ-বিদেশের নানা বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় তাঁর বহু নিবন্ধাদি প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর কয়েক জন ছাত্র গবেষণা করে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি-এইচ. ডি ডিগ্রি লাভ করেছেন। আগ্রা এবং রাজস্থানে বিভিন্ন কলেজে শিক্ষকতা করবার পর তিনি 1948 সালে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন।

তিনি ইণ্ডিয়ান ন্যাশান্যাল সায়েন্স অ্যাকা-

ডেমি এবং ইণ্ডিয়ান বটানিক্যাল সোসাইটির ফেলো এবং ইন্টারন্যাশন্যাল সোসাইটি অব প্ল্যান্ট মরফোলজিষ্ট-এর সদস্য। তিনি ফাইটোমরফোলজি নামক জার্নালের সম্পাদক ছিলেন। এশিয়ান অ্যাসোসিয়েসন ফর বায়োলজি এডুকেশন সংস্থার তিনি প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য এবং এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলর। এছাড়াও তিনি দেশ ও বিদেশের আরও নানা শিক্ষামূলক সংস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আছেন।

তিনি কয়েকবার বিদেশেও গিয়েছেন। তিনি ভারতবর্ষে উদ্ভিদবিদ্যা সংক্রান্ত কয়েকটি আলোচনা-চক্রের ব্যবস্থা করেছিলেন। বিদেশে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন সম্মিলনে তিনি একাধিকবার অংশগ্রহণ করেছেন। 1969 সালে যুক্তরাষ্ট্রের Seattle-এ অনুষ্ঠিত একাদশ আন্তর্জাতিক উদ্ভিদ কংগ্রেস এবং 1970 সালে ফ্রান্সের Strasbourg-এ অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় টিস্যু কালচার সম্মিলনীর একদিনের অধিবেশনে তিনি সভাপতিত্ব করেন।

ডক্টর এ. কে. গায়েন

সভাপতি—পরিসংখ্যান শাখা

ডক্টর অনিলকুমার গায়েন মেদিনীপুর এবং কলিকাতায় শিক্ষালাভ করেন। তাঁর শিক্ষা-জীবন কৃতিত্বপূর্ণ ছিল। 1943 সালে তিনি এম. এ/এম. এস-সি পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বর্ণপদক লাভ করেন। 1944 সালে তিনি গণিতের অস্থায়ী লেক্‌চারার হিসাবে প্রেসিডেন্সী, বিদ্যাসাগর এবং বেঙ্গল ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে কাজ করেন। 1945 সালে তিনি ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিষ্টিক্যাল ইনষ্টিটিউটে পরিসংখ্যানের রিসার্চ স্কলার হিসাবে যোগদান করেন। 1947 সালে তিনি কেম্বিজে যান এবং 1949 সালে নন-নরম্যালিটি এবং টাওার্ড টেষ্ট সম্পর্কে থীসিস দাখিল করে কেম্বিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন। 1950 সালে কলিকাতায় তিনি আই. এস. আই-তে লেক্‌চারার নিযুক্ত হন। 1954 সালে তিনি খড়্গপুরের ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব টেক্‌নোলোজীতে অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট প্রোফেসর হিসাবে যোগ দেন। বর্তমানে তিনি সেখানকার গণিত বিভাগের প্রোফেসর এবং বিভাগীয় প্রধান হিসাবে নিযুক্ত আছেন। শিক্ষাদান ছাড়াও তিনি গবেষক-ছাত্রদের গবেষণার তত্ত্বাবধানও করে থাকেন। তিনি ইনষ্টিটিউটে ম্যাথামেটিক্স সামার স্কুলের সংগঠক এবং অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সামার স্কুলের তিনি ভিজিটিং প্রোফেসর। ইণ্ডিয়ান সোসাইটি ফর কোয়ালিটি কণ্ট্রোলের প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই তিনি সেখানকার পার্ট-টাইম লেক্‌চারার এবং ট্রেনিং বোর্ডের সদস্য আছেন। 1965 সালে হংকঙে অনুষ্ঠিত স্ট্যাটিস্টিক্যাল কোয়ালিটি কণ্ট্রোল সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক আলোচনা-চক্রে তিনি ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন।

কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রণালয় কর্তৃক (পরবর্তী সময়ে NCERT কর্তৃক আয়োজিত) আয়োজিত পরীক্ষা ও ইভ্যালুয়েশন সংক্রান্ত গবেষণা প্রকল্পের তিনি প্রোফেসর ডিরেক্টর হন। আই. আই. টি-র (খড়্গপুর) জার্নাল অব সায়েন্স অ্যাণ্ড ইঞ্জিনীয়ারিং রিসার্চ, ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব থিয়োরেটিক্যাল অ্যাণ্ড অ্যাপ্লায়েড মিকানিক্স-এর কার্যবিবরণী, আই-এস. কিউ. সি বুলেটিন, ইণ্ডিয়ান জার্নাল অব ম্যাথামেটিক্স অ্যাণ্ড মিকানিক্স, জার্নাল অব ম্যাথামেটিক্যাল অ্যাণ্ড ফিজিক্যাল সায়েন্স প্রভৃতির তিনি সম্পাদনা করে থাকেন। ম্যাথামেটি-ক্যাল রিভিউ-এর তিনি একজন পর্যালোচক।

ডক্টর গায়েন ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল সায়েন্স অ্যাকাডেমির, রয়্যাল স্ট্যাটিষ্টিক্যাল সোসাইটি এবং কেম্ব্রিজ ফিলোসফিক্যাল সোসাইটির ফেলো। তিনি রিজিওন্যাল সায়েন্স অ্যাসোসিয়েসন অব ইণ্ডিয়ার সহ-সভাপতি, এবং ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিষ্টিক্যাল সোসাইটির আজীবন সদস্য।

ডক্টর বি. জি. দেশপাণ্ডে

সভাপতি—ভূতত্ত্ব ও ভূগোল শাখা

ডক্টর বালকৃষ্ণ গণেশ দেশপাণ্ডে 1911 সালের নভেম্বর মাসে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পুনায় শিক্ষালাভ করেন। তিনি 1936 সালে কার্গুসন কলেজ (তৎকালীন বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত) ভূতত্ত্বে মাষ্টার ডিগ্রি অর্জন করেন।

1936 সালের জুন মাসে তিনি জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়ায় যোগদান করেন। তিনি কলিকাতার পেট্রোলজি লেবরেটরীতে বছর দুই অতিবাহিত করেন। 1940 সালে তিনি সিন্ধু, পাঞ্জাব ও সীমান্ত প্রদেশে তাঁর গবেষণার বিষয় সম্পর্কে অনুসন্ধান চালান। পরবর্তী সময়ে তিনি জি. এস. আই.-এর ইঞ্জিনীয়ারীং জিওলজি এবং গ্রাউণ্ড ওয়াটার বিভাগে যোগদান করেন। 1946 সালে এক বছরের জন্যে তিনি অষ্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরিত হন। গুজরাট, পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ, পশ্চিম বাংলা, আসাম, বোম্বে, মধ্যপ্রদেশের বিভিন্ন বাঁধ এবং ভূগর্ভস্থ জল সম্বন্ধে অনুসন্ধান-কার্যে তিনি অংশ গ্রহণ করেন। 1953 সালে তিনি হাইড্রোজিওলজি বিষয়ে পুনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি-এইচ. ডি ডিগ্রী লাভ করেন।

1952 সালে তিনি দিল্লীর ইণ্ডিয়ান ব্যুরো অব মাইনস্-এ বদলী হন। ডেপুটি ডিরেক্টর (রিসার্চ) হিসাবে তাঁর উপর কয়েকটি গবেষণাগার স্থাপনের দায়িত্ব দেওয়া হয়। এই গবেষণাগারগুলির উদ্দেশ্য, খনিজ সম্পদকে মানুষের কাজে লাগাবার উপায় অনুসন্ধান করা। তাঁর তত্ত্বাবধানে পান্নার সঞ্চিত হীরক এবং ক্ষেত্রীর সঞ্চিত তামা এবং হিন্দুস্থান ইস্পাতের কাঁচা মাল সম্পর্কে অনুসন্ধান পরিচালিত হয়।

1956 সালে তিনি অয়েল অ্যাণ্ড ন্যাচারাল গ্যাস ডাইরেক্টরটে (বর্তমানে অয়েল অ্যাণ্ড ন্যাচারাল গ্যাস কমিশন) সুপারিন্টেণ্ডিং জিওলজিষ্ট হিসাবে যোগদান করেন এবং তিনি তৈল অনুসন্ধান কার্যের ভারপ্রাপ্ত হন।

তিনি দেরাদুনে পেট্রোলোজি, প্যালিওন্টোলজি, প্যালিনোলজি এবং রসায়ন সংক্রান্ত গবেষণাগার প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হন। 1966 সালে তিনি জিও-লজিক্যাল সার্ভিস-এর চীফ হিসাবে নিয়োজিত হন। 1967 সালে তিনি বরোদায় বদলী হন এবং জিওলজি, জিওফিজিক্স, খনন, উৎপাদন ও গবেষণাগারসহ সকল কারিগরী বিভাগের ভার-প্রাপ্ত হন। বর্তমানে তিনি পুনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব বিভাগের প্রোফেসর এবং বিভাগীয় প্রধান।

ডক্টর দেশপাণ্ডে তেহরাণে (ইরাণ) অনুষ্ঠিত ECAFE সম্মিলনে 1962 সালে উপস্থিত ছিলেন। 1959 সালে নিউ ইয়র্কে, 1963 সালে ফ্রাঙ্কফুর্টে এবং 1967 সালে মেক্সিকোয় অনুষ্ঠিত বিশ্ব পেট্রো-লিয়াম কংগ্রেসে তিনি যোগদান করেন। 1966 সালে তিনি ন্যাশন্যাল ইনষ্টিটিউট অব সায়েন্স অব ইণ্ডিয়ার (বর্তমানে ন্যাশন্যাল অ্যাকাডেমি) ফেলো নির্বাচিত হন।

অধ্যাপক এইচ. স্বরূপ

সভাপতি—প্রাণী ও পতঙ্গবিদ্যা শাখা

অধ্যাপক এইচ. স্বরূপ 1921 সালের 21শে জানুয়ারী বিআওরেতে (রাজগড়, মধ্যপ্রদেশ) জন্মগ্রহণ করেন। কৃতিত্বের সঙ্গে তিনি এম. এস-সি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। 1953 সালে সাগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি-এইচ. ডি এবং 1957 অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি ডি. ফিল ডিগ্রী লাভ করেন।

তিনি 1946 সালে কানপুরের ডি. এ. ভি. কলেজে প্রাণিবিদ্যার লেকচারার, 1946-1960 সাল পর্যন্ত সাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যার অধ্যাপক, 1960-1961 সালে নৈনিতালের ডি. এস. বি. সরকারী কলেজে প্রাণিবিদ্যার অধ্যাপক হিসাবে

কাজ করেন। 1961 সালের জুন মাস থেকে উজ্জয়িনীর বিক্রম বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি প্রাণি-বিদ্যার অধ্যাপক হিসাবে নিয়োজিত আছেন।

তাঁর গবেষণার প্রধান বিষয় হচ্ছে মাছের ভ্রূণতত্ত্ব। তিনি 1946 সালে সাগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ডেভেলপমেণ্টাল মরফোলজি বিষয়ে কাজ সুরু করেন। ডেভেলপমেণ্ট অব কণ্ড্রোক্রানিয়াম, খুলির কাঠিন্ত, অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্রের বিকাশ, রক্তবাহী নালী ইত্যাদি সম্বন্ধে তিনি কতকগুলি মৌলিক গবেষণা-পত্র প্রকাশ করেন। 1955 সালে তিনি পরীক্ষামূলক ভ্রূণতত্ত্ব বিষয়ে গবেষণা সুরু করেন। সম্প্রতি তাঁর গবেষণাগারে মলিকিউলার ভ্রূণতত্ত্ব এবং মাছের ভ্রূণীভবনে নিউক্লিক অ্যাসিডের ভূমিকা সম্পর্কে গবেষণা সুরু হয়েছে। তিনি এবং তাঁর সহযোগীরা দেশ-বিদেশের পত্রিকায় 100টির বেশী গবেষণা-পত্র প্রকাশ করেছেন।

1955-1957 সালে তিনি অক্সফোর্ডে ছিলেন এবং বিভিন্ন বৃটিশ বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করেন। তিনি অনেক আন্তর্জাতিক আলোচনা-চক্র ও সম্মিলনে যোগদান করেছেন। তিনি অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজ ও লণ্ডনে তাঁর গবেষণার বিষয়বস্তু সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি ন্যাশন্যাল অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সেস, জুওলজিক্যাল সোসাইটি এবং অ্যাকাডেমি অব জুওলজি অব ইণ্ডিয়ার ফেলো। তাঁর উদ্যোগে 1965 সালে 'প্রাণীদের অঙ্গসংস্থান সম্বন্ধীয় গবেষণার প্রবণতা' বিষয়ে একটি সর্বভারতীয় রিসার্চ সেমিনারের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনও এই ব্যাপারে সাহায্য করেছিলেন।

অধ্যাপক এস. সি. মণ্ডল
সভাপতি—কৃষিবিজ্ঞান শাখা

অধ্যাপক এস. সি. মণ্ডল 1921 সালের জানুয়ারী মাসে জন্মগ্রহণ করেন। বিহার, উড়িষ্যা, পশ্চিম বাংলা এবং উত্তর প্রদেশে তাঁর শিক্ষাজীবন অতিবাহিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রের আইওয়া ষ্টেট কলেজ এবং নিউজীল্যাণ্ডের লিনকোলন্ কলেজে কৃষি-বিজ্ঞান সম্বন্ধে তিনি উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন। তিনি বিহার রাজ্যে এগ্রিকালচার্যাল কেমিষ্ট্রির অধ্যাপক এবং মৃত্তিকা-বিজ্ঞানী হিসাবে কাজ করেন। তিনি ভারতের প্রবীন মৃত্তিকা-বিজ্ঞানীদের অন্যতম একজন হিসাবে পরিচিত। গত 25 বছরে বিহার রাজ্যের মৃত্তিকা সম্পর্কিত গবেষণায় তাঁর দান যথেষ্ট।

তিনি প্রায় 70টি গবেষণা-পত্র প্রকাশ করেছেন। বিহারের অম্লাত্মক মাটি সম্পর্কিত তাঁর গবেষণার ফলেই ভারতের মৃত্তিকা-বিজ্ঞান যথেষ্ট সমৃদ্ধ হয়েছে। তিনি বর্তমানে বিহার রাজ্যের এগ্রিকালচার্যাল রিসার্চের ডিরেক্টর হিসাবে গবেষণায় ব্যাপৃত আছেন। গত দুই বছর যাবৎ তিনি বিহারের কৃষিবিষয়ক বিশ্ববিদ্যালয় প্রকল্পের মুখ্য ভারপ্রাপ্ত হিসাবে নিয়োজিত আছেন। তাঁরই একান্ত প্রচেষ্টায় বিহার রাজ্যে একটি কৃষিবিষয়ক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। তিনি ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব এগ্রিকালচার্যাল কেমিষ্ট, রয়েল ইনস্টিটিউট অব কেমিষ্ট্রির ফেলো এবং ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব সায়েন্স, ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব এগ্রিকালচার্যাল কেমিষ্ট্রির সহকারী সভাপতি।

অধ্যাপক জে. কে. চৌধুরী
সভাপতি—ইঞ্জিনীয়ারীং ও ধাতু-বিজ্ঞান শাখা

1923 সালে বর্ধমান জেলায় অধ্যাপক চৌধুরী জন্মগ্রহণ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি ফলিত পদার্থবিদ্যায় এম. এস-সি ডিগ্রী এবং ডি-ফিল ডিগ্রী লাভ করেন।

অধ্যাপক চৌধুরী ইংল্যাণ্ডে বৈদ্যুতিক পরিমাপ ও যন্ত্রীকরণ সম্বন্ধে বিশেষভাবে শিক্ষালাভ করেন। ম্যাঞ্চেষ্টার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইলেক্‌ট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং-এ এম. এস-সি (টেক) রিসার্চ

ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি লণ্ডনের মেসার্স এভারেট এজকাম অ্যাণ্ড কোম্পানীর গবেষণা বিভাগে কাজ করেন।

1951 সালে তিনি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে (পূর্বতন ন্যাশন্যাল কাউন্সিল অব এডুকেশন, বেঙ্গল) যোগদান করেন। বর্তমানে তিনি সেখানকার ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগের সিনিয়র প্রোফেসর। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈদ্যুতিক পরিমাপ ও মাননির্ণায়ক গবেষণাগার তাঁরই উদ্যোগে গঠিত হয় এবং দেশের এই জাতীয় শ্রেষ্ঠ গবেষণাগারগুলির মধ্যে এটি অন্যতম। এই বিভাগের গবেষণা সর্বত্রই প্রশংসিত হয়েছে। তাঁর তত্ত্বাবধানে একদল ছাত্র গবেষণা করছেন। বৃটেন, আমেরিকা এবং ভারতের খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় তাঁর অনেক মৌলিক গবেষণা-নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। অধ্যাপক চৌধুরীর বৈদ্যুতিক পরিমাপ, মাননির্ণয় ও যন্ত্রীকরণ সম্বন্ধীয় গবেষণার ফল আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করেছে। অধ্যাপক চৌধুরী কলকারখানায় বায়ু-চলাচলের বিষয় সম্বন্ধেও একজন বিশেষজ্ঞ।

1967 সালে পশ্চিম জার্মেনীর ব্যাডেন, ব্যাডেন-এ অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ইলেকট্রোটেকনিক্যাল কমিশনে তিনি ভারতের প্রতিনিধি ছিলেন এবং ঐ কমিশনের টেকনিক্যাল কমিটির একটি অধিবেশনে তিনি সভাপতিত্ব করেন। তিনি ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাণ্ডার্ড ইনস্টিটিউটের ইলেকট্রিক্যাল মেজারিং ইনষ্ট্রুমেন্ট বিভাগীয় কমিটির চেয়ারম্যান। তিনি লণ্ডনের ইনষ্টিটিউশন অব ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ার্স-এর ফেলো এবং ইনষ্টিটিউট অব মেজারমেন্টস অ্যাণ্ড কণ্ট্রোল (লণ্ডন) এবং ভারতের ইনষ্টিটিউট অব ইঞ্জিনীয়ার্স-এর সদস্য।

অধ্যাপক এম. সি. গোস্বামী

সভাপতি—নৃতত্ত্ব ও প্রত্নতত্ত্ব শাখা

আসামের কামরূপ জেলার একটি গ্রামে 1918 সালের 1 লা অক্টোবর অধ্যাপক গোস্বামী জন্মগ্রহণ করেন। 1935 সালে তিনি প্রবেশিকা এবং 1939 সালে গৌহাটি কটন কলেজ থেকে স্নাতক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। 1943 সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি বি. টি. ডিগ্রী লাভ করেন।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসাবে তাঁর কর্মজীবন সুরু হয় এবং শিক্ষকতাকালে তিনি পার্বত্য অধিবাসীদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন এবং তাদের চাল-চলন, রীতি-নীতি সম্বন্ধে অধ্যাপক গোস্বামী কৌতূহলী হয়ে ওঠেন। 1947 সালে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নৃতত্ত্বে এম. এ. পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয় স্বর্ণপদক এবং নৃতত্ত্বে এস. সি. মিত্র স্বর্ণপদক পান। 1946 সালে বিহার ও তন্নিকটবর্তী বর্তী অঞ্চলের হো-দের সম্বন্ধে নৃতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের কাজে তিনি অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। 1948 সালে তিনি গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ে লেকচারার নিযুক্ত হন। 1956 এবং 1959 সালে তিনি যথাক্রমে নৃতত্ত্ববিভাগের রীডার এবং অধ্যাপক নিযুক্ত হন। 1966 থেকে 1969 সাল পর্যন্ত তিনি গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টি অব সায়েন্স-এর ডীন ছিলেন, পরবর্তী সময়ে তিনি সিনিয়র প্রোফেসর নিযুক্ত হন।

নৃতাত্ত্বিক বিষয়ে শিক্ষা ও গবেষণার জন্যে তিনি একটি উত্তম সংগ্রহশালা তৈরি করেছেন। আসাম, নাগারাজ্য, মনিপুর, নেফা এবং আসামের বাইরের কয়েকটি স্থান থেকে সংগৃহীত নৃজাতিতাত্ত্বিক নমুনার জন্যে এই সংগ্রহশালা গবেষক, দর্শক—সকলের কাছেই আকর্ষণীয়।

1952 সালে তিনি কেম্বিজের প্রত্নতাত্ত্বিক ও নৃতাত্ত্বিক বিভাগে যোগদান করেন। 1954 সালে তিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. লিট. ডিগ্রী লাভ করেন। কারবি (মিকির বা আরলেং), গারো, রাভা, আদি, বোদো কাছারি, খাসী, লালুং, ডাফলা, শেরডুকপেন, আপাতানি, তাই-ফাকে, তুরাং প্রভৃতি উপজাতিদের সম্বন্ধে

তিনি অনেক অনুসন্ধান-কার্য চালিয়েছেন। বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় তাঁর বহু গবেষণামূলক নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

ডাঃ ফণীন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী

সভাপতি—চিকিৎসা ও পশু-চিকিৎসা শাখা

ডাঃ ব্রহ্মচারী 1904 সালের 26শে সেপ্টেম্বর কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। এঁর পিতা বিখ্যাত বিজ্ঞানী স্বর্গীয় ডাঃ উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী। 1921 সালে তিনি হিন্দু স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। 1925 সালে প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে রসায়নে অনার্সসহ বি. এস-সি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি মেডিক্যাল কলেজে এম. বি. এবং সেই সঙ্গে প্রেসিডেন্সী কলেজে তিনি এম. এস-সি পড়তে থাকেন। 1928 সালে তিনি শারীরতত্ত্বে এম. এস-সি. পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। 1931 সালে তিনি কৃতিত্বের সঙ্গে এম. বি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রেমচাঁদ রায় চাঁদ গবেষণা বৃত্তি লাভ করেন। তিনি মোয়াট পদকও অর্জন করেন। তিনি হৃৎস্পন্দন সম্পর্কিত গবেষণার জন্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভেষজে লেডী ব্রহ্মচারী গবেষণা বৃত্তি লাভ করেন। 1940 সালে তিনি এম. ডি. ডিগ্রী লাভ করেন।

তিনি কার্ডিওলজী সম্পর্কে গবেষণায় উৎসাহিত হন। তিনি কলিকাতার বিভিন্ন হাসপাতালে গবেষণা করেছেন। তিনি ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুল ও হাসপাতালে (বর্তমান নীলরতন সরকার হাসপাতাল ও কলেজ) অবৈতনিক সহযোগী চিকিৎসক ও পরে অবৈতনিক ভিজিটিং চিকিৎসক এবং আর. জি. কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের অবৈতনিক কার্ডিওলজিষ্ট ছিলেন। তিনি কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের অবৈতনিক কার্ডিওলজিষ্ট এবং অবৈতনিক সিনিয়র ভিজিটিং চিকিৎসক (সাধারণ) হিসাবে নিযুক্ত হন। 1968 সালের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি সেখান থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শারীরতত্ত্ব, ফার্স্ট এম. বি. এবং ফাইনাল এম. বি-এর ভেষজ বিষয়ের পরীক্ষক ছিলেন। তিনি সিনেট, ভেষজ ও বিজ্ঞান অনুশীলন সম্বন্ধীয় বোর্ডের (পুরাতন বিশ্ববিদ্যালয় আইনানুসারে গঠিত) সদস্য ছিলেন। তিনি ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েসন ফর দি কালটিভেসন অব সায়েন্সের কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন এবং তিনি ঐ সংস্থার একজন ট্রাষ্টি। তিনি ভারতীয় চিকিৎসক সমিতির সদস্য এবং সহ-সভাপতিও ছিলেন। 1969 সালে তিনি কার্ডিওলজিক্যাল সোসাইটি অব ইণ্ডিয়ান সভাপতি ছিলেন। ব্রহ্মচারী রিসার্চ ইনষ্টিটিউশন প্রাঃ লিঃ-এর তিনি ম্যানেজিং ডিরেক্টর। তিনি ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ভেষজ ও পশু-চিকিৎসার শাখার রেকর্ডারও ছিলেন।

ডক্টর শ্রীমতী সারদা সুব্রহ্মণ্যম

সভানেত্রী—শারীরবৃত্ত শাখা

ডক্টর শ্রীমতী সুব্রহ্মণ্যম 1918 সালে ত্রিচুরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম শ্রী টি. এস. মারার। 1941 সালে মাদ্রাজ মেডিক্যাল কলেজ থেকে স্নাতক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি কোচিন রাজ্য চিকিৎসা দপ্তরে যোগদান করেন। তিনি ঐ রাজ্যের নানা হাসপাতালে কাজ করে গভীর জ্ঞান ও বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। 1944 সালে শ্রীআর. সুব্রহ্মণ্যমের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়।

1947 সালে তিনি মাদ্রাজ যান। কস্তুরবা ট্রাস্ট এবং মাদ্রাজ কর্পোরেশনে কিছু দিন কাজ করবার পর 1948 সালে তিনি মাদ্রাজ সরকারের ফার্মাকোলজি বিভাগে যোগদান করেন এবং সেখান থেকে 1951 সালে ষ্ট্যানলি মেডিক্যাল

কলেজের শারীরতত্ত্ব বিভাগে বদলী হন। 1954 সালে তিনি শারীরতত্ত্বে এম. এস সি ডিগ্রী অর্জন করেন এবং তাঁর বিভাগের প্রধান হিসাবে উন্নীত হন। এর চার বছর বাদে তিনি মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি-এইচ. ডি. ডিগ্রী লাভ করেন।

1961 সালে তিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ভিজিটিং প্রোফেসর হিসাবে আমন্ত্রিত হন। 1961 সালে ষ্টকহোমে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক কার্মাকোলজি সম্মিলনে তিনি গ্রেট বৃটেন থেকে প্রতিনিধি হিসাবে যোগদান করেন এবং ক্যারলিন্‌স্ক ইনষ্টিটিউটের অধ্যাপক ভন ইউলার-এর সঙ্গে কিছু দিন কাজ করেন। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক, চিকাগো, উইসকনসিনের মেডিক্যাল কলেজ এবং গবেষণাগারগুলি পরিদর্শন করেন।

দেশ-বিদেশের চিকিৎসা সম্বন্ধীয় পত্রিকায় তাঁর 40টি মৌলিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশনে শারীরবৃত্ত শাখার তিনিই প্রথম মহিলা সভানেত্রী। তিনি মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলের সদস্য এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক। তিনি I. C. M. R-এর বিশেষজ্ঞ গ্রুপ কমিটির সদস্য ছিলেন। তাঁর তত্ত্বাবধানে কয়েক জন ছাত্র গবেষণার কাজ করছেন।

তিনি ভারতবর্ষ এবং অন্যান্য দেশ পরিভ্রমণ করেছেন। একজন একনিষ্ঠ সমাজকর্মী হিসাবে তিনি পরিচিত। তিনি ওয়ার্কিং উইমেনস অ্যাসোসিয়েসন এবং ব্রাহ্ম বিদ্যা সঙ্ঘের (মাদ্রাজ) সহ-সভানেত্রী।

ডক্টর মদনমোহন সিংহ

সভাপতি—মনস্তত্ত্ব ও শিক্ষামূলক বিজ্ঞান শাখা

1924 সালের 1লা ডিসেম্বর ডক্টর সিংহ মেদিনীপুর জেলার গোপালনগরে জন্মগ্রহণ করেন। কলিকাতার পার্ক ইনষ্টিটিউশন ও স্কটিশচার্চ কলেজে শিক্ষালাভের পর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 1947 সালে দর্শনে এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এম. এ. পরীক্ষায় মনস্তত্ত্ব তাঁর অধীতব্য বিষয় ছিল। তিনি কয়েক মাস গোপালনগর কে. পি. হাই স্কুলে শিক্ষকতা করেন। 1948 সালে শিলং-এর সেন্ট অ্যাণ্টনিস কলেজে তিনি তর্কশাস্ত্র ও মনস্তত্ত্বের লেকচারার নিযুক্ত হন। 1953 সাল পর্যন্ত তিনি সেখানে ছিলেন। তার পর যুক্তরাষ্ট্রের অরিগন বিশ্ববিদ্যালয়ের মনস্তত্ত্ব বিভাগে সহকারী গবেষক হিসাবে যোগদান করেন। তিন বছরের মধ্যেই তিনি এম. এস. এবং পি-এইচ. ডি (মনস্তত্ত্বে) ডিগ্রী অর্জন করেন। এর পর তিনি অরিগন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইউ-এস-পি-এইচ-এস গবেষণা প্রকল্পের প্রোগ্রাম ডিরেক্টর ও মনস্তত্ত্বে সহযোগী গবেষক হিসাবে নির্বাচিত হন। 1957 সালে ভারতে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি গোরক্ষপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে মনস্তত্ত্ব ও দর্শন বিভাগের প্রধান হিসাবে নিযুক্ত হন। 1962 সালের 1লা মার্চ তিনি বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে মনস্তত্ত্ব বিভাগের প্রোফেসার ও প্রধানরূপে যোগদান করেন।

ডক্টর সিংহের অনেক গবেষণা-পত্র দেশ-বিদেশের পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। ব্যক্তির আচরণগত গুণাগুণ সম্পর্কে গবেষণার জন্য তিনি ইউ-জি-সি থেকে দুটি অনুদান পেয়েছেন। প্রোটিনের ঘাটতি এবং বুদ্ধিবৃত্তি প্রভৃতি বিষয়ে তিনি গবেষণা করেছেন। 1970 সালের প্রথম ছয় মাস তিনি যুক্তরাষ্ট্রের উইসকনসিন বিশ্ববিদ্যালয়ে নিউরোফিজিওলজি গবেষণাগারে কাজ করেন।

তাঁর তত্ত্বাবধানে গবেষণা করে কয়েকজন ছাত্র পি-এইচ. ডি. ডিগ্রী লাভ করেছেন। প্রাচ্য দেশের উপযোগী করে তিনি মনস্তত্ত্বসম্বন্ধীয় পাঠ্যক্রমের কিছু পরিবর্তন সাধনও করেছেন।

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

জানুয়ারী — 1971

চতুর্বিংশ বর্ষ — প্রথম সংখ্যা
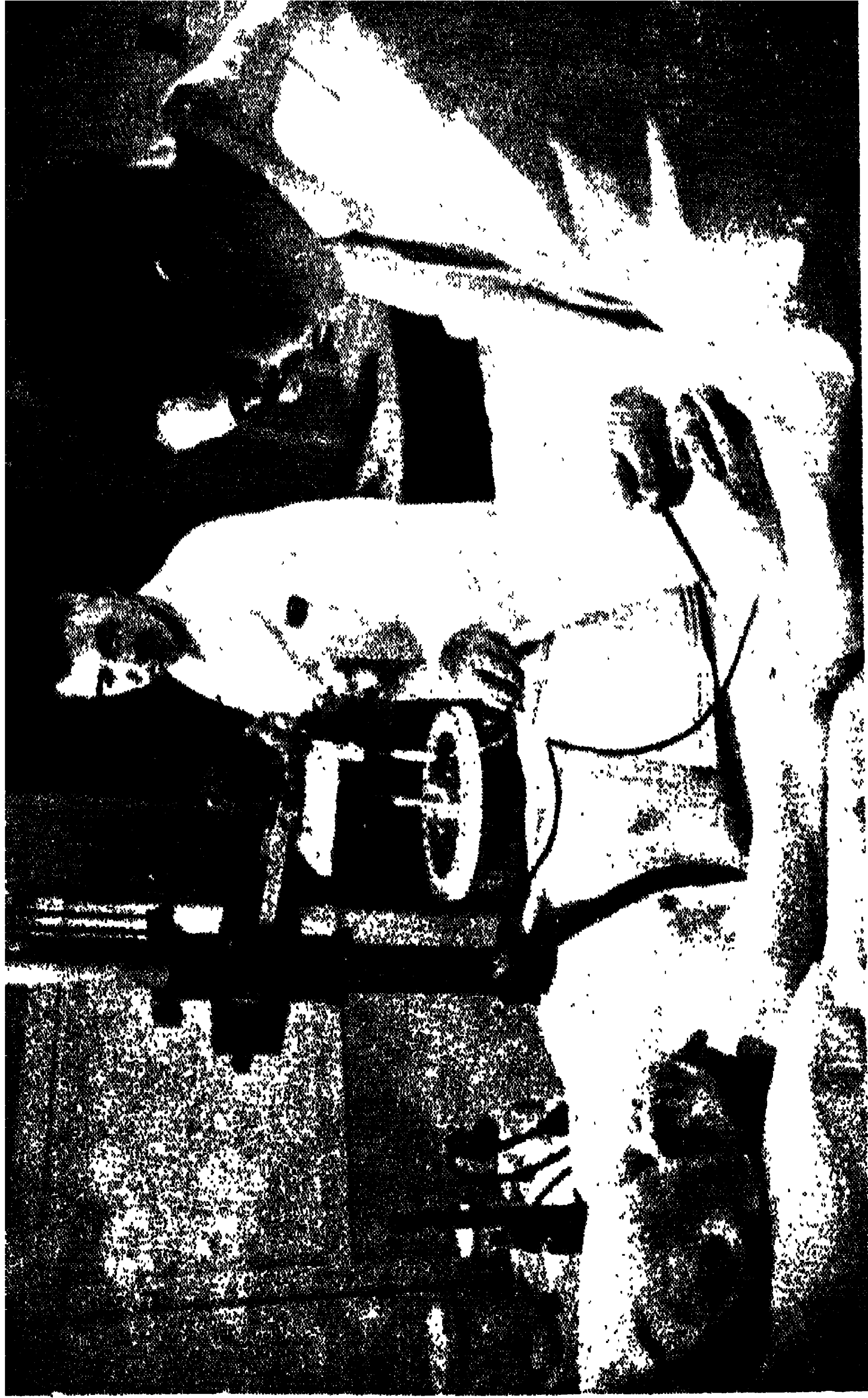
বয়োবৃদ্ধির ফলে শারীরিক অক্ষমতার কারণ অনুসন্ধান

বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক কর্মশক্তির শৈথিল্য ও অক্ষমতা আসে কেন? কেমন করে শরীরকে আরও দীর্ঘকাল যুবজনোচিত কর্মক্ষম রাখা যায়? এই সমস্যার সমাধানের উপায় খুঁজে বের করবার জন্যে ইউ. এস. এ-র বিজ্ঞানীরা অনেক কাল থেকেই পরীক্ষা চালিয়ে আসছেন। ছবিতে দেখা যাচ্ছে — একজন স্বেচ্ছাকর্মীর হৃৎপিণ্ডের কর্মশক্তি-সহনশীলতা পরীক্ষার জন্যে এক রকম হাল্কা তরল রঞ্জক পদার্থ প্রয়োগ করে 'ডাইলিউশন টেষ্ট' করা হচ্ছে। অনেক দিনের গৃহীত পরীক্ষার ফলাফল তুলনা করে শরীরকে দীর্ঘকাল কর্মক্ষম রাখবার উপযোগী ব্যবস্থার সন্ধান পাওয়া যেতে পারে।

ধাতুর অবক্ষয়

পৃথিবীতে বছরে যত ধাতু উৎপন্ন হয়, তার শতকরা প্রায় 10 ভাগ নষ্ট হয় অবক্ষয়ে। কোন কোন রাসায়নিক শিল্পে সাজসরঞ্জাম বদ্‌লাতে হয় প্রতি ছয় থেকে বারো মাসে; আর হাইড্রোজেন সালফাইট থাকলে তৈল উৎপাদনে ব্যবহৃত পাম্পের নল 25-30 দিনেই নষ্ট হয়ে যেতে পারে। আলো, জল, বাতাস এবং আরো কিছু কিছু ভৌত কারণে ধাতুর উপর যে অবক্ষয় ঘটে থাকে, বিজ্ঞানীদের কাছে সেটি এক বিরাট সমস্যা।

মানুষ যখন প্রস্তর যুগ পেরিয়ে এলো, তখন থেকেই সে ধাতু-অবক্ষয়ের সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল এবং আজ অবধি সে সমস্যার সমাধান হয় নি। অথচ ভাবলে অবাক হতে হয় যে, ভারতীয় লৌহ-শিল্প এক সময়ে বিশ্বে চমক সৃষ্টি করেছিল। ঐতিহাসিকদের বক্তব্য—ভারত এক সময়ে যে ইস্পাত রপ্তানী করতো, সেই ইস্পাত দিয়েই তৈরি হয়েছিল দামস্কাসের বিখ্যাত তরবারি, যা এখনো যাদুঘরে সযত্নে রক্ষিত আছে। ভারতের প্রাচীন লৌহ-শিল্পের আর এক ঐতিহাসিক নিদর্শন দিল্লীর লৌহস্তম্ভ। রোদ-জল, ঝড়-বৃষ্টি এবং বাতাস—দীর্ঘ পনেরো-শ' বছর ধরে আজো তার বুকে সামান্য অবক্ষয়ের রেখা এঁকে দিতে পারে নি—তার বুকে কোথাও এতটুকু মরচে ধরে নি।

আমরা সেই প্রাচীন লৌহ-শিল্পের ধারাবাহিকতা সযত্নে রক্ষা করতে পারি নি। অতীতের কুশলী ধাতু-বিজ্ঞানীদের সেই অভিনব কলা-কৌশল কোথায় হারিয়ে গেছে, কে তার খবর রাখে। প্রাচীন ভারতের ইস্পাত উৎপাদনের পদ্ধতিটি হেনরি বেসিমার মাদ্রাজ থেকে জেনে নিয়ে দেশে ফিরে ইস্পাত উৎপাদনের আধুনিকতম চুল্লী বেসিমার কনভার্টার তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

বিংশ শতাব্দীতে বিশ্বের ধাতু-বিজ্ঞানীরা ধাতু-নিষ্কাশনের নতুন নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন, তৈরি করেছেন উন্নত মানের সঙ্কর ধাতু। ফলে বর্তমান শতাব্দীর মাঝামাঝি ধাতুর ব্যবহার দারুণভাবে বেড়ে গেছে এবং ধাতু-বিজ্ঞানের যথেষ্ট উন্নতিও ঘটেছে। কিন্তু আজো পর্যন্ত কিছু কিছু ধাতুকে মরচে-ধরা বা অন্যভাবে অবক্ষয়ের হাত থেকে পুরাপুরি রক্ষা করবার মত কোন সঠিক উপায় এখনো কোন দেশ আয়ত্ত করতে পারে নি। ফলে ভারত ছাড়াও বিশ্বের অন্যতম উন্নত দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বার্ষিক ক্ষতি হয় অন্তত 850 কোটি ডলার, বৃটেনে হয় 200 কোটি ডলার এবং সোভিয়েট ইউনিয়নে ওই ক্ষতির পরিমাণ 600 কোটি রুবল।

কাজেই ধাতুতে মরচে-ধরা একটি সমস্যা—বড় রকমের সমস্যা, তবে সমস্যাটা

ঘটে রসায়নের স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারেই। মরচে-ধরা লোহার একটি ধর্ম। বাতাসে লোহায় মরচে ধরে এবং যে মূল যৌগিক পদার্থ থেকে সেটা পাওয়া গিয়েছিল, আবার তাতেই পরিণত হয়।

বিজ্ঞান কি তাহলে অবক্ষয় নিবারণে অক্ষম? না—যেমন বিভিন্ন রকম অবক্ষয়ের প্রক্রিয়া আছে, তেমনি অবক্ষয় থেকে ধাতু সংরক্ষণের বিভিন্ন রকম উপায়ও আছে। এই ব্যাপারে বিশ্বের সর্বত্র গবেষণা চলছে।

ধাতু অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে সোভিয়েট ইউনিয়নে বিস্তর গবেষণা হচ্ছে। বিশেষ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে কাজে লাগাবার জন্যে ক্রোম, মলিবডিনাম আর অন্যান্য ধাতুর সঙ্গে লোহার কয়েকটি নতুন সঙ্কর ধাতু তৈরি করা হয়েছে রাশিয়ায়। যাতে অবক্ষয়রোধক গুণ সৃষ্টি হতে পারে, সে জন্যে বিশুদ্ধ টাইটানিয়াম এবং তার ভিত্তিতে কোন কোন সঙ্কর ধাতু উৎপাদনের প্রণালীও নির্ধারণ করেছে তারা। ট্যান্টালাম, বিভিন্ন নিকেলভিত্তিক সঙ্কর ধাতু এবং প্ল্যাটিনাম আর সোনার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হতে পারে, এমন একটা নতুন অবক্ষয়রোধক সঙ্কর ধাতু সোভিয়েট ইউনিয়ন উৎপন্ন করেছে —সেটা হলো '4201' (টাইটানিয়াম + 33% মলিবডিনাম)। তাছাড়া সাধারণ এবং অতিরিক্ত তাপমাত্রায় বায়ুমণ্ডলীয় অবক্ষয় এবং কয়েক রকমের অতি প্রতিকূল মাধ্যমে অবক্ষয় থেকে ধাতু সংরক্ষণের জন্যে ব্যাপকভাবে ধাতব প্রলেপ ব্যবহৃত হচ্ছে। আগে এজন্যে ব্যবহার করা হতো বিভিন্ন প্রকার গ্রীজ। কিন্তু তাতে দীর্ঘস্থায়ী সংরক্ষণের কাজ হতো না। অবশ্য কোন কোন ধাতু সংরক্ষণের জন্যে ব্যবহৃত অন্যান্য ধাতুর প্রলেপ দীর্ঘস্থায়ী হয়।

তাছাড়া ক্যাথোডিক সংরক্ষণ পদ্ধতিতে রাশিয়া নলপথের ব্যাপক ব্যবহার এবং জাহাজ, বিশেষতঃ ট্যাংকারের কাঠামোকে সমুদ্রজলের ক্রিয়া থেকে রক্ষার ব্যবস্থা করছে। ক্যাথোডিক সংরক্ষণ বলতে বুঝায়—দুটি ধাতু পরস্পরের সংস্পর্শে এলে ধাতু দুটির রাসায়নিক সক্রিয়তার মধ্যে পার্থক্য যত বেশী হবে—অধিকতর সক্রিয় ধাতুটির অবক্ষয় হবে তত বেশী, আর অন্যটার সংরক্ষণও হবে তত ভাল।

আমেরিকাও অবক্ষয়রোধক সঙ্কর ধাতু তৈরি করেছে এবং অবক্ষয়ের হাত থেকে লোহা ও অন্যান্য ধাতুকে রক্ষা করবার জন্যে বা ধাতুকে যাতে বাতিল গাদায় ফেলতে না হয়, সে জন্যে তৈরি করেছে এক পরত কিংবা একাধিক পরতের বিভিন্ন প্রলেপ। সেগুলিতে কোন অতিরিক্ত যান্ত্রিক ফিনিশের দরকার হয় না। এই ব্যবস্থা অবশ্য রাশিয়াতেও প্রচলিত আছে।

এই অবক্ষয় সমস্যা সমাধানের জন্যে ভারত যে একেবারে পিছিয়ে রয়েছে, তা নয়। এই ব্যাপারে ভারতেও গবেষণা চলেছে। জামসেদপুরের জাতীয় ধাতু গবেষণাগারের বিশেষজ্ঞেরা নিয়মিত গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। কিভাবে এই

অবক্ষয় প্রতিরোধ করা সম্ভব, অন্ততপক্ষে যাতে এই সমস্যাটি যথেষ্ট পরিমাণে কমিয়ে আনা যায়। ইতিমধ্যে এই সম্পর্কে অনেক মূল্যবান তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। এঁরা অ্যালুমিনিয়ামঘটিত এক ধরণের ধনাত্মক তড়িৎ-দ্বার বা অ্যানোড তৈরি করেছেন, যা সমুদ্রে যাতায়াতকারী জাহাজের নীচের অংশকে লবণাক্ত জলের সংস্পর্শে আসবার ফলে ক্ষয়ে যাবার হাত থেকে বাঁচাতে পারবে। এই ধরণের অবক্ষয় রোধের ব্যাপারে ভারতীয় জাতীয় ধাতু গবেষণাগারের একটি শাখা পশ্চিম বঙ্গের দীঘা সাগর-সৈকতে স্থাপিত হয়েছে। এখানে চলছে ধাতুর অবক্ষয় রোধের ব্যাপক গবেষণা।

বিজ্ঞানীরা অবক্ষয় থেকে ধাতু সংরক্ষণের জন্যে যতই গবেষণা চালান না কেন, ব্যাপারটার ক্রিয়াকৌশল আমাদের সম্পূর্ণ জানা আছে, এমন কথা বলা যায় না। মূলতঃ ধাতু যতকাল ব্যবহৃত হবে—অবক্ষয়ও থাকবে ততকালই। ধাতুর জীবনকাল বাড়ানো যায় কি ভাবে—সেটা নিয়েই কথা।

সুনীল সরকার

পাতার রং ও ক্লোরোফিল

পাতার রং বলতে প্রথমেই মনে পড়ে সবুজ রঙের কথা। কারণ অধিকাংশ উদ্ভিদেরই পাতার রং সবুজ। সবুজ রং ছাড়াও বিভিন্ন জাতীয় কতকগুলি উদ্ভিদের পাতায় লাল, নীল, হলদে, কমলা প্রভৃতি বিচিত্র রং দেখা যায়। উদ্ভিদেরও যে প্রাণ আছে, তা তোমরা সবাই জান। উদ্ভিদ-কোষ সম্পর্কে উনবিংশ ও বিংশ শতকেই উল্লেখযোগ্য গবেষণা হয়। আরও আগে 1665 সালে রবার্ট হুক সোলার ছিপির খুব পাত্‌লা প্রস্থচ্ছেদ অণুবীক্ষণ যন্ত্রে পর্যবেক্ষণ করে অসংখ্য ছোট ছোট খোপ (Chamber) দেখতে পান। মৌমাছির চাকের খোপের সঙ্গে সাদৃশ্য লক্ষ্য করে তিনি এগুলির নাম দিয়েছিলেন সেল অর্থাৎ কোষ। সেই নামই আজ পর্যন্ত চলে আসছে। রবার্ট হুক ছিপিতে দেখেছিলেন উদ্ভিদের মৃত কোষ। আজকের মত তখন উন্নত ধরণের অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছিল না। কাজেই জীবন্ত কোষ ও তার ভিতরের জীবন্ত পদার্থ সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আণুবীক্ষণিক পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হয় নি।

তারপর কেটে গেছে প্রায় দেড়-শ' বছরের মত, উদ্ভিদ-কোষ সম্পর্কিত গবেষণায় খুব একটা উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আসে নি। তার পর উনবিংশ শতাব্দীতে আসে

একটা প্রচণ্ড আলোড়ন—উদ্ভিদ-কোষের গবেষণায় অকল্পনীয় প্রগতি সাধিত হয়। Mathias Jacob Schleiden, Theodor Schwann, Hugo Von Mohl, Nägeli, Thomas Henry Huxley, জগদীশচন্দ্র প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণের গবেষণায় উদ্ভিদ-কোষ সম্পর্কে অনেক অজ্ঞাত রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয়। বিংশ শতাব্দীতে এ-সম্পর্কে অনুসন্ধান-কার্য অধিকতর দ্রুত গতিতে চলতে থাকে। ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ উদ্ভাবিত হবার ফলে বিজ্ঞানের আরেক অধ্যায় উন্মোচিত হয়। পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে উদ্ভিদ-কোষের পর্যবেক্ষণ সম্ভব হবার ফলে আবিষ্কৃত হলো অনেক অজানা বস্তু—জানা গেল উদ্ভিদ-কোষের বহু রহস্যের কথা। পাতার রঙের কথা বলতে গেলে এই উদ্ভিদ-কোষ সম্পর্কে আলোচনা করা প্রয়োজন। প্রাণিদেহের মত উদ্ভিদদেহও কোটি কোটি কোষের সমন্বয়ে গঠিত। একটি উদ্ভিদ-কোষে সজীব ও নির্জীব দুটি অংশ থাকে। কোষ-প্রাচীর নির্জীব পদার্থে গঠিত আর প্রোটোপ্লাজমে আছে সজীব পদার্থ। কোষের চারদিকে যে বেষ্টনী থাকে, তাই কোষ-প্রাচীর এবং কোষ-প্রাচীরের দ্বারা আবদ্ধ কোষের মধ্যস্থিত পদার্থ ই প্রোটোপ্লাজম। জীবন্ত এই প্রোটোপ্লাজম তিনটি সজীব পদার্থের দ্বারা গঠিত।

প্রোটোপ্লাজমের কেন্দ্রীয় বস্তু হচ্ছে নিউক্লিয়াস, সাইটোপ্লাজম ও প্লাসটিড নিউক্লিয়াসের, আদেশমতই অন্য সবাই চলাফেরা করে। তাছাড়া কোষে থাকে কোষ-গহ্বর (Vacuole)। এতে বাতাস ও কোষ-রস থাকে। কোষের মধ্যে গোলাকার ঘন অংশটিই নিউক্লিয়াস, তার চেয়ে ছোট ছোট গোলাকার জিনিষগুলি প্লাসটিড, আর যে ঘন জলীয় মাধ্যমে নিউক্লিয়াস ও প্লাসটিডগুলি চলাফেরা করে, তার নাম সাইটোপ্লাজম। অবশ্য ক্ষেত্রবিশেষে এই কোষের মধ্যে বিশেষ ধরণের নির্জীব আগন্তুককে জায়গা দিতে হয়; যেমন—আলুর কোষে শ্বেতসার, আখের কোষে শর্করা, কচুজাতীয় গাছের কোষে ক্যালসিয়াম অক্জালেট; তিল, সর্ষে ইত্যাদির কোষে তৈলজাতীয় পদার্থ ইত্যাদি।

গোলাকার ছোট ছোট জীবন্ত প্লাসটিডগুলিই বিভিন্ন রঙের আধার। প্রতিটি কোষে এদের সংখ্যা কয়েকটি থেকে শতাধিকও হতে পারে। এগুলির জন্যেই পাতার রং সবুজ বা অন্যান্য বিভিন্ন বর্ণের হয়ে থাকে। অবশ্য কখনো কখনো কোষের রসে অ্যানথোসায়ানিন নামে একটি রং থাকে। অ্যানথোসায়ানিন কোষের অম্লাত্মক রসে লাল ও ক্ষারীয় রসে নীলবর্ণ ধারণ করে। রঙের প্রকারভেদ অনুযায়ী প্লাসটিড তিন রকম হয়ে থাকে—ক্লোরোপ্লাস্ট, ক্রোমোপ্লাস্ট ও লিউকোপ্লাস্ট। সবুজ রঙের প্লাসটিডগুলিকে বলে ক্লোরোপ্লাস্ট, সবুজ রং বাদে অন্য যে কোন রঙের প্লাসটিড হলেই তাকে বলে ক্রোমোপ্লাস্ট আর যে প্লাসটিডগুলির কোন রং নেই, অর্থাৎ বর্ণহীন তাদের বলে লিউকোপ্লাস্ট।

প্লাসটিডগুলির একটা অদ্ভুদ ক্ষমতা আছে। এরা বহুরূপীর ন্যায় রং বদ্‌লাতে পারে; অর্থাৎ আজ যে বর্ণহীন লিউকোপ্লাস্ট, দু-দিন বাদে সেটাই সবুজ রঙের ক্লোরোপ্লাস্টে

পরিবর্তিত হতে পারে—যেমন দেখা যায়, হাল্‌কা রঙের কচিপাতা বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে ঘন সবুজ পাতায় রূপান্তরিত হয় অথবা ঢেকে রাখা ফ্যাকাসে ঘাস-পাতা সূর্যালোকের স্পর্শে সবুজ রঙে পরিবর্তিত হয়। তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করে থাকবে যে, অনেক গাছের কচিপাতা প্রথমে ঈষৎ লাল্‌চে-হল্‌দে বা খুব হাল্কা সবুজ রঙের হয়ে থাকে। কিন্তু বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে ঐ পাতাগুলি ক্রমশঃ ঘন সবুজ পাতায় পরিবর্তিত হয়। এক্ষেত্রে কচিপাতার লিউকোপ্লাস্ট ও ক্রোমোপ্লাস্ট সবুজ রঙের ক্লোরোপ্লাস্টে রূপান্তরিত হয়। আর সবুজ ঘাস ঢেকে রাখলে পাতার সবুজ ক্লোরোপ্লাস্ট সূর্যালোক না পাওয়ায় বর্ণহীন লিউকোপ্লাস্ট ও কিছু পরিমাণ ক্রোমোপ্লাস্টে রূপান্তরিত হয়। তাই ঘাসের রং হয়ে যায় সাদা বা ফ্যাকাসে হল্‌দে, কিন্তু ঢাকা তুলে দিলে সেই রূপান্তরিত লিউকোপ্লাস্ট ও ক্রোমোপ্লাস্টই সূর্যের আলো পেয়ে আবার সবুজ রঙের ক্লোরোপ্লাস্টে পরিবর্তিত হয়ে যায়।

এ তো গেল প্লাসটিডের রূপান্তরিত হবার ঘটনা। কিন্তু প্লাসটিডগুলি কেন এমন বিভিন্ন রঙের হয়ে থাকে? প্লাসটিডের রাসায়নিক বিশ্লেষণ ও আণুবীক্ষণিক পরীক্ষা-নিরীক্ষায় দেখা গেছে যে, এক-একটি ক্লোরোপ্লাস্ট প্রোটিনজাতীয় matrix stroma-র দ্বারা গঠিত। এই ষ্ট্রোমার মধ্যেই ছোট ছোট দানার মত নানা রঙের সমাবেশ দেখা যায়। দানাগুলিকে বলা হয় grana। ক্লোরোপ্লাস্টের grana-র মধ্যে এক প্রকার সবুজ রং থাকে, যার জন্যে ক্লোরোপ্লাস্ট সবুজ রঙের হয়। রংটির নাম ক্লোরোফিল। এক-একটি grana-তে কয়েক লক্ষ ক্লোরোফিল অণু থাকতে পারে। Stroma ও grana সমেত একটি পূর্ণাঙ্গ ক্লোরোপ্লাস্টকে অণুবীক্ষণ যন্ত্রে অনেকটা প্লেটের মত দেখায়। ব্যাসে 4 থেকে 10 মাইক্রন আর উচ্চতায় 1 থেকে 2 মাইক্রন (1 মাইক্রন $=10^{-4}$ সে. মি.)। ক্যারোটিনয়েড পিগ্‌মেন্ট নামক এক ধরণের রং থাকবার ফলে ক্রোমোপ্লাস্টগুলির বর্ণ নানা রকম হয়ে থাকে। ক্যারোটিনয়েড পিগ্‌মেন্ট আবার অনেক রকমের হয়; যেমন—জ্যান্‌থোফিল রং থাকলে ক্রোমোপ্লাস্টের রং হয় হল্‌দে; ক্যারোটিন রং থাকলে হয় কমলাভ-লাল; আবার লাইকোপিন থাকলে ক্রোমোপ্লাস্টের বর্ণ হয় একদম লাল। শুধু কি তাই? আবার যখন সবুজ রঙের ক্লোরোপ্লাস্ট এই সব বিভিন্ন রঙের ক্রোমোপ্লাস্টের সঙ্গে মিশ্রিত অবস্থায় থাকে, তখন উদ্ভিদ-পত্র, ফুল, ফল ও মূলে অনেক বিচিত্র বর্ণের সৃষ্টি হয়ে থাকে। ক্রোমো-প্লাস্ট বেশী থাকে প্রধানতঃ ফুল, যাবতীয় পাকাফল, বীট-গাজরের মূল প্রভৃতিতে এবং লাল রঙের লাইকোপিনযুক্ত ক্রোমোপ্লাস্ট বেশী থাকে পাকা টোম্যাটো, লাল লঙ্কা, লাল গোলাপ ফুল প্রভৃতিতে।

ক্লোরোফিলের সবুজ রঙের আবার প্রকারভেদ আছে; যেমন—ক্লোরোফিল এ, বি সি, ডি, ইত্যাদি। ব্যাক্টিরিও ক্লোরোফিল ব্যাক্টিরিও ভিরিডিন প্রভৃতি বিভিন্ন রকমের

হলেও রাসায়নিক সংযুতিতে প্রচুর সাদৃশ্য বিদ্যমান। উচ্চস্তরের উদ্ভিদের ক্লোরোফিল—এ ও বি-এর অনুপাত মোটামুটি 3 : 3 থেকে 5 : 1 পর্যন্ত দেখা যায়।

ক্লোরোফিল-এ থাকে সমস্ত আলোকসংশ্লেষণকারী উদ্ভিদে, ক্লোরোফিল-বি থাকে সবুজ শৈবাল ও উচ্চস্তরের উদ্ভিদে। ক্লোরোফিল-সি থাকে খয়েরী রঙের শৈবাল ও ডায়েটম নামক অতি ক্ষুদ্র উদ্ভিদে। আর ক্লোরোফিল-ডি থাকে লাল শৈবালে। Purple bacteria-তে থাকে ব্যাক্টিরিও ক্লোরোফিল এবং সবুজ জীবাণুতে থাকে ব্যাক্টিরিও ভিরিডিন।

উদ্ভিদই যে সব ক্লোরোফিল তৈরি করতে পারে, তা নয়। ক্লোরোফিলের গঠন কতকগুলি বিষয়ের উপর নির্ভর করে; যেমন—আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য, উদ্ভিদ-বংশ এবং অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, ম্যাগ্‌নেসিয়াম, লোহা, তামা, জল এবং তাপমাত্রা ইত্যাদি।

445 মি. মাইক্রন এবং 620 থেকে 660 মি. মাইক্রন তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের আলোর সব-চেয়ে বেশী ক্লোরোফিল গঠনের ক্ষমতা রয়েছে। আবার ব্যতিক্রমও আছে, যেমন—জলপদ্মের চারা উৎপন্ন হবার সময় আলোর উপস্থিতি ছাড়াই ক্লোরোফিল তৈরি করতে পারে। আবার মস্, ফার্ন, শৈবাল প্রভৃতি উদ্ভিদ আলো ও অন্ধকার দুই অবস্থাতেই ক্লোরোফিল গঠন করতে পারে। এখন কথা হচ্ছে, ক্লোরোফিল কি শুধু পাতার রঙের জন্যেই থাকে? না, তা নয়। ক্লোরোফিল উদ্ভিদকে এক গুরুত্বপূর্ণ কাজে সাহায্য করে থাকে। কাজটি হচ্ছে আলোকসংশ্লেষণ। উদ্ভিদ পত্ররন্ধ্রের ভিতর দিয়ে বাতাস থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড টেনে নেয় এবং আলোকের সাহায্যে কোষের মধ্যস্থিত জলের সঙ্গে বায়োকেমিক্যাল বিক্রিয়া ঘটিয়ে শর্করা প্রস্তুত করে। এই প্রক্রিয়াকেই বলে আলোকসংশ্লেষণ। রসায়নবিদেরা এই প্রক্রিয়াকেই অতি সংক্ষেপে এই ভাবে প্রকাশ করেছেন—

$$6CO_2+6H_2O \xrightarrow[\text{ক্লোরোফিল}]{\text{সূর্যালোক}} C_6H_{12}O_6+6O_2$$

$$\text{কার্বন ডাই-অক্সাইড}+\text{জল} \xrightarrow[\text{''}]{\text{''}} \text{শর্করা}+\text{অক্সিজেন}$$
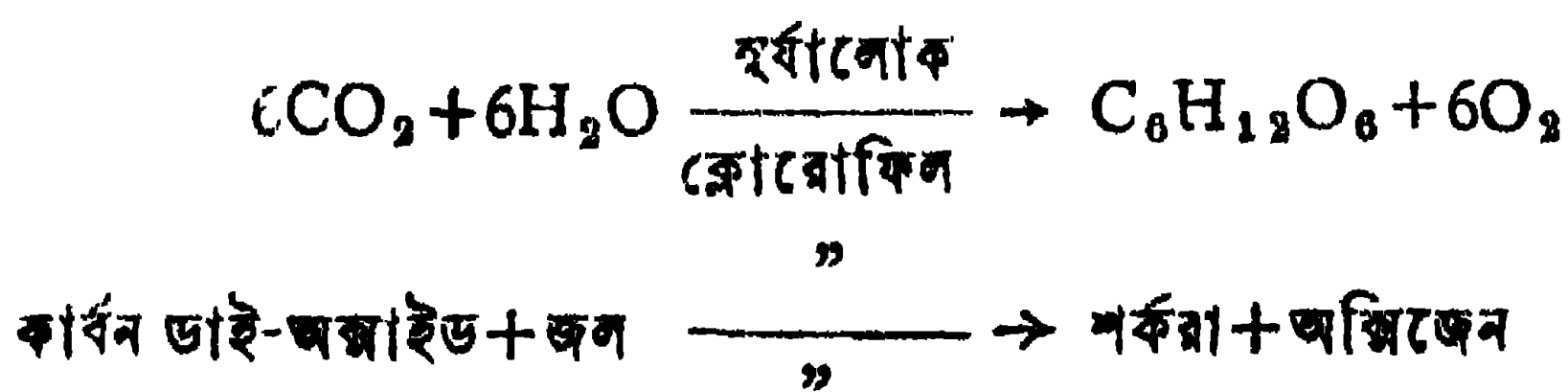
ক্লোরোফিল সূর্যালোক শোষণ করে উপরিউক্ত বায়োকেমিক্যাল বিক্রিয়া নিষ্পন্ন করে থাকে। এমনি ভাবেই সমস্ত উদ্ভিদ-জগৎ বায়ুমণ্ডল থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড টেনে নেয় এবং অক্সিজেন ছেড়ে দেয়। তাই বাতাসে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বেড়ে যেতে পারে না। ফলে জীবজগতের নিশ্বাস-প্রশ্বাসে উদ্ভূত কার্বন ডাই-অক্সাইডের জন্যে বায়ুমণ্ডল দূষিত হতে পারে না। পূর্বে ধারণা ছিল, উদ্ভিদ বাতাস থেকে যে কার্বন ডাই-অক্সাইড টেনে নেয়, তাই আলোকসংশ্লেষণ বিক্রিয়ার মাধ্যমে অক্সিজেনে রূপান্তরিত করে বায়ুমণ্ডলে ছেড়ে দেয়। কিন্তু আলোকসংশ্লেষণ

ব্যবহৃত জলে অক্সিজেন আইসোটোপ (O^{18}) ব্যবহার করে দেখা গেছে যে, উদ্ভিদ যে অক্সিজেন ছাড়ে, তার মধ্যে অক্সিজেন আইসোটোপ (O^{18}) রয়েছে; অর্থাৎ উদ্ভিদ বায়ুমণ্ডলে যে অক্সিজেন ছাড়ে, তা আসে মূলতঃ আলোকসংশ্লেষণে অংশগ্রহণকারী জল থেকেই। উদ্ভিদে ক্লোরোফিলের অবদান যে কত গুরুত্বপূর্ণ, এথেকে সহজেই তা বোঝা যায়। মহাকাশ-বিজ্ঞানীরা ভবিষ্যৎ মহাকাশযানে অক্সিজেন না নিয়ে শুধু ক্লোরেলা নামক উদ্ভিদ নিয়ে কাজ চালাবার জন্যে কৌতূহলান্বিত হয়ে উঠেছেন। ক্লোরেলাতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ক্লোরোফিলের উপস্থিতি। তাই আজ ক্লোরোফিল নিয়ে গবেষণার ক্ষেত্র হয়েছে বিস্তৃত। এই বিষয়ে কাজও চলেছে অতি দ্রুতগতিতে।

মধুশ্রী দে ও মণ্টু বাগচী*

* কৃষি-বিভাগ, বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা-19

জিরাফ

পৃথিবীর সর্বোচ্চ প্রাণী হচ্ছে জিরাফ। হাতী, গরিলা, গণ্ডার প্রভৃতি কোন হিংস্র প্রাণীই উচ্চতায় এদের সমকক্ষ নয়। আফ্রিকা মহাদেশের সাহারা মরুভূমির দক্ষিণাঞ্চলে এদের বাস। এরা সাধারণতঃ দলবেঁধে বিচরণ করে।

জিরাফ স্তন্যপায়ী শ্রেণীর আর্টিওডাকৃটাইলা বর্গের অন্তর্গত। এদের বৈজ্ঞানিক নাম —জিরাফা ক্যামেলোপার্ডালিস। এরা তৃণভোজী প্রাণী। বিরাটকায় মাইমোসা গাছের কচিপাতা খেয়েই এরা জীবনধারণ করে। তা ছাড়া কাঁটাগাছও এদের প্রিয় খাদ্য। একটি প্রাপ্তবয়স্ক জিরাফ উচ্চতায় প্রায় সতেরো-আঠারো ফুট হয়ে থাকে। এক একটির ওজন হয় প্রায় দেড় টন। এদের পা বেশ লম্বা, কিন্তু ঘাড় ও পায়ের তুলনায় দেহটা খুবই ছোট। এদের বুক প্রশস্ত, কিন্তু তার তুলনায় দেহের অন্যান্য অংশ খুব সরু। এদের সামনের পা দুটি বেশ লম্বা, কিন্তু পিছনের পা দুটি বেশ ছোট। ফলে যখন এরা ঘাড় তুলে দাঁড়ায়, তখন দেখায় যেন সমগ্র দেহটা ঘাড় থেকে ঢালু হয়ে নেমে এসেছে। এদের গায়ে চামড়া ভয়ানক শক্ত, কোন কোন অংশে প্রায় এক ইঞ্চি পুরু। এদের গায়ে ডোরা দাগ থাকে। এই দাগগুলি হলদে ও তামাটে রঙের। ছোট অথচ ঘন লোমের দ্বারা এদের সারা দেহ আবৃত। এদের মাথায় শিঙের মত দুটি উঁচু অংশ থাকে। এই দুটি আসলে শিং নয়—শক্ত মাংসপিণ্ড মাত্র। নাকের উপরেও এরকমের আর একটা তৃতীয় মাংসপিণ্ড থাকে। জিরাফের ঘাড় এবং জিহ্বা বেশ লম্বা। এদের চোখ দুটি বেশ বড় বড়। চোখের দৃষ্টি থেকেই বোঝা যায় যে, জিরাফ বেশ চালাক।

জিরাফের গতিবেগ খুব তীব্র। এরা যখন ছুটতে থাকে তখন লেজটাকে কুণ্ডলী পাকিয়ে পিঠের উপর তুলে লম্বা ঘাড়টা এদিক-ওদিক দোলাতে থাকে। যখন পুরা বেগে ছুটতে থাকে, তখন অতি দ্রুতগামী ঘোড়ার পিঠে চাবুক মেরেও জিরাফের গতিবেগ অতিক্রম করা যায় না।

জিরাফ মরুভূমির পরিবেশেই বাস করতে অভ্যস্ত। এরা একটানা কয়েক সপ্তাহ জল পান না করেই থাকতে পারে। এদের পাকস্থলীতে তিনটি অংশ আছে। খাদ্য পেলেই এরা তা তাড়াতাড়ি গিলে খেয়ে নেয়। তার পর অবসর সময়ে সেগুলি পাকস্থলী থেকে বের করে জাবর কাটে।

জিরাফের লম্বা ঘাড়ের সুবিধা-অসুবিধা দুই-ই আছে। লম্বা ঘাড় থাকবার ফলে এরা উঁচু গাছের মগ ডালের কচিপাতা খেতে পারে। পাতার কাছে মুখ না পেঁছুলেও দেড় ফুট লম্বা জিহ্বার সাহায্যে এরা অনায়াসে পাতা টেনে নিতে পারে। জিরাফ শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হলে আত্মরক্ষা করে সাধারণতঃ এই লম্বা ঘাড়ের সাহায্যে। লম্বা ঘাড়ের সাহায্যে তার মাথা দিয়ে শত্রুকে এমন আঘাত করতে পারে যে, শত্রু সহজেই পরাস্ত হয়। সাধারণতঃ সিংহ ছাড়া অন্য কোন প্রাণীই জিরাফকে আক্রমণ করতে সাহস পায় না। খুব ক্ষুধার্ত হলেই সিংহ জিরাফকে আক্রমণ করে। এই হলো জিরাফের লম্বা ঘাড় থাকবার সুবিধা। কিন্তু অসুবিধার দিকটাও কম নয়। মাটি থেকে ছোট ঘাস খাওয়া আর জল পান করা—এই দুটি কাজে তাকে বিশেষ বেগ পেতে হয়। মাটি থেকে কিছু কুড়িয়ে নেবার সময় বা জল পান করবার সময় জিরাফ প্রথমে সামনের পা দুটিকে দুদিকে অনেকখানি ফাঁক করে দেয়। তার পর সুবিধামত ঘাড়টিকে নীচে নামিয়ে দেয়। জিরাফের পক্ষে এটা বেশ কষ্টসাধ্য। তাছাড়া সময়ও লাগে বেশ কিছু।

জিরাফের জন্মবৃত্তান্ত সম্পর্কে এখনও বিজ্ঞানীরা কোন সঠিক সিদ্ধান্তে আসতে পারেন নি। প্রাচীন গ্রীসের বিজ্ঞানীরা বলেছেন যে, জিরাফ বর্ণসঙ্কর প্রাণী—উট ও লেপার্ডের সম্মিলনের ফলে জিরাফ তার গায়ের ডোরাকাঁটা দাগগুলি পেয়েছে লেপার্ডের কাছ থেকে আর তার লম্বা ঘাড় ও পা পেয়েছে উটের কাছ থেকে। তাঁদের মতে, বহু দিন জল পান করে না থাকবার ক্ষমতাও উত্তরাধিকারীসূত্রে জিরাফ উটের কাছ থেকে পেয়েছে। এই জন্যেই গ্রীসদেশীয় লোকেরা জিরাফকে ক্যামেলোপার্ড বলে। আর এই কারণেই জিরাফের বৈজ্ঞানিক নাম জিরাফা ক্যামেলোপার্ডালিস।

আধুনিক যুগের বিজ্ঞানীরা কিন্তু গ্রীসের প্রাচীন বিজ্ঞানীদের কথা মানতে মোটেই রাজী নন। এঁদের মতে, উট ও লেপার্ডের সম্মিলনের ফলে জিরাফের উৎপত্তি হয়েছে—এ কথা ঠিক নয়। জিরাফ নিঃসঙ্গ প্রাণী। একমাত্র অন্যান্য জিরাফ ছাড়া অন্য কোন প্রাণীর সঙ্গে এদের সম্পর্ক নেই। আফ্রিকার সোমালিল্যাণ্ডের জিরাফের সঙ্গে সাহারা প্রান্তের

জিরাফের বেশ কিছুটা সম্পর্ক রয়েছে। একজন ইংরেজ প্রাণিবিদ্ মধ্য-আফ্রিকার ওকাপি প্রাণীর সম্বন্ধে বলেছেন—যদিও একে জিরাফ বলা চলে না, তবুও একে নিঃসন্দেহে জিরাফ পরিবারভুক্ত বলা যায়। তাঁর মতে, জিরাফ হলো প্রাগৈতিহাসিক যুগের প্রাণী। সেই হিমযুগ থেকে রকমে আত্মরক্ষা করে টিকে আছে এবং এই যুগের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলেছে।

শ্রীশঙ্করলাল সাহা

রাবার আবিষ্কারের কাহিনী

1736 সাল—ইউরোপের ভৌগোলিক শার্লে-মারি কোঁদামিন ব্রেজিলে গিয়েছিলেন। তিনি সেখানকার আদিবাসীদের কাছে জানতে পারলেন সেখানে একটি গাছ আছে, যার কাণ্ডে আঘাত করলে এক প্রকার সাদা দুধের মত রস বের হয়। এই জন্তেই তারা এই গাছের নাম দিয়েছে 'কাহুনে গাছ'। এই রসকে সামান্য গরম করলে জমাট বেঁধে কাদার মত হয় এবং তার দ্বারা নানা প্রকার জিনিষ তৈরি করা যায়।

তিনি ভাবতে লাগলেন এটাকে অন্য কোন কাজে লাগানো যায় কিনা? এই খবর ইউরোপ ও আমেরিকার বিজ্ঞানীদের মধ্যে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করে। সকলেই জিনিষটাকে নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা সুরু করেন। তাঁরা শুধু জানতে পারলেন, এটা দিয়ে পেনসিলের দাগ তোলা ছাড়া আর কিছু করা যায় না। সে জন্যে এর নাম দেওয়া হয় রবার।

এর পর অনেক বছর কেটে গেল। সকলেই জানতো, এর দ্বারা অন্য কিছু করা যায় না। তারপর আঠারো শতকের গোড়ার দিকে একজন বিজ্ঞানী কিছুটা চাঞ্চল্য সৃষ্টি করলেন। এঁর নাম চার্লস ম্যাকিনটশ। তাঁর ছিল একটা ছোট রঙের কারখানা। রং তৈরির সময় ন্যাপ্‌থা নামক এক প্রকার তেলজাতীয় জিনিষ পাওয়া যেত। তিনি এই ন্যাপ্‌থার সঙ্গে রাবার মিশিয়ে এক প্রকার ঘন জিনিষ তৈরি করলেন এবং তা কাপড়ের উপর ঢেলে জলরোধক করে তা দিয়ে তিনি কোট তৈরি করেন। এইভাবে তিনি কোট তৈরীর ছোট্ট একটি কারখানাও খোলেন।

এর ফলে আমেরিকায় বহুলোক ছোট ছোট কারখানা স্থাপন করে কোট প্রস্তুতে উৎসাহী হয়ে ওঠেন। কিছুকাল পরে দেখা গেল হঠাৎ তাপ প্রবাহ আবহাওয়াকে উত্তপ্ত করে তুলেছে। এর ফলে কাপড়ের আস্তরণের সমস্ত পদার্থ গেল গলে। গলে যাওয়া পদার্থগুলি ঠাণ্ডায় আবার শক্ত হয়ে ফেটে যেতে লাগলো। সমস্ত কারখানাতেই সঙ্কট দেখা দিল এবং শেষ পর্যন্ত কারখানাগুলি বন্ধ হয়ে গেল।

সেই সময় এই বিষয় নিয়ে ভাবতে সুরু করেন চার্লস গুড্‌ইয়ার। 1800 সালে তাঁর জন্ম। চরম দারিদ্র্য, লাঞ্ছনা ও অবহেলার মধ্যে তাঁর সমস্ত জীবন কেটেছে। এই চরম দুর্দশার মধ্যেও তিনি তাঁর জীবন উৎসর্গ করেছিলেন বিজ্ঞানের সাধনায়। তাঁর বাবার ছিল ছোট্ট একটা রাবারের কারখানা। ছোট ছোট পুতুল, খেলনা তৈরি করে তিনি চরম দারিদ্র্যের মধ্যে সংসার চালাতেন। তিনি এই কারখানায় 1816-1826 সাল পর্যন্ত দশ বছর কাজ করেছিলেন, তারপর স্বাধীনভাবে একটা ব্যবসায় সুরু করেন। কিন্তু এই ব্যবসায় চার বছরও টিকলো না। দেনার দায়ে স্ত্রী-পুত্র সমস্ত ছেড়ে তাঁকে কারাগারে যেতে হলো। তারপর কারাগার থেকে বেরিয়ে তিনি একান্ত মনে পথ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। এমন সময় তিনি লক্ষ্য করলেন একটি কারখানায় কতকগুলি রাবারের জিনিষ সাজানো রয়েছে। তিনি মনে করলেন, এর চেয়ে ভাল জিনিষ তিনি তৈরি করতে পারবেন। তিনি কারখানার মালিকের কাছে সেই মর্মে আবেদন করলেন এবং ভাল জিনিষ তৈরিও করলেন। কিন্তু এই সাফল্য ক্ষণিকের। আবার সেই তাপ-প্রবাহের ফলে সমস্ত জিনিষ ক্ষতিগ্রস্ত হলো এবং পুনরায় তাঁকে কারাবরণ করতে হলো।

কিন্তু এবারেও তিনি উদ্যম হারালেন না। কারাগারের কর্তৃপক্ষের কাছে একটি আবেদন করলেন যে, তাঁকে গবেষণার জন্যে কিছু জিনিষপত্র কারাগারের ভিতর দেওয়া হোক। আবেদন মঞ্জুর হলো। তিনি কারাগারে পুরাদমে গবেষণা চালিয়ে যেতে লাগলেন এবং সেখানেই আবিষ্কৃত হলো—রাবার তৈরির নতুন একটি কৌশল। তিনি দেখলেন—রাবারের সঙ্গে ম্যাগনেসিয়াম মেশালে এর উপরিভাগের চট্‌চটে ভাব অনেকটা দূর হয়ে যায়। কারাগার থেকে ছাড়া পেয়ে তিনি নিজের বাড়ীতে বসে নতুন প্রণালীতে রাবারের জুতা, খেল্‌না প্রভৃতি তৈরি করতে সুরু করলেন। কিন্তু এবারও আর এক অভিযোগ এলো গ্রামবাসীদের কাছ থেকে—রাবারের গন্ধে তারা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন।

কিন্তু গুড্‌ইয়ার দমলেন না। তিদি গেলেন নিউইয়র্কে। এখান থেকে কিছুদূরে তিনি একটি কারখানা খোললেন এবং জুতা ও অন্যান্য জিনিষ তৈরি করে কিছু রোজকার করতে আরম্ভ করলেন। এখানে তিনি আবিষ্কার করেন, যে রাবারের সঙ্গে নাইট্রিক অ্যাসিড মেশালে বেশী উত্তাপের প্রভাবে তা চট্‌চটে হয় না। এভাবে বেশ কিছুদিন কেটে গেল। কিন্তু দুর্ভাগ্য তাঁর, আর্থিক মন্দায় এবার তিনি একেবারে নিঃসম্বল হয়ে পড়লেন।

পরবর্তী সময়ে বোষ্টনে সেই একই বিপর্যস্ত অবস্থা চললো। তারপর এক দিন দেখলেন, রাবারের সঙ্গে গন্ধক মেশালে রাবার আরও বেশী উত্তাপ সহ্য করতে পারে। এরপর যত দিন যায়, তাঁর উদ্যমও তত বাড়তে থাকে। তাঁর স্ত্রী এই সকল পাগলামী সহ্য করতে পারলেন না। এমন কি, তিনি ভাবলেন, তাঁর স্বামী পাগল

হয়ে গেছেন। কাজেই তাঁকে আর রবারের কাজ করতে দিলেন না। একবার এক মজার ঘটনা ঘটলো। একদিন গুড্ইয়ার রান্নাঘরে লুকিয়ে রাবারের সঙ্গে গন্ধক মিশিয়ে পরীক্ষা করছিলেন, হঠাৎ তাঁর স্ত্রী প্রবেশ করলেন। গুড ইয়ার তাড়াতাড়ি রাবারের পিণ্ডটি উনুনের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেন। স্ত্রী যখন বেরিয়ে গেলেন, তখন তিনি উনুনের ভিতর তাকিয়ে উন্মাদের মত চেঁচিয়ে উঠলেন। তিনি দেখলেন অঙ্গারের স্পর্শে রাবার একেবারে শক্ত হয়ে গেছে। তাপ-প্রবাহের হাত থেকে তিনি এই ভাবে গন্ধক মিশিয়ে রাবারের গলন বন্ধ করবার উপায় উদ্ভাবন করেছিলেন।

এদিকে পরিবারের অবস্থা খুব খারাপ। বিক্রয় করবার মত কোন জিনিষই তাঁর নেই। কিন্তু হোটেলের দেনা পরিশোধ করতে না পারায় তাঁকে কারাবরণ করতে হয়। জেল থেকে বেরিয়ে এসে দেখেন তাঁর ছোট ছেলেটি মারা গেছে।

1860 সালের 30শে জুন তিনি ছিলেন নিউইয়র্কে, খবর এল তাঁর মেয়েটি মারা গেছে। এর একদিন পরে তিনিও ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

তুষারকান্তি মণ্ডল

রেডিয়ামের কথা

রেডিয়াম আবিষ্কার এক বিস্ময়কর ঘটনা। অনেক হাতঘড়ি বা টেবিল ঘড়িকে রাতের অন্ধকারে জ্বলজ্বল করতে দেখা যায়। কেন জ্বলে, কি বৃত্তান্ত—এক আশ্চর্যের বিষয়। রেডিয়ামই এই অদ্ভুত ব্যাপারের উৎস। রেডিয়ামের আবিষ্কার বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এক নতুন অধ্যায় রচনা করেছে।

রেডিয়াম একপ্রকার সাদা খনিজ পদার্থ। খাদ্যোপযোগী লবণের মত বলা যেতে পারে। এপর্যন্ত এর সন্ধান খুব কমই পাওয়া গেছে। সমগ্র পৃথিবীতে এই পদার্থ কয়েক চামচের মত আছে। এক পাউণ্ড রেডিয়ামের মূল্য এক হাজার পাউণ্ড সোনার মূল্যের সমান। এটি যেমন মূল্যবান, তেমনি শক্তিশালী। একটু বেশী পরিমাণ খুবই বিপজ্জনক। কোন জায়গায় দুই-এক পাউণ্ড রেখে দিয়ে তার সংস্পর্শে গেলে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। একে অনায়াসে নাড়াচাড়া করা যায়, কোন ব্যথা-বেদনার উদ্রেক হয় না। কিন্তু দুই-এক সপ্তাহের মধ্যেই বিচিত্র পরিবর্তন লক্ষিত হয়। শরীরের চামড়া উঠে যায়, অন্ধ হয়ে যেতে হয় এবং খুব শীঘ্রই প্রাণ হারাতে হয়। যে সকল বিজ্ঞানীরা এই পদার্থটি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন—তাঁদেরই প্রভূত ক্ষতি হয়েছে।

এই মূল্যবান পদার্থটি এতই দুষ্প্রাপ্য এবং শক্তিশালী যে, একমাত্র বিজ্ঞানীরাই এই পদার্থটি নিয়ে কাজ করতে পারেন।

বিজ্ঞানী বেকেরেল খনিজ পদার্থ পিচ্‌ব্লেণ্ড থেকে ইউরেনিয়াম নামক এক প্রকার রেডিওঅ্যাকটিভ বা তেজস্ক্রিয় পদার্থ আবিষ্কার করেন। পরে প্যারিসের অধ্যাপক পিয়ারী কুরী এবং তাঁর স্ত্রী ম্যাডাম কুরী পিচ্‌ব্লেণ্ড থেকে ইউরেনিয়াম অপেক্ষা হাজার গুণ শক্তিসম্পন্ন আর একপ্রকার তেজস্ক্রিয় পদার্থ আবিষ্কার করেন এবং তার নাম দেন পলোনিয়াম (ম্যাডাম কুরীর দেশ পোল্যাণ্ডের নাম অনুসারে)। এতেও তাঁরা থেমে থাকেন নি, বহু পরিশ্রমের পর রেডিয়াম আবিষ্কার করেন। এটাই পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী তেজস্ক্রিয় পদার্থ। এই আবিষ্কারের জন্যে বিজ্ঞানী বেকেরেল এবং কুরী দম্পতি 1904 সালে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। তাঁদের এই সম্মিলিত প্রচেষ্টা বিজ্ঞানীদের কাছে এক নতুন দ্বার খুলে দিয়েছে।

অন্ধকারে রেডিয়ামকে জ্বলন্ত আগুনের মত উজ্জ্বল দেখায়। অনন্তকাল ধরে আলো ও তাপ বিকিরণ করে এর কিন্তু ওজন বা অবস্থার কোন পরিরর্তন লক্ষিত হয় না। প্রত্যেক বস্তুই রেডিয়ামের সংস্পর্শে তেজস্ক্রিয় হয়ে যায়। প্রত্যেক বস্তু রেডিয়ামের সংস্পর্শে কিছু নতুন গুণের অধিকারী হয়, বিশেষতঃ অন্ধকারে যেগুলিকে উজ্জ্বল দেখায় —সেই বস্তুগুলিকে তেজস্ক্রিয় বলা যায়।

রেডিয়ামের এই বিশেষ ধর্মকে কাজে লাগিয়ে অন্ধকার যেখানে বিপদের কারণ, সে স্থানকে বিপদমুক্ত করা হয়। এক প্রকার রেডিয়াম রঙের দ্বারা ইলেক্ট্রিকের সুইচ্ বোর্ডের উপর রং করা হয়। কারণ অন্ধকারে কোন সুইচ্ খুঁজতে গেলে হয়তো মৃত্যু ঘটতে পারে। ঘড়ি, বিষের বোতল, তালার ছিদ্র এবং ছোটদের পুতুলের চোখে এর ব্যবহার উল্লেখযোগ্য। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে বহু মূল্যবান প্রকৃত রেডিয়াম ব্যবহার করা হয় না। জিঙ্ক সালফেট নামক এক প্রকার যৌগ, যাতে খুব সামান্য রেডিয়ামের চিহ্ন মেলে, তাই ব্যবহৃত হয়। রেডিয়ামের পরমাণু প্রতি সেকেণ্ডে যথেষ্ট রশ্মি বিচ্ছুরণ করে। চিকিৎসা ক্ষেত্রে এর প্রভাব যথেষ্ট। ক্যান্সার রোগ উপশমে এবং টিউমার নিরাময়ের জন্যে এর ব্যবহার উল্লেখযোগ্য।

বিজ্ঞানীদের আশা, ভবিষ্যতে রেডিয়ামকে কাজে লাগিয়ে অনেক কিছু অজানাকে জানা যাবে, এক পদার্থকে অন্য পদার্থে পরিবর্তন করা সম্ভব হবে। সেটাই খুব আশ্চর্যজনক হবে, যদি এক ধাতুকে অন্য ধাতুতে পরিবর্তিত করা যায়। আমরা এমন একদিনের অপেক্ষায় থাকবো, যেদিন এই রেডিয়ামকে কাজে লাগিয়ে সমগ্র পৃথিবীর প্রভূত কল্যাণ সাধিত হবে।

শিবশঙ্কর মিত্র

প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন 1। টোম্যাটোর উপকারিতা কি ?

দীপিকা মিত্র ও কাজল মিত্র
বীরভুম

প্রশ্ন 2। আল্‌সার কি ?

দীপক চক্রবর্তী, হাওড়া

উঃ 1। সুস্থ বা অসুস্থ নির্বিশেষে যে কোন লোকের পক্ষে টোম্যাটো একটি উপকারী খাদ্য। টোম্যাটো বিভিন্ন প্রকার খাদ্যপ্রাণ বা ভিটামিন ও প্রোটিন-সমৃদ্ধ। টোম্যাটোতে বিশেষভাবে ভিটামিন-এ, ভিটামিন-বি ও ভিটামিন-সি-এরই আধিক্য। ভিটামিনগুলির উপস্থিতির জন্য অপুষ্ট রোগীদের ক্ষেত্রে, চক্ষুরোগে, চর্মরোগে, বহুমূত্র রোগে ও রিকেট প্রভৃতি রোগে টোম্যাটোর রস ওষুধের মত কাজ করে। অন্ত্র ও পাকস্থলীকে সুস্থ রাখবার ক্ষেত্রে যে কোন রকম খাদ্যবস্তুর তুলনায় টোম্যাটো অধিকতর কার্যকরী। উপরিউক্ত ভিটামিনগুলি ছাড়াও টোম্যাটোতে নানা প্রকার ধাতব পদার্থ, যেমন—সোডিয়াম, গন্ধক, ক্লোরিন, লোহা ইত্যাদি বর্তমান। মানুষের শরীরে রক্ত তৈরির ব্যাপারে লোহার উপস্থিতি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। রক্ত তৈরির কাজে সাহায্য করা ছাড়াও টোম্যাটোর রস রক্ত পরিষ্কার করবার কাজেও সহায়তা করে থাকে। অতিরিক্ত ভোজনের ফলে যে বিষক্রিয়ার সৃষ্টি হয়, টোম্যাটোর রস তা নিবারণ করতে সক্ষম। টোম্যাটোতে প্রধানতঃ তিনটি অ্যাসিড পাওয়া যায়; যেমন—সাইট্রিক অ্যাসিড, ম্যালিক অ্যাসিড ও ফস্‌ফোরিক অ্যাসিড। এই তিনটি অ্যাসিডই আমাদের শরীরের পক্ষে অপরিহার্য।

উঃ 2। আল্‌সার শব্দটির অর্থ হচ্ছে—ক্ষত। শরীরের কোন স্থানের তন্তু নষ্ট হয়ে গেলে সেস্থানে ক্ষতের সৃষ্টি হয়। সাধারণতঃ রোগ-জীবাণু সংক্রমণের ফলেই ক্ষতের উৎপত্তি হয়; তবে বাহ্যিক কারণে আঘাত লাগবার ফলেও ক্ষতের সৃষ্টি হতে পারে। দেহের কোন জায়গার ধমনী যদি দুর্বল ও শীর্ণ হয়ে পড়ে, তখন সেই জায়গায় রক্তসঞ্চালন হ্রাস পায়। রক্তচলাচলের এই অবস্থায় রোগ-জীবাণু সংক্রামিত হলে দেহের ঐ অংশে পচনশীল ক্ষতের উদ্ভব হয়। বিভিন্নভাবে শরীরের যে কোন জায়গাতেই ক্ষতের সৃষ্টি হতে পারে। তবে পাকস্থলীর ক্ষতের সঙ্গে আমরা বেশী পরিচিত। পাকস্থলীতে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ও পেপ্‌সিনের পরিমাণ বেশী হলে পাকস্থলীর ভিতরের স্তর ক্ষয়ে যায়। পাকস্থলীতে মিউকাস স্তরের উপস্থিতি এদের ক্ষয়ক্রিয়াকে রোধ করে। আর কোন কারণে রোধক্ষমতা হারালেই ক্ষতের সৃষ্টি হয়। ক্ষতস্থান অনবরতই পেপ্‌সিন ও হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের সংস্পর্শ থাকায় পচনক্রিয়া ক্রমশঃই বেড়ে গিয়ে মারাত্মক অবস্থার সৃষ্টি করে। ফলে ব্যাধি দুরারোগ্য হয়ে পড়ে এবং শেষে রক্তনালী ক্ষয় পেয়ে রক্তক্ষরণ সুরু হয়। যক্ষ্মা, টাইফয়েড, আমাশয় প্রভৃতি রোগের সংক্রমণেও ক্ষতের সৃষ্টি হতে পারে।

শ্যামসুন্দর দে*

* ইনষ্টিটিউট অব রেডিও-ফিজিক্স অ্যাণ্ড ইলেকট্রনিক্স, বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা-9

শোক-সংবাদ

ডক্টর সহায়রাম বসু

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য, বাংলা তথা ভারতের বিশিষ্ট উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী ডক্টর সহায়রাম বসু দীর্ঘকাল অসুস্থতার পর গত 6ই ডিসেম্বর (1970) কলকাতার আর. জি. কর মেডিক্যাল কলেজে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স 83 বছর হয়েছিল।

1888 সালের 15ই ফেব্রুয়ারী হুগলী জেলার নাগবোল গ্রামে সহায়রাম জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা বেনীমাধব বসু বাংলা দেশের প্রাদেশিক বিচার বিভাগে চাকরি করতেন। হুগলী কলেজিয়েট স্কুল থেকে এণ্ট্রান্স পরীক্ষা পাস করে সহায়রাম কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন। সেখান থেকে 1907 সালে তিনি 'বি' কোর্সে স্নাতক ডিগ্রী এবং 1908 সালে এম. এ. ডিগ্রী লাভ করেন। বাবার ইচ্ছানুযায়ী তিনি আইন বিষয়ে পড়া সুরু করেন এবং 1910 সালে বি. এল. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কিন্তু তাঁর আইনবৃত্তি দীর্ঘস্থায়ী হয় নি, মাত্র 6 বছর তিনি হাইকোর্টে ছিলেন। এই সময় তিনি স্যার আশুতোষ এবং শ্রীরাসবিহারী ঘোষের সংস্পর্শে আসেন। তাঁর মনে তখন দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়—আইনবিদ্যা, না উদ্ভিদবিদ্যা কোন্‌টিকে তিনি জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করবেন? শেষ পর্যন্ত তিনি উদ্ভিদবিদ্যাতেই আত্মনিয়োগ করা স্থির করেন। 1916 সালে তিনি তৎকালীন কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজে (বর্তমান আর. জি. কর মেডিক্যাল কলেজ) উদ্ভিদবিদ্যার অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন।

এই সময় কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের জীববিদ্যার অধ্যাপক একেন্দ্রনাথ ঘোষের অনুপ্রেরণায় তরুণ সহায়রাম ছত্রাক সম্বন্ধে গবেষণা সুরু করেন। কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজে যোগদানের কিছুকাল পরেই তিনি পলিপোর শ্রেণীর ছত্রাকের সম্বন্ধে গবেষণায় মনোনিবেশ করেন। প্রখ্যাত ছত্রাক-বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক টম পেক-এর অধীনে উদ্ভিদ শ্রেণীবদ্ধকরণ-বিদ্যায় বিশেষ শিক্ষা গ্রহণের জন্যে তাঁকে সিংহলের সুপ্রসিদ্ধ রয়েল বটানিক গার্ডেনে পাঠানো হয়।

ডক্টর সহায়রাম বসু

সিংহল থেকে ফিরে এসে সহায়রাম ছত্রাক বিষয়ক গবেষণায় গভীরভাবে আত্মনিয়োগ করেন এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই সম্পর্কে থিসিস দাখিল করেন। তাঁর গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার

স্বীকৃতিতে বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে উদ্ভিদ-বিজ্ঞানে ডি-এস. সি ডিগ্রীতে ভূষিত করেন।

ছত্রাক-বিজ্ঞান সম্পর্কে উচ্চতর গবেষণার জন্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাসবিহারী ঘোষ ভ্রমণ-বৃত্তি লাভ করে তিনি এক বছরের জন্যে ইউরোপে গমন করেন। এই সময় তিনি ইউরোপের বিশিষ্ট ছত্রাক-বিজ্ঞানীদের সান্নিধ্যে আসেন এবং বৃটিশ মিউজিয়ামের কিউ গার্ডেন ও প্যারিসের প্রাকৃতিক ইতিহাস মিউজিয়ামের হার্বেরিয়ামে কাজ করবার সুযোগ পান। ইউরোপ থেকে ফিরে এসে তিনি এক বছরকাল বসু-বিজ্ঞান মন্দিরে আচার্য জগদীশচন্দ্রের সহযোগী হিসাবে কাজ করেন।

ভারতে ছত্রাক-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় গবেষণার ক্ষেত্রে ডক্টর সহায়রাম বসু একটি গৌরবোজ্জ্বল নাম। ভারতে উৎপন্ন আহারোপ-যোগী ছত্রাক সম্বন্ধে তিনি ব্যাপক গবেষণা করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় পেনিসিলিয়াম নোটাটাম নামক ছত্রাক থেকে পেনিসিলিন নামক অ্যান্টিবায়োটিক আবিষ্কারের ব্যাপারে উৎসাহিত হয়ে তিনি পলিপোরজাতীয় ছত্রাকের ভেষজমূল্য অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হন এবং পলিপোরিন নামে একটি অ্যান্টিবায়োটিক আবিষ্কার করেন। পরবর্তী কালে তাঁর গবেষণার ফলে ক্যাম্পস্টেরিন নামে আর একটি অ্যান্টিবায়োটিকও আবিষ্কৃত হয়। প্রায় 44 বছরব্যাপী তিনি ছত্রাক সম্পর্কে গবেষণা করেছেন এবং 1963 সাল পর্যন্ত ইউরোপ, আমেরিকা ও এশিয়ার বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পত্র-পত্রিকায় তাঁর 117টি গবেষণা-নিবন্ধ প্রকাশিত হয়।

ছত্রাক-বিজ্ঞানে গবেষণার জন্যে ডক্টর সহায়রাম বসু স্বদেশ ও বিদেশের বহু সম্মানে ভূষিত হয়েছেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে তিনবার গ্রিফিথ স্মৃতি পুরস্কার এবং বাংলার এশিয়াটিক সোসাইটি তাঁকে ক্রস স্মৃতিপদক ও বার্কলে স্মৃতিপদক প্রদান করেন। পলিপোর সংক্রান্ত গবেষণার জন্যে লণ্ডনের রয়েল সোসাইটি তাঁকে তিন বছরকাল গবেষণা-বৃত্তি দিয়েছিলেন। 1925 সালে ডক্টর বসু এডিনবরার রয়েল সোসাইটির ফেলো এবং 1930 সালে ইটালীর আন্তর্জাতিক মাইক্রোবায়োলজি সোসাইটির সম্মানিত সদস্য নির্বাচিত হন। 1937-38 সালে তিনি ভারতের বটানিক্যাল সোসাইটির সভা-পতির পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ছত্রাক-বিজ্ঞান সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সম্মিলনে যোগদানের জন্যে তিনি একাধিকবার ইউরোপ ও আমেরিকায় যান এবং বিভিন্ন গবেষণাগার পরিদর্শন করেন। 1950 সালে স্টকহোমে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক উদ্ভিদ-বিজ্ঞান কংগ্রেসে তিনি ছত্রাক-বিজ্ঞান শাখার সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন। ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের উদ্ভিদ-বিজ্ঞান শাখার তিনি সভাপতিত্ব করেছেন। 1957 সালে ফরাসী শিক্ষা দপ্তরের আমন্ত্রণে তিনি জাতীয় বিজ্ঞান গবেষণা সংস্থার (C. N. R. S) গবেষণার অধ্যক্ষরূপে কাজ করেন। 1960 সালে তিনি কলকাতার স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিন-এ ভেষজ ছত্রাকবিদ্যার অধ্যাপকরূপে কাজ করেন। 1963 সালে তিনি আর. জি. কর মেডিক্যাল কলেজের এমেরিটাস অধ্যাপক-পদে বৃত হন। তিনি ভারতের ন্যাশন্যাল ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স-এর (বর্তমানে ন্যাশন্যাল সায়েন্স অ্যাকাডেমি) ফেলো ছিলেন।

মানুষ হিসাবে ডক্টর সহায়রাম বসু ছিলেন নিরহঙ্কার, অমায়িক ও আত্ম-উদাসীন এবং আধ্যাত্মিকতাবাদী। তাঁর সংস্পর্শে এসে আমরা তাঁর প্রীতিপূর্ণ মধুর ব্যবহারে মুগ্ধ হয়েছি। তাঁর লোকান্তরিত আত্মার স্মৃতির প্রতি আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

র. ব.

বিবিধ

ডক্টর মৃত্যুঞ্জয়প্রসাদ গুহের শিশু-সাহিত্যে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার লাভ

বাংলা ভাষায় শিশু সাহিত্যে বিশেষ অবদানের জন্যে 1970 সালে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার পেয়েছেন ডক্টর মৃত্যুঞ্জয়প্রসাদ গুহ, তাঁর 'চল যাই চাঁদের দেশে' নামক বিজ্ঞানভিত্তিক গ্রন্থের জন্যে। পুরস্কারের আর্থিক মূল্য এক হাজার টাকা।

মহাকাশে যে দিন স্পুটনিক বা নকল চাঁদ স্থাপিত হয়েছিল, সেই দিন থেকে সুরু করে মহাকাশ-বিজ্ঞান কিভাবে ধাপে ধাপে গড়ে উঠেছে এবং শেষ পর্যন্ত মানুষ কিভাবে চাঁদের মাটিতে পা ফেলে আবার পৃথিবীতে ফিরে আসতে সক্ষম হয়েছে, তারই এক সম্পূর্ণ, সচিত্র, তথ্যবহুল কাহিনী দেওয়া হয়েছে এই গ্রন্থে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, ডক্টর গুহের বিজ্ঞানভিত্তিক গ্রন্থ 'আকাশ ও পৃথিবী' 1964 সালে রবীন্দ্র পুরস্কারে সম্মানিত হয় এবং 'বিজ্ঞানের বিচিত্র বার্তা' নামক অপর একটি গ্রন্থ 1969 সালে ইউনেস্কো পুরস্কারে সম্মানিত হয়।

ডক্টর গুহ বর্তমানে আর. জি. কর মেডিক্যাল কলেজের রসায়ন বিভাগের বিভাগীয় প্রধানের পদে অধিষ্ঠিত। তিনি বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের একজন সভ্য এবং প্রায়ই 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকায় লিখে থাকেন।

বিজ্ঞপ্তি

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত যাবতীয় পুস্তক এখন হইতে কেবল মেসার্স ওরিয়েণ্ট লঙম্যান অ্যাণ্ড কোং হইতে (17, চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউ, কলিকাতা-13) বিক্রয় করা হইবে। সদস্যগণ বাদে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ কার্যালয় হইতে এখন আর কারো নিকট কোন পুস্তক বিক্রয় করা হইবে না।

সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য
শ্রীমিহিরকুমার ভট্টাচার্য কর্তৃক পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-6 হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ
37/7 বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

চতুর্বিংশ বর্ষ   ফেব্রুয়ারী, 1971   দ্বিতীয় সংখ্যা

স্বপ্নের স্নায়ু-রাসায়নিক ভিত্তি

সুভাষচন্দ্র বসাক ও জগৎজীবন ঘোষ *

স্বপ্ন আমাদের জীবনের একটা প্রাত্যহিক ঘটনা। প্রাচীন কালেও স্বপ্নের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হতো। গ্রীক দার্শনিক অ্যারিষ্টটলের মতে, স্বপ্ন হলো ঘুমন্ত প্রাণীর মানসিক সক্রিয়তার অবস্থা। স্বপ্নের সঙ্গে জাগ্রতাবস্থার যেমন অনেক মিল আছে, তেমনি অনেক পার্থক্যও আছে। স্বপ্নকালীন ঘটনার অধিকাংশই কোন দৃশ্যমান বস্তুর রূপ নেয়, কিন্তু শুধুমাত্র অনুভূতির স্তরেও স্বপ্নের ঘটনা বিরল নয়। স্বপ্নের বর্ণনা দিতে গিয়ে অনেকে বলেছেন—"I can draw it but I do not know how to put it into words." অপরিচিত লোকের মত কোন কোন স্বপ্ন জীবনে একবার মাত্র আসে, আবার একই স্বপ্ন বার বার দেখবার ঘটনাও খুব বিরল নয়। স্বপ্ন সম্পর্কে গবেষণার সবচেয়ে অসুবিধা এই যে, স্বপ্নের সমস্ত ঘটনা আমাদের মনে থাকে না, যা মনে থাকে, তা স্বপ্নের একটা সামান্য অংশ মাত্র।

আগে অনেকেরই ধারণা ছিল স্বপ্ন একটা মানসিক ঘটনা মাত্র, এর কোন জৈবিক দিক নেই। কিন্তু গত দশকের গবেষণা এই ধারণাকে একেবারেই মুছে ফেলেছে। স্বপ্ন সম্পর্কে অনেক তথ্য আজ আমাদের জানা আছে। কিন্তু স্বপ্ন মন বা শরীরের কি বিশেষ ক্রিয়ার জন্যে দায়ী, তা আজও অজানাই রয়ে গেছে।

স্বপ্ন ও নিদ্রার সম্পর্ক—স্বপ্নের সব ঘটনাকে ব্যাখ্যা করতে পারে এমন কোন সংজ্ঞা জানা নেই। যদি বলা হয়, পরিবেশের উত্তেজনায় ঘুমন্ত প্রাণীর

* প্রাণ-রসায়ন বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

যে মানসিক সংবেদন হয়—তাই স্বপ্ন, তবে স্বপ্নের জৈবিক (Somatic) দিকটা একেবারেই বাদ পড়ে যায়। আবার প্রাণীদেহের স্বপ্নকালীন রাসায়নিক পরিবর্তনের মধ্যে এমন কোন বিশেষত্ব নেই, যা শুধুমাত্র স্বপ্নেই হয়, অন্য কোন ক্ষেত্রে হয় না। তবে প্রতি ক্ষেত্রেই স্বপ্নের সময় আমরা কতকগুলি অলীক ঘটনা দেখি—বিজ্ঞানের ভাষায় যাকে বলে হ্যালুসিনেশন (Hallucination)।

পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, ঘুমন্ত মস্তিষ্ক পর পর ছুটি অবস্থার মধ্য দিয়ে যায়। প্রথমটি হলো ধীর-তরঙ্গ নিদ্রা, ইলেক্ট্রোএনসেফালোগ্র্যাম বা ই.ই.জি.তে ধীর-তরঙ্গ এবং মানসিক শূন্যতা এই নিদ্রার বৈশিষ্ট্য। কিছুক্ষণ ধীর-তরঙ্গ নিদ্রা চলবার পর দ্রুত চক্ষু-স্পন্দন নিদ্রার আবির্ভাব হয়। এই সময় শারীরিক ও মানসিক ক্রিয়া জাগ্রতাবস্থার তুলনায় দ্রুততর হয়। ই.ই.জি.তে এক প্রকার দ্রুত তরঙ্গ এবং চোখের এক বিশেষ ধরণের দ্রুত স্পন্দন এই নিদ্রার বৈশিষ্ট্য; যদিও এই অবস্থায় মন খুবই সক্রিয় থাকে, তবু বহিঃপ্রকৃতির সঙ্গে প্রাণীর কোন যোগাযোগ থাকে না; কারণ নিদ্রার এই অবস্থা থেকে জাগাবার জন্যে ন্যূনতম উত্তেজনার মান ধীর-তরঙ্গ নিদ্রার চেয়ে সব সময়েই বেশী। দ্রুত চক্ষু-স্পন্দন নিদ্রা থেকে জাগবার পর সকলেই স্বপ্ন দেখার কথা বলেছেন। তাই বলা যেতে পারে, দ্রুত চক্ষু-স্পন্দন নিদ্রার সময় যে হ্যালুসিনেশন হয়, সেটাই হলো স্বপ্ন।

স্বপ্নকালীন শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন—স্বপ্নের সময় আমাদের দেহ বিশেষ ভঙ্গীতে থাকে, যা জাগ্রতাবস্থা বা ধীর-তরঙ্গ নিদ্রার অবস্থা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। স্বপ্নের সময় চোখ নড়া একটা স্বাভাবিক ঘটনা। স্বপ্নের দৃশ্যাবলী যত উত্তেজনাপূর্ণ হয়, চোখ নড়বার গতি তত বেশী হয়। চোখ যখন নড়ে না, তখন স্বপ্নের দৃশ্য স্থির থাকে অথবা দৃশ্যের পটপরিবর্তন হয়। স্বপ্নে যখন কথা বলা বা হাসির ঘটনা থাকে, তখন শ্বাসকার্যের কষ্ট হয়।

স্বপ্নের সময় মস্তিষ্কে রক্তের প্রবাহ ও মস্তিষ্কের তাপমাত্রা বেড়ে যায়। এছাড়া অ্যাড্রিন্যাল গ্রন্থি থেকে কর্টিকয়েড জাতীয় হর্মোনের নিঃসরণ বেড়ে যায়। বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, স্বপ্নের যে অংশে সর্বাধিক শারীরিক পরিবর্তন দেখা যায়, সেই অংশের দৃশ্যাবলী সবচেয়ে বেশী স্পষ্ট হয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, স্বপ্নের ক্ষেত্রে শরীর ও মনের মধ্যে একটা জৈবিক যোগসূত্র রয়েছে; অর্থাৎ মানসিক ভ্রান্তির ফল হিসাবে স্বপ্নের সৃষ্টি নয় বরং স্বপ্ন অত্যন্ত সক্রিয়, জটিল ও ছন্দবদ্ধ স্নায়ু-রাসায়নিক ক্রিয়ার বহিঃপ্রকাশ, জাগ্রতাবস্থা বা নিদ্রার মতই একটা সম্পূর্ণ পৃথক জৈবিক ঘটনা।

স্বপ্নকালীন হ্যালুসিনেশনের সময় আমাদের মানসিক অনুভূতির সমস্ত স্তরেই ভ্রান্তির আবির্ভাব হয়, কিন্তু স্বপ্নের চরম উত্তেজনাপূর্ণ মুহূর্তেও বহিরাগত কোন উত্তেজনার উপস্থিতির প্রমাণ পাওয়া যায় না। সুতরাং ধরে নেওয়া যায়, স্বপ্নের জন্যে প্রয়োজনীয় উত্তেজনার সৃষ্টি মস্তিষ্কেই হয় এবং স্বপ্নের সময় মস্তিষ্ক নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত থাকে, বাইরের উত্তেজনায় সাড়া দেবার কোন অবসর থাকে না। অন্ধ হবার আগে বা পরে স্বপ্নের দৃশ্যের কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে না। যেহেতু স্বপ্নের হ্যালুসিনেশনের জন্যে বাইরের কোন উত্তেজনা দায়ী নয়, সেহেতু বিজ্ঞানী ডিমেন্ট মনে করেন, স্বপ্নকালীন হ্যালুসিনেশনই প্রকৃত হ্যালুসিনেশন।

স্বপ্নের নিয়ন্ত্রক কেন্দ্র—আগে ধারণা ছিল নিদ্রা ও স্বপ্ন একই জটিল স্নায়ু-রাসায়নিক প্রক্রিয়ার রূপভেদ মাত্র এবং কেন্দ্রীয় স্নায়ুমণ্ডলীর একই কেন্দ্রের দ্বারা এই ক্রিয়াগুলি নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্তু সাম্প্রতিক কালে একাধিক পরীক্ষা এই ধারণার বিলুপ্তি ঘটিয়েছে। দেখা গেছে মস্তিষ্কের Nucleus cocrulens-কে ক্ষতিগ্রস্ত করলে স্বপ্ন একেবারে বন্ধ হয়ে যায়, কিন্তু ধীর-তরঙ্গ নিদ্রার

এমন কোন ক্ষতি হয় না। অন্য দিকে Raphe system-এর কার্যক্ষমতা নষ্ট করে দিলে ধীর-তরঙ্গের নিদ্রা খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হয়, কিন্তু স্বপ্নের পরিমাণে বিশেষ কোন হেরফের হয় না। তাই বলা যেতে পারে যে, স্বপ্ন ও ধীর তরঙ্গের নিদ্রা সম্পূর্ণ পৃথক স্নায়ু-রাসায়নিক প্রক্রিয়া এবং মস্তিষ্কের বিভিন্ন কেন্দ্রের দ্বারা তা নিয়ন্ত্রিত হয়।

নবজাতকের স্বপ্ন—দ্রুত চক্ষু-স্পন্দন নিদ্রাকালীন হ্যালুসিনেশনকে যদি স্বপ্ন বলা হয়, তবে প্রশ্ন উঠতে পারে, শিশুরা আদৌ স্বপ্ন দেখে কিনা। যদি স্বপ্ন বলতে আমরা স্পষ্ট হ্যালুসিনেশন বুঝি, তবে শিশুরা নিশ্চয়ই স্বপ্ন দেখে না। জন্মান্ধ ব্যক্তিরও দ্রুত চক্ষু-স্পন্দন নিদ্রা হয়। এ ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই কোন বিশেষ ধরণের দৃশ্যের সঙ্গে এই নিদ্রার যোগাযোগ থাকে না। গুরুমস্তিষ্কের আস্তরণ (Cerebral cortex) সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়েছে, এমন প্রাণীরও দ্রুত চক্ষু-স্পন্দন নিদ্রা হয়। তাই এই ক্ষেত্রে দ্রুত চক্ষু-স্পন্দন নিদ্রা ও হ্যালুসিনেশনকে অবিচ্ছেদ্য মনে করবার কোন সঙ্গত কারণ নেই। তাছাড়া জন্মের পূর্বেও এই দুই ঘটনার মধ্যে সংযোগ ঘটা সম্ভব এবং সেই ক্ষেত্রে জন্মের পূর্বেই দ্রুত চক্ষু-স্পন্দন নিদ্রার সময় অপরিস্ফুট হ্যালুসিনেশন হতে পারে। কিন্তু এই ক্ষেত্রে হ্যালুসিনেশনের স্বরূপ কি, তা বলা কঠিন। এই ধারণা সঠিক হলে স্বপ্নের মানসিক দিকের চেয়েও শারীরিক দিকটাই বেশী উল্লেখযোগ্য বলে মনে হয়।

দ্রুত চক্ষু-স্পন্দন নিদ্রা বা স্বপ্নকালীন নিদ্রার কার্যকারিতা—ক্রমবিবর্তনের বিভিন্ন স্তরের প্রাণীদের উপর পরীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে যে, মস্তিষ্কের উন্নতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে এই নিদ্রার পরিমাণও বেড়ে যায়। পাখীর ক্ষেত্রে এই নিদ্রার পরিমাণ মোট নিদ্রার 0·3% এবং নবজাত শিশুর ক্ষেত্রে 50% বা তারও বেশী। তাই মনে হয়, উন্নততর প্রাণীর মস্তিষ্কের কোন বিশেষ প্রয়োজনেই এই নিদ্রার আবির্ভাব হয়েছে।

মানুষের ক্ষেত্রে যতদিন মস্তিষ্ক অপরিণত থাকে, ততদিন এই নিদ্রার পরিমাণ থাকে বেশী এবং মস্তিষ্কের পরিণতি প্রাপ্তির সঙ্গে এই নিদ্রার পরিমাণও কমে যায়। নবজাত শিশুর ক্ষেত্রে এই নিদ্রার পরিমাণ মোট নিদ্রার 50 শতাংশ, 5 বছর বয়স্ক শিশুর ক্ষেত্রে 20%, অপরিণত মস্তিষ্কসম্পন্ন শিশুদের ক্ষেত্রে এই নিদ্রার পরিমাণ থেকে মনে হয়, ভ্রূণাবস্থায় 30 সপ্তাহ বা তার আগে এই নিদ্রার পরিমাণ হবে 100 শতাংশ। ভ্রূণাবস্থায় প্রাণীর সঙ্গে পরিবেশের সরাসরি কোন যোগাযোগ থাকে না। কিন্তু দ্রুত চক্ষু-স্পন্দন নিদ্রার সময় মস্তিষ্কের কার্যকারিতা অবিশ্বাস্যরূপে বেড়ে যায়। অনেকের ধারণা, উন্নততর প্রাণীর ক্ষেত্রে মস্তিষ্কের পরিণত অবস্থা প্রাপ্তির জন্যে উত্তেজনার প্রয়োজন এবং ভ্রূণাবস্থায় শুধুমাত্র দ্রুত চক্ষু-স্পন্দন নিদ্রাই এই আভ্যন্তরীণ উত্তেজনার কাজ করে। জন্মের পরে যতই শিশু বাইরের উত্তেজনার সাড়া দিতে শেখে, ততই উত্তেজনার প্রয়োজন কমে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত চক্ষু-স্পন্দন নিদ্রার পরিমাণও হ্রাস পায়।

বিশেষ প্রক্রিয়ার সাহায্যে শুধুমাত্র দ্রুত চক্ষু-স্পন্দন নিদ্রা বন্ধ করলে প্রাণীর মানসিক ও শারীরিক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। বিড়ালের ক্ষেত্রে পরীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে যে, দ্রুত চক্ষু-স্পন্দন নিদ্রা পর পর কয়েক দিন বন্ধ করবার ফলে অতি-যৌনতা (Hypersexuality) এবং বাহ্যিক আচরণে মানসিক অসুস্থতার প্রমাণ পাওয়া যায়। তাই দেখা যাচ্ছে, শুধুমাত্র মস্তিষ্কের পূর্ণতাপ্রাপ্তির জন্যেই নয়, পরিণত মস্তিষ্কের স্বাভাবিক ক্রিয়ার জন্যেও দ্রুত চক্ষু-স্পন্দন নিদ্রার প্রয়োজন।

স্বপ্নের সঙ্গে শয্যাসিক্তকরণ ও নিদ্রা-ভ্রমণের সম্পর্ক—শয্যাসিক্তকরণ অন্যতম প্রাচীন মানসিক রোগ। শৈশব ও কৈশোরে এর প্রাবল্য

থাকে অত্যধিক। এই ক্ষেত্রে রোগী নিদ্রা থেকে জেগে উঠে শয্যায় নিজেকে সিক্ত অবস্থায় দেখে। নিদ্রিত রোগীকে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, নিদ্রা কিছুক্ষণ চলবার পর হঠাৎ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নড়াচড়া বেড়ে গেছে। এরপর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ একেবারে স্থির হয়ে যায় এবং এই স্থির অবস্থার সময়ই শয্যাসিক্ত হয়ে থাকে। এই অবস্থা থেকে জেগে ওঠবার পর মানসিক অস্পষ্টতা লক্ষ্য করা যায়, কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই স্বপ্ন দেখবার কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না।

নিদ্রা-ভ্রমণও একটা পুরনো মানসিক রোগ। কিছুক্ষণ নিদ্রার পর রোগী হঠাৎ বিছানায় উঠে বসে, এলোমেলোভাবে চলাফেরা করতে থাকে, চোখ খোলা থাকে, কিন্তু পরিবেশের সঙ্গে প্রাণীর কোন যোগাযোগ থাকে না। সেক্সপীয়ারের ম্যাকবেথে নিদ্রা-ভ্রমণের একটা সুন্দর বর্ণনা আছে—

'Doctor of physic: 'You see her eyes are open.'

'Lady in waiting: 'Ay, but their sense are shut.'

কিন্তু খুব তাড়াতাড়িই রোগীর চলাফেরা বেশ নিয়মিত হয়ে পড়ে এবং রোগী নানা প্রকার দুর্বোধ্য কথা বলতে থাকে। এই অবস্থাতেই রোগী জাগ্রতাবস্থার মত কোন একটা কাজ করে বিছানায় ফিরে আসে। কিন্তু ঘুম ভাঙবার পর স্বপ্ন দেখবার বা নিদ্রা-ভ্রমণের কার্যাবলীর কোন কথাই স্মরণ করতে পারে না। সাম্প্রতিক এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, একমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই নিদ্রা-ভ্রমণকারীর সংখ্যা 40 লক্ষ।

আগে শয্যাসিক্তকরণ বা নিদ্রা-ভ্রমণকে স্বপ্নের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য বলে মনে করা হতো। কিন্তু মস্তিষ্কের অবিরাম ই. ই. জি. নিতে গিয়ে দেখা গেছে যে, কোন ক্ষেত্রেই শয্যাসিক্তকরণ বা নিদ্রা-ভ্রমণের সময় দ্রুত চক্ষু-স্পন্দন নিদ্রা হয় না। সুতরাং মনে হয়, স্বপ্নের সঙ্গে উপরিউক্ত ঘটনাগুলির কোন সম্পর্ক নেই। ধীর-তরঙ্গ নিদ্রা থেকে জাগ্রতাবস্থায় আসবার সময় এই দুই অবস্থার সন্ধিক্ষণে নিদ্রা-ভ্রমণ ও শয্যাসিক্তকরণের লক্ষণগুলি প্রকাশ পায়। তাই অনেক বিজ্ঞানী মনে করেন, ধীর-তরঙ্গ নিদ্রা থেকে অস্বাভাবিক জাগরণের জন্যে কোন বিশেষ স্নায়ু-রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে এই সব মানসিক ব্যাধির লক্ষণ প্রকাশ পায়, কিন্তু আজ পর্যন্ত এমন কোন স্নায়ু-রাসায়নিক ক্রিয়া আবিষ্কৃত হয় নি।

নিদ্রাকালীন বিভীষিকা কি চরম দুঃস্বপ্ন?— নিদ্রাকালীন বিভীষিকা আজকের সমাজ ও চিকিৎসা-বিজ্ঞানের অন্যতম সমস্যা। দান্তের লেখাতেও নিদ্রাকালীন বিভীষিকার উল্লেখ আছে। তাই মনে হয়, তৎকালীন সমাজেও এই মানসিক ব্যাধির যথেষ্ট প্রাবল্য ছিল। নিদ্রাকালীন বিভীষিকার বীভৎসতা যে কোন বাস্তব ভয়ের ঘটনাকে অতি সহজেই হার মানায়। এই সময় হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন অবিশ্বাস্যভাবে বেড়ে যায়, শরীর অস্বাভাবিকভাবে ঘামতে থাকে, চরম মানসিক অধৈর্যের সঙ্গে শরীরও কিছুক্ষণের জন্যে আয়ত্তের বাইরে চলে যায়। নিদ্রাকালীন বিভীষিকা শেষ হবার পরেও এর রেশ থাকে, স্বাভাবিক মানসিক অবস্থা ফিরে আসতে বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগে। সাধারণতঃ শিশুদের নিদ্রাকালীন বিভীষিকার সংখ্যা বেশী হয়। প্রাপ্তবয়স্ক লোকের ক্ষেত্রে নিদ্রাকালীন বিভীষিকা একটা বিরল ঘটনা হলেও কোন কোন লোকের ক্ষেত্রে সপ্তাহে কয়েক বার এমন কি, এক রাতে তিন-চার বার নিদ্রাকালীন বিভীষিকা হতে দেখা গেছে। একটা নিদ্রাকালীন বিভীষিকার উদাহরণ দেওয়া যাক।

গভীর রাত। নিউইয়র্কের মাউন্ট সিনাই হসপিটালের ছোট একটি ঘরে এক ভদ্রমহিলা ঘুমাচ্ছেন। তাঁর মাথায় লাগানো ই. ই. জি.

যন্ত্রের তার পাশের ঘরে গিয়ে যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানে টেপ-রেকর্ডার ও মাইক্রোফোন নিয়ে বসে আছেন একজন গবেষক। ভদ্রমহিলার শরীরের সামান্যতম পরিবর্তনও যন্ত্রে ধরা পড়ছে। তিনি শান্তভাবে ঘুমাচ্ছেন, হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন 60। ই. ই. জি-তে স্বপ্নের কোন আভাস নেই। এমন সময় হঠাৎ পাশের ঘর থেকে একটা মৃদু গোঙানী শোনা গেল। পরক্ষণেই মাইক্রোফোনে ভেসে এল পর পর কয়েকটি বীভৎস চীৎকার। এই চীৎকার যে কোন সাধারণ চীৎকারের তুলনায় অনেক বেশী ভয়াল, অমানুষিক ও স্থায়ী—নিদ্রাকালীন বিভীষিকার আসল চীৎকার। ইতিমধ্যে হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন বেড়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে 152-তে। দেখা গেল, তিনি বিছানার উপর উঠে বসে ভীষণভাবে কাঁপছেন, সমস্ত শরীর ঘামে ভিজে গেছে। একটু শান্ত হবার পর জিজ্ঞাসা করা হলে ঘটনার যেটুকু তিনি মনে করতে পারলেন, তা হলো—রাশি-রাশি বই নিজের শক্তিতে তার দিকে ছুটে আসছিল আর তিনি অসহায়ভাবে সেই বইয়ের স্তূপের মধ্যে ডুবে যাচ্ছিলেন।

এই হলো সত্যকারের নিদ্রাকালীন বিভীষিকা। মনোবিজ্ঞানী জন ম্যাকের মতে—"Absolutely the most terrifying psychic experience known to man—young or old, ancient or modern, savage or civilized beings."

প্রাচীন মানুষের ধারণা ছিল যে, নিশাচর কোন দানব নিদ্রাকালীন বিভীষিকার জন্যে দায়ী। এই দানব এসে ঘুমন্ত লোকের বুকের উপর চেপে বসবার ফলেই নিদ্রাকালীন বিভীষিকার হাওয়া লেগে যায়।

মনোবিজ্ঞানী ফ্রয়েড এই অলীক দানবকে সরিয়ে তার জায়গায় আরও ভয়ঙ্কর বাস্তবকে নিয়ে এলেন। তিনি বললেন—আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে রয়েছে আদিম প্রবৃত্তি বা Libido। বিবেক বা সামাজিক অনুশাসনের চাপে এই লিবিডোর অনেকখানি চাপা পড়ে থাকে। মনের চেতন স্তরে স্থান না পেয়ে লিবিডো বাসা বাঁধে অবচেতন স্তরে। নিদ্রার সময় মনের উপর বিবেক বা সামাজিক অনুশাসনের কোন প্রভাব থাকে না এবং অবদমিত লিবিডো মনের চেতন স্তরে উঠে এসে মন ও শরীরকে এক প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দেয় এবং এটাই হলো নিদ্রাকালীন বিভীষিকার কারণ। কোন কোন স্নায়ুরোগগ্রস্ত লোকের ক্ষেত্রে নিদ্রাকালীন বিভীষিকার সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্র বা জীবনের বিশেষ বিশেষ ঘটনার সংযোগ লক্ষ্য করা গেছে। তাই ফ্রয়েডের মতে, নিদ্রাকালীন বিভীষিকা একটা চরম দুঃস্বপ্ন।

নিদ্রাকালীন বিভীষিকা যদি স্বপ্ন হয়, তবে দ্রুত চক্ষু-স্পন্দন নিদ্রার সঙ্গে এর একটা অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক থাকবার কথা। কিন্তু নিদ্রাকালীন বিভীষিকার সময় বিস্ময়করভাবে ই. ই. জি-তে দ্রুত চক্ষু-স্পন্দন নিদ্রার কোন আভাসই পাওয়া যায় না। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা এই যে, নিদ্রাকালীন বিভীষিকার সময় ই. ই. জি-তে সাধারণ নিদ্রারও কোন সঙ্কেত পাওয়া যায় না, বরং বাহ্যিক আচরণ ও ই. ই. জি-তে নিদ্রা ও জাগরণের মাঝামাঝি একটা অবস্থা ধরা পড়ে। তাই Roger. J. Broughton মনে করেন, নিদ্রাকালীন বিভীষিকা ঘটে অসংলগ্ন জাগ্রতাবস্থায় এবং এর কারণ হলো নিদ্রা থেকে অস্বাভাবিক জাগরণ। নিদ্রাকালীন বিভীষিকার মূল প্রক্রিয়ার আরম্ভ স্বাভাবিক নিদ্রার সময়, কিন্তু নিদ্রাকালীন বিভীষিকা প্রতি ক্ষেত্রেই ঘটে নিদ্রা-জাগরণের মাঝামাঝি একটা সময়ে। কিছুক্ষণ হ্যালুসিনেশন চলবার পর বাইরের পরিবেশের সঙ্গে আবার প্রাণীর যোগাযোগ স্থাপিত হয় এবং স্বাভাবিক মানসিক অবস্থা ফিরে আসে। স্বাভাবিক নিদ্রা থেকে 'Buzzer'-এর সাহায্যে জাগিয়ে বিজ্ঞানী ফিশার কৃত্রিম নিদ্রাকালীন বিভীষিকা সৃষ্টি

করতে সক্ষম হয়েছেন। তাই মনে হয়, নিদ্রা কালীন বিভীষিকার কারণ নিদ্রা থেকে অস্বাভাবিক জাগরণ, স্বপ্নের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই।

স্বপ্নের রাসায়নিক কারণ—বিড়ালকে Reserpine ইনজেকশন দিলে কিছুক্ষণের জন্যে নিদ্রা বন্ধ হয়ে যায়। এই অবস্থায় Dopa ইনজেকশন দিলে দ্রুত চক্ষু-স্পন্দন নিদ্রা ফিরে আসে। Dopa মস্তিষ্কে গিয়ে Dopamine তৈরি করে। তাই বলা যেতে পারে Dopamine দ্রুত চক্ষু-স্পন্দন নিদ্রা, তথা স্বপ্নের জন্যে দায়ী। অপর পক্ষে 5-hydroxy tryptophan ইঞ্জেকশন দিলে মস্তিষ্কে গিয়ে Serotonin তৈরি করে এবং ধীর তরঙ্গ-নিদ্রা আসে। তাই বলা যায় Serotonin ধীর তরঙ্গ-নিদ্রার কারণ।

p-Chlorophenyl alanine ইনজেকশন দিলে নিদ্রা একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। এই ওষুধটি মস্তিষ্কের Serotonin তৈরি বন্ধ করে দেয়। এই অবস্থায় 5-hydroxytryptophan ইনজেকশন দিলে উভয় প্রকার নিদ্রাই ফিরে আসে। তাই মনে হয়, স্বপ্নের নিদ্রার জন্যে শুধুমাত্র Dopamine জাতীয় পদার্থই দায়ী নয়, Serotonin থেকে উদ্ভূত এক বা একাধিক রাসায়নিক পদার্থও স্বাভাবিক স্বপ্নের জন্যে প্রয়োজন।

Amphitamine ইনজেকশন দিলে প্রথম প্রথম স্বপ্ন ও দ্রুত চক্ষু-স্পন্দন নিদ্রা ব্যাহত হয়। কিন্তু কিছুদিন ধরে ইনজেকশন দিলে আবার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসে। এই সময় ইনজেকশন বন্ধ করলে দ্রুত চক্ষু-স্পন্দন নিদ্রার পরিমাণ স্বাভাবিক অবস্থার তুলনায় বেড়ে যায় এবং নানা প্রকার অদ্ভুত স্বপ্ন দেখা যায়। Barbiturate জাতীয় ওষুধের বেলায়ও ঠিক একই ঘটনা ঘটে। মনে হয় এই সব ওষুধের প্রভাবে স্নায়ুকোষের মধ্যে নতুন ধরণের প্রোটিন তৈরি হয় এবং প্রোটিনই উপরিউক্ত ক্রিয়াগুলির জন্যে দায়ী। স্ট্রেপ্টোমাইসিন কোষের প্রোটিন তৈরি বন্ধ করে দিতে পারে এবং স্ট্রেপ্টোমাইসিন ইনজেকশন দিলে দ্রুত চক্ষু-স্পন্দন নিদ্রা কমে যায়।

প্রাণীকে উন্নততর পরিবেশে রাখলে শিক্ষার পরিমাণ বেশী হয় এবং এই ক্ষেত্রে প্রাণীর মস্তিষ্কের সিক্ত ওজন সাধারণের তুলনায় বেড়ে যায়। দেখা গেছে, উন্নততর পরিবেশে প্রাণীর স্বপ্নের পরিমাণও বেড়ে যায়। আবার মানসিক দিক থেকে অনুন্নত লোকেদের স্বপ্নের পরিমাণ কম হয়।

তাই অনেক বিজ্ঞানী মনে করেন, মস্তিষ্ক-কোষের যে সব সংশ্লেষণী প্রক্রিয়া প্রাণীর বাহ্যিক ব্যবহারের সঙ্গে সংযুক্ত, সেই সব প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে স্বপ্নের একটা বিশেষ ভূমিকা আছে। সেই সব প্রক্রিয়াগুলি কি বা স্বপ্ন কিভাবে এই প্রক্রিয়াগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে, তা জানা নেই।

আগামী দিনের স্বপ্ন—স্বপ্নের রহস্য উদ্‌ঘাটন করা আজকের স্নায়ু-রসায়নবিদ্‌দের অন্যতম লক্ষ্য। মস্তিষ্কের পূর্ণতাপ্রাপ্তির সঙ্গে স্বপ্নের পরিমাণ ও প্রকৃতিতে কিছু কিছু পরিবর্তন হয়, এবং সে সম্পর্কে অনেক তথ্য জানা আছে। কিন্তু মস্তিষ্কের পরিণত অবস্থা প্রাপ্তি বা পরিণত মস্তিষ্কের স্বাভাবিক ক্রিয়া-কলাপের সঙ্গে স্বপ্নের কি সম্পর্ক, তা জানা নেই। বিকৃত বা অপরিণত মস্তিষ্কের লোকের স্বপ্নের পরিমাণ ও প্রকৃতির সঙ্গে সাধারণ মানুষের স্বপ্নের অনেক তফাৎ। কিন্তু এরও কোন কারণ জানা নেই। সুতরাং স্বপ্নের রহস্যভেদ করা গেলে—বিভিন্ন মানসিক ব্যাধির স্বরূপ জানা এবং নিয়ন্ত্রণ করবার ব্যাপারে এক নতুন অধ্যায় রচিত হবে।

পৃথিবীর সৃষ্টি-রহস্য

দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়*

নিখিল বিশ্বের কথা ভাবলে বিস্ময়ে হতবাক হতে হয়। কি বিপুল মহাজাগতিক কর্মকাণ্ড সমাধা হচ্ছে পরম সুচারু শিল্পের ছন্দে। কোথাও কোন বিশৃঙ্খলা নেই—গ্রহ-নক্ষত্র সব কিছুই মহাজাগতিক নিয়মে আবর্তিত হয়ে চলেছে বিরামহীন গতিতে। সৌরজগৎ এই নিখিল বিশ্বেরই একটি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। সূর্যকে কেন্দ্র করে যে নয়টি গ্রহ আবর্তিত হচ্ছে, পৃথিবী তারই একটি।

সৌরজগৎ সম্বন্ধে প্রথম আধুনিক চিন্তাধারার সূত্রপাত হয় টাইকোব্রাহী, কেপ্‌লার কিংবা নিউটনের গবেষণায়। সৌরজগৎ সম্বন্ধে মানুষের জানবার উৎসাহ কিন্তু সেখানেই থেমে থাকে নি, ক্রমশঃই বৃদ্ধি পেয়েছে। সৌরজগতের অন্যতম গ্রহ পৃথিবীর জন্ম কি করে হলো, এই প্রশ্নই চিন্তিত করে তুলেছে চিরকাল বিজ্ঞানীদের। বিশেষতঃ এসম্বন্ধে মানুষের অনুসন্ধিৎসা দুর্বার হয়ে ওঠে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে।

অন্যান্য কূট বৈজ্ঞানিক সমস্যার চেয়ে পৃথিবীর জন্ম-রহস্যের সমাধান অনেক বেশী জটিল ব্যাপার। কারণ এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে সৌরমণ্ডলের সৃষ্টির প্রশ্ন, বলতে গেলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের জন্ম-রহস্যও এর সঙ্গে যুক্ত। শুধুমাত্র পৃথিবীর জন্ম-রহস্যের সমাধানই নয়, মহাকাশের বুকে আগুনের ফুলঝুরি সৃষ্টি করে নিঃশেষে মিলিয়ে যায় যে সব উল্কাপিণ্ড, তাদের জন্ম-সূত্রের সন্ধান করাও কম জটিল ব্যাপার নয়।

পৃথিবী, সূর্য অথবা ছায়াপথের জন্ম-রহস্যের সমাধানে মানুষের চিন্তাজগতের সীমাবদ্ধতার সমস্যাও বিরাট। কারণ মহাজাগতিক বস্তু-পিণ্ডের জন্মলগ্নে হয়তো এমন অদ্ভুত ক্রিয়াকাণ্ড ঘটেছিল, যা পার্থিব মানুষের কল্পনা ও প্রত্যক্ষ জগতের বাইরে। অন্তহীন ধূসর মরুভূমির বাসিন্দার পক্ষে নীল সমুদ্রের অতল গভীরতা সম্বন্ধে কোন ধারণা করা যেমন দুরূহ, মর্ত্যবাসী বিজ্ঞানীদের সৌরজগতের জন্মবৃত্তান্তের ইতিবৃত্ত কল্পনা করা তার চেয়েও দুঃসাধ্য। পৃথিবীর জন্মলগ্নে অভিকর্ষ ও তাপমাত্রার যে উত্থান-পতন ও কোটি কোটি বছর ধরে মহাজাগতিক শূন্যে যে বিপুল শক্তিক্ষরণের প্রয়োজন হয়েছে, তা বিজ্ঞানীদের পুরাপুরি কল্পনা করে নিতে হয়েছে এবং সৌরজগৎ সৃষ্টির প্রকল্পগুলি বিজ্ঞানীর দার্শনিক] চিন্তার ফসলমাত্র, পরীক্ষিত বাস্তব সত্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত নয়। সৌরজগৎ সৃষ্টির প্রকৃত ব্যাপারটি এতই জটিল যে, দুরূহ গাণিতিক সূত্রের সাহায্যেও তা প্রকাশ করা অসম্ভব ব্যাপার। এত সীমাবদ্ধতার মধ্যেও পৃথিবীর জন্মলগ্নের রহস্য সন্ধানে যুগ যুগ ধরে অদম্য উৎসাহে প্রয়াসী হয়েছেন বিজ্ঞানীরা।

পৃথিবীর উৎপত্তি সম্বন্ধে যে তত্ত্বগুলি প্রচলিত রয়েছে, তার মধ্যে প্রুশিয়ান দার্শনিক ইমানুয়েল কান্টের তত্ত্বই 'সর্বপ্রথম' বলে দাবী করতে পারে। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রচারিত কান্টীয় তত্ত্বের সঙ্গে আধুনিকতম তত্ত্বের আশ্চর্য মিল লক্ষ্য করে সত্যই বিস্মিত হতে হয়। কান্টের মতে, সৌরজগতের উৎপত্তি হয়েছে মহাশূন্যে বিচরণশীল ঘন জাড্যঃমেঘের সম্মিলনের ফলে। সৃষ্টির প্রথম লগ্নে এই জাড্যঃ-মেঘের রাশি আপন খেয়ালে দিকবিদিকে ঘুরে

---

*ভারতীয় ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা

বেড়াতো মহাশূন্যে। ক্রমে এই মেঘপুঞ্জ প্রাকৃতিক ঘাত-প্রতিঘাতে সংঘবদ্ধ ও একমুখী হয়ে এলো, উত্তপ্ত বর্তুলের আকারে মহাশূন্যের বুকে সূর্যের চার দিকে নির্দিষ্ট কক্ষে ঘুরতে সুরু করলো। এদিকে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মেঘপুঞ্জ তাপ বিকিরণের ফলে ক্রমে ক্রমে ঠাণ্ডা ও সঙ্কুচিত হয়ে এলো। কান্টের মতে, এর ফলে মেঘপুঞ্জের গোলকটির গতিবেগ ও কেন্দ্রাতিগ বলের পরিমাণ বৃদ্ধি পেল এবং ক্রমে নিরক্ষদেশীয় অঞ্চল থেকে গোলাকার মালার মত অনেকগুলি মণ্ডলের সৃষ্টি হলো। এই মেঘের মণ্ডলগুলি ঘনীভূত হয়ে সৃষ্টি হলো নব নব গ্রহের। গ্রহগুলি শক্ত নিরেট হবার আগে সেগুলিকে ঘিরে উপগ্রহের সৃষ্টি হয়েছে প্রায় একইভাবে। এমনিভাবেই একদিন মহাশূন্যের বুকে বিচরণশীল ভাস্তঃমেঘ থেকে সৃষ্টি হলো সৌরজগতের, যদিও ভাস্তঃমেঘের উৎপত্তি বিষয়ে কান্টীয় দর্শন একেবারেই নীরব।

কিন্তু বলবিদ্যার সূত্র অনুযায়ী কান্টীয় তত্ত্বকে কয়েকটি গুরুতর সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। তত্ত্ব-সমালোচকেরা বলছেন, বাইরের কোন শক্তির সাহায্য ছাড়া কৌণিক ভরবেগের পরিবর্তন সম্ভব নয়। আর ভাস্তঃমেঘপুঞ্জ থেকে পরস্পর ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে গ্রহমণ্ডলীর উৎপত্তির ব্যাপারে বাইরের কোন শক্তির অংশগ্রহণের কথা কান্টীয় তত্ত্বের মধ্যে চিন্তা করা হয় নি। তাছাড়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত গতিচঞ্চল মেঘপুঞ্জের একমুখী হবার পিছনে যথেষ্ট কার্য-কারণ সম্বন্ধ দেখানো হয় নি বলে বিজ্ঞানীদের ধারণা।

কান্টীয় তত্ত্বের প্রবক্তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন ফরাসী গণিতজ্ঞ মার্কুইস দ্য লা প্লাস। কিন্তু তিনিও কান্টীয় তত্ত্বকে হুবহু মানতে রাজী ছিলেন না। 1796 সালে কান্টীয় তত্ত্বের সামান্য সংশোধন করে তিনি আর একটি তত্ত্ব পরিবেশন করেন। অবশ্য গণিতজ্ঞদের মূল সমালোচনাকে এড়িয়ে যাবার জন্যে তিনি কান্টীয় তত্ত্বের প্রথম অংশটুকু বর্জন করেন। তাই মহাশূন্যে ইতস্ততঃ ভ্রাম্যমান ভাস্তঃমেঘপুঞ্জের পরিবর্তে একমুখী গতিশীল হবার কথা কল্পনা করে কৌণিক ভরবেগের সমস্যার সমাধান করতে চাইলেন তিনি। কিন্তু তবু সন্তুষ্ট করা গেল না কট্টর তাত্ত্বিকদের। তাঁরা বললেন, সৌরজগতের প্রধান চারটি গ্রহের মধ্যে সমস্ত সৌরজগতের শতকরা 98 ভাগ কৌণিক ভরবেগ ছড়িয়ে রয়েছে, যদিও ভরের দিক থেকে এই চারটি ভর সমস্ত সৌর-জগতের শতকরা মাত্র 1.5 ভাগ। বিখ্যাত বিজ্ঞানী স্পেন্সার জোন্স স্বভাবতঃই কল্পনা করেছেন, সৌরজগতের উৎপত্তির মূলে কাজ করেছে দুর্জ্ঞয় কোন বহিঃশক্তি।

1900 খৃষ্টাব্দে চেম্বারলেন ও মূলটন আরেকটি নতুন তত্ত্বের কথা বলেন। এটি 'গ্রহাণুপুঞ্জ তত্ত্ব' নামে পরিচিত। সুদূর অতীতে সূর্যের সঙ্গে মহাকাশের বুকে ভ্রাম্যমান কোন একটি নক্ষত্রের সঙ্গে সংঘর্ষে সূর্যের অংশবিশেষ অসংখ্য গ্রহাণু-পুঞ্জে পরিণত হয়েছিল। সময়ের ব্যবধানে সেই গ্রহাণুপুঞ্জ ঠাণ্ডা হয়ে জমে গিয়ে সৃষ্টি হয় সৌর-জগতের গ্রহমণ্ডলীর। প্রায় দু-দশক পরে জিনস ও জেফরীস গ্রহাণুপুঞ্জ-তত্ত্বকে মোটামুটি সমর্থন করলেও সূর্যের সঙ্গে নক্ষত্রের সংঘর্ষের ব্যাপারটা মেনে নিতে পারেন নি। তাঁদের মতে, নক্ষত্রটি মহাকাশের বুকে বিচরণ করতে করতে যখন সূর্যের খুব কাছাকাছি এসে পড়েছিল, সেই অবস্থায় সূর্যের দেহ থেকে অংশবিশেষ গ্যাসীয় অবস্থায় ছিটকে বেরিয়ে আসে। তারপর উত্তপ্ত অবস্থাতেই সৃষ্টি হয় গ্রহমণ্ডলীর। এই দুটিই তত্ত্বই প্রথম পর্যায়ে গৃহীত হলেও শেষ পর্যন্ত বিতর্কের সৃষ্টি করে।

বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ডক্টর ও. জে. স্মিথ তাঁর 'উল্কাতত্ত্বের' সাহায্যে সৌরজগতের উৎপত্তির বিষয় আলোচনা করেন। মহাকাশের বুকে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য নক্ষত্রপুঞ্জ আর ছায়াপথ। এমনি এক

ছায়াপথ বা নক্ষত্রপুঞ্জের মধ্যাঞ্চল অতিক্রম করবার সময় সূর্য নিজের চারদিকে জড়িয়ে নেয় উল্কা-জাতীয় পদার্থ, যা অনাদি অনন্তকাল ধরে নক্ষত্র-পুঞ্জের ভিতরে ছড়িয়ে ছিল। তার পর কালক্রমে সূর্যের মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবে ঘুরতে ঘুরতে সেই উল্কাজাতীয় পদার্থের স্তূপ রূপ নিয়েছে গ্রহমণ্ডলীর।

সৌরজগৎ উদ্ভবের রহস্য সমাধানে দার্শনিক কান্টের সময় থেকে প্রচুর আলাপ-আলোচনা, তর্ক ও বিতর্ক এবং অনেক তত্ত্ব বা প্রকল্পের উদ্ভব হয়েছে। মূল সমস্যার উপর মোটামুটিভাবে আলোকপাত হলেও কোন চরম মীমাংসা হয়েছে বলে মনে হয় না। আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে সৌরমণ্ডলের উৎপত্তি-রহস্যের ব্যাপারে এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়। এই দৃষ্টিভঙ্গীর স্রষ্টা প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ফন ভাইজেকার, যদিও মূল প্রকল্পে মূল কান্টীয় সিদ্ধান্তের প্রভাব সুস্পষ্ট, তথাপি এই প্রকল্পের মধ্যে যথেষ্ট মৌলিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, ভাইজেকারের প্রকল্প মূলতঃ গণিত ও পদার্থবিদ্যাসম্মত হাইড্রোডিনামিক্সের সাধারণ সূত্রের উপর নির্ভরশীল।

ভাইজেকারের মতে, সৃষ্টির আদিমতম কোন যুগে গ্রহ বা উপগ্রহ সৃষ্টির আগে সূর্য মহাকাশের বুকে ছড়ানো ভাস্তঃমেঘের অপেক্ষাকৃত ভারী কোন অংশের মধ্য দিয়ে নিজের যাত্রাপথ রচনা করেছিল নিতান্তই আকস্মিকভাবে, হয়তো বা সৃষ্টির তাগিদে। এই মেঘমালার রাসায়নিক সংযুক্তি সূর্যের অনুরূপ ছিল বলেই ধারণা। এর প্রধান উপাদান হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম গ্যাস। মেঘ-মণ্ডলের মধ্য দিয়ে পথ পরিক্রমায় সূর্যের চারদিকে একটি আবরণের সৃষ্টি হয়, যদিও এই আবরণটি কতকগুলি অণু-পরমাণুসদৃশ ধূলিকণার সমন্বয় ছাড়া কিছুই নয়। এই ধূলির আবরণ মাধ্যাকর্ষণের টানে সূর্যের চারদিকে খানিকটা নিরপেক্ষ কক্ষ-পথে আবর্তিত হতে থাকে।

এই মেঘের আবরণের আভ্যন্তরীণ ঘর্ষণ ও নানারকম প্রক্রিয়ার ফলে ক্রমে আবরণটি একটি গোলাকার থালার আকারে সূর্যের চারদিকে ঘুরতে থাকে চাক্রকার কক্ষপথে। এই আদি মেঘপুঞ্জের থালাটির ব্যাস বর্তমান সৌরজগতের ব্যাসের সমান।

সৌরজগৎ সৃষ্টির আদিতে চরম বিশৃঙ্খলার যুগে মেঘপুঞ্জের থালাটি অনেকগুলি গোলাকার বলয়ে ভেঙ্গে যায় ও সমান গতিসম্পন্ন কণিকাগুলি সমবেত হয়ে প্রতিটি বলয়ে পরিমিত আকারের পাঁচটি বলয়াকার আবর্তের সৃষ্টি হয়। টিটিয়াস বোডের সূত্র অনুযায়ী পর পর দুটি কক্ষবলয়ের ব্যাসার্ধের অনুপাত সব সময় সমান হবে। ভাই-জেকারের অনুমান, চক্রাকৃতি বলয়ের মধ্যে যে মাধ্যমিক আবর্ত অবস্থিত ছিল, সেগুলি ক্রমে ক্রমে পরস্পর মিলিত হয়ে গ্রহমণ্ডলীর সৃষ্টি করে; যদিও গ্রহের উৎপত্তির ব্যাপারে শেষোক্ত পন্থাটি সম্বন্ধে ভাইজেকার নিজেও পুরাপুরি নিঃসন্দেহ হতে পারেন নি। গ্রহেরসৃষ্টির সময় গ্রহের চারদিকে যে মেঘমণ্ডল তখনো ছড়িয়ে ছিল, তাথেকে প্রায় একইভাবে সৃষ্টি হয়েছে উপগ্রহের।

ভাইজেকারের এই প্রকল্পটি বিজ্ঞানীদের কাছে মোটামুটিভাবে গ্রহণীয় বলে মনে হয়েছে। যদিও বিখ্যাত বিজ্ঞানী টার হার এমন কতকগুলি তথ্য হাজির করেছেন, যা এই প্রকল্পটির সাহায্যে ব্যাখ্যা করা শক্ত। প্রথমতঃ, প্রকল্পের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যা হওয়া উচিত, মঙ্গলগ্রহের আসল ভর তার চেয়ে অনেক কম। দ্বিতীয়তঃ, মঙ্গল ও বৃহস্পতির মধ্যে অন্য কোন গ্রহের অস্তিত্ব নেই। এর ব্যাখ্যা হিসাবে অবশ্য বলা হয়েছে যে, সৌরমণ্ডলের কোন এক গভীর বিপর্যয়ের ক্ষণে মঙ্গল ও বৃহস্পতির মধ্যবর্তী গ্রহটি ধ্বংস হয়ে গ্রহাণুপুঞ্জের সৃষ্টি হয়েছে। তাছাড়া আবর্তগুলির আকারে সমতা রাখবার ব্যাপারটি অনেকের অবাস্তব মনে হয়েছে।

কিছুকাল পরে কুইপার (1951) সামান্য সংস্কার করে ভাইজেকার-প্রকল্প নতুনভাবে পরিবেশন করেন। তাঁর অভিমত, ধূলিমেঘের থালাটি ভেঙ্গে কতকগুলি বলয় আর বলয়ের মধ্যে বিভিন্ন আকারের মেঘের আবর্তের সৃষ্টি হয়েছিল, যদিও ভাইজেকার-প্রকল্পের মত আবর্তের আয়তন এক বিশেষ মাপের মধ্যে আবদ্ধ থাকে নি। এই আবর্তগুলি সূর্য থেকে যে যত দূরে রইলো, তার মাপ হলো তত বড়। এই সব আবর্ত ঘুরতে ঘুরতে নিজেদের মধ্যে সংঘাতের ফলে ক্রমশঃ আকারে বৃদ্ধি পেতে লাগলো। অবশেষে শেষ পর্যায়ে প্রতিটি কক্ষপথে কেবলমাত্র একটি করেই আবর্ত অবশিষ্ট ছিল, যা থেকে সৌর-মণ্ডলীর উদ্ভব হয়েছে। এই সব মেঘের গ্রহ-গুলির আকার প্রথমদিকে এত বড় ছিল যে, সূর্যের চারদিকে আবর্তনের সময় ভিন্ন ভিন্ন কক্ষপথে থাকলেও পরস্পরের সঙ্গে প্রায়ই সংঘর্ষ ঘটতো। 'রোশ' সূত্রের উপর নির্ভর করে মেঘ-মালার সম্ভাব্য ঘনত্ব, আয়তন এবং অবস্থান সম্বন্ধে নির্দেশ দিয়েছেন কুইপার। ক্রমে মেঘের আবর্তের ভিতর থেকে গ্যাস বেরিয়ে গেল, অবশিষ্ট পদার্থ থেকে জন্ম হলো গ্রহমণ্ডলীর। গ্যাস বেরিয়ে যাবার ফলে কৌণিক ভরবেগও কমে গেল বেশ খানিকটা এবং গ্রহগুলি আগের চেয়ে দ্রুতবেগে আবর্তিত হতে লাগলো। কুইপারের এই প্রকল্পে এভাবেই কৌণিক ভরবেগের হের-ফেরের সমস্যার আংশিক সমাধান হলো। মেঘ-মালা থেকে কিভাবে গ্রহের জন্ম হলো—সে আভাসও দিয়েছেন কুইপার, যদিও এই ব্যাপারে তিনি মূলতঃ ইউরেনের তত্ত্বের (1944) উপরই নির্ভর করেছেন। গ্রহের জন্মের প্রাথমিক পর্যায়ে আধা স্থিতাবস্থায় এমডেন গ্যাসবলয়ের কথা চিন্তা করেছেন ইউরেন, যদিও তখন তাপ, চাপ ও ঘনত্বের মধ্যে পারস্পরিক ধনত্ব মোটামুটি বজায় ছিল। বলয়টি থেকে গ্যাস বেরিয়ে গেলে সবচেয়ে কম উদ্বায়ী পদার্থগুলি বলয়টির কেন্দ্রীয় অঞ্চলে জমতে সুরু করে আর এর উপরের স্তরে জমে উদ্বায়ী সিলিকেটজাতীয় পদার্থ। এমনিভাবেই পৃথিবীর সিলিকেট ম্যান্টল ও লৌহ-নিকেলের অন্তঃস্তল গড়ে উঠেছে বলে ধারণা করা হয়। বিখ্যাত বিজ্ঞানী ইউরি মোটামুটিভাবে কুইপারের তত্ত্ব গ্রহণযোগ্য বলে স্বীকার করেছেন, যদিও তত্ত্বটির কয়েকটি বিষয় নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হতে পারে, তবু সৌরজগতের সৃষ্টি-রহস্য অনুধাবন করবার পক্ষে কুইপারের প্রকল্পটি যে সঠিক পথ নির্দেশ করবে, তাতে সন্দেহ নেই।

বিংশ শতাব্দীর এক বিস্ময়কর যুগসন্ধিক্ষণে বাস করছি আমরা। মানুষ আজ পাড়ি দিচ্ছে ভূলোক ছেড়ে দ্যুলোকের পথে—গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে, সৃষ্টি-রহস্যের সন্ধানে। সৌরজগতের সৃষ্টি-রহস্য আজ বিজ্ঞানের আলোয় ক্রমশঃ স্পষ্টতর হয়ে আসছে। এখনো আরো অনেক কিছুই জানতে বাকী। তার জন্যে মানুষকে অতিক্রম করতে হবে জ্ঞানের পথের দুস্তর বাধা। ঐতরীয় ব্রাহ্মণের মত বিজ্ঞানীরা বলছেন, চরৈবেতি চরৈবেতি—অর্থাৎ বিজ্ঞানের অন্তহীন পথে আমাদের শুধু চলতে হবে, কোথাও থেমে থাকবার উপায় নেই।

নিউক্লিয়াসের চৌম্বক অনুনাদীয় বর্ণালী ও জৈব যৌগের কাঠামো

কালীশঙ্কর মুখোপাধ্যায়*

আধুনিক যুগে যে সব যান্ত্রিক প্রয়োগ-কৌশল রসায়ন-বিজ্ঞানীরা রাসায়নিক যৌগের, বিশেষ করে জৈব যৌগের কাঠামো নির্ণয়ে প্রায়শঃই ব্যবহার করে থাকেন, সেগুলির মধ্যে অন্যতম হচ্ছে নিউক্লিয়াসের চৌম্বক অনুনাদীয় বর্ণালী-বীক্ষণ পদ্ধতি (Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy)। এই পদ্ধতির মূল সূত্রটি বেশ কিছুদিন আগে আবিষ্কৃত হলেও যৌগের কাঠামো নিয়ে তার সঠিক ব্যবহার 1950 সালের আগে তেমন প্রসার লাভ করে নি। 1951 সালে ভারতীয় বিজ্ঞানী ধর্মাট্টি এবং পাশ্চাত্যের কয়েকজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ঐ মূল সূত্রটিকে জৈব যৌগের কাঠামো নির্ণয়ে প্রথম ব্যবহার করেন। এর পর থেকেই এই পদ্ধতিটিকে বিভিন্ন যৌগের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে বিজ্ঞানীরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁচেছেন যে, এই প্রয়োগ-কৌশলের সহায়তায় নির্ভুলভাবে জৈব যৌগের কাঠামো নির্ণয় সম্ভব, তাছাড়া ঐ সমস্ত যৌগের নানান রাসায়নিক সমস্যার সমাধানও অসম্ভব নয়।

এই পদ্ধতির মূল কথা হচ্ছে নিউক্লিয়াসের চুম্বকত্ব। আমরা জানি, পরমাণুর মধ্যে একটা নিউক্লিয়াস থাকে এবং তার চারদিকে ঘুরে বেড়ায় কতকগুলি ইলেকট্রন। নিউক্লিয়াসে থাকে প্রোটন অর্থাৎ পজিটিভ তড়িৎ-কণা এবং এই পজিটিভ তড়িৎ-কণার সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে ঘুরে বেড়ায় ইলেকট্রন বা নেগেটিভ তড়িৎ-কণা। সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি, নিউক্লিয়াস প্রত্যক্ষভাবে তড়িৎ-শক্তির সঙ্গে জড়িত। 1927 সালে ডেনিসন দেখালেন, সকল পরমাণুর নিউক্লিয়াস স্থিতিশীল নয়, কিছু কিছু পরমাণুর নিউক্লিয়াসের অবিরাম গতি আছে: সব সময়েই সেটা বিশেষ দিকের অভিমুখী নিজস্ব কক্ষপথে ঘুরে বেড়ায়[1]। অতএব আমরা বলতে পারি ঐ সব পরমাণুর নিউক্লিয়াস হচ্ছে তড়িৎ-শক্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ঘূর্ণায়মান একটা বস্তু। সলিনয়েড-এর নীতি অনুযায়ী এও আমাদের জানা আছে যে, কোন ঘূর্ণায়মান বস্তুর মধ্যে তড়িৎ-শক্তি প্রবাহিত হলে তাতে স্থায়ী চুম্বকত্বের উদ্ভব ঘটে। সুতরাং পরমাণু গঠন-তত্ত্বের উপরিউক্ত মতবাদের ভিত্তিতে একথা সহজেই অনুমেয় যে, কিছু কিছু পরমাণুর নিউক্লিয়াস চুম্বকধর্মী অর্থাৎ ঐ জাতীয় নিউক্লিয়াসগুলিকে আমরা অতি ক্ষুদ্র চুম্বক হিসাবে কল্পনা করতে পারি এবং যেহেতু নিউক্লিয়াসটি ঘূর্ণায়মান, সেহেতু তার একটা চৌম্বক গতি থাকবে।

এখন ঐ জাতীয় ঘূর্ণায়মান চৌম্বক নিউক্লিয়াসকে একটা স্থিতিশীল নিরবচ্ছিন্ন চৌম্বক ক্ষেত্রে[2] রাখলে দেখা যাবে, সেটির গতি নিয়ন্ত্রিত হবে এবং সেটি (2I+1) [I হচ্ছে ঘূর্ণন পরিমিতি

---

*রসায়ন বিভাগ, সরকারী কলেজ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া

1. কোন একটা বিশেষ পরমাণুর নিউক্লিয়াসের গতি আছে কি নেই, তা সাধারণতঃ ঘূর্ণন পরিমিতি সংখ্যা (I, Spin-quantum number) দিয়ে নির্দেশ করা হয়। I-এর মান, O, $\frac{1}{2}$, 1, $\frac{3}{2}$.........হতে পারে।

2. স্থিতিশীল নিরবচ্ছিন্ন চুম্বকের শক্তি সাধারণতঃ 10,000 Gauss-এর কাছাকাছি হওয়া দরকার।

সংখ্যা] সম্ভাব্য দিকের যে কোন একটা বিশেষ দিকের অভিমুখী হয়ে ঘুরতে থাকবে। এখানে উল্লেখ্য, এই এক একটা দিক নিউ-ক্লিয়াসের এক একটা শক্তি-স্তরের নির্দেশক। যেহেতু নিউক্লিয়াসটি তার নির্দিষ্ট কক্ষপথে ঘুরছে, সেহেতু তার কক্ষপথটি ব্যবহৃত স্থিতি-শীল চৌম্বক ক্ষেত্রের বরাবর একটা বৃত্তপথ তৈরি করবে—এটা ঠিক যেন মাটিতে লাটিম যে ভাবে ঘোরে, সে রকম (চিত্র নং-1)। এই ধরণের গতিকে পূর্ব-গমন গতি বলে। দেখা গেছে,

বৃত্তপথ
ঘূর্ণায়মান নিউক্লিয়াস
স্থিতিশীল চৌম্বক ক্ষেত্র

1নং চিত্র
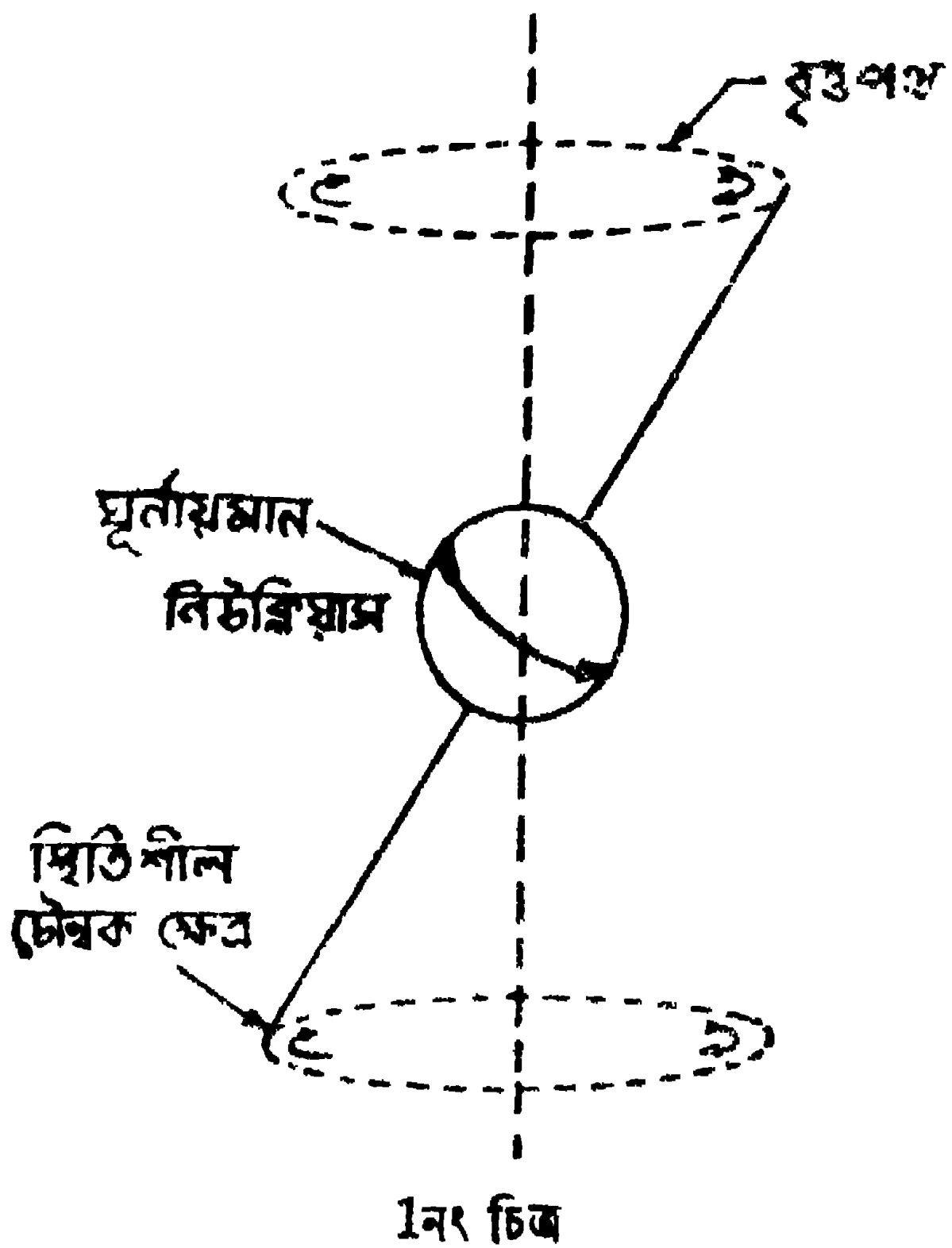
পূর্ব-গমন গতিসম্পন্ন চৌম্বক নিউক্লিয়াসে বেতার তরঙ্গের গতিবেগসম্পন্ন তড়িৎ-চুম্বক শক্তি প্রয়োগ করলে তার কক্ষপথ পরিবর্তিত হয় অর্থাৎ ঐ জাতীয় তড়িৎ-চুম্বক শক্তির সহায়তায় চৌম্বক নিউক্লিয়াসকে এক শক্তি-স্তর থেকে অন্য শক্তি-স্তরে স্থানান্তরিত করা যায়। এখন প্রশ্ন হলো—কি ভাবে তড়িৎ-চুম্বক শক্তি প্রয়োগ করা হবে? ঘূর্ণায়মান চৌম্বক নিউক্লিয়াসের কাছে যদি আর একটা চুম্বক রাখা যায়, তাহলে ঐ নিউক্লিয়াসটি চুম্বকের দিকে ঢলে পড়বে এবং তখন তার কক্ষপথ পরিবর্তিত হবে।

এই প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন যে, ঐ ব্যবহৃত চুম্বকটিকে স্থির রাখলে চলবে না, কারণ ঘূর্ণায়মান নিউক্লিয়াস-চুম্বকটি ঘুরতে ঘুরতে যখন ব্যবহৃত চৌম্বক সীমানার বাইরে চলে যাবে, তখন আবার সেটা পূর্বাবস্থায় ফিরে যাবে এবং কক্ষপথ পরিবর্তনের প্রচেষ্টা ক্ষণিকের জন্যে সফল হয়ে শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হবে। তাই সর্বক্ষণের জন্যে ঈপ্সিত দিক পরিবর্তন করতে হলে ব্যবহৃত ঐ চুম্বকটিকে স্থির না রেখে ঘোরাতে হবে।

ঘূর্ণায়মান চৌম্বক
বৃত্তপথ
চৌম্বক নিউক্লিয়াস
স্থিতিশীল চৌম্বক ক্ষেত্র
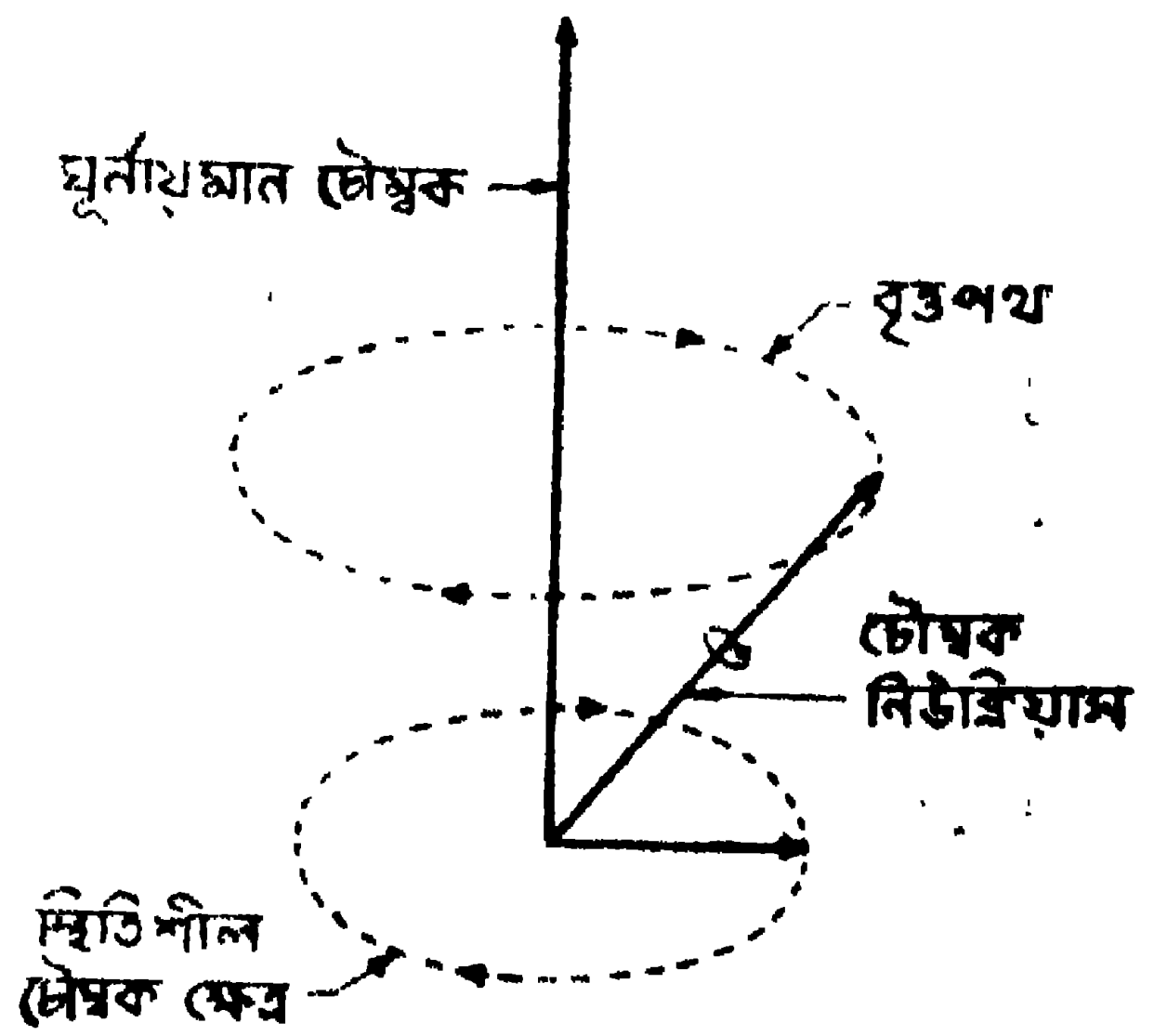
2নং চিত্র

দেখা গেছে এই চুম্বকটিকে পূর্বে ব্যবহৃত স্থিতি-শীল চুম্বক-ভূমির লম্ব বরাবর রেখে নিউক্লিয়াসের সমান গতিবেগে ঘোরালে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করা সম্ভব হয় (চিত্র নং-2)। এই ধরণের পরি-স্থিতির সৃষ্টি করে যখন স্থায়ীভাবে চৌম্বক নিউক্লিয়াসের কক্ষপথ পরিবর্তন করে তাকে একটা শক্তি-স্তর থেকে অন্য শক্তি-স্তরে স্থানান্তরিত করা হয়, তখন দেখা যায় পাক-খাওয়া নিউক্লিয়াস-চুম্বক এবং ব্যবহৃত ঘূর্ণায়মান চুম্বকের

মধ্যে একটা সুন্দর বোঝাপড়ার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। বোঝাপড়ার এই অবস্থাকে বলা হয় অনুনাদীয় অবস্থা ; অর্থাৎ এই অবস্থায় কক্ষপথের পরিবর্তনকে স্থির রাখবার জন্যে নিউক্লিয়াস-চুম্বক ও ব্যবহৃত ঘূর্ণায়মান চুম্বক একে অপরের সঙ্গে যেন সমঝে চলছে। এই অনুনাদীয় পরিস্থিতির উদ্ভব হলেই বুঝতে হবে, চৌম্বক নিউক্লিয়াসটি স্থায়ী ভাবে তার শক্তি-স্তর পরিবর্তন করেছে এবং তার জন্যে সেটি বেতার তরঙ্গের মত গতিসম্পন্ন তড়িৎ-চুম্বক শক্তি গ্রহণ কিংবা বর্জন করেছে। আর এই অবস্থা সৃষ্টি হবার সঙ্গে সঙ্গে একটা বিশেষ সংকেত পাওয়া যাবে।

এই প্রসঙ্গে একটা কথার উল্লেখ বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। রেডিয়েশন বা বিকিরণ তত্ত্বে বলা হয়েছে, সাধারণতঃ তড়িৎ-চুম্বক শক্তির সাহায্যে নিম্ন থেকে উচ্চ শক্তি-স্তরে চৌম্বক নিউক্লিয়াসটি উন্নীত হয়। কারণ একই পরমাণুর কতকগুলি নিউক্লিয়াসের সমষ্টিকে কোন স্থিতিশীল চৌম্বক ক্ষেত্রে রাখলে দেখা যাবে, সব সময়েই নিম্ন শক্তি-স্তরে কিছু বেশী সংখ্যক নিউক্লিয়াস থাকে। যার ফলে নিম্ন শক্তি-স্তরের নিউক্লিয়াসগুলি ব্যবহৃত তড়িৎ-চুম্বক শক্তি শোষণ করে উচ্চ স্তরে উন্নীত হতে থাকে, যতক্ষণ না উভয় স্তরের নিউক্লিয়াসের সংখ্যা সমান হয়। এই অবস্থাকে সম্পৃক্তি বলে। এই ধরণের সম্পৃক্তির অবস্থা সৃষ্টির সম্ভাবনা বেশী থাকবার জন্যে সব সময়েই শক্তি শোষিত হয়[3]। ঠিক কি পরিমাণ শক্তি শোষিত হবে, তা নির্ভর করছে বিবেচনাধীন চৌম্বক নিউক্লিয়াসের শক্তির উপর এবং তা বোঝা যাবে পূর্বোক্ত সংকেত সৃষ্টির মাধ্যমে। সুতরাং এই সংকেতটিকে ঠিকমত লিপিবদ্ধ করলে পরীক্ষাধীন নিউক্লিয়াসের চৌম্বক শক্তির একটা পরিমাপ করা যেতে পারে এবং নিউক্লিয়াসের চৌম্বক শক্তির পরিমাপ নির্ণয়ই হচ্ছে আলোচ্য প্রয়োগ-কৌশলের প্রধান ভিত্তি।

এতক্ষণ আমরা যা আলোচনা করেছি, তা শুধুমাত্র অনাবৃত চৌম্বক নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে। কিন্তু অনাবৃত চৌম্বক নিউক্লিয়াসের কল্পনা কি সম্ভব ? কেন না, নিউক্লিয়াসের অস্তিত্ব তখনই স্বীকার করা সম্ভব, যখন তাকে কেন্দ্র করে ঘুরে বেড়াচ্ছে ইলেকট্রন অর্থাৎ ইলেকট্রন দিয়ে আবৃত নিউক্লিয়াসকেই (≡পরমাণুকে) আমরা কল্পনা করতে পারি। সুতরাং নিউক্লিয়াসের কথা চিন্তা করবার সঙ্গে সঙ্গে খুব স্বাভাবিকভাবেই তার চারপাশে ঘুরে বেড়ানো ইলেকট্রনের কথা এসে পড়বেই। পরমাণুর গঠন-তত্ত্বে একথা সুস্পষ্টভাবে স্বীকৃত হয়েছে যে, ইলেকট্রনগুলি চুম্বকধর্মী। অতএব চারপাশের ইলেকট্রন-চুম্বক মধ্য স্থানে অবস্থিত পাক-খাওয়া চৌম্বক নিউক্লিয়াসের চারদিকে একটা আবরণ সৃষ্টি করবে। এর অর্থ, কোন পরমাণুকে যখন কোন চৌম্বক ক্ষেত্রে রাখা হবে, তখন চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রভাব সরাসরি ঐ পরমাণুর চৌম্বক নিউক্লিয়াসের উপর পড়বে না—সেটাকে ইলেকট্রন-চুম্বকের ঐ আবরণকে ভেদ করে নিউক্লিয়াস-চুম্বকের উপর প্রভাব বিস্তার করতে হবে। এই আবরণের ঘনত্ব কেমন হবে, তা নির্ভর করছে নিউক্লিয়াসের চার পাশের ইলেকট্রন-ঘনত্বের উপর। যত বেশী সংখ্যক ইলেকট্রন থাকবে, তত বেশী ইলেকট্রন-ঘনত্ব বাড়বে এবং ইলেকট্রন-চুম্বক আবরণের ঘনত্বও বাড়বে তত বেশী। এই আবরণ সৃষ্টি করাকে বলা হয় আচ্ছাদন প্রক্রিয়া।

আবার আমরা জানি, ইলেকট্রনগুলি (বিশেষ

3. মাঝে মাঝে অবশ্য শক্তির বিকিরণ ঘটে এবং তখন চৌম্বক নিউক্লিয়াসগুলি উচ্চ থেকে নিম্ন শক্তি-স্তরে অবনমিত হয়। এই অবনমন প্রক্রিয়াকে বিরাম-অবস্থা বলে। দু-ধরণের বিরাম-অবস্থা জানা আছে। একটাকে বলে আন্তঃঘূর্ণন এবং অন্যটা হচ্ছে স্পিন-ল্যাটিস। শেষোক্ত বিরামাবস্থা শক্তি শোষণের সহায়ক।

করে একত্রে নিউক্লিয়ার ইলেকট্রনগুলি) কেমিক্যাল বণ্ড (রাসায়নিক বন্ধন)-এর সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত এবং রাসায়নিক বন্ধনের সঙ্গে ইলেকট্রন-ঘনত্বের একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। কারণ, যখন দুই ভিন্ন পরমাণুর মধ্যে রাসায়নিক বন্ধন তৈরি হয়ে একটা অণুর উৎপত্তি হয়, তখন দেখা যায় ঐ অণুর দুই পরমাণুর চারপাশের ইলেকট্রন-ঘনত্ব এক হয় না। একটা পরমাণুর চার পাশে কিছু বেশী এবং অন্যটার চারপাশে কিছু কম ইলেকট্রন-ঘনত্ব লক্ষ্য করা যায়। সুতরাং রাসায়নিক বন্ধনের সঙ্গে আচ্ছাদন প্রক্রিয়ার একটা নিবিড় যোগসূত্র রয়েছে। অতএব আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারি যে, কোন অণুর পারমাণবিক নিউক্লিয়াসের চৌম্বক শক্তির পরিমাপ করবার অর্থই হচ্ছে, ঐ বিশেষ অণুর রাসায়নিক বন্ধনের প্রকৃতি নির্ণয় করা এবং এই অর্থেই রাসায়নিক যৌগের, বিশেষ করে জৈব যৌগের কাঠামো নির্ণয়ে এই যান্ত্রিক পদ্ধতিটি ব্যবহৃত হয়। প্রকৃতপক্ষে রাসায়নিক বন্ধনের প্রকৃতি নির্ণয়ের ক্ষমতাই হচ্ছে এই প্রয়োগ-কৌশলের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা উল্লেখ করা অত্যন্ত প্রয়োজন। রাসায়নিক যৌগগুলি বিভিন্ন পদার্থের পরমাণুর মধ্যে পারস্পরিক বন্ধনের ফলে গঠিত হয় এবং বিভিন্ন পরমাণুর নিউক্লিয়াসের চৌম্বক শক্তি বিভিন্ন। সুতরাং যে কোন রাসায়নিক যৌগের প্রত্যেকটি পরমাণুর নিউক্লিয়াসের চৌম্বক শক্তি নির্ণয় করা বেশ জটিল ব্যাপার। এই জটিল পরিস্থিতির হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যে সাধারণতঃ হাইড্রোজেন পরমাণুর নিউক্লিয়াসের অর্থাৎ প্রোটনের চৌম্বক শক্তি নির্ণয় করা হয় এবং তখন পদ্ধতিটিকে চৌম্বক প্রোটনের অনুনাদ বলা হয়।

এখন প্রশ্ন হলো, জৈব যৌগের ক্ষেত্রে চৌম্বক প্রোটনের অনুনাদ পদ্ধতিকে কিভাবে প্রয়োগ করলে সেগুলির কাঠামো সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট-ধারণা আমরা পেতে পারি। রাসায়নিক বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, যদিও জৈব যৌগের মূল উপাদান হচ্ছে কার্বন, কিন্তু অধিকাংশ জৈব যৌগে হাইড্রোজেন থাকেই। তা ছাড়া যে সব পদার্থের উপস্থিতি প্রায়ই লক্ষ্য করা যায়, সেগুলি হচ্ছে নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, সালফার এবং হ্যালোজেন গোষ্ঠীভুক্ত পদার্থ। এই সমস্ত ভিন্ন জাতীয় পরমাণুর মধ্যে নানা ধরণের রাসায়নিক বন্ধন তৈরি হতে পারে, যার ফলে হাইড্রোজেনের পারিপার্শ্বিক ইলেকট্রন-ঘনত্বের তারতম্য ঘটবে। অতএব একটা বহু প্রোটনিক জৈব যৌগকে মোটামুটিভাবে কতকগুলি বিভিন্ন প্রোটন-চুম্বকের মিশ্রণ হিসাবে কল্পনা করা যেতে পারে। ঐ রকম একটা প্রোটন-চুম্বকের মিশ্রণকে (জৈব যৌগকে) যথেষ্ট শক্তির (10,000 Gauss-এর কাছাকাছি) স্থিতিশীল নিরবচ্ছিন্ন চৌম্বক ক্ষেত্রে রাখলে বিভিন্ন পরিবেশের প্রোটন-চুম্বকগুলি ভিন্ন ভিন্ন কক্ষপথে পূর্ব-গমন গতিতে ঘুরতে থাকবে এবং তখন বেতার-তরঙ্গের গতিসম্পন্ন (সাধারণতঃ 60×10^6 কিংবা 100×10^6 cycles per second) তড়িৎ-চুম্বক শক্তি প্রয়োগ করলে তা শোষিত হবে। এখানে একটা কথা উল্লেখ-যোগ্য, একটা নির্দিষ্ট শক্তিতে শুধুমাত্র একটা কিংবা একাধিক সমপরিবেশের প্রোটন-চুম্বকের শক্তি-স্তরের উন্নতি ঘটবে এবং তার জন্যে একটা মাত্র সঙ্কেত পাওয়া যাবে। সুতরাং প্রয়োজনীয় ন্যূনতম শক্তি প্রয়োগ করে আস্তে আস্তে বাড়াতে থাকলে ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশের প্রোটনের জন্যে পৃথক পৃথক সঙ্কেত পাওয়া যাবে। এই সঙ্কেতগুলিকে তখন ধারক-যন্ত্রে বিধৃত করা হয় এবং পরে অ্যাম্প্লিফায়ারের সাহায্যে বড় করে নিয়ে স্বয়ংক্রিয় রেকর্ডারের সহায়তায় একটা চার্টে ঠিকমত লিপিবদ্ধ করা হয়। এই চার্টের পৃথক পৃথক স্থানে ভিন্ন ভিন্ন সঙ্কেতগুলি শৃঙ্গের (Peak) আকারে অবস্থান করে। সেগুলির অবস্থান পরিমাপ করা

হয় একটা নির্দিষ্ট মানের প্রোটন-সমষ্টির অবস্থানের আপেক্ষিক অর্থে। সাধারণতঃ নির্দিষ্ট মানের প্রোটন-সমষ্টির শৃঙ্গটিকে চার্টের ডানদিকে বসানো হয় অর্থাৎ সেটাকে প্রারম্ভিক স্থান হিসাবে ধরা হয় এবং তার পর অন্যান্য সঙ্কেত-শৃঙ্গগুলিকে সেগুলির শক্তি অনুযায়ী (পূর্বেই বলা হয়েছে, একটা সঙ্কেত একটা বিশেষ পরিবেশের প্রোটন বা প্রোটন-সমষ্টির চৌম্বক শক্তির নির্দেশক) প্রারম্ভিক স্থানের বামদিকে বসানো হয়। জৈব যৌগের ক্ষেত্রে অধিকাংশ সময় নির্দিষ্ট মানের যৌগ হিসাবে

$$\text{Tetramethyl silane}\quad \left(CH_3-\overset{\overset{CH_3}{|}}{\underset{\underset{CH_3}{|}}{Si}}-CH_3\right)$$
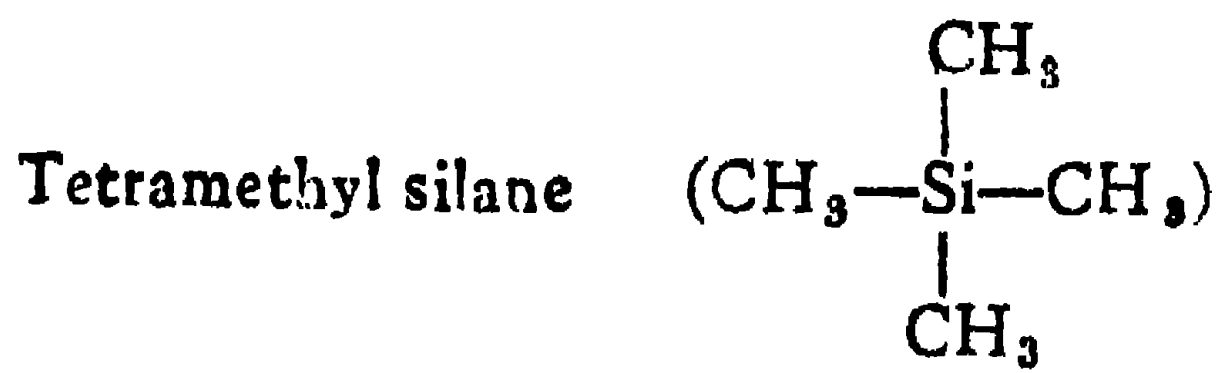
বা সংক্ষেপে T. M. S নেওয়া হয়। এই যৌগটিকে নির্দিষ্ট মান হিসাবে গ্রহণ করবার কারণ হচ্ছে, এটা কোন জৈব যৌগের সঙ্গে বিক্রিয়া করে না বা বিবেচনাধীন যৌগস্থিত কোন প্রোটনের চৌম্বক শক্তির তারতম্য ঘটায় না। উল্লিখিত যৌগে 12টি প্রোটন আছে। পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর দেখা গেছে, ঐ 12টি প্রোটনের যা ইলেকট্রন-ঘনত্ব, তা রসায়ন-বিজ্ঞানীরা প্রতিনিয়ত যে সব জৈব যৌগ নিয়ে কাজ করে থাকেন, সেগুলির যে কোন পরিবেশের প্রোটনের ইলেকট্রন-ঘনত্বের চেয়ে অনেক বেশী। সুতরাং T. M. S-এর প্রোটন-সঙ্কেতের অবস্থান কোন চার্টের সবচেয়ে বেশী ইলেকট্রন-ঘনত্বের প্রোটনের ইঙ্গিত বহন করছে এবং অন্যান্য সঙ্কেত-শৃঙ্গগুলি তার চেয়ে কম ঘনত্বের প্রোটন নির্দেশ করছে। অতএব যৌগের প্রোটন-সঙ্কেতগুলি সব সময়ই T. M. S-এর বামদিকে (কম চৌম্বক শক্তির দিকে) থাকবে। এখন T. M. S-এর প্রোটন-সঙ্কেতের অবস্থানকে জিরো ধরলে অন্যান্য সঙ্কেতগুলির অবস্থানকে সূচিত করতে হবে —1, —2, —3··· ইত্যাদি সংখ্যা দিয়ে আর নির্দিষ্ট মানের প্রোটনের অবস্থানকে 10 ধরে নিলে অন্যান্য সঙ্কেত-অবস্থানগুলিকে নির্দেশ করতে হবে 9, 8, 7, 6···ভাবে। দু-রকমভাবেই সঙ্কেতগুলিকে নির্দেশ করবার রীতি প্রচলিত আছে। প্রথমোক্ত পদ্ধতিতে সঙ্কেত-অবস্থান নির্দেশিত হলে অবস্থানের একক হচ্ছে δ অর্থাৎ তখন সঙ্কেত-অবস্থানকে 1δ, 2δ, 3δ······($\delta = -1$) ইত্যাদি ভাবে প্রকাশ করা হয়। সুতরাং সঙ্কেত-শৃঙ্গের অবস্থানের মান যত বেশী δ হবে, বুঝতে হবে সঙ্কেতটি T. M. S-এর প্রোটন-সঙ্কেত থেকে তত বেশী দূরে আছে এবং ঐ প্রোটনের বা প্রোটন-সমষ্টির ইলেকট্রন-ঘনত্ব তত কম। আবার যখন T. M. S-এর প্রোটন-সঙ্কেত অবস্থানের মানকে 10 ধরে অন্যান্য সঙ্কেত অবস্থান সূচিত হয়, তখন সেগুলির একক হচ্ছে τ এবং প্রোটন-সঙ্কেতগুলিকে তখন 9τ, 8τ, 7τ······ভাবে লেখা হয়। এখানে τ-এর মান কম হওয়ার অর্থই হচ্ছে, ইলেকট্রন-ঘনত্ব কম হওয়া। এই প্রসঙ্গে একটা কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, T. M. S-এর সঙ্কেত-শৃঙ্গের অবস্থান এবং বিবেচনাধীন যৌগের যে কোন একটা প্রোটন-সঙ্কেতের অবস্থানের মধ্যে যে দূরত্ব (যেটাকে δ বা τ দিয়ে নির্দেশ করা হচ্ছে), তাকে রাসায়নিক দূরত্ব বলে। সুতরাং δ বা τ হচ্ছে রাসায়নিক দূরত্বের নির্দেশক এবং একটা বিশুদ্ধ সংখ্যা। এই ভাবে বিভিন্ন সঙ্কেতগুলিকে রাসায়নিক দূরত্বের মাধ্যমে প্রকাশ করে যে পুরা চার্টটা পাওয়া যাবে, তাকে পরীক্ষাধীন যৌগের নিউক্লিয়াসের চৌম্বক অনুনাদীয় বর্ণালী বা N. M. R Spectrum বলে এবং যে যন্ত্রের সহায়তায় রাসায়নিক দূরত্ব স্থিরীকৃত হয়, সেটাকে N. M. R বর্ণালী-বীক্ষণ যন্ত্র বলা হয় (চিত্র নং-3)।

একটা উদাহরণ দিলে উপরে আলোচিত

বক্তব্যটা পরিষ্কার বোঝা যাবে। খুব সহজ এবং বহুল প্রচলিত উদাহরণ হচ্ছে ইথাইল অ্যালকোহল,

$$\left(H \rightarrow \overset{H}{\underset{H}{C^{2}}} - \overset{H}{\underset{H}{C^{1}}} - O - H\right)।$$

3নং চিত্র

এই যৌগে মোট 6টা প্রোটন আছে এবং তাদের ইলেকট্রন-ঘনত্ব এক নয়। একটা প্রোটন প্রত্যক্ষভাবে অক্সিজেনের সঙ্গে যুক্ত, 1 নং কার্বনের সঙ্গে যুক্ত আছে 2টি প্রোটন এবং প্রান্তিক কার্বনে আছে 3টি প্রোটন। যেহেতু অক্সিজেনের ইলেকট্রন আকর্ষণ করবার প্রবণতা কার্বন এবং হাইড্রোজেনের তুলনায় অনেক বেশী, সেহেতু অক্সিজেনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত হাইড্রোজেনের চারপাশের ইলেকট্রন-ঘনত্ব বেশ কম হবে এবং একই কারণে 1 নং কার্বনের ইলেকট্রন-ঘনত্ব কম হবে, যার অর্থ ঐ কার্বনে যুক্ত হাইড্রোজেন দুটির চারপাশের ইলেকট্রন-ঘনত্ব কম হওয়া। কিন্তু অক্সিজেনের ইলেকট্রন আকর্ষণের এই প্রভাব প্রান্তিক কার্বনের উপর বেশ কম হবে। সুতরাং ঐ কার্বনে যুক্ত হাইড্রোজেনগুলির ইলেকট্রন-ঘনত্ব তেমন কম হবে না। অতএব আমরা দেখতে পাচ্ছি, ইথাইল অ্যালকোহল অণুতে তিনটি ভিন্ন পরিবেশের প্রোটন আছে। সবচেয়ে কম ইলেকট্রন-ঘনত্বের প্রোটন একটা (অক্সিজেনের সঙ্গে যুক্ত,—O—H), মোটামুটি কম ঘনত্বের দুটি (1 নং কার্বনের $-CH_2-O$) এবং বেশ বেশী ঘনত্বের তিনটি প্রোটন (প্রান্তিক,$-CH_3$)। সুতরাং আলোচ্য যৌগের নিউক্লিয়াস চৌম্বক অনুনাদীয় বর্ণালীতে পৃথক পৃথক স্থানে তিনটি শৃঙ্গ পাওয়া যাবে (চিত্র নং-4)।

এখানে উল্লেখ্য, আলোচ্য পদ্ধতিটি সাধারণতঃ তরল যৌগের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অতএব কার্বন যৌগের ক্ষেত্রে পদ্ধতিটি প্রয়োগ করতে হলে তাকে একটা দ্রাবকে গুলে নিতে হবে। কিন্তু কোন দ্রাবক ব্যবহার করবার সময় মনে রাখা দরকার—সেটা নিষ্ক্রিয়, চুম্বকত্বের দিক থেকে পরীক্ষাধীন যৌগের সমধর্মী, নির্দিষ্ট মানের যৌগ T. M. S-কে গুলতে সক্ষম এবং পারতপক্ষে নন-প্রোটনিক[4] হওয়া বাঞ্ছনীয়। কারণ তা না হলে দ্রাবক এবং পরীক্ষাধীন যৌগের যুগ্ম বিক্রিয়ার

4. মাঝে মাঝে প্রোটনিক দ্রাবক ব্যবহার করা হয়, সে ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংশোধন করে নেওয়া হয়।

ফলে একটা জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হবে এবং মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হবে। সে জন্যে কার্বন টেট্রাক্লোরাইড (CCl_4), ডয়টরো-ক্লোরোফরম ($CDCl_3$), ডয়টেরিয়াম অক্সাইড (D_2O) এবং কার্বন ডাইসালফাইড (CS_2) ইত্যাদি দ্রাবক-গুলি সাধারণতঃ ব্যবহার করা হয়।

এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা উল্লেখ করা অত্যন্ত প্রয়োজন। পূর্বেই বলা হয়েছে আলোচ্য বর্ণালীতে যে শৃঙ্গগুলি পাওয়া যায়, তা এক বা একাধিক প্রোটনের ইঙ্গিত বহন করতে পারে। তাহলে প্রশ্ন হলো, কি ভাবে বোঝা যাবে কোন একটি বিশেষ শৃঙ্গ কটা প্রোটনের নির্দেশক? সাধারণতঃ শৃঙ্গের তীব্রতা থেকে আপেক্ষিক প্রোটন-সংখ্যা বের করা হয়। শৃঙ্গের তীব্রতা নির্ভর করছে, তার সীমানার উপর। এই আপেক্ষিক শৃঙ্গ-সীমানা (Peak-area) বের করা হয় একটি নির্দেশক রেখার সহায়তায় এবং সেই রেখাটাকে বলা হয় আপেক্ষিক প্রোটন-সংখ্যা নির্দেশক রেখা। আলোচ্য প্রয়োগ-কৌশল যন্ত্রে এই নির্দেশক রেখাটি লিপিবদ্ধ হবার স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা থাকে। সুতরাং বর্ণালীর সঙ্গে সঙ্গে ঐ রেখাটিও লিপি-বদ্ধ হয়। এই নির্দেশক রেখার উচ্চতা অনুযায়ী আপেক্ষিক প্রোটন-সংখ্যা নির্ণীত হয়; যেমন—
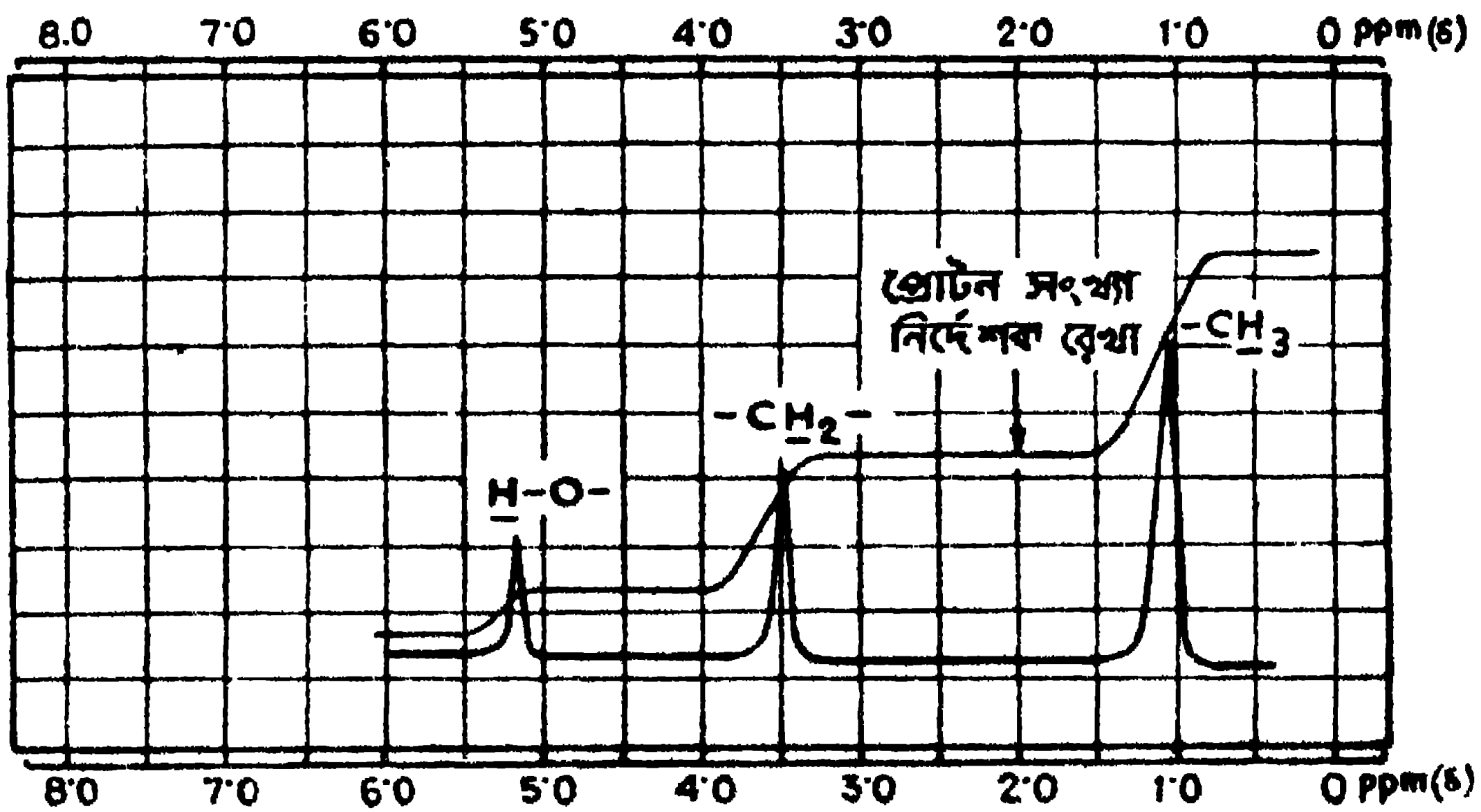
4নং চিত্র

ইথাইল অ্যালকোহলের ক্ষেত্রে (চিত্র নং-4) তিনটি শৃঙ্গের নির্দেশক রেখার উচ্চতা যথাক্রমে 6, 12·4 এবং 17·8 ঘর (চার্টের এক-একটা চতুর্ভুজীয় ঘরকে একক ধরে)। অতএব ঐ তিনটি শৃঙ্গের প্রোটন-সংখ্যার অনুপাত 1 : 2 : 3। এখন বিবেচনাধীন জৈব যৌগের যে কোন একটি সঙ্কেত-শৃঙ্গের প্রোটন-সংখ্যা সম্পর্কে ধারণা থাকলে অন্যান্য শৃঙ্গের প্রোটন-সংখ্যা নির্ণয় করা বেশ সহজসাধ্য ব্যাপার।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, নিউক্লিয়াসের চৌম্বক অনুনাদীয় বর্ণালীতে সঙ্কেত-শৃঙ্গের অবস্থান এবং জৈব যৌগের কাঠামো নির্ণয়ে সেগুলির সঠিক ব্যাখ্যান প্রোটনের ইলেকট্রন-ঘনত্বের উপর নির্ভরশীল। কাজেই কি কি কারণে ইলেকট্রন-ঘনত্বের তারতম্য ঘটে, সে সম্পর্কে কয়েকটি কথার উল্লেখ বোধ হয়

অপ্রাসঙ্গিক হবে না। দেখা গেছে, যে সমস্ত কারণের জন্যে ইলেকট্রন-ঘনত্বের তারতম্য ঘটে, সেগুলির মধ্যে অন্যতম হচ্ছে আবিষ্টকরণ। আমরা জানি, আবিষ্টকরণ নির্ভর করে পরমাণুর ইলেকট্রন-আকর্ষণী ক্ষমতার উপর। কোন প্রোটনের কাছাকাছি ইলেকট্রন-আকর্ষণী পরমাণু থাকলে সেটি তার নিজের দিকে ইলেকট্রন-আকর্ষণ করবে—যার ফলে প্রোটনের চারপাশের ইলেকট্রন-ঘনত্ব কম হবে এবং আচ্ছাদন ক্রিয়া কমে যাবে। ঠিক কি পরিমাণে ইলেকট্রন-ঘনত্ব কমবে, তা নির্ভর করছে ঐ বিশেষ পরমাণুর ইলেকট্রন-আকর্ষণী ক্ষমতার উপর, যত বেশী ইলেকট্রন ও আকর্ষণী ক্ষমতা থাকবে, প্রোটনের ইলেকট্রন-ঘনত্ব কমবে তত বেশী। যেমন, $H_3C—C\leftarrow$, $H_3C—N<$, $H_3C—O—$, ইত্যাদি শ্রেণীর মিথাইল প্রোটনের ইলেকট্রন-ঘনত্ব বা আচ্ছাদন প্রক্রিয়া হবে $H_3C—C\leftarrow > H_3C—N< > H_3C—O—$ এবং হ্যালাইড গোষ্ঠীর মিথাইল প্রোটনের আচ্ছাদন ক্রিয়া হবে নিম্নরূপ :—

$$CH_3I > CH_3Br > CH_3Cl > CH_3F$$

উল্লিখিত ইলেকট্রন-আকর্ষণজনিত যে আচ্ছাদন প্রক্রিয়া, তাকে বলা হয় ডায়াম্যাগ্‌নেটিক শিল্ডিং এফেক্ট। এছাড়া আরও দুই ধরণের আচ্ছাদন প্রক্রিয়া জানা আছে: একটিকে বলা হয় প্যারাম্যাগ্‌নেটিক শিল্ডিং এফেক্ট এবং অন্যটি ইনটারঅ্যাটমিক ডায়াম্যাগ্‌নেটিক শিল্ডিং এফেক্ট নামে পরিচিত। প্রথমোক্ত প্রক্রিয়াটিকে এক কথায় মিশ্র প্রক্রিয়া বলা যেতে পারে। যখন কোন যৌগকে একটি স্থিতিশীল নিরবচ্ছিন্ন চৌম্বক ক্ষেত্রে রাখা হয়, তখন চৌম্বক প্রোটনের কাছাকাছি অবস্থিত পরমাণুর (কার্বন, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, হ্যালোজেন ইত্যাদি) নিউক্লিয়াসের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ইলেকট্রনগুলি যথেষ্ট পরিমাণে না হলেও কিছুটা শক্তিসম্পন্ন একটি আচ্ছাদন প্রক্রিয়া ঘটাতে পারে। এই প্রক্রিয়া কখন কখন ইলেক্ট্রন-আকর্ষণজনিত আচ্ছাদনের পরিমাণ বাড়িয়ে দিতে পারে আবার মাঝে মাঝে সেটাকে কমিয়েও দিতে পারে। ঠিক এই ধরণের আচ্ছাদন-ক্রিয়া লক্ষ্য করা যায় অ্যালডিহাইড ($—\overset{\overset{\displaystyle O}{\|}}{C}—H$) এবং অ্যাসিটিলিন ($H—C\equiv C—H$) প্রোটনের ক্ষেত্রে। অক্সিজেনের ইলেকট্রন-আকর্ষণী ক্ষমতা অনুযায়ী অ্যালডিহাইড প্রোটনের যে পরিমাণ ইলেকট্রন-ঘনত্ব হওয়া উচিত ছিল, প্রকৃতপক্ষে তার চেয়ে অনেক কম ঘনত্ব লক্ষ্য করা যায়। আবার অ্যাসিটিলিন অণুতে অসম্পৃক্ত বাহুর উপস্থিতির জন্যে যে পরিমাণ ইলেকট্রন-ঘনত্ব আশা করা যায়, তার চেয়ে কিন্তু বেশী ঘনত্বের লক্ষণ দেখা যায় অর্থাৎ অ্যালডিহাইড প্রোটন বর্ণালীর আশাতিরিক্ত নিম্নশক্তি সীমানায় এবং অ্যাসিটিলিন প্রোটনগুলি কিছুটা উচ্চশক্তির অঞ্চলে সঙ্কেত-শৃঙ্গ প্রদর্শন করবে।

তৃতীয় আচ্ছাদন প্রক্রিয়াটি পরীক্ষাধীন যৌগের সবটা কিংবা কোন বিশেষ অংশের কাঠামোর প্রভাব থেকে উদ্ভূত হয়। যেহেতু প্রোটনগুলি একটা বিশেষ যৌগের সঙ্গে জড়িত, সেহেতু তাদের চারপাশের ইলেকট্রন-ঘনত্বের উপর ঐ যৌগের কিংবা তার কোন অংশবিশেষের কাঠামোর একটি প্রভাব থাকবেই এবং সেই প্রভাবের ফলে দেখা যায় আচ্ছাদন প্রক্রিয়ার তারতম্য ঘটছে। বিবেচনাধীন জৈব যৌগটি অ্যারোমেটিক জাতীয় হলে কিংবা ঐ যৌগে অ্যারোমেটিক রিং থাকলে এই ধরণের আচ্ছাদন প্রক্রিয়া ভালরূপ কার্যকরী হয়। আমরা জানি, অ্যারোমেটিক রিং-এর মধ্যে পাই ইলেকট্রনের একটি রুদ্ধ লুপ থাকে এবং তার একটা নিজস্ব চৌম্বক ধর্ম আছে। এই রুদ্ধ লুপ চুম্বকটি সাধারণতঃ অ্যারোমেটিক প্রোটনগুলির (যে সব প্রোটন রিং-এর সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত) ইলেকট্রন-ঘনত্ব কমিয়ে দেয়, যার জন্যে ঐ প্রোটনগুলি বর্ণালীর নিম্ন-

শক্তির সীমানায় শৃঙ্গের আকারে অবস্থান করে। কিন্তু যে সব প্রোটন রুদ্ধ লুপের সমতলের ঠিক উপরে কিংবা নীচের দিকে থাকে, তাদের ক্ষেত্রে বিপরীত প্রক্রিয়া দেখা যায় অর্থাৎ সে সব ক্ষেত্রে আচ্ছাদনের ইলেকট্রন-ঘনত্ব বেড়ে যায়, যার ফলে তারা বর্ণালীর উচ্চশক্তির অঞ্চলে সংকেত-শৃঙ্গ প্রদর্শন করে—যেমন দেখা যায় পলিমেথিলিন-বেঞ্জিনে। ঐ যৌগের মাঝের দুই মেথিলিন পুঞ্জের ($-CH_2$) প্রোটনগুলি অস্বাভাবিক রকম উচ্চ শক্তির সীমানায় অবস্থান করে।

শনির বলয়

গিরিজাচরণ ঘোষ*

শনি হলো সৌরজগতের ষষ্ঠ গ্রহ, সূর্য থেকে যার গড়-দূরত্ব হলো প্রায় অষ্টআশি কোটি একষট্টি লক্ষ মাইলের মত, অর্থাৎ সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্বের প্রায় নয় গুণ বেশী। সেকেণ্ডে ছয় মাইল বেগে আপন কক্ষপথে ঐ গ্রহ পরিক্রমা করে চলেছে সূর্যকে এবং প্রায় সাড়ে উনত্রিশ বছরে সেটি একবার সম্পূর্ণ করে তার প্রদক্ষিণ। এই হলো শনিগ্রহের সাধারণ পরিচয়। তাছাড়া আরও দু-একটা সাধারণ মাপজোখ দেখিয়ে শনির চেহারাটা আরও একটু পরিষ্কার করা যেতে পারে; যেমন—ঐ গ্রহের ব্যাস হলো একাত্তর হাজার মাইল অর্থাৎ নয়টি পৃথিবী পাশাপাশি রাখলে যে ব্যাস দাঁড়াবে, তাই। আর শনির যা আয়তন, তাতে সাত-শ' তেষট্টিটি পৃথিবী ওর ভিতরে স্থান পেতে পারে। আর ওজনের কথা বলতে গেলে দাঁড়িপাল্লার এক দিকে শনিগ্রহকে চাপালে অপর দিকে চাপাতে হবে পঁচানব্বুইটি পৃথিবী-বাটখারা। আর পৃথিবী যেখানে চব্বিশ ঘণ্টায় আপন অক্ষের চারপাশে একবার আবর্তিত হয়, সেখানে শনিগ্রহের আপন অক্ষের চারপাশে একবার আবর্তিত হতে সময় লাগে দশ ঘণ্টা চৌদ্দ মিনিট। কিন্তু এতেও শনিগ্রহের পরিচয় সম্পূর্ণ হলো না। শনির সবচেয়ে বড় যে পরিচয় অর্থাৎ যা দিয়ে সমগ্র গ্রহমণ্ডলী থেকে তাকে পৃথকভাবে চেনা যায়, তা হলো শনির বলয়। এই বলয় শনির এমন এক অপূর্ব বস্তু, যা থেকে সৌর-জগতের অন্য সব গ্রহই বঞ্চিত।

শনির বলয় হলো ঐ গ্রহের বিষুবতলের সঙ্গে সমান্তরালভাবে অবস্থিত তিনটি পাতলা সমকেন্দ্রিক বলয়, যা ঐ গ্রহের চতুষ্পার্শ্বে আবর্তিত হয়ে চলেছে। সবচেয়ে ভিতরের বলয়টিকে বলা হয় ক্রেপ-বলয়। এই বলয়টি অত্যন্ত আবছা এবং এই বলয়ের ভিতরের ব্যাস অষ্টআশি হাজার এক-শ' নব্বুই মাইল অর্থাৎ শনির পৃষ্ঠ থেকে ঐ বলয়ের দূরত্ব আট হাজার মাইলের কিছু বেশী। সুতরাং শনির পৃষ্ঠ এবং প্রথম বলয়ের মধ্যবর্তী ফাঁক দিয়ে আমাদের পৃথিবী চলে যেতে পারবে অনায়াসে। কারণ পৃথিবীর ব্যাস হলো প্রায় আট হাজার মাইল। শনির তৃতীয় বা শেষ বলয়টির বাইরের ব্যাস হলো প্রায় এক লক্ষ বাহাত্তর হাজার তিন শ' দশ মাইল। অর্থাৎ তিনটি বলয়ের প্রস্থ যোগ করলে যে চওড়া রাস্তাটা দাঁড়াবে, তার প্রস্থ

*পদার্থবিদ্যা বিভাগ, বিদ্যাসাগর কলেজ, কলিকাতা—6।

হবে প্রায় বিয়াল্লিশ হাজার মাইলের মত। সুতরাং পাশাপাশি পাঁচটি পৃথিবী ঐ চওড়া রাস্তা দিয়ে স্বচ্ছন্দে চলতে পারবে। তবে শনির শেষ এবং মধ্যবর্তী বলয় দুটির মাঝখানে কিছুটা ফাঁক রয়েছে। পৃথিবীতে বসে ঐ ফাঁক দিয়ে দৃষ্টি চালালে কখনও কখনও নক্ষত্রও দেখা যায়। এই বলয়গুলির প্রস্থের তুলনায় বেধ অত্যন্ত কম। ওদের বেধ কুড়ি মাইলের বেশী হবে না।

শনির বলয়ের প্রকৃতি সম্বন্ধে দুটি তত্ত্ব প্রচলিত আছে। প্রথম তত্ত্বানুসারে এই বলয়গুলি একটানা কঠিন পদার্থে গঠিত। দ্বিতীয় তত্ত্বানুসারে ঐ বলয়-গুলি হলো বহু ক্ষুদ্র কণার ঝাঁক। ঐ কণাগুলি এত কাছাকাছিভাবে ঠাসা যে, ওগুলিকে এক-টানা একটি বস্তু বলে মনে হয়।

1857 সালে ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল গাণিতিক তত্ত্বের দ্বারা প্রমাণ করেন যে, বলয়গুলি কঠিন পদার্থের হলে গতিশীল অবস্থায় সেগুলি ভঙ্গুর হবে। কারণ, যদি কোন বলের দ্বারা সেগুলির অল্প সরণ হয়, তবে সেগুলি নিশ্চয়ই ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে যাবে।

দুটি তত্ত্বের সত্যতা যাচাই করা যেতে পারে একটি বলয়ের ভিতরের এবং বাইরের কিনারা দুটির আপেক্ষিক আবর্ত-গতি পরিমাপ করে। প্রথম তত্ত্বানুসারে যদি বলয়টি কঠিন পদার্থের হয়, তবে একথা উপলব্ধি করা খুব কঠিন হবে না যে, বলয়ের বাইরের কিনারার বেগ ভিতরের কিনারার বেগ অপেক্ষা বেশী হবে। গণিতের সাহায্যে বলা যেতে পারে, যদি বলয়টির প্রতি সেকেণ্ডে আবর্তন সংখ্যা হয় n এবং বলয়ের ভিতরের ও বাইরের ব্যাসার্ধ হয় যথাক্রমে r_1 এবং r_2, তবে বলয়টির ভিতরের এবং বাইরের কিনারার বেগ হবে $2\pi r_1 n$ এবং $2\pi r_2 n$; যেহেতু বাইরের ব্যাসার্ধ r_2 ভিতরের ব্যাসার্ধ r_1 অপেক্ষা বড়, সেহেতু বাইরের কিনারার বেগ ভিতরের কিনারার বেগ অপেক্ষা বেশী।

দ্বিতীয় তত্ত্বানুসারে বলয়গুলি যদি ক্ষুদ্রতম কণার সমষ্টি হয়, তবে প্রতিটি কণার উপর দুটি বল ক্রিয়া করবে। একটি হলো শনির অভিকর্ষজ বল এবং অপরটি অপকেন্দ্রিক বল। নিউটনের মহাকর্ষ তত্ত্ব অনুসারে শনির অভিকর্ষজ বলের মান হবে $\frac{GMm}{r^2}$, যেখানে G হলো মহাকর্ষীয় ধ্রুবক, M হলো শনিগ্রহের ভর, m হলো কণাটির ভর এবং r হলো গ্রহের কেন্দ্রবিন্দু থেকে কণাটির দূরত্ব। এখন অপকেন্দ্রিক বলের মান হলো $\frac{mv^2}{r}$, যেখানে v হলো আপন কক্ষপথে কণাটির বেগ। সাম্য অবস্থায়, অর্থাৎ কণাটি একই বৃত্তপথে গ্রহটিকে ক্রমাগত প্রদক্ষিণ করে গেলে অভিকর্ষজ বল অপকেন্দ্রিক বলের সমান হবে। সুতরাং

$$\frac{GMm}{r^2} = \frac{mv^2}{r}$$

$$\text{বা}\quad v = \sqrt{\frac{GM}{r}}$$

এই সমীকরণ থেকে দেখা যাচ্ছে, r-এর মান যত বেশী হবে, v-এর মান তত কম হবে, অর্থাৎ গ্রহ থেকে থেকে দূরে অবস্থিত কণাগুলির গতি-বেগ কম। সুতরাং শনির বলয় যদি অসংখ্য কণা সমষ্টি হয়, তবে ঐ বলয়ের বাইরের কিনারার বেগ ভিতরের কিনারার বেগ অপেক্ষা কম হবে।

এখন কথা হলো, এই পৃথিবীতে বসে আশি কোটি মাইল দূরের ঐ বলয়ের ভিতর ও বাইরের কিনারার বেগ কি ভাবে পরিমাপ করা যেতে পারে? এটা করা সম্ভব বর্ণালীবীক্ষণ যন্ত্রের পরীক্ষার দ্বারা। শনির বলয় থেকে যে আলো আসে, তাতে পরিষ্কার ফ্রনহোফার রেখা দেখা যায়। এখানে ফ্রনহোফার রেখা সম্বন্ধে দু-একটা কথা বলা প্রয়োজন। সূর্য থেকে যে আলো আসে, তা একটা প্রিজ্‌মের মধ্য দিয়ে দেখলে সাত রঙের একটা আলোর পটি দেখা যায়, যাকে বলে বর্ণালী। যদি কোন বর্ণালীবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে সূর্যের আলো ভাল

ভাবে পরীক্ষা করা যায়, তবে ঐ বর্ণালীর মধ্যে কতকগুলি কালো রেখা দেখা যায়। ঐ কালো রেখাগুলিকেই বলে ফ্রনহোফার রেখা। ঐ রেখাগুলির কিছুটা বিশেষত্ব আছে। এই রেখাগুলি দেখে বুঝতে পারা যায়, সূর্যে কি কি বস্তু রয়েছে। কারণ অত্যন্ত গরম অবস্থায় যখন কোন বস্তু থেকে নির্গত আলো বর্ণালীবীক্ষণ যন্ত্রের দ্বারা পরীক্ষা করা যায়, তখন তার যে বর্ণালী-রেখা দেখা যায়, অপেক্ষাকৃত কম গরম অবস্থায় তার মধ্য দিয়ে সাদা আলো গেলে ঐ বর্ণালী রেখার স্থানে অন্ধকার রেখা পড়ে। উদাহরণ-স্বরূপ অত্যন্ত গরম অবস্থায় সোডিয়াম থেকে যে আলো নির্গত হয়, তার বর্ণালীতে পাওয়া যায় হলদে আলোর রেখা, অপেক্ষাকৃত কম উত্তপ্ত সোডিয়ামের মধ্য দিয়ে যাওয়া সাদা আলোর বর্ণালীতে যে সাতরঙা আলোর পটি দেখা যাবে, তাতে হলদে বর্ণালী রেখার স্থানে কালো রেখা দেখা যাবে। শনির বলয় থেকে যে আলো আসে, বর্ণালীবীক্ষণ যন্ত্রে তা পরীক্ষা করে ঐরূপ ফ্রনহোফার রেখা পাওয়া যায়। শনির বলয়গুলি যদি স্থির অবস্থায় থাকে, তবে তার বর্ণালীতে ফ্রনহোফার রেখাগুলির অবস্থান সৌর-বর্ণালীর ফ্রনহোফার রেখার অনুরূপ স্থানে হবে। কিন্তু বলয়গুলি যদি আবর্তিত হয়, তবে বলয়ের বাম এবং দক্ষিণ প্রান্তীয় অংশগুলি দৃশ্য পথের সঙ্গে পরস্পর বিপরীতমুখী হয়ে ছুটবে। ফলে ডপ্‌লার এফেক্ট দেখা যাবে। বলয়ের যে প্রান্তীয় অংশ দর্শকের অভিমুখে ছুটে আসবে, তার বর্ণালীরেখা সরে যাবে বেগুনী আলোর দিকে, আর বলয়ের যে প্রান্তীয় অংশ দর্শকের দৃষ্টিপথের বিপরীতমুখে ছুটে যাবে, তার বর্ণালী রেখা সরে যাবে লাল আলোর দিকে। এই সরণ নির্ভর করবে বলয়ের আবর্ত-গতির উপর। যদি দ্বিতীয় তত্ত্বানুসারে বলয়গুলি কণা-সমষ্টির দ্বারা গঠিত হয়, তবে বলয়ের ভিতরের কিনারার বেগ বাইরের কিনারার বেগ অপেক্ষা বেশী হবে, ফলে ভিতরের কিনারার জন্যে বর্ণালী-রেখার সরণ হবে বেশী। কিন্তু প্রথম তত্ত্বানুসারে বলয়গুলি যদি কঠিন পদার্থের দ্বারা গঠিত হয়, তবে বিপরীত ফল পাওয়া যাবে।

1895 সালে অধ্যাপক কীলার বর্ণালীবীক্ষণ যন্ত্রে পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ করেন—বলয়ের ভিতরের অংশ বাইরের অংশ অপেক্ষা দ্রুত আবর্তিত হচ্ছে। পরে বিজ্ঞানী ডেস্‌লাণ্ডারস বলয়ের ভিতরের এবং বাইরের অংশের বেগ পরিমাপ করে ঐ প্রমাণ আরও দৃঢ়তর করেন। ডেস্‌লাণ্ডারস ভিতরের বলয়ের বেগ পরিমাপ করেন 20·1 কিলোমিটার/সেকেণ্ড; গণনা অনুসারে এর নির্ণীত বেগ হলো 21·0 কিলোমিটার/সেকেণ্ড। তিনি বাইরের বলয়ের বেগ পরিমাপ করেন 15·4 কিলোমিটার/সেকেণ্ড, যেখানে গণনা অনুসারে এর মান হলো 17·1 কিলোমিটার/সেকেণ্ড।

শনির এই বলয়গুলির মাঝে মাঝে অবলুপ্তি ঘটে অর্থাৎ পৃথিবী থেকে সেগুলিকে দেখা সম্ভব হয় না। এর কারণ আমরা পূর্বেই বলেছি যে, বলয়গুলির বেধ অত্যন্ত পাত্‌লা—তাদের বেধ কুড়ি মাইলের চেয়েও কম। কাজেই উনত্রিশ বছরে শনিগ্রহ যখন সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করে, তখন ঐ সময়ের মধ্যে বলয়গুলি দু-বার এমন অবস্থানে থাকে, যাতে সেগুলির তল আমাদের দৃষ্টি-পথের সঙ্গে সমান্তরাল হয়। ফলে বলয়গুলি একটা রেখার সামিল হয়ে দাঁড়ায়। সেগুলির বেধ অত্যন্ত অল্প হওয়ায় সাধারণতঃ দূরবীনে তা ধরা পড়ে না।

এখন কথা হচ্ছে, শনির এই বলয়গুলি সৃষ্টি হলো কিভাবে? এর সঠিক উত্তর এখনও পাওয়া যায় নি। অনেকের মতে, পূর্বে ওটা ছিল শনির নিকটতম উপগ্রহ। অধিক আকর্ষণের টানা-পোড়েনে ওটা গুঁড়িয়ে গিয়ে ঐ অবস্থাপ্রাপ্তি ঘটেছে। কিন্তু একথা খুব বিশ্বাসযোগ্য নয়। গুঁড়িয়ে-যাওয়া গ্রহের টুক্‌রাগুলি নিশ্চয় ছোট-

বড় হতো, ঐ রূপ সমসত্ত্ব বলয় নিশ্চয় সৃষ্টি হতো না। এই কারণে অনেকে মনে করেন ওটা একটা উপগ্রহ সৃষ্টির প্রথম অবস্থা। বোধ হয় আমাদের সৌরজগতের প্রতিটি গ্রহ-উপগ্রহ ঐ ভাবেই সৃষ্টি হয়েছে। একদিন ঐ কণাগুলি একত্রিত হয়ে সৃষ্টি হবে শনির আর একটি উপগ্রহ। তবে এসবই কল্পনা, এর পশ্চাতে জোরালো কোন যুক্তি নেই। তবে এর সঠিক সৃষ্টি-রহস্য মানুষ একদিন নিশ্চয়ই জানবে—এই আশায় এগিয়ে চলেছে বিজ্ঞানের জয়যাত্রা।

নক্ষত্রের শক্তির উৎস

দেবাশিস দত্ত*

মহাকাশে অজস্র নক্ষত্র ছড়িয়ে রয়েছে। অন্ধকার রাতে খালি চোখেও তাদের মহাব্যোমের বুকে অগ্নিজ্বালা ধারণ করে অনলস ধৈর্যে জ্বলতে দেখা যায়। তারা সবাই মিলে কোটি কোটি নক্ষত্রের এক বিরাট পরিবার রচনা করেছে। আমাদের সূর্যও ঐ পরিবারেরই অন্তর্ভুক্ত। সকলেই সদা জ্যোতির্ময়। তাদের অসীম শক্তি সৃষ্টির উৎসমূল কি হতে পারে, তাই আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু।

আমাদের সূর্যের কথাই ধরা যাক। বিজ্ঞানীরা গণনা করে দেখেছেন যে, সূর্যের বয়স কয়েক হাজার কোটি বছর, আনুমানিক প্রায় $3\text{-}4\times10^{10}$ বছর। সৌর ধ্রুবকের মান জেনে এবং ষ্টিফেনের বিকিরণ সূত্র ব্যবহার করে সূর্যের বহিরাংশের যে উষ্ণতা নির্ণয় করা হয়েছে, তা প্রায় 6,000°সে.। সূর্যের বহিরাংশের উষ্ণতা এবং যে সকল গ্যাসীয় পদার্থের দ্বারা সূর্যের সৃষ্টি হয়েছে, তাদের তাপ পরিবাহিতার মান জেনে সূর্যের কেন্দ্রের উষ্ণতাও বের করা হয়েছে, তা বহিরাংশের উষ্ণতার বেশ কয়েক হাজার গুণ বেশী—আনুমানিক প্রায় 20,000,000° সে.। গণনা করে দেখানো সম্ভব যে, প্রতি সেকেণ্ডে সূর্যের আলোক ও উত্তাপের বিকিরণের পরিমাণ প্রায় 9×10^{25} ক্যালোরি অর্থাৎ প্রতি সেকেণ্ডে বিকিরিত সৌর শক্তির পরিমাণ প্রায় 4×10^{33} আর্গ। এখন যদি আমরা উপরিউক্ত বিকিরিত শক্তিকে সৌর-বস্তুরই রূপান্তর বলে ধরে নিই, তাহলে আইন-স্টাইনের 'ভর-শক্তি সূত্র' প্রয়োগ করে সৌরবস্তুর ভর হ্রাসের পরিমাণ নির্ণয় করতে পারি। উপরি-উক্ত সূত্রানুযায়ী প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় $4{\cdot}4\times10^{12}$ গ্র্যাম সৌরবস্তু শক্তিতে রূপান্তরিত হচ্ছে। কিন্তু সূর্যের ভর আনুমানিক প্রায় 2×10^{33} গ্র্যাম। এতদিনে সূর্যের নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবারই কথা। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, বিগত কোটি কোটি বছরে সূর্যের বহিরাংশের উষ্ণতার তারতম্য পর্যন্ত ঘটে নাই। সুতরাং উপরিউক্ত মতবাদ গ্রহণযোগ্য নয়।

আমরা জানি যে, যখন বস্তু সঙ্কুচিত ও ঘনীভূত হয়, তখন সেই বস্তুপিণ্ডের নিভৃতের অণু-পরমাণুগুলির সংঘর্ষে তাপ নির্গত হয়। সঙ্কোচন-জনিত এই তাপ-শক্তিকে সূর্যের বিকিরণের জন্যে প্রয়োজনীয় শক্তির উৎস বলে ধারণা করা কিছুমাত্র আশ্চর্য নয়। কিন্তু এই তত্ত্বানুযায়ী সূর্যের

*পদার্থবিদ্যা বিভাগ, ভবানীপুর এডুকেশন সোসাইটি কলেজ, কলিকাতা-20

বর্তমান বয়স হচ্ছে মাত্র 5 কোটি বছর। কাজেই এই তত্ত্বকেও সঠিক বলে মনে করা যায় না।

বেথে এবং ভাইৎস্যাকার সর্বপ্রথম সৌর-শক্তির উৎসের পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম হন। তাঁদের মতে, সূর্যের কেন্দ্রে অতি প্রচণ্ড উষ্ণতা হেতু, যে পারমাণবিক কেন্দ্রিক বিক্রিয়া ঘটে থাকে, একমাত্র তজ্জাত শক্তিই ঐ অফুরন্ত শক্তির উৎস হতে পারে।

বোরের তত্ত্বানুযায়ী কোন একটি বস্তুকণা যখন একটি পারমাণবিক কেন্দ্রীনের সঙ্গে সংঘর্ষ ঘটায়, তখন প্রথমে একটি অস্থায়ী যৌগিক কেন্দ্রীনের সৃষ্টি হয়। পরে তা বিভাজনের ফলে নতুন একটি স্থির কেন্দ্রীন, একটি চলমান বস্তুকণা অথবা আলোককণা (Photon অর্থাৎ γ-ray) এবং প্রচুর পরিমাণ শক্তির উদ্ভব হয়ে থাকে। এই জাতীয় বিক্রিয়াগুলিকে তাপ-কেন্দ্রিক বিক্রিয়া (Thermo-nuclear reaction) নামে অভিহিত করা হয়েছে, কারণ উপরিউক্ত পরিবর্তনগুলি একান্তভাবে উষ্ণতার উপর নির্ভরশীল। সাধারণভাবে যে কোন কেন্দ্রিক বিক্রিয়াকে আমরা

$$a+b \rightarrow c \rightarrow d+e$$

সমীকরণের দ্বারা সূচিত করতে পারি। এখানে a হচ্ছে সংঘর্ষকারী বস্তুকণা, b স্থির কেন্দ্রীন, c অস্থায়ী যৌগিক কেন্দ্রীন, d চলমান বস্তুকণা এবং e নতুন স্থির কেন্দ্রীন। যদি m_1, m_2, m_3, এবং m_4 যথাক্রমে সংঘর্ষকারী বস্তুকণা, স্থির কেন্দ্রীন, চলমান বস্তুকণা এবং নতুন স্থির কেন্দ্রীনের ভর এবং e_1, e_2, ও e_3 সংঘর্ষকারী বস্তুকণা, চলমান বস্তুকণা ও নতুন কেন্দ্রীনের শক্তির পরিমাণ হয়ে থাকে, তাহলে শক্তির নিত্যতা সূত্রানুসারে উপরিউক্ত পরিবর্তনকে আমরা নিম্নলিখিতভাবে উপস্থাপিত করতে পারি।

$$(e_1+m_1)+m_2=(e_2+m_3)+(e_3+m_4)$$

অথবা $m_1+m_2-m_3-m_4=e_2+e_3-e_1$

অর্থাৎ বিক্রিয়ার পূর্ববর্তী ভর – বিক্রিয়ার পরবর্তী ভর = বিক্রিয়ার পরবর্তী শক্তি – বিক্রিয়ার পূর্ববর্তী শক্তি

অর্থাৎ ভর পরিবর্তন = বিক্রিয়া-উৎপন্ন শক্তি

অর্থাৎ ভরের পরিবর্তনই হচ্ছে উৎপন্ন শক্তির পরিমাণ।

বোর-হুইলার অনুযায়ী কেন্দ্রিক বিক্রিয়ার ব্যাখ্যা করা যায়। তাঁদের মতবাদানুযায়ী পরমাণুর একটি কেন্দ্রীন এবং কোন তরলের একটি বিন্দু একগোত্রীয়। এই ধারণার পক্ষে যৌক্তিকতা এই যে, উভয়েই নিবিড় বস্তুকণার সমষ্টি, উভয়েরই ঘনত্ব ধ্রুবকরাশি এবং উভয়েরই অভ্যন্তরে ক্ষুদ্র-দূরত্ব বল ক্রীয়াশীল। এই সকল বিশেষ কেন্দ্রিক ধর্মের জন্যে সংঘর্ষকারী বস্তুকণার সংগৃহীত নিজস্ব শক্তি অতি শীঘ্র উৎপন্ন অস্থায়ী যৌগিক কেন্দ্রীনের কণাগুলির ভিতরে বিভক্ত হয়ে যায়। প্রত্যেক কণারই কিছু পরিমাণ শক্তি সঞ্চয় থাকলেও যতক্ষণ পর্যন্ত কোন একটি কণা অপর কণাগুলির নিকট থেকে যথেষ্ট শক্তি সংগ্রহ করতে না পারে, ততক্ষণ পর্যন্ত কেন্দ্রীন থেকে উৎক্ষিপ্ত হতে পারে না।

এই সকল বিক্রিয়া সম্পন্ন করতে হলে সংঘর্ষকারী কণার গতিবেগ অত্যন্ত অধিক হওয়া আবশ্যক। তা না হলে সেগুলি স্থির বৈদ্যুতিক বিকর্ষণ থেকে মুক্ত হতে পারবে না। কেবলমাত্র অতি প্রচণ্ড উষ্ণতারই ঐরূপ কণা থাকা সম্ভব। সূর্যের কেন্দ্রের উষ্ণতা এইরূপ কেন্দ্রিক বিক্রিয়ার উপযোগী। এই বিক্রিয়ার ফলে যে শক্তি উদ্ভূত হয়, তাই বিকিরণে রূপান্তরিত হয়ে থাকে।

বিভিন্ন কেন্দ্রিক বিক্রিয়ার ক্রান্তি লক্ষ্য করে এবং সূর্যে হাইড্রোজেনের পরিমাণ (প্রায় 35%) নির্ণয় করে বেথে প্রমাণ করেছেন যে, একটি 'কার্বন-নাইট্রোজেন বিবর্তন-চক্র'ই সৌরশক্তির উৎস। এই চক্রটি এক সারি কেন্দ্রিক বিক্রিয়ার দ্বারা গঠিত এবং ঐ সকল বিক্রিয়ার কার্বন ও

নাইট্রোজেনের সান্নিধ্যে হাইড্রোজেন হিলিয়ামে রূপান্তরিত হয়ে থাকে। প্রতিটি বিক্রিয়াতেই একটি হাইড্রোজেন পরমাণু অর্থাৎ প্রোটন সংঘর্ষকারী কণার অংশ গ্রহণ করে থাকে। সৌর শক্তির উৎসের এই ব্যাখ্যা সকল নক্ষত্রের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

সৃষ্টিতত্ত্বের বর্তমান মতবাদানুযায়ী নক্ষত্রগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসীম বস্তুকণার সমন্বয়ে গঠিত। মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবে তাদের যে সংকোচন হয়, তার ফলে তাদের অভ্যন্তরে শক্তি ও উত্তাপের সৃষ্টি হয়। এই উত্তাপে দুটি হাইড্রোজেন পরমাণু পরস্পরের মধ্যে বিক্রিয়া করে হাইড্রোজেনের একটি আইসোটোপ ডয়টেরিয়ামের সৃষ্টি করে এবং তা পুনরায় দুটি হাইড্রোজেন পরমাণুর সঙ্গে বিক্রিয়া করে একটি হিলিয়াম পরমাণুর সৃষ্টি করে। কয়েক লক্ষ বছর অতীত হবার পর যখন সমস্ত ডয়টেরিয়াম নিঃশেষিত হয়ে যায়, তখন নক্ষত্রগুলি পুনরায় সঙ্কুচিত হয় এবং উষ্ণতা আরও বৃদ্ধি পায়। এই সময়ে লিথিয়াম, বেরিলিয়াম ইত্যাদি ধাতুর সঙ্গে হাইড্রোজেন পরমাণুর সংঘর্ষ ঘটে থাকে এবং প্রচুর শক্তির উদ্ভব হয়। পুনরায় যখন উপরিউক্ত সকল মৌলই নিঃশেষিত হয়ে যায়, তখন নক্ষত্রগুলি পুনরায় সঙ্কুচিত হয় এবং উষ্ণতা আরও বৃদ্ধি পেয়ে থাকে (প্রায় 2 কোটি ডিগ্রী সে.)। এই উষ্ণতা কার্বন ও নাইট্রোজেনের প্রভাবে হাইড্রোজেনকে হিলিয়ামে পরিণত করবার উপযোগী। কিন্তু পৌনঃপুনিক এই বিক্রিয়ায় কার্বন ও নাইট্রোজেনের কোন ব্যয় হয় না। কাজেই যতদিন পর্যন্ত নক্ষত্রগুলিতে হাইড্রোজেন সঞ্চিত থাকবে, ততদিন পর্যন্ত তাদের আমরা দীপ্তিমান দেখবো।

তেজস্ক্রিয়তা

অমলচন্দ্র সাহা*

সেদিন আকাশ ছিল মেঘাচ্ছন্ন। তাই আর ফটোর প্লেটটা ডেভেলপ করা হলো না। ক'দিন পরে পরীক্ষাগারে এসে হেনরি বেকারেল (1852-1908) ফটোর প্লেটটা খুব সতর্কতার সঙ্গে ডেভেলপ করে এক অপ্রত্যাশিত ব্যাপার দেখে হতভম্ব হয়ে গেলেন। গবেষণাগারে কালো কাগজে মোড়া ফটোর প্লেটের উপর সামান্য পরিমাণে যে ইউরেনিয়ামের যৌগ রাখা ছিল, ফটোর প্লেটে তারই এক হুবহু চিত্র দেখতে পেলেন। পরীক্ষাটি তিনি বার বার করে দেখলেন। প্রতিবারই একই রকম ফল পাওয়া গেল। এর ফলে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, ফটোর প্লেটটা কালো কাগজে মোড়া থাকলেও ইউরেনিয়ামের মধ্যে এমন কোন গুপ্ত রশ্মির উৎস রয়েছে, বাইরের কোন প্রভাব ব্যতিরেকেই যা থেকে একটা অদৃশ্য রশ্মি সর্বদা বের হতে থাকে। এর পর ইউরেনিয়াম নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা আরম্ভ করেন ফরাসী বিজ্ঞানী পিয়ের কুরী ও তাঁর পোলিশ সহধর্মিণী মেরী কুরী। তখনকার দিনে পিচ্‌ব্লেণ্ড থেকেই পাওয়া যেত

* অল ইণ্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব হাইজিন অ্যাণ্ড পাব্লিক হেলথ, রুম নং-107, 110, চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-12

তেজস্ক্রিয় ধাতু ইউরেনিয়াম। পিচ্‌ব্লেণ্ড হচ্ছে এক প্রকার খনিজ পদার্থ। কুরীদম্পতি লক্ষ্য করেন যে, পিচ্‌ব্লেণ্ড থেকে ইউরেনিয়াম ধাতু বের করে নেবার পরেও পরিত্যক্ত পিচ্‌ব্লেণ্ডের তেজস্ক্রিয়তা হ্রাস পায় না। এর কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে আবিষ্কৃত হলো আর একটি তেজস্ক্রিয় ধাতু পোলোনিয়াম। ম্যাডাম কুরীর জন্মভূমি পোল্যাণ্ডের নামানুসারে এর নাম রাখা হয়েছিল পোলোনিয়াম। শুধু একটি আবিষ্কার করেই কুরীদম্পতি ক্ষান্ত হলেন না। অক্লান্ত পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের ফলে 1902 সালে পিচ্‌ব্লেণ্ড থেকে আবিষ্কৃত হলো তেজস্ক্রিয় ধাতু রেডিয়াম।

রেডিয়াম হচ্ছে সমপরিমাণ ইউরেনিয়াম থেকে প্রায় দশ লক্ষ গুণ বেশী তেজী। এক টন পিচ্‌ব্লেণ্ড থেকে মাত্র কয়েক ডেসিগ্র্যাম বিশুদ্ধ রেডিয়াম ধাতু পাওয়া যায়। 1903 সালে বেকারেলের সঙ্গে কুরীদম্পতি পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার অর্জন করেছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এর কিছু দিন পরেই দুর্ঘটনায় অধ্যাপক পিঁয়ের কুরীর অকাল মৃত্যু ঘটে। 1911 সালে মাদাম কুরী রসায়নবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার লাভ করলেন। ইতিমধ্যে আরও দু-একটি তেজস্ক্রিয় মৌলিক পদার্থ বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করতে সক্ষম হলেন। 1898 সালে স্মিট (Schmidt) আবিষ্কার করেন থোরিয়াম, আর 1900 সালে ডে-বের্নে (Debierne) আবিষ্কার করেন অ্যাক্টিনিয়াম। 1907 সালে বিজ্ঞানী হান্‌ও বোল্ট উড স্বতন্ত্রভাবে আবিষ্কার করেন আয়োনিয়াম। 1932 সালে হেভেসি ও পল্‌ দেখান যে, সামারিয়াম হচ্ছে একটি তেজস্ক্রিয় পদার্থ। 1869 সালে রাশিয়ান বিজ্ঞানী মেণ্ডেলিফ (1834-1907) পর্যায়-সূত্র ও পর্যায়-সারণী প্রবর্তন করেন। বর্তমানে পর্যায়-সারণীতে আছে বিরানব্বুইটি মৌলিক পদার্থের নাম। সবার প্রথমে আছে হাইড্রোজেন আর সবার শেষে আছে ইউরেনিয়াম। এছাড়া আছে আরও বারোটি ইউরেনিয়ামোত্তর মৌল (Transuranic element)। ইউরেনিয়ামোত্তর মৌলের (যার পারমাণবিক সংখ্যা বর্তমানে 93 থেকে 104 পর্যন্ত) নিউক্লিয়াসগুলির অর্ধ-জীবনকাল খুব হ্রস্ব। এগুলির নাম হচ্ছে :—

93 নেপচুনিয়াম
94 প্লুটোনিয়াম
95 অ্যামেরিসিয়াম
96 কুরীয়াম
97 বার্কেলিয়াম
98 ক্যালিফোর্নিয়াম
99 আইনষ্টিনিয়াম
100 ফের্মিয়াম
101 মেণ্ডেলিভিয়াম
102 নোবেলিয়াম
103 লরেন্সিয়াম
104 কুর্চাটোভিয়াম

আশা করা যাচ্ছে, আগামী কয়েক বছরের মধ্যে বিজ্ঞানীরা আরও কিছু অতি ভারী মৌলিক পদার্থ (মনে হচ্ছে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশটি) আবিষ্কার করতে সক্ষম হবেন।

বিজ্ঞানীদের বিভিন্ন পরীক্ষায় জানা যায় যে, তেজস্ক্রিয়তার হ্রাস বা বৃদ্ধি, চাপ তাপ অন্ধকার বা আলোকের প্রভাবে প্রভাবিত করা যায় না। তাই বিশেষ কয়েকটি মৌলিক পদার্থের স্বতঃস্ফূর্ত তেজ-বিকিরণের বিশেষ গুণকে বলা হয় তেজস্ক্রিয়তা। মৌলিক পদার্থ ইউরেনিয়াম, থোরিয়াম, প্লুটোনিয়াম, রেডিয়াম প্রভৃতি হচ্ছে তেজস্ক্রিয় পদার্থ। রাদারফোর্ড (1871-1937) দেখতে পান, তেজস্ক্রিয় পদার্থ অতি অল্প চাপে বায়ুশূন্য সীসার কক্ষে অতি শক্তিশালী চৌম্বক ক্ষেত্রে রাখলে তেজস্ক্রিয় পদার্থের তেজ বিকিরণ হয় এবং অদৃশ্য রশ্মিসমূহের অধিকাংশই চৌম্বক শক্তির প্রভাবে তিন ভাগে বিভক্ত হয়।

(1নং, চিত্র)। গ্রীক বর্ণমালার তিনটি বর্ণের সাহায্যে নির্গত রশ্মিসমূহের নাম রাখা হয়েছে—1। আল্‌ফা রশ্মি, 2। বিটা রশ্মি এবং 3। গামা রশ্মি।

আল্‌ফা রশ্মি প্রবাহের সময় চৌম্বক ক্ষেত্রে সামান্য বেঁকে যায় এবং ধনাত্মক তড়িৎ-কণা দিয়ে তা গঠিত। বিটা রশ্মি বেশী বেঁকে যায় এবং ঋণাত্মক তড়িৎসম্পন্ন ইলেকট্রন দিয়ে তা তৈরি। আর গামা রশ্মি চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রভাব উপেক্ষা করে সোজা বেরিয়ে যায়। পরীক্ষার দ্বারা আরও জানা গেছে যে, আল্‌ফা রশ্মি হচ্ছে নিষ্ক্রিয় মৌলিক পদাথ হিলিয়াম পরমাণুর দ্রুত ধাবিত স্রোতমাত্র। হিলিয়ামের
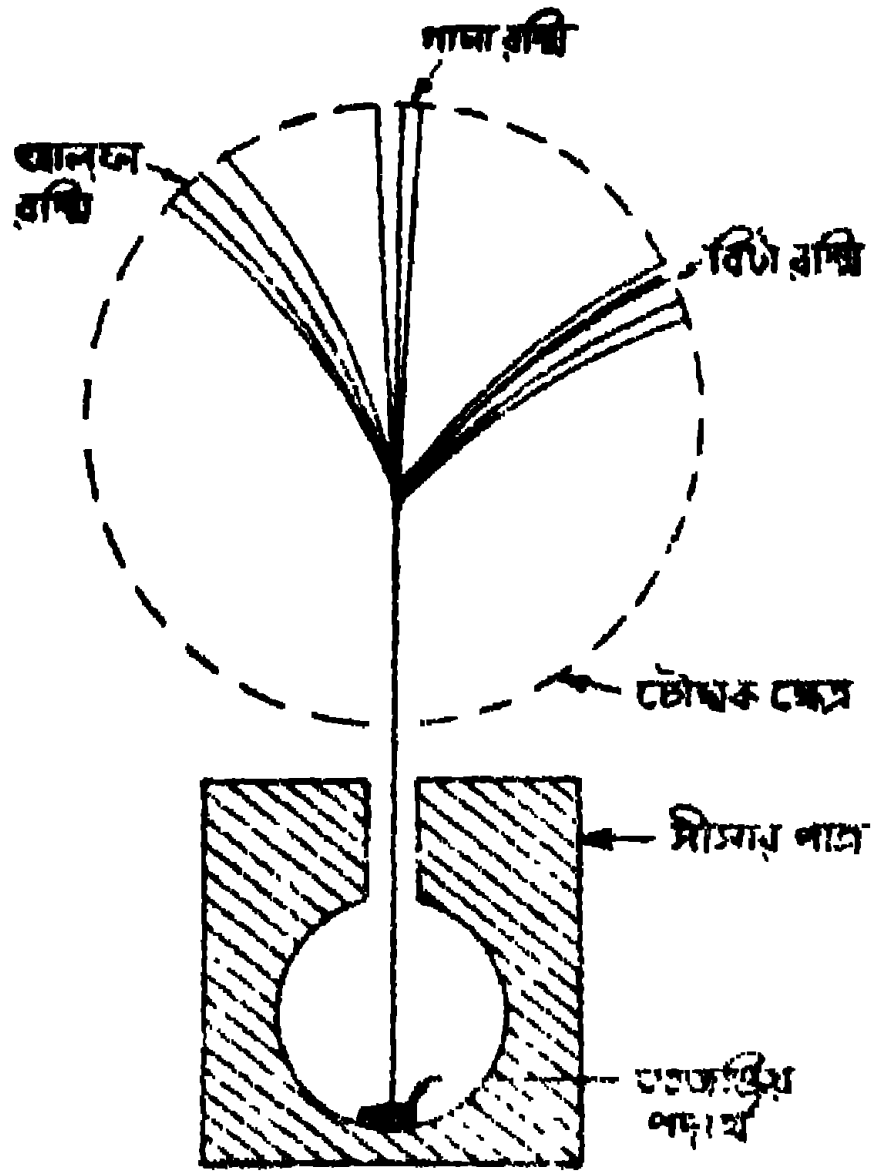
1 নং চিত্র

পারমাণবিক ভার হলো চার এবং আধান ধনাত্মক তড়িৎসম্পন্ন। আধানের মাত্রা হলো প্রায় $9{\cdot}58 \times 10^{-10}$ e. s. u.। নির্গত আল্‌ফা রশ্মির বেগও প্রচণ্ড—এমন কি, আলোর বেগের চেয়েও বেশী। আলোর বেগ প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় তিন লক্ষ কিলোমিটার। কোন তেজস্ক্রিয় মৌল থেকে প্রতি সেকেণ্ডে কতটা আল্‌ফা কণা বেরোয়, তা গাইগার-মুলার কাউন্টার, স্পিনথ্যারিস্কোপ বা ক্লাউড চেম্বারের সাহায্যে নির্ণয় করা যায়। রাদারফোর্ড ও গাইগারের পরীক্ষায় দেখা গেছে যে, এক গ্রাম রেডিয়াম থেকে সেকেণ্ডে প্রায় $0{\cdot}7 \times 10^{10}$ সংখ্যক (বা 37000,000,000) আল্‌ফা কণা নির্গত হয়। কোন তেজস্ক্রিয় মৌলিক পদার্থ থেকে আল্‌ফা কণা বেরিয়ে যাবার পর মৌলিক পদার্থটির তেজস্ক্রিয়তা ক্রমশঃ হ্রাস পেতে থাকে এবং আদি মৌলটির রূপান্তর ঘটে। রেডিয়ামের পারমাণবিক ভার হচ্ছে 226। রেডিয়াম থেকে আল্‌ফা রশ্মি বেরিয়ে যাবার পরে তা হয়ে যায় নিষ্ক্রিয় মৌলিক পদার্থ রেডন, যার পারমাণবিক ভার 222। কিন্তু সাধারণ মৌলিক পদার্থের বেলায় আমরা সে রকম কোন রূপান্তর দেখতে পাই না। যেমন—তামা চিরকাল তামাই থাকে, তামাকে কখনও সোনা করা যায় না।

কোন তেজস্ক্রিয় মৌলিক পদার্থের তেজস্ক্রিয়তা কি হারে হ্রাস পেতে থাকে, তার একটা হিসাব আমরা পেতে পারি সামান্য একটা সূত্রের সাহায্যে। যদি ধরা হয়,

N_o=পর্যবেক্ষণের প্রথম একক সময়ে নির্গত আল্‌ফা কণার সংখ্যা।

N_t=পর্যবেক্ষণের t সময় অতিক্রান্ত হবার পর আল্‌ফা কণার সংখ্যা একক সময়ে।

t—সময়

λ—ক্ষয়-ধ্রুব সংখ্যা (Decay-Constant)

e—ন্যাচার্যাল লগারিদম্‌-এর ভূমি

তাহলে,

$$N_t = N_o e^{-\lambda t}$$

কিন্তু সমীকরণটি সমাধান করে দেখা যায় যে, কোন তেজস্ক্রিয় পদার্থের তেজস্ক্রিয়তা হ্রাস পাবে (অর্থাৎ $N_t = o$) অনন্তকাল পরে (অর্থাৎ $t = \infty$)। এটা বাস্তবক্ষেত্রে হিসাব করা সম্ভব নয়। সে জন্যে সিদ্ধান্ত নেয়া হলো যে, কোন তেজস্ক্রিয় পদার্থের অর্ধ-পরিমাণ যে সময়ে ব্যয়িত হয়, সেই সময়কে (T) যদি অর্ধ-আয়ুষ্কাল ধরা

হয়, তবে $N_t = \frac{N_0}{2}$

তখন $\frac{N_0}{2} = N_0 e^{-\lambda T}$

অথবা, $\frac{1}{2} = e^{-\lambda T}$

অথবা, $e^{\lambda T} = 2$

উভয় পক্ষের লগারিদম নিয়ে,

$\log_e (e^{\lambda T}) = \log_e 2$

অথবা, $\lambda T = \log_e 2$

অতএব, $T = \frac{\log_e 2}{\lambda} = \frac{0.695}{\lambda}$

এবার দেখা যাক, তেজস্ক্রিয় পদার্থ রেডিয়ামের অর্ধ-আয়ুষ্কাল কত। রাদারফোর্ড ও গাইগারের পরীক্ষায় জানা যায় যে, এক গ্র্যাম রেডিয়াম এক সেকেণ্ডে প্রায় 3.7×10^{10} আলফা কণা ছেড়ে দেয়। আর এক গ্র্যাম রেডিয়ামে 2.7×10^{21} সংখ্যক পরমাণু থাকে।

$$\lambda Ra = \frac{3.7 \times 10^{10}}{2.7 \times 10^{21}} = 1.37 \times 10^{-11} \text{ sec.}^{-1}$$

$$T Ra = \frac{0.695}{\lambda Ra} = \frac{0.695}{1.37 \times 10^{-11}} \text{ sec.}$$

$$= 5 \times 10^{10} \text{ sec.} = 1600 \text{ বছর}$$

সুতরাং রেডিয়ামের অর্ধ-আয়ুষ্কাল হচ্ছে 1600 বছর। আবার এক গ্র্যাম ইউরেনিয়াম থেকে এক সেকেণ্ডে প্রায় 1.25×10^4 আল্‌ফা কণা নির্গত হয়।

সুতরাং, $\lambda U = 5 \times 10^{18}$ Sec.$^{-1}$

অতএব, $TU = \frac{0.695}{\lambda U} = 1.45 \times 10^{17}$ Sec.

$= 4.4 \times 10^9$ বছর

দেখা যাচ্ছে, ইউরেনিয়ামের অর্ধ-আয়ুষ্কাল চার-শ' চল্লিশ কোটি বছর।

বিটা রশ্মি ইলেকট্রন কণিকার এক দ্রুত গতি-সম্পন্ন স্রোত। বিটা রশ্মি অ্যালুমিনিয়াম ও অভ্রের পাতলা পাত অনায়াসে ভেদ করে চলে যেতে পারে। আর গামা রশ্মি হলো এক প্রকারের অদৃশ্য ক্ষুদ্র তরঙ্গের আলোক রশ্মি। গামা রশ্মির তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য হলো প্রায় 10^{-8} সেন্টিমিটার থেকে 10^{-11} সেন্টিমিটার পর্যন্ত।

মানুষের শরীরের উপর তেজস্ক্রিয়তার অসীম প্রভাব। অসাবধানতা বশতঃ একবার পকেটে তেজস্ক্রিয় ধাতু রেডিয়াম রেখে রেইস নামে একজন তরুণ বিজ্ঞানীর অকালমৃত্যু ঘটে। বিজ্ঞানী বেকারেল ভ্রমবশতঃ এক টুক্‌রা রেডিয়াম ধাতু পকেটে রেখে পরে দেখেন যে, পকেট-সংলগ্ন দেহের চামড়ার উপর পোড়া দাগবিশিষ্ট ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে। পিঁয়ের কুরী ও ম্যাডাম কুরী তেজস্ক্রিয় ধাতু নিয়ে গবেষণা করবার সময় দেখতে পান যে, বহু বার তাঁদের হাতের আঙুল ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে।

বর্তমানে বিভিন্ন দেশে বহু স্বল্প স্থায়ী কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় পদার্থ তৈরি হচ্ছে। কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় পদার্থ প্রস্তুত করবার সময় প্রয়োজন হয় সাইক্লোট্রোন, বিটাট্রোন বা সর্বাধুনিক প্রোটন সিনক্রোট্রন যন্ত্র। এই যন্ত্রের সাহায্যে প্রোটন, নিউট্রন, ডয়টেরন বা কোন কোন সময়ে আল্‌ফা কণিকাকে চল্লিশ লক্ষ ইলেকট্রন ভোল্ট থেকে প্রায় এক-শ' কোটি ইলেকট্রন ভোল্টে উত্তেজিত করা হয়। অতঃপর সেই উত্তেজিত কণিকার দ্বারা প্রচণ্ডভাবে আঘাত করা হয় মৌলিক পদার্থ সোডিয়াম, আয়োডিন, ক্রোমিয়াম, কোবাল্ট বা কার্বনের নিউক্লিয়াসকে, যার ফলে উক্ত পদার্থগুলি কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় পদার্থে পরিণত হয়। তেজস্ক্রিয় বা কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় পদার্থের মধ্যে কয়েকটি চিকিৎসা ক্ষেত্রে বিশেষভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় কোবাল্ট প্রচণ্ড গামা রশ্মি বিকিরণ করে। সেই প্রখর গামা রশ্মির সাহায্যে মস্তিষ্কের টিউমার ও ফুস্‌ফুসের ক্যান্সার সহজেই নিরাময় করা যায়। দুরারোগ্য ক্যান্সার ব্যাধি নিবারণে ব্যবহার করা হয় তেজস্ক্রিয় ধাতু

রেডিয়াম এবং কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় 'সোডিয়াম। তাছাড়া কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় আয়োডিন, তেজস্ক্রিয় পটাসিয়াম, তেজস্ক্রিয় ক্রোমিয়াম, তেজস্ক্রিয় স্ট্রনসিয়াম বিভিন্ন ব্যাধির চিকিৎসায় বিশেষ ফলপ্রদ। একটা আনন্দের কথা হচ্ছে এই যে, আমাদের দেশও তেজস্ক্রিয় ধাতুর ব্যবহারে পিছিয়ে নেই। কলিকাতার চিত্তরঞ্জন ক্যান্সার হাসপাতাল, চিত্তরঞ্জন ন্যাশন্যাল ক্যান্সার রিসার্চ সেন্টার, মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের সুযোগ্য চিকিৎসকমণ্ডলী এবং কলাকুশলীবৃন্দের তত্ত্বাবধানে সাফল্যের সঙ্গে বিশেষ কয়েকটি তেজস্ক্রিয় পদার্থ রোগ নিরাময়ে ব্যবহৃত হচ্ছে।

মঙ্গলগ্রহে অভিযান

অলকরঞ্জন বসুচৌধুরী

প্রতিদিন পূর্বাকাশে যে লাল নক্ষত্রটি দেখা যায়, মানুষের মহাশূন্য বিজয়ের বহু আগেই এখানে বুদ্ধিদীপ্ত প্রাণীর অস্তিত্ব সম্পর্কে বহু গল্পের অবতারণা হয়েছিল। তাই দুরবীন দিয়ে বিজ্ঞানীরা যখন এর গায়ে নানারকম লাল-কালো রেখা দেখতে পেলেন, তখন সকলেই ভাবলো এগুলি নিশ্চয়ই মঙ্গলগ্রহের অধিবাসীদের তৈরি খাল-বিল, যদিও প্রকৃতপক্ষে তা নয়। মঙ্গলগ্রহের ব্যাস পৃথিবীর ব্যাসের অর্ধেক আর এর আকাশে রয়েছে দুটি উপগ্রহ—ফোবোস আর ডিমস। মঙ্গলের একদিন হচ্ছে 24 ঘণ্টা 37 মিনিট আর তার বছর হয় 687 দিনে। পৃথিবী থেকে প্রায় তেরো কোটি মাইল দূরে বসে এতদিন এই গ্রহটি বিজ্ঞানীদের প্রলুব্ধ করেছে এবং গল্পলেখকদের প্রেরণা জুগিয়েছে।

যে ব্যক্তি মঙ্গলগ্রহ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক তথ্য কিছুই জানে না, তারও নিজের অজ্ঞাতসারে এমন একটা ধারণা রয়ে গেছে যে, মঙ্গলগ্রহে বুদ্ধিদীপ্ত প্রাণী থাকতে পারে। মঙ্গলগ্রহ তাই বহুদিন থেকেই মানুষের আত্মীয়। চাঁদ মানুষের বেশী সামনে আছে, সে মানুষের সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে স্থানও লাভ করেছে, কিন্তু চাঁদের দেশে মানুষ প্রাণের অস্তিত্ব কল্পনা করে না। এই দিক দিয়ে এই মঙ্গলগ্রহ দূরে থেকেও বেশী কাছাকাছি। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে জ্যোতির্বিজ্ঞানী অধ্যাপক লোয়েল ঘোষণা করেন যে, তিনি মঙ্গলগ্রহে একাধিক খাল দেখেছেন। আর যেহেতু এগুলি জ্যামিতিক আকারবিশিষ্ট, অতএব নিশ্চয়ই এগুলি উন্নত প্রাণীর দ্বারা তৈরি হয়েছে। তাঁরা দুরবীনের সাহায্যে দেখলেন যে, এক লাল আবরণে ঢাকা রয়েছে মঙ্গলগ্রহ।

লোয়েলের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ এলো বার্নার্ড ও পিকারিং-এর কাছ থেকে। পিকারিং-এর বক্তব্য হচ্ছে—শুধু জ্যামিতিক আকারের জন্যেই মঙ্গলগ্রহকে বুদ্ধিমান জীবের আবাস বলে ধরা যায় না, কত প্রাকৃতিক জিনিষেও তো জ্যামিতিক পারিপাট্য দেখা যায়! শনিগ্রহের বলয়টিও কি কোন প্রাণীর সৃষ্টি? একটি ফুলের পাঁপড়িতেও কি জ্যামিতিক নৈপুণ্য কিছু কম? মঙ্গলের পরিবেশে না গিয়ে তার বিবর্তন ধারা না জেনে শুধু ড্রাফ্‌ট্‌স্‌ম্যানের স্কেলে আঁকা কতকগুলি দাগ দেখেই এসব বিচার করা চলে না।

আরও নানারকম অভিমতের কথা শোনা গেল। লোয়েল মানমন্দিরের জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বললেন,

মঙ্গলের বায়ুমণ্ডল (গভীরতা 50 মাইল) অনেকটা পৃথিবীর মতই—কেবল জলীয় বাষ্প খুব বেশী। লিক মানমন্দিরের জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বললেন—না, জলীয় বাষ্প ওখানে থাকলেও তা নগণ্য। মাউন্ট উইলসন মানমন্দিরের জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বললেন—না, মঙ্গলে জলীয় বাষ্পও নেই, অক্সিজেনও নেই।

1954 সালে ই. সি. স্লিকার দক্ষিণ আফ্রিকার ব্লমফোঁ মানমন্দির থেকে মঙ্গলগ্রহের কুড়ি হাজার ছবি তুলে সিদ্ধান্ত করলেন যে, সেখানে প্রাণী আছে এবং ঋতুর পরিবর্তনও হয়। জ্যোতির্বিজ্ঞানী ডক্টর রিচার্ডসন 1956 সালের 10ই সেপ্টেম্বর খুব নিকট থেকে মঙ্গলগ্রহের ছবি তুলেছিলেন। তিনি তাতে কতকগুলি নীল রেখা দেখে বললেন, সেখানে অনেক নদী-খাল-বিল আছে।

মঙ্গলগ্রহ, না রহস্য গ্রহ? সীমাহীন রহস্য, তার কোন সমাধান হয় নি। দূরবীক্ষণ যন্ত্রে অনেকে যে সমুদ্র বা সুবিশাল জলরাজ্য দেখেছিলেন, সে কি ভুল—শুধু মায়া? বিস্তীর্ণ কালো এলাকাটা যদি জলরাজ্যই হয়, তবে মধ্যাহ্নেও সেই জলের গভীরে সূর্যের ছায়াপাত একদিনও হয় না কেন? এ কি স্পেক্ট্রোমিটারের গলদ—না মঙ্গলের লোহিতাবরণের ছলনা? স্তরে স্তরে যে মেঘপুঞ্জকে মঙ্গলগ্রহের আকাশে ঘুরে বেড়াতে দেখা গেছে, তা কি নিতান্ত চোখের ভুল? মঙ্গলগ্রহ রহস্যময়ী—দূর থেকে তার কিছুই বোঝবার উপায় নেই। তাই তার সামনে গিয়ে তাকে দেখে আসতে হবে।

মহাকাশচারণার যুগে সে সুযোগ পাওয়া গেল। মহাকাশযান দূরপাল্লায় যাত্রা করতে সক্ষম, কিন্তু তাতেও রহস্যের কিছুমাত্র সুরাহা হলো না। সর্বশেষ সাফল্য লাভ হলো মেরিনার-7-এর। অনেক নতুন তথ্য সে পৃথিবীতে পাঠিয়েছে, কিন্তু রহস্যের সমাধান তেমন কিছু একটা করতে পারে নি।

মঙ্গলের উদ্দেশ্যে রাশিয়ার প্রথম মহাকাশযান জোণ্ড-1 উড়লো 1962-এর 1লা নভেম্বর। 12 কোটি কুড়ি লক্ষ মাইল পাড়ি দেবার পর পৃথিবীর সঙ্গে তার বেতার যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে যায়। 1963 সালের ফেব্রুয়ারীতে রাশিয়া মঙ্গল-9 নামে আরেকটি সন্ধানী-রকেট উৎক্ষেপণ করে। সেই বছরই মার্চ মাসে যুক্তরাষ্ট্র তিন টন ওজনের একটা দূরবীন পৃথিবীর পনেরো মাইল উর্ধ্বে উৎক্ষেপণ করে। এর স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতির সাহায্যে জানা গেল যে, এই গ্রহের প্রবল বায়ুবেগসম্পন্ন আবহমণ্ডলে জলীয় বাষ্প শতকরা একভাগেরও কম। এই আবহাওয়ায় মানুষ বাঁচতে পারে না।

1964 সালে 5ই নভেম্বর যুক্তরাষ্ট্র মেরিনার-3 মঙ্গলের দিকে উৎক্ষেপণ করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়। আবার 28শে নভেম্বর যুক্তরাষ্ট্র মেরিনার-4 মহাকাশে পাঠায়। সেটির ওজন ছিল 575 পাউণ্ড—এতে একটা টেলিভিশন ক্যামেরা ছিল এবং গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় 24000 মাইল। তখন ঘোষণা করা হয় যে, মেরিনার-4 প্রায় সাড়ে সাত মাস পরে মঙ্গলগ্রহের ছবি পাঠাতে সুরু করবে। 1964 সালে যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় বিমানবিদ্যা ও মহাকাশ সংস্থার (NASA) অনুরোধে মঙ্গলগ্রহে জীবনের অস্তিত্ব সম্পর্কে একটি সমীক্ষা করা হয়। তার রিপোর্টে বলা হয় যে, মঙ্গলগ্রহে প্রাণের অস্তিত্ব থাকা সম্ভব।

1964 সালের 30শে নভেম্বর রাশিয়া বহু পর্যায়বিশিষ্ট একটি মহাকাশযান মহাকাশে প্রেরণ করে। সেটি একটি কৃত্রিম উপগ্রহকে কক্ষপথে স্থাপন করে এবং কক্ষ পরিক্রমারত সেই উপগ্রহটি থেকে আবার আরেকটি রকেট মঙ্গলগ্রহের দিকে উৎক্ষিপ্ত হয়। 7ই ডিসেম্বর রাশিয়ার জোণ্ড-2-এর আগে মেরিনার-4 ধাবিত হচ্ছে বলে জানা যায়।

মঙ্গলগ্রহে নামলে (যদিও তা এখন পর্যন্ত সুদূরপরাহত) মানুষ কি দেখবে? তা বলা খুবই

কঠিন। মঙ্গলগ্রহ সম্পর্কে এক মত আজ পর্যন্ত কেউই হতে পারেন নি। তবুও কষ্টসাধ্য অনুমানের সাহায্যে মানুষ মঙ্গলগ্রহের আবহাওয়া সম্পর্কে কিছুটা জানতে পেরেছে, তবে যে কোন মুহূর্তে এই ধারণাও বদ্‌লে যেতে পারে।

মাধ্যাকর্ষণ সেখানে পৃথিবীর অর্ধেক। শীত ও গ্রীষ্মের স্থিতিকাল পৃথিবীর দ্বিগুণ। গড়পড়তা তাপ পৃথিবীর শূন্য ডিগ্রীরও নীচে। তাপমাত্রা দিনে 50° এবং রাতে −90° ফারেনহাইট। আর আকাশে জ্বলজ্বল করছে একসঙ্গে দুটি চাঁদ। এই রকম আবহাওয়ায় শ্যাওলা ছাড়া আর অন্য কোন প্রাণের বিকাশ সম্ভব নয়। সেখানে কি রয়েছে? নিষ্প্রাণ তুষার রাজ্য, না অন্তহীন উষর মরুভূমি—তা সামনে গিয়ে দেখে আসবার জন্যেই মেরিনার-4 যাত্রা করেছিল।

অবশেষে 1965 সালে 14ই জুলাই মেরিনার-4 আট মাস ধরে 13 কোটি 34 লক্ষ মাইল পরিভ্রমণের পর মঙ্গলগ্রহের কাছ থেকে তার প্রথম ছবি পাঠায়। একটি মাত্র টি-ভি-ক্যামেরা দিয়ে মঙ্গলগ্রহের নিকটতম এবং স্পষ্টতম 22টি ছবি তুলে মেরিনার পৃথিবীতে পাঠিয়েছে, কিন্তু জীবন-রহস্যের সমাধান করা তারও সাধ্য হয় নি। তবে অনেক নতুন তথ্য এবং রহস্যের সন্ধান মিলেছে।

প্রথম ছবিটা ছিল মঙ্গলের কেলেশ্রা মরুর, এটাতে পাহাড়ের কোন চিহ্ন ছিল না। মেরিনার-4 অনেক মূল্যবান তথ্যও পাঠিয়েছে। মঙ্গলগ্রহে নাকি চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রাবল্য নগণ্য। মঙ্গলগ্রহকে ঘিরে পৃথিবীর ভ্যান অ্যালেন বলয়ের মত কোন বিকিরণ বলয় নেই। মঙ্গলগ্রহের মাটিতে তেজস্ক্রিয়তা আছে, কিন্তু মানুষের পক্ষে তা ক্ষতিকর নয়। মেরিনার-4-এর পাঠানো এক-একটা ছবিতে মঙ্গলগ্রহের এক শতাংশেরও কম অংশ ধরা পড়ে। সম্পূর্ণ মঙ্গলগ্রহের রূপ পেতে হলে অন্ততঃ ওরকম চার হাজার আলোকচিত্রের দরকার। একটা ছবি পাঠাতে সময় লাগে অন্ততঃ আট ঘণ্টা।

মঙ্গলের দ্বিতীয় ও চতুর্থ ছবি বিশ্লেষণ করে জানা গেছে যে, সেখানে জীবাণুজাতীয় জীবনের অস্তিত্ব থাকা সম্ভব। পৃথিবীর তিরিশ হাজার মিটার উর্ধ্বে বায়ুর চাপ যত, মঙ্গলগ্রহেও বায়ুর চাপ তত। মঙ্গলগ্রহের বায়ুমণ্ডলে নাইট্রোজেন রয়েছে 72%, কার্বন ডাই-অক্সাইড 1% এবং নিষ্ক্রিয় গ্যাস আর্গন 8%। এই ছবিগুলিতে পাহাড়, আগ্নেয়গিরি ও গহ্বরের রূপ ফুটে উঠেছে। তৃতীয় ছবিটিতে একটা আগ্নেয়গিরি দেখা গেছে। দিনের বেলায় সূর্যকিরণের মুখামুখি হওয়া সত্ত্বেও তার গহ্বরটা দেখা গেছে অন্ধকারাচ্ছন্ন। এটা একটা নতুন রহস্য। মেরিনার-4 প্রেরিত সঙ্কেতগুলি থেকে জানা গেছে যে, পৃথিবীর চেয়ে চন্দ্রের সঙ্গেই মঙ্গলের সাদৃশ্য বেশী। সেখানে সুবিস্তৃত জলাশয় বা শ্যামল বনাঞ্চল নেই, শুধু রুক্ষ পাহাড়, শুষ্ক গিরি-গহ্বর—যা জীবন-বিকাশের পক্ষে অনুপযোগী। সুতরাং মঙ্গলগ্রহে খালের অস্তিত্বের কথা নিছক কল্পনা মাত্র। অবশ্য মেরিনার-4 প্রেরিত প্রথম 10টি ছবি পাবার পর—কোন কোনটিতে কালো দাগ দেখে বিজ্ঞানীরা বলেছিলেন যে, সেখানে গাছপালা থাকতে পারে। হয়তো মঙ্গলের মাধ্যাকর্ষণ সম্পর্কে মানুষের আগের ধারণা ঠিক নয়, তার মাধ্যাকর্ষণ আরও বেশী। কারণ মঙ্গলগ্রহের দিগন্ত অতিক্রম করতে মেরিনার-4-এর যে সময় লাগবে ধরা হয়েছিল, তার বেশী সময় লেগেছে।

মেরিনার-4-এর পাঠানো তথ্যের পরেও জেট প্রপালশন লেবরেটরীর জীব-বিজ্ঞানী সোফেন বলেছেন—আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, মঙ্গলগ্রহে জীবন আছে। মঙ্গলগ্রহের প্রতিকূল পরিবেশ সত্ত্বেও সেখানে প্রাণ থাকতে পারে। কারণ দারুণ প্রতিকূল অবস্থায় বাঁচতে পারে, এমন জীবাণুও তো পৃথিবীতেই আছে। সোফেনের মতে, জীবন-বিবর্তনের পরিবেশের দিক দিয়ে মঙ্গলগ্রহ পৃথিবী ও চাঁদের মাঝামাঝি।

এর পর দীর্ঘদিন মঙ্গলগ্রহে আর কোন অভিযান হয় নি। অবশেষে 1969 সালে আবার অভিযান সুরু হয়। ঐ বছরের অগাষ্টের প্রথম দিকের কাছাকাছি সময়ে উৎক্ষিপ্ত যুক্তরাষ্ট্রের দুটি মহাকাশযান মেরিনার-6 ও মেরিনার-7 মঙ্গলগ্রহের সর্বাধিক দুই হাজার মাইল কাছে এসে ছবি পাঠাতে সুরু করে। ছবিগুলির বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, এই প্রথম ছয় কোটি মাইল দূরের (অর্থাৎ প্রথম দিকের দূর থেকে তোলা ছবিগুলি) ছবি টেপ-রেকর্ড না করে সরাসরি পৃথিবীর টেলিভিশন পর্দায় দেখা সম্ভব হয়। ছবি থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদি বিশ্লেষণ করে প্রথমেই জীবনের অস্তিত্ব সম্পর্কে নিরাশ হতে হয়। কারণ মেরিনার-6 স্পষ্টই জানিয়ে দেয় যে, পৃথিবীতে প্রাণের যে মৌল উপাদান অর্থাৎ নাইট্রোজেনের কোন অস্তিত্বই মঙ্গলগ্রহের আবহমণ্ডলের কোন স্তরেই নেই। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, মেরিনার-4 জানিয়েছিল যে, ওখানে শতকরা 72 ভাগই নাইট্রোজেন। মেরিনার-6 মঙ্গলের বিষুবরেখা বরাবর উড়ে যায় এবং জানায় যে, পৃথিবীর দূরবীনে দেখা নীলাভ মেঘ বা ঐ জাতীয় কিছু ওখানে নেই। তবু বিজ্ঞানীরা ফটোতে লক্ষ্য করলেন মঙ্গলের দক্ষিণ মেরু শীর্ষে ক্ষীণতণু এক শ্বেত কীরিট। তাঁরা মেরিনার-7-কে এই ব্যাপারের খোঁজ নিতে নির্দেশ দিলেন। হয়তো বা ওটা মেঘ কিংবা পৃথিবীর মেরুর মতই বরফ—জল থাকলে প্রাণও নিশ্চয় থাকতে পারে। কিন্তু সপ্তম মেরিনার তেমন কোন তথ্য সংগ্রহ করতে পারে নি। মেরিনার-6-এর সংগৃহীত তথ্যে জানা যায়, মঙ্গলগ্রহের নিম্নতর আবহমণ্ডলে জলীয় বাষ্প ও জমাটবদ্ধ জলের অতি ক্ষীণ প্রমাণ পাওয়া গেছে। তাছাড়া আর কোন তথ্যই জীবনের ইঙ্গিত দেয় না। অন্যান্য তথ্য বিশ্লেষণ করে জানা যায়—মঙ্গলগ্রহে নদী, পাহাড়, সমুদ্র ও উপত্যকা নেই—শুধু আছে গভীর ও অগভীর গোলাকার খাদ। এথেকে বোঝা যায় যে, অতীতেও সেখানে কোন দিন জল বা সমুদ্র ছিল না। শুধু মেঘপুঞ্জ নয়, মঙ্গলগ্রহের কোথায়ও লতাগুল্মেরও কোন সন্ধান পাওয়া যায় নি। পৃথিবী থেকে দেখা ছোট-বড় খালগুলি মাত্র দু-হাজার মাইল দূর থেকে দেখে মেরিনার জানায় যে, ওগুলি নাকি মঙ্গলগ্রহের পৃষ্ঠে রঙীন ছায়া মাত্র। এই সমস্ত তথ্যই মঙ্গলগ্রহে কোন প্রাণ বা বুদ্ধিদীপ্ত জীবের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমাদের নিরাশ করে। এর পর মেরিনার-7 খবর পাঠায় যে, মঙ্গলগ্রহে দক্ষিণ-মেরু অঞ্চলে সে মিথেন ও অ্যামোনিয়া গ্যাসের সন্ধান পেয়েছে। এথেকে বিজ্ঞানীদের সিদ্ধান্ত হলো—সেখানে কোন না কোন ধরণের জীবনের অস্তিত্ব থাকতে পারে; অর্থাৎ এক কথায় ষষ্ঠ এবং সপ্তম মেরিনারও মঙ্গলগ্রহে জীবনের অস্তিত্বের সমস্যার কোন কিনারা করতে পারে নি।

মঙ্গলগ্রহে অভিযানের পূর্ববর্ণিত ঘটনাগুলি এবং তার ফলে প্রাপ্ত তথ্যগুলি বিচার করলে স্পষ্টই দেখা যাবে যে, এক বারের সিদ্ধান্তের সঙ্গে অন্য বারের সিদ্ধান্তের কোন মিল নেই। এক বার যে ধারণা ধূলিসাৎ হয়েছে, পরের বার তা আবার গড়ে উঠেছে, তারপর হয় তো তা আবার বাতিল হয়েছে। একজন যে সিদ্ধান্ত করলেন, পরক্ষণেই হয়তো আর একজন তার উল্টো সিদ্ধান্তই করে বসলেন। সুতরাং মঙ্গলগ্রহ সম্বন্ধে সঠিক খবর আজ পর্যন্ত জানা যায় নি। আর মঙ্গলগ্রহের মাটিতে না নামলে সেটা বোধ হয় সম্ভবও নয়। মঙ্গলগ্রহের মাটিতে পৃথিবীর মহাকাশযান এখনও নামে নি। যতদিন না মঙ্গলগ্রহের সব বিষয়ে সকলে নিঃসন্দেহ হচ্ছেন, ততদিন মঙ্গলগ্রহে নামতে সাহস করাটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। কারণ এর নানা সুবিধা-অসুবিধা আছে। মঙ্গলগ্রহে অবতরণ করাটা সেদিক দিয়ে সময়সাপেক্ষ। কিন্তু মঙ্গলগ্রহে নামবার পরিকল্পনা মানুষের মনে আগেই এসে গেছে। মঙ্গলগ্রহে

নামবার জন্যে 1965 সালে দুজন সোভিয়েট বিজ্ঞানী কৃত্রিম উপায়ে মঙ্গলের আবহাওয়া, (তাপাঙ্ক, তেজস্ক্রিয় বিকিরণ ও চাপ) পৃথিবীরই লেবরেটরীতে সৃষ্টি করে পার্থিব জীবের উপর তার প্রতিক্রিয়া পরীক্ষা করেছেন। এই কৃত্রিম মঙ্গলগ্রহে অতিবেগুনী রশ্মির ক্ষয়-ক্ষতি থেকে সবচেয়ে বেশী আত্মরক্ষা করতে পেরেছে, কয়েকটি আদিম জৈব পদার্থ। মানুষ আজ চাঁদে নেমেছে। চাঁদের পরে লক্ষ্য হবে মঙ্গলগ্রহ। কিন্তু তার আগে মঙ্গগ্রলহের জমি ও পরিবেশ সম্পর্কে ভাল করে জ্ঞান আহরণ করতে হবে। অসংখ্য পরস্পর বিরোধী তথ্যের জট খুলে প্রকৃত তথ্যটি খুঁজে বের করতে হবে। এপর্যন্ত দেখা গেছে যে, মঙ্গলগ্রহ সম্পর্কে রাশিয়ার চেয়ে যুক্তরাষ্ট্রই বেশী তথ্য সংগ্রহ করেছে। মঙ্গলগ্রহে রুশ অভিযানগুলির ফলাফল সম্পর্কে কোন খবর পাওয়া যায় নি; হয় সেগুলি ব্যর্থ হয়েছে, কিংবা রুশ বিশেষজ্ঞেরা প্রাপ্ত তথ্যগুলি গোপন রেখেছেন। রুশ ও মার্কিন উভয়েই স্বীকার করেছেন যে, মঙ্গলগ্রহে যাবার কর্মসূচী তাঁদের রয়েছে।

মঙ্গলগ্রহের যাত্রীকে প্রথমেই নানা অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে। মঙ্গলগ্রহে গিয়ে ফিরে আসতে যে সুদীর্ঘ সময় লাগে, তাতে তাকে অস্বস্তিকর ভারশূন্যতার মধ্যে কাটাতে হবে। এছাড়া দূর-পাল্লার যাত্রার জন্যে চাই বৃহদাকৃতির মহাকাশযান। এতে জ্বালানীও লাগবে বেশী। তাই এর নির্মাণকার্য হবে সময় ও অর্থসাপেক্ষ।

মঙ্গলগ্রহের মত দূরগ্রহে যাত্রা করতে মহাশূন্যে স্থায়ী ভাসমান স্পেসপ্ল্যাটফর্ম চাই—যা মানুষ এখনও তৈরি করতে পারে নি। মঙ্গলগ্রহে নেমে ফিরে আসবার ব্যাপারে মানুষ এখনও সাফল্য লাভ করে নি। বৃহৎ ও ভারী মহাকাশযান সরাসরি উৎক্ষেপণ করা দুঃসাধ্য, তাই তাকে টুকরা টুকরা করে মহাকাশে পাঠিয়ে তারপর জোড়া লাগিয়ে নিতে হবে। মানুষ অনেক দিন পূর্বেই তা পরিকল্পনা করেছে, কিন্তু এখনও সেই কাজে সাফল্য লাভে সক্ষম হয় নি। চাঁদে নেমে ফিরে আসবার জন্যে যাত্রা করা সহজ, কিন্তু মঙ্গলে নেমে আবার যাত্রা করতে হলে শক্তিশালী উৎক্ষেপণ ব্যবস্থার প্রয়োজন। কারণ মঙ্গলগ্রহে মাধ্যাকর্ষণ চাঁদের তুলনায় বেশী। চাঁদের মত আবহাওয়াশূন্য নয় বলে মঙ্গলগ্রহে নামবার জন্যে ব্রেক-ব্যবস্থা কার্যকর করা সহজতর হবে। কিন্তু অসুবিধাও আছে। মঙ্গলের মাধ্যাকর্ষণ ও ওজন চাঁদের তুলনায় বেশী বলে চাঁদ থেকে চান্দ্রযানকে ওঠবার জন্যে যে নিষ্ক্রমণ-বেগ (Escape velocity) দরকার হয়েছিল, মঙ্গলগ্রহে প্রয়োজন হবে তার চেয়ে অনেক বেশী। মঙ্গলগ্রহ প্রত্যাগত মহাকাশযান তাই খুব জোরে পৃথিবীর আবহমণ্ডলে প্রবেশ করবে, ফলে মহাকাশযানে ঘর্ষণজনিত তাপের সৃষ্টি হবে।

আরেকটা অসুবিধা হচ্ছে এই যে, মঙ্গলগ্রহ সব সময় সুবিধাজনক স্থানে থাকে না। একটা সময় আসে যখন সূর্য, পৃথিবী ও মঙ্গল একই সরলরেখায় থাকে। এই লগ্নকে বলে প্রতিযোগ। এটা মোটামুটি দু-বছরে একবার ঘটে থাকে। কিন্তু সবচেয়ে ভাল সময় হচ্ছে মহাপ্রতিযোগ, যখন মঙ্গলগ্রহ পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে আসে। 15 থেকে 17 বছর পরপর এই মহাপ্রতিযোগ ঘটে থাকে। এই সময়েই মঙ্গলগ্রহে অভিযান চালানো সবচেয়ে সুবিধাজনক। কারণ মঙ্গলগ্রহ পৃথিবীর সামনে আসবার ফলে যাত্রাসংক্রান্ত খরচ এবং সময় খুবই কম লাগবে। পরবর্তী মহাপ্রতিযোগ ঘটবে 1971 সালে। ততদিনে মঙ্গলগ্রহ অভিযানের সমস্ত ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হবে কি না, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। তার পরে 1973, 1975, 1981 এবং 1935 সালে আরও কয়েকটি প্রতিযোগ আছে। 1971-এর মহাপ্রতিযোগে যে উৎক্ষেপণ

শক্তির দরকার হবে, 1981-এর প্রতিযোগে হবে তার তিন গুণ। 1975 সালে মঙ্গলগ্রহাভিযানের কোন সম্ভাবনা নেই, যদি না এই সংক্রান্ত কারিগরী কলাকৌশলের ক্ষেত্রে এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কোন উন্নতি সাধিত হয়।

রকেটের জ্বালানী প্রথম যুগে ছিল কঠিন। ডক্টর গোডার্ড প্রথম ব্যবহার করেন তরল জ্বালানী। আর এখন যদি পারমাণবিক জ্বালানী ব্যবহার করা যায়, তবে দূর গ্রহে যাত্রা সহজ হয়ে যাবে। কিন্তু এখনকার বিজ্ঞানীর চিন্তার বিষয় সেটা নয়। সুতরাং কার্য সূচীটা দাঁড়াচ্ছে এইরকম—1969 সালে চন্দ্রজয়ের পর মঙ্গলগ্রহ জয়—1975 সালে কিংবা 1985 সালে হতে পারে।

মঙ্গলগ্রহে অবতরণ করবার জন্যে পরিকল্পনা রচিত হয়েছে। 100 বা 200 দিন ধরে যাত্রা শেষে মহাকাশযান মঙ্গলগ্রহের কক্ষে স্থাপিত হয়ে গ্রহটিকে পরিক্রমা করতে থাকবে। তখন মহাকাশযানটি দু-ভাগে বিভক্ত হয়ে যাবে। মূল অংশটি কক্ষ পরিক্রমা-করতে থাকবে আর অন্য অংশটি গিয়ে উপস্থিত হবে মঙ্গলগ্রহে। মহাকাশযান থেকে নেমে মঙ্গলগ্রহের যাত্রীরা তাঁদের পর্যবেক্ষণ ও তথ্য সংগ্রহ শেষ করে আবার মঙ্গলযানে চড়ে উড়ে গিয়ে যুক্ত হবেন কক্ষ-পরিক্রমারত মূল যানের সঙ্গে। তার পর আরেকটি রকেট-ইঞ্জিন তাকে পাঠিয়ে দেবে পৃথিবীর দিকে অর্থাৎ মানুষের চন্দ্র-অভিযানের সঙ্গে এই পরিকল্পনাটির মূলতঃ কোন প্রভেদ নেই।

অবশ্য আর একটা পরিকল্পনা একটু সহজতর। মহাকাশযানটি সোজা গিয়ে নামবে মঙ্গলগ্রহের দুটি উপগ্রহের যে কোন একটিতে এবং তার পর সেখান থেকে হিসাব মত মঙ্গলগ্রহের যে কোন স্থানে গিয়ে অবতরণ করবে।

মঙ্গলগ্রহে প্রাণ আছে এবং নেই—এই দু-রকম মতই সমভাবে উচ্চারিত হয়েছে। এখন পর্যন্ত উভয় মতের স্বপক্ষে বা বিপক্ষে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নি। সুতরাং মঙ্গলগ্রহ সম্বন্ধে মানুষের কৌতূহল অসীম।

মানুষ আজ যখন চাঁদে নেমেছে, তখন এটাও ধরে নেওয়া যায় যে, মঙ্গলগ্রহে একদিন মানুষের অবতরণও প্রায় সুনিশ্চিত।

সঞ্চয়ন

1971 সালে আমেরিকার মহাকাশ অভিযানের কার্যসূচী

আমেরিকার মহাকাশ ও বিমান বিজ্ঞান বিষয়ক সংস্থা ন্যাশন্যাল এরোনটিক্স অ্যাণ্ড স্পেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (সংক্ষেপে নাসা) 1971 সালের মহাকাশ অভিযান সম্পর্কে কার্যসূচী প্রকাশ করেছেন। এতে জানা যায়, আলোচ্য বছরে চন্দ্রাভিমুখে দুটি মনুষ্যবাহী অ্যাপোলো যান আর দুটি যাত্রীবিহীন স্বয়ংক্রিয় মহাকাশযান প্রেরণ করা হবে। যাত্রীবিহীন স্বয়ংক্রিয় মহাকাশযান প্রেরণ করা হবে মঙ্গল গ্রহাভিমুখে। এছাড়া অন্যান্য রাষ্ট্রের সহযোগিতায়ও নয়টি তথ্যসন্ধানী উপগ্রহ মহাকাশে উৎক্ষিপ্ত হবে। তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 1971 সালে 19টি কৃত্রিম উপগ্রহ বিভিন্ন গ্রহাভিমুখে ও মহাকাশে প্রেরণ করবার লক্ষ্য স্থির করেছেন। মঙ্গলগ্রহের কক্ষপথে

মেরিনার 8 ও 9 নামক দুটি উপগ্রহ স্থাপন করা হবে। ঐ গ্রহের কক্ষপথে কোন কৃত্রিম উপগ্রহ স্থাপনের চেষ্টা এর আগে আর হয় নি।

এই কার্যসূচী অনুসারে 1971 সালের প্রথম চন্দ্রাভিযান সুরু হয়েছে 31শে জানুয়ারী। অ্যাপোলো-14 মহাকাশযানে অ্যালান বি. শেপার্ড, ষ্টুয়ার্ট এ. রুশা এবং এডগার ডি. মিচেল চন্দ্রাভিমুখে যাত্রা করেছেন।

25শে জুলাই (1971) সুরু হবে এই বছরের দ্বিতীয় চন্দ্রাভিযান। ঐ সময়ে অ্যাপোলো-15 মহাকাশযানে মহাকাশচারী ডেভিড ডি. স্কট, আলফ্রেড এম. ওয়ার্ডেন এবং জেমস বি. আরউইন একটি বিদ্যুচ্চালিত গাড়ী নিয়ে যাবেন। ঐ গাড়ীটি চন্দ্রপৃষ্ঠে নামানো হবে এবং ঐ গাড়ীতে মহাকাশচারীদ্বয় চন্দ্রপৃষ্ঠে ঘুরে বেড়াবেন এবং উপকরণাদি সংগ্রহ করবেন।

মঙ্গলগ্রহের কক্ষপথে মেরিনার উপগ্রহ স্থাপনের কাজ এই বছরেরই মে মাসে হবে। কেপ কেনেডী থেকে মঙ্গল গ্রহাভিমুখে মেরিনার-8 উপগ্রহটি মহাকাশে উৎক্ষিপ্ত হবে, মেরিনার-9টি ছাড়া হবে এর কয়েক দিন পরে। পৃথিবী থেকে যাত্রা করে প্রায় ছ-মাস পরে ঐ দুটি উপগ্রহ মঙ্গলগ্রহে গিয়ে পৌঁছুবে। পৃথিবী থেকে নির্দেশ দিয়ে এই দুটি কৃত্রিম উপগ্রহকে মঙ্গলের কক্ষপথে স্থাপন করা হবে। ঐ উপগ্রহদ্বয়ের স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতির সাহায্যে মঙ্গলপৃষ্ঠের 1000 মাইল উর্ধ্বে থেকে ঐ গ্রহের প্রায় 70 ভাগ স্থানের ছবি তোলা হবে।

বিভিন্ন রাষ্ট্রের সহযোগিতায় তথ্যসন্ধানী মহাকাশযান উৎক্ষেপণের পরিকল্পনা—জাতীয় বিমান বিজ্ঞান ও মহাকাশ সংস্থা বা নাসা বিশ্বের বিভিন্ন সংস্থার সহযোগিতায় 1971 সালে আরও কয়েকটি কৃত্রিম উপগ্রহ মহাকাশে উৎক্ষেপণ করবার পরিকল্পনা করা হয়েছে।

পৃথিবীর 71টি রাষ্ট্রের সংস্থা ইন্টারন্যাশন্যাল টেলিকমিউনিকেশন কন্সরটিয়ামের পক্ষ থেকে ইনটেলস্যাট নামে বার্তাবহ উপগ্রহ পৃথিবীর কক্ষপথে স্থাপন করা হবে। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে বার্তার আদান-প্রদানের উদ্দেশ্যে এর আগে আরও কয়েকটি এই ধরণের উপগ্রহ পৃথিবীর কক্ষপথে স্থাপন করা হয়েছে। ন্যাটো-2 নামে আর একটি বার্তাবহ উপগ্রহ উৎক্ষিপ্ত হবে। দূরাঞ্চলের সঙ্গে বার্তা আদান-প্রদানের উদ্দেশ্যে এই উপগ্রহটি মহাকাশে স্থাপিত হবে। উত্তর আটলাণ্টিক চুক্তি সংস্থার অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্রসমূহ কর্তৃক এই উপগ্রহ সংক্রান্ত সকল কাজকর্ম নির্বাহ হবে।

25শে ফেব্রুয়ারী মহাকাশের চৌম্বক ক্ষেত্র, সৌর ঝঞ্ঝা বা সোলার উইণ্ড এবং মহাকাশ সম্পর্কে অন্যান্য তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে এই ইন্টার-প্ল্যানেটারী মনিটারিং প্ল্যাটফর্ম সংক্ষেপে আই-এম-পি-1 নামে একটি উপগ্রহ মহাকাশে উৎক্ষিপ্ত হবে। তারপর ফেব্রুয়ারী মাসেই সৌর তেজ-ক্রিয়া বা সোলার রেডিয়েশন সম্পর্কে তথ্যানু-সন্ধানের উদ্দেশ্যে সোলর্যাড নামে একটি উপগ্রহ প্রেরণ করা হবে। এই ধরণের উপগ্রহ এর আগে আর মহাকাশে প্রেরণ করা হয় নি। মার্চ মাসে আয়নমণ্ডল সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ক্যানাডা ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিলিত উদ্যোগে আইসিস-বি নামে একটি উপগ্রহ মহাকাশে উৎক্ষিপ্ত হবে।

পৃথিবী থেকে বহু দূরে যে সকল গ্রহ-তারকা রয়েছে, মহাকাশের সেই সকল অঞ্চল সম্পর্কে আজ পর্যন্ত খুব কম তথ্যই জানা গেছে। মহাকাশের ঐ সকল অঞ্চল সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের পন্থা উদ্ভাবনের উদ্দেশ্যে পরীক্ষামূলকভাবে প্ল্যানেটারী অ্যাট-মোস্ফিয়ার এক্সপেরিমেন্টস টেষ্ট (সংক্ষেপে পি-এ-ই-টি) নামে আর একটি উপগ্রহও মার্চ মাসেই উৎক্ষেপন করা হবে।

এপ্রিল মাসে মেঘ সম্পর্কে তথ্যা-

সন্ধানী উপগ্রহ উৎক্ষিপ্ত হবে। এই কৃত্রিম উপগ্রহটির নাম ব্যারিয়ান এরোসোলস। অল্প শক্তিসম্পন্ন রকেটের সাহায্যে এটিকে পৃথিবীর কক্ষপথে আয়নমণ্ডলের নিম্নাঞ্চলে স্থাপন করা হবে। পশ্চিম জার্মেনী ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিলিত উদ্যোগে এই উপগ্রহটি মহাকাশে উৎক্ষিপ্ত হবে। এপ্রিল মাসেই সূর্য সম্পর্কে তথ্যসন্ধানী আর একটি সৌর মানমন্দির বা সোলার অবজারভেটরী নামক কৃত্রিম উপগ্রহ মহাকাশে প্রেরণ করা হবে। এটি হবে ঐ পর্যায়ের সপ্তম কৃত্রিম উপগ্রহ।

মে মাসে তারকামণ্ডলী সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইটালীর মিলিত উদ্যোগে সায়েণ্টিফিক স্যাটেলাইট (সংক্ষেপে এস. এস. এ.) নামক একটি কৃত্রিম উপগ্রহ মহাকাশে উৎক্ষিপ্ত হবে। আফ্রিকার কেনিয়া রাষ্ট্রের উপকূল থেকে বেশ কিছু দূরে সমুদ্রে অবস্থিত একটি জাহাজ থেকে এই কৃত্রিম উপগ্রহটিকে মহাকাশ অভিমুখে প্রেরণ করা হবে।

জুন মাসে যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের সহযোগিতায় প্রেরিত হবে ইউ. কে. নামে একটি কৃত্রিম উপগ্রহ। ইলেকট্রন, প্রোটন, কসমিক নয়েজ, বাজ পড়বার শব্দ, আয়নমণ্ডল এবং মহাশূন্যের নিকটবর্তী অঞ্চল সম্পর্কে নানা তথ্যাদি সংগ্রহের জন্যে এই উপগ্রহটি উৎক্ষেপণ করা হবে। জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে উৎক্ষিপ্ত হবে আর একটি ইনটেলস্যাট নামক বার্তাবহ কৃত্রিম উপগ্রহ।

সেপ্টেম্বর মাসে চৌম্বক ঝড় সম্পর্কে এফরল নামক একটি বৈজ্ঞানিক তথ্যসন্ধানী উপগ্রহ প্রেরণের পরিকল্পনা করা হয়েছে। আমেরিকার ম্যাসাচুসেট্স্ অঙ্গরাজ্যের কেম্ব্রিজে অবস্থিত বিমান বাহিনীর গবেষণাগার কর্তৃক এটি নির্মিত হচ্ছে।

1971 সালের অক্টোবর, নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসের মধ্যে প্রেরিত গ্রহ-নক্ষত্র সম্পর্কে তথ্য-সন্ধানী কৃত্রিম উপগ্রহ অরবিটিং অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল অবজারভেটরী বা সংক্ষেপে ও-এ-ও। এর আগে ঐ ধরণের আরও দুটি উপগ্রহ মহাকাশে উৎক্ষিপ্ত হয়েছে।

1971 সালে একেবারে শেষের দিকে ফ্রান্সের সহযোগিতায় আবহবিজ্ঞান সম্পর্কে কোঅপারেটিভ অ্যাপ্লিকেশনস স্যাটেলাইট (সংক্ষেপে সি. এ. এস) নামক একটি কৃত্রিম উপগ্রহ মহাকাশে উৎক্ষিপ্ত হবার কথা আছে।

ভারতের সংবাদ-জ্ঞাপন ব্যবস্থা

স্বাধীনতা লাভের পর ভারতের সংবাদ-জ্ঞাপন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ খুবই উল্লেখযোগ্য। ভারতের ডাক ও তারযোগে সংবাদ প্রেরণের ব্যবস্থা সম্ভবতঃ পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম। 1970 সালের 1লা জুলাই পর্যন্ত ভারতে ডাকঘরের সংখ্যা ছিল 1,05,433। তাছাড়া আছে ভ্রাম্যমান এবং নৈশ ডাকঘরের ব্যবস্থা। কাশ্মীরের ঝিলাম নদীতে একটি ভাসমান ডাকঘর আছে।

ভারতে 14,925টিরও বেশী টেলিগ্রাফ অফিস আছে এবং 1970 সালের 31শে মার্চ পর্যন্ত ভারতে টেলিফোনের সংখ্যা ছিল 11·75 লক্ষ। 1969 সালের 31শে ডিসেম্বর পর্যন্ত দেবনাগরী কী-বোর্ডের 600 টেলিপ্রিন্টার সহ মোট টেলিপ্রিন্টারের সংখ্যা ছিল 1,22,011। ভারতে প্রায় 7,000 লাইনের ক্ষমতাসম্পন্ন 30টি টেলেক্স এক্সচেঞ্জ আছে। মাদ্রাজের হিন্দুস্থান টেলিপ্রিন্টার লিঃ

টেলিপ্রিন্টার এবং তার প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম প্রস্তুত করে থাকে। 1964-65 সালে এই কারখানাটি স্থাপিত হয়।

আশা করা যায়, চলতি পরিকল্পনানুযায়ী কো-অ্যাক্সিয়াল কেবল এবং মাইক্রোওয়েভ ব্যবস্থায় পথের দৈর্ঘ্য বাড়বে যথাক্রমে 6,200 কিলোমিটার

মাইক্রোওয়েভ পদ্ধতিতে খুব নির্ভরযোগ্যভাবে সংবাদ প্রেরণ করা যায়। এর ফলে দূরবর্তী স্থানে খুব তাড়াতাড়ি এবং অল্প খরচে সংবাদ প্রেরণের জন্যে এখন আর কোন সমস্যার সৃষ্টি হয় না। ছবিতে একটি মাইক্রোওয়েভ অ্যান্টিনা-টাওয়ার দেখা যাচ্ছে।

থেকে 13,000 কিলোমিটার এবং 2,455 কিলো-মিটার থেকে 14,000 কিলোমিটার।

কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে সংবাদ প্রেরণের ব্যবস্থা করবার জন্যে পুণার নিকটবর্তী আরভীতে

পুণার নিকটবর্তী আরভীতে ভারতের প্রথম ভূপৃষ্ঠস্থ টেলিকমিউনিকেশন কেন্দ্রের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে সংবাদ প্রেরণের ক্ষেত্রে ভারতে এক নবযুগের সূচনা হবে। ছবিতে আরভী-স্থিত কেন্দ্রে একটি 97 ফুটের বেতার-বার্তা সংগ্রাহক অ্যান্টিনা দেখা যাচ্ছে।

একটি ভূপৃষ্ঠস্থ কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা বর্তমানে বাস্তবায়িত হবার চূড়ান্ত পর্যায়ে এসেছে। এটি সমাপ্ত করতে খরচ পড়বে আনুমানিক 78·6 মিলিয়ন টাকা।

ব্যাঙ্গালোরে বিজ্ঞান কংগ্রেসের 58তম অধিবেশন

রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়*

প্রতি বছর জানুয়ারী মাসের 3 থেকে 9 তারিখ পর্যন্ত এক সপ্তাহব্যাপী ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় ভারতের নানা প্রান্তে। এবার ছিল বিজ্ঞান কংগ্রেসের 58তম অধিবেশন। এবারের আসর বসেছিল মহীশূর রাজ্যের রাজধানী ব্যাঙ্গালোর শহরে। অবশ্য ব্যাঙ্গালোরে বিজ্ঞান কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন এই প্রথম নয়, এর আগে আরও চারবার এখানে অধিবেশন হয়েছে। তবে ব্যাঙ্গালোর বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে বিজ্ঞান কংগ্রেসের আয়োজন এই প্রথম। এবারকার অধিবেশনে ভারতের নানা প্রান্ত থেকে প্রায় তিন হাজার প্রতিনিধি যোগদান করেছিলেন এবং বিদেশ থেকে পঁচিশ জন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী এসেছিলেন।

ব্যাঙ্গালোরের গৌরব ভারত-রত্ন বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞানী সি. ভি. রামনের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনস্বরূপ এবারের অধিবেশন মণ্ডপের নামকরণ করা হয়েছিল রামন মণ্ডপ (কানাড়া ভাষায় মন্তপ)। তেসরা জানুয়ারী সকালে এই সুসজ্জিত মণ্ডপে ভারতীয় কৃষি-বিজ্ঞান গবেষণা কাউন্সিলের ডিরেক্টর-জেনারেল ডক্টর বি. পি. পালের মূল সভাপতিত্বে বিজ্ঞান কংগ্রেসের 58তম অধিবেশনের উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর অধিবেশন উদ্বোধন করবার কথা ছিল। কিন্তু বিশেষ কাজের চাপে তিনি উপস্থিত হতে না পারায় তাঁর লিখিত উদ্বোধনী ভাষণ পাঠ করেন মহীশূরের রাজ্যপাল শ্রীধরমবীর।

অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে ব্যাঙ্গালোর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী কুমারী জ্যোতি বিজ্ঞান কংগ্রেস উপলক্ষে কানাড়া ভাষায় রচিত 'স্বাগত হে বিজ্ঞানী' শীর্ষক একটি মনোজ্ঞ প্রশস্তি সুরেলা কণ্ঠে পাঠ করেন। তারপর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রীভুকল সমবেত প্রতিনিধি ও বিদেশী বিজ্ঞানীদের স্বাগত জানান। মহীশূরের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবীরেন্দ্র পাতিল রাজ্য সরকার ও মহীশূরবাসীদের পক্ষ থেকে সকলকে স্বাগত জানিয়ে বিজ্ঞানকে সর্বসাধারণের কাছে পৌঁছে দেবার গুরু দায়িত্বের কথা উল্লেখ করেন। বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করবার জন্যে বিজ্ঞান কংগ্রেসের দীর্ঘকালের প্রচেষ্টাকে তিনি অভিনন্দিত করেন এবং আশা প্রকাশ করেন যে, সংবাদপত্রগুলি যেন এই কাজের গুরুত্ব অনুধাবন করে তাঁদের পৃষ্ঠায় লোকরঞ্জক বিজ্ঞানের জন্যে অন্ততঃ কিছু পরিমাণে স্থান সঙ্কুলান করবেন।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী তাঁর লিখিত ভাষণে বিজ্ঞানীদের এমন একটি দৃঢ় এবং সৃজনশীল প্রচেষ্টার পরিবেশ গড়ে তুলতে আহ্বান জানান, যার ফলে দেশের বহুবিধ সমস্যার সমাধানে সহায়তা করা যেতে পারে। তিনি বলেন, মানুষের বৈষয়িক প্রয়োজন পূরণের উদ্দেশ্যে ভারতীয় বিজ্ঞানীদের এমন একটি নতুন পথ খুঁজে বের করতে হবে, যাতে মানুষের এই বৈষয়িক প্রয়োজন মেটাতে গিয়ে মানুষ যেন মানবিক মূল্যবোধ হারিয়ে না ফেলে অথবা ব্যক্তি কিংবা জাতি

* দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং, কলিকাতা-29

হিসাবে তাদের স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন না দেয়। মানুষের প্রয়োজন তাদের বৈষয়িক প্রয়োজনকেও ছাড়িয়ে যায়। আমরা যাঁরা ভারতে বাস করি, তাঁরা অবশ্যই প্রযুক্তিবিদ্যাকে নতুনভাবে গ্রহণ করে মানুষকে এবং মানবাত্মাকে বিজ্ঞানের কেন্দ্রস্থলে স্থাপনের জন্যে চেষ্টা করবো। ভাষণের উপসংহারে শ্রীমতী গান্ধী বলেন—বিজ্ঞান যদিও একান্তভাবে নিরপেক্ষ, কিন্তু সামাজিক ও ঐতিহাসিক বিবর্তন সম্বন্ধে উদাসীন থাকা কি বিজ্ঞানীর পক্ষে সম্ভব? আজকে ভারতীয় বিজ্ঞান যে চ্যালেঞ্জের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে এবং তাদের সামনে এমন কি পথ খোলা আছে এবং বর্তমান সঙ্কট-কালে বিজ্ঞান কংগ্রেস কিভাবে পথপ্রদর্শকের ভূমিকা নিতে পারে, সে বিষয়ে বিজ্ঞানীরা চিন্তা করবেন আশা করি।

মূল সভাপতি ডক্টর পাল তাঁর 'কৃষি-বিজ্ঞান ও মানব-কল্যাণ' শীর্ষক অভিভাষণে কৃষিজীবী ও কৃষি-বিজ্ঞানীদের দীর্ঘকাল যাবৎ অবহেলা করবার জন্যে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি প্রখ্যাত উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী ডক্টর মাহেশ্বরীর উক্তি উদ্ধৃত করে বলেন—উদ্ভিদই আমাদের সমস্ত খাদ্য জোগায়, কাজেই উদ্ভিদ-বিজ্ঞানীদের সকল বিজ্ঞানীর নীচের দিক থেকে তুলে এনে সকলের উপরে স্থান দেওয়া কর্তব্য।

ডক্টর পাল বলেন—কৃষি-বিজ্ঞান বলতে যে বিস্তৃত ক্ষেত্রটির কথা বলা হয়, সেই ক্ষেত্রে সুদূর-প্রসারী অগ্রগতি সাধনের সম্ভাবনা এখন ভারতের নাগালের মধ্যে এসে পড়েছে। কিন্তু যদি উপযুক্ত অর্থসংস্থান এবং সুপরিকল্পিত ও সুসংহত প্রকল্প রচনা করা হয়, তাহলেই শুধু এই কাজ হতে পারে।

উপসংহারে তিনি বলেন—ভারতে যে 'সবুজ বিপ্লব' ঘটেছে, তা মাত্র কয়েক জাতীয় খাদ্য অর্থাৎ চাল, গম, ভুট্টা এবং মরশুম শস্যের ক্ষেত্রেই সীমিত থাকে। ভারতের খাদ্য-সমস্যা সমাধানে অনেক কিছু করা হয়ে থাকলেও আমাদের সামনে এখনও বহু বিরাট সমস্যা রয়ে গেছে। ডালজাতীয় শস্য আমাদের এই নিরামিষাশী দেশে বহুল পরিমাণে প্রোটিন জুগিয়ে থাকে, কিন্তু ডালজাতীয় শস্য ও তৈল-বীজজাতীয় শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্যে এখন পর্যন্ত বিশেষ কিছুই করা হয় নি।

এরপর কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর ভি. কে. আর. ভি. রাও বিজ্ঞান কংগ্রেস উপলক্ষে আয়োজিত বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ও বিজ্ঞান-বিষয়ক পুস্তক প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। বিজ্ঞান কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদিকা অধ্যাপিকা অসীমা চট্টোপাধ্যায় বিদেশাগত বিশিষ্ট বিজ্ঞানীদের পরিচিতি প্রদান করেন। বুলগেরিয়া থেকে এসেছিলেন অধ্যাপক এস. জি. কৃস্টভ এবং অধ্যাপক আই. পি. গারবাউচেক, সিংহল থেকে ডক্টর এন. কোদাগোদা, চেকোশ্লো-ভাকিয়া থেকে অধ্যাপক জে. পাউলিক, ফ্রান্স থেকে অধ্যাপক আর. ও. প্রুদোহম, হাঙ্গেরী থেকে ডক্টর এম. পেকৃসি এবং ডক্টর এস. রাজকি, ইরান থেকে ডক্টর আলি আসগর আজাদ, জাপান থেকে ডক্টর ওয়াই. হিরামা, পোল্যাণ্ড থেকে ডক্টর এস. পিয়েনিয়াজেক, রুমানিয়া থেকে অধ্যাপক এ. রোসেত, যুক্তরাজ্য থেকে অধ্যাপক জি পি. ওয়েলস, মিঃ জে.এস. লুমস, ডক্টর পি. আর. বেল, অধ্যাপক সি. আর. পি. টাউনম্যান এবং অধ্যাপক আর. ডাবলিউ. টরেনস, ডেনমার্ক থেকে ডক্টর জে. ইউ. অ্যাণ্ডারসন এবং অধ্যাপক পি. জি. হানসেন, পশ্চিম জার্মেনী থেকে অধ্যাপক জি. মেলচারস ও অধ্যাপক এফ. ভোগেল, নরওয়ে থেকে অধ্যাপক কে. ফেগরী, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে ডক্টর ই. সি. ক্রুজ, ডক্টর আর. রেভেলি এবং মিঃ ডাবলিউ. ইলারস এবং সোভিয়েট রাশিয়া থেকে অ্যাকাডেমিশিয়ান এস. এইচ. এসেনফ এবং মিঃ ভি. আই. টাকাচেনকফ।

দ্বিতীয় দিন অর্থাৎ 4ঠা জানুয়ারী বিজ্ঞান

কংগ্রেসের 13টি বিভিন্ন শাখার পৃথক পৃথক অধিবেশন সুরু হয়। গণিত এবং রসায়ন শাখার নির্বাচিত সভাপতি ডক্টর রামবল্লভ ও ডক্টর আর ডি. তেওয়ারি অনিবার্য কারণে উপস্থিত থাকতে পারেন নি। তাঁদের লিখিত ভাষণ নিজ নিজ শাখায় পঠিত হয়। শারীরতত্ত্ব শাখার সভানেত্রী ডক্টর শ্রীমতী সারদা সুব্রহ্মণ্যম তাঁর ভাষণে আলোচনা করেন 'এণ্ডোক্রিনোলজির এক দশক', মনস্তত্ত্ব ও শিক্ষা-বিজ্ঞান শাখার সভাপতি ডক্টর মদনমোহন সিংহ বলেন 'সাম ইম্প্রিক্যাল বিহেভিয়োরাল ডেটা' সম্পর্কে, যন্ত্রবিদ্যা ও ধাতু-বিজ্ঞান শাখার সভাপতি ডক্টর জে. কে. চৌধুরী আলোচনা করেন 'মেজারমেন্ট—ইটস সায়েন্স অ্যাণ্ড টেক্নোলজি', সংখ্যায়ন শাখার সভাপতি ডক্টর অনিলকুমার গায়েনের আলোচ্য বিষয় ছিল 'রোবাষ্ট টেষ্ট অ্যাণ্ড এষ্টিমেশান ইন স্ট্যাটিস্টিক্স', ভূতত্ত্ব ও ভূগোল শাখার সভাপতি ডক্টর বি. জি. দেশপাণ্ডে 'ভারতে তৈল অনুসন্ধান' সম্পর্কে আলোচনা করেন, প্রাণীবিদ্যা ও কীটতত্ত্ব শাখার সভাপতি অধ্যাপক এইচ. স্বরূপ বলেন 'নিউক্লিক অ্যাসিড ইন টেলিওষ্টান এম্‌ব্রিওজেনেসিস' সম্পর্কে, কৃষি-বিজ্ঞান শাখার সভাপতি অধ্যাপক এস.সি. মণ্ডল আলোচনা করেন 'ভারতের অম্লাত্মক রক্তিম ভূমি এবং তৎসম্পর্কিত ব্যবস্থা' সম্পর্কে, পদার্থ-বিজ্ঞান শাখার ডক্টর ডি. জি. বিদের আলোচ্য বিষয় ছিল 'সাম অ্যাপ্লিকেশন অফ মসবয়ার এফেক্ট টু সলিড স্টেট ফিজিক্স', উদ্ভিদবিদ্যার সভাপতি অধ্যাপক বি. এম. জোহরি বলেন 'ডিফারিয়েনশিয়েশন ইন প্ল্যাণ্ট টিস্যু কালচার' সম্পর্কে, নৃতত্ত্ব ও প্রত্নতত্ত্ব শাখার সভাপতি অধ্যাপক এম. সি. গোস্বামী আলোচনা করেন 'উপজাতি—উত্তর-পশ্চিম ভারতে বর্তমান সম্প্রদায়গত অবস্থা' এবং ভেষজ ও প্রাণী-বিজ্ঞান শাখার সভাপতি ডাঃ ফণীন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী আলোচনা করেন 'মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীতে এথেরোস্ক্লেরোসিস ব্যাধি' সম্পর্কে।

সভাপতির ভাষণ ছাড়া প্রত্যেক শাখায় বিভিন্ন দিনে বিশেষ বক্তৃতা, আলোচনা-চক্র ও গবেষণা-পত্র পাঠ করা হয়। এছাড়া মূল মণ্ডপে কয়েক দিন ডক্টর এডওয়ার্ড ক্রুজ, ডক্টর এস.পি. রায়চৌধুরী, অধ্যাপক এ. ভি. রাও, অধ্যাপিকা পার্বতী দেবী, ডক্টর কে. এস. রাজগোপালন, অ্যাকাডেমিশিয়ান এসেনক, ডক্টর এম.এস. স্বামীনাথন, ডক্টর নীলরতন ধর প্রমুখ কয়েকজন বিশিষ্ট বিদেশী ও ভারতীয় বিজ্ঞানী কয়েকটি লোকরঞ্জক বক্তৃতা দেন। আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ডক্টর মাতাপ্রসাদের সভাপতিত্বে লোকরঞ্জক বিজ্ঞান সম্পর্কে একটি আলোচনা হয়, তাতে ডক্টর বি. কে. নায়ার, ডক্টর রবীন্দ্রলাল রায়, শ্রীরবীন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীআশিস সিংহ প্রমুখ অংশ গ্রহণ করেন।

বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ও বিজ্ঞান সম্পর্কিত পুস্তকের প্রদর্শনী বিজ্ঞান কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনের অন্যতম অঙ্গ এবং এবারও তার ব্যতিক্রম হয় নি। অভ্যর্থনা সমিতি, মহীশূরের রাজ্যপাল এবং ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স বিদেশাগত বিশিষ্ট বিজ্ঞানী এবং বিজ্ঞান কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের তিন দিন প্রীতি সম্মিলনে আপ্যায়িত করেন। প্রথম চার দিন ব্যাঙ্গালোর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা এবং রাজ্য সরকারের লোকরঞ্জক শাখা প্রতিনিধিদের কাছে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন। কিন্তু এই অনুষ্ঠানগুলি তেমন আকর্ষণীয় ও উচ্চ মানের হয় নি।

অভ্যর্থনা সমিতি প্রতিনিধিদের স্থানীয় কয়েকটি শিল্প প্রতিষ্ঠান দেখাবার ব্যবস্থাও করেছিলেন। প্রতিনিধিদের অনেকে ভারত ইলেক্ট্রনিক্স, এইচ. এম. টি. ঘড়ি কারখানা পরিদর্শন করেন। এছাড়া অনেকে ব্যাঙ্গালোর, মাদ্রাজ ও মহীশূরের অন্যান্য দর্শনীয় প্রসিদ্ধ স্থানগুলি দেখতে যান। ব্যাঙ্গালোরের রামন রিসার্চ ইনস্টিটিউট বিজ্ঞানানুরাগীদের কাছে একটি বিশেষ আকর্ষণীয় স্থান। ডক্টর রামনের পুণ্য স্মৃতিবিজড়িত

এই গবেষণা কেন্দ্রটি দেখবার জন্যে বিশেষ ইচ্ছা ছিল। অভ্যর্থনা সমিতির অন্যতম সম্পাদকের সহযোগিতায় শ্রীমতী লোকসুন্দরী রামনের অনুমতিক্রমে এই গবেষণা কেন্দ্রটি দেখে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করেছি। কিন্তু বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশনের মাত্র দু-মাস আগে ডক্টর রামনের তিরোধানের কথা স্মরণ করে আমরা সকলেই বেদনা বোধ করেছিলাম। এবারের অধিবেশনে তাঁকে দেখবার বা তাঁর কথা শোনবার সৌভাগ্য আমাদের হলো না।

অভ্যর্থনা সমিতির কর্তৃপক্ষ ও স্বেচ্ছাসেবক-সেবিকারা প্রতিনিধিদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে বিশেষ সচেষ্ট ছিলেন; কিন্তু অধিবেশনের স্থান থেকে 6/7 কিলোমিটার দূরে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের হোস্টেলগুলিতে যাঁদের থাকবার ব্যবস্থা হয়েছিল, তাঁদের নানা অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। ভবিষ্যৎ অধিবেশনে অভ্যর্থনা সমিতির কর্তৃপক্ষ এই সব বিষয়ে অবহিত হবেন, আশা করি।

বিজ্ঞান-সংবাদ

দৈহিক বৃদ্ধির জন্যে কৃত্রিম উপায়ে প্রয়োজনীয় হর্মোন উৎপাদন

বিজ্ঞানীরা দীর্ঘকাল ধরেই মানুষের শরীরের গুরুত্বপূর্ণ রাসায়নিক পদার্থসমূহ কৃত্রিম উপায়ে উৎপাদনের চেষ্টা করে আসছেন। রোগ ও অস্বাভাবিকতা নিয়ন্ত্রণ এবং এই সম্পর্কে গবেষণার জন্যে এই ধরণের রাসায়নিক পদার্থের প্রয়োজন। দেহ কর্তৃক জৈব প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন এরূপ বহু রাসায়নিক পদার্থ বীক্ষণাগারে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত করা যায়। কিন্তু অন্য আরও অনেক পদার্থ রয়েছে, যা এখনও পর্যন্ত কৃত্রিম উপায়ে উৎপাদন করা যায় নি।

কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত গুরুত্বপূর্ণ জৈব পদার্থসমূহের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। মার্কিন বিজ্ঞানীরা এই তালিকায় আর একটি নতুন পদার্থ যোগ করেছেন। এর নাম এইচ. জি. এইচ.—পুরা নাম হিউম্যান গ্রোথ হর্মোন, অর্থাৎ মানুষের দৈহিক বৃদ্ধির হর্মোন। মানুষ উচ্চতা ও স্থূলতার দিক থেকে কতটা বৃদ্ধি পাবে, তা নিয়ন্ত্রণ করে এই হর্মোন। মানুষের দেহ কয়েকটি খাদ্যোপাদান কি ভাবে কাজে লাগাবে, তা নির্ধারণ করে এইচ. জি. এইচ. এবং স্বভাবতঃই অন্যান্য কয়েকটি প্রয়োজনীয় দৈহিক কার্যকলাপও নিয়ন্ত্রণ করে, মানুষের ক্যান্সার রোগের সৃষ্টিতে এর কিছু ভূমিকাও থাকতে পারে।

কৃত্রিম উপায়ে এইচ. জি. এইচ. তৈরির সাফল্যের ফলে কালক্রমে মানুষের প্রভূত উপকার হবে বলেই গবেষণাকারী বিজ্ঞানীরা মনে করেন। অবশ্য এই আবিষ্কারের ফলে যে আশু বাস্তব সুফল পাওয়া যাবে, তা নয়।

এই কৃত্রিম হর্মোন শীঘ্রই প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাবে। এখন পর্যন্ত এর অভাবে গবেষকদের কাজকর্ম বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। মৃত ব্যক্তিদের দেহ থেকে এই পদার্থ যে সামান্য পরিমাণে সংগ্রহ করা যায়, তা দিয়েই এতদিন বিজ্ঞানীরা কাজ চালিয়েছেন।

মানুষ কেনই বা বেঁটে হয়, আর কেনই বা বিশালদেহী হয়, তার কারণ নির্ণয় করবার কাজে

গবেষণা এখন অনেক দ্রুততর হবে। কেন মানুষ ও অন্যান্য জীব একটা নির্দিষ্ট আকৃতি পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়, বিজ্ঞানীরা এই বিষয়েও গবেষণা করতে সক্ষম হবেন।

ডাঃ চো হাও লী এবং ডাঃ ডি. রামন আইরো সানফ্র্যান্সিস্কোর ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের হর্মোন রিসার্চ লেবরেটরীতে কৃত্রিম উপায়ে এই হর্মোন উৎপাদন করেছেন। ডাঃ লী এই লেবরেটরীর ডিরেক্টর। তাঁর সহকর্মীরা 1956 সালে এইচ. জি. এইচ. পৃথক করে পরিশোধিত করেন এবং রাসায়নিক গঠন-প্রণালী আবিষ্কার করেন 1966 সালে। তবে বীক্ষণাগারে এই পদার্থটি কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত করবার জন্যে তাঁদের আরও চার বছর সময় লেগে যায়। সাফল্যের সঙ্গে এই হর্মোন তৈরির কথা 7ই জানুয়ারী ঘোষণা করা হয়েছে।

পিটুইটারী গ্ল্যাণ্ড বা গ্রন্থির সামনের অংশ থেকে নিঃসৃত দশটি পরিচিত হর্মোনের অন্যতম হলো এইচ. জি. এইচ। মস্তিষ্কের নিম্নাংশে অবস্থিত এই গ্রন্থিটির আকৃতি একটি মটরদানার মত। হর্মোন হলো দেহ কর্তৃক উৎপন্ন রাসায়নিক পদার্থ। হরমোন প্রধানতঃ দেহগ্রন্থির মধ্যেই উৎপন্ন হয় এবং দেহের আকৃতি ও অন্যান্য ক্রিয়া-কলাপে অংশগ্রহণ করে।

ডাঃ লী ও তাঁর সহকর্মীরা এই কয় বছর ধরে 8টি পিটুইটারী হর্মোন পৃথক ও পরিশোধিত করেছেন এবং 7টি হর্মোনের রাসায়নিক গঠন আবিষ্কার করেছেন। কিন্তু এপর্যন্ত এর দুটি মাত্র কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে।

পিটুইটারী গ্ল্যাণ্ড গেঁটেবাত বা রিউমেটয়েড আর্থ্রাইটিস, দেহে রাসায়নিক বিপাকজনিত ব্যাধি বা মেটাবলিক ডিজিজেস, ক্যান্সার রোগ এবং কোন কোন অ্যালার্জিক অবস্থাকে নিয়ন্ত্রিত করে থাকে বলে বিজ্ঞানীদের ধারণা। এই গ্রন্থি ও গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হর্মোন সম্পর্কে আরও কিছু জানা গেলে ঐ সকল ব্যাধির নিরাময় ও চিকিৎসা আরও সহজ হবে। ঐ সকল রোগের চিকিৎসার উপরে এই গ্রন্থি ও হর্মোন সংক্রান্ত তথ্যাদি বিশেষভাবে আলোকপাত করবে।

ডাঃ লী গত 32 বছর ধরে এই গ্রন্থি নিয়ে গবেষণায় ব্যাপৃত রয়েছেন। তিনি পরীক্ষা করে দেখিয়েছেন যে, এইচ. জি. এইচ. প্রাণীর দেহে বুকের দুধ নিঃসরণ ও বৃদ্ধিতে বিশেষভাবে সাহায্য করে। তাছাড়া এই বস্তুটি পুরুষ ও নারী দেহের কোন কোন যৌন হর্মোনের কার্যকারিতাও বাড়িয়ে দেয় এবং প্রাণিদেহে রোগের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবার উপযোগী রোগ-প্রতিরোধক বস্তুর সৃষ্টি করে।

এইচ. জি. এইচ. নামে হর্মোনের অংশবিশেষ প্রাণিদেহে ইনজেকশন করে দেখা গেছে যে, হাড় ভেঙে গেলে এর ফলে ঐ ভাঙা হাড় খুবই তাড়াতাড়ি জোড়া লাগে এবং রক্তে কোলেস্টেরলের পরিমাণ হ্রাস পায়। রক্তবহা নালীতে কোলেস্টেরল জমলে হৃদ্‌রোগ ও অন্যান্য রোগ দেখা দেয়।

এই পরীক্ষায় আরও দেখা গেছে—পশুদেহে এই হর্মোন ইনজেকশন দেবার পর তাদের গুরুপাক খাদ্য খাওয়ালেও তারা অস্বাভাবিক রকমের মোটা হয়ে যায় না। মানুষের দেহে এই ইনজেকশন দিলে অনুরূপ ফল পাওয়া যাবে কি না, সে বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে।

ডাঃ লী 1913 সালে চীনের ক্যাণ্টনে জন্মগ্রহণ করেন। 1933 সালে তিনি নানকিং বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক হন। 1935 সালে উচ্চতর শিক্ষালাভের জন্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আসেন এবং 1938 সালে ক্যালিফোর্ণিয়ার বার্কলে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট উপাধি লাভ করেন।

বৃহস্পতি প্রভৃতি গ্রহ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের উদ্যোগ

আমেরিকার মহাকাশ-বিজ্ঞানীরা এই দশকেই চন্দ্রলোক ছাড়িয়ে মহাকাশের বহু দূরদূরান্তের বিভিন্ন গ্রহে তথ্যসন্ধানী স্বয়ংক্রিয় উপগ্রহ প্রেরণের কথা ভাবছেন।

1972 ও 1973 সালে দুবার এই তথ্য-সন্ধানী অভিযান চালানো হবে বলে আমেরিকার জাতীয় বিমান বিজ্ঞান ও মহাকাশ সংস্থা একটি ঘোষণায় জানিয়েছেন। মঙ্গলের কক্ষপথ ছাড়িয়ে সৌর পরিমণ্ডলে এটাই হবে মানুষের প্রথম তথ্যানুসন্ধানী উদ্যোগ।

যাত্রীবিহীন স্বয়ংক্রিয় দুটি মহাকাশযানই 50000 গ্রহাণুর বলয় ভেদ করে চলে যাবে বৃহস্পতির দিকে এবং এই বিরাট গ্রহের 100000 মাইলের মধ্যে থেকে ঐ গ্রহের আলোকচিত্র তুলে ও নানাবিধ বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহ করে পৃথিবীতে প্রেরণ করবে। তারপর চলে যাবে অনন্ত মহাশূন্যের দিকে।

বৃহস্পতির কাছে পৌঁছুতে হলে দুটি পায়োনিয়ার মহাকাশযানেরই 50 কোটি মাইল পাড়ি দিতে হবে। এতে তাদের দু-বছর লাগবে। তার পর প্রায় সপ্তাহকাল ঐ গ্রহকে কেন্দ্র করে আবর্তন করবার সময় নানাবিধ তথ্যাদি সংগ্রহ করবে।

এই দুটি মহাকাশযানের এক-একটির ওজন হবে 550 পাউণ্ড এবং প্রত্যেকটিতে থাকবে 60 পাউণ্ড ওজনের বৈজ্ঞানিক সাজসরঞ্জাম। দুটিই কেপ কেনেডি থেকে উৎক্ষিপ্ত হবে।

পৃথিবী থেকে 18 কোটি মাইল দূরে শুরু হয়েছে গ্রহাণু বলয়। এতে আছে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রহ—তাদের কোনটির ব্যাস 480 মাইল আর কোনটির ব্যাস এক মাইল। 18 কোটি থেকে 33 কোটি মাইল পর্যন্ত এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রহ সূর্যকে ঘিরে রয়েছে। পায়োনিয়ার নামক উপগ্রহ দ্বয়ের এই গ্রহাণু-বলয় পেরিয়ে যেতে সময় লাগবে ছয় মাসেরও বেশী। এই সকল গ্রহাণুর মধ্যে যে মালমশলা রয়েছে, সেগুলি একত্রিত করলে একটি ছোট আকারের গ্রহের রূপ নিতে পারে।

ঐ গ্রহাণু-বলয়ের মধ্য দিয়ে যাবার সময় মহাকাশযানের যন্ত্রপাতি গ্রহাণুপুঞ্জ থেকে প্রতিফলিত সূর্যের আলো এবং তেজস্ক্রিয় কণার মোটামুটি পরিমাণ সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ করে পৃথিবীতে প্রেরণ করবে। বৃহস্পতির কাছাকাছি আসবার পর ঐ গ্রহের রহস্যপূর্ণ পরিবেশ সম্পর্কেও বহু তথ্য ঐ দুটি মহাকাশযানের যন্ত্রপাতির সাহায্যে সংগৃহীত হবে।

বৃহস্পতি সম্পর্কে এখনও অনেক কিছুই জানা যায় নি। এর পৃষ্ঠদেশ কঠিন, তরল বা গ্যাসীয় পদার্থে গঠিত, বিজ্ঞানীরা তা জানেন না। আর যে গ্রহটির ব্যাস পৃথিবীর ব্যাসের 11 গুণ, সেটি কেমন করে পৃথিবীর দ্বিগুণের চেয়েও বেশী বেগে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে? এটিও তাদের কাছে আর একটি রহস্য। তারপর বৃহস্পতির মধ্যে যে লাল কলঙ্ক বা 'রেড স্পট' রয়েছে, তার রহস্যের কিনারাও আজ পর্যন্ত করা যায় নি। এটি এক জায়গা থেকে ধীরে ধীরে সরে যায়। গত দু-শ' বছরের মধ্যে এটি তিন বার গ্রহটিকে প্রদক্ষিণ করেছে। পায়োনিয়ার উপগ্রহের যন্ত্রপাতি এই লাল কলঙ্কের প্রকৃতি ও সৃষ্টি-রহস্যের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করতে পারে।

বিজ্ঞানীদের ধারণা, সৌরমণ্ডলীর এই গ্রহটি সূর্য থেকে যতখানি শক্তি আত্মসাৎ করে, তার চেয়ে বিকিরণ করে অনেক বেশী; অর্থাৎ এর আভ্যন্তরীণ কর্মকাণ্ডের সঙ্গে মিল রয়েছে সূর্যের। মাঝে মাঝে বৃহস্পতি থেকে আসা বেতার-তরঙ্গের প্রচণ্ড আওয়াজ শোনা যায়। ঐ গ্রহের চৌম্বক ক্ষেত্র সম্পর্কে তথ্যাদি জানা গেলে এই সকল রহস্যের উপর আলোকপাত হতে পারে।

পিটুইটারী গ্রন্থি নিয়ন্ত্রণকারী হর্মোন আবিষ্কার

মানবদেহের ক্রিয়াপ্রণালীর অনেক কিছুই পিটুইটারী গ্রন্থি নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। আবার এই গ্রন্থির কাজকর্ম নিয়ন্ত্রিত হয় টি. আর. এফ. নামে এক প্রকার হর্মোনের দ্বারা। দেহযন্ত্রের বিভিন্ন অত্যাবশ্যক ক্রিয়া সম্পাদন ও নিয়ন্ত্রণের জন্যে বিভিন্ন গ্ল্যাণ্ড বা গ্রন্থি থেকে বিভিন্ন প্রকার হর্মোন নিঃসৃত হয়ে থাকে। বিজ্ঞানীরা বহুকাল ধরে এই টি.আর.এফ-এর সন্ধানে ছিলেন। আমেরিকার টেক্সাস রাজ্যের বেলার ইউনিভারসিটি কলেজ অব মেডিসিনের বিজ্ঞানীরা বলেছেন যে, অতি সামান্য পরিমাণ টি. আর. এফ. থাইরপ্‌টিন নামে এক প্রকার উপাদান পিটুইটারী গ্রন্থি থেকে নিষ্কাশিত করে। এই থাইরপ্‌টিনের জন্যে আবার ঐ গ্রন্থি থেকে থাইরয়েড হর্মোন বের হয়ে আসে। জীবদেহের বৃদ্ধির জন্যে ঐ হর্মোনের বিশেষ প্রয়োজন।

বিজ্ঞানীরা এই প্রসঙ্গে আরও বলেছেন যে, থাইরয়েড গ্রন্থি সংক্রান্ত যে সকল রোগ দেখা যায়, সেই সকল রোগনিদানে ও চিকিৎসায় টি. আর. এফ-এর খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। কারণ থাইরয়েড-এর ক্রিয়া টি. আর. এফ-এর দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়।

এই গবেষণার ফলাফল খুবই দূরপ্রসারী হতে পারে। কারণ বিজ্ঞানীদের ধারণা, গ্রন্থি নিয়ন্ত্রণ-কারী অন্যান্য উপাদানও মস্তিষ্ক থেকেই নিঃসৃত হয়ে থাকে। মস্তিষ্কের হাইপোথ্যালামাস নামক অংশই টি. আর. এফ-এর উৎস। অন্যান্য গ্রন্থির ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণকারী উপাদানও ঐখানেই রয়েছে। টি. আর. এফ-এর রাসায়নিক গঠন-প্রণালী খুবই সরল। তিন প্রকার অ্যামিনো অ্যাসিড এর মূল উপাদান। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, কৃত্রিম উপায়ে টি. আর. এফ. তৈরি করা যাবে।

জীবদেহের তাপমাত্রা, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ঘুম, রক্তে শর্করা, লবণ, জলের পরিমাণ—এমন কি, ভাবসমূহ নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারেও মস্তিষ্কের হাইপোথ্যালামাস নামক অংশের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

কৃত্রিম বৃষ্টিপাত ঘটাবার পরীক্ষা

মাদ্রাজ থেকে সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান পি.টি. আই জানাচ্ছেন—ভারতের মানমন্দিরসমূহের ডিরেক্টর জেনারেল ডক্টর কোটেশ্বরন 25শে জানুয়ারী এক সাংবাদিক বৈঠকে বলেন—মাদ্রাজে কৃত্রিম উপায়ে বৃষ্টিপাত ঘটানো সম্ভব কি না, সে সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষা এই বছরেই সুরু হচ্ছে।

গত দশ বছর ধরে দিল্লী, আগ্রা, জয়পুর এলাকায় পরীক্ষা সফল হয়েছে এবং বৃষ্টিপাতের পরিমাণ 20 থেকে 30 ভাগ বেড়ে গেছে।

ডক্টর কোটেশ্বরন আরও বলেন, 24 ঘন্টা আগে ঝড়ের সঙ্কেত দেবার জন্যে আগামী বছরের সুরুতেই মাদ্রাজ ও কলকাতায় 400 কিলোমিটার পাল্লার দুটি রেডার বসানো হবে। প্রতিটি রেডারের জন্যে ব্যয় পড়বে 4 কোটি 2 লক্ষ টাকা।

বঙ্গোপসাগরে ঝড়ের পৌনঃপুনিকতার দিকে নজর রেখেই সারা পূর্ব উপকূল বরাবর রেডার যন্ত্র বসানো হচ্ছে।

এর ফলে কৃত্রিম উপগ্রহের চেয়ে আরও ভাল কাজ পাওয়া যাবে এবং ঝড়ের অবস্থান সম্পর্কে তথ্য আরও সুনিশ্চিতভাবে জানা যাবে বলেই রেডারের উপর জোর দেওয়া হচ্ছে।

শিক্ষা ও পরীক্ষা-সংস্কার

শান্তিকুমার চট্টোপাধ্যায়*

এক-শ' বছরেরও বেশী প্রচলিত পরীক্ষা-ব্যবস্থাই যে শুধু প্রহসনে পরিণত হয়েছে, তা নয়, পাঠ্যসূচী প্রণয়ন এবং শিক্ষাদানের পদ্ধতিও প্রহসনে পরিণত হয়েছে। শিক্ষায় ও পরীক্ষায় এই ভাঙন একদিনের সৃষ্টি নয়, প্রায় চার বছর পূর্বে লেখকের 'বর্তমান শিক্ষা' প্রবন্ধে (জ্ঞান ও বিজ্ঞান, দ্বাদশ সংখ্যা, 1966) তার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। অন্তঃসারশূন্য শিক্ষা-ব্যবস্থার সংস্কার সম্বন্ধে অনেক পূর্বেই চিন্তা করা উচিত ছিল। দুঃখের বিষয়, এখনও পর্যন্ত কার্যকরী ব্যবস্থারূপে কিছুই পরিলক্ষিত হয় নি। শুধু মতামত বিনিময় করলেই সংস্কার হয় না—ধারাবাহিক সংস্কারের জন্যে কার্যকরী ব্যবস্থার প্রয়োজন। শুধু পরীক্ষা সংস্কারের কথা ভাবলেই চলবে না—পরীক্ষা-সংস্কারের সঙ্গে পাঠ্যসূচী প্রণয়ন ও শিক্ষাদানের পদ্ধতির কথাও চিন্তা করা প্রয়োজন। কোন বিষয়ের প্রগতির দিকে লক্ষ্য রেখে সুসমঞ্জস পাঠ্যসূচী প্রণয়ন এক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। পাঠ্যসূচীতে শুধু আবিষ্কৃত সত্যের কথা থাকলেই চলবে না—দৃষ্টিভঙ্গীর বিবর্তনের ইতিহাস ও আবিষ্কারের ধারায় উল্লেখও থাকবে। বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত পাঠ্যসূচী যদি সুচিন্তিতভাবে তৈরি না হয়, তবে শিক্ষা-জগতে যে এক দুর্যোগ আসবে, তাতে সন্দেহ নেই। বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত পাঠ্য-সূচীতে যদি কোন ফাঁক দেখা যায় বা তা কালের উপযোগী না হয়, তাহলে শিক্ষাদানের পদ্ধতিতেও ত্রুটি থেকে যায়। পাঠ্যসূচী প্রণয়নে প্রতিটি শিক্ষকের দায়িত্ব আছে, কিন্তু তা প্রণয়নের সময় সেই দায়িত্বের কথা চিন্তা করা হয় না।

শিক্ষাদানের পদ্ধতির বিষয় কিছু বলতে গেলে প্রথমে মনে পড়ে, ছাত্রের মঙ্গলময় সুপ্ত শক্তির পূর্ণ বিকাশের কথা এবং তা করতে হলে শিক্ষক ও ছাত্রের মধুর সম্পর্কের প্রয়োজন এবং তা একমাত্র সম্ভব সর্বস্তরে টিউটোরিয়াল ক্লাশের উপর সব-চেয়ে বেশী গুরুত্ব আরোপ এবং পরীক্ষা ব্যবস্থায় এই কাজের উপর 50% নম্বর স্থিরীকৃত করা। আজকাল পরীক্ষা-ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণের কথা উঠছে, কিন্তু উপযুক্ত টিউটোরিয়াল ক্লাশ ব্যতিরেকে বিকেন্দ্রীকরণের কথা ভাবা দায়িত্ব এড়াবার অজুহাত। কারণ প্রচলিত টিউটোরিয়াল ক্লাশের নামে যেখানে এক প্রহসন চলছে, সেখানে টিউটোরিয়ালে প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে সার্টিফিকেট দেবার ব্যবস্থাও আর এক প্রহসন। অনার্স, স্নাতকোত্তর, ডাক্তারি এবং ইঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষাতেও টিউটোরিয়াল ক্লাশের কথা ভাবা উচিত, অন্যথায় বিকেন্দ্রীকরণ হলেও কি বিশ্ব-বিদ্যালয় এই সব পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে চালাতে পারবেন? পঠন-পাঠন যদি সুষ্ঠুভাবে না হয়, তবে যে কোন পরীক্ষা-ব্যবস্থা প্রহসনে পরিণত হবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, একজন শিক্ষককে প্রতি বছর দশটি ছাত্র দিন—তিনি তাদের হাতে-কলমে তাঁর বিষয় শিক্ষা দিবেন, প্রতিদিনের কাজের ভিত্তিতে এবং পরীক্ষার মাধ্যমে তিনি যে সার্টিফিকেট দিবেন, তাই ছাত্রের শিক্ষার

---

* গণিত বিভাগ, বঙ্গবাসী কলেজ, কলিকাতা-9

সফলতার একমাত্র মাপকাঠি হবে। সার্টিফিকেট দেবার দায়িত্ব হবে শিক্ষকের। এতে যদি মানের তারতম্য সম্বন্ধে কেউ প্রশ্ন তোলেন, তাহলে ছাত্রের কাজের খাতা পরীক্ষার জন্যে কর্তৃপক্ষ পরীক্ষক নিয়োগ করে দেখতে পারেন এবং তৎসঙ্গে নৈবর্তক প্রশ্নের দ্বারা লিখিতভাবে ও মৌখিকভাবে ছাত্রের মেধাশক্তি পরীক্ষা করতে পারেন। ছাত্র শিক্ষকের কাছ থেকে কতটা শিক্ষা নিতে পেরেছে এবং তা ব্যবহার করতে পেরেছে, সেই সব দেখবার দায়িত্ব প্রথম শিক্ষকের। শিক্ষক যতদিন না এই দায়িত্ব গ্রহণ করবেন, ততদিন পর্যন্ত ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের মধ্যে শূন্যতা বিরাজ করবে। তবে যদি শিক্ষা-শিক্ষণকে শিক্ষক তাঁর একমাত্র কর্তব্য বলে স্বীকার করেন, তাহলে তাঁর প্রাপ্য দক্ষিণার জন্যে যেন তাঁকে রাজপথ দিয়ে সরবে স্লোগান দিতে দিতে যেতে না হয় বা শিক্ষা-বিভাগের কর্মকর্তাদের করুণার অপেক্ষায় না থাকতে হয়—তাহলেই শিক্ষকের ধ্যানধারণার বস্তু হবে একমাত্র ছাত্র এবং ছাত্রও শিক্ষককে সময়ে অসময়ে কাছে পাবে। পাঠ্যসূচীতে যদি প্রহসন না থাকে, শিক্ষাদানের পদ্ধতিতে যদি প্রহসন না থাকে, তবে যে কোন ধরণের পরীক্ষা প্রহসনে পরিণত হতে পারে না। তাই বড় বড় থিয়োরেটিক্যাল ক্লাশের সংখ্যা যতদূর সম্ভব কমিয়ে টিউটোরিয়াল ক্লাশের সংখ্যা বাড়ালে শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে এক নিগূঢ় সম্পর্ক গড়ে উঠবে। তরুণ-মন যদি ঘরে ও বাইরে দেখে সর্বত্র প্রহসনের খেলা, তবে কি সে চুপ করে থাকবে? তাই প্রবীণের পুরাতনকে আঁকড়ে ধরবার এবং নবীনের পুরাতনকে ভেঙে গড়বার মধ্যে দ্বন্দ্ব চলছে। শিক্ষাকে কালের উপযোগী করে তুলতে না পারলে এক সর্বনাশা অবস্থার সৃষ্টি হবে।

উপরিউক্ত আলোচনার ফলে পরীক্ষা-ব্যবস্থা সংস্কারের নিম্নলিখিত উপায়গুলি উল্লেখ করা যেতে পারে। যথা—(1) পরীক্ষামূলক ভিত্তিতে টিউটোরিয়াল ক্লাশের কাজের উপর 50% নম্বর স্থিরীকৃত করা, (2) মাত্র এক ঘণ্টার পরীক্ষার নৈবর্তক প্রশ্নের দ্বারা ছাত্রের মেধাশক্তি পরীক্ষা করা, এর জন্যে 25% নম্বর স্থিরীকৃত করা—এই পরীক্ষায় যোগ্য প্রশ্নকর্তার দ্বারা প্রশ্নপত্র রচিত হলে ছাত্রদের পরীক্ষার সময় পুস্তকের সাহায্য নিতে অনুমতি দেওয়া যেতে পারে। এরূপ পরীক্ষার ব্যবস্থা হলে নোটবই ও সাজেশানের চাহিদাও কমে যাবে, (3) মাত্র পাঁচ বা দশ মিনিট মৌখিক পরীক্ষার ব্যবস্থা করা এবং এর জন্যে 25% নম্বর স্থিরীকৃত করা।

পরিশেষে বলা প্রয়োজন যে, প্রচলিত শিক্ষা-পদ্ধতিতে ছাত্রেরা প্রধানতঃ কতকগুলি পুরাতন আবিষ্কৃত সত্যের কথা পাখীপড়ার মত শেখে —দৃষ্টিভঙ্গীর বিবর্তনের ইতিহাস শেখে না বা আবিষ্কারের ধারা বোঝে না। যদিও নতুন পদ্ধতিতে পড়াবার ক্ষমতার জন্যে শিক্ষকেরও চাই উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা এবং এর জন্যে শিক্ষকদের জন্যে নানা ধরণের স্কলারশিপের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন এবং ছাত্রদের জন্যেও চাই ভাল গ্রন্থাগার।

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

ফেব্রুয়ারী — 1971

চতুর্বিংশ বর্ষ — দ্বিতীয় সংখ্যা
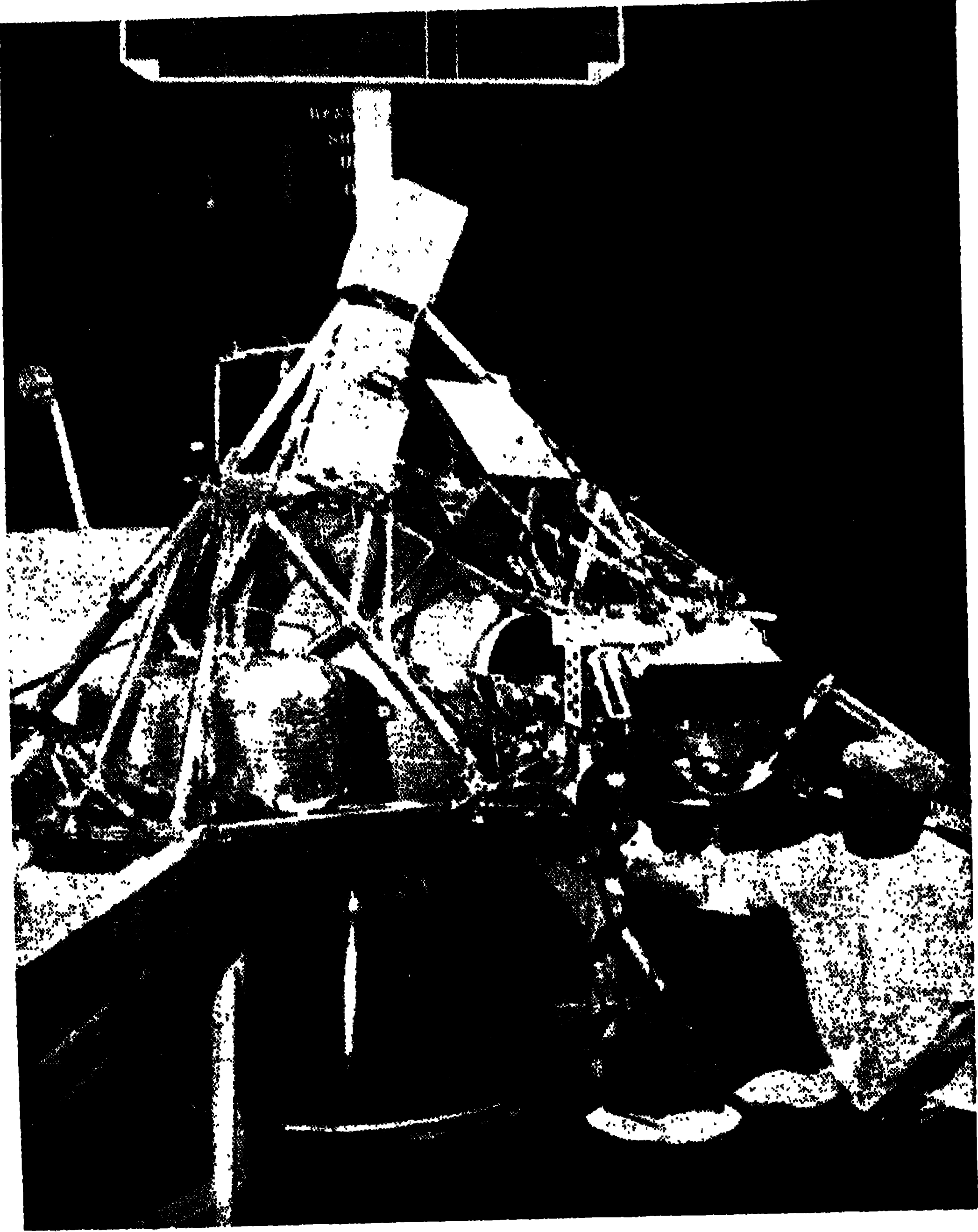
আল্‌ফা স্ক্যাটারার

পৃথিবী ছাড়া মহাকাশের যে কোন জ্যোতিষ্কের উপাদান বিশ্লেষণ করিয়া দেখিবার জন্য আমেরিকায় নির্মিত আল্‌ফা স্ক্যাটারার নামক এই যন্ত্রটি সার্ভেয়র - 5 কর্তৃক চন্দ্রপৃষ্ঠে স্থাপন করা হইয়াছে।

জলজ উদ্ভিদ

আমাদের দেশে প্রধানতঃ তিন প্রকারের জলজ উদ্ভিদ দেখা যায়। (1) কোনটি জলে ডুবে থাকে, যেমন—পাটাশ্যাওলা; (2) আবার কোনটি জলাশয়ের তলদেশে আট্‌কে থাকে, কিন্তু পাতাগুলি জলে ভাসে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে—পদ্ম, শালুক ইত্যাদির কথা। (3) আবার কতকগুলি উদ্ভিদকে দেখা যায় জলের উপর সম্পূর্ণ ভাসমান অবস্থায় রয়েছে; যেমন—কেশরদাম, কচুরিপানা ইত্যাদি।

এই সব উদ্ভিদের মূল, কাণ্ড এবং পাতার মধ্যে কিছু না কিছু বৈচিত্র্য আছে। কিন্তু কেন এই বৈচিত্র্য? একটু চিন্তা করলেই দেখতে পাওয়া যাবে—বৈচিত্র্যের প্রধান কারণ হলো পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া, যার পরিপ্রেক্ষিতে প্রত্যেক উদ্ভিদের আকৃতি-গত পরিবর্তন হয়েছে।
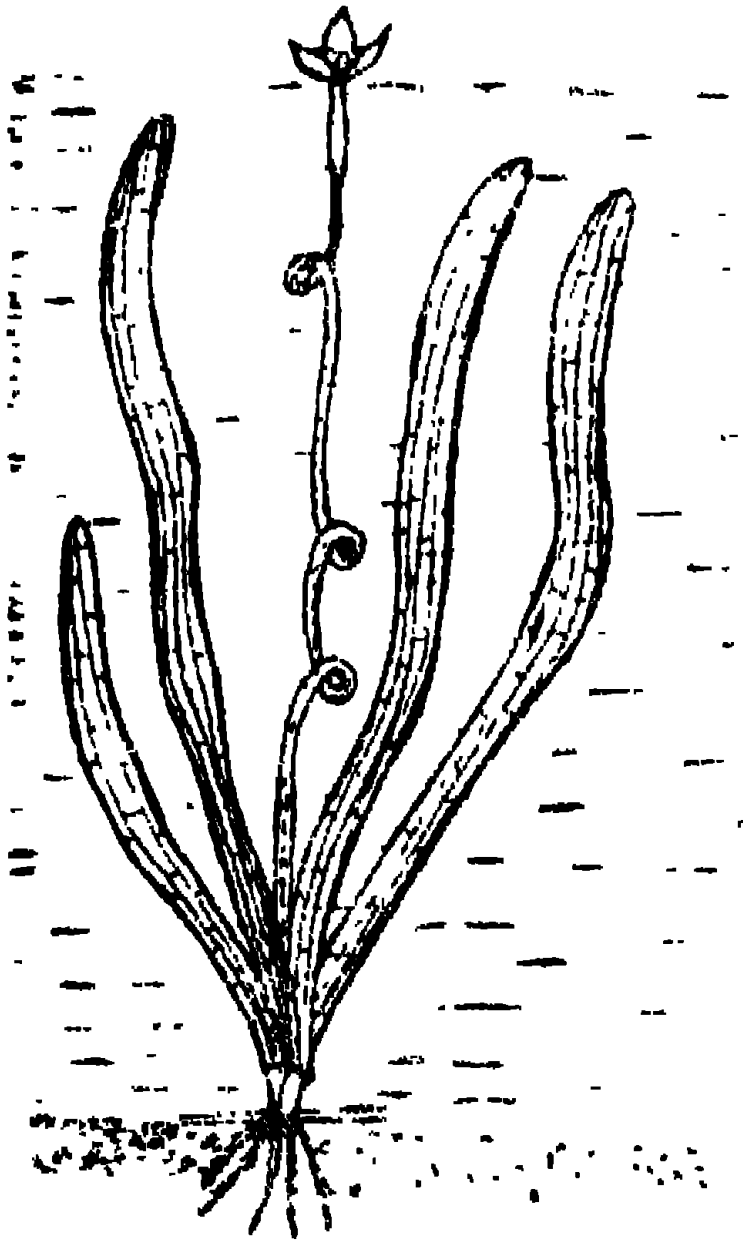
পাটাশ্যাওলা
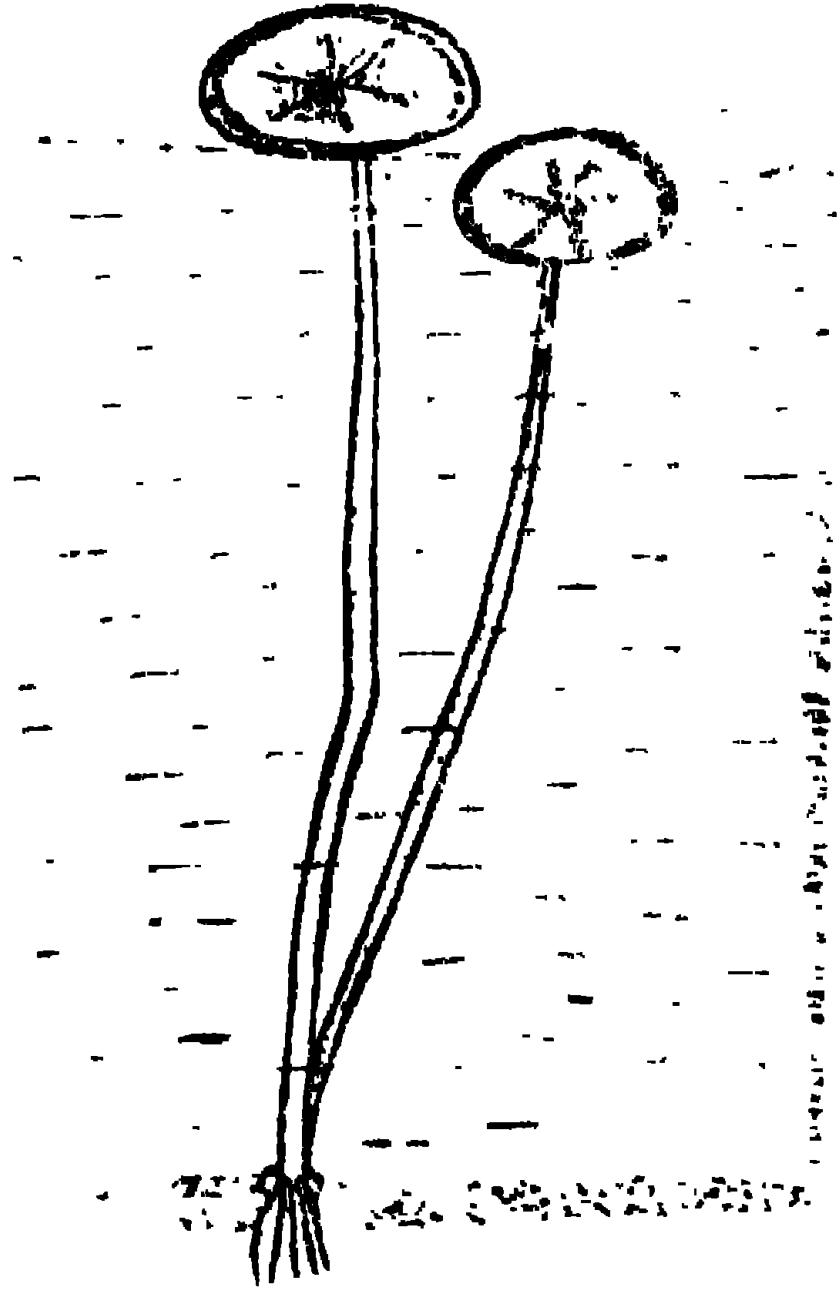
পদ্ম

যদি এই সব উদ্ভিদকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করা যায়, তাহলে প্রথমতঃ দেখা যাবে যে, এরা জলের মধ্যে বাস করে বলে এদের দেহে প্রয়োজনের অতিরিক্ত জল জমে, দ্বিতীয়তঃ পর্যাপ্ত পরিমাণে অক্সিজেনও পায় না। ফলে এদের দেহে আকৃতিগত নানা বৈচিত্র্য দেখা দেয়।

জলজ উদ্ভিদের কাণ্ড খুবই নরম এবং এদের মধ্যে অসংখ্য বাতাবকাশ থাকে। একটু চাপ দিলেই জল আর বাতাস বের হয়ে আসে। এই কারণে জলের মধ্যে থেকেও এরা বায়ুর অভাব বোধ করে না। এই সঞ্চিত বাতাসের সাহায্যেই শ্বাসকার্য ও খাদ্য উৎপাদনকার্য সমাধা হয়ে থাকে। অতিরিক্ত বাতাবকাশ থাকবার দরুণ উদ্ভিদগুলি হাল্কা

হয়ে জলে ভাসমান অবস্থায় থাকতে পারে। এই সব উদ্ভিদের কতকগুলি মূল খুব সরু আবার কতকগুলিতে একেবারে কোন মূলই থাকে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে—ঝাঁজির কথা।

মূলের প্রসঙ্গে প্রথমেই বলা প্রয়োজন—জলজ উদ্ভিদের মূল স্থলজ উদ্ভিদের মূলের মত দৃঢ় হয় না। মূল থাকলেও মূলত্র ও মূলরোম থাকে না। কারণ স্থলজ উদ্ভিদের মত এদের মূলের সাহায্যে মাটি আঁকড়ে দাঁড়িয়ে থাকবার প্রয়োজন হয় না এবং এরা সর্বদেহ দিয়ে চতুষ্পার্শ্ব থেকে জল ও জলে মিশ্রিত লবণসমূহ গ্রহণ করে। সুতরাং মূলের বিশেষ প্রয়োজন হয় না বললেই হয়। কেশরদামের ক্ষেত্রে অস্থানিক মূলগুলি পর্ব থেকে বের হয় এবং জলের উপর ভাসমান অবস্থায় থাকে। এগুলি ভাসমান মূল নামে পরিচিত। এই মূলগুলিকে সাদা রঙের ভিজা তুলার মত দেখায়। আবার কেউ কেউ একে জলজ শ্বাসমূল বলে থাকেন। এই মূলগুলির দেহের অভ্যন্তরের কোষের মধ্যস্থিত প্রচুর বায়ু এই সব উদ্ভিদকে জলের উপর ভাসমান অবস্থায় থাকতে সাহায্য করে। অনেকের ধারণা এই বায়ুর দ্বারা এরা শ্বাসকার্য পরিচালনা করে।

লিমনোফাইলা
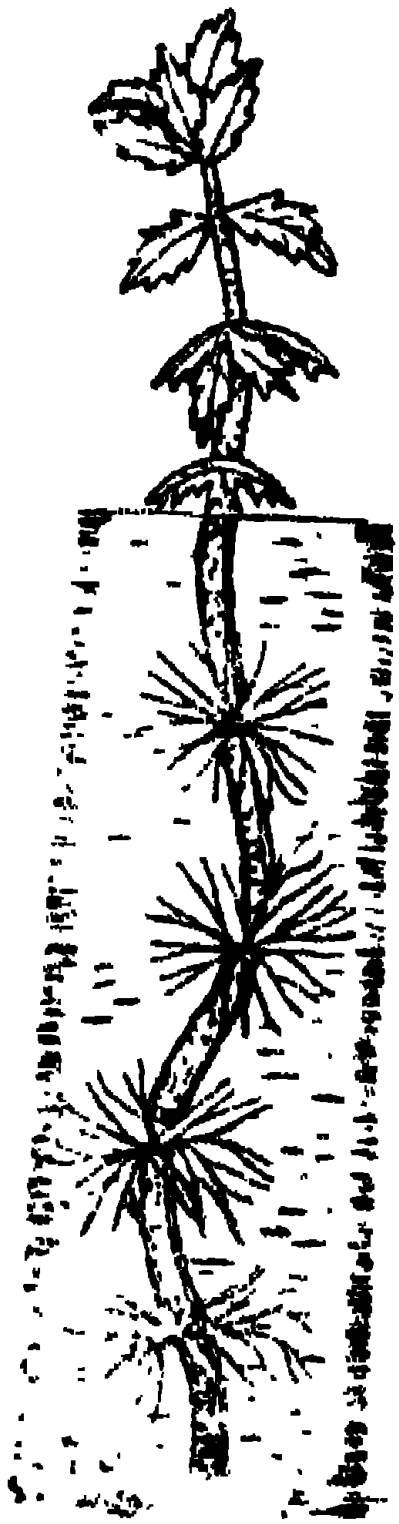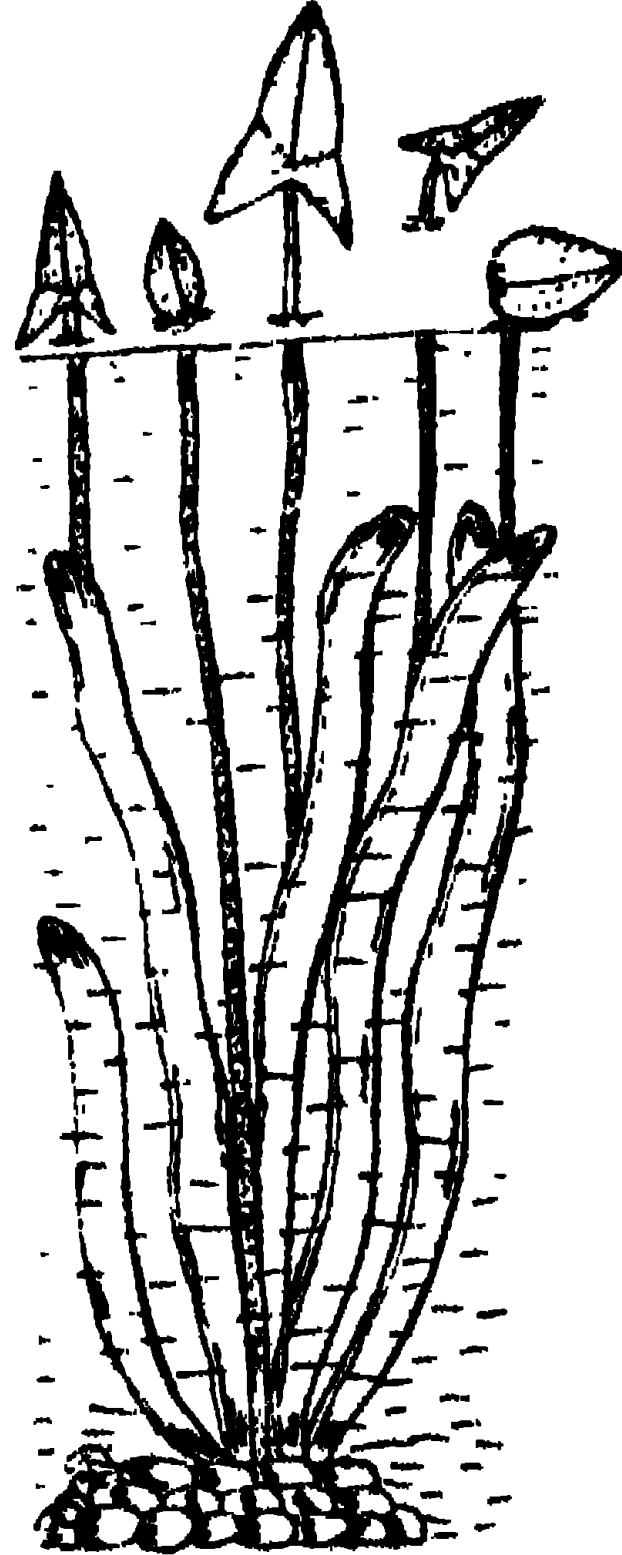
স্যাজিটেরিয়া

পাতার মধ্যেও বৈচিত্র্য আছে। এই বৈচিত্র্য নির্ভর করে পাতার সম্পূর্ণ জলে ডুবে থাকা বা না থাকবার উপর এবং জলের স্রোতের পরিমাণের উপর। যে সব উদ্ভিদের

পাতা জলের উপর ভাসে, কিন্তু দীর্ঘ পত্রবৃন্তের সাহায্যে জলাশয়ের তলদেশে আটকে থাকে। সেগুলির পাতা সাধারণতঃ গোলাকার, বড় বড় এবং তৈলাক্ত বলে মনে হয়। এরূপ হবার কারণ, যাতে পাতার উপর জল জমতে না পারে। পদ্ম ও শালুক পাতার উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। এদের দীর্ঘ পত্রবৃন্তের উপর একটু চাপ দিলেই জল ও বায়ু বের হয়ে আসে। এদের পাতার উপরের ত্বক বেশ পুরু এবং তাতে পত্ররন্ধ্র বা ষ্টোমাটা থাকে। পত্রের ত্বকের উপর কম-বেশী সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্র আছে, যেগুলিকে বলা হয় পত্ররন্ধ্র বা ষ্টোমাটা। এই পত্ররন্ধ্র শুধুমাত্র গ্যাসই নির্গত করে না, আবার তা গ্রহণও করে এবং আলোকসংশ্লেষণ, শ্বাসকার্য, বায়ু থেকে জলীয় বাষ্প গ্রহণ এবং অতিরিক্ত জল বাষ্পাকারে নির্গত করতে সাহায্য করে। পাতার নীচের ত্বক খুব পাত্‌লা হয় জল আহরণের সুবিধার জন্যে। সুতরাং পত্ররন্ধ্রের উপস্থিতিরও প্রয়োজন হয় না। তাই পত্ররন্ধ্র থাকলেও নিতান্ত অকেজো অবস্থায় থাকে।

আবার যে সব উদ্ভিদ জলে সম্পূর্ণ নিমজ্জিত থাকে, সেগুলির পাতা হয় লম্বা, সরু এবং খুব পাত্‌লা। সেগুলিতে পত্ররন্ধ্র থাকে না। কারণ পাত্‌লা ত্বকের মধ্য দিয়ে জলের সঙ্গে লবণ ও গ্যাস অনায়াসেই যাতায়াত করতে পারে; যেমন—পাতাঝাঁজি। জলের মধ্যস্থিত পাতাগুলি পাত্‌লা হবার কারণ কিউটিকলবিহীন ত্বক এবং কোষগাত্রে কিউটিন ও সুবারিনের একান্ত অভাব। কিউটিন মোমের মত এক প্রকার পদার্থ এবং সুবারিন হলো একপ্রকার তৈলাক্ত পদার্থ। এই দুই পদার্থের মধ্য দিয়ে জল বা গ্যাস যাতায়াত করতে পারে না। এই দুই পদার্থ কোষ-প্রাচীরের গাত্রে সাধারণতঃ সঞ্চিত থাকে। কিন্তু এক্ষেত্রে এর একান্ত অভাব দেখা যায়।

আবার যদি দেখা যায় যে, জলে বেশ স্রোতের প্রাবল্য রয়েছে, তবে সেই স্থানের উদ্ভিদের সব পাতা লম্বা লম্বা সুতা বা কাঁটার মত আকার ধারণ করে। এর কারণ হচ্ছে—সরু সুতার মধ্য দিয়ে যাতে জলের স্রোত বাধাপ্রাপ্ত না হয়ে অনায়াসেই যাতায়াত করতে পারে।

আবার অনেক সময় দেখা যায়, কতকগুলি উদ্ভিদের দেহের কিছুটা জলের মধ্যে এবং অবশিষ্টটা জলের উপরে রয়েছে। এসব উদ্ভিদ উভচর নামে পরিচিত। লিমনোফাইলা, স্যাজিটেরিয়া, কার্ডেনথেরা, রেনানকিউলাস ইত্যাদি এই ধরণের উদ্ভিদ। লিমনোফাইলা ও রেনানকিউলাসের ক্ষেত্রে জলের মধ্যস্থিত পাতাগুলি সুতার মত আকার নেয় এবং জলের উপরের অংশের পাতাগুলি প্রায় গোলাকার হয়। এই সকল উদ্ভিদের বাসস্থান স্রোতপূর্ণ জলাশয়। কার্ডেনথেরা উদ্ভিদের জলের মধ্যস্থিত সব পাতা কাঁটার আকার ধারণ করে এবং জলের উপরের অংশের পাতাগুলি গোলাকার বা ডিম্বাকার হয়। স্যাজিটেরিয়া উদ্ভিদের পাতাগুলি জলের মধ্যে লম্বা হয়ে থাকে এবং জলের উপরের অংশের পাতাগুলি ত্রিকোণাকৃতির হয়। এই উদ্ভিদকে সাধারণতঃ স্রোতহীন জলাশয়ে

দেখতে পাওয়া যায়। তাছাড়া একই উদ্ভিদে দুই রকমের পাতা দেখা যায়। এর প্রধান কারণ নির্ভর করে আলোর তীব্রতা এবং বাষ্পমোচনের পরিমাণের উপর। জলের উপরের অংশে আলোর তীব্রতা এবং বাষ্পমোচনের পরিমাণ বেশী। কাজেই সেখানকার পাতাগুলি প্রায় গোলাকার বা ডিম্বাকৃতির হয় এবং জলের মধ্যে আলোর তীব্রতা এবং বাষ্পমোচনের পরিমাণ অনেক কম। ফলে উদ্ভিদের নিমজ্জিত অংশের পাতাগুলি লম্বা, কণ্টকাকৃতি অথবা সরু সূতার মত হয়।
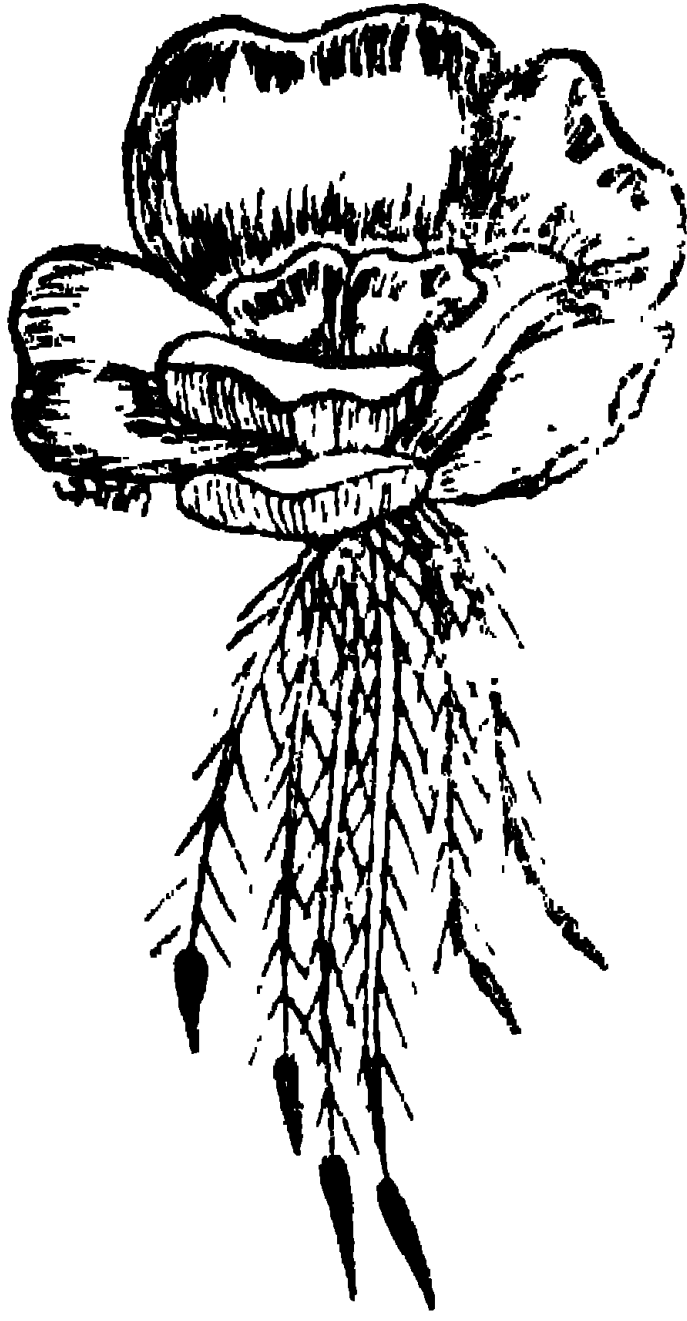
টোকাপানা

এখন আভ্যন্তরীণ অবস্থা বিচার করলে দেখা যায়, সব রকম জলজ উদ্ভিদই স্পঞ্জের ন্যায় কোষ দিয়ে গঠিত। এই সব কোষ অ্যারেনকাইমা নামে পরিচিত। কতিপয় কোষ একসঙ্গে যুক্ত অবস্থায় বিভক্ত হয় এবং বড় বড় কোষান্তর রন্ধ্রের সৃষ্টি করে। এই কোষান্তর রন্ধ্রগুলি বায়ুপূর্ণ থাকে।

কচুরিপানার স্ফীত পত্রবৃন্ত এই রকম অ্যারেনকাইমা নামক কোষ দিয়ে গঠিত এবং এর মধ্যে সঞ্চিত বায়ু উদ্ভিদটিকে জলের উপর ভাসমান অবস্থায় থাকতে সাহায্য করে। পদ্মফুলের বীজের মধ্যে এই রকম বায়ুপূর্ণ কোষ দেখা যায়। এর সাহায্যে বীজ বিস্তারের সময় হাল্কা হয়ে জলের উপর ভাসমান অবস্থায় এক স্থান থেকে সহজেই অন্য স্থানে চলে যেতে পারে।

জলজ উদ্ভিদে মিকানিক্যাল কোষ বা কোলেনকাইমা কোষ নেই বললেই চলে এবং পরিচলন কোষ খুব অল্প পরিমাণে বিদ্যমান। ভাসকুলার কোষগুলি

কেন্দ্রস্তম্ভের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। মূল ও কাণ্ডের প্রস্থে গৌণ কোষের বৃদ্ধি সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিত। এটি জলজ উদ্ভিদের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। অল্প কথায় এই হলো জলজ উদ্ভিদের আভ্যন্তরীণ গঠনের কথা।

এখন দেখা যাক, এদের বংশবিস্তার কিভাবে সম্পন্ন হয়। প্রথমেই বলে নেওয়া প্রয়োজন যে, জলজ উদ্ভিদের অধিকাংশই বহু বর্ষজীবী। অধিকাংশ উদ্ভিদ হাইবারনেসনের পন্থায় বহু বর্ষ জীবিত থাকে। হাইবারনেসন অর্থাৎ উদ্ভিদের প্রতি শাখার শেষে একটি করে শীতকালীন বড় মুকুল জন্মায়, যাতে প্রচুর পরিমাণে খাদ্য সঞ্চিত থাকে। এই মুকুলগুলি শীতকালে শাখাচ্যুত হয়ে জলাশয়ের তলদেশে পড়ে এবং গরম আবহাওয়ায় প্রস্ফুটিত হয়ে থাকে; উদাহরণস্বরূপ—আর্টিকুলেরিয়া, পোটামোগিটন ইত্যাদির কথা বলা যেতে পারে।

আবার অনেক উদ্ভিদ অঙ্গজ জননের সাহায্যে নিজেদের বংশবিস্তার করে থাকে। অঙ্গজ জনন অর্থাৎ বীজ থেকে গাছ উৎপন্ন না হয়ে কাণ্ড থেকেই নতুন গাছ জন্মায়। এটা কিরূপে সম্ভব? মূল উদ্ভিদের কাণ্ডটি জলের উপরিতলের সঙ্গে সমান্তরালভাবে বৃদ্ধি পায়। কাণ্ডটি খুব সরু, নরম এবং পর্বমধ্যগুলি বেশী দীর্ঘ হয় না। পর্বের উপর দিক থেকে পাতা এবং নীচের দিক থেকে অস্থানিক মূল বের হয়। আর দুই পর্বের মধ্যের অংশটি ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে এক-একটি স্বাধীন উদ্ভিদে পরিণত হয়। এই ধরণের অঙ্গজ জনন কেবলমাত্র জলে সম্পূর্ণ ভাসমান উদ্ভিদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ; যেমন—কচুরিপানা, টোকাপানা ইত্যাদি।

এই বিষয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে পাটাশ্যাওলার পরাগসংযোগ। পাটাশ্যাওলার পুরুষ ফুল স্প্যাডিক্সের আকারে অবস্থান করে। এক-একটি পূর্ণতাপ্রাপ্ত পুরুষ ফুল বৃন্তচ্যুত হয়ে জলের উপরিতলে ভাসমান অবস্থায় থাকে। অপর দিকে স্ত্রী-পুষ্পের দীর্ঘ পুষ্পবৃন্ত কুণ্ডলীর আকারে জলের নীচে থাকে এবং যখন পূর্ণতা লাভ করে তখন ধীরে ধীরে কুণ্ডলী খুলে যায় এবং জলের উপরিতলে ভাসমান অবস্থায় অবস্থান করে এবং ঐ স্ত্রী-পুষ্পটিকে চারদিক থেকে পুরুষ ফুল ঘিরে থাকে। অতঃপর পুরুষ ফুলের পরাগধানী ফেটে যায় এবং পরাগ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। আঠালো পরাগ স্ত্রী-পুষ্পের গর্ভমুণ্ডে লেগে যায়। একেই পরাগসংযোগ বলা হয়। পরাগসংযোগ হবার সঙ্গে সঙ্গে পুষ্পবৃন্ত পুনরায় কুণ্ডলী পাকিয়ে জলাশয়ের তলদেশে চলে যায়। জলাশয়ের তলদেশে পৌঁছুবার পর ফল পূর্ণতা লাভ করে। আর সেই পূর্ণতাপ্রাপ্ত ফল থেকেই আর একটি নতুন পাটাশ্যাওলার জন্ম হয়। এই জাতীয় জলজ উদ্ভিদের সংখ্যা এভাবেই ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়।

এণাক্ষী রায়চৌধুরী

কেফিনের কথা

পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই চা এবং কফির কদর—বিশেষ করে শীতপ্রধান অঞ্চলের লোকেদের প্রিয় পানীয় হলো চা এবং কফি। আগের দিনে চায়ের নেশা খুব কম লোকেরই ছিল। তখন চা সম্পর্কে লোকের ধারণাই ছিল অন্য রকম। এখন কিন্তু চা-কে একটি প্রিয় পানীয় হিসাবে আমরা ব্যবহার করছি। এই ব্যাপারে কফিও কম যায় না। এই চা এবং কফির মধ্যে এক রকম রাসায়নিক পদার্থ আছে, যাকে বলা হয় কেফিন। চা ও কফিতে এই কেফিনের মাত্রা বেশী থাকলে ঐ চা বা কফি খেলে শরীরের নানা রকম ক্ষতি হতে পারে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে, কিড্‌নী ও হৃৎপিণ্ডের কর্মক্ষমতা হ্রাস পাওয়ার কারণ, কেফিনমিশ্রিত চা ও কফি পান করা। কাজেই চা ও কফি থেকে যদি কেফিন বের করে নেওয়া যায়, তবে এই সব রোগযন্ত্রণা থেকে রেহাই পাওয়া যেতে পারে। সেই জন্যে বর্তমানে এ নিয়ে বিভিন্ন দেশে গবেষণা চলছে।

কারো কারো মতে, চা এবং কফিতে কেফিনের উপস্থিতি শুধুমাত্র ক্ষতিকারকই নয়, এর কিছু উপকরিতাও আছে। এর জন্যে বর্তমানে নানা রকম ওষুধ প্রস্তুতিতে কেফিন ব্যবহার করা হচ্ছে। ডাক্তারী মতে, স্নায়ুতন্তুগুলিকে কার্যক্ষম রাখতে ও শরীর থেকে মূত্র নির্গমন ঠিক রাখতে হলে কেফিনই একমাত্র ওষুধ। শরীরের ক্লান্তি ও অবসাদ দূর করতে কেফিন যথেষ্ট সহায়তা করে। মাথা ধরলে বা মাথায় যন্ত্রণা হতে থাকলে কেফিন খুবই ফলপ্রদ। পরীক্ষার আগে রাত জাগবার জন্যে ছাত্রসমাজে এই বড়ি খুবই আদরনীয়। ঠাণ্ডা পানীয়ের সঙ্গে অল্প পরিমাণে কেফিন মিশিয়ে পান করলে মুহূর্তের মধ্যেই ক্লান্ত শরীরকে চাঙ্গা করা যায়। এবার কেফিনের গঠন সম্পর্কে কিছু বলছি।

কেফিন (যার ফর্মুলা $C_8H_{10}N_4O_2$) হলো পিউরিন গ্রুপের একটা যৌগ। আরও পরিষ্কার করে বলতে গেলে কেফিনকে 1,3,7 ট্রাইমিথাইলজ্যান্থিনও বলা যেতে পারে। কফি ও চা ছাড়া গ্যারানা, কোলা বাদামে প্রচুর পরিমাণে এবং কোকোতে স্বল্প পরিমাণে কেফিন থাকে। কৃত্রিম উপায়েও আজকাল কেফিন তৈরি করা হচ্ছে। তবে কেফিন প্রস্তুতের জন্যে কফি ও চা-ই বেশী পরিমাণে ব্যবহৃত হয়, কারণ এই দুটিতে অন্যান্য জিনিষের তুলনায় কেফিনের পরিমাণ অনেক বেশী। শুষ্ক কফি তৈরির সময় অবশেষ হিসাবে কেফিন পাওয়া যায়। এই কফিতে শতকরা 1·2 ভাগ কেফিন থাকে। কেফিন সংগ্রহ করবার জন্যে অনেক রকম পদ্ধতির সহায়তা নেওয়া হয়। বাগান থেকে কফি সংগ্রহের পর সেগুলিকে পরিষ্কার করে জলে ধুয়ে রৌদ্রে শুকানো হয়। পরে মেশিনের সাহায্যে একেবারে গুঁড়া করা হয়। এই পদ্ধতিতে শতকরা প্রায় 97 ভাগ কেফিন দূর হয়ে যায়। ব্যবসায়িক দিক দিয়ে পূর্বোক্ত পদ্ধতিই লাভজনক। এই পদ্ধতিতে কেফিনবিমুক্ত কফির স্বাদ ও গন্ধ অবিকৃত থাকে। কফি থেকে কেফিন দূর করবার আরও অনেক পদ্ধতি আছে। তন্মধ্যে একটা পদ্ধতি হলো, পরিষ্কার করবার পর কফিকে একটি বিশেষ দ্রাবকে ভিজিয়ে রাখা। এই

পদ্ধতিতে প্রথমে কফি থেকে শতকরা 10 থেকে 18 ভাগ আর্দ্রতা দূর করা হয়। তারপর যে জিনিষটা পাওয়া যায়, তার সঙ্গে একটা জৈব দ্রাবক ট্রাইক্লোরোইথিলিনের বিক্রিয়া ঘটানো হয়, যাতে 97% কেফিন দূরীভূত হয় কফি থেকে। এর পর যে অবশেষ পড়ে থাকে, তার মধ্যে খুব তাড়াতাড়ি বাষ্প পাঠানো হয়। এখন এই যে কফি পাওয়া গেল, তা সম্পূর্ণ কেফিনমুক্ত। এই কেফিনমুক্ত কফিকে আরও ভালভাবে শুকিয়ে নিয়ে প্যাক করে বিভিন্ন বাক্সে রাখা হয়। আগেই বলেছি, পরিশুদ্ধ কেফিন থেকে আজকাল নানা রকম ওষুধ প্রস্তুত করা হচ্ছে। পরিত্যক্ত কেফিনকে পরিশুদ্ধ করবার জন্যে কেফিনের মধ্য দিয়ে গরম জলের প্রবাহ পাঠানো হয়। এই গরম জলে কেফিন সহজেই দ্রবীভূত হয়। তার পর এই দ্রবণকে ঠাণ্ডা করলে কেলাসের আকারে কেফিন বেরিয়ে আসে।

কেফিন যে কেবল কফি থেকেই সংগৃহীত হয়, তা নয়—চা থেকেও প্রচুর পরিমাণে কেফিন পাওয়া যায়। চা বাগানের চা তোলবার পর মাটিতে যে চায়ের পাতা, ডাঁটা পড়ে থাকে, তার মধ্যেও শতকরা 3-4 ভাগ কেফিন থাকে। এই কেফিন সংগ্রহ করতে হলে ঐ সব চায়ের পাতার সঙ্গে জল ও চুন মিশিয়ে কিছুক্ষণ গরম করে নিতে হয়। এখন এই যে দ্রবণ পাওয়া গেল, তাকে ক্রমান্বয়ে গরম ও ঠাণ্ডা করে স্ফটিকে পরিণত করা হয়। কয়েক বার ক্রিস্ট্যালাইজ করলে বিশুদ্ধ কেফিন পাওয়া যায়। চুন ছাড়াও টলুওল বা ক্লোরোফরমের সঙ্গে বাগান থেকে কুড়ানো চা-পাতা বা অন্যান্য ময়লামিশ্রিত চা এবং পরিমিত জল মিশিয়ে জ্বাল দিলেও কেফিন পাওয়া যেতে পারে।

তোমরা জান, পৃথিবীর মধ্যে চা উৎপাদনে ভারতের স্থান প্রথম। সত্যই এটা আমাদের গর্বের বিষয়। বহু যুগ ধরে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ভারতীয় জাহাজ চা বোঝাই করে পাড়ি দিয়ে আসছে। পরিবর্তে নিয়ে আসছে বহু আকাঙ্খিত বৈদেশিক মুদ্রা। ভারতবর্ষের চা-এর অভাব নেই। আমাদের দেশে প্রচুর পরিমাণে কেফিন উৎপন্ন করা যেতে পারে এই চা থেকে। দুঃখের বিষয়, চা থেকে কেফিন তৈরির কারখানা ও প্রয়োজনীয় রাসায়নিক দ্রব্যের বড়ই অভাব আমাদের দেশে, ফলে আমরা কেফিন তৈরি করতে পারছি না। ওষুধ তৈরির জন্যে প্রয়োজনীয় কেফিন বিদেশ থেকে কিনে আনতে হচ্ছে বহু পয়সা খরচ করে। বাণিজ্য দপ্তরের মতে, 1964-65 সালে 38,315 কিলোগ্র্যাম কেফিন কিনতে হয়েছে বিদেশ থেকে। আর 1965-66 সালে এই পরিমাণ বেড়ে গিয়ে দাঁড়ায় 77095 কিলোগ্র্যামে। অথচ আমাদের দেশে উৎপন্ন চায়ের পরিমাণ হলো 335 লক্ষ কিলোগ্র্যাম। এর মধ্যে অর্ধেক চা আসে আসাম থেকে।

সম্প্রতি আসামের Regional Research Laboratory চা থেকে কেফিন তৈরির জন্যে এক কারখানা স্থাপন করেছেন। বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ের ব্যাপারে তাঁদের এই প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়।

হিল্লোল রায়

মেঘ-বিদ্যুৎ-বজ্রপাত

প্রাচীন যুগের মানুষ আকাশের কোলে বিদ্যুৎ ও বজ্র সম্বন্ধে অনেক কিছু অদ্ভুত কল্পনা করতো। বিদেশী প্রাচীন পণ্ডিতদের এই সম্বন্ধে এক মজার ধারণা ছিল যে, মেঘের ভিতরকার কিছু পরিমাণ বাষ্প জ্বলেই বুঝি বিদ্যুতের সৃষ্টি হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিজ্ঞানীদের অক্লান্ত প্রচেষ্টার ফলে আসল তথ্য জানা যায়। ইংল্যাণ্ডের বিখ্যাত বিজ্ঞানী ফ্যারাডেই হলেন এই রহস্য সমাধানের পথিকৃৎ।

পরীক্ষায় দেখা গেছে, আকাশে যে মেঘ ভেসে বেড়ায়—তা তড়িৎগ্রস্ত। ধরা যাক, কোন একখণ্ড মেঘ কোন কারণে ধন-বিদ্যুৎ পূর্ণ হয়েছে। কোন জিনিষকে বিদ্যুৎযুক্ত করে তার কাছে যদি আর একটা পরিচালক পদার্থ রাখা হয়, তবে তাতে বিপরীতধর্মী বিদ্যুৎ জন্মায়—একে বিদ্যুতের আবেশ বলে। তারপর দুই বিদ্যুতের শক্তির প্রাবল্যে যখন বিদ্যুৎ-শক্তির অবক্রম (Potential gradient) প্রতি ইঞ্চিতে প্রায় 30,000 ভোল্ট, তখন বাতাসের বাধা তুচ্ছ হয়ে গিয়ে দেখা যায় উজ্জ্বল আলোর গতি, যাকে বলি বিদ্যুৎ-স্ফুরণ বা তড়িৎ-মোক্ষণ।

তাহলে বিদ্যুৎ কি একটা আগুনের মত জিনিষ? না, বিদ্যুৎকে কখনো চোখে দেখা যায় না। স্ফুলিঙ্গের আলো বিদ্যুতের আলো নয়। এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাবার প্রাক্কালে বৈদ্যুতিক শক্তি মাধ্যমের বাতাস ও ধুলিকণাকে উত্তপ্ত ও প্রজ্বলিত করে এবং তারই ফলস্বরূপ আমরা আলো দেখতে পাই। তাই বিদ্যুৎ তাপ বা আলো সৃষ্টি করে মাত্র।

বিদ্যুৎ-চমকের আকৃতি-প্রকৃতি নানা রকম, কখনো গগন বিদীর্ণ করে আগুনের বলের মত সোজাপথে নীচে নেমে আসে, কখনো বা মেঘের কোলেই আঁকাবাঁকা পথে মিলিয়ে যায়। যখন বিদ্যুৎ-শক্তির প্রাচুর্য থাকে, তখন সোজাপথে চলে, তা না হলে শাখা-প্রশাখায় বক্রগতি দেখা যায়। কম শক্তিশালী বিদ্যুৎ তার গতিপথে কোন কঠিন কণিকা, পূর্ববর্তী কোন বিদ্যুৎ-স্ফুরণের পথ বা অন্য কোন জিনিষের বাধা পেলে গতিপথ পরিবর্তন করে ভিন্ন পথে কম বাধায় চলে। এমনি করেই সৃষ্টি হয় বিদ্যুতের আঁকাবাঁকা পথ। এছাড়াও অনেক সময় দেখা যায় কোন বিদ্যুৎ-স্ফুলিঙ্গ নেই, অথচ মেঘ-জমা আকাশের কোলে আলোর আভাস পাওয়া যায়। কারণ হিসেবে বলা যায়, একই মেঘের ভিতরে এক দিকের বিদ্যুৎ যখন অন্য দিকের বিদ্যুতের সঙ্গে মিলিত হতে যায়, তখনই সূচিত হয় ঐ রকম আলো কিংবা দৃষ্টির বাইরে দূরের কোন মেঘ থেকে বিদ্যুতের আলোর প্রতিফলন।

সমস্ত বিদ্যুৎ-স্ফুলিঙ্গের রং এক রকম নয়—কখনো সাদা, কখনো তামাটে আবার

কখনো বেগুনী। সাধারণতঃ কম উচ্চতার মেঘ থেকে সাদা স্ফুলিঙ্গ—আর খুব উঁচু মেঘ থেকে নির্গত স্ফুলিঙ্গগুলিকে বেগুনী রঙের দেখা যায়। স্ফুলিঙ্গের রং থেকে তাই মোটামুটি মেঘের একটা উচ্চতা অনুমান করা যায়।

বিদ্যুতের সঙ্গে বজ্রপাতের সম্পর্ক কোথায়? মেঘের বিদ্যুৎ যখন মেঘ থেকে ছুটে এসে মাটিতে পড়ে, তখন এই বিদ্যুৎ-স্ফুলিঙ্গকেই আমরা বাজ বলি। ধরা যাক, মাথার উপরের মেঘ ধন-বিদ্যুতে পূর্ণ। স্বাভাবিক কারণে নীচের মাটিতে ঋণ বিদ্যুতের আবেশ হবে। তড়িতাহিত মেঘ ও কাছের পৃথিবী-পৃষ্ঠকে একটা ধারক হিসাবে ধরা যায়। বাতাস হলো মধ্যেকার তড়িৎ-বিভাজক (Dielectric)। বিদ্যুতের শক্তি যত বাড়বে অর্থাৎ যতই বিভব-পার্থক্য বৃদ্ধি হবে, ততই তাদের মিলনের প্রবণতা বৃদ্ধি পাবে। যখন বিভব-পার্থক্য একটা নির্দিষ্ট মান অতিক্রম করে যায়, তখন তড়িৎ-বিভাজক অকেজো হয়ে পড়ে—ছুই বিপরীতধর্মী বিদ্যুতের মিলনে আর তা বাধাদান করতে পারে না। তাই ধন-বিদ্যুৎ প্রকাণ্ড স্ফুলিঙ্গের আকার নিয়ে নীচে এসে মিলিত হয় মাটির বিদ্যুতের সঙ্গে—যাকে বলা হয় বজ্রপাত।

বজ্রপাতে বাড়ী-ঘর, গাছপালা সব পুড়ে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়, কখনো কখনো প্রাণীদের মৃত্যুও ঘটে। বজ্রপাতে মৃত্যু কিন্তু মোটেই কষ্টকর বা যন্ত্রণাদায়ক নয়। মেঘ থেকে মাটিতে আসতে বিদ্যুতের এক সেকেণ্ডের লক্ষ লক্ষ ভাগের চেয়েও কম সময় লাগে। মৃত্যু ঘটতে লাগে আরও কম সময়। মৃত্যু-যন্ত্রণা বোঝবার আগেই আসে মৃত্যু। অনেক সময় বজ্রপাতের জায়গা থেকে কখনো এক-শ' বা ছু-শ' হাত দূরের প্রাণীকেও মরতে দেখা যায়। হঠাৎ শারীরিক পরিবর্তনই এই মৃত্যুর কারণ। বজ্রপাতের পূর্বে মাটিতে, তথা প্রাণিদেহে উপরকার মেঘ বিদ্যুতের আবেশ সৃষ্টি করে অর্থাৎ তখন প্রাণিদেহে বিদ্যুৎ জমা হয়। বজ্রপাতের সঙ্গে সঙ্গে ধনাত্মক ও ঋণাত্মক বিদ্যুৎ মিলে সব বিদ্যুতের বিলুপ্তি ঘটায়। হঠাৎ প্রাণিদেহে বিদ্যুতের বিলুপ্তি ঘটলে শরীরের ভিতর ঘটে বিরাট পরিবর্তন, ফলে অনুভূত হয় প্রচণ্ড ঝাঁকুনি। প্রাণীরা তা সহ্য করতে না পেরে মারা যায়। ছু'চার-শ' গজ দূরে বাজ পড়লে গন্ধক পোড়বার মত এক রকম গন্ধও পাওয়া যায়, কারণ বিদ্যুৎ-স্ফুরণের সময় সেখানকার অক্সিজেন ওজোনে (O_3) পরিণত হয়।

বিদ্যুৎ-স্ফুরণের পরেই গগনভেদী গর্জন শোনা যায়। বিদ্যুৎ-প্রবাহ যে পথে চলে, প্রচণ্ড তাপের জন্যে সেখানকার বাতাস হঠাৎ উত্তপ্ত, সম্প্রসারিত ও হাল্কা হয়ে উপরে উঠতে চেষ্টা করে এবং প্রায় সহসাই তা ঠাণ্ডা হয়ে যায়। সে সঙ্গে চতুর্দিকের বেশী চাপের বাতাসও চাপ দেয়—ফলে হয় সঙ্কোচন। আর এই সব চাপ বা দ্রুত আলোড়নই সৃষ্টি করে মেঘ-গর্জন বা বজ্রনাদের। বিদ্যুৎ যখন সোজা পথে গিয়ে কাছের মেঘে উপস্থিত হয়, তখন কামানের গোলা ছোঁড়বার আওয়াজের মত কেবল একটা শব্দ শুনতে পাওয়া যায় আর আঁকাবাঁকা পথে চললেই শোনা যায় গুরু গুরু আওয়াজ। বাতাসকে

আলোড়িত করে মেঘের বিদ্যুৎ যে শব্দের ঢেউ তোলে, তা ঘুরে-ফিরে মেঘ থেকে মেঘে ধাক্কা খেয়ে বেড়ায় ; অর্থাৎ হয় শব্দের বহুল প্রতিফলন বা প্রতিধ্বনি আর তারই ফলে হয় গুরুগুরু আওয়াজ।

বিদ্যুৎ-চমকের স্থায়িত্বকাল কখনও $\frac{1}{৫,০০০}$ সেকেণ্ডের বেশী হয় না। বিদ্যুৎ-চমকের কিছু পরেই শ্রবণেন্দ্রিয়ের পর্দায় ধাক্কা দেয় তার শব্দ। আলো এবং শব্দ যদিও এক সঙ্গেই উৎপন্ন হয়, তথাপি এক সঙ্গে দেখা ও শোনা যায় না। বিদ্যুতের আলো ও শব্দের দৌড়ের পাল্লায় শব্দ বেশ পিছনে পড়ে যায়। আলো চলে সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল বেগে, আর শব্দ চলে সেকেণ্ডে মাত্র 1120 ফুট বেগে। এক মাইল দূরের মেঘ থেকে এই গতিতে শব্দের আসতে প্রায় পাঁচ সেকেণ্ড সময় লাগে অথচ ঐ দূরত্ব থেকে আসা চোখে-পড়া আলোর জন্যে যে সময় লাগে, তা ধর্তব্যের মধ্যেই আসে না। বজ্রনাদ শুনলে তাই বজ্রাহত হবার ভয় থাকে না, কারণ বজ্রাহত ব্যক্তির বজ্রনাদ শোনবার সময় থাকে না। আলো দেখবার কত সেকেণ্ড পরে শব্দ শোনা গেল, তা জানলে বিদ্যুৎ-স্ফুরণের দূরত্ব অতি সহজেই জানা যায়। অনেক সময় আবার আলোর নিশানাই শুধু দেখা যায়, কিন্তু তার শব্দ কানে এসে পৌঁছায় না। তার মানে হলো, অনেক দূরের মেঘে বিদ্যুৎ-স্ফুরণ হয়েছে, তাই শব্দ কানে এসে পৌঁছুতে পারে না।

1752 সালে বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন তাঁর বিখ্যাত ঘুড়ির পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ করেন যে, মেঘ তড়িৎগ্রস্ত অবস্থায় থাকে। বায়ুমণ্ডল ও মেঘে বিদ্যুৎ-উৎপত্তির উৎস কোথায়? বায়ুমণ্ডল ও মেঘে তড়িতাধানের উপস্থিতির নানাবিধ কারণ বিজ্ঞানীরা দেখিয়েছেন। সূর্য থেকে আসা অতিবেগুনী রশ্মি, মহাজগৎ থেকে বিকিরিত মহাজাগতিক রশ্মি, পৃথিবী-পৃষ্ঠের তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে নির্গত রশ্মি প্রভৃতি বায়ুমণ্ডলের কণা ও মেঘের জলবিন্দুগুলিকে সর্বদা তড়িতাহিত করে। ডক্টর জি. সি. সিম্পসনের (1909) সর্বজনস্বীকৃত আবিষ্কৃত তত্ত্বই মোটামুটিভাবে মেঘে বিদ্যুৎ-উৎপত্তির রহস্যের সমাধান করেছে। ডক্টর সিম্পসন কিছুদিন ভারতেই আবহাওয়া অফিসে কাজ করেছিলেন। প্রথমে মেঘ সম্বন্ধে কিছুটা অনুসন্ধান করা হয়। গ্রীষ্মের প্রখর উত্তাপে পুকুর, নদী, সমুদ্র প্রভৃতির জল বাষ্পীভূত হয়। জলীয় বাষ্প বায়ু অপেক্ষা হাল্কা, তাই ওপরের দিকে ওঠবার সময় ঠাণ্ডা হয়ে ছোট ছোট জলকণায় পরিণত হয়। বাতাসে ভাসমান অসংখ্য জলকণা যখন এক জায়গায় জড়ো হয়, তখনই তাকে মেঘ বলা হয়। জলকণাগুলি ঠাণ্ডা বাতাসের সংস্পর্শে এসে একত্রে জমাট বেঁধে বড় বড় ভারী ফোঁটায় পরিণত হয়। বাতাসে তখন সেগুলি আর ভেসে থাকতে পারে না বলেই ভূপৃষ্ঠে পড়ে—একে বলা হয় বৃষ্টিপাত। নানা রকমের মেঘ দেখা যায়। নীল আকাশের গায়ে ভেসে বেড়ায় পেঁজা তুলা বা জড়ো-করা পাখীর পালকের মত

মেঘ—তার নাম অলকমেঘ (Cirrus)। মাটি থেকে প্রায় পাঁচ-সাত মাইল উপরে এর অবস্থান এবং এই মেঘে বৃষ্টি হয় না। স্তূপীকৃত তুলার মত মেঘকে বলা হয় স্তূপ-মেঘ (Cumulus)। স্তূপমেঘের চূড়াগুলির আকৃতি লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় যে, নীচেকার বাষ্পই উপরে উঠে জমাট বেঁধেছে। এই স্তূপমেঘই বৈশাখ মাসে ঘটায় কালবৈশাখী কিংবা ঝড়, বিদ্যুৎ, বজ্রপাত ও শিলাবৃষ্টি। শরতের শেষে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় দিগন্ত রেখার কাছে এক রকম ধূসর বর্ণের মেঘ স্তরে স্তরে সাজানো থাকে, তার নাম হলো স্তরমেঘ (Stratus)। স্তরমেঘ থেকে অনেক সময় বৃষ্টি হয়। প্রায় সমগ্র বর্ষাঋতুতে আকাশজোড়া কালো মেঘের ঘনঘটা দেখা যায়—একে বলা হয় জলদ মেঘ (Nimbus)। এই মেঘ মাটির প্রায় আধ মাইলের কাছাকাছি থেকে বজ্র-বিদ্যুৎসহ প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটায়।

বড় বৃষ্টির ফোঁটা যখন খুব উঁচু থেকে নীচের দিকে পড়তে থাকে, তখন তা তার নিজের আকৃতি ঠিক রাখতে পারে না—বিকৃত ও বিস্তৃত হয় এবং ভেঙ্গে ভেঙ্গে ছোট ছোট বিন্দুতে পরিণত হয়। গণিতের সাহায্যে এবং প্রত্যক্ষ পরীক্ষায় দেখা যায় যে, এই বিন্দুগুলির ব্যাস কখনও $\frac{1}{8}$ ইঞ্চির বেশী হয় না। জার্মান পণ্ডিত লেনার্ড দেখিয়েছেন যে, জলের ফোঁটা যত বড়ই হোক না কেন, তা বাতাসের ভিতর দিয়ে সেকেণ্ডে নয় গজ বেগে নীচে নামতে গেলেই ভেঙ্গে ছোট ছোট বিন্দুতে পরিণত হবে। শুধু তাই নয়, নীচের বাতাসও যখন সেকেণ্ডে নয় গজ বেগে উপরে উঠতে থাকে, তখনও সেই প্রবাহে বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটা ভেঙ্গে ছোট ছোট জলকণায় বিভক্ত হয়ে যায়। যদি নিজের বেগ বা বাতাসের বেগ সেকেণ্ডে নয় গজের বেশী হয়, তাহলেই বড় জলবিন্দুগুলি ভেঙ্গেচুরে ছোট হয়ে যায়। তাই খুব বড় বৃষ্টির ফোঁটা মাটিতে পড়তে দেখা যায় না। সিমলার পাহাড়ে বসে পরীক্ষা করে ডক্টর সিম্পসন দেখিয়েছেন যে, নিজের বেগ বা বাতাসের বেগ সেকেণ্ডে নয় গজের বেশী হলেই বড় জলবিন্দুগুলি ভেঙ্গে ছোট হয়ে যায়; ছোট বিন্দুগুলি ধন-বিদ্যুতে এবং পাশের বাতাস ঋণবিদ্যুতে আহিত হয়। ভেঙ্গে যাবার প্রাক্কালে জলকণা থেকে কতকগুলি ইলেকট্রন বেরিয়ে যাওয়ায় এই ব্যাপার ঘটে থাকে। জলপ্রপাত বা ফোয়ারার কাছের বাতাসকেও ঠিক একই কারণে ঋণ-বিদ্যুতে আহিত দেখা যায়। নীচে নামবার সময় ধনাত্মক বিদ্যুৎ-যুক্ত জলকণাগুলির মধ্যে যেগুলি ঊর্ধ্বগামী বাতাসের প্রচণ্ড প্রবাহের মধ্যে পড়ে, সেগুলিকে বাধ্য হয়ে বাতাসের সঙ্গে উপরের দিকে যেতে হয়। কিন্তু উপরে উঠেও নিস্তার নেই। কারণ সম-তড়িৎ পরস্পরকে বিকর্ষণ করে। সুতরাং একই ধন-বিদ্যুতে পরিপূর্ণ জলকণাগুলি উপরে উঠে পৃথক থাকবার জন্যে চেষ্টা করে। এর ফলে ছোট জলকণাগুলি মিলে ঠিক আগের মত বড় বড় ফোঁটার আকৃতি ধারণ করে নীচে নামতে সুরু করে। ফোঁটাগুলি তখন কিন্তু প্রচুর ধন-বিদ্যুতে পূর্ণ থাকে। নীচে নামবার সময় আবার এগুলি ছোট ছোট জলকণায়

বিভক্ত হয় এবং একই ভাবে উপরে এসে বড় ফোঁটায় পরিণত হয়। এরূপ কিছুক্ষণ অবিরাম উঠা-নামা চলে এবং সঙ্গে সঙ্গে ধন-বিদ্যুতের পরিমাণও ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকে। অবশেষে অধিকাংশ জলের ফোঁটা ধন-বিদ্যুৎ সঙ্গে নিয়ে বৃষ্টির আকারে ভূপৃষ্ঠে পতিত হয়; ফলে মেঘের চূড়াগুলি ঋণ-বিদ্যুতে পূর্ণ হয়ে যায়। তার পর এই বিদ্যুতের পরিমাণ যখন বেশী হয়, তখন মেঘের অন্য অংশে ধন-বিদ্যুতের আবেশ সৃষ্টি হয়। এর পর দুই বিপরীতধর্মী বিদ্যুৎ স্ফুলিঙ্গাকারে মিলিত হয়ে তড়িৎ-মোক্ষণ বা বিদ্যুৎ-চমক সৃষ্টি হয়। এইভাবে কিন্তু সব ঋণ-বিদ্যুতের বিলুপ্তি ঘটে না; কিছু কখনো কখনো ছোট ছোট জলবিন্দুর সঙ্গে বৃষ্টির সময় মাটিতে পতিত হয়। পরীক্ষা করে দেখা গেছে ধনাত্মক আয়ন অপেক্ষা ঋণাত্মক আয়নকেই কেন্দ্র করে সহজে বাষ্প জমা হয়ে বৃষ্টির ফোঁটায় পরিণত হয়। সুতরাং এভাবে গঠিত বৃষ্টির ফোঁটা প্রধানতঃ ঋণ-তড়িৎই বহন করবে। এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা বলা দরকার, বিশ্রী আবহাওয়া ও বৃষ্টির সময় বাতাস সাধারণতঃ ঋণ-তড়িৎগ্রস্ত থাকে; অন্য সময় অর্থাৎ ভাল আবহাওয়ায় ধন-তড়িৎগ্রস্ত অবস্থায় থাকে। বাতাসের তড়িতাবস্থা জেনে বলা যায়—আবহাওয়া কিরূপ যাবে। বৃষ্টির পর বাতাসকে যদি বেশী পরিমাণ ধন-তড়িৎগ্রস্ত দেখা যায়, তাহলে বলা যায় আবহাওয়া কয়েক দিন ভাল যাবে।

একজন বিজ্ঞানী হিসেব করে দেখিয়েছেন যে, প্রতি বছরই প্রায় দেড়কোটি বার বিদ্যুতের সঙ্গে ঝড় হয় এবং প্রত্যেক সেকেণ্ডে পৃথিবীর আকাশে এক-শ' বার বিদ্যুৎ-ঝলক হয়। তাঁর মতে, কোন লোক যদি চাঁদ থেকে পৃথিবীকে দেখে, তাহলে পৃথিবীকে একটা বিদ্যুতের গোলক বলে তার মনে হবে। সে জন্যে কিন্তু মেঘে সৃষ্ট বিদ্যুতের পরিমাণ মোটেই বেশী নয়, ঘরের বৈদ্যুতিক বাতিতে এক মিনিটে যত বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়, মেঘের এক-একটা বড় স্ফুলিঙ্গে তার বেশী বিদ্যুৎ থাকে না। তবে এই অল্প বিদ্যুতের চাপ খুব বেশী, সে জন্যেই এই চাপ সামলাতে না পেরে বড় গাছ বা বাড়ী ভেঙ্গেচুরে মাটিতে পড়ে যায়।

সন্তোষকুমার ঘোড়ই*

* পদার্থবিদ্যা বিভাগ, মেদিনীপুর কলেজ, মেদিনীপুর

প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন 1। থার্মো-ইলেক্‌ট্রিসিটি সম্বন্ধে কিছু জানতে চাই।

শ্যামল রাউত, পূর্বা রাউত ও কবিতা রাউত,
মুর্শিদাবাদ

প্রশ্ন 2। E. E. G. কি?

কেবলকুমার দত্ত, বাঁকুড়া
বেলা হালদার, মালদহ

উঃ 1। দুটি বিভিন্ন ধাতুর তারের সাহায্যে কোন বর্তনী তৈরি করে ধাতু দুটির দুই প্রান্তের সংযোগস্থলের মধ্যে যদি তাপমাত্রার প্রভেদ রাখা হয়, তাহলে বর্তনীতে তড়িৎ-প্রবাহের সৃষ্টি হয়। 1821 সালে বিজ্ঞানী সীবেক এই তথ্য আবিষ্কার করে এর নাম দেন থার্মো-ইলেকট্রিসিটি। সংযোগস্থল দুটির মধ্যে তাপমাত্রার ব্যবধান বাড়তে সুরু করলে প্রবাহের মাত্রা বাড়তে বাড়তে একটি সর্বোচ্চ মাত্রায় গিয়ে পৌঁছায়। এর পর প্রবাহ কমতে সুরু করে এবং শেষে প্রবাহের মান শূন্য হয়ে বিপরীত দিকে তড়িৎ-প্রবাহ সুরু হয়। তাপ-মাত্রা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে তড়িৎ-প্রবাহের মান বিভিন্ন ধাতুর বর্তনীর ক্ষেত্রে বিভিন্ন হয়ে থাকে। বর্তনীতে যে দুটি ধাতুর তার সংযুক্ত থাকে, তাদের যুগ্ম অবস্থাকে বলা হয় থার্মো-কাপ্‌ল্‌। উপরিউক্ত প্রক্রিয়াকে সীবেকের নামানুসারে সীবেক প্রক্রিয়া বলা হয়।

ইলেকট্রন তত্ত্বের সাহায্যে এই থার্মো-ইলেকট্রিসিটির ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। ইলেকট্রন তত্ত্ব অনুযায়ী প্রত্যেকটি ধাতুর মধ্যে অসংখ্য মুক্ত ইলেকট্রন থাকে, যেগুলি ধাতুর মধ্যে ঘুরে বেড়ায়। এই মুক্ত ইলেকট্রনের সংখ্যা ধাতুর প্রকৃতি ও তাপমাত্রার উপর নির্ভর করে। দুটি বিভিন্ন ধাতুর তারকে যখন পরস্পর দুই প্রান্তে সংযুক্ত করা হয়, তখন যে তারের মধ্যে মুক্ত ইলেকট্রনের সংখ্যা বেশী থাকে, তাথেকে অন্য তারে ইলেকট্রন স্থানান্তরিত হয়ে যায়, ফলে দুই প্রান্তের সংযোগ স্থলেই একটা বিভব-প্রভেদের সৃষ্টি হয়—যার মান ক্রমশঃ বাড়তে থাকে এবং শেষে আর ইলেকট্রন স্থানান্তরিত হতে পারে না। ধাতু-নির্মিত তার দুটি যখন একই তাপমাত্রায় থাকে, তখন দুই প্রান্তে

বিভব-প্রভেদ থেকে উদ্ভূত তড়িচ্চালক বলের মান সমান ও বিপরীতমুখী হয়—তাই তড়িৎ-প্রবাহ সম্ভব হয় না। কিন্তু যেহেতু ইলেকট্রনের ঘনত্ব তাপমাত্রার উপর নির্ভর করে, অতএব সংযোগ স্থলের মধ্যে তাপমাত্রার প্রভেদ রাখলে দুই প্রান্তের সংযোগ স্থলে পারস্পরিক বিভব-প্রভেদ ও তড়িচ্চালক বলের মধ্যে পার্থক্য হবে। এই দুই বলের বিয়োগফলই তখন বর্তনীতে তড়িৎ-প্রবাহ ঘটায়।

উঃ 2। E.E.G. হচ্ছে ইলেক্ট্রোএনসেফালোগ্রাফ (Electroencephalograph) যন্ত্রের সংক্ষিপ্ত নাম।

মস্তিষ্কের স্নায়ুতন্ত্রের মধ্যে পারস্পরিক বৈদ্যুতিক বিভব-প্রভেদ থাকে। এই প্রভেদ বিভিন্ন স্নায়ুতন্তুর ক্ষেত্রে বিভিন্ন। এই তড়িৎ বিভব রেখান্বিত করবার যন্ত্রকে E. E. G. বলা হয়।

মস্তিষ্ক থেকে প্রাপ্ত এই তড়িৎ-শক্তির পরিমাণ খুবই কম। এই শক্তি আহরণ করতে হলে জেলিজাতীয় পদার্থের সাহায্যে মস্তিষ্কের বিভিন্ন জায়গায় অনেকগুলি তড়িৎ-দ্বার বসানো হয়। তড়িৎ-দ্বারের অন্য প্রান্তগুলি E. E. G. যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত থাকে। প্রত্যেকটি তড়িৎ-দ্বারে প্রাপ্ত তড়িৎ-শক্তিকে যন্ত্রের দ্বারা যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত করা হয়, যা শেষে একটি কলমকে গতিশীল করে কাগজের উপর রেখাঙ্কিত করায়। রেখাঙ্কনের কাগজও একটা নির্দিষ্ট গতিতে সরতে থাকে। বিভিন্ন জায়গার বিভিন্ন কলমের রেখাঙ্কন থেকে মস্তিষ্কের বিভিন্ন জায়গার তড়িৎ-শক্তির বিস্তার, স্পন্দন প্রভৃতি বিষয়ে তথ্য পাওয়া যায় এবং এই তথ্যের সাহায্যে মস্তিষ্কের রোগের বিশ্লেষণ ও চিকিৎসা করা হয়ে থাকে।

শ্যামসুন্দর দে*

* ইনস্টিটিউট অব রেডিও-ফিজিক্স অ্যাণ্ড ইলেকট্রনিক্স, বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা-9

বিবিধ

'বিজ্ঞান জিজ্ঞাসা' পত্রিকার বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান

পশ্চিম বঙ্গের বহরমপুর থেকে 'বিজ্ঞান জিজ্ঞাসা' নামক যে পত্রিকাটি প্রকাশিত হচ্ছে, তার বর্ষপূর্তি উপলক্ষে গত 27শে ও 28শে ডিসেম্বর ঐ সহরে কয়েকটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করেন আর. জি. কর. মেডিক্যাল কলেজের ডাঃ কালীময় ভট্টাচার্য ও ডাঃ যজ্ঞেশ্বর সেনগুপ্ত, বিশ্বভারতীর অধ্যাপক শ্রীসমীরকুমার ঘোষ, দেশ পত্রিকার শ্রীসমরজিৎ কর, গবেষণা পত্রিকার সম্পাদক শ্রীআশীষকুমার সিংহ এবং বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের কর্মসচিব ডক্টর জয়ন্ত বসু ও পরিষদের কার্যকরী সমিতির অন্যতম সদস্য শ্রীশঙ্কর চক্রবর্তী। 'বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান-চর্চা' শীর্ষক আলোচনা-চক্রে কয়েকজন বিজ্ঞানী, বিজ্ঞান-শিক্ষক, বিজ্ঞান-লেখক এবং স্কুলের ছাত্রও অংশগ্রহণ করেন।

বাংলা ভাষায় প্রকাশিত বিজ্ঞানবিষয়ক পুস্তক ও পত্রিকার একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল। প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন মুর্শিদাবাদের অতিরিক্ত জেলা শাসক শ্রীসুজিতশঙ্কর চট্টোপাধ্যায়। প্রদর্শনীটির বিশেষ আকর্ষণ ছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর কয়েকটি দুষ্প্রাপ্য পত্র-পত্রিকা।

'বিজ্ঞান-জিজ্ঞাসা' পত্রিকা কর্তৃক আয়োজিত বিজ্ঞানবিষয়ক পুস্তক ও পত্র-পত্রিকা প্রদর্শনীর একাংশ। [ফটো—ষ্টার ষ্টুডিও, বহরমপুর

'বিজ্ঞান জিজ্ঞাসা' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীআলোক সেন, প্রকাশক শ্রীবিমল বসু, ব্যবস্থাপক শ্রীঅশোকরঞ্জন দে এবং অন্যান্য কর্মীদের প্রশংসনীয় উদ্যম ও অক্লান্ত পরিশ্রমে বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান সর্বতোভাবে সাফল্যমণ্ডিত হয়। এই অনুষ্ঠান পরিচালনায় সহযোগিতা করেন পশ্চিমবঙ্গ

সরকারের তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগের মুর্শিদাবাদ শাখা।

রকেট-ট্রেন

টোকিও থেকে সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান ইউ. পি. আই. কর্তৃক প্রচারিত এক সংবাদে জানা যায়—জাপানী অধ্যাপক হিসানোজো ওজাওয়া 'রকেট-ট্রেন' তৈরি করতে চলেছেন, যেটা বায়ুহীন টিউবের মধ্য দিয়ে ঘণ্টায় 2500 কিলোমিটার বেগে ছুটে চলবে।

ডক্টর ওজাওয়া বলেন—আমার ট্রেন মাটির উপর দিয়ে চলবে, কিন্তু এর গতিবেগ হবে বিমানের মত। 1956 সাল থেকে তিনি এই পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছেন। নানা রকম যান্ত্রিক সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে তিনি কোথাও সফল হয়েছেন, আবার কোথাও ব্যর্থ হয়েছেন। অতি সম্প্রতি একটি ব্যাং, একটি কচ্ছপ ও একটি আরসোলাকে যাত্রী হিসাবে নিয়ে তিনি পরীক্ষা চালান, কিন্তু ব্রেক চালু না হওয়ায় তিনটি প্রাণীই মারা যায়। পরবর্তী পরীক্ষায় সফল হবে বলেই তিনি আশা করছেন। ধূমহীন বিস্ফোরক নাইট্রোগ্লিসারিন রকেট-ট্রেনের যান্ত্রিক শক্তি জোগাবে।

শুক্রগ্রহে সোভিয়েট মহাকাশযান

টাস জানাচ্ছেন, মানব আরোহীবিহীন সোভিয়েট মহাকাশযান ভেনাস-7 15ই ডিসেম্বর শুক্রগ্রহে পৌঁচেছে এবং পৌঁছুতে সময় লেগেছে 120 দিন।

মহাকাশযানটি ডিসেম্বর মাসে শুক্রগ্রহে পৌঁছাবার পর সরকারীভাবে কোন খবর না দেওয়ায় অনুমান করা হয়েছিল যে, সেটি হয় জ্বলে গেছে, নয়তো সংঘর্ষের ফলে বিনষ্ট হয়েছে।

মহাকাশযানটির শুক্রগ্রহে অবতরণের খবর দিয়ে টাস বলেছে যে, মহাকাশযানটি শুক্রগ্রহে অবতরণের পর 23 মিনিট ধরে সংকেত পাঠিয়েছে।

টাস বলেছে, ভেনাস-7 কর্তৃক প্রেরিত তথ্য থেকে জানা গেছে যে, সন্ধ্যাতারা বলে পরিচিত এই শুক্রগ্রহের উপরিভাগের তাপমাত্রা 475 ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডের এদিকে-ওদিকে 20 ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডের মত হেরফের হয়।

শুক্রগ্রহের বায়ুমণ্ডলের চাপ পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের চাপের প্রায় 90 গুণ।

ভেনাস-7 পূর্ববর্তী ভেনাস-5 ও ভেনাস-6-এর চেয়ে ভারী। ভেনাস-5 ও ভেনাস-6 1969 সালের মে মাসে প্যারাশুটে করে শুক্রগ্রহের বায়ুমণ্ডলের মধ্য দিয়ে 24 ঘণ্টারও কম ব্যবধানে নামে।

তারা ভেনাস-4-এর মত শুক্রপৃষ্ঠে অবতরণের আগেই পুড়ে গিয়েছিল বলে অনুমান করা হয়। তারা নীচে নামবার সময় যে সব তথ্যাদি পাঠায়, তাতে আগেরগুলিরই মত জানা যায় যে, শুক্রগ্রহের বায়ুমণ্ডল প্রধানতঃ কার্বন ডাই-অক্সাইড দিয়ে গঠিত বলে পৃথিবীতে যে ধরণের জীব দেখা যায়, সেখানে তা থাকতে পারে না।

মহাকাশযানের চীফ ডিজাইনার মন্তব্য করেছেন, শুক্রগ্রহে যদি কোনদিন মানুষ নামেও, তবু কয়েক বছরের মধ্যে নামতে পারবে বলে মনে হয় না।

ব্যাঙের লড়াই

মালয়েশিয়া থেকে ইউ. পি. আই. কর্তৃক প্রচারিত এক সংবাদে প্রকাশ—পেনাং থেকে 110 মাইল দক্ষিণে একটি রাস্তার পাশে এক জলাভূমিতে 17ই জানুয়ারী দুই জাতের হাজার হাজার ব্যাং পরস্পরের মধ্যে প্রচণ্ড লড়াই সুরু করে। লড়াই থেমে যাবার পর দেখা যায়,

ঐ এলাকায় শত শত মরা ব্যাং ছড়িয়ে রয়েছে এবং আহত ব্যাঙের আর্তনাদে সমস্ত অঞ্চলটিতে এক বিশ্রী অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। গত বছর এই জায়গার কাছে একটি রবার বাগানে প্রায় 2 হাজার ব্যাঙের মধ্যে 6 দিন ধরে এক প্রচণ্ড লড়াই হয়েছিল।

নীল গোলাপ

ব্যাঙ্গালোর থেকে সংবাদ সরবরাহ সংস্থা ইউ. এন. আই. কর্তৃক প্রচারিত এক সংবাদে প্রকাশ —নয়াদিল্লীর ভারতীয় কৃষি গবেষণা সংস্থার বিজ্ঞানীরা এখন খাঁটি নীল রঙের একটি গোলাপ ফুল ফোটাতে ব্যস্ত। স্বর্গতঃ অধ্যাপক সি. ভি. রামনের নামে এই গোলাপের নাম হবে। তিনি রং আর গোলাপের অনুরাগী ছিলেন। এই গোলাপটির জন্ম-রহস্তের মূলে তাঁর প্রস্তাবও কাজ করেছে।

যীশুখৃষ্টের সমসাময়িক ক্রুশবিদ্ধ কঙ্কাল আবিষ্কার

জেরুজালেম থেকে সংবাদ সরবরাহ সংস্থা এ. পি. কর্তৃক প্রচারিত এক সংবাদে প্রকাশ —ইজরায়েলের পণ্ডিতেরা প্রায় 2 হাজার বছর আগে ক্রুশবিদ্ধ একজন মানুষের কঙ্কাল আবিষ্কার করেছেন। নৃতত্ত্ববিদ্ শ্রীনিকো হাস 3রা জানুয়ারী বলেন, দণ্ডিত ব্যক্তির হাঁটুতে একটি লোহার পেরেক মারা হয়েছিল, পেরেকটিও পাওয়া গেছে। তিনি আরও বলেন, ছবি থেকে যীশুখৃষ্টের চেহারার যে আভাষ পাওয়া যায়, তার সঙ্গে ঐ কঙ্কালের কোন সাদৃশ্য নেই।

তিনি আশা করেন যে, একদিন হয় তো যীশুখৃষ্টের দেহাবশেষও আবিষ্কার করা সম্ভব হবে। যে পাথরের শবাধারে উপরিউক্ত ব্যক্তির মৃতদেহটি সমাহিত করা হয়, তার উপর 'ইয়েচো-চানান' নামটি খোদাই করা আছে। এই থেকে বোঝা যায় যে, ঐ ব্যক্তি ইহুদি ছিলেন।

গাব্রা

ইউ. এন. আই. কর্তৃক প্রচারিত এক সংবাদে জানা যায়—উত্তর জাপানের আসাহিয়ামা চিড়িয়াখানার কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে গাধা আর জেব্রার সংমিশ্রণে এক সঙ্কর-জীব সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে। তার নাম রাখা হয়েছে ইংরেজীতে—ডব্রা (ডঙ্কি-জেবরা)। বাংলায় বলা যায়—গাব্রা। নতুন জন্তুটি (একটি মাদী বাচ্চা) কালো গাধার মত। ঘাড়ের উপর গাধার মত চুলও আছে। তার পাগুলি কিন্তু তার জেব্রা মায়ের মতই ডোরাকাটা।

ভীষণ পরমাণু অস্ত্রের যুগ আসছে

রাষ্ট্রসঙ্ঘ থেকে পি. টি. আই. কর্তৃক প্রচারিত এক সংবাদে জানা যায়—রাষ্ট্রসঙ্ঘ সাধারণ পরিষদ পরমাণু অস্ত্র প্রতিযোগিতা বন্ধের জন্যে যে আবেদন জানিয়েছিলেন, তা অগ্রাহ্য করে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ভয়ঙ্কর পরমাণু অস্ত্রের যুগ সূচনা করছে।

পেন্টাগণের পক্ষ থেকে 8ই জানুয়ারী ওয়াশিংটনে ঘোষণা করা হয় যে, স্বতন্ত্রভাবে লক্ষ্যে নিক্ষেপণ-যোগ্য এবং আঘাত করে ফিরে আসবার ক্ষমতা-সম্পন্ন বহু পর্যায়ের প্রথম মারণাস্ত্র এখন যুদ্ধাস্ত্রের পর্যায়ে এসে গেছে এবং এই রকম 50টি মিনিটম্যান-3 ক্ষেপণাস্ত্র কমিশন করা হয়েছে। প্রত্যেকটি ক্ষেপণাস্ত্রে তিনটি করে মারণাস্ত্র থাকবে। একবারের উৎক্ষেপণেই তিনটি একত্রে সক্রিয় হবে, পরে উর্দ্ধাকাশে গিয়ে এগুলি আলাদা হয়ে পৃথক পৃথক লক্ষ্যে আঘাত করতে পারবে।

অ্যাপোলো-14-র চাঁদের দিকে যাত্রা

31শে জানুয়ারী ভারতীয় সময় রাত্রি 2টা 32 মিনিটে তিনজন মহাকাশযাত্রীকে নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাপোলো-14 মহাকাশযান চন্দ্রাভিমুখে যাত্রা করেছে।

চিঠি-পত্র

সবিনয় নিবেদন,

'জ্ঞান ও বিজ্ঞান'-এর জানুয়ারী (1971) সংখ্যায় প্রকাশিত 'লণ্ডনের রয়েল সোসাইটির ভারতীয় সদস্যগণ' শীর্ষক প্রবন্ধে অতি সাম্প্রতিক-কালে নির্বাচিত সদস্য ডক্টর এম. জি. কে. মেননের উল্লেখ ছিল না। এঁর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি নিম্নে দেওয়া হলো।

এম. জি. কে. মেনন :—মামবিল্লিকালাথিল গোবিন্দ কুমার মেননের জন্ম 28শে আগষ্ট, 1928। পদার্থ-বিজ্ঞানী। 1949 সালে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি এম. এস-সি. ডিগ্রী লাভ করেন। নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত বিজ্ঞানী পাওয়েলের সঙ্গে 1949-1955 সাল পর্যন্ত বৃস্টল বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা করেন। অন্যান্য সহযোগীদের সঙ্গে বৃস্টলে অধ্যাপক মেনন নিউক্লিয়ার ইমালশন টেক্‌নিকের প্রভূত উন্নতি সাধন করেন, যার ফলে ভারী মেসন ও হাইপেরনসমূহের পারস্পরিক ক্রিয়া (Interactions) ও বিভিন্ন অবক্ষয় প্রণালী (Decay modes) সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানা গেছে। 1955 সালে বোম্বাই সহরের টাটা ইনস্টিটিউট অব ফাণ্ডামেণ্টাল রিসার্চ-এ যোগদানের পর অধ্যাপক মেনন ও তাঁর সহযোগী বিজ্ঞানিগণ বিশেষভাবে প্রস্তুত বেলুনের সাহায্যে ভূচৌম্বক নিরক্ষরেখার অঞ্চলে সমধিক উচ্চতায় মহাজাগতিক রশ্মিসংক্রান্ত কাজের সূচনা করেন। ভূপৃষ্ঠের বহু গভীরে কোলার স্বর্ণখনির অভ্যন্তরে অধ্যাপক মেনন ও তাঁর সহযোগীরা মহাজাগতিক রশ্মিসংক্রান্ত মূল্যবান পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন; বিশেষতঃ অত্যন্ত শক্তিশালী মিউয়ন ও নিউট্রিনোসম্পর্কিত বহু উল্লেখযোগ্য তথ্য আবিষ্কৃত হয়। টাটা ইনস্টিটিউটের বর্তমান ডিরেক্টর ডক্টর মেনন 1970 সালে এফ. আর. এস. নির্বাচিত হয়েছেন।

দেবাশীষ বসু
সাহা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স।
কলিকাতা-9

বিজ্ঞপ্তি

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত যাবতীয় পুস্তক এখন হইতে কেবল মেসার্স ওরিয়েন্ট লঙম্যান অ্যাণ্ড কোং হইতে (17, চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউ, কলিকাতা-13) বিক্রয় করা হইবে। সদস্যগণ বাদে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ কার্যালয় হইতে এখন আর কাহারো নিকট কোন পুস্তক বিক্রয় করা হইবে না।

সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য
শ্রীমিহিরকুমার ভট্টাচার্য কর্তৃক পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-6 হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ
37/7 বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত

অধ্যাপক চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রামন

জন্ম—7ই নভেম্বর, 1888 মৃত্যু— 21শে নভেম্বর, 1970

রামন রিসার্চ ইনস্টিটিউট (ব্যাঙ্গালোর)

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

চতুর্বিংশ বর্ষ | মার্চ, 1971 | তৃতীয় সংখ্যা

নিবেদন

পৃথিবীতে যে কয়জন প্রথম সারির বিজ্ঞানী ছিলেন এবং আছেন, নিঃসন্দেহে আচার্য চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রামন তাঁহাদের অন্যতম। তাঁহার প্রতিভার একটি বিশিষ্ট দিক হইল এই যে, ইহা একান্তরূপে ভারতীয়। বস্তুতঃ উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশী কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারস্থ না হইয়াও ভারতীয় গবেষণাগারেই যে বিজ্ঞানের দুরূহতম সমস্যার সমাধান করা সম্ভব, আচার্য রামনের সাফল্যদীপ্ত জীবনই তাহার উজ্জ্বল প্রমাণ। অদম্য ইচ্ছাশক্তি, প্রবল নিষ্ঠা ও আত্মপ্রত্যয়ের বলে তিনি আন্তর্জাতিক খ্যাতির সর্বোচ্চ স্তরে আরোহণ করিয়া মাত্র 42 বছর বয়সেই নোবেল পুরস্কার লাভের গৌরব অর্জন করেন। এই শতাব্দীর প্রায় সূচনায় তিনি যে বিজ্ঞান-সাধনা সুরু করিয়াছিলেন—মৃত্যুকালেও তাহাতেই লিপ্ত ছিলেন। তাঁহার বৈজ্ঞানিক কর্মময় জীবনের ইতিহাস উত্তরসুরী বিজ্ঞানীদের নিকট প্রেরণাস্বরূপ।

বর্তমান 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান'-এর সংখ্যাটিকে আমরা শ্রদ্ধাবিনম্র চিত্তে এই মহান বিজ্ঞানীর গৌরবোজ্জ্বল স্মৃতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করিতেছি। আচার্য রামনের বিজ্ঞান-সাধনা, বিশেষতঃ শব্দ ও আলোক-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মৌলিক ও যুগান্তকারী আবিষ্কারসমূহের বিবরণ এবং বিজ্ঞানের ঐ দুইটি শাখা সম্পর্কে কয়েকটি প্রাসঙ্গিক প্রবন্ধ এই সংখ্যায় পরিবেশিত হইয়াছে। তাঁহার কর্মময় জীবনের স্মৃতিচারণে যাঁহারা অংশগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের কেহ কেহ আচার্য রামনের সহযোগী ও কর্মসঙ্গী।

লেসার আবিষ্কারের পর রামন এফেক্টের পরিধি বিস্তৃত হইয়াছে—এই বিষয়ে গবেষণার পরিমাণ বহুলাংশে বৃদ্ধি পাইয়াছে। সাম্প্রতিক কালে প্লাজ্‌মাতেও রামন এফেক্ট পরিলক্ষিত হইয়াছে। বর্তমান সংখ্যায় এই বিষয়গুলি এবং আচার্য রামন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত রামন গবেষণা মন্দির সম্বন্ধে বিবরণ এই সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে।

'জ্ঞান ও বিজ্ঞান'-এর রামন-স্মৃতি সংখ্যা বিজ্ঞানানুরাগী পাঠকসমাজের রামন সম্বন্ধে কৌতূহল কিছুটা তৃপ্ত করিলেও আমাদের শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

রামন এফেক্টের আবিষ্কার ও তত্ত্ব

শ্রীসুকুমারচন্দ্র সরকার

আচার্য চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রামন প্রায় 43 বৎসর পূর্বে যে তথ্য আবিষ্কার করিয়াছিলেন, সেই তথ্যের সাহায্যে অদ্যাপি জগতের অনেক গবেষণা কেন্দ্রে যাবতীয় স্বচ্ছ পদার্থের অণুগুলির স্বরূপ নির্ধারণ সম্বন্ধে নানারূপ পরীক্ষা চলিতেছে। এইরূপ গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার কিরূপে সংঘটিত হইয়াছিল ও তাহার সাহায্যে নূতন নূতন তথ্যের সমাধান করা কিরূপে সম্ভব হইতেছে, তাহা সংক্ষেপে আলোচনা করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজের পদার্থবিদ্যা বিভাগের প্রথম পালিত অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হইবার পূর্বে রামন সহকারী অ্যাকাউন্ট্যান্ট জেনারেলের পদে নিযুক্ত থাকিয়া অবসর সময়ে 210 নং বহুবাজার ষ্ট্রীটে ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের অবিশ্রান্ত প্রচেষ্টায় স্থাপিত 'ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কাল্টিভেশন অফ সায়েন্স' নামক প্রতিষ্ঠানের অতি সামান্য-সুযোগ-বিশিষ্ট গবেষণাগারে শব্দতত্ত্ব সম্বন্ধে গবেষণা করিতেন। এই সম্বন্ধে তাঁহার অনেক মৌলিক প্রবন্ধ 1912 সাল হইতে 1920 সাল পর্যন্ত বিবিধ বৈদেশিক ও উক্ত অ্যাসোসিয়েশনের বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। 1917 সালে তিনি সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালিত অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন ও 1920 সাল পর্যন্ত সহকর্মীদের সহিত শব্দতত্ত্ব সম্বন্ধেই গবেষণা পরিচালনা করেন। এই সম্বন্ধে প্রকাশিত তাঁহার মৌলিক প্রবন্ধগুলি পাশ্চাত্য দেশের বৈজ্ঞানিকদের নিকট আদরণীয়রূপে গণ্য হয়। 1921 সালে তিনি ইউরোপ ও আমেরিকা পরিভ্রমণে যান এবং সেই বৎসরেই তিনি লণ্ডনের রয়্যাল সোসাইটির সভ্য মনোনীত হন।

ইতিপূর্বে লর্ড র‍্যালে আকাশের নীলত্বের প্রকৃত কারণ সম্বন্ধে তত্ত্ব নির্ধারণ করেন। এই তত্ত্বে তিনি দেখান যে, সরল পথে অগ্রসরমান সূর্যরশ্মি পৃথিবী-পৃষ্ঠের বায়ুমণ্ডলের অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন অণুগুলির উপর আপতিত হইলে তাহার কিয়দংশ পার্শ্বদেশে বিচ্ছুরিত (Scattered) হয় এবং এই প্রক্রিয়ায় সূর্যালোকের নীলাংশ লোহিতাংশ অপেক্ষা অধিক পরিমাণে বিচ্ছুরিত হওয়ায় উক্ত বিচ্ছুরিত নীল-প্রধান আলোক—উক্ত বায়ুমণ্ডলের পশ্চাদ্ভাগে অবস্থিত আকাশকে নীলবর্ণে প্রতিভাত করে। সমুদ্রপথে বিদেশ যাত্রার সময় রামন সমুদ্রগুলির বিভিন্ন অংশের জলের নীলবর্ণের তারতম্য লক্ষ্য করিয়া উক্ত অংশগুলি হইতে জল সংগ্রহ করিয়া আনিয়া উহার দ্বারা বিচ্ছুরিত সূর্যালোকের গুণাবলী পরীক্ষা করিয়াছিলেন ও লর্ড র‍্যালের আকাশের নীলত্বের তত্ত্বের অনুরূপ সমুদ্রের নীলত্বের এক তত্ত্ব নির্ধারণ করেন। এই র‍্যালে বিচ্ছুরণ (Rayleigh scattering) সম্বন্ধে ফরাসী দেশীয় পদার্থবিদ্যাবিদ্ অধ্যাপক কাবানে ইহার পরেই একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন। উক্ত পুস্তক রামনের মনোযোগ এই প্রক্রিয়া সম্বন্ধে গবেষণায় আকৃষ্ট করে। তিনি তাঁহার সহকর্মীদের সাহায্যে নানারূপ জৈব তরল পদার্থ ও বায়বীয় পদার্থ হইতে বিচ্ছুরিত সূর্যরশ্মির গুণাবলী সম্বন্ধে গবেষণায় অধিকতর মনোযোগের সহিত ব্যাপৃত হন।

1921 সালে আমেরিকার প্রসিদ্ধ পদার্থবিদ্যা

বিদ্ অধ্যাপক কম্পটন রঞ্জেন রশ্মির তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য নির্ধারণের সময় লঘু, কঠিন পদার্থ ভেদ করিয়া অগ্রসর হইবার সময় উক্ত রশ্মির কিয়দংশের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়—এই গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার করেন। এই আবিষ্কার কম্পটন এফেক্ট নামে পরিচিত এবং ইহা প্লাঙ্কের কোয়ান্টাম তত্ত্বের (Quantum theory) যাথার্থ্য প্রমাণ করে। রঞ্জেন রশ্মি যুগপৎ ইথারে কম্পমান বৈদ্যুতিক ও চৌম্বক ক্ষেত্রে এবং তেজকণা রূপে ধাবমান হয়। সাধারণ আলোকও বিচ্ছুরিত হইবার সময় কম্পটন-আলোক দেখা যায়। তাঁহার খ্যাতনামা সহকর্মী কৃষ্ণন বহুসংখ্যক স্বচ্ছ তরল পদার্থে ঐরূপ ক্ষীণ সবুজ বর্ণের আলোক উৎপন্ন হইতে দেখিয়া এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, শোধিত হওয়া সত্ত্বেও উক্ত তরল পদার্থগুলিতে দ্বিতীয় কোন পদার্থ অতি সামান্য পরিমাণে মিশ্রিত থাকে ও উহার অণুগুলি নীল আলোকে উত্তেজিত হইয়া সবুজ বর্ণের নির্দিষ্ট তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট আলোক বিকিরণ করে, অর্থাৎ ঐ আলোক ফ্লুরেসেন্স (Fluorescence) ব্যতীত অন্য কিছু নূতন বিকিরণ নহে।
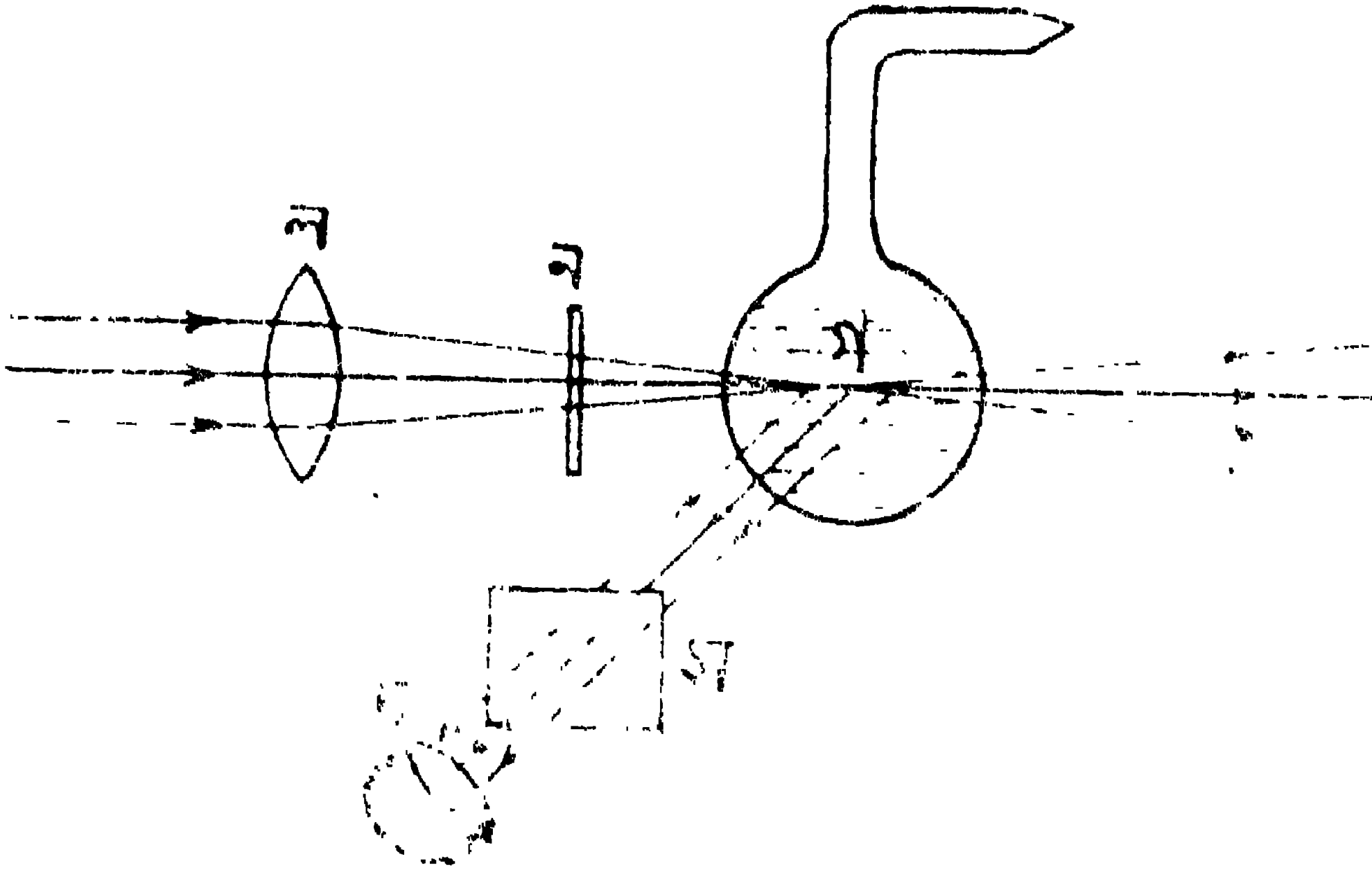
1নং চিত্র

এফেক্টের মত পরিবর্তিত হইতে পারে—এইরূপ ধারণা রামনের হৃদয়ে বদ্ধমূল হয় এবং তিনি ঐরূপ প্রক্রিয়ার প্রমাণ অনুসন্ধান করিতে থাকেন। এই সময়ে 210 নং বহুবাজার স্ট্রিটের গবেষণাগারে তাঁহার সহকর্মীদের কেহ কেহ কয়েকটি স্বচ্ছ জৈব তরল পদার্থ হইতে বিচ্ছুরিত সূর্যরশ্মির গুণাবলী পরীক্ষার সময় লক্ষ্য করেন যে, তরল পদার্থগুলি বিশেষভাবে শোধিত হওয়া সত্ত্বেও উজ্জ্বল নীল বর্ণের সূর্যরশ্মির দ্বারা আলোকিত হইলে উক্ত রশ্মির পার্শ্বদেশে বিচ্ছুরিত অংশে ক্ষীণ সবুজ বর্ণের

1928 সালের প্রারম্ভে রামনের মনে এই ক্ষীণ সবুজ বর্ণের বিকিরণের উৎপত্তি নিশ্চয়তার সহিত নির্ধারণ করিবার দৃঢ় সঙ্কল্প হয়। তিনি স্বয়ং এই সম্বন্ধে পরীক্ষা করা মনস্থ করিয়া—প্রথমে এইরূপ একখানি নীল বর্ণের ও অপর একখানি সবুজ বর্ণের কাচের ফলক (Plate) সংগ্রহ করেন যে, দুইখানি ফলক একত্রে ধরিলে তাহাদের মধ্য দিয়া সূর্যরশ্মি নির্গত হইতে পারে না; অর্থাৎ নীল বর্ণের ফলক ভেদ করিয়া যে নীল রশ্মি সবুজ বর্ণের ফলকে আপতিত হয়, উহা শেষোক্ত ফলক

ভেদ করিতে পারে না, উহাতে মিলাইয়া যায়। এই দুইখানি ফলকের সাহায্যে বেঞ্জিন নামক জৈব তরল পদার্থের দ্বারা বিচ্ছুরিত সূর্যরশ্মি তিনি যেভাবে পরীক্ষা করেন, তাহা 1নং চিত্রে প্রদর্শিত হইল।

সূর্যরশ্মি একটি বৃহৎ দূরবীনের প্রশস্ত 'ল' চিহ্নিত অবজেক্ট লেন্সে আপতিত হইয়া পুঞ্জীভূত হয় ও উহা হইতে নির্গত হইয়া কিয়দ্দূরে অতি অপ্রশস্ত স্থানের মধ্য দিয়া অতি উজ্জ্বল অবস্থায় অগ্রসর হয়। এই অংশে একটি নল-সংযুক্ত কাচনির্মিত গোলকে (Bulb) শোধিত বেঞ্জিন রাখা হয়। 'ন' চিহ্নিত নীলবর্ণের কাচ ফলকটি উক্ত পুঞ্জীভূত সূর্যরশ্মির সহিত লম্বভাবে এইরূপে রাখা হয় যে, বেঞ্জিনের মধ্য দিয়া কেবল নীল রশ্মিই অগ্রসর হয়। তৎপরে পার্শ্বদেশে বিচ্ছুরিত গ চ পথে ধাবমান রশ্মিকে 'স' চিহ্নিত সবুজ বর্ণের ফলকটির মধ্য দিয়া পর্যবেক্ষণ করিয়া তিনি বেঞ্জিনের আলোকিত অংশটি অতি ক্ষীণ ও সবুজবর্ণযুক্ত দেখিতে পান। ইহাতে তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে, এই ক্ষীণালোক র‍্যালে বিচ্ছুরণের সময় নূতন প্রকারের বিচ্ছুরণ প্রক্রিয়ার দ্বারা উৎপন্ন হয়। কিন্তু এইরূপ সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইতে হইলে বিচ্ছুরিত আলোকরশ্মির বর্ণালী (Spectrum) পরীক্ষা করিবার প্রয়োজন ও মাত্র একটি তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট আলোক আপতিত রশ্মিরূপে ব্যবহার করা উচিত—ইহা তিনি উপলব্ধি করেন। তখন তিনি একটি পারদরশ্মি উৎপাদক বাতি (Mercury arc) সংগ্রহ করেন, কারণ উক্ত রশ্মির বর্ণালীতে পরস্পর দূরবর্তী কয়েকটি রেখা ও মধ্যবর্তী স্থানগুলিতে অন্ধকার দৃষ্ট হয়। বর্ণালীর ফটোগ্রাফ লইবার জন্য তিনি তাঁহার পরীক্ষাগারে অতি ক্ষুদ্র একটি স্পেক্ট্রোগ্রাফ সংগ্রহ করিতে পারেন ও তদ্দ্বারা বেঞ্জিন হইতে বিচ্ছুরিত পারদ-রশ্মির বর্ণালীর ফটোগ্রাফ প্রস্তুত করেন। উক্ত ফটো-গ্রাফের পার্শ্বেই আপতিত পারদরশ্মির বর্ণালীরও একটি ফটোগ্রাফ লওয়া হয়। এই দুইটি ফটোগ্রাফ পর্যবেক্ষণ করিয়া তিনি দেখিতে পান যে, পূর্বোক্ত ফটোগ্রাফে পারদরশ্মির রেখা ব্যতীত কয়েকটি নূতন রেখা বিদ্যমান এবং এই রেখাগুলির তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য যথাক্রমে আপতিত পারদরশ্মির দুইটি উজ্জ্বল রেখার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য অপেক্ষা বৃহত্তর। তিনি এই সময়ে উক্ত নূতন রেখাগুলির প্রকৃত তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য নির্ধারণ করিতে সক্ষম হন নাই এবং ঐ ফটোগ্রাফটি ব্যাঙ্গালোরের ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স-এর এক সভায় প্রথম প্রদর্শন করিয়া তাঁহার আবিষ্কার ঘোষণা করেন। পরে এই সম্বন্ধে একটি মৌলিক প্রবন্ধ তিনি 'ইণ্ডিয়ান জার্নাল অফ ফিজিক্স' নামক পত্রিকায় প্রকাশ করেন ও তাহাতে ফটোগ্রাফটি উদ্ধৃত করেন। এই প্রবন্ধটি তিনি নিজের নামেই প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহার পর কৃষ্ণান প্রমুখ তাঁহার সহকর্মীগণ উদ্যমের সহিত বহুসংখ্যক স্বচ্ছ পদার্থের দ্বারা বিচ্ছুরিত পারদরশ্মির বর্ণালী পরীক্ষা করেন। এইরূপ পরীক্ষাকালে একদিন কৃষ্ণান প্রথম দেখিতে পান যে, কোন কোন পদার্থ হইতে বিচ্ছুরিত রশ্মির বর্ণালীতে আপতিত রশ্মির উজ্জ্বল রেখার যে পার্শ্বে তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য বৃহত্তর, তাহার বিপরীত পার্শ্বেও ক্ষুদ্রতর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট নূতন রেখা বিদ্যমান এবং এই রেখাগুলি পূর্বোক্ত পার্শ্বের নূতন রেখাগুলি হইতে ক্ষীণতর। রামন ও কৃষ্ণান একত্রে শেষোক্ত রেখাগুলিকে অ্যান্টিষ্টোক্স (Anti-Stokes) রেখা ও পূর্বোক্ত রেখাগুলিকে ষ্টোক্স (Stokes) রেখা নামে অভিহিত করেন। এই উভয় প্রকারের নূতন রেখাসমেত একখানি ফটোগ্রাফ 2নং চিত্রে উদ্ধৃত হইল।

ইহার অল্প দিন পরেই ল্যাণ্ডস্‌বার্গ (Landsberg) ও ম্যাণ্ডেলষ্টাম (Mandelstam) নামক বৈজ্ঞানিকদ্বয়ের দ্বারা প্রকাশিত একটি মৌলিক প্রবন্ধে দেখা যায় যে, তাঁহারা কয়েকটি দানাবিশিষ্ট (Crystalline) কঠিন পদার্থের দ্বারা বিচ্ছুরিত

আলোকের বর্ণালীতে ঐরূপ নূতন রেখা আবিষ্কার করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন যে, কেবল দানাবিশিষ্ট কঠিন পদার্থই ঐরূপ নূতন রেখা উৎপন্ন করিতে পারে এবং এই প্রক্রিয়া যে সকল বস্তুর অণুগুলিতেই সম্ঘটিত হয়—ইহা তাঁহারা ধারণা করিতে পারেন নাই। তবুও রামনের আবিষ্কার যে, শেষোক্ত বৈজ্ঞানিকদ্বয়ের আবিষ্কার অপেক্ষা বহু গুণ গুরুত্বপূর্ণ ও সম্পূর্ণ নূতন ও মৌলিক ধরণের—এইরূপ মন্তব্য কোন বৈজ্ঞানিক কিছুদিন যাবৎ কোন প্রবন্ধে প্রকাশ করেন নাই।

করিয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ করেন। উক্ত তত্ত্বে দেখান হয় যে, কোন নির্দিষ্ট কম্পন-হারবিশিষ্ট রশ্মির পার্শ্বদেশে বিচ্ছুরণের সময় বিচ্ছুরিত রশ্মির কিয়দংশের কম্পন-হারের হ্রাস বা বৃদ্ধি হইতে পারে। কোয়ান্টাম তত্ত্ব অনুসারে উক্ত আপতিত রশ্মির কম্পন-হার যদি ν হয়, তাহা হইলে তাহার শক্তিকণার পরিমাণ $h\nu$ হইবে এবং বৃদ্ধি বা হ্রাসপ্রাপ্ত কম্পন-হারবিশিষ্ট বিচ্ছুরিত রশ্মির শক্তি-কণার পরিমাণ $h\nu \pm h\nu_{mn}$ হইবে। এখানে ν_{mn} অণুটির নিজের যে কোন প্রকার কম্পনের
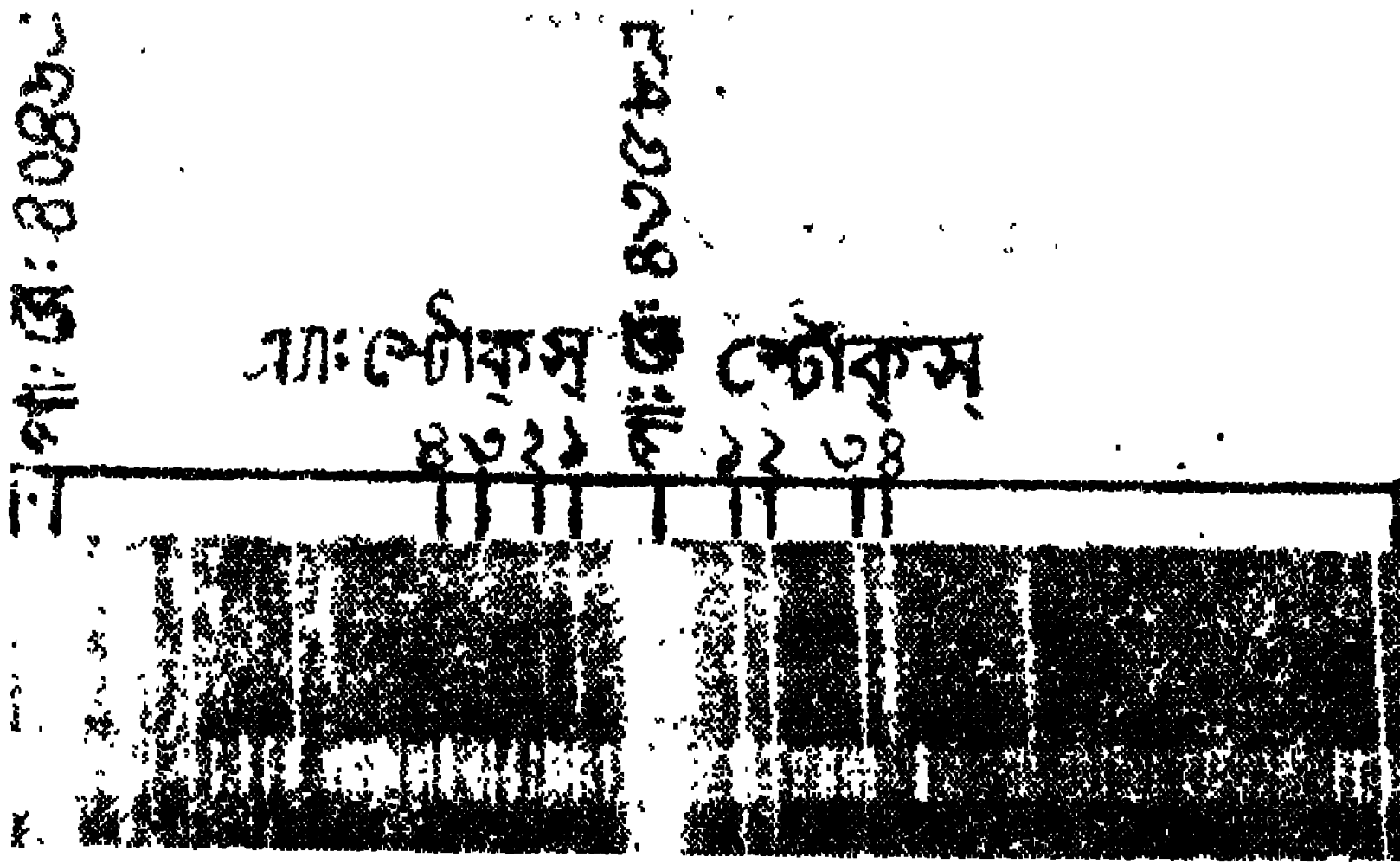
2নং চিত্র
ক্লোরোফরমের রামন বর্ণালীতে একদিকে ষ্টোক্‌স ও অপর দিকে অ্যান্টি-ষ্টোক্‌স রেখাগুলি দেখান হইয়াছে।

পরে জার্মান দেশীয় প্রিংশায়েম (Pringsheim) নামক একজন প্রসিদ্ধ পদার্থবিজ্ঞাবিদ 'নাচুর-ভিসেনশাফ্‌টেন' (Naturwissenschaften) নামক পত্রিকায় 'ডাঃ রামন এফেক্ট' শীর্ষক একটি প্রবন্ধে রামনের আবিষ্কারের গুরুত্ব বিচার করিয়া উহাকে রামন এফেক্ট আখ্যা দেন।

রামন তাঁহার আবিষ্কার ঘোষণা করিয়া যে প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে জার্মান দেশীয় বৈজ্ঞানিকদ্বয় ক্রামার্স (Kramers) ও হাই-সেনবার্গ (Heisenberg) 1925 সালে যে অণুর দ্বারা বিচ্ছুরণ প্রক্রিয়ার কোয়ান্টাম তত্ত্ব প্রকাশ

হার। রামন মন্তব্য করেন যে, ν' কম্পন-হারবিশিষ্ট নূতন রেখাগুলি নিম্নলিখিত প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন হয়।

$$h\nu - h\nu' = h\nu_{osc}$$

এখানে ν_{osc} হইতেছে অণু যে পরমাণুগুলির দ্বারা গঠিত, তাহাদের পরস্পরের কম্পনের হার। কিন্তু নূতন রেখার অন্যান্য গুণাবলী সম্বন্ধে প্রকৃত তত্ত্ব অনেক দিন যাবৎ প্রকাশিত হয় নাই। রামন এফেক্টের আবিষ্কারের পর বিভিন্ন দেশের বহু বৈজ্ঞানিক বহু জৈব খনিজ পদার্থের রামন বর্ণালী পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পান যে, একই পদার্থের বিভিন্ন রামন রেখার উজ্জ্বলতা বিভিন্ন।

তাঁহাদের কেহ কেহ রামন রেখাগুলির পোলারিজেশন (Polarisation) উলাষ্টন (Wollaston) প্রিজম্-এর সাহায্যে প্রত্যেক রামন রেখাকে ঊর্ধ্বাধঃ দুই অংশে বিভক্ত করিয়া পরীক্ষা করেন। তাঁহারা দেখিতে পান যে, বিভিন্ন রামন রেখার পোলারিজেশন পরস্পর বিভিন্ন ও র‍্যালে রেখার পোলারিজেশন হইতে পৃথক।

কখনও উক্ত পরমাণুর কোন ইলেকট্রন উত্তেজিত হইয়া পরমাণুটিকে একটি অস্থায়ী শক্তিতে উন্নত করে ও পরে স্বতঃই পরমাণুটি হয় পূর্বের নিম্নতর শক্তিযুক্ত অবস্থা, নতুবা তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ উচ্চতর অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করে। এইরূপ সংঘটনের সময় পরমাণুর ইলেকট্রনগুলির ভারকেন্দ্র উহার অষ্টির (Nucleus) ভারকেন্দ্র হইতে কিঞ্চিৎ

3নং চিত্র

কার্বন টেট্রাক্লোরাইডের চিহ্নিত রামন রেখা চারটির পোলারিজেশন দেখান হইয়াছে।

এইরূপ পোলারিজেশন পরীক্ষার জন্য একটি ফটোগ্রাফ 3নং চিত্রে প্রদর্শিত হইল। ইহার দক্ষিণ পার্শ্বে কৃষ্ণবর্ণ তীরের সাহায্যে রেখাগুলির উভয় অংশের বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র যে অভিমুখে কম্পমান, তাহা দেখান হইয়াছে। যে কারণে বিভিন্ন রামন রেখাগুলির উজ্জ্বলতা ও পোলারিজেশন পরস্পর বিভিন্ন হয়, ইহার প্রকৃত কারণ 1930 সালে মানেবাক (Manebuck) নামক বৈজ্ঞানিক প্রথমে দুইটি পরমাণুবিশিষ্ট অণুগুলির রামন এফেক্টের তত্ত্বে নির্ধারণ করেন। 1931 সালে প্লাচেক (Placzek) নামক বৈজ্ঞানিক ঐরূপ তিন বা ততোধিক পরমাণুবিশিষ্ট অণুগুলির রামন এফেক্টের তত্ত্ব প্রকাশ করেন।

মানেবাক ও প্লাচেক উভয়েই তাঁহাদের তত্ত্ব দুইটিতে পূর্বে ক্রামার্স ও হাইসেনবার্গের বিচ্ছুরিত রশ্মির কোয়ান্টাম তত্ত্বের সাহায্য লইয়াছেন। শেষোক্ত তত্ত্বে এইরূপ ধারণা করা হইয়াছে যে, কোন পদার্থের পরমাণুতে নির্দিষ্ট আকারের শক্তিকণাবিশিষ্ট রশ্মি আপতিত হইলে কখনও অপসৃত হইয়া পুনরায় স্বস্থানে প্রত্যাবর্তন করায় পরমাণুটিতে অস্থায়ী ও কম্পমান বৈদ্যুতিক মোমেন্টের (Moment) সৃষ্টি হয়, সেই জন্য পরমাণুটি অবিকৃত কম্পন-হারযুক্ত রশ্মি অথবা কিঞ্চিৎ হ্রাস বা বৃদ্ধি প্রাপ্ত কম্পন-হারযুক্ত রশ্মি বিকিরণ করে। বিকিরিত অবিকৃত রশ্মির উজ্জ্বলতা উক্ত বৈদ্যুতিক মোমেন্টের পরিমাণের উপর নির্ভর করে। এই তত্ত্ব রামন এফেক্টের উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রয়োগ করিবার সময় মানেবাক প্রথমে কল্পনা করেন যে, কোনও অণুর দ্বারা বিচ্ছুরণের সময় অণুটির যে কোন একটি ইলেকট্রন ঐরূপ উত্তেজিত হইতে পারে এবং অণুটি যে পরমাণুগুলির দ্বারা গঠিত, সেগুলির মধ্যে যদি পরস্পর কম্পনের উত্তেজনা না হয়, তাহা হইলে অণুটির বিকিরণ র‍্যালে বিচ্ছুরণের ন্যায় হইবে, কিন্তু যদি পরমাণুগুলির পরস্পর কম্পনের উত্তেজনা হয়, তাহা হইলে অণুটি সর্বশেষে কিঞ্চিৎ উচ্চতর শক্তির অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করিবে ও বিকিরিত রশ্মির কম্পন-হার আপতিত রশ্মির কম্পন-হার অপেক্ষা ন্যূনতর হইবে। তিনি

আরও কল্পনা করেন যে, পরমাণুগুলির পরস্পর কম্পনের ফলে উক্ত বৈদ্যুতিক মোমেন্টেরও কম্পমানের পরিবর্তন ঘটে এবং এই পরিবর্তনের পরিমাণের উপর হ্রাসপ্রাপ্ত কম্পন-হারযুক্ত বিকিরিত রশ্মির অর্থাৎ ষ্টোক্স রামন রেখার উজ্জ্বলতা নির্ভর করে। আবার ঐরূপ কম্পমান অণুর উপর আপতিত রশ্মি বিচ্ছুরিত হইবার সময় যদি পরিশেষে অণুটির কম্পন স্থগিত হইয়া যায়, তাহা হইলে বিচ্ছুরিত রশ্মির কম্পন-হার বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে; অর্থাৎ রশ্মিটি অ্যান্টি-ষ্টোক্স্ রামন রেখা উৎপাদন করিবে। শতকরা অতি অল্পসংখ্যক অণুই তরল পদার্থে ঐরূপ কম্পমান অবস্থায় থাকে। সেই জন্য শেষোক্ত রামন রেখার উজ্জ্বলতা ষ্টোক্স রেখার উজ্জ্বলতা অপেক্ষা অতি অল্প। বায়বীয় অবস্থায় থাকিলে অণুটিতে ঘূর্ণনের উত্তেজনাও হইতে পারে এবং সেই জন্যও রামন রেখা উৎপন্ন হইতে পারে।

উল্লিখিত বৈদ্যুতিক মোমেন্টের পরিবর্তিত অংশের বিভিন্ন দিকের পরিমাণ অণুর মধ্যে অবস্থিত পরমাণুগুলির কম্পনের উপর যে ভাবে নির্ভর করে, তাহার উপর উৎপন্ন রামন রেখার পোলারিজেশন নির্ভর করে। সাধারণতঃ কম্পন-হীন অণুতে যে অস্থায়ী বৈদ্যুতিক মোমেন্টের সৃষ্টি হয়, উহার সমসাদৃশ্য (Symmetry) অণুটির সমসাদৃশ্যের অনুরূপ, কিন্তু কম্পমান অণুতে কম্পনের জন্য উক্ত মোমেন্টের যে পরিবর্তন হয়, তাহার সমসাদৃশ্য কি ধরণের কম্পন, তাহার উপর নির্ভর করে।

দুইটির অধিক পরমাণুবিশিষ্ট অণুগুলির রামন এফেক্টের তত্ত্ব অনুশীলন করিয়া পরে প্ল্যাচেক দেখান যে, এই প্রকার অণুগুলির মধ্যস্থ কোন বিন্দু, রেখা অথবা সমতলের উভয় পার্শ্বে যে সমসাদৃশ্য থাকে, যদি উহাদের পরমাণুগুলির পরস্পর বিকম্পনের সময় উক্ত সমসাদৃশ্য অক্ষুণ্ণ থাকে, তাহা হইলে উক্ত বিকম্পনজনিত রামন রেখা সমুজ্জ্বল হইবে ও উহার পোলারিজেশন অত্যধিক হইবে অর্থাৎ যদি 3য় চিত্রে প্রদর্শিত রামন রেখাগুলি ঐরূপ কম্পনের জন্য হইত, তাহা হইলে নিম্নের অংশে রেখাগুলির উজ্জ্বলতা অতি অল্প হইত। কিন্তু দেখা যাইতেছে যে, মাত্র বাম দিক হইতে তৃতীয় উজ্জ্বল রামন রেখারই নিম্নের অংশের উজ্জ্বলতা অল্প এবং অবশিষ্ট তিনটির উভয় অংশের উজ্জ্বলতা প্রায় সমান। ইহাতেই বুঝা যাইতেছে যে, তৃতীয় রেখাটি পরমাণুগুলির পরস্পর যে কম্পনের দ্বারা উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাতে অণুটির সমসাদৃশ্য অবিকৃত থাকে। সেইরূপ অপর তিনটি রেখা যে বিভিন্ন কম্পনের দ্বারা উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাতে অণুর সমসাদৃশ্য বিনষ্ট হয়।

বহু পরমাণুবিশিষ্ট অণুতে কত প্রকারের বিভিন্ন কম্পন হইতে পারে, তাহা অণুটিতে পরমাণুগুলি সজ্জিত হইয়া যে সমসাদৃশ্যের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহার উপর নির্ভর করে। আবার এই বিভিন্ন প্রকারের কম্পনের কোন্ কোন্টি রামন রেখা উৎপন্ন করিবে ও কোন্ কোন্টি করিবে না, তাহাও কম্পনগুলির দ্বারা অণুটির সম-সাদৃশ্য যে ভাবে পরিবর্তিত হয়, তাহার উপর নির্ভর করে। সুতরাং কোনও অণুর রামন বর্ণালী এবং উৎপন্ন রামন রেখাগুলির পোলারিজেশন পরীক্ষা করিয়া অণুটির সমসাদৃশ্য ও সেই সঙ্গে তাহার আকৃতি নির্ধারণ করা যায়। আবার রামন রেখাগুলির পোলারিজেশন পরীক্ষা করিয়া কোন্ রামন রেখা কি প্রকার কম্পনের দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে, ইহা অনেক ক্ষেত্রে স্থির করা যায় এবং পরে পরমাণুগুলির পরস্পরের মধ্যে যে বন্ধন আছে, তাহার দৃঢ়তাও নির্ধারণ করা যায়।

পূর্বে বলা হইয়াছে যে, প্রত্যেক পদার্থের অণু নির্দিষ্ট কয়েকটি রামন রেখা উৎপন্ন করে, সুতরাং বিভিন্ন পদার্থের অণুর রামন রেখাগুলির

সংখ্যা ও তাহাদের প্রত্যেকটির কম্পন-হার বহু পূর্বেই নির্ধারিত হইয়াছে। এই জন্য রামন এফেক্ট পরীক্ষা করিয়া কোন অজ্ঞাত পদার্থের অণুর স্বরূপ নির্ণয় করা যায় অথবা কোন জ্ঞাত পদার্থে দ্বিতীয় কোন পদার্থ অল্প পরিমাণে সংমিশ্রিত আছে কিনা, ইহাও বুঝা যায়। আবার কোন পদার্থ বায়বীয় অবস্থা হইতে তরল অথবা তরল অবস্থা হইতে কঠিন অবস্থায় রূপান্তরিত হইলে উহার অণুগুলির মধ্যে শেষোক্ত দুইটি অবস্থায় কোন আকর্ষণজনিত পরিবর্তন ঘটে কিনা, তাহাও উক্ত তিনটি অবস্থায় পদার্থটির রামন রেখাগুলি পর্যবেক্ষণ করিয়া বুঝা যায়। এই ভাবে বিভিন্ন পদার্থের অণুগুলির সম্বন্ধে নানারূপ তথ্য অনুসন্ধান করিয়া যে সকল নূতন জ্ঞান বৈজ্ঞানিকগণ লাভ করিয়াছেন, তাহা এই পর্যন্ত প্রকাশিত প্রায় পাঁচ সহস্র মৌলিক প্রবন্ধে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা হইতেই রামনের আবিষ্কারের গুরুত্বের উপলব্ধি হইবে।

লেসার রামন বর্ণালী-বিজ্ঞান

সূর্যেন্দুবিকাশ কর *

লেসার ও রামন এফেক্ট—বর্তমান শতাব্দীর এই দুটি মৌলিক আবিষ্কার আলোক-বিজ্ঞানে যুগান্তর এনেছে। একদিকে রামন এফেক্টের প্রয়োগ অণুরাজ্যের অন্তর্জগতের সন্ধান দিয়ে তার বৈচিত্র্যের বহুমুখী সমস্যার সমাধান করেছে, অন্য দিকে লেসারের মাধ্যমে আমরা সাধারণ আলোর চেয়ে বহুলাংশে প্রখর ও দীপ্তিমান আলোর সন্ধান পেয়েছি। প্রযুক্তি-বিস্তার মাধ্যমে লেসারের প্রয়োগ মানুষের সভ্যতাকে বিস্ময়করভাবে অগ্রগামী করেছে। রামন এফেক্টের প্রয়োগ নিয়ে যে রামন বর্ণালী-বিজ্ঞান গড়ে উঠেছে, সাধারণ উদ্ভাসী একবর্ণী আলোর পরিবর্তে লেসার ব্যবহার করে তার উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে; ফলে লেসার রামন বর্ণালী-বিজ্ঞান অণুজগতে গবেষণার এক সুস্পষ্ট বিস্ময়কর অগ্রগতির আভাস নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। এই সম্পর্কে আলোচনার আগে অণুজগতের গবেষণার পদ্ধতিগুলি সম্পর্কে কিছু বলা দরকার।

অণুর অন্তর্লোকে

পরমাণু সম্পর্কে আমাদের অনেক কিছুই জানা আছে। পরমাণুর ইলেকট্রনগুলি বিভিন্ন কক্ষে ওঠা-নামার ফলে আমরা পাই শক্তির বিকিরণ। সেই শক্তি আলো কখনো বা এক্স-রশ্মি বা অতি-বেগুনী রশ্মি হিসাবে ধরা পড়ে। সবচেয়ে শক্তিশালী গামারশ্মির উৎস হলো পরমাণুর নিউ-ক্লিয়াস। কিন্তু দুই বা ততোধিক পরমাণু মিলে যখন অণুর সৃষ্টি হয়, তখন পরমাণুগুলির প্রকৃতির যে বড় একটা পরিবর্তন হয়—তা নয়, কিন্তু তাদের এই অণুতে বাঁধা পড়বার ফলে তাদের গতিবিধি কিছুটা জটিল হয়ে পড়ে। যেমন পরমাণুগুলি তাদের অদৃশ্য গাঁটছড়ার মাঝামাঝি একটি অক্ষ-পথে ঘুরপাক (Rotation) খায়। এই ঘুরপাকের ফলে যে শক্তি আমরা পাই, তা সাধারণতঃ অণুতরঙ্গের (Microwave) পর্যায়ে পড়ে।

*সাহা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, কলিকাতা—9

তাছাড়া অণুতে সৃষ্টি হয় স্থির কম্পন বা স্পন্দন (Vibration)। এই স্পন্দন পরমাণুতে ইলেকট্রনের ওঠা-নামার সঙ্গে তুলনীয় নয়, যদিও উভয় ক্ষেত্রেই এরা বিকিরণধর্মী। অণুতে এই স্পন্দন সম্ভব হয় পরমাণুর গতিবিধির ফলে। এই গতিবিধির জন্যে অণুটি যে ভেঙ্গে পড়ে—তা নয়, কিন্তু তাতে সৃষ্টি হয় বিভিন্ন কম্পাঙ্কের স্পন্দন।

এই কম্পাঙ্কের পাল্লা অবলোহিত রশ্মি বা তার কাছাকাছি পড়ে। বিভিন্ন শক্তির কম্পাঙ্ক সম্পর্কে যাঁরা খবর রাখেন, তাঁদের কাছে এটা স্পষ্ট যে, এই পাল্লার কম্পাঙ্কে নিহিত শক্তিমাত্রা সাধারণ আলোর চেয়ে অনেক গুণ কম। তাই বস্তুর বাইরে আসবার আগেই এরা তাপের আকারে নিজেদের হারিয়ে ফেলে অথচ এই কম্পাঙ্কের স্বরূপ না জানতে পারলে অণু সম্পর্কে কিছু জানা যাবে না। পরমাণুতে যেমন কক্ষগুলি শক্তির স্তর—তেমনি অণুর ক্ষেত্রে তাদের কাঠামো বা পরমাণুর অবস্থান এক রকম নয়। অণুদের কেউ সরল রেখাকার, কেউ ইংরেজী V বা L-এর মত, কোনটা অষ্টতলীয় বা বহুতলীয় ইত্যাদি। অণুর গঠন-রহস্য জানতে হলে তাই এই স্পন্দনের (Vibration) ধর্ম জানা বিশেষ প্রয়োজন।

অবলোহিত রশ্মির শোষণ পদ্ধতি ও রামন এফেক্ট

পরমাণুর গতিবিধির ফলে অণুতে সৃষ্ট এই স্পন্দন একটি বিশেষ অণুর ক্ষেত্রে তার বিভিন্ন স্পন্দন শক্তিস্তরে (Vibrational energy level) ওঠা-নামার ফলে সম্ভব হয়। আগেই আমরা বলেছি, এই স্পন্দনের শক্তি অবলোহিত রশ্মির পাল্লায় পড়ে। তাই অবলোহিত রশ্মিতে অণুকে উদ্ভাসিত করলে অণু তার কম্পাঙ্ক অনুযায়ী এই রশ্মি শোষণ করে নেয়। এই পরীক্ষা থেকে আমরা অণুর কম্পাঙ্ক পরোক্ষভাবে ধরতে পারি। কিন্তু এই পরীক্ষায় নানা অসুবিধা রয়েছে। প্রথমতঃ বস্তুর নমুনার আবরণটি এমন হওয়া চাই যে, তা যেন এই রশ্মি শোষণ না করে। তাই সাধারণ কাচ নয়, সোডিয়াম ক্লোরাইড বা ঐ জাতীয় বস্তুর মাধ্যমে এই রশ্মি পাঠাতে হয়। জলীয় বা অনুরূপ দ্রবণে নমুনা নেওয়া চলে না—সেখানেও সেই একই সমস্যা।

তাছাড়া অবলোহিত রশ্মির উৎপাদন ও নমুনা থেকে বিক্ষিপ্ত এই রশ্মি ধরে পরিমাপ করা আলোর চেয়ে যে কষ্টসাধ্য, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

সাধারণ আলোতে উদ্ভাসিত অণু থেকে উদ্ভাসী আলোর কম্পাঙ্ক নিয়ে যে আলো বিক্ষিপ্ত হয়, যাকে আমরা র‍্যালে বিকিরণ বলি, তা দিয়ে অণুর স্পন্দনের কম্পাঙ্কের হদিস পাওয়া যায় না। রামন এফেক্ট দিয়ে পরীক্ষায় সাধারণ উদ্ভাসী আলোর কম্পাঙ্ক অণু থেকে বিক্ষিপ্ত হয়ে কিছুটা হ্রাসপ্রাপ্ত ও কিছুটা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত কম্পাঙ্কের আলোতে রূপান্তরিত হয়ে বেরিয়ে আসে। এই বাড়্তি ও ঘাটতি কম্পাঙ্কই হলো অণুর স্পন্দনের কম্পাঙ্ক। অণুর বিভিন্ন শক্তিস্তরের জন্যে এরকম একাধিক বাড়্তি ও ঘাটতি কম্পাঙ্কের সন্ধান পাওয়া যায়। অণুর কম্পাঙ্ক অবলোহিত পর্যায়ে পড়লেও উদ্ভাসী ও বিক্ষিপ্ত—উভয় রশ্মিই রামন পরীক্ষায় দৃশ্য আলোর পর্যায়ে পড়ে। তাই এই পরীক্ষায় কিছুটা সুবিধা রয়েছে। তবু 1928 খৃষ্টাব্দের আগে কেউ এরকম বিক্ষিপ্ত আলোর সন্ধান পান নি কেন, তার কারণ হিসেবে বলা যায় যে, রামন বর্ণালী রেখার দীপ্তি র‍্যালের বিকিরণ থেকে অনেকাংশে ক্ষীণতর। তাছাড়া বহু অণুর ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, উদ্ভাসী আলো অণুতে শোষিত হয়ে যায়। পরে অণু তার স্পন্দন শক্তিস্তরগুলিতে নীচের দিকে নামতে থাকে ও স্পন্দনের বিকিরণ তাপের আকারে বস্তুর নমুনাতেই ছড়িয়ে পড়ে। শোষণ প্রক্রিয়াতে পরমাণুর ইলেকট্রনও অংশ নেয়।

ফলে এখন পরমাণুর উত্তেজনা প্রশমিত হয়ে আমরা যে বিকিরণ পাই, তাকে বলা হয় প্রতিপ্রভা (Florescence)। এই আলো থেকেও স্পষ্টতঃই দেখা যাচ্ছে, অণুর স্পন্দনের কোন আভাস পাওয়া যায় না অথচ এর দীপ্তিও সামান্ত নয়। র‍্যালে বিকিরণ ও প্রতিপ্রভার দীপ্তিতে রামন রেখাগুলি সহজেই চাপা পড়ে যায়।

তাই রামন এফেক্টের পরীক্ষাও খুব সাবধানতার সঙ্গে করা প্রয়োজন। তাছাড়া, পরবর্তী কালে উদ্ভাসী আলোর জন্তে সাধারণ পারদ-বাষ্প দীপের পরিবর্তে কুণ্ডলীকৃত দীপ দিয়ে এই পরীক্ষা আরো সহজ করা হয়েছে। এখন মনোক্রোমেটারের সাহায্যে রামন বর্ণালী উদ্ভাসী আলোর বর্ণালী থেকে পৃথক করে নেওয়া যায়। ফটোগ্রাফিক প্লেটের পরিবর্তে ফটোমালটিপ্লায়ারের সাহায্যে কাগজের উপর লেখনী দিয়ে রামন বর্ণালী রেকর্ড করা যায়।

কিন্তু রামন বর্ণালী ও অবলোহিত শোষণ পদ্ধতির মৌলিক প্রক্রিয়াতেই একটা পার্থক্য রয়েছে, যার ফলে অণুগুলির সম্পূর্ণ সাম্যধর্মী স্পন্দন অবলোহিত প্রক্রিয়ায় ধরা পড়ে না অথচ রামন এফেক্টে এদের ধরা যায়। আবার সম্পূর্ণ সাম্যবিরোধী স্পন্দনের বেলায় এর ঠিক উল্টো। ছুই পরমাণুযুক্ত সরলরেখাকার অণুতে সাম্যধর্মী স্পন্দনের একটা-উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। ছুটি পরমাণুই এরকম স্পন্দনে মুখোমুখি এগিয়ে আসছে আবার উল্টো দিকে পিছিয়ে যাচ্ছে। ফলে যেন পর পর অণুটির আয়তন বাড়ছে ও কমছে। সাম্যবিরোধী স্পন্দনের বেলায় একটি পরমাণু যখন এগিয়ে আসছে, অন্তটি তখন বিপরীতমুখী। এই অবস্থায় অণুর আয়তনে যেন একটুও হ্রাস-বৃদ্ধি হচ্ছে না। বিজ্ঞানের ভাষায় এই ব্যাখ্যাটি আর একটু জটিল। সামান্ত পরিসরে সে সম্পর্কে ছু-এক কথা বলা যায়। যে কোন বিকিরণই তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ। বিকিরণ তরঙ্গের সঙ্গে আড়াআড়িভাবে তড়িৎ ও চৌম্বক ক্ষেত্রের তরঙ্গও তার সঙ্গে এগিয়ে চলে। অণুতে পরমাণুর ধন ও ঋণবিদ্যুৎ মেঘের মত যেভাবেই ছড়িয়ে থাকুক না কেন, বিকিরণসংশ্লিষ্ট তড়িৎ ক্ষেত্রের প্রভাবে অণুটি একটি দ্বিমেরুর (Dipole) মত আচরণ করে অর্থাৎ এক দিকে ধন আধান অন্ত দিকে ঋণ আধান যেন কেন্দ্রীভূত হয়—একটি বৈদ্যুৎ কেন্দ্রের ছু-দিকে। তড়িৎ ক্ষেত্রটি পরিবর্তী বলেই এই দ্বিমেরু ও কম্পমান (Oscillating) অবস্থা পায়, ফলে বিকিরণের উৎস হয়ে দাঁড়ায়। এই বিকিরণই র‍্যালে বিকিরণ নামে পরিচিত। এর কম্পাঙ্ক উদ্ভাসী বিকিরণের, তথা তার তড়িৎ ক্ষেত্রের কম্পাঙ্কের অনুরূপ। অণুর সাম্যবিরোধী স্পন্দনে এই দ্বিমেরু ভ্রামকের (Dipole moment) পরিমাণ বদলে যায়, সে ক্ষেত্রে অবলোহিত শোষণ কার্যকরী হয়। আবার সাম্যধর্মী কম্পনের বেলায় অণুর স্পন্দনগুলি র‍্যালে বিকিরনের সঙ্গে দোলায়িত (Modulated) হয়ে রামন রেখার জন্ম দেয়। অণুর একটি বিশেষ কম্পাঙ্ক যদি ν' আর উদ্ভাসী আলোর কম্পাঙ্ক ν হয়, তবে রামন বর্ণালী রেখা $\nu-\nu'$ বা $\nu+\nu'$ হবে। $\nu-\nu'$ রেখাটি ষ্টোক্সের নামে অভিহিত হয়। তার কারণ প্রতিপ্রভার আলো উদ্ভাসী আলোর কম্পাঙ্কের চেয়ে কম হয়—ষ্টোক্স এই নিয়মটি প্রচলন করেছিলেন। তাই হ্রাসপ্রাপ্ত কম্পাঙ্কের রামন-রেখা ঐ নামেই পরিচিত আবার বৃদ্ধিপ্রাপ্ত কম্পাঙ্কের রামন-রেখা অ্যান্টি-ষ্টোক্স নামে অভিহিত হয়। প্রসঙ্গতঃ বলা যায়, নিম্নতর স্পন্দন শক্তিস্তরের অণু উদ্ভাসী আলোর সংঘাতে যখন উর্ধ্বতর স্তরে থেকে যায়, তখন ষ্টোক্স রেখা ($\nu-\nu'$) ও গোড়াতেই যে সব অণু উর্ধ্বস্তরে থাকে, তারা উদ্ভাসী আলোতে নিম্নতর স্তরে ফিরে এলে অ্যান্টি-ষ্টোক্স রেখা ($\nu+\nu'$) পাওয়া যায়।

সে যাহোক, আংশিক সাম্যধর্মী স্পন্দন ছুটি প্রক্রিয়াতেই ধরা পড়ে। অণুরাজ্যে এই রকম

স্পন্দন অধিকাংশ অণুতেই রয়েছে। তাই রামন এফেক্ট ও অবলোহিত প্রক্রিয়া একদিকে পরস্পরের পরিপূরক হয়েও কিছুটা প্রতিদ্বন্দ্বীও বটে। রামন পরীক্ষায় উল্লিখিত সুবিধাজনক রূপান্তরের ফলেও যে অসুবিধা দেখা যায়, তা হলো রামন বর্ণালীর দীপ্তির ক্ষীণতা। আর এই দীপ্তির মাত্রা ও সমবর্তনের (Polarisation) মাত্রার পরিমাপ দিয়েই তো অণুর গঠন, তার কম্পনের সাম্যধর্ম প্রভৃতি জানা যাবে। তাই উজ্জ্বলতর লেসার রশ্মি উদ্ভাসী আলোরূপে ব্যবহার করে এই অসুবিধাগুলি সম্পূর্ণ দূর করা সম্ভব হয়েছে।

লেসারের প্রয়োগে রামন এফেক্ট

সাধারণ আলোর চেয়ে বহুলাংশে উজ্জ্বলতর লেসার আলোতে অণু উদ্ভাসিত হয়ে যে আলো বিক্ষিপ্ত হবে, তার দীপ্তিও হবে উজ্জ্বলতর সন্দেহ নেই। ক্ষীণ রামন-রেখাগুলিও হবে দীপ্ততর। অবিরাম তরঙ্গের গ্যাস লেসার (Continuous wave gas laser) আধুনিক রামন বর্ণালী যন্ত্রের সহযোগে রামন এফেক্টের পরীক্ষা আরো সহজ করেছে। লেসারের প্রখর একবর্ণী আলোর রৈখিক ব্যাপ্তি সাধারণ আলোর চেয়ে অনেক কম। তাই 1/2 মিঃ মিঃ ব্যাসের সরু এই আলো উপযুক্ত দর্পণের সাহায্যে খুব ছোট আয়তনের নমুনায় কেন্দ্রীভূত (Focussed) করা যায়। এমন কি 8×10^{-9} লিটার আয়তনের নমুনা থেকেও লেসার দিয়ে রামন বর্ণালী পাওয়া সম্ভব হয়েছে। কঠিন পদার্থের রামন বর্ণালীও সহজেই পাওয়া যায়। বায়ব পদার্থে অণুর ঘনত্ব অনেক কম হলেও লেসারের 3×10^{-9} সেঃ মিঃ আয়তনেও এত উজ্জ্বল আলো হয় যে, বায়ব পদার্থের রামন-রেখা পাওয়া আর কোন সমস্যাই নয়। রামনের পরীক্ষায় রঙীন পদার্থের নমুনা নিয়ে সমস্যা হলো যে, উদ্ভাসী আলো এই সব নমুনায় শোষিত হয়—ফলে রামন বর্ণালী পাওয়ার কোন সম্ভাবনা থাকে না। গ্যাস লেসার থেকে এখন এমন সব কম্পাঙ্কের উদ্ভাসী আলো পাওয়া যায় যে, রঙীন পদার্থে শোষণযোগ্য কম্পাঙ্ক বাদ দিয়ে যে কোন একটি লেসার রশ্মির কম্পাঙ্ক নির্বাচন করে নিয়ে রঙীন নমুনার রামন বর্ণালী ধরা সম্ভব হয়। লেসারের আলোর সবটাই সমবর্তিত (Polarised)। সাধারণ আলোর রামন পরীক্ষায় রামন বর্ণালীর আলো কতটা সমবর্তিত, তাই দেখে অণুর স্পন্দন কতটা সাম্যধর্মী, তা স্থির করা হতো। এখন লেসার রামন বর্ণালীর আলো কতটা সমবর্তিত নয়, তা থেকে স্পন্দনের সাম্য বিরোধিতা ঠিক করা হয়। লেসারের প্রয়োগে একটি যন্ত্র দিয়েই 60 cm^{-1} থেকে 4000^{-1} তরঙ্গ সংখ্যার (Wave number) রামন বর্ণালী পাওয়া যায় অনায়াসে (তরঙ্গ সংখ্যা = কম্পাঙ্ক/আলোর গতি)। অজৈব রসায়নবিদ্‌দের কাছে তাই লেসার রামন বর্ণালী যন্ত্র একটি নতুন যুগের ইঙ্গিত নিয়ে এসেছে। অথচ 60 cm^{-1} থেকে 400 cm^{-1} তরঙ্গ সংখ্যার আণবিক কম্পনের জন্যে অবলোহিত শোষণ পদ্ধতির জটিল যন্ত্রপাতি নিয়ে তাঁদের দুর্ভাবনার অন্ত ছিল না। অবশ্য এখনও জৈব রসায়নবিদ্‌দের কাছে অবলোহিত পদ্ধতিটি অপরিহার্য, কারণ জৈব অণুর অধিকাংশই সাম্যবিরোধী স্পন্দনের উৎস। কিন্তু যেক্ষেত্রে দুটি পদ্ধতিই কার্যকরী, সেক্ষেত্রে লেসার রামন যন্ত্রকে অগ্রাধিকার দিতে এখন কোনও দ্বিধার কারণ নেই।

লেসার রামন বর্ণালী-বিজ্ঞানের প্রয়োগের উদাহরণ

(1) রঙীন অণু—MX_6^{n-} অষ্টতলীয় অণু।

(M=Re, Ir, Os, Pt বা Pd আর X=Cl বা Br)। এই অণু এত রঙীন যে, সাধারণ চোখে মনে হয় অস্বচ্ছ। অথচ এদের রামন বর্ণালী জানা একান্ত প্রয়োজনীয় ছিল। বর্তমান লেসার রামন

যন্ত্রে সেই বর্ণালী ধরা পড়েছে। ফলে এই সব অণুর স্পন্দন থেকে M ও X কিভাবে বাঁধা পড়ে, সেই বাঁধনের প্রকৃতিই বা কি, তা সুস্পষ্টভাবে নির্ধারণ করা যাবে।

(2) যে সব অণু আলোতে বিকৃত হয়—এমন কতকগুলি অণু আছে, যারা উদ্ভাসী পারদ দীপের 4358Å তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলোয় বিকৃত হয়ে যায় অর্থাৎ তাদের আণবিক আসল কাঠামোটি ভেঙে পড়ে। এই অবস্থায় রামন বর্ণালী নেবার কোন প্রয়োজনই থাকে না। হিলিয়াম-নিওন লেসারের লাল আলো উদ্ভাসী আলো হিসেবে ব্যবহার করে এখন এসব অণুর রামন বর্ণালী স্বচ্ছন্দে ধরা যাচ্ছে। এই আলোতে কিন্তু এসব অণু ভেঙে পড়ে না। এই অণুগুলি হলো $V(CO)_6^-$, $Cr(CO)_6$, $MO(CO)_6$, $W(CO)_6$, $Re(CO)_6^+$। এরা সবাই অষ্টতলীয়। এসব অণুতে ধাতু ও কার্বন যে ভাবে জোট বেঁধেছে, রামন বর্ণালী থেকে সেই বাঁধন শক্তির একটা আঁচ পাওয়া যায়। ফলাফল দৃষ্টে বলা যায়, এই শক্তি Re, Cr, W, V-র ক্ষেত্রে যেন ক্রমশঃ হ্রাস পাচ্ছে।

(3) গ্যাসের রামন বর্ণালী—লেসার রামন যন্ত্রে গ্যাসীয় অণুর রামন বর্ণালী নেওয়া যে সম্ভব হয়, একথা আগেই বলেছি। কঠিন, তরল ও গ্যাসীয় অবস্থায় XeF_6-এর রামন বর্ণালী নিয়ে দেখা যাচ্ছে যে, গ্যাসীয় অবস্থায় অণুর গঠন অন্য দুটি অবস্থায় অণু থেকে পৃথক। $NbOCl_3$ অণুর গ্যাস অবস্থায় (300°C) ও কঠিন অবস্থায় রামন বর্ণালীর পার্থক্য থেকে এদের গঠনের পার্থক্য ধরা পড়েছে (1নং চিত্র)।

1নং চিত্র

$NbOCl_3$ অণু (ক) কঠিন ও (খ) গ্যাসীয় অবস্থায় গঠন-বিন্যাস, যা লেসার রামন বর্ণালীর সাহায্যে নির্ধারিত হয়েছে।

(4) অবলোহিত রশ্মির সঙ্গে প্রতিক্রিয়াশীল এবং অস্থায়ী যৌগিক পদার্থ লেসার রামন পরীক্ষায় সাফল্য দেয়। বহু ক্ষেত্রে রামন বর্ণালী বিশ্লেষণে এই সব পদার্থের নূতন আণবিক সূত্র প্রতিপাদিত হয়েছে।

(5) কঠিন পদার্থের পৃষ্ঠদেশে শোষিত সামান্যতম পদার্থের রামন বর্ণালী লেসার প্রয়োগে ধরা পড়ে। সিলিকা জেল (Silica gel)-এর উপর শোষিত Br, CCl_4, Cs_2 ইত্যাদির রামন বর্ণালী নেওয়া সম্ভব হয়েছে। এমন কি, সিলিকা জেলের পৃষ্ঠদেশে শোষিত অ্যাসিট্যালডিহাইড-এর রামন বর্ণালীতে তার ভিন্ন রূপ গঠন-বিন্যাস

ধরা পড়েছে। তাই মনে হয়, লেসার রামন বর্ণালী অনুঘটক (Catalyst) প্রক্রিয়ার গবেষণায় যথেষ্ট সাহায্য করবে।

(6) উদ্ভাসিত কৃষ্ট্যাল থেকে লেসার রামন বর্ণালী অনেক কিছু নূতন তথ্য আহরণ করতে পারবে। গবেষণাগারে তৈরি কৃষ্ট্যাল কতটা পূর্ণাঙ্গ হয়েছে, তাও এই প্রক্রিয়ায় পরীক্ষা করা সম্ভব হবে।

(7) পলিমার—ছোটখাটো সাধারণ প্লাষ্টিকের বোতাম, গিয়ার (Gear) অথবা টিউবের রামন বর্ণালী লেসার সহযোগে সহজেই পাওয়া যায়। পলিভিনাইল ক্লোরাইডের গঠন-বিন্যাসে যে বিশৃঙ্খলা অন্যান্য পরীক্ষায় ধরা পড়েছিল, এখন রামন বর্ণালীতে তার সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে।

(8) অনুনাদী রামন বর্ণালী—1951 সালে অণুর স্পন্দনজনিত মূল রামন-রেখার অনুনাদী রামন বর্ণালী আবিষ্কৃত হয়। ফলে তত্ত্বের দিক দিয়ে রামন এফেক্টের গবেষণায় এই আবিষ্কার একটি মৌলিক অধ্যায়ের সূচনা করে।

2নং চিত্র
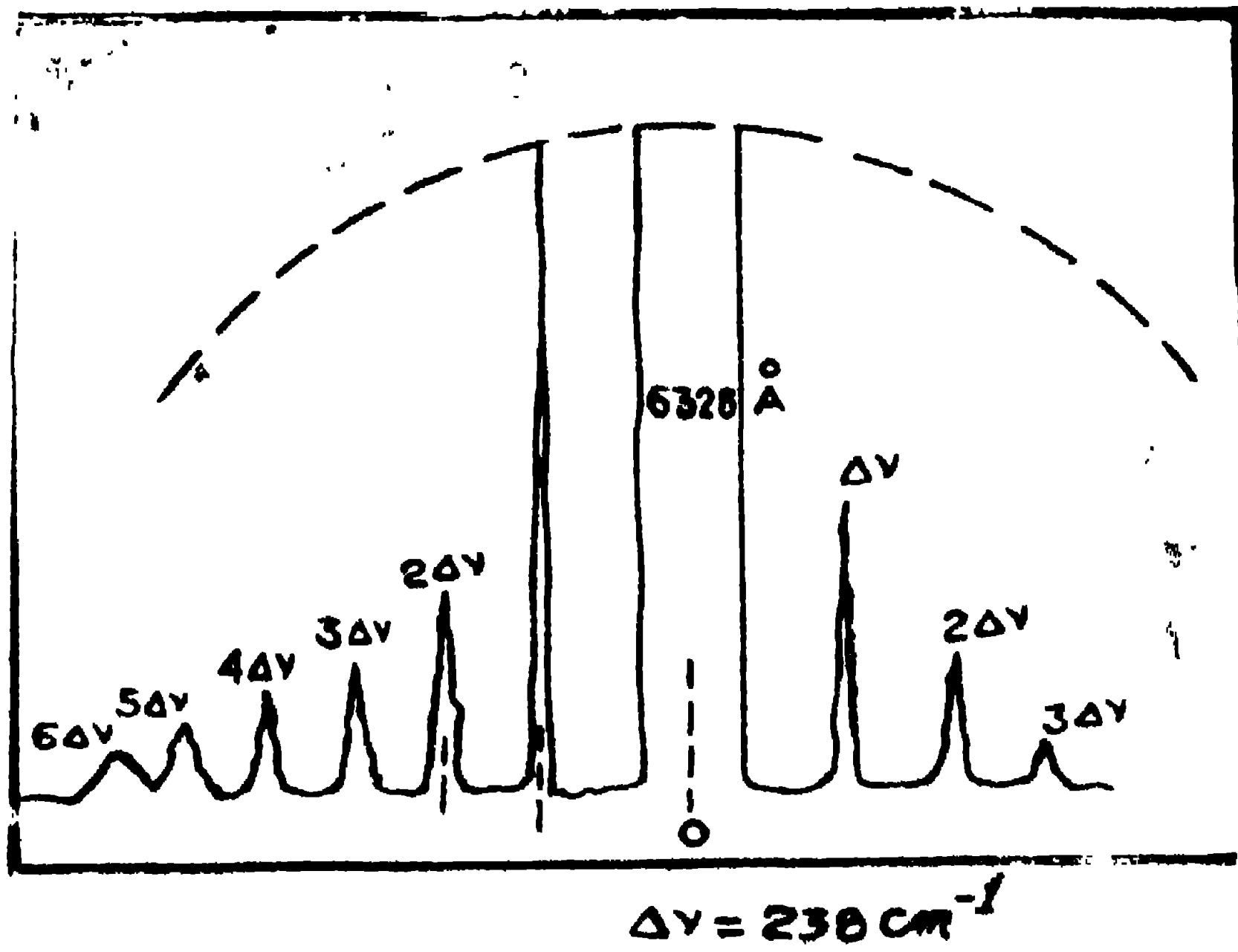
I_2^+ অণুর অনুনাদী রামন বর্ণালী। দ্রব ক্লোরোসালফিউরিক অ্যাসিডের ক্ষীণতর রামন বর্ণালী শোষিত হয়ে যায়। অনুনাদী রামন বর্ণালী ক্রমশঃ ক্ষীণতর অথচ তাদের রেখার ব্যাপ্তি (Width) বেড়ে যায়। উপরের খাপছাড়া রেখাটি I_2^+-এর শোষণ কম্পাঙ্কের পাল্লা নির্ণয় করে। এক্ষেত্রে সর্বোচ্চ শোষণ কম্পাঙ্ক হলো 6400Å।

রঙীন পদার্থের রামন বর্ণালী প্রসঙ্গে লেসারের উপযোগিতা সম্পর্কে আমরা আগেই বলেছি ঐ পদার্থে শোষণযোগ্য কম্পাঙ্কের বাইরে সাধারণতঃ একটি লেসার কম্পাঙ্ক উদ্ভাসী আলো হিসেবে ব্যবহার করতে হয়, তা না হলে বিক্ষিপ্ত রামন বর্ণালীও শোষণযোগ্য কম্পাঙ্কের পাল্লায় পড়েছে বলে তারাও শোষিত হয়ে যায়। কিন্তু

তত্ত্বের দিক দিয়ে এই সত্যটি সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল যে, ঐ সব পদার্থে শোষণযোগ্য কম্পাঙ্কের পাল্লায় যে কম্পাঙ্কের শোষণ সর্বোচ্চ, তার কাছাকাছি কোন নির্দিষ্ট কম্পাঙ্কের আলো দিয়ে ঐ রঙীন পদার্থটিকে উদ্ভাসিত করলে বিক্ষিপ্ত 2, 3 ইত্যাদি গুণের কম্পাঙ্কের অনুনাদী রামন বর্ণালী পাওয়া যাবে। এই উল্লেখযোগ্য পরীক্ষাটির জন্তে নমুনাটি খুব ছোট আকারে নিতে হবে, যাতে বিক্ষিপ্ত রামন বর্ণালীকে নমুনার মধ্যে অতি অল্প পথ অতিক্রম করতে হয়। ফলে শোষণের সুযোগ কমে যাবে। এভাবে গাঢ় নীল I_2^+ -এর রামন বর্ণালী নেওয়া হয়েছে। ফ্লোরোসালফিউরিক অ্যাসিডের সঙ্গে I_2^+-এর 10^{-3} মোলার দ্রবণ নিয়ে এই পরীক্ষা করা হয়। I_2^+-এর সর্বোচ্চ শোষণ কম্পাঙ্ক 6400Å-এর কাছাকাছি, 6328Å লেসারের লাল আলো দিয়ে এই নমুনাটি উদ্ভাসিত করে শুধু উজ্জ্বল ষ্টোক্স ও অ্যান্টিষ্টোক্স রামন-রেখা নয়, তাদের ওভারটোনগুলিও ধরা পড়েছে (2নং চিত্র)। 10^{-2} থেকে 10^{-4} মোলার ঘনীভবনের দ্রবণে লেসার ছাড়া রামন বর্ণালীর উৎপাদন কখনই সম্ভব হতো না।

এই আবিষ্কারটি লেসার রামন বর্ণালী-বিজ্ঞানে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ সন্দেহ নেই। এথেকে রামন এফেক্টের মৌলিক তত্ত্ব এবং তার প্রয়োগের নূতন নূতন ক্ষেত্র ক্রমশঃ জানা যাবে। রঙীন পদার্থের সামান্ত নমুনা থেকে—এমন কি উত্তেজিত পরমাণু সমন্বিত অণুর স্পন্দন ও লেসার রামন যন্ত্রে আরো নূতন তথ্যের সন্ধান দেবে।

(9) প্লাজ্মার ধর্ম—কঠিন, তরল ও গ্যাসীয় পদার্থ ছাড়া পদার্থের চতুর্থ অবস্থা প্লাজ্মার নমুনাতেও লেসার রামন বর্ণালী থেকে প্লাজ্মার ধর্ম সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়। তাপকেন্দ্রিক ক্রিয়ার (Thermonuclear reaction) জন্তে গবেষণাগারে যে প্লাজ্মা উৎপাদন করা হয়, তার পরীক্ষা-নিরীক্ষায় লেসার রামন বর্ণালী-বিজ্ঞান ক্রমশঃ একটি বিশিষ্ট ভূমিকা নেবে, সন্দেহ নেই।

উপসংহারে একথা বলা যায় যে, লেসার ও রামন এফেক্টের সম্মিলিত পরীক্ষায় অতি অল্প সময়ের মধ্যে যে প্রভূত পরীক্ষালব্ধ ফল আমাদের ভাণ্ডারে জমা হয়েছে তাতে মনে হয় রামন এফেক্ট নিয়ে গবেষণায় এই শতাব্দীর সমস্ত ফলাফলই অন্ত যে কোন আবিষ্কারের ফলাফলকে অতিক্রম করে যাবে।

স্বর্গীয় অধ্যাপক চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রামন

সতীশরঞ্জন খাস্তগীর*

বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীদের অন্যতম ও ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ পদার্থবিদ 'ভারত-রত্ন' চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রামনের মহাপ্রয়াণে সমগ্র বিজ্ঞান-জগৎ ও ভারতবাসী আজ শোকে অভিভূত। মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্বে তিনি হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হন এবং ব্যাঙ্গালোরে তাঁর নিজ ভবনে গত বছরের 21শে নভেম্বর সকালে তিনি শেষ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করেন। 1888 সনের নভেম্বর 21 তারিখে ত্রিচিনপল্লীতে তাঁর জন্ম হয়। তাঁর দীর্ঘ জীবনে তিনি গভীর নিষ্ঠা ও অক্লান্ত পরিশ্রম সহকারে পদার্থ-বিজ্ঞানে উচ্চাঙ্গের গবেষণা করে গেছেন। তাঁর জীবনের মূল মন্ত্রই ছিল—"বিজ্ঞানেনৈব বিজানাতি বিজ্ঞানমুপাস স্ব" অর্থাৎ বিজ্ঞানের দ্বারাই বিশেষ জ্ঞান লাভ হয়, বিজ্ঞানের উপাসনা কর।

অধ্যাপক রামনের জীবন-বৃত্তান্ত ও বৈজ্ঞানিক অবদানের কথা কিছু বলবার পূর্বে তাঁর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত সম্পর্কের কথা বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। 1919-21 সনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ-বিজ্ঞানে আমি তাঁর অনুগত ছাত্র ছিলাম। তিনি তখন ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থ-বিজ্ঞানে পালিত-অধ্যাপকের পদে অধিষ্ঠিত। তিনি আমাদের তড়িৎ-বিজ্ঞান পড়িয়েছিলেন। এই বিষয়ে সেই সময়কার আধুনিক আবিষ্কারগুলি সম্বন্ধে তিনি যে সব উদ্দীপনাপূর্ণ বক্তৃতা দিতেন, তা আজ প্রায় পঞ্চাশ বছর পরেও আমার মনে সুস্পষ্টভাবে অঙ্কিত আছে। 'বজ্র ও বিদ্যুৎ' সম্বন্ধে তাঁর তথ্যপূর্ণ বক্তৃতাগুলি আমার পরবর্তী জীবনে ঐ বিষয়ের গবেষণায় উৎবুদ্ধ করেছিল। আমি তাঁর অধীনে কয়েক মাস গবেষক ছাত্র হিসেবে কাজ করে তাঁর মনীষার পরিচয় পেয়েছিলাম। সেই সময় অধ্যাপক দেবেন্দ্রমোহন বসুও আমাদের পড়িয়েছিলেন। সদ্য-জার্মান প্রত্যাগত অধ্যাপক দেবেন্দ্র মোহন বসুর অধ্যাপনাও আমাদের খুব প্রিয় ছিল। স্বর্গতঃ অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা এবং শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসুও আমাদের সময়ে কলিকাতা সায়েন্স কলেজে অধ্যাপনা করতেন। তাঁদের কাছে পড়বার সৌভাগ্য আমার হয় নি। এখানে বলা প্রয়োজন, তদানীন্তন অনেক তরুণ অধ্যাপক, যাঁরা পরবর্তী জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন, যথা—স্বর্গতঃ অধ্যাপক ফণীন্দ্রনাথ ঘোষ, স্বর্গতঃ অধ্যাপক শিশিরকুমার মিত্র, স্বর্গতঃ অধ্যাপক বিধুভূষণ রায় প্রভৃতি, অধ্যাপক রামনের অধীনেই গবেষণা সুরু করেন। দুঃখের বিষয়, পরবর্তী জীবনে অধ্যাপক রামনের সঙ্গে আমার যোগ ছিল না।

চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রামন মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে মাত্র আঠারো বছর বয়সে কৃতিত্বের সঙ্গে পদার্থ-বিজ্ঞানে এম. এস-সি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ভারতীয় রাজস্ব বিভাগে উচ্চ কর্মচারীরূপে নিযুক্ত হন। 1907 থেকে 1917 পর্যন্ত দশ বছর দক্ষতার সঙ্গে তিনি ভারতীয় রাজস্ব বিভাগে কাজ করেন। অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু বলছেন যে, চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রামন যখন ঐ কাজে কলিকাতায় বদ্‌লি হন (সম্ভবতঃ 1914 সনে), তখন তিনি বউবাজারে ভারতীয় বিজ্ঞান-চর্চা পরিষদের (Indian Association for the Cultivation of Science)

* বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন

ক্ষুদ্র বীক্ষণাগারে তাঁর গবেষণা আরম্ভ করেছিলেন। সেই সময় থেকেই তিনি ধ্বনি-তত্ত্ব ও ভারতীয় বাদ্যযন্ত্র নিয়ে গবেষণার কাজে নিযুক্ত ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন উপাচার্য প্রখ্যাত আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের আহ্বানে চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রামন 1917 সনে কলিকাতা বিজ্ঞান কলেজের পদার্থ-বিজ্ঞানের পালিত-অধ্যাপকের পদে যোগ দেন। এই সময়ে একই সঙ্গে তিনি ভারতীয় বিজ্ঞান-চর্চা পরিষদের মহেন্দ্রলাল সরকার অধ্যাপকের কাজ করেন। এই সময় থেকেই অধ্যাপক রামনের অধ্যাপনা আরম্ভ হয় এবং সেই সঙ্গে ধ্বনি-তত্ত্ব, ভারতীয় বাদ্যযন্ত্র ও আলোকের বিচ্ছুরণ নিয়ে তাঁর নিজস্ব প্রকল্প অনুযায়ী উচ্চাঙ্গের গবেষণা নানা প্রদেশের ছাত্রদের সহযোগিতায় চলতে থাকে। আকাশ নীল কেন, সমুদ্রের জল বিভিন্ন রকমের নীল কেন—প্রখ্যাত ইংরেজ বিজ্ঞানী স্বর্গতঃ Lord Rayleigh-র ব্যাখ্যাকে তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। এই সব গবেষণার জন্যে 1924 সনে অধ্যাপক রামন লণ্ডনের রয়েল সোসাইটির সভ্য নির্বাচিত হন। এর চার বছর পর 1928 সনে আলোকের বিচ্ছুরণ সম্বন্ধে পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে অধ্যাপক রামন এক আশ্চর্য আবিষ্কার করেন। এই আবিষ্কারে তাঁর পূর্বতন মেধাবী ছাত্র কে. আর. রামনাথন, স্বর্গতঃ কে. এস. কৃষ্ণান এবং অন্যান্য ছাত্র অধ্যাপক রামনের সহযোগী ছিলেন। সামান্য যন্ত্রপাতি ও গবেষণা-গারে প্রস্তুত উপকরণ ইত্যাদি দিয়ে এই যুগান্তকারী আবিষ্কারটি সম্ভব হয়েছিল। পরে অবশ্য দেশ-বিদেশে অধিকতর ফলপ্রদ ও কার্যকরী উন্নত ধরণের যন্ত্রাদি ব্যবহার করে এই আবিষ্কারটি সমর্থিত হয়েছিল। আবিষ্কারটি মোটামুটি এই—যদি একই তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের আলোক রশ্মি, benzene, toluene প্রভৃতি তরল পদার্থের উপরে প্রক্ষিপ্ত করা হয়, তবে এই তরল পদার্থ থেকে বিচ্ছুরিত আলোতে আপতিত তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য ছাড়াও ক্ষুদ্রতর এবং দীর্ঘতর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য বর্ণালী-বীক্ষণ যন্ত্রের প্লেটে ধরা পড়ে। এই ব্যাপারটিকে প্রখ্যাত বিজ্ঞানী Stokes-এর প্রতিপ্রভ বিকিরণ (Fluorescence) বলা যায় না, কারণ প্রতিপ্রভ বিকিরণে আপতিত তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যই ব্যতীত তার চেয়ে দীর্ঘতর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য কেবল দেখা যায়। অধ্যাপক রামন প্রমাণ করেন যে, তাঁর আবিষ্কৃত তথ্যটি সম্পূর্ণ নূতন এক প্রক্রিয়া এবং আণবিক বিচ্ছুরণের সঙ্গেই এটি সংশ্লিষ্ট। এখানে বলা প্রয়োজন, প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানী Smekal 1923 সনে তত্ত্বের দিক দিয়ে অনুরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন। অধ্যাপক রামন শুধু যে তাঁর পরীক্ষা-গত সত্যতা প্রদর্শন করেছিলেন তা নয়, ব্যাপক-ভাবে অন্যান্য অনেক তথ্য আবিষ্কার করেন। এই অভিনব আবিষ্কারটি বিজ্ঞান-জগতে আজ 'Raman Effect' নামে পরিচিত। Mandelstam, Landsberg প্রভৃতি বিজ্ঞানী এবং পরে অধ্যাপক রামনের ছাত্রেরাও কঠিন পদার্থে রামন এফেক্ট প্রদর্শন করেন। বিখ্যাত মার্কিন বিজ্ঞানী Wood এবং Rasetti সর্বপ্রথম গ্যাসীয় পদার্থে রামন এফেক্ট দেখিয়েছিলেন। রামন এফেক্টের প্রয়োগ বিজ্ঞানের নানা বিভাগে খুবই কার্যকরী হয়েছে।

1930 সনে রামনের এই আশ্চর্য আবিষ্কারের জন্যে অধ্যাপক রামনকে বিজ্ঞানীর সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান নোবেল পুরস্কার প্রদত্ত হয়। এর পূর্বে 1929 সনে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট তাঁকে Knight উপাধিতে ভূষিত করেন। 1933 সনে অধ্যাপক রামন ব্যাঙ্গালোরের ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব সায়েন্সের অধিকর্তা নিযুক্ত হন এবং এর চার বছর পরে তিনি ঐ পদ ত্যাগ করেন। তখন এই ইনষ্টিটিউটে তিনি শুধু পদার্থ-বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যক্ষ হয়ে তাঁর গবেষণার কাজে ব্রতী হন। 1943 সনে তিনি ব্যাঙ্গালোরে রামন রিসার্চ ইনস্টিটিউট স্থাপন

করেন। পরবর্তী কালে এখানেই তিনি তাঁর বহু সহযোগীদের সাহায্যে রামন এফেক্টের উপর আরো অনেক গবেষণা করেছিলেন। এই সময়েই, মনে হয় বিদ্যুৎ-চুম্বক তত্ত্বের (Electromagnetic theory) সাহায্যে রামন এফেক্টের ব্যাখ্যা দিতে তিনি চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু এই ব্যাখ্যা সুসম্পূর্ণ ও দোষমুক্ত ছিল না। কোয়ান্টাম তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত Smekal এবং পরে Kramers ও Heisenberg-এর ব্যাখ্যাই এখন প্রচলিত। এই ব্যাখ্যায় আপতিত তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য অপেক্ষা দীর্ঘতর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য (Stokes lines) এবং আপতিত তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য (Anti-Stokes lines) কি ভাবে সম্ভব, তা স্পষ্টই বোঝা যায়। এই সময় থেকেই অধ্যাপক রামন রঞ্জেন রশ্মির ব্যাবর্তনের (Diffration) সাহায্যে হীরা, চুনি, পান্না প্রভৃতি মূল্যবান অনেক ক্রিস্ট্যাল, স্ফটিক (Quartz) ও অনেক অজৈব ও জৈব ক্রিস্ট্যালের গঠন-বিন্যাস সম্বন্ধে গবেষণা করে নূতন নূতন তত্ত্বের উদ্‌ঘাটন করেন। এই সময় থেকেই অধ্যাপক রামন ও তাঁর সহযোগীরা আরও একটি বিশেষ দিকে মনোনিবেশ করেন। 1913 সনে স্বর্গতঃ জার্মান বিজ্ঞানী Laue, Friedrick ও Knipping-এর সহযোগিতায় রঞ্জেন রশ্মির সাহায্যে ক্রিস্ট্যালের গঠন-বিন্যাস নির্ধারণের জন্যে একটি পরীক্ষা করেন। কোনও বিষম (Heterogeneous) বা পর পর অবস্থিত বিভিন্ন তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের রঞ্জেন রশ্মি কোনও ক্রিস্ট্যালের উপর ফেললে দেখা যায় যে, ক্রিস্ট্যাল থেকে বহির্গত রশ্মি বিভিন্ন দিকে ক্রিস্ট্যালের পশ্চাতে অবস্থিত ফোটোগ্রাফিক ফিল্মে সুন্দরভাবে সাজানো অনেকগুলি উজ্জ্বল ও অনুজ্জ্বল দাগের সৃষ্টি করে। এই দাগগুলিকে Laue spots বলা হয়। এই কালো দাগগুলির সংস্থান থেকে ক্রিস্ট্যালের গঠন-বিন্যাস জানা যায়। Laue-এর সময় থেকেই কালো দাগগুলির সঙ্গে অস্পষ্ট ও ঈষৎ-বিক্ষিপ্ত অনেকগুলি ছায়া-রেখা দেখা গিয়েছিল। এগুলিকে Extra Laue Spots বলা হয়। আবার এক তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের সুষম (Homogeneous) রঞ্জেন রশ্মি যদি চূর্ণ-ক্রিস্ট্যালে ফেলা যায়—তখন এই চূর্ণ-ক্রিস্ট্যাল থেকে বিভিন্ন দিকে বহির্গত রশ্মি চূর্ণ-ক্রিস্ট্যালের চারদিকে বৃত্তাকার চোঙের উপর সংলগ্ন ফোটোগ্রাফিক ফিল্মে কতকগুলি রেখা দেখা যায়। এই সব রেখার অবস্থান থেকে ক্রিস্ট্যালের অণুর সংবিন্যাস নির্ধারণ সম্ভব। এক্ষেত্রেও বৃত্তাকার রেখাগুলির সঙ্গে অনেক অস্পষ্ট ঈষৎ-বিক্ষিপ্ত ছায়া-রেখা দৃষ্ট হয়। এই সব অস্পষ্ট ছায়া-রেখাগুলির তাৎপর্য কি, ফ্রান্সে Wadlund (1938), Preston (1939) ও Maguin (1939) তা জানবার জন্যে প্রথম গবেষণা করেছিলেন। তার পরেই করেন ভারতবর্ষে অধ্যাপক রামন ও তাঁর সহকর্মীরা (1940) এবং ইংল্যাণ্ডে Lonsdale, Knaggs ও Smith (1940) প্রভৃতি। এই সময় স্বাধীনভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ডক্টর কেদারেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর ছাত্রেরা এই বিষয় নিয়ে গবেষণা করেন। বিভিন্ন ক্রিস্ট্যালে অণুগুলি বিশেষ বিশেষ ভাবে বিন্যস্ত এবং এই সুবিন্যস্ত অণু-সমষ্টি পর পর চতুর্দিকে অবস্থিত থাকে। এক-একটি সুবিন্যস্ত অণুসমষ্টিকে জাফ্‌রি (Lattice) বলা হয়। বহু সংখ্যক নানা রকমের ক্রিস্ট্যালের Extra Laue spots নিয়ে গবেষণার ফলে অনেকেই এক মত যে, এই অস্পষ্ট ঈষৎ-বিক্ষিপ্ত ছায়া-রেখাগুলির সৃষ্টি জাফ্‌রিগুলির স্পন্দনের জন্যেই হয়, কিন্তু জাফ্‌রির স্পন্দনের কারণ সম্বন্ধে অধ্যাপক রামন প্রমুখ বিজ্ঞানীদের সঙ্গে Lonsdale প্রভৃতি বিজ্ঞানীদের সঙ্গে ঘোর মতভেদ হয়। Lonsdale প্রমুখ বিজ্ঞানীরা জোর দিয়েই বলেন যে, এই জাফ্‌রিগুলির স্পন্দন তাপজনিত। অধ্যাপক রামনের স্থির বিশ্বাস যে, তাঁর আবিষ্কার অনুযায়ী আলোক (বা বিকিরণ) বিচ্ছুরিত হলে তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের যে পরিবর্তন দেখা যায় এবং তারই দরুণ

যে স্পন্দনগত পার্থক্য হয়—সেই অনুযায়ী কৃস্ট্যালের জাফ্‌রিগুলিও কাঁপতে থাকে। উচ্চতাপের জন্মে এই স্পন্দনের যে কিছুটা পরিবর্তন হতে পারে, অধ্যাপক রামন তা স্বীকার করেন। Max Born এই প্রসঙ্গে তাঁর Cyclic lattice theory প্রবর্তন করেন। এই বিষয়টির বিস্তারিত আলোচনা এখানে সম্ভব নয়।

দেশ-বিদেশের অনেক প্রতিষ্ঠান থেকে অধ্যাপক রামন যে সব সম্মান ও উপাধি পেয়েছিলেন তার সংখ্যা নেই। 1930 সনে নোবেল পুরস্কার পাবার অব্যবহিত পূর্বে 1928 সনে ইতালীয় সোসাইটি অব সায়েন্সের Matteucci পদক এবং 1930 সনে লণ্ডন রয়েল সোসাইটির প্রসিদ্ধ Hughes পদক দিয়ে তঁকে সম্মানিত করা হয়। 1941 সনে তিনি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের Franklin পদক লাভ করেন। প্যারী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনারারী ডি. এস-সি., গ্লাস্‌গো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এল. এল. ডি. এবং ফ্রাইবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনারারী পি-এইচ. ডি. উপাধি তাঁকে দেওয়া হয়। কলিকাতা, বম্বে ও মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ও অধ্যাপক রামনকে অনারারী ডি. এস-সি. দিয়ে সম্মানিত করেন। ইংল্যাণ্ড, ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক সংস্থার তিনি ফেলো নির্বাচিত হন। তিনি ইণ্ডিয়ান অ্যাকাডেমির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি ছিলেন। 1929 সনে তিনি ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতির কাজ করেন। 1949 সনে অধ্যাপক রামন ভারতের 'জাতীয় অধ্যাপক' নির্বাচিত হন। 1954 সনে তাঁকে ভারত গভর্নমেন্ট 'ভারত-রত্ন' উপাধিতে ভূষিত করেন। 1957 সনে তিনি আন্তর্জাতিক Lenin পুরস্কার লাভ করেন। ইংল্যাণ্ড, ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান থেকে বহুবার আমন্ত্রিত হয়ে এই সব স্থানে বক্তৃতাদি দিয়ে তিনি ভারতবর্ষের গৌরব বর্ধন করেছিলেন।

অধ্যাপক রামন তাঁর শেষ বয়সে নিজের প্রতিষ্ঠিত রামন ইনস্টিটিউটে যে সব গবেষণা করেছিলেন, তার মধ্যে মানুষের দৃষ্টিতত্ত্ব এবং ফুলের বিবিধ রং সম্বন্ধে তাঁর কাজের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

অধ্যাপক রামন তাঁর গবেষণা সম্পর্কে বহু শত নিবন্ধ দেশী-বিদেশী বিভিন্ন আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত করেছেন। তাছাড়া তাঁর নিজের গবেষণা নিয়ে তিনি কতকগুলি পুস্তক রচনা করে গেছেন; যথা—Molecular Diffraction of Light, Mechanical Theory of Bowed strings, Theory of Musical Instruments, Physics of crystals; Diffraction of X-rays প্রভৃতি।

পরিশেষে অধ্যাপক রামনের উপযুক্ত সহধর্মিণীর কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁরই অক্লান্ত সেবায় এরূপ আশ্চর্য প্রতিভাসম্পন্ন মহাবিজ্ঞানীর দীর্ঘজীবন সযত্নে সংরক্ষিত ও লালিত হয়েছিল, সন্দেহ নেই।

আচার্য রামনের বিজ্ঞান-সাধনার কলিকাতা অধ্যায়

শ্রীকেদারেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

আচার্য রামনের বিজ্ঞান-প্রসিদ্ধির প্রধান পীঠস্থান কলিকাতা। তাই তাঁর গবেষণা-জীবনের কলিকাতা অধ্যায়ের গুরুত্ব খুবই বেশী।

ভারতের এই শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীকে দেখবার প্রথম সৌভাগ্য হয় আমার এম.এস-সি ক্লাসের ছাত্র হিসাবে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.এস-সি ক্লাসে তাঁর বক্তৃতা শোনা জীবনে এক অনির্বচনীয় অভিজ্ঞতা। তাঁর বলবার অসাধারণ ক্ষমতায় পদার্থ-বিজ্ঞানের জটিল বিষয় এত সহজ ও আকর্ষণীয় করে তুলছিলেন যে, তাঁর প্রতি আমাদের মন শ্রদ্ধায় ভরে উঠে। এম.এস-সি পরীক্ষার পর যখন ফল বেরোবার সময় হয়ে এসেছে, তখন একদিন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে তাঁর গবেষণাস্থল ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অব সায়েন্সে যাই। দেখা হওয়ায় তিনি খুব খুসী হয়ে বললেন যে, আমি প্রথম বিভাগে পাশ করেছি এবং জানতে চান, আমি পালিত গবেষণা বৃত্তি নিতে ইচ্ছুক কি না। আমি তখনই সম্মতি এবং ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁর উপদেশমত গবেষণার কাজে ব্রতী হলাম।

আচার্য রামন কলিকাতায় আসেন 1907 সালে ভারত গভর্ণমেন্টের অর্থবিভাগের অফিসার হিসাবে। তার পূর্বে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত পরীক্ষায় বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন। ছাত্রাবস্থায়ই তিনি পদার্থ-বিজ্ঞানে গবেষণা আরম্ভ করেন এবং আলোক-বিজ্ঞানে একটা মৌলিক প্রবন্ধ লণ্ডনের ফিলজফিক্যাল ম্যাগাজিনে প্রকাশ করেন। শিক্ষাবিভাগে ভাল কোনও কাজ না পাওয়ায় তিনি ইণ্ডিয়ান ফাইনান্স পরীক্ষায় বসেন এবং তাতে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করে কলিকাতায় ফাইনান্স বিভাগে কাজ করেন। কিন্তু তাঁর মনে বিজ্ঞানে গবেষণার জন্যে সব সময়ে আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা জেগে ছিল। কলিকাতায় অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁর সে সুযোগ মিলে গেল। অফিসে যাওয়া-আসার পথে বৌবাজার ষ্ট্রীটে একটি সাইনবোর্ড তাঁর চোখে পড়লো, লেখা "ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অব সায়েন্স"। তিনি একদিন ঢুকে পড়লেন সেখানে এবং তদানীন্তন সেক্রেটারী ডাঃ অমৃতলাল সরকারের সঙ্গে দেখা। ডাঃ সরকারকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এই অ্যাসোসিয়েশনের কি উদ্দেশ্য এবং কি কার্যকলাপ। ডাঃ সরকার তাঁকে বললেন যে, এই অ্যাসোসিয়েশন তাঁর স্বর্গতঃ পিতৃদেব ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার আপ্রাণ চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন 1876 সালে। উদ্দেশ্য—সর্বসাধারণকে বিজ্ঞানে শিক্ষিত করা, বিশেষ করে হাতে-কলমে বিজ্ঞানী তৈরি করা এবং ভারতীয়দের দ্বারা বিজ্ঞানের গবেষণা চালানো। আচার্য রামনের প্রশ্নের উত্তরে তিনি আরও বললেন যে, তাঁর পিতৃদেব জীবনের শেষ সময় পর্যন্তও দুঃখ করে গেছেন যে, বিজ্ঞানের গবেষণা আশানুরূপ আরম্ভ করা যায় নি। পরে অবশ্য কিছু কিছু কাজ হয়েছে। আচার্য রামন নিজের পরিচয় দিয়ে জানতে চাইলেন, তিনি অবসর সময়ে এখানে গবেষণা করতে পারবেন কিনা। ডাঃ সরকার উৎফুল্ল হয়ে বললেন—তিনি অত্যন্ত সুখী হবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে দিলেন যন্ত্রপাতির দৈন্য ও আর্থিক অসচ্ছলতার কথা। আচার্য রামন তাতে একটুও না দমে কাজ আরম্ভ করলেন সকালে ও সন্ধ্যায় এবং ছুটির দিনে। তিনি শব্দ-বিজ্ঞানে কাজ আরম্ভ

করেন এবং যন্ত্রপাতির অভাব সত্ত্বেও কয়েকটি মৌলিক গবেষণা করে তা ফিলজফিক্যাল ম্যাগাজিন, নেচার প্রভৃতি বিদেশী সাময়িক পত্রে প্রকাশ করেন।

অ্যাসোসিয়েশনে যোগ দেবার পর কিছু সময়ের জন্যে কাজে ছেদ পড়ে, কারণ গভর্ণমেন্ট তাঁকে রেঙ্গুনে বদ্‌লী করেন। সৌভাগ্যবশতঃ অল্প সময়ের মধ্যেই আবার তিনি কলিকাতায় ফিরে আসবার সুযোগ পান। বেহালা, বীণা প্রভৃতি নানা রকম তারের বাদ্যযন্ত্রের স্পন্দনের শব্দ-তরঙ্গ নিয়ে মৌলিক গবেষণায় মগ্ন থাকেন। এই সব গবেষণার ফলগুলি বিদেশের পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে। তিনি অ্যাসোসিয়েশনে যাতে যত বেশী সময় দিতে পারেন, সে জন্যে বাড়ী নেন অ্যাসোসিয়েশনের ঠিক পিছনে অত্যন্ত অনাকর্ষণীয় জায়গায়। তাঁর একমাত্র চিন্তা ছিল যেন যাতায়াতে সময় নষ্ট না হয়।

এই সময়ে ভারতের অন্যতম প্রধান মনীষী স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চান্সেলর ছিলেন এবং তিনি বিশ্ববিদ্যালয়কে শিক্ষা ও গবেষণার পূর্ণাঙ্গ প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে ব্রতী হন। সেই উদ্দেশ্যে তিনি 1915 সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। আচার্য রামনের একান্ত গবেষণানুরাগ তাঁর নজরে পড়ে এবং পদার্থ-বিজ্ঞানের নূতন স্থাপিত পালিত প্রোফেসারের পদ গ্রহণের জন্যে তাঁকে আমন্ত্রণ জানান। আচার্য রামন এই সুযোগ সানন্দে গ্রহণ করেন এবং 1917 সালে সরকারী চাকুরী ছেড়ে এই পদে যোগদান করেন। ভারতের বিজ্ঞানের ইতিহাসে এটি একটি যুগান্তকারী ঘটনা।

বিজ্ঞান কলেজে যোগদান করবার পরেও তাঁর গবেষণার প্রধান কর্মক্ষেত্র সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশনেই থাকে এবং দুটি প্রতিষ্ঠানেরই সমস্ত সুযোগ-সুবিধা তিনি পান। ইতিমধ্যে তাঁর গবেষণার খ্যাতি দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে। কলিকাতা বিজ্ঞান কলেজের শিক্ষক ও শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্র এবং ভারতের অন্যান্য স্থান থেকে বহু বিজ্ঞানী তাঁর কাছে গবেষণার জন্যে আসতে আরম্ভ করেন। ফলে সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশনে পদার্থ-বিজ্ঞানের এক বিশিষ্ট গবেষণা কেন্দ্র গড়ে ওঠে, যা ভারতবর্ষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তো বটেই—পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান কেন্দ্রের সমপর্যায়ে উন্নীত হয়। সে সময়ের মধ্যে তাঁর যে সকল সহকর্মী জগতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ডাঃ এস. কে. ব্যানার্জী, ডাঃ বি. এন. ব্যানার্জী, ডাঃ পি. এন. ঘোষ, ডাঃ এস. কে. মিত্র, ডাঃ বি. বি. রায় ইত্যাদি।

ডাঃ অমৃতলাল সরকারের মৃত্যুর পর 1919 সালে আচার্য রামন অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারী হন। পালিত প্রোফেসার হিসাবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের টাকায় কেনা যন্ত্রপাতি সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশনে ব্যবহার করবার অনুমতি তিনি পেলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা-বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রদেরও সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশনে কাজ করতে দেওয়া হলো। অ্যাসোসিয়েশন গবেষণারত বিজ্ঞানীতে ভরে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে গবেষণার বিষয়ের গণ্ডীও বাড়তে লাগলো। আলোকবিদ্যা, চুম্বক-বিজ্ঞান, এক্স-রে প্রভৃতি বিষয়ে গবেষণার পরিধি বিস্তৃত হলো।

আলোক-বিজ্ঞানে ইন্টারফিয়ারেন্স ও ডিফ্র্যাকসনের গবেষণায় যাঁরা তাঁর সহযোগিতা করেন, তাঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ডাঃ এন. এম. বসু, ডাঃ পি. এন. ঘোষ, ডাঃ বি. বি. রায় প্রমুখ। এই বিষয়ে অনেক কঠিন প্রশ্নের সমাধান করে তিনি এবং তাঁর সহকর্মীরা আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেন। এই সময়ে আলোর বিচ্ছুরণের উপর তাঁর মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। কঠিন, তরল ও বায়বীয় সব রকম পদার্থের আণবিক বিচ্ছুরণে (Scattering) তিনি অনেক নূতন মৌলিক তত্ত্ব

আবিষ্কার করেন। বিশেষ করে বিচ্ছুরিত আলোর পোলারাইজেশন থেকে অণুর গঠন সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানা যায়। এই বিষয়ে তাঁর বহু সহকর্মীদের মধ্যে ডাঃ কে. আর. রামনাথন ও ডাঃ কে. এস. কৃষ্ণানের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সব কাজের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়বার ফলে তিনি 1924 সালে লণ্ডনের রয়াল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হবার বিশেষ সম্মান লাভ করেন। 1926 সালে ভারত সরকার অ্যাসোসিয়েশনকে বার্ষিক 10,000 টাকা অনুদান দিতে আরম্ভ করে এবং 1927 সাল থেকে তা বাড়িয়ে 20,000 টাকা করা হয়। 1929 সালে তিনি ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের মূল সভাপতি হন।

আলোর বিচ্ছুরণ সম্বন্ধে কাজ করবার সময় তিনি এবং তাঁর সহকর্মীরা দেখেন যে, বিচ্ছুরিত আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের যদিও কোন পরিবর্তন হবার কথা জানা নেই, তবু পরিবর্তিত বর্ণের সামান্য একটা অংশ বিচ্ছুরিত আলোর মধ্যে দেখা যায়। তখন মনে হয়েছিল, তরল পদার্থের মধ্যে কোনও ফ্লুয়োরেসেন্ট জিনিষ সামান্য পরিমাণে মিশ্রিত আছে এবং তা থেকেই ভিন্ন বর্ণের আলো আসছে। কিন্তু তরল পদার্থটিকে শোধিত করবার বহু চেষ্টা সত্ত্বেও এই আলোটিকে দূর করা যায় নি। সে সময় প্রোফেসার কম্পটনের আবিষ্কৃত এক্স-রে-র বিচ্ছুরণে তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের পরিবর্তন আচার্য রামনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং তিনি তাঁর দেখা বিষয়টি ভালভাবে পরীক্ষা করতে উৎসাহী হন। এই বিষয়ে ডাঃ কে. এস. কৃষ্ণান তাঁর সহকর্মী হন। অসাধারণ দৃষ্টিশক্তি থাকায় আচার্য রামন বর্ণের পরিবর্তন খালি চোখেই উপলব্ধি করেন। কিন্তু এটা কম্পটন এফেক্ট জাতীয়, কি অন্য কিছু, তা দেখবার জন্যে বিশেষভাবে বর্ণালী পরীক্ষা করা দরকার। অ্যাসোসিয়েশনে তখন একটি ছোট স্পেক্ট্রোগ্রাফ ছিল, তাই দিয়ে তিনি বিচ্ছুরিত আলোর বর্ণালী পরীক্ষা করে একটি অসাধারণ যুগান্তকারী মৌলিক তথ্য আবিষ্কার করলেন 1928 সালে। আলো অণুতে পড়ে তার অবস্থার পরিবর্তন ঘটায় এবং তাতে বিচ্ছুরিত আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের পরিবর্তন হয়। এই তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের পরিবর্তন থেকে অণুর গঠন ইত্যাদি সম্বন্ধে বহু তথ্য জানা যায়। বর্ণালী-বিজ্ঞান ও রসায়নে এই আবিষ্কার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই আবিষ্কারের সঙ্গে আচার্য রামনের খ্যাতি দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে এবং 1930 সালে তিনি পদার্থ-বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পান। এই আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গেই অ্যাসোসিয়েশনে দারুণ কর্মচাঞ্চল্য দেখা দিল। ঘন, তরল, বায়বীয় সব রকম পদার্থের রামন-বর্ণালী নিয়ে নানাবিধ গবেষণা পূর্ণোদ্যমে চলতে থাকে। গবেষণার ফল প্রবন্ধের পর প্রবন্ধে প্রকাশিত হতে থাকে এবং তাতে আচার্য রামন, তাঁর সহকর্মীবৃন্দ ও অ্যাসোসিয়েশনের সুনাম প্রচারিত হতে থাকে।

এই সময়ে আরও বিভিন্ন দিকে তাঁর গবেষণার পরিধি বিস্তৃত হতে থাকে। আলোর দ্বিপ্রতিসরণের (Birefringence) ক্ষেত্রে তাঁর বহুমুখী গবেষণা উৎকৃষ্ট ফল লাভ করে। তাঁর এই কাজের সঙ্গে আমারও জড়িত হবার সুযোগ হয়েছিল। এমেথিষ্ট স্ফটিকের পোলারাইজ্‌ড্‌ আলোতে এক নূতন রকমের ইন্টারফিয়ারেন্স দেখা যায় এবং তার উৎপত্তি বিশ্লেষণ করা হয়। দ্বিপ্রতিসরণের অন্যান্য কাজের মধ্যে তাঁর উদ্দীপনায় বৈদ্যুতিক বা চৌম্বক ক্ষেত্রের দরুণ অথবা কঠিন পদার্থে চাপের দরুণ যে দ্বিপ্রতিসরণ হয়, সে সম্বন্ধে বহু গবেষণা হয় এবং আণবিক সংগঠন সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান তথ্য জানা যায়। ক্রিস্ট্যালের সম্বন্ধেও বহু মূল্যবান তথ্য সংগৃহীত হয় এবং ডাঃ কে. এস. কৃষ্ণান ও ডাঃ এস. ভাগবন্তম ক্রিস্ট্যাল ফিজিক্সে নূতন নূতন আবিষ্কারের খ্যাতি অর্জন করেন। এই বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকবার ফলে আমারও পরবর্তী জীবনের গবেষণার ক্ষেত্র তৈরি হয়।

আলোর বিচ্ছুরণের সঙ্গে সঙ্গে এক্স-রে সম্বন্ধেও তাঁর মন আকৃষ্ট হয়। তিনি ও ডাঃ কে. আর. রামনাথন তরল পদার্থে এক্স-রে-র বলয়াকৃতি বিচ্ছুরণের উৎপত্তির মতবাদ (Theory) বের করেন। তাঁর এই মতবাদের সত্যতা প্রমাণের জন্যে ডাঃ সি. এম. সোগানী, ডাঃ পি. কে. কৃষ্ণমূর্তি প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক লেবরেটরীতে এক্স-রে বিচ্ছুরণের পরীক্ষা করেন। কৃষ্ণমূর্তির পরীক্ষা থেকে কিছু নূতন সমস্যার উদ্ভব হয় এবং সেগুলি বুঝতে এই মতবাদের পরিবর্তন করবার সৌভাগ্য আমার হয়। তখন থেকে এক্স-রে সম্বন্ধে এই প্রতিষ্ঠানে বহু কাজ হয় এবং তার ফল বিদেশের বিজ্ঞানীমহলে বহু প্রশংসিত হয়। এই সব কাজের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, আচার্য রামন বিদেশী যন্ত্রপাতির ব্যবহার পছন্দ করতেন না, তাছাড়া আর্থিক অসচ্ছলতায় তা সম্ভবও ছিল না। এক্স-রে-র কাজের জন্যে যে রকম জটিল যন্ত্রপাতির প্রয়োজন, তাও অ্যাসোসিয়েশনের কর্মশালায় তৈরি হয়—শুধু ট্রান্সফর্মার কলিকাতারই একটি কারখানায় এখানকার বিজ্ঞানীদের পরামর্শমত তৈরি করা হতো।

আচার্য রামন যখন কথা বলতেন, তাঁর অসাধারণ বহুমুখী প্রতিভা ও চিন্তাধারার নূতনত্বে মুগ্ধ হতে হতো। বিজ্ঞানের গবেষণার চিন্তা তাঁর সমস্ত মন সর্বক্ষণের জন্যে ভরে রাখতো। সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশনে কাজ করবার সময় তাঁর যে একনিষ্ঠা দেখেছি, তা অসাধারণ। তাঁর কলিকাতার কর্মজীবনের মধ্যে এফ. আর. এস. এবং নোবেল লরিয়েট হওয়া ছাড়াও বিশ্ব-বিজ্ঞানীদের কাছে যে সব সম্মান পেয়েছেন, তার মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সম্মানের কথা বলছি। বৃটিশ সাম্রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয় সম্মেলনে 1921 সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি হয়ে তিনি যান। 1927 সালে তিনি বৃটিশ অ্যাসোসিয়েশন ফর দি অ্যাডভান্সমেন্ট অব সায়েন্সে আমন্ত্রিত হয়ে যোগদান করেন এবং টরন্টোতে ইন্টার্নেশন্যাল কংগ্রেস অব ম্যাথেম্যাটিক্সের আলোর বিচ্ছুরণ শাখার উদ্বোধন করেন। 1925 সালে ফ্রাঙ্কলিন ইনস্টিটিউটের শতবার্ষিকীতে তিনি ভারতের প্রতিনিধি হন এবং মস্কো ও লেনিনগ্রাডের অ্যাকাডেমী অব সায়েন্সের দ্বিশতবার্ষিকী উৎসবে বিশেষ নিমন্ত্রিত অতিথি হন। 1928 সালে তিনি ইটালিয়ান সোসাইটি অব সায়েন্সের ম্যাটেউচি মেডাল এবং লণ্ডনের রয়াল সোসাইটির হিউগেস মেডাল পান। তিনি অনরারি ডক্টরেট ডিগ্রীতে ভূষিত হয়েছেন বহু ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্যারি প্রমুখ বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে।

বিজ্ঞানের গবেষণার ফল দেশে প্রকাশের কথা অনেক দিন থেকেই আমাদের দেশের বিজ্ঞানীরা চিন্তা করছিলেন। 1906 সাল থেকে অ্যাসোসিয়েশনের বার্ষিক রিপোর্টের সঙ্গে কিছু বিজ্ঞান-প্রবন্ধ প্রকাশ করা হচ্ছিল। পরে অনিয়মিতভাবে বুলেটিন ও ট্রানজ্যাকশন প্রকাশ করে এই অভাব আংশিক ভাবে পূরণ করবার চেষ্টা করা হয়, কিন্তু গবেষণা-কাজের সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে এই অভাব তীব্রভাবে অনুভূত হতে থাকে। 1915 সালে 'প্রোসিডিংস অব দি ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কাল্টিভেশন অব সায়েন্স' নামে সাময়িক পত্র প্রকাশিত হতে আরম্ভ হয়। আচার্য রামনের চেষ্টায় এটি উচ্চাঙ্গের সাময়িক পত্রে পরিণত হয় এবং 1926 সালে এটি ইণ্ডিয়ান জার্নাল অব ফিজিক্স নাম গ্রহণ করে। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমে ক্রমে এটি দ্বৈমাসিক পত্রিকায় পরিণত হয় এবং পৃথিবীর বিজ্ঞান-পত্রিকার মধ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। এই পত্রিকা ভারতবর্ষের পদার্থ-বিজ্ঞানসেবীদের একটা বিশেষ অভাব পূরণ করে।

1933 সালে তিনি ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স অ্যাণ্ড টেক্‌নোলজির ডাইরেক্টার নিযুক্ত হন। সেখানে যাবার পরেও তিনি সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে প্রেসিডেন্ট হিসাবে

যোগাযোগ রাখেন। পরের বছর অ্যাসোসিয়েশনের সভ্যবৃন্দের সঙ্গে মতের অমিল হওয়াতে তিনি প্রেসিডেন্ট থাকেন না এবং সে সময় থেকে অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করেন।

সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশনে কাজ করবার সময় তাঁকে আমরা কখনও বিশ্রাম নিতে দেখি নি। অতি প্রত্যূষে তিনি লেবরেটরিতে চলে আসতেন। সায়েন্স কলেজে যাবার জন্যে বাড়ী গিয়ে অতি অল্প সময়ের মধ্যে খাওয়া সেরে চলে যেতেন এবং কলেজ থেকে ফিরতেন লেবরেটরীতেই। বৈকালেও কয়েক মিনিটের জন্যে কফি খেতে বাড়ী গিয়ে আবার লেবরেটরীতে ফিরে আসতেন এবং অনেক রাত পর্যন্ত থাকতেন। রামন এফেক্ট খালি-চোখে আবিষ্কার করেন রাত 1টার সময়। যখন কাজে মগ্ন থাকতেন বাইরের জগতের কথা ভুলে যেতেন। স্বর্গীয় সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের প্রতি তাঁর যে অসাধারণ শ্রদ্ধা ছিল, তা তাঁর কথায় ও কাজে প্রতিফলিত হতো। অ্যাসোসিয়েশনের জন্যে নিজের অর্থব্যয় করতে কার্পণ্য করতেন না এবং সময় সময় ব্যাঙ্ক থেকে নিজের টাকা দিয়ে অ্যাসোসিয়েশনের ঘাটতি পূরণ করতেন। তাঁর জীবন ও কাজ আমাদের দেশের বিজ্ঞানীদের কাছে এক মহান আদর্শ সৃষ্টি করেছে এবং আশা করি তা বহু দিন দেশবাসীকে একনিষ্ঠ বিজ্ঞান সাধনায় উদ্বুদ্ধ করবে।

আলোর উপর শব্দ-তরঙ্গের প্রভাব

সুনীলকুমার সিংহ*

অধ্যাপক চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রামনের বৈজ্ঞানিক কাজের আলোচনা করলে দেখা যায় যে, তিনি প্রধানতঃ আলো এবং শব্দ—এই দুটি বিষয়ে বিশেষ কৌতূহলী ছিলেন। আলোকশক্তির বিচ্ছুরণ, মানবচক্ষুর রেটিনায় আলোর প্রতিক্রিয়া, মানুষের রঙের অনুভূতি প্রভৃতি বিষয়ে তিনি দীর্ঘকাল নানা ধরণের পরীক্ষা চালিয়েছেন। তেমনি আবার শব্দ, মানুষের শ্রবণ-অনুভূতি এবং শ্রবণোত্তর (Ultrasonic) কম্পন সম্পর্কেও তাঁর বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা এবং গাণিতিক বিশ্লেষণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অধুনা শ্রবণোত্তর শব্দ নিয়ে যে সব গবেষণা হচ্ছে, সেগুলি পদার্থ-বিজ্ঞানের অনেক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সঙ্গে জড়িত এবং এটা স্মরণযোগ্য যে, রামন এই গবেষণাধারার প্রথম দিকের সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন। শ্রবণোত্তর শব্দের সঙ্গে আলোর সংঘাত সম্পর্কে রামন ও তাঁর সহকর্মীদের গবেষণা অবশ্যই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আমরা এই প্রবন্ধে সাধারণভাবে আলোর উপর শব্দ-তরঙ্গের প্রভাব সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করবো।

আমরা জানি, বস্তুর মধ্যে অণু-পরমাণুর স্বাভাবিক বিন্যাস তাদের মধ্যে আকর্ষণ ও বিকর্ষণের দ্বারা নিরূপিত হয়। বাইরে থেকে এই আকর্ষণ-বিকর্ষণের মাত্রা কম-বেশী করে অণুগুলির মধ্যে মৃদু কম্পনের সৃষ্টি করা যায়। এই কম্পনের বিশেষ কতকগুলি বৈশিষ্ট্য থাকলেই আমরা তাকে 'শব্দ' বলি। কম্পনাঙ্ক অনুসারে শব্দকে মোটামুটি দু-ভাগে ভাগ করা যায়—(1) সাধারণ শব্দ, যা মানুষের স্বাভাবিক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এবং (2) শ্রবণোত্তর শব্দ। যদিও মানুষের ইন্দ্রিয়-

*সাহা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, কলিকাতা—9

গ্রাহ্যতার দিক থেকে এই বিভাগ যথেষ্ট তাৎপর্য-পূর্ণ, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই বৈজ্ঞানিক আলোচনার জন্যে সাধারণ শব্দ ও শ্রবণোত্তর শব্দ—এই দুই ধরণের শব্দকেই মৃদু আণবিক কম্পন হিসাবে একই পর্যায়ে ফেলে বর্ণনা করা অনেক সুবিধা-জনক। এখানে আমরা এই সব বিশেষ ধরণের মৃদু আণবিক কম্পনকে সাধারণভাবে 'শব্দ' বলে অভিহিত করবো। কোনও বস্তুতে শব্দ সৃষ্টি করবার জন্যে বস্তুটির একটি অংশের অণুগুলিকে তাদের স্বাভাবিক অবস্থিতি থেকে সামনে ও পিছনে একটি বিশেষ কম্পনাঙ্কে নাড়াচাড়া করা হয়। এই মৃদু আণবিক কম্পন অণুগুলির মধ্যে আকর্ষণ ও বিকর্ষণের জন্যে সামনে ও পিছনে ছড়িয়ে পড়ে। এইভাবে কম্পনজনিত শক্তি তরঙ্গের আকারে প্রবাহিত হতে থাকে। এটা সহজেই অনুমান করা যায় যে, এই আণবিক কম্পন বা শব্দ বস্তুর সামগ্রিক আণবিক-বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন করবে; কিন্তু কোন্ কোন্ আণবিক-বৈশিষ্ট্য শব্দের দ্বারা পরিবর্তিত হতে পারে, তা জানতে হলে গাণিতিক বিশ্লেষণ ছাড়া উপায় নেই। মোটা-মুটিভাবে বলা যায় যে, শব্দের উপস্থিতিতে বস্তুর মধ্যে পর্যায়ক্রমে চাপ কম-বেশী হয়। বিশেষ করে তরল পদার্থের বেলায় শব্দ যেদিকে প্রবাহিত হয়, সেই দিক বরাবর বস্তুর মধ্যে চাপ ক্রমান্বয়ে কম-বেশী হয়। অপর পক্ষে, আমরা জানি যে, কোনও বস্তুর মধ্যে আলোর গতি বস্তুশূন্য স্থানে আলোর গতির চেয়ে কম। কতটা কম, তা নির্ভর করে বস্তুর আণবিক-বৈশিষ্ট্যের উপর এবং বস্তুর মধ্যে চাপমাত্রার উপর। চাপমাত্রা বেশী হলে আলোর গতি বেশী হারে কমে যায়। সেজন্যে শব্দ-তরঙ্গের উপস্থিতিতে কোনও বস্তুর মধ্যে আড়াআড়িভাবে আলো পাঠালে পর্যায়ক্রমিক চাপ পরিবর্তনের জন্যে আলোর বিভিন্ন রশ্মি বিভিন্ন গতিতে বস্তুর মধ্যে প্রবাহিত হবে। এইভাবেই শব্দ আলোর গতিবেগে পরিবর্তন আনে এবং এই প্রক্রিয়াকে শব্দের সঙ্গে আলোর সংঘাত বলা যায়।
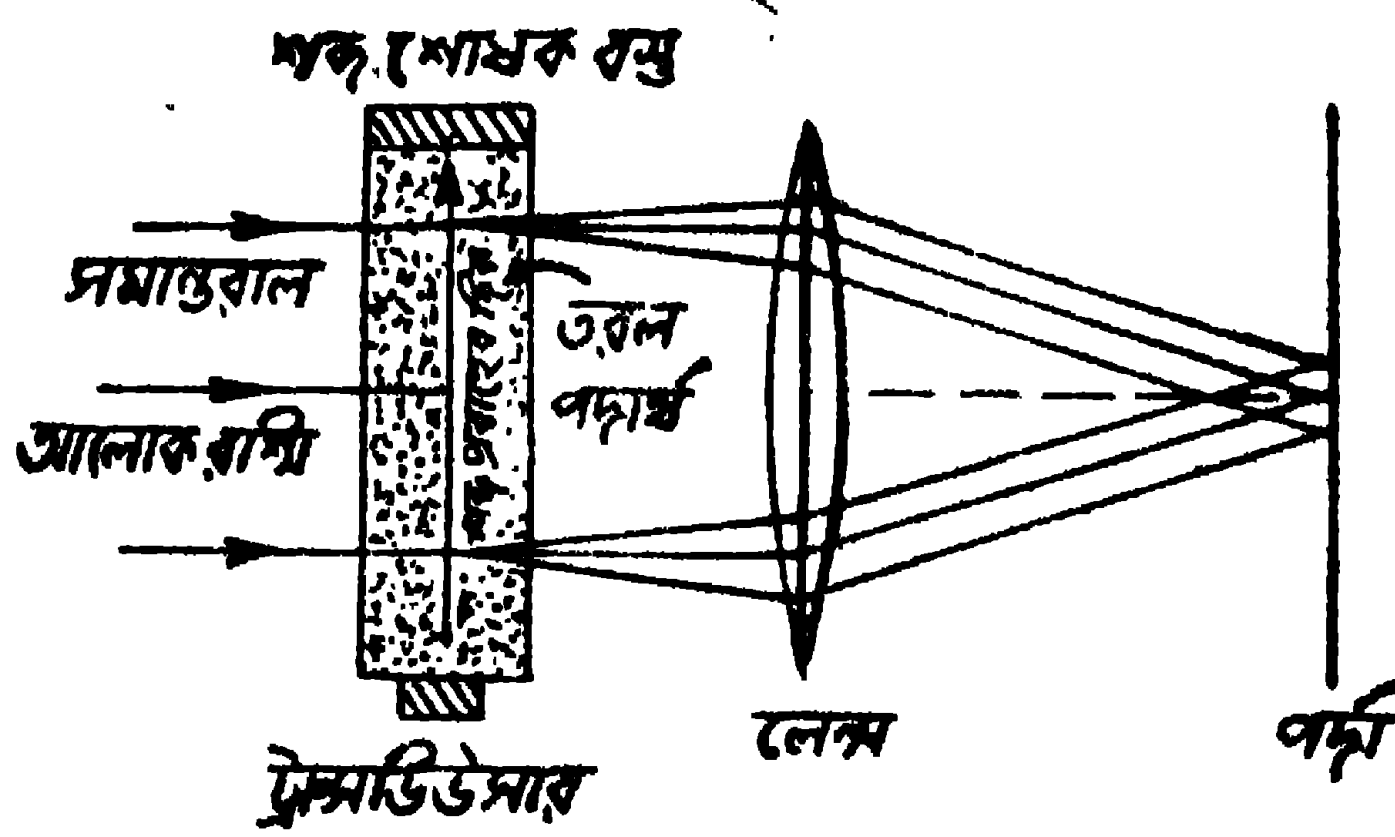
1নং চিত্র
ডিবাই ও সিয়ার্স (আমেরিকা) এবং লুকাস ও বিকার্ডের (ফ্রান্স) পরীক্ষার যন্ত্রবিন্যাস।

1932 সালে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে এবং ফ্রান্সে শব্দের সঙ্গে আলোর সংঘাত সম্পর্কে প্রথম পরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষাটির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এখানে দেওয়া হলো (1নং চিত্র)। একটি পাত্রে স্বচ্ছ তরল পদার্থ রেখে তার মধ্যে শ্রবণোত্তর শব্দ-প্রবাহ সৃষ্টি করা হয়। এর জন্যে একটি পিয়েজো-ইলেকট্রিক (Piezo-electric) ট্রান্স-ডিউসারকে (Transducer) শ্রবণোত্তর কম্পনাঙ্ক বিশিষ্ট ইলেকট্রনিক অসসিলেটরের (Electronic

oscillator) দ্বারা চালিত করা হয়। পিয়েজো-ইলেকট্রিক ট্র্যান্সডিউসার ইলেকট্রিক কম্পন-শক্তিকে আণবিক গতি-শক্তিতে রূপান্তরিত করে। ট্র্যান্সডিউসারের অপর দিকে শব্দ শোষক বস্তু দিয়ে পাত্রটিকে বন্ধ করা হয়। এর ফলে তরল পদার্থটিতে স্থায়ী শব্দ-প্রবাহের (Standing waves) সৃষ্টি হতে পারে না। চিত্রে তীর চিহ্ন দিয়ে শব্দ-প্রবাহের দিক দেখানো হয়েছে। বাইরে থেকে সমান্তরাল আলোকরশ্মি শব্দ-প্রবাহের দিকের মত কতকটা এইরূপ—তরল পদার্থে শব্দ-প্রবাহের জন্যে তার বিভিন্ন অংশে চাপ পর্যায়ক্রমে কম-বেশী হয়। সুতরাং সমান্তরাল আলোকরশ্মিগুলির বিভিন্ন রশ্মি বিভিন্ন গতিতে তরল পদার্থটিকে অতিক্রম করবে। 2নং চিত্রে এই চাপের বিন্যাস দেখানো হয়েছে। এর ফলে, আলোক-রশ্মিগুলি যখন তরল পদার্থের বাইরে বেরিয়ে আসবে, তখন শব্দ-প্রবাহের দিক বরাবর বিভিন্ন স্থানে আলোর বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় কম্পনের ফেজ
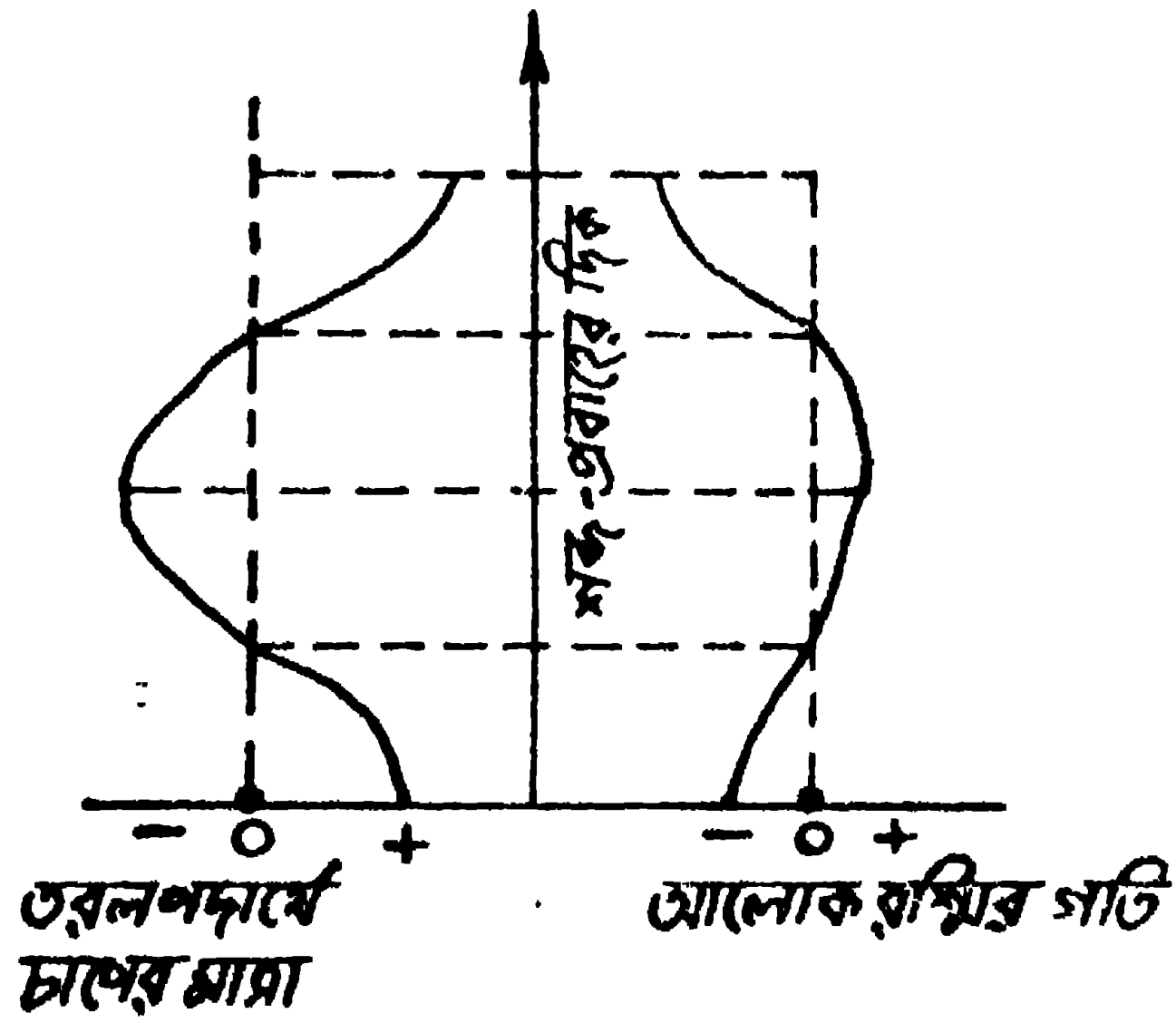
2নং চিত্র

শব্দ-প্রবাহের উপস্থিতিতে তরল পদার্থের মধ্যে চাপ ও আলোকরশ্মির গতির বিন্যাস। শূন্য চিহ্ন স্বাভাবিক (শব্দের অনুপস্থিতিতে) মাত্রা নির্দেশ করছে।

সঙ্গে লম্বভাবে তরল পদার্থে প্রবেশ করে। তরল পদার্থ থেকে নির্গত আলোকরশ্মি লেন্সের (Lens) দ্বারা কোনও পর্দায় ফোকাস (Focus) করা হয়। এই পরীক্ষায় দেখা যায় যে, পর্দার উপর আলোর তীব্রতা গ্রেটিং (Grating) দিয়ে অপবর্তিত (Diffracted) ফ্রনহফার (Fraunhaufer) অপবর্তনের মতন।

অধ্যাপক রামন এবং তাঁর সহকর্মীরা এই পরীক্ষার একটি ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। তাঁদের (Phase) পর্যায়ক্রমে কম-বেশী হবে; অর্থাৎ শব্দের উপস্থিতিতে তরল পদার্থটি একটি এস্‌লন (Echelon) গ্রেটিঙের মতন কাজ করবে।

রামন ও তাঁর সহকর্মীরা এই বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাটির গাণিতিক বিশ্লেষণও করেছেন। তিনি এজন্যে র‍্যালে (Rayleigh) কর্তৃক প্রবর্তিত গ্রেটিঙের দ্বারা আলোক অপবর্তনের গাণিতিক বিশ্লেষণের শব্দপদ্ধতিটি ব্যবহার করেছিলেন। আলোকরশ্মি-গুলি শব্দ-প্রবাহের দিকের সঙ্গে লম্বভাবে না পড়লে

অথবা তরল পদার্থে স্থায়ী শব্দ-প্রবাহ সৃষ্টি হলে যে অবস্থার উদ্ভব হবে, তাও তাঁরা বিশ্লেষণ করেছিলেন এবং পরীক্ষালব্ধ ফলের সঙ্গে তাঁদের গাণিতিক পূর্বাভাস নিখুঁতভাবে মিলে যায়।

উপরিউক্ত গাণিতিক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, বিভিন্ন ক্রমের অপবর্তন বর্ণালীর তীব্রতা থেকে শব্দের উপস্থিতিতে তরল পদার্থের আলোক-প্রতিসরণাঙ্কের যে পরিবর্তন হয়, তার সর্বোচ্চ মানের পরিমাপ করা যায়।

অবশ্য রামনের গাণিতিক বিশ্লেষণের পূর্বেই লুকাস (R. Lucas) এবং বিকার্ড (P. Biquard), যাঁরা উপরে বর্ণিত পরীক্ষা ফ্রান্সে করেছিলেন, তাঁদের সেই পরীক্ষার অন্য এক ব্যাখ্যা দেন। শব্দ-প্রবাহের বিভিন্ন স্তরে আলোক-প্রতিসরণাঙ্কের মাত্রা বিভিন্ন থাকায় আলোকরশ্মি লম্বভাবে শব্দ-প্রবাহে প্রবেশ করবার পর ক্রমাগত বেঁকে যাবে, মরীচিকা সৃষ্টির জন্যে আলোকরশ্মি যেভাবে বেঁকে যায়—কতকটা সেইভাবে। এর ফলে পাশাপাশি অনেক আলোকরশ্মি এক-একটি স্থানে কেন্দ্রীভূত হবে এবং শব্দ-প্রবাহের দিক বরাবর আলোকের তীব্রতা কম-বেশী হবে; অর্থাৎ শব্দ-প্রবাহের জন্যে তরল পদার্থটি কতকটা রুল্ড (Ruled) গ্রেটিঙের মত কাজ করবে।

এই মতবাদের সঙ্গে রামনের মতবাদের তফাৎ হলো, রামন আলোকরশ্মি বেঁকে যাবার সম্ভাব্যতা বিবেচনা করেন নি। পরে 1949 সালে উইলার্ড (G. W. Willard) গাণিতিক বিশ্লেষণ করে দেখান যে, তরল পদার্থের মধ্যে শব্দ-প্রবাহের আড়াআড়ি বেধের (Width) উপর নির্ভর করছে। উপরিউক্ত দুইটি মতবাদের কোন্‌টি সঠিক? অবশ্য এই আড়াআড়ি বেধ ছাড়াও তরল পদার্থের স্বাভাবিক আলোক-প্রতিসরণাঙ্ক কত, শব্দ-প্রবাহের জন্যে এই প্রতিসরণাঙ্ক কতটা পরিবর্তিত হচ্ছে অথবা শব্দ-তরঙ্গের দৈর্ঘ্য কত—এই সবকিছু মিলিয়ে দেখেই মতবাদ দুটির যাথার্থ্য বিচার করতে হবে।

রামন ও তাঁর সহযোগীদের কাজের সূত্র ধরে 1963 সালে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে বোলেফ (D. I. Bolef) ও তাঁর সহকর্মীরা স্বচ্ছ কেলাস নিয়েও অনুরূপ পরীক্ষা করেন। উপরিউক্ত র‍্যালে-রামন পদ্ধতিতে মারাডুদিন (A. A. Maradudin) ও তাঁর সহকর্মীরা গাণিতিক বিশ্লেষণ করে দেখান যে, কেলাসের ক্ষেত্রে অপবর্তিত বর্ণালীতে আলোর তীব্রতা একই ক্রমানুযায়ী নেগেটিভ (Negative) ও পজিটিভ (Positive) দিকে বিভিন্ন হবে। তরল পদার্থের ক্ষেত্রে এই তীব্রতা সমান হয়। কেলাসের মধ্যে পারমাণবিক আকর্ষণ-বিকর্ষণের বৈশিষ্ট্য কিছুটা জটিল। স্বাভাবিক পারমাণবিক বিন্যাসের অবস্থা থেকে পরমাণুগুলিকে মৃদুভাবে কাঁপিয়ে দিলে তাদের কম্পন সুসমঞ্জস (Harmonic) থাকে না। এই অসামঞ্জস্যই (Anharmonicity) কেলাসের মধ্যে প্রবাহিত শব্দ-তরঙ্গকে বিশেষভাবে বিকৃত করে। এই বিকৃতির জন্যেই অপবর্তিত আলোর তীব্রতার কম-বেশী হয়। এই তীব্রতার মাত্রাভেদের পরিমাপ থেকে শব্দ-প্রবাহের বিকৃতির পরিমাপ এবং তাথেকে কেলাসটির স্থিতিস্থাপকতার বিশদ বৈশিষ্ট্য জানতে পারা যায়।

উপরে বর্ণিত আলোকের অপবর্তনের ক্ষেত্রে আলোর কম্পনাঙ্ক অথবা তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যে কোনও পরিবর্তন হয় না। শব্দ-তরঙ্গ শুধুমাত্র আলোর গতি এবং আলোকরশ্মির গতিপথের পরিবর্তন ঘটায়। কিন্তু শব্দের সঙ্গে সংঘাতের ফলে আলোর এক ধরণের বিচ্ছুরণের (Scattering) অস্তিত্ব জানা গেছে, যা ব্রিলুয়াঁ (Brilluoin) বিচ্ছুরণ নামে পরিচিত। এই বিচ্ছুরণে আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য পরিবর্তিত হয়ে যায়, যেমন হয় রামন এফেক্টে (Raman effect)। যে কোনও কেলাসের মধ্যেই উত্তাপের মাত্রা অনুসারে পরমাণুগুলি সব সময়েই কম-বেশী মৃদুভাবে কম্পিত হয়। এর মধ্যে কিছু কম্পনের বৈশিষ্ট্য বাইরে থেকে পাঠানো

শব্দ-তরঙ্গের মত এগুলিকে শব্দধর্মী তাপ-কম্পন (Acoustic mode of vibration) বলা হয়। এদের মধ্যে যেগুলির তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য খুব বেশী, তারা কেলাসের মধ্যে শব্দ-তরঙ্গের গতিতেই তরঙ্গ-আকারে প্রবাহিত হয়। এই শব্দধর্মী তাপ-কম্পনের দ্বারা আলোক-শক্তি বিচ্ছুরিত হয়ে ব্রিলুঁয়া বর্ণালীর সৃষ্টি হয়। 3নং চিত্রে এই বিচ্ছুরণের সবচেয়ে সহজ পদ্ধতিটির কোয়ান্টাম মতবাদভিত্তিক বর্ণনা দেওয়া হলো। চিত্রে (3 ক) বর্ণিত বিচ্ছুরণে আপ-ফোনন সৃষ্টি করছে, তার বর্ণনা সাধারণ ভাষায় দেওয়া সম্ভব নয়। এই সব ঘটনার সম্ভাব্যতা গণনা করবার জন্যে কোয়ান্টাম মতবাদে বিশেষ এক ধরণের গণনা-পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় এবং তারই ভিত্তিতে 3নং চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। সেই অনুসারে বলা যায় যে, আপতিত আলোর কোয়া-ন্টাম প্রথমে তার সমস্ত শক্তিই কেলাসটিকে দিয়ে দেয় এবং তার ফলে কেলাসটি তার ইলেকট্রনিক ভাইব্রনিক (Electronic vibronic) শক্তিস্তর

3নং চিত্র
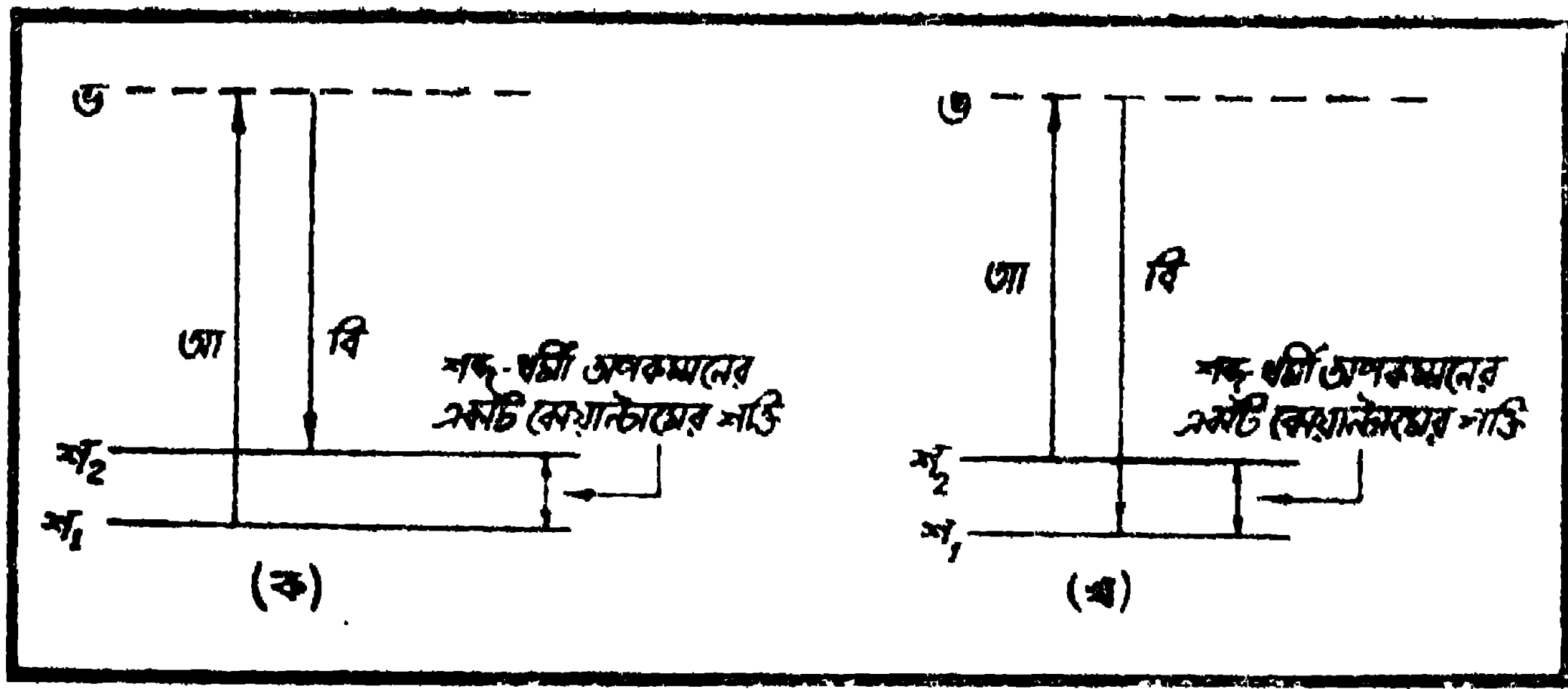
ব্রিলুয়াঁ (প্রথম ক্রমের) বিচ্ছুরণের কোয়ান্টাম মতবাদভিত্তিক বর্ণনা।
$শ_1$ এবং $শ_2$—ইলেকট্রনিক ভাইব্রনিক শক্তিস্তর, ভ—ভারচুয়াল (অপ্রাকৃত) ইলেকট্রনিক ভাইব্রনিক শক্তিস্তর, আ—আপতিত আলোক-কোয়ান্টামের শক্তি, বি—বিচ্ছুরিত আলোক-কোয়ান্টামের শক্তি।

তিত আলোর একটি কোয়ান্টামের (ফোটনের) শব্দধর্মী তাপ-কম্পনের সঙ্গে সংঘাতের ফলে ঐ তাপ-কম্পনের একটি কোয়ান্টাম (ফোনন) এবং নতুন একটি আলোক কোয়ান্টামের সৃষ্টি হয়েছে। এই ফোনন (Phonon) সৃষ্টি করতে যতটুকু শক্তির প্রয়োজন, এই নূতন ফোটনের (Photon) শক্তি অথবা কম্পনাঙ্ক আপতিত ফোটনের চেয়ে ঠিক ততটুকুই কম। সমস্ত ঘটনাটি কোয়ান্টামভিত্তিক, সুতরাং ঠিক কি ভাবে একটি ফোটন তাপ-কম্পনের সঙ্গে সংঘাতে নতুন একটি ফোটন ও একটি থেকে একটি ভারচুয়াল (Virtual) বা অপ্রাকৃত শক্তিস্তরে উন্নীত হয়। পরে এই ভারচুয়াল শক্তিস্তর থেকে কেলাসটি পূর্বতন একই ইলেকট্র-নিক কিন্তু অন্য একটি ভাইব্রনিক শক্তিস্তরে ফিরে আসে। এর ফলে একটি ফোননের সৃষ্টি হয় এবং কম কম্পনাঙ্কবিশিষ্ট আলো বিচ্ছুরিত হয়। এই আলো কোন্ দিকে বিচ্ছুরিত হবে, তা নির্ভর করে আপতিত আলোর গতির দিক এবং নব-সৃষ্ট ফোননের গতি কোন্ দিকে, তার উপর। অবশ্য এই একই সংঘাতের ফলে কেলাসের তাপ-কম্পনের

একটি কোয়ান্টাম কমে যেতে পারে এবং সে ক্ষেত্রে বিচ্ছুরিত আলোর কম্পনাঙ্ক বেড়ে যাবে (3খ)। সুতরাং বাইরে থেকে কেলাসের মধ্যে শব্দ সৃষ্টি না করলেও শব্দধর্মী তাপ-কম্পন আলোক বিচ্ছুরণ করবে। এই ধরণের বিচ্ছুরণ থেকে শব্দধর্মী তাপ-কম্পনের বৈশিষ্ট্যগুলি জানতে পারা যায় এবং তা থেকে কেলাসটির গঠন-বিন্যাস ও কেলাসের মধ্যে পারমাণবিক আকর্ষণ-বিকর্ষণের অনেক খবর পাওয়া যায়। এই বিষয়ে রামনের একজন কৃতী ছাত্র কৃষ্ণানের (R. S. Krishnan) গবেষণা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বর্ণালী-বিজ্ঞান ও প্লাজ্‌মা

জয়ন্ত বসু*

আমাদের এক এক জনের কণ্ঠস্বর এক এক রকম হয়ে থাকে। এজন্যে পরিচিত কোন লোকের কণ্ঠস্বর শুনেই তাকে চিনতে পারা যায়। হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, লোহা, তামা প্রভৃতি বিভিন্ন মৌল উত্তপ্ত হলে সেগুলি থেকে যে আলো নির্গত হয়, সেই আলোর প্রকৃতি যেন ঐ কণ্ঠস্বরের মত। এক একটি মৌলের ক্ষেত্রে বিকীর্ণ আলোর প্রকৃতি এক একটি বিশেষ ধরণের হয়; ঐ আলোকে বিশ্লেষণ করে তাই মৌলটিকে চেনা যেতে পারে। এই যে আলোকে বিশ্লেষণ করে তার সংগঠক বিভিন্ন বর্ণের (বা তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের) মূল আলোক-তরঙ্গগুলিকে পৃথক করা এবং সেগুলির পারস্পরিক অবস্থান, ঔজ্জ্বল্য প্রভৃতি ব্যাখ্যা করা—এই থেকেই বর্ণালী-বিজ্ঞানের (Spectroscopy) সূত্রপাত হয়। এখন অবশ্য কেবল আলোই নয়, অবলোহিত রশ্মি, অতি-বেগুনী-রশ্মি, রঞ্জ্‌গ্যেন রশ্মি প্রভৃতি সব রকম বিকিরণের বিশ্লেষণ-বিদ্যাকেই সাধারণভাবে বর্ণালী-বিজ্ঞান বলা হয়। তাছাড়া কোন পদার্থের স্বতঃবিকিরণ কেবল নয়, পদার্থটির উপর আপতিত বিকিরণের শোষণ বা বিচ্ছুরণ সম্পর্কিত তত্ত্ব ও তথ্যাদি বর্ণালী-বিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা হিসাবে গণ্য হয়। বিশ্ববিশ্রুত ভারতীয় বিজ্ঞানী চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রামনের নামানুযায়ী যে রামন এফেক্ট, তা এই শাখারই অন্তর্ভূত।

অতি ক্ষুদ্র যে পারমাণবিক জগতের রহস্য আজ মানুষের সামনে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে, তার প্রবেশ-দ্বারের অন্যতম চাবিকাঠি হিসাবে কাজ করছে বর্ণালী-বিজ্ঞান। এটা সম্ভব হয়েছে এই কারণে যে, কোন পদার্থ থেকে নির্গত বিকিরণের প্রকৃতি ঐ পদার্থের পরমাণুর গঠন-বৈচিত্র্যের উপর নির্ভর করে। আবার কেবল পরমাণুর ক্ষেত্রেই নয়, অণুর উপাদান, গঠন প্রভৃতি সম্পর্কেও বহু তথ্যাদি বর্ণালী-বিজ্ঞানের সাহায্যে জানতে পারা যায়। এই প্রসঙ্গে রামন এফেক্টের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখ্য।

আমাদের সুপরিচিত কঠিন, তরল ও গ্যাসীয়—এই তিন অবস্থার পদার্থের প্রকৃতি বিশ্লেষণে এক দিকে যেমন বর্ণালী-বিজ্ঞানের প্রয়োগ হয়েছে, অন্য দিকে তেমনি পদার্থের চতুর্থ অবস্থা—প্লাজ্‌মার অন্তর-রহস্য উন্মোচনেও এই বিজ্ঞান বিশেষ ভাবে কার্যকর হয়েছে। অন্য অবস্থাগুলির সঙ্গে

* সাহা ইনষ্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, কলিকাতা-9

প্লাজ্মার পার্থক্যের মূলে রয়েছে এর মধ্যে অনেকগুলি ধনাত্মক আয়ন ও সমান সংখ্যক বন্ধনমুক্ত ইলেকট্রনের উপস্থিতি। ঐ সব মুক্ত বিদ্যুৎকণার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে প্লাজ্মা থেকে নিঃসরিত বিকিরণের এমন কয়েকটি বৈশিষ্ট্য থাকে, যা কঠিন, তরল বা গ্যাসীয় পদার্থের বিকিরণের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় না।

1নং চিত্র

বদ্ধ-বদ্ধ পরিবর্তনে রেখা-বর্ণালীর উৎপত্তি।

(ক) 1, 2—শক্তি-স্তর। পরমাণু 2 থেকে 1-এ নেমে গেলে কমতি শক্তিটুকু ($h\nu_{21}$) ν_{21} কম্পাঙ্কের বিকিরণরূপে নির্গত হয়।

(খ) উপরিউক্ত বিকিরণ বর্ণালী-বিশ্লেষণে একটি রেখা হিসাবে দেখা দেয়। $\lambda_{21}=c/\nu_{21}$, যেখানে c হলো আলোর গতিবেগ।

পৃথিবীতে প্লাজ্মা অপেক্ষাকৃত বিরল হলেও অধিকাংশ নক্ষত্রই রয়েছে প্লাজ্মা অবস্থায়। কোন নক্ষত্রের বিষয়ে আমাদের জ্ঞানের মাধ্যম হলো, ঐ নক্ষত্র থেকে আগত বিকিরণ। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে যে, জ্যোতির্বিদ্যায় প্লাজ্মা সম্পর্কিত বর্ণালী-বিজ্ঞানের সমধিক গুরুত্ব রয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, বিজ্ঞানীরা কৃত্রিম উপায়েও প্লাজ্মা সৃষ্টি করেছেন। গত কয়েক বছর ধরে তাঁরা নিয়ন্ত্রিতভাবে পরমাণু কেন্দ্রকের সংযোজন ঘটিয়ে শক্তি আহরণের উদ্দেশ্যে নানাবিধ অত্যুত্তপ্ত প্লাজ্মা সৃষ্টি করে সেগুলি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছেন। এই সব প্লাজ্মা সাধারণতঃ অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী। এই ধরণের প্লাজ্মা সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহের জন্যে বর্ণালী-বিজ্ঞানে নূতন পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয়। সাম্প্রতিক কালে গবেষণাগারে প্লাজ্মা লেসারের তীব্র রশ্মি প্রয়োগে রামন এফেক্টের নিদর্শন পাওয়া গেছে। এর মূলে রয়েছে প্লাজ্মার মুক্ত আহিত কণাগুলির বিশেষ ধরণের গতিবিধি।

প্লাজ্মা থেকে বিকিরণ

প্লাজ্মা থেকে যে বিকিরণ নির্গত হয়, তা নির্ভর করে মূলতঃ ইলেকট্রনের অবস্থার পরিবর্তনের

উপর। এই অবস্থার পরিবর্তন তিন ধরণের হতে পারে—বদ্ধ-বদ্ধ পরিবর্তন, বদ্ধ-মুক্ত পরিবর্তন ও মুক্ত-মুক্ত পরিবর্তন।

(1) বদ্ধ-বদ্ধ পরিবর্তন (Bound-bound transition)—আমরা জানি পরমাণুর মাঝখানে একটি নিউক্লিয়াস বা কেন্দ্রক থাকে, আর তার চতুর্দিকে আবর্তন করে এক বা একাধিক ইলেকট্রন। বিভিন্ন কক্ষে ইলেকট্রনগুলির অবস্থানের উপর নির্ভর করে পরমাণুর আভ্যন্তরীণ শক্তি। ইলেকট্রনগুলির অবস্থান নির্দিষ্ট হলে এই আভ্যন্তরীণ শক্তিও নির্দিষ্ট হয়—তখন বলা হয়, পরমাণুটি একটি নির্দিষ্ট শক্তি-স্তরে রয়েছে। কোন একটি ইলেকট্রনের অবস্থান পরিবর্তিত হলেই পরমাণুর আভ্যন্তরীণ শক্তিও পরিবর্তিত হয়; তখন বলা যেতে পারে যে, পরমাণুটি রয়েছে অন্য একটি শক্তি-স্তরে। ইলেকট্রনটি বাইরের এক কক্ষ থেকে ভিতরের কক্ষে সরে এলে পরমাণুর শক্তি কমে যায় অর্থাৎ পরমাণুটি উচ্চতর শক্তি-স্তর থেকে নিম্নতর শক্তি-স্তরে চলে যায়; কমতি শক্তিটুকু বিকিরণ হিসাবে নির্গত হয় [1 (ক) নং চিত্র]। অপর পক্ষে পরমাণু কর্তৃক বিকিরণ শোষিত হলে ইলেকট্রন ভিতরের কোন কক্ষ থেকে বাইরের কক্ষে যায় এবং পরমাণু নিম্নতর শক্তি-স্তর থেকে উন্নীত হয় উচ্চতর শক্তি-স্তরে। ইলেকট্রনের অবস্থানের এই ধরণের যে কোন পরিবর্তনকেই বলা হয় বদ্ধ-বদ্ধ পরিবর্তন, কারণ এক্ষেত্রে ইলেকট্রন স্থানান্তরিত হচ্ছে পরমাণুর অভ্যন্তরে একটি বদ্ধ কক্ষ থেকে অন্য একটি বদ্ধ কক্ষে।

এই পরিবর্তনে নির্গত ফোটনে (বিকিরণের শক্তি-কণা) শক্তির পরিমাণ বা শক্তির কোয়ান্টাম পরমাণুর দুটি শক্তি-স্তরের পার্থক্যের সমান। আবার শক্তির কোয়ান্টাম E ও বিকিরণের কম্পাঙ্ক ν-এর মধ্যে যে সহজ সম্বন্ধ আছে, তা প্লাঙ্কের নিম্নলিখিত সূত্র থেকে পাওয়া যায়—

$$E = h\nu$$

এখানে h হলো একটি ধ্রুবক, প্লাঙ্কের নামানুসারে একে প্লাঙ্কের ধ্রুবক বলা হয়। কোন বদ্ধ-বদ্ধ পরিবর্তনে কার্যকর দুটি শক্তি-স্তরের মধ্যে পার্থক্য নির্দিষ্ট হওয়ায় বিকীর্ণ শক্তির কোয়ান্টামের মান নির্দিষ্ট; সুতরাং বিকিরণের কম্পাঙ্ক বা তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যও নির্দিষ্ট হয়। এজন্যে বর্ণালী বিশ্লেষণে ঐ বিকিরণ একটি রেখা হিসাবে দেখা দেয় [1 (খ) নং চিত্র]।

পরমাণুর আভ্যন্তরীণ শক্তি যেখানে ইলেকট্রনের অবস্থার দ্বারা নির্ধারিত হয়, অণুর আভ্যন্তরীণ শক্তি সেখানে অণুর মধ্যস্থিত পরমাণুগুলির স্পন্দন ও ঘূর্ণনের উপরও নির্ভর করে। ইলেকট্রনের অবস্থার পরিবর্তন ছাড়াও ঐ সব পরমাণুর স্পন্দন বা ঘূর্ণনের পরিবর্তনের ফলে অণু কর্তৃক বিকিরণের শোষণ বা নিঃসরণ হতে পারে।

গ্যাসের মধ্যে অণু-পরমাণু উচ্চতর শক্তি-স্তর থেকে নিম্নতর শক্তি-স্তরে সরে গেলে যে বিকিরণ নির্গত হয়, তার বর্ণালীর রেখা কিছুটা বিস্তৃত হয়ে একটি সরু ফিতার মত দেখায়। এই বিস্তারের কারণ হলো চাপের প্রভাব, অণু-পরমাণুর গতিজনিত ডপ্‌লার এফেক্ট ইত্যাদি। প্লাজ্‌মার ক্ষেত্রে আরও একটি কারণে বর্ণালী-রেখার বিস্তার ঘটে। বিদ্যুৎ-ক্ষেত্রের প্রভাবে কয়েক ধরণের অণু-পরমাণুর শক্তি-স্তর পরিবর্তিত হয় এবং তাদের বর্ণালীতে নূতন রেখা দেখা দেয়; একে বলা হয় 'স্টার্ক এফেক্ট' (Stark effect)। প্লাজ্‌মার মধ্যে মুক্ত আহিত কণা থাকায় বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র বর্তমান, তবে কণাগুলির গতির ফলে এই ক্ষেত্র সর্বদাই পরিবর্তনশীল; আবার প্লাজ্‌মার ভিতরের অণুগুলিও সঞ্চরমাণ। এজন্যে অণুগুলির উপর কার্যকর বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রের মান নির্দিষ্ট নয়। এই কারণে স্টার্ক এফেক্টের ফলে কয়েকটি বিচ্ছিন্ন রেখার পরিবর্তে মূল রেখার পাশে নিরবচ্ছিন্নভাবে কয়েকটি রেখার সৃষ্টি হয়ে কার্যতঃ রেখাটির বিস্তৃতি ঘটিয়ে থাকে। প্লাজ্‌মার মুক্ত বিদ্যুৎকণা ও নিরপেক্ষ অণু-পরমাণুর পারস্পরিক ক্রিয়ার ফলে ঐ সব অণু-পরমাণুর

বর্ণালীতে অন্যান্য কিছু কিছু পরিবর্তনও পরিলক্ষিত হয় ; যথা—রেখার ঔজ্জ্বল্যের তারতম্য ও কয়েকটি নূতন রেখার সৃষ্টি।

(2) বদ্ধ-মুক্ত পরিবর্তন (Bound-free transition)—নিরপেক্ষ অণু বা পরমাণু থেকে ইলেকট্রন নির্গত হলে অণু বা পরমাণুটি ধনাত্মক আয়নে পর্যবসিত হয় ; তেমনি আবার ধনাত্মক আয়ন ও ইলেকট্রন মিলে নিরপেক্ষ অণু বা পরমাণু গঠন করতে পারে। এই ধরণের পরিবর্তনকে বলা হয় বদ্ধ-মুক্ত পরিবর্তন ; এক্ষেত্রে ইলেকট্রন একটি অবস্থায় অণু বা পরমাণুর মধ্যে বদ্ধ এবং অন্য অবস্থায় ঐ বন্ধন থেকে মুক্ত।

অণু-পরমাণুকে আয়নিত করতে হলে অর্থাৎ মুক্ত আয়ন ও ইলেকট্রন সৃষ্টি করতে হলে খানিকটা শক্তির প্রয়োজন। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে যে, মুক্ত অবস্থা থেকে বদ্ধ অবস্থায় ইলেকট্রন ও আয়নের মোট শক্তি অপেক্ষাকৃত কম। এজন্যে ইলেকট্রন ও আয়নের পুনর্মিলনে (Recombination) যখন অণু বা পরমাণু গঠিত হয়, তখন তাদের উদ্বৃত্ত শক্তি ব্যয় করতে হয়। এই শক্তি বিকিরণ হিসাবে নির্গত হতে পারে। ঐ বিকিরণের কোয়ান্টামের একটি ন্যূনতম মাত্রা থাকায় প্লাঙ্কের সূত্র অনুসারে বিকিরণের কম্পাঙ্কেরও একটি ন্যূনতম মান থাকে। তবে ইলেকট্রন বা আয়নের গতীয় শক্তি নানা মাত্রার হতে পারে বলে কোয়ান্টাম বা কম্পাঙ্কের মানও নির্দিষ্ট নয়। এজন্যে পুনর্মিলনের ক্ষেত্রে একটি সীমার পর থেকে নিরবচ্ছিন্ন (Continuous) বর্ণালী দেখতে পাওয়া যায়। প্লাজ্‌মা থেকে পুনর্মিলনজাত যে বিকিরণ পাওয়া যায়, কঠিন, তরল বা গ্যাসীয় পদার্থের ক্ষেত্রে সাধারণতঃ তা অনুপস্থিত।

(3) মুক্ত-মুক্ত পরিবর্তন (Free-free transition)—ইলেকট্রন মুক্ত অবস্থায় থাকতেই যদি তার শক্তি-স্তরের পরিবর্তন হয় অর্থাৎ তার শক্তির হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে, তবে সেই পরিবর্তনকে বলা হয় মুক্ত-মুক্ত পরিবর্তন। প্লাজ্‌মার মধ্যে এই পরিবর্তন সাধারণতঃ দু-ধরণের হতে পারে।

প্রথমতঃ, ধনাত্মক আয়নের বিদ্যুৎক্ষেত্র কর্তৃক ইলেকট্রনের গতি ত্বরান্বিত বা মন্দীভূত হতে থাকলে এই পরিবর্তন সাধিত হয় ; সেই সময় ইলেকট্রন থেকে বিকিরণ নির্গত হতে থাকে। এই বিকিরণকে বলা হয় ব্রেম্‌স্‌ট্রালুং (Bremsstrahlung) বিকিরণ। যেহেতু ইলেকট্রনের মুক্ত অবস্থায় শক্তি-স্তরগুলি নিরবচ্ছিন্নভাবে বর্তমান, সুতরাং শক্তির পরিবর্তন যে কোন মানের হতে পারে। এক্ষেত্রে বিকিরণের কম্পাঙ্কের সব মানই সম্ভব। এই বিকিরণের বর্ণালী হয় নিরবচ্ছিন্ন।

দ্বিতীয়তঃ, প্লাজ্‌মার মধ্যে চৌম্বক ক্ষেত্র বর্তমান থাকলে আহিত কণাগুলি ঐ ক্ষেত্রের চতুর্দিকে বৃত্তাকার পথে ঘুরতে থাকে। বিকিরণের দিক থেকে বিবেচনা করলে আয়ন অপেক্ষা ইলেকট্রনের গতিই সমধিক গুরুত্বপূর্ণ। কোন বস্তুর বৃত্তাকার পথে গতি হলো প্রকৃতপক্ষে ত্বরান্বিত গতি ; বৃত্তের কেন্দ্রের দিকে বস্তুটির সর্বদাই একটি ত্বরণ থাকে বলে বস্তুটি সরল রেখায় না চলে বৃত্তাকার পথে আবর্তিত হয়। আবর্তনরত ইলেকট্রনের ত্বরণের জন্যে ইলেকট্রন থেকে বিকিরণ নিঃসৃত হয়। ইলেকট্রনের গতিবেগ আলোর গতিবেগের তুলনায় নগণ্য অথবা নগণ্য নয়, তার উপর নির্ভর করে ঐ বিকিরণের প্রকৃতি। প্রথম ক্ষেত্রে ঐ বিকিরণকে বলা হয় সাইক্লোট্রন (Cyclotron) বিকিরণ আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সিংক্রোট্রন (Synchrotron) বিকিরণ।

ইলেকট্রনের গতি যথেষ্ট কম হলে নির্দিষ্ট চৌম্বক ক্ষেত্রে তার আবর্তনকালও নির্দিষ্ট হয়। সে জন্যে এক সেকেণ্ডে সেটি চৌম্বক ক্ষেত্রের চতুর্দিকে কতবার ঘুরবে, তা নির্দিষ্ট। একে বলা হয় সাইক্লোট্রন কম্পাঙ্ক। সাইক্লোট্রন বিকিরণ মূলতঃ ঐ কম্পাঙ্কেরই তরঙ্গ হওয়ায় বিকিরণের বর্ণালীতে একটি রেখা দেখতে পাওয়া

যায়। এক্ষেত্রে আবর্তনরত ইলেকট্রনের সামনের ও পিছনের দিকে বিকিরণের মাত্রা প্রায় সমান হয় এবং ইলেকট্রনের প্রায় চতুর্দিকেই বিকিরণ ছড়িয়ে পড়ে [2 (ক) নং চিত্র]।

ইলেকট্রনের গতিবেগ আলোর গতিবেগের সঙ্গে তুলনীয় হলে নির্দিষ্ট চৌম্বক ক্ষেত্রেও ইলেকট্রন আবর্তনের কম্পাঙ্ক নির্দিষ্ট থাকে না। সে জন্যে সিঙ্ক্রোট্রন বিকিরণে অনেকগুলি কম্পাঙ্ক থাকে এবং বিকিরণের বর্ণালীতে বহু ঘন-সন্নিবিষ্ট রেখা দেখতে পাওয়া যায়। সিঙ্ক্রোট্রন বিকিরণের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো, আবর্তনরত ইলেকট্রনের সামনের দিকে একটি ছোট শঙ্কুর মধ্যে ঐ বিকিরণ প্রধানতঃ সীমাবদ্ধ থাকে [2 (খ) নং চিত্র]—এ যেন অনেকটা ছুটন্ত রেলগাড়ির ইঞ্জিনের হেড-লাইটের আলোর মত।

বিভিন্ন মডেলের সাহায্যে প্লাজ্‌মার আভ্যন্তরীণ অবস্থা নির্ধারণ

উপরের আলোচনা থেকে বোঝা গেল যে, বিভিন্ন কারণে প্লাজ্‌মা থেকে বিকিরণ নির্গত হতে পারে। বিকিরণের বর্ণালী থেকে প্লাজ্‌মার আভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্বন্ধে তথ্যাদি সংগ্রহ করা বেশ একটি জটিল ব্যাপার। এজন্যে প্রথমতঃ প্লাজ্‌মার আভ্যন্তরীণ প্রকৃতি অনুযায়ী কয়েকটি মডেল ধরে নিয়ে সেগুলির বিকিরণের বর্ণালী তত্ত্বগতভাবে নির্ণয় করা হয় এবং পরে ঐ সব বর্ণালীর কোন্‌টির সঙ্গে পরীক্ষালব্ধ বর্ণালী মিলে যায়, তা লক্ষ্য করে প্লাজ্‌মার অবস্থা নির্ধারণ করা হয়। সাধারণতঃ তিন ধরণের মডেল ধরা হয়; যথা—(1) তাপীয় সাম্যাবস্থার (Thermal Equilibrium) মডেল বা TE মডেল, (2)
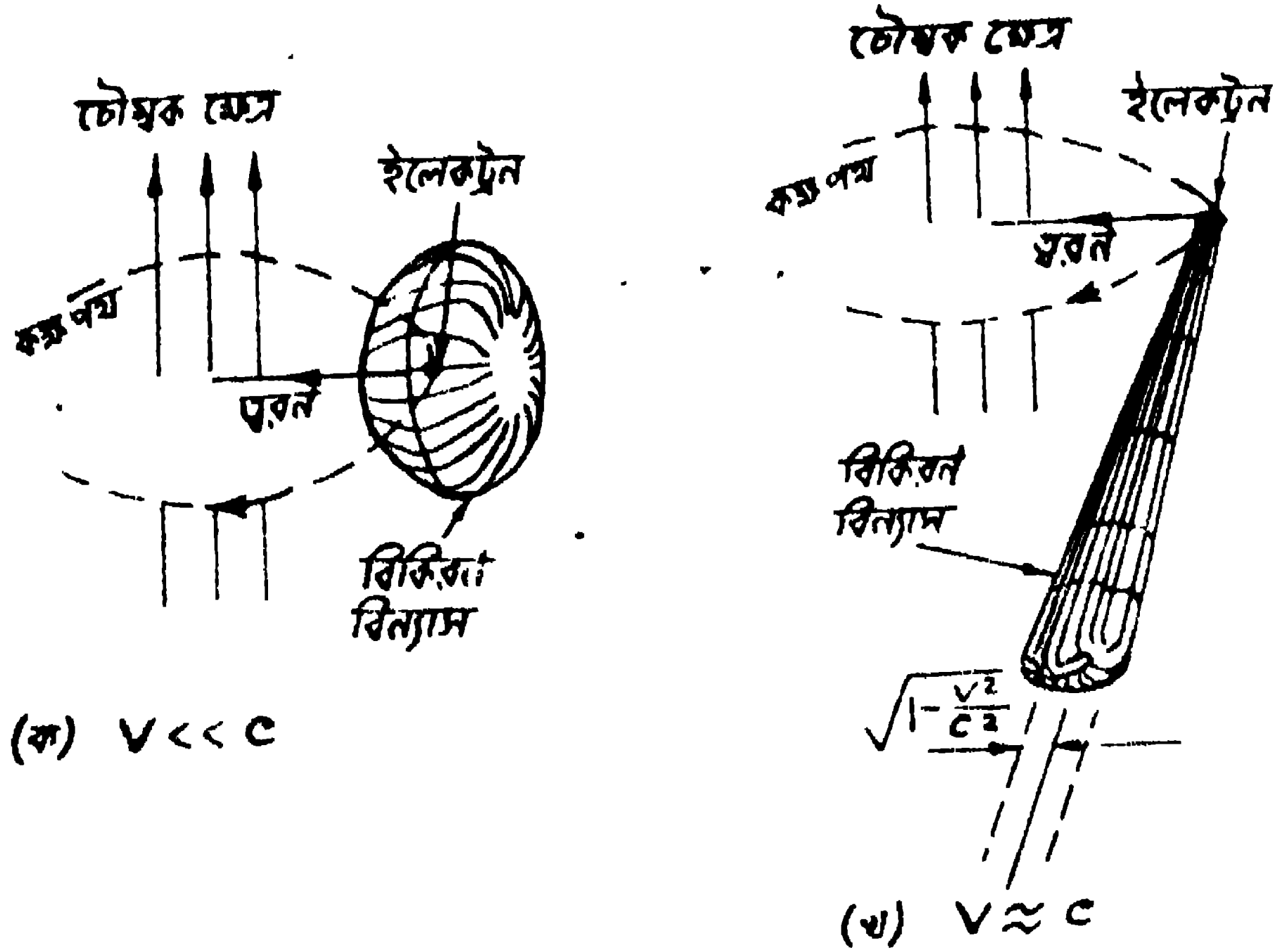
2নং চিত্র

চৌম্বক ক্ষেত্রের চতুর্দিকে আবর্তনরত ইলেকট্রন থেকে নির্গত বিকিরণের বিন্যাস। V—ইলেকট্রনের গতিবেগ, C—আলোর গতিবেগ

স্থানীয় তাপীয় সাম্যাবস্থার (Local Thermal Equilibrium) মডেল বা LTE মডেল এবং (3) করোনা মডেল।

প্লাজ্‌মার মধ্যস্থিত অণু, পরমাণু, আয়ন, ইলেকট্রন ও ফোটনের মধ্যে যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া হয়, সেই অনুযায়ী নির্দিষ্ট হয় প্লাজ্‌মার অবস্থা। এই প্রসঙ্গে দুটি আয়নন প্রক্রিয়ার কথা আলোচনা করা যাক।

পরমাণু + ইলেকট্রন ⇌ আয়ন + ইলেকট্রন + ইলেকট্রন

পরমাণু + ফোটন ⇌ আয়ন + ইলেকট্রন
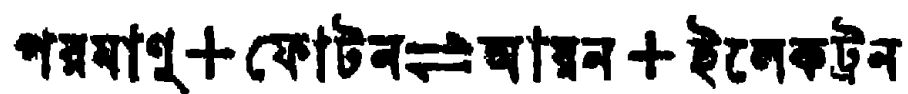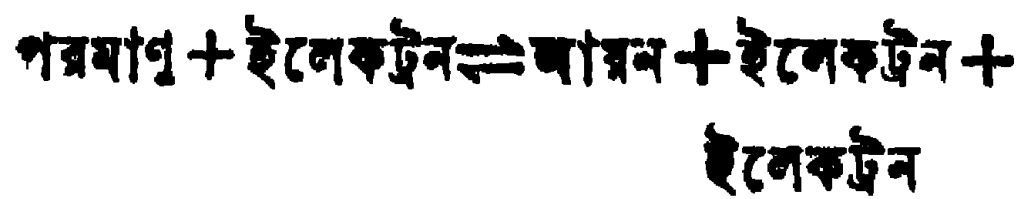
এখানে ডান দিক থেকে বাঁ দিকে আয়ননের বিপরীত অর্থাৎ পুনর্মিলনের যে ক্রিয়া, তাকে বলা হয় বিপরীত প্রক্রিয়া।

প্লাজ্‌মার বিভিন্ন ধরণের কণার সংখ্যা যথেষ্ট হলে তাদের মধ্যে পারস্পরিক সংঘর্ষের ফলে সেগুলির তাপমাত্রা একই হয় এবং তখন প্রতিটি প্রক্রিয়া ও তার বিপরীত প্রক্রিয়ার মধ্যে সাম্য বজায় থাকে। এই হলো প্লাজ্‌মার তাপীয় সাম্যাবস্থা। এই অবস্থায় বিভিন্ন ধরণের কণার সংখ্যা মেঘনাদ সাহা কর্তৃক আবিষ্কৃত 'সাহা সমীকরণ' দ্বারা নির্দিষ্ট হয়।

নক্ষত্রের অভ্যন্তরভাগে সর্বদাই শক্তি-প্রবাহ থাকায় সম্পূর্ণ সাম্যাবস্থা রক্ষিত হয় না। কিন্তু কোন অংশের স্থানীয় অবস্থা বিচার করলে দেখা যায় যে, তা বেশ ভাল ভাবেই তাপীয় সাম্যাবস্থার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। এই ঘটনা থেকেই স্থানীয় তাপীয় সাম্যাবস্থা নামটি উদ্ভূত হয়েছে। বর্তমানে এই নামটির দ্বারা সাধারণভাবে সেই অবস্থাকে বোঝায়, যাতে ফোটন ব্যতীত অন্যান্য কণা সংক্রান্ত প্রক্রিয়া ও বিপরীত প্রক্রিয়ার মধ্যে সাম্য রক্ষিত হয় এবং ঐ সব কণা তাপীয় সাম্যাবস্থায় আছে বলে ধরা যায়। এক্ষেত্রে তাপমাত্রার ধারণা স্বভাবতঃই খানিকটা সীমিত। এই তাপমাত্রাকে ইলেকট্রন তাপমাত্রা নামে অভিহিত করা হয়।

সূর্যের বহির্ভাগে যে করোনা অঞ্চল, সেই করোনার প্লাজ্‌মা অনুযায়ী করোনা মডেলের কল্পনা করা হয়েছে। এই মডেলে প্লাজ্‌মার কণার ঘনত্ব অপেক্ষাকৃত অনেক কম। আয়ননের প্রক্রিয়া ও তার বিপরীত প্রক্রিয়ার মধ্যে আদৌ সাম্য রক্ষিত হয় না। বস্তুতঃ আয়নন ও পুনর্মিলনের যে দুটি প্রক্রিয়া ও বিপরীত প্রক্রিয়ার কথা পূর্বে বলা হয়েছে, তার উপরের বাঁ দিকেরটি এবং নীচের ডান দিকেরটিই কেবল কার্যকর হয়; অর্থাৎ ইলেকট্রনের সংঘর্ষের দ্বারাই কেবল আয়নন সংঘটিত হয়, কিন্তু পুনর্মিলন সর্বদা বিকিরণধর্মী হয়ে থাকে।

প্লাজ্‌মা থেকে নির্গত বিকিরণের বর্ণালীতে কয়েকটি রেখা ও নিরবচ্ছিন্ন ঔজ্জ্বল্য, দুই-ই বর্তমান থাকে। ঐগুলির পরিমাপ থেকে কোন একটি উপযোগী মডেলের ভিত্তিতে প্লাজ্‌মার মধ্যস্থিত ইলেকট্রনের তাপমাত্রা ও ঘনত্ব, আয়নের তাপমাত্রা প্রভৃতি নির্ণয় করা যায়। কোন দুটি রেখার ঔজ্জ্বল্যের অনুপাত থেকে ইলেকট্রনের তাপমাত্রা হিসাব করতে পারা যায়। আবার ইলেকট্রনের গতিসঞ্জাত ডপ্‌লার এফেক্টের জন্যে রেখার বিস্তার থেকেও ঐ তাপমাত্রা নির্ণয় করা যায়। আয়নের গতিসঞ্জাত ডপ্‌লার এফেক্টের ফলে রেখার যে বিস্তার হয়, তার সাহায্যে আয়নের তাপমাত্রা নির্ধারণ করা সম্ভব। ইলেকট্রনের তাপমাত্রা জানা থাকলে কোন একটি রেখার নিজস্ব ঔজ্জ্বল্যের পরিমাপ থেকে ইলেকট্রন ঘনত্ব হিসাব করা যায়। বিদ্যুৎক্ষেত্রজনিত স্টার্ক এফেক্টের ফলে রেখার যে বিস্তার হয়, তার সাহায্যেও এই ঘনত্ব নির্ণয় করা যেতে পারে।

প্লাজ্‌মার বিকিরণ ব্যাখ্যা করবার পক্ষে মডেলের ধারণা বহু ক্ষেত্রে কার্যকর হলেও এর ব্যতিক্রম নেহাৎ দুর্লভ নয়। উদাহরণস্বরূপ, পরমাণু-কেন্দ্রকের সংযোজন পরীক্ষার জন্যে যে সব অতি ক্ষণস্থায়ী প্লাজ্‌মার সৃষ্টি করা হয়, সেগুলির উল্লেখ

করা যেতে পারে। এই ধরণের প্লাজ্‌মার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া কেবলমাত্র তাৎক্ষণিক তাপমাত্রার উপরই নির্ভর করে না, পূর্ববর্তী সময়ের তাপমাত্রাও তাদের উপর প্রভাব বিস্তার করে। এই সব প্লাজ্‌মার যথাযথ ব্যাখ্যা করবার জন্যে বিজ্ঞানীরা গবেষণায় নিযুক্ত আছেন।

বিভিন্ন প্রকৃতির বিকিরণ

আমরা জানি, বিকিরণ হচ্ছে বস্তুতঃ বিদ্যুচ্চৌম্বক তরঙ্গ এবং কম্পাঙ্ক বা তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য অনুযায়ী ঐ তরঙ্গ বিভিন্ন প্রকৃতির হতে পারে, যথা—বেতার তরঙ্গ, দৃশ্য আলো, রন্টগ্যেন রশ্মি ইত্যাদি। প্লাজ্‌মা থেকে যে বিকিরণ নিঃসৃত হয়, তাতে দৃশ্য আলো ছাড়াও বেতার-তরঙ্গ, অবলোহিত রশ্মি, অতিবেগুনী রশ্মি বা রন্টগ্যেন রশ্মি থাকতে পারে। রেখা বর্ণালী ও নিরবচ্ছিন্ন বর্ণালী, উভয় ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, প্লাজ্‌মার তাপমাত্রা T যত বেশী হয়, বর্ণালীর সর্বোচ্চ অংশের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য λm তত কম হয়। আদর্শ বিকিরকের (Black body) বর্ণালীর ক্ষেত্রে ঐ তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য ভীনের সূত্র (Wien's law) থেকে জানা যায়। সূত্রটি অনুযায়ী

$\lambda mT = 0{\cdot}2898$ সে. মি. ডিগ্রী

এই সূত্র থেকে দেখা যায় যে, প্লাজ্‌মার তাপমাত্রা 10 হাজার ডিগ্রী কেল্‌ভিন হলে ঐ তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য হয় 2898×10^{-8} সে. মি. বা 2898 অ্যাংস্ট্রম (অতি বেগুনী রশ্মি) আর তাপমাত্রা 10 লক্ষ ডিগ্রী কেল্‌ভিন হলে তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য হয় 28·98 অ্যাংস্ট্রম (রন্টগ্যেন রশ্মি)।

ব্রেম্‌স্ট্রালুং বিকিরণের জন্যে যে নিরবচ্ছিন্ন বর্ণালী দেখা যায়, তার সর্বোচ্চ অংশের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য নিম্নলিখিত সূত্র থেকে পাওয়া যেতে পারে।

$\lambda mT = 0{\cdot}720$ সে. মি. ডিগ্রী

এই সূত্র অনুযায়ী 10 হাজার ডিগ্রী কেল্‌ভিন তাপমাত্রায় ঐ তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য হয় 7200 অ্যাংস্ট্রম (দৃশ্য আলো) এবং 10 লক্ষ ডিগ্রী কেল্‌ভিন তাপমাত্রায় তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য হচ্ছে 72 অ্যাংস্ট্রম (অতি বেগুনী রশ্মি)।

পরমাণু-কেন্দ্রকের সংযোজন চুল্লী নির্মাণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞানীরা যে সব অত্যুত্তপ্ত প্লাজ্‌মা নিয়ে গবেষণা করছেন, সেগুলির বিকিরণের প্রধান অংশ থাকে রন্টগ্যেন রশ্মি এলাকায়। এখানে উল্লেখ্য যে, প্লাজ্‌মা থেকে নিঃসৃত রন্টগ্যেন রশ্মি সম্পর্কে বহু কাল পূর্ব থেকেই বিজ্ঞানীদের কৌতূহল ছিল, কারণ তাঁদের জানা ছিল যে, সৌর করোনার তাপমাত্রা 10 লক্ষ ডিগ্রী কেল্‌ভিনের চেয়ে কিছুটা বেশী এবং সেজন্যে করোনার প্লাজ্‌মা থেকে নিঃসৃত বিকিরণের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হলো রন্টগ্যেন রশ্মি। তবে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল কর্তৃক এই রশ্মি শোষিত হওয়ায় তা আর ভূপৃষ্ঠে পৌঁছতে পারে না বলে ঐ রশ্মি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা পূর্বে সম্ভব ছিল না। সাম্প্রতিক কালে রকেট ও কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে বায়ুমণ্ডলের উর্ধ্বে যন্ত্র পাঠিয়ে রন্টগ্যেন রশ্মি সম্পর্কে গবেষণা করা সম্ভব হচ্ছে। কেবল সৌর করোনাই নয়, বিভিন্ন জ্যোতিষ্ক থেকে আগত রন্টগ্যেন রশ্মিরও পরিমাপ করা হয়েছে। এর ফলে জ্যোতির্বিদ্যায় অনেক নূতন তথ্যের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে।

প্লাজ্‌মা থেকে নিঃসৃত মাইক্রো-ওয়েভ (ক্ষুদ্র বেতার-তরঙ্গ), অবলোহিত রশ্মি ও অতি বেগুনী রশ্মি নিয়েও গবেষণা হয়েছে। মাইক্রো-ওয়েভ এলাকায় কোন বিশেষ কম্পাঙ্কের নিকটবর্তী কম্পাঙ্কসমূহের যে নিরবচ্ছিন্ন বিকিরণ নির্গত হয়, তার শক্তির পরিমাণ প্লাজ্‌মাস্থিত ইলেকট্রনের তাপমাত্রা নির্ণয়ের একটি প্রকৃষ্ট উপায় হিসাবে গণ্য হয়। বৈদ্যুতিক ক্ষরণ নলের মধ্যে নির্দিষ্ট ধরণের প্লাজ্‌মা সৃষ্টি করে তা ব্যবহার করা হয় বিশেষ কোন তাপমাত্রায় মাইক্রো-ওয়েভ বিকিরণের আদর্শ উৎস রূপে। মাইক্রো-ওয়েভ গ্রাহক-যন্ত্রের কার্যকারিতার পরীক্ষায় এই প্লাজ্‌মা প্রায়শঃই ব্যবহৃত হয়।

প্লাজ্মা ও রামন এফেক্ট

সাম্প্রতিক কালে প্লাজমায় রামন এফেক্টের নিদর্শন পাওয়া গেছে। এ কথা জানা আছে যে, উপযোগী অণুর উপর কোন একটি কম্পাঙ্কের আলো আপতিত হলে অণু কর্তৃক বিচ্ছুরিত আলোর রামন এফেক্ট অনুযায়ী ঐ কম্পাঙ্ক অপেক্ষা বৃহত্তর ও ক্ষুদ্রতর কম্পাঙ্কও বর্তমান থাকে। এর মূলে রয়েছে অণুর এমন সব শক্তি-স্তরের অস্তিত্ব, যাদের কোন একটি থেকে অন্য একটিতে অণু সরে গেলে সেই দুটি স্তরের শক্তি-পার্থক্য আপতিত বিকিরণের কম্পাঙ্কের পার্থক্য ঘটিয়ে থাকে। প্লাজ্মার মধ্যে স্পন্দনের মাধ্যমে বিভিন্ন শক্তি-স্তর থাকায় সেক্ষেত্রেও স্বভাবতঃই রামন এফেক্ট কার্যকর হয়। তবে প্লাজ্মাজাত বিকিরণের মধ্য থেকে রামন এফেক্টের কম্পাঙ্কগুলিকে চিনে নিতে হলে প্লাজ্মার উপর আপতিত আলো অত্যন্ত তীব্র হওয়া দরকার। তাছাড়া আপতিত আলোর কম্পাঙ্ক বিশেষভাবে নির্দিষ্ট হওয়া দরকার, যাতে বিচ্ছুরিত আলোর কম্পাঙ্কের সামান্য পার্থক্যও ধরতে পারা যায়। লেসারের সাহায্যে প্রয়োজনানুগ আলো সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে। লেসার-রশ্মির বিচ্ছুরণ সংক্রান্ত গবেষণা গত সাত-আট বছরে এত উন্নত হয়েছে যে, উচ্চ তাপমাত্রার ক্ষণস্থায়ী প্লাজ্মাতেও এখন বিচ্ছুরণের পরীক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে।

ক্যানাডার অটোয়া শহরের ন্যাশনাল রিসার্চ কাউন্সিলের গবেষণাগারে র‍্যাম্সডেন ও ডেভিস প্লাজ্মা কর্তৃক বিচ্ছুরিত লেসার-রশ্মির যে বর্ণালী পেয়েছেন, 3 নং চিত্রে তা দেখানো হলো। 1-চিহ্নিত অংশের মধ্যবর্তী তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য λ_0 আপতিত

তীব্রতা (যথেচ্ছ একক) →
6920 6930 6940 6950 6960 6970
λ_1' λ_0 λ_1 তরঙ্গ দৈর্ঘ্য (Å) →

3নং চিত্র
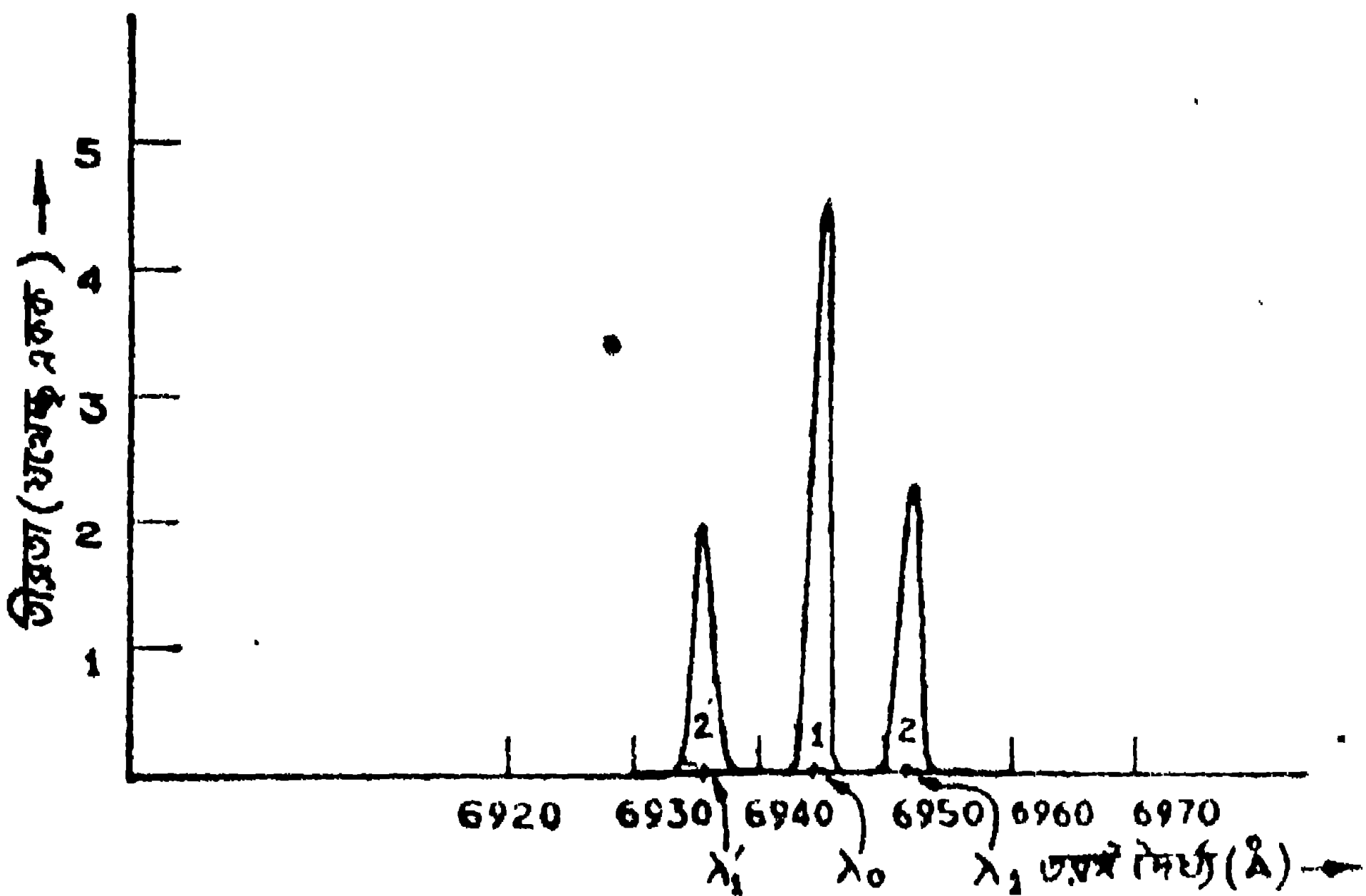
প্লাজ্মা কর্তৃক লেসার-রশ্মির বিচ্ছুরণে রামন এফেক্টের নিদর্শন। আপতিত আলোর (তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য : λ_0) সঙ্গে 13° কোণ করে যে বিচ্ছুরিত আলো নির্গত হয়েছে, তার এই বর্ণালীতে λ_1 ও λ_1' হচ্ছে কার্যতঃ যথাক্রমে স্টোক্স্ রেখা ও বিপরীত-স্টোক্স্ রেখার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য। (Å—অ্যাংস্ট্রম।)

রশ্মির তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের নির্দেশক। এই অংশের বিস্তারের মূলে আছে আয়নের তাপমাত্রা। রামন একেক্ট অনুযায়ী কম্পাঙ্ক বা তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের পরিবর্তন হওয়ায় বর্ণালীতে যে স্টোক্‌স্ ও বিপরীত-স্টোক্‌স্ রেখা পাওয়া যায়, সেই দুটি রেখাকে সূচিত করছে যথাক্রমে 2 ও 2'-চিহ্নিত অংশ। রেখাদ্বয়ের যে বিস্তার দেখা যাচ্ছে, তার প্রধান কারণ সম্ভবতঃ প্লাজ্‌মার মধ্যে ইলেকট্রনের তাপমাত্রা ও ইলেকট্রন ঘনত্বের তারতম্য। 2 ও 2'-চিহ্নিত অংশের মধ্যবর্তী তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যকে λ_1 ও λ_1' লিখলে λ_0 থেকে তাদের উভয়ের পার্থক্য সমান। এই পার্থক্য হলো 8 অ্যাংস্ট্রম. প্লাজ্‌মার মধ্যস্থিত ইলেকট্রনগুলির দোলনের যে নিজস্ব কম্পাঙ্ক আছে, তার উপর নির্ভর করে তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের এই পার্থক্য। সেজন্যে এর পরিমাণ থেকে ঐ কম্পাঙ্ক নির্ণয় করা যায় এবং তা থেকে আবার নিরূপণ করা যায় ইলেকট্রন ঘনত্ব।

কোয়ান্টাম তত্ত্বের নিরিখে প্লাজ্‌মাকে বিচার করবার যে প্রচেষ্টা সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে, তাতে রামন একেক্ট বিশেষ সহায়ক হবে বলে মনে হয়।

রামন রিসার্চ ইনস্টিটিউট

রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়*

গত বছর (1970) খড়্গপুরে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনের শেষে যখন পরবর্তী অধিবেশনের স্থান হিসাবে ব্যাঙ্গালোরের নাম ঘোষিত হয়, তখন থেকেই একটা গভীর প্রত্যাশা জেগেছিল 1971 সালের গোড়ায় ব্যাঙ্গালোরে গিয়ে বিজ্ঞানাচার্য চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রামনের সাক্ষাৎ-লাভের ও তাঁর প্রতিষ্ঠিত গবেষণাকেন্দ্র দেখবার সুযোগ আমরা নিশ্চয়ই পাব। কিন্তু আমাদের পরম দুর্ভাগ্য, এই বছর ব্যাঙ্গালোরে বিজ্ঞান কংগ্রেস অধিবেশনের মাত্র দেড় মাস আগে গত 21 নভেম্বর আচার্য রামন আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। তাই এক পরম আক্ষেপ রয়ে গেল, এবার ব্যাঙ্গালোরে উপস্থিত হয়েও তাঁর সাক্ষাৎ-লাভের সৌভাগ্য আমাদের আর হলো না!

সে সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়ে মনের মধ্যে একটা গভীর বাসনা জেগেছিল—আচার্য রামনের স্মৃতি-বিজড়িত গবেষণা কেন্দ্র রামন রিসার্চ ইনষ্টিটিউট অন্ততঃ দেখতেই হবে। একথা আজ সকলেরই জানা আছে, আচার্য রামন তাঁর জীবন-কালে লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে বিজ্ঞান-সাধনায় একান্তভাবে নিমগ্ন থাকতে চাইতেন। তাই তিনি চাইতেন না, দর্শনার্থীদল তাঁর গবেষণাকেন্দ্রে এসে বিজ্ঞান-সাধনায় ব্যাঘাত ঘটাক। রামন রিসার্চ ইনষ্টিটিউটের প্রবেশদ্বারে একটি নোটিশ বোর্ডে তাঁর এই অভিপ্রায় ব্যক্ত হয়েছে: This Institute is NOT OPEN to visitors. Please DO NOT DISTURB us।

মনে একটা সংশয় ছিল, আচার্য রামনের তিরোধানের পর এই নিষেধবিধি এখনও হয়তো বহাল আছে। যা হোক, ব্যাঙ্গালোরে বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশন চলাকালে রামন রিসার্চ ইনষ্টিটিউট দেখবার একটা সুযোগ করে দেবার জন্যে অভ্যর্থনা সমিতির অন্যতম সম্পাদক অধ্যাপক রুদ্রাপ্পিয়াকে বিশেষভাবে অনুরোধ জানিয়েছিলাম। আমাদের এই বিশেষ আগ্রহের কথা আচার্য

* দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং, কলিকাতা-29

রামনের সহধর্মিণী শ্রীমতী লোকসুন্দরী রামনকে তিনি ফোনযোগে জানালেন। শ্রীমতী রামন প্রথম একটু দ্বিধা প্রকাশ করলেও আমাদের বিশেষ আগ্রহের কথা শুনে শেষে অনুমতি দিলেন।

অনুমতি পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে রামন রিসার্চ ইনস্টিটিউট অভিমুখে রওনা হলাম। ব্যাঙ্গালোর-6 এলাকায় মেকরি সার্কেলে এই ইনস্টিটিউট অবস্থিত। মেকরি রোড ধরে এগিয়ে গেলে বাঁ দিকে প্রথমে পড়ে ইণ্ডিয়ান অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্সস-এর ভবন এবং তার ডান দিকে রামন ইনস্টিটিউট। ইনস্টিটিউটে ঢুকে বাঁ দিকে প্রথমেই চোখে পড়লো দর্শনার্থীদের উদ্দেশ্যে লিখিত সুবিদিত নোটিশ বোর্ডটি। ইনস্টিটিউটের প্রাঙ্গণে উপস্থিত হবার কিছুক্ষণ পরে ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল সায়েন্স অ্যাকাডেমির তিনজন বিজ্ঞানী ও কার্যালয়ের সম্পাদক সেখানে এসে হাজির হলেন। ইতিমধ্যে আচার্য রামনের একান্ত সচিব শ্রীপদ্মনাভন এসে আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন। আমাদের আসবার উদ্দেশ্য তিনি আগেই ফোনযোগে জানতে পেরেছিলেন। তাই প্রথমে শ্রীমতী রামনের কাছে আমাদের নিয়ে গেলেন।

আলাপ-পরিচয়ের পর শ্রীমতী রামন আমাদের ইনস্টিটিউটের বিভিন্ন বিভাগ ও মিউজিয়াম দেখবার জন্যে শ্রীপদ্মনাভনের হাতে চাবি দিলেন। তিনি আমাদের প্রথমে নিয়ে এলেন আচার্য রামনের বসবার ঘরে। ঘরটি ইনস্টিটিউটের মূল ভবনের একতলায় বাঁ দিকে একেবারে শেষ প্রান্তে অবস্থিত। ঘরে ঢুকে প্রথমেই চোখে পড়লো সামনের দেয়ালে টাঙানো একটি মানপত্র। মানপত্রটি কলকাতা পৌর সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত। 1930 সালে আচার্য রামন নোবেল পুরস্কার পাবার পর কলকাতা পৌর সংস্থা তাঁকে সংবর্ধনা জানিয়ে যে মানপত্র দেন, তৎকালীন মেয়র ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের স্বাক্ষরিত সেই মানপত্রটি সামনের দেয়ালের টাঙানো আছে। এই মানপত্রটি দেখে সত্যি খুব আনন্দ হয়েছিল এই ভেবে যে, কলিকাতাবাসী হিসাবে আমরাই সর্বপ্রথম আচার্য রামনকে নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্তি উপলক্ষে সংবর্ধনা জানবার সুযোগ পেয়েছিলাম। সামনের দেয়ালের বাঁ দিকে আছে আর একটি বাঁধানো মানপত্র। সেটি হচ্ছে ইণ্ডিয়ান অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্সস-এর পক্ষ থেকে আচার্য রামনকে নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্তি উপলক্ষে প্রদত্ত মানপত্র। এছাড়া, বাঁ দিকের দেয়ালে টাঙানো আছে 1931 সালে অনুষ্ঠিত রামন এফেক্ট সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক আলোচনা-চক্রের একটি বিবরণ।

আচার্য রামনের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে এই ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার ইতিবৃত্ত শ্রীপদ্মনাভনের কাছে জানতে চেয়েছিলাম। তিনি জানালেন—নোবেল পুরস্কার লাভের পর থেকেই আচার্য রামন নিজস্ব একটি গবেষণা কেন্দ্র স্থাপনের স্বপ্ন দেখেছিলেন। কলকাতা থেকে ব্যাঙ্গালোরে আসবার পর তাঁর এই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্যে তিনি বিশেষ সচেষ্ট হন। দেশবাসীর কাছে তাঁর অন্তরের বাসনা জানিয়ে তিনি আবেদন করেছিলেন—It is my earnest desire to bring into existence a centre of scientific research worthy of our ancient country where the keenest intellects of our land can probe into the mysteries of the Universe and by so doing help us to appreciate the transcendent power that guides its activities. This aim can only be achieved, if by His Divine Grace, all lovers of our country see this way to help the cause. (আমার একান্ত অভিলাষ আমাদের প্রাচীন দেশের যোগ্য এমন একটি বৈজ্ঞানিক গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা, যেখানে আমাদের দেশের তীক্ষ্ণধী গবেষকরা বিশ্বের রহস্য অনুসন্ধান করতে পারেন এবং তার

দ্বারা যে অজ্ঞের মহাশক্তি বিশ্বের কার্যধারা নিয়ন্ত্রণ করে, তা উপলব্ধিতে সহায়তা করবেন। এই উদ্দেশ্য সার্থক হতে পারে, যদি বিধাতার অনুগ্রহে আমাদের সকল দেশপ্রেমিক মানুষ এই উদ্দেশ্য সাধনে সাহায্য করেন)। আচার্য রামনের এই আবেদন ব্যর্থ হয় নি। দেশবাসীর সাহায্য ও সহযোগিতায় 1951 সালে তিনি ব্যাঙ্গালোরে এই গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন।

রামন রিসার্চ ইনষ্টিটিউটের ইতিবৃত্ত শুনতে শুনতে আমরা উপস্থিত হলাম আচার্য রামনের নিজস্ব গবেষণাগারে। অসুস্থ হয়ে পড়বার আগে পর্যন্ত তিনি এখানে রামন এফেক্ট সম্পর্কে নানা পরীক্ষা চালিয়ে গেছেন। এর পরের ঘর হচ্ছে পেট্রোলজিক্যাল বা শিলাতাত্ত্বিক গবেষণাগার, তারপর ক্রষ্ট্যালোগ্রাফী বা কেলাসতাত্ত্বিক গবেষণাগার। এই ঘরের শেষে দ্বিতলে ওঠবার সিঁড়ি। সিঁড়ির ডানদিকে একতলায় এক্স-রশ্মি বিভাগ।

ইনষ্টিটিউটের দ্বিতলে আছে বিভিন্ন মিউজিয়াম, লাইব্রেরি, বক্তৃতা-কক্ষ ও প্রকাশনা বিভাগ। সিঁড়ি দিয়ে দ্বিতলে উঠে ডানদিকে প্রথম ঘরটি হচ্ছে শিলাতাত্ত্বিক মিউজিয়াম। এই প্রদর্শনশালায় আছে দেশ-বিদেশ থেকে সংগৃহীত বহু বিচিত্র শিলাখণ্ড। এর পাশের ঘরটিতে আছে প্রাকৃতিক ইতিহাস মিউজিয়াম। এই প্রদর্শনশালায় আছে ডক্টর রামন কর্তৃক দেশ-বিদেশ থেকে সংগৃহীত দু-শতাধিক প্রজাপতি, বহু কীট-পতঙ্গ, শামুক, শঙ্খ ও পাখীর নিদর্শন। তাঁর প্রজাপতির এই অমূল্য সংগ্রহ দেখে অভিভূত হতে হয়। কত বিচিত্র তাদের রঙ, আর কি নয়নবিমোহন তাদের গায়ের নক্সা! মানুষ বিরাট শিল্পী বলে আমরা গর্ব করে থাকি, কিন্তু প্রকৃতি যে কতবড় শিল্পী, তা এই প্রজাপতির নিদর্শনগুলি দেখে উপলব্ধি করা যায়।

আচার্য রামনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য মিউজিয়ম হচ্ছে মণিমাণিক্যের প্রদর্শনশালা। খনিজদ্রব্য, শিলাখণ্ড ও মণিমাণিক্যের রঙ সম্পর্কে ডক্টর রামন দীর্ঘকাল গবেষণা করেছিলেন। এজন্যে দেশ-বিদেশ থেকে তিনি বহু মূল্যবান খনিজদ্রব্য, শিলাখণ্ড ও মাণিক সংগ্রহ করেছিলেন। এই সংগ্রহশালায় পান্না, হীরা, চুনি, গোমেদ, ওপেল, অ্যাগেট ইত্যাদি কত অমূল্য মাণিকের যে নিদর্শন আছে, তা বলা যায় না। এই সংগ্রহশালায় একটি সংরক্ষিত ঘরে আছে দীপ্তিমান খনিজদ্রব্যের অতি মূল্যবান সংগ্রহ। সাধারণ আলোতে এই খনিজদ্রব্যগুলির বর্ণ বৈশিষ্ট্য চোখে ধরা পড়ে না। কিন্তু আলট্রা-ভায়োলেট আলোর পরিবেশে এই খনিজদ্রব্যগুলির যে বর্ণ-বৈচিত্র্য উদ্ভাসিত হয়, তা দেখে মনে হয় যেন এক স্বপ্নময় রাজ্যে প্রবেশ করেছি। কি বিচিত্র তাদের বর্ণশোভা! কোনটি থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে নীল, কোনটি থেকে লাল, কোনটি থেকে সবুজ, কোনটি থেকে স্বর্ণাভ হলুদ, আবার কোন একটি থেকে লাল, সবুজ নানা রং। রাসায়নিক বিচারে এই খনিজদ্রব্যগুলি হচ্ছে ফেল্ডস্পার (Feldspar) এবং এদের সাধারণ রাসায়নিক সংযুতি হচ্ছে অ্যালুমিনো সিলিকেট (Alumino Silicate)। পটাশ ফেল্ডস্পারকে বলা হয় অরথোক্লেজ (Orthoclase), সোডা ও ক্যালসিয়াম ফেল্ড স্পারকে বলে প্ল্যাগিওক্লেজ (Plagioclase)। দীপ্তিমান ফেল্ডস্পারের মধ্যে সবচেয়ে চমকপ্রদ হচ্ছে ল্যাব্রাডোরাইট (Labradorite)। ল্যাব্রাডোর-এ পাওয়া যায় বলে এদের এই নামকরণ। এই খনিজদ্রব্য ছাড়া তাঁর আর একটি বিশেষ মূল্যবান সংগ্রহ হচ্ছে হীরক। নোবেল পুরস্কারের অর্থের একটা বড় অংশ তিনি হীরা কেনবার জন্যে ব্যয় করেছিলেন। এই অর্থ দিয়ে তিনি 300টিরও বেশী হীরক কিনেছিলেন বলে শোনা যায়। আমরা জানি, আচার্য রামন হীরক নিয়ে দীর্ঘ দিন বহু গবেষণা করেছিলেন। দীপ্তিমান

খনিজদ্রব্য ও হীরকের নিদর্শনগুলি তাঁর অত্যন্ত প্রিয় ছিল। এজন্যে এই নিদর্শনগুলি বিশেষ সংরক্ষিত ঘরে তিনি রাখবার ব্যবস্থা করেছিলেন।

রামন ইনস্টিটিউটের দ্বিতলে এই সংগ্রহশালাগুলি ছাড়া আছে লাইব্রেরি, বক্তৃতা-কক্ষ ও রিপ্রিন্ট দপ্তর। বক্তৃতা-কক্ষটি খুব বড় নয়। সেখানে রামন এফেক্ট সম্পর্কিত নানা আলোকচিত্র শোভিত আছে এবং প্রবেশদ্বারের বাঁ পাশে এক কোণে আছে আচার্য রামনের একটি আবক্ষ প্রতিমূর্তি। প্রতি বছর দোসরা অক্টোবর গান্ধীজীর জন্মদিনে ডক্টর রামন গান্ধী স্মারক বক্তৃতা দিতেন। এই বক্তৃতায় তিনি তাঁর সাম্প্রতিক গবেষণা সম্পর্কে আলোচনা করতেন। তিনি সর্বশেষ গান্ধী স্মারক বক্তৃতা দেন 1970 সালের 2রা অক্টোবর। তাঁর এই সর্বশেষ বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল 'ককলিয়া (অন্তঃকর্ণের অংশবিশেষ) ও শব্দানুভূতি'। বক্তৃতা-কক্ষের বোর্ডে এই বিষয় ব্যাখ্যার জন্যে যে রেখাচিত্র সেদিন অঙ্কিত হয়েছিল, সেটি এখনও অবিকৃত রয়েছে দেখলাম।

রামন ইনস্টিটিউটের যে বিভাগগুলির বিষয় আগে উল্লেখ করেছি, সেগুলি ছাড়া গণিত, প্রাণরসায়ন এবং আবহতত্ত্বের বিভাগও আছে। ইনষ্টিটিউটের প্রাঙ্গণে একটি পূর্ণাঙ্গ মানমন্দিরও আছে। গোলাপ ফুল আচার্য রামনের বিশেষ প্রিয় ছিল। প্রাঙ্গণের মধ্যে তাঁর গোলাপ ফুলের বাগানটি দেখবার মত। শ্রীপদ্মনাভনের কাছে শুনলাম, তিনি নিজে বাগানের তদারক করতেন। প্রতিদিন সকালে বাগানে গিয়ে তিনি প্রস্ফুটিত গোলাপের স্পর্শ অনুভব করতেন। কিন্তু একটিও গোলাপ ফুল তিনি গাছ থেকে কখনও ছিঁড়তেন না। এই প্রসঙ্গে একটি কাহিনী শোনালেন শ্রীপদ্মনাভন। একবার আচার্য রামনের জন্মদিন ইনষ্টিটিউটের গবেষক ও কর্মীরা তাঁকে একটি গোলাপের তোড়া উপহার দেন। গোলাপ দেখে তিনি প্রথমে খুশীই হয়েছিলেন, কিন্তু পরক্ষণে প্রশ্ন করলেন 'এই গোলাপ তোমরা কোথা থেকে নিয়ে এসেছো? আমার বাগান থেকে নয় নিশ্চয়? যখন শুনলেন তাঁর বাগান থেকেই এই গোলাপগুলি ছিঁড়ে আনা হয়েছে। তখন একটু ক্ষুণ্ণ হয়ে বললেন, 'এগুলি যেখানে ছিল সেখানে থাকলেই আমি বেশী খুশী হতাম'। শ্রীপদ্মনাভন বললেন, আচার্য রামন সুন্দরের পূজারী ছিলেন মনেপ্রাণে। তাই তিনি ইনষ্টিটিউটের দোতলার বারান্দা থেকে দূরের নন্দী পর্বতের দৃশ্য যাতে অবরুদ্ধ না হয়, সেজন্যে ইনষ্টিটিউটের সামনে বড় গাছ লাগাতে দেন নি।

শ্রীপদ্মনাভনের কাছ থেকে আরও জানা গেল, ইনস্টিটিউটের প্রকাশনা বিভাগ থেকে 'প্রোসিডিং অফ ইণ্ডিয়ান অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্সেস' পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে থাকে। ডক্টর রামনের প্রয়াণের দু-বছর আগে এখান থেকে তাঁর সর্বশেষ গবেষণা গ্রন্থ 'The Physiology of vision' প্রকাশিত হয়েছে।

রামন রিসার্চ ইনস্টিটিউট দেখবার সুযোগ পেয়ে নিজেদের সৌভাগ্যবান মনে করেছি। কিন্তু সেই সঙ্গে একটা ব্যাপার লক্ষ্য করে দুঃখ বোধও করেছি। আমরা যখন ইনস্টিটিউট দেখতে যাই, তখন আচার্য রামনের তিরোধানের প্রায় দেড় মাস পরে সেখানে কাজকর্ম বিশেষ হচ্ছে বলে মনে হয় নি। একারণে সেখানকার বিভিন্ন বিভাগের বর্তমান গবেষণা-কাজের পরিচয় লাভের সুযোগ আমরা পাই নি। শ্রীপদ্মনাভন কথা প্রসঙ্গে আমাদের বলেছিলেন—ডক্টর রামন তাঁর ইনস্টিটিউটের কাজ পরিচালনের জন্যে কোন সরকারী অনুদান গ্রহণ করতেন না, জাতীয় অধ্যাপক হিসাবে তিনি যা পেতেন, শুধু তাই গ্রহণ করতেন। জানি না সেটাই সাময়িক পরিস্থিতির কারণ কিনা। শ্রীমতী রামন আমাদের সঙ্গে আলোচনার সময়ে বলেছিলেন—আচার্য রামনের তিরোধানের পর এই ইনষ্টিটিউট এখন ভারতের জাতীয় সম্পদ। দেশবাসীরই এখন এর পরিচালন দায়িত্ব গ্রহণ করা উচিত। তাঁর এই অভিমত বিজ্ঞানানুরাগী ব্যক্তি মাত্রই সমর্থন করবেন বলে মনে করি।

আণবিক বর্ণালী-বিজ্ঞানের ভূমিকা

দিলীপকুমার ঘোষ*

বর্ণালী-বিজ্ঞান পদার্থবিদ্যার অন্যতম প্রধান বিষয় এবং একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, বর্ণালী-বিজ্ঞানের উপর আধুনিক পদার্থবিদ্যার ভিত্তি স্থাপিত। বর্তমান প্রবন্ধে আণবিক বর্ণালী সংক্ষেপে আলোচনা করা হবে। অধ্যাপক রামনের আবিষ্কার আণবিক প্রক্রিয়া ও এই আবিষ্কার আণবিক বর্ণালী-বিজ্ঞানের মধ্যে বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে।

বর্ণালী-বিজ্ঞানের সাহায্যে আমরা অণু-পরমাণু ও নিউক্লিয়াসের শক্তির স্তর (Energy level) নিরূপণ করে থাকি। একটি অণু কর্তৃক যদি কোনও বিকিরণ শোষিত হয়, তাহলে ঐ বিকিরণের কম্পাঙ্ক জানা থাকলে আমরা দুটি শক্তির স্তরের পার্থক্য জানতে পারব (1নং চিত্র)।

তিন ভাগে ভাগ করে থাকি, যথা—ইলেকট্রনিক বর্ণালী (Electronic spectra), স্পন্দন বর্ণালী (Vibrational spectra) ও আবর্তন বর্ণালী (Rotational spectra)। এ ছাড়া আণবিক বর্ণালীর অন্য বিভাগ নিয়ে বর্তমান প্রবন্ধে আলোচনা করা হবে না। যখন কোনও বিশেষ ধরণের বিকিরণ কোনও অণুর উপর আপতিত হয়, তখন ঐ অণু বিকিরণ শোষণ করে ও অণুর মধ্যস্থিত আবর্তন শক্তি, স্পন্দন শক্তি বা ইলেকট্রনিক শক্তির মান বৃদ্ধি পায়। অণুর আবর্তন, স্পন্দন ও ইলেকট্রনিক গতি (Motion) সম্বন্ধে জানতে হলে প্রতিটি গতির জন্যে নির্দিষ্ট ধরণের বিকিরণ ব্যবহার করতে হয়। এই বিকিরণের কম্পাঙ্ক প্রতিটি ক্ষেত্রে ভিন্ন।

আমরা যখন অতি ক্ষুদ্র বেতার-তরঙ্গ (Microwave) ব্যবহার করি, তখন ঐ তরঙ্গ বা বিকিরণ অণুর দ্বারা শোষিত হয়, ফলে অণুর

1নং চিত্র
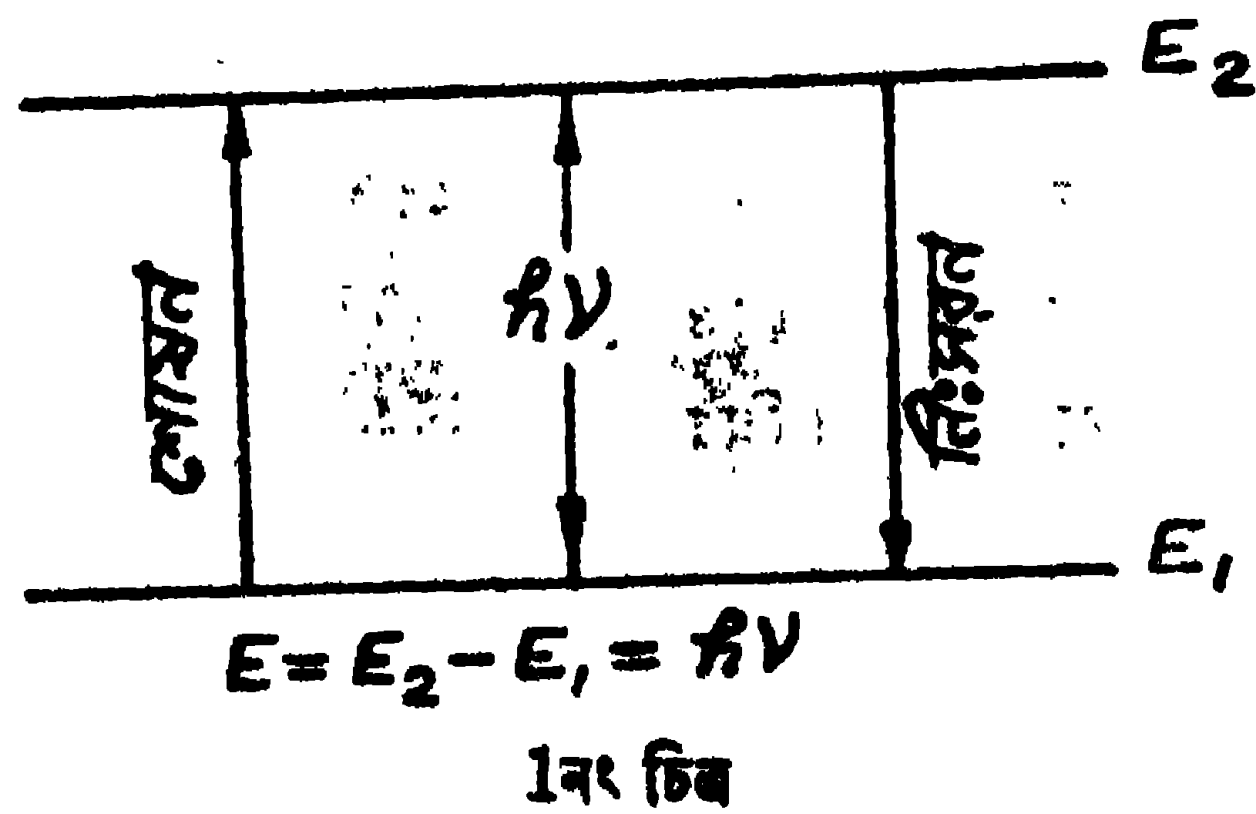
ν-বিকিরণের কম্পাঙ্ক, h-প্ল্যাঙ্কের নামানুসারে একটি ধ্রুবক। E—শক্তি, E_1-শক্তির নিম্নস্তর, E_2-শক্তির উর্ধ্বস্তর। অণু শক্তির নিম্নস্তরে থাকলে বিকিরণ শোষণ করে উর্ধ্বস্তরে যায়, অণু শক্তির উর্ধ্বস্তরে থাকলে বিকিরণ নিঃসরণ করে শক্তির নিম্নস্তরে ফিরে আসে।

যখন কোনও অণু ν কম্পাঙ্কের বিকিরণ শোষণ করে বা নিঃসরণ করে তখন সে কেবল মাত্র একটি শক্তির কোয়ান্টাম $h\nu$ শোষণ বা নিঃসরণ করে।

আণবিক বর্ণালীকে আমরা সাধারণভাবে

* সাহা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, কলিকাতা-9

মধ্যস্থিত আবর্তনজনিত শক্তি বৃদ্ধি পায় ও আমরা অণুর আবর্তন শক্তির স্তর নির্ণয় করতে পারি। এই প্রক্রিয়ার ফলে আণবিক আবর্তন বর্ণালী দেখতে পাই। এই একই প্রকারে আমরা যদি অবলোহিত (Infrared) বিকিরণ ব্যবহার করি, তাহলে আমরা আণবিক স্পন্দন বর্ণালী দেখতে পাব। মার্কারি আর্ক, সোডিয়াম বাতি বা হাইড্রোজেন আর্কের আলোর মত বিশেষ ধরণের বিকিরণ ব্যবহার করে ইলেকট্রনিক বর্ণালী পাওয়া যায়। উদাহরণ দিযে আমরা সাধারণ লবণ-অণুর কথা ট্রনিক বর্ণালীর কম্পাঙ্ক খুব বেশী। দ্বিতীয়, অণুর মধ্যস্থিত পরমাণুগুলির পারস্পরিক দূরত্বের পরিবর্তনের ফলে অণুগুলি সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হতে পারে, ফলে অণুর মধ্যে স্পন্দন হয়। পরমাণুগুলি ভারী হওয়ায় ইলেকট্রনিক গতি অপেক্ষা তাদের স্পন্দন অনেক ধীরে হয়, এই জন্যে অণুর স্পন্দন বর্ণালীর কম্পনে অনেক কম। এই ভাবে আমরা দেখাতে পারি, সমগ্র অণুর আবর্তনের কম্পাঙ্ক আরও অনেক কম। 2নং চিত্রে এই তিন প্রকার আণবিক বর্ণালীর বৈশিষ্ট্য

	ক্ষুদ্র বেতার তরঙ্গ (মাইক্রোওয়েভ)	অবলোহিত রশ্মি	দৃশ্য আলো ও অতিবেগুনি রশ্মি
তরঙ্গ দৈর্ঘ্য	10^{2}cm — 10^{-1}cm	10^{-1}cm — 10^{-4}cm	10^{-4} — 10^{-6}cm
কম্পাঙ্ক	3×10^{8} — 3×10^{11} c/sec c/sec	3×10^{11} — 3×10^{14} c/sec c/sec	3×10^{14} — 3×10^{16} c/sec c/sec
আণবিক গতি বা অবস্থা	আণবিক আবর্তন ০ পরমাণু	আণবিক স্পন্দন সঙ্কোচন প্রসারণ ০ পরমাণু	ইলেকট্রনের গতি • যোজ্যতা-ইলেকট্রন

2নং চিত্র
আণবিক বর্ণালীর সাধারণ বিভাগ

বলতে পারি। এতে একটি সোডিয়াম পরমাণুর সঙ্গে একটি ক্লোরিন পরমাণু যুক্ত আছে। ঐ অণুতে তিন রকম গতি সম্ভব। প্রথম, ইলেকট্রনগুলি অতি দ্রুত বেগে, প্রায় আলোর গতিবেগের সমান বেগে, ক্লোরিন ও সোডিয়াম পরমাণুর চারদিকে ঘোরে। বাইরের কোনও উপযুক্ত বিকিরণ ইলেকট্রনিক শক্তির স্তর পরিবর্তনের পক্ষে উপযোগী হলে সোডিয়াম ক্লোরাইড অণুর দ্বারা তা শোষিত হয়ে এই অণুকে পরবর্তী উচ্চ ইলেকট্রনিক শক্তিস্তরে নিয়ে যায়। ইলেক- ও বিভিন্ন ধরণের আণবিক গতি তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। 3নং চিত্রে বিভিন্ন শক্তিস্তর পরিবর্তন সম্বন্ধে বোঝানো হয়েছে।

একটি অণুর মধ্যে অসংখ্য শক্তিস্তর থাকে। অণুর মোটশক্তি = আবর্তনশক্তি + স্পন্দনশক্তি + ইলেকট্রনিকশক্তি। আবর্তন বর্ণালী থেকে আমরা অণুর গঠন সম্বন্ধে জানতে পারি। অণুর মধ্যস্থিত পরমাণুর পারস্পরিক দূরত্ব এবং তারা পরস্পরের সঙ্গে কত কোণে অবস্থিত আমরা নির্ভুলভাবে জানতে পারি। এই বর্ণালীর সাহায্যে আমরা

অণুর ডাইপোল মোমেন্টও (দ্বিমেরু ভ্রামক) নির্ভুল করে জানতে পারি। এই নির্ভুলের পরিমাণ হচ্ছে 1 এক কোটি অংশের মধ্যে মাত্র এক অংশ। এই প্রসঙ্গে ডাইপোল মোমেন্ট

$$\mu = Z \times d$$

ডাইপোল মোমেন্টের একক (Unit) বৈজ্ঞানিক ডিবাইয়ের নামানুসারে একটি ধ্রুব।

আবর্তন বর্ণালীর মত আমরা আণবিক স্পন্দন
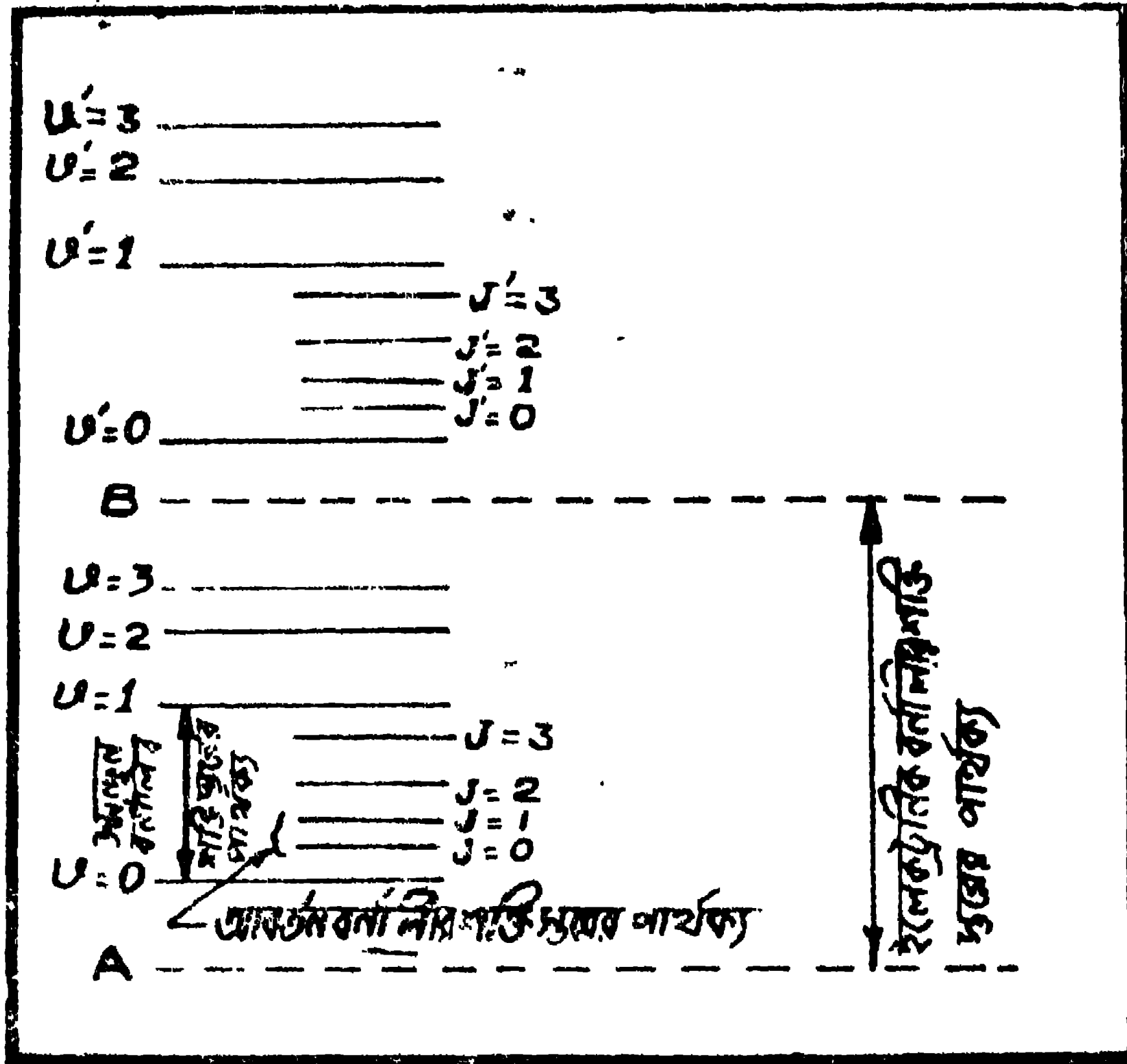
3নং চিত্র

A,B—ইলেকট্রনিক শক্তিস্তর, v—স্পন্দনমূলক কোয়ান্টাম সংখ্যা, v-এর মান 0,1,2,3 বা তদূর্ধ্ব হতে পারে। v=0 স্তর সর্বনিম্ন স্পন্দনস্তর (Vibrational Ground State)। J—আবর্তনমূলক কোয়ান্টাম সংখ্যা। J-এর মানও 0,1,2,3 বা তদূর্ধ্ব হতে পারে। J=0 স্তর সর্বনিম্ন আবর্তনস্তর (Rotational Ground State)। যখন কোনও অণু বিকিরণ শোষণ করে তখন অণুর মধ্যস্থিত ইলেকট্রনিক শক্তি বৃদ্ধি পেয়ে A স্তর থেকে B স্তরে যায় অথবা স্পন্দনশক্তি বৃদ্ধি পেয়ে v=0 স্তর থেকে v=1 স্তরে যায় বা আবর্তনশক্তি বৃদ্ধি পেয়ে J=0 স্তর থেকে J=1 স্তরে যায়। বিশেষ অবস্থায় অণু বিকিরণ শোষণ করে পরবর্তী ঊর্ধ্বস্তরে না গিয়ে ঊর্ধ্বতর কোন স্তরেও উন্নীত হতে পারে।

সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। অণুর আধানের আচ্ছাদনকে (Charge cloud) একটি ডাইপোল ধরে নেওয়া যায়। যদি কোনও ধনাত্মক আধান +Z ও ঋণাত্মক আধান—Z-এর মধ্যের দূরত্ব d হয়, তাহলে ডাইপোল মোমেন্ট হবে—

থেকেও আণবিক গঠন ও অণুর নমনীয়তা (Flexibility) সম্বন্ধে জানতে পারি। অবলোহিত বর্ণালী ও রামন বর্ণালী আমরা আণবিক স্পন্দনের জন্যে পাই। অবলোহিত বর্ণালীর সাহায্যে অণুর আবর্তন বর্ণালীও পরীক্ষা করা

যায়। অণুর মধ্যে বিশেষ গোষ্ঠী (Group), যেমন OH, NH ইত্যাদি থাকলে ঐ গোষ্ঠীর অবলোহিত শোষণ কম্পাঙ্ক সব সময় একই থাকে। যে কোনও অণুর সঙ্গে ঐ গোষ্ঠী যুক্ত থাকতে পারে, কিন্তু তাতে তাদের শোষণ কম্পাঙ্কের কোনও পরিবর্তন হয় না—ফলে অণুগুলিকে সঠিকভাবে চিনতে পারা যায়। অবলোহিত বর্ণালীর সাহায্যে রাসায়নিক মিশ্রণ ও রাসায়নিক বিশ্লেষণও সম্ভব। কোনও অণুর স্পন্দন বর্ণালী সম্পূর্ণ জানতে হলে আমাদের ঐ অণুর রামন বর্ণালী ও অবলোহিত বর্ণালী পরীক্ষা করা দরকার, কারণ একটি আর একটির পরিপূরক। অণুর কয়েকটি স্পন্দন অবলোহিত সক্রিয় (Infrared active) বা রামন নিষ্ক্রিয় (Raman inactive) কিংবা এর ঠিক বিপরীত হতে পারে। কোনও অণুর স্পন্দন অবলোহিত সক্রিয় তখনই হবে, যখন স্পন্দিত অবস্থায় অণুর ডাইপোল মোমেন্টের পরিবর্তন হবে, কিন্তু রামন বর্ণালী পেতে হলে স্পন্দিত অবস্থায় অণুর ডাইপোল মোমেন্টের পরিবর্তন দরকার হয় না। সে জন্যে N_2, O_2 ও Cl_2-এর মত সমকেন্দ্রক (Homonuclear) অণুর রামন বর্ণালী পাওয়া যায়, কিন্তু অবলোহিত বর্ণালী পাওয়া যায় না। কতকগুলি অণুর (যেমন CO_2) কয়েকটি স্পন্দন অবলোহিত সক্রিয় ও কয়েকটি রামন সক্রিয়।

আরও একটি প্রক্রিয়া আমরা প্রায় ব্যবহার করি, তার নাম প্রতিপ্রভা বর্ণালী (Fluoroscence Spectrum)। অণু আপতিত বিকিরণ শোষণ করে উচ্চতর ইলেকট্রনিক শক্তিস্তরে উন্নীত হলে যে সকল প্রক্রিয়ায় এই অণুর উদ্বৃত্ত শক্তি বিনষ্ট হয়, অর্থাৎ বিকিরণ নিঃসরণ করে অণুটি নিম্নস্তরে ফিরে আসে, প্রতিপ্রভা সেগুলির অন্যতম। ধরে নেওয়া যাক, একটি অণু ইলেকট্রনিক শক্তির দ্বারা উত্তেজিত হয়ে কোনও উচ্চতর স্পন্দিত অবস্থায় আছে। এই অণুর উদ্বৃত্ত স্পন্দনশক্তি অণুগুলির মধ্যে পারস্পরিক সংঘর্ষে বিনষ্ট হয় ও প্রতিপ্রভা বর্ণালীর সৃষ্টি হয়। রামন বর্ণালীর সঙ্গে প্রতিপ্রভা বর্ণালীর পার্থক্য এই যে, শেষোক্ত প্রক্রিয়ায় অণুটি বিকিরণ শোষণ করে ও একটি উত্তেজিত ইলেকট্রনিক শক্তিস্তরের সৃষ্টি হয়। রামন বর্ণালীতে বিকিরণ থেকে শক্তি কেবল অণুতে স্থানান্তরিত হয়, কোনও উত্তেজিত ইলেকট্রনিক অবস্থার সৃষ্টি হয় না—রামন বর্ণালী যে কোনও কম্পাঙ্কের আপতিত বিকিরণের জন্যে দেখতে পাওয়া যায়, কারণ এটি একটি আলোক বিচ্ছুরণ (Light scattering) প্রক্রিয়া; কিন্তু প্রতিপ্রভা ঘটতে পারে কেবল সেই সব কম্পাঙ্কে, যে সব কম্পাঙ্কের বিকিরণ শোষণ করে অণুটি উচ্চতর ইলেকট্রনিক স্তরে উন্নীত হয়।

রামনের আবিষ্কার ও রসায়ন-বিজ্ঞানে তার প্রয়োগ

প্রিয়দারঞ্জন রায়

অধ্যাপক রামনের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ঘটে 1919-20 সালে, আমি যখন বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান কলেজে অধ্যাপনা করি। তিনি তখন সবেমাত্র ঐ কলেজের পদার্থ-বিজ্ঞান বিভাগে পালিত অধ্যাপক নিযুক্ত হয়েছেন। কিন্তু তাঁর গবেষণার কাজ চলত বহুবাজারে ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার প্রতিষ্ঠিত ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর কালটিভেশন অফ সায়েন্স-এর পরীক্ষাগারে। এই প্রতিষ্ঠানের সংলগ্ন একটি ভাড়াটে বাড়িতে তিনি তখন বাসা নিয়েছিলেন। ঐ সময়ে আমারও বাসা ছিল তারই খুব নিকটে।

একথা হয়তো সবাই জানেন, ডক্টর রামন প্রথমে অ্যাকাউন্টেন্ট জেনারেল অফিসে উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন এবং অদূর ভবিষ্যতে তাঁর অ্যাকাউন্টেন্ট জেনারেল হবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ছিল। পালিত অধ্যাপক নিযুক্ত হবার আগেও তিনি বহুবাজারের অ্যাসোসিয়েশনে অবসর সময়ে বিজ্ঞান গবেষণায় গভীরভাবে নিমগ্ন থাকতেন। বৈজ্ঞানিক সত্যান্বেষণের গভীর আগ্রহে তিনি লোভনীয় সরকারী কাজ পরিত্যাগ করে অল্প বেতনে পালিত অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। তখন তিনি মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ. ডিগ্রীধারী পদার্থ-বিজ্ঞানের একজন কৃতী গবেষক মাত্র। ঐ বয়সেই তিনি তাঁর গবেষণায় মৌলিকত্বের পরিচয় দেন। ঐ সময়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন স্বনামধন্য আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। তাঁর গুণগ্রাহিতা ও উপযুক্ত ব্যক্তি নির্বাচনের অসাধারণ ক্ষমতা ছিল সুবিদিত। তাই তিনি রামনকে পালিত অধ্যাপক হিসাবে নিযুক্ত করায় অনেকে প্রথমে বিস্মিত হয়েছিলেন। কিন্তু নির্বাচনের পরিণাম কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে যে কত বড় গৌরবের বিষয় হয়েছে, সে কথা বলা বাহুল্য।

অধ্যাপক রামন প্রত্যহ সন্ধ্যাবেলায়, অনেক সময় প্রত্যুষেও গড়ের মাঠে হেঁটে বেড়াতে যেতেন। প্রায়ই খালি পায়ে ও নিজের মাদ্রাজী পোষাকে তাঁর চলাফেরার অভ্যাস ছিল। আমিও প্রায় সন্ধ্যায় ময়দানে বেড়াতে যেতাম—অনেক সময় তাঁর সঙ্গে। বৈজ্ঞানিক সত্য সন্ধানে তাঁর যে কি গভীর নিষ্ঠা ও একাগ্রতা, সে সময় আমি তার পরিচয় পেয়েছিলাম। বহুবাজার থেকে ময়দানে যাবার সময় সারা পথে তিনি তাঁর তৎকালীন গবেষণার বিষয় আমাকে বোঝাতে চেষ্টা করতেন। তাতে তাঁর কি অপূর্ব উৎসাহ ও আত্মবিস্ফোরণ আমি লক্ষ্য করেছি, তা বলবার নয়! সারা জীবন বিজ্ঞানের সাধনায় তাঁর এই ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও অবিচলিত একাগ্রতা তিনি সম্পূর্ণ রক্ষা করে গেছেন অনন্যমনা হয়ে। রাজ্য সরকারের সম্মান বা উচ্চপদের প্রলোভন, ক্ষমতা বা অর্থের মোহ তাঁকে বিজ্ঞানের পথ থেকে বিচলিত করতে পারে নি। এরূপ সম্পূর্ণভাবে বিজ্ঞানের সাধনা, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আত্মসমর্পিত জীবনযাপনের দৃষ্টান্ত আমাদের দেশের আধুনিক বিজ্ঞানের ইতিহাসে বিরল বললে অত্যুক্তি হবে না।

তাঁর দীর্ঘ জীবনব্যাপী পদার্থ-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় গবেষণার বিবরণ দেবার অধিকার আমি দাবী করতে পারি না। তাই বর্তমান প্রবন্ধে রামনের আবিষ্কার ও আণবিক গঠন নির্ণয়ে তাঁর অবদান সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলবার অভিপ্রায় করছি।

একথা হয়তো কারো অজানা নয় যে, রামনের পরীক্ষা ও তার প্রয়োগ বিজ্ঞানের ইতিহাসে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এর ফলে অধ্যাপক রামন নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। বিজ্ঞানের বহু শাখায় ব্যাপকভাবে এর প্রয়োগ দেখা যায়। এখন আমরা এসম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনায় অগ্রসর হবো।

রামনের আবিষ্কার বিশ্বের বিজ্ঞানী মহলে রামন প্রক্রিয়া-ফল (Raman Effect) নামে অভিহিত। যাবতীয় বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের মত রামনের আবিষ্কারেরও একটি ইতিহাস আছে। মার্কিন বিজ্ঞানী অধ্যাপক এ. এইচ. কম্পটন (A. H. Compton) 1919-20 সালে কোন নির্দিষ্ট তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের বা কম্পনসংখ্যার রঞ্জেন-রশ্মি (X-rays) জড় বস্তুর মাধ্যমে পরিচালিত করে দেখতে পান যে, তাথেকে বহির্গত তরঙ্গ-রশ্মির কয়েকটির তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের বৃদ্ধি বা তাদের কম্পনসংখ্যার হ্রাস ঘটেছে। একথা তখন জানা ছিল যে, জড় পরমাণুর সঙ্গে রঞ্জেন রশ্মির সংঘাতের ফলে তাথেকে ইলেকট্রন বিচ্ছিন্ন অবস্থায় বিকীর্ণ হয়। তিনি আরও দেখলেন যে, ঐ বিকীর্ণ ইলেকট্রনের গতিশক্তির পরিমাণ রঞ্জেন রশ্মির কম্পনসংখ্যার হ্রাসজনিত শক্তির পরিমাণের সঙ্গে হুবহু মিলে যায়। রঞ্জেন রশ্মি যে কণিকা ধর্ম গ্রহণ করতে পারে—কম্পটনের এই পরীক্ষা হলো তার প্রমাণ। কারণ দুটি জড় কণিকার সংঘাত ঘটলে তাদের শক্তিসমষ্টির কোন ব্যতিক্রম হয় না। একটি শক্তি যে পরিমাণে বাড়ে, অন্যটির শক্তি ঠিক সে পরিমাণে কমে যায়। এই আবিষ্কারকে কম্পটন প্রক্রিয়া-ফল (Compton Effect) বলা হয়। এই আবিষ্কারের জন্যে তিনি নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

কম্পটনের আবিষ্কারের বিবরণী পাঠ করে অধ্যাপক রামন কল্পনা করলেন যে, হয়তো দৃশ্য আলোকের বেলায়ও অনুরূপ ঘটনা ঘটতে পারে। এই সিদ্ধান্ত করেই তিনি তাঁর গবেষণা সুরু করেন। বহুবাজারে ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের পরীক্ষাগারে একটি অতি সেকেলে বর্ণালী-বীক্ষণ যন্ত্র (Spectroscope) নিয়ে কৃষ্ণান প্রমুখ ছাত্রদের সঙ্গে তিনি পরীক্ষায় নিমগ্ন হন। কোন নির্দিষ্ট তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের বা কম্পনসংখ্যার দৃশ্য আলোক-তরঙ্গ বিবিধ স্বচ্ছ জড় পদার্থের মাধ্যমে পরিচালিত করে তার কম্পনসংখ্যা তিনি পরিমাপ করতে আরম্ভ করেন। গোড়াতে জৈব তরল পদার্থ, যথা—সুরাসার, গ্লিসারিন ইত্যাদি নিয়ে তিনি পরীক্ষা করেন। পরবর্তী কালে বরফ, অতি-স্বচ্ছ কাচ—এমন কি, অবশেষে হীরকখণ্ডও তিনি এই পরীক্ষায় ব্যবহার করেন। পরীক্ষার ফলে তিনি দেখতে পান, কম্পটনের পরীক্ষার অনুরূপ উদ্ভাসী দৃশ্য আলোক-তরঙ্গের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি বা কম্পন-সংখ্যার হ্রাস ঘটে। কিন্তু অনেক সময়ে দেখা যায় যে, সঙ্গে সঙ্গে উদ্ভাসী দৃশ্য আলোকরশ্মির দৈর্ঘ্যের হ্রাস বা কম্পনসংখ্যার বৃদ্ধিও ঘটে। এখানে কম্পটনের পরীক্ষার ফলের সঙ্গে রামনের পরীক্ষার ফলের প্রভেদ দেখা যায়। কারণ রঞ্জেন রশ্মি যেমন জড় কণিকা থেকে ইলেকট্রন বিচ্ছিন্ন করতে পারে, দৃশ্য আলোক রশ্মির বেলায় তা সাধারণতঃ সম্ভব নয়। এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে, জড়াণুর সঙ্গে আলোক-তরঙ্গের সংঘাতে তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য যে বদ্‌লে যেতে পারে, তার গাণিতিক ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন জার্মান বিজ্ঞানী স্মেকেল (Smekel) 1923 সালে। অধ্যাপক রামনের পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয় 1928 সালে।

গোড়াতে এই পরীক্ষার ফলের ব্যাখ্যা নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে নানা মতবাদের সৃষ্টি হয়। পরিশেষে বহুবিধ গবেষণার ফলে এই সিদ্ধান্ত হলো যে, জড়াণুর আভ্যন্তরীণ স্বকম্পন বা স্বতঃস্পন্দনের সঙ্গে উদ্ভাসী আলোক রশ্মির শক্তি বিনিময় ঘটে। একারণে উদ্ভাসী আলোক রশ্মির কম্পন সংখ্যার হ্রাস ও অবস্থাবিশেষে বৃদ্ধিও ঘটতে

পারে। প্রত্যেক জড়াণুর অন্তর্নিহিত কতকগুলি নির্দিষ্ট স্বাভাবিক কম্পনসংখ্যা থাকে। যে ক্ষেত্রে জড়াণুর কোন নির্দিষ্ট প্রকম্পন শক্তি থেকে উদ্ভাসী আলোক রশ্মি শক্তি গ্রহণ করে, সে অবস্থায় অন্তর্নিহিত কম্পনসংখ্যার খবর পাওয়া যায়। এসব অণুনিহিত কম্পনসংখ্যা জড়াণুর মধ্যে পরমাণুর গঠনবৈশিষ্ট্যের খবর দিতে পারে। একারণে রসায়ন-বিজ্ঞানে রামনের আবিষ্কারের
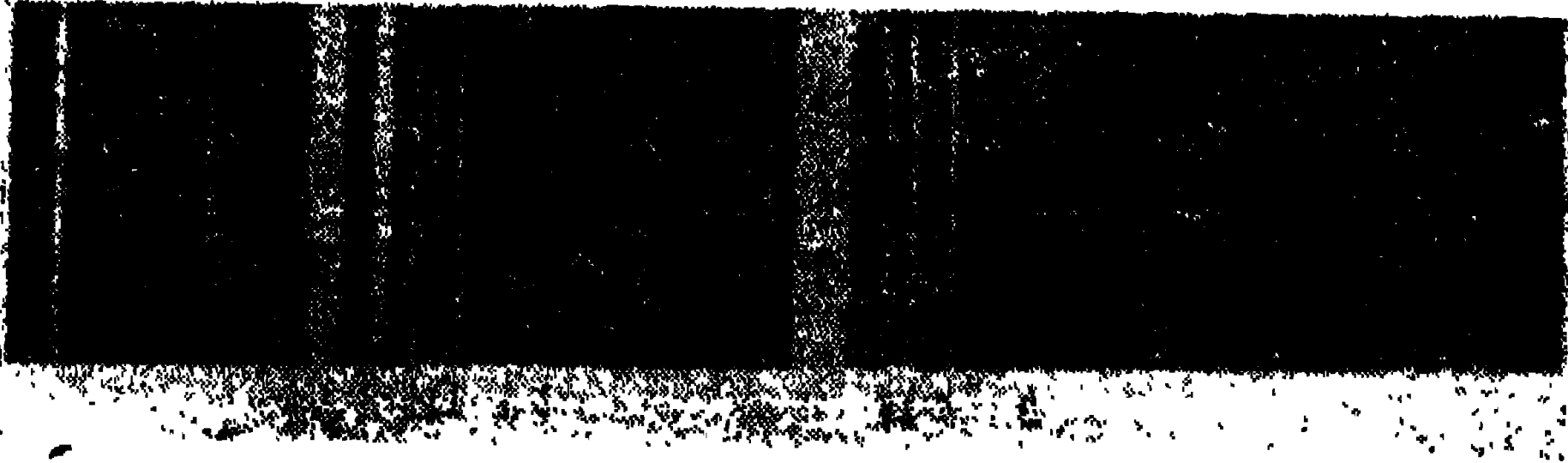
1নং চিত্র

আলোকদীপ্ত কার্বন টেট্রাক্লোরাইডের রামন বর্ণালী

ক

খ

2নং চিত্র

সুরাসারের (নির্জল কোহল) রামন বর্ণালী

(ক) ফিলটার সহিত (খ) ফিলটার ব্যতীত

তার কম্পনসংখ্যা বেড়ে যায়। আবার যে ক্ষেত্রে উদ্ভাসী আলোক রশ্মির শক্তি গ্রহণ করে জড়াণুর অন্তর্নিহিত কোন স্বাভাবিক কম্পনসংখ্যা উচ্চতর স্তরে উন্নীত হয়, সে অবস্থায় উদ্ভাসী আলোক-রশ্মির কম্পনসংখ্যা কমে যায়। এ থেকে অণুর বহুল প্রয়োগ দেখা যায়। আণবিক গঠন, যোজনসংখ্যা ও যোজনশক্তির পরিমাণ এথেকে নির্ধারিত হয়। রামনের পরীক্ষায় পরিবর্তিত আলোক রশ্মিকে রামন রশ্মি বলা হয়।

একথা বলা বাহুল্য, কম্পটনের পরীক্ষার মত

এক্ষেত্রেও দৃশ্য আলোক রশ্মির অধিকাংশই অপরিবর্তিত অবস্থায় জড়বস্তুর মাধ্যম থেকে বেরিয়ে আসে, শুধু অল্প কয়েকটি জড়াণুর স্বাভাবিক স্বকম্পনের সঙ্গে শক্তি বিনিময় করবার সুযোগ পায়। ফলে দেখা যায়, রামন প্রক্রিয়ার বর্ণালী-চিত্রে অবস্থাবিশেষে একটি গাঢ় উদ্ভাসী আলোক রশ্মির কম্পনসংখ্যার রেখার দক্ষিণে বা বামে কিংবা উভয় পার্শ্বে একটি ক্ষীণ রেখা ফুটে উঠেছে। কখনও কখন উদ্ভাসী আলোক রশ্মির কম্পন-সংখ্যার রেখার উভয় পার্শ্বে দুটি ক্ষীণ রেখাও দেখা যায়। 1 ও 2নং চিত্রে কার্বন টেট্রাক্লোরাইড এবং সুরাসারের রামন প্রক্রিয়া-ফলের বর্ণালী দেখানো হয়েছে।

রামন প্রক্রিয়া-ফলের প্রয়োগের সহজ দৃষ্টান্ত দিলে সাধারণের পক্ষে বিষয়টি বোঝবার সুবিধা হবে।

(1) গন্ধক (Sulfur) পোড়ালে গন্ধক পরমাণুর সঙ্গে বাতাসের অক্সিজেন পরমাণুর সংযোগ ঘটে একটি তীব্র গন্ধক-গ্যাস সৃষ্টি হয়। তাকে বলা হয় সালফার ডাইঅক্সাইড (SO_2)। এই গ্যাসের প্রত্যেক অণুতে একটি গন্ধক-পরমাণুর সঙ্গে দুটি অক্সিজেন-পরমাণু সংযুক্ত থাকে। এখন এই তিনটি অণুকে সরল রেখায় সাজানো যায়:

$$O=S=O$$

অথবা V-এর আকারে সাজানো যায়

$$\begin{array}{ccc} O & & O \\ & \backslash\!\backslash \; /\!/ & \\ & S & \end{array}$$
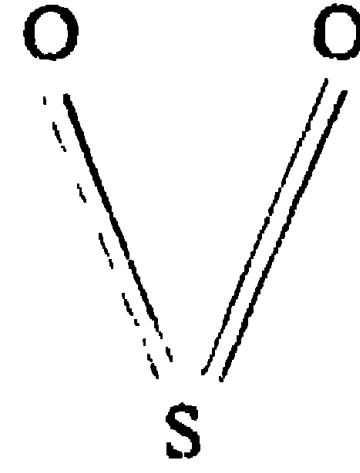
এই দুটি গঠনের মধ্যে কোন্‌টি ঠিক, তার সত্যতা নিরূপণ করা যায় রামন প্রক্রিয়া-ফলের বিচারে। V-এর আকারে গঠিত অণুটির তিনটি স্বকম্পন সম্ভব। রামন প্রক্রিয়া-ফলে এই তিনটি স্বকম্পনই ধরা পড়ে। সুতরাং বলা যায় যে, SO_2 অণুর গঠন V-আকারের। (2) কার্বন মনোক্সাইডের (CO) অণুতে একটি কার্বন (C) পরমাণুর সঙ্গে একটি অক্সিজেন-পরমাণু (O) যুক্ত থাকে। উভয়ের মধ্যে যোজন-সংখ্যা পূর্বে একক সংখ্যার দ্বিগুণ বলে মনে করা হতো, অর্থাৎ অণুর গঠন লেখা হতো $C=O$। রামনের পরীক্ষায় দেখা গেল, এর যোজন-শক্তি অন্যান্য জৈব পদার্থের $C-O$-এর স্বাভাবিক কম্পন-শক্তির দেড় গুণ। সুতরাং কার্বন মনোক্সাইড অণুর কার্বন ও অক্সিজেন পরমাণুর মধ্যে যোজন-সংখ্যা হলো 3। অতএব তার গঠন হলো $C\equiv O$। এই তথ্য অন্যান্য পরীক্ষার ফলেও সমর্থিত হয়েছে।

পদার্থবিদ্যার বিভিন্ন শাখায় অধ্যাপক রামনের অবদান

ব্রহ্মানন্দ দাশগুপ্ত*

রামন এফেক্ট আবিষ্কারের জন্য অধ্যাপক চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রামনের নাম সুপরিচিত। পত্রিকার বর্তমান সংখ্যায় অন্যত্র ঐ এফেক্টের বিষয় বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে। ঐ বিষয় ছাড়াও পদার্থবিদ্যার বিভিন্ন শাখায় অধ্যাপক রামন গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক গবেষণা করিয়াছিলেন। বর্তমান প্রবন্ধে সেই সব গবেষণার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিবার চেষ্টা করা হইবে। 1938 সাল পর্যন্ত তাঁর গবেষণার পর্যালোচনাতেই দেখা যায় যে, রামন এফেক্টের আবিষ্কার ও তৎসম্পর্কে পরীক্ষাদি ছাড়া তিনি প্রায় 14টি বিভিন্ন বিষয়ে নিজে প্রায় একশত পঁচিশটি গবেষণা-পত্র প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার ছাত্রেরা সেই সময়ে প্রায় চারি শত গবেষণা-পত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন।

রামনের প্রথম গবেষণা-নিবন্ধ 1906 সালে ইংল্যাণ্ডের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গবেষণা-পত্রিকা 'দি ফিলোসফিক্যাল ম্যাগাজিন'-এ প্রকাশিত হয়। এই নিবন্ধে তিনি ত্রিকোণ কাচ ফলকের উপর অতি তির্যকভাবে প্রতিফলিত আলোক রশ্মিতে অসম ব্যবর্তন স্তবক (Diffraction band) পর্যবেক্ষণের কথা প্রকাশ করেন। মাদ্রাজে প্রেসিডেন্সী কলেজে এম. এ. ক্লাসের ছাত্র থাকা অবস্থাতেই তিনি মৌলিক গবেষণা-কার্য আরম্ভ করিয়াছিলেন। রামনের দ্বিতীয় নিবন্ধ 1907 সালে উক্ত পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, বিষয়—The curvature method of determining surface tension of a liquid—এই নিবন্ধেই রামনের পরীক্ষা-পদ্ধতির মৌলিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। এই সময়ে (1907 সাল) তাঁহার তৃতীয় গবেষণা-নিবন্ধ ইংল্যাণ্ডের 'নেচার' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, New-ton's ring in polarised light.

1907 সালে রামন কিঞ্চিদধিক অষ্টাদশ বর্ষ বয়সে কলিকাতায় Assistant Accountant General-এর পদ গ্রহণ করেন। এই সময় হইতে 1917 সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যা বিভাগে পালিত অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করিবার পূর্ব পর্যন্ত রামন প্রধানতঃ শব্দ-বিজ্ঞান, বাদ্যযন্ত্রের শব্দতত্ত্ব ও আলোর তরঙ্গ-ধর্মের উপর গবেষণা করেন। 1909 সালে নেচার, ফিলোসফিক্যাল ম্যাগাজিন এবং ফিজিক্যাল রিভিয়ু পত্রিকায় তাঁহার বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। 1918 সালে প্রকাশিত 'বুলেটিন অব দি ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েসন ফর দি কালটিভেসন অব সায়েন্স'-এ তিনি বিস্তৃতভাবে বেহালা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের তারের কম্পনতত্ত্ব ও পরীক্ষালব্ধ প্রমাণ প্রকাশ করেন। এই প্রসঙ্গে বেহালার ছড়ের (Bow) দ্বারা পরিচালিত বিন্দুর (Bowed point) গতি, সোয়ারির (Bridge) অবস্থানের সঙ্গে তার ও বেহালার প্রধান অংশের কম্পনের সংযোজন (Coupling) প্রভৃতি বিষয়ে মৌলিক গবেষণা করেন। ধারাবাহিকতাহীন তরঙ্গ-গতি (Dis-continuous wave motion) সম্পর্কে বিস্তারিত গবেষণা 1917 সালে ফিলোসফিক্যাল ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়। 1927 সালে তিনি 'Handbuch der physik'-এ প্রকাশের জন্য বাদ্যযন্ত্রের শব্দ তত্ত্বের উপর প্রবন্ধ রচনা করেন।

---

* সাহা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, কলিকাতা-9

1917 সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করিবার পর অধ্যাপক রামন পদার্থবিদ্যার অন্যান্য বহু শাখায় গবেষণায় মনোনিবেশ করেন। এই সময় হইতেই তিনি পদার্থের অণুসমূহ কর্তৃক আলোক বিচ্ছুরণ (Scattering) তত্ত্বে আকৃষ্ট হন।

1919 সালে অধ্যাপক রামন 'নেচার' পত্রিকায় The Doppler effect in Molecular Scattering of radiation শীর্ষক গবেষণা-পত্র প্রকাশ করেন। 1921 সালে নেচার পত্রিকায় The colour of the sea নামক আণবিক বিচ্ছুরণ সংক্রান্ত দ্বিতীয় পত্র প্রকাশিত হয়। এই পত্রে তিনি সমুদ্র জলের নীল রঙের কারণ সম্পর্কিত কয়েকটি পরীক্ষার উল্লেখ করেন। লর্ড র‍্যালে সমুদ্র-জলে নীল আকাশের প্রতিফলনকে সমুদ্রের নীল রঙের কারণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন। রামন দেখাইলেন যে, ভূমধ্যসাগর এবং লোহিত সাগরের জল লইয়া পরীক্ষা করিবার সময় সমুদ্র-জলে আকাশের নীল আলোর প্রতিফলন বন্ধ রাখিলে সমুদ্র-জলের নীল বর্ণ হ্রাস পায় না, বরঞ্চ উজ্জ্বলতর হইয়া ওঠে। ইহার কারণ হিসাবে তিনি বলেন সমুদ্র-জলের মধ্য দিয়ে আলোর গতি-পথে আলোক বিচ্ছুরিত হয় এবং জলের অণু-সমূহ এই বিচ্ছুরণ ঘটায়।

আলোকের আণবিক বিচ্ছুরণের সাহায্যে কেলাসের অভ্যন্তরস্থ অণুসমূহের তাপচাঞ্চল্য পর্যবেক্ষণ সম্পর্কিত গবেষণা-পত্র ইহার পরে প্রকাশিত হয়। অসমসত্ত্ব মাধ্যমে আলোর বিচ্ছুরণ প্রসঙ্গে তিনি আইনষ্টাইন-স্মোলুচাউসকি সূত্রের প্রয়োগ করেন। 1922 সালে 'নেচার' পত্রিকায় প্রকাশিত Diffraction by molecular structure and Quantum Structure of Light শীর্ষক পত্রে তিনি গ্যাসীয় পদার্থের সঙ্কট তাপ-মাত্রায় নিয়ে তাহা কর্তৃক আলোক বিচ্ছুরণের পরীক্ষার ফল প্রকাশ করেন এবং পরীক্ষালব্ধ ফল ও তাত্ত্বিক সূত্রগত ফলের ভিন্নতা হইতে আলোর ফোটন প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা করেন। রামনের এই আলোচনা অত্যন্ত মৌলিক চিন্তার পরিচায়ক। কম্পটন বিচ্ছুরণের তত্ত্ব তখনও প্রকাশিত হয় নাই।

বায়ুমণ্ডলের অণুসমূহ কর্তৃক বিচ্ছুরিত আলোর সমবর্তন (Polarisation) পরীক্ষা করিয়া রামন দেখিলেন যে, বিচ্ছুরিত আলো আংশিক সমবর্তিত। ইহা হইতে রামন অনুমান করিলেন যে, অণুর মধ্যে আলোক রশ্মির ক্ষেত্রে দিকসাম্যের (Isotropy) অভাব আছে। এই দিকসাম্যহীনতার উপর ভিত্তি করিয়া তিনি 1928 সালে কে. এস. কৃষ্ণানের সহিত তরল পদার্থের দ্বারা আলোক বিচ্ছুরণের বিস্তৃত তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা প্রদান করেন। আণবিক বিচ্ছুরণ সংক্রান্ত পরীক্ষাসমূহ হইতেই 1928 সালে রামন এফেক্টের আবিষ্কার সম্ভব হইয়াছিল।

রামন যুগপৎ একই সময়ে পদার্থের গঠন, চৌম্বক ধর্ম এবং রঞ্জেন রশ্মির বিচ্ছুরণ সংক্রান্ত বহু গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেন। তিনি 1922 সালে 2রা ফেব্রুয়ারী নেচার পত্রিকায় অনিয়তাকার (Amorphous) কঠিন পদার্থের আণবিক গঠন ও বিন্যাস সম্পর্কিত একটি পত্র প্রকাশ করেন। অধ্যাপক রামন সে সময়ে পদার্থের গঠন ও আণবিক বিন্যাস সম্পর্কিত বহু মৌলিক সমস্যার সমাধানে সচেষ্ট ছিলেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে, 1923 সালের নেচার পত্রিকায় প্রকাশিত একটি পত্রে তিনি কেলাসিত পদার্থের তরল পদার্থে অবস্থান্তর ঘটিলে কেলাসের অণুবিন্যাস কিরূপে বিপর্যস্ত হয় এই মৌলিক প্রশ্ন উপস্থাপিত করেন এবং আলোক বিচ্ছুরণের সাহায্যে এই রহস্য উদ্‌ঘাটনের উপায় সম্পর্কে ইঙ্গিত প্রদান করেন। বিভিন্ন পদার্থের রঞ্জেন রশ্মির ব্যবর্তন (Diffraction) সম্পর্কিত পরীক্ষা 1927 সালে নেচার এবং ইণ্ডিয়ান জার্নাল অব ফিজিক্স-এ প্রকাশিত হয়।

1928 সালে ইণ্ডিয়ান জার্নাল অব ফিজিক্সে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে অধ্যাপক রামন রঞ্জেন রশ্মির কম্পটন বিচ্ছুরণের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা প্রদান করেন। এই প্রসঙ্গে কম্পটন ও ডিবাই কর্তৃক প্রদত্ত ব্যাখ্যা—ফোটনকণা ও ইলেকট্রনের সংঘাতের ফলে ফোটনের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের পরিবর্তন—তিনি গ্রহণ করেন নাই। এই প্রবন্ধে আলোকের ক্লাসিক্যাল তরঙ্গ-চিত্রই গ্রহণ করিয়াছেন।

এই সময়ে পদার্থের তিরশ্চুম্বকত্ব (Diamagnetism) এবং কেলাস গঠন সম্বন্ধেও তিনি বহুবিধ গবেষণা করেন। পরীক্ষার দ্বারা তিনি দেখাইয়াছিলেন যে, কেলাসিত অবস্থায় পদার্থের তিরশ্চুম্বকীয় গ্রাহিতা (Diamagnetic susceptibility) বেশী, তাপমাত্রার আধিক্যে কেলাসের অণুর বিন্যাস বিপর্যস্ত হয় এবং তিরশ্চুম্বকীয় গ্রাহিতা হ্রাস পায়। 1929 সালে নেচার পত্রিকায় প্রকাশিত এক পত্রে তিনি ব্যতিক্রমী তিরশ্চুম্বকতার (Anomalous diamagnetism) ব্যাখ্যা প্রদান করেন।

অধ্যাপক রামন দীর্ঘদিন ধরিয়া তীব্র বৈদ্যুতিক ও চৌম্বক ক্ষেত্রে আলোর দ্বিপ্রতিসরণ (Optical birefringence) সম্পর্কে অনুসন্ধান করেন। এই প্রসঙ্গে 1927 সালে অধ্যাপক রামন এবং কে. এস. কৃষ্ণান অ্যালিফ্যাটিক যৌগসমূহের মধ্যে Cotton-Mouton প্রভাব সম্পর্কে পরীক্ষা করেন। পদার্থের আণবিক বিন্যাস ও অণুর দিকসাম্যহীনতার (Anisotropy) উপর ভিত্তি করিয়া তিনি এবং কে. এস. কৃষ্ণান চৌম্বক ক্ষেত্র সঞ্জাত ও বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র সঞ্জাত দ্বিপ্রতিসারিত্বের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা প্রদান করেন। 1927 সালে 'প্রসিডিংস অব দি রয়েল সোসাইটি'তে তাহা প্রকাশিত হয়।

1931 সালে ইণ্ডিয়ান জার্নাল অব ফিজিক্সে রামন ভগবন্তম-এর সহযোগিতায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে ফোটনের স্পিন নির্ধারণ করিবার বিখ্যাত পরীক্ষা সম্পন্ন করেন। ইহার পরে তিনি হীরকের ভৌত ধর্ম ও তাহার মধ্যে আলোক রশ্মির গতি সম্পর্কে বিস্তৃত গবেষণা করেন। বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় না হইলেও প্রসঙ্গতঃ বলা চলে যে, তিনি জীবনের শেষ ভাগে দৃষ্টি, চোখে বিভিন্ন বর্ণের অনুভূতি প্রভৃতি শারীরতত্ত্ব বিষয় সংক্রান্ত গবেষণায় ব্যাপৃত ছিলেন।

অধ্যাপক রামন প্রসঙ্গে

প্রভাসচন্দ্র কর*

সিটি কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ৺জিতেন্দ্রনাথ সেন এক সময়ে ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার প্রতিষ্ঠিত বহুবাজারের ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অব সায়েন্স-এর গবেষণাগারে পদার্থ-বিজ্ঞান বিভাগে অধ্যাপক রামনের অন্যতম সহকর্মী ছিলেন। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতার পত্র মাধ্যমে অধ্যাপক রামনের সঙ্গে সামান্য পরিচিত হবার সৌভাগ্য আমার হয়। তারই পরিপ্রেক্ষিতে অধ্যাপক রামনের মানবতা ও আদর্শের কয়েকটি দিকে তুলে ধরার উদ্দেশ্যে এই নিবন্ধের অবতারণা।

নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্তিতে প্রতিক্রিয়া

1930 সালে নোবেল পুরস্কার লাভের খবর যিনি সর্বপ্রথম অধ্যাপক রামনকে জানান, তিনি হচ্ছেন রয়টারের কলকাতা কার্যালয়ের শ্রীকালিপদ বিশ্বাস। এই প্রসঙ্গে শ্রীবিশ্বাস 2রা ডিসেম্বর (1970) Amrita Bazar Patrika যা লিখেছেন, তাথেকে জানা যায় (বঙ্গানুবাদ)—'1930-এ যখন অধ্যাপক রামন পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার পেলেন, তখন আমি রয়টার এবং অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস অফ ইণ্ডিয়ার কলকাতা কার্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। এজেন্সির কর্মকর্তা মিঃ টার্নার তখন ঘটনাচক্রে কলকাতায় ছিলেন। মিঃ টার্নার আমার উপর ভার দিলেন বহুবাজার ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অফ সায়েন্স-এর প্রধান কেন্দ্রে (এখন যেখানে গোয়েঙ্কা কলেজ অফ কমার্স) রয়টারের টেলিগ্রামের নকল নিয়ে অধ্যাপক রামনের সঙ্গে দেখা করতে। এই টেলিগ্রামে ঘোষণা করা হয়েছিল—কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালিত অধ্যাপক রামনকে পদার্থ-বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে। তখন এই অ্যাসোসিয়েশনেই অধ্যাপক রামন থাকতেন। সমগ্র দৃশ্যটির প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি আমার মনে রয়েছে। বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পাগড়ীপরিহিত অধ্যাপক রামন এই সংবাদ শুনে চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে বন্দেমাতরম বলে আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।'

অধ্যাপক রামন ও কলকাতা

অধ্যাপক রামনের ঘটনাবহুল জীবনের এক বিরাট অংশ অতিবাহিত হয়েছিল কলকাতায় বাঙালী জীবনের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল নিবিড়। রবীন্দ্রনাথের সপ্ততি বৎসর পূর্তি উপলক্ষে কলকাতা ও বাংলা দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের যে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছিল, তাতে স্বাক্ষরকারীদের অন্যতম ছিলেন অধ্যাপক সি. ভি. রামন। তাঁর স্বাক্ষরের আর একটি বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, সেটি ছিল তাঁর মাতৃভাষার অক্ষরে।

কলকাতা মহানগরীর প্রতিও তাঁর অনুরাগ কম ছিল না। তিনি বলতেন, 'মহানগরীগুলি বিদ্যা ও পাণ্ডিত্যের সহায়ক পারিপার্শ্বিকতা সৃষ্টি করে না। পৃথিবীতে শুধু দুটি মহানগরী আছে, যেখানে কৃষ্টি ও বিদ্যাচর্চা যথাযথভাবে চলতে পারে। এক প্যারিস ও দুই কলকাতা।'

[প্রবাসী, পৌষ, 77]

ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের বহুবাজারের

---

* বঙ্গলক্ষ্মী সোপ ওয়ার্কস প্রাঃ লিঃ, কলিকাতা-5.

গবেষণাগারের সঙ্গে প্রথম জীবন থেকে অধ্যাপক রামনের নিরবচ্ছিন্ন সম্পর্ক ছিল। 1950 সালে যখন এই সংস্থা যাদবপুরে নতুন ভবনে স্থানান্তরিত হলো, সেই থেকে তিনি এর সঙ্গে সকল সংস্রব ত্যাগ করেন। এই প্রসঙ্গে Statesman পত্রিকা (নভেম্বর 22, 1970) লেখেন, 'হয়তো অধ্যাপক রামনের এই আচরণ কম আশ্চর্যজনক মনে হবে, যদি আমরা চিন্তা করে দেখি, এই বহুবাজারের ষ্ট্রীটের বাড়িতেই তিনি 'রামন এফেক্ট' সংক্রান্ত গবেষণা করেন এবং এই রামন এফেক্ট তাঁকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ও নোবেল পুরস্কার এনে দিয়েছিল।' কলকাতায় অবস্থানের সময় তিনি শুধু বিজ্ঞান গবেষণায় ব্যাপৃত থাকেন নি। যত দূর জানি, চৈতন্য লাইব্রেরী, ওরিয়েন্টাল সেমিনারী, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের বিশেষ অনুষ্ঠান উপলক্ষে তিনি সানন্দে উপস্থিত হতেন।

কলকাতার সঙ্গে অধ্যাপক রামনের নিবিড় সম্পর্ক ছিল। Amrita Bazar Patrika-য় (ডিসেম্বর 2, 1970) শ্রীকালিপদ বিশ্বাস লিখেছেন, 'আমার বেশ মনে আছে, ব্যাঙ্গালোরে তাঁর (রামনের) কর্মকেন্দ্র স্থানান্তরিত করবার কয়েক বছর পরে তিনি একবার কলকাতায় এসেছিলেন। তিনি সে দিন বৃটিশ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীটের বড় রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। Statesman-এর শ্রী কে. সি. ঘোষ ও আমি সেই মুহূর্তে কাছে ছিলাম। আমরা তাঁকে দেখামাত্র তাঁর কাছে ছুটে গেলাম। তিনি থামলেন এবং আগেকার মত আমাদের সম্ভাষণ জানিয়ে অন্যান্য সহকর্মীদের বিষয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন।'

বিদ্বজ্জনের প্রতি শ্রদ্ধা ও তাঁদের সান্নিধ্য

সমসাময়িক মনীষীদের প্রতি অধ্যাপক রামনের অপরিসীম শ্রদ্ধা ছিল। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় শ্রদ্ধার কথা সুবিদিত। রবীন্দ্রনাথ ও বাংলা ভাষা সম্পর্কে তাঁর মনোভাব ছিল উদার। এই বিষয়ে তিনি যা লিখে গেছেন, তা পরিপাটী শব্দচয়ন, ভাষার লালিত্য ও বর্ণনা-নৈপুণ্যের এক সুন্দর নজীর: 'মানুষের উপভাষাগুলি অগণিত হওয়ায় সঠিক বিজ্ঞানগুলির ক্ষেত্রেও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যথোচিত গুণের কদরে বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়। সামান্য জ্ঞান একটা বিজ্ঞানাশ্রয়ী গবেষণায় ভাষা প্রবহমান রাখতে অনেক দূর সুগম হওয়া সত্ত্বেও এই রকম বাধা দেখা যায়। হাস্যকৌতুক অথবা গভীর অনুভূতির প্রকাশ অথবা সাহিত্যিক গুণাগুণের মূল্যায়ণ একটা স্বতন্ত্র ব্যাপার। শুধু তথ্য পরিবেশনে বিজ্ঞান ভাষা ব্যবহার করে। শব্দরাজি দিয়ে সাহিত্য একটা পোশাক তৈরি করে—যা মানুষের ভাবের অতি সূক্ষ্ম তাকে অর্ধেক ঢেকে রাখে এবং অর্ধেকটা প্রকাশ করে। এটা অনুধাবন করা যাচ্ছে যে, সাহিত্যিক কৃষ্টির ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পূর্ণ আলাদা ভিত্তির উপর খাড়া রয়েছে। এটা অবিশ্বাস্য যে, একটা বড় রকমের বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়া একটা দেশে আজকে হতে পারলে জগতের অন্য অংশে দীর্ঘকাল অজ্ঞাত থাকবে। কিন্তু একজন অতি বিদ্বান অথবা বড় দার্শনিকের ক্ষেত্রে এটা সম্পূর্ণরূপে সম্ভব। তাঁর নিজের দেশের বাইরে একেবারে অজ্ঞাত থাকা সম্ভব। পূর্ণ এক হাজার বছর পর্যন্ত কালিদাস অথবা শঙ্করাচার্য সম্বন্ধে ইউরোপ একেবারে কিছুই জানতো না। সময় কাটাবার জন্যে যখন টেগোর (রবীন্দ্রনাথ) তাঁর গীতাঞ্জলির কবিতাগুচ্ছের কিছু অংশ ভাষান্তরিত করতে মনস্থ করেন, তখন ইউরোপ তাঁকে খুঁজে বের করেছিল। এই খুঁজে বের করবার কাজ তখন সম্পূর্ণ হলো, যখন অতি মাত্রায় সংবেদনশীল, চিরনবীন এবং সুন্দর কবিতাকে সুইডেন নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করলো। ভূষিত করলো অনুপম নৈপুণ্যকে, যা দিয়ে

তিনি (রবীন্দ্রনাথ) তাঁর কাব্যানুগ ভাবকে ইংরেজীর বাহনরূপে পাশ্চাত্যের সাহিত্যে অবতারণা করেছিলেন।

যাহোক, এটা ধরে নেওয়া অন্যায় হবে যে, টেগোরের মহান আন্তর্জাতিক খ্যাতি নির্ভর করছে শুধু তাঁর এমন রচনাবলীর উপর যেগুলি মূল বাংলা থেকে অপর ভাষাগুলিতে তাদের পথ করে নিয়েছে। এটা বলা আরও নির্ভুল হবে যে, তাঁর ব্যক্তিত্বের দুর্লভ আকর্ষণ এবং তাঁর মানবতার গুণাবলী মানব জাতির ভক্তি ও ভালবাসার ক্ষেত্রে উচ্চ স্থান জয় করে এনে দিয়েছে তাঁর জন্যে। তাঁর ব্যাপক পর্যটনকালে সব জায়গাতেই তিনি ব্যক্তিগত স্মৃতিগুলি পিছনে ফেলে রেখে এসেছিলেন—যেগুলিকে সাধারণতঃ পোষণ করা হয় ও যথেষ্ট মূল্য দেওয়া হয়। তাঁর সরলতা, মর্যাদা, সাহিত্য, কলা ও গানে বহুমুখী অবদান এবং যা কিছু 'সত্য, শিব ও সুন্দর' তার প্রতি সূক্ষ্ম অনুভূতি তাঁর মহত্ত্বের কয়েকটি প্রতীক।

বিশ্ব যে আজ তাঁকে জীবিত মহান মানুষদের মধ্যে অন্যতম বলে দাবী করছে, তাতে কোনই সন্দেহের অবকাশ নেই।' [রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণে বিশেষ টেলিগ্রাম]

বিদেশের সুধীসমাজেও অধ্যাপক রামনের আত্মিক সম্বন্ধ ছিল। তাঁর 'Aspects of science'-এ লেখা আছে 'আমার মত একজন বিজ্ঞানীর পক্ষে অমূল্য স্মৃতিরাজির মধ্যে যেটাকে সঞ্চিত ধনের মত জমা রেখে দিয়েছি, তা হলো স্বর্গতঃ লর্ড রাদারফোর্ড এবং পরলোকগতা মাদাম কুরীর মত বিজ্ঞানের পুরোধাদের সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয়। কোপেনহেগেনের অধ্যাপক নীলস বোর এবং লর্ড রাদারফোর্ডের ছবি ব্যাঙ্গালোরে আমার বাড়িতে সিঁড়ির মাথার সামনাসামনি টাঙানো আছে।' সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, যোগ্য পূর্বসূরী ও সমসাময়িক দিকপালের মনীষার প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিল কত গভীর।

মহাত্মা গান্ধীর প্রতিও তাঁর শ্রদ্ধা ছিল অপরিসীম। 1945 সালে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের এলাহাবাদ অধিবেশনে তিনি বলেছিলেন, 'ডাণ্ডীতে মহাত্মা গান্ধী যখন মার্চ করে এগিয়ে গেলেন, তখন তিনি জানতেন না যে, ভৌত রসায়নের একটি অতি সাধারণ পরীক্ষা তিনি করেছিলেন।'

অধ্যাপক রামন এমনই গুণগ্রাহী ছিলেন যে, দেশ-কাল-পাত্র নির্বিশেষে যোগ্য ব্যক্তি ও উপযুক্ত জিনিষের সমাদর তিনি সব সময়েই করতেন। এর প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হচ্ছে, বহুবাজারে ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার প্রতিষ্ঠিত গবেষণাগারে তাঁর সহকারী কর্মী আশু বাবু সম্বন্ধে তিনি অত্যন্ত উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন এবং খ্যাতির শিখরে উঠেও আশু বাবুর কর্মদক্ষতার প্রশংসা করতে কুণ্ঠিত হন নি।

এলাহাবাদে পৌর সংবর্ধনার প্রত্যুত্তরে

1949 সালের জানুয়ারী মাসে এলাহাবাদ পৌর সংস্থা অধ্যাপক রামনকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন। এই সংবর্ধনার প্রত্যুত্তরে তিনি যা বলেছিলেন, তা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য—

'ভারতে অ্যাকাডেমিক কেন্দ্রগুলি, পরীক্ষাগারগুলি এবং পাঠাগারসমূহকে যদি শক্তিশালী করা হয়, তাহলে পরবর্তী দশ বছরে ভারত সমগ্র জগতে সর্বপ্রধান না হলেও বিজ্ঞানের শীর্ষস্থানীয় চিন্তানায়কদের দু-তিনটির মধ্যে একটি নিশ্চয়ই হয়ে উঠবে।'

দেশের যুবসমাজের উদ্দেশ্যে তিনি সে সভায় বলেন—'তাঁদের উচিত জ্ঞানের জন্যে আরও বেশী অনুসন্ধানের কাজ চালিয়ে যাওয়া। সামান্য সাফল্যে তাঁরা যেন অবশ্যই সন্তুষ্ট না থাকেন।'

এর পর 1950 সালের অক্টোবরে মহীশূরে সেন্ট্রাল ফুড টেকনোলজিক্যাল রিসার্চ ইনস্টিটিউটের উদ্বোধন উপলক্ষে এক দুর্লভ বিজ্ঞানী

সমাবেশ ঘটেছিল। এই সমাবেশে উপস্থিত হয়েছিলেন ডক্টর শান্তিস্বরূপ ভাটনাগর, ডক্টর সি. ভি. রামন, ডক্টর কে. এস. কৃষ্ণান, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, শ্রীচক্রবর্তী রাজাগোপালচারী প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবৃন্দ। অধ্যাপক রামন এই অনুষ্ঠানে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলেছিলেন—'ভারতের জনসাধারণের সকল কার্যকলাপের ক্ষেত্রে মুক্তি নির্ভর করছে বিজ্ঞান এবং একমাত্র বিজ্ঞানের উপর। দারিদ্র্যজনিত কষ্ট, অস্বাস্থ্য এবং অধঃপতন থেকে ভারতবাসীদের উদ্ধার করতে পারে শুধু বিজ্ঞানীকুল।'

অধ্যাপক রামন নিজে যা সমীচীন বলে মনে করতেন, তা প্রকাশ করতে কখনও দ্বিধা বোধ করতেন না। 1969 সালে চাঁদের বুকে মানুষের প্রথম পদার্পণ উপলক্ষে সারা বিশ্ব যখন অভিনন্দন জানিয়েছিল, অধ্যাপক রামন তখন দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এই বিরাট ব্যয়বহুল প্রচেষ্টার বিরূপ সমালোচনা করেছিলেন। তিনি এই প্রসঙ্গে বলেছিলেন—'মহাকাশে মানুষ পাঠাবার জন্যে লক্ষ লক্ষ ডলার খরচ করা একেবারে মোহগ্রস্ত পাগলামির চূড়ান্ত ছাড়া আর কিছুই নয়।...মানবজাতির পক্ষে এই রকম পাগলামিকে আমি ঘৃণা করি এবং অবজ্ঞাভরে শুধু হাসি।

বিজ্ঞানের এই ধরণের 'ব্যভিচার বৃত্তিতে' তিনি বিস্ময় প্রকাশ করেন। তবে সেই সঙ্গে একথাও তিনি জানান যে, এই বিষয়ে আমরা কিছুই করতে পারি না।

গান্ধীজী ও রামন

1936 সালের মে মাসের তৃতীয় সপ্তাহে গান্ধীজী মহীশূর রাজ্যের নন্দী পর্বতে কয়েক দিন অতিবাহিত করেন। সে সময় সুইজারল্যাণ্ডের বিশিষ্ট জীব-বিজ্ঞানী অধ্যাপক র‍্যাহম গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করতে আসেন। এই সাক্ষাতের সময় অধ্যাপক রামন ছিলেন অধ্যাপক র‍্যাহমের সঙ্গী।

গান্ধীজীর সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে অধ্যাপক র‍্যাহম তাঁকে প্রশ্ন করেন—আমরা যদি বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাসীদের এক করতে না পারি, তাহলে আমরা কি ক্রমবর্ধমান নাস্তিকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে পারি না?

অধ্যাপক রামন এতক্ষণ নীরবে তাঁদের আলোচনা শুনছিলেন। তিনি এই প্রশ্ন শুনে অধ্যাপক র‍্যাহমকে বললেন—আমি আপনার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি। ভগবান যদি সত্যই থাকেন, তাহলে ব্রহ্মাণ্ডে আমরা তাঁর অনুসন্ধান করবো। ব্রহ্মাণ্ডে তিনি যদি না থাকেন, তাহলে তাঁকে খোঁজবার কোন সার্থকতা নেই। বিভিন্ন মহলে আমাকে নাস্তিক বলে ভাবা হয়, কিন্তু আমি তা নই। জ্যোতির্বিজ্ঞান ও পদার্থ-বিজ্ঞানে যে নতুন নতুন আবিষ্কার হচ্ছে, তার মধ্য দিয়েই ভগবান আমার কাছে ক্রমশঃ প্রকাশমান।

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

রামন-বিচিত্রা

এযুগের কিশোর-কিশোরীদের কাছে আচার্য চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রামন বোধ হয় শুধুই একটি নাম—অবশ্য খ্যাতিমান নাম। এই মহৎ বিজ্ঞানীকে দেখবার বা তাঁর অপরূপ ভাষণ শোনবার সৌভাগ্য থেকে তারা বঞ্চিত হওয়ায় আমি বেদনা অনুভব করছি।

আমি তাঁকে প্রথম দেখি বোধহয় 1926 সালে। যখন আমাদের কলেজে আসেন একটি বক্তৃতা দিতে, তাঁর দীর্ঘ সুসমঞ্জস দেহ, আশ্চর্য প্রতিভাদীপ্ত চোখ, প্রশস্ত ললাট, দৃপ্ত সতেজ ভঙ্গী এবং সর্বোপরি তাঁর অপূর্ব প্রাঞ্জল এবং সরস বাক্‌বৈদগ্ধ্য আমাকে অদ্ভুতভাবে বিস্মিত করেছিল। সেই বিস্ময় এতকাল পরেও আমি কাটিয়ে উঠতে পারি নি। এর পর 1927 সাল থেকে 1929 সাল পর্যন্ত দু-বছর তাঁর কাছে পড়বার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। এদেশের শীর্ষস্থানীয় বহু বিজ্ঞানী, খ্যাতনামা বক্তা ও বিদেশের কয়েকজন স্বনামধন্য বিজ্ঞানীর ভাষণ শোনবার সুযোগ আমার হয়েছে; কিন্তু আচার্য রামনের বাগ্মিতার কাছাকাছি কাউকে পৌঁছুতে দেখি নি। তাঁর সাধারণবোধ্য লেখার সঙ্গে যারা পরিচিত হতে ইচ্ছুক, তারা রামনের 'অ্যাসপেক্টস্ অফ সায়েন্স'-এর বাংলা অনুবাদ 'বিজ্ঞান-বিচিত্রা'[1] পড়ে দেখতে পারে। ইংরেজী বইটি পাওয়া যায় না।

গত বছরের 21শে নভেম্বর (1970) 82 বছর বয়সে ব্যাঙ্গালোরে তাঁর নিজস্ব গবেষণা কেন্দ্র রামন রিসার্চ ইনস্টিটিউটের ভবনে তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। রামনের মৃত্যুতে

ভারতের একমাত্র এবং এশিয়ার প্রথম নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত বিজ্ঞানীকে আমরা হারালাম। রামনের বিজ্ঞান-কৃতি সম্পর্কে এখানে আমি বিশেষ কিছু বলতে চাই না, কারণ তা নানা পত্র-পত্রিকায় বহু প্রবন্ধে ও নিবন্ধে আলোচিত হয়েছে। শুধু এইটুকু বললেই বোধহয় যথেষ্ট হবে যে, সুর এবং বর্ণ তাঁকে সবচেয়ে বেশী অভিভূত করেছিল। গবেষণার প্রথম দিকে তিনি কাজ করেছেন সঙ্গীত-যন্ত্র নিয়ে এবং পরে আকাশ ও সমুদ্রের রং সম্বন্ধে। তাঁর আবিষ্কৃত রামন এফেক্ট আলোর বিচ্ছুরণ ও বর্ণ পরিবর্তন সম্পর্কে। পরে মণি-মাণিক্য, ফুল, কীট-পতঙ্গ, পাখীর পালকের বর্ণসুষমা তাঁর কৌতূহল উদ্রিক্ত করে এবং বর্ণের বৈচিত্র্য থেকে আসে বর্ণের অনুভূতি সম্পর্কে গবেষণা। বর্ণানুভূতির শারীরবিজ্ঞান সম্পর্কে তিনি উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন। তাঁর খ্যাতির অক্ষয়-স্তম্ভ অবশ্যই রামন এফেক্ট। 1928 সালে কলকাতার সায়েন্স কলেজে একটি বক্তৃতায় রামন এফেক্টের বিবরণ ঘোষণা করেন। এই বক্তৃতার পর সহপাঠীদের সঙ্গে এই বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে আমি বলেছিলাম যে, এবার অধ্যাপক রামনের জন্যে নোবেল পুরস্কার নির্দিষ্ট হচ্ছে। এই কথা বলবার জন্যে সতীর্থদের যথেষ্ট ব্যঙ্গ আমাকে সহ্য করতে হয়েছিল। তবে সুখের বিষয়, বেশী দিন নয়। রামনের গবেষণার মান সম্পর্কে কোন সন্দেহ আমার সহপাঠীদের মধ্যে হয়তো ছিল না, কিন্তু কোনও ভারতীয়ের পক্ষে বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পাওয়া যে সম্ভব, এ ছিল তাদের পক্ষে অচিন্তনীয়। আমি জানি না, আমার কোন সতীর্থের নজরে এই লেখা পড়বে কি না। রামন এফেক্টের জন্যে রামনের নাম বিজ্ঞানে অমর হয়ে থাকবে।

রামন এফেক্ট সম্পর্কে একটি মজার ঘটনা মনে পড়লো। 1939 সালে কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে দার্জিলিং বেড়াতে গিয়েছি। সেখানে পথে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হলো। আমার সঙ্গীদের একজনের সঙ্গে তাঁর সামান্য পরিচয় ছিল। সাজ-পোশাক, হাবভাবে বোঝা যায় ভদ্রলোক বিত্তবান, সুতরাং সব বিষয়ে মত প্রকাশ করবার অধিকার তাঁর সাধারণের চেয়ে একটু বেশী। তিনি আমায় প্রশ্ন করলেন, টাইগার হিলে সূর্যোদয় দেখেছি কিনা। তিনি প্রায় উত্তেজিত হয়ে উঠলেন, 'আরে মশাই বলেন কি, জানেন রহমান সাহেব টাইগার হিলে সূর্যোদয় দেখে অনেক কিছু রিসার্চ করেছেন।' রহমান সাহেবের পরিচয় সম্পর্কে আমার অজ্ঞতা প্রকাশ করাতে তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হলেন, 'আরে, এই সব রিসার্চ করে রহমান সাহেব নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন, তা জানেন?' সবিনয়ে স্বীকার করলাম—এ ব্যাপারও আমার জানা নেই। প্রচণ্ড মূর্খ মনে করে ভদ্রলোক দুর্জনসঙ্গ তাড়াতাড়ি ত্যাগ করলেন। এরাই হয় আমাদের বিদগ্ধ-সমাজ।

বড় চাকরি হয়তো রামনের বিজ্ঞান-প্রতিভা বিনষ্ট করে দিত, যদি ঊনত্রিশ বছর বয়স্ক যুবক রামনকে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় একেবারে পদার্থ-বিজ্ঞানে পালিত অধ্যাপকরূপে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমন্ত্রণ করে না আনতেন। এই একটি মাত্র কারণেই সমগ্র দেশ এবং বিজ্ঞানী-সমাজ আশুতোষের কাছে ঋণী।

রামন কলকাতায় প্রথম আসেন 1907 সালে ফিন্যান্স সার্ভিস পাস করে অ্যাসিস্ট্যাণ্ট অ্যাকাউণ্ট্যাণ্ট জেনারেলরূপে। একজন বড় সাহেব আসছেন, সুতরাং তাঁকে সম্বর্ধনার জন্যে ফুলের মালা নিয়ে অফিসের কর্মচারীরা এলেন হাওড়া স্টেশনে। সকলেই ভেবেছিলেন, এই উচ্চ পদে নিশ্চয়ই কোন বয়স্ক লোক আসছেন। মাদ্রাজ মেল যথাসময়ে হাওড়া স্টেশনে এলো। যাত্রীরা প্রায় সবাই চলে গেল। কিন্তু প্রাপ্তবয়স্ক অফিসারের চিহ্নমাত্র দেখা গেল না। শেষে দেখা গেল, এক দক্ষিণ ভারতীয় যুবককে, যার বয়স তখনও বিশ হয় নি। হাতে একটি কার্পেট ব্যাগ আর একটি বইয়ের বাণ্ডিল। অফিসের কর্মচারীরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—সি. ভি. রামনের এই গাড়ীতে আসবার কথা ছিল, তাঁকে তিনি দেখেছেন কি না অথবা তাঁর কোন সন্ধান দিতে পারেন কিনা। তখন রামন বললেন, তিনিই সেই সি. ভি. রামন। বলা বাহুল্য সম্বর্ধনাকারীরা অত্যন্ত বিস্মিত হলেন, এই বালক—প্রায় নাবালক বললেই চলে, এমন একটি বড় পদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন!

কলকাতার ফিন্যান্স ডিপার্টমেণ্টে চাকরি করেন রামন 1917 সাল পর্যন্ত। চাকরির শেষের দিকে অল্প কিছু কালের জন্যে তিনি রেঙ্গুনে বদ্‌লি হন। গোটা ব্রহ্মদেশ তখন ভারতের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এখানে তাঁর উপরওয়ালা অ্যাকাউণ্ট্যাণ্ট জেনারেল ছিলেন একজন ইংরেজ। অল্প দিনের মধ্যে স্বাধীনচেতা রামন ও সেই ব্যক্তির মধ্যে বিরোধ দেখা দিল। অ্যাকাউণ্ট্যাণ্ট জেনারেলের একটি আদেশ সমালোচনা করায় সাহেব অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে কাগজপত্র নিয়ে রামনের ঘরে ছুটে এলেন। টেবিলের উপর একটি লাল কালির বোতল দেখিয়ে সাহেব বললেন—'শুনুন মিঃ রামন, এই লাল কালির বোতল দেখিয়ে যদি আমি বলি যে, এটা নিশ্চিত যে এই বোতলে কালো কালি রয়েছে, তাহলে আপনার কর্তব্য বলা—হাঁ মহাশয়, এটা কালো কালি—বুঝেছেন?' রামন উত্তর দিলেন 'এক্ষেত্রে আমার কর্তব্য হচ্ছে এই বলা—হয় আপনি অন্ধ, নয়তো পাগল, কিংবা দুই-ই।' এর অল্প দিন পরে তিনি পদত্যাগ করে কলকাতায় ফিরে আসেন এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থ-বিজ্ঞানে পালিত অধ্যাপক নিযুক্ত হন।

কলকাতায় সরকারী চাকরীর অবসরে রামন ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অফ সায়েন্সে গবেষণা করেন। স্বর্গীয় ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার এই বিজ্ঞান সভা প্রতিষ্ঠা করেন 1876 সালে। এখান থেকে অনেক কৃতী বিজ্ঞানী বেরিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য রামন এবং কারিয়ামানিক্কম কৃষ্ণান। অ্যাসোসিয়েশনের শতবর্ষ পূর্তির আর মাত্র কয়েক বছর বাকী আছে। এর দীর্ঘ ইতিহাসে মাত্র একটি রামনের কাজেই এর অস্তিত্বের যথেষ্ট সার্থকতা সাধিত হয়েছে।

আগে এই প্রতিষ্ঠান ছিল বহুবাজার স্ট্রীটে (বর্তমানে বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট), এখন যেখানে গোয়েঙ্কা কলেজ অবস্থিত। রামন দীর্ঘকাল এই প্রতিষ্ঠানের সেক্রেটারী

ছিলেন। 1934 সালে কৌশল করে তাঁকে এই পদ থেকে অপসারিত করা হয়—যার পশ্চাতে ছিল কিছু অসূয়া এবং কিঞ্চিৎ প্রাদেশিকতা। এই ঘটনায় তাঁর মন তিক্ত হয়ে যায় এবং তিনি কলকাতার পাট একেবারে উঠিয়ে ব্যাঙ্গালোর চলে যান সেখানকার ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্সের ডিরেক্টর হয়ে। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বিরোধের ফলে তিনি এই পদ ত্যাগ করেন 1938 সালে। তবে আরও দশ বছর ছিলেন পদার্থ-বিজ্ঞানের অধ্যাপকরূপে। 1949 সালে তিনি জাতীয় অধ্যাপক নিযুক্ত হন। 1943 সালে তিনি নিজের গবেষণাগার রামন রিসার্চ ইনস্টিটিউট স্থাপন করেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি এখানে কাটিয়েছেন।

অন্যমনস্ক অধ্যাপকের কাহিনী আমাদের বহু জানা আছে। অন্যমনস্কতার জন্যে রামনকে মাঝে মাঝে অসুবিধায় পড়তে হতো। তাঁর স্ত্রীকে এজন্যে কিছু দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে, কিন্তু তিনি তা হাসিমুখে সহ্য করেছেন। অন্য কারণেও দুর্ভোগ কম হতো না ভদ্রমহিলার। একদিন কাজ করতে করতে অনেক রাত্রি হয়ে যাওয়ায় রাত প্রায় কাবার করে রামন গৃহে ফিরে দেখেন, স্ত্রী তখনও অভুক্ত রয়েছেন। তিনি ভীষণ চটে গেলেন এবং চেঁচামেচি করতে লাগলেন যে, তাঁর দেশবাসী, বন্ধু ও প্রতিবেশী রাওবাহাদুর গোবিন্দ রাজু মুদালিয়ারকে ছুটে আসতে হলো কাজপাগল লোকটিকে শান্ত করতে।

রামনের অন্যমনস্কতা সম্পর্কে দুটি ঘটনার কথা এখানে বলছি। প্রথমটি ঘটেছিল আমাদের ক্লাসে। অধ্যাপক রামন আমাদের থিয়োরেটিক্যাল ফিজিক্স (তাত্ত্বিক পদার্থ-বিজ্ঞান) পড়াতেন। একদিন ক্লাসের বোর্ডে একটি সমীকরণ লিখতে লিখতে পরের পদ কি হবে, মনে করতে পারলেন না। বোর্ডের সামনে বেশ কয়েক মিনিট দাঁড়িয়ে রইলেন, মনে এলো না। আমাদের বললেন—একটু বসো, আমি এখনই আসছি। ঘর থেকে বইপত্র দেখে এসে আরও লাইন দুয়েক লিখে আবার আটকে গেলেন। আবার কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেন, বললেন আজ আর হলো না, পরের দিন দেখা যাবে। পরের দিন অবশ্য কোন অসুবিধা হয় নি।

দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটেছিল আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সামনে—তাঁর কাছে শোনা। আমার দাদা ছিলেন রেলের অফিসার এবং প্রায়ই তাঁকে বাইরে যেতে হতো। একদিন তিনি তাঁর কামরায় একটি বার্থে সি. ভি. রামনের নাম দেখে আগ্রহান্বিত হন। রামন গাড়ীতে উঠলে দু-একটি সৌজন্যসূচক কথাবার্তাও হয়েছিল। তার পর দু-জনেই কিছুক্ষণ বই পড়ে যে যার বার্থে শুয়ে পড়লেন। দাদা জানলেন, রামন যাচ্ছেন বেনারস বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি পরীক্ষা নিতে। সকালে বেনারসে পৌঁছে টিকিট চেকার টিকিটের খোঁজ করাতে রামন সমস্ত পকেট হাতড়ে টিকিট খুঁজে পেলেন না। টিকিট-চেকার ভাড়া, জরিমানা ইত্যাদি আদায়ের জন্যে খাতাপত্র বের করে বসলো। আমার দাদা তখন নিজের পরিচয় দিলেন চেকারকে এবং অধ্যাপক রামনকে। চেকারকে বললেন—তুমি

নিজে সঙ্গে করে নিয়ে অধ্যাপককে গেট পার করে দাও। অধ্যাপককে বললেন—আপনি টিকিট কিনেছেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, কারণ তা না হলে বার্থ বিজার্ভেশনে আপনার নাম থাকতো না। আপনি টিকিটটা খুঁজে পেলে দয়া করে রেল কোম্পানীকে পাঠিয়ে দেবেন। অধ্যাপক রামন ধন্যবাদ দিয়ে চলে গেলেন।

সময় নষ্ট করা রামন একেবারে সহ্য করতে পারতেন না। তিনি আমাদের রোল কল করতেন না। কেবল মাত্র প্রথম দিন করেছিলেন। কারণ প্রথম সময় নষ্ট, যদি কারো শোনবার ইচ্ছা থাকে সে আসবেই। আর যার ইচ্ছা নেই, তার না শোনবার স্বাধীনতা থাকলো। ক্লাস শেষ হবার কয়েক মিনিট আগে তাঁর বেয়ারা দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়ে থাকতো—যার অর্থ ট্যাক্সি এনেছি—অপেক্ষা করছে। ক্লাস থেকে সোজা বেরিয়ে ট্যাক্সিতে উঠতেন, গন্তব্য স্থল বৌবাজারের গবেষণাগার।

রামন কিছু পরমত-অসহিষ্ণু ছিলেন এবং যাঁদের অপছন্দ করতেন, তাঁদের কঠোর ভাষায় সমালোচনা করতেন, কিন্তু বিদ্বেষ পোষণ করতেন না। তাঁর আত্মবিশ্বাস ছিল অসাধারণ। 1925 সালে তিনি সার আশুতোষকে বলেন—'আমাকে কাজ করবার সুযোগ দিন। পাঁচ বছরের মধ্যে আমি নোবেল পুরস্কার এনে দেব।' রামন তাঁর আপাতঃ দম্ভোক্তি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন। তিনি নোবেল পুরস্কার পান 1930 সালে।

রামন বলেছেন, 'বিজ্ঞানই আমার ধর্ম, এই ধর্ম থেকে আমি যেন কোন দিন বিচ্যুত না হই।' তা তিনি কোন দিন হন নি।

সুধাংশুপ্রকাশ চৌধুরী

[1]বিজ্ঞান বিচিত্রা। শ্রীচন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রামন; অনুবাদক—শ্রীসুধাংশুপ্রকাশ চৌধুরী। পাবলিকেশন্স্ ডিভিশন, মিনিস্ট্রি অব ইনফরমেশন অ্যাণ্ড ব্রডকাস্টিং, গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়া। দিল্লী-8

সি. ভি. রামন ও তাঁর সহকারী

কলকাতায় তখন রাতের আঁধার নেমে এসেছে। মহানগরীর অশান্ত কলকোলাহল ক্রমেই স্তিমিত হয়ে আসছে। শহরের এক গবেষণাগারে কিন্তু কাজ করে চলেছেন এক মনীষী। বিজ্ঞানের এক অভিনব আবিষ্কারের চিন্তায় তখন তিনি মগ্ন। সে দিন ছিল 28 ফেব্রুয়ারী, 1928 সাল।

বিজ্ঞানের ইতিহাসে দিনটি স্মরণীয়। এই দিনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে এই ভারতীয় বিজ্ঞানী যে তথ্য আবিষ্কার করেন, তা যে শুধু তাঁকেই দুর্লভ গৌরবের অধিকারী করে, তা নয়, বিশ্বের দরবারে তাঁর স্বদেশের মান-মর্যাদাও বৃদ্ধি করে। এই মনীষীর নাম সি. ভি. রামন—এশিয়ার প্রথম নোবেল পুরস্কার-বিজয়ী বিজ্ঞানী। তিনি নোবেল পুরস্কার পান 1930 সালে।

রামনের এই আবিষ্কারের জন্মকথা বলতে হলে বলতে হবে—এক বাঙালীর কথা, এক আত্মভোলা নিঃস্বার্থপর গবেষকের কথা। গবেষণাগারে সে রাত্রিতে তিনিই ছিলেন রামনের একমাত্র সঙ্গী, তাঁর সুদক্ষ সহযোগী। গবেষণার জন্যে যা কিছু যন্ত্রপাতি সাজ-সরঞ্জামের সে দিন প্রয়োজন হয়েছিল—তা সবই তিনি রামনের জন্যে সাজিয়েগুছিয়ে দিয়েছিলেন সযত্নে ও নিখুঁতভাবে। মার্কারি আর্ক, কণ্ডেন্সার, অপ্‌টিক্যাল ফিল্টার প্রভৃতি প্রয়োজনীয় জিনিষ রামনের নির্দেশমত সঠিকভাবে স্থাপন করে তাঁর গবেষণার কাজ সহজ করে দিয়েছিলেন। রামন বলেছেন, এসব কাজে তিনি ছিলেন অত্যন্ত দক্ষ। এই সহকারী গবেষকের নাম আশুতোষ দে।

1953 সালের মার্চ মাসে হায়দরাবাদে ভারতীয় বিজ্ঞানীরা মিলিত হয়ে রামনকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন। রামন এফেক্ট আবিষ্কারের পঁচিশ বছর পূর্তি উপলক্ষে তাঁরা আয়োজন করেন এই সম্বর্ধনার। সম্বর্ধনার উত্তরে রামন সে দিন যা বলেছিলেন—তা প্রণিধানযোগ্য।

রামন বলেন, 28শে ফেব্রুয়ারীর রাত্রিতে আশু দে-ই ছিলেন আমার একমাত্র সহকারী। তিনি ছিলেন নিঃস্বার্থপরতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। কোন ডিগ্রির প্রতি তাঁর মোহ ছিল না, ছাপার অক্ষরে নিজের নাম প্রকাশের জন্যে কোন আগ্রহই ছিল না তাঁর, কোন সার্টিফিকেট চাইতেন না তিনি, কাজের জন্যে কখনও কোন প্রশংসা গ্রহণ করেন নি, আর আশাও করেন নি কোন দিন। আদর্শ সহযোগী গবেষকের এই সবই হচ্ছে বাস্তবিক মহৎ গুণ।

স্টকহোম থেকে নোবেল পুরস্কার লাভ করে রামন এলেন কলকাতায়। দেখা হলো আশু দে-র সঙ্গে। রামন বলেছেন—যে ফাউন্টেন পেনটি দিয়ে আমি নোবেল পরস্কারের রসিদটি সই করেছিলাম, সেই কলমটি চাইলেন আশু দে। আমি সানন্দেই সেই ফাউন্টেন পেনটি তাঁর হাতে তুলে দিলাম।

বিজ্ঞানীদের এই সম্মেলনে রামন বলেছেন—তিনি নিজেই আবিষ্কার করেছিলেন, কিন্তু এই প্রসঙ্গে আশু দে গবেষণাকার্যে তাঁকে সাহায্য করেছিলেন; তাও স্বীকার করেন। তিনি বলেন—'He was the man who was with me in the dark room that night and helped me to make the observations thus recognized by the Noble foundation.'

বহুকাল আগেই আশু দে আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। কিন্তু এই নিঃস্বার্থ, নির্লোভ গবেষকের কথা কি আমরা ভুলতে পারি? রামনের এই আবিষ্কারের পটভূমিতে চিরদিন বিরাজ করবে তাঁর নাম।

রামনও তাঁকে ভোলেন নি কোন দিন।

রাসবিহারী রায়

আচার্য চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রামন

অধ্যাপক রামনের নাম তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছ। তিনি ছিলেন ভারত, তথা এশিয়ার মধ্যে বিজ্ঞানে সর্বপ্রথম নোবেল পুরস্কারবিজয়ী। গত বছর (1970) 21শে নভেম্বর তিনি ব্যাঙ্গালোরে পরলোক গমন করেছেন।

আচার্য রামন 1888 সালে 7ই নভেম্বর তামিলনাড়ুর বিখ্যাত এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। অধ্যাপক রামনের পিতা চন্দ্রশেখর আয়ার ভিজিগাপট্টমের এ. ভি. এন্. কলেজের গণিতের অধ্যাপক ছিলেন, পরে ঐ কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল হয়েছিলেন।

রামন বিশাখাপত্তনমে হিন্দু কলেজ হাই স্কুলে পড়াশুনা করেন। ছাত্রাবস্থা থেকেই বিজ্ঞান ছিল তাঁর প্রিয় বিষয়। শোনা যায়, এই সময়ে তিনি নাকি ডায়নামোর মত একটি যন্ত্র তৈরি করেছিলেন। তখন থেকেই তিনি শব্দ, তাপ ও বিদ্যুৎ সম্পর্কে তথ্যাদি জানবার জন্যে অধীর আগ্রহে পড়াশুনায় ব্যাপৃত থাকতেন। অনেক সময় বি. এ. ক্লাসের ছাত্রদের নিকট থেকে এসব বিষয়ের পুস্তকাদি ধার করে এনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সেগুলি তন্ময় হয়ে পাঠ করতেন। এরূপ অস্বাভাবিক পরিশ্রমের ফলে তাঁর স্বাস্থ্য খুবই খারাপ হয়ে পড়ে। শয্যাশায়ী অবস্থায় একদিন তো তিনি লিডেন জারের (Leyden Jar) পরীক্ষা দেখবার জন্যে অতিমাত্রায় অস্থির হয়ে ওঠেন এবং পরীক্ষাটি না দেখে কিছুতেই ঘুমুতে যাবেন না বলে জেদ ধরেন। অগত্যা ছেলেকে রাত্রিজাগরণ থেকে নিবৃত্ত করবার জন্যে তাঁর বাবাকে তাঁর শয্যাপার্শ্বেই লিডেন জারের পরীক্ষা দেখাতে হয়েছিল।

তিনি প্রায় 12 বছর বয়সে প্রথম স্থান অধিকার করে ম্যাট্রিকিউলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। 1902 সালে তিনি হিন্দু কলেজ থেকে ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি কলেজে বি. এ. (পদার্থ-বিজ্ঞান) ক্লাসে যোগদান করেন এবং 1904 সালে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে পুরস্কার লাভ করেন।

এম. এ. ক্লাসে তাঁর নিয়মিত উপস্থিতি বাধ্যতামূলক ছিল না, তাছাড়া লাইব্রেরী থেকে পুস্তকাদি নেবার জন্যেও তাঁকে কোন নিয়ম মেনে চলতে হতো না। এই সময়ে প্রিজম্ নিয়ে পরীক্ষা করবার সময় একদিন একটি অদ্ভুত ব্যাপার তিনি লক্ষ্য করেন এবং সে বিষয়ের পুস্তকাদি পাঠ করে এই ব্যাপারের কোন কারণ খুঁজে না পাওয়ায় তাঁর অনুসন্ধিৎসু মন খুবই চঞ্চল হয়ে ওঠে। পরের দিন বার বার সেই পরীক্ষাটি করে এর কারণ সম্বন্ধে এক নতুন সিদ্ধান্তে উপনীত হন এবং এই বিষয়ে একটি নিবন্ধ রচনা করে পদার্থ-বিজ্ঞানের অধ্যাপক জোন্সের নিকট প্রদান করেন। কয়েক মাস পরেও অধ্যাপক জোন্সের কাছ থেকে কোন জবাব না পেয়ে তাঁর কাছে গিয়ে থিসিসটিতে আরও কিছু তথ্য যোগ করবার জন্যে সেটি ফেরৎ নিয়ে আসেন এবং একটি বৃটিশ বৈজ্ঞানিক পত্রে নিবন্ধটি প্রকাশ করেন। এই বিষয়ে তাঁর সহপাঠী আপ্পা রাও একটি সমস্যা উত্থাপন করেন। এর ফলে আরও কতকগুলি পুরস্কার পুব 1906 সালে তিনি

লণ্ডনের ফিলোসফিক্যাল ম্যাগাজিনে আলো সম্বন্ধে একটি নতুন নিবন্ধ প্রকাশ করেন। 1907 সালে বিখ্যাত 'নেচার' পত্রিকায় তাঁর আর একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। 1907 সালে 18 বছর বয়সে তিনি এম. এ. পরীক্ষায় (পদার্থ-বিজ্ঞানে) প্রথম স্থান অধিকার করে স্বর্ণপদক লাভ করেন। 1907 সালে ভারত সরকার কর্তৃক অনুষ্ঠিত এক প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় তিনি যোগদান করেন। তিনি এই পরীক্ষায় সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন এবং 1907 সালের জুন মাসে ইণ্ডিয়ান ফাইন্যান্স ডিপার্টমেণ্টে ডেপুটি অ্যাকাউণ্টেণ্ট জেনারেলের পদে নিযুক্ত হন। 1907 সাল থেকে 1917 সালের জুলাই পর্যন্ত তিনি কলিকাতা, নাগপুর এবং রেঙ্গুনে এই দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই কাজে নিযুক্ত থাকা সত্ত্বেও তিনি বৈজ্ঞানিক গবেষণায় বিরত থাকেন নি। এই সময়ের মধ্যেই নেচার, ফিলোসফিক্যাল ম্যাগাজিন, ফিজিক্যাল রিভিউ প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর মৌলিক গবেষণা সংক্রান্ত নিবন্ধাদি প্রকাশিত হয়। গবেষণার কৃতিত্বের জন্যে তাঁর প্রতি বিদ্বজ্জন সমাজের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় এবং সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তাঁকে কলিকাতা বিজ্ঞান কলেজে পদার্থ-বিজ্ঞানের পালিত চেয়ার গ্রহণের আমন্ত্রণ জানান। সার আশুতোষের আমন্ত্রণ তিনি গ্রহণ করেন। 1917 সালে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বৌবাজারের ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের লেবরেটরীতেই তাঁর অধিকাংশ গবেষণার কাজ পরিচালিত হয়েছিল। 1919 সালে ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের মৃত্যুর পরে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অবৈতনিক সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত হন। 1933 সালে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে ব্যাঙ্গালোরে ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব সায়েন্সে যোগদান করেন। 1924 সালে তিনি লণ্ডনের রয়েল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হন। 1929 সালে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট তাঁকে নাইট উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেন। ইটালিয়ান সোসাইটি অব সায়েন্স 1928 সালে তাঁকে ম্যাটিউচি মেডাল এবং 1930 সালে রয়েল সোসাইটি হিউজ মেডাল দিয়ে পুরস্কৃত করেন। 1930 সালে তিনি রামন এফেক্ট নামক যুগান্তকারী আবিষ্কারের জন্যে পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার লাভের গৌরব অর্জন করেন। প্যারিস, গ্লাসগো, ফ্রেইবার্গ এবং কলিকাতা, বম্বে, মাদ্রাজ, বেনারস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে অনারেরী ডক্টরেট ডিগ্রি দিয়ে সম্মান প্রদর্শন করেন। দেশ-বিদেশের বহু বৈদেশিক প্রতিষ্ঠানের তিনি অনারেরী ফেলো নির্বাচিত হন।

বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর গবেষণা বস্তুতঃ আলোক-বিজ্ঞানেরই বিভিন্ন দিক মাত্র। কৃষ্টাল ফিজিক্স, বিশেষতঃ ডায়মণ্ড-ফিজিক্সের উপর তাঁর অনুরাগ ছিল সবচেয়ে বেশী। কৃষ্টাল-ফিজিক্সের গবেষণায় তিনি অভিনব পন্থা উন্মুক্ত করেছেন। সঙ্গীত-যন্ত্র, আলোক-তরঙ্গের বিচিত্র অভিব্যক্তি, সমুদ্রের রং, পাখীর পালকের বর্ণবৈচিত্র্য, শামুক-ঝিনুকের খোলার রামধনুর রং, স্ফটিকের কম্পন, বিশেষ করে ফ্লোরেসেন্স, ফস্‌ফোরেসেন্স, হীরকের গঠন ও আণবিক সংস্থান প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে তিনি বহু মূল্যবান গবেষণা করে গেছেন।

প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন 1। র‍্যালে বিচ্ছুরণ ও রামন বিচ্ছুরণের মধ্যে পার্থক্য কি?

অনিমেষ চট্টোপাধ্যায়, বকুলবরণ চট্টোপাধ্যায়, ঢাকা

প্রশ্ন 2। বিজ্ঞানী রামনের আগে রামন-প্রক্রিয়া সংক্রান্ত ব্যাপারটা নিয়ে অন্য কোন বিজ্ঞানী ভেবেছিলেন কি? পাপিয়া ঘোষদস্তিদার, মনুয়া পাহাড়ী, জলপাইগুড়ি

প্রশ্ন 3। ষ্টোক রেখা ও অ্যান্টিষ্টোক রেখা কি?

চন্দনা মিত্র, হাওড়া ও জীবনকুমার বসু, ডায়মণ্ডহারবার

প্রশ্ন 4। (ক) রামন-প্রক্রিয়া কি? (খ) রামন প্রক্রিয়ার ব্যবহারিক প্রয়োগ সম্পর্কে কিছু বলুন। দীপা চৌধুরী, কবিতা দত্ত, হৃষীকেশ দত্ত, উল্টাডাঙ্গা

প্রশ্ন 5। ইনভারস রামন-প্রক্রিয়া কি? দেবব্রত সিংহ, কলিকাতা-54

উঃ 1। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণায় বাধা পেয়ে আলোকরশ্মি বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ে। এই বিচ্ছুরিত আলোকরশ্মির প্রকৃতি নিয়ে অনেক বিজ্ঞানী উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে গবেষণা করেন। র‍্যালে বস্তুর অণুকে বিচ্ছুরক কণা হিসাবে নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। তিনি বস্তুর অণুকে কোন এক নির্দিষ্ট তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের বা এক বর্ণের আলো দিয়ে উদ্ভাসিত করেন এবং বস্তু থেকে বিকিরিত আলোকরশ্মি পরীক্ষা করে দেখেন যে, বিকিরিত আলোর বর্ণ বা তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য আপতিত আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের সঙ্গে অভিন্ন, যদিও বিকিরিত আলোর তীব্রতা আপতিত আলোর তুলনায় অনেক কমে যায়। একে বলা হয় র‍্যালে বিচ্ছুরণ।

এর বহু কাল পরে রামন পরীক্ষা করে দেখেন যে, বিকিরিত আলোর সবটুকুই অভিন্ন ও অবিকৃত নয়—র‍্যালের অভিন্ন আলোর সঙ্গে মিশে থাকে আরও কিছু ক্ষীণ নতুন তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের আলো, যা আপতিত রশ্মি থেকে আলাদা। 1928 সালে রামন এই তথ্য প্রচার করেন এবং এই ঘটনার মর্ম ব্যাখ্যা করে এর তাৎপর্যের উল্লেখ করেন। র‍্যালে বিচ্ছুরণের পাশে এই ভিন্ন তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট আলোকমালাকে রামন বিচ্ছুরণ বলা হয়।

উঃ 2। রামনের আগে 1923 সালে স্মেকলে গাণিতিক যুক্তি দিয়ে আলো ও অণুর সংঘর্ষে আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য বদ্‌লে যাবার সম্ভাবনা প্রমাণ করেন। এর পর 1925 সালে ক্রামার্স ও হাইসেনবার্গ অণু ও আলোর সংঘর্ষ নিয়ে বিস্তারিত গবেষণা করেন এবং অঙ্কের সাহায্যে প্রমাণ করেন যে, আপতিত আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য এই সংঘর্ষে বদ্‌লে যায়। তবে তখন পর্যন্ত এর কোন পরীক্ষালব্ধ প্রমাণ পাওয়া যায় নি।

উঃ 3। বিচ্ছুরিত র‍্যালে রশ্মির পাশে নতুন ভিন্ন তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের আলোকমালাকে রামন বর্ণালী বলা হয়। অণু ও আলোর সংঘর্ষে এই বর্ণালীর সৃষ্টি হয়। দেখা গেছে যে, অণুর গঠনের উপরেই এই বর্ণালীর বৈশিষ্ট্য নির্ভর করে। সংঘর্ষের সময় আপতিত আলো কিছু শক্তি হারাতেও পারে বা অণু থেকে শক্তি গ্রহণ করতেও পারে। সংঘর্ষে আলোক-কণা যদি শক্তি হারায়, তখন বর্ণালীতে বেশী তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের রেখা দেখা যায়—যাদের বলা হয় স্টোক রেখা। এই জাতীয় সংঘর্ষে অণু আলো থেকে শক্তি নিয়ে

কম্পনের উচ্চতর স্তরে চলে যায়। অণু উত্তেজিত স্তরে থাকাকালীনও আবার সংঘাত হতে পারে। এখন অণু আলোক-কণাকে শক্তি দিয়ে নীচের শক্তিস্তরে চলে আসে। এই পদ্ধতিতে রামন বর্ণালীর মধ্যে বিচ্ছুরিত আলো কম তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের হয়ে থাকে। এদের বলা হয় অ্যান্টিস্টোক্ লাইন্। অ্যান্টিস্টোক রেখার তুলনায় স্টোক রেখা বেশী তীব্র। কেন না, সাধারণ অবস্থায় বেশীর ভাগ অণুই কম্পনজাত শক্তিস্তরের নীচের স্তরে অবস্থান করে। ফলে সংঘর্ষের সময় আলোক-কণা থেকেই শক্তি আহরণ করে। তবে তাপমাত্রা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অ্যান্টিস্টোক রেখার তীব্রতাও বৃদ্ধি পায়।

উঃ 4। (ক) বর্তমান সংখ্যায় একাধিক প্রবন্ধে এ নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

(খ) রামন-প্রক্রিয়ার প্রয়োগ পদার্থ ও রসায়নবিদ্যায় আজ খুবই পরিব্যাপ্ত। রামন বর্ণালী বিশ্লেষণ করে বস্তুর অণুর আভ্যন্তরীণ গঠন সহজেই জানা যায়। রামন-প্রক্রিয়া প্রয়োগ করে স্বল্প পারমাণবিক অণুর আপেক্ষিক তাপ, বৈদ্যুতিক ভ্রামক এবং অপরাপর নিত্যধর্ম নির্ণয় করা যায়। কেলাসের ভৌতধর্ম ও আভ্যন্তরীণ গঠন নির্ণয়ে কেলাসের রামন বর্ণালী সার্থকতার সঙ্গে প্রয়োগ করা হচ্ছে, যা এক্স-রে-র অপবর্তন পদ্ধতির তুলনায় অনেকাংশে নিখুঁৎ।

রসায়নবিদ্যার সব বিভাগেই রামন-প্রক্রিয়ার প্রয়োগ হচ্ছে। পদার্থের রামন বর্ণালী বিশ্লেষণ করে তার রাসায়নিক গঠন-প্রণালী এবং যোজ্যতা জানা সম্ভব। রামন-প্রক্রিয়ার দ্বারা তড়িদ্‌বিশ্লেষণ ও হাইড্রোলিসিস্ সংক্রান্ত বহু সমস্যার সমাধান সম্ভব হয়েছে। জৈব রসায়নবিদ্যায় রামন-প্রক্রিয়ার প্রয়োগ দিনের পর দিন বেড়েই চলছে। বিশেষ করে জৈব রাসায়নিক পদার্থের প্রকৃতি ও তার বিশুদ্ধতা, আইসোমার অণুগুলির মধ্যে পরমাণু-বিন্যাসের পার্থক্য, অতিকায় অণুর গঠন প্রভৃতি নির্ণয়ে রামন-প্রক্রিয়ার প্রয়োগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েই চলেছে।

উঃ 5। কোন বিচ্ছুরক মাধ্যমকে এক রঙের তীব্র আলো (যেমন—রুবী লেসার থেকে নির্গত আলো) এবং একই সঙ্গে তীব্র সাধারণ আলো দিয়ে উদ্ভাসিত করলে মাধ্যমের অণু আপতিত এক রঙের আলোর উত্তেজিত বিকিরণ দেয় এবং এর সঙ্গে সাধারণ আলো থেকে অন্য কম্পনাঙ্কের আলো শোষণ করে। এই শোষিত আলোর কম্পনাঙ্ক আপতিত আলোর কম্পনাঙ্কের চেয়ে একটা নির্দিষ্ট কম্পনাঙ্কের কম বা বেশী হয়ে থাকে। নির্দিষ্ট কম্পনাঙ্কটি অণুর দুই শক্তিস্তরের কম্পনাঙ্কের পার্থক্যের সঙ্গে সমান। রামন বর্ণালীতে এই শোষিত স্তরকে বলা হয় ইনভার্স রামন-প্রক্রিয়া।

শ্যামসুন্দর দে*

* ইনস্টিটিউট অব রেডিও-ফিজিক্স অ্যাণ্ড ইলেকট্রনিক্স, বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা-9

সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

শ্রীমিহিরকুমার ভট্টাচার্য কর্তৃক পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-6 হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ 37/7 বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

চতুর্বিংশ বর্ষ | এপ্রিল, 1971 | চতুর্থ সংখ্যা

ভাসমান মহাদেশ

সৌম্যানন্দ চট্টোপাধ্যায়*

ভাসমান জাহাজ নয়, এমনকি ভাসমান হিমশৈলও নয়, এ হলো ভাসমান মহাদেশের কথা। যে মহাদেশকে আমরা আবহমানকাল অচল, অনড় বলে ভাবি। কিন্তু সৃষ্টির সুরু থেকেই বিশ্বের সমস্ত জিনিষের মতই মহাদেশগুলি ঘুরে বেড়াচ্ছে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। অবশ্য গতি খুবই ধীর। এই ব্যাপারটি প্রথম লক্ষ্য করেন বাইথানক নামে এক বৈজ্ঞানিক 1877 খৃষ্টাব্দে। এটিকে জার্মান বৈজ্ঞানিক ওয়েগ্‌নার (Wegner) প্রথম বৈজ্ঞানিক তত্ত্বরূপে 1914 খৃঃ উপস্থাপিত করেন। তার আগে আমেরিকান বৈজ্ঞানিক টেলর ও ফরাসী ভূবিদ্যাবিদ্ স্নাইডার এই বিষয়ে আলোচনা করেছিলেন। পরবর্তী কালে ডু টয়েট (Du Toit) এই তত্ত্বটির ভুলভ্রান্তি সংশোধন করে এটিকে গ্রহণযোগ্য করবার চেষ্টা করেন। সম্প্রতি রাশিয়ান ভূ-বিজ্ঞানীরাও এই তত্ত্বটি মেনে নিয়েছেন।

পৃথিবীর মানচিত্রে দেখা যায় সাতটি মহাদেশ এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা, উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া ও অ্যান্টার্কটিকা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন। এশিয়া ও ইউরোপই শুধু যুক্ত। চিরদিন এরকম অবস্থা ছিল না। ধরা যাক, আজ থেকে প্রায় সাড়ে সাঁইত্রিশ কোটি বছর আগে সিলুরিয়ান যুগে (Silurian

*ভূগোল বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা-19

age) পৃথিবীর মহাদেশগুলি একটি বিরাট মহাদেশ বা প্যানজিয়া (Pangea) হয়ে অবস্থান করছিল আর তার চারদিকে ছিল নীল সমুদ্র প্যানথালসী (Panthalsea)। এই প্রাগৈতিহাসিক মহাদেশে একদিন ভাঙন দেখা দেয়। সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি খণ্ডে মহাদেশটি বিচ্ছিন্ন হয় ও একে অন্যের থেকে দূরে সরে যায়। এই ফাটল সুরু হয়েছিল সিলুরিয়ান যুগে এবং ইওসিন (Eocene) যুগে 6 কোটি বছর আগে বিচ্ছিন্ন খণ্ডগুলি পরস্পর থেকে আরও
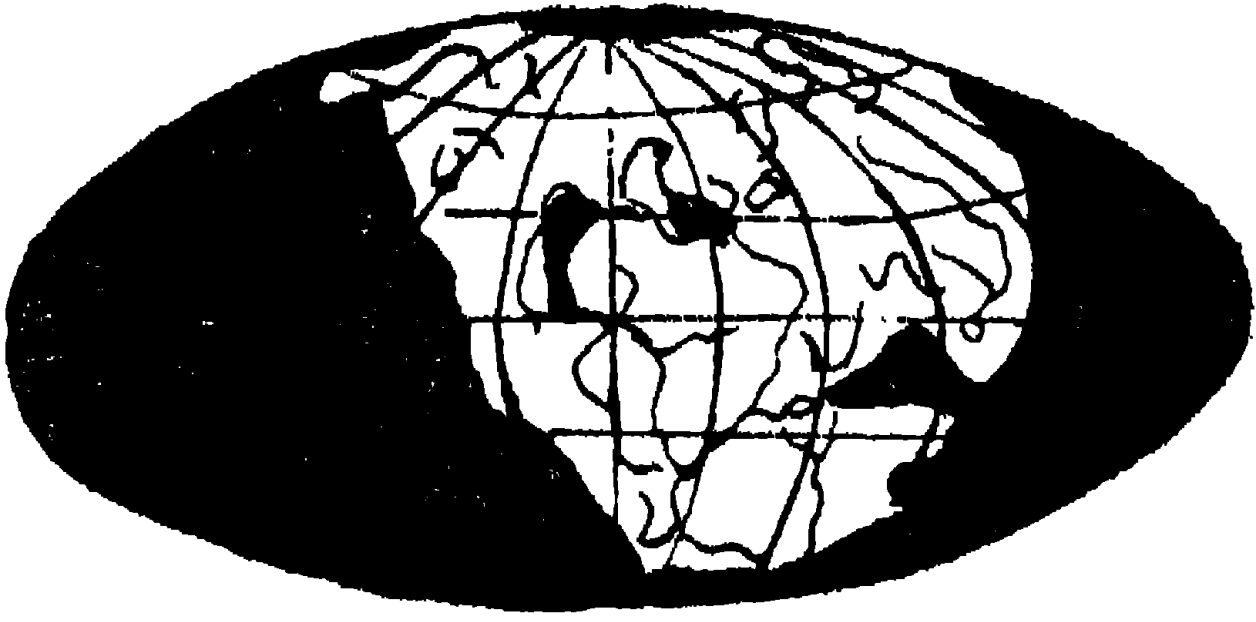
কার্বনিফেরাস যুগ
(ওয়েগ্‌নারের ধারণানুযায়ী মহাদেশগুলির উদ্ভব)

দূরে চলে যায়। প্লিস্টোসিন যুগে (Pleistocene age) অর্থাৎ প্রায় 15 লক্ষ বছর আগে মহাদেশগুলি আজকের অবস্থায় আসে। মানচিত্র লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, দক্ষিণ আমেরিকার পূর্ব তটরেখা আফ্রিকা মহাদেশের পশ্চিম তটরেখার সঙ্গে খাপে খাপে মেলে এবং উত্তর আমেরিকার পূর্ব তট ও ইউরোপের পশ্চিম তটও তাই। শুধু তটরেখাই নয়, পাহাড়-পর্বতের অবস্থান ও সেগুলির ভূতাত্ত্বিক উপাদান পর্যন্ত মিলে যায়।

পৃথিবীর ভূ-তাত্ত্বিক ইতিহাসে বিভিন্ন যুগের আবহাওয়ার মধ্যে পরিবর্তন দেখা যায়। বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস, আজ থেকে তিরিশ কোটি বছর আগে কার্বোনিফেরাস যুগের (Carboniferous age) প্রথমে ভারতবর্ষ অবস্থান করতো দক্ষিণ মেরুর কাছে। তার স্বাক্ষর আছে সে যুগের শিলার বুকে। এই দেখে বিজ্ঞানীরা বলেছেন যে, পৃথিবীর মেরু অঞ্চল যুগে যুগে স্থান পাল্টেছে অর্থাৎ মহাদেশগুলি যুগে যুগে নিজেদের অবস্থান বদ্‌লেছে।

এই মহাদেশগুলি চলে কি করে? মহাদেশগুলি সিয়াল (Sial) নামে হাল্‌কা পাথরে তৈরি বলে সেগুলি ভাসছে তদপেক্ষা ভারী সিমা (Sima) পাথরে—অনেকটা সমুদ্রে হিমশৈলের মত। তবে এখানে জলের পরিবর্তে ভারী সিমাজাতীয় শিলা—যা নাকি এমন অবস্থায় আছে, যা তরলও নয়, কঠিনও নয়। এই সিয়াল শিলা সিলিকন, অ্যালুমিনিয়াম ইত্যাদিতে তৈরি হাল্‌কা যৌগিক পদার্থ আর সমুদ্রের তলার সিমা হলো সিলিকন, ম্যাগ্‌নেসিয়াম, লৌহ ইত্যাদিতে তৈরি ভারী যৌগিক পদার্থ।

প্লিষ্টোসিন যুগ
(ওয়েগ্‌নারের ধারণানুযায়ী মহাদেশগুলির উদ্ভব)

এখন এই বৈজ্ঞানিক সত্যটি অবিশ্বাস্য মনে হলেও এর দ্বারা অনেক ভূতাত্ত্বিক সমস্যার সমাধান হয়েছে। প্রথমতঃ পৃথিবীর বিভিন্ন যুগে কেমন করে আবহাওয়া ও তার ফল হিসাবে উদ্ভিদ-জগতের পরিবর্তন হয়েছিল, তারই স্বাক্ষর পাওয়া যায় ভূতাত্ত্বিক ইতিহাসের পাতায়, যেমন—গণ্ডোয়ানা যুগে মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের অংশবিশেষে জলবায়ুগত কারণে ঘন অরণ্যের সৃষ্টি হয়। এই সব উদ্ভিদ বিরাটাকার সমস্ত হ্রদের জলে পলিমাটি চাপা পড়ে বহুকাল পরে কয়লায় রূপান্তরিত হয়।

এছাড়া পৃথিবীর প্রধান পর্বতগুলির উদ্ভবের ব্যাপারেও সন্তোষজনক আলোকপাত সম্ভব হয়েছে এই বৈজ্ঞানিক সত্যের সাহায্যে। ওয়েগ্নার বলছেন যে, মহাদেশগুলির বিষুবরেখামুখী গতির জন্যেই আল্পস ও হিমালয় পর্বতের সৃষ্টি হয়েছে। তটদেশে প্রতিহত হয়ে সমুদ্র যেমন ঢেউ সৃষ্টি করে, তেমনি এশিয়া ও ইউরোপ মহাদেশ বিষুবরেখার দিকে চলবার সময় ঘর্ষণের মধ্য দিয়ে সৃষ্টি করেছে পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত হিমালয় ও আল্পস পর্বতকে। টার্শিয়ারী যুগে

টার্শিয়ারী যুগ
(ওয়েগ্নারের ধারণানুযায়ী মহাদেশগুলির উদ্ভব)

অর্থাৎ প্রায় দেড় কোটি বছর পূর্বে এভাবেই উত্তর আমেরিকার রকি ও দক্ষিণ আমেরিকার আন্দিজ পর্বতের সৃষ্টি হয়েছিল।

যে সব পর্বতশ্রেণী ভূতাত্ত্বিক বিচারে সমসাময়িক এবং একই শ্রেণীর শিলায় তৈরি, সেগুলিকে অনেক সময়ে মহাসাগরের উভয় তীরে মুখোমুখী অবস্থায় পাওয়া গেছে। সে অবস্থায় সেগুলিকে দেখে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, কোন কালে তারা একই পর্বতশ্রেণীভুক্ত ছিল; কিন্তু মহাদেশগুলি ভেসে সরে যাওয়ায় মহাসাগরের দু-পারে দু-অংশ চলে গেছে। ব্রেজিলের উপকূলের পর্বতশ্রেণী সম্বন্ধে এই কথা খাটে। আর উত্তর আমেরিকার অ্যাপালাশিয়ান পর্বতমালা সম্বন্ধেও এই একই কথা বলা চলে, কারণ তার প্রাচীন প্রান্তর হঠাৎ নোভোস্কোশিয়াতে খণ্ডিত হয়ে আবার নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড, গ্রীনল্যাণ্ড ও পূর্ব আয়ার্ল্যাণ্ডে দেখা দিয়ে স্কটল্যাণ্ডের গ্রাম্পিয়ান পর্বতমালায় গিয়ে শেষ হয়েছে।

সম্প্রতি নিউইয়র্কে ব্রস হিজেন (Bross Hijen) নামে এক বৈজ্ঞানিক বলেছেন যে, ভারতবর্ষ গত দশ কোটি বছর ধরে ক্রমশ: 37,000 মাইল উত্তরে সরে গেছে। এটা তাঁর একার মত নয়, ইউনেস্কোর কার্যক্রম অনুসারে চব্বিশটি দেশ থেকে দু-হাজার বৈজ্ঞানিক ও বিশেষজ্ঞ পাঁচ বছর ধরে গবেষণা করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁচেছেন।

মহাদেশগুলির সঞ্চরণশীলতার স্বপক্ষে প্রাণীতাত্ত্বিক প্রমাণও রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ গিনিপিগ, চিনচিল্লা, নানাপ্রকার স্থলচর অদ্ভুত শামুক একান্তভাবে অরণ্যজ এবং উইপোকার ঢিবিতে যারা ডিম পাড়ে, সেই জাতের টিকটিকি—এই সব প্রাণীদের নাম করা যায়, যাদের দেখা যায় মাত্র দক্ষিণ আমেরিকা ও আফ্রিকা মহাদেশে। দক্ষিণ আমেরিকার সব রকম মাছ ও নির্মল জলের অধিবাসী প্রাণীর নিকট আত্মীয়ের সন্ধান পাওয়া যায় আফ্রিকাতে। এদের মধ্যে আছে বৈদ্যুতিক ইল এবং লাঙ্ ফিস বা ফুসফুসযুক্ত মাছ, যারা বিস্তীর্ণ আবদ্ধ জলাভূমির জলের উপরকার নোংরা স্তর ভেদ করে নাক উঁচু করে মাঝে মাঝে ফুসফুস ভর্তি করে বাতাস টেনে

নেয়। একটি বিরাট মহাসাগরের দুই তীরের বিশিষ্ট প্রাণীদের এত বেশী মিল থাকবার একমাত্র সম্ভাব্য কারণ, এই মহাদেশ দুটি এককালে যুক্ত ছিল।

আটলান্টিক মহাসাগরের ঠিক মাঝখানে জলের তলদেশ দিয়ে উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত দুই মহাদেশের উপকূলরেখার সমান্তরালভাবে অবস্থিত দেখা যায় একটি বৃহৎ শৈলশিরা (Mid-Atlantic Ridge)। এটি দেখে মনে হয়, দুই মহাদেশ যে জায়গায় একে অন্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, সেই বরাবরই এক অংশ জলের তলায় থেকে গেছে।

উদ্ভিদ-বিজ্ঞানীরাও ওয়েগ্‌নারকে সমর্থন করেছেন। উত্তর মেরুবৃত্তের 300 মাইল উত্তরে গ্রীনল্যাণ্ডের একটি খাদে পুরাতন বইয়ের পাতার মত পরস্পর বিচ্ছিন্ন, শ্লেটজাতীয় প্রস্তরের পাত্‌লা স্তর দেখা যায়। সেই সব স্তরের প্রত্যেকটিতেই যে ধরণের উদ্ভিদের চিহ্ন পরিস্ফুট, যথা—সাসাফ্রাস, উত্তর আমেরিকার এক ধরণের গাছ, যার বাকল থেকে ওষুধ তৈরি হয়, সাইকামোর ডুমুর জাতীয় গাছ ও তার পাতা ডানাযুক্ত এল্‌ম বীজ—তাদের কোনটিই খাঁটি মেরু অঞ্চলের উদ্ভিদ নয়, এরা সবই নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের বনাঞ্চলের উদ্ভিদ। গ্রীনল্যাণ্ডে স্যাক্সিফ্রেজ গাছের যে সমাবেশ দেখা যায়, তা পৃথিবীর অন্যত্র—এমন কি, হিমালয়েও দেখা যায়। এই ফুল গাছের বংশবিস্তারে কোন বীজের দরকার হয় না। ক্ষুদ্র এক-একটি কাণ্ডের সাহায্যে অদূরে এক-একটি করে অঙ্কুর রোপণ করেই এরা বংশবিস্তার করে। এই উপায়ে হাজার হাজার বছরে এরা হয়তো কয়েক হাজার মাইল যেতে পারে, কিন্তু মহাসাগর অতিক্রম দুঃসাধ্য ব্যাপার। সুতরাং ওয়েগ্‌নারের মতে—উত্তর আমেরিকা ও গ্রীনল্যাণ্ডের সংযুক্তিই এর সন্তোষজনক ব্যাখ্যা।

প্রায় 20 কোটি বছর আগে পৃথিবীর বৃহত্তম তুষার যুগ বিস্তার লাভ করেছিল দক্ষিণ মেরু থেকে। এখানে সেখানে বিচ্ছিন্ন বৃহদাকার প্রস্তর, জলের তলার পাললিক শিলার স্তর ও শিলার গায়ের হিমবাহের ঘর্ষণজনিত দাগ প্রভৃতি থেকে অনুমান করা হয় যে, প্রাচীন হিমবাহ দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশকে উত্তরে নিরক্ষীয় অঞ্চল পর্যন্ত বরফে ঢেকে ফেলেছিল ও সেই সঙ্গে পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়া ও ভারতবর্ষ তুষারাবৃত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু এই হিমবাহের দক্ষিণ আমেরিকার নিরক্ষীয় অঞ্চলে পৌঁছাবার কথা নয় বা নিরক্ষরেখা পেরিয়ে ভারতে চলে আসাও আশ্চর্য ব্যাপার। কারণ নিরক্ষরেখা সব সময়েই সূর্য থেকে উত্তাপ সংগ্রহ করে যথেষ্ট উত্তপ্ত থাকছে, যার ফলে হিমবাহ ওখানে পৌঁছবার আগেই গলে যাবে। বর্তমানেও নিরক্ষীয় অঞ্চলে হিমরেখা দেখা যায় সমুদ্রতল থেকে 18000 ফুট উপরে। ওয়েগ্‌নার বলেন যে, মহাদেশগুলির চলমান প্রকৃতির জন্যেই এটা সম্ভব হয়েছিল। এই তুষার যুগের সময়ে অ্যাণ্টার্কটিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, ভারতবর্ষ ও অষ্ট্রেলিয়া নিশ্চয়ই একটি প্রকাণ্ড মহাদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল, যা তাঁর মতে গণ্ডোয়ানা মহাদেশ।

প্রাচীন হিমবাহগুলি গলে যাবার পরে তুন্দ্রা অঞ্চলে এক ধরণের গুল্ম জন্মায়, যা পৃথিবীর অন্য কোথাও আগে দেখা যায় নি। এর নাম গ্লোসোপটেরিস ও এটি শীতল আবহাওয়ার উপযোগী পুরু কর্কশ জিহ্বার আকৃতির পাতাযুক্ত এক প্রকার ফার্ণ জাতীয় উদ্ভিদ। এই উদ্ভিদের জীবাশ্ম দেখা গেছে আর্জেনটিনা, ব্রেজিল, মধ্য আমেরিকা, দক্ষিণ ভারত, অষ্ট্রেলিয়া এবং অ্যাণ্টার্কটিকাতে। যেহেতু এই উদ্ভিদের পক্ষে হাজার হাজার মাইল সমুদ্র অতিক্রম করা অসম্ভব, সুতরাং এর একমাত্র কারণ গণ্ডোয়ানা মহাদেশের অস্তিত্ব।

প্রাচীন যুগে হিমবাহ যখন গলে যায় ও গ্লোসোপটেরিস উদ্ভিদ বিস্তার লাভ করে, তখন সেই

বিরাট ভূখণ্ড ঘুরতে ঘুরতে উত্তর দিকে ভেসে চলে। এই আবর্তনের টানে সমগ্র আফ্রিকা দক্ষিণ আমেরিকা ও আরও দুটি বিরাট ভূখণ্ড বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ভারতবর্ষ ভাসমান অবস্থায় ক্রান্তীয় অঞ্চলে, বর্তমান এশিয়া মহাদেশের উত্তরাংশ আঙ্গারা ভূখণ্ডের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে সেখানেই হিমালয়ের সৃষ্টি করে। অষ্ট্রেলিয়া যায় তার বর্তমান স্থানে। আদি গণ্ডোয়ানা মহাদেশের বাকীটা তারপরেও দক্ষিণে এগিয়ে গিয়ে সেখানকার ঠাণ্ডায় জমে বিপুলায়তন সাদা বরফের চূড়ার তলায় চাপা পড়ে থাকে। আধুনিক যুগে দক্ষিণ মেরু অভিযাত্রীরা ভূগর্ভে শব্দ প্রেরণ ও গ্রহণ করে অ্যান্টার্কটিকা মহাদেশের বরফের নীচে মহাদেশীয় অনুপাতের বিরাট ফাটল ও গহ্বরের সন্ধান পেয়েছেন, যা সম্ভবতঃ সেই স্থলভাগের অতীতের নানা অভিযানের চিহ্ন।

মহাদেশীয় সঞ্চরণশীলতার সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য প্রমাণ নবাবিষ্কৃত জীবাশ্ম-চুম্বকত্ব। স্থলভাগের শিলার উপাদানে থাকে গলিত লাভা বা জলযুক্ত পলল শিলাকণা, যার মধ্যে চুম্বকত্ব প্রাপ্ত আণুবীক্ষণিক ভংগুর লৌহকণিকা বা আয়রন অক্সাইড সহজেই আবর্তন করতে পারে। এই শিলার উপাদান কঠিন হবার আগেই এই লৌহকণিকাগুলি কম্পাশ যন্ত্রের কাঁটার মত উত্তর দিক নির্দেশ করে নিজেদের স্থান গ্রহণ করে। শিলার উপাদান, আকৃতি, গঠন ও অবস্থান থেকে যেমন ভূ-বিজ্ঞানীরা ভূতাত্ত্বিক কালপঞ্জী অনুসারে তার প্রকৃত বয়স বলে থাকেন, তেমনি জীবাশ্মস্থিত চুম্বকত্বপ্রাপ্ত ভংগুর লৌহকণিকারূপ কম্পাশ যন্ত্রের নির্দেশ থেকে তাঁরা বলতে পারেন যে, ঐ শিলা বা শিলাস্তর প্রথম যখন সেখানে সঞ্চিত হয়েছিল, তখন সেখানের অক্ষাংশ, দ্রাঘিমাংশ কত ছিল। এর ফলে দেখা গেছে, পৃথিবীর উত্তর দিক বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দিকে নির্দেশিত হয়েছে। চুম্বকের উত্তর দিক পাওয়া যাচ্ছে এখনকার মধ্য প্রশান্ত মহাসাগরে হাওয়াই দ্বীপের কাছে, জাপানে এবং আরও পরে সাইবেরিয়ার কামচাট্কাতে। কিন্তু পৃথিবী হলো একটি ভাল জাইরোস্কোপ, যা একটি স্থির কোণে আবর্তন করছে। ফলে এর মেরু খুব বেশী সরে যাওয়া অসম্ভব। কাজেই জীবাশ্ম-চুম্বকের বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দিকে উত্তর মেরু নির্দেশের অর্থ এই নয় যে, উত্তর মেরু স্থান পরিবর্তন করেছে। কিন্তু তার পরিবর্তে যে সব মহাদেশে ঐ সব শিলা বা শিলাস্তর জমা হয়েছে, সেগুলিই ভূপৃষ্ঠের উপর স্থান পরিবর্তন করে বেড়াচ্ছে।

বর্তমানে লণ্ডনের ইম্পিরিয়াল কলেজের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক পি. এম. এস. ব্লাকেট বলেছেন, ভারতীয় শিলার পরীক্ষার দ্বারা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় যে, সাত কোটি বছর আগে ভারত নিরক্ষরেখার দক্ষিণে অবস্থিত ছিল। তেমনি দক্ষিণ আফ্রিকার শিলা দেখেও প্রমাণিত হয়েছে যে, সমগ্র আফ্রিকা মহাদেশ গত ত্রিশ কোটি বছর ধরে দক্ষিণ মেরুর উপর দিয়ে ভেসে গেছে।

তাহলে মহাদেশগুলির ভৌগোলিক স্থান পরিবর্তনের কারণ কি? বহু বছর ধরে পৃথিবীতে এমন কোনও শক্তি জানা ছিল না, যার দ্বারা কোন মহাদেশের স্থান ত্যাগ সম্ভব মনে করা যেতো। কেউ কেউ মনে করতেন, এর উৎস হলো পৃথিবীর কেন্দ্রাতিগ বল, যা মহাদেশগুলিকে বিষুবরেখার দিকে যেতে বাধ্য করেছে। আবার একটি হচ্ছে জোয়ার-ভাঁটার শক্তি, যা মহাদেশগুলির গতি পশ্চিমমুখী করেছে। সেই সঙ্গে পৃথিবীর ভিতরের তাপ বেরিয়ে যাওয়ায় ভূত্বক ক্রমশঃ শীতল ও সঙ্কুচিত হয়ে ফেটে গিয়ে মহাদেশগুলিকে গতিশীল করে অনেকে এই মতবাদের বিপক্ষে ছিলেন; তাঁদের মতে, গাণিতিক দিক থেকে এত বড় একটা মহাদেশকে এত দূরে সরাতে আরও বেশী

শক্তির দরকার, যে শক্তির জোরে পৃথিবীর ঘোরাই বন্ধ হতো। এতদিনে আন্তর্জাতিক ভূ-পদার্থ বিজ্ঞান বছরের সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে একটি শক্তির আবিষ্কার হয়েছে, যার নাম পরিবহন প্রবাহ বা তাপ প্রবাহ, যা যে কোন বস্তুর মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়, তাতেই একটি সক্রিয় গতির সৃষ্টি করে। পরিবহন প্রবাহসমূহের উৎপত্তি হয়েছে পৃথিবীর কেন্দ্রের তেজস্ক্রিয়তা থেকে। কেন্দ্র থেকে উৎপন্ন এই প্রবাহগুলি পৃথিবীর উপরের আবরণের নীচের শিলাস্তরেরও নীচের 2,000 মাইল পুরু স্তরের মধ্য দিয়ে বৃত্তাকারে বয়ে গিয়ে একটি পূর্ণ আবর্ত সৃষ্টি করে পুনরায় কেন্দ্রে ফিরে আসে।

বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের এই দ্রুত অগ্রগতির যুগে মানুষ মহাকাশ ও অন্য গ্রহের সম্বন্ধে খবর নেবার জন্যে খুবই সচেষ্ট অথচ মজার কথা এই যে, তার নিজের পৃথিবীর অনেক খবরই এখনও পরিপূর্ণভাবে সে জানতে পারে নি।

উৎপাদক রিয়্যাক্টর

দেবেন্দ্রবিজয় গুপ্ত

মৎস্য ও তৈল উভয়ের মূল্য যে হারে বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাতে মৎস্যভোজীদের শঙ্কিত হইবারই কথা। এই অবস্থায় যদি কেহ দাবী করে এবং তাহা সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয় যে, তাহার পুষ্করিণীর মৎস্য ভাজিবার সুরুতে যৎসামান্য তৈলের প্রয়োজন হইলেও শেষে যে পরিমাণ তৈল নির্গত হইবে, তাহাতে সবগুলিই উত্তমরূপে ভাজা যাইবে ও কিছু উদ্বৃত্তও থাকিবে—তাহা হইলে নিশ্চয়ই আনন্দের কথা।

বাচ্যার্থে না হইলেও লক্ষ্যার্থে এই 'মৎস্যের তৈলে মৎস্য ভাজা' লইয়া বিজ্ঞানীদের নিরন্তর গবেষণার ফল হইল উৎপাদক রিয়্যাক্টর (Breeder reactor)। ইহাতে কিছু পরিমাণ পারমাণবিক জ্বালানী দিয়া কাজ সুরু করিতে হয় বটে, কিন্তু পরে অন্য ধরণের যে জ্বালানীর সৃষ্টি হয়, তাহা পূর্বের জ্বালানীর চেয়ে অনেক বেশী।

পরমাণুর শক্তি সম্বন্ধীয় কর্মসূচীতে প্রথমেই যাহা উল্লেখযোগ্য, তাহা হইল ইউরেনিয়াম। স্বাভাবিক ইউরেনিয়ামের প্রায় সমস্তটাই হইল দুই ধরণের ইউরেনিয়ামের সহাবস্থান—ইউরেনিয়াম 235 এবং ইউরেনিয়াম-238। ইহারা সমস্থানিক (Isotopes) অর্থাৎ রাসায়নিক গুণের বিচারে অভিন্ন, ভিন্ন শুধু পারমাণবিক ওজনে, তথা ভৌত (Physical) গুণাবলীতে। 100 গ্র্যাম ইউরেনিয়ামের 99·3 গ্র্যামই হইল ইউরেনিয়াম-238, বাকীটা ইউরেনিয়াম-235। মাত্রালঘিষ্ঠ হইলেও শেষেরটিই শুধু জ্বালানী হিসাবে ব্যবহারযোগ্য।

ইউরেনিয়ামের ভাণ্ডার এমনিতেই আমাদের সীমাবদ্ধ; তায় আবার জ্বালানী-অজ্বালানীর এই তীব্র বৈষম্য! এদিকে আরও একটি পদার্থের ব্যাপারে আমাদের ভাণ্ডার বিশ্বের সবচেয়ে সমৃদ্ধ—সেটি হইল থোরিয়াম (Thorium)। কিন্তু হইলে কি হয়, এটি সোজাসুজি জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করা যায় না। সমুদ্রের জলভাণ্ডার অসীম, কিন্তু প্রয়োজনে এক গ্লাস পানীয় জলও পাওয়া যায় না। তবুও বিজ্ঞানের এই প্রগতির দিনে আমরা কি হাত-পা গুটাইয়া বসিয়া থাকিব? নিশ্চয়ই নয়। সমুদ্রের লবণাক্ত জলকেও পানীয় জল হিসাবে ব্যবহার করা সম্ভব, সম্ভব থোরিয়াম হইতে পরমাণু-শক্তির উৎপাদন।

এখন আবার আগের প্রসঙ্গে ফিরিয়া যাই। ইউরেনিয়ামের বেশীর ভাগই (ইউরেনিয়াম-238), যাহা জ্বালানী হিসাবে অকেজো, তাহা নিউট্রন শোষণ করিয়া অন্য যৌগে পরিণত হয়। প্রথমে নেপচুনিয়াম-239 পরে প্লুটোনিয়াম-239 (Pu^{239})। এই প্লুটোনিয়াম-239 হইল পারমাণবিক জ্বালানী।

ইউরেনিয়াম (ইউরেনিয়াম-238) হইতে পাওয়া প্লুটোনিয়াম (প্লুটোনিয়াম-239) অন্য এক ধরণের রিয়্যাক্টরে জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করা হয়। এই জ্বালানীর চারপাশে রাখা হয় থোরিয়াম (Th-232)। কেন্দ্রক বিভাজনের সময় যে সব নিউট্রনের সৃষ্টি হয়, সেগুলি থোরিয়াম কেন্দ্রকে (Nucleus) শোষিত হয় ; ফলে ইউরেনিয়াম-233-এর সৃষ্টি হয়। এই ইউরেনিয়াম-233 বেশ কিছুটা উৎপন্ন হইবার পর আসে শেষ পর্যায়ের কাজ। এখানে আর এক ধরণের রিয়্যাক্টরে ইউরেনিয়াম-233-কে জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করা হয় ও চারপাশে আবার থোরিয়াম রাখা হয়। আগের মতই এই থোরিয়াম ইউরেনিয়াম-233-এ পরিণত হয়। যেটুকু জ্বালানী দিয়া কাজ সুরু হয়, শেষে তদপেক্ষা আরও অধিক জ্বালানী পাওয়া যায়। ব্যাপারটি সংক্ষেপে এইরূপ দাঁড়ায় :

(1) ইউরেনিয়াম (জ্বালানী 0·7% / অজ্বালানী 99·3%) —নিউট্রন প্রতিক্রিয়ায়, অজ্বালানী ইউরেনিয়াম→ প্লুটোনিয়াম-239 (জ্বালানী)

(2) প্লুটোনিয়াম-239 + থোরিয়াম-232 ———→ ইউরেনিয়াম-233
(জ্বালানী) (অজ্বালানী) (জ্বালানী)

(3) ইউরেনিয়াম-233 + থোরিয়াম-232 ———→ ইউরেনিয়াম-233
(জ্বালানী) (অজ্বালানী) (জ্বালানী)
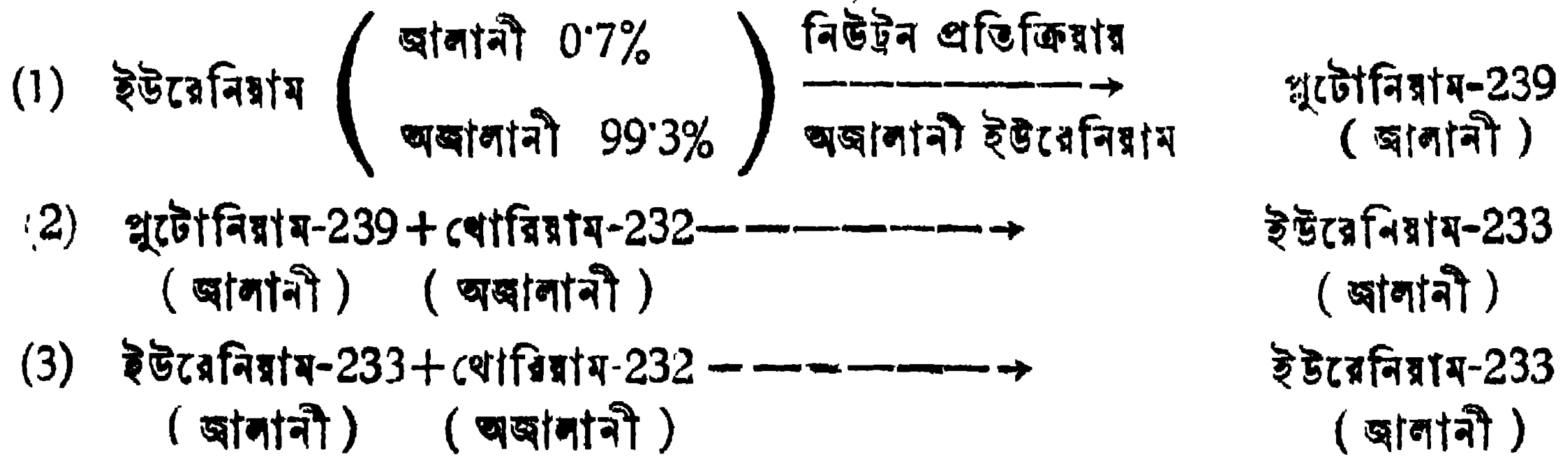
বিজ্ঞানীরা উৎপাদক রিয়্যাক্টরের এই অশেষ সম্ভাবনার বিষয় লইয়া চিন্তা করিয়াছেন এবং ইতিমধ্যে কাজও সুরু হইয়াছে। সত্তরের দশকের পারমাণবিক শক্তি সংক্রান্ত যে কর্মসূচী হাতে লওয়া হইয়াছে, তাহাতে অন্যান্য রিয়্যাক্টরের সঙ্গে রহিয়াছে দুইটি উৎপাদক রিয়্যাক্টর নির্মাণের কাজ। মোট শক্তির মাত্রা স্থির করা হইয়াছে 2·900 মেগাওয়াট। নির্মিত ও নির্মীয়মান সব রিয়্যাক্টর হইতে যে পরিমাণ প্লুটোনিয়াম পাওয়া যাইবে, তাহাতে প্রতি বৎসর 400-500 মেগাওয়াট শক্তিসম্পন্ন একটি করিয়া রিয়্যাক্টর নির্মাণের কাজ হাতে লওয়া সম্ভব।

অন্যান্য কয়েকটি উন্নতিশীল দেশ ইউরেনিয়াম সম্পদে আমাদের অপেক্ষা অনেক বেশী সমৃদ্ধ হইলেও থোরিয়াম হইতে পারমাণবিক জ্বালানী উৎপন্ন করিবার রিয়্যাক্টর লইয়া বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার কাজ চালাইতেছে। উদাহরণস্বরূপ ফ্রান্সের কথাই ধরা যাক। উৎপাদক রিয়্যাক্টর সংক্রান্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ইতিমধ্যেই সেখানে 200 কোটি টাকা খরচ হইয়াছে। শিক্ষা, তথা গবেষণা খাতে আমাদের দেশে ব্যয়-বরাদ্দ বোধ করি সর্বাপেক্ষা কম। এই অবস্থায় অনুরূপ খরচের কথা কল্পনা করাও যায় না। তবুও অন্যান্য দেশের গবেষণালব্ধ ফল হইতে আমরাও উপকৃত হইতে পারি।

ফরাসী পারমাণবিক শক্তি সংস্থার সহিত ইতিমধ্যেই আমাদের একটি চুক্তি সম্পন্ন হইয়াছে। প্রথম অবস্থায় মাদ্রাজের কলপক্কমে ছোট ধরণের একটি উৎপাদক রিয়্যাক্টর বসানো হইবে 1974-'75 সালের মধ্যে। দ্বিতীয় পর্যায়ে তৈয়ারী হইবে একটি উৎপাদক-চুল্লী গবেষণা কেন্দ্র। সেখানে বিভিন্ন ধরণের উৎপাদক চুল্লী, তাহাদের গঠন-শৈলী, যান্ত্রিক কলাকৌশল ইত্যাদি সম্পর্কীয় গবেষণা

এবং ভবিষ্যতের রিয়্যাক্টর সংক্রান্ত সব কিছু পরিকল্পনা হাতে লওয়া হইবে।

যে সকল দেশ উৎপাদক রিয়্যাক্টর নির্মাণ বিষয়ে সাফল্য লাভ করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইল পশ্চিম জার্মেনী, বৃটেন (DRF পর্যায়), রাশিয়া (BR-5), আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র (EBR পর্যায়) এবং ফ্রান্স (Rhapsodie)। ইহারা ইতিমধ্যেই 250-350 মেগাওয়াট শক্তিসম্পন্ন উৎপাদক রিয়্যাক্টরের কাজ সুরু করিয়াছে এবং অদূর ভবিষ্যতে সম্পন্ন হইবে এইরূপ আরও অনেক উচ্চশক্তিসম্পন্ন প্রকল্পের কাজ হাতে লইয়াছে।

শক্তির উৎপাদন ও তাহার সুষ্ঠু ব্যবহার দেশের সমৃদ্ধির মানদণ্ড। জলবিদ্যুৎ ও তাপবিদ্যুৎ এখনও পর্যন্ত আমাদের দেশের শক্তির প্রধান উৎস। কিন্তু চাহিদা ও উৎপাদনের মধ্যে রহিয়াছে বিরাট এক ব্যবধান। এই ব্যবধান অন্ততঃ আংশিকভাবে পূরণ করিবে পারমাণবিক শক্তি। তারাপুরে ইতিমধ্যেই তাহার শুভ সূচনা হইয়াছে। কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি, ইউরেনিয়ামের ভাণ্ডার আমাদের খুবই সীমিত। এদিকে থোরিয়ামের ভাণ্ডার অফুরন্ত। তাই থোরিয়াম হইতে পারমাণবিক জ্বালানী উৎপাদনের এই প্রকল্পের বাস্তব রূপায়ণে দেশে এক নূতন গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের সূচনা হইবে। কারণ আমাদের অতুলনীয় থোরিয়াম সম্পদ, যাহা জ্বালানী হিসাবে এতদিন নিতান্তই অব্যবহার্য ছিল, তাহাকে শক্তি-উৎপাদনের নামভূমিকায় দেখিতে পাইব।

জৈব ও অজৈব তন্তু

শ্রীসুকুমার শেঠ

জৈব তন্তুর মূল উপাদান হলো সেলুলোজ। সেলুলোজ হলো একটি জটিল জৈব রাসায়নিক যৌগ। এটি উদ্ভিদদেহের একটি মুখ্য উপাদান, যা উদ্ভিদদেহে সৃষ্টি হয় প্রাকৃতিক রাসায়নিক বিক্রিয়ায়। উদ্ভিদ তার পাতার ছিদ্র বা ষ্টোমাটার সাহায্যে বায়ুর কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে এবং দেহস্থ জল ও সূর্যকিরণের সাহায্যে পাতার সবুজ-কণিকা বা ক্লোরোফিলের আশ্চর্য কার্যকারিতায় নিজদেহে প্রথমে গ্লুকোজ এবং তা-থেকে পরে সেলুলোজ উৎপন্ন করে। উদ্ভিদের এই জৈব প্রক্রিয়াকে ফোটোসিন্থেসিস বা অঙ্গার-আত্তীকরণ বলা হয়।

$$xCO_2+xH_2O+h\nu \text{ (ফোটন বা আলোকশক্তি)} \longrightarrow (CH_2O)_x+xO_2$$

যখন $x=6$ $(CH_2O)_6=C_6H_{12}O_6$

গ্লুকোজ

$$n\ C_6H_{12}O_6 \longrightarrow (C_6H_{10}O_5)_n+nH_2O$$
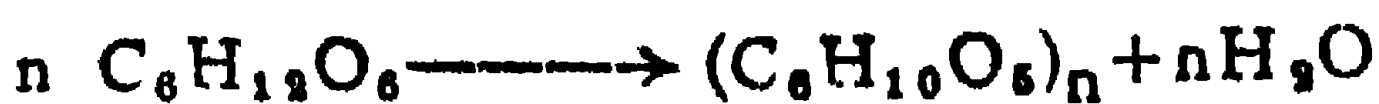
$n=$ একটি বড় সংখ্যা সেলুলোজ

প্রকৃতির বিচিত্র রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদদেহের এরূপ শত শত গ্লুকোজ অণু যুক্ত হয়ে এক একটি বৃহদাকায়ের সেলুলোজ অণু গঠিত হয়। এই সংযোগকালে দুটি পাশাপাশি গ্লুকোজ

অণু থেকে এক অণু জল বেরিয়ে যায় আর বাকী অংশ পরস্পর জুড়ে যায়।

উদ্ভিজ্জ পদার্থমাত্রই প্রধানতঃ সেলুলোজ জাতীয় পদার্থে গঠিত। কাঠের তন্তু, নানা রকম উদ্ভিজ্জ আঁশ, তুলা প্রভৃতির মুখ্য উপাদান হলো সেলুলোজ। তুলা বা কাঠের মণ্ড থেকে আমরা প্রায় বিশুদ্ধ সেলুলোজ পেতে পারি। আর এই উদ্ভিজ্জ সেলুলোজকে ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে কাগজ-শিল্প, নানাবিধ বিস্ফোরক পদার্থ, সেলুলয়েড, সেলোফেন, রেক্সিন প্রভৃতি নানারকম অত্যাশ্চর্য ও অতি প্রয়োজনীয় পদার্থ।

আমরা বস্ত্রশিল্পে জৈব তন্তুর কৃত্রিম-ব্যবহার সম্বন্ধে এস্থলে আলোচনা করবো। কৃত্রিম রেশম বা রেয়ন, টেরিলিন প্রভৃতির সঙ্গে আজ আমরা বেশ ভালভাবেই পরিচিত। বস্ত্রশিল্পে এগুলির ব্যবহার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

রেয়ন হলো কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত জৈব তন্তু, যার রাসায়নিক ভিত্তি হলো সেলুলোজ। রেয়ন শিল্প গত ষাট বছরে পৃথিবীতে অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। 1890 সালে সারা পৃথিবীতে রেয়ন উৎপন্ন হয়েছিল মাত্র 30,000 পাউণ্ড, যেখানে 1940 সালের মোট উৎপাদন হলো 2,380,000,000 পাউণ্ড। রেয়ন প্রস্তুতের বেশ কতকগুলি পদ্ধতি রয়েছে। যেমন:—

(1) সেলুলোজ-নাইট্রেট পদ্ধতি।

(2) কিউপ্রা-অ্যামোনিয়াম পদ্ধতি।

(3) সেলুলোজ-অ্যাসিটেট পদ্ধতি।

(4) ভিস্কস পদ্ধতি।

1968 সালে পৃথিবীর সমগ্র রেয়ন উৎপাদনের 73·5 শতাংশ ভিস্কস পদ্ধতিতে, 23·5 শতাংশ অ্যাসিটেট পদ্ধতিতে ও 3 শতাংশ কিউপ্রা-অ্যামোনিয়াম পদ্ধতিতে উৎপাদিত হয়েছে। নাইট্রো-সেলুলোজ পদ্ধতি আজকাল প্রায় অচল আর বাকী পদ্ধতিগুলির মধ্যে ভিস্কস পদ্ধতির গুরুত্বই সর্বাধিক। সুতরাং এর শিল্প-প্রস্তুতি সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা হচ্ছে।

ভিস্কস পদ্ধতি

1893 সালে দু-জন বৃটিশ রসায়ন-বিজ্ঞানী বিভান ও ক্রশ যুগ্মভাবে এই পদ্ধতির উদ্ভাবন করেন। এই পদ্ধতিটি ফরাসী দেশে বিজ্ঞানী শারদোন কর্তৃক 1889 সালে উদ্ভাবিত কৃত্রিম রেশম উৎপাদনের পদ্ধতিরই প্রায় অনুরূপ।

সেলুলোজের উৎস:—এই পদ্ধতিতে সেলু-লোজ উৎপাদনের প্রধান উৎস হলো কাঠের মণ্ড বা বিশুদ্ধিকৃত তুলার আঁশ। বর্তমানে অবশ্য কাঠের মণ্ডই বেশী ব্যবহৃত হয়। কারণ এতে আল্‌ফা সেলুলোজ রয়েছে শতকরা 88 থেকে 98 ভাগ। প্রথমে কাঠকে পাতলা পাতে কেটে নেওয়া হয়, তারপর এগুলির সঙ্গে অ্যাসিড সালফার নামক রাসায়নিক পদার্থ মিশিয়ে বেশ কয়েক দিন তাপ ও জলীয় বাষ্প-নিয়ন্ত্রিত আবদ্ধ কক্ষে রেখে দেওয়া হয়। এর ফলে কাঠের জৈব ও ধাতব অংশ দ্রবীভূত হয়ে বেরিয়ে যায় আর তার সেলুলোজ বা কাঠের তন্তুগুলি বিচ্ছিন্ন হয়ে তুলার মত হয়ে পড়ে।

অ্যালকালি সেলুলোজ—এই কাঠের মজ্জা ঠিকমত প্রস্তুত হবার পর সেগুলিকে 17% থেকে 18% কষ্টিক সোডা দ্রবণে একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় প্রায় ঘণ্টাখানেক চাপে রেখে দেওয়া হয়। আল্‌ফা সেলুলোজ বাদে বিটা ও গামা সেলুলোজ দ্রবীভূত হয়ে নলের সাহায্যে বের হয়ে যায়। তখন সেই ভেজা অ্যালকালি সেলুলোজ পাম্পের সাহায্যে চাপ দিয়ে শুষ্ক করা হয় এবং এটাকে 20°C-এর নিম্ন তাপমাত্রায় রাখা হয়। এর পর এটাকে একটি তাপনিয়ন্ত্রিত কক্ষে নিয়ে বেশ কয়েক দিন বাতাসের সংস্পর্শে রেখে দেওয়া হয়। এর ফলে এটা তখন জারিত হবার সুযোগ পায়।

সেলুলোজ জ্যান্থেট—অ্যালকালি সেলুলোজ

বিশেষভাবে প্রস্তুত হবার পর এটাকে কয়েক ঘণ্টা কার্বন ডাই-সালফাইড দ্রবণের সঙ্গে নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় বিক্রিয়া করানো হয়। এর ফলে প্রস্তুত হয় সেলুলোজ-জ্যান্থেট।

$$(\text{সেলুলোজ})ONa + CS_2 \rightarrow SC\begin{cases} O\ (\text{সেলুলোজ}) \\ S.Na \end{cases}$$
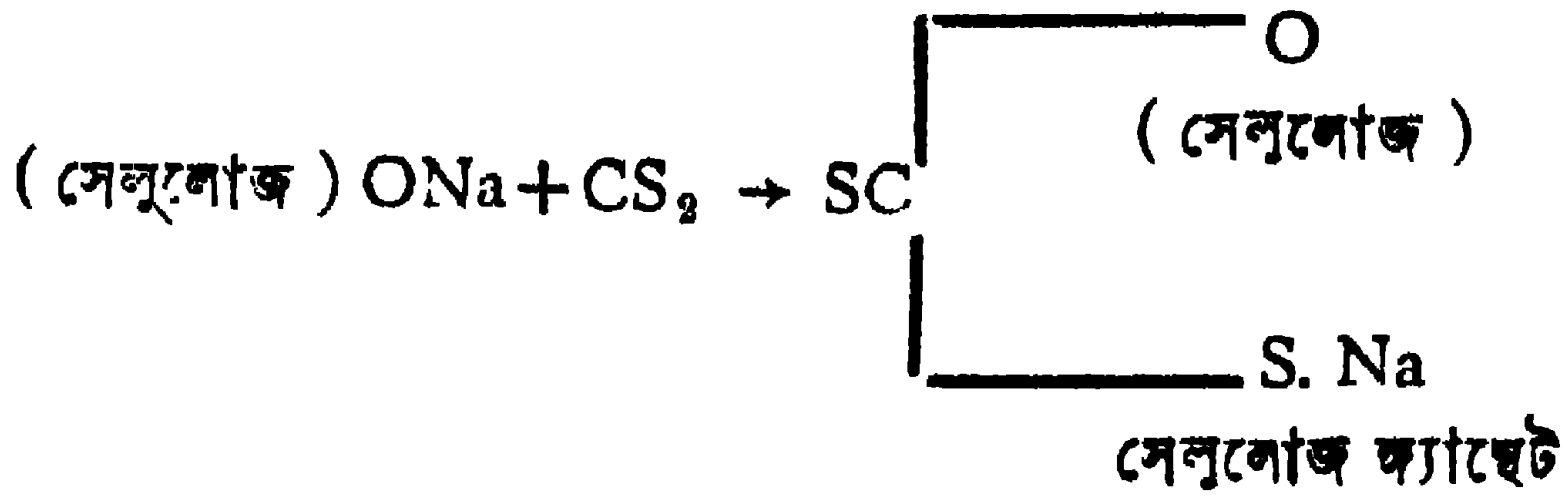
অ্যালকালি সেলুলোজ   সেলুলোজ জ্যান্থেট   সেলুলোজ জ্যান্থেট

সেলুলোজ জ্যান্থেট ঘন সিরাপের মত কমলা রঙের তরল পদার্থ। সুতরাং যখন দ্রবণের বর্ণ সাদা থেকে হলুদ এবং তাথেকে কমলা রঙের হবে, তখন বুঝতে হবে বিক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়েছে এবং তখন বাড়্‌তি কার্বন ডাই-সালফাইড বাষ্পাকারে বের করে সেলুলোজ জ্যান্থেটকে একটি পাত্রে স্থানান্তরিত করা হয়, যাকে বলা হয় দ্রাবক পাত্র।

সুতা তৈরির দ্রবণ প্রস্তুতিকরণ

দ্রাবক পাত্র পাত্‌লা কষ্টিক সোডা দ্রবণে পূর্ণ থাকে। সুতরাং সেলুলোজ জ্যান্থেট যখন সেই কষ্টিক সোডা দ্রবণে দ্রবীভূত হয়, তখন সেই দ্রবণে 9.25% সেলুলোজ ও 6.5% কষ্টিক সোডা থাকে। এটা ঈষৎ বাদামী রঙের সবুজ আঠালো পদার্থ। এখন এর থেকেই সুতা প্রস্তুত করা যায়। কিন্তু সেই সুতার বস্ত্রাদি আসল রেশম অপেক্ষা অনেক চক্‌চকে হয় এবং বহুলাংশে রুচিবহির্ভূত হয়ে পড়ে। এজন্যে ঐ দ্রবণের সঙ্গে টাইটেনিয়াম অক্সাইড নামক একটি পদার্থ মেশানো হয়, যাতে দ্রবণ থেকে প্রস্তুত সুতার অধিক চাকচিক্য কমিয়ে এটাকে আসল রেশমের মত করা সম্ভব হয়। এখন প্রশ্ন হলো, টাইটেনিয়াম অক্সাইড দ্রবণের সঙ্গে মেশালেই এর ঔজ্জ্বল্য হ্রাস পায় কেন? এর কারণ হলো টাইটেনিয়াম অক্সাইডের প্রতিসরাঙ্ক সেলুলোজ দ্রবণের অপেক্ষা বেশী।

এবার আঠালো দ্রবণ পরিস্রুত করা হয়, যাতে অন্যান্য ময়লা ও অদ্রবীভূত সেলুলোজ পৃথক করা সম্ভব হয়। এর পর ঐ দ্রবণ পাম্প করে বড় বড় ট্যাঙ্কে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানে বেশ কয়েক দিন 16°C তাপমাত্রায় রেখে দেওয়া হয়। যখন পরীক্ষার দ্বারা বোঝা যায় যে, সুতা প্রস্তুতের জন্যে দ্রবণের যে ভিস্‌কোসিটি প্রয়োজন, তাতে পৌঁছানো গেছে, তখনই এটাকে পাম্প করে সুতাকলে (স্পিনার্ট) নেওয়া হয়।

সুতা প্রস্তুতিকরণ

প্রত্যেকটি স্পিনার্ট নিজস্ব এক-একটি পাম্পের দ্বারা পরিচালিত হয় এবং ভিস্‌কস দ্রবণ উপযুক্ত চাপে তার মধ্যে রাখা হয়। স্পিনার্টের বহির্মুখ একটি ঘনীভবন পাত্রের মধ্যে ঢুকানো থাকে। এই ঘনীভবন পাত্রে থাকে 8% থেকে 10% সালফিউরিক অ্যাসিড, 13.5% থেকে 20% সোডিয়াম সালফেট ও প্রায় 1% জিঙ্ক সালফেট এবং 4% থেকে 10% গ্লুকোজ। যখন ভিস্‌কস দ্রবণ চাপে স্পিনার্টের সূক্ষ্মমুখ থেকে বহির্গত হয়ে এই দ্রবণের সংস্পর্শে আসে, তৎক্ষণাৎ এটা জমে শক্ত সুতায় পরিণত হয়। এই পুনর্গঠিত সেলুলোজের সুতাগুলি আসল রেশমের মত চক্‌চকে ও উজ্জ্বল। আর এই সুতা থেকেই প্রস্তুত হয় নানা রকম রেয়নের বস্ত্রাদি।

এতক্ষণ আমরা জৈব তন্তু সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। এখন অজৈব তন্তু সম্বন্ধে আলোচনা করা হচ্ছে। বর্তমানে রকেট-বিজ্ঞানে উচ্চ তাপ-সহ খুব শক্ত তন্তুর প্রয়োজন। যে সমস্ত তন্তুর ঘনত্ব কম, প্রায় 200°F-এর উপর তাপমাত্রায় কাজ করতে পারে, যেগুলির প্রসারণ শক্তি প্রতি বর্গইঞ্চিতে 100,000 পাউণ্ডের বেশী এবং স্থিতিস্থাপক গুণাঙ্ক 30,000,000-এর উপর, সেই সমস্ত তন্তু বর্তমানে রকেট-বিজ্ঞানে কার্যোপযোগী তন্তু বলে বিবেচ্য। কয়েকটি বিশেষ অজৈব পদার্থ, যেমন—সিলিকা বোরন, সিলিকন কার্বাইড, বোরন নাইট্রাইড বা গ্র্যাফাইট থেকেই উপরিউক্ত গুণসম্পন্ন তন্তু প্রস্তুত করা সম্ভব। এখন দেখা যাক, জৈব তন্তুতে উপরিউক্ত গুণগুলি কেন পাওয়া যায় না। প্রথমতঃ জৈব তন্তুর অণুগুলির প্রতি পরমাণু সমযোজক (Co-valence) বন্ধনীর দ্বারা আবদ্ধ, যেখানে অজৈব তন্তুর অণুগুলির প্রতি দুটি পরমাণু তড়িৎযোজক (Electro-valence) বন্ধনীর দ্বারা আবদ্ধ। সমযোজক বন্ধনীতে দুটি পরমাণুই একটি করে ইলেকট্রন দান করে একটি ইলেকট্রন যুগলের সৃষ্টি করে। এই দুটি ইলেকট্রনের বিপরীত ঘূর্ণনের জন্যে উদ্ভূত আকর্ষণ তাদের পারস্পরিক বিকর্ষণ অপেক্ষা বেশী বলে সমযোজী যৌগ স্থায়ী হয়। কিন্তু সমযোজী বন্ধন তড়িৎযোজী বন্ধন অপেক্ষা অনেক দুর্বল। কারণ তড়িৎযোজী বন্ধনে ইলেকট্রনের আদান-প্রদানের ফলে একটি পরমাণু পরা-তড়িৎযুক্ত আয়নে এবং অপর পরমাণু অপরা তড়িৎযুক্ত আয়নে পরিণত হয়। ফলে বিপরীত তড়িৎধর্মের জন্যে একটি শক্তিশালী কুলম্বিক বলের সৃষ্টি হয় এবং বিপরীত তড়িৎ-শক্তিতে আকৃষ্ট হয়ে আয়ন দুটি পরস্পর যুক্ত থাকে এবং যৌগের সৃষ্টি করে। সে জন্যে অজৈব তন্তুর অণুগুলি জৈব তন্তুর অণু অপেক্ষা অধিকতর শক্ত। বন্ধন যত বেশী শক্ত হবে, তাকে ভাঙতে তত বেশী তাপশক্তির প্রয়োজন হবে। সে জন্যে অজৈব তন্তুগুলি বেশ তাপসহ।

অজৈব তন্তুগুলির তাপসহনশীলতা ও প্রসারণ শক্তির অপর একটি কারণ হলো, এদের গঠন-প্রণালী। এদের অণুগুলি প্রভূত পরিমাণে আড়াআড়িভাবে যুক্ত হয়ে গঠিত হয়, যা ভাঙতে গেলে অধিক তাপ শক্তির প্রয়োজন হয়।

কাচের তন্তু—অ্যাসিডিক সিলিকার সঙ্গে কিছু সংখ্যক ধাতব ও ক্ষারীয় অক্সাইড ও কার্বনেট (বিশেষ গুণসমন্বিত কাচের তন্তুর সংযুতি সারণীতে দেওয়া হলো) জলের উপস্থিতিতে বা অনুপস্থিতিতে ভালভাবে মিশিয়ে অতি উচ্চ তাপমাত্রায় গলানো হয়, যতক্ষণ পর্যন্ত না মিশ্র বাড়্‌তি গ্যাসের বুদ্‌বুদ মুক্ত হয়। এই গ্যাসের (বিশেষতঃ কার্বন ডাই-অক্সাইড) বুদ্‌বুদ জল ঢেলে বা বাতাসে ঠাণ্ডা করে দূরীভূত করা যায়। বুদ্‌বুদ দূরীভূত হবার পর কাচের এই সমসত্ত্ব মিশ্রণকে ছোট ছোট টুক্‌রায় ভেঙ্গে নেওয়া হয় এবং সূক্ষ্ম ছিদ্রসমন্বিত প্ল্যাটিনাম-রেডিয়াম উনুনে পুনরায় গলানো হয়। সেই গলা কাচের মণ্ডকে যান্ত্রিক উপায়ে চাপ দিয়ে সূক্ষ্ম ছিদ্রপথে দ্রুত গতিতে নির্গত করানো হয়। ফলে যে কাচের তন্তু পাওয়া যায়, তার ব্যাস হয় 0·00076 সে. মি. থেকে 0·00152 সে. মি.।

বিশেষ গুণসমন্বিত বিভিন্ন কাচতন্তুর সংযুতি

যৌগের নাম	সিলিকন ডাই-অক্সাইড	অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড	ম্যাগ্‌নেসিয়াম অক্সাইড	অ্যানহাইড্রাইড বোরন অক্সাইড	ক্ষারীয় অক্সাইড	অন্যান্য অক্সাইড
আণবিক সঙ্কেত	SiO_2	Al_2O_3	MgO	B_2O_3		
যৌগের সংখ্যা						
(1)	65	20	15	—	—	—
(2)	50	32·5	12·5	—	—	5*
(3)	50	35	7·5	—	—	7·5§
(4)	55	15	3	10	1	16☸
(5)	60	5	15	5	10	5☸

* ল্যান্থানাম অক্সাইড La_2O_3
§ বেরিলিয়াম অক্সাইড BeO
☸ ক্যালসিয়াম অক্সাইড CaO

কাচের তন্তুর বৈশিষ্ট্য হলো এর অদ্ভুত আকৃতিগত দৃঢ়তা ও তাপসহনশীলতা। যখন অ্যাসিডিক সিলিকা ক্ষারীয় অক্সাইডের দ্বারা উচ্চ তাপমাত্রায় প্রশমিত হয়, তখন তিন মাত্রাবিশিষ্ট আড়াআড়ি সংযুক্ত অতিকায় কাচের অণু গঠিত হয়। ফলে কাচের তন্তুর আকৃতিগত দৃঢ়তা বৃদ্ধি পায়। মিশ্রণের সঙ্গে বেরিলিয়াম অক্সাইড মেশানোর ফলে কাচের তন্তুর স্থিতিস্থাপক গুণাঙ্ক বৃদ্ধি পায়। কারণ এটি BeO_4 রূপে আভ্যন্তরীণ সংযোজনের সৃষ্টি করে।

কাচতন্তুর প্রাগুক্ত গুণগুলির জন্যে আজ রকেট-বিজ্ঞানে, মিসাইল প্রস্তুতিতে এবং সুপারসনিক বিমানে এর বহুল ব্যবহার দেখা যায়। আমেরিকার বাজারে বহুল প্রচলিত কাচতন্তু হলো বিটা আর্ন, যার ব্যাস হলো 0·00038 সে. মি.। জৈব তন্তু অপেক্ষা এটি বেশ নরম এবং যেখানে জৈব তন্তুর জামাকাপড় সুবিধাজনক নয় (যেমন কারখানার বয়লার বা অধিক তাপযুক্ত স্থানে), সেখানে এই কাচতন্তুর জামা-প্যান্ট বিশেষভাবে উপযুক্ত। এছাড়া বর্তমানে জিনিষপত্রের ঢাকনা, লোহের চাদর, রবারের বাহক বেল্টকে শক্তিশালী করবার জন্যে কাচের তন্তু ব্যবহৃত হচ্ছে। এগুলি গুণগত দিকে উৎকৃষ্ট ও দামেও সস্তা হওয়ায় আমেরিকার বাজারে নাইলন, রেয়ন, টেরিলিনের বদলে এগুলি দ্রুত প্রসার লাভ করেছে। আমরা আশা করতে পারি, অদূর ভবিষ্যৎ আমাদের দেশেও কাচ, সিলিকন কার্বাইড, বোরন নাইট্রাইড, গ্র্যাফাইট প্রভৃতি অজৈব তন্তু প্রস্তুত করা সম্ভব হবে এবং এগুলির ব্যবহারও বৃদ্ধি পাবে। সুতরাং তখন কাউকে কাচের জামা-কাপড় পরে বেড়াতে দেখলে আমরা নিশ্চয়ই অবাক হবো না।

সাপ ও সাপের বিষ

শ্রীহরিমোহন কুণ্ডু*

অনেক সময় খবরের কাগজে দেখা যায় ওঝারা সাপে কাটা রোগীর রক্ত ক্ষতস্থান হইতে মুখ দিয়া শোষণ করিয়া রোগীকে সম্পূর্ণ সুস্থ করিয়া তোলেন। সাধারণ মানুষ এই সমস্ত ঘটনাকে এক অলৌকিক ব্যাপার বলিয়া মনে করেন। আসলে সাপের বিষ সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান না থাকায় সাপ সম্বন্ধে মানুষের একটা সাধারণ আতঙ্ক থাকে। বিষধর সাপ একদিকে যেমন মানুষের মৃত্যুর কারণ হইয়া থাকে, অন্যদিকে সাপের বিষ এবং সাধারণভাবে সর্প-জগৎ মানব সভ্যতার অগ্রগতিতে এক বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছে।

বিষধর সর্পের বিষগ্রন্থি

1943 সালে Smith-এর গণনা অনুসারে ভারতবর্ষে মোট 216 রকম প্রজাতির সাপ আছে। এর মধ্যে মাত্র 52 রকম প্রজাতি বিষধর সাপ। বিষধর সাপগুলি তিনটি পরিবারের (Family) অন্তর্ভুক্ত।

(ক) হাইড্রোফিডি (Hydrophidae)—সব রকমের সামুদ্রিক সাপ।

(খ) এলাপিডি (Elapidae)—সব রকমের গোখরা, কেউটে এবং চিতি সাপ।

(গ) ভাইপারিডি (Viperidae)—সব রকমের বোরা সাপ।

বিষগ্রন্থির অবস্থান

সব বিষধর সাপের চোখের পিছন দিকে কিন্তু মুখের ভিতরে একজোড়া বিষগ্রন্থি থাকে। এই বিষগ্রন্থি হইল পরিবর্তিত লালাগ্রন্থি, যাহার মধ্যে থাকে কিছু সংখ্যক বিশেষ ধরণের কোষ। ঐ

*প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, বাঁকুড়া সম্মিলনী কলেজ, বাঁকুড়া

কোষগুলি হইতে বিভিন্ন রকমের এনজাইম নির্গত হয় এবং লালাগ্রন্থিকে বিষগ্রন্থিতে রূপান্তরিত করে। প্রতিটি বিষগ্রন্থি হইতে একটি করিয়া সরু নল সামনের দিকে অগ্রসর হইয়া আসে এবং বিষদাঁতের গোড়ায় গিয়া উহা শেষ হয়। বিষধর সাপের উভয় চোয়ালে প্রচুর ছোট ছোট দাঁত থাকে। তাহার মধ্যে উপরের চোয়ালের সামনের দিকে যে দুইটি বিশেষ ধরণের বড় দাঁত থাকে, উহাদিগকে বিষদাঁত বলে। বিষহীন সাপের বিষদাঁত থাকে না এবং সব দাঁতই ছোট ছোট। বিষদাঁত দুই রকমের হয়—

(ক) ফাঁপা বিষদাঁত—এই ধরণের বিষদাঁতের মধ্য দিয়া একটি সরু নালী থাকে এবং অগ্রভাগে ছিদ্র থাকে। এই ধরণের বিষদাঁত বোরা সাপের দেখা যায়। ইহা ইচ্ছামত ঘোরানো যায়।

(খ) খোলা নালীযুক্ত বিষদাঁত—এই ধরণের বিষদাঁতের গায়ে একটি খোলা সরু নালী থাকে, যাহা দাঁতের অগ্রভাগ পর্যন্ত বিস্তৃত। ইহা গোখরা, চিতি ও সামুদ্রিক সাপের মধ্যে দেখা যায়। ইহা ঘোরানো যায় না।

সামগ্রিকভাবে বিষযন্ত্র ইঞ্জেকশনের সিরিঞ্জের মত কাজ করে। সাপ কামড়াইবার সঙ্গে সঙ্গে বিষগ্রন্থিতে চাপ পড়ে এবং বিষগ্রন্থি হইতে তরল বিষ নির্গত হইয়া নালী দিয়া বিষ দাঁতে আসে এবং ক্ষতস্থানে বিষ ঢালিয়া দেয়। বিষদাঁত ভাঙিয়া গেলে নূতনভাবে গজাইতে পারে।
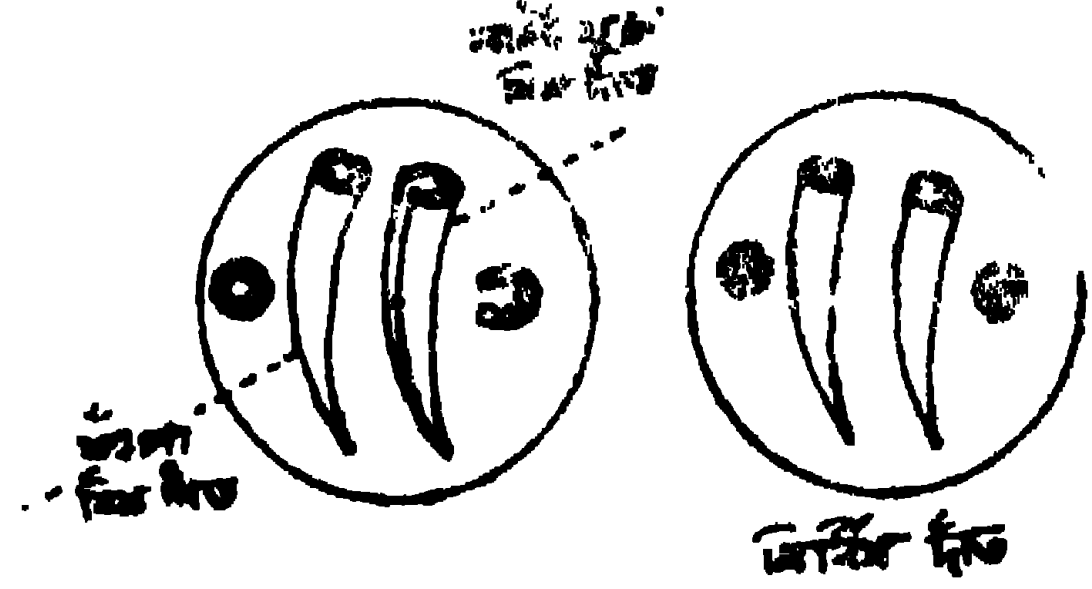
সাপের বিষদাঁত

বিষ নির্গমনের পরিমাপ

একটি বিষধর সাপ একবার কামড়াইলেই বিষ শেষ হইয়া যায় না। পর পর কয়েক বার কামড়াইলেও প্রতি কামড়ের সঙ্গে বিষ থাকে। বোম্বাইয়ের হফকিন্‌স্‌ ইনষ্টিটিউটে ডাঃ দেবরাজ 1959 সালে এক নিরীক্ষা চালান। প্রতি এক মাস অন্তর তিনি কয়েকটি ভারতীয় বিষধর সাপের বিষ নির্গমনের পরিমাপ গ্রহণ করেন এবং ঐ বিষকে শুষ্ক করিয়া তিনি যে ওজন নেন, তাহা নিম্নে দেওয়া হইল।

সাপের নাম	প্রতিমাসে সংগৃহীত শুষ্ক বিষের পরিমাপ	মানুষের মৃত্যু ঘটাইবার জন্য ঐ বিষের সর্বোচ্চ পরিমাণ
1. গোখরা (Cobra)	0·2 গ্রাম	12 মিলিগ্রাম
2. চন্দ্রবোরা (Russels viper)	0·15 „	15 „
3. চিতি (Krait)	0·022 „	6 „
4. একিস বোরা (Echis)	0·0046 „	8 „

বিষধর সাপ জন্মের প্রথম দিন হইতে অর্থাৎ ডিম হইতে বাহির হইয়া আসিবার সঙ্গে সঙ্গে বিষ ধারণ করে। কিন্তু বিষের পরিমাপ বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে বিভিন্ন রকম হয়। তাহা ছাড়া বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিষের পরিমাণও বাড়ে। শীতকালে পরিমাণ কমে, গ্রীষ্মে সবচেয়ে বেশী হয়। স্ত্রী-সাপের চেয়ে পুরুষ সাপের বিষের পরিমাণ বেশী।

বিষের ভৌত ও রাসায়নিক ধর্ম

গোখরা সাপের বিষ টাট্‌কা অবস্থায় স্বচ্ছ ও হাল্‌কা হলুদ রঙের। কিছুটা ঘন, শীতকালে ঘনত্ব বেশী। বোরা সাপের বিষ সাধারণতঃ সাদা, কখনও কখনও হাল্‌কা হলুদ রঙের হয়। সাপের বিষের আস্বাদ অম্ল। শুষ্ক অবস্থায় সূচের মত সরু সরু দানা বাঁধে এবং ঐ দানা জলে সহজেই দ্রবীভূত হয়।

Kellaway, 1939 এবং Porges, 1963 সালে দেখাইয়াছেন যে, সাপের বিষে দুইটি বিষাক্ত প্রোটিন এনজাইম আছে। একটির নাম Phosphatidases এবং অন্যটির নাম Neurotoxin। এই দুইটি এনজাইম সরাসরি রক্তের সান্নিধ্যে না আসিলে কোন ক্ষতি করে না, কিন্তু পেটের মধ্যে গেলে হজমে সাহায্য করে। এই দুইটি বিষাক্ত এনজাইম ছাড়া সাপের বিষে অন্য যে সমস্ত এনজাইম থাকে, সেগুলির নাম ও কার্যকারিতা নিম্নে দেওয়া হইল।

(ক) Proteoses—ইহা প্রোটিনজাতীয় খাদ্যকে হজম করিতে সাহায্য করে।

(খ) Erepsin—ইহাও প্রোটিনজাতীয় খাদ্যকে হজম করিতে সাহায্য করে।

(গ) Cholinesterase—এই এনজাইম গোখরা সাপের বিষের মধ্যেই দেখা যায়। ইহা choline এবং acetic acid প্রস্তুত করিতে সাহায্য করে।

(ঘ) Hyaluronidase—ইহা বিষকে স্তন্যপায়ী জন্তুদের দেহের মধ্যে দ্রুত বিস্তার লাভ করিতে সাহায্য করে।

(ঙ) Ribonuclease and Desoxyribonuclease—ইহা অন্যান্য এনজাইমের কার্যকারীতাকে বৃদ্ধি করিয়া বিষকে আরও শক্তিশালী করে।

(চ) Ophio-oxidase :—এই এনজাইম বিষাক্ত নয়। ইহা পরিপাক ক্রিয়ায় এবং খাদ্যকে পচনে সাহায্য করে।

(ছ) Lecithinase—ইহা ধমনী ও শিরার প্রাচীরকে জারিত করে।

সুতরাং বিভিন্ন এনজাইমের কার্যকারিতা লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, সাপের ক্ষেত্রে এগুলি হজমেই সাহায্য করে।

মানবদেহে সাপের বিষের ক্রিয়া

মানবদেহে Phosphatidases এবং Neurotoxin এনজাইম বিষের কাজ করে। উক্ত দুইটি এনজাইম একই সাপের বিষে থাকে না। সুতরাং সাপের বিষ দুই রকমের এবং মানবদেহে উহাদের ক্রিয়াও দুই ধরণের।

(ক) ভাসোটক্সিন—এই ধরণের বিষে Phosphatidases এনজাইম থাকে। সাধারণতঃ বোরা সাপের বিষেই ইহা দেখা যায়। সাপে কামড়াইবার পর এই এনজাইম রক্তের সান্নিধ্যে আসিলে ইহা লোহিত কণিকার উপর ক্রিয়া শুরু করে এবং উহাকে ভাঙ্গিয়া ফেলে (Hæmolysis)। Lecithinase নামক এনজাইমটি পূর্বোক্ত এনজাইমের সঙ্গে এক সঙ্গে কাজ করে। উহা শরীরের মধ্যে অবস্থিত বিভিন্ন যন্ত্রের উপর যে পাত্‌লা আবরণী (Endothelium) থাকে, তাহার কোষ-প্রাচীরের উপর ক্রিয়া করে। Lecithinase কোষস্থ Oleic acid-কে ভাঙ্গিয়া Lysolecithin নামক আর একটি পদার্থের সৃষ্টি করে। Lysolecithin দ্রুত পাত্‌লা আবরণীর কোষ-প্রাচীরকে জারিত করিয়া শিরা ও ধমনীর প্রাচীরকে ভাঙ্গিয়া ফেলে। ফলে ফুসফুসের ভিতর প্রচুর রক্তপাত হয়। দেহের মধ্যে অন্যান্য স্থানেও রক্তপাত হইয়া থাকে। হৃৎপিণ্ডের কলার উপরেও নানারূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়।

(খ) নিউরো-টক্সিন—এই এনজাইম প্রধানতঃ গোখরা ও চিতি সাপেরবিষে দেখা যায়। উহা

স্নায়ুতন্ত্রের উপর ক্রিয়া করে। দেহ ক্রমশঃ অবশ হইয়া যায় এবং ধীরে ধীরে শ্বাস বন্ধ হইয়া আসে।

সাপে কামড়াইবার লক্ষণ

গোখরা ও কেউটে—এই সাপে কামড়াইলে ক্ষতস্থানে লাল দাগ হয় এবং অল্প জ্বালা করে। প্রায় আধ ঘণ্টা বাদে রোগীর ঘুমের ভাব দেখা যায় এবং কিছুটা নেশাচ্ছন্ন হয়। পাগুলি দুর্বল হইয়া আসে এবং বেশীক্ষণ দাঁড়াইতে পারে না। 40 মিনিট হইতে 1 ঘণ্টার মধ্যে মুখ দিয়া প্রচুর লালা গড়াইতে থাকে। বমিও হইতে পারে। ইহার পর ধীরে ধীরে দেহ অবশ হইয়া আসে। জিহ্বা ও গলনালী ফুলিতে আরম্ভ করে। ফলে রোগী কথা বলিতে ও ঢোক গিলিতে পারে না। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে শরীর সম্পূর্ণ অবশ হইয়া আসে। শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি মন্দীভূত হয়, হৃদ্‌-স্পন্দন বাড়ে। এক সময় শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হইয়া রোগী মারা যায়।

চিতি—এই সাপে কামড়াইলে লক্ষণগুলি গোখরার মতই দেখা যায়, কিন্তু জ্বালা-যন্ত্রণা একেবারে থাকে না। ঘুমের ভাব আরও বেশী হয়। তবে চিতি সাপে কামড়াইলে প্রস্রাবের সহিত অ্যালবুমেন থাকিতে পারে।

বোরা—এই সাপের দংশনে ক্ষতস্থান লাল হয় এবং তীব্র জ্বালা অনুভূত হয়। 15 মিনিটের মধ্যেই ক্ষতস্থান ফুলিতে সুরু করে এবং দূষিত রক্ত নির্গত হইতে পারে। জ্বালার তীব্রতা বাড়িতে থাকে। চোখের তারা উপরে উঠিয়া যায়। 1 ঘণ্টার মধ্যেই রোগী অজ্ঞান হইয়া যাইতে পারে।

প্রাথমিক চিকিৎসা

সাপে কামড়াইলে সঙ্গে সঙ্গে ক্ষতস্থানের কিছুটা উপরে রুমাল, রবারের দড়ি অথবা একখণ্ড কাপড়ের দ্বারা শক্ত করিয়া বাঁধনের প্রয়োজন, যাহাতে রক্ত সঞ্চালনের সঙ্গে বিষ দেহের অন্যান্য স্থানেও ছড়াইতে না পারে। তাহার পর দুইটি বিষদাঁতের ক্ষতস্থানে $\frac{1}{4}$ ইঞ্চি গর্ত করিয়া কাটিয়া ফেলিতে হইবে। ইহার পর দূষিত রক্তকে চুষিয়া অথবা পাম্পের সাহায্যে বাহির করিতে হইবে। মাঝে মাঝে Epsom লবণজল কাপড়ে ভিজাইয়া ক্ষতস্থানে দিলে অভিস্রবণের (Osmosis) সাহায্যে দূষিত লসিকাকে (Lymph) বাহির করিতে সাহায্য করে। অল্প পরিমাণ Potassium permanganet জলে গুলিয়া ক্ষতস্থানে দিলে জারণ-ক্রিয়ার সাহায্যে বিষকে কিছুটা প্রশমিত করিতে পারে। কিন্তু উহা শুষ্ক দানা বা ঘন করিয়া গুলিয়া কখনই দেওয়া উচিত নয়।

মুখের সাহায্যে চোষণ অপেক্ষা যন্ত্রের সাহায্যেই বিষাক্ত রক্ত বাহির করা উচিত। কারণ চোষণকারীর মুখে যদি কোন ক্ষত থাকে, তাহা হইলে বিষ তাহার রক্তের সান্নিধ্যে আসিতে পারে এবং ইহার ফলে সমূহ বিপদ ঘটিতে পারে।

সিরাম চিকিৎসা

বিভিন্ন সাপের বিষ সংগ্রহ করিয়া স্তন্যপায়ী জন্তু, সাধারণতঃ ঘোড়ার রক্তে অল্প পরিমাণে ইনজেকশনের সাহায্যে ঢুকাইয়া দেওয়া হয়। বিষের পরিমাণ এমন হওয়া চাই, যাহাতে ঘোড়ার প্রাণসংশয় না হয়। ইহাতে ঘোড়ার প্লাজ্‌মায় উক্ত বিষকে ধ্বংস করিবার জন্য কিছু Antibody তৈয়ারী হয়।

কিছু দিন পরে ঘোড়ার শরীরে আরও একটু বেশী পরিমাণে বিষ ঢুকাইয়া দেওয়া হয়। তখন প্লাজ্‌মায় আরও বেশী Antibody তৈয়ারী হয়। বিষের পরিমাণ ক্রমশঃ বাড়াইয়া যদি নিরীক্ষা করা হয়, তাহা হইলে দেখা যাইবে, ঘোড়ার প্লাজ্‌মায় এত বেশী Antibody তৈয়ারী হইয়াছে যে, ঐ ঘোড়ার প্লাজ্‌মা সংগ্রহ করিয়া সাপের

বিষের প্রতিষেধক তৈয়ারী করা যায় এবং উহা Antivenin নামে বাজারে বিক্রয় হয়। বিভিন্ন সাপের বিষের ক্রিয়া যেমন আলাদা, Antivenim-ও তেমনি আলাদা হইবে। এখন গোখরা, চিতি, বোরা সাপের Antivenin নির্দিষ্ট পরিমাণে মিশাইয়া Polyvalent anti-snake serum তৈয়ারী করা হয়। কোন্ সাপে কামড়াইয়াছে, জানা না গেলে প্রথমে ঐ সিরামই ইনজেক্‌শন দেওয়া হয়।

মানব সভ্যতায় সাপ

বিষধর সাপ যেমন মৃত্যুর কারণ, তেমনি এই সভ্যজগতে মানব সমাজে সাপের প্রয়োজনীয়তাও কম নয়। এই কারণেই বোধ হয়, হিন্দুশাস্ত্রে সাপকে মনসাদেবীর বাহন হিসাবে পূজা করিবার বিধান দেওয়া হইয়াছে। সর্প-দেবতার পূজা শুধু ভারতবর্ষে নয়, পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও হইয়া থাকে। সাপের উপকারিতা নিম্নে উল্লেখ করা হইল।

1. রোডেন্ট দমন:—কৃষকদের ক্ষেতে যখন ধান, গম প্রভৃতি শস্য পাকিয়া ওঠে, তখন মানুষের পরম শত্রু হিসাবে ইঁদুর, কাঠবিড়ালী প্রভৃতি জন্তুরা ঐ শস্যকে প্রচুর পরিমাণে নষ্ট করে। ইঁদুর আবার প্লেগ রোগেরও জীবাণু বহন করে। Dr. Kunhardt 1919 সালে হিসাব করিয়া দেখান যে, মাত্র কুড়ি বৎসরে শুধু ইঁদুরই ভারতবর্ষে 1241 কোটি টাকার সম্পত্তি নষ্ট করিয়াছে। এখন ঐ সমস্ত রোডেন্ট জাতীয় জন্তুদের দমন করিবার জন্য সাপের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে পৃথিবীর সব দেশের লোকই যথেষ্ট সচেতন।

2. খাদ্য হিসাবে সাপ—ময়াল সাপ (পাইথন) ভারতবর্ষ, চীন এবং ব্রহ্মদেশে খাদ্য হিসাবে প্রচলিত আছে। আমেরিকাসহ পশ্চিমী দেশ-গুলিতে ময়াল সাপের মাংস হোটেল-রেষ্টুরেন্টে সুস্বাদু খাদ্য হিসাবে পরিবেশিত হইয়া থাকে। আদিবাসীরা অন্যান্য বিষহীন সাপকেও খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করিয়া থাকে।

3. বেদেদের জীবিকা—বিভিন্ন দেশে জীবন্ত সাপের খেলা দেখাইয়া বেদেরা জীবিকা অর্জন করে।

4. সাপের চামড়া—সাপের চামড়ার চাহিদা যথেষ্ট। ইহা বেল্ট, জুতা, হাতব্যাগ, চিরুনি, সিগারেট এবং তামাক রাখিবার কেস প্রভৃতি তৈয়ারী করিতে কাজে লাগে। এমন কি, খেলাধূলার জন্য জ্যাকেট, ক্যাপ, নেকটাই প্রভৃতিও ইহার দ্বারা তৈয়ারী হয়। সাপের চামড়া দিয়া জুতার উপরিভাগ ঢাকিবার জন্য বাজারে ইহার প্রচুর চাহিদা। বই বাঁধাইয়ের কাজেও ইহার চাহিদা কম নয়। Dr. Klauber-এর হিসাব অনুযায়ী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারতবর্ষ, নেদারল্যাণ্ড, ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ প্রভৃতি দেশ হইতে বৎসরে 45 লক্ষ টাকার সাপের চামড়া পশ্চিমী দেশগুলিতে পাঠান হইত।

5. সাপের চর্বি—ইহা আয়ুর্বেদ চিকিৎসায় একটি প্রয়োজনীয় ঔষধ হিসাবে ব্যবহৃত হয়; বোরা সাপের চর্বি হইতে যে তেল তৈয়ারী হয়, তাহা টিউমার, অবশ হাত-পা এবং মোচড়ানো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে মালিশ হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

6. সাপের বিষের এনজাইম—সাপের বিষের বিভিন্ন এনজাইমকে বায়োকেমিষ্টরা বিভিন্ন কাজে প্রয়োগের জন্য ব্যাপক গবেষণা চালাইতে-ছেন।

7. ঔষধ হিসাবে সাপ—বিভিন্ন চিকিৎসায় সাপের বিষ খুবই উপকারী। Chopra এবং Chouhan 1940 সালে দেখাইয়াছেন যে, গোখরা সাপের বিষ স্নায়ুকুষ্ঠ (Neural leprosy) রোগে বিশেষ উপকারী। ঐ বিষ ক্রনিক স্নায়ুযন্ত্রণায়, পা ও হাতের গাঁটের যন্ত্রণায় (Arthritis) এবং

মৃগী রোগে ব্যবহার করা হয়। আমেরিকার চিকিৎসাশাস্ত্রে ক্যান্সার, মাথার যন্ত্রণা এবং স্নায়ুযন্ত্রণা প্রশমনে গোখরা সাপের বিষ ব্যবহৃত হয়। Pradhan এবং Patwabardhan (1941) বলিয়াছেন যে, Hæmophelia রোগ এবং জরায়ুতে রক্তপাত উপশমে বোরা সাপের বিষ খুবই কাজে লাগে। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় সাপের বিষ ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

কঠিন প্রোপেল্যাণ্ট

সত্যেন্দ্রনাথ গুপ্ত

প্রোপেল্যান্ট বলতে বোঝায় এমন কতকগুলি পদার্থ, যেগুলির বিস্ফোরণজাত শক্তি কোন কিছুকে অভীষ্ট দিকে প্রচণ্ড বেগে ধাবিত করে। বন্দুক-পিস্তলের কার্টিজের খোলে বা কামানের শেলে এবং রকেটের প্রচণ্ড গতির প্রয়োজনীয় ঘাত সৃষ্টির কাজে এরই ব্যবহার হয়। এগুলি নানা-রকমের হয়। পুরনো যুগে চলতো সোরা, কয়লা ও গন্ধকের মিশ্রণে প্রস্তুত গান পাউডার। কিন্তু এর ক্ষমতা খুবই সীমিত, তাই নতুন নতুন বিস্ফোরকের আবিষ্কার বাড়তে লাগলো। রকেটের প্রয়োজনে যেসব প্রোপেল্যান্ট ব্যবহৃত হয়, সেগুলিকে মোটামুটি দুই ভাগে ভাগ করা চলতে পারে—তরল ও কঠিন প্রোপেল্যান্ট। তরল প্রোপেল্যান্ট ব্যবস্থায় সাধারণতঃ তরল জ্বালানী ও তরল জারক আলাদাভাবে থাকে এবং জ্বলন-কক্ষে এই দুটির মিলন-ক্রিয়ার ফলে উত্তপ্ত গ্যাস প্রচণ্ড বেগে ধাবিত হয়ে রকেটটিকে ঊর্ধ্বগতি দান করে। কিন্তু কঠিন প্রোপেল্যান্ট জ্বলনকক্ষেই জমানো থাকে এবং প্রয়োজনমত প্রজ্বলন করানো হয়। আমরা এখানে কঠিন প্রোপেল্যান্টের কথা সংক্ষেপে আলোচনা করবো।

কঠিন প্রোপেল্যান্টকে প্রধানতঃ দুই ভাগে ভাগ করা চলতে পারে। দ্বিমূল প্রোপেল্যান্ট (Double base propellant) এবং বিমিশ্র প্রোপেল্যান্ট (Composite propellant)। উভয় প্রকার জ্বালানীর জন্যে মোটামুটি একই রকমের জ্বলনকক্ষ বা রকেট মোটর ব্যবহৃত হয়। খুব শক্ত ধরণের ইস্পাত দিয়ে সিলিণ্ডারাকৃতির এই কক্ষটি তৈরি করা হয় (ইস্পাতের টেনসাইল স্ট্রেংথ প্রতি বর্গইঞ্চিতে 200,000 পাউণ্ডেরও বেশী)। সমস্ত প্রোপেল্যান্টটাই কক্ষের ভিতরের দেয়ালের চারপাশে জমিয়ে দেওয়া হয় এবং মাঝ বরাবর একটি গর্ত করা থাকে, যার চারদিকে আগুন লাগাবার পর জ্বলতে থাকে। বৈদ্যুতিক উপায়ে একটি প্রচণ্ড তাপ-উৎপাদক বারুদে (পাইরো-টেকনিক) অগ্নিসংযোগ করা হয় এবং এর ফলেই জমানো প্রোপেল্যান্টের গর্ত বরাবর উন্মুক্ত পৃষ্ঠ জ্বলতে সুরু করে। উত্তপ্ত জ্বলনজাত গ্যাস প্রচণ্ড বেগে পিছনের উন্মুক্ত পথ দিয়ে বেরুতে থাকে এব প্রয়োজনীয় ঘাত সৃষ্টির ফলে রকেটটি ঊর্ধ্বগতি লাভ করে।

দ্বিমূল প্রোপেল্যান্ট উৎপন্ন হয় প্রধানতঃ নাইট্রোসেলুলোজ ও নাইট্রোগ্লিসারিনের মিশ্রণে। পদার্থদুটিকে মোটরকক্ষে প্রবেশ করিয়ে 45°-55° সে. তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করা হয়; ফলে দুটি পদার্থ বেশ ভালভাবে মিলে গিয়ে একটি কঠিন পদার্থরূপে কক্ষটির দেয়াল বরাবর বসে যায়। একটি দণ্ডের সাহায্যে ভিতরে জ্বলনক্রিয়ার উপযোগী উন্মুক্ত ক্ষেত্রের জন্যে গর্ত করা থাকে। অনেক সময় এছাড়াও জারক পদার্থ হিসাবে অ্যামো-

নিয়াম পারক্লোরেট এবং অ্যালুমিনিয়াম বা অন্য কোন ধাতব জ্বালানীও এর মধ্যে মিশ্রিত করে দেওয়া হয়। নাইট্রোগ্লিসারিনের সহজ বিস্ফোরকতার জন্যে অনেক সময় এর বদলে অন্য নাইট্রো যৌগ, যেমন—ডাইইথিলিন গ্লাইকল ডাইনাইট্রেট, ট্রাইইথিলিন গ্লাইকল ডাইনাইট্রেট বা ট্রাইমিথাইলল ইথেন ট্রাইনাইট্রেট ইত্যাদিও ব্যবহৃত হয়।

রকেটশিল্পে প্রোপেল্যাণ্টের গুণাগুণ সাধারণতঃ আপেক্ষিক ইম্‌পাল্‌স (Specific impulse) দিয়ে মাপা হয়। সেই পরিমাপকে উৎপন্ন ঘাত ও প্রোপেল্যাণ্ট পুড়ে যাবার হারের অনুপাত হিসাবে প্রকাশ করা হয়। কাজেই এর একক হিসাবে দেখানো হয় পাউণ্ড-সেকেণ্ড ইম্‌পাল্‌স অর্থাৎ পাউণ্ডপ্রতি প্রোপেল্যাণ্ট খরচে বা কেবলমাত্র সেকেণ্ডে। উপরিউক্ত দ্বিমূল প্রোপেল্যাণ্টে উৎপন্ন আপেক্ষিক ইমপাল্‌স বেশ কম, তাই আরও বেশী শক্তিশালী প্রোপেল্যাণ্টের খোঁজেই বিমিশ্র প্রোপেল্যাণ্টের উৎপত্তি হয়েছে।

বিমিশ্র প্রোপেল্যাণ্টের মূল কথা হলো, অ্যামোনিয়াম পারক্লোরেট বা অন্য কোন জারক পদার্থ এবং কোন ধাতব জ্বালানী কোন একটি ধারক (Binder) যৌগের মধ্যে মিলিয়ে পরে রাসায়নিক (Chemical crosslinking) পুরা জিনিষটাকে শক্ত কঠিন পদার্থে পরিণত করা। বর্তমানে ব্যবহৃত ধারকগুলি প্রধানতঃ পলিবিউটাডাইন-অ্যাক্রাইলিক অ্যাসিড, এপক্সাইড দিয়ে ক্রশলিঙ্ক করা পলিইউরিথেন এবং পলিসালফাইড।

প্রচলিত পলিমারগুলির মধ্যে পলিসালফাইড (Thiokol-ST)-এরই ব্যবহার বেশী। উপযুক্ত জৈব ডাইহ্যালাইড ও সোডিয়াম ডাইসালফাইডের বিক্রিয়ায় এই পলিমারটি উৎপন্ন হয়। এটিকে ব্যবহারের জন্যে প্রথমে এর আণবিক ওজন কমিয়ে একটি তেলের মত তরল পদার্থে পরিণত করা হয়। এর পরের কাজ প্রোপেল্যাণ্টের প্রয়োজনীয় জারক ও অন্যান্য জিনিষগুলি বেশ ভালভাবে মিশিয়ে ফেলা। উৎপন্ন ঘন তরল মিশ্রণটিকে এবার কোন ধাতব অক্সাইড (PbO_2) বা জৈব পারঅক্সাইড বা প্যারাকুইনোন ডাইঅক্সিমের সাহায্যে কঠিন অন্তর্বন্ধনিযুক্ত পলিমারে রূপান্তরিত করা হয়। আপেক্ষিক ইম্‌পাল্‌স বাড়াবার প্রয়োজনে অনেক সময় দুটি সালফাইড মূলকের মাঝে কার্বনের সংখ্যা বাড়িয়ে দেওয়া হয়, যেমন—ডোডেকামিথাইলিন পলিসালফাইডে দুটি সালফার পরমাণুর মধ্যে বারোটি কার্বন পরমাণু রয়েছে। একই রকম মূল পদ্ধতিতে পলিবুউটাডাইন-অ্যাক্রাইলিক অ্যাসিড কোপলিমার বা পলিপ্রোপাইলিন গ্লাইকল এবং ট্রাইয়ল-এর সঙ্গে জারক ও ধাতব জ্বালানী মিশিয়ে প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে এপক্সাইড় দিয়ে এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে টলাইলিন ডাইআইসোথায়ানেট দিয়ে পুরা তরল মিশ্রণটিকে কঠিন পলিমারে রূপান্তরিত করা হয়। অবশ্য এর জন্যে কিছু তাপ প্রয়োগের প্রয়োজন হয়। শেষোক্ত পদ্ধতিতে প্রস্তুত পলিমারটিই হলো পলিইউরিথেন। কঠিনীভূত করবার আগেই সমস্ত ঘন তরল মিশ্রণটিকে রকেট মোটরের মধ্যে ঢুকিয়ে নেওয়া হয় এবং জ্বলনের উপযোগী গর্ত তৈরির জন্যে একটি দণ্ড (Mandrel) মাঝ বরাবর ঢুকিয়ে রাখা হয়। এর পর সমগ্র মোটরটিকে প্রয়োজনীয় তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করা হয়; ফলে পদার্থটি রাসায়নিক অন্তর্বন্ধনীযুক্ত একটি কঠিন পদার্থ হিসাবে মোটরের মধ্যে জমে থাকে। ভিতরে জ্বলনক্রিয়ার উপযোগী পৃষ্ঠদেশ-সমন্বিত একটি গর্ত করবার জন্যে যে দণ্ডটি প্রবেশ করানো থাকে, এবার সেটিকে বের করে নেওয়া হয়।

বিমিশ্র প্রোপেল্যাণ্টে ধারক ছাড়াও থাকে একটি জারক ও কিছু ধাতব জ্বালানী। নাইট্রোনিয়াম পারক্লোরাইডকে বাদ দিলে অন্যান্য কঠিন জারকগুলি তরল জ্বালানীতে ব্যবহৃত তরল জারকের চেয়ে অনেক কম শক্তিশালী। ধাতব

পারক্লোরেট বা অ্যামোনিয়াম নাইট্রেটের তুলনায় অ্যামোনিয়াম পারক্লোরেট বেশী শক্তিশালী, তবে নাইট্রোনিয়াম পারক্লোরেটের মত নয়, যদিও অ্যামোনিয়াম পারক্লোরেটই ব্যবহারিক সুবিধার জন্যে বেশী ব্যবহৃত হয়।

প্রোপেল্যান্টের সঙ্গে ধাতু বা ধাতব অক্সাইড মেশানো থাকলে এর আপেক্ষিক ইম্‌পাল্‌স অনেক বেড়ে যায়। অ্যামোনিয়াম পারক্লোরেট জারক-যুক্ত প্রোপেল্যান্টে দেখা গেছে, অ্যালুমিনিয়াম মেশাবার ফলে আপেক্ষিক ইম্‌পাল্‌স প্রায় 17 সেকেণ্ড বেড়ে গেছে, 27 সেকেণ্ড বেড়ে যায় অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রাইড ব্যবহারে, 39 সেকেণ্ড বেরিলিয়ামে এবং 57 সেকেণ্ড বেরিলিয়াম হাইড্রাইড যোগ করায়।

বিভিন্ন ধারক পদার্থগুলির তুলনা করলে দেখা যায়, পলিইউরিথেন, পলিসালফাইড প্রভৃতির মধ্যে যেগুলিতে বিশেষ অক্সিজেন নেই, সেগুলি অনেকটা আদর্শ কার্বন-হাইড্রোজেন পলিমারের মতই কাজ দেয়। যেগুলিতে যথেষ্ট অক্সিজেন, যেমন—পলিএস্টার, কার্বন পরমাণুর সঙ্গে যুক্ত হিসাবে আছে, সেগুলি অপেক্ষাকৃত খারাপ ফল দেয়। কারণ এতে উৎপন্ন গ্যাসের গড় আণবিক ওজন কিছুটা বেশী হওয়ায় একই ওজনে কম আয়তনের গ্যাস সৃষ্টি করে। কিন্তু অক্সিজেন যদি অনেক বেশী দুর্বলভাবে, যেমন নাইট্রোজেনের সঙ্গে যুক্ত থাকে, তবে হাইড্রোকার্বনের তুলনীয় কাজই পাওয়া যায়। ধাতব পদার্থ না থাকলে আদর্শ জ্বলন-ক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন গ্যাসে নাইট্রোজেন, হাইড্রো-ক্লোরিক অ্যাসিড, জলীয় বাষ্প, কার্বন মনোক্সাইড ও কিছু কার্বন ডাই-অক্সাইড থাকে। ধাতু বা ধাতব হাইড্রাইড মিশ্রিত থাকলে ঐ ধাতুর অক্সাইড ও মুক্ত হাইড্রোজেনের উৎপত্তি হয়; ফলে উৎপন্ন গ্যাসের গড় আণবিক গুরুত্ব কমে যাওয়ায় মোট গ্যাসের আয়তনও বেড়ে গিয়ে অধিক ঘাতের সৃষ্টি করে।

পলিসালফাইডের বেলায় কঠিনীভূত করবার সময় সাবধান হতে হয়, যাতে বিক্রিয়াজাত অক্সিজেন বা জল প্রোপেল্যান্টের অভ্যন্তরে গ্যাস পকেটের সৃষ্টি না করে। পলিইউরিথেনের বেলায় কোন আলাদা রাসায়নিক উৎপন্ন না হওয়ায় এই অসুবিধা নেই। যে সব ধারকগুলি সহজে তাপে ভেঙ্গে যায় না, সেগুলি জারকের কার্যকর ঘনত্ব কমিয়ে দিয়ে জ্বলনক্রিয়ার গতিও কমিয়ে দেয়। আবার যেগুলি অল্প তাপে উচ্চ তাপ সৃষ্টি করে ভাঙ্গতে থাকে, তাতে জারকের বিক্রিয়ার গতিও বেড়ে যায়। নীচে কয়েকটি পলিমারের গুণাগুণ দেওয়া গেল।

ধারকের নাম (Binder)	ভাঙবার তাপমাত্রা, °সে. (Decomposition temp.)	জ্বলনগতি (অ্যামোঃ পারক্লোরেটযুক্ত) ইঃ/সে. 1000 psia চাপে
পলিইউরিথেন	>350	0·22
পলিবুটাডাইন-অ্যাক্রাইলিক অ্যাসিড কোপলিমার (Polybutadine acrylic acid copolymer)	300	0·30
পলিসালফাইড (Polysulfide)	150	0·50
নাইট্রোসেলুলোজ (Nitrocellulose)	90	0·65
সিলিকন (Silicon)	75	0·72

তরল জ্বালানীর রকেটের কঠিন জ্বালানী থেকে মূল সুবিধা হলো, তার ঘাতের দিক ও পরিমাণের প্রয়োজনমাফিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এবং উচ্চ শক্তির সমন্বয়। কারণ উচ্চ শক্তির জ্বালানী ও জারকগুলি হয় তরল, না হয় তরলীকৃত গ্যাস। অপর দিকে কঠিন জ্বালানীর মোটরে সুবিধা এর উপর বেশী নির্ভরতা, জটিলতামুক্ত সহজ জ্বালানী সংরক্ষণ ও সহজে এবং স্বল্প সময়ের মধ্যে ব্যবহারযোগ্যতা। কাজের রকমই ঠিক করে দেয় কোন্ ধরণের জ্বালানী বেশী উপযোগী। তবে কঠিন জ্বালানীর রকেটের ক্ষেত্রে সমস্ত প্রোপেল্যাণ্টটিই জ্বলনকক্ষে জমানো থাকায় রকেট মোটরটি একবারই চালানো যায়, ইচ্ছামত বারবার জ্বালানো ও বন্ধ করা চলে না।

এই ধরণের কঠিন জ্বালানীর রকেট সাধারণতঃ এমন সব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়, যেখানে অল্প ঘাত সৃষ্টি করে মূল রকেটের গতিপথ সংশোধন করবার প্রয়োজন হয়। এছাড়াও রেট্রো-রকেট অর্থাৎ আবহমণ্ডলে ফেরবার সময় মহাকাশযানের গতি কমিয়ে দেওয়া বা ক্ষেত্রবিশেষে মূল প্রক্ষেপণ ব্যবস্থাতেও এর ব্যবহার হয়।

আমেরিকার চন্দ্রাভিযানে ব্যবহৃত স্যাটার্ন-5 রকেটের জ্বালানী ব্যবস্থা সংক্ষেপে এই রকমের ছিল। প্রথম পর্যায়ে তরল অক্সিজেন ও কেরোসিন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ে তরল অক্সিজেন ও তরল হাইড্রোজেন। সার্ভিস মডিউলের জন্যে জারক নাইট্রোজেন টেট্রক্সাইড ও জ্বালানী হিসেবে হাইড্রাজিন ও ডাইমিথাইল হাইড্রাজিনের মিশ্রণ। উপরিউক্ত জ্বালানী ও জারক মিশলে আপনা থেকেই জ্বলে ওঠে, অগ্নিসংযোগের প্রয়োজন হয় না। কম্যাণ্ড মডিউলের প্রোপেল্যাণ্ট ছিল ঐ একই জারক ও মনোমিথাইল হাইড্রাজিন। হাইড্রাজিন ও ডাইমিথাইল হাইড্রাজিনের মিশ্রণ থেকে মনোমিথাইল হাইড্রাজিনের তাপসহন ক্ষমতা বেশী।

Launch escape system, অর্থাৎ যার কাজ হলো রকেট উৎক্ষেপণের সময় কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটলে মহাকাশচারীদের নিয়ে কম্যাণ্ড মডিউলটিকে মূল রকেট থেকে বিচ্ছিন্ন করে জোরে সরিয়ে আনবে। এই ব্যবস্থাটি ছিল তিনটি কঠিন প্রোপেল্যাণ্ট মোটর দিয়ে গড়া। এই প্রোপেল্যাণ্টের একটি মোটামুটি গঠন এখানে দেওয়া গেল। 72 ভাগ অ্যামোনিয়াম পারক্লোরেট, 22 ভাগ পলিসালফাইড ধারক, 2 ভাগ 20 মাইক্রন অ্যালুমিনিয়াম গুঁড়া, 2 ভাগ ফেরিক অক্সাইড, 1 ভাগ প্যারাকুইনোন ডাইঅক্সিম, 0·8 ভাগ ম্যাগ্‌নেসিয়াম অক্সাইড ও 0·1 ভাগ গন্ধক।

সরষের তেলে শিয়ালকাঁটার তেলের সংমিশ্রণ নির্ণয়ের পদ্ধতি

শ্রীপ্রশান্তকুমার বসু

সরষের তেলে শিয়ালকাঁটার সংমিশ্রণ—অনেকের মতে, এপিডেমিক ড্রপসি ও গ্লকুমা রোগের অন্যতম কারণ। শিয়ালকাঁটার বীজ দেখতেও অনেকটা সরষের বীজের মত। সে জন্যে এতে ভেজাল দেবার সম্ভাবনা বেশী। শিয়ালকাঁটার তেলে দুটি অ্যালকালয়েড আছে। একটির নাম সানগুইনারিন, অপরটির নাম ডাই-হাইড্রোসানগুই-নারিন। এদের বিষক্রিয়ার ফলেই নাকি উপরি-উক্ত রোগ দুটি হতে দেখা যায়। শিয়ালকাঁটার তেল সামান্য পরিমাণেও গ্রহণ নিষিদ্ধ এবং সরষের তেলে ভেজাল হিসাবে নিরূপণ করবার যথেষ্ট গুরুত্ব আছে।

যে সমস্ত প্রচলিত পদ্ধতিতে সরষের তেলে শিয়ালকাঁটার ভেজাল নির্ণয় করা হয়, তা হলো (1) নাইট্রিক অ্যাসিড পরীক্ষা, (2) ফেরিক ক্লোরাইড পরীক্ষা, (3) অতিবেগুনী রশ্মির প্রতিপ্রভা (Fluorescence) পরীক্ষা। প্রথম দুটি পরীক্ষার দ্বারাই সাধারণতঃ ভেজাল হিসাবে শিয়ালকাঁটার তেলের অস্তিত্ব ধরা হয়। অনেক সময় আকস্মিক সংমিশ্রণও ঘটে, অর্থাৎ শিয়ালকাঁটা গাছ সরষের ক্ষেতে পাশাপাশি জন্মায়। তারই সামান্য পরিমাণ সংমিশ্রণ ধরবার জন্যে 3য় পদ্ধতিই কার্যকরী। সংমিশ্রণের কারণ যাই হোক না কেন, স্বাস্থ্যহানিকর মাত্রা পর্যন্ত এটি নির্ণয় করা খুবই জরুরী কাজ।

নাইট্রিক অ্যাসিড পরীক্ষায় একটি পরীক্ষা নলে 5 মিলিলিটার তেলে 5 মিলিলিটার বিশুদ্ধ, বর্ণহীন নাইট্রিক অ্যাসিড ঢেলে দেওয়া হয়। কিছুক্ষণ নাড়বার পর যদি অ্যাসিডের অংশটা হলদে অথবা লাল্‌চে হয়ে ওঠে, তবে শিয়ালকাঁটার অস্তিত্ব আছে বলা যায়। এই পরীক্ষায় সর্বনিম্ন 0·5% শিয়ালকাঁটার তেলের ভেজাল ধরা যায়। দ্বিতীয় পরীক্ষায় 5 মিলিলিটার তেলের সঙ্গে 2 মিলিলিটার বিশুদ্ধ হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ও কয়েক ফোঁটা অ্যালকোহল সংমিশ্রিত করা হয়। ফুটন্ত জলের পাত্রে অ্যাসিড অংশটি পৃথক হবার পর 1 মিলিলিটার 10% ফেরিক ক্লোরাইড দ্রব দিয়ে ফুটন্ত গরম জলের পাত্রে পরীক্ষা নলটি 12 মিনিট ডুবিয়ে রাখবার পর তুলে নিলে সূচের মত সরু, কতকটা লাল্‌চে কমলালেবু রঙের স্ফটিক তলায় পড়ে থাকে। খালি চোখেও এগুলি দেখা যায় এবং অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে খুব স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়। এতে সর্বনিম্ন 0·25% শিয়ালকাঁটার তেলের ভেজাল ধরা যায়। শেষোক্ত পদ্ধতিটি হচ্ছে ক্রোমাটোগ্রাফির সাহায্যে অ্যালকালয়েড পৃথকীকরণ এবং অতিবেগুনী রশ্মির প্রভাবে কমলালেবু রঙের আলোক বিচ্ছুরণের দ্বারা দৃষ্টিগোচরে আনা। এই পদ্ধতিতে 0·005% অথবা তার নীচ পর্যন্ত শিয়ালকাঁটার ভেজালের পরিমাণ নির্ণয় করা যায়।

লেখক দীর্ঘদিন পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে তেল থেকে একটি বিশেষ পদ্ধতিতে অ্যালকালয়েড দুটিকে মুক্ত করে নিতে পেরেছেন। পরে সেই মুক্ত অ্যালকালয়েডকে ক্লোরোফরমে ঘন দ্রব তৈরি করে একটি ফিল্টার কাগজে দাগ ফেলে নাইট্রিক অ্যাসিড পরীক্ষা এবং একটি পরীক্ষা নলের মধ্যে ফেরিক ক্লোরাইড পরীক্ষা চালান। তাতে এই

পরীক্ষা ছুটির নির্ণয়ের নিম্নতম মাত্রা বেড়ে গিয়ে যথাক্রমে 0.01% এবং 0.02% নির্ণয় করা সম্ভব হয়। এছাড়াও মিলিকলাম ও ক্ষীণ স্তর ক্রোমাটো-গ্রাফিতে, নিজস্ব পদ্ধতিতে ছুটি অ্যালকালয়েডকে পৃথক করে অতিবেগুনী রশ্মির সাহায্যে দৃষ্টি-গোচর করা সম্ভব হয়েছে। যেখানে অতিবেগুনী রশ্মির ব্যবস্থা নেই, সেখানে অ্যান্টিমনি ট্রাই-ক্লোরাইড সহযোগে কমলালেবুর রঙের মত দাগ ফুটে ওঠে অ্যালকালয়েডগুলির অবস্থানের জায়গায়।

শেষোক্ত পদ্ধতির উপর নির্ভর করে লেখক শিয়ালকাঁটার তেলের পরিমাণ মাপবার একটি সহজ পদ্ধতি বের করেছেন। কলরিমিটার যন্ত্রের সাহায্যে রঙের গাঢ়তা মেপে বলে দেওয়া যায়, তেলের মধ্যে কতটা শিয়ালকাঁটার তেল আছে। এই সব পদ্ধতিতে অতি দ্রুত অর্থাৎ 15-20 মিনিটের মধ্যে শিয়ালকাঁটা তেলের অস্তিত্ব এবং পরিমাণ নির্ণয় করা যায়।

জৈব রসায়ন-বিজ্ঞানে অবলোহিত আলোক বর্ণালীর অবদান

কালীশঙ্কর মুখোপাধ্যায়*

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই বর্ণালীবীক্ষণ পদ্ধতিগুলি রসায়নশাস্ত্রের নানা সমস্যার সমাধানে নিখুঁতভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং বর্তমানে এদের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণী ক্ষমতা এবং প্রয়োজনীয়তা এমন একটা স্তরে পৌঁচেছে যে, কোন রাসায়নিক তত্ত্বের ব্যাখ্যা বর্ণালীবীক্ষণ পদ্ধতির দ্বারা সমর্থিত না হলে সেই তত্ত্বের সার্বিক প্রযুক্তি সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় না। অবলোহিত আলোক বর্ণালীবীক্ষণ পদ্ধতি (Infrared spectroscopy) এই সব যান্ত্রিক প্রয়োগ কৌশলের মধ্যে অন্যতম।

এই বিশেষ প্রয়োগ-কৌশলের মূল কথা হলো, যখন কোন রাসায়নিক যৌগের ভিতর দিয়ে আলোক-তরঙ্গ প্রবাহিত করানো হয়, তখন ঐ যৌগটি কিছু পরিমাণ আলোকশক্তি শোষণ করে, যার ফলে পরীক্ষাধীন যৌগটির অন্তঃস্থ শক্তির পরিবর্তন ঘটে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে—অবলোহিত এলাকার আলোক-শক্তি[1] শোষণের ফলে ঠিক কি ধরণের অন্তঃস্থ শক্তির পরিবর্তন ঘটতে পারে? দেখা গেছে, এই ধরণের আলোক-শক্তি যৌগের ঘূর্ণন এবং স্পন্দন-শক্তির পরিবর্তন ঘটাবার পক্ষে যথেষ্ট। সুতরাং ঐ আলোক-শক্তি শোষণের ফলে পরীক্ষাধীন যৌগটির বিশেষ অক্ষ বরাবর পারমাণবিক ঘূর্ণন ও স্পন্দন ব্যবস্থা পাল্টে যাবে। অতএব যে পরিমাণ শক্তি শোষিত হলো (যা ঘূর্ণন বা স্পন্দন-শক্তির পরিমাপক), তা যদি নিরূপণ করা যায় তা হলে বিবেচনাধীন যৌগটির

* কৃষ্ণনগর সরকারী কলেজ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া-1

1. সাধারণতঃ প্রয়োজনীয় অবলোহিত আলোক এলাকা হচ্ছে 2.5-16 মাইক্রন। এই এলাকায় আলোক-শক্তির পরিমাণ হচ্ছে প্রায় 1-10 K cal/mole। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, শক্তি শোষণের ফলে অণুটি উচ্চতর শক্তি স্তরে উন্নীত হয় এবং যখন অণুটি স্বাভাবিক স্তরে ফিরে আসে, তখন শোষিত শক্তি তাপ-শক্তির আকারে নির্গত হয়।

রাসায়নিক বণ্ডের প্রকৃতি অর্থাৎ সেটির কাঠামো সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া যেতে পারে। কারণ আমরা জানি, পারমাণবিক ঘূর্ণন ও স্পন্দন ব্যবস্থা রাসায়নিক বণ্ডের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত এবং প্রকৃতপক্ষে এই অর্থেই আলোচ্য প্রয়োগ-কৌশলটি জৈব রসায়নে ব্যবহৃত হয়। পারমাণবিক স্পন্দন ও ঘূর্ণন ব্যবস্থা অণুর পুরা কাঠামোর সঙ্গে ঠিক কিভাবে জড়িত, তা একটা উপমার সহায়তায় সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা যায়। কোন একটা অণুকে স্থির বস্তু বলে মনে না করে তার পরমাণুগুলিকে এক-একটা গোলক এবং বণ্ডগুলিকে ধাতব স্প্রিং হিসাবে আমরা কল্পনা করতে পারি। আমরা জানি, প্রত্যেকটি স্প্রিংয়ের নিজস্ব স্থিতিস্থাপকতা বা স্বাভাবিক স্পন্দন-কম্পাঙ্ক (Vibrational frequency) আছে এবং এও আমরা জানি, যখন কোন একটা গোলককে একটা স্প্রিং দিয়ে ঝুলিয়ে ক্রমাগত একটা চিহ্নিত স্থান অবধি টেনে ছেড়ে দেওয়া যায়, তখন ঐ গোলকটি একটা নির্দিষ্ট বিস্তার (Amplitude) ও কম্পাঙ্ক অনুযায়ী দুলতে থাকে। এখন এই দোদুল্যমান গোলকটির সঙ্গে যদি অন্য একটা গোলক আর একটা স্প্রিং দিয়ে ঝুলিয়ে দেওয়া যায় এবং প্রথমোক্ত গোলক-টিকে আগের চিহ্নিত স্থান অবধি টেনে এনে ছেড়ে দেওয়া যায় অর্থাৎ দোলানো যায়, তাহলে দেখা যাবে, এবার তার বিস্তার ও কম্পাঙ্ক আগের চেয়ে পৃথক হচ্ছে। সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি, কোন দুই গোলকের মধ্যবর্তী স্পন্দনগতি ঐ দুই গোলকের সঙ্গে সংযুক্ত স্প্রিং ও গোলকের উপর নির্ভরশীল। অতএব কোন একটা অতিকায় অণুকে যদি আমরা বিভিন্ন প্রসারণী শক্তির স্প্রিংয়ের সাহায্যে পারস্পরিক সংযুক্ত কতকগুলি গোলকের সমষ্টি বলে মনে করি, তাহলে যখন কোন একটা বিশেষ বস্তু (স্প্রিং) স্পন্দিত হবে, তখন ঐ অণুটির পুরা গঠন-ব্যবস্থা অল্পবিস্তর প্রভাবিত হবে এবং কোন একটা বিশেষ বণ্ডের অনুনাদীয় কম্পাঙ্ক পুরা অণুর উপর নির্ভর করবে। কাজেই পারমাণবিক স্পন্দন বা ঘূর্ণন-শক্তি নিরূপণ করতে পারলে পরীক্ষাধীন যৌগটির রাসায়নিক বণ্ডের প্রকৃতি এবং তার আণবিক কাঠামো সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া মোটেই অসম্ভব নয়।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা বিশেষ প্রয়োজন যে, প্রধানতঃ দু-রকমের পারমাণবিক স্পন্দন লক্ষ্য করা যায়,—(1) বণ্ডের সম্প্রসারণ ও সঙ্কোচন-জনিত স্পন্দন বা ষ্ট্রেচিং (streching), (2) বেণ্ডিং বা বিকৃতকরণ স্পন্দন। প্রথমোক্ত স্পন্দনে বণ্ডের সঙ্গে যুক্ত দুই পরমাণুর দূরত্ব কমতে বা বাড়তে পারে, কিন্তু তারা সব সময়ে একই অক্ষ বরাবর থাকে না। এই দুই প্রধান স্পন্দন কখনও যুক্তভাবে, কখনও বা বিপরীতমুখী হয়ে নানা ধরণের আণবিক বিকৃতকরণ স্পন্দন ঘটাতে পারে। কোয়াণ্টাম বলবিদ্যায় বলা হয়েছে, কোন অণু 'n' সংখ্যক পরমাণু নিয়ে গঠিত হলে সেই অণুটি $(3n-6)^2$ সংখ্যক স্বাভাবিক স্পন্দনের ফলে অবলোহিত এলাকার আলোক-শক্তি শোষণ করতে পারে, যেমন দেখা যায় কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2) অণুটি 3টি পরমাণু নিয়ে গঠিত। সুতরাং এই অণুটি $(3 \times 3-6) \equiv 3$ সংখ্যক স্বাভাবিক স্পন্দনের ফলে আলোচ্য শক্তি শোষণ করে।

এখানে উল্লেখযোগ্য, উপরিউক্ত স্পন্দনগুলির প্রত্যেকের স্পন্দন-কম্পাঙ্ক এক নয়, পৃথক পৃথক স্পন্দনের জন্যে পৃথক পৃথক কম্পাঙ্ক লক্ষ্য করা যায়। সুতরাং বিবেচনাধীন যে কোন

2. উপরিউক্ত স্বাভাবিক স্পন্দন ছাড়া আরও কিছু অতিরিক্ত স্পন্দনের ফলে আলোক-শক্তি শোষিত হতে পারে। এই অতিরিক্ত স্পন্দনগুলি ওভারটোন এবং হারমনিক্সের উপস্থিতির জন্যে লক্ষ্য করা যায়।

অণু অবলোহিত এলাকার বিভিন্ন তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের আলোক-শক্তি শোষণ করবে। কারণ আমরা জানি শক্তির শোষণ তখনই হবে, যখন স্পন্দনের ও আলোক-তরঙ্গের কম্পাঙ্ক একই হবে। যেহেতু বিভিন্ন তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের আলোক-শক্তির কম্পাঙ্ক বিভিন্ন, সুতরাং বিভিন্ন স্পন্দনের জন্যে বিভিন্ন তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের আলোক-শক্তি শোষিত হবে। অতএব 2·5 মাইক্রন তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য থেকে কোন অণুর উপর প্রয়োজনীয় আলোক-তরঙ্গ প্রবাহিত করে ধীরে ধীরে ঐ তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য বাড়াতে থাকলে পৃথক পৃথক স্পন্দনের (যা বিভিন্ন বণ্ডের উপস্থিতির জন্যে ঘটছে) জন্যে ভিন্ন ভিন্ন তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের আলোক-শক্তি শোষিত হবে। আলোচ্য পদ্ধতিতে ঐ শোষিত শক্তিগুলির পরিমাণ নির্ণয় করে একটা লেখচিত্রের সাহায্যে প্রকাশ করা হয়। এই লেখচিত্রের এক অক্ষ তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য আর অন্য অক্ষ শোষিত শক্তির পরিমাণ বা আলোকীয় ঘনত্ব সূচিত করে এবং শোষিত শক্তিগুলি এই লেখ-চিত্রের পৃথক পৃথক স্থানে শৃঙ্গের আকারে অবস্থান করে। সুতরাং এই লেখচিত্রের এক-একটা আলোকশৃঙ্গ এক-একটা বিশেষ বণ্ড বা কার্যকরী পুঞ্জের (Functional group) উপস্থিতি নির্দেশ করে এবং লেখচিত্রটিকে পরীক্ষাধীন যৌগের অবলোহিত আলোক বর্ণালী বলা হয় (1নং চিত্র)।

1নং চিত্র

আর একটা কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, পূর্বোক্ত সকল স্পন্দনের জন্যে আলোক-শক্তি শোষিত হয় না। পূর্বোক্ত স্পন্দনগুলির মধ্যে সেই বিশেষ ধরণের স্পন্দনের জন্যে আলোক-শক্তি শোষিত হবে, যাদের উপস্থিতির ফলে পরীক্ষাধীন অণুটির দ্বিমেরু মুহূর্তমান (Dipole moment value) পরিবর্তিত হতে পারে। কাজেই সুষম গুণাবলীসম্পন্ন অণুগুলির ক্ষেত্রে মোটামুটি একই ধরণের সরল বর্ণালী পাওয়া যায় এবং একই ধরণের রাসায়নিক বণ্ড বা কার্যকরী পুঞ্জ সকল অণুর ক্ষেত্রে মোটামুটি একটা নির্দিষ্ট তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য এলাকার আলোক-শক্তি শোষণ করে, যার ফলে ঐ সমস্ত এলাকাস্থিত শোষিত আলোক-শক্তি শৃঙ্গগুলিকে এক-একটা বিশেষ বণ্ড বা কার্যকরী পুঞ্জের উপস্থিতির ইঙ্গিতবাহক বলে গণ্য করা হয় (তালিকা দ্রষ্টব্য)।

তালিকা

বণ্ড বা কার্যকরী পুঞ্জ	যৌগের প্রকৃতি	আলোকশৃঙ্গের অবস্থান (মাইক্রন)
C—H	অ্যালকেন	3·38—3·51
C—H	অ্যালকিন	6·80—7·41 এবং 10—14·82
C—H	অ্যারোমেটিক	11·50—14·82
C—C	অ্যালকিন	5·95—6·10
C—O	কার্বনীল	5·68—5·92
O—H	মনোমেরিক কোহল বা ফিনল	2·80—2·90
O—H	হাইড্রোজেন বণ্ডেড	2·90—3·10
N—H	অ্যামিন	2·85—3·13

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কিভাবে এই যান্ত্রিক পদ্ধতিটি পরিচালনা করা হবে? সাধারণতঃ এই পদ্ধতিতে পরীক্ষাধীন যৌগটিকে ধাতব হেলাইড[3] নির্মিত একটা ছোট্ট চাকৃতিতে নিয়ে আর একটি অনুরূপ চাকৃতি দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয় এবং তার পর ঐ পাত্রটিকে বর্ণালীবীক্ষণ যন্ত্রের (Infra red spectrophotometer) রেকর্ডার ও আলোর উৎসস্থলের মধ্যবর্তী যে কোন একটা স্থানে বসানো হয়। আলোচ্য প্রক্রিয়ায় প্রধানতঃ নার্ষ্ট গ্লোয়ারকে (Nerst glower)[4] আলোক-তরঙ্গের উৎস হিসেবে ব্যবহার করা হয় এবং পরে প্রিজম্ বা গ্রেটিং ব্যবহার করে প্রয়োজনীয় মনোক্রোমেটিক আলোক-তরঙ্গের উৎপত্তি ঘটিয়ে তাকে পাত্রস্থিত যৌগের উপর প্রবাহিত করানো হয়। এখন যে পরিমাণ আলোক-শক্তি শোষিত হলো, তা যন্ত্রস্থিত স্বয়ংক্রিয় রেকর্ডারে লিপিবদ্ধ হয়। এই ভাবে পাত্রস্থিত যৌগ এবং আলোক-তরঙ্গের উৎসের দূরত্ব ধীরে ধীরে পরিবর্তন করে 2·5 থেকে 16 মাইক্রন এলাকার পৃথক পৃথক তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যে শোষিত আলোক-শক্তির পরিমাণ বা আলোকীয় ঘনত্ব নির্ণয় করবার পর সেগুলিকে লেখচিত্রের সাহায্যে প্রকাশ করা হয়। লেখচিত্রের কাগজগুলি স্বয়ংক্রিয় রেকর্ডারের সঙ্গে সংযুক্ত একটা ঘূর্ণায়মান স্তম্ভকে জড়ানো থাকে। সুতরাং ঐ লেখচিত্রটিকে আলাদাভাবে অঙ্কন করবার দরকার হয় না, পরীক্ষা শেষে স্বাভাবিকভাবেই ঐ লেখচিত্রটি অঙ্কিত অবস্থায় পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে একটা কথা উল্লেখ করা বিশেষ প্রয়োজন। পূর্বেই বলা হয়েছে লেখচিত্রের কাগজগুলি একটা ঘূর্ণায়মান স্তম্ভকে জড়ানো থাকে, কিন্তু সব সময়েই ঐ কাগজগুলিকে স্তম্ভকের একই জায়গায় জড়ানো সম্ভব হয় না। তাই ঐ লেখচিত্রের বিভিন্ন শৃঙ্গগুলির অবস্থান সঠিকভাবে সূচিত করবার জন্যে একটা মান-নির্দেশক রেখা (Calibration line) অঙ্কন করা হয়। এই উদ্দেশ্যে পলিষ্টাইরিন ব্যবহার করা হয়। পলিষ্টাইরিন অবলোহিত এলাকার 3·50, 6·23 এবং 11·03 মাইক্রনের কাছাকাছি স্থানে শৃঙ্গ প্রদর্শন করে। সুতরাং এই সকল শৃঙ্গের যে কোন একটাকে নির্দিষ্টমান বা ষ্ট্যাণ্ডার্ড ধরে নিয়ে তার পরিপ্রেক্ষিতে অন্যান্য শৃঙ্গগুলির অবস্থান সূচিত করা

3. সাধারণতঃ সোডিয়াম ক্লোরাইড-নির্মিত চাকৃতি ব্যবহার করা হয়। কাচ বা স্ফটিক-মণি-নির্মিত চাকৃতি ব্যবহার করা হয় না। কারণ ঐ সকল পদার্থ আলোচ্য এলাকায় বেশ ভালভাবে আলোক-শক্তি শোষণ করতে পারে।

4. নার্নষ্ট গ্লোয়ার হচ্ছে জার্কোনিয়াম, ইট্রিয়াম ও এরবিয়াম অক্সাইডের মিশ্রণে নির্মিত একটা দণ্ড। এটাকে বৈদ্যুতিক শক্তির সহায়তায় প্রায় 1500° তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করলে প্রয়োজনীয় আলোক-তরঙ্গের সৃষ্টি হয়।

হয় এবং তাদের অবস্থান সূচকের একক হচ্ছে মাইক্রন বা তরঙ্গ-সংখ্যা (Cm^{-1}); যেমন—3·01 মাইক্রন, 6·15 মাইক্রন ইত্যাদি।

আলোচ্য প্রয়োগ-কৌশলটি কঠিন, তরল বা গ্যাসীয় যে কোন জাতীয় যৌগের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তবে মনে রাখতে হবে, পরীক্ষাধীন যৌগটি যেন সম্পূর্ণরূপে জলমুক্ত হয়। কারণ জলের মধ্যে হাইড্রক্সিল (O—H) বণ্ড থাকায় বর্ণালীর 2·7 মাইক্রন বা $3710Cm^{-1}$-এর কাছাকাছি স্থানে বেশ তীব্র শৃঙ্গ দেখা যাবে। এর ফলে পরীক্ষাধীন যৌগের বর্ণালীর সঠিক ব্যাখ্যানে যথেষ্ট সংশয় দেখা দিতে পারে। পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর দেখা গেছে, কঠিন যৌগগুলিকে পটাশিয়াম ব্রোমাইডের (KBr) সঙ্গে মিশিয়ে খুব পাত্‌লা চাকৃতি করে নিলে নিখুঁৎভাবে বর্ণালী নির্ধারণ করা যায়। এই উদ্দেশ্যে এক থেকে দুই মিলিগ্র্যামের মত যৌগের সঙ্গে 100-200 মিলিগ্রাম পটাশিয়াম ব্রোমাইড ভাল করে মিশিয়ে ঐ মিশ্রণকে উচ্চ-চাপে ও উচ্চতাপমাত্রায় চাপ দিয়ে এক বা দুই মিলিমিটার পুরু একটা ছোট চাকৃতি করা হয় এবং তারপর যথারীতি পরীক্ষা পরিচালনা করা হয়।

পটাশিয়াম ব্রোমাইডের চাকৃতি ছাড়া মল (Mull) ব্যবহার করেও মোটামুটি সন্তোষজনক-ভাবে কঠিন যৌগের বর্ণালী নির্ণয় করা যেতে পারে। বহুল ব্যবহৃত মল হচ্ছে নুজল মল। ধাতব হেলাইড-নির্মিত চাকৃতিতে 5 মিলিগ্র্যামের মত কঠিন যৌগ নিয়ে তাতে কয়েক ফোঁটা নুজল মল মিশিয়ে চালনা করা হয়। তবে নুজল মল ব্যবহারের সময় মনে রাখতে হবে, যেহেতু এটা হচ্ছে বেশী আণবিক ওজনের তরল হাইড্রোকার্বনজাতীয় একটা যৌগ, সেহেতু এটি বর্ণালীর 3·3—3·5, 6·85 এবং 7·28 মাইক্রন এলাকায় শৃঙ্গ প্রদর্শন করবে এবং বিবেচনাধীন যৌগের বর্ণালীর এই সকল এলাকায় অবস্থিত শৃঙ্গগুলি সম্পর্কে কোন স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে বেশ সংশয় দেখা দিতে পারে।

তরল যৌগের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি পরিচালনা করা বেশ সহজ। সোডিয়াম ক্লোরাইড-নির্মিত চাকৃতিতে এক ফোঁটা তরল যৌগ নিয়ে খুব পাত্‌লা একটা আবরণ তৈরি করা হয় এবং তার পর কঠিন যৌগের মত পরীক্ষা চালনা করলেই বর্ণালী পাওয়া যাবে।

অনেক সময় এই পদ্ধতি পরিচালনার নিমিত্ত দ্রাবক ব্যবহার করা একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়ে। সে সব ক্ষেত্রে যে সব দ্রাবক ব্যবহৃত হয়, তাদের মধ্যে কার্বন টেট্রাক্লোরাইড (CCl_4) এবং কার্বন ডাই-সালফাইড (CS_2) হচ্ছে প্রধান।

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে একথা দৃঢ়ভাবে বলা যেতে পারে যে, অবলোহিত আলোক বর্ণালীর শৃঙ্গগুলিকে ঠিকমত বিশ্লেষণ করতে পারলে জৈব যৌগে কি ধরণের কার্যকরী পুঞ্জ আছে, সে সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট ধারণা পেতে যেমন কোন অসুবিধা হয় না, তেমনি কোন রাসায়নিক প্রক্রিয়া ঈপ্সিত ফলাভিমুখী হচ্ছে কিনা—সে বিষয়েও ইঙ্গিত পাওয়া অসম্ভব নয়। যেমন—কোন জৈব যৌগে কার্বনীল পুঞ্জ (>C=0) আছে এবং তাকে জারিত করে কোহলে রূপান্তরিত করা দরকার। জারণ-ক্রিয়া আরম্ভ করবার পর বিক্রিয়া চলবার সময় কিছুটা জারিত যৌগ নিয়ে বর্ণালী নির্ধারণ করে যদি দেখা যায় বর্ণালীতে কোহল-পুঞ্জের (O-H) শৃঙ্গ পাওয়া যাচ্ছে, তাহলে বুঝতে হবে রাসায়নিক প্রক্রিয়াটি ঠিকমত চলছে এবং পরিশেষে জারণ-ক্রিয়া সম্পূর্ণ হলে জারিত যৌগের বর্ণালীতে কার্বনীল পুঞ্জের শৃঙ্গ দেখা যাবে না, কিন্তু কোহল পুঞ্জের শৃঙ্গটি যথারীতি অবস্থান করবে। আবার দুই জৈব যৌগের অভিন্নতা প্রতিপন্ন করবার কাজে খুব নিখুঁৎভাবে এই বর্ণালীবীক্ষণ পদ্ধতিটা প্রয়োগ করা যেতে পারে। কারণ আমরা জানি, কোন দুই যৌগ অভিন্ন হলে তাদের বর্ণালীর প্রকৃতিও পুরাপুরি সদৃশ হবে।

খাদ্য-সংরক্ষণ

প্রশান্ত মৈত্র*

ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ—শতকরা 85 ভাগ লোকই কৃষিজীবী। কিন্তু ভারতে প্রকৃত বৈজ্ঞানিক উপায়ে গুদামজাত না হওয়ায় উৎপন্ন শস্যের (যেমন ধান, চাল, গম, ভুট্টা ইত্যাদি) শতকরা 9·3 ভাগ খাদ্য অপচয় হয়। ভারত সরকারের সমীক্ষা অনুযায়ী এই নষ্ট খাদ্যশস্যের বার্ষিক মূল্য প্রায় 700 কোটি টাকা। প্রকৃত বৈজ্ঞানিক সংরক্ষণের অভাবে অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যও এইভাবে কীট-পতঙ্গ, মথ, ইঁদুর ও পাখী—ইত্যাদির দ্বারা নষ্ট হয়; যেমন—ফল, মশলা, গুড়, চিনি, তৈল বীজ ইত্যাদি। অপচয় হবার প্রধান কারণ —(1) শস্যের পোকা (Pest), (2) ইঁদুর ও পাখী, (3) অস্বাস্থ্যকর স্যাঁতসেঁতে গুদাম, যেখানে ড্যাম্প লেগে শস্য পচে যায়। গ্রামে গ্রামে কৃষকদের শস্যভাণ্ডার (গোলা) এত নিম্নমানের যে, সেখানে প্রচুর খাদ্যশস্য নষ্ট হয়। শহরে শহরেও প্রকৃত বৈজ্ঞানিক সংরক্ষণাগারের অভাব।

গুদামজাত খাদ্যশস্যের বড় শত্রু কীট ও মথ। একজোড়া চাল বা গমের কীট উপযুক্ত পরিবেশে তিন মাসে 10 লক্ষে উপনীত হয় এবং ঐ জাতীয় কীটের জীবনচক্র শস্যদানার অভ্যন্তরেই পূর্ণতা লাভ করে। ফলে সেই সব শস্য-দানার ভিতরে খাদ্যবস্তু বলতে কিছুই থাকে না। নীচে কয়েকটি কীট ও মথের নাম দেওয়া হলো, যারা সব সময়েই গুদামজাত ধান, চাল গম, আটা, ময়দা, রবিশস্য ইত্যাদির ভয়াবহ ক্ষতি সাধন করে।

(1) চালের পোকা (Sitophilus oryzae), (2) ছিদ্রকারী পোকা (Rhizopertha dominica), (3) খাপ্‌রা (Trogodernma granaria), (4) ময়দার পোকা (Tribolium castenium), (5) করাতমুখো পোকা (Oryzaephilus surinamensis), (6) রবিশস্যের পোকা, (Bruchus species), (7) চালের মথ (Corcyra cephalonica), (8) শস্যের মথ (Ephestia cautella)।

এই সব কীট, মথ, ইঁদুর ও পাখীর হাত থেকে খাদ্যশস্যকে একমাত্র বৈজ্ঞানিক উপায়ে সংরক্ষণ-পদ্ধতির দ্বারা রক্ষা করা সম্ভব। যে গুদাম বা সংরক্ষণাগারে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় খাদ্যশস্যের গুণ ও পরিমাণ অপরিবর্তিত অবস্থায় রাখা যায়, তাকে বৈজ্ঞানিক সংরক্ষণাগার বলা হয়।

খাদ্যশস্যের কীট-পতঙ্গ ও মথ বিনাশ করা কষ্টসাধ্য—বিশেষতঃ বর্ষাকালে এদের বংশবৃদ্ধির হার কল্পনাতীতভাবে বৃদ্ধি পায়। এদের বিনাশ করা যায় ফিউমিগেশন করে। ফিউমিগেশন বলতে আমরা বুঝি, বায়ুরোধী অবস্থায় কীট-নাশক ওষুধের ধোঁয়ার সাহায্যে যাবতীয় কীট, মথ এবং তাদের পিউপা ও ডিম বিনাশ করা। অধুনা কীটনাশের জন্যে অনেক নূতন উপায় আবিষ্কৃত হয়েছে এবং সেগুলি নিয়ে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। নীচে তার কিছু উদাহরণ দেওয়া হলো।

(1) তাপ প্রয়োগ—140° ফারেনহাইট তাপ 10 মিনিট বা 120° ফাঃ তাপ 20 মিঃ পর্যন্ত প্রয়োগ করে দেখা গেছে, খাদ্যশস্যের যাবতীয় কীট ও মথ বিনষ্ট হয়। তৈল বীজের ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য নয়।

---

* পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ওয়ারহাউসিং কর্পোরেশন, কলিকাতা-13

(2) ঠাণ্ডা প্রয়োগ—যদি তাপমাত্রা 18° সেন্টিগ্রেডে নামিয়ে প্রয়োগ করা হয়, তবে কীট ও মথ জীবন্ত থাকে না।

(3) বিকিরণ-শক্তি প্রয়োগ—শব্দ-তরঙ্গ, তড়িৎ শক্তি, অবলোহিত আলো, অতিবেগুনী রশ্মি—ইত্যাদির সাহায্যে খাদ্যশস্যের যাবতীয় কীট ও মথ অতি অল্প সময়ে বিনাশ করা যায়; কিন্তু এসব প্রক্রিয়া ব্যয়বহুল।

(4) আয়ন-বিকিরণ প্রথা—কোবাল্ট 60 যে তেজস্ক্রিয় বিকিরণ করে, তাতে দেখা গেছে—কোন কীট-পতঙ্গ, মথ অথবা খাদ্যদ্রব্যের অন্তর্নিহিত সজীব কীট অতি দ্রুত মরে যায়। এই প্রক্রিয়ার ফল অত্যন্ত কার্যকর এবং এই সম্বন্ধে পারমাণবিক শক্তি কেন্দ্রে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে।

(5) জৈব নিয়ন্ত্রণ—এক জাতীয় জীবাণু বা কীট-পতঙ্গের দ্বারা তাদের শত্রু অন্য জাতীয় জীবাণু বা কীট-পতঙ্গ ধ্বংস করা। এরা শত্রুর দেহ ভক্ষণ করে বেঁচে থাকে, যার ফলে খাদ্য-শস্য ঐ কীট-পতঙ্গের কবল থেকে রক্ষা পায়।

(6) কীটনাশক ঔষধের দ্বারা নিয়ন্ত্রণ—যেমন বেঞ্জিন হেক্সাক্লোরাইড, পাইরিথ্রাম ও ম্যালাথিয়ন—ইমালশন ছিটিয়ে কীট-পতঙ্গ মারা। মিথাইল ব্রোমাইড, ইথিলিন ডাই-ব্রোমাইড, অ্যালুমিনিয়াম ফসফাইড ইত্যাদির ধোঁয়ার দ্বারা ফিউমিগেট করা বা জীবাণু নাশ করা।

ইঁদুর গুদামজাত খাদ্যশস্যের আর একটি বড় শত্রু। একজোড়া ইঁদুর 1 বছরে 100টিতে পরিণত হয়। 1টি ইঁদুর দিনে 25 গ্র্যাম শস্য খায় এবং সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন প্রকারে আরও প্রায় 10 গুণ খাদ্যশস্য মানুষের আহার্যের অনুপযোগী করে নষ্ট করে। 1 বছরে 1টি ইঁদুর 9 কে. জি. শস্য খায়, যার মূল্য প্রায় 8 টাকা। পরিসংখ্যান অনুযায়ী ভারতে 110 রকম জাতের প্রায় 48×10^8 ইঁদুর আছে।

ইঁদুর মারবার যে পদ্ধতি চলে আসছে, তাকে বেটিং বলে, অর্থাৎ ইঁদুর-মারা বিষ রুটি, কলা এবং একটু তেল দিয়ে চটকে মেখে ইঁদুরের যাতায়াতের পথে রেখে দিতে হয়। এই বেট্ খেয়ে ইঁদুর মারা যায়। ইঁদুর এত বুদ্ধিমান, স্পর্শসচেতন এবং এদের ঘ্রাণশক্তি এত বেশী যে, ঐ বেট্ তারা সহজে খেতে চায় না। তার জন্যে প্রথম কয়েক দিন বিষ না মেশানো বেট্ দিয়ে সুরু করে হঠাৎ একদিন বিষ মেশানো বেট্ দিলে কার্যকরী হয়। কয়েকটি ইঁদুর মারা বিষ—যেমন, জিঙ্ক ফসফাইড, থ্যালিয়াম সালফেট, বেরিয়াম কার্বনেট, আর্সেনিক অক্সাইড ইত্যাদি। এই বেট্ প্রয়োগে খুব বেশী হলেও শতকরা 80 ভাগ ইঁদুর মারা যায়।

বর্তমানে বেটের সাহায্যে নতুন এক ধরণের ইঁদুর মারা বিস প্রয়োগ করা হয়, যার দ্বারা ইঁদুরের আভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণ হয় এবং তার ফলে ইঁদুর মারা যায়। এই জাতীয় বিষকে বলা হয় অ্যান্টিকোয়াগুল্যান্ট; যেমন—Warfarin, Pival, Tomorin ইত্যাদি। এই বিষ প্রয়োগে খুব বেশী হলেও 90 ভাগ ইঁদুর মারা যায়। কিন্তু শতকরা 95-100 ভাগ ইঁদুর মারতে না পারলে কোন ফল নেই। কারণ ইঁদুর বিপুল সংখ্যায় বংশবৃদ্ধি করে। উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক, কোন স্থানে 100টি ইঁদুর আছে এবং সেখানে 60টির উপযুক্ত খাদ্য আছে। যদি বেটিং করে 40টি ইঁদুর মারা হয়, তবে বাদ বাকী 60টির ভয়ানক আনন্দ হয়—যেহেতু তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীর সংখ্যা কমে যায়। এই পরিস্থিতিতে ঐ 60টি ইঁদুর এক মাসে আবার 100টিতে পরিণত হয়। বর্তমানে ইঁদুরের পরিবার পরিকল্পনা নিয়ে অনেক গবেষণা চলছে। তবে ইঁদুরের উৎপাত থেকে খাদ্যশস্য বাঁচাবার একমাত্র উপায়—গুদাম ও সংরক্ষণাগারকে অবশ্যই ইঁদুর-প্রতিরোধক করা।

পাখীর মধ্যে চড়ুই ও পায়রা গুদামের খাদ্য-

শস্যের প্রভূত ক্ষতি করে। সে জন্যে পাখী ঢোকবার পথ তারের জাল দিয়ে ঢেকে দেওয়া প্রয়োজন। পাখীর ক্ষেত্রেও পরিবার পরিকল্পনা নিয়ে গবেষণা চলছে।

এখন দেখা যাক, কি কি উপায়ে খাদ্য সংরক্ষণ হয়। (1) বস্তার মাধ্যমে সংরক্ষণ, (2) বাক্স সংরক্ষণ, (3) বিশেষ প্রক্রিয়ায় সংরক্ষণ।

(1) বস্তার মাধ্যমে সংরক্ষণ—গুদামে সাধারণতঃ খাদ্যশস্য বস্তায় ভরে সংরক্ষণ করা হয়। বস্তাগুলি সরাসরি মেঝেতে রাখা হয় না বা রাখা ঠিকও নয়। কারণ ড্যাম্প লেগে খাদ্যশস্য নষ্ট হয়ে যায়। কাঠের পাটাতনের উপর বস্তাগুলি স্তরে স্তরে সাজিয়ে রাখা হয়। দেয়াল থেকে $2\frac{1}{2}'$ তফাতে রাখা হয় এবং প্রতিটি লাটের মধ্যে $2\frac{1}{2}'$ দূরত্ব রাখা হয়। এদের বলা হয় গলিপথ।

(2) বাক্স সংরক্ষণ—

(ক) লোহার চাদর দিয়ে তৈরি গোলা বা বিন: কনক কুঠী—ভারত সরকারের গ্রেন রিসার্চ ইনষ্টিটিউট (হাপুর, উত্তরপ্রদেশ) এই জাতীয় গোলা বা বিন প্রস্তুত করে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছে। আমাদের দেশের কৃষকদের পক্ষে ধানের গোলার পরিবর্তে এগুলি ব্যবহার করা চলে, যার ভিতরে খাদ্যশস্য অক্ষত ও অপরিবর্তিত অবস্থায় 4-5 বছর থাকে। কোন কীট বা মথ খাদ্যশস্যে লাগতে পারে না অথবা লাগলেও অতি সহজেই কীটনাশক ওষুধ প্রয়োগে তা ধ্বংস করা যায়। আর্দ্রতা, ইঁদুর, আরশোলা, পিঁপড়ের হাত থেকে খাদ্যশস্য রক্ষা পায়। সহজে খাদ্যশস্য চুরি যাবার সম্ভাবনা নেই। 8′ উঁচু, 8′ ব্যাস। ঢালু ছাদ। ছাদে 2′ ম্যানহোল ও ঢাকনা। বিনের অভ্যন্তরে বায়ু-চলাচলের ব্যবস্থা আছে। নীচে খাদ্যশস্য বের করবার জন্যে ফানেলের মত তৈরি পথ আছে। মাটি থেকে 3′ উপরে বিনের অবস্থান। 100 কুইন্ট্যাল খাদ্যশস্য মজুত করতে পারে, এমন একটি বিন তৈরির খরচ প্রায় 1800 টাকা।

কনক কুঠী

(খ) প্লাস্টিক বা রাবারের বিন: কিষাণ কুঠী—এই জাতীয় বিন তৈরির খরচ অনেক কম এবং সবচেয়ে সুবিধা হলো, অংশগুলি বিচ্ছিন্ন করে স্থানান্তরিত করা যায়। 2′ উঁচু লোহা বা

বাঁশের লাঠি
লোহা বা টিনের রিং
নির্গম দ্বার

কিষাণ কুঠী

টিনের চাদরের গোলাকৃতি রিং (ঠিক পাতকুয়ার মত), যার ভিতরে চতুর্দিকে কয়েকটা বাঁশের লাঠি বসিয়ে তার ভিতরে রাবার বা প্লাস্টিকের গোলাকৃতি চাদর ঝুলিয়ে দিতে হবে। লোহার রিংয়ের তলদেশও ঐ লোহা বা টিনের। ভিতরে খাদ্যশস্য রেখে মুখ বেঁধে দিতে হবে। প্রয়োজনমত উপর বা নীচ থেকে খাদ্যশস্য বের করা যায়। 10′ উঁচু, 5′ ব্যাস ও 30 কুইন্টাল খাদ্যশস্য মজুদ করতে এই জাতীয় বিন তৈরির খরচ প্রায় 200 টাকা।

(গ) সিমেন্টের ঢালাই বিন: ধান কুঠী—এই জাতীয় বিন সিমেন্ট দিয়ে তৈরি, মজবুত ও জলবায়ু প্রতিরোধ করতে সক্ষম। 2′ উঁচু বেষ্টনী বা রিং পর পর সাজিয়ে সিমেন্ট দিয়ে জুড়ে দেওয়া হয়। ছাদে ম্যানহোল, ঢাকনা ও নীচে শস্য বের করবার নালী আছে। সমস্ত কীট, মথ, ইঁদুর ইত্যাদির হাত থেকে খাদ্যশস্য দীর্ঘ দিন অক্ষত অবস্থায় থাকে। 8′ উঁচু, 8′ ব্যাস ও 60 কুইন্টাল খাদ্যশস্য ধারণক্ষমতাবিশিষ্ট এই জাতীয় বিন তৈরির খরচ প্রায় 800 টাকা।
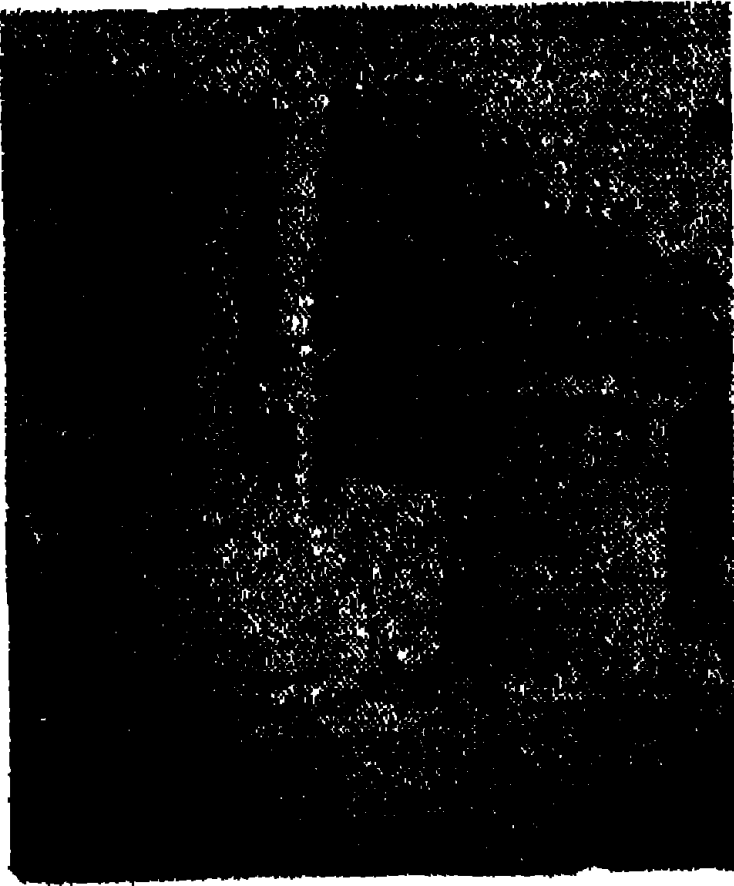
ধান কুঠী, (বাঁ-দিকে গোলাকৃতি গ্লাস ফাইবারের আধার, ডানদিকে ধানকুঠী।)

(ঘ) উন্নত বিন—সিমেন্টের ষড়্ভুজী বিন অনেক উপকারে লাগছে। মাটি থেকে 3′ উঁচে জোড়ায় জোড়ায় দু-সারিতে সাজানো। সুউচ্চ ছাদে ম্যানহোল ও ঢাকনা আছে। নীচে ফানেলের মত তৈরি পথ দিয়ে খাদ্যশস্য বের করা যায়। কীট-পতঙ্গ, মথ, ইঁদুর, পিঁপড়ে, পশু, পাখী, ড্যাম্প ইত্যাদির হাত থেকে খাদ্যশস্যকে দীর্ঘদিন অক্ষত অবস্থায় রাখা যায়।

(ঙ) গোলাকৃতি বিন—উপরিউক্ত সিমেন্ট কংক্রীটের বিনের মতই, তবে গোলাকৃতি। একই রকমভাবে সাজানো। এক-একটি বিনের ব্যাস 15′, উচ্চতা 17′ এবং এতে 240 কুইন্টাল খাদ্যশস্য মজুত করা যায়।
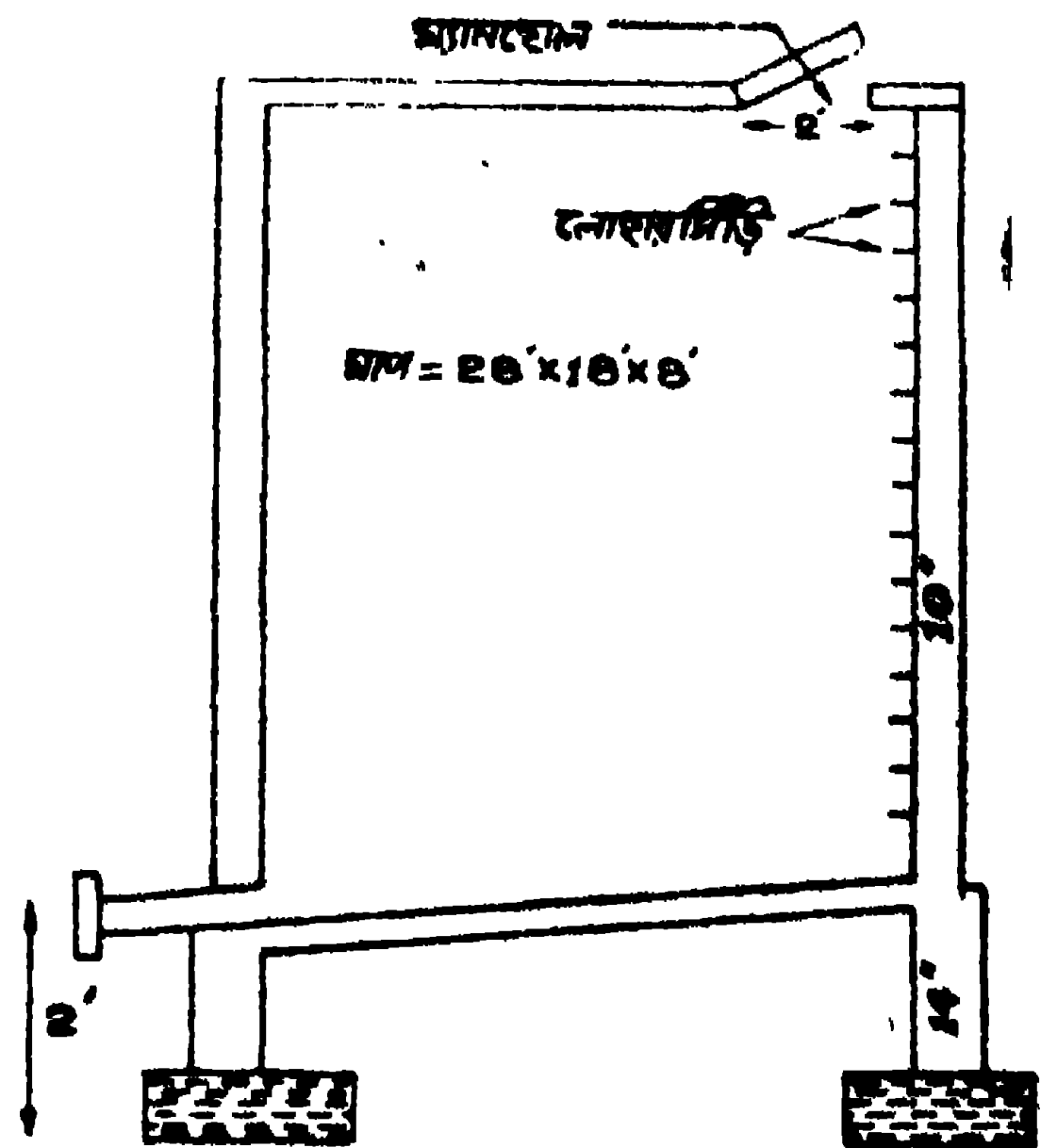
(চ) সিমেন্ট বিন: আনাজ ঘর 2′ উঁচু প্ল্যাটফরমের উপর এই বিন অবস্থিত। 10″ দেয়াল—সিমেন্ট প্লাস্টার করা। ছাদে 2′ ম্যানহোল ও ঢাকনা আছে। নীচে মালনির্গম দ্বার। বিনের মেঝে কিছুটা ঢালু করা। একটি 23′ লম্বা, 18′ চওড়া ও 8′ উচ্চতাবিশিষ্ট এই জাতীয় বিন (আনাজ ঘর) তৈরি করতে প্রায় 5000 টাকা খরচ হয় এবং 600 কুইন্টাল খাদ্যশস্য মজুদ রাখা যায়।

আনাজ ঘর

(ছ) সাইলো—খাদ্যশস্য সংরক্ষণের সর্বাধুনিক

ব্যবস্থা হলো সাইলো। ইস্পাতের তৈরি সুউচ্চ বিন, যার প্রত্যেকটির ধারণক্ষমতা 20 থেকে 500 টন পর্যন্ত হয়। খাদ্যশস্য বোঝাই ও খালাস করা হয় যন্ত্রের সাহায্যে; যেমন—কনভেয়র বেল্ট, এলিভেটর ইত্যাদি। 5·6 বছর খাদ্যশস্য অক্ষত ও
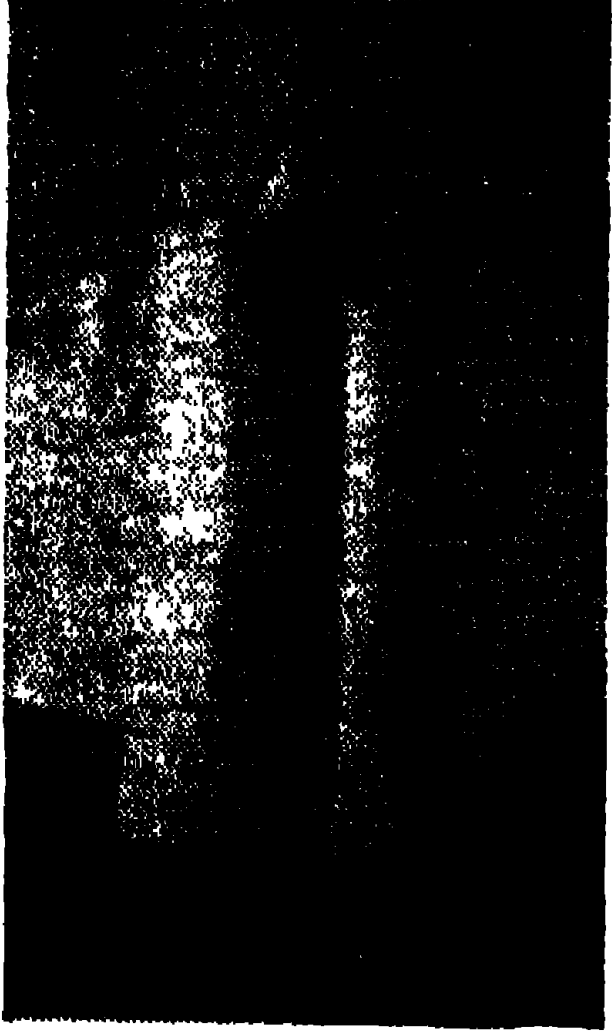
সাইলো

অপরিবর্তিত অবস্থায় মজুদ করা যায়। একই সংরক্ষণ ক্ষমতা নিয়ে সাইলো গুদামের $\frac{1}{8}$ অংশ স্থান জুড়ে থাকে। কলকাতায় এবং হাপুরে (উত্তর প্রদেশ) সাইলোতে খাদ্যশস্য মজুদ করা হয়।

(3) বিশেষধরণের সংরক্ষণাগার—হলুদ, লঙ্কা, তৈল বীজ, কফি ইত্যাদি সংরক্ষণ করা হয় সম্পূর্ণ ভিন্ন উপায়ে—যেখানে কীটপতঙ্গ, মথ, ড্যাম্প, ছত্রাকের দ্বারা এরা ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। তৈলবীজের ক্ষেত্রে আর্দ্রতা শতকরা 6-7 ভাগের বেশী হবে না, নইলে সংরক্ষণ করা যায় না।

লঙ্কা অবশ্যই শুষ্ক থাকবে, তবে খুব বেশী হলেও শতকরা 10 ভাগ আর্দ্রতা থাকতে পারে। লঙ্কা, হলুদ ইত্যাদি আর্দ্রতা নিরন্ধ্রক। বায়ুরোধী, ঢালাই গুদামে দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করা যায়।

গুড় বাতাসের জলীয় বাষ্পের জন্যে গলে গিয়ে ঝোলা গুড়ে পরিণত হয়। আর্দ্রতা ও তাপ নিয়ন্ত্রিত করে গুড় দীর্ঘ দিন অপরিবর্তিত অবস্থায় সংরক্ষণ করা যায়। গুড়ের সংরক্ষণাগার বায়ুরোধী করা হয়, শোষক যন্ত্রের দ্বারা ভিতরের বায়ু বাইরে বের করে দেওয়া হয় এবং আর্দ্রতা ও তাপ নিয়ন্ত্রিত করে বরাবর অপরিবর্তনীয় রাখা হয়। কেন্দ্রীয় সংরক্ষণাগার সংস্থার মুজফ্ফরনগরে (উত্তর প্রদেশ) গুড়ের এই জাতীয় একটি বিশেষ সংরক্ষণাগার আছে। তবে সাধারণভাবে গুড় যদি পলিথিন বা চটের কাপড় দিয়ে ভালভাবে মুড়ে রাখা হয়, তবে তা দীর্ঘদিন ভাল অবস্থায় থাকে।

হিমঘর—এই জাতীয় সংরক্ষণাগারে তাপ ও আর্দ্রতা এত কম যে, কীটপতঙ্গ, মথ, ছত্রাক ও জীবাণুর দ্বারা খাদ্যদ্রব্যের ক্ষতি হবার কোন সম্ভাবনা নেই। সাধারণতঃ আলু, ফল ইত্যাদি হিমঘরে রাখা হয়। কেন্দ্রীয় সংরক্ষণাগার সংস্থা ও পশ্চিম বঙ্গ সংরক্ষণাগার সংস্থার হিমঘর ও বহু বৈজ্ঞানিক সংরক্ষণাগার আছে, যেখানে খাদ্যশস্য দীর্ঘদিন অবিকৃত অবস্থায় রাখা হয়। তাছাড়া পশ্চিম বঙ্গে সংরক্ষণাগার সংস্থা বৈজ্ঞানিক উপায়ে বর্তমানে খাদ্যকর্পোরেশনের খাদ্যশস্য (যেমন ধান, চাল, গম ইত্যাদি) কৃতিত্বের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে অবিকৃত অবস্থায় সংরক্ষণ করে আসছে। দেখা গেছে, প্রতি বছর পশ্চিম বঙ্গ ওয়্যার হাউসিং কর্পোরেশনের সংরক্ষণ ব্যবস্থার মাধ্যমে খাদ্যশস্য অপচয়ের হাত থেকে রক্ষা তো হচ্ছেই, অধিকন্তু এর ফলে মজুদ খাদ্যশস্য পরিমাণে বেশীও হচ্ছে।

বিষের প্রতিষেধক তৈয়ারী করা যায় এবং উহা Antivenin নামে বাজারে বিক্রয় হয়। বিভিন্ন সাপের বিষের ক্রিয়া যেমন আলাদা, Antivenim-ও তেমনি আলাদা হইবে। এখন গোখরা, চিতি, বোরা সাপের Antivenin নির্দিষ্ট পরিমাণে মিশাইয়া Polyvalent anti-snake serum তৈয়ারী করা হয়। কোন্ সাপে কামড়াইয়াছে, জানা না গেলে প্রথমে ঐ সিরামই ইনজেক্শন দেওয়া হয়।

মানব সভ্যতায় সাপ

বিষধর সাপ যেমন মৃত্যুর কারণ, তেমনি এই সভ্যজগতে মানব সমাজে সাপের প্রয়োজনীয়তাও কম নয়। এই কারণেই বোধ হয়, হিন্দুশাস্ত্রে সাপকে মনসাদেবীর বাহন হিসাবে পূজা করিবার বিধান দেওয়া হইয়াছে। সর্প-দেবতার পূজা শুধু ভারতবর্ষে নয়, পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও হইয়া থাকে। সাপের উপকারিতা নিয়ে উল্লেখ করা হইল।

1. রোডেন্ট দমন:—কৃষকদের ক্ষেতে যখন ধান, গম প্রভৃতি শস্য পাকিয়া ওঠে, তখন মানুষের পরম শত্রু হিসাবে ইঁদুর, কাঠবিড়ালী প্রভৃতি জন্তুরা ঐ শস্যকে প্রচুর পরিমাণে নষ্ট করে। ইঁদুর আবার প্লেগ রোগেরও জীবাণু বহন করে। Dr. Kunhardt 1919 সালে হিসাব করিয়া দেখান যে, মাত্র কুড়ি বৎসরে শুধু ইঁদুরই ভারতবর্ষে 1241 কোটি টাকার সম্পত্তি নষ্ট করিয়াছে। এখন ঐ সমস্ত রোডেন্ট জাতীয় জন্তুদের দমন করিবার জন্য সাপের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে পৃথিবীর সব দেশের লোকই যথেষ্ট সচেতন।

2. খাদ্য হিসাবে সাপ—ময়াল সাপ (পাইথন) ভারতবর্ষ, চীন এবং ব্রহ্মদেশে খাদ্য হিসাবে প্রচলিত আছে। আমেরিকাসহ পশ্চিমী দেশ-গুলিতে ময়াল সাপের মাংস হোটেল-রেষ্টুরেন্টে সুস্বাদু খাদ্য হিসাবে পরিবেশিত হইয়া থাকে। আদিবাসীরা অন্যান্য বিষহীন সাপকেও খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করিয়া থাকে।

3. বেদেদের জীবিকা—বিভিন্ন দেশে জীবন্ত সাপের খেলা দেখাইয়া বেদেরা জীবিকা অর্জন করে।

4. সাপের চামড়া—সাপের চামড়ার চাহিদা যথেষ্ট। ইহা বেল্ট, জুতা, হাতব্যাগ, চিরুনি, সিগারেট এবং তামাক রাখিবার কেস প্রভৃতি তৈয়ারী করিতে কাজে লাগে। এমন কি, খেলাধূলার জন্য জ্যাকেট, ক্যাপ, নেকটাই প্রভৃতিও ইহার দ্বারা তৈয়ারী হয়। সাপের চামড়া দিয়া জুতার উপরিভাগ ঢাকিবার জন্য বাজারে ইহার প্রচুর চাহিদা। বই বাঁধাইয়ের কাজেও ইহার চাহিদা কম নয়। Dr. Klauber-এর হিসাব অনুযায়ী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারতবর্ষ, নেদারল্যাণ্ড, ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ প্রভৃতি দেশ হইতে বৎসরে 45 লক্ষ টাকার সাপের চামড়া পশ্চিমী দেশগুলিতে পাঠান হইত।

5. সাপের চর্বি—ইহা আয়ুর্বেদ চিকিৎসায় একটি প্রয়োজনীয় ঔষধ হিসাবে ব্যবহৃত হয়; বোরা সাপের চর্বি হইতে যে তেল তৈয়ারী হয়, তাহা টিউমার, অবশ হাত-পা এবং মোচড়ানো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে মালিশ হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

6. সাপের বিষের এনজাইম—সাপের বিষের বিভিন্ন এনজাইমকে বায়োকেমিষ্টরা বিভিন্ন কাজে প্রয়োগের জন্য ব্যাপক গবেষণা চালাইতে-ছেন।

7. ঔষধ হিসাবে সাপ—বিভিন্ন চিকিৎসায় সাপের বিষ খুবই উপকারী। Chopra এবং Chouhan 1940 সালে দেখাইয়াছেন যে, গোখরা সাপের বিষ স্নায়ুকুষ্ঠ (Neural leprosy) রোগে বিশেষ উপকারী। ঐ বিষ ক্রনিক স্নায়ুযন্ত্রণায়, পা ও হাতের গাঁটের যন্ত্রণায় (Arthritis) এবং

মৃগী রোগে ব্যবহার করা হয়। আমেরিকার চিকিৎসাশাস্ত্রে ক্যান্সার, মাথার যন্ত্রণা এবং স্নায়ুযন্ত্রণা প্রশমনে গোখরা সাপের বিষ ব্যবহৃত হয়। Pradhan এবং Patwabardhan (1941) বলিয়াছেন যে, Hæmophelia রোগ এবং জরায়ুতে রক্তপাত উপশমে বোরা সাপের বিষ খুবই কাজে লাগে। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় সাপের বিষ ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

কঠিন প্রোপেল্যাণ্ট

সত্যেন্দ্রনাথ গুপ্ত

প্রোপেল্যান্ট বলতে বোঝায় এমন কতকগুলি পদার্থ, যেগুলির বিস্ফোরণজাত শক্তি কোন কিছুকে অভীষ্ট দিকে প্রচণ্ড বেগে ধাবিত করে। বন্দুক-পিস্তলের কার্ট্রিজের খোলে বা কামানের শেলে এবং রকেটের প্রচণ্ড গতির প্রয়োজনীয় ঘাত সৃষ্টির কাজে এরই ব্যবহার হয়। এগুলি নানা-রকমের হয়। পুরনো যুগে চলতো সোরা, কয়লা ও গন্ধকের মিশ্রণে প্রস্তুত গান পাউডার। কিন্তু এর ক্ষমতা খুবই সীমিত, তাই নতুন নতুন বিস্ফোরকের আবিষ্কার বাড়তে লাগলো। রকেটের প্রয়োজনে যেসব প্রোপেল্যান্ট ব্যবহৃত হয়, সেগুলিকে মোটামুটি দুই ভাগে ভাগ করা চলতে পারে—তরল ও কঠিন প্রোপেল্যান্ট। তরল প্রোপেল্যান্ট ব্যবস্থায় সাধারণতঃ তরল জ্বালানী ও তরল জারক আলাদাভাবে থাকে এবং জ্বলন-কক্ষে এই দুটির মিলন-ক্রিয়ার ফলে উত্তপ্ত গ্যাস প্রচণ্ড বেগে ধাবিত হয়ে রকেটটিকে উর্ধ্বগতি দান করে। কিন্তু কঠিন প্রোপেল্যান্ট জ্বলনকক্ষেই জমানো থাকে এবং প্রয়োজনমত প্রজ্বলন করানো হয়। আমরা এখানে কঠিন প্রোপেল্যান্টের কথা সংক্ষেপে আলোচনা করবো।

কঠিন প্রোপেল্যান্টকে প্রধানতঃ দুই ভাগে ভাগ করা চলতে পারে। দ্বিমূল প্রোপেল্যান্ট (Double base propellant) এবং বিমিশ্র প্রোপেল্যান্ট (Composite propellant)। উভয় প্রকার জ্বালানীর জন্যে মোটামুটি একই রকমের জ্বলনকক্ষ বা রকেট মোটর ব্যবহৃত হয়। খুব শক্ত ধরণের ইস্পাত দিয়ে সিলিণ্ডারাকৃতির এই কক্ষটি তৈরি করা হয় (ইস্পাতের টেনসাইল স্ট্রেংথ প্রতি বর্গইঞ্চিতে 200,000 পাউণ্ডেরও বেশী)। সমস্ত প্রোপেল্যান্টটাই কক্ষের ভিতরের দেয়ালের চারপাশে জমিয়ে দেওয়া হয় এবং মাঝ বরাবর একটি গর্ত করা থাকে, যার চারদিকে আগুন লাগাবার পর জ্বলতে থাকে। বৈদ্যুতিক উপায়ে একটি প্রচণ্ড তাপ-উৎপাদক বারুদে (পাইরো-টেকনিক) অগ্নিসংযোগ করা হয় এবং এর ফলেই জমানো প্রোপেল্যান্টের গর্ত বরাবর উন্মুক্ত পৃষ্ঠ জ্বলতে সুরু করে। উত্তপ্ত জ্বলনজাত গ্যাস প্রচণ্ড বেগে পিছনের উন্মুক্ত পথ দিয়ে বেরুতে থাকে এবং প্রয়োজনীয় ঘাত সৃষ্টির ফলে রকেটটি উর্ধ্বগতি লাভ করে।

দ্বিমূল প্রোপেল্যান্ট উৎপন্ন হয় প্রধানতঃ নাইট্রোসেলুলোজ ও নাইট্রোগ্লিসারিনের মিশ্রণে। পদার্থদুটিকে মোটরকক্ষে প্রবেশ করিয়ে 45°-55° সে. তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করা হয়; ফলে দুটি পদার্থ বেশ ভালভাবে মিশে গিয়ে একটি কঠিন পদার্থরূপে কক্ষটির দেয়াল বরাবর বসে যায়। একটি দণ্ডের সাহায্যে ভিতরে জ্বলনক্রিয়ার উপযোগী উন্মুক্ত ক্ষেত্রের জন্যে গর্ত করা থাকে। অনেক সময় এছাড়াও জারক পদার্থ হিসাবে অ্যামো-

নিয়াম পারক্লোরেট এবং অ্যালুমিনিয়াম বা অন্য কোন ধাতব জ্বালানীও এর মধ্যে মিশ্রিত করে দেওয়া হয়। নাইট্রোগ্লিসারিনের সহজ বিস্ফোরকতার জন্যে অনেক সময় এর বদলে অন্য নাইট্রো যৌগ, যেমন—ডাইইথিলিন গ্লাইকল ডাইনাইট্রেট, ট্রাইইথিলিন গ্লাইকল ডাইনাইট্রেট বা ট্রাইমিথাইলল ইথেন ট্রাইনাইট্রেট ইত্যাদিও ব্যবহৃত হয়।

রকেটশিল্পে প্রোপেল্যাণ্টের গুণাগুণ সাধারণতঃ আপেক্ষিক ইম্‌পাল্‌স (Specific impulse) দিয়ে মাপা হয়। সেই পরিমাপকে উৎপন্ন ঘাত ও প্রোপেল্যাণ্ট পুড়ে যাবার হারের অনুপাত হিসাবে প্রকাশ করা হয়। কাজেই এর একক হিসাবে দেখানো হয় পাউণ্ড-সেকেণ্ড ইম্‌পাল্‌স অর্থাৎ পাউণ্ডপ্রতি প্রোপেল্যাণ্ট খরচে বা কেবলমাত্র সেকেণ্ডে। উপরিউক্ত দ্বিমূল প্রোপেল্যাণ্টে উৎপন্ন আপেক্ষিক ইমপাল্‌স বেশ কম, তাই আরও বেশী শক্তিশালী প্রোপেল্যাণ্টের খোঁজেই বিমিশ্র প্রোপেল্যাণ্টের উৎপত্তি হয়েছে।

বিমিশ্র প্রোপেল্যাণ্টের মূল কথা হলো, অ্যামোনিয়াম পারক্লোরেট বা অন্য কোন জারক পদার্থ এবং কোন ধাতব জ্বালানী কোন একটি ধারক (Binder) যৌগের মধ্যে মিলিয়ে পরে রাসায়নিক অন্তর্বন্ধনে (Chemical crosslinking) পুরা জিনিষটাকে শক্ত কঠিন পদার্থে পরিণত করা। বর্তমানে ব্যবহৃত ধারকগুলি প্রধানতঃ পলিবিউটাডাইন-অ্যাক্রাইলিক অ্যাসিড, এপক্সাইড দিয়ে ক্রশলিঙ্ক করা পলিইউরিথেন এবং পলিসালফাইড।

প্রচলিত পলিমারগুলির মধ্যে পলিসালফাইড (Thiokol-ST)-এরই ব্যবহার বেশী। উপযুক্ত জৈব ডাইহ্যালাইড ও সোডিয়াম ডাইসালফাইডের বিক্রিয়ায় এই পলিমারটি উৎপন্ন হয়। এটিকে ব্যবহারের জন্যে প্রথমে এর আণবিক ওজন কমিয়ে একটি তেলের মত তরল পদার্থে পরিণত করা হয়। এর পরের কাজ প্রোপেল্যাণ্টের প্রয়োজনীয় জারক ও অন্যান্য জিনিষগুলি বেশ ভালভাবে মিশিয়ে ফেলা। উৎপন্ন ঘন তরল মিশ্রণটিকে এবার কোন ধাতব অক্সাইড (PbO_2) বা জৈব পারঅক্সাইড বা প্যারাকুইনোন ডাইঅক্সিমের সাহায্যে কঠিন অন্তর্বন্ধনিযুক্ত পলিমারে রূপান্তরিত করা হয়। আপেক্ষিক ইম্‌পাল্‌স বাড়াবার প্রয়োজনে অনেক সময় দুটি সালফাইড মূলকের মাঝে কার্বনের সংখ্যা বাড়িয়ে দেওয়া হয়, যেমন—ডোডেকামিথাইলিন পলিসালফাইডে দুটি সালফার পরমাণুর মধ্যে বারোটি কার্বন পরমাণু রয়েছে। একই রকম মূল পদ্ধতিতে পলিবুউটাডাইন-অ্যাক্রাইলিক অ্যাসিড কোপলিমার বা পলিপ্রোপাইলিন গ্লাইকল এবং ট্রাইয়ল-এর সঙ্গে জারক ও ধাতব জ্বালানী মিশিয়ে প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে এপক্সাইড দিয়ে এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে টলাইলিন ডাইআইসোথায়ানেট দিয়ে পুরা তরল মিশ্রণটিকে কঠিন পলিমারে রূপান্তরিত করা হয়। অবশ্য এর জন্যে কিছু তাপ প্রয়োগের প্রয়োজন হয়। শেষোক্ত পদ্ধতিতে প্রস্তুত পলিমারটিই হলো পলিইউরিথেন। কঠিনীভূত করবার আগেই সমস্ত ঘন তরল মিশ্রণটিকে রকেট মোটরের মধ্যে ঢুকিয়ে নেওয়া হয় এবং জ্বলনের উপযোগী গর্ত তৈরির জন্যে একটি দণ্ড (Mandrel) মাঝ বরাবর ঢুকিয়ে রাখা হয়। এর পর সমগ্র মোটরটিকে প্রয়োজনীয় তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করা হয়; ফলে পদার্থটি রাসায়নিক অন্তর্বন্ধনীযুক্ত একটি কঠিন পদার্থ হিসাবে মোটরের মধ্যে জমে থাকে। ভিতরে জ্বলনক্রিয়ার উপযোগী পৃষ্ঠদেশ-সমন্বিত একটি গর্ত করবার জন্যে যে দণ্ডটি প্রবেশ করানো থাকে, এবার সেটিকে বের করে নেওয়া হয়।

বিমিশ্র প্রোপেল্যাণ্টে ধারক ছাড়াও থাকে একটি জারক ও কিছু ধাতব জ্বালানী। নাইট্রোনিয়াম পারক্লোরাইডকে বাদ দিলে অন্যান্য কঠিন জারকগুলি তরল জ্বালানীতে ব্যবহৃত তরল জারকের চেয়ে অনেক কম শক্তিশালী। ধাতব

পারক্লোরেট বা অ্যামোনিয়াম নাইট্রেটের তুলনায় অ্যামোনিয়াম পারক্লোরেট বেশী শক্তিশালী, তবে নাইট্রোনিয়াম পারক্লোরেটের মত নয়, যদিও অ্যামোনিয়াম পারক্লোরেটই ব্যবহারিক সুবিধার জন্যে বেশী ব্যবহৃত হয়।

প্রোপেল্যান্টের সঙ্গে ধাতু বা ধাতব অক্সাইড মেশানো থাকলে এর আপেক্ষিক ইম্‌পাল্‌স অনেক বেড়ে যায়। অ্যামোনিয়াম পারক্লোরেট জারক-যুক্ত প্রোপেল্যান্টে দেখা গেছে, অ্যালুমিনিয়াম মেশাবার ফলে আপেক্ষিক ইম্‌পাল্‌স প্রায় 17 সেকেণ্ড বেড়ে গেছে, 27 সেকেণ্ড বেড়ে যায় অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রাইড ব্যবহারে, 39 সেকেণ্ড বেরিলিয়ামে এবং 57 সেকেণ্ড বেরিলিয়াম হাইড্রাইড যোগ করায়।

বিভিন্ন ধারক পদার্থগুলির তুলনা করলে দেখা যায়, পলিইউরিথেন, পলিসালফাইড প্রভৃতির মধ্যে যেগুলিতে বিশেষ অক্সিজেন নেই, সেগুলি অনেকটা আদর্শ কার্বন-হাইড্রোজেন পলিমারের মতই কাজ দেয়। যেগুলিতে যথেষ্ট অক্সিজেন, যেমন—পলিএস্টার, কার্বন পরমাণুর সঙ্গে যুক্ত হিসাবে আছে, সেগুলি অপেক্ষাকৃত খারাপ ফল দেয়। কারণ এতে উৎপন্ন গ্যাসের গড় আণবিক ওজন কিছুটা বেশী হওয়ায় একই ওজনে কম আয়তনের গ্যাস সৃষ্টি করে। কিন্তু অক্সিজেন যদি অনেক বেশী দুর্বলভাবে, যেমন নাইট্রোজেনের সঙ্গে যুক্ত থাকে, তবে হাইড্রোকার্বনের তুলনীয় কাজই পাওয়া যায়। ধাতব পদার্থ না থাকলে আদর্শ জ্বলন-ক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন গ্যাসে নাইট্রোজেন, হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, জলীয় বাষ্প, কার্বন মনোক্সাইড ও কিছু কার্বন ডাই-অক্সাইড থাকে। ধাতু বা ধাতব হাইড্রাইড মিশ্রিত থাকলে ঐ ধাতুর অক্সাইড ও মুক্ত হাইড্রোজেনের উৎপত্তি হয়; ফলে উৎপন্ন গ্যাসের গড় আণবিক গুরুত্ব কমে যাওয়ায় মোট গ্যাসের আয়তনও বেড়ে গিয়ে অধিক ঘাতের সৃষ্টি করে।

পলিসালফাইডের বেলায় কঠিনীভূত করবার সময় সাবধান হতে হয়, যাতে বিক্রিয়াজাত অক্সিজেন বা জল প্রোপেল্যান্টের অভ্যন্তরে গ্যাস পকেটের সৃষ্টি না করে। পলিইউরিথেনের বেলায় কোন আলাদা রাসায়নিক উৎপন্ন না হওয়ায় এই অসুবিধা নেই। যে সব ধারকগুলি সহজে তাপে ভেঙ্গে যায় না, সেগুলি জারকের কার্যকর ঘনত্ব কমিয়ে দিয়ে জ্বলনক্রিয়ার গতিও কমিয়ে দেয়। আবার যেগুলি অল্প তাপে উচ্চ তাপ সৃষ্টি করে ভাঙ্গতে থাকে, তাতে জারকের বিক্রিয়ার গতিও বেড়ে যায়। নীচে কয়েকটি পলিমারের গুণাগুণ দেওয়া গেল।

ধারকের নাম (Binder)	ভাঙ্গবার তাপমাত্রা, °সে. (Decomposition temp.)	জ্বলনগতি (অ্যামোঃ পারক্লোরেটযুক্ত) ইঃ/সে. 1000 psia চাপে
পলিইউরিথেন	>350	0·22
পলিবুটাডাইন-অ্যাক্রাইলিক অ্যাসিড কোপলিমার (Polybutadine acrylic acid copolymer)	300	0·30
পলিসালফাইড (Polysulfide)	150	0·50
নাইট্রোসেলুলোজ (Nitrocellulose)	90	0·65
সিলিকন (Silicon)	75	0·72

তরল জ্বালানীর রকেটের কঠিন জ্বালানী থেকে মূল সুবিধা হলো, তার ঘাতের দিক ও পরিমাণের প্রয়োজনমাফিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এবং উচ্চ শক্তির সমন্বয়। কারণ উচ্চ শক্তির জ্বালানী ও জারকগুলি হয় তরল, না হয় তরলীকৃত গ্যাস। অপর দিকে কঠিন জ্বালানীর মোটরে সুবিধা এর উপর বেশী নির্ভরতা, জটিলতামুক্ত সহজ জ্বালানী সংরক্ষণ ও সহজে এবং স্বল্প সময়ের মধ্যে ব্যবহারযোগ্যতা। কাজের রকমই ঠিক করে দেয় কোন্ ধরণের জ্বালানী বেশী উপযোগী। তবে কঠিন জ্বালানীর রকেটের ক্ষেত্রে সমস্ত প্রোপেল্যাণ্টটিই জ্বলনকক্ষে জমানো থাকায় রকেট মোটরটি একবারই চালানো যায়, ইচ্ছামত বারবার জ্বালানো ও বন্ধ করা চলে না।

এই ধরণের কঠিন জ্বালানীর রকেট সাধারণতঃ এমন সব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়, যেখানে অল্প ঘাত সৃষ্টি করে মূল রকেটের গতিপথ সংশোধন করবার প্রয়োজন হয়। এছাড়াও রেট্রো-রকেট অর্থাৎ আবহমণ্ডলে ফেরবার সময় মহাকাশযানের গতি কমিয়ে দেওয়া বা ক্ষেত্রবিশেষে মূল প্রক্ষেপণ ব্যবস্থাতেও এর ব্যবহার হয়।

আমেরিকার চন্দ্রাভিযানে ব্যবহৃত স্যাটার্ন-5 রকেটের জ্বালানী ব্যবস্থা সংক্ষেপে এই রকমের ছিল। প্রথম পর্যায়ে তরল অক্সিজেন ও কেরোসিন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ে তরল অক্সিজেন ও তরল হাইড্রোজেন। সার্ভিস মডিউলের জন্যে জারক নাইট্রোজেন টেট্রক্সাইড ও জ্বালানী হিসেবে হাইড্রাজিন ও ডাইমিথাইল হাইড্রাজিনের মিশ্রণ। উপরিউক্ত জ্বালানী ও জারক মিশলে আপনা থেকেই জ্বলে ওঠে, অগ্নি-সংযোগের প্রয়োজন হয় না। কম্যাণ্ড মডিউলের প্রোপেল্যাণ্ট ছিল ঐ একই জারক ও মনোমিথাইল হাইড্রাজিন। হাইড্রাজিন ও ডাইমিথাইল হাইড্রাজিনের মিশ্রণ থেকে মনোমিথাইল হাইড্রাজিনের তাপসহন ক্ষমতা বেশী।

Launch escape system, অর্থাৎ যার কাজ হলো রকেট উৎক্ষেপণের সময় কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটলে মহাকাশচারীদের নিয়ে কম্যাণ্ড মডিউলটিকে মূল রকেট থেকে বিচ্ছিন্ন করে জোরে সরিয়ে আনবে। এই ব্যবস্থাটি ছিল তিনটি কঠিন প্রোপেল্যাণ্ট মোটর দিয়ে গড়া। এই প্রোপেল্যাণ্টের একটি মোটামুটি গঠন এখানে দেওয়া গেল। 72 ভাগ অ্যামোনিয়াম পারক্লোরেট, 22 ভাগ পলিসালফাইড ধারক, 2 ভাগ 20 মাইক্রন অ্যালুমিনিয়াম গুঁড়া, 2 ভাগ ফেরিক অক্সাইড, 1 ভাগ প্যারা-কুইনোন ডাইঅক্সিম, 0·8 ভাগ ম্যাগ্নেসিয়াম অক্সাইড ও 0·1 ভাগ গন্ধক।

সরষের তেলে শিয়ালকাঁটার তেলের সংমিশ্রণ নির্ণয়ের পদ্ধতি

শ্রীপ্রশান্তকুমার বসু

সরষের তেলে শিয়ালকাঁটার সংমিশ্রণ—অনেকের মতে, এপিডেমিক ড্রপসি ও গ্লকুমা রোগের অন্যতম কারণ। শিয়ালকাঁটার বীজ দেখতেও অনেকটা সরষের বীজের মত। সে জন্যে এতে ভেজাল দেবার সম্ভাবনা বেশী। শিয়ালকাঁটার তেলে দুটি অ্যালকালয়েড আছে। একটির নাম সানগুইনারিন, অপরটির নাম ডাই-হাইড্রোসানগুই-নারিন। এদের বিষক্রিয়ার ফলেই নাকি উপরি-উক্ত রোগ দুটি হতে দেখা যায়। শিয়ালকাঁটার তেল সামান্য পরিমাণেও গ্রহণ নিষিদ্ধ এবং সরষের তেলে ভেজাল হিসাবে নিরূপণ করবার যথেষ্ট গুরুত্ব আছে।

যে সমস্ত প্রচলিত পদ্ধতিতে সরষের তেলে শিয়ালকাঁটার ভেজাল নির্ণয় করা হয়, তা হলো (1) নাইট্রিক অ্যাসিড পরীক্ষা, (2) ফেরিক ক্লোরাইড পরীক্ষা, (3) অতিবেগুনী রশ্মির প্রতিপ্রভা (Fluorescence) পরীক্ষা। প্রথম দুটি পরীক্ষার দ্বারাই সাধারণতঃ ভেজাল হিসাবে শিয়ালকাঁটার তেলের অস্তিত্ব ধরা হয়। অনেক সময় আকস্মিক সংমিশ্রণও ঘটে, অর্থাৎ শিয়ালকাঁটা গাছ সরষের ক্ষেতে পাশাপাশি জন্মায়। তারই সামান্য পরিমাণ সংমিশ্রণ ধরবার জন্যে 3য় পদ্ধতিই কার্যকরী। সংমিশ্রণের কারণ যাই হোক না কেন, স্বাস্থ্যহানিকর মাত্রা পর্যন্ত এটি নির্ণয় করা খুবই জরুরী কাজ।

নাইট্রিক অ্যাসিড পরীক্ষায় একটি পরীক্ষা নলে 5 মিলিলিটার তেলে 5 মিলিলিটার বিশুদ্ধ, বর্ণহীন নাইট্রিক অ্যাসিড ঢেলে দেওয়া হয়। কিছুক্ষণ নাড়বার পর যদি অ্যাসিডের অংশটা হলুদে অথবা লালচে হয়ে ওঠে, তবে শিয়ালকাঁটার অস্তিত্ব আছে বলা যায়। এই পরীক্ষায় সর্বনিম্ন 0·5% শিয়ালকাঁটার তেলের ভেজাল ধরা যায়। দ্বিতীয় পরীক্ষায় 5 মিলিলিটার তেলের সঙ্গে 2 মিলিলিটার বিশুদ্ধ হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ও কয়েক ফোঁটা অ্যালকোহল সংমিশ্রিত করা হয়। ফুটন্ত জলের পাত্রে অ্যাসিড অংশটি পৃথক হবার পর 1 মিলিলিটার 10% ফেরিক ক্লোরাইড দ্রব দিয়ে ফুটন্ত গরম জলের পাত্রে পরীক্ষা নলটি 12 মিনিট ডুবিয়ে রাখবার পর তুলে নিলে সূচের মত সরু, কতকটা লালচে কমলালেবু রঙের স্ফটিক তলায় পড়ে থাকে। খালি চোখেও এগুলি দেখা যায় এবং অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে খুব স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়। এতে সর্বনিম্ন 0·25% শিয়ালকাঁটার তেলের ভেজাল ধরা যায়। শেষোক্ত পদ্ধতিটি হচ্ছে ক্রোমাটোগ্রাফির সাহায্যে অ্যালকালয়েড পৃথকীকরণ এবং অতিবেগুনী রশ্মির প্রভাবে কমলালেবু রঙের আলোক বিচ্ছুরণের দ্বারা দৃষ্টিগোচরে আনা। এই পদ্ধতিতে 0·005% অথবা তার নীচ পর্যন্ত শিয়ালকাঁটার ভেজালের পরিমাণ নির্ণয় করা যায়।

লেখক দীর্ঘদিন পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে তেল থেকে একটি বিশেষ পদ্ধতিতে অ্যালকালয়েড দুটিকে মুক্ত করে নিতে পেরেছেন। পরে সেই মুক্ত অ্যালকালয়েডকে ক্লোরোফরমে ঘন দ্রব তৈরি করে একটি ফিল্টার কাগজে দাগ ফেলে নাইট্রিক অ্যাসিড পরীক্ষা এবং একটি পরীক্ষা নলের মধ্যে ফেরিক ক্লোরাইড পরীক্ষা চালান। তাতে এই

পরীক্ষা দুটির নির্ণয়ের নিম্নতম মাত্রা বেড়ে গিয়ে যথাক্রমে 0.01% এবং 0.02% নির্ণয় করা সম্ভব হয়। এছাড়াও মিলিকলাম ও ক্ষীণ স্তর ক্রোমাটোগ্রাফিতে, নিজস্ব পদ্ধতিতে দুটি অ্যালকালয়েডকে পৃথক করে অতিবেগুনী রশ্মির সাহায্যে দৃষ্টিগোচর করা সম্ভব হয়েছে। যেখানে অতিবেগুনী রশ্মির ব্যবস্থা নেই, সেখানে অ্যান্টিমনি ট্রাইক্লোরাইড সহযোগে কমলালেবুর রঙের মত দাগ ফুটে ওঠে অ্যালকালয়েডগুলির অবস্থানের জায়গায়।

শেষোক্ত পদ্ধতির উপর নির্ভর করে লেখক শিয়ালকাঁটার তেলের পরিমাণ মাপবার একটি সহজ পদ্ধতি বের করেছেন। কলরিমিটার যন্ত্রের সাহায্যে রঙের গাঢ়তা মেপে বলে দেওয়া যায়, তেলের মধ্যে কতটা শিয়ালকাঁটার তেল আছে। এই সব পদ্ধতিতে অতি দ্রুত অর্থাৎ 15-20 মিনিটের মধ্যে শিয়ালকাঁটা তেলের অস্তিত্ব এবং পরিমাণ নির্ণয় করা যায়।

জৈব রসায়ন-বিজ্ঞানে অবলোহিত আলোক বর্ণালীর অবদান

কালীশঙ্কর মুখোপাধ্যায়*

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই বর্ণালীবীক্ষণ পদ্ধতিগুলি রসায়নশাস্ত্রের নানা সমস্যার সমাধানে নিখুঁতভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং বর্তমানে এদের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণী ক্ষমতা এবং প্রয়োজনীয়তা এমন একটা স্তরে পৌঁচেছে যে, কোন রাসায়নিক তত্ত্বের ব্যাখ্যা বর্ণালীবীক্ষণ পদ্ধতির দ্বারা সমর্থিত না হলে সেই তত্ত্বের সার্বিক প্রযুক্তি সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় না। অবলোহিত আলোক বর্ণালীবীক্ষণ পদ্ধতি (Infrared spectroscopy) এই সব যান্ত্রিক প্রয়োগ কৌশলের মধ্যে অন্যতম।

এই বিশেষ প্রয়োগ-কৌশলের মূল কথা হলো, যখন কোন রাসায়নিক যৌগের ভিতর দিয়ে আলোক-তরঙ্গ প্রবাহিত করানো হয়, তখন ঐ যৌগটি কিছু পরিমাণ আলোকশক্তি শোষণ করে, যার ফলে পরীক্ষাধীন যৌগটির অন্তঃস্থ শক্তির পরিবর্তন ঘটে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে—অবলোহিত এলাকার আলোক-শক্তি[1] শোষণের ফলে ঠিক কি ধরণের অন্তঃস্থ শক্তির পরিবর্তন ঘটতে পারে? দেখা গেছে, এই ধরণের আলোক-শক্তি যৌগের ঘূর্ণন এবং স্পন্দন-শক্তির পরিবর্তন ঘটাবার পক্ষে যথেষ্ট। সুতরাং ঐ আলোক-শক্তি শোষণের ফলে পরীক্ষাধীন যৌগটির বিশেষ অক্ষ বরাবর পারমাণবিক ঘূর্ণন ও স্পন্দন ব্যবস্থা পাল্টে যাবে। অতএব যে পরিমাণ শক্তি শোষিত হলো (যা ঘূর্ণন বা স্পন্দন-শক্তির পরিমাপক), তা যদি নিরূপণ করা যায় তা হলে বিবেচনাধীন যৌগটির

* কৃষ্ণনগর সরকারী কলেজ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া-1

1. সাধারণতঃ প্রয়োজনীয় অবলোহিত আলোক এলাকা হচ্ছে 2.5-16 মাইক্রন। এই এলাকায় আলোক-শক্তির পরিমাণ হচ্ছে প্রায় 1-10 K cal/mole। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, শক্তি শোষণের ফলে অণুটি উচ্চতর শক্তি স্তরে উন্নীত হয় এবং যখন অণুটি স্বাভাবিক স্তরে ফিরে আসে, তখন শোষিত শক্তি তাপ-শক্তির আকারে নির্গত হয়।

রাসায়নিক বণ্ডের প্রকৃতি অর্থাৎ সেটির কাঠামো সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া যেতে পারে। কারণ আমরা জানি, পারমাণবিক ঘূর্ণন ও স্পন্দন ব্যবস্থা রাসায়নিক বণ্ডের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত এবং প্রকৃতপক্ষে এই অর্থেই আলোচ্য প্রয়োগ-কৌশলটি জৈব রসায়নে ব্যবহৃত হয়। পারমাণবিক স্পন্দন ও ঘূর্ণন ব্যবস্থা অণুর পুরা কাঠামোর সঙ্গে ঠিক কিভাবে জড়িত, তা একটা উপমার সহায়তায় সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা যায়। কোন একটা অণুকে স্থির বস্তু বলে মনে না করে তার পরমাণুগুলিকে এক-একটা গোলক এবং বণ্ডগুলিকে ধাতব স্প্রিং হিসাবে আমরা কল্পনা করতে পারি। আমরা জানি, প্রত্যেকটি স্প্রিংয়ের নিজস্ব স্থিতিস্থাপকতা বা স্বাভাবিক স্পন্দন-কম্পাঙ্ক (Vibrational frequency) আছে এবং এও আমরা জানি, যখন কোন একটা গোলককে একটা স্প্রিং দিয়ে ঝুলিয়ে ক্রমাগত একটা চিহ্নিত স্থান অবধি টেনে ছেড়ে দেওয়া যায়, তখন ঐ গোলকটি একটা নির্দিষ্ট বিস্তার (Amplitude) ও কম্পাঙ্ক অনুযায়ী দুলতে থাকে। এখন এই দোদুল্যমান গোলকটির সঙ্গে যদি অন্য একটা গোলক আর একটা স্প্রিং দিয়ে ঝুলিয়ে দেওয়া যায় এবং প্রথমোক্ত গোলক-টিকে আগের চিহ্নিত স্থান অবধি টেনে এনে ছেড়ে দেওয়া যায় অর্থাৎ দোলানো যায়, তাহলে দেখা যাবে, এবার তার বিস্তার ও কম্পাঙ্ক আগের চেয়ে পৃথক হচ্ছে। সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি, কোন দুই গোলকের মধ্যবর্তী স্পন্দনগতি ঐ দুই গোলকের সঙ্গে সংযুক্ত স্প্রিং ও গোলকের উপর নির্ভরশীল। অতএব কোন একটা অতিকায় অণুকে যদি আমরা বিভিন্ন প্রসারণী শক্তির স্প্রিংয়ের সাহায্যে পারস্পরিক সংযুক্ত কতকগুলি গোলকের সমন্বয় বলে মনে করি, তাহলে যখন কোন একটা বিশেষ বন্ধ (স্প্রিং) স্পন্দিত হবে, তখন ঐ অণুটির পুরা গঠন-ব্যবস্থা অল্পবিস্তর প্রভাবিত হবে এবং কোন একটা বিশেষ বণ্ডের অনুনাদীয় কম্পাঙ্ক পুরা অণুর উপর নির্ভর করবে। কাজেই পারমাণবিক স্পন্দন বা ঘূর্ণন-শক্তি নিরূপণ করতে পারলে পরীক্ষাধীন যৌগটির রাসায়নিক বণ্ডের প্রকৃতি এবং তার আণবিক কাঠামো সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া মোটেই অসম্ভব নয়।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা বিশেষ প্রয়োজন যে, প্রধানতঃ দু-রকমের পারমাণবিক স্পন্দন লক্ষ্য করা যায়,—(1) বণ্ডের সম্প্রসারণ ও সঙ্কোচন-জনিত স্পন্দন বা স্ট্রেচিং (streching), (2) বেণ্ডিং বা বিকৃতকরণ স্পন্দন। প্রথমোক্ত স্পন্দনে বণ্ডের সঙ্গে যুক্ত দুই পরমাণুর দূরত্ব কমতে বা বাড়তে পারে, কিন্তু তারা সব সময়ে একই অক্ষ বরাবর থাকে না। এই দুই প্রধান স্পন্দন কখনও যুক্তভাবে, কখনও বা বিপরীতমুখী হয়ে নানা ধরণের আণবিক বিকৃতকরণ স্পন্দন ঘটাতে পারে। কোয়াণ্টাম বলবিদ্যায় বলা হয়েছে. কোন অণু 'n' সংখ্যক পরমাণু নিয়ে গঠিত হলে সেই অণুটি $(3n-6)$[2] সংখ্যক স্বাভাবিক স্পন্দনের ফলে অবলোহিত এলাকার আলোক-শক্তি শোষণ করতে পারে, যেমন দেখা যায় কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2) অণুটি 3টি পরমাণু নিয়ে গঠিত। সুতরাং এই অণুটি $(3\times3-6)\equiv3$ সংখ্যক স্বাভাবিক স্পন্দনের ফলে আলোচ্য শক্তি শোষণ করে।

এখানে উল্লেখযোগ্য, উপরিউক্ত স্পন্দনগুলির প্রত্যেকের স্পন্দন-কম্পাঙ্ক এক নয়, পৃথক পৃথক স্পন্দনের জন্যে পৃথক পৃথক কম্পাঙ্ক লক্ষ্য করা যায়। সুতরাং বিবেচনাধীন যে কোন

---

2. উপরিউক্ত স্বাভাবিক স্পন্দন ছাড়া আরও কিছু অতিরিক্ত স্পন্দনের ফলে আলোক-শক্তি শোষিত হতে পারে। এই অতিরিক্ত স্পন্দনগুলি ওভারটোন এবং হারমনিক্‌সের উপস্থিতির জন্যে লক্ষ্য করা যায়।

সংকেত পায়। চন্দ্রপৃষ্ঠে যে লেসার প্রতিফলক স্থাপিত হয়েছে, তার দ্বারা পৃথিবী ও চাঁদের দূরত্ব অত্যন্ত সঠিকভাবে জানা গেছে (সম্ভাব্য ভুলের পরিমাণ ছয় ইঞ্চির বেশী নয়)।

মহাকর্ষাঙ্ক প্রকৃতির পক্ষে ধ্রুবক কিনা, বিজ্ঞানীদের কাছে সেটি এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। পৃথিবী ও চাঁদের দূরত্ব সর্বদা সমান থাকে না। সারা বছরে এই দূরত্ব কিভাবে বদ্‌লায়, তা সঠিক জানা থাকলে এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যেতে পারে।

মার্কিণ বিজ্ঞানীরা লেসার হলোগ্রামের সাহায্যে মাত্র এক ফুট দীর্ঘ বস্তুর ত্রিমাত্রিক ছবি তোলবার কৌশল আবিষ্কার করেছেন। ফটোগ্রাফিক প্লেটে ত্রিমাত্রিক ছবি তোলবার কৌশলকেই হলোগ্রাফি বলে। লিখিত তথ্যাদির ছবি তোলা এবং প্রয়োজনমত সেগুলি প্রেরণ করবার জন্যে এই কৌশলকে কাজে লাগানো যাবে বলে গবেষকদের বিশ্বাস।

চিকিৎসাশাস্ত্রেও রক্তপাতবিহীন অস্ত্রোপচারের জন্যে লেসার রশ্মি ব্যবহৃত হচ্ছে। চোখের পিছন দিকে অবস্থিত রেটিনা যদি অক্ষিগোলক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, তবে কেন্দ্রীভূত লেসার রশ্মির সাহায্যে তা অনায়াসে এক সেকেণ্ডের এক সহস্রাংশ সময়ের মধ্যেই জোড়া লাগিয়ে দেওয়া যায়। অথচ সাধারণ প্রচলিত উপায়ে এই জাতীয় একটি অস্ত্রোপচারে তিন-চার ঘণ্টারও বেশী সময় লাগে। লেসার রশ্মি ক্যান্সার-আক্রান্ত দেহকোষগুলিকেও বিনষ্ট করতে পারে।

লেসার রশ্মি থেকে যে তাপ উৎপন্ন হয়, তার দ্বারা বিভিন্ন ধাতুকে জোড়া দেওয়া যায়। এমন কি, সাধারণ উপায়ে জোড়া দেওয়া যায় না. এমন বিরুদ্ধ ধর্মীয় ধাতু এবং তাদের প্রতিবন্ধক যে সিরামিক, তাকেও লেসার রশ্মির সাহায্যে জোড়া দেওয়া সম্ভব। লেসার রশ্মির সাহায্যে ধাতু এবং হীরকখণ্ডের মধ্যে খুব সূক্ষ্ম ছিদ্র (ব্যাস '001 ইঞ্চি) করা যায়। তাড়াতাড়ি গাছ কাটবার ব্যাপারেও লেসার রশ্মি ব্যবহার করা যেতে পারে।

ব্যবহারিক রসায়ন-বিজ্ঞানে লেসার এরই মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে। কতকগুলি রাসায়নিক পদার্থের উপর কোন বিশেষ তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট রশ্মিগুচ্ছ আপতিত হলে সেই পদার্থটি অধিক মাত্রায় সক্রিয় হয়ে পড়ে। লেসারের সাহায্যে সেই বিশেষ তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট রশ্মিগুচ্ছ উৎপন্ন করা হয় এবং সেই রশ্মিগুচ্ছের সাহায্যে রাসায়নিক বিক্রিয়ার (যাতে উপরিউক্ত বিশেষ ধর্মবিশিষ্ট কোন রাসায়নিক পদার্থ অংশ গ্রহণ করে) বেগ ত্বরান্বিত করা হয়।

উপযুক্ত ক্ষমতাসম্পন্ন লেসার রশ্মির সাহায্যে বিমানাদি অনায়াসে ধ্বংস করা চলে। বিমান-বিধ্বংসী কামানের গোলার চেয়ে লেসার রশ্মি অনেক সঠিকভাবে লক্ষ্যে আঘাত হানতে পারে।

লক্ষ্যবস্তুর উপর সঠিকভাবে বোমা নিক্ষেপের কাজে লেসার রশ্মি ব্যবহার করা যায় কিনা—এই বিষয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানীরা গত পাঁচ বছরে প্রচুর গবেষণা চালিয়েছেন এবং সম্প্রতি এই বিষয়ে যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করেছেন।

লেসার কিভাবে নিক্ষিপ্ত বোমাকে নিয়ন্ত্রণ করে, তার বিশদ আলোচনার মধ্যে না গিয়ে সংক্ষেপে এটুকু বলা যেতে পারে যে, বোমা নিক্ষেপকারী বিমান ছাড়া অন্য একটি বিমান থেকে লক্ষ্যবস্তুর উপর লেসার রশ্মি নিক্ষেপ করা হয়। প্রতিফলিত রশ্মির পথ অনুসরণ করেই নিক্ষেপকারী বিমান থেকে বোমা বা মিসাইল সঠিকভাবে লক্ষ্যবস্তুর উপর আঘাত হানে। লেসার রশ্মির এই ব্যবহার অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ হবে বলে অনেকের ধারণা। বর্তমানে একটি 2000 পাউণ্ড ওজনের বোমার জন্যে খরচ হয় অন্ততঃ 30,000 টাকা।

গত একদশকে লেসার-বিজ্ঞানের খুবই উন্নতি ঘটেছে। আমেরিকা ছাড়াও রাশিয়া,

জার্মেনী, জাপান প্রভৃতি দেশের এতে গুরুত্ব-পূর্ণ অবদান রয়েছে। এই সব দেশের বৈজ্ঞানিক-দের ঐকান্তিক চেষ্টায় প্রতিদিনই লেসার-বিজ্ঞানের নব নব দিগন্ত উন্মোচিত হচ্ছে। লেসার ও মেসারের উপর মৌলিক গবেষণার জন্যে 1964 সালে আমেরিকার বৈজ্ঞানিক টাউন্স ও রাশিয়ার দু'জন বিশিষ্ট পদার্থবিদ্ ব্যাসভ্ ও প্রখোরভ্‌কে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। আমাদের দেশেও লেসারের উপর গবেষণা আরম্ভ হয়েছে।

সৌরশক্তির ভবিষ্যৎ ব্যবহার

পার্থসারথি চক্রবর্তী*

বর্তমানে আমরা বড় ধরণের তিন রকম শক্তি পেয়ে থাকি। সেগুলি হচ্ছে—ফসিল জ্বালানীর রাসায়নিক শক্তি, নিউক্লিয়ার শক্তি এবং সৌর-শক্তি। এর মধ্যে সৌরশক্তি হলো মানুষের জীবন-ধারণের পক্ষে অপরিহার্য। প্রকৃতপক্ষে যাবতীয় প্রাণীর জীবনই সৌরশক্তির উপর নির্ভর করছে এবং সূর্যকিরণ ব্যতীত কোনও প্রাণের অস্তিত্বই সম্ভব নয়। একথা ভাবতে আশ্চর্য লাগে যে, এই বিরাট সৌরশক্তিকে মানবকল্যাণের কাজে নিয়োজিত করা সম্পর্কে আমরা বহুদিন উদাসীন ছিলাম। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলে মনে হবে যে, এটা সম্পূর্ণ আমাদের দোষ নয়। কারণ এত কাল হাতের কাছেই আমরা পেয়েছি অজস্র কয়লা, খনিজ তৈল, প্রাকৃতিক গ্যাস প্রভৃতি এবং এগুলির সাহায্যেই মানবসভ্যতার অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে। বর্তমানে পরিসংখ্যান নিয়ে দেখা যাচ্ছে, ফসিল জ্বালানীকে আর ইচ্ছামত ব্যবহার করা যাবে না—এমন কি, এখন অনেকে মনে করেছেন যে, হয়তো ভবিষ্যতে একদিন সমস্ত ফসিল জ্বালানী নিঃশেষিত হয়ে যাবে।

1850 সাল পর্যন্ত জ্বালানী হিসাবে একমাত্র কাঠেরই ব্যবহার হয়েছে। 1910 সাল পর্যন্ত সমগ্র শক্তির শতকরা পঁচাত্তর ভাগ এসেছে কয়লা থেকে এবং 1960 সাল পর্যন্ত প্রাকৃতিক গ্যাস ও তৈল সমগ্র ব্যবহৃত শক্তির প্রায় শতকরা 65 ভাগ দখল করেছে। ক্রমবর্ধমান নিউক্লিয়ার শক্তি-উৎপাদক যন্ত্রসমূহও আগামী কয়েক দশকের মধ্যেই আমাদের ভবিষ্যৎ ব্যবহার-যোগ্য শক্তির চাহিদা অনেকাংশে মেটাতে সক্ষম হবে। নিউক্লিয়ার শক্তি ব্যবহারের অসুবিধাও নেহাৎ কম নয়। এই শক্তি-উৎপাদক যন্ত্রসমূহ জনবহুল শহরাঞ্চলের পুষ্করিণী এবং নদীর জল দূষিত করে তুলছে (Thermal pollution)। তাই নিউক্লিয়ার শক্তি উৎপাদনকারী যন্ত্রসমূহের কক্ষ-গুলিকে ঠাণ্ডা রাখবার প্রয়োজন হচ্ছে এবং তার জন্যে প্রচুর অর্থব্যয়ও হচ্ছে। প্রয়োজনীয় ঠাণ্ডা কক্ষগুলি এবং আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতির জন্যে আমেরিকার কোনও কোনও কোম্পানীর দুই হাজার কোটিরও বেশী টাকা খরচ হয়েছে। তার উপর একটি নিউক্লিয়ার শক্তি-উৎপাদক যন্ত্র বসাতে গেলে প্রাথমিক খরচই পড়ে বহু কোটি টাকা। তাই বিজ্ঞানীরা এখন সৌরশক্তির দিকে দৃষ্টি দিয়েছেন এবং মনে করছেন যে, সৌরশক্তিই হবে ভবিষ্যতে মানবকল্যাণকর কাজের অধিক উপযোগী।

সৌরশক্তি ব্যবহারের অসুবিধা

পৃথিবীতে সৌরশক্তিকে ব্যাপকভাবে কাজে

*রসায়ন বিভাগ, কৃষ্ণনগর সরকারী কলেজ; কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

লাগাতে প্রারম্ভিক খরচও হবে অনেক। টাকার অঙ্কটা কল্পনা করাও কঠিন। সূর্যকিরণের সবটাই আবার আমরা সদ্ব্যবহার করতে পারবো না। মেঘ, ধুলাবালি, বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন স্তর ইত্যাদি সূর্যকিরণের স্বতঃস্ফূর্ত গতিকে ব্যাহত করবে। সৌরশক্তি উৎপাদক যন্ত্রের উপর কিছুটা বাতাসের প্রভাব বিস্তার করবে এবং সূর্য যখন দিকচক্রবালের (Horizon) কাছে থাকবে, তখন মাত্র আংশিক সূর্যকিরণ সংগ্রহ করা যাবে। যাহোক, কিছু সময়ের জন্যে এসব অসুবিধাগুলি থাকলেও নিশ্চয় তা অনন্ত কাল ধরে থাকবে না। শক্তি উৎপাদনের জন্যে সৌরশক্তিই হবে ভবিষ্যতে প্রধান উৎস।

সৌরশক্তি ব্যবহারের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

সূর্যরশ্মি থেকে শক্তির উৎপাদন মোটেই নতুন প্রকল্প নয়। 1901 খৃষ্টাব্দে ক্যালিফোর্নিয়ার পাসাডেনায় সূর্যশক্তির সাহায্যে 4½ অশ্বশক্তিসম্পন্ন একটি ষ্টীম ইঞ্জিন তৈরি করা হয়। এর কয়েক বছর পরেই সেন্ট লুই এবং নিডলসে সৌরশক্তির সাহায্যে 20 অশ্বশক্তিসম্পন্ন এবং কায়রোর নিকট 50 অশ্বশক্তিসম্পন্ন ইঞ্জিন প্রস্তুত করা হয়। আজকাল মহাশূন্যে ভ্রমণের উদ্দেশ্যে সৌরশক্তির উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে। সৌরশক্তির ভবিষ্যৎ ব্যবহারের মোটামুটি উদ্দেশ্য তিনটি। (এক)—কেবলমাত্র সৌর শক্তি সম্বন্ধে গবেষণা; যেমন—ফ্রান্সে 1000 কিলোওয়াট শক্তিসম্পন্ন যে বিরাট চুল্লীটি নির্মিত হয়েছে, সেখানে শুধু উচ্চতাপ সম্বন্ধীয় গবেষণা হবে। (দুই)—বিবিধ কাজের জন্যে শক্তি উৎপন্ন করা, প্রধানতঃ দেশ গঠনের জন্যে। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে বিভিন্ন দেশে সৌরশক্তিচালিত পাতনযন্ত্রসমূহ এবং উচ্চ শক্তিসম্পন্ন ইঞ্জিন ও সৌরতড়িৎ কোষ প্রভৃতি তৈরি করা হবে। (তিন)—অনগ্রসর দেশগুলিতে সমুদ্র থেকে ভাসমান 100 মেগাওয়াট শক্তিসম্পন্ন যন্ত্রের সাহায্যে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন করা হবে।

কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে সৌরশক্তি সংগ্রহ

কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে সৌরশক্তি সংগ্রহের পরিকল্পনার সময় কয়েকটি প্রয়োজনীয় কথা মনে রাখা দরকার। (1) নির্দিষ্ট কক্ষবিশিষ্ট কৃত্রিম উপগ্রহটির সৌরশক্তি গ্রহণের স্থানটিকে সূর্যের দিকে রাখতে হবে এবং সেখান থেকে বিকিরিত সূর্যকিরণ কোনও এক স্থানে সংগ্রহ করা হবে। (2) সৌরশক্তি রূপান্তরকারী যন্ত্রটিকে সর্বাধিক ক্ষমতাপ্রযুক্ত করা হবে। (3) রূপান্তরিত সৌরশক্তি কয়েকটি প্রেরক যন্ত্রের সাহায্যে পৃথিবীর কোনও এক স্থানে সংগ্রহ করা হবে। এই স্থানে যেন খুব কম পরিমাণ বায়ুমণ্ডলের শোষণ হয় এবং এখান থেকে যাতে সামান্য রশ্মি বিক্ষিপ্ত হতে পারে—সেদিকে নজর দেওয়া দরকার। (4) পৃথিবীর সৌরশক্তি সংগ্রহের স্থানটি যেন প্রয়োজনীয় পরিমাণ শক্তি গ্রহণ করে তা বিভিন্ন শক্তি বিতরণ করবার স্থানগুলিতে প্রেরণ করতে পারে।

উপগ্রহের কক্ষপথ

সৌরশক্তি সংগ্রহের জন্যে দুটি কৃত্রিম উপগ্রহ নির্মাণ করা হবে এবং তাদের মধ্যে একটি উপগ্রহ সর্বক্ষণ সূর্যালোকিত অবস্থায় থাকবে। প্রায় 35,700 কিলোমিটার উঁচু একটি কক্ষে বিষুবরেখার সমান্তরাল অবস্থায় পূর্বদিক থেকে পশ্চিমে একটি উপগ্রহ ভ্রমণ করবে। এই উপগ্রহটি প্রতিদিন একবার পৃথিবীর আলোকবিহীন স্থানের ভিতর দিয়ে যাতায়াত করবে এবং যখন একটি উপগ্রহ সূর্যালোকিত থাকবে, তখন অন্যটি হবে অন্ধকারময়। অবশ্য উপগ্রহগুলির এই অবস্থানের জন্যে তাদের মধ্যে 21° ডিগ্রীর ভিন্ন ভিন্ন কলা সৃষ্টির প্রয়োজন এবং তাদের দূরত্ব

13,200 কিলোমিটার হওয়া দরকার। এভাবে পৃথিবীর যে কোনও স্থান থেকেই উপগ্রহ দুটিকে দৃষ্টিগোচর করা সম্ভব হবে।

শক্তির রূপান্তর কৌশল

সিলিকন ফটো-সেলের সাহায্যে সম্ভবতঃ প্রথম থেকেই সৌরশক্তিকে বিদ্যুৎ-শক্তিতে রূপান্তরের চেষ্টা চলবে। বর্তমানে গবেষণা করে দেখা যাচ্ছে যে, বহু জৈব পদার্থের অর্ধ-পরিবাহী ক্ষমতা এবং ফটো-ভোল্ট ক্রিয়া রয়েছে। পলিমার ফিল্ম অথবা অ্যারোমেটিক রঞ্জক প্রভৃতির সাহায্যেও ফটো-ভোল্ট ক্রিয়া ঘটানো যেতে পারে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, অজৈব অর্ধ-পরিবাহী, যেমন—গ্যালিয়াম আর্সেনাইড, সিলিকন ইত্যাদি অপেক্ষা জৈব অর্ধ-পরিবাহীগুলি অধিকতর উপযোগী এবং জৈব অর্ধ-পরিবাহীগুলির সাহায্যে আশী ভাগ পর্যন্ত শক্তির রূপান্তর করা যেতে পারে। সূর্যকিরণ এবং মহাজাগতিক রশ্মির সোজাসুজি সংস্পর্শে এসে যাতে জৈব অর্ধ-পরিবাহীগুলি নষ্ট হয়ে না যায়, তার জন্যে উন্নত ধরণের প্লাষ্টিক জাতীয় দ্রব্যাদি আবিষ্কারের চেষ্টা চলছে পুরাদমে।

শক্তি উৎপাদন এবং বিতরণ

উচ্চ শক্তিসম্পন্ন অ্যামপ্লিফায়ারের সাহায্যে ক্ষুদ্র তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের $2{\cdot}5 \times 10^7$ কিলোওয়াট রশ্মি পৃথিবীতে আনা হবে। এক বর্গসেন্টিমিটারে শক্তি ঘনত্ব এক ওয়াটেরও কম হবে। যখন ক্ষুদ্র তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের রশ্মি উচ্চ বায়ুমণ্ডলের ভিতর দিয়ে যাবে (এক সেন্টিমিটারে 100 ভোল্টেরও কিছু কমে), তখন সম্ভবতঃ ভোল্টের ক্রমোন্নতি লক্ষ্য করা যাবে। এই সময় বায়ুমণ্ডল আয়নিত হওয়াও বিচিত্র নয়। শক্তি উৎপাদন এবং বিভিন্ন স্থান তদারকি করবার জন্যে বিভিন্ন উপগ্রহে অবশ্য মানুষকেই কাজ করতে হবে।

পৃথিবীর সৌরশক্তি গ্রহণের কেন্দ্র

পৃথিবীর তিন কিলোমিটার ব্যাসবিশিষ্ট কোনও এক স্থানে 2×10^7 কিলোওয়াট শক্তি সংগ্রহের জন্যে কেবল মাত্র ক্ষুদ্র তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের রশ্মিগুলিকে নেওয়া হবে। উচ্চ শক্তিসম্পন্ন একটি ডাইপোল ক্ষেত্রে কঠিন বিশোধকের সাহায্যে এই শক্তিকে শোষণ করা হবে। এই শোষিত শক্তি জৈব অর্ধ-পরিবাহীর সাহায্যে বিভিন্ন কেন্দ্রে বিতরণ করা হবে। এই সংগৃহীত রশ্মি যাতে জীবিত পদার্থের কোষের কোন ক্ষতি সাধন করতে না পারে, তার জন্যে যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি অবলম্বন করা হবে।

সৌরশক্তি উৎপাদন আপাতদৃষ্টিতে অত্যন্ত ব্যয়বহুল এবং কষ্টসাধ্য ব্যাপার বলে মনে হলেও অদূর ভবিষ্যতে তা বিজ্ঞানকে নতুন যুগের সন্ধান দেবে। নিউক্লিয়ার শক্তি-উৎপাদক যন্ত্র অপেক্ষা অনেক সহজে আমরা সৌরশক্তিকে ইচ্ছামত ব্যবহার করতে পারবো এবং ভবিষ্যতে সৌরশক্তির সাহায্যে সাধিত হবে মানুষের বহু কল্যাণমূলক কাজ।

প্রাচীন দাক্ষিণাত্যের মন্দির-নগরীর পরিকল্পনা

শ্রীঅবনীকুমার দে*

গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর দক্ষিণ ভারতে ষষ্ঠ শতাব্দীতে পহ্লব রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়। এই সময়ে কর্ণাটক প্রদেশে পহ্লব রাজাদের প্রতিদ্বন্দ্বী চালুক্য রাজবংশেরও প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। অষ্টম শতাব্দীর প্রথম দিকে কনৌজে গুর্জর প্রতিহারদের, পূর্ব ভারতে পাল রাজবংশের ও দক্ষিণ ভারতে রাষ্ট্রকূটদের উত্থান হয়। দশম শতাব্দীর শেষের দিকে পহ্লব রাজাদের ও দক্ষিণে রাষ্ট্রকূটদের প্রস্থান ঘটে। তারপর আবার পরবর্তী চালুক্য বংশ শক্তি ফিরে পান ও কিছুকাল রাজত্ব করতে থাকেন। পহ্লব রাজারা দুর্বল হয়ে পড়লে দ্রাবিড় দেশ বা তামিল ভূমিতে চোল রাজবংশ পহ্লব রাজাদের স্থান নেন। উত্তরে গুর্জর প্রতিহারদের পতন ও রাজপুতদের উত্থান হয়।

নগর পরিকল্পনার বিষয়ে এই সময় বিশেষ উল্লেখযোগ্য নয়। তবে এই সময়ে মন্দির-নগরীর পরিকল্পনার রীতি যথেষ্ট উন্নতি লাভ করেছিল। স্থানীয় নেতারা ও জায়গীরভোগী রাজারা এই সময়ে নিজেদের জন্যে অনেক দুর্গ-নগরী তৈরি করিয়েছিলেন

প্রাচীনকাল থেকেই ভারতবর্ষে প্রধানতঃ মন্দিরের চারধারে নগর ও শহর গড়ে উঠেছিল। যেখানেই প্রসিদ্ধ মন্দির আছে, সেখানেই জনসাধারণ আকৃষ্ট হয়। ফলে, সেখানে ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসার লাভ করে, সভ্যতার প্রসার হয় এবং ক্রমে শহর গড়ে ওঠে। এই মন্দিরগুলি সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে অবস্থিত হতো। মন্দিরের এমন অবস্থান নির্বাচন করা হতো, যাতে যুদ্ধের সময় সহজেই মন্দির-নগরীর আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করা যায়। মন্দির থাকলেই তার পবিত্রতা রক্ষা করবার জন্যে চারদিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হয়, উত্তম পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হয়, মন্দিরের প্রয়োজনের জন্যে দুধ সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হয় এবং দেবতার পূজার ফুলের জন্যে ফুলের বাগানেরও প্রয়োজন হয়। সে জন্যে মন্দিরসংলগ্ন জায়গায় এইগুলির ব্যবস্থা রাখা হতো। মন্দির-নগরীতে মন্দিরের চারধারে চারটি রাস্তা থাকতো। এই রাস্তাগুলির ধারে মন্দিরের পুরোহিতদের ও মন্দিরের অন্যান্য কর্মচারীদের বাসস্থান নির্দিষ্ট হতো। এই রাস্তাগুলি ধর্মীয় শোভাযাত্রার জন্যেও ব্যবহৃত হতো। মন্দিরকে কেন্দ্রস্থলে রেখে ও সেখান থেকে সুরু করে মন্দিরের চারধারে মন্দির-নগরী গড়ে উঠতো এবং ক্রমে ক্রমে ভিতর থেকে বাইরের দিকে নগর প্রসারিত হতো।

রাজপ্রাসাদের চারদিকের রাস্তার ধারে মন্ত্রীরা, রাজার উপদেষ্টাগণ, প্রাসাদ-রক্ষীরা, ধনী ব্যবসায়ী ও ব্রাহ্মণেরা বাস করতেন। প্রাসাদ ও এই রাস্তাগুলির মাঝে থাকতো রাজার স্নানাগার, সরোবর, মাটি ও পাথর দিয়ে তৈরি কৃত্রিম ঢিবি, ফুল ও ফলের বাগান ইত্যাদি। ফলে এই সব খোলা জায়গা রাজপ্রাসাদকে নিকটবর্তী বাসস্থান থেকে আলাদা করে রাখতো।

দক্ষিণ ভারতের রাজারা এখানকার যে সব অসংখ্য মন্দির তৈরি করিয়েছিলেন, সেই সব দেবস্থানগুলির অবস্থান নির্বাচনে তাঁদের অসীম সৌন্দর্যবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। পবিত্র

*নগর ও আঞ্চলিক পরিকল্পনা বিভাগ, বেঙ্গল ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ, শিবপুর।

নদীর ধারে, মনোরম উপত্যকার মাঝখানে, পাহাড়ের চূড়ায় অথবা জনবহুল তীর্থস্থানের কেন্দ্রস্থলে মন্দিরের অবস্থান নির্দিষ্ট করা হতো। সাধারণতঃ পুরোহিতেরা এই সব মন্দির পরিচালনা করতেন। আবার কোন কোন জায়গায় গ্রামবাসীদের নির্বাচিত অথবা তাদের বা রাজার দ্বারা নিযুক্ত লোকেরা মন্দির পরিচালনা করতেন। মন্দিরগুলি যে কেবলমাত্র ধর্মীয় অনুপ্রেরণার উৎস ছিল, তা নয়। তাছাড়াও এদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সত্তা ছিল খুবই শক্তিশালী।

বিদেশী পর্যটকদের এবং গ্রীস, চীন, পারস্য, পর্তুগাল, স্পেন ইত্যাদি দেশের ধর্মপ্রচারকদের বিবরণ ও আমাদের দেশের প্রাচীন ঐতিহাসিক ও কবিদের সাহিত্য থেকে এই দেশের ঐতিহাসিক নগরগুলির যে সব প্রাকৃতিক ও অন্যান্য বিবরণ পাওয়া যায়, তাথেকে প্রমাণিত হয় যে, এই সব নগর প্রাচীন শিল্পশাস্ত্র-বর্ণিত নগর পরিকল্পনার নিয়মাবলী অনুযায়ী পরিকল্পিত ও নির্মিত হয়েছিল।

সর্বতোভদ্র পদ্ধতি অনুসারে পরিকল্পিত ও নির্মিত মাদুরা, তাঞ্জোর ও কাঞ্চীপুরম্ নগরের প্রাচীন কেন্দ্রস্থলগুলির প্রথম নগর-বিন্যাসের নিদর্শন আজও আছে। তিরুপতি পাহাড়ের উপর তিরুমালি মন্দির-নগরী ও শ্রীশৈলম পাহাড়ের উপর শ্রীশৈলম মন্দির-নগরীর বাস্তুশাস্ত্র বর্ণিত দেবনগর পদ্ধতি অনুযায়ী নির্মিত নগর-বিন্যাস এখনও সুরক্ষিত আছে। নন্দ্যাবর্ত রীতি অনুযায়ী পরিকল্পিত ও নির্মিত শ্রীরঙ্গম মন্দির নগরীরও প্রথম নগর-বিন্যাস এখনও সুরক্ষিত আছে।

মন্দির-নগরী ছাড়া দুর্গ ও সাধারণ নগর নির্মাণও শাস্ত্রানুযায়ী করা হতো। রাজস্থানের জয়পুর শহর 'প্রস্তর' পদ্ধতি অনুযায়ী পরিকল্পিত ও নির্মিত হয়েছে। দক্ষিণ ভারত ও রাজস্থানের হিন্দু রাজাদের নির্মিত বেশীর ভাগ দুর্গই শাস্ত্রবর্ণিত রীতি অনুসারে নির্মিত হয়েছিল এবং এগুলি দুর্গ-স্থাপত্যের উৎকৃষ্ট নিদর্শন হিসাবে গণ্য হয়ে থাকে। এমন কি, এখন পর্যন্তও দক্ষিণ ভারত ও গুজরাটের কোন কোন অংশে হিন্দুরা মন্দির নির্মাণকালে শিল্পশাস্ত্র বর্ণিত নিয়মাবলী অনুসরণ করে থাকেন।

প্রাচীন দাক্ষিণাত্যে গৃহ-বিন্যাস ও গৃহ-নির্মাণ রীতি

প্রাচীন দাক্ষিণাত্যের নগরগুলিতে ধনীদের বাসগৃহ, দরিদ্র লোকদের কুটীর ও জনসাধারণের জন্যে নির্দিষ্ট সৌধাদি শাস্ত্রমতে পরিকল্পিত ও নির্মিত হতো।

ব্রাহ্মণদের গৃহ এরকম ভাবে পরিকল্পিত হতো, যাতে ব্রাহ্মণেরা সেখানে বেদপাঠ ও দৈনিক ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানাদি সুসম্পন্ন করতে পারেন এবং শিষ্যেরাও অধ্যয়ন করতে পারেন। গরু রাখবার জন্যে বাড়ী থেকে আলাদা জায়গায় নীচু ছাদের গোয়ালঘর থাকতো। হোমের আগুনের ধোঁয়া বের হয়ে যাবার জন্যে ঘরে যথেষ্ট জানালার বন্দোবস্ত রাখা হতো।

অপেক্ষাকৃত ধনী লোকদের বাসগৃহের ছাদ সমতল ছিল। এই ছাদে গৃহের মহিলারা বেড়াতেন ও উন্মুক্ত বায়ু সেবন করতেন। গৃহের দেয়াল যথেষ্ট উঁচু করা হতো। দেয়ালের উপর চুনের প্লাস্টার করা থাকতো। আলো, বাতাস আসবার জন্যে বাড়ীর ঘরগুলিতে যথেষ্ট সংখ্যক জানালা রাখা হতো। এই জানালাগুলিতে জাফরীর কাজ করা থাকতো। রান্নাঘর বেশ প্রশস্ত হতো। বাড়ীতে প্রশস্ত উঠানও রাখা হতো।

কৃষকদের কুটীরগুলির সামনে খোলা জায়গা ছেড়ে রাখা হতো। এখানে বাড়ীর ছেলেমেয়েরা খেলা করতো। কুটীরের পাশে অবস্থিত নীচু ছাদের গোয়ালঘরে গরু রাখা হতো। কুটীর

সংলগ্ন জায়গায় ধানের মরাই এবং অন্যান্য শস্য ও ডাল ইত্যাদি রাখবার জন্যে উঁচু আধার থাকতো। উপর থেকে এই আধারগুলির মধ্যে শস্যাদি ঢালা হতো। এগুলি যথেষ্ট উঁচু ছিল বলে এর উপরে ওঠবার জন্যে মই ব্যবহার করা হতো।

মেষপালকদের কুটীরের প্রবেশদ্বার ছোট হতো। কুটীরের ছাদের কাঠামো হিসাবে বাঁশ ব্যবহার করা হতো। এই কাঠামোর খুঁটিগুলি হতো নীচু। কুটীরে খোলা উঠান থাকতো। কুটীরের মধ্যস্থলে খোলা ও ঘেরা জায়গায় ছাগল, ভেড়া ইত্যাদি গৃহপালিত পশু ছেড়ে রাখা হতো। মেষপালকদের বসবাস করবার অঞ্চলের কুটীরগুলির চারদিকে ছোটখাটো বনের মত জায়গা রাখা হতো। এখানকার ছোট ছোট গাছপালা থেকে মেষপালকদের ছাগল, মেষ ইত্যাদির খাবার যোগানো হতো। বনের ধারে থাকতো তালপাতায় ছাওয়া ব্যাধদের কুটীর। কুটীরের পিছনে থাকতো উঠান। পাতকুয়া থেকে পানীয় জল নেওয়া হতো।

ধীবরদের কুটীরের ছাদও নীচু হতো। ছাদের কাঠামো হিসাবে বনের কাঠ ও বাঁশ ব্যবহার করা হতো। ছাদের উপর থাকতো ঘাসের ছাউনি। কুটীরে উঠান থাকতো। ধীবরদের কুটীরগুলির কাছেই থাকতো গভীর পুষ্করিণী। ধীবরদের ছেলেরা এখানে মাছ ধরতো।

নগরের বাইরে থাকতো অপেক্ষাকৃত দরিদ্র লোকদের কুটীর। সেখানেও উঠান থাকতো। কুটীরের ছাদ ঘাসের ছাওয়া হতো। জায়গায় জায়গায় পাতকুয়া থাকতো, সেখান থেকে সকলে পানীয় জল নিত।

শাস্ত্রবর্ণিত মতে গৃহের বিভিন্ন কক্ষের স্থান নির্দিষ্ট ছিল; যেমন—শয়ন ও বাসকক্ষগুলি দক্ষিণ দিকে, পাঠকক্ষ দক্ষিণ-পশ্চিমে, আহার-কক্ষ পশ্চিম দিকে, রান্নাঘর দক্ষিণ-পূর্বে, স্নানঘর পূর্ব দিকে, পূজার ঘর উত্তর-পূর্ব দিকে, গোয়াল ঘর উত্তর-পশ্চিম দিকে এবং ধান ও অন্যান্য শস্যাদি রাখবার আধার রাখা হতো উত্তর দিকে

বাসগৃহ তৈরির জন্যে পূর্ব দিকের এবং ক্রমশঃ ঢালু জমি সবচেয়ে ভাল বলে মনে করা হতো, যাতে বাড়ীর সব জায়গায় ভালভাবে সূর্যের আলো প্রবেশ করতে পারে। কোন জায়গা বাড়ী তৈরি করবার পক্ষে উপযুক্ত কিনা, তা দেখবার জন্যে প্রথমে ঐ জায়গায় মাটি খুঁড়ে ভূমি পরীক্ষা করা হতো। লবণাক্ত মাটি, নীচু জমি, জলমগ্ন হয়ে যায় এরকম জায়গা, আগে শ্মশান ছিল এরকম জায়গা, গবাদি পশু রাখা হয়, এরকম জায়গা গৃহ-নির্মাণের পক্ষে অনুপযুক্ত বিবেচিত হতো। মাটিতে তেল, রক্ত, মাছ বা মৃতদেহের গন্ধ ইত্যাদি থাকলেও ঐ জমি বাড়ী তৈরি করবার পক্ষে উপযুক্ত বলে গণ্য হতো না।

গৃহের প্রবেশদ্বার অপেক্ষা গৃহের অন্যান্য অংশ ও ভিতরের ঘরগুলি আরও উঁচুতে রাখা হতো। গৃহের সামনের দৈর্ঘ্য প্রস্থ অপেক্ষা বেশী রাখা হতো।

গৃহের মধ্যে ময়লা জল জমতে দেওয়া হতো না। পাশাপাশি বাড়ী থেকে ময়লা জল রাস্তার ধারের প্রধান নালায় গিয়ে পড়তো এবং নিষ্কাশিত হতো। এই থেকে দেখা যায় যে, তখন স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় নিয়মাবলীও বিশেষভাবে পালন করা হতো।

স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যে বাসগৃহে প্রচুর উন্মুক্ত স্থান ছেড়ে রাখা হতো। বাসগৃহের প্রবেশদ্বারের সামনে খোলা জায়গা থাকতো। গৃহের মধ্যস্থলের উন্মুক্ত স্থানে তুলসীমঞ্চ থাকতো। বাসনপত্র ধৌত করবার জন্যে রান্নাঘর-সংলগ্ন খোলা জায়গা থাকতো। এই সব ছোট ছোট খোলা জায়গায় ছোট ছোট গাছ পোঁতা হতো।

গ্রাম ও নগরে জায়গায় জায়গায় যথেষ্ট খোলা জায়গা ছেড়ে রাখা হতো। গ্রামের

কেন্দ্রস্থলে বটগাছ ও তার নীচে বেদী থাকতো। গ্রামবাসীরা এখানে বসে গল্প করতো। সরকার বা ধনী লোকেরা নগরে সরাইখানা বা 'চোলট্রী' তৈরি করিয়ে দিতেন। এর চারপাশে যথেষ্ট খোলা জায়গা থাকতো। এই খোলা জায়গায় ফলের গাছ, বিশেষ করে কাঁঠাল গাছ পোঁতা হতো। পথিকেরা ইচ্ছামত এই সব গাছের ফল খেতো। দেবস্থানগুলির চারপাশেও খোলা জায়গা ছেড়ে রাখা হতো। এইখানে সাধারণতঃ নিম গাছ পোঁতা হতো। নিমগাছের পাতা ওষুধ হিসাবে ব্যবহৃত হতো এবং এই গাছের বিশুদ্ধ বাতাসে পুজার্থীরা বিশেষ উপকৃত হতেন।

মন্দির-বিন্যাস রীতি

শিল্প শাস্ত্রানুযায়ী মন্দিরে সর্বাধিক পাঁচটি চত্বর থাকবে, কিন্তু রাজপ্রাসাদের ক্ষেত্রে সাতটি পর্যন্তও চত্বর থাকতে পারে। কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত মন্দিরের অংশের আয়তনের পরিমাপ হবে এক একক। প্রথম চত্বরের নাম অন্তর্মণ্ডল এবং এর আকার নয় এককের সমান হবে। দ্বিতীয় চত্বরকে বলা হয় অন্তর্হর এবং এটি আকারে 49 এককের সমান। তৃতীয় চত্বরের নাম মধ্য-হর এবং আকারে এটি 169 এককের সমান। চতুর্থ চত্বরের নাম প্রকার এবং এটি আয়তনে 441 এককের সমান। পঞ্চম ও সর্বশেষ চত্বর হলো মহা-মর্যাদা। এটি আকারে 961 এককের সমান। ভগবান বিষ্ণু ও শিবের মন্দিরের ক্ষেত্রে এই এককগুলি পরিমাপ কি হবে, তা শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ আছে। এই দুই দেবতার মন্দিরের প্রথম চত্বর প্রধান বিগ্রহ ও তাঁর আটজন সহগামী দেব-দেবীর মূর্তি থাকবে। প্রধান মন্দিরের সামনে ভূত ও গণদের উদ্দেশ্যে বলি-পীঠ থাকবে। দ্বিতীয় চত্বরে নিম্নস্তর পদের আরও 16টি দেব-দেবীর মন্দির থাকবে। তৃতীয় চত্বরে প্রধান বিগ্রহের দূরসম্পর্কীয় আরও 32টি দেব-দেবীর মন্দির থাকবে। এগুলি ছাড়াও দ্বারপাল, দিকপতি ও কুবেররাও থাকবেন। চতুর্থ ও পঞ্চম চত্বরে মন্দিরের পরিচালনার জন্যে নিযুক্ত কর্মীদের বাসস্থান, গুদামঘর, গোয়ালঘর, পুষ্করিণী ইত্যাদি থাকবে।

হিন্দু মন্দিরের বিভিন্ন অংশ মোটামুটি এই রকমের। বিগ্রহ যেখানে অধিষ্ঠিত থাকেন, সেই গৃহটিকে সমগ্রভাবে বিমান বলা হয়। বিমানের মধ্যস্থলে ছোট অন্ধকার বিগ্রহের কক্ষ বা গর্ভগৃহে বিগ্রহ অধিষ্ঠিত থাকেন। গর্ভগৃহের প্রবেশ দ্বার সাধারণতঃ পূর্বদিকে থাকে। এই দ্বারের সামনে থাকে পুজার্থীদের জন্যে থামবিশিষ্ট মণ্ডপ। গর্ভগৃহ ও মণ্ডপের মধ্যে থাকে অন্তরাল বা মধ্যবর্তী কক্ষ ও পরে অর্ধমণ্ডপ। মধ্যবর্তী মণ্ডপের দুই পাশে থাকে মহা-মণ্ডপ। পরবর্তীকালের মন্দিরগুলিতে গর্ভ-গৃহের চারপাশে ঢাকা প্রদক্ষিণ পথ থাকে। এক বা ততোধিক এই সকল হলঘর বা মণ্ডপে ধর্মীয় নৃত্যগীতেরও অনুষ্ঠান হয়।

মন্দিরের উঁচু শিখর বহু দূর থেকে দেখা যায় বলে সকলেই অনায়াসে দেবমন্দিরের অবস্থান বুঝতে পারেন। মন্দিরের চারপাশের গ্রামের নীচু ও সমতল ছাদের বাড়ীগুলির ও মন্দিরের খাড়া উঁচু শিখরের প্রবল বৈষম্য দেখতে খুবই সুন্দর লাগে।

পরবর্তী কালে নির্মিত দ্রাবিড় মন্দিরগুলিতে অসংখ্য স্তম্ভবিশিষ্ট হলঘর, সরোবর, বহু প্রশস্ত চত্বর ইত্যাদি বিগ্রহের কক্ষ ঘিরে বিন্যস্ত আছে। দুইটি চত্বরের মধ্যে সুউচ্চ গোপুরম আছে। গোপুরমের উদ্দেশ্যে মন্দিরের শক্তি ও ঐশ্বর্য প্রদর্শন করা এবং এগুলি মন্দিরের দিকে অগ্রসরমান পুজার্থীদের অনুভূতি ও আবেগের উপর ক্রমশঃই বেশী প্রভাব বিস্তার করে। পরবর্তী কালের মন্দিরগুলির সৌন্দর্য ও স্থাপত্য পূর্ববর্তী কালের মন্দিরগুলির তুলনায় অত উন্নত নয়।

দক্ষিণ ভারতের মন্দির-নগরী

দক্ষিণ ভারতের মন্দির-নগরীগুলি দুটি বিশেষ ও বিভিন্ন প্রকার ধারা অনুযায়ী পরিকল্পিত ও নির্মিত হয়েছিল। প্রথম প্রকারের নগরীগুলি মন্দিরের চারধারে বা বিশেষ একটি দিকে ক্রমে ক্রমে সম্প্রসারিত হতো, কিন্তু নগরীতে মন্দিরের প্রাধান্য বজায় থাকতো। পল্লব রাজাদের কাঞ্চী ও মহাবলীপুরম এই প্রকারের। রামেশ্বরম নগর ও বিজয় নগরও (হাম্পি) এই শ্রেণীর। অপর ক্ষেত্রে মন্দিরকে কেন্দ্রস্থলে রেখে তার চারদিকে সমকেন্দ্রীক আয়তাকার বা বর্গাকারভাবে ক্রমে ক্রমে নগরী প্রসারিত হয়ে যেত। সম্প্রসারিত নগরীর প্রাচীন কেন্দ্র থাকতো মন্দিরই। মাদুরা, শ্রীরঙ্গম ও দক্ষিণ ভারতের বেশীর ভাগ মন্দিরই এই শ্রেণীর।

বিজ্ঞান-সংবাদ

সোভিয়েট বিজ্ঞানীদের তৈলভুক্ জীবাণু আবিষ্কার

সোভিয়েট জীববিজ্ঞানীরা এক ধরণের জীবাণু আবিষ্কার করেছেন, যার বৃদ্ধির উৎস হলো তৈল ও তৈলজাত দ্রব্য। এর ফলে তৈলের দ্বারা জল দূষিত হবার বিরুদ্ধে লড়াই করবার কাজে জীবাণুগুলিকে ব্যবহার করা সম্ভব হবে। এই অনন্যসাধারণ তৈলভুক্ জীবাণুগুলি আবিষ্কৃত হয়েছে ফিনল্যাণ্ড উপসাগর, কৃষ্ণ সাগর ও ভারত মহাসাগরে কাজের সময়।

সমুদ্রে প্রাপ্ত 37 জাতের ক্ষুদ্র জীব লেবরেটরিতে বিজ্ঞানীরা পর্যবেক্ষণ করেছেন। তাতে দেখা গেছে, এই ক্ষুদ্র জীবগুলি বেঁচে আছে তৈল প্রভৃতি পথ্যের উপর নির্ভর করে। জীববিজ্ঞানীদের মতে, পৃথিবীর সমুদ্রের গভীরে অদ্রবণীয় তৈলজাত দ্রব্য ক্রমে ক্রমে যে অদৃশ্য হয়ে যায়, এর দ্বারাই তার ব্যাখ্যা মেলে (সমুদ্রে প্রতি-বছর তৈল-শিল্পের কয়েক লক্ষ টন বিভিন্ন পদার্থ ও আবর্জনা ফেলা হয়)।

সমুদ্রগর্ভে বিপুল পরিমাণ সোনা

ফেডারেল রিপাবলিক অব জার্মেনীর কিয়েলের ইউনিভার্সিটি ফর জিওলজি অ্যাণ্ড প্যালিওণ্টোলজির অধ্যাপক ইউগেন সিবোল্ড সমুদ্রগর্ভে সঞ্চিত বিপুল পরিমাণ সম্পদের ভবিষ্যৎ উপযোগিতা সম্পর্কে সম্প্রতি যে মন্তব্য করেছেন, তাতে তাঁর আশাবাদী দৃষ্টিভঙ্গীরই পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি যে হিসাব দিয়েছেন তদনুযায়ী বিশ্বের সাগর-মহাসাগরগুলির তলায় লুকিয়ে আছে 1 হাজার কোটি টাকারও বেশী সোনা ও 400 কোটি টনের বেশী ইউরেনিয়াম। তিনি অবশ্য একথাও বলেছেন যে, এখন পর্যন্ত যে সব পদ্ধতি জানা আছে, সেগুলির কোনটির সাহায্যেই লাভজনকভাবে উদ্ধারকার্য চালানো সম্ভব নয়। কেন না, ওই সব পদার্থ এক জায়গায় সঞ্চিত হয়ে নেই।

অধ্যাপক সিবোল্ড মনে করেন, মানুষ আজ আবিষ্কারের দ্বিতীয় যুগের মধ্য দিয়ে চলছে—যে যুগ এক সময় সমুদ্রগর্ভের এই বিপুল মহামূল্য সম্পদের আবরণ উন্মোচিত করবে। তার জন্যে চাই, সর্বাগ্রে ওই সম্পদ আহরণের উদ্দেশ্যে কম খরচের কোন পদ্ধতির উদ্ভাবন।

সাগরজলে ওই সব পদার্থের ঘনত্ব যেখানে বেশী সেখানে আধুনিক রাসায়নিক পদ্ধতির সাহায্যে এখনও পদার্থগুলি বেশ ভাল পরিমাণেই নিষ্কাশন করা যায়। অধ্যাপক সিবোল্ডের বিবৃতি

অনুযায়ী পৃথিবীর মোট উৎপাদিত খাদ্যলবণের শতকরা 20 ভাগই আসে সমুদ্রজল থেকে, ব্রোমিন পাওয়া যায় শতকরা 70 ভাগ ও ম্যাগ্নেশিয়াম শতকরা 61 ভাগ। তাছাড়া সাবমেরিনের কয়লা, লোহা, গন্ধক এবং অন্যান্য কাঁচামালের জন্যে প্রায় 100 জায়গায় খননকার্য চলছে। 1968 সাল পর্যন্ত পেট্রোলিয়ামের শতকরা 16 ভাগ এসেছিল সমুদ্রতলে সঞ্চিত প্রাকৃতিক ভাণ্ডার থেকে এবং এখন যে পরিমাণ তৈল ক্রেতাদের সরবরাহ করা হয়, 1985 সালের মধ্যে সেই পরিমাণ তৈল সমুদ্রগর্ভ থেকেই আসবে।

কিয়েলের এই ভূতত্ত্ববিদের মতে, সামুদ্রিক পদার্থ ও তাদের উৎপত্তি সম্পর্কে আরও জ্ঞান-লাভ করাই এখন বিজ্ঞানের অন্যতম প্রধান কাজ হওয়া উচিত।

মহাকাশের শূন্য অভিকর্ষে অভিনব পদার্থ তৈরির পরিকল্পনা

ভবিষ্যতে হয়তো এমন দিন আসবে, যখন আমরা সংবাদপত্রে মহাকাশে তৈরী অতি উৎকৃষ্ট ধরণের চশমার কাচ বা অতিশয় শক্ত ও হাল্কা ধাতুর বিজ্ঞাপন দেখতে পাব। যদি মহাকাশে এই সকল উপকরণ নির্মাণের কারখানা চালু করা সম্ভব হয়, তবে সে দিন অনেকেই অ্যাপোলো 14-এর মহাকাশ-চারীদের স্মরণ করবেন।

চন্দ্রপৃষ্ঠ থেকে পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তনের পথে সুবিধামত মহাকাশচারীরা শূন্য অভিকর্ষে এই বিষয়ে চারটি পরীক্ষা চালান।

শূন্য অভিকর্ষ এই পৃথিবীতে এককালে মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের বেশী সৃষ্টি করা যায় না। পৃথিবীর কতিপয় তরল রাসায়নিক পদার্থ মিশ্রিত করলে ভারী পদার্থসমূহ পাত্রের তলায় এসে জমা হয়। শূন্য অভিকর্ষে তা হয় না, সকল পদার্থ পাত্রে সমানভাবে ছড়িয়ে থাকে। সুতরাং বিভিন্ন ওজনের গলিত পদার্থ যখন সেখানে কঠিন রূপ ধারণ করে, তখন তার মধ্যে সকল পদার্থই সমভাবে বিস্তৃত থাকে। শূন্য অভিকর্ষে সোনার চেয়েও হাল্কা কিন্তু ইস্পাতের চেয়েও কঠিন মিশ্রধাতু উৎপাদন করা সম্ভব হবে।

অভিকর্ষের দরুণ পৃথিবীতে সম্পূর্ণ নিখুঁত আকৃতির বল বেয়ারিং বা লেন্স তৈরি করা সম্ভব হয় না, শূন্য অভিকর্ষে তা সম্ভব হবে। পৃথিবীতে সেন্টি ফিউজ নামক যন্ত্রে কেন্দ্রাতিগ বলের সাহায্যে বিভিন্ন ঘনত্বের উপাদানগুলিকে পৃথক করা হয়। এই যন্ত্রের চেয়েও দ্রুত এবং আরও অল্প খরচে মহাকাশে জীববিদ্যা সংক্রান্ত উপাদান-গুলিকে পৃথক করা যাবে। সুতরাং সেখানে টীকা এবং টীকায় ব্যবহৃত রক্তের জলীয় অংশ বা সীরাম আরও সুষ্ঠুভাবে উৎপাদন করা যাবে।

মহাকাশচারীদের চন্দ্র সফরের অতি মূল্যবান সময়ের শেষ দু ঘন্টা এই বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখবার সুবিধা হয়েছিল। তবে চন্দ্র সফরের শেষ পর্যায়ে মহাকাশচারীরা যেন পূর্ণ বিশ্রাম নেন—মহাকাশ দপ্তরের বহু পদস্থ কর্মচারীরই এই অভিমত। কারণ চন্দ্রের কক্ষে ভ্রমণ, চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণ, পদচারণা এবং তথ্যাদি সংগ্রহের জন্যে মহাকাশচারীদের অতিরিক্ত পরিশ্রম করতে হবে। তার পরে চন্দ্রের অভিকর্ষ ছাড়িয়ে পৃথিবীর আবহ-মণ্ডলে পুনরায় প্রবেশ করবার জন্যে তাদের প্রস্তুত থাকতে হয়। এজন্যেই তাঁদের সফরের শেষ পর্যায়ে বিশ্রাম নেওয়া প্রয়োজন।

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

এপ্রিল — 1971

চতুর্বিংশ বর্ষ — চতুর্থ সংখ্যা
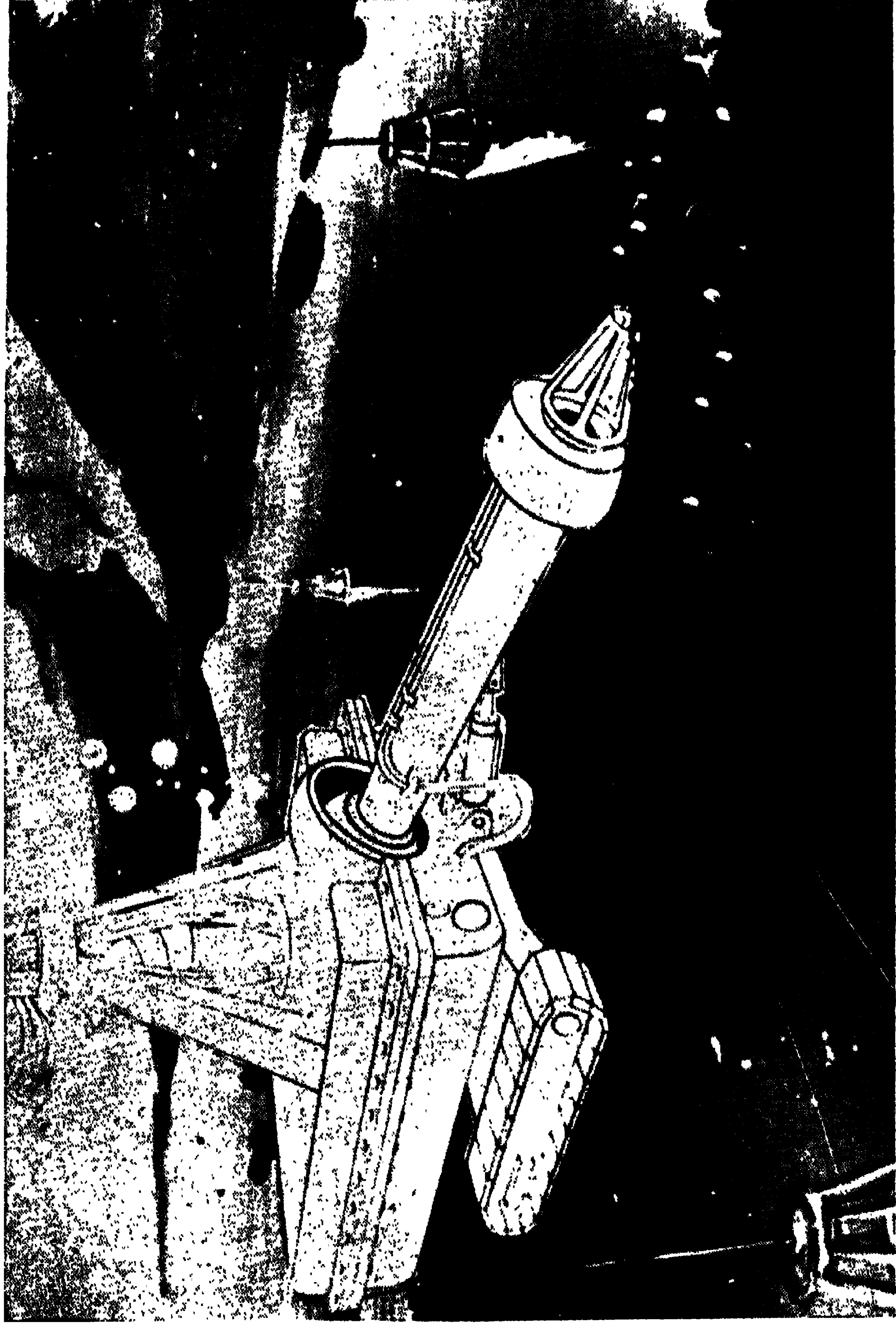
সী-ড্রেজার

সমুদ্রের মধ্যে রয়েছে অফুরন্ত সম্পদ। এই সম্পদ আহরণের উদ্দেশ্যে কয়েকটি অগ্রসরমান দেশে বিভিন্ন রকমের যন্ত্রপাতি উদ্ভাবিত হয়েছে। সম্প্রতি ডুশেলডর্ফে (জার্মেনীর ফেডারেল রিপাবলিক) এরকমের বিভিন্ন যন্ত্রপাতি প্রদর্শিত হয়েছে। উপরের ছবিটি সী-ড্রেজার নামক এরূপ একটি অভিনব যন্ত্রের। **5,000** মিটার জলের নীচে সমুদ্রের তলা থেকে ম্যাঙ্গানিজ সঞ্চয় আহরণের উদ্দেশ্যে এই অভিনব যান্ত্রিক কৌশল উদ্ভাবিত হয়েছে।

কীট-পতঙ্গভুক্ উদ্ভিদ

তোমরা অনেকে ম্যাডাগাস্কার দ্বীপের মানুষ-খেকো গাছের কথা হয়তো শুনে থাকবে। এই সম্পর্কে কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে অনকেই অনেক জায়গায় মানুষ-খেকো গাছ খুঁজে বেড়িয়েছেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত পান নি কেউ মানুষ-খেকো গাছের সন্ধান। মানুষ-খেকো গাছের সন্ধান না পাওয়া গেলেও ছোট ছোট কীট-পতঙ্গভুক্ উদ্ভিদের সন্ধান পাওয়া গেছে প্রচুর।

আজ পর্যন্ত বিভিন্ন প্রজাতির সাড়ে চার শতেরও বেশী কীট-পতঙ্গভুক্ উদ্ভিদের সন্ধান পাওয়া গেছে। এক ধরণের ছত্রাকও ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কীটাণু উদরসাৎ করে থাকে। অদ্ভুত কৌশলে এসব উদ্ভিদ কীট-পতঙ্গ শিকার করে থাকে। এই রকম দু'চারটি উদ্ভিদ সম্পর্কেই তোমাদের কিছু বলছি।

প্রথমে কীট-পতঙ্গভুক্ ঘটপত্রী উদ্ভিদের কথাই বলি। ঘটপত্রী উদ্ভিদ নেপেনথেসি (Nepenthaceae) গোত্রের অন্তর্ভুক্ত। এটা একটি জঙ্গলা গাছ। সিংহল, আসামের পার্বত্য অঞ্চলে, ম্যাডাগাস্কারে, সুমাত্রা, সাভানার স্যাঁতসেতে জমিতে এরা প্রচুর সংখ্যায় জন্মায়। এদের পাতাগুলিই সবচেয়ে আকর্ষণীয়। পাতাগুলির ডগার দিকটা ঠিক যেন এক-একটি ঘটের মত। এই পাতার জন্যেই এর নাম হয়েছে ঘটপত্রী উদ্ভিদ। এই ঘটযুক্ত পাতাগুলিই কীট-পতঙ্গ ধরবার ফাঁদ। ঘটের মধ্যে এক প্রকার মিষ্ট রস থাকে। এই মিষ্ট রসের আকর্ষণে কীট-পতঙ্গ ভিতরে ঢুকে যায়। কিন্তু ঘটগুলির মুখের ভিতরের দিকে নিম্নাভিমুখী শোঁয়ার জন্যে তারা আর বেরিয়ে আসতে পারে না, সঙ্গে সঙ্গে একটা ঢাক্না ঘটের মুখ বন্ধ করে দেয়। ঘটের ভিতরের দিকটা অসংখ্য রোমযুক্ত ও আঠালো হওয়ায় কীট-পতঙ্গ ঘটের ভিতরে পড়ে গেলে আর বেরোতে পারে না। ঘটের মধ্যে এক প্রকার জারক রসের প্রভাবে কীট-পতঙ্গ ধীরে ধীরে হজম হয়ে যায়। অনেকের মতে, জারক-রস ছাড়াও এক প্রকার জীবাণুর দ্বারা আক্রান্ত হবার ফলে কীট-পতঙ্গের দেহ জীর্ণ হয়ে উদ্ভিদের পক্ষে গ্রহণযোগ্য তরল পদার্থে পরিণত হয়। পাতার মধ্যেকার জারক রস বিশ্লেষণ করে বিভিন্ন প্রকার অ্যাসিড, যেমন—ম্যালিক, সাইট্রিক, ফরমিক, অ্যাসিটিক এবং অন্যান্য পদার্থ, যেমন—পটাসিয়াম, সোডিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, ক্যালসিয়াম প্রভৃতি পাওয়া গেছে।

ঘটপত্রী উদ্ভিদের পাতার আকার, আয়তন ও রং বিভিন্ন প্রজাতির বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। কারোর ছোট ছোট পাতা, কারোর বা বেশ বড় বড় (প্রায় এক মিটার লম্বা)। কারো কারোর পাতার বোঁটা লম্বা হয়ে আকর্ষে রূপান্তরিত হয় অন্য কোন আশ্রয়কে জড়িয়ে

ধরবার জন্যে। আবার কারোর বা বোঁটা ছোট ও শক্ত হয় ঘটাকৃতি পাতাকে খাড়া রাখবার জন্যে।

রাজা (Rajah) নামে একটি ঘটপত্রী উদ্ভিদের পাতা প্রায় 25 থেকে 30 সে. মি. লম্বা ও 12 সে. মি. চওড়া হয়। এতে ছোট ছোট পাখী অনায়াসেই বন্দী হয়ে পড়তে পারে। ঘটপত্রী উদ্ভিদের পাতা সাধারণতঃ লাল ছিটযুক্ত সবুজ রঙেরই বেশী হয়ে থাকে। র‍্যাফ্লেসিয়ানা নামক ঘটপত্রী উদ্ভিদের পাতা ধব্‌ধবে সাদা হয়; আবার রাজার পাতা আগাগোড়াই গাঢ় লাল রঙের হয়ে থাকে।
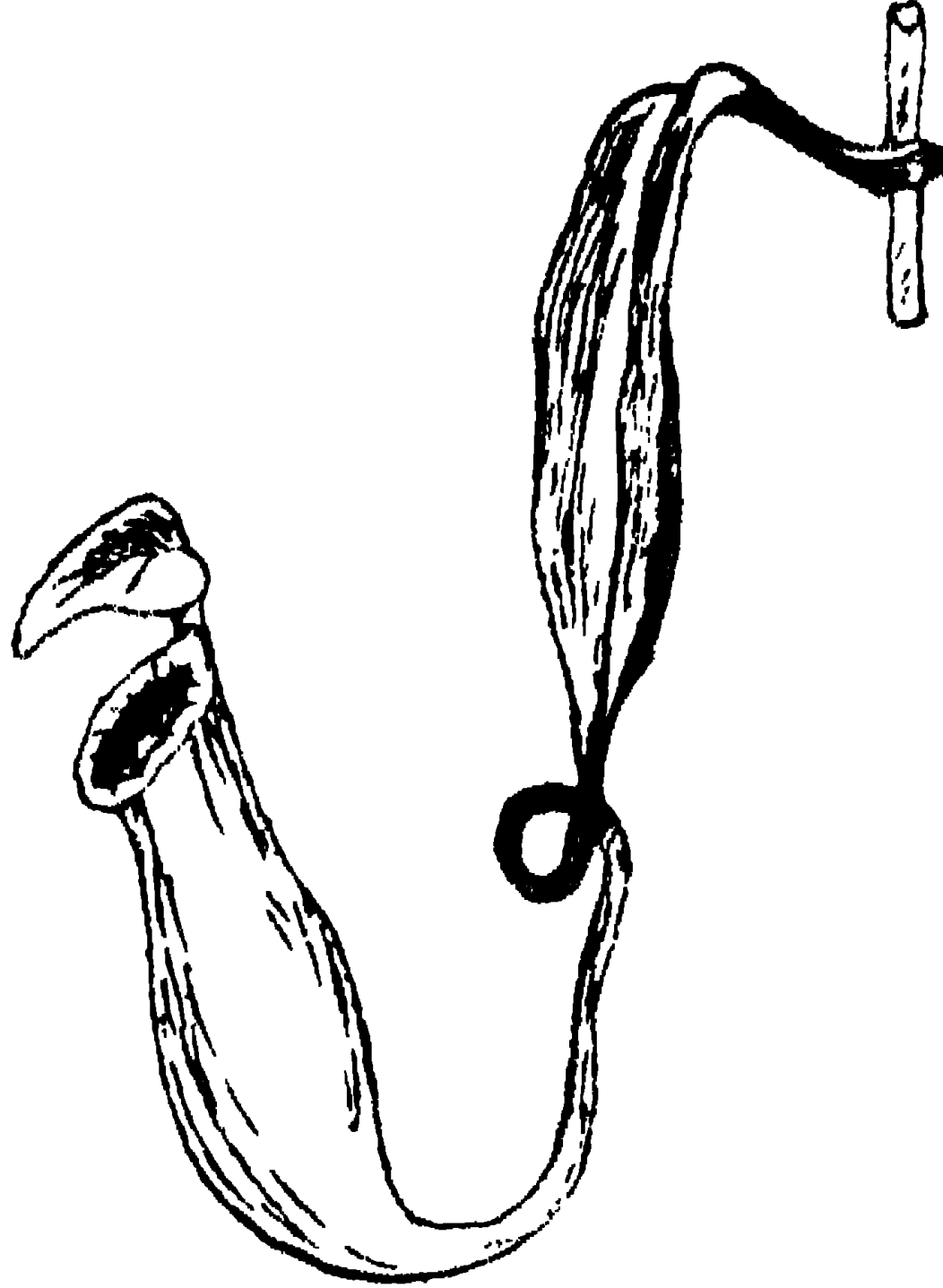
ঘটপত্রী উদ্ভিদের পাতা

ওয়ালেসের 'মালয়দ্বীপপুঞ্জ' নামক বই থেকে জানা যায় যে, একদিন মালয় দ্বীপপুঞ্জে বেড়াতে বেড়াতে তিনি খুব তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়েন। কাছাকাছি কোথাও জল না পেয়ে তিনি ও তাঁর সঙ্গীরা কতকগুলি ঘটপত্রী উদ্ভিদ দেখতে পান। তখন বৃষ্টির জলে প্রত্যেকটি পাতাই পরিপূর্ণ ছিল। যদিও তার মধ্যে ছিল নানা রকম ছোট ছোট কীট-পতঙ্গ। তাঁরা প্রকৃতিদত্ত এই ঘটপত্রী পাতা থেকে জল পান করে তৃষ্ণা নিবারণ করেন। ঘটপত্রী উদ্ভিদ সম্পর্কে বেশ মজার মজার কিংবদন্তী ও শোনা যায়।

রুমফিয়াসের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, সুদূর প্রাচ্যে ঘটপত্রী উদ্ভিদ নিয়ে গবেষণা করবার সময় তাঁকে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। তিনি স্থানীয় অধিবাসীদের ঘটপত্রী উদ্ভিদ সংগ্রহ করে আনতে বলায় তারা কেউ রাজী হয় নি। কারণ স্থানীয় অধিবাসীরা বিশ্বাস করতো যে, কেউ যদি ঘটপত্র ছিঁড়ে ফেলে, তাহলে বাড়ী পৌঁছাবার আগেই সে ভীষণ

ঝড়-বৃষ্টির সম্মুখীন হবে। যাহোক, পরে অবশ্য অনেক বুঝিয়ে তিনি অধিবাসীদের এই অন্ধবিশ্বাস দূর করতে পেরেছিলেন। রুমফিয়াস তাঁর বিবরণে আরো একটা বেশ মজার কথা উল্লেখ করেছেন। রাত্রিতে যে সব বাচ্চা ছেলে-মেয়ের বিছানায় মূত্রত্যাগের অভ্যাস আছে, স্থানীয় অধিবাসীরা তাদের মাথায় ঘটপত্রী উদ্ভিদের জল ঢেলে দিত এবং ঘটের জল পান করাতো। তাহলেই নাকি বাচ্চাদের এই অভ্যাস সেরে যেত।
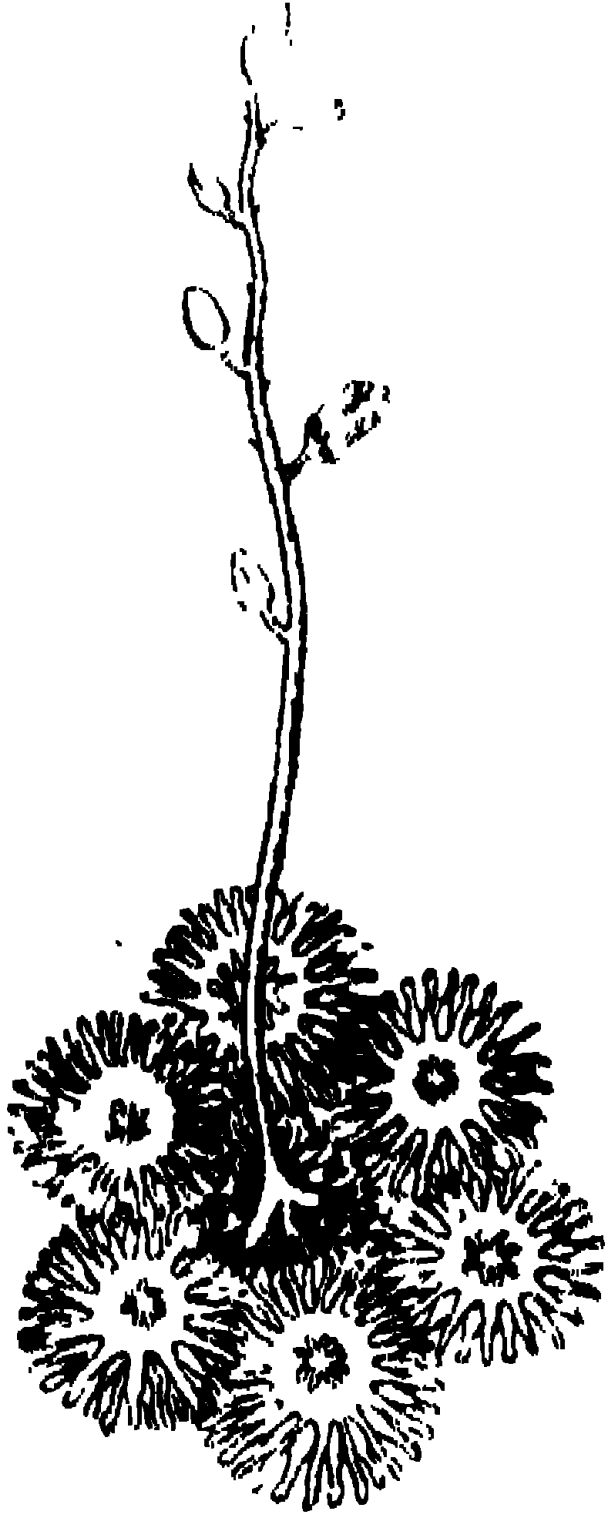
কীট-পতঙ্গভুক্ সূর্যশিশির

সোন ড্রোসেরা নামক কীট-পতঙ্গভুক্ উদ্ভিদ ড্রোসেরাসি গোত্রের অন্তর্ভুক্ত। এরা উত্তর ও উত্তর-দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়া, ইউরোপ, জাপান, ভারত, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে জন্মায়। ড্রোসেরার অন্তর্ভুক্ত একটি প্রজাতি হলো সূর্যশিশির। সূর্যশিশিরের পাতাগুলি মোটামুটি গোলাকৃতির এবং ধারগুলি কাটা। পাতায় দুই সারি শোঁয়া আছে। এই শোঁয়াই শিকার ধরবার ফাঁদ। শোঁয়াগুলির মুখে বিন্দু বিন্দু এক রকম আঠালো পদার্থ জমা থাকে।

সূর্যের আলো এই সব বিন্দু থেকে যখন প্রতিফলিত হয়, তখন ঘাসের ডগায় শিশির-বিন্দুর মতই এগুলি জ্বল্ জ্বল্ করতে থাকে। তাই এর নাম সূর্যশিশির। ছোট ছোট কীট-পতঙ্গ এর পাতায় বসলে আঠালো রসে জড়িয়ে যায় এবং শোঁয়াগুলিও তৎক্ষণাৎ পাতার মধ্যে গুটিয়ে শিকারকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরে। তার পর শোঁয়ার

জারক রস পতঙ্গদেহ পরিপাক করে ফেলে। পরে পাতার শোঁয়াগুলি খুলে গিয়ে আবার পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে।

জলে-স্থলে সর্বত্রই কীট-পতঙ্গভুক্ উদ্ভিদের সন্ধান পাওয়া গেছে। এক জাতীয় ঝাঁঝিও জলজ কীট-পতঙ্গভুক্ উদ্ভিদ। এই জাতীয় ঝাঁঝির পাতা ছোট ছোট থলিতে রূপান্তরিত হয়ে থাকে। থলিগুলিই শিকার ধরবার ফাঁদ। এদের কিউবা, দক্ষিণ-পূর্ব আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, ভারত, আফ্রিকা প্রভৃতি দেশে পাওয়া যায়। বিভিন্ন প্রকার ঝাঁঝির থলির আকার, আয়তন বিভিন্ন রকমের হয়। থলিগুলির একটি করে মুখ অর্থাৎ প্রবেশপথ থাকে। জলজ কীট-পতঙ্গ
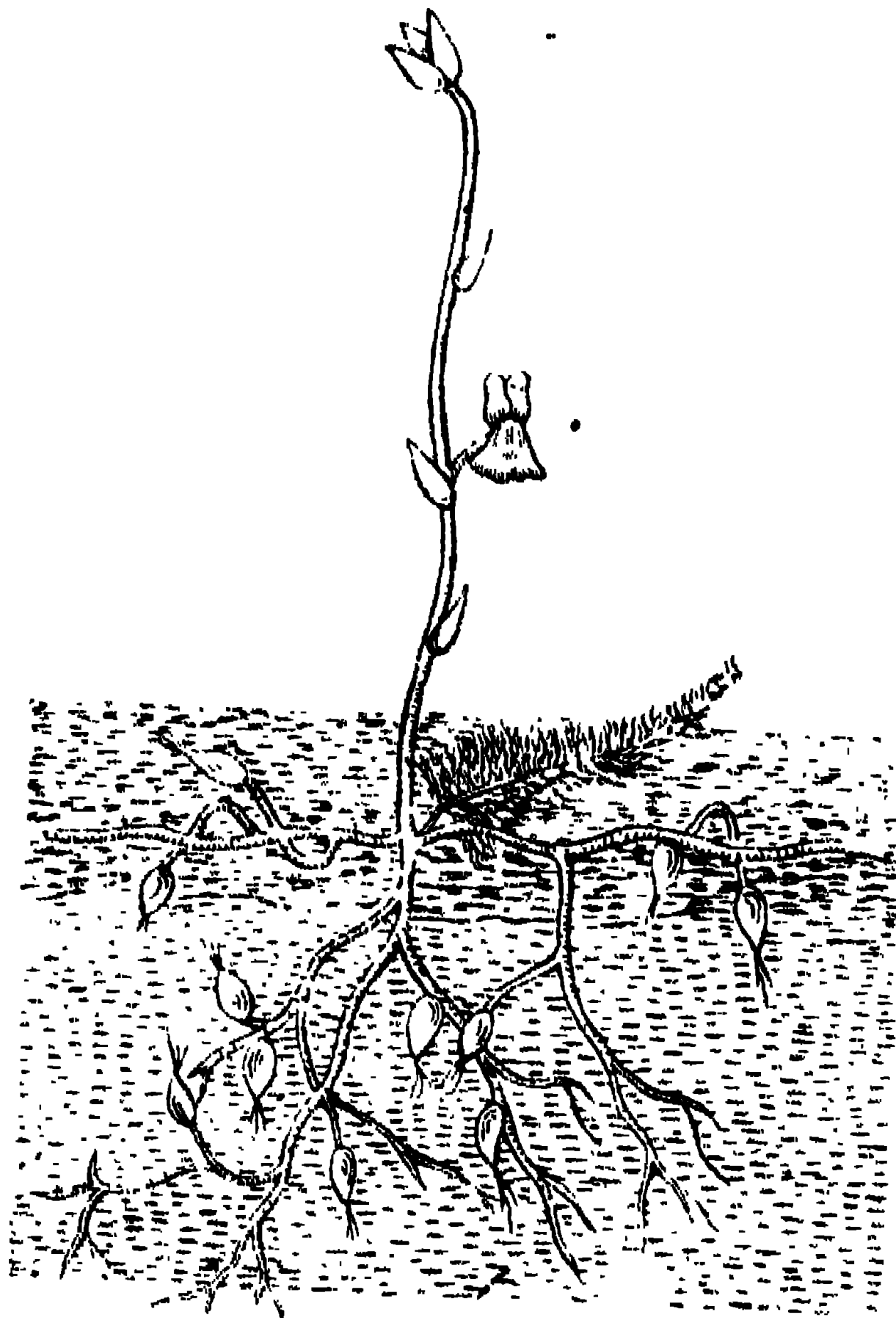
কীটভুক্ ঝাঁঝি

জলের সঙ্গে থলির মধ্যে প্রবেশ করলে আর বেরোতে পারে না। প্রবেশপথ দিয়ে শিকার শুধু ঢুকতেই পারে, কিন্তু বেরোবার পথ আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে যায়। যে সব ঝাঁঝির থলি বড় হয়, সেগুলি মশার লার্ভা, ব্যাঙাচি প্রভৃতি ফাঁদে আবদ্ধ করে থাকে। আবদ্ধ শিকারের দেহ জারক রসে জীর্ণ হয়ে যায়। এছাড়া আরও অনেক কীট-পতঙ্গভুক্ উদ্ভিদ আছে, যাদের কাহিনীও কম বিচিত্র নয়।

অভিজিৎ গুপ্ত ও মণ্টু বাগচী

পারদর্শিতার পরীক্ষা

তোমাদের মধ্যে অঙ্কে কে কেমন পারদর্শী, তার একটা মোটামুটি ধারণা যাতে তোমরা নিজেরাই করতে পার, সে জন্যে কয়েকটি প্রশ্ন দিচ্ছি। ধরে নেওয়া হচ্ছে, উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্যে নির্ধারিত পাঠ্যসূচীর বিষয়বস্তু তোমাদের পড়া আছে। সময় দেওয়া হচ্ছে—5 মিনিট। যে এই সময়ের মধ্যে 5টি, 4টি বা 3টি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারবে, তার পারদর্শিতা যথাক্রমে খুব বেশী, বেশী বা চলনসই। 2টি বা 1টি প্রশ্নের উত্তর সঠিক হলে পারদর্শিতা বাড়াবার জন্যে তার বিশেষ মনোযোগ দেওয়া দরকার। কোন উত্তরই সঠিক না হলে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

1 নং প্রশ্ন। কোন্‌টি ঠিক বল—

কোন কাপড়ের কলে যদি x সংখ্যক লোক দিনে x ঘণ্টা কাজ করে x দিনে xটি কাপড় প্রস্তুত করে, তাহলে y সংখ্যক লোক দিনে y ঘণ্টা হিসাবে কাজ করে y দিনে যে কাপড় প্রস্তুত করবে, তার সংখ্যা

ক) y, খ) $\frac{x^3}{y^2}$, গ) $\frac{y^3}{x^2}$, ঘ) $\frac{y^2}{x}$

2 নং প্রশ্ন। দুটি গ্লাসের একটিতে জল ও অন্যটিতে দুধ আছে। প্রথম গ্লাসটির আয়তন দ্বিতীয় গ্লাসটির আয়তনের অর্ধেক। জলের গ্লাস থেকে এক চামচ ভর্তি জল দুধের গ্লাসে মিশিয়ে খুব ভাল করে নেড়ে দেওয়া হলো। এবার এই মিশ্রণ থেকে এক চামচ দুধ (সামান্য জল মেশানো) নিয়ে জলের গ্লাসে মিশিয়ে দেওয়া হলো। এখন তাহলে দুধের গ্লাসে সামান্য জল আছে আর জলের গ্লাসে আছে সামান্য দুধ। বল তো, দুধের গ্লাসে জলের পরিমাণ বেশী, না জলের গ্লাসে দুধের, নাকি ঐ জল ও দুধের পরিমাণ সমান?

3 নং প্রশ্ন। কোন্‌টি ঠিক বল—

কোন গুণোত্তর শ্রেণীর প্রথম তিনটি পদ হলো $\sqrt{}$, $\sqrt[3]{2}$, $\sqrt[6]{2}$। চতুর্থ পদটি হচ্ছে

ক) 1, খ) $\sqrt[7]{2}$, গ) $\sqrt[8]{2}$, ঘ) $\sqrt[9]{2}$

4 নং প্রশ্ন। চন্দন আর অরূপের মধ্যে কথা হচ্ছিলো, ওদের একজন যদি 2 কোটি টাকার গুপ্তধন পেয়ে যায়, তাহলে কিভাবে তারা তা ভাগ করে নেবে। চন্দন বললো, ঐ টাকা তারা সমান ভাগে ভাগ করে নেবে। অরূপ বললো, প্রথমতঃ তাই হবে, তারপর 30 দিন ধরে প্রতিদিন সে চন্দনকে এক লক্ষ টাকা করে দিয়ে যাবে আর চন্দন

তাকে প্রথম দিন এক পয়সা, দ্বিতীয় দিন দু' পয়সা, তৃতীয় দিন চার পয়সা, চতুর্থ দিন আট পয়সা,—এইভাবে 30 দিন ধরে দেবে। চন্দন খুব খুশী হয়ে রাজী হয়ে গেল।

এই সর্ত অনুযায়ী 30 দিন পরে কে মোট বেশী টাকা পাবে ?

5 নং প্রশ্ন। কোন্‌টি ঠিক বলো—

চিত্রে প্রদর্শিত ABC সমবাহু ত্রিভুজের অন্তঃস্থিত বৃত্তের মধ্যে MNOP একটি

A
M N
P O
B C
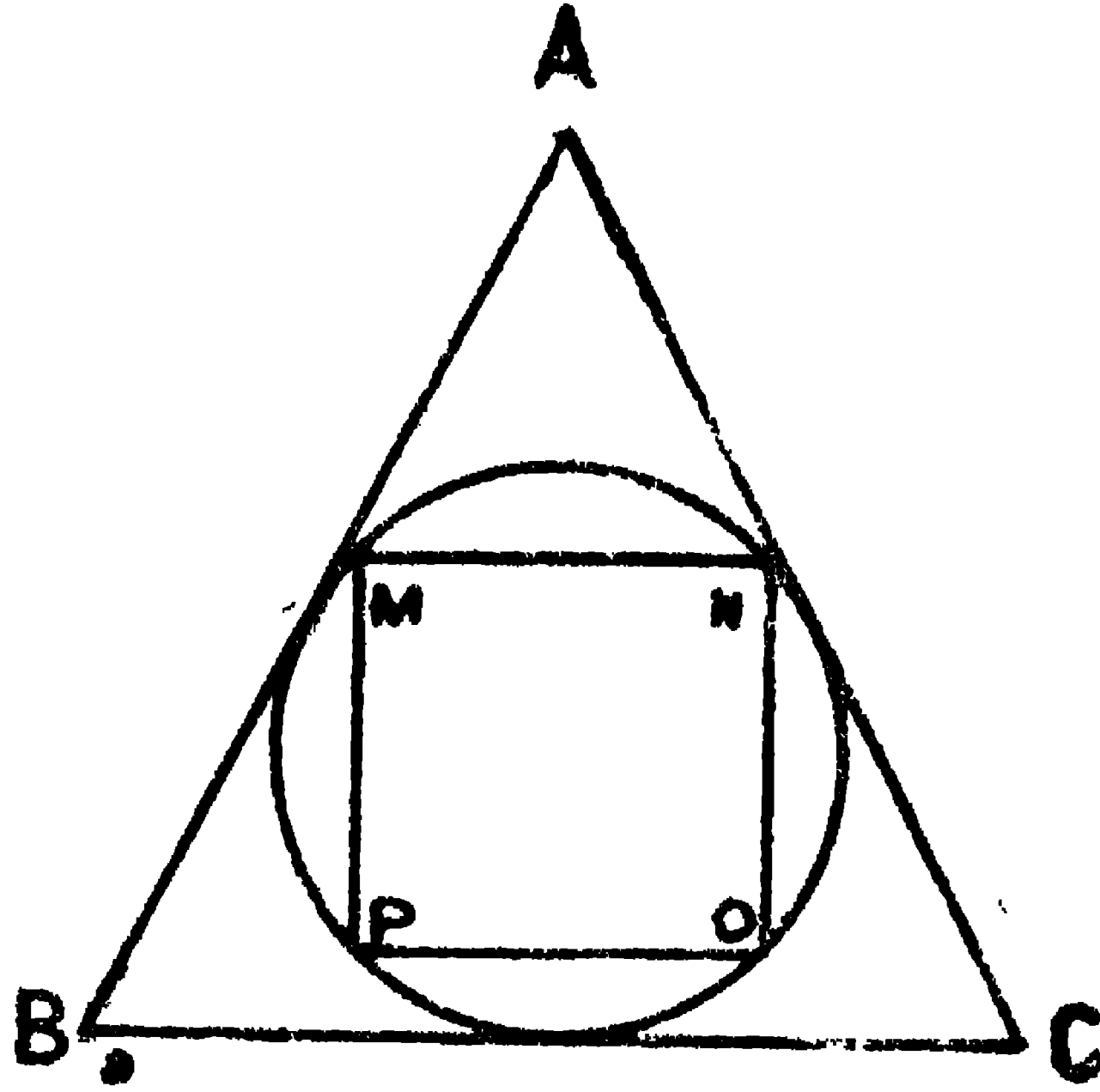
পারদর্শিতার পরীক্ষা

বর্গ। ত্রিভুজ ও বর্গের ক্ষেত্রফলের অনুপাত

ক) 3 : 1, খ) $\sqrt{3} : \sqrt{2}$, গ) $3\sqrt{3} : 2$, ঘ) $3 : \sqrt{2}$

(উত্তর—250 নং পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ব্রহ্মানন্দ দাশগুপ্ত ও জয়ন্ত বসু*

* সাহা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, কলিকাতা-9

প্যাভেল আলেক্সিভিচ চেরেনকভ্

তোমরা অনেক বিজ্ঞানীর কথা শুনেছ। আজ তোমাদের রুশদেশীয় এক বিজ্ঞানীর কথা বলবো। 1904 খৃষ্টাব্দে রাশিয়ার ভরোনে অঞ্চলে এক সাধারণ কৃষক পরিবারে এই রুশ বিজ্ঞানী—প্যাভেল আলেক্সিভিচ চেরেনকভের জন্ম হয়।

1928 খৃষ্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশুনা শেষ করে চেরেনকভ্ মস্কোর ইনষ্টিটিউট অব ফিজিক্সে একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী হিসাবে যোগদান করেন। বিজ্ঞান সম্বন্ধে নানা রকম অনুসন্ধিৎসার জন্যে তাঁর প্রতি অনেকেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। 1932 খৃষ্টাব্দে তিনি বিজ্ঞানাচার্য এস. আই. ভ্যাভিলভ্-এর কাছে গবেষণায় ব্যাপৃত হন। গবেষণার বিষয়বস্তু ছিল ইউরানিল লবণের দ্রবণে রঞ্জেনরশ্মি প্রভাবিত দীপ্তি সম্বন্ধে অনুসন্ধান। এই সময়ে তিনি এক অদ্ভুত নীলাভ বিকিরণ লক্ষ্য করেন। তখন বিজ্ঞানীরা মাদাম কুরী ও পিয়ারী কুরীর যুগান্তকারী আবিষ্কার তেজস্ক্রিয় বস্তুর প্রভাবে এমনই দিশাহারা যে, প্রতিটি বিকিরণকেই তাঁরা তেজস্ক্রিয়াজনিত বলে মনে করতেন। এমন কি, শোনা যায় মাদাম কুরী নিজেও চেরেনকভের দেখা বিকিরণ সম্বন্ধে একই ভুল করেছিলেন।

চেরেনকভের আগেই ম্যালেট এই নীলাভ বিকিরণ সম্বন্ধে কিছু পর্যালোচনা করেন, কিন্তু কোন সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেন নি। চেরেনকভ্ই প্রথম 1937 খৃষ্টাব্দে বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন হয়েও তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ করেন যে, তাঁর দেখা নীলাভ বিকিরণ তেজস্ক্রিয়াজনিত বিকিরণ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। ঠিক ঐ সময়ে বিজ্ঞানী আই. ই. তাম ও আই. এম. ফ্রাঙ্ক এক গবেষণা-পত্র প্রকাশ করেন। এই গবেষণা-পত্রে তাঁরা দেখান যে, যদি একটি তড়িৎ-কণা কোন তড়িৎ-বিভাজক (Dielectric) মাধ্যমের মধ্যে আলোকের গতি অপেক্ষা দ্রুততর একই গতিতে চালিত হয়, তা হলে মাধ্যমের অণুগুলি অসমভাবে বর্তিত হয়ে তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গের সৃষ্টি করে এবং এটাই শঙ্কুর আকারে নীলাভ বিকিরণরূপে প্রতিভাত হয়। তত্ত্বগত ফলাফল আর চেরেন-কভের পরীক্ষাপ্রসূত ফলাফল একই রূপ হওয়ায়, চেরেনকভের সিদ্ধান্ত নির্ভুল বলে প্রমাণিত হয়। এই বিকিরণ চেরেনকভ্ বিকিরণ নামে পরিচিত।

চেরেনকভ্ বিকিরণের উপর গত কয়েক বছর ধরে প্রচুর গবেষণা হয়েছে, এবং এখনও বহু বিজ্ঞানী এর উপর কাজ করে চলেছেন। সূক্ষ্ম চেরেনকভ্ নিরূপক যন্ত্রের সাহায্যে অতি দ্রুত গতিযুক্ত বা উচ্চ শক্তিসম্পন্ন কণার গুণাগুণ সম্বন্ধে অনেক কিছু জানা সম্ভব হয়েছে। মহাজাগতিক রশ্মি বিশ্লেষণে চেরেনকভ্ বিকিরণের তথ্যাবলী বিশেষ সহায়ক। চেরেনকভ্ নিরূপক যন্ত্রেই সেগ্রে, চেম্বারলিন প্রমুখ বিজ্ঞানীরা প্রথম অ্যান্টি-প্রোটনের

সন্ধান পান। পদার্থের চতুর্থ অবস্থার (প্লাজ্‌মা) জ্ঞান সংগ্রহে, উচ্চ শক্তিসম্পন্ন কণার গতি ও ভর নিরূপণে, অতি ক্ষুদ্র তরঙ্গ সৃষ্টির ব্যাপারে, শক্তির সমাহরণে এবং আরও নানা কাজে চেরেনকভ্‌ বিকিরণ বিজ্ঞানীদের কাছে হাতিয়ারস্বরূপ।

এই মৌলিক গবেষণার স্বীকৃতিস্বরূপ চেরেনকভ্‌, ভাম ও ফ্রাঙ্ককে যুক্তভাবে 1958 খৃষ্টাব্দে পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। 1964 খৃষ্টাব্দে রুশ সরকার তাঁদের দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মানজনক পুরস্কার চেরেনকভকে ভ্যাভিলভ্‌, ভাম ও ফ্রাঙ্কের সঙ্গে যৌথভাবে প্রদান করেন। ভ্যাভিলভ্‌ এই ঘোষণার বহু আগেই ইহলোক ত্যাগ করেন এবং এর অব্যবহিত পরেই চেরেনকভ্‌ তাঁর পত্নী, এক পুত্র ও এক কন্যাকে রেখে পরলোক গমন করেন।

শ্রীরতনমোহন খাঁ*

* সিটি কলেজ, কলিকাতা-9

উত্তর

(পারদর্শিতার পরীক্ষা)

1 নং — $\frac{y^3}{x^2}$

[x	জন	$(x \times x =) x^2$	ঘণ্টায়	x টি	কাপড়	প্রস্তুত	করে
$\therefore 1$	,,	x^2	,,	1 টি	,,	,,	,,
1	,,	1	,,	$\frac{1}{x^2}$ টি	,,	,,	,,
1	,,	$(y \times y =) y^2$	,,	$\frac{y^2}{x^2}$ টি	,,	,,	,,
y	,,	y^2	,,	$\frac{y^3}{x^2}$ টি	,,	,,	,,]

2 নং—সমান

[দুধের গ্লাস থেকে যে এক চামচ জলমিশ্রিত দুধ নেওয়া হলো, ধরা যাক তাতে জলের পরিমাণ x চামচ $(x<1)$। দুধের গ্লাসে আগে এক চামচ জল দেওয়ায় সেখানে এখন জলের পরিমাণ থাকছে $(1-x)$ চামচ। আবার জলের গ্লাসে যে জলমিশ্রিত দুধ ঢালা হলো, তাতে দুধের পরিমাণ $(1-x)$ চামচ।]

3 নং—1

[গুণোত্তর শ্রেণীটিতে সাধারণ গুণক হচ্ছে $2^{\frac{1}{3}}/2^{\frac{1}{2}}=2^{-\frac{1}{6}}$।

(এটাও দেখা যায় যে, $2^{\frac{1}{6}}/2^{\frac{1}{3}}=2^{-\frac{1}{6}}$)

সুতরাং চতুর্থ পদ $=2^{\frac{1}{6}}\times 2^{-\frac{1}{6}}=2^{0}=1$]

4 নং—অরূপ

[চন্দন অরূপের কাছ থেকে পাবে

$$30 \times 1 \text{ লক্ষ টাকা} = 30 \text{ লক্ষ টাকা}।$$

অরূপ চন্দনের কাছ থেকে পাবে

$$2^{0}+2^{1}+2^{2}+2^{3}+\ldots\ldots+2^{29} \text{ পয়সা}$$
$$= 2^{30}-1 \text{ পয়সা}$$
$$= 1073741823 \text{ পয়সা}$$
$$= 1 \text{ কোটি } 7 \text{ লক্ষ } 37 \text{ হাজার } 418 \text{ টাকা } 23 \text{ পয়সা}।$$

কে বেশী পাবে, এটা 2^{30}-এর মান নিখুঁতভাবে নির্ণয় না করেও নিম্নলিখিত উপায়ে অপেক্ষাকৃত সহজভাবে বলা যেতে পারে।

$$2^{30}-1=(2^{10})^{3}-1=(1024)^{3}-1>10^{9}$$

সুতরাং অরূপ পাবে 10^{9} পয়সারও বেশী অর্থাৎ 10^{7} বা 1 কোটি টাকারও বেশী কিন্তু চন্দন পাবে 30 লক্ষ টাকা।]

5 নং—$3\sqrt{3} : 2$

[ধরা যাক, r = বৃত্তের ব্যাসার্ধ,

a = ত্রিভুজের বাহু $=2r\sqrt{3}$

b = বর্গের বাহু $=r\sqrt{2}$

$\therefore$ ত্রিভুজ ও বর্গের ক্ষেত্রফলের অনুপাত

$$=\frac{a^{2}\sqrt{3}}{4} : b^{2}$$

$$=\frac{(2r\sqrt{3})^{2}\sqrt{3}}{4} : 2r^{2}$$

$$=3\sqrt{3} : 2 \text{]}$$

প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন 1। উদ্ভিদ-হর্মোন কি ?

গোপাল হালদার, বীরভূম।

প্রশ্ন 2। ভূমিকম্পের উৎপত্তি সম্বন্ধে কিছু বলুন।

পিন্টু দাস, সরলা বসু, রাঁচী।

উঃ 1। প্রাণীদেহে কতকগুলি অন্তঃস্রাবী গ্রন্থি থাকে। এসব গ্রন্থি থেকে বিভিন্ন ধরণের জৈব রাসায়নিক পদার্থ নিঃসৃত হয়—যাদের বলা হয় হর্মোন বা উত্তেজক রস। প্রাণীদেহে বিভিন্ন প্রকার নিঃসৃত হর্মোন বিশেষ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে।

প্রাণিদেহে হর্মোন নিঃসারক গ্রন্থিগুলির অস্তিত্ব ও হর্মোনের বহুমুখী কার্যক্ষমতার কথা চিন্তা করে বিজ্ঞানীরা উদ্ভিদদেহেও হর্মোনের অস্তিত্ব প্রমাণ করেছেন। বিজ্ঞানী-দের এই বিষয়ে অনুসন্ধিৎসার ফলে জানা গেছে যে, উদ্ভিদের দেহের বিভিন্ন অংশে এই সব হর্মোন তৈরি হয়—যেগুলি হলো জটিল ধরণের জৈব রাসায়নিক পদার্থ। উদ্ভিদদেহের এক অংশে উৎপন্ন হয়ে এরা অপরাপর অংশে প্রবাহিত হয়। এরা উদ্ভিদদেহে নানারকম পরিবর্তন ঘটায়। উদ্ভিদ-হর্মোনের বিভিন্ন ধরণের কাজের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো—উদ্ভিদের দৈহিক বৃদ্ধি, কোষ-বিভাজন, উদ্ভিদের ফুল, ফল, ডাল, পাতার পতন রোধ, উদ্ভিদের মুকুলোদ্গম, অঙ্কুরোদ্গম ইত্যাদিতে সাহায্য করা। এগুলি ছাড়াও কতকগুলি উদ্ভিদ-হর্মোন আছে—যারা উদ্ভিদ মূলের বৃদ্ধি, বীজের অঙ্কুরোদ্গম প্রভৃতি কাজে বাধার সৃষ্টি করে।

বর্তমানে বিজ্ঞানীরা কৃত্রিমভাবে রাসায়নিক সংশ্লেষণ পদ্ধতির সাহায্যে উদ্ভিদ-হর্মোনের সমতুল্য পদার্থ তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন। এসব কৃত্রিম হর্মোনগুলিকে প্রধানতঃ কিনিন, অক্সিন ও জিবারেলিন—এই তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। এদের প্রয়োগ কৃষি-জগতে যুগান্তর এনেছে। কালে এবং অকালে ফসল তৈরি, বীজহীন ফলের উৎপাদন, বিভিন্ন ফসলের দ্রুত উৎপাদন ইত্যাদি ব্যাপারে উদ্ভিদ-হর্মোন যথেষ্ট আশার সঞ্চার করেছে।

উঃ 2 প্রাচীনকালে ভূমিকম্পের উৎপত্তির কারণ হিসাবে বিভিন্ন বিজ্ঞানী বিভিন্ন ধারণা পোষণ করতেন। অ্যারিষ্টোটল মনে করতেন যে, ভূগর্ভস্থিত গহ্বরসমূহে আবদ্ধ গ্যাস উন্মুক্ত হবার চেষ্টায় শিলাস্তরে আঘাত করলে নিকটবর্তী অঞ্চলে কম্পনের সৃষ্টি হয়—যাকে ভূমিকম্প বলা হয়। বর্তমান কালের ভূতাত্ত্বিকগণ কিন্তু ভূমিকম্পের কারণ হিসাবে এই ব্যাখ্যা মেনে নিতে রাজী নন। বিজ্ঞানসম্মত চিন্তার দ্বারা ভূমিকম্পের কারণ হিসাবে তাঁরা প্রধানতঃ নিম্নোক্ত ঘটনাগুলিকেই দায়ী করেন।

1) আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতজনিত—আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের সঙ্গে ভূমিকম্পের বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। ভূপৃষ্ঠের নীচে অতিরিক্ত চাপে শিলা গলিত অবস্থায় থাকে। একেই বলা হয় লাভা। আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদ্গারের সময় এই গলিত লাভা ভূগর্ভ থেকে বেরিয়ে আসবার জন্যে প্রচণ্ড বেগে ভূপৃষ্ঠে আঘাত করে এবং এর ফলেই ভূমিকম্পের সৃষ্টি হয়।

2) শিলাস্তরের চ্যুতিজনিত—উপরিউক্ত কারণটি কেবলমাত্র আগ্নেয়গিরিবহুল অঞ্চলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। আধুনিক ভূতাত্ত্বিকদের মতানুযায়ী বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই শিলাচ্যুতির ফলেই ভূমিকম্পের সৃষ্টি হয়। প্রাকৃতিক কারণে শিলাস্তরগুলির উপর স্থিতিস্থাপক টানের উদ্ভব হয়। স্থিতিস্থাপক টানের ফলে শিলাস্তরটি ক্রমাগতই বেঁকে যেতে থাকে। অবশেষে একটা নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করলে শিলাস্তরটির বিচ্যুতি ঘটে। এই বিচ্যুতির ফলে সমস্ত শিলাস্তর প্রচণ্ডভাবে কাঁপতে সুরু করে এবং ভূমিকম্পের সৃষ্টি হয়।

উপরিউক্ত কারণগুলি ছাড়াও পাহাড়ী অঞ্চলে ভূমিকম্পের অন্যতন প্রধান কারণ হচ্ছে পার্বত্য ধ্বস্। পর্বতশীর্ষ থেকে বিরাটাকার ধ্বস্ নামবার ফলে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ভূমিকম্পের সৃষ্টি হয়। এছাড়াও সমুদ্রপোকূলে তরঙ্গের আঘাতেও মৃদু ভূমিকম্পের উৎপত্তি হয়ে থাকে।

ভূমিকম্পের উৎপত্তি সম্বন্ধে আরও অনেক মতবাদ প্রচলিত আছে।

শ্যামসুন্দর দে*

* ইনস্টিটিউট অব রেডিও-ফিজিক্স অ্যাণ্ড ইলেকট্রনিক্স, বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা-9

বিবিধ

জগদীশ বসু জাতীয় বিজ্ঞান প্রতিভা অনুসন্ধান বৃত্তি

বর্তমান বছরে জগদীশ বসু জাতীয় বিজ্ঞান প্রতিভা অনুসন্ধান বৃত্তিপ্রাপ্ত তালিকায় শ্রীঅরূপকুমার দাস প্রথম স্থান অধিকার করেছেন। তিনি মৌলানা-আজাদ কলেজের প্রাক্-চিকিৎসা-বিদ্যার ছাত্র। বাকী 19 জন বৃত্তিপ্রাপ্ত স্নাতক-পূর্ব ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে আছেন:—শ্রীঅরবিন্দ চক্রবর্তী, শ্রীরাজীব এম. দেশপাণ্ডে, শ্রীসমররঞ্জন পাল, শ্রীইন্দ্রজিৎ সরদার, শ্রীরাকেশকুমার লাল, শ্রীঅঞ্জন ঘোষ, শ্রীগৌতম সাহা, মিস ম্যারিয়েট্টা নিগ্‌লি, শ্রীগুরুপ্রসাদ বন্দোপাধ্যায়, শ্রীঅনুপকুমার মিত্র, শ্রীঅরবিন্দ পাল, শ্রীসুমনকুমার রায়, শ্রীসৌরভকান্তি দত্ত, শ্রীঅমিতাভ ঘোষ, শ্রীসোমনাথ সাহা, শ্রীডি. সীতারাম, শ্রীসত্যপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীসোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীসুপ্রিয় দত্ত।

এই বৃত্তিপ্রাপ্তদের মধ্যে প্রথম দশটি স্থানের অধিকারীরা বছরে মোট দশহাজার টাকা এবং সংগঠনের বিশেষ সমৃদ্ধি-সাধন কর্মসূচীর সুবিধা পাবেন। পরবর্তী দশজন পাবেন উৎসাহদায়ক পুরস্কার হিসাবে বই বা যন্ত্রপাতি।

বিজ্ঞান মেলা পরিকল্পনার অঙ্গ হিসাবে পশ্চিমবঙ্গের যে কোন ছাত্র-ছাত্রী বৈজ্ঞানিক প্রকল্পের কাজ গ্রহণ করতে পারেন এবং বৈজ্ঞানিক প্রকল্পের কর্মসাধনের কৃতিত্বের ভিত্তিতে বিজ্ঞান মেলা পুরস্কার প্রদত্ত হয়। 1970 সালে এই পরিকল্পনায় বিভিন্ন জেলা থেকে ৩৫৪ জন প্রতিযোগী অংশ নেন তন্মধ্যে এরা পুরস্কার লাভ করেন—শ্রীদিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায় (বনওয়ারীলাল ভালোটিয়া কলেজ, আসানসোল) শ্রীঅচিন্ত্যকুমার দাস (যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়), শ্রীজয়ন্ত স্থ্যানাপতি (যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়), শ্রীরতনকান্তি ঘোষ (নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজে), শ্রীসমররঞ্জন পাল (মৌলানা আজাদ কলেজ), শ্রীশুভব্রত রায়চৌধুরী (সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ), শ্রীগুরুপ্রসাদ বন্দোপাধ্যায় (মৌলানা আজাদ কলেজ), শ্রীঅরূপকুমার দাস (মৌলানা আজাদ কলেজ), শ্রীসৌরভকান্তি দত্ত (মৌলানা আজাদ কলেজ), শ্রীমতী মহাশ্বেতা ঘোষ (রামমোহন কলেজ), শ্রীচন্দন রক্ষিত (মহারাজা বীরবিক্রম কলেজ, আগরতলা), শ্রীদেবশঙ্কর রায় (প্রেসিডেন্সী কলেজ,) শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ খাঁন (সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ), শ্রীজগন্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (প্রেসিডেন্সী কলেজ।

জগদীশ বসু জাতীয় বিজ্ঞান-প্রতিভা অনুসন্ধান বৃত্তি এবং বিজ্ঞান মেলা সম্বন্ধে বিস্তৃত তথ্য ঐ সংস্থার কার্যালয়ে (93/1 আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড, কলিকাতা-9) জানা যাবে।

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের উদ্যোগে লোকরঞ্জক বিজ্ঞানবিষয়ক বক্তৃতা

গত 16ই ফেব্রুয়ারী, '71 বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের উদ্যোগে পরিষদ ভবনের 'কুমার প্রথম নাথ রায় হলে' চলচ্চিত্র সহযোগে 'ক্যান্সার ও তার প্রতিকার' শীর্ষক একটি লোকরঞ্জক বিজ্ঞান-বিষয়ক বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হয়। বক্তৃতাটি প্রদান করেন কলিকাতার চিত্তরঞ্জন জাতীয় ক্যান্সার গবেষণা-কেন্দ্রের অধিকর্তা ডক্টর সন্তোষ মিত্র।

ভারতের তিনটি শহরের বাতাসে আবর্জনার পরিমাণ বৃদ্ধি

ইউ. এন. আই.-এর সংবাদে প্রকাশ—ভারতের মানমন্দিরসমূহের ডিরেক্টর জেনারেল ডক্টর কোটেশ্বরম

22শে মার্চ এক সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, দিল্লী, কলকাতা এবং কানপুরের স্থায় শহরগুলিতে গত 14 বছরে বায়ুমণ্ডলে আবর্জনার পরিমাণ শতকরা 50 থেকে 100 ভাগ পর্যন্ত বেড়ে গেছে।

কানপুর ও কলকাতার প্রতি 1 মাইল স্থানে এক মাসে যে পরিমাণ দূষিত পদার্থ আকাশ থেকে নেমে আসে, ভারতের আবহাওয়া বিভাগ সেটা সংগ্রহ করে উপরিউক্ত সিদ্ধান্তে পৌঁচেছেন।

মনসুনের বাতাস অবশ্য ঝাড়ুদারের কাজ করে, বায়ুমণ্ডল এবং নদীনালা থেকে সে দূষিত পদার্থ ঝেঁটিয়ে নিয়ে চলে যায়।

পৃথিবীর কক্ষপথে জাপানের প্রথম পূর্ণাঙ্গ উপগ্রহ

জাপানের প্রথম পূর্ণাঙ্গ কৃত্রিম উপগ্রহ পৃথিবীর কক্ষপথে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং নির্ভুলভাবে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে চলছে।

16ই মার্চ দক্ষিণ জাপানের উচিনৌরা মহাকাশ ঘাঁটি থেকে রয়টার, এ. পি. ও এ. এফ. পি. জানিয়েছেন, ভারতীয় সময় সকাল 9-30 মিনিটে 63 কে.জি ওজনের কৃত্রিম উপগ্রহটি পৃথিবীতে বেতার-সঙ্কেত পাঠাতে সুরু করেছে।

এই সঙ্কেত হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে আমেরিকান মহাকাশ ঘাঁটিতেও ধরা পড়েছে। প্রায় এক বছর আগে একটি রকেটের নাসিকাগ্রভাগ পৃথিবীর কক্ষপথ প্রদক্ষিণ করে এবং জাপান আন্তর্জাতিক মহাকাশ ক্লাবের পঞ্চম সদস্য হিসাবে গণ্য হয়। অন্যেরা হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট ইউনিয়ন, ফ্রান্স ও চীন। পুরাপুরি নিজেদের বৈজ্ঞানিক চেষ্টা ও অর্থসঙ্গতির দ্বারা এই কয়টি রাষ্ট্র পৃথিবীর কক্ষপথে কৃত্রিম উপগ্রহ স্থাপন করতে পেরেছে।

এই বছরের শেষাশেষি জাপান পৃথিবীর কক্ষপথে একটি বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাগার পাঠাবে—16ই মার্চের উৎক্ষেপণের দ্বারা তারই চূড়ান্ত মহড়া হিসাবে রকেট ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি পরীক্ষা করে নেওয়া হলো।

এই চেষ্টা গত সেপ্টেম্বরেও একবার করা হয়েছিল, কিন্তু তখন রকেটের চতুর্থ পর্যায়টি চালু না হওয়ায় সব কিছু পণ্ড হয়ে যায়।

জাপানী মহাকাশ ঘাঁটি থেকে বিজ্ঞানীরা ঘোষণা করেছেন, কৃত্রিম উপগ্রহটি প্রতি 1 ঘণ্টা 35 মিনিটে একবার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে চলছে এবং অতি সুস্পষ্টভাবে বেতার-সঙ্কেত পাঠাচ্ছে।

বিজ্ঞানীরা একথাও জানিয়েছেন যে, উপগ্রহটির ব্যাটারীগুলি প্রায় এক সপ্তাহ চালু থাকবে। এরপর কোন বেতার-সঙ্কেত পাওয়া যাবে না—কিন্তু ওর গতিবিধির দিকে নজর রাখবার ব্যবস্থাটি চালু থাকবে।

জ্যোতির্বিজ্ঞানের বিবিধ প্রত্যয়

সম্প্রতি কলকাতার মার্কিন তথ্য দপ্তরের সাংস্কৃতিক বিভাগ তাঁদের প্রেক্ষাগৃহে বাংলা ভাষার মাধ্যমে লোকরঞ্জক বিজ্ঞান বক্তৃতামালার আয়োজন করেছেন। গত 5ই ফেব্রুয়ারী এই বক্তৃতামালার দ্বিতীয় অধিবেশনে সাহা ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের সহযোগী অধ্যাপক ও বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের বিশিষ্ট সদস্য ডক্টর সূর্যেন্দুবিকাশ কর 'জ্যোতির্বিজ্ঞানের বিবিধ প্রত্যয়' বিষয়ে একটি মনোজ্ঞ আলোচনা করেন। স্লাইড সহযোগে জ্যোতির্বিজ্ঞানের দুরূহ তত্ত্বগুলি তিনি প্রাঞ্জল ভাষায় সাধারণের কাছে উপস্থাপন করেন। নক্ষত্রের সৃষ্টিতত্ত্ব থেকে সুরু করে কিভাবে জ্যোতির্বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা গড়ে উঠেছে এবং ভারত ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সে সব বিষয়ে নানা গবেষণার কথা তিনি উল্লেখ করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি 50 বছর আগে ভারতীয় বিজ্ঞানী ডক্টর মেঘনাদ সাহার তাপ-আয়নন তত্ত্বের বিষয় উত্থাপন করেন। সুপার নোভা, নক্ষত্রের বিস্ফোরণ, কোয়াসার, পালসার, নিউট্রন নক্ষত্র

ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করে ঐ সমস্ত জ্ঞান কিভাবে আমাদের সাধারণ জীবনেও কাজে লাগছে, সে কথা তিনি উল্লেখ করেন। তিনি আশা করেন, ভারতের মত উন্নতিশীল দেশে জ্যোতির্বিজ্ঞানের চর্চা সম্পর্কে গুরুত্ব আরোপ করা হবে। কারণ আধুনিক যুগে বিজ্ঞানের কোন শাখাকে উপেক্ষা করে অন্য শাখার উন্নয়ন সম্ভব নয়।

পৃথিবীর চতুর্দিকে নিরাপত্তামূলক আবরণ সংক্রান্ত গবেষণা

মিউনিখ (ডি. এ. ডি.)—পৃথিবীর বায়ুবেষ্টনীর দুটি অংশ—ট্রোপোস্ফিয়ার নীচের অংশ আর তার উপরের অংশ স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার। এই দুই অংশের মধ্যবর্তী একটি স্তর আছে। তার নাম ট্রোপোপজ। এর উচ্চতা 10 থেকে 13 কিলোমিটার। এই বিশেষ স্তরটি নিয়ে গবেষণা চলছে। বিজ্ঞানীরা বলেন এই স্তরটি উপরের দুটি অংশের মধ্যে বায়ু চলাচলের পথ বন্ধ করে রাখে। মহাকাশে পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণের পর এই ট্রোপোপজের সহায়তায় পৃথিবীমুখী বিষাক্ত পদার্থের পতনের পথ রোধ করা যায়। তবে এই স্তরে কোথাও কোথাও ছিদ্রও আছে। পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণের বহুদিন পরে বিষাক্ত পদার্থ এই ছিদ্রপথে পৃথিবীতে নেমে এসে মানুষের জীবন বিপন্ন করতে পারে। বিজ্ঞানীরা এই ছিদ্রগুলি বন্ধ করবার চেষ্টা করছেন। জার্মান বিজ্ঞানীরা পশ্চিম জার্মেনীর সর্বাপেক্ষা উঁচু পর্বত জুগস্পিটের চূড়ায় একটি যন্ত্র বসিয়ে গবেষণা করছেন আর অন্বেষণ করছেন ওই ছিদ্রগুলি। গবেষণার উদ্যোক্তা পশ্চিম জার্মেনীর বিজ্ঞানীরা, তবে মার্কিন দেশও এই কর্মপন্থা অনুসরণ করছেন।

ভ্রম সংশোধন

গত ফেব্রুয়ারী (1971) সংখ্যার 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে' প্রকাশিত "তেজস্ক্রিয়তা" শীর্ষক প্রবন্ধে একটি ভুল রহিয়া গিয়াছে। 90 পৃষ্ঠার চতুর্দশ লাইনে—'নির্গত আল্‌ফা রশ্মির বেগও···তিন লক্ষ কিলোমিটার"। এই অংশটুকু বাদ দিয়া পড়িতে হইবে।

সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য
শ্রীমিহিরকুমার ভট্টাচার্য কর্তৃক পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-6 হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ 37/7 বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত।
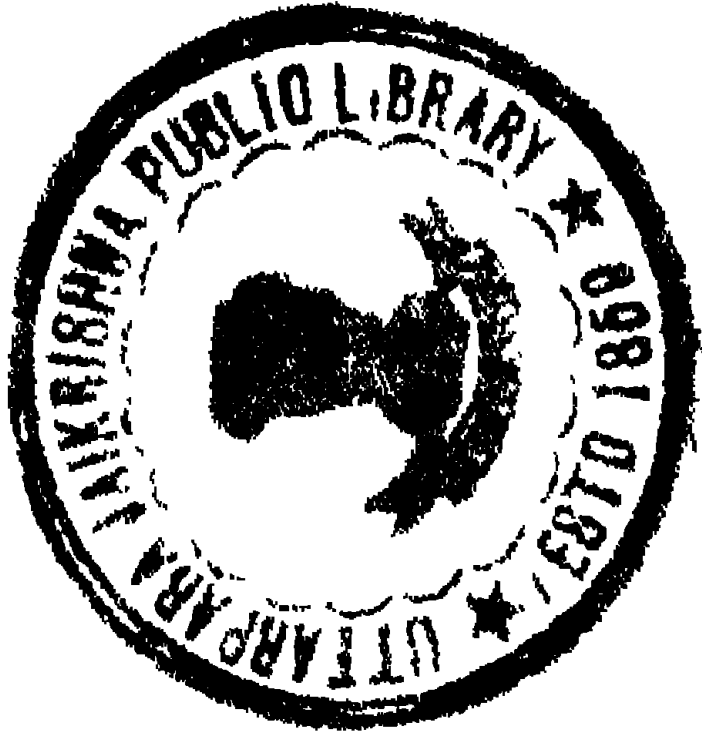
জ্ঞান ও বিজ্ঞান

চতুর্বিংশ বর্ষ মে, 1971 পঞ্চম সংখ্যা

বাংলা দেশে নৃশংস বর্বরতার বিরুদ্ধে বিজ্ঞানীদের প্রতিবাদ

বাংলা দেশে পশ্চিম পাকিস্তানের জঙ্গীশাহীর নৃশংস বর্বরতার বিরুদ্ধে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের উদ্যোগে গত 16ই এপ্রিল, '71 তারিখে পরিষদ ভবনে পশ্চিম বঙ্গের বিজ্ঞানী, বিজ্ঞানকর্মী ও বিজ্ঞানানুরাগী জনসাধারণের একটি প্রতিবাদ-সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন জাতীয় অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু। পশ্চিম পাকিস্তানের জঙ্গী গোষ্ঠী কর্তৃক হিংস্র পশুশক্তির চরম প্রকাশের তীব্র নিন্দা করে এবং বাংলা দেশের অভূতপূর্ব মুক্তি-সংগ্রামের ঐতিহাসিক গুরুত্ব বিশ্লেষণ করে ভাষণ দেন অধ্যাপক প্রিয়দারঞ্জন রায়।

নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি সভায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়—

"বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের উদ্যোগে আয়োজিত এই সভা বাংলা দেশে পশ্চিম

পাকিস্তানের জঙ্গী গোষ্ঠীর নৃশংস বর্বরতার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাইতেছে এবং বাংলা দেশের অভূতপূর্ব মুক্তি-সংগ্রামের প্রতি সম্পূর্ণ সহানুভূতি ও সমর্থন জ্ঞাপন করিতেছে। বাংলা দেশের বিজ্ঞানী, শিক্ষাবিদ্, ছাত্র, তথা সমগ্র জনসাধারণের উপর নারকীয় অত্যাচার যাহাতে অবিলম্বে বন্ধ হয়, সেই উদ্দেশ্যে পাকিস্তান সরকারের উপর নৈতিক প্রভাব প্রয়োগ করিবার জন্য বিশ্বের বিজ্ঞানীসমাজের নিকট এই সভা আবেদন জানাইতেছে। বাংলা দেশের জনপ্রিয় সরকারকে অবিলম্বে কূটনৈতিক স্বীকৃতি দানের জন্য ভারত সরকারকে এই সভা অনুরোধ করিতেছে। বাংলা দেশের ঐতিহাসিক মুক্তি-সংগ্রামে যথাসাধ্য সাহায্য করিবার জন্য জনসাধারণকে অনুরোধ করা হইতেছে।"

সভাপতির ভাষণে অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু বলেন, পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যদের আক্রমণে বাংলা দেশে যে গণহত্যা ও নিদারুণ অত্যাচার চলছে, তাতে আমরা মর্মান্তিক দুঃখিত ও বিচলিত। এই ব্যাপারে যতটা সম্ভব অর্থ-সাহায্য ও প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র দিয়ে বাংলা দেশের জনগণের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করা আমাদের একান্ত কর্তব্য। তিনি সকলের নিকট এই উদ্দেশ্যে সাহায্য ও সহযোগিতার জন্য আবেদন জানান।

পরিশেষে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের কর্মসচিব ডক্টর জয়ন্ত বসু পশ্চিম পাকিস্তানের বর্বরতার বিরুদ্ধে বাংলা দেশের মানুষের বলিষ্ঠ সংগ্রামকে অভিনন্দন জানিয়ে তাঁদের এই মুক্তি-সংগ্রামের সাহায্যার্থে বিজ্ঞান পরিষদ কর্তৃক একটি সাহায্য তহবিল খোলার কথা ঘোষণা করেন এবং এই তহবিলে সকলকে যথাসাধ্য দান করতে আহ্বান জানান।

দান পাঠাবার ঠিকানা—

বাংলা দেশ সাহায্য তহবিল,
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ,
পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-6
(ফোন : 55-0660)।

প্রাচীন ভারতবর্ষে বিজ্ঞান-চর্চা

অরূপরতন ভট্টাচার্য

প্রাচীন ভারতবর্ষে বিজ্ঞান-চর্চার ইতিহাস যেমন গৌরবোজ্জ্বল, তেমনি ঐতিহ্যমণ্ডিত। সে আজকের কথা নয়—ভারতীয় সভ্যতা এবং সংস্কৃতির ধারাবাহিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা লক্ষ্য করি যে, সেকালেও, বৈদিক সভ্যতার সময়ে তো বটেই—এমন কি, সিন্ধু সভ্যতার সমসাময়িক কালের সভ্যতার এক অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে ভারতীয় বিজ্ঞান সুস্পষ্ট এবং সুসংবদ্ধরূপে উদ্ভূত, উন্নত এবং সমাজে স্বীকৃত হয়েছিল।

ভারতীয় বিজ্ঞানের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য—তার স্বাতন্ত্র্য, স্বনির্ভরতা এবং চিন্তার নবীনতা। একথা ঠিক যে, বিজ্ঞানের যে সব শাখার সঙ্গে ধর্মের যোগ গভীর, সেই শাখাগুলির দিকেই ভারতীয় বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি সর্বাগ্রে সবচেয়ে বেশী আকৃষ্ট হয়। কিন্তু ধর্ম কোথাও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর স্বচ্ছতাকে অস্পষ্ট করে নি। পূজা-পার্বণে গ্রহ-নক্ষত্রের অনুকূল অবস্থান—সেখানে মহাকাশ এবং জ্যোতির্বিজ্ঞান, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে যাগ-যজ্ঞ এবং বেদী নির্মাণ—সেখানে জ্যামিতিক চিত্র এব' বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান এবং সমগ্র জীবনে সততা ও নিষ্ঠার মাত্রা ও স্থান—সেখানে উপযুক্ত মহাজাগতিক পরিবেশ এবং জ্যোতিষিক ব্যাখ্যান প্রসঙ্গে ভারতীয় বিজ্ঞান ধীরে ধীরে বিকাশ লাভ করে। কিন্তু শুধু ধর্মীয় দিকটিই একমাত্র উল্লেখযোগ্য দিক নয়, উন্নতির মূলে সমস্ত কৃষ্টিসম্পন্ন দেশের মত ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেও একটি সামাজিক প্রসঙ্গ আছে। সে প্রসঙ্গ নিঃসন্দেহে তার জীবনযাত্রার মান সহজ ও স্বাচ্ছন্দ্যযুক্ত করবার জন্যে। এদের সকলের মিলিত শক্তিতে ভারতীয় বিজ্ঞান শাখা-পল্লবে ধীরে ধীরে পূর্ণতা লাভ করে।

জ্যোতির্বিজ্ঞান

প্রাচীন ভারতীয় বিজ্ঞানের যে সব শাখাগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য, তার মধ্যে সর্বাগ্রে জ্যোতির্বিজ্ঞানের কথা ধরা যাক। শুধু প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের সাহায্যে জ্যোতির্বিজ্ঞানের যে সব সত্য সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম হিসাবে ভারতীয় বৈজ্ঞানিকেরা উদ্ভাবন করে গেছেন, তা তৎকালীন পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ এবং এযুগেও সমানভাবে গ্রহণযোগ্য। সূর্যকে কেন্দ্র করে পৃথিবীর বার্ষিক গতির কাল, অর্থাৎ এক সৌরবর্ষের পরিমাণ স্থূল হিসাবে হলো 365 দিন। কিন্তু নিখুঁৎ হিসাবে দশমিক সংখ্যায় এযুগে তার নির্ণীত পরিমাণ 365.2564 দিন। প্রাচীন পৃথিবীর দু-জন জ্যোতির্বিজ্ঞানীর কথা উল্লেখ করা যায়। দু-জনেই বিশ্ববন্দিত এবং এযুগেও সমান শ্রদ্ধেয়, একজন গ্রীসদেশীয়—নাম টলেমী, জন্মেছিলেন খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথমার্ধে এবং অন্যজন ভারতবর্ষীয়—নাম আর্যভট্ট, জন্মেছিলেন সম্ভবতঃ 476 সালে। দু-জনেই এক সৌরবর্ষের পরিমাণ নিখুঁৎভাবে নির্ণয় করবার চেষ্টা করেছিলেন। তার মধ্যে টলেমী কর্তৃক নির্ণীত পরিমাণ 365.263 এবং আর্যভট্ট কর্তৃক নির্ণীত সংখ্যা 365.258; অর্থাৎ আর্যভট্টের গণনা সঠিক সময়ের অনেক কাছাকাছি।

আর্যভট্টের পূর্বেও ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যা আলোচনার কিছু কিছু উল্লেখযোগ্য পরিচয় পাওয়া যায়। এই পরিচয় গ্রন্থনির্ভর। প্রাচীন ভারতবর্ষে যতগুলি জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক গ্রন্থের

সন্ধান মিলে. তন্মধ্যে বেদাঙ্গ জ্যোতিষ প্রাচীনতম। এটি বেদের অঙ্গস্বরূপ পরিশিষ্ট গ্রন্থ, রচনাকাল সম্ভবতঃ 1200 খৃষ্টপূর্বাব্দ। এটিতে পাঁচ বছরে এক যুগ ধরে একটি কাল বিভাগের দ্বারা বর্ণিত আছে।

বৈদিক যুগে এবং তৎপরবর্তী কালে জ্যোতির্বিদ্যার আরও অনেকগুলি সিদ্ধান্ত ও সংহিতা গ্রন্থের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু জ্যোতির্বিদ্যার পূর্ণতর বৈজ্ঞানিক আলোচনার সূত্রপাত হয় আর্যভট্টের সময়ে, খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর শেষার্ধে বা সমসাময়িক কালে। বিভিন্ন গ্রহ-উপগ্রহের সঠিক আবর্তন-কাল নির্ণয় করা ছাড়াও আর্যভট্ট অজস্র বৈজ্ঞানিক সত্য সর্বসমক্ষে উপস্থাপিত করে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

পৃথিবীর গতি ও আবর্তন সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য পাশ্চাত্য দেশে নিকোলাওস কোপার্নিকাস (1473-1543 খৃঃ), জিওর্দানো ব্রুনো (1548-1600 খৃঃ) এবং গ্যালিলিও গ্যালিলিয়ের (1568-1642 খৃঃ) প্রায় সাত শত বছর পূর্বে ভারতবর্ষে আর্যভট্টই সুস্পষ্ট ভাষায় এবং প্রত্যয়ের সঙ্গে গীতিকাপাদ গ্রন্থশেষে ব্যক্ত করেন।

পৃথিবী যে পূর্বদিকে আবর্তনরত এবং সেই কারণেই যে সূর্য-চন্দ্র-গ্রহ-নক্ষত্র দৈনিক পশ্চিমে ধাবমান বলে মনে হয়, আর্যভট্ট একটি শ্লোকে সে কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন:

অনুলোমগতির্নৌস্থ পশ্যত্যচলং বিলোমগং যদ্বৎ।
অচলানি তানি তদ্বৎ সম পশ্চিমগানি লঙ্কায়াম্॥

অর্থাৎ, পূর্ব দিকে চলমান নৌকায় উপবিষ্ট জন যেমন নদীর দুই পারের অচল বৃক্ষ এবং

মহারাজা জয়সিংহ কর্তৃক স্থাপিত (সম্ভবতঃ 1734 খৃঃ) জয়পুরের বিখ্যাত মান মন্দিরের রেখাচিত্র। যন্ত্রগুলি অতি প্রাচীন নয়। কিন্তু দূরবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কারের পূর্বে ভারতবর্ষে জ্যোতির্বিজ্ঞানের চর্চায় যে সব যন্ত্রের ব্যবহার ছিল, সেগুলির উপর ভিত্তি করেই এই মানমন্দির নির্মিত।

পর্বত পশ্চিম দিকে ধাবমান দেখেন, তেমনি লঙ্কায়* স্থির নক্ষত্রগুলিকে পশ্চিম দিকে গতিশীল দেখায়।

তাছাড়া কোপারনিকাসের জন্মের প্রায় দু-হাজার বছর পূর্বে রচিত ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (3য় পঞ্চিকা. 44 অধ্যায়) এবং বিষ্ণুপুরাণে (দ্বিতীয় অংশ, অষ্টম অধ্যায়) দিন-রাত্রি ভেদের কারণ সম্পর্কেও সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে। পৃথিবী যে গোলাকার, একথাও বৈদিক ঋষিরা অবগত ছিলেন এবং পরবর্তী কালে দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য (জন্ম 1114 খৃঃ) সিদ্ধান্ত শিরোমণি গ্রন্থে তা নির্দ্বিধায় উল্লেখ করেছেন। শুধু তাই নয়, পৃথিবী গোলাকার হওয়া সত্ত্বেও কেন তাকে সমতল দেখায়, এই বিষয়ে ভাস্করাচার্য সুন্দর একটি উপমা দিয়ে বলেন যে, একটি বৃত্তের পরিধির শত ভাগের এক ভাগকে যেমন সমান বোধ হয়, তেমনি মানুষ পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে পৃথিবীর যৎসামান্য অংশ দেখতে পায় বলে তাকে সমতল দেখায়।

এসব ছাড়াও ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা আরও অনেকগুলি তথ্যের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। তাঁরা সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণের কারণ বুঝেছিলেন, চন্দ্রের সঠিক ব্যাস নির্ণয় করেছিলেন। মেরু-দ্বয়ের অবস্থান জানতেন এবং অধিকাংশ তারকার গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তাঁরা আরও জানতেন যে, চন্দ্র ও গ্রহগুলির ঔজ্জ্বল্য তাদের আপন আলো বিচ্ছুরণের ফল নয়—সূর্যের আলোর প্রতিফলনই তাদের ঔজ্জ্বল্যের মূল কারণ।

পাটীগণিত

জ্যোতির্বিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষে গণিত সংক্রান্ত অঙ্ক যে শাখাটি সবচেয়ে বেশী পরিণতি লাভ করেছিল, সেটি হলো পাটীগণিত। পাটী-গণিতে ভারতীয়দের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব শূন্য উদ্ভাবন এবং দশমিক সংখ্যা পাতন পদ্ধতির আবিষ্কার। সমস্ত গণিতের ইতিহাসে এটি নিঃসন্দেহে মহত্তম কীর্তি। অনস্তিত্বকে রূপদান করা এবং তাকে ব্যবহারোপযোগী অসাধারণ শক্তিতে প্রতিষ্ঠা করা সহজ কথা নয়—আমাদের আদি যুগের পূর্বপুরুষেরা সেই অসাধ্য সাধন করে গণিতের জগতে এক অতি বিশিষ্ট আসন লাভ করেছিলেন।

দশমিক সংখ্যা পাতন পদ্ধতিতে ব্যবহৃত সংখ্যাগুলি এই যুগেও আরব দেশীয় সংখ্যা নামে প্রচলিত। এই আখ্যা নিঃসন্দেহে ভুল। আরব দেশ থেকে ইউরোপে প্রচারিত হয় বলে আজ সমগ্র পৃথিবীতে এই সংখ্যাগুলি সেকালের ইউ-রোপীয় চিন্তায় আরব দেশীয় সংখ্যা হিসাবে পরিচিত। কিন্তু আরব দেশে দশমিক সংখ্যা-পদ্ধতির সংখ্যাগুলির প্রথম ব্যবহারের (873 খৃঃ) প্রায় এক হাজার বছর পূর্বে মহারাজা অশোকের শিলালিপি (256 খৃঃ) সংখ্যাগুলির প্রাথমিক ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। শূন্যকে সংখ্যা হিসাবে ব্যবহার এবং প্রতীকের সাহায্যে রূপদান করবার প্রথম সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় পিঙ্গলের ছন্দ সূত্র নামক গ্রন্থটিতে। ছন্দ সূত্রটি খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী বা ঐ সময়কার রচনা।

দশমিক পদ্ধতিতে সংখ্যা-লিখন প্রণালী কবে প্রথম ভারতে আবিষ্কৃত হয়, তা নির্ণয় করা কঠিন। কিন্তু খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে আর্যভট্টের সমসাময়িক কালে ভারতবর্ষে এটির ব্যাপক প্রচলন লক্ষ্য করা যায়।

প্রাচীন ভারতবর্ষে যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ বর্গ, ঘন, বর্গমূল, ঘনমূল—পাটীগণিতের প্রাথমিক এই আট রকমের প্রণালী প্রচলিত ছিল এবং প্রতিটি পদ্ধতিই ছিল সহজ ও সাধারণের গ্রহণযোগ্য। ইউরোপে পঞ্চদশ—এমন কি, ষোড়শ শতাব্দীতে ভাগ একটি দুঃসাধ্য প্রক্রিয়া ছিল, যা তার

*এযুগে যেমন গ্রীনিচকে, প্রাচীন কালে লঙ্কাকে তেমনি পৃথিবীর কেন্দ্রস্থল ধরা হতো।

সহস্রাধিক বছর পূর্বের ভারতবর্ষে গণিতের এক অতি সাধারণ প্রণালী হিসাবে গণ্য হতো। সাধারণ উৎপাদক অপসারণের সাহায্যে ভাগফল নির্ণয় এবং ভাগফল নির্ণয়ের বর্তমান প্রচলিত পদ্ধতি দুটিই ভারতবর্ষে আবিষ্কৃত হয়েছিল।

গণিতে ত্রৈরাশিক পদ্ধতিটিও ভারতের আবিষ্কার। ঠিক কোন্ সময়ে পদ্ধতিটি আবিষ্কৃত হয়, তা বলা কঠিন, তবে খৃষ্টীয় তৃতীয়-চতুর্থ শতাব্দীর বখ্‌শালীতে পুঁথিতে সর্বপ্রথম এটির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

মাপ প্রসঙ্গে আমরা সংখ্যার কনিষ্ঠতম অংশগুলিকে লক্ষ্য করি। খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর ললিতবিস্তর নামে একটি বিখ্যাত বৌদ্ধ গ্রন্থে দৈর্ঘ্য বিভাজনের একটি শ্রেণীর উল্লেখ করা হয়েছে। এটিতে দৈর্ঘ্যের কনিষ্ঠতম ভাগ হিসাবে যে এককটিকে কল্পনা করা হয়েছে, তার নাম পরমাণু—পরিমাণে এটি $1{\cdot}3\times7^{-10}$ ইঞ্চি।

বীজগণিত, জ্যামিতি ও ত্রিকোণমিতি

গণিতের জগতে বীজগণিত, জ্যামিতি ও ত্রিকোণমিতি—এই তিনটি বিভাগেও ভারতীয়েরা আশ্চর্য সাফল্য লাভ করেছিলেন। তার মধ্যে বীজগণিতের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বীজগণিতে ভারতবর্ষের সঙ্গে সঙ্গে আর একটি দেশেরও অসাধারণ উন্নতি লক্ষ্য করা যায়—দেশটির নাম গ্রীস। এই দুটি দেশেই বীজগণিতের চর্চা নিরপেক্ষভাবে হয়েছিল, না একে অন্যের উপর নির্ভরশীল ছিল—এই বিষয়ে সকলের মনেই কৌতূহল থাকা স্বাভাবিক। গণিতের ঐতিহাসিকেরা বলছেন যে, বীজগণিতের ইংরেজী প্রতিশব্দ অ্যালজেব্‌রার আরবিক মূল (অ্যাল-জাব্‌র্ অর্থাৎ স্থিরিকরণ) লক্ষ্য করলে এই সম্পর্কে
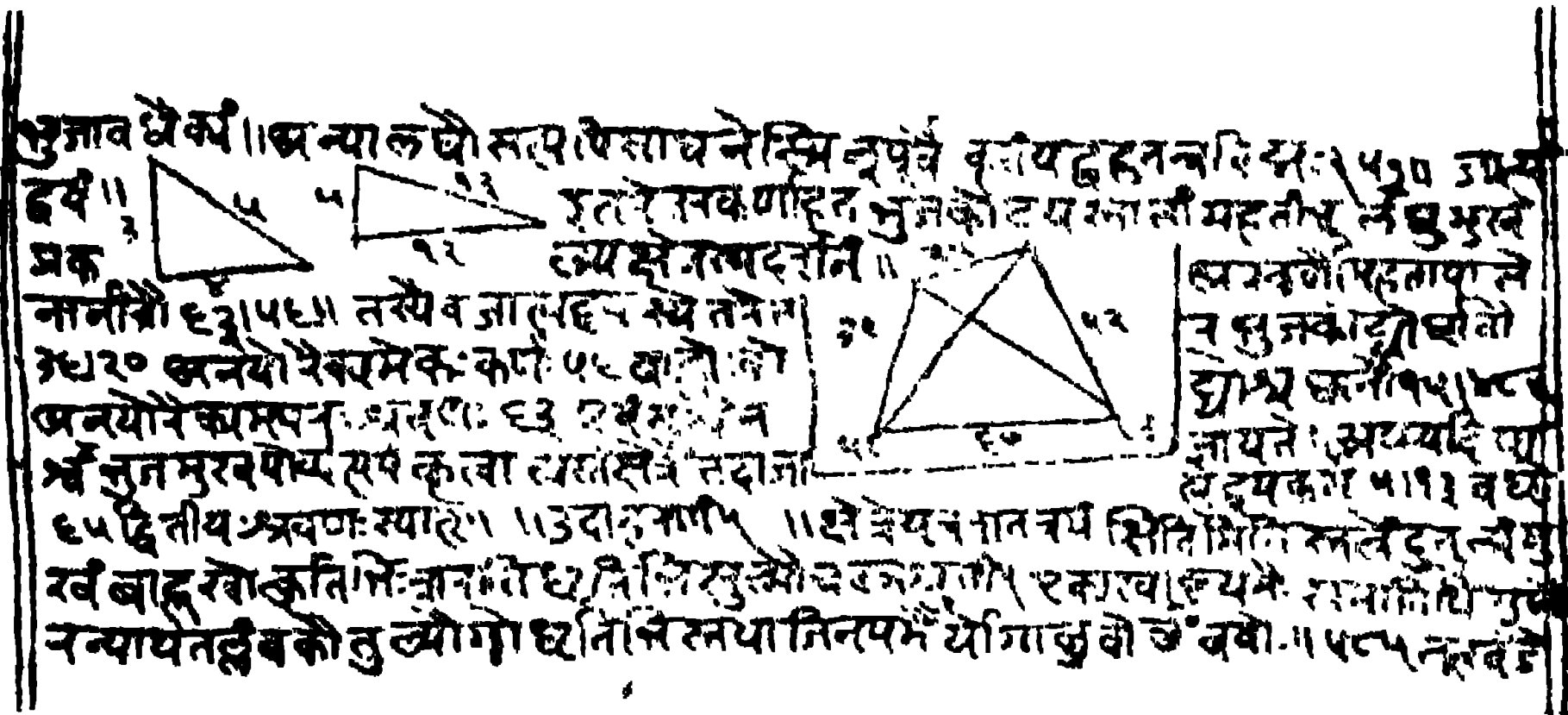
বিশ্ববিশ্রুত ভারতীয় গাণিতিক দ্বিতীয় ভাস্করাচার্যের (জন্ম—1114 খৃঃ) লীলাবতীর একটি অংশ চিত্র। চিত্রটি 1600 খৃষ্টাব্দের একটি পুঁথি থেকে গৃহীত। মূল রচনাকাল 1150 খৃষ্টাব্দ।

বিরাট সংখ্যাসমূহের নামকরণ ও কল্পনা বৈদিক যুগের ভারতীয়দের আর একটি উল্লেখযোগ্য কীর্তি। খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে যে সময়ে প্রাচীন গ্রীকেরা 10,000 এবং রোমানেরা 1,000 পর্যন্ত সংখ্যা গণনায় অভ্যস্ত ছিলেন, ভারতীয়েরা সে সময়ে পরার্ধ (100,000,000,000,000) পর্যন্ত সংখ্যা সহজে গণনা এবং স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করতে পারতেন। যজুর্বেদ সংহিতা, মৈত্রায়নী সংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থে বৃহৎ সংখ্যার বিভিন্ন এককগুলি বর্ণিত আছে।

ক্ষুদ্র সংখ্যার চিন্তাও ভারতীয় গণিতে আছে। কাল বিভাজন, ওজনের পরিমাণ, দৈর্ঘ্যের পরি-

কৌতূহল নিরসন হবে এবং এই সিদ্ধান্তে আসা যাবে যে, গ্রীসে বীজগণিত স্বতঃউৎসারিত নয়, বরং আরব দেশ থেকে গ্রীসে বীজগণিত ক্রমে ক্রমে প্রসার লাভ করে এবং একথা বিতর্কের উর্ধ্বে যে, আরব দেশ থেকে যে বীজগণিত গ্রীস দেশে স্থানান্তরিত হয়েছিল, তার উৎপত্তিস্থল নিঃসন্দেহে ভারতবর্ষে ছিল।

ভারতীয় বীজগণিতে যাঁদের অবদান সবচেয়ে বেশী, তাঁরা হলেন আর্যভট্ট, ব্রহ্মগুপ্ত, দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য এবং শ্রীধরাচার্য। আর্যভট্ট এবং ব্রহ্মগুপ্ত প্রধানতঃ জ্যোতির্বিজ্ঞানী এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানের বিভিন্ন গণনার সঠিক ফলাফল নির্ণয়ের জন্যে তাঁদের প্রচেষ্টাতেই গণিতের বীজগণিত শাখাটি অনেকাংশে পূর্ণতা লাভ করেছিল। মূলতঃ গাণিতিক হিসাবে পরিচিত ভাস্করাচার্য বীজগণিতের ক্ষেত্রে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার করেছিলেন। তিনি সম্ভবতঃ বর্গমূল নির্ণয়ের চিহ্নটি এবং বীজগণিতের আরও কয়েকটি চিহ্নের উদ্ভাবক ছিলেন। যে কোন দ্বিঘাত সমীকরণের মূল নির্ণয় করবার বর্তমান প্রচলিত পদ্ধতিটি শ্রীধরাচার্যের আবিষ্কার। তাছাড়া বীজগণিতের ক্ষেত্রে তাঁর আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য অবদান আছে।

ভারতীয় বিজ্ঞানীরাই প্রথম ঋণাত্মক সংখ্যার চিন্তা করেন—এই ঋণাত্মক সংখ্যাই ভারতীয় বীজগণিতের এক বিশেষ উল্লেখযোগ্য পরিচয় এবং এটি ছাড়া বীজগণিতের মূল প্রতিষ্ঠা করা কোন দিনই সম্ভব ছিল না। ভারতীয় গাণিতিকেরা সমবায় এবং বিন্যাসের বিভিন্ন সূত্র আবিষ্কার করেছিলেন। তাঁরা 2—এই সংখ্যাটির বর্গমূল নির্ণয় করেন এবং অষ্টম শতাব্দীতে বিভিন্ন অনির্ণেয় দ্বিঘাত সমীকরণগুলি সমাধান করেন। এই দ্বিঘাত সমীকরণগুলির সমাধান পদ্ধতি প্রায় হাজার বছর পরে ইউরোপে বিখ্যাত গাণিতিক অয়লারের (Euler) সমসাময়িক কালে আবিষ্কৃত হয়।

জ্যামিতিতেও ভারতীয়দের দান উপেক্ষণীয় নয়। বৈদিক যুগে যজ্ঞের বেদী নির্মাণের জন্যে বর্গক্ষেত্র, আয়তক্ষেত্র, ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ প্রভৃতি ঋজুরেখ গঠন এবং তার পরিমাণ, ঘনমান নির্ণয় করবার প্রয়োজন ছিল। তাছাড়া সামন্তরিক, রম্বাস, বৃত্ত ও উপবৃত্ত সম্বন্ধেও পরিণত চিন্তার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

ভারতীয় জ্যামিতির পুস্তক হিসাবে বৌধায়ন ও আপস্তম্বের শুল্বসূত্রের নাম করা চলতে পারে। এগুলির রচনার কাল কিছুটা অনির্দিষ্ট। তবে খৃষ্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দীর সমসাময়িক কালে এগুলি রচিত হয়েছিল বলেই ঐতিহাসিকদের বিশ্বাস। এই শুল্বসূত্রগুলির মধ্যেই তৎপরবর্তী কালের পিথাগোরাসের (খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী) বিখ্যাত উপপাদ্যটির সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে। বৌধায়নে বলা হয়েছে, সমচতুরস্রস্যাক্ষণয়ারজ্জুর্দ্বিস্তাবতীং ভূমিং করোতি—সমচতুষ্কোণের কর্ণের উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রের আয়তন ঐ চতুষ্কোণের দ্বিগুণ এবং দীর্ঘচতুরস্রস্যাক্ষণয়ারজ্জুঃপার্শ্বমানী তির্যঙ্‌মানী চ যৎ পৃথগ্‌ভূতে কুরুতস্তদুভয়ং করোতি—দীর্ঘ চতুষ্কোণের কর্ণের উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রে চতুষ্কোণের পাশের ও নীচের দুই বাহুর অঙ্কিত দুটি বর্গক্ষেত্রের সমষ্টির সমান। উপরের উদ্ধৃতির মধ্যে পিথাগোরাসের উপপাদ্যের সম্পূর্ণ পরিচয় মেলে।

পিথাগোরাসের পরবর্তী কালে আর্যভট্ট তাঁর গ্রন্থে বৃত্ত ও ত্রিভুজের বিশেষত্ব সম্বন্ধে অনেক মৌলিক আলোচনা করেন। প্রাচীন কালের ভারতীয়েরা ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলের সমান বর্গক্ষেত্র, একটি বর্গক্ষেত্রের দ্বিগুণ, তিন গুণ বা অর্ধেক ও এক-তৃতীয়াংশের সমান বর্গক্ষেত্র এবং বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের সমান ক্ষেত্রফলবিশিষ্ট বৃত্ত অঙ্কনে পারদর্শী ছিলেন।

ত্রিকোণমিতিতেও ভারতবর্ষে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার হয়েছিল—এগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য সাইন (Sine) প্রক্রিয়া। এটি এক

যুগান্তকারী উদ্ভাবন, সমস্ত গণনার জগতে এখনও যার নিত্য ব্যবহার। আর্যভট্ট এই সাইন প্রক্রিয়াকে জ্যা-অর্ধ নাম দেন এবং পরে সংক্ষিপ্ত রূপে জ্যা বলেন। আরও বহু বিষয়ের মত আরবীয়েরা ভারতবর্ষ থেকে এই বিষয়ে শিক্ষালাভ করেন এবং দ্বাদশ শতাব্দীতে এটি ইউরোপে প্রচারিত হয়।

ত্রিকোণমিতিতে আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় বৃত্তের ব্যাস ও পরিধির অনুপাত। এটি একটি ধ্রুবক অর্থাৎ অপরিবর্তনীয় সংখ্যা। পাঁচ দশমিক স্থান পর্যন্ত এটির মান 3·14159। প্রাচীন কালের পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের গাণিতিকেরা এই ধ্রুবকের মান নির্ণয়ের চেষ্টা করেন। তার মধ্যে আর্যভট্ট কর্তৃক নির্ণীত মান অনেকগুলি দশমিক স্থান পর্যন্ত শুদ্ধ।

পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন-বিজ্ঞান

পদার্থবিদ্যায় ভারতীয় চিন্তা বিশেষভাবে উল্লেখ করবার মত। মাধ্যাকর্ষণ শক্তির আবিষ্কারক হিসাবে এযুগে নিউটন জগদ্বিখ্যাত। একথা ঠিক যে, নিউটন মাধ্যাকর্ষণকে সূত্রাকারে অঙ্কশাস্ত্রের ভিত্তিতে সর্বপ্রথম লিপিবদ্ধ করেন, কিন্তু পৃথিবীর আকর্ষণে সমস্ত ভারী বস্তুই যে পৃথিবীর দিকে আকৃষ্ট হয়, একথা নিউটনের পূর্বের ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্‌দের অজ্ঞাত ছিল না। দ্বিতীয় ভাস্করাচার্যের সিদ্ধান্ত শিরোমণি গ্রন্থে স্পষ্টতঃ উল্লেখ আছে যে :

আকৃষ্টি শক্তিশ্চ মহী তয়া যৎ
খস্থং গুরু স্বাভিমুখং স্বশক্ত্যা।
আকৃষ্যতে তৎ পততীব ভাতি'
সমে সমন্তাৎ ক্ব পতত্বিয়ং খে॥

আকর্ষণ শক্তিসম্পন্ন পৃথিবী যখন উপরিস্থিত গুরু বস্তুকে আপন শক্তির সাহায্যে নিজের দিকে আকর্ষণ করে, তখন মনে হয় যে, ঐ সকল বস্তু ভূপাতিত হচ্ছে—সহজবোধ্য এই এই শ্লোকটির প্রথম তিন পংক্তিতে ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের পৃথিবীর আকর্ষণ শক্তি সংক্রান্ত সুস্পষ্ট ধারণা সম্পর্কে সংশয়ের কোন অবকাশ থাকে না। এই উদ্ধৃতির শেষ পংক্তিতে জ্যোতির্বিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ সত্যকে ব্যক্ত করা হয়েছে। এটি শূন্যে ভাসমান পৃথিবী সম্পর্কে। এটিতে বলা হচ্ছে যে, পৃথিবী সকল দিকে সমান আকর্ষণে আবদ্ধ অর্থাৎ বিভিন্ন শক্তির বলে মহাকাশে পৃথিবীর অবস্থান সুনির্দিষ্ট। বিভিন্ন শক্তি এখানে গ্রহ, নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্যের আকর্ষণ শক্তি, যাদের মিলিত ফলে মহাশূন্যে কেবলমাত্র পৃথিবী নয়, ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন জ্যোতিষ্কই শূন্যে ভাসমান এবং আপন কক্ষপথে স্থির।

পদার্থ-বিজ্ঞানের আর একটি উল্লেখযোগ্য অবদান—সাদা আলোর বিশ্লেষণ। সূর্যের আলো যে রামধনুর সাতটি রঙে বিশ্লিষ্ট হবার শক্তি রাখে, পাশ্চাত্য দেশে এযুগে এই সত্য নিউটনের আবিষ্কার। কিন্তু ঋক্‌ সংহিতায় সূর্যের সপ্তরশ্মির কথার উল্লেখ আছে। তাছাড়া সূর্যের এক পৌরাণিক নাম সপ্তাশ্ব—সাতটি অশ্ববাহিত রথে সূর্য আপন পথ পরিক্রমণ করেন। পুরাণে এই জাতীয় এক কল্পনা থেকে সপ্তাশ্ব নামকরণ হয়। এখানে মনে করা অসঙ্গত নয় যে, সূর্যের বিশ্লিষ্ট সাতটি রঙের ভারতীয় ঋষিদের পরিচয় ছিল বলেই সূর্যের প্রতীক অশ্বের সংখ্যা রঙের সংখ্যা সাতে নির্দিষ্ট ছিল।

ভারতীয় পদার্থবিদ্যায় আরও কতকগুলি বিশিষ্ট চিন্তার পরিচয় আছে, যেগুলির সঙ্গে গ্রীক চিন্তার সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। বৈশেষিক দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা কণাদ বিশ্বাস করতেন যে, পৃথিবীতে যত রকমের পদার্থ আছে, অণুও আছে তত রকমের এবং সেই অণুগুলির সাহায্যে পৃথিবী গঠিত হয়েছে। জৈন পণ্ডিতদের প্রাসঙ্গিক ধারণার সঙ্গে গ্রীক দার্শনিক ডেমোক্রিটাসের চিন্তার গভীর মিল উল্লেখ করবার

মত। জৈন পণ্ডিতেরা বলেছেন, বিভিন্ন পদার্থের সমস্ত অণু একই ধরণের, কেবল বিজাতীয় মিলনে বিভিন্ন রূপের সৃষ্টি। কণাদের আরও দু-একটি সিদ্ধান্ত বিশেষ পাণ্ডিত্যপূর্ণ। তাঁর অভিমত, আলো এবং উত্তাপ একই শক্তির রূপান্তর মাত্র। নিউটনের মত ভারতীয় দার্শনিক বাচস্পতি বলেছেন যে, আলো পদার্থের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা-বিশিষ্ট এবং তা সরল রেখায় এসে চোখে আঘাত করে' তাকে উত্তেজিত করে।

এযুগের মেরিনার্স কম্পাসের মত খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর ভারতবর্ষেও লৌহ-মৎস্যেরও পরিচয় পাওয়া যায়। এটি উত্তরমুখীন হয়ে একটি তৈলাধারে ভাসমান থাকতো।

প্রাচীন ভারতীয় বিজ্ঞান-চর্চার ইতিহাসে রসায়নের কথাও বিশেষভাবে উল্লেখ করা চলতে পারে। ভারতবর্ষে রসায়নের বিকাশ প্রধানতঃ দুটি কারণে—প্রথমটি চিকিৎসা-বিজ্ঞানের প্রয়োজনে, দ্বিতীয়টি শিল্পের প্রয়োজনে। কিন্তু কারণ নির্ণয়ই মূল কথা নয়, আসল বক্তব্য এই যে, রসায়নে ভারতীয় বুৎপত্তি বিস্ময়কর এবং এখনও ভারতীয় স্থাপত্যকার্যে এবং শিল্পকলায় তার নিদর্শন রয়েছে। প্রাচীন ভারতবর্ষে মরচেবিহীন লৌহ নির্মাণে ভারতীয় রসায়নবিদেরা যে চূড়ান্ত উৎকর্ষের পরিচয় দিয়েছেন, তা সমস্ত পৃথিবীতে তুলনারহিত। দিল্লীর কুতুবমিনারের নিকটবর্তী লৌহস্তম্ভ হিন্দুদের অতীত জ্ঞানের উজ্জ্বল স্বাক্ষর। গুপ্ত সভ্যতার সময়ে ভারতবর্ষে রসায়নসংক্রান্ত নানা শিল্পের বিশেষ উন্নতি হয়। কাচ-শিল্প, সাবান নির্মাণ, রঞ্জন-শিল্প, চর্মশিল্প এবং সিমেন্ট-নির্মাণ সম্বন্ধে ভারতীয় শক্তির উল্লেখযোগ্য পরিচয় পাওয়া যায়। ঐতিহাসিক প্লিনি প্রথম শতাব্দীতে বলেছেন যে, সেই সময়ে সবচেয়ে উৎকৃষ্ট কাচ ভারতবর্ষেই তৈরি হতো। খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে ভারতীয় রসায়নবিদ্ নাগার্জুন পারদের উপরেই একখানি সম্পূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেন।

বৈদিক যুগে ভারতীয়েরা স্বর্ণালঙ্কার ব্যবহারে অভ্যস্ত ছিলেন। ছান্দোগ্য উপনিষদে সোনা, রূপা, লোহা, টিন ও সীসা—এই পাঁচটি ধাতুর উল্লেখ পাওয়া যায়। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে এগুলি ছাড়াও তামা ও পারদের উল্লেখ আছে। খনি থেকে ধাতু নিষ্কাশন এবং রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় তাকে বিশুদ্ধ করে ব্যবহারের উপযোগী করা—এই দুটি ব্যবহারিক বিদ্যায় খৃষ্টের জন্মের পূর্বেই ভারতীয়েরা যে বিশেষ উন্নতি লাভ করেছিলেন, গ্রীক দূত মেগাস্থিনিসের বিবরণ এবং কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র থেকে সে কথা জানা যায়। শেষোক্ত গ্রন্থে এটির বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যেই ইউরোপের তুলনায় ভারতবর্ষ শিল্পে ব্যবহার্য রসায়নে অনেক বেশী উন্নত হয়েছিল। ঐ সময়ের পূর্বেই ভস্মীকরণ (Calcination), অধঃপাতন (Distillation), স্বেদন (Steam distillation), ঊর্ধ্বপাতন (Sublimation) এবং স্তম্ভন (Fixation) প্রভৃতি প্রসিদ্ধ রাসায়নিক প্রক্রিয়া সম্বন্ধে ভারতীয়েরা যথেষ্ট জ্ঞানলাভ করেছিলেন।

চিকিৎসাবিদ্যা ও শল্যচিকিৎসা

ভারতীয় বিজ্ঞানের বিভিন্ন পরিমণ্ডলের মধ্যে চিকিৎসাবিদ্যা সংক্রান্ত শাখাটি রীতিমত প্রাচীন এবং অতিশয় গৌরবমণ্ডিত। খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে চিকিৎসাবিষয়ক বিভিন্ন ভারতীয় আলোচনায় শারীরিক নানা অংশের সুস্পষ্ট এবং উল্লেখযোগ্য পরিচয় পাওয়া যায়। খৃষ্টপূর্ব সময়কার চিকিৎসকেরা অ্যারিস্টটলের মত ভুল করে হৃদয়কেই চেতনা নির্ণায়ক যন্ত্র হিসাবে মনে করেছিলেন, কিন্তু তাঁরা নিখুঁৎভাবে পরিপাক প্রণালীর স্তরগুলি অবগত ছিলেন। তাঁরা পাকস্থলীতে খাদ্যনিঃসৃত রসের বিভিন্ন কার্যকলাপ জানতেন এবং পরিণতিতে তা যে রক্তে রূপান্তরিত হয়, সে বিষয়েও সচেতন ছিলেন। ওয়েজমানের (Weismann)

প্রায় 2400 বছর পূর্বে আত্রেয় উল্লেখ করেছেন যে, পিতৃজ শুক্রাণু দেহ-অনধীন এবং নিজের সংক্ষিপ্ত চেহারার মধ্যে পিতার শারীরিক বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে। সেকালে বিবাহের পূর্বে পুরুষদের পৌরুষ পরীক্ষাও যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হতো। সেই প্রাচীন কালেই, প্রায় খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে কোন কৃত্রিম সাহায্য না নিয়ে ঋতুচক্রকে অবলম্বন করে জন্ম-নিয়ন্ত্রণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

ভারতীয় চিকিৎসাবিদ্যার প্রথম পরিচয় পাওয়া যায় অথর্ব বেদে। এতে চিকিৎসা-শাস্ত্রকে অনেকটা ম্যাজিকের অনুরূপ দেখানো হয়েছে। তাছাড়া এটিতে রোগের তালিকা, রোগের বিভিন্ন লক্ষণ এবং ভেষজ পদ্ধতিতে রোগ নির্ণয়ের প্রক্রিয়ার বিষয় বর্ণিত আছে। ঋগ্বেদে জলকেই সর্ব-রোগের মহত্তম ঔষধ হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য নাম চরক (সম্ভবতঃ দ্বিতীয় শতাব্দী) এবং সুশ্রুত (খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দী)। সুশ্রুতের গুরু ছিলেন ধন্বন্তরি—ভারতীয় চিকিৎসাবিদ্যায় এটিও একটি স্মরণযোগ্য নাম। চরক এবং সুশ্রুত কর্তৃক রচিত যথাক্রমে চরক সংহিতা এবং সুশ্রুত সংহিতা আয়ুর্বেদের দুটি অতি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। চরকে অস্ত্রচিকিৎসার কথা নেই এবং সুশ্রুতে সে কথা বিশেষ করে উল্লেখ করা হয়েছে।

সুশ্রুত সংহিতায় মোট 1120 রকমের রোগের বিষয় বর্ণিত আছে। রোগ নির্ণয়ের জন্যে সুশ্রুত যতগুলি পদ্ধতির কথা বলেন, তার মধ্যে হৃদ্‌যন্ত্রের শব্দ শুনে রোগ পরীক্ষার কথাও আছে। নাড়ী দেখার কথা 1300 সালের একটি গ্রন্থে বর্ণিত আছে। এভাবে রোগ নির্ণয় সম্ভবতঃ পারস্য থেকে ভারতবর্ষে এসেছে। মূত্র পরীক্ষাও ছিল রোগ নির্ণয়ের একটি প্রকৃষ্ট পদ্ধতি। হিউয়েনসাংয়ের সময়ে রোগীকে সর্বাগ্রে সাত দিন উপবাসে রেখে রোগের চিকিৎসা করা হতো। এই উপবাসেই অধিকাংশ রোগ দূরীভূত হতো। তা না হলে ওষুধের ব্যবহার—তাও পরিমিত পরিমাণে। রোগ নির্মূলের জন্যে মূলতঃ স্নান, আহার এবং বাহ্যিক প্রক্রিয়াগুলির উপরেই গুরুত্ব দেওয়া হতো সবচেয়ে বেশী। ভারতবর্ষে 550 সালে ইঞ্জেকসনের প্রচলন লক্ষ্য করা যায়। ইউরোপে অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বে এটি সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল।

শল্যচিকিৎসার ক্ষেত্রে অস্ত্রোপচারে সে কালে কমবেশী 127 রকমের যন্ত্র ব্যবহৃত হতো। যন্ত্র-গুলি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে নির্মিত। একটি চুলকে লম্বালম্বিভাবে কাটতে পারে, এমনি ধারালো অস্ত্র শল্যচিকিৎসায় উপযুক্ত অস্ত্র বলে বিবেচিত হতো।

তাছাড়া ভারতীয় চিকিৎসাবিদ্যায় ভাল অস্ত্রচিকিৎসকের লক্ষণও দেওয়া আছে :—যে অস্ত্র-চিকিৎসকের বল, ক্ষিপ্রতা, তীক্ষ্ণ অস্ত্র, পরিশ্রমে ঘর্মহীনতা, অস্ত্রের কম্পনশূন্যতা এবং ব্রণের পক্কাপক্কাদি অবস্থা নিরূপণে জ্ঞান আছে, এরূপ ব্যক্তিই অস্ত্রচিকিৎসার কার্যে প্রশস্ত। শল্য-চিকিৎসায় সাফল্যের জন্যে শবব্যবচ্ছেদের কথাও সুশ্রুত সংহিতায় বর্ণিত আছে। ছিন্ন নাসিকায় অস্ত্রোপচার করে স্বাভাবিক করবার পদ্ধতি সুশ্রুতই সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন। এটি হলো একালের Rhinoplasty, বর্তমান চিকিৎসা-বিজ্ঞানে যা সর্বত্র প্রচলিত। সুশ্রুত এবং চরক দু-জনেই অস্ত্রোপচারের সময়ে যন্ত্রণার উপশমের জন্যে অবশ করবার ওষুধ ব্যবহারের উল্লেখ করেছেন। 927 সালে দু-জন ভারতীয় চিকিৎসক এক রাজার মস্তিষ্কে অস্ত্রোপচার করবার সময়ে অবচেতন করবার জন্যে যে ওষুধ ব্যবহার করেন, তার নাম ছিল সম্মোহনী।

প্রাচীন ভারতীয় বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তির বিভিন্ন প্রসঙ্গ এভাবে শুধুমাত্র উল্লেখ করাও সম্ভব নয়। তবু এরই ভিতর দিয়ে আমরা ভারতীয় বিজ্ঞানীদের সংস্কারহীন, উদার এবং যুক্তিগ্রাহ্য মনোবৃত্তির যে পরিচয় পাই, তা এযুগের উন্নত বৈজ্ঞানিক পরিবেশের সঙ্গেও সমানভাবে উল্লেখযোগ্য।

বিস্ফোরক

বিমল বসু

বিস্ফোরক শব্দের সঙ্গেই যেন জড়িয়ে আছে এক আতঙ্কের ইতিহাস—যুদ্ধ, হত্যা আর মৃত্যুর দৃশ্য। অথচ ভাবতে অবাক লাগে সভ্যতা সৃষ্টির আদিতে বিস্ফোরক এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। একটা দল বা একটা জাতি যখনই সভ্যতার সৌধ গড়ে তুলতে চেয়েছে, অমনি অসভ্য জাতির আক্রমণে ভেঙ্গে গুড়িয়ে গেছে তার সম্ভাবনা। তারপর সভ্যতা-কামী মানুষের হাতে যে দিন বিস্ফোরক এলো, তখন থেকেই সভ্যতার সুদিন। প্রতিহত হলো অসভ্যদের আক্রমণ। ইট গাঁথা হতে লাগলো একের পর এক সভ্যতার ভিত্তি-স্তম্ভে।

আদি কথা

বারুদ বা গান-পাউডার হলো আদিমতম বিস্ফোরক—সোরা, গন্ধক আর কাঠ-কয়লার গুঁড়া নির্দিষ্ট অনুপাতে মিশিয়ে যা তৈরি হয়। বারুদের ব্যবহার ঠিক কবে থেকে সুরু হয়েছিল, তা নির্দিষ্টভাবে বলা যায় না। সম্ভবতঃ চীন দেশেই বারুদ আবিষ্কৃত হয় খৃষ্ট জন্মের বেশ কয়েক শতাব্দী পূর্বে। নানা রকম অগ্নিপ্রজ্বালক পদার্থের ব্যবহার গ্রীকরাও জানতো। 429 খৃষ্টপূর্বাব্দে প্লেটিয়া অধিকার করবার সময় স্পার্টানরা পিচে ডোবানো কাঠ আর গন্ধকের স্তূপে আগুন ধরিয়ে গোটা শহরটাকে পুড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেছিল। সপ্তম শতাব্দীতে বাইজান-টাইনরা যুদ্ধে একটা জিনিষ ব্যবহার করতো, যার নাম ছিল wet-fire বা ভিজা-আগুন। সম্ভবতঃ পদার্থটি ছিল আলকাৎরা, গন্ধক, চুন, ন্যাপথা আর সল্টপিটারের মিশ্রণ। ইউরোপে বারুদের প্রচলন সুরু করেন রোজার বেকন, 1270 সালে। চতুর্দশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে কামানের গোলা ছোঁড়বার কাজে বারুদের ব্যবহার সুরু হয়।

সামরিক বিস্ফোরক হিসাবে বারুদের কদর ছিল উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত। তারপর গান-কটন আবিষ্কৃত হলো। সাধারণ বারুদের ব্যবহার সীমাবদ্ধ হয়ে পড়লো কেবল আতস বাজি তৈরির কাজে।

নূতন নূতন বিস্ফোরকের আবিষ্কার

1832 সালে হেনরি ব্রাক্যানট শ্বেতসারজাতীয় পদার্থের সঙ্গে নাইট্রিক অ্যাসিড মিশিয়ে নূতন একটি বিস্ফোরক তৈরি করেন। 1838 সালে ডুমাস ও পেলাউজ তুলা এবং কাগজের উপর নাইট্রিক অ্যাসিডের বিক্রিয়া ঘটিয়ে একই ফল পান, তৈরি হলো নাইট্রোসেলুলোজ। এর পর অস্কানিও সবরেরো গ্লিসারিনের সঙ্গে নাইট্রিক অ্যাসিড মিশিয়ে তৈরি করেন খুব শক্তিশালী একটি বিস্ফোরক পদার্থ। পদার্থটির নাম নাইট্রো-গ্লিসারিন। সামান্য আঘাতেই এটি প্রচণ্ডভাবে বিস্ফোরিত হয়। সুতরাং নাইট্রোগ্লিসারিন সাধারণভাবে ব্যবহার করাই ছিল মুস্কিল। এর ব্যবহার নিরাপদ করেন সুইডিশ বিজ্ঞানী আল-ফ্রেড নোবেল—যাঁর নামে দেওয়া হয় নোবেল পুরস্কার। তিনি কাইসেলগুড় নামে এক রকমের সচ্ছিদ্র মাটির ভিতর নাইট্রোগ্লিসারিন শোষণ করিয়ে নিলেন। এর ফলে যে কঠিন দানাদার পদার্থটি পাওয়া গেল, সেটি নাইট্রোগ্লিসারিনের মতই শক্তিশালী, তাছাড়া যত্রতত্র ব্যবহার করবার পক্ষেও

নিরাপদ। এই নতুন বিস্ফোরক পদার্থটিই হলো প্রথম ডিনামাইট। এটি আবিষ্কৃত হয় 1866 সালে। এর প্রায় দশ বছর পরে নোবেল আরও উন্নত ধরণের ডিনামাইট তৈরি করেন। গান কটন বা নাইট্রোসেলুলোজের সঙ্গে নাইট্রোগ্লিসারিন মিশিয়ে এটি পাওয়া গিয়েছিল।

আলফ্রেড নোবেলের সূত্র অনুসরণ করে এর পর ধোঁয়াহীন বিস্ফোরক আবিষ্কৃত হয়। আমেরিকায় তৈরি হলো ব্যালিস্টাইট—ভারী কামান ছোঁড়বার ব্যাপারে যা ব্যবহৃত হয়। আর বৃটেন তৈরি করলো কর্ডাইট, নাইট্রোসেলুলোজের সঙ্গে অ্যাসিটোন, নাইট্রোগ্লিসারিন আর পেট্রোলিয়াম জেলি মিশিয়ে। চালক-বিস্ফোরক (Propellant) হিসাবে এক সময় কর্ডাইটের বহুল প্রচলন ছিল।

আজকাল যে সব ধোঁয়াহীন বিস্ফোরক তৈরি হচ্ছে, সেগুলির ফর্মুলাও প্রায় একই। এগুলিতে সাধারণতঃ থাকে শতকরা 84 ভাগ নাইট্রোসেলুলোজ, শতকরা 15 ভাগ বেরিয়াম ও পটাসিয়াম নাইট্রেট আর এক শতাংশ ডাইফিনাইল অ্যামিন। ধোঁয়াহীন বিস্ফোরকগুলি ছোট ছোট দানা, প্যালেট, চোঙ বা বলের আকারে তৈরি হয়।

বিস্ফোরক কত রকমের ?

বিস্ফোরক প্রধানতঃ তিন রকমের—প্রাথমিক বিস্ফোরক বা ডিটোনেটর, উচ্চমানের বিস্ফোরক বা হাই এক্সপ্লোসিভ এবং চালক-বিস্ফোরক বা প্রোপেল্যান্ট। লেড অ্যাজাইড [$Pb(N_3)_2$], মার্কারি ফুলমিনেট [$Hg(ONC)_2$] প্রভৃতি প্রাথমিক বিস্ফোরকগুলি সামান্য আঘাতে বা অগ্নিস্পর্শে খুব দ্রুত বিস্ফোরিত হয়। সাধারণতঃ কোন বড় রকমের বিস্ফোরণ ঘটাবার কাজে প্রজ্বালক বা ডিটোনেটর হিসাবে এগুলি ব্যবহৃত হয়। ডিনামাইট, টি. এন. টি (ট্রাইনাইট্রো টলুইন: $C_6H_2[NO_2]_3CH_3$), অ্যামাটল (ডিনামাইট ও টি. এন. টি-র মিশ্রণ), টেট্রাইল [2, 4, 6-ট্রাই-নাইট্রো-ফিনাইল-মিথাইলনাইট্রামিন: [$C_6H_2(NO_2)_3NCH_3NO_2$] প্রভৃতি উচ্চমানের বিস্ফোরকগুলি খুব সহজে বিস্ফোরিত হয় না বটে, কিন্তু প্রজ্বালকের সাহায্যে একবার বিস্ফোরণ শুরু করিয়ে দিতে পারলে তার বেগ হয় প্রচণ্ড। আর চালক-বিস্ফোরক, যেমন—কর্ডাইট, সাধারণ বারুদ, কেরোসিন ও তরল হাইড্রোজেন বা হাইহাইড্রোজেন পারক্সাইডের মিশ্রণ প্রভৃতি পদার্থকে ঠিক বিস্ফোরক বলা যায় না—আগুনের সংস্পর্শে এগুলি সাধারণভাবে জ্বলে আর একেত্রে বিক্রিয়ার গতিও হয় বেশ মন্থর। তবে এই বিক্রিয়ার ফলে কার্বন ডাই-অক্সাইড, নাইট্রোজেন প্রভৃতি গ্যাসীয় পদার্থ উৎপন্ন হয় বিপুল পরিমাণে এবং এই গ্যাসকেই বন্দুক বা কামানের নল অথবা রকেটের আবদ্ধ প্রকোষ্ঠে নিয়ন্ত্রিত করে যে প্রচণ্ড চাপের সৃষ্টি করা হয়, তারই ধাক্কায় বন্দুক বা কামান থেকে ছোটে গুলি-গোলা, রকেট উঠে যায় উর্ধ্বাকাশে। খোলা জায়গায় খানিকটা বারুদ রেখে আগুন ধরিয়ে দিলে কিছুই হবে না, কিন্তু ঐ বারুদকে মাটি বা কাগজের খোলে পুরে জ্বালিয়ে দেওয়া মাত্রই ঘটবে সশব্দ বিস্ফোরণ।

বিস্ফোরণ

দেশলাইয়ের বাক্সের গায়ে কাঠি ঠুক্‌লে কাঠিটা জ্বলে ওঠে। দেশলাই কাঠির মাথায় যে বারুদ আছে, ঘর্ষণজাত তাপের প্রভাবে তার বিক্রিয়া ঘটে বায়ুর অক্সিজেনের সঙ্গে আর তার ফলে উৎপন্ন হয় কার্বন ডাই-অক্সাইড, কার্বন মনোক্সাইড, নাইট্রোজেন প্রভৃতি গ্যাসীয় পদার্থ। রসায়ন-বিজ্ঞানের ভাষায় এর নাম হলো দহন। কয়লা পুড়িয়ে যে তাপ ও আলো পাওয়া যায়, তাও দহন-ক্রিয়ার ফল অর্থাৎ কয়লার সঙ্গে বায়ুর অক্সিজেনের রাসায়নিক ক্রিয়া। বিস্ফোরণও এই রকম দহন-ক্রিয়া। তবে সাধারণ দহনের সঙ্গে এর তফাৎ এই যে, বিস্ফোরণে পদার্থের

দহন অত্যন্ত দ্রুত গতিতে ঘটে। দহন ঘটাতে গেলেই অক্সিজেনের প্রয়োজন। সাধারণ দহনে বায়ুর অক্সিজেনই এর অভাব মেটায়। কিন্তু বিস্ফোরণে দহন দ্রুত গতিতে ঘটাবার জন্যে যেহেতু অক্সিজেন চাই অনেক বেশী পরিমাণে, সেহেতু বিস্ফোরক পদার্থের সঙ্গেই মিশিয়ে দেওয়া হয় অক্সিজেনঘটিত রাসায়নিক পদার্থ—অক্সাইড বা নাইট্রেট; যেমন সাধারণ বারুদে মেশানো থাকে সোরা বা পটাসিয়াম নাইট্রেট (KNO_3)। এর কাজ অক্সিজেন যোগানো। সরাসরি অগ্নিস্পর্শে, আঘাত বা ঘর্ষণজনিত উত্তাপে পটাসিয়াম নাইট্রেট অক্সিজেন ও নাইট্রাইটে বিয়োজিত হয়। অতঃপর এই অক্সিজেন গন্ধক আর কাঠকয়লার সঙ্গে যুক্ত হয়ে সালফার ডাই-অক্সাইড, কার্বন ডাই-অক্সাইড, কার্বন মনোক্সাইড প্রভৃতি গ্যাসীয় পদার্থ উৎপন্ন করে। বিপুলায়তন এই গ্যাসের চাপে তখন সুরু হয় বিস্ফোরণ। কোন কোন বিস্ফোরক বিশুদ্ধ অর্থাৎ এগুলির ভিতর অক্সিজেন যুক্ত অবস্থায় থাকে, বাইরে থেকে কোন অক্সিজেনঘটিত যৌগ যোগ করতে হয় না; যেমন—নাইট্রোগ্লিসারিন বা টি. এন. টি। এগুলির রাসায়নিক সঙ্কেত যথাক্রমে $C_3H_5N_3O_9$ এবং $C_6H_2(NO_2)_3$-CH_3। সঙ্কেত থেকেই বোঝা যায়, অক্সিজেন এগুলির মধ্যে যুক্ত অবস্থায় রয়েছে। প্রাথমিক বিস্ফোরকের সাহায্যে এগুলিকে একবার তাতিয়ে দিলেই হলো; অমনি ভিতরকার অক্সিজেন অণুর বন্ধন কেটে বেরিয়ে এসে দহনের কাজ সুরু করে দেয় এবং এই দহন চলে অত্যন্ত দ্রুত লয়ে। বিস্ফোরকমাত্রেরই এই বৈশিষ্ট্য। এগুলির মধ্যে কেউ নিজের অক্সিজেন নিজেই সরবরাহ করে, কারোকে বা অক্সিজেন নিতে হয় বাইরে থেকে। উভয় ক্ষেত্রেই বিস্ফোরক পদার্থের অণু বিয়োজিত হয়ে বিপুল সংখ্যক সরলতর গ্যাসীয় অণুতে পরিণত হয়। ফলে উৎপন্ন গ্যাসের আয়তন খুব দ্রুত বেড়ে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে ছাড়া পায় বিপুল পরিমাণ তাপ। যেমন—

$$4C_3H_5N_3O_9 = 12\,CO_2 + 10\,H_2O + 6\,N_2 + O_2$$
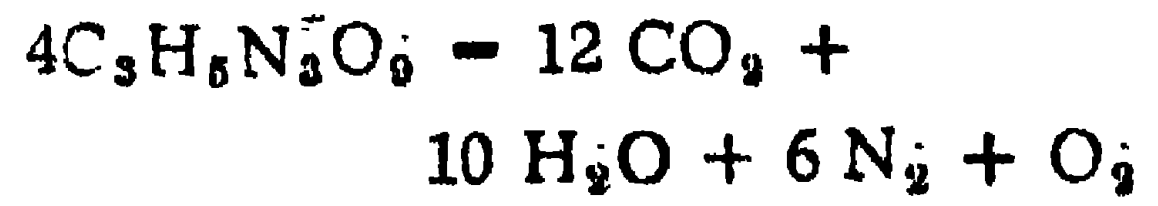
এখানে 4 অণু নাইট্রোগ্লিসারিন বিয়োজিত হয়ে 29 অণু গ্যাসীয় পদার্থে পরিণত হয়েছে অর্থাৎ আয়তনের বৃদ্ধি ঘটেছে চার গুণেরও কিছু বেশী।

বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গেই বিপুলায়তন এই সব গ্যাস উচ্চচাপ কেন্দ্র থেকে ছড়িয়ে পড়তে চায় চারদিকে। আর এই চাপের মুখে পড়ে বায়ুস্তরগুলি অকস্মাৎ তরঙ্গায়িত হয়ে ওঠে। বিস্ফোরণজনিত চাপ তরঙ্গের পর তরঙ্গ সৃষ্টি করে এগিয়ে চলে প্রায় শব্দের সমান বেগে। এই বিশেষ ধরণের তরঙ্গকে ইংরেজীতে বলে শক ওয়েভ। শক ওয়েভ বিস্তৃত পরিধি জুড়ে যতই অগ্রসর হতে থাকে, তরঙ্গের চাপ ও তাপমাত্রা ততই কমে যায়। বিস্ফোরণের কাছাকাছি অঞ্চলেই তাই এর প্রভাব সবচেয়ে বেশী। ঠিক বিস্ফোরণের মুহূর্তে কাছাকাছি কোন বস্তু থাকলে তার প্রতি বর্গইঞ্চি পরিমাণ স্থানে দুই লক্ষ থেকে তিন লক্ষ পাউণ্ড পর্যন্ত ধাক্কার সৃষ্টি করতে পারে এই শক ওয়েভ। শক ওয়েভের আর একটি বৈশিষ্ট্য—উচ্চ-চাপবিশিষ্ট তরঙ্গশীর্ষের পরেই থাকে একটি নিম্নচাপ অঞ্চল। এই শূন্যস্থান পূরণ করবার জন্যে আশেপাশের চতুর্দিক থেকে ছুটে আসে বাতাস। ফলে মূল তরঙ্গগতির উল্টোমুখে একটি বিপরীত চাপের সৃষ্টি হয়। কোথাও বিস্ফোরণ ঘটবার সঙ্গে সঙ্গেই এটা খুব সহজে টের পাওয়া যায়। প্রথমেই বন্ধ জানালার পাল্লাগুলিতে এসে লাগে একটা ধাক্কা—বাইরে থেকে ভিতর দিকে। পরমুহূর্তেই পাল্লাগুলিকে কে যেন ভিতর থেকে বাইরের দিকে একটা টান দেয়; অর্থাৎ শক ওয়েভের উল্টোমুখী বায়ুচাপ তখন কাজ করে।

বিস্ফোরণ কতটা জোরালো হবে, সেটা নির্ভর করে প্রধানতঃ বিস্ফোরকের মান এবং পরিমাণের উপর। এরই সঙ্গে বিস্ফোরণ কতখানি আবদ্ধতার মধ্যে ঘটেছে, তাও বিবেচ্য। মিথেন গ্যাস খোলা বায়ুতে আগুনের সংস্পর্শে সাধারণভাবে জ্বলে। কিন্তু ঐ গ্যাসই যখন কয়লার খনিতে আবদ্ধ অবস্থায় আগুনের ছোঁয়া পায়, তখন তার রূপ অতি ভয়ংকর। মারাত্মক ধরণের বিস্ফোরণের ফলে কয়লা-খনির ছাদ পর্যন্ত ধ্বসে পড়ে—জীবনহানিও ঘটে বিস্তর। সুতরাং বিস্ফোরককে যত বেশী আবদ্ধ স্থানের মধ্যে রেখে জ্বালিয়ে দেওয়া যাবে, বিস্ফোরণের তীব্রতাও হবে তত বেশী।

বিস্ফোরকের ব্যবহার

বিস্ফোরক পদার্থ ছাড়া আধুনিক জীবনের কথা ভাবাই যায় না। সামরিক এবং প্রতিরক্ষার কাজে এর ব্যবহার নানাবিধ। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, যুদ্ধবিগ্রহে বিস্ফোরকের অমিত শক্তি দেখে মানুষ ভেবেছে, কি করে একে শান্তির কাজে লাগানো যায়। তাই আজকের দিনে আমরা দেখতে পাচ্ছি, বিস্ফোরক শুধু শত্রুপক্ষের সেতুই উড়িয়ে দেয় না, বিস্ফোরকের সাহায্যে দুরন্ত নদীর বুকে গড়ে ওঠে বাঁধ, পাহাড়ের বুক চিড়ে জেগে ওঠে রাস্তা, মাটির গর্ভ ভেদ করে মানুষ চলে যায় ভূপৃষ্ঠের অভ্যন্তরে—উদ্ধার করে নিয়ে আসে অমূল্য সব খনিজ পদার্থ। শুধু তাই নয়, বিস্ফোরণ-জনিত শক ওয়েভ ভূপৃষ্ঠের অভ্যন্তরে প্রয়োগ করে আজকাল ভূস্তরের প্রকৃতিও নির্ণয় করা হচ্ছে। মাটি না খুঁড়েও জানা যাচ্ছে, ভূস্তরের কোথায়, কত ফুট নীচে, কি কি ধরণের পাথরের স্তর লুকিয়ে আছে। ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন স্থানে মাইক্রোফোন বসিয়ে মাটির ভিতরে শক ওয়েভ পাঠানো হয়, তারপর মাইক্রোফোনের সাহায্যে দেখে নেওয়া হয়, কতক্ষণে সেই শক ওয়েভ ফিরে আসছে প্রতিফলিত হয়ে। সময়ের তারতম্য অনুসারে তারপর ঠিক করা হয় ভূস্তরের অবস্থান। সম্প্রতি ধাতুর পাত্ থেকে বিভিন্ন আকৃতির জিনিষ তৈরির কাজেও বিস্ফোরক ব্যবহৃত হচ্ছে।

কেন্দ্রীন বিক্রিয়ার স্বরূপ ও শ্রেণীবিভাগ

অরূপ রায়

বর্তমান পরমাণুর গঠনচিত্রের প্রধান উদ্ভাবক লর্ড রাদারফোর্ড। তিনিই প্রথম ডালটনীয় পরমাণু মতবাদকে বাতিল করে পরমাণুর নতুন স্বরূপ তুলে ধরেন বিশ্ববাসীর সামনে। আধুনিক মতানুযায়ী, পরমাণুর কেন্দ্রে থাকে পরমাণু কেন্দ্রীন (Nucleus) এবং কেন্দ্রীনকে বৃত্তাকার ও উপবৃত্তাকার পথে একক ঋণাত্মক বিদ্যুৎধর্মী ইলেকট্রন আবর্তিত হয়। কেন্দ্রীনে হ্যাঁ-বিদ্যুৎধর্মী প্রোটন, নিস্তড়িৎ নিউট্রন ছাড়াও বহু প্রাথমিক কণার সমাবেশ আছে। কেন্দ্রীনে প্রোটনের সংখ্যা ও কেন্দ্রীন-আবর্তিত ইলেকট্রনের সংখ্যা সমান, আবার কেন্দ্রীনের প্রোটন সংখ্যাই ঐ মৌলের পারমাণবিক ক্রমাঙ্ক (Atomic Number)। প্রোটনের সংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটিয়ে আজকাল এক মৌলকে অপর মৌলে পরিণত করা বৈজ্ঞানিকদের কাছে সহজ হয়ে গেছে। এক মৌলকে অপর মৌলে রূপান্তরিত করা অর্থাৎ কেন্দ্রীনের পরিবর্তনঘটিত বিক্রিয়াসমূহকে কেন্দ্রীন বিক্রিয়া বা (Nuclear Reaction) বলে।

কোন পরমাণুর কেন্দ্রীনকে উচ্চ শক্তিসম্পন্ন কণিকার দ্বারা আঘাত করে কেন্দ্রীন বিক্রিয়া ঘটানো হয়। এদের প্রোজেক্টাইল (Projectile) বলে। এক মৌলের কেন্দ্রীনকে অপর মৌলের কেন্দ্রীনে প্রথম রূপান্তর ঘটান লর্ড রাদারফোর্ড 1919 সালে। Ra-C থেকে নাইট্রোজেন গ্যাসের মধ্যে আল্‌ফা-কণিকা প্রবাহিত করে তিনি ${}_8O^{17}$ ও প্রোটন পান।

$${}_7N^{14} + {}_2He^4 = {}_8O^{17} + {}_1H^1$$

এখানে নাইট্রোজেন পরিবর্তিত হলো অক্সিজেনে এবং পারমাণবিক ক্রমাঙ্ক 7 থেকে হলো 8। পরে রাদারফোর্ড ও স্যাডউইক (1921-22) দেখান, বোরন (পা. ক. 5) থেকে পটাসিয়াম (পা. ক. 19) পর্যন্ত সমস্ত মৌলই (He, C, O ব্যতীত) এইরূপ বিক্রিয়ার অংশগ্রহণে সক্ষম।

বুথ ও বেকার 1930 সালে বেরিলিয়াম ধাতুকে আল্‌ফা-কণিকার দ্বারা আঘাত করে γ-রশ্মি অপেক্ষাও এক প্রকার শক্তিশালী রশ্মি-প্রবাহ পান। পরে তার নামকরণ হয় নিউট্রন। এক্ষেত্রে বেরিলিয়াম, আল্‌ফা কণিকার সঙ্গে সংঘর্ষে কার্বন ও নিউট্রন উৎপন্ন করে।

$${}_4Be^9 + {}_2He^4 = {}_6C^{12} + {}_0n^1$$

নিউট্রন খুব কার্যকরী প্রোজেক্টাইল, কারণ এটা তড়িৎশূন্য। ফলে পরমাণু কেন্দ্রীনের হ্যাঁ-তড়িৎধর্মী ক্ষেত্রে এটা আকর্ষিত অথবা বিকর্ষিত হয় না, সোজা লক্ষ্যে আঘাত হানে।

1934 সালে মাদাম কুরীর কন্যা ইরিন কুরী ও তাঁর স্বামী এফ. জোলিয়ট পৃথকভাবে বোরন, ম্যাগনেসিয়াম ও অ্যালুমিনিয়াম পরমাণু-কেন্দ্রীনকে α-কণিকার দ্বারা আঘাত হেনে আধুনিক বিজ্ঞানে একটি নতুন অধ্যায়—কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়ার সংযোজনা করেন। এই কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ নোবেল কমিটি তাঁদের যুগ্মভাবে নোবেল পুরস্কার প্রদান করেন।

$$_{5}B^{10} + {}_{2}He^{4} \longrightarrow {}_{7}N^{13} + {}_{0}n^{1}$$

$$\longrightarrow {}_{6}C^{13} + \beta^{+} \quad (t_{\frac{1}{2}} = 9.9 \text{ min.})$$

$$_{13}Al^{27} + {}_{2}He^{4} \longrightarrow {}_{15}P^{30} + {}_{0}n^{1}$$

$$\longrightarrow {}_{14}Si^{30} + \beta^{+} \quad (t_{\frac{1}{2}} = 2.55 \text{ min.})$$
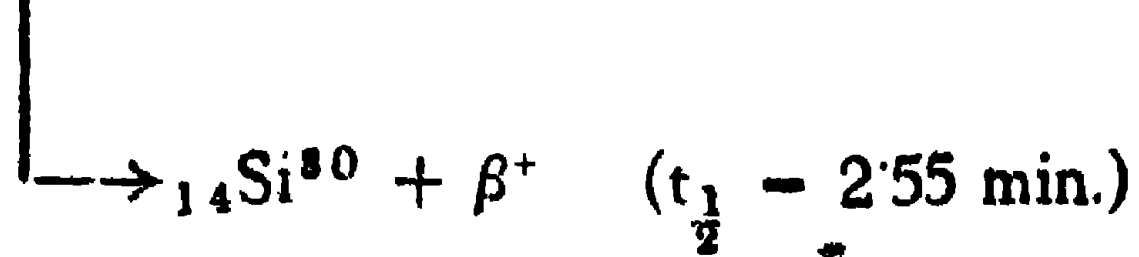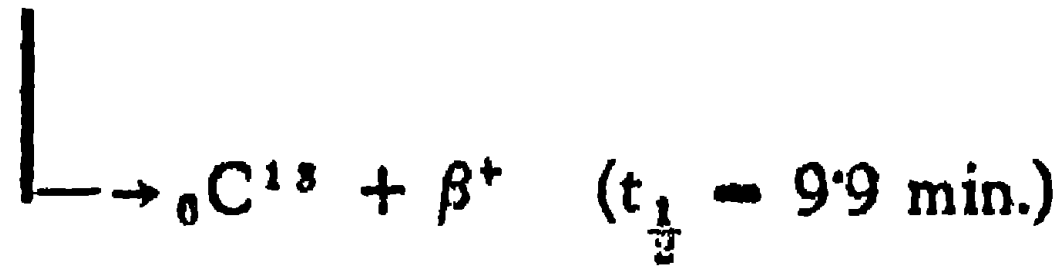
এখানে উৎপন্ন নতুন পরমাণু কেন্দ্রীন $_{7}N^{13}$ বা $_{15}P^{30}$। আল্‌ফা কণার দ্বারা আঘাত বন্ধ করবার পরেও উৎপন্ন কেন্দ্রীনগুলি যথারীতি তেজস্ক্রিয় বিকিরণের সূত্র মেনে পজিট্রন ত্যাগ করে অপর একটি মৌলের কেন্দ্রে পরিবর্তিত হয়ে যায়।

তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে প্রাপ্ত কণিকাগুলির গতিবেগ উচ্চ না হওয়ায় সব রকমের কেন্দ্রীন বিক্রিয়া এদের দ্বারা ঘটানো সম্ভব নয়, আজকাল প্রোজেক্টাইল উচ্চত্বরণসম্পন্ন করবার জন্যে প্রধানতঃ সাইক্লোট্রোন ব্যবহার করা হয়। এতে পরিবর্তনশীল বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রে প্রোজেক্টাইল-গুলিকে বারবার আবর্তিত করে উচ্চত্বরণসম্পন্ন করা হয়। সাইক্লোট্রোন ছাড়াও বিভাট্রোন, কস্‌মোট্রোন, বিটাট্রোন এবং সিনক্রোট্রোন উল্লেখ-যোগ্য। প্রোজেক্টাইল হিসাবে আজকাল α-কণিকা ($_{2}He^{4}$) ছাড়াও ডয়টেরন ($_{1}H^{2}$), প্রোটন ($_{1}H^{1}$), নিউট্রন, ($_{0}n^{1}$), X-রেডিয়েশন, γ-রেডিয়েশন (বা প্রোটন), ইলেকট্রন (e) ব্যবহার করা হয়।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায়, রাসায়নিক বিক্রিয়া ও কেন্দ্রীন বিক্রিয়ার স্বরূপ (Mechanism) সম্পূর্ণ আলাদা। রাসায়নিক বিক্রিয়ায় যোজ্যতা-ইলেকট্রনের বিন্যাস ঘটে মাত্র, কিন্তু কেন্দ্রীন বিক্রিয়ায় নিউট্রন-প্রোটনের সংখ্যার পরিবর্তন ঘটে পরমাণুর কেন্দ্রীনের ভিতর। ডেনিশ বিজ্ঞানী নীল্‌স্ বোর (1936) কেন্দ্রীন বিক্রিয়ার স্বরূপ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, পরমাণুর কেন্দ্রীন কর্তৃক প্রোজেকটাইল শোষিত হয়ে অস্থায়ী যৌগিক কেন্দ্রীনের সৃষ্টি করে, যার স্থায়িত্বকাল মাত্র 10^{-12} থেকে 10^{-14} সেকেণ্ড। এই সময়ের মধ্যেই শোষিত প্রোজেক্টাইলের সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীনের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে ও কেন্দ্রীনটি উত্তেজিত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। অতঃপর উত্তেজিত কেন্দ্রীনটি কণিকা উৎপন্ন করে স্থায়ী অথবা অস্থায়ী কেন্দ্রীনে পরিণত হয়। অস্থায়ী পরমাণু কেন্দ্রীন যতক্ষণ না স্থায়ী পরমাণু কেন্দ্রীনে রূপান্তরিত হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত এরূপ প্রক্রিয়া চলতে থাকে।

টার্গেট বা লক্ষ্যকেন্দ্র + প্রোজেক্টাইল ——→ যৌগিক কেন্দ্রীন বা উত্তেজিত অবস্থা ——→ নতুন কেন্দ্রীন + নিঃসৃত কণিকা।

কেন্দ্রীন বিক্রিয়া বহু প্রকার, সেগুলি সম্বন্ধে পৃথকভাবে আলোচনা করা হলো।

(1) প্রোজেক্টাইল শোষক বিক্রিয়া (Projectile Capture Reaction)—এই পদ্ধতিটি খুব সাধারণ। যখন কোন পরমাণুর কেন্দ্রীনকে প্রোজেক্টাইলের দ্বারা আঘাত করা হয়, তখন কেন্দ্রীন প্রোজেক্টাইলটি শোষণ করে

নেয়, ফলে যৌগিক কেন্দ্রীনের সৃষ্টি হয়, কিন্তু নতুন কেন্দ্রীনের সৃষ্টির সঙ্গে কোন কণিকার সৃষ্টি হয় না, অতিরিক্ত শক্তি γ শক্তি হিসাবে বিকিরিত হয়ে যায়। উৎপন্ন কেন্দ্রীনটি অস্থায়ীও হতে পারে এবং অস্থায়ী হলে তেজস্ক্রিয় বিকিরণের মাধ্যমে স্থায়িত্ব লাভ করে।

$$_1H^1+{_0n^1}\longrightarrow {_1H^2}+\gamma,\quad {_{37}Rb^{85}}+{_0n^1}\longrightarrow {_{37}Rb^{86}}+\gamma$$

$$_6C^{12}+{_1H^1}\longrightarrow {_7N^{13}}+\gamma \longrightarrow {_6C^{13}}+\beta^{+}$$

(2) **প্রোজেক্টাইল-কণিকা বিক্রিয়া** (Projectile-particle Reaction)—বেশীর ভাগ কেন্দ্রীন বিক্রিয়াই এই ধরণের। প্রোজেকটাইল শোষণের পর উত্তেজিত কেন্দ্রীন ভেঙ্গে অবশেষে নতুন কেন্দ্রীন ও কেন্দ্রীন কণিকার সৃষ্টি করে।

$$_{13}Al^{27}+{_1H^1}\longrightarrow {_{12}Mg^{24}}+{_2He^4}$$

$$_7N^{14}+{_0n^1}\longrightarrow {_6C^{14}}+{_1H^1},\quad {_5B^{11}}+{_1H^1}\longrightarrow {_6C^{11}}+{_0n^1}.$$

(3) **বিভাজন বিক্রিয়া** (Fission Reaction): কোন ভারী মৌলের কেন্দ্রকে (Mass Number 200-র অধিক) নিউট্রন বা অন্য কোন শক্তি-সম্পন্ন প্রোজেক্টাইলের দ্বারা আঘাত হানলে এক প্রচণ্ড উত্তেজিত কেন্দ্রীনের সৃষ্টি হয়, ফলে যৌগিক কেন্দ্রীন ভেঙ্গে দুটি প্রায় সমান ভরের কেন্দ্রীন উৎপন্ন হয়। এদের সঙ্গে উৎপন্ন কণা হিসাবে নিউট্রন (বা অন্য কণিকা) ও বিপুল পরিমাণ শক্তি বের হয়ে আসে। এই ধরণের কেন্দ্রীন বিক্রিয়াকে বিভাজন বিক্রিয়া বলে। উৎপন্ন নিউট্রন আবার প্রাথমিক ভারী কেন্দ্রীনে আঘাত করে, এই ভাবে বিক্রিয়াটি বিভাজন শৃঙ্খল বিক্রিয়ায় (Fisson Chain Reaction) পরিণত হয়। অতএব, বিভাজন বিক্রিয়া স্বতঃ-ক্রিয়াশীল।

$$_{92}U^{235}+{_0n^1}\longrightarrow {_{56}Ba^{141}}+{_{36}Kr^{92}}+(2\text{-}3)\,{_0n^1}+200\text{ Mev.}$$

ধীর-ত্বরণসম্পন্ন নিউট্রন বা থার্মাল নিউট্রনের দ্বারাও বিভাজন বিক্রিয়া ঘটানো সম্ভব। যখন U^{235}-কে ধীর-ত্বরণসম্পন্ন নিউট্রনের দ্বারা আঘাত হানা হয়, তখন জিঙ্ক (Zn 30) থেকে ইউরোপিয়াম (Eu 63) পর্যন্ত সমস্ত মৌলই উৎপন্ন পদার্থ হিসাবে পাওয়া যায়। উৎপন্ন পদার্থের মধ্যে কিছু প্রাথমিক উৎপাদক ও বাকী সব মাধ্যমিক উৎপাদক অর্থাৎ প্রাথমিক উৎপাদক থেকে প্রাপ্ত। বিভাজন বিক্রিয়ায় কিছু ভর ধ্বংসই উৎপন্ন শক্তির কারণ (আইনষ্টাইনের সূত্র, $E=mc^2$ অনুযায়ী)।

পারমাণবিক চুল্লীতে পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনে বিভাজন শৃঙ্খল বিক্রিয়াকে কাজে লাগানো হয়। বর্তমানে ভারতের তারাপুরে এইরূপ একটি পারমাণবিক চুল্লী স্থাপিত হয়েছে। পারমাণবিক বোমাতেও এই বিক্রিয়াই ঘটে। দ্রুতগামী নিউট্রনের দ্বারা $_{90}Th^{232}$, $_{91}Pa^{231}$, $_{92}U^{238}$ ও ধীর-গতিসম্পন্ন নিউট্রনের দ্বারা $_{92}U^{233}$, $_{92}U^{235}$, $_{94}Pu^{239}$-এর বিভাজন বিক্রিয়া ঘটানো হয়। তবে বর্তমানে হাল্কা কেন্দ্র-বিশিষ্ট মৌল, যেমন—টাইটেনিয়াম (22)-এর বিভাজন বিক্রিয়া অত্যধিক উচ্চ-ত্বরণসম্পন্ন প্রোজেক্টাইলের দ্বারা ঘটানো সম্ভব হচ্ছে।

(4) **সংযোজন বিক্রিয়া** (Fusion Reaction)—হাল্কা মৌলের আইসোটোপ, যেমন—$_1H^2$, $_1H^3$, $_3Li^6$ প্রভৃতি একে অপরের সঙ্গে বিক্রিয়া করে আরো স্থায়ী ও ভারী মৌলের

পরমাণু-কেন্দ্রীনে পরিণত হয়। এই সকল কেন্দ্রীন বিক্রিয়াকে সংযোজন বিক্রিয়া বলে। হাইড্রোজেনের আইসোটোপ ডয়টেরিয়াম ও ট্রিটিয়াম পরস্পর বিক্রিয়া করে স্থায়ী হিলিয়ামের কেন্দ্রে পরিণত হয়।

$_1H^2 + {}_1H^3 \longrightarrow {}_2He^4 + {}_0n^1 + 17{\cdot}8$ Mev.। এই বিক্রিয়াতে প্রচ্ছন্ন প্রতিবন্ধক (Potential barrier) খুব বেশী। একমাত্র কয়েক মিলিয়ন ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রাতেই এই প্রচ্ছন্ন প্রতিবন্ধক অতিক্রম করা সম্ভব। তাই একে তাপ-কেন্দ্রীন বিক্রিয়াও (Thermo-nuclear Reaction) বলা হয়। হাল্কা মৌলের কেন্দ্র একে অপরকে উচ্চবিকর্ষণ বল প্রয়োগ করে। উচ্চতাপমাত্রায় থার্মাল মোসানের ফলে শক্তি এত প্রচণ্ড হয়ে যায় যে, কেন্দ্রগুলি বিকর্ষণ বল অতিক্রম করে পরস্পর মিলিত হয়। হাইড্রোজেন বোমার প্রচণ্ড শক্তি কেবলমাত্র সংযোজন বিক্রিয়ার জন্যেই। সংযোজন বিক্রিয়াতেও বিভাজন বিক্রিয়ার ন্যায় কিছু ভর ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং এর ফলেই শক্তির উদ্ভব। তবে সংযোজন বিক্রিয়ার দক্ষতা বিভাজন বিক্রিয়ার 4 গুণ। বৈজ্ঞানিকগণ মনে করেন, জ্যোতিষ্ক-সূর্য প্রভৃতির শক্তি বিভাজন বিক্রিয়ালব্ধ। 1938 সালে Weizacker ও Bathe বলেন, 4টি হাইড্রোজেন 1 টি হিলিয়ামে পরিণত হবার সময়ই এই প্রচণ্ড তাপ-শক্তির উদ্ভব হয়। তাঁরা নিম্নলিখিত বিক্রিয়া পেশ করেন :

$$_6C^{12} + {}_1H^1 \longrightarrow {}_7N^{13} + \gamma$$
$$_7N^{13} \longrightarrow {}_6C^{13} + \gamma + \beta^+$$
$$_6C^{13} + {}_1H^1 \longrightarrow {}_7N^{14} + \gamma$$
$$_7N^{14} + {}_1H^1 \longrightarrow {}_8O^{15} + \gamma$$
$$_8O^{15} \longrightarrow {}_7N^{15} + \gamma + \beta^+$$
$$_7N^{15} + {}_1H^1 \longrightarrow {}_6C^{12} + {}_2He^4 + \gamma$$

$$4\,{}_1H^1 \longrightarrow {}_2He^4 + \text{শক্তি}$$
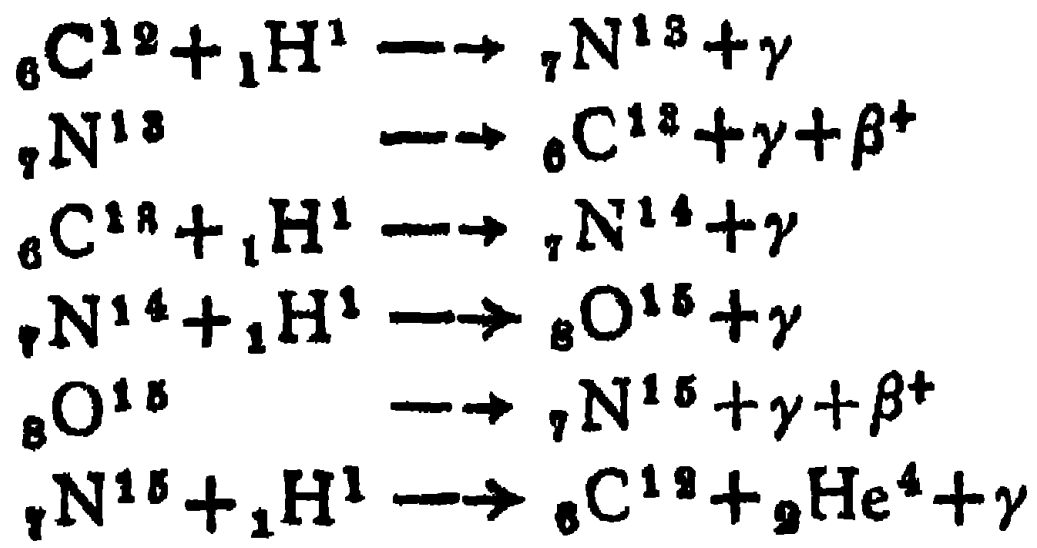
এখানে প্রায় 0·7% ভর শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। প্রতি পূর্ণ পর্যায় বিক্রিয়াতে 26·8 Mev. শক্তি উৎপন্ন হয়। এই বিক্রিয়া পৃথিবীপৃষ্ঠে ঘটানো অসম্ভব, কারণ বিক্রিয়াটি ঘটতে 2×10^7 °C তাপমাত্রার প্রয়োজন হয় এবং এক একটি পর্যায় সম্পূর্ণ করতে সময় লাগে 6 মিলিয়ন বছর।
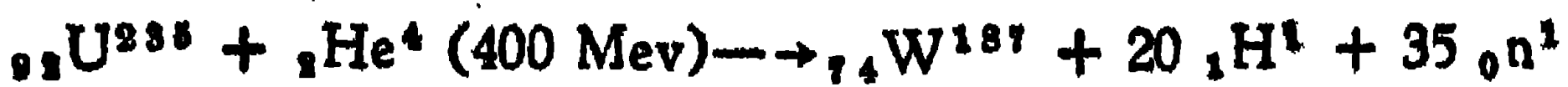
পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণজাত তাপমাত্রা আজকাল সংযোজন বিক্রিয়ার প্রয়োজনীয় তাপ উৎপাদনে ব্যবহৃত হচ্ছে। আল্ফা কণার গড় গতিশক্তি সাধারণ তাপমাত্রায় 10^{-2}ev এবং 10^7 °C তাপমাত্রায় 10^4ev। পারমাণবিক বোমায় উৎপন্ন তাপমাত্রার পরিমাণ 10^6 °C প্রায়। সুতরাং পারমাণবিক বোমা তাপ-কেন্দ্রীন বিক্রিয়াতে দেশলাইয়ের কাজ করে। হাইড্রোজেন বোমায় খুব সম্ভবতঃ নিম্ন-বর্ণিত বিক্রিয়াটি সম্পন্ন হয়।

$$_1H^2 + {}_1H^2 \longrightarrow {}_2He^4 + \gamma$$
$$_1H^2 + {}_1H^1 \longrightarrow {}_2He^3 + \gamma$$
$$_1H^1 + {}_1H^3 \longrightarrow {}_2He^4 + \gamma$$
$$_3Li^7 + {}_1H^1 \longrightarrow 2\,{}_2He^4 + \gamma$$
$$_3Li^6 + {}_1H^2 \longrightarrow 2\,{}_2He^4 + \gamma$$
$$_3Li^6 + {}_1H^3 \longrightarrow 2\,{}_2He^4 + {}_0n^1 + \gamma$$
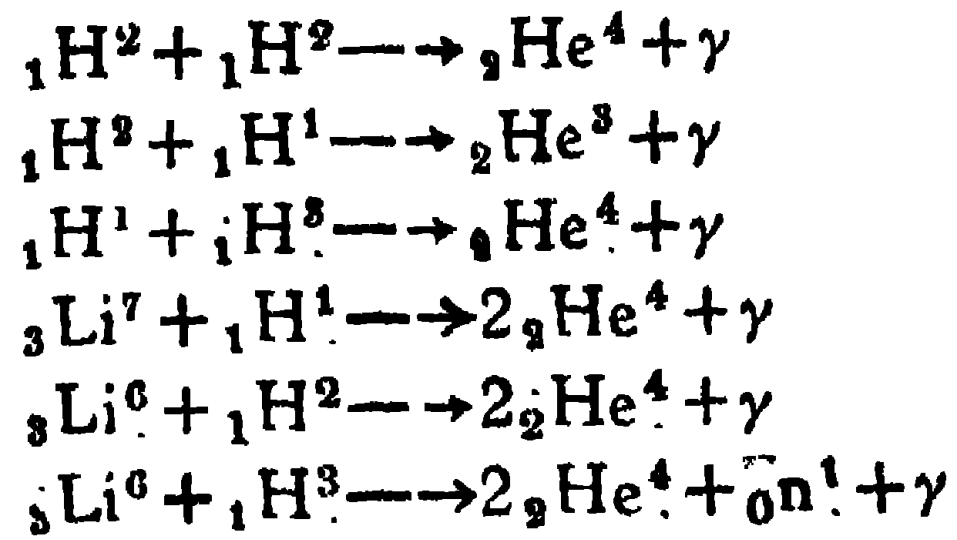
চতুর্থ বিক্রিয়াতে প্রায় 0·231% ভর শক্তিতে পরিবর্তিত হয়, যেখানে U^{235} ব্যবহার করলে মাত্র 0·1% ভর শক্তিতে পরিণত হয়।

(5) স্প্যালেসন বিক্রিয়া (Spallation Reaction)—অত্যধিক ত্বরণ ও শক্তিসম্পন্ন (প্রায় 400 Mev) প্রোজেক্টাইলের দ্বারা যখন কোন ভারী মৌলের কেন্দ্রকে আঘাত করা হয়। তখন আঘাত হানা কেন্দ্র অপেক্ষা 10 থেকে 20 একক পারমাণবিক ক্রমাঙ্কবিশিষ্ট মৌলের কেন্দ্র ও সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে কণা উৎপন্ন হয়। সাধারণ কেন্দ্রীন বিক্রিয়াতে পারমাণবিক ক্রমাঙ্কের পরিবর্তন 2-এর বেশী হয়, এমন বিক্রিয়া খুবই বিরল। আবার বিভাজন বিক্রিয়ার সঙ্গে এর তফাৎ—এই বিক্রিয়াতে প্রচুর কণার সৃষ্টি হয়, কিন্তু ভর সংখ্যার পরিবর্তন বিভাজন বিক্রিয়ার মত অত বিরাট নয়। আবার বিক্রিয়াটি স্বতঃক্রিয়াশীলও নয়।

$$_{92}U^{238} + {}_2He^4\ (400\ \text{Mev}) \longrightarrow {}_{74}W^{187} + 20\,{}_1H^1 + 35\,{}_0n^1$$
$$_{33}As^{75} + {}_1He^2\ (200\ \text{Mev}) \longrightarrow {}_{25}Mn^{50} + 9\,{}_1H^1 + 12\,{}_0n^1.$$

এই বিক্রিয়াটির আবিষ্কার খুব সম্প্রতি হয়েছে।

আদমসুমারী

শ্রীশচীনন্দন আঢ্য

আমাদের দেশে সর্বশেষ আদমসুমারী বা লোকগণনা হয় 1961 সালে। আবার হচ্ছে এই বছর অর্থাৎ 1971 সালে।

প্রতি দশ বৎসর অন্তর পৃথিবীর সব রাষ্ট্রেই লোকগণনা হয়ে থাকে। আদমসুমারির মোটামুটি উদ্দেশ্য হচ্ছে, প্রতি দশ বৎসর অন্তর দেশে লোকসংখ্যা কত বৃদ্ধি হচ্ছে, কোন্ রাজ্যে শতকরা কত পরিমাণ বৃদ্ধি, নারী, শিশু ও পুরুষের সংখ্যা বাড়ছে, না কমছে, কোন্ রাজ্যে কত লোক সক্ষম, কোন্ কোন্ রাজ্যে কায়িক পরিশ্রমী, ব্যবসায়ী ও চাকরীজীবী কত, দেশে ভবঘুরে, ভিখারী ও বেকার লোকের সংখ্যা কত, কোন্ রাজ্যে কতজন কৃষিজীবী, বুদ্ধিজীবী বা শ্রমজীবী বাস করেন—তা নির্ণয় করা। শিক্ষিত, অশিক্ষিত বা অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন কতজন, কোন্ ধর্মের লোক কতজন কোন্ কোন্ রাজ্যে থাকেন, কোন্ কোন্ রাজ্যে স্ত্রীলোক ও পুরুষের সংখ্যাবৃদ্ধি বা হ্রাসের হিসাব কিরূপ—এসব আদমসুমারী থেকে লাভ করা যায়। এছাড়া সমগ্র রাষ্ট্রে মূলত: কত খাদ্যসামগ্রী প্রয়োজন ও তার আমদানী-রপ্তানী এবং উৎপাদন-অনুৎপাদন রাজ্যগুলির শিক্ষা, প্রগতি এবং সংস্কৃতি সম্বন্ধেও আদমসুমারীর সাহায্যে তথ্যাদি সংগ্রহ করা হয়। এছাড়াও বিশেষত: ভারতের ন্যায় উন্নতিকামী দেশে আদমসুমারীর ফলাফলের উপরেই জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পূর্ণ নির্ভর করে।

সরকারীভাবে 1971 সালকেই ভারতে আদমসুমারীর শতবর্ষ পূর্তি বলে প্রচারিত হচ্ছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভারতে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে সর্বপ্রথম লোকগণনা হয় 1881 সালের 17ই ফেব্রুয়ারী। তার পূর্বে অবশ্য আংশিকভাবে ভারতের দু-একটি প্রদেশ ও শহরে লোকগণনা কিছু কিছু হয়। 1853 সালে সর্বপ্রথম উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে লোকগণনা করা হয়। তারপর পাঞ্জাবে 1855 সালে ও কলকাতায় হয় 1866 সালের 8ই জানুয়ারী রাত্রে। সারা বাংলায় সরকারীভাবে আদমসুমারী হয় 1872 সালে। বলা বাহুল্য এসবই ভারতে ইংরেজ-শাসিত যুগের কথা। যখন যে সময় শাসন-কার্যের সুবিধা-অসুবিধা বুঝেছেন, তারই প্রয়োজনের উপর নির্ভর করেই তদানীন্তন ইংরেজ সরকার ভারতের স্থানে স্থানে লোকগণনা করেন।

আদমসুমারী সাধারণতঃ দু-রকম পদ্ধতিতে হয়ে থাকে। এই দুটি পদ্ধতিই হচ্ছে আন্তর্জাতিক নিয়মভুক্ত। একটি হচ্ছে De facto আর অপরটি হচ্ছে De jure। De facto হচ্ছে দেশের সমস্ত মানুষকে একটি বিশেষ ক্ষণের মধ্যে গণনা করা আর De jure হচ্ছে আবাসস্থলের ভিত্তিতে গণনা করা। এই দুটি নিয়মের একটিকে অবলম্বন করেও দেখা গেছে, তাতেও কিছু কিছু অসুবিধার সৃষ্টি হয়। কারণ একটি বিশেষ ক্ষণে গণনা করলে অনেক লোক নিয়োগ করতে হয়। যে যেখানেই থাকুক না কেন, জলে, স্থলে, বিমানে বা নিবাসে-প্রবাসে—নির্বিশেষে সকলকেই গণনা করতে হয়। আবার আবাস্থলের অর্থাৎ De jure পদ্ধতি অনুসরণ করলেও অনেক অসুবিধা থেকে যায়। সেই কারণে 1931 সাল অবধি Defacto পদ্ধতিতেই লোকগণনা বার বার হয়ে গেছে। কিন্তু তার

পর থেকে অত্যাবধি. অর্থাৎ 1941, 1951 এবং 1961-তে পূর্বোক্ত দুই পদ্ধতির মধ্যপন্থা অবলম্বন করে ভারতে লোকগণনা করা হয়।

পৃথিবীর কোন্ রাষ্ট্রে সর্বপ্রথম আদমসুমারী সুরু হয়, তা ঠিকমত জানতে না পারলেও আমরা বলবো ভারত এই বিষয়ে প্রথম অগ্রণী। কারণ কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে ও মেগাস্থিনীসের কড়চায় পাওয়া যায় যে, মৌর্যরাজ চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে জন্ম ও মৃত্যুর হিসাব রাখবার জন্যে আলদা একটা বিভাগই ছিল। এই ব্যবস্থাকে এক প্রকার লোকগণনাই বলা যেতে পারে। এ তো গেল আজ থেকে তেইশ শত বছরের আগের কথা। তারপর আইন-ই-আকবরীতে পাওয়া যায় যে, আকবর বাদশাহের রাজ্যে একজন খালি কোতোয়াল ছিলেন, যিনি রাজ্যে লোক সংখ্যা ও রাজ্যে বহিরাগতদের আগমন-নির্গমনের খোঁজ রাখতেন। রাজ্যে কি সব ঘটনা ঘটবে, তার সংখ্যা নির্ণয়েরও ভার ছিল ঐ কোতোয়ালের উপর।

শোনা যায় রাজস্ব আদায়ের সুবিধার্থে খৃঃ পূঃ তৃতীয় সহস্রকে ব্যাবিলন, পারস্য, চীন ও মিশরে একবার লোকগণনা হয়। আজ থেকে বহু শত বছর পূর্বে রোমেও নাকি কর আদায়, সামরিক অবস্থা ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা স্থির করবার জন্যে প্রতি পাঁচ বছর অন্তর লোকগণনা করা হতো। খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীতে রোম সরকারী ভাবে লোকগণনার ব্যবস্থা করে। তারপর ধীরে ধীরে পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রে তার পরিব্যাপ্তি ঘটে।

1770 সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ও 1801 সালে ইংল্যাণ্ডে সর্বপ্রথম লোকগণনা চালু হয়। আদম-সুমারী কথাটা ফার্সী। বাংলায় লোকগণনা ইংরেজীতে সেনসাস বলা হয়। এই আদম-সুমারীর কল্যাণে আমরা দেশের বা পৃথিবীর বহু তথ্য জানতে পারি। এক রাষ্ট্রের তুলনায় অন্য রাষ্ট্রের অবস্থা যে কি, তাও জানা সহজ হয় আদমসুমারীরই কল্যাণে। তাই লোকগণনা সম্পর্কে লোক যত সজাগ হয়, ততই মঙ্গল।

বিমানগাত্রে তুষারীভবন

শ্রীঅঞ্জনকুমার দাশ

বিমান চালনার সময় যে সমস্ত সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, তার মধ্যে অন্যতম হলো বিমানগাত্রে তুষারীভবনের সমস্যা।

বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় দেখা গেছে, যে জলকে তার হিমাঙ্কের নীচে প্রায় $-41°$ সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত তরল অবস্থায় রাখা যায়। মেঘের মধ্যস্থিত জলকণাকেও $-35°$ সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা পর্যন্ত তরল অবস্থায় অবস্থান করতে দেখা যায়।

আমরা জানি যে, প্রতি এক হাজার ফুট উচ্চতায় গড়ে তাপমাত্রা প্রায় $1·7°$ সেন্টিগ্রেড হ্রাস পায়। আবার অনেক উঁচুতে বায়ুর চাপ কমে যাওয়ায় সেখানে আরোহণের ফলে মেঘ প্রসারিত হয় এবং তার তাপমাত্রা খানিকটা কমে যেতে পারে। এইভাবে উচ্চস্থিত মেঘের তাপমাত্রা অধিকাংশ সময়েই জলের হিমাঙ্কের ($0°$ সেন্টিগ্রেড) নীচে থাকে। আর মেঘের মধ্যস্থিত জলকণাগুলি থাকে অতি শীতল অবস্থায়। এক্স-রে ব্যবর্তন পরীক্ষায় দেখা গেছে যে, অতি শীতল জলের অণুগুলির গঠন প্রায় বরফের অণুর গঠনের অনুরূপ। এই অতি শীতল জল আবার তিন রকমভাবে বরফে পরিণত হতে পারে, যথা—

(1) বরফের সংস্পর্শে স্বয়ং তুষারীভবন হয়;

(2) অন্য কোন শীতল কঠিন পদার্থের সংস্পর্শে অসম তুষারীভবন হয়;

(3) $-41°$ সেন্টিগ্রেডের নীচে জল আপনা থেকেই বরফে পরিণত হয়।

স্বভাবতঃই একটি বিমান যখন এরকম একখণ্ড মেঘের মধ্য দিয়ে উড়ে যায়, তখন জলকণাগুলি বিমানের গায়ে বরফাকারে জমতে সুরু করে। এমনিতে এই প্রক্রিয়া বেশ দ্রুত, কিন্তু প্রতি গ্র্যাম বরফ জমাকালে 80 ক্যালরি তাপ উদ্ভূত হয়; ফলে প্রক্রিয়াটি অপেক্ষাকৃত মন্দীভূত হয়ে আসে।

সাধারণতঃ $-3°$ সেন্টিগ্রেড থেকে $0°$ সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রার বায়ুতে আর্দ্রতার পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হয়ে থাকে। তাই এই তাপমাত্রায় ঘন তুষারীভবনের সম্ভাবনা বেশী।

বিমানগাত্রে তিন ধরণের তুষার জমতে পারে—

(1) ফ্রস্ট (Frost) বা জমাট হিমকণা— এইগুলি হাল্কা বরফকুচির আকারে অল্প পরিমাণে জমা হয়, তবে প্রচণ্ড বাতাসে আর বিমানটির কাঁপুনিতে এগুলি সহজেই ঝরে পড়ে। এগুলি দৃষ্টিপথে বাধা দিতে ও বেতার যোগাযোগ ব্যবস্থায় বিঘ্ন ঘটাতে পারে। সাধারণতঃ পরিষ্কার অথচ আর্দ্র বাতাসের মধ্য দিয়ে যাবার সময় অথবা উপরের ঠাণ্ডা বায়ুস্তর থেকে হঠাৎ নীচেকার আর্দ্র, উষ্ণ বায়ুস্তরে নামবার সময় এই জমাট হিমকণার সৃষ্টি হয়।

(2) রাইম (Rime) বা তুহিণকণা—এগুলি অস্বচ্ছ, সাদা দানার আকারে দেখা দেয়। এই অস্বচ্ছতার কারণ, এগুলি বেশ ধীরে ধীরে জমে; ফলে দুটি তুহিনকণার মধ্যে কিছু বাতাস আটকে পড়ে। এর আপেক্ষিক গুরুত্ব গড়ে 0·6। এগুলি বিমানের অগ্রভাগে জমা হয় (1নং চিত্র-ক) আর সহজেই বিমানের কাঁপুনিতে বা যান্ত্রিক উপায়ে এগুলিকে ঝরানো যেতে পারে। এগুলিও দৃষ্টির বিস্তারে বাধা দিতে বা বেতার যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করতে পারে। আবার অত্যধিক পরিমাণে জমা হয়ে এগুলি বিমানের ভারসাম্য রক্ষায় বিপদ ডেকে আনতে পারে।

সাধারণতঃ খুব ঠাণ্ডায় (—10° সেন্টিগ্রেড) তাপমাত্রার নীচে) বা পাতলা ছড়ানো স্তরমেঘের মধ্য দিয়ে যাবার সময় এগুলি বিমানগাত্রে ঘনীভূত হয়।

1নং চিত্র-ক
বিমানের অগ্রভাগে জমা বরফ

1নং চিত্র-খ
বিমানে গ্লেজের আস্তরণ

(3) গ্লেজ (Glage) বা পরিষ্কার বরফ— এই শ্রেণীর তুষারীভবন বেশ মারাত্মক হতে পারে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সমগ্র বিমানটির গায়ে শক্ত, জমাট বরফের আস্তরণরূপে দেখা দিতে পারে (1নং চিত্র-খ)। এগুলির আপেক্ষিক গুরুত্ব 0·9 আর এগুলি খুবই তাড়াতাড়ি জমতে

থাকে। এর ফলে বৃষ্টি প্রসারে বিঘ্ন বা বেতার যোগাযোগ ব্যবস্থায় বিঘ্ন তো ঘটেই, উপরন্তু প্লেনের ভারসাম্য ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে, বিমানের সঙ্গে বায়ুর ঘর্ষণ বেড়ে যায়, ওজন বেড়ে যাবার ফলে বিমানটি অনির্দিষ্টভাবে নীচে নামতে থাকে—এমন কি, চাপমান যন্ত্রগুলিও বিকল হয়ে গিয়ে ব্লাইণ্ড ল্যাণ্ডিং (Blind landing) প্রক্রিয়াকেও অসম্ভব করে তোলে।

অতি আর্দ্র স্তূপমেঘ, যার তাপমাত্রা −3° সে. থেকে 0°সে-র মধ্যে বা যে মেঘের অন্তর্নিহিত জলকণাগুলি আকারে বড়, সেগুলি এধরণের বরফ তৈরি করতে পারে। আবার একটি উষ্ণ স্তর থেকে বৃষ্টি হবার সময় যদি বিমানটি নীচেকার অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা বাতাসের মধ্য দিয়ে উড়ে যায়, তাহলেও গ্লেজ জমতে পারে।

জ্বালানীর অন্তর্গমনের পরিমাণও নিয়ন্ত্রিত করা যায়। মিশ্রণের সুবিধার জন্যে মিশ্রণস্থলের মুখটি সরু করে দেওয়া হয় (2নং চিত্র)। এর ফলে বায়ু প্রচণ্ড বেগে ভিতরে ঢুকতে পারে, কিন্তু সরু মুখের অপর পাশে চাপ কম থাকায় বায়ু হঠাৎ প্রসারিত হয়। এই প্রসারণের ফলে এবং তরল জ্বালানী জেট থেকে বের হবার সময় বাষ্পীভূত হবার ফলে তাপমাত্রা অত্যধিক হ্রাস পেয়ে বরফ জমে যেতে পারে।

স্বভাবতঃই প্রশ্ন মনে আসে—এই তুষারীভবন দূর করবার উপায় কি? এই ব্যাপারে লক্ষণীয় যে, প্রতি একক সময়ে কতটা পুরু হয়ে বরফ জমবে, তার মান নির্ভর করে—
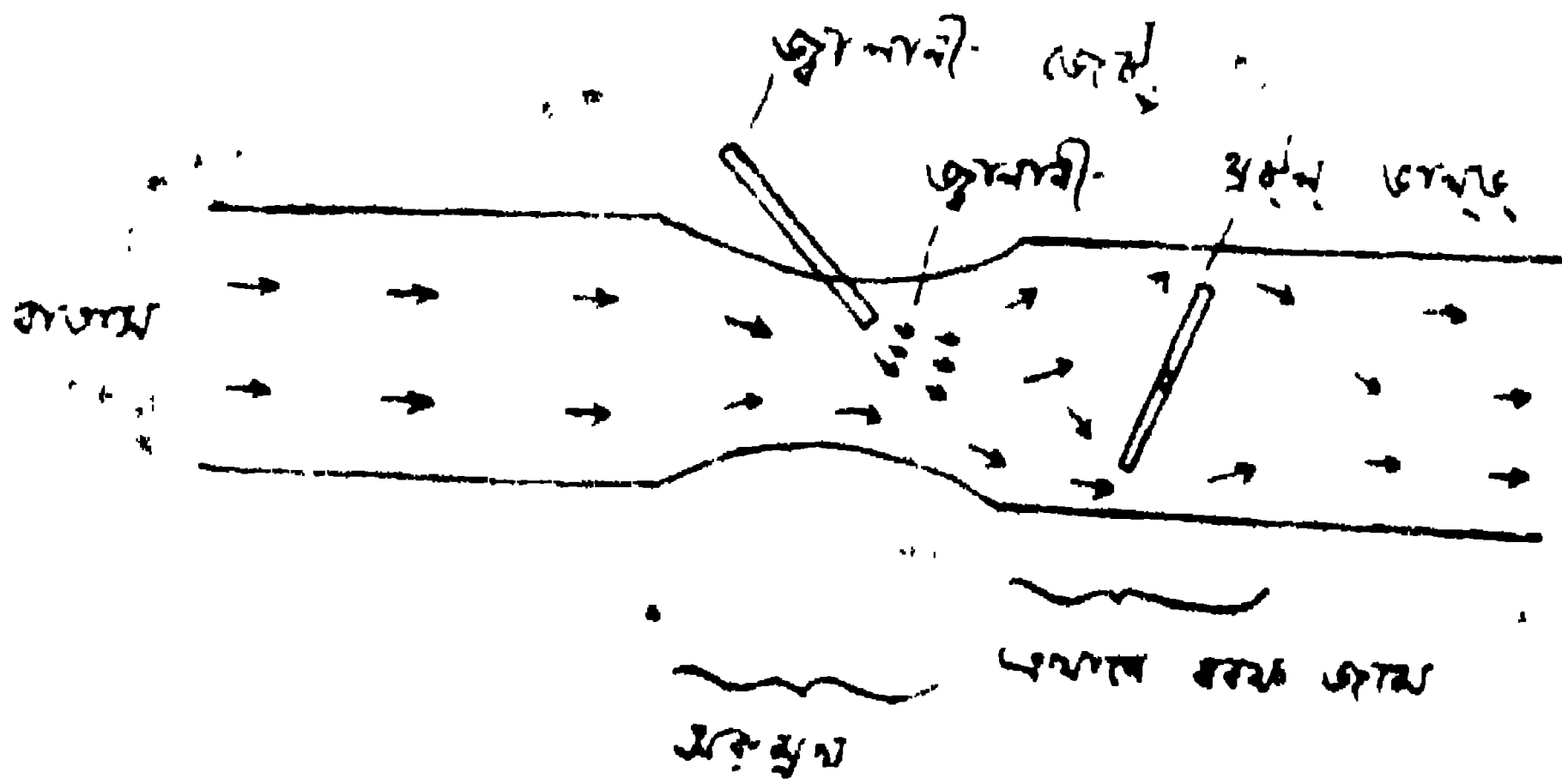
2নং চিত্র
বিমানের কারবুরেটারে তুষারীভবন

এছাড়া ছোট প্লেনের কারবুরেটারে (Carburetter) বরফ জমে তার ইঞ্জিনটি বিকল করে দিতে পারে। কারবুরেটার হলো ইঞ্জিনের জন্যে প্রয়োজনীয় জ্বালানী ও বায়ু মিশ্রিত করবার যন্ত্র। কারবুরেটার থেকে প্লেনের ইঞ্জিনে কতটা পরিমাণ বায়ুমিশ্রিত জ্বালানী প্রবেশ করবে, তা নির্ধারণ করে থ্রট্‌ল্ ভাল্‌ভ্। এই ভাল্‌ভ্‌টির অবস্থান ইচ্ছামত পরিবর্তন করে বায়ুমিশ্রিত

(i) একক আয়তনের মেঘে বা বাতাসে কতটা পরিমাণ জল অতি শীতল অবস্থায় থাকা জলের ভর (w),

(ii) বাতাসের তুলনায় বিমানের গতি (v),

(iii) যে ধরণের বরফ জমবে তার ঘনত্ব, (ρ),

(iv) বিমানের পাখার ধারণ ক্ষমতা (E)।

গাণিতিক আকারে বলা যায় যে, একক সময়ে জমা বরফের বেধ $\propto \frac{Evw}{\rho}$

সমীকরণ থেকে বোঝা সহজ, কেন যাত্রীবাহী বিমানের সম্মুখভাগে জমা বরফের তুলনায় একই পারিপার্শ্বিক অবস্থায় দ্রুতগতির একটি ফাইটার বিমানের সম্মুখে জমা বরফের বেধ অনেক বেশী হতে পারে।

E ও w-র মান নিরূপণ হয়:

	E	w গ্র্যাম/ঘন মিঃ
বৃষ্টি	1	·5-5
ইন্‌সেণ্ডি	·6-·9	·5-2
মেঘ	·4-·6	·2-1

স্পষ্টতঃই, বিমানচালকের প্রথম কাজ হবে বাদলমেঘের উপর দিয়ে ওড়া এবং যতটা সম্ভব মেঘ ও ঠাণ্ডা অঞ্চলের বৃষ্টিকে পরিহার করে চলা। তবে হিমকণা ও রাইমকে নিয়ে ভাবনার বিশেষ কিছু নেই—কেন না, প্লেনের স্বাভাবিক কম্পন ও বাতাসের ঝাপ্‌টাতেই এগুলিকে ঝরানো যেতে পারে। ছোট প্লেনের কারবুরেটারে বরফ জমা বন্ধ করতে হলে বহিরাগত বায়ুকে তার ঢোকবার পথেই উষ্ণ (Pre-heating) করে নিতে হবে।

অসুবিধা হচ্ছে, প্লেনের সম্মুখভাগের জমাট বরফ দূরীকরণ প্রসঙ্গে। এজন্যে বিভিন্ন যান্ত্রিক ও তাপীয় পদ্ধতি এবং তরল বা পেষ্টজাতীয় তুষার-রোধক উদ্ভাবিত হয়েছে, তন্মধ্যে গুড্‌রিচ্‌ যান্ত্রিক তুষার-রোধক (Goodrich mechanical de-icer) অন্যতম। এই পদ্ধতিতে যে সমস্ত স্থানে বরফ জমবার আশঙ্কা, সে সব জায়গায় রাবারের আবরণ পরিয়ে দেওয়া হয় ও এই আবরণটিকে পর্যায়ক্রমে প্রসারিত ও সঙ্কুচিত করা হয়। ফলে বরফগুলি আল্‌গা হয়ে আসে ও বাতাসের ঝাপ্‌টায় উড়ে যায়।

আবহাওয়ার উন্নত ধরণের পূর্বাভাস এবং উন্নত ধরণের বিমান প্রস্তুতের ফলে এই সমস্যাটির সমাধান এখন ধীরে ধীরে সহজ হয়ে আসছে।

সঞ্চয়ন

বার্তাবহ উপগ্রহ

উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপের মধ্যে বার্তার আদান-প্রদানের উদ্দেশ্যে ইনটেলস্যাট-4 নামে একটি অতি শক্তিশালী নূতন উপগ্রহ সম্প্রতি মহাকাশে উৎক্ষিপ্ত হয়েছে। প্রশান্ত এবং ভারত মহাসাগরের উপরিস্থিত মহাকাশে এই বছরের শেষের দিকে আরও দুটি বার্তাবহ উপগ্রহ স্থাপনেরও পরিকল্পনা করা হয়েছে।

এই নূতন বার্তাবহ উপগ্রহটি খুবই উন্নত ধরনের। এর সাহায্যে অন্ততঃ যুগপৎ 1000 টেলিফোন বার্তা প্রেরিত হবে এবং 12টি রঙীন টেলিভিশন বার্তা ও চিত্র প্রচার করা সম্ভব হবে।

পৃথিবীতে বহু দূরবর্তী অঞ্চলের মধ্যে বেতার ও টেলিভিশনের মাধ্যমে সরাসরি বার্তার আদান-প্রদান এতকাল সম্ভব হয় নি। ইকো, টেলস্টার, রিলে, সিন্কম, কুরিয়ার, স্কোর, ট্র্যানজিট, ইনটেলস্যাট প্রভৃতি কৃত্রিম উপগ্রহই এই অসম্ভবকে সম্ভব করেছে।

রাশিয়ার স্পুটনিক-1 1954 সালে মহাকাশে উৎক্ষিপ্ত হয়। এর তিন বছর পূর্বে বেল টেলিফোন কোম্পানীর মার্কিন বিজ্ঞানী ডক্টর জন-আর. পিয়ার্স দুই প্রকার কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে যে সমগ্র বিশ্বে দূরবর্তী অঞ্চলের মধ্যে বার্তার আদান প্রদান করা যেতে পারে, যোগাযোগ স্থাপন করা যেতে পারে, সে বিষয়ে সুনির্দিষ্ট

পথের সন্ধান দেন। এই দুই প্রকার উপগ্রহের মধ্যে একপ্রকার হচ্ছে নিষ্ক্রিয়। পৃথিবী থেকে প্রেরিত বেতার-তরঙ্গসমূহ ঐ সকল উপগ্রহে প্রতিফলিত হয়ে পৃথিবীতে ফিরে আসে।

পৃথিবীর নিরক্ষবৃত্তের 22300 মাইল ঊর্ধ্বে এই সকল উপগ্রহ স্থাপন করা হয়। পৃথিবী 24 ঘণ্টায় নিজের কক্ষে একবার আবর্তন করে। ঐ সকল গ্রহ নিরক্ষবৃত্ত এলাকার উপরে বৃত্তাকার কক্ষে পৃথিবীর সমান গতিতে 24 ঘণ্টায় পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে। এজন্যে পৃথিবী থেকে মনে হয়, ঐ সকল উপগ্রহ যেন মহাকাশে একই স্থানে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

সক্রিয় উপগ্রহে সাজসরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি থাকে। পৃথিবী থেকে প্রেরিত বেতার-তরঙ্গ ঐ সকল যন্ত্র গ্রহণ করে এবং বেতার-তরঙ্গকে আরও শক্তিশালী করে পৃথিবীতে পুনরায় প্রেরণ করে। আর্লি বার্ড, ইকো, সিঙ্কম ইত্যাদি নিষ্ক্রিয় বা প্যাসিভ বার্তাবহ উপগ্রহ। 1960 সালের অগাষ্ট মাসেই বার্তাবহ উপগ্রহ ইকো মহাকাশে প্রেরণ করা হয় এবং ডক্টর পিয়ার্সের বক্তব্য প্রমাণিত হয়।

এর দু-বছর পরে বেল টেলিফোন এবং জাতীয় বিমান ও মহাকাশ সংস্থার উদ্যোগে 1962 সালের জুলাই মাসে টেলস্টার-1 নামে দ্বিতীয় ধরণের বার্তাবহ কৃত্রিম উপগ্রহ মহাকাশে উৎক্ষিপ্ত হয়। এরই সাহায্যে প্রথম টেলিভিশন বার্তা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে ইউরোপে রীলে করা হয় এবং 11ই জুলাই ইংল্যাণ্ড থেকে আমেরিকায় টেলিভিশন বার্তা প্রচারিত হয়। এই সকল উপগ্রহে থাকে রেডিও রিসিভার, ট্র্যান্সমিটার বা বেতারে বার্তা প্রেরণ ও গ্রহণ করবার যন্ত্র এবং বার্তা পুনরায় প্রেরণ করবার, তা পরিবর্ধন ও গ্রহণের অন্যান্য যন্ত্রপাতি। এদের বলা যায় মহাকাশের ক্ষুদ্র বেতার-তরঙ্গের রীলে-কেন্দ্র। ইকো-2 ছাড়া হয় 1964 সালের 25শে জানুয়ারী। এই বেলুন-জাতীয় মার্কিন উপগ্রহটির সুযোগ-সুবিধা প্রথম সোভিয়েট রাশিয়াও গ্রহণ করে।

সক্রিয় বার্তাবহ উপগ্রহ রীলে প্রথম উৎক্ষিপ্ত হয় 1962 সালের 13ই ডিসেম্বর। দূর-দূরান্তের মহাদেশসমূহের মধ্যে এরই মাধ্যমে বার্তার আদান-প্রদান হয়। রিলে-2 উৎক্ষিপ্ত হয় 1964 সালের 21শে জানুয়ারী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাপানের মধ্যে এর সাহায্যে প্রথম বার্তার আদান-প্রদান হয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উদ্যোগের ফলে উপগ্রহের মাধ্যমে বার্তার আদান-প্রদানের উদ্দেশ্যে ইণ্টার-ন্যাশন্যাল টেলিকমিউনিকেশন্স স্যাটেলাইট কনসরটিয়াম—সংক্ষেপে ইনটেলস্যাট নামে সংস্থা গঠিত হয়েছে। আমেরিকাসহ পৃথিবীর 70টি রাষ্ট্র এই সংস্থার সদস্য। এই সংস্থার পক্ষ থেকে ইতিমধ্যে যে সকল বার্তাবহ উপগ্রহ মহাকাশে স্থাপন করা হয়েছে, সেগুলির মাধ্যমে বেতার, টেলিফোন ও টেলিভিশনে পূর্ব এশিয়া, দক্ষিণ আমেরিকা, ইউরোপ এবং আফ্রিকার বহু দেশের সঙ্গে বার্তার আদান-প্রদান সম্ভব হয়েছে।

ইনটেলস্যাট-4 নামে উপগ্রহটি 25শে জানুয়ারী অ্যাটলাসসেণ্টার রকেটের সাহায্যে ফ্লোরিডার কেপ কেনেডী থেকে মহাকাশে উৎক্ষিপ্ত হয়েছে। এই উপগ্রহটির ওজন 1·5 টন। আজ পর্যন্ত যত বার্তাবহ উপগ্রহ মহাকাশে উৎক্ষিপ্ত হয়েছে, সেগুলির মধ্যে এটি বৃহত্তম। এটি অ্যাটলান্টিক মহাসাগরের উপরে পৃথিবীর সমগতিতে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করছে।

1972 সাল পর্যন্ত আরও সাতটি বার্তাবহ উপগ্রহ মহাকাশে উৎক্ষিপ্ত হবে। বর্তমানে ভারত, প্রশান্ত ও অ্যাটলান্টিক মহাসাগরের উপরি-স্থিত মহাকাশে যে সকল বার্তাবহ উপগ্রহ রয়েছে, সেগুলির স্থান ঐ সকল উপগ্রহ গ্রহণ করবে।

ইনটেলস্যাটজাতীয় বার্তাবহ উপগ্রহসমূহ আমেরিকার কমিউনিকেশন্স স্যাটেলাইট কর্পো-

স্টেশন সংক্ষেপে কমস্যাটের সহযোগিতায় নির্মিত হচ্ছে। ইনটেলস্যাট-3 পর্যায়ের প্রথম উপগ্রহটি 1968 সালের সেপ্টেম্বর মাসে উৎক্ষেপণ কালে ধ্বংস হয়ে যায়। 1969 সালে পঞ্চম উপগ্রহটির উৎক্ষেপণও সাফল্যমণ্ডিত হয় নি। ইনটেলস্যাট-3 পর্যায়ের আরও দুটি উপগ্রহ অ্যাটলাণ্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগরের ঊর্ধ্বাকাশে স্থাপন করা হয়েছে। আর ইনটেলস্যাট-3 উপগ্রহটি ভারত মহাসাগরের ঊর্ধ্বাকাশে সরে এসেছে। এটি উৎক্ষিপ্ত হয় 1968 সালে। অ্যাটলাণ্টিক, প্রশান্ত ও ভারত মহাসাগরের উপকূলবর্তী বহু রাষ্ট্র বার্তার আদান-প্রদানে এই সকল উপগ্রহের সুযোগ-সুবিধা লাভ করছে। 1970 সালের জানুয়ারী মাস পর্যন্ত পৃথিবীর 27টি দেশে এই সকল বার্তা গ্রহণের জন্যে 43টি কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে।

হোভার ট্রেলার

সিভিল ইঞ্জিনীয়ার ও তৈলকূপ খননকারীদের অনেক সময় দুর্গম অঞ্চলে এমন সব ভারী ভারী যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ করতে হয় যে, সেগুলি সেখানে নিয়ে যাওয়া এক সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। বৃটিশ বিজ্ঞানীরা এজন্যে এক নতুন ধরণের মালবাহী গাড়ি উদ্ভাবন করেছেন—নাম হোভার ট্রেলার। লরী বা সাধারণ ট্রেলার চলবার পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত জমির উপর দিয়ে নিয়ে যাবার পক্ষে এটি খুবই উপযোগী।

হোভার ক্র্যাফ্‌ট ডাঙা জমি বা সমুদ্রের উপর দিয়ে যাত্রী ও মাল নিয়ে অনায়াসে চলাচল করে। হোভার ট্রেলারও অনেকটা সেই হোভার ক্র্যাফ্‌টের মতই কাজ করে। হোভার ক্র্যাফ্‌ট ও হোভার ট্রেলার উভয়েই জমি বা জলের একটু উপরে থেকে চলাচল করে। এগুলির তলায় থাকে বায়ুপূর্ণ গদী বা এয়ার কুশন। তবে হোভার ক্র্যাফ্‌টের নিজস্ব স্বয়ংচালিত ইঞ্জিন রয়েছে, আর হোভার ট্রেলারকে টেনে নিয়ে যেতে হয় ছোট ট্র্যাক্টর, কখনও বা মানুষের সাহায্যে।

হোভার ট্রেলারগুলি তৈরি করেছেন সাদাম্পটনের (দক্ষিণ ইংল্যাণ্ড) এয়ার কুশন ইকুইপমেণ্ট লিমিটেড। এতে থাকে একটি কঠিন ইস্পাতের প্ল্যাটফরম এবং তার চারপাশ থেকে ঝুলে থাকে নাইলনের ঝালর। শক্তিশালী পাখার সাহায্যে জমি ও প্ল্যাটফরমের মধ্যে এমন ভাবে বাতাস ভরা হয় যে, ঝালরগুলি ফুলে ওঠে এবং একটি এয়ার কুশন তৈরি করে। প্ল্যাটফরমটি ঐ এয়ার কুশনের উপর ভাসতে থাকে।

এই ধরণের হোভার ট্রেলার ব্যবহৃত হবে আলাস্কা ও ক্যানাডায় খনিজ তৈল উৎপাদনের কাজে। বছরের অধিকাংশ সময়ই ঐ অঞ্চলের জমি বরফে ঢাকা থাকে, কিন্তু গ্রীষ্মে সেই বরফ গলে সমস্ত অঞ্চলটি জলকাদায় মাখামাখি হয়ে যায় এবং যে কোন ধরণের চক্রযানের পক্ষেই অগম্য হয়ে ওঠে।

কৃষিজমির উপর দিয়ে যখন বৈদ্যুতিক তার নিয়ে যাবার প্রয়োজন হয়, তখনও এই হোভার ট্রেলারগুলি কাজে লাগানো যেতে পারে।

বড় বড় ইস্পাতের স্তম্ভের উপর দিয়ে ভারী ভারী বৈদ্যুতিক তার নিয়ে যাবার দরকার হলে সেগুলিকে যদি হোভার ট্রেলারে চাপিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়, তবে কৃষিক্ষেত্রের খুব অল্পই ক্ষতি হয়। কেন না, এগুলিকে টেনে নিয়ে যায় ট্র্যাক্টর, যা কৃষিক্ষেত্রের উপযোগী করেই তৈরি করা হয়।

এই একই কারণে মাটিতে বসে যাবার সম্ভাবনাও কম থাকে।

হোতার ট্রেলারগুলি কৃষকেরা নিজেদের কাজেও ব্যবহার করতে পারেন। এমার কুশন ইকুইপমেন্ট লিমিটেডের ধারণা এগুলি গ্রীষ্মপ্রধান দেশে শস্যবহনের কাজের পক্ষে বেশ উপযোগী হবে।

মরুভূমিতে খাদ্যোৎপাদন

পৃথিবীর সাতটি সমুদ্রের জলে পাঁচ হাজার কোটি টন লবণ রয়েছে, অর্থাৎ প্রতি 100 পাউণ্ডে আছে 3·3 পাউণ্ড। এই লবণ সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিলে পৃথিবীর বর্তমান স্তর আরও 500 ফুট উঁচু হয়ে পড়বে।

এই বিপুল পরিমাণ লবণের জন্যে সমুদ্রের জলকে কি পানীয়, কি চাষ-আবাদ বা অন্য কোন কাজে লাগানো যায় নি।

মানুষ আবহমানকাল সমুদ্রের জল থেকে লবণ সংগ্রহ করেছে। কিন্তু সমুদ্রের লবণাক্ত জলকে লবণমুক্ত করে সেই জলের সাহায্যে সমুদ্রোপকূলবর্তী লক্ষ লক্ষ মাইল জুড়ে যে মরুভূমি ও বন্ধ্যা ভূমি রয়েছে, তাতে ফসল ফলানো বা চাষ-আবাদের উদ্যোগ এর আগে আর হয় নি। তবে যান্ত্রিক উপায়ে মৃত্তিকাগর্ভ থেকেজল সংগ্রহ করে অথবা নিকটবর্তী অঞ্চলের কোন নদী থেকে খাল কেটে এনে সেই জলের সাহায্যে বন্ধ্যা ও মরুভূমি অঞ্চলে ফসল ফলানোর উদ্যোগ এর আগেও হয়েছে, এখনও হচ্ছে।

পৃথিবীর সমুদ্রোপকূলের 20,000 মাইল স্থান জুড়ে রয়েছে মরুভূমি। সমুদ্রের জল থেকে বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদন করে এবং সেই শক্তির সাহায্যে লবণাক্ত জলকে লবণমুক্ত করে মরুভূমি ও বন্ধ্যা অঞ্চলে ফসল ফলানোর পরিকল্পনা রকফেলার ফাউণ্ডেশনের উদ্যোগে আমেরিকা গ্রহণ করেছে।

অতি অল্প খরচে লবণাক্ত জলকে লবণমুক্ত করবার পদ্ধতি উদ্ভাবিত হলে এই জলের সাহায্যে উৎপন্ন ফসল পৃথিবীর খাদ্যাভাব মেটাতে অনেকখানি সহায়ক হতে পারে বলেই বিজ্ঞানীদের ধারণা। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের 700 কারখানায় ইতিমধ্যেই 25 কোটি টন লবণমুক্ত জল উৎপন্ন হচ্ছে। চাষ-আবাদের জন্যে মরুভূমি অঞ্চলে যে পরিমাণ জলের প্রয়োজন, এ তার বিন্দু মাত্র। তবে এই মূল্যবান জলের অতি সামান্য অংশ নিয়ে কৃত্রিম উপায়ে বন্ধ্যা ও মরুভূমি অঞ্চলে ফসল ফলানো যায় কি না, সে বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা হচ্ছে। আমেরিকার এনভিরনমেণ্টাল রিসার্চ লেবরেটরী অব দি ইউনির্ভাসিটি অব অ্যারিজোনার ইনষ্টিটিউট অব অ্যাটমস্ফেরিক ফিজিক্স এই পরীক্ষামূলক পরিকল্পনা তৈরি করেছেন।

অ্যারিজোনা বিশ্ববিদ্যালয়ে এবিষয়ে প্রাথমিক গবেষণা ও তথ্যানুসন্ধানের পর ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের এনভিরনমেণ্টাল রিসার্চ লেবরেটরী এবং মেক্সিকোর সোনোরা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে সোনোরা রাজ্যে ক্যালিফোর্ণিয়া উপসাগরের পশ্চিম উপকূলস্থিত পুয়ের্তো পেনাসকোতে একটি গবেষণাগার নির্মিত হয়েছে। এছাড়া বন্ধ্যা ভূমিতে ফসল ফলানোর সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে মধ্যপ্রাচ্যে আরব সাগরের তীরবর্তী আবুধাবিতেও আর একটি পরীক্ষামূলক গবেষণাগার তৈরি হচ্ছে।

অ্যারিজোনা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা এই প্রসঙ্গে বলেছেন যে, অল্প খরচে লবণমুক্ত জল উৎপাদনের পদ্ধতি এখনও উদ্ভাবিত হয় নি। একজন্যে অদূর ভবিষ্যতেও এই জলের সাহায্যে প্রচলিত পদ্ধতিতে কম খরচে চাষ করা সম্ভব হবে না। তাঁরা অতি অল্প পরিমাণ লবণমুক্ত

জলের সাহায্যে চাষ করবার ও ফল উৎপাদনের এক বিকল্প পদ্ধতির সন্ধান দিয়েছেন।

এই পদ্ধতিতে সমুদ্র তীরবর্তী বন্ধ্যা ভূমি ও মরু অঞ্চলে শাকসব্জি ও শস্য উৎপাদনের উপযোগী ভবন নির্মিত হয়। প্লাষ্টিকের নির্মিত এই সকল ভবনে বা গ্রীন হাউসে উপযুক্ত পরিমাণ আলো বাতাসের অভাব যাতে না হয় তারও ব্যবস্থা থাকে। ডিজেল ইঞ্জিনে উৎপন্ন বিদ্যুৎ-শক্তির সাহায্যে সমুদ্রের জলকে লবণমুক্ত করবার পর সেই জল একটি নলের সাহায্যে এই ঘরে সরবরাহ করা হয়। এই পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ-শক্তির সাহায্যে লবণাক্ত জলকে উত্তপ্ত করা হয় এবং ঐ জলের দশ ভাগ লবণমুক্ত জলে পরিণত হয়। বাকী 90 ভাগ পুনরায় সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হয় অথবা গ্রীন হাউসকে উত্তপ্ত রাখবার জন্যে সেখানে প্রেরণ করা হয়।

মরুভূমিতে কোন উদ্ভিদের বৃদ্ধির সময়ে তার শ্বাস-প্রশ্বাস নেবার ক্ষুদ্র ছিদ্রসমূহ উন্মুক্ত থাকে বলে তার যা ওজন তার এক-শ' গুণ জল সেচন করতে হয়। এই জলের বেশ কিছুটা বাষ্প হয়ে উবে যায়। তবে এই জল বাষ্পীভূত হয়ে উদ্ভিদের দেহকে ঠাণ্ডা রাখে। এছাড়া উদ্ভিদের শারীরক্রিয়ায় এর ভূমিকা খুব বড় রকমের কিছু নয় বলে শারীর-বিজ্ঞানীদের ধারণা। সুতরাং কোন বদ্ধ ঘরে বা কোন প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদের দেহকে ঠাণ্ডা রাখবার ব্যবস্থা করতে পারলে লবণমুক্ত জল সরবরাহের পরিমাণ প্রভূত পরিমাণে হ্রাস করা যেতে পারে।

এই সকল তথ্যের ভিত্তিতেই বিজ্ঞানীরা মরুভূমি অঞ্চলে গ্রীন হাউসের বদ্ধ পরিবেশে উদ্ভিদ জন্মানোর উদ্যোগ করেন। এই সকল বিশাল ভবনের অভ্যন্তরস্থ বাতাসের সঙ্গে বাইরের বাতাসের কোন সংযোগ নেই। কিন্তু সেখানে সর্বদাই সমুদ্রের জল সিক্তনের ও বাতাস সরবরাহের ব্যবস্থা রয়েছে। ফলে এর দ্বারা দুটি উদ্দেশ্য সাধিত হয়ে থাকে। প্রথমতঃ সময় ও ঋতু অনুযায়ী এই সিক্তি জল গ্রীন হাউসের বাতাসকে উত্তপ্ত বা ঠাণ্ডা রাখে। এছাড়া ঐ ঘরের বাতাসের জলীয় অংশও এর ফলে বৃদ্ধি পায় এবং স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়া গাছপালা বৃদ্ধির পক্ষে সহায়ক হয়ে থাকে। উদ্ভিদের পত্রপল্লব কিছুটা জল আত্মসাৎ করে। এজন্যে সাধারণতঃ যে পরিমাণ জল সেচন করতে হয়, এই প্রক্রিয়ায় সেই পরিমাণে জল প্রয়োগের আদৌ প্রয়োজন হয় না।

বর্তমানে পুয়ের্তো পেনাসকোতে পলিথিলিন ফিল্মের তৈরি চারটি গ্রীন হাউস রয়েছে—এগুলির পরমায়ু 12 থেকে 14 মাস। পলিথিলিন আচ্ছাদনের মস্ত সুবিধা এই যে, যখন খুশী যে কোন ব্যক্তি এই সকল বদ্‌লাতে পারেন, তার জন্যে দক্ষ শ্রমিকের কোন প্রয়োজন হয় না। এই সকল গাছপালা জন্মানোর ঘর দৈর্ঘ্যে 100 ফুট এবং প্রস্থে 12 ফুট। প্রত্যেকটি গ্রীন হাউসে চাষের জন্যে থাকবে 4600 বর্গফুট স্থান।

সমুদ্রের তীরেও প্রত্যক্ষভাবে শস্য রোপণ করা হয় এবং তাদের উপর সমুদ্রের লবণমুক্ত জল সেচন করা হয়ে থাকে। শস্যবৃদ্ধির সহায়ক উপকরণসমূহ মিশিয়েই ঐ জল ঐ সকল শস্যে প্রয়োগ করা হয়। সেখানে কোন রকম আগাছা জন্মে না বলে উদ্ভিদের রোগের সমস্যাও সেখানে নেই। মরুভূমিতে গাছপালা জন্মানোর ঘরে টোম্যাটো, শশা, লেবু, লেটুস প্রভৃতি আঠারো রকমের তরিতরকারী উৎপন্ন হয়েছে। গুণাগুণের দিক থেকে এগুলি অতি উৎকৃষ্ট ধরণের।

গ্রীন হাউসের ভিতরের আবহাওয়ার সঙ্গে বাইরের আবহাওয়ার কোন সংযোগ থাকে না। সেখানকার স্যাঁতসেঁতে পরিবেশ বজায় রাখবার উদ্দেশ্যে গাছপালার আলোক-সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া চালু রাখবার জন্যে কার্বন ডাই-অক্সাইড সরবরাহ করতে হয়।

বর্তমানে পুষ্টিকর তরকারী উৎপাদনের উপরেই অধিকতর গুরুত্ব অর্পণ করা হয়েছে। তবে আর্থিক সামর্থ্যানুযায়ী অন্যান্য বিষয়ে—এমন কি, ধান উৎপাদন নিয়েও পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হচ্ছে। এই পদ্ধতিতে পুষ্টিকর খাদ্যসমৃদ্ধ তরিতরকারী পৃথিবীর বহু অঞ্চলেই উৎপাদন করা যেতে পারে।

সমুদ্র ও আবহাওয়া দূষিত হবার সমস্যা

প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ টন ধূলিকণা, জঞ্জাল, নানাবিধ রাসায়নিক দ্রব্য অবশেষে সমুদ্রে গিয়েই জমা হচ্ছে। বৃষ্টির ধারা নদীনালার সাহায্যে এসব আবর্জনা সমুদ্রে নিয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া কল-কারখানার পুঞ্জীভূত আবর্জনাও মানুষ সমুদ্রেই ঢালছে। ফলে সমুদ্রের পরিবর্তন ঘটছে। কালক্রমে হয়তো এমন দিন আসবে, যখন সমুদ্রে কোন প্রকার প্রাণীরই আর বেঁচে থাকা সম্ভব হবে না।

বাতাস সম্পর্কেও মানুষ একই রকম বিচার-বিবেকহীন বেপোরোয়া মনোভাবের পরিচয় দিচ্ছে। পৃথিবীর এই আকৃতির তুলনায় যতটুকু বাতাস তাকে ঘিরে রয়েছে, তুলনামূলক ভাবে তা আপেলের খোসার মতই পাতলা, তার চেয়ে ভারী নয়। বাতাস এই পরিমাণে দূষিত হচ্ছে যে, তা আশঙ্কার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। একে যদি রোধ করা না যায়, তবে অদূর ভবিষ্যতেই শ্বাস-প্রশ্বাস রুদ্ধ হয়ে পৃথিবীর যাবতীয় প্রাণীর মৃত্যু ঘটতে পারে।

কোন কোন বিজ্ঞানীর ধারণা, মানুষ নিজে যে পরিবেশ সৃষ্টি করছে, তার মধ্যে খুব বেশী দিন তার পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব হবে না। অনেকে অবশ্য এরকম নিরাশাবাদী নন। কিন্তু আবহাওয়া দূষিতকরণ, প্রাকৃতিক সম্পদের অপচয় এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধি বর্তমান হারে চলতে থাকলে প্রাণীদের বাঁচিয়ে রাখবার যে ব্যবস্থা পৃথিবীতে রয়েছে, সেই ব্যবস্থার উপর প্রতিক্রিয়া যে খুবই ক্ষতিকর হবে—এই কথা তাঁরাও স্বীকার করেন।

কেবলমাত্র ভাসাভাসাভাবে বাইরের দিক থেকে এই বিষয়টি বিবেচনা করে দেখলে মনে হবে, যেন অর্থনৈতিক উন্নতিসাধন এবং সুস্থ হয়ে বেঁচে থাকবার মধ্যে একটা বিরোধ আছে। অন্য কথায়, হয় বৈজ্ঞানিক উন্নতির সুফল নতুবা মালিন্যমুক্ত স্বচ্ছ পরিবেশ—এই দুটির মধ্যে একটিকে বেছে নিতে হবে। প্রকৃত বিষয়টি তা নয়, একটিকে পেতে হলেই যে আমাদের আর একটিকে ছাড়তে হবে এমন কোন কথা নেই।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র দশ বছরের মধ্যে আবহাওয়াকে কলুষমুক্ত রাখবার জন্যে 1970 সালের 1লা জানুয়ারীতেই সরকারীভাবে প্রথম ব্যবস্থা অবলম্বন করে এবং ন্যাশন্যাল এনভিরনমেন্ট্যাল অ্যাক্ট নামে আইনটি চালু হয়। যে অবস্থায় মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে সামঞ্জস্যপূর্ণ সম্পর্কে বজায় রাখা এবং বর্তমানে ও ভবিষ্যতে মানুষের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও অন্যান্য প্রয়োজন মেটানো সম্ভব, সেই অবস্থা সৃষ্টি এবং তা বজায় রাখবার জন্যে সকল রকম কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রতিশ্রুতি এই আইন অনুযায়ী গ্রহণ করা হয়েছে।

জলবায়ু দূষিত হবার ফলে জলে ও স্থলে সকল প্রাণীরই জীবন বিপন্ন হয়ে পড়ছে। এই সকল বিপদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও প্রাণীসমূহকে রক্ষা করবার উদ্দেশ্যে উদ্যোগী হবার জন্যে পৃথিবীর সকল দেশকেই মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র থেকে অনুরোধ জানানো হয়েছে। এছাড়া সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রসমূহকে ন্যাশন্যাল পার্ক নির্মাণ এবং বন্য প্রাণী সংরক্ষণের স্থান গড়ে তোলবার জন্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে কারিগরী সাহায্য দেবারও প্রস্তাব করা হয়েছে।

গবেষণাগারে অতীন্দ্রিয়-বোধের পরীক্ষা

গোপাল রায়*

বৃহদারণ্যক উপনিষদের মতে, মন হলো বোধসৃষ্টির যন্ত্র (Organ of preception)। ছান্দোগ্য উপনিষদে একটা তুলনার সাহায্যে বলা হয়েছে, দুটি আমলকি হাতে নিয়ে মুঠো করলে মুষ্টিবদ্ধ হাত যেমন তা অনুভব করে, মন তেমনি বাক্‌ ও নাম অনুভব করে—এই দুটিকে মন ধরে রাখে। কঠোপনিষদও দিয়েছে এক রথের তুলনা। তাতে ইন্দ্রিয়গুলি হলো রথের ঘোড়া, বুদ্ধি তার সারথি, মন হলো সারথির হাতের লাগাম। সহজ কথায় বুদ্ধি মনের সাহায্যে ইন্দ্রিয়গুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে। Spinoza-র মতে, দেহ এবং মন যেন একখানা কাগজের এপিঠ আর ওপিঠ। আসলে দুটি পিঠ মিলেই একখানা কাগজ। বস্তু এবং মন মিলে সৃষ্টি করেছে একটিই প্রবাহ। যাকে ভিতর থেকে মনে হয় চিন্তা আর বাইরে থেকে মনে হয় শারীরিক চলনশীলতা। Henry Bergson-এর মতে, মন এতটা নিষ্ক্রিয় নয়, মনের একটা বস্তু-সম্পর্কশূন্য সৃজনশীল সক্রিয়তা আছে। Herbert Spencer মনের উৎপত্তি দেখাতে গিয়ে যে ক্রমবিবর্তনের কাহিনী শুনিয়েছেন, তার সুরু শুধুমাত্র নীহারিকা-পুঞ্জ থেকে এবং এথেকেই কল্পনা, বুদ্ধি, যুক্তিবোধ ও চৈতন্যের সৃষ্টি। গত আড়াই থেকে তিন হাজার বছর ধরে অসংখ্য মনীষীর চেষ্টায় যে জ্ঞানের পাহাড় জমেছে, এখন তার পুরা চাপটা পড়েছে বিংশ শতাব্দীর মস্তিষ্কে। তা সত্ত্বেও যেগুলি সম্পর্কে স্পষ্টই কোন বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব হয় নি, মন তাদের মধ্যে একটি।

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে পর্যবেক্ষণ সুরু করলে প্রথমেই যে সাধারণ সত্যটা আমাদের চোখে পড়ে, তা হলো—মন যা-ই হোক না কেন, সে ইন্দ্রিয়ের কারায় বন্দী।

আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি যেন জানালা, যার মধ্য দিয়ে পারিপার্শ্বিক জগতের খবর আসে। এই জানালাগুলির পরিসর খুবই সীমিত। চোখের ক্ষেত্রে বলা যায়—নিম্ন-কম্পাঙ্কের (যেমন 10^5 cycles প্রতি সেকেণ্ডে) বেতার-তরঙ্গ থেকে সুরু করে উচ্চ-কম্পাঙ্কের (যেমন প্রতি সেকেণ্ডে 10^{22} cycles) গামারশ্মি পর্যন্ত তড়িৎ-চুম্বক তরঙ্গের যে দীর্ঘ কম্পাঙ্ক-পরিসর তার একটি অতি নগণ্য অংশ (0.4×10^{15} c/s থেকে 0.75×10^{15} c/s) আমাদের চোখে আলো বলে মনে হয়। কম্পন বিস্তৃতিরও একটি বিশেষ অংশই কেবল শব্দ বলে কানে ধরা পড়ে। তবুও একথা ঠিক যে, মনকে যদি কিছু জানতে হয়, তবে তাকে এই সঙ্কীর্ণ পরিসরের ফাঁক দিয়েই উঁকি মারতে হবে। এর বাইরে মন নিরুপায়—জানলাভে অক্ষম। আলমারীর মাথা থেকে নীচের দিকে নামছে একটা টিকটিকি। যদি আমার চোখ বন্ধ থাকতো অথবা মাঝখানে দেয়াল তুলে আলমারীটা আড়াল করা হতো, তবে মন জানতেই পারতো না যে, একটা টিকটিকি নামছে। ইন্দ্রিয়ের পরিসর যতই কম হোক, তার মধ্যেই মনের সক্রিয়তা, তার বাইরে নিষ্ক্রিয়তা—মন ইন্দ্রিয়ের কারায় বন্দী।

বিজ্ঞানের যে শাখা এটা অস্বীকার করলো, তার নাম পরামনোবিদ্যা (Para-psychology)। সুতরাং বস্তুমুখ (Objective) জগতের সাহায্য ছাড়াও মন যে জানলাভে সক্ষম, এটা হাতে-

*ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগ, পাঞ্জাব ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ, চণ্ডীগড়।

কলমে প্রমাণ করে দেখবার ভার পড়লো তার উপর। যদিও পরামনোবিদ্যা ও সাইবারনেটিক্স্ (Cybernatics) বিজ্ঞানের শাখাগুলির মধ্যে নবীনতম, তথাপি একথা মনে রাখতে হবে যে, এই দুটি জড়-বিজ্ঞানের পরিণত বয়সের সৃষ্টি। সুতরাং অপেক্ষাকৃত পরিণত মন নিয়েই শাখা দুটির জন্ম।

মথ এবং পিটু-ভাইপার অবলোহিত রশ্মি দেখতে পায়। কম্পন-বীপ্সা প্রতি সেকেণ্ডে 20×10^3 cycles ছাড়িয়ে গেলেও শব্দোত্তর শব্দ বাদুড়েরা শুনতে পায়, Elasmobranch ও Gymnotids-এর বৈদ্যুতিক সংকেত অনুভব করবার ক্ষমতা আছে। এগুলির দিকেই প্রথম পরামনোবিদ্যার নজর পড়েছিল। কিন্তু পরে দেখা গেল, এগুলির কারণ সম্পূর্ণভাবেই শারীরবৃত্তগত।

বিষয়মুখ জগতের সাহায্য ছাড়াও মন জ্ঞান লাভ করতে পারে কিনা, এটা যেমন অনিশ্চিত, তেমনি কোয়ান্টাম উপপাদ্যের মতে, আলোর ফোটন অথবা ইলেকট্রনের গতিবিধিও অনিশ্চিত। এই দুটি অনিশ্চিত পদ্ধতিকে পরস্পরের উপর স্থাপন করে Dr. Helmut Schmidt একটা নতুন পরীক্ষা করেছেন।

মনে করা যাক, আলো এসে পড়ছে এক খানা অর্ধস্বচ্ছ আয়নার উপর, যাতে আপতিত আলোর ঠিক অর্ধেকটা প্রতিফলিত হয় ও বাকী অর্ধেকটা প্রতিসরিত হয়। যে অসংখ্য ফোটনের প্রবাহ আছে আলোক রশ্মির মধ্যে, পরিসংখ্যানগত হিসাবে তার অর্ধেকটা প্রতিফলিত ও অপর অর্ধেকটা প্রতিসরিত হবে। কিন্তু যদি কোন উপায়ে একটি মাত্র ফোটনের গতিবিধি লক্ষ্য করা সম্ভব হতো, তবে সেটি আয়নার উপর এসে পড়লে প্রতিসরিত হবে, না প্রতিফলিত হবে? এটি কোন নিয়ম-নির্দিষ্ট নয়। যেন মনে হয় স্বতন্ত্রভাবে ফোটনগুলি স্বাধীন, কিন্তু দলগতভাবে একটা শৃঙ্খলা মেনে চলছে। যেহেতু ফোটনটি প্রতিফলিতও হতে পারে আবার প্রতিসরিতও হতে পারে, সেহেতু ফোটনটির গতিপথ নিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করলে শতকরা 50 ভাগ মাত্র সত্য হবার সম্ভাবনা। যদি এটা সম্ভব হতো যে, কোন লোক আয়নার সামনে বসে আপতিত আলোর সবগুলি ফোটনের গতিপথ নিয়ে দিনের পর দিন ভবিষ্যদ্বাণী করে গেল, তবে যত দীর্ঘকাল ধরেই সে চেষ্টা করুক না কেন, তার পরিসংখ্যানগত নির্ভুলতার সীমা হবে শতকরা 50 ভাগ। অপর পক্ষে যদি দেখা যায় যে, কোন লোকের ভবিষ্যদ্বাণী পরিসংখ্যানগত নির্ভুলতার সীমা (50%) বার বার ছাড়িয়ে যাচ্ছে, সে ক্ষেত্রে দুটি মন্তব্য সম্ভব—হয় Quantum process সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী সম্ভব অথবা ওই লোকগুলি ভবিষ্যৎ ঘটনা অনুমান করতে পারে, তাদের মন ভবিষ্যৎ সত্যকে বুঝতে পারে বিষয়মুখ জগতের সাহায্য ছাড়াই।

Dr. Schmidt প্রথমে 100 জন সাধারণ মানুষকে নিয়ে পরীক্ষাটি করেন। তাদের সকলেরই পরিসংখ্যানগত নির্ভুলতা হলো অনিশ্চয়তার ফলাফল, কোন রকম ধারাবাহিকতা অথবা বৈশিষ্ট্য তার মধ্যে দেখা গেল না। শেষে তিনি ডাকলেন মিসেস জে. বি., মিষ্টার ও. সি. এবং মিস এস. সি.কে। এঁদের সকলেরই সুনাম আছে বিশেষভাবে আত্মিক ক্ষমতাসম্পন্ন বলে। মিসেস জে. বি. আত্মিক উন্নয়নের শিক্ষিকা, মিষ্টার ও. সি. লরীর ড্রাইভার এবং মিস এস. সি. তার মেয়ে।

পরীক্ষায় Dr. Schmidt ফোটন-প্রবাহের বদলে ব্যবহার করলেন ইলেকট্রন-প্রবাহ, যার উৎস হলো ষ্ট্রনশিয়াম-90-এর তেজস্ক্রিয়তা, পাশে রাখা একটা গাইগার-মুলার কাউণ্টার (Geiger-Mueller counter)। দেখা গেল, তেজস্ক্রিয়তায় গড়ে প্রতি সেকেণ্ডে দশটি ইলেকট্রন আসছে। কোয়ান্টাম উপপাদ্য বলে, এক সেকেণ্ড সময়ের মধ্যে ওই ইলেকট্রনগুলির সঠিক আগমন-মুহূর্ত অনির্দিষ্ট। এই ইলেকট্রন-প্রবাহের পথে রাখা হলো একটা ঘূর্ণায়মান সুইচ, যার সঙ্গে

বৈদ্যুতিক তার দিয়ে যুক্ত আছে দূরের একটি বোর্ডে চারটি রঙীন আলো। সুইচ যে অবস্থানে থামবে, তার উপর নির্ভর করবে—কোন্ আলোটি জ্বলে উঠবে। তেজস্ক্রিয়তার যখনই ইলেকট্রন এসে পড়ে (এই মুহূর্তটি অনির্দিষ্ট) একটি নিখুঁৎ ইলেকট্রনীয় প্রক্রিয়া সুইচটিকে হঠাৎ থামিয়ে দেয় এবং বোর্ডের চারটির মধ্যে একটি আলো জ্বলে ওঠে। ধরা যাক, মিসেস জে. বি. ভাবলেন, এবার 3নং আলোটি জ্বলবে, তিনি তার আগের নম্বর অর্থাৎ দু-নম্বর আলোর সুইচটি টিপে তার সিদ্ধান্ত জানালেন। একটি স্বয়ংক্রিয় গণনাকারী যন্ত্র তার প্রচেষ্টা লিখে রাখলো এবং যদি তার ধারণা ঠিক হয় অর্থাৎ একটু পরে সত্যই 3নং আলোটা জ্বলে ওঠে, তবে সেটাও স্বয়ংক্রিয়ভাবে লেখা হয়ে যাবে। Dr. Schmidt বলেন, সিদ্ধান্ত সত্য হবার সম্ভাবনা বেশী থাকে, যদি পরীক্ষাধীন ব্যক্তিরা হন গভীরভাবে আগ্রহী এবং আশাবাদী। তাদের মানসিক অবস্থার উপর পরীক্ষার ফলাফল নির্ভর করে।

এই পরীক্ষায় যান্ত্রিক পরিকল্পনা এমনভাবে করা হয়েছিল, যাতে প্রতি সেকেণ্ডে দুটি প্রচেষ্টা সম্ভব হয়। পরীক্ষার সময় আত্মিক ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিরা অবশ্য অনেক ধীরে ধীরে কাজ করেছেন। তারা গড়ে প্রতি দুই সেকেণ্ডে একটি করে সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন। প্রথম বার তিন জনকে নিয়ে মোট প্রচেষ্টার সংখ্যা ছিল 63000। পরিসংখ্যানগত নির্ভুলতা ছিল 29·4%। এই উচ্চ মাত্রার নির্ভুলতার হার খুঁজে পাবার সম্ভাবনা পাঁচ শত লক্ষের মধ্যে মাত্র এক। দ্বিতীয়বার প্রচেষ্টার সংখ্যা ছিল 20,000। এর মধ্যে 10,672টি প্রচেষ্টা ছিল উচ্চ মাত্রার নির্ভুলতার হার লক্ষ্য করে। পরিসংখ্যানগত নির্ভুলতা 32·1% এবং এই উচ্চ হার খুঁজে পাবার সম্ভাব্যতা 10^{10}-এর মধ্যে একের চেয়েও কম। Dr. Schmidt উপরের লেখচিত্রে দেখিয়েছেন, প্রচেষ্টার সংখ্যা যত বাড়ানো হয়েছে, পরিসংখ্যানগত নির্ভুলতা ততই 25%-এর উপরে উঠে গেছে (যেহেতু এখানে আলোর সংখ্যা চারটি, সুতরাং পরিসংখ্যানগত নির্ভুলতার সীমা 25%)।

লেখচিত্র

গবেষক Dr. Schmidt মন্তব্য প্রকাশ করেছেন যে, মনের ইন্দ্রিয়াতীত অনুমান শক্তির ফলে এখানে Quantum process সম্পর্কেও ভবিষ্যদ্বাণী সম্ভব হয়েছে। তাঁর এই ধারণা খুবই বিতর্কমূলক, কারণ এটা হাইজেন্‌বার্গের অনিশ্চয়তা-সূত্রের (Uncertainty principle) বিরোধী।

মনের 'ইন্দ্রিয়াতীত বোধ' (Extra-Sensory Perception সংক্ষেপে ESP) বিজ্ঞানের দুরূহ সমস্যাগুলির অন্যতম। কোয়ান্টাম তত্ত্বের সঙ্গে মিলিয়ে Dr. Schmidt-এর পরীক্ষা এই প্রথম আধুনিক পদার্থ-বিজ্ঞানের একটি বড় সত্যের প্রতিবাদ করলো। কোয়ান্টাম তত্ত্বের জন্ম হয়েছিল বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে। তার পর থেকে প্রায় এক শতাব্দীর তিন-চতুর্থাংশ ধরে এই তত্ত্ব বিজ্ঞানের বিভিন্ন অগ্রগতিকে নির্ভুল-ভাবে নিয়ন্ত্রণ করেছে। তথাপি একথা ঠিক, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পরীক্ষালব্ধ বিপরীতমুখী ফলাফল মাত্রেই আশার বস্তু, যা হয় কিন্টারের মত আপাত প্রতীয়মান সত্যের ভিতর থেকে গোপন ত্রুটি নিষ্কাশিত করে অথবা আরও বড় সত্যের আভাস দিয়ে।

নিউট্রন তেজস্করণ বিশ্লেষণ

দেবেন্দ্রবিজয় গুপ্ত

অবশেষে খুনীকে সনাক্ত করলো মাত্র কয়েক-গাছি চুল! অপরাধ-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে চুলের এই চুলচেরা বিচার খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আঙ্গুলের ছাপের মত প্রতিটি মানুষের চুলও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। চুলের নমুনা বিশ্লেষণ করে চুলের মালিককে সনাক্ত করা যায়। আপনারা জানেন, সেন্ট হেলেনায় অন্তরীণ অবস্থায় নেপোলিয়নের মৃত্যু হয়। 1962 সালে তাঁর সে সময়কার কিছু চুলের নমুনা বিশ্লেষণ করা হয়। এতে দেখা যায়, ঐ চুলে আর্সেনিকের পরিমাণ বেশ অস্বাভাবিক। স্বভাবতঃই সন্দেহ করা হলো, তাঁকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয়েছে। কিন্তু অন্তরীণ অবস্থার কয়েক বছর আগের কিছু চুল বিশ্লেষণ করে যখন দেখা গেল আর্সেনিকের পরিমাণ ঠিক আগের মতই, তখন সব সন্দেহের অবসান ঘটলো।

গাঁজা, ভাং, চরস ইত্যাদির কারবার রীতি-মত কলাও করে চলছে। এক জায়গার মাল বিচিত্র কৌশলে চোরাগোপ্তা পথে হাত বদল হয়ে দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ছে। হঠাৎ কিছু নমুনা ধরা পড়ে গেল। এই চোরাই জিনিষের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট ধরা পড়লো, যার ফলে এগুলির ভৌগোলিক অবস্থানের বিষয়ও জানা গেল।

এই যে ঘটনার কথা বলা হলো, তা সবই সম্ভব এবং বাস্তবসম্মত। এর মূলে রয়েছে এক বিশেষ ধরণের বিশ্লেষণ-পদ্ধতি—নিউট্রন তেজস্করণ বিশ্লেষণ (Neutron activation analysis)।

পরমাণুর কেন্দ্রীনের (Nucleus) দুটি মূল উপাদান—প্রোটন ও নিউট্রন কণিকা। প্রোটনের বিদ্যুৎ-আধান ধনাত্মক আর নিউট্রন হলো বিদ্যুৎ-আধান নিরপেক্ষ। দুটির ভরই প্রায় সমান। সাধারণ হাইড্রোজেন ছাড়া আর সব যৌগিক পদার্থের কেন্দ্রীনে আছে নিউট্রন। যেহেতু নিউট্রন হলো আধান-নিরপেক্ষ, সেহেতু

কেন্দ্রীনের বিদ্যুৎ-আধানের দ্বারা প্রতিহত হয় না, কাজেই কেন্দ্রীনে প্রবেশের বাধাও থাকে না। বাইরের নিউট্রন কেন্দ্রীনে অনুপ্রবেশ করলে দুই রকমের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় :

(ক) আগের কেন্দ্রীনটি অন্য মৌলিক পদার্থের কেন্দ্রীনে পরিণত হয়।

(খ) একই মৌলিক পদার্থের ভিন্ন সমস্থানিক অর্থাৎ আইসোটোপে পরিণত হয়।

এই রূপান্তরিত পরমাণু সাধারণতঃ তেজস্ক্রিয়। এথেকে বিশেষ ধরণের তেজস্ক্রিয় বিকিরণ সুরু হয়। এই বিকিরণের বৈশিষ্ট্য ও অর্ধ-জীবনকালের পরিমিতি থেকেই কণিকাগুলিকে সহজে চেনা যায়।

তেজস্করণ বিশ্লেষণ-পদ্ধতির উপযোগিতা তখনই, যখন নূতন উৎপাদিত পদার্থটি হবে তেজস্ক্রিয় এবং তার অর্ধ-জীবনকাল সহজে পরিমাপযোগ্য। তাছাড়া নিউট্রন সংযোজনের পরিসরও যথেষ্ট হওয়া চাই—তা না হলে সেটা সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের কাজের উপযোগী নির্দিষ্ট মানে পৌঁছুবে না।

পারমাণবিক চুল্লী বা রিয়্যাক্টরের তাপ-নিউট্রনের সাহায্যে তেজস্করণের কাজ চালানো যেতে পারে। হাল্কা পদার্থের ক্ষেত্রে (যাদের পারমাণবিক ওজন 26 বা কম) হিলিয়াম-3 যথেষ্ট উপযোগী। পোলোনিয়াম-বেরিলিয়ামঘটিত প্রতিক্রিয়ার ফলেই পরীক্ষাগারে প্রথম নিউট্রন-উৎসের সৃষ্টি করা হয়। কোন কোন পদার্থের কেন্দ্রীনের উপর প্রোটন, ডয়টেরন বা আল্‌ফা কণিকার আঘাতের ফলেও নিউট্রনের সৃষ্টি হয়। তাছাড়া উচ্চ শক্তিসম্পন্ন গামা-বিকিরণও একাজে লাগে।

বেরিলিয়াম + আল্‌ফা কণিকা—→নিউট্রন + অঙ্গার

$$C^{9} + {}_2He^4 \qquad {}_0n^1 + {}_6C^{12}$$

বেরিলিয়াম + গামা রশ্মি—→নিউট্রন + বেরিলিয়াম

$${}_4Be^9 + \gamma \qquad {}_0n^1 + {}_4Be^8$$

বেরিলিয়ামের সঙ্গে পোলোনিয়াম-210 (α বিকিরণকারী তেজস্ক্রিয় সমস্থানিক), রেডিয়াম-226 বা অ্যাণ্টিমনি-124 মিশ্রিত করেও নিউট্রন উৎপন্ন করা হয়। এগুলি ভালভাবে চূর্ণ করবার পর মিশ্রিত করে ছোট ছোট গুলি পাকিয়ে সম্পূর্ণ নিশ্ছিদ্র ধাতব আধারে রাখা হয়। বর্তমানে ভাবা পারমাণবিক শক্তি-কেন্দ্রে (BARC) পোলোনিয়াম-210-এর বদলে প্লুটোনিয়াম-239 ব্যবহার করে আরও ভাল ফল পাওয়া যাচ্ছে। কারণ প্লুটোনিয়ামের গামা-বিকিরণ কম। 1300° সেণ্টিগ্রেডে এর যে সঙ্কর ধাতু পাওয়া যায় (বেরিলিয়ামের সঙ্গে), তা অন্যগুলির চেয়ে বেশী স্থায়ী। এথেকে প্রতি সেকেণ্ডে 17 লক্ষ নিউট্রন পাওয়া যায়। 140 লক্ষ ইলেকট্রন ভোল্ট শক্তিসম্পন্ন নিউট্রন উৎপাদকও (Generator) তৈরি হয়েছে।

প্রথমতঃ, অন্যান্য গতানুগতিক বিশ্লেষণ-পদ্ধতির চেয়ে এই তেজস্করণ বিশ্লেষণের সুযোগ-সুবিধা অনেক বেশী। এতে পরীক্ষিত বস্তুটির কোন ক্ষয় বা ধ্বংস হয় না—আলাদাভাবে নমুনা সংগ্রহের প্রয়োজন নেই। দ্বিতীয়তঃ, এটা এতই সংবেদনশীল এবং এর দ্বারা পরিমাণঘটিত বিশ্লেষণ এতই সূক্ষ্মভাবে করা যায় যে, তা রীতিমত বিস্ময়কর। বিশ্লেষণ-পদ্ধতিও কম সময়সাপেক্ষ। অবশ্য বিশ্লেষণের সূক্ষ্মতা নির্ভর করে নিউট্রন-উৎস ও তেজস্করণের পরিমাণ এবং আঘাতকারী কণিকাগুলির ঘনত্বের উপর। সাধারণভাবে সূক্ষ্মতার পরিমাণ হলো 10^{-6} থেকে 10^{-9} গ্র্যাম। প্রয়োজন হলে আরও বাড়িয়ে 10^{-12} গ্র্যাম পর্যন্তও করা যায়।

আগেই এই পদ্ধতির উপযোগিতার কথা দুটি

দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা হয়েছে। এর একটা বিশেষ উপযোগিতা হলো, পদার্থের বিশুদ্ধতা নির্ণয়। কতকগুলি বস্তুর ক্ষেত্রে, যেমন—রিয়্যাক্টর তৈরির জিনিষপত্র, নিয়ন্ত্রক (Moderator), ট্রানজিষ্টর ইত্যাদির বিশুদ্ধতার বিশেষ উচ্চ মানের উপর জোর দেওয়া হয়। সে ক্ষেত্রে অবাঞ্ছিত খাদের সূক্ষ্ম মাত্রা নির্ধারণের জন্যে এবং ঐ সকল বিশেষ কাজে ব্যবহার করা যায় কিনা, তা জানবার জন্যেও এই বিশ্লেষণের প্রয়োজন।

কয়েক ধরণের মৌলিক পদার্থের সূক্ষ্মাভাস (দশ লক্ষ ভাগের কয়েক ভাগ মাত্র) উদ্ভিদ ও প্রাণী-জগতের পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ; যেমন—দস্তা, তামা, ম্যাঙ্গানিজ, কোবাল্ট ইত্যাদি। বিশেষ বিশেষ কয়েক ধরণের রোগ বা শারীরিক বৈশিষ্ট্য যে বিশেষ কয়েকটি ধাতুর সূক্ষ্ম উপস্থিতির ফলেই সম্ভব, তা জানা যায় এই ধরণের বিশ্লেষণে। হয়তো দেখা যাচ্ছে, কোন এক বিশেষ লোকালয়ের অধিকাংশেরই দাঁত ক্ষয়ে যাবার প্রবণতা আছে। দুধ, মাটি, জল প্রভৃতি পরীক্ষা করে বিশেষ কোন বৈলক্ষণ্য ধরা পড়লো না, কিন্তু তেজস্ক্রিয়ণ বিশ্লেষণ-পদ্ধতিতে সেটা জানা যাবে। হয়তো দেখা যাবে, সূক্ষ্ম মাত্রায় হলেও মলিবডিনাম, টাইটেনিয়াম ইত্যাদির উপস্থিতির বেশ কিছুটা হেরফের হয়েছে।

ভূ-পদার্থ ও ভূ-রসায়নেও (Geo-physics & Geo-chemistry) এর উপযোগিতা যথেষ্ট। বালি, পাথর, মাটি ইত্যাদি বিশ্লেষণ করে যে সব মৌলাভাস (Trace elements) ধরা পড়ে, তাদের পরিমাণের তারতম্য বিচার-বিশ্লেষণ করে ঐ সব বস্তুর উৎপত্তি সম্বন্ধে অনেক কিছু জানা যায়। বিভিন্ন স্থানে অথবা বিভিন্ন খনিজ পদার্থে বিভিন্ন আইসোটোপের উপস্থিতির তারতম্যের ভিত্তিতে ভূতাত্ত্বিক নিদর্শনের বয়স জানা যায়।

দুষ্প্রাপ্য পুরাকীর্তির নিদর্শন যথাযথ অবিকৃত রেখেও প্রতিটি উপাদানের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করা যায়। পদার্থের বিভিন্ন মৌলাভাসের বিন্যাসের তারতম্য থেকে সেগুলি কোন্ কোন্ বিশেষ অঞ্চলের, তাও জানা যায়। অসাধু পুরাকীর্তি ব্যবসায়ীরা আসল বলে নকল মাল বিক্রয় করে বেশ দু-পয়সা আয় করে। চর্মচক্ষে এই তফাৎ ধরা না গেলেও তেজস্করণ বিশ্লেষণে তা সহজেই ধরা পড়বে।

তেজস্করণ বিশ্লেষণের এই যে সামান্য পরিচয় দেওয়া হলো, এতেই এর অসামান্যতার পরিচয় পাওয়া যাবে। এর ব্যবহার আরও ব্যাপক ও বিচিত্র। ব্যবহারিক জীবনে এর উপযোগিতা অনস্বীকার্য।

হয়েল-নারলিকার অভিকর্ষ-তত্ত্ব

অঞ্জন ভট্টাচার্য

অভিকর্ষ বলকে আইনষ্টাইনের আপেক্ষিকতা তত্ত্ব দিয়ে যেভাবে ব্যাখ্যা করা যায়, তার সংস্কার করেন হয়েল ও নারলিকার 1964 সালের জুনের দিকে। যে কোন মাধ্যমেই অভিকর্ষ থাকুক না কেন, এই বল মাধ্যমের সমস্ত পদার্থকেই সমান প্রভাবিত করে। কোন পদার্থের শূন্যে অবস্থান কি, তা জানতে গেলে তিনটি অঙ্কের দরকার। যদি কোন নির্দিষ্ট সময়ের অবস্থান জানতে হয়, তাহলে আরও একটা অঙ্ক জরুরী। আইনষ্টাইন বক্র চতুর্অক্ষীয় শূন্য সময়ের যে অচ্ছেদ (Curved four-dimensional space-time continuum), তার এক গুণ হিসেবে অভিকর্ষের ব্যাখ্যা করেন। এই নিয়মটি বের করতে গিয়ে আপেক্ষিকতা তত্ত্বের প্রধান প্রতিপাদ্য—বস্তু ও শক্তির সমতা এবং চতুর্অক্ষীয় রিম্যানিয়ান জ্যামিতি কাজে লাগানো হয়। কিন্তু এর কয়েকটা দোষ রয়েছে—

(ক) এই তত্ত্ব অনুযায়ী অভিকর্ষের উৎস হিসেবে কোন বস্তু আদপে না থাকলেও অভিকর্ষ থাকবে, যেটা ঠিক মেনে নেওয়া যায় না।

(খ) সময়-অঙ্কের আসল অবস্থান ব্যাখ্যা করা যায় না, যদিও শূন্য সময়ের যে অচ্ছেদ কল্পনা করা হয়েছে, তাতে সময় ও শূন্য দুই-ই খুব সদৃশ বলে মনে হয়।

(গ) নিউটনের মত আইনষ্টাইনও বিশ্বাস করতেন যে, সৌরমণ্ডলের অভিকর্ষীয় পদার্থের জন্যেই কোন বস্তুর ভর বা ভার হয়। কিন্তু ফুকোর পেণ্ডুলাম দিয়েই হোক বা সুদূর নীহারিকার সাপেক্ষেই হোক, অক্ষের চারদিকে পৃথিবীর ঘূর্ণনবেগ যদি বের করা যায়, তবে দুটি পদ্ধতিতেই এক মান পাওয়া যায়। Mach প্রায় এক শতাব্দী আগে এই প্রসঙ্গে বলেছেন যে, কোন একটা কণিকার ভর ব্রহ্মাণ্ডের অন্য সব কণিকার সঙ্গে সম্পর্ক রাখে। তার অর্থ এই যে, জাড্যতা (inertia) কোন বস্তুবিশেষের গুণ নয় বরং অন্যান্য বস্তুর গুণের যোগেই তার ধারণা করা যায়।

আইনষ্টাইন-তত্ত্বের এই দোষগুলি দূর করতে গিয়ে Mach-এর ধারণা কাজে লাগানো হয়েছে, যাতে সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্ব ব্রহ্মাণ্ডের তাবৎ দৃশ্য নিয়মগুলির সঙ্গে একটা সামঞ্জস্য রাখতে পারে। হয়েল-নারলিকারের মতে, অভিকর্ষের ব্যাখ্যায় ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত গ্রহ, তারার অবস্থান, ক্ষেত্র (Field) ইত্যাদি একটা ভূমিকা রাখে। ব্রহ্মাণ্ডে যত তারা রয়েছে, আজকে যদি ঠিক তার অর্ধেক থাকতো, তাহলে পৃথিবীর যে কোন জিনিষের ভার হয়ে যেত দুই গুণ আর সূর্য হাজারো গুণ বেশী আলো ছড়াতো।

হয়েল-নারলিকার সমীকরণগুলিতে কোন বস্তুর ভরের সঙ্গে ব্রহ্মাণ্ডের সম্পূর্ণ ভরের কি যোগ, ব্রহ্মাণ্ডের প্রসরণের হারের সঙ্গে বস্তুর ঘনত্বের কি সম্পর্ক, তা জানা যায়। আইনষ্টাইনের এই-জাতীয় সমীকরণগুলির সঙ্গে এদের তফাৎ অল্পই এবং সিদ্ধান্ত আসে একই। তবে হয়েল-নারলিকার সমীকরণের কোন পদ যে ভাবে খুসী বেছে নেওয়া হয় নি।

প্রসরণশীল ব্রহ্মাণ্ড একটা সাম্য অবস্থায় (Steady state) থাকতে পারে তখনই, যখন পদার্থের সৃষ্টি হয় ক্রমান্বয়ে। নীহারিকা থেকে বেরুনো আলোর লাল-বিচ্যুতি (Red-shift) দেখে মনে হয় যে, নীহারিকাগুলি

আস্তে আস্তে দূরে সরে যাচ্ছে। ব্রহ্মাণ্ডটাকে তাই একটা রবারের বেলুনের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। নীহারিকাগুলি যেন তার উপরে মাখানো কালির ছোপ। বেলুনটাকে যত ফোলানো যাবে, কালির ছোপগুলি তত বড় আর অস্পষ্ট হয়ে উঠবে। আইনষ্টাইন, এডিংটন, ফ্রিড্ম্যান প্রমুখেরা Big Bang তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন অর্থাৎ তাঁদের ধারণা অনুযায়ী এই প্রসরণশীল ব্রহ্মাণ্ড একটা মূল পরমাণুর (Primeval atom) বিস্ফোরণের ফলে তৈরি হয়েছে। সেই আদি বিস্ফোরণ যবে হয়েছে, তার বয়স বেরিয়েছে 5 থেকে 10 হাজার লক্ষ বছর।

জ্যোতির্পদার্থ-বিজ্ঞানীদের মতে, আমাদের সৌরমণ্ডলী যে নীহারিকার সদস্য, তার বয়স 10 থেকে 15 হাজার লক্ষ বছর। আমাদের নীহারিকার চেয়েও বেশী পুরনো নীহারিকার অস্তিত্ব আশা করা হয়েছে। এখন ব্রহ্মাণ্ডের বয়স যেহেতু তার এক ভগ্নাংশ নীহারিকার চেয়ে কম হতে পারে না, সেহেতু আমরা বলতে পারি, বয়স গোণা ভুল হয়েছে অথবা অভিকর্ষের ব্যাপারে তাবৎ ব্রহ্মাণ্ডের যে ভূমিকা রয়েছে, সেই তত্ত্বটাই ভুল। দ্বিতীয়তঃ কিছু জ্যোতির্বিজ্ঞানী মনে করেন যে, খালি একটা মূল বিন্দু থেকে সব এসেছে, এই ধারণা পদার্থ-বিজ্ঞানের যাবতীয় ধারণাকে ভেঙ্গে দেয়—কারণ তাহলে শূন্ত-সময়ে কোনও কিছুর অস্তিত্ব থাকে না।

এই অসুবিধা দূর করবার জন্তে হয়েল-নারলিকার তাঁদের 'সাম্যাবস্থা তত্ত্বে' ব্রহ্মাণ্ডকে সামগ্রিকভাবে সময়ের সাপেক্ষে এক অচল (Invariant) বলে বর্ণনা করেন। তাহলে ব্রহ্মাণ্ডের বয়স বের করবার দরকারই পড়ে না। তাছাড়া ব্রহ্মাণ্ডের সম্প্রসারণ সত্ত্বেও যদি সাম্যাবস্থা বজায় রাখতে হয়, তবে পদার্থের ক্রমান্বয়ে সৃষ্টিকে স্বীকার করতেই হবে। কারণ সম্প্রসারণের ফলে ঘনত্বের যে হ্রাস হবে, তাকে সাম্যে আনা প্রয়োজন। এই কারণেই কোন পুরনো নীহারিকা বিলীন হয়ে গেলে নতুন নীহারিকার উদ্ভব হওয়া উচিত।

পদার্থ-বিজ্ঞানের যে দুটি প্রাথমিক নিয়ম রয়েছে, যেমন—বস্তু ও শক্তি অবিনাশী, তা পদার্থের ক্রমান্বয়ে সৃষ্টির তত্ত্বকে অস্বীকার করে না। যদি সৃষ্টির হার দিয়ে সম্প্রসারণের হারকে সাম্যে আনতে হয়, তাহলে একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা যায় যে, এক লিটার H_2 গ্যাস এক লক্ষ বছরে যে হারে প্রসারিত হবে, তাতে ঐ সময়ে একটা নতুন H – atom-এর সৃষ্টি হওয়া দরকার (কোন প্রায়োগিক মাপকাঠিতে এর যৌক্তিকতা বিচার করতে যাওয়া অসম্ভব)। আবার সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্ব দিয়েও পদার্থের ক্রমান্বয়ে সৃষ্টির একটা গাণিতিক সূত্র দেওয়া সম্ভব [বস্তুর উৎপত্তি হিসাবে এখানে একটা শক্তির ক্ষেত্রকে (Field) ধারণা করা হয়]।

পৃথিবীর উপর দূরের নীহারিকাগুলির টান এত ক্ষীণ যে, প্রায়োগিক উপায়ে তাদের যাচাই করবার উপায় নেই; কিন্তু হয়েল-নারলিকার তত্ত্ব দৃষ্ট ঘটনাগুলির ব্যাখ্যা করবার (যতদূর সম্ভব) সামর্থ্য রাখে। কয়েকটা কোয়াসারের (Quasars) অস্তিত্ব, নীহারিকা থেকে বেরুনো শক্তিশালী বেতার তরঙ্গের অস্তিত্ব (সব নীহারিকা থেকে এই তরঙ্গ বেরোয় না) প্রভৃতি সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ হওয়া গেছে। বেতার-তরঙ্গের উৎস যে সব নীহারিকা, তাদের আগেকার ইতিহাস (কারণ সঙ্কেতগুলি পৃথিবীতে আসতে সময় নেয় প্রচুর) পাওয়া যায় তরঙ্গগুলি বিশ্লেষণ করে। এখন সাম্যাবস্থা তত্ত্ব অনুযায়ী ব্রহ্মাণ্ডের অবস্থা আগে যা ছিল, এখনও তাই থাকা উচিত (Time invariant)।

কেম্ব্রিজের জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা প্রাথমিক সমীক্ষায় দেখেছেন যে, পৃথিবীর বাইরে থেকে আসা তরঙ্গের সাংখ্যিক ঘনত্ব আগের তুলনায় অনেক কমে এসেছে। কিন্তু এর বিপক্ষে যুক্তি খাড়া

করা যায় এইভাবে যে, বেতার-উৎসগুলি আয়তনে বিশাল বলে গড় নির্ণয় অতখানি সঠিক নাও হতে পারে। তাছাড়া উৎসগুলির আসল দূরত্ব কি, তা জানা প্রয়োজন। কিন্তু বেরুনো আলোর রশ্মি নিয়ে যে ধরণের পরীক্ষা করে সঠিক দূরত্ব বের করা সম্ভব, বেতার-সংকেত দিয়ে অতটা সম্ভব নয়। আলোর লাল-বিচ্যুতি মেপে দূরত্ব নির্ভুলভাবে বের করা যায়, বেতার-তরঙ্গের ক্ষেত্রে এই ধরণের কোন উপায় আবিষ্কৃত হয় নি। কাজে কাজেই দূরত্ব বের করতে গিয়ে এদের আপাত তীব্রতা বিচার করা হয়। ফলে অপেক্ষাকৃত কাছের কোন দুর্বল উৎস এবং দূরের কোন শক্তিশালী উৎস সাড়া দেবে একই রকম। আলোর লাল-বিচ্যুতি মাপতে যে প্রক্রিয়ার সাহায্য নেওয়া হয়, আজকাল অবশ্য কোন কোন বিশেষ কম্পাঙ্কের বহিরাগত বেতার-তরঙ্গের উপর সেই প্রক্রিয়া চালানো হয়েছে (মান কিছু কম বেরিয়েছে আগের তুলনায়)। কিন্তু কোন সিদ্ধান্তে আসবার আগে আরও তথ্য জানা দরকার।

হয়েল-নারলিকার তত্ত্বে ব্রহ্মাণ্ডের বয়স ধরা হয়েছে গাণিতিক অর্থেই অসীম, যেটাকে ঠিক মেনে নেওয়া যায় না, কারণ সাম্যাবস্থা তত্ত্বে পদার্থের ক্রমান্বয়ে সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে আবার কোনও বস্তুর সৃষ্টির আগে এক এবং একটি মাত্র প্রাথমিক পরমাণুর কল্পনাও করা হয়েছে। তাহলে সময়ও শূন্যের মতই অসীম এবং দুটাই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের ঘটনাগুলির উপর সমান প্রভাব আনে। তবে সময় ও শূন্যের মধ্যে তফাৎটা এই কারণে যে, সময়ের প্রবাহ অপরিবর্তনীয় ও একটা নির্দিষ্ট দিকের অভিমুখী (অতীত থেকে ভবিষ্যৎ অবধি)। সময়ের প্রবাহ পদার্থ-বিজ্ঞানের কোন নিয়মের (Effect) ফল নয়, কারণ পদার্থ-বিজ্ঞানের নিয়মগুলি অতীতেও যা ছিল, ভবিষ্যতেও তাই থাকবে। ব্রহ্মাণ্ডের সম্প্রসারণও যা অপরিবর্তিত ক্রিয়া (অর্থাৎ যার দিক পরিবর্তন করা যায় না), আইনষ্টাইন-তত্ত্ব দিয়ে বোঝানো যায় না।

প্রাথমিক পরমাণুর সময়ে (যখন সময়=0) যখন কোনও বস্তুর উদ্ভব হয় নি, তখনও অভিকর্ষ বলের অস্তিত্ব ছিল, একথা মানা যায় না। কিন্তু আইনষ্টাইন অবশ্যই এই ধরণের ধারণা পোষণ করেন নি। তিনি কেবল অভিকর্ষীয় বস্তুকে একটা বক্র স্থানীয়ভাবে অনিয়মিত, বিশেষ করে পাহাড় বা ঐ জাতীয় ভারী বস্তুর কাছে, শূন্য সময়ের অচ্ছেদ বলে ব্যাখ্যা করেছেন।

নভশ্চারণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, বস্তুর ভার কমে। কাজেই অন্যান্য বস্তুর উপযুক্ত সজ্জায় কোনও বস্তুর ভার বাড়ানোও যেতে পারে। সে জন্যেই সৌরমণ্ডলের বদলে ব্রহ্মাণ্ডের সকল বস্তুর সঙ্গে অভিকর্ষের সম্বন্ধ আছে বলে মনে করা যায়। এক্ষেত্রে হয়েল-নারলিকার তত্ত্ব আইনষ্টাইনের তত্ত্বের চেয়ে ব্যাপক।

1965 সালের অক্টোবরে হয়েল দেখেন যে, তাঁর সাম্যাবস্থা তত্ত্ব (পদার্থ ক্রমান্বয়ে শক্তি থেকে সৃষ্টি হচ্ছে এবং সৃষ্টির হার—ব্রহ্মাণ্ডের সম্প্রসারণের হার) পরীক্ষালব্ধ ফলের সঙ্গে ঠিক মেলে না। তিনি এখন বিশ্বাস করেন যে, ব্রহ্মাণ্ড একটা নিত্য প্রবাহের অবস্থায় আছে এবং লক্ষ লক্ষ বছরে একবার সম্প্রসারিত হচ্ছে এবং আস্তে আস্তে আবার একটা অতি ঘন বর্তুলে সঙ্কুচিত হচ্ছে (এই তত্ত্ব Big-Bang Theory দিয়ে আরও দৃঢ়ভাবে বিধৃত)। এজাতীয় সঙ্কোচন ও প্রসারণ সম্পূর্ণ স্থানীয় ক্রিয়া, যেমন—আমাদের নীহারিকার এখন প্রসারণের অবস্থা, হতে পারে এমন অনেক নীহারিকা রয়েছে, যাদের সঙ্কোচনের পর্যায় এসে গেছে।

বিজ্ঞান-সংবাদ

বর্ষণ-সমুদ্রে বৈজ্ঞানিক গবেষণা

লুনোখোদ-1 যে স্থানে অবতরণ করেছিল, সেখান থেকে প্রায় এক কিলোমিটার উত্তরে বর্ষণ-সমুদ্রের এলাকায় একটি অত্যন্ত দুর্গম পথ অতিক্রম করে সেটি সেই জায়গায় ফিরে আসে, যে জায়গায় সে তার চতুর্থ চান্দ্ররাত্রি অতিবাহিত করেছিল।

যাঁরা এই অবভাবনীয় পরীক্ষাকার্য চালিয়েছেন, তাঁরা স্বয়ংক্রিয় যান লুনোখোদ-1 কতটা পথ অতিক্রম করলো, তাতে আর আগ্রহী নন। তাঁরা চাঁদের ব্যাসল্ট ভূখণ্ডের গঠন ও তার রাসায়নিক তথ্য সম্বন্ধে আগ্রহী।

মনে হয় লুনোখোদ-1 চাঁদের সর্বোচ্চ স্তরের যে 8 কিলোমিটার জমি অতিক্রম করেছে, সেই জমি সমরূপ। পাঁচটি চান্দ্রদিনে এটা লক্ষ্য করা গেছে যে, সাধারণভাবে ব্যাসাল্ট ভূমি-প্রকৃতির ব্যতিক্রম বিশেষ কিছু হয় নি। বিশেষ করে লক্ষ্য করা গেছে টাইটেনিয়াম ও ক্রোমের সঞ্চয় এবং লোহা ও অন্যান্য ধাতুর বর্ধিত সঞ্চয়।

কিন্তু এসব ব্যতিক্রম চাঁদের শিলার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত কিংবা শুধু চাঁদের মাটির উপরের স্তরের বৈশিষ্ট্য, তা নিশ্চয় করে বলা কঠিন।

পৃথিবীর গবেষণাগারে রাসায়নিক গবেষণা চালিয়ে একটা খুব আশ্চর্য ব্যাপার জানা গেছে। প্রমাণিত হয়েছে যে, চান্দ্রধূলা, যা সমুদ্রগুলিকে কার্পেটের মত ঢেকে রেখেছে, তার বয়স 20·2 থেকে 30·6 হাজার লক্ষ বছর। মাটির তলা থেকে যে পাথর বেরিয়েছে, তার বয়স অপেক্ষাকৃত কম। পাথরের বয়স ধূলার বয়সের চেয়ে গড়ে 2000 থেকে 2500 লক্ষ বছর কম।

বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, এই অসঙ্গতি একটা কারণেই সম্ভব। সম্ভবতঃ উল্কাপাতের ফলে চান্দ্রজগৎ থেকে পাথরের টুকরা ছিট্‌কে পড়েছিল চাঁদের ভূমিতে। বর্তমান ধারণা অনুযায়ী চান্দ্র-জগৎ সমুদ্র থেকে প্রাচীনতর।

লুনোখোদ-1-এর গবেষণার কয়েক মাস অতিবাহিত

স্বয়ংক্রিয় চান্দ্রযান লুনোখোদ-1-এর গবেষণার চতুর্থ মাস অতিবাহিত হয়েছে। খুবই নির্ভরযোগ্য এবং কার্যকর এই চান্দ্রযানটি চাঁদের জটিল পরিবেশে বিস্ময়করভাবে খাপ খাইয়ে নিয়েছে। যানটির শক্তি এখনও অফুরন্ত।

গত বছর 17ই নভেম্বর লুনোখোদ-1-কে চাঁদের মাটিতে নামানো হয়েছিল। এই সময়ের মধ্যে চান্দ্রযান সাত কিলোমিটার দীর্ঘ পথ অতিক্রম করেছে। বর্ষণ-সাগরের যে এলাকায় সে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছে, তার আয়তন হবে সবশুদ্ধ 50 হেক্টর। প্রাচীনতম চান্দ্রভূমির ব্যাসাল্ট পাথরে ভরা মালভূমিতে এই কাজ চালানো হয়। তাতে অভূতপূর্ব তথ্য সংগৃহীত হয়েছে।

পরবর্তী চান্দ্ররাত্রি যাপনের পরেও লুনোখোদ-1-এর অস্তিত্ব অটুট থাকে এবং বর্ষণ-সমুদ্রে পঞ্চম বার সে তার যাত্রাপথে প্রায় 2 কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে। সে নতুন এক ধরণের বড় আগ্নেয়গিরির মুখ সম্পর্কে গবেষণা চালায় এবং এটা আর একবার প্রমাণিত হলো যে, যন্ত্রটির দক্ষতা অপরিসীম।

অর্ধ কিলোমিটার ব্যাসযুক্ত একটি প্রাচীন আগ্নেয়গিরির মুখে গিয়ে যানটি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান চালিয়েছে। চতুর্থ চান্দ্রদিনে যানটি এই আগ্নেয়গিরির মুখের দিকে এগিয়েছিল। তাছাড়া খুব অপ্রত্যাশিত ভাবেই যানটি একটি নবীন

আগ্নেয়গিরির গভীর মুখের দিকে ছুটে যায়। সেই আগ্নেয়গিরিটি অন্য একটি বড় আগ্নেয়গিরির ঢালুতে অবস্থিত। তার ব্যাস 200 মিটারের বেশী। এই নতুন আগ্নেয়গিরির মুখের পাশ কাটিয়ে যাওয়া ঠিক হয়। কিন্তু নতুন বিস্ময়ের বস্তু হলো এই নবীন আগ্নেয়গিরির মুখ। এটা তৈরি হয়েছে হালে চন্দ্রপৃষ্ঠে উল্কাপাতের ফলে। একটি দুর্গের মত নতুন আগ্নেয়গিরির মুখটি যেন পাথরের প্রাচীরে বেষ্টিত। তার ব্যাস 60 মিটার।

বর্ষণ-সমুদ্রে লুনোখোদ-1-এর পরিক্রমার সময় এই রকমের অসুবিধার সৃষ্টি হয়। আর তা হলো এই প্রথম। বিজ্ঞানীরা আশা করেন যে, এই গবেষণার ফলে ভূতাত্ত্বিক ইতিহাসের অনেক জটিল প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে এবং বর্ষণ-সমুদ্রের এলাকার সৃষ্টি-রহস্য উদঘাটন করা সম্ভব হবে।

18ই মার্চ পঞ্চম চান্দ্রদিনে আগ্নেয়গিরির মুখের জটিল অনুসন্ধানের কাজ পরিসমাপ্ত হয়।

লুনোখোদ-1 আবার একটি মসৃণ পথ ধরেছে এবং এই পথে অগ্রসর হতে প্রস্তুত হয়েছে।

জাহাজের দুর্ঘটনা নিবারণের নতুন উপায়

আজকাল জলপথে যে সব দুর্ঘটনা ঘটে, তার বেশীর ভাগই হয় জাহাজে জাহাজে সংঘর্ষের ফলে। পৃথিবীতে যত জাহাজ আছে, তার প্রতি পঞ্চদশ জাহাজটি সহযাত্রী আরেকটি জাহাজের সঙ্গে সংঘর্ষ ঘটায়। এই দুর্ঘটনার 90 শতাংশই ঘটে উপকূলের কাছে, যেখানে জাহাজ চলাচলের প্রচণ্ড ব্যস্ততা, সব কিছু ভাল করে দেখা যায় না, যখন রেডার ছাড়া এক মাইলও জাহাজ চালানো অসম্ভব। সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার—সংঘর্ষ ঘটবার 5, 10, 20 মিনিট আগেও এক জাহাজের ক্যাপ্টেন অপর জাহাজের ক্যাপ্টেনকে দেখতে পান। কিন্তু তাঁরা ঠিক সময়ে ঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না। কারণ যে ছবি তাঁরা দেখেন, তা অস্পষ্ট। উল্টোদিক থেকে যে জাহাজ আসছে, তা কত ডিগ্রি কোণে আসছে, তাও বোঝা যায় না। অনেক সময় দুটি জাহাজ যখন সমান্তরালভাবে চলে, তখন দুটিকে রেডারের পর্দায় একটি আকারহীন বস্তুর মত দেখায়।

রাশিয়ার বিদ্যুৎ-বেতার জাহাজ চলাচল বিভাগের প্রধান সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, মিলিমিটার ও সাবমিলিমিটার বেতার-তরঙ্গের সাহায্যে জাহাজ চলাচল করানো যায় কিনা, সে বিষয়ে চেষ্টা করে দেখা হবে। রাশিয়ার ভেন্তস্পিলস্-এর উপকূলে একটি রেডার স্টেশন স্থাপিত হয়েছে। এই স্টেশন থেকে বন্দরে এবং বন্দরের মুখে জাহাজ চলাচল সফলভাবে নিয়ন্ত্রিত করা যায়। তৈলবাহী অতিকায় জাহাজের নোঙর ফেলবার ব্যবস্থা অত্যন্ত সহজভাবে এখানে করা হয়েছে।

যদিও এই বেতার-তরঙ্গমালা প্রাকৃতিক পরিবর্তনের উপর নির্ভরশীল, তবু এই ব্যবস্থার আসল সুবিধা হলো এই যে, এতে পর্দার উপর ছবিটি স্পষ্ট ও সঠিকভাবে দেখা যায়। ছায়া দাগগুলি খুব স্পষ্টভাবে জাহাজের ছবি ফুটিয়ে তোলে এবং তার উপরিতলও ভালভাবেই দেখা যায়। তার ফলে জাহাজটিকে সঠিকভাবে চেনা যায়। মিলিমিটার তরঙ্গের সাহায্যে সমুদ্রের ঢেউ মাপবার এবং জলের উপর ছোট ছোট জিনিষ (যেমন বয়া) খুঁজে বের করবার একটা কৌশল আবিষ্কৃত হয়েছে। আর জলের যখন জমাটবাধা অবস্থা, তখনও স্বভাবতঃই, এসব পদ্ধতি অপরিহার্য হয়ে পড়ে। অবশ্য তার সঙ্গে পুরনো পদ্ধতির প্রয়োগও চলবে, কারণ তা প্রকৃতির উপর কম নির্ভরশীল।

পূর্বোক্ত স্টেশনটি উপকূলের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। এখন জাহাজে তার কার্যকারিতা পরীক্ষা করে দেখা হবে।

মহাকাশ-আলোকচিত্রের ভিত্তিতে মানচিত্র প্রস্তুত

পৃথিবীর কক্ষ প্রদক্ষিণকারী মহাকাশযান থেকে গৃহীত আলোকচিত্র পরীক্ষামূলক-ভাবে ব্যবহার করে মার্কিন ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা সংস্থা দক্ষিণ অ্যারিজোনায় প্রায় 62 বর্গমাইল বিস্তৃত এলাকার একটি নতুন বিস্তৃত মানচিত্র প্রস্তুত করেছেন। জেমিনি ও অ্যাপোলো অভিযানগুলিতে গৃহীত আলোকচিত্র থেকে 55 ইঞ্চি দৈর্ঘ্য ও 25 ইঞ্চি প্রস্থবিশিষ্ট এই মান-চিত্রটি প্রস্তুত করা হয়েছে। এই মানচিত্রে মরুভূমি অঞ্চল, পর্বতশ্রেণী, রাজপথ, জনসমাকীর্ণ অঞ্চলসমূহ, কলিজ বাঁধ ও তার জলাধার প্রভৃতি সবই দেখানো হয়েছে। ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা সংস্থার একজন মুখপাত্র বলেছেন যে, এই মানচিত্রটি ভূগোল বিশেষজ্ঞ, আঞ্চলিক পরিকল্পনা প্রস্তুতকারী, পরিবেশ বিশেষজ্ঞ, রাজপথ নির্মাণকারী ইঞ্জিনীয়ার এবং আরও অনেকের প্রয়োজনে লাগবে।

সূর্য সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধানী দূরবীক্ষণ যন্ত্র

সূর্য সম্পর্কে তথ্য গ্রহণের নূতন ধরণের একটি টেলিস্কোপ বা দূরবীক্ষণ যন্ত্র সম্প্রতি চালু হয়েছে। এটি নামকরণ করা হয়েছে সোলার ভ্যাকুয়াম টাওয়ার টেলিস্কোপ। নিউ মেক্সিকোতে 9200 ফুট উঁচু একটি পাহাড়ের চূড়ায় এটি স্থাপন করা হয়েছে। মার্কিন বিমানবাহিনীর কেম্ব্রিজ রিসার্চ লেবরেটরীর এটি একটি নূতন সংযোজন। এই দূরবীক্ষণ যন্ত্রের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—এর অভ্যন্তরে কোন বাতাস নেই। সূর্যের কিরণে বাতাস উত্তপ্ত হলে প্রতিবিম্বে বিকৃতি ঘটে, প্রকৃত প্রতিবিম্ব পাওয়া যায় না। প্রধানতঃ সৌরকলঙ্ক এবং সৌরঝলা সম্পর্কেই এই দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে তথ্য সংগ্রহ করা হবে। পৃথিবীর আবহমণ্ডলে এসব উৎপাতের ফলে নানা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় এবং মহাকাশে তথ্যানুসন্ধানের ব্যাপারেও বিশেষ অসুবিধার সৃষ্টি করে।

অনেক দূর দৌড়ানো অভ্যাসের দ্বারা কি ক্যান্সার দূর করা যায়?

1920 সালে জার্মেনীর নোবেল পুরস্কারবিজয়ী অটো ওয়ারবার্গ এক অদ্ভুত ধারণা প্রকাশ করেছিলেন যে, সম্ভবতঃ যথেষ্ট পরিমাণ অক্সিজেনের অভাবেই শরীরের সুস্থ কোষে ক্যান্সারজনিত রোগ দেখা দেয়। যদিও এযাবৎ এসম্বন্ধে মতদ্বৈধতা চলেছে, তথাপি সম্প্রতি খেলোয়াড়দের চিকিৎসক ডাঃ আকেন (পশ্চিম জার্মেনী) প্রমাণ করতে চেষ্টা করছেন যে, শরীরে অত্যধিক পরিমাণে অক্সিজেন সরবরাহ হলে মানুষ ক্যান্সারের হাত থেকে রক্ষা পেতে পারে। ডাঃ আকেন ওয়ার-বার্গের উক্তি সমর্থনের জন্যে 40 থেকে 90 বছর বয়স্ক লোকদের নিয়ে 2টি দলের উপর সমীক্ষা চালিয়ে দেখেছেন যে, অনেক দূর দৌড়ানো দলের মধ্যে অল্প দূর দৌড়ানো দল অপেক্ষা অনেক কম ক্যান্সার রোগ দেখা গেছে। এই ডাক্তারের মতে—দৌড়, সাঁতার কাটা, দাঁড়টানা, সাইকেল চালনা বা বরফের উপর স্কিয়িং প্রভৃতির নিয়মমাফিক দৈনন্দিন অভ্যাস করবার ফলে শরীরে সর্বাধিক পরিমাণে অক্সিজেন প্রবেশ করতে পারে। তিনি মনে করেন যে, প্রত্যেক দিন 5 থেকে 8 কি. মি. পর্যন্ত অল্প গতিতে সারাজীবন দৌড় অভ্যাস ক্যান্সার রোগের একটি ফলপ্রদ প্রতিরোধক। তাঁর মতে, এই দৌড়াবার অভ্যাস যেমন হিতকর, তেমনি এই অভ্যাসে মাঝে মাঝে বিরতি দেওয়া বিশেষ ক্ষতিকর, কারণ তাতে সহজেই শরীরে অক্সিজেনের অভাব ঘটে।

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

মে — 1971

চতুর্বিংশ বর্ষ — পঞ্চম সংখ্যা

চন্দ্রপৃষ্ঠে ফ্রা মরো সংলগ্ন উচ্চ ভূমিতে দ্বিতীয় বার পদচারণার সময় (6ই ফেব্রুয়ারী) অ্যাপোলো-**14** মহাকাশযানের অভিযাত্রী এডগার মিচেলকে **Modularized Equipment Transporter (MET)** থেকে হস্তচালিত একটি যন্ত্র নামাতে দেখা যাচ্ছে। দূর থেকে তোলা এই ছবি থেকে চন্দ্রপৃষ্ঠের একটি বিস্তৃত অঞ্চলের অবস্থা সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা করা যায়

বৈদ্যুতিক বাতি

বৈদ্যুতিক বাতি আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আজ প্রায় অপরিহার্য। এই বৈদ্যুতিক বাতি সম্বন্ধে মোটামুটি কিছু আলোচনা করছি।

যখনই কোন পরিবাহী তারের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ-প্রবাহ চালিত হয়, তখনই তার মধ্যে বিদ্যুৎ-প্রবাহের বিভিন্ন ফল দেখতে পাওয়া যায়। এরই একটির নাম তাপীয় ফল বা Thermal effect। পরিষ্কারভাবে এর অর্থ হলো এই—যখন কোন পরিবাহী তারের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ-স্রোত প্রবাহিত হয়, তখনই তারটি গরম হয়ে ওঠে। তারটির উষ্ণতার পরিমাণ অবশ্য নির্ভর করে বিভিন্ন পদার্থের উপর। যাহোক, বিদ্যুৎ-প্রবাহ চলামাত্র তারটি গরম হবেই এবং বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থার মাধ্যমে এই তারের উষ্ণতা এতই বৃদ্ধি পায় যে, তাথেকে আলোর সৃষ্টি হয়। বিদ্যুৎ-প্রবাহের তাপায় ফলের এই ব্যবহারিক প্রয়োগের দ্বারা আলো উৎপাদনের উপাদানকেই আমরা বলি বৈদ্যুতিক বাতি।

সাধারণ একটা বৈদ্যুতিক বাতি বলতে আমরা বুঝি, একটি বায়ুশূন্য কাচের গোলকের ভিতর খুব সরু একটি তার লাগানো থাকে, যাকে বলা হয় ফিলামেন্ট। এই সরু তারটির মধ্য দিয়ে যখন বিদ্যুৎ-প্রবাহ চালিত হয়, তখন তারটি স্বভাবতঃই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং উত্তপ্ত এই তার থেকেই আলোকের সৃষ্টি হয়। এভাবে উৎপন্ন আলোকের রং বা প্রকৃতি অবশ্য নির্ভর করে, তারটি কি পরিমাণে উত্তপ্ত হয়—তার উপর। তারটির উষ্ণতা যখন 550° সেন্টিগ্রেডের মত থাকে, তখন খুব হাল্কা লাল রঙের সৃষ্টি হয়। 1000° সেন্টিগ্রেডে চেরী ফলের মত গভীর লাল রঙের আলো, 1300° সেন্টিগ্রেডে সাদা আলো এবং 2000° সেন্টিগ্রেডে আরও বেশী সাদা আলো উৎপন্ন হয়। এথেকেই সহজে বোঝা যায় যে, কোন বৈদ্যুতিক বাতি যখন আলো প্রদান করে, তখন তার ভিতরে উত্তাপ প্রায় 2000° সেন্টিগ্রেডের মত হয়। স্বভাবতঃই বাতির ভিতরে যে সরু তারটি থাকে, সেটি এমন এক পদার্থের দ্বারা তৈরি হওয়া দরকার, যা এই প্রচণ্ড উত্তাপ সহ্য করতে পারে।

ফিলামেন্টের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ-স্রোত প্রবাহিত হলেই ফিলামেন্টটি যথারীতি উত্তপ্ত হতে থাকে এবং উত্তাপ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই এর গা থেকে তাপ বিকিরণ সুরু হয়। এই বিকিরণের পরিমাণও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে থাকে। এইভাবে তাপ বিকিরণের সময়ে যদি ফিলামেন্টটির চারদিকে বাতাস থাকে, তাহলে ঐ প্রচণ্ড উত্তাপে ফিলামেন্টটি বাতাসের সংস্পর্শে তৎক্ষণাৎ জ্বলে যায়। সে জন্যে বৈদ্যুতিক বাতি তৈরির প্রথম পদক্ষেপেই কাচের গোলকটিকে সম্পূর্ণ বায়ুশূন্য করবার প্রয়োজন হয়েছিল।

বিদ্যুতের সাহায্যে আলোক উৎপাদনের প্রথম চেষ্টা হয় 1810 সালে, যখন প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানী হামফ্রী ডেভী দুটি কার্বন দণ্ডের মধ্যে বৈদ্যুতিক আর্কের সৃষ্টি করে

আলোক উৎপাদন করেন। কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এভাবে আলোক সৃষ্টি করবার ব্যাপারে অনেক অসুবিধা দেখা দিল। প্রথমতঃ, এভাবে আলোক উৎপাদনে বিদ্যুতের প্রয়োজন হতো অনেক বেশী। দ্বিতীয়তঃ, একনাগাড়ে এভাবে উৎপন্ন আলোকের ব্যবহারে অসুবিধাও দেখা দিল। সে জন্যে ডেভীর আর্ক-বাতির ব্যবহারিক প্রয়োগ খুবই সীমাবদ্ধ হয়ে রইলো। এর পর 1877 সালে জ্যাবলোকফ্ নামে একজন বিজ্ঞানী কিছুটা উন্নত ধরণের এক প্রকার আর্ক-বাতির উদ্ভাবন করেন। তাঁর সেই বাতিটি যদিও ডেভীর বাতি অপেক্ষা অনেক উন্নত ধরণের হলো, তথাপি ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রায় সেই একই রকমের অসুবিধা থেকে যাওয়ায় আর্ক-বাতির সাফল্য বিঘ্নিত হলো বলা চলে।

আর্ক-বাতির নানারকম অসুবিধার ফলেই ফিলামেণ্ট বাতির দিকে বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। এই ধরণের বাতি তৈরির প্রথম চেষ্টা হয় 1840 সালে, যখন গ্রোভ ও মলিন্স নামক দু-জন বিজ্ঞানী টাংষ্টেনের একটি সরু তারের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ চালনা করে দেখতে পান—তার থেকে আলোকের উৎপত্তি হয়। কিন্তু ঐ তারটি বাতাসের সংস্পর্শে থাকায় টাংষ্টেন বাষ্পীভূত হয়ে ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হতে থাকে। এই অসুবিধা দূর করবার ব্যবস্থা করেন 1845 সালে ষ্টার ও কিং নামে দু-জন বিজ্ঞানী। তাঁরা টাংষ্টেন ফিলামেণ্টটিকে একটি বায়ুশূন্য গোলকের মধ্যে রেখে তার আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি করতে সক্ষম হন। প্রকৃতপক্ষে সফলভাবে ফিলামেণ্টযুক্ত বৈদ্যুতিক বাতি তৈরি করেন 1880 সালে আমেরিকার প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানী এডিসন এবং একই সময়ে ইংল্যাণ্ডের বিজ্ঞানী সোয়ান। এজন্যেই এই ধরণের ফিলামেণ্ট বাতিকে বলা হয় Ediswan বাতি। এঁদের বাতিতে ফিলামেণ্ট হিসাবে ব্যবহৃত হতো সরু কার্বনের তার। কিন্তু এই ধরণের কার্বন ফিলামেণ্টের অসুবিধা ছিল অনেক। প্রচণ্ড উত্তাপ সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে কার্বন ধীরে ধীরে ক্ষয়প্রাপ্ত হতে থাকে, যার ফলে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কার্বনের গুঁড়া কাচের গোলকের ভিতরে জমা হয়ে আলোর ঔজ্জ্বল্য হ্রাস করে দেয়। তাছাড়া কার্বন বাষ্পীভূত হয় 1800° ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডে অথচ বেশ সাদা আলো পেতে হলে উত্তাপের প্রয়োজন 2000° ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডের কাছাকাছি। সে জন্যে কার্বন ফিলামেণ্টের অসুবিধা দূর করে তার উন্নতি সাধনের চেষ্টা করেন যথাক্রমে 1897 সালে বৈজ্ঞানিক নার্ণষ্ট (Nernst), 1900 সালে বৈজ্ঞানিক ওয়েলসবাক (Welsbach), 1905 সালে বৈজ্ঞানিক বটন (Botton) এবং সর্বশেষে 1909 সালে বৈজ্ঞানিক কুলিজ (Coolidge)। এই কুলিজের তৈরি ফিলামেণ্টের প্রচলনই আজ পর্যন্ত চলে আসছে। এই ফিলামেণ্টটি তৈরি হয়েছিল উলফ্রেমাইট (Wolframite) নামে টাংষ্টেন, লৌহ ও ম্যাঙ্গানিজের এক মিশ্রণ থেকে।

বৈদ্যুতিক বাতির কাচের গোলকটিকে বায়ুশূন্য করবার ফলে তাপ পরিবাহিত হয় কম একথা ঠিক, কিন্তু ফিলামেণ্ট ক্রমশঃ বাষ্পীভূত হয়ে কাচের গোলকের মধ্যে

পাতলা আবরণের সৃষ্টি করায় বাতির ঔজ্জ্বল্য ক্রমশঃ কমে আসতো। এই অসুবিধা দূর করবার জন্যে আধুনিক বিজলী বাতিতে কাচের গোলকটিকে বায়ুশূন্য না রেখে কোন নিষ্ক্রিয় গ্যাস, যেমন—আর্গন, নাইট্রোজেন ইত্যাদি ভর্তি করে দেওয়া হয়। এর ফলে ফিলামেন্ট থেকে তাপ কিছুটা পরিমাণে পরিবাহিত হয় বটে, তবে এই ব্যবস্থায় বাতির ঔজ্জ্বল্য অনেক বৃদ্ধি পায়। অবশ্য এভাবে পরিবাহিত তাপের পরিমাণ কমাবার জন্যে 1913 সালে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ল্যাংমায়ার এক উপায় উদ্ভাবন করেন। তিনি ফিলামেন্টের তারটিকে সোজা অবস্থায় না রেখে কুণ্ডলীকৃত অবস্থায় রাখেন—যাকে বলা হয় Coiled coil। এই ব্যবস্থায় পরিবাহিত তাপের পরিমাণ অনেক কমিয়ে ফেলা হয় এবং ফলে বাতির ঔজ্জ্বল্য বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। আধুনিক কালে প্রায় অধিকাংশ বৈদ্যুতিক বাতিতেই এই Coiled coil প্রথার প্রচলন হয়েছে।

নাইট্রোজেন বা আর্গন জাতীয় নিষ্ক্রিয় গ্যাস ভর্তি বাতি, যা আমরা সচরাচর ব্যবহার করে থাকি, সাধারণতঃ 1000 ঘণ্টার মত আয়ুসম্পন্ন হয়, অর্থাৎ এই ধরণের বাতির ফিলা-মেন্ট 1000 ঘণ্টার বেশী আলো দিতে পারে না, কিন্তু বৈদ্যুতিক বাতির আয়ুষ্কাল আরো বাড়াবার জন্যে আধুনিক কালে ফ্লুরোসেন্ট বাতি নামে এক প্রকার বৈদ্যুতিক বাতির ব্যাপক প্রচলন হয়েছে। এই ধরণের বাতিতে সাধারণতঃ একটি লম্বা কাচের নলের মধ্যে কিছু পারদ ভর্তি করে তার দুই মুখ বন্ধ করে দুটি তড়িৎ-দ্বার বা ইলেকট্রোড দুই মুখ দিয়ে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। নলের ভিতর বায়ুর চাপ অত্যন্ত কম রাখা হয়। যখন তড়িৎ-দ্বার দুটির সঙ্গে বিদ্যুৎ-প্রবাহের সংযোগ করা হয়, তখন বাতির অভ্যন্তরস্থ পারদ-বাষ্পের ভিতর তড়িৎ মোক্ষণ সুরু হয় এবং তার ফলে আলোর উৎপত্তি হয়। কাচের নলের ভিতরের দিকের দেয়ালে এক প্রকার ফ্লুরোসেন্ট রঙের প্রলেপ দিয়ে নানা বর্ণের আলোক উৎপন্ন করা যায়। এই ধরণের বাতির সুবিধা হলো—এই বাতি থেকে যে আলো উৎপন্ন হয়, তা ছায়া সৃষ্টি করে না বললেই হয় এবং চোখে ধাঁধার (Glare) সৃষ্টি করে না। তাছাড়া এই ধরণের বাতি থেকে যে আলো উৎপন্ন হয়, তার ঔজ্জ্বল্য সাধারণ একটা বৈদ্যুতিক বাতি থেকে নির্গত আলোর প্রায় তিন গুণ। অধিকন্তু একটি ফ্লুরোসেন্ট বাতি প্রায় 3000 ঘণ্টা আলো দিতে পারে। এজন্যেই আজকাল বাড়ী, ফ্যাক্টরী, হাসপাতাল, স্কুল, কলেজ প্রভৃতিতে এই বাতি ব্যবহারের ব্যাপক প্রচলন হয়েছে। আর ফ্লুরোসেন্ট বাতির কাচের নলটিকে বিভিন্ন আকৃতি বা আকার দেওয়া যায় বলে আলোকসজ্জার ব্যাপারে এই ধরণের বাতির যে যথেষ্ট সমাদর হয়েছে, আমরা তা হামেশাই রাস্তাঘাটে দেখতে পাই।

সমীরকুমার ঘোষ*

*পদার্থবিদ্যা বিভাগ, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন।

ভাল্কান নামক গ্রহের কাহিনী

1846 সালে লেভেরিয়ার (Leverrier) সৌরজগতের অষ্টম গ্রহ নেপচুন আবিষ্কার করেন। এই আবিষ্কারের মূলে ছিল ইউরেনাস গ্রহের বিচিত্র চলবার ভঙ্গী। ইউরেনাস গ্রহ কিছুটা উৎকেন্দ্রিক উপবৃত্তাকার পথে পরিক্রমা করে সূর্যকে। গণনার সাহায্যে বিজ্ঞানীরা স্থির করেন ঐ গ্রহের চলবার পথ। কিন্তু দূরবীনের সাহায্যে ওর যাত্রাপথের দিকে দৃষ্টি রেখে দেখা গেল, গ্রহটি তার প্রকৃত যাত্রাপথ ঠিকমত অনুসরণ করছে না। ওর গতি কোন সময় হচ্ছে দ্রুততর আবার কোন সময় হচ্ছে মন্দীভূত। ইউরেনাসের এই চলবার ভঙ্গী দেখে লেভেরিয়ার বুঝে নিলেন, এর জন্যে দায়ী কোন অনাবিষ্কৃত গ্রহ। ফলে চললো তার ব্যাপক অনুসন্ধান। শীঘ্রই এই অনুসন্ধান বিরাট সাফল্য এনে দিল লেভেরিয়ারের জীবনে। আবিষ্কৃত হলো নেপচুন।

কিন্তু নেপচুন আবিষ্কারের ক্ষেত্রে লেভেরিয়ার বিরাট সাফল্য অর্জন করলেও আর এক দিক থেকে তাঁর জীবনে এলো এক চরম ব্যর্থতা। লেভেরিয়ার লক্ষ্য করলেন, ইউরেনাসের মত বুধগ্রহের রয়েছে এক বিচিত্র চলবার ভঙ্গী। বুধগ্রহও এক উৎকেন্দ্রিক উপবৃত্তাকার পথে পরিক্রমা করে চলেছে সূর্যকে। লেভেরিয়ার অনুমান করলেন, বুধগ্রহের অন্তর্বর্তী কোন কক্ষপথে নিশ্চয়ই রয়েছে অপর কোন অনাবিষ্কৃত গ্রহ, যার প্রভাবে ঐ গ্রহের চলবার ভঙ্গীতে দেখা যায় অমন বৈচিত্র্য। নেপচুন অনুসন্ধানের মত এ-ক্ষেত্রেও চললো নতুন গ্রহ খোঁজবার পালা। সূর্য এবং বুধগ্রহের মাঝামাঝি স্থানে সতর্ক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন বিজ্ঞানীরা।

অবশেষে 1860 সালে ফরাসী জ্যোতির্বিদ ডক্টর লেস্‌কারবল্ট (Dr. Lescarbault) অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে ঘোষণা করলেন, তিনি নতুন গ্রহটিকে সূর্য-থালা অতিক্রম করতে দেখেছেন। এই ঘোষণার ফলে লেভেরিয়ার যোগাযোগ স্থাপন করলেন ডক্টর লেস্‌কারবল্টের সঙ্গে। তাঁর কাছে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করে লেভেরিয়ার নব আবিষ্কৃত গ্রহটির নাম দিলেন ভাল্কান। লেভেরিয়ার আরও জানালেন যে, ঐ নব আবিষ্কৃত ভাল্কান গ্রহটি সূর্য থেকে এক কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল দূরে থেকে তার পথ পরিক্রমা করে চলেছে, যেখানে সূর্য থেকে বুধের গড়-দূরত্ব হলো তিন কোটি ষাট লক্ষ মাইল। আর ঐ নব আবিষ্কৃত গ্রহের ব্যাস স্থির হলো প্রায় এক হাজার মাইলের মত, যেখানে বুধের ব্যাস হলো তিন হাজার এক-শ' মাইল। লেভেরিয়ার আরও জানালেন, এই ভাল্কানগ্রহটি 19.75 দিনে পরিক্রমা করছে সূর্যকে, যেখানে বুধগ্রহের সূর্য পরিক্রমার সময় হলো অষ্টাশী দিন। ভাল্কানগ্রহ আবার কোন্ নির্দিষ্ট সময়ে সূর্য-থালা অতিক্রম করবে, তিনি সে কথাও ঘোষণা করলেন।

তাঁর এই ঘোষণার ফলে ভাল্কানগ্রহ প্রত্যক্ষ করবার জন্যে বহু সংখ্যক বিজ্ঞানী প্রস্তুত হয়ে রইলেন। তাঁরা তাঁদের নিখুঁৎ যন্ত্রপাতি নিয়ে নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে অধীর প্রতীক্ষায় রইলেন, কারণ তাঁদের এই প্রত্যক্ষ করবার উপর নির্ভর করছে ভাল্কানের স্থায়িত্ব। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সমস্ত কিছু প্রস্তুত রেখেও ভাল্কানের আর দেখা পাওয়া গেল না। গণনায় কিছু ভুল থাকতে পারে মনে করে এর পরেও তাঁরা তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান চালালেন। কিন্তু না, কোন কিছুরই দেখা মিললো না! বিজ্ঞানীরা নিশ্চিন্ত হলেন—বুধ এবং সূর্যের মাঝামাঝি অন্য কোন গ্রহ নেই। দুর্ভাগ্য লেভেরিয়ারের এবং দুর্ভাগ্য ডক্টর লেস্কারবল্টের। কিন্তু একটা সন্দেহ সকলের মনের মধ্যে উঁকি মারতে লাগলো, যদি কোন গ্রহ না-ই থাকবে, তবে ডক্টর লেস্কারবল্ট ওটা দেখলেন কি? হয়তো বিন্দুবৎ কোন সৌরকলঙ্ক (Sun spot)। সূর্যের আবর্তনের ফলে একটি বিন্দুবৎ সৌরকলঙ্ক হয়তো সরে যেতে দেখেছিলেন ডক্টর লেস্কারবল্ট এবং তাকেই তাঁর নতুন গ্রহ বলে ভ্রম হয়েছিল।

কিন্তু তা না হয় হলো। এদিকে বুধগ্রহের উৎকেন্দ্রিক উপবৃত্তাকার পথে চলবার রহস্যের তো কোন কিনারা হলো না! হ্যাঁ, তাও হলো। এর জন্যে এগিয়ে এলেন বিজ্ঞানী আইনষ্টাইন। তাঁর আপেক্ষিকতা মতবাদ ঘোষণার পর গণনার সাহায্যে দেখালেন, উপবৃত্তের একটি নাভিতে (Focus) সূর্যকে রেখে যদি কোন গ্রহ তার পথ পরিক্রমা করে, তবে ঐ উপবৃত্তাকার পথটি ঐ নাভিকে কেন্দ্র করে ধীরে ধীরে আবর্তিত হয়ে চলবে; অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট উপবৃত্তে কোন গ্রহের পক্ষে পথ পরিক্রমা করা অসম্ভব। তবে পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি প্রভৃতি গ্রহগুলির কক্ষপথের নাভিদ্বয়ের পারস্পরিক দূরত্ব এত অল্প যে, ওদের কক্ষপথগুলি প্রায় বৃত্তের সামিল। কাজেই কোন নাভিকে কেন্দ্র করে ওদের কক্ষপথের আবর্তন উপলব্ধি করা কঠিন। কিন্তু বুধগ্রহ অপেক্ষাকৃত লম্বাটে উপবৃত্তে কিছুটা দ্রুত গতিতে সূর্যকে পরিক্রমা করায় ঐ গ্রহের কক্ষপথের অনুসূর (Perihelion) প্রতি শতাব্দীতে 42·9 কৌণিক সেকেণ্ডে আবর্তিত হয়ে চলেছে। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বুধের কক্ষপথের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রেখে দেখলেন, আইনষ্টাইনের মতবাদ অনুসারে তার যাত্রাপথ হুবহু মিলে যাচ্ছে। [অন্যভাবে বলা যায়, বুধের ঐ বিচিত্র চলবার ভঙ্গীই আইনষ্টাইনের আপেক্ষিকতা তত্ত্বের প্রমাণ সুদৃঢ় করলো, অর্থাৎ ভাল্কান বিজ্ঞান-জগৎ থেকে বিলুপ্ত হলো বটে, কিন্তু তার স্থানে সুপ্রতিষ্ঠিত হলো আপেক্ষিকতা তত্ত্ব।]

গিরিজাচরণ ঘোষ*

---

*বিদ্যাসাগর কলেজ। কলিকাতা-6

ফল পাকে কেন ?

ফল পাকে কেন আর কেনই বা তার রং ও গন্ধের পরিবর্তন ঘটে ? এই প্রশ্ন তোমাদের অনেকেরই মনে জাগে। এই বিষয়ে মোটামুটিভাবে কিছু আলোচনা করবো।

ফল পাকবার সঙ্গে সঙ্গে তার মধ্যে বিভিন্ন প্রকার অম্লের পরিমাণ, শ্বেতসার, শর্করা ও প্রোটিন প্রভৃতির উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে। এছাড়া কোষ-প্রাচীরেরও পরিবর্তন ঘটতে দেখা যায়।

ফল পাকে কেন ? এক কথায় তার জবাব হলো—বয়েস বাড়ে বলে। তবে এটাই ফল পাকবার কারণ সম্বন্ধে শেষ কথা নয়। আরো অনেক কিছু জানবার আছে। নানা প্রকার পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাহায্যে ফল পাকবার কারণ সম্বন্ধে বিস্তৃত তথ্য বিজ্ঞানীরা জানতে পেরেছেন। ফলে আবিষ্কৃত হয়েছে নানা প্রকার সুগন্ধি দ্রব্য, যেগুলি পাকা ফলে বিদ্যমান। তাদের কিছু কিছু কৃত্রিম উপায়ে তৈরি করাও সম্ভব হয়েছে; যেমন—কমলা লেবু, পাকা কলা, আপেল প্রভৃতির সৌরভ। আবার অন্য দিকে উদ্ভাবিত হয়েছে কৃত্রিম উপায়ে ফল পাকাবার নানাবিধ প্রক্রিয়া।

উদ্ভিদ-বিজ্ঞানীরা ফল পাকবার সময় ফলের শ্বাসক্রিয়ার বৃদ্ধি লক্ষ্য করেছেন। পাকবার সময় কিছু কিছু ফলের ক্ষেত্রে অবশ্য এই শ্বাসক্রিয়ার বৃদ্ধি ঘটে না; যেমন—চেরী, ডুমুর প্রভৃতি। কিন্তু অধিকাংশ ফলের এই শ্বাসক্রিয়া বৃদ্ধি পায় কেন ? তার এক কথায় উত্তর দিতে পারেন নি কেউ। বিভিন্ন প্রকার ফলের রাসায়নিক বিশ্লেষণ ও অন্যান্য পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা বিজ্ঞানীরা তাঁদের নিজ নিজ মত ব্যাখ্যা করেছেন। এর ফলে আমের ক্ষেত্রে যা সত্য—আপেলের বেলায় তা পুরাপুরি সত্য নয়, আবার লিচুর ক্ষেত্রে তা হয়তো একেবারেই প্রযোজ্য নয়। তবে একটা ব্যাপারে সবাই একমত। সেটা হচ্ছে ফলের ঐ অদ্ভুত শ্বাসক্রিয়ার বৃদ্ধি। বিজ্ঞানী কিডের মতে, কোষের মধ্যস্থিত সাইটোপ্লাজমে সক্রিয় ফ্রুক্টোজের উপস্থিতিই শ্বাসক্রিয়ার বৃদ্ধি ঘটায়। ফলের কোষের মধ্যস্থিত ফস্‌ফেট-গ্রাহক অ্যাডিনোসিন ডাইফস্‌ফেট (ADP) যে ফলের শ্বাসবৃদ্ধি ঘটায়, এটাও আজ সর্বজনস্বীকৃত। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ফলের মেটাবলিক সক্রিয়তা লক্ষণীয়ভাবে বৃদ্ধি পায়, যেমন—কলা পাকবার সময় Carboxylase ও Aldolase এবং আপেল পাকবার সময় Malicenzyme ও Pyruvic carboxylase-এর সক্রিয়তার বৃদ্ধি দেখা যায়। এছাড়া আছে ফল পাকবার সময় কতকগুলি উল্লেখযোগ্য রাসায়নিক পরিবর্তন। কাঁচা ও পাকা ফলের স্বাদের তারতম্য এই রাসায়নিক পরিবর্তনের ফলেই ঘটে থাকে। আপেল পাকবার সময় শ্বেতসারের পরিমাণ কমে আর শর্করার পরিমাণ বাড়ে। ন্যাসপাতি ও আপেলের যে মিষ্টতা, তা পাওয়া যায় মূলতঃ ফ্রুক্টোজ শর্করার জন্যে। পাকা কলাতে ফ্রুক্টোজ

গ্লুকোজ প্রভৃতি শর্করাগুলির পরিমাণ প্রচুর বৃদ্ধি পায় আর হেমিসেলুলোজজাতীয় কার্বোহাইড্রেটের পরিমাণ হ্রাস পায়।

অনেক সময় দেখা যায় কলা, আম প্রভৃতি ফল বেশী পেকে গেলে (মজে যাওয়া) তার মিষ্টতা কমে যায়। তার কারণ, এই সময় শ্বাসকার্যের জন্যে ব্যবহৃত হবার দরুণ শর্করার হ্রাসপ্রাপ্তি ঘটে। কমলা লেবু ও আঙুর ফল গুদামজাত করবার সময় শর্করার বৃদ্ধি ও অম্লের পরিমাণ হ্রাস পায়। পক্ষান্তরে লেবুর বেলায় মোট অম্লের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়; অর্থাৎ কাঁচা লেবুর চেয়ে পাকা লেবু বেশী টক্ লাগে।

টক্‌জাতীয় (সাইট্রাস) ফলগুলিতে উদ্ভিদ থেকে যে অম্ল সঞ্চিত হয়, সেগুলি অন্যান্য মেটাবলিক কার্যে ব্যবহৃত হয় না অথবা উদ্ভিদের অন্যান্য অংশে স্থানান্তরিত হতে পারে না বলেই পাকবার সঙ্গে সঙ্গে এদের অম্লতা বৃদ্ধি পেতে থাকে।

কাঁচা আপেল, টম্যাটো, আম প্রভৃতি খেতে খুবই টক্ লাগে, তার কারণ কাঁচা অবস্থায় এদের মধ্যে থাকে Malic, Quinic, Ascorbic প্রভৃতি অম্ল।

ফল পাকবার সঙ্গে সঙ্গে ফলের যে নমনীয়তা আসে, তার জন্যে মূলতঃ বিভিন্ন প্রকারের Pectic দ্রব্যই গুলিই দায়ী। বৃহৎ বৃহৎ Pectic দ্রব্যের অণুগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণুতে রূপান্তরিত হয় বলেই ফল পাকলে দৃঢ়তা কমে গিয়ে ফলে নমনীয়তা আসে। তাছাড়া আছে কতকগুলি পেক্‌টিক এনজাইম, যেমন—Pectic esterage ও Polygalacturonage, যেগুলি পূর্বোক্ত পেক্‌টিক দ্রব্যের রূপান্তরে সাহায্য করে থাকে।

এবার ফলের রং পরিবর্তন ও সুমিষ্ট গন্ধের কথা কিছু বলা যাক। সুস্বাদু ফলের খোসাতে সর্বাধিক পরিমাণ Carotenoid ও Chlorophyll রং থাকে। পাকবার সঙ্গে সঙ্গে ফলের সবুজ রং ক্লোরোফিলের পরিমাণ কমতে থাকে—কিছুটা বিনষ্ট হয় আর কিছুটা অন্য রঙে রূপান্তরিত হয়। পাকা টম্যাটোতে প্রচুর পরিমাণে লাইকোপিন আর হল্‌দে আপেলের কোমল অংশে প্রচুর পরিমাণে ক্যারোটিন থাকে। ফল পাকবার সঙ্গে সঙ্গে ক্লোরোফিল বিলুপ্তির প্রমাণ পাওয়া যায় Bosc ও Anjou নামে দুই প্রকার ন্যাসপাতিতে। তবে সব ফলেই যে ক্যারোটিন বৃদ্ধি পাবে এমন নয়, যেমন—আঙুর। লেবু প্রভৃতিতে বরং ক্যারোটিনের পরিমাণ কমতেই দেখা যায়। সাধারণভাবে দেখা গেছে, সমস্ত টক্‌জাতীয় (সাইট্রাস) ফলে ক্লোরোফিলের পরিমাণ প্রচুর পরিমাণে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। ফল পাকতে প্রচুর পরিমাণে ক্লোরোফিল বিনষ্ট হবে বা হ্রাস পাবে এমন কোন কথা নেই। কারণ ইথিলিন গ্যাস দিয়ে কার্বন ডাই-অক্সাইডের উপস্থিতিতে কৃত্রিম উপায়ে সাইট্রাস ফলগুলি পাকাবার সময় কম পরিমাণে ক্লোরোফিল হ্রাস পেতে দেখা যায়।

লাউ, টম্যাটো, লঙ্কা, আম, কমলালেবু ইত্যাদি ফলে Carotenoid বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়। এছাড়া ফলে পাওয়া যায় ফ্লোভোনয়েড, নানাপ্রকার ফেনোলিক যৌগ ও Xanthophyll, Anthocyanin, Anthoxanthim প্রভৃতি রং। শেষোক্ত রংগুলির পরিপূর্ণ বিকাশ আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য, পরিমাণ প্রভৃতির উপর নির্ভর করে। এই ব্যাপারটা খুব ভালভাবে লক্ষ্য করা যায় আপেল ফলের বেলায়। আপেল গাছে থাকবার সময় আপেলে প্রখর সূর্যালোকে তেমন রং ধরে না, কিন্তু গাছ থেকে তুলে আব্‌ছা আলোতে রেখে দিলে আপেলের উপরের সুন্দর রং আস্তে আস্তে ফুটে ওঠে।

ফলের সৌরভ কোন একটি বিশিষ্ট পদার্থের জন্যে হয় না। অনেকগুলি রাসায়নিক যৌগের মিশ্রিত ক্রিয়ার ফল। ফলের সৌরভ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান খুবই সীমাবদ্ধ, কারণ এগুলি ফলে এত কম পরিমাণে থাকে যে, এগুলির সংগ্রহ ও রাসায়নিক বিশ্লেষণ খুবই কষ্টসাধ্য। পাকা ফল থেকে যে সব উদ্বায়ী পদার্থ পাওয়া যায়, সেগুলির মধ্যে আছে বিভিন্ন প্রকার অ্যালকোহল, অ্যালডিহাইড, কিটোন, এষ্টার, টারপিন, ইথিলিন প্রভৃতি। তাছাড়া ফলের শ্বাস-প্রশ্বাসের ফলে উদ্ভূত কার্বন ডাই-অক্সাইড তো আছেই।

সাইট্রাস ফলগুলিতে টারপিনয়েড, কুমারিন ফেরোকুমারিনজাতীয় যৌগগুলি থাকবার দরুণ সুগন্ধ উৎপন্ন হয়। তাছাড়া বিভিন্ন ধরণের অম্ল এবং শর্করাও ফলের সৌরভের জন্যে কিছু অংশে দায়ী।

কৃত্রিম উপায়ে ফল পাকানো ও সংরক্ষণ করা যায়। আমাদের দেশে গ্রামাঞ্চলে কৃত্রিম উপায়ে ফল পাকাবার বহুবিধ প্রথা প্রচলিত আছে; যেমন—মাটির তলায় গর্ত খুঁড়ে তার মধ্যে শুক্‌নো ঘাস, খড় ইত্যাদি বিছিয়ে আম, সবেদা প্রভৃতি পাকানো হয়ে থাকে। পাকাবার জন্যে কলার কাঁদি পর পর সাজিয়ে ছোট্ট ঘরে প্রচুর ধোঁয়া দিয়ে বন্ধ করে রাখা হয়। কোথাও কোথাও কাঁঠালের বোঁটায় লাল টক্‌টকে গরম লোহার রড ঢুকিয়ে পাকানো হয়। এমনি নানারকম পদ্ধতি গ্রামাঞ্চলে প্রচলিত আছে।

বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে ফল পাকানো হয় বাতাসে অক্সিজেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বাড়িয়ে-কমিয়ে এবং ইথিলিন গ্যাস প্রয়োগ করে। বাতাসে অক্সিজেন অথবা ইথিলিন গ্যাসের পরিমাণ বাড়িয়ে দিলে ফলের অতিরিক্ত শ্বাসক্রিয়ার বৃদ্ধি ঘটে এবং ফলে অতি দ্রুত Climacteric অবস্থা দেখা যায় এবং তাড়াতাড়ি ফল পাকতে আরম্ভ করে। ইথিলিন একটি শক্তিশালী ফল পাকানো গ্যাস। বাতাসে লক্ষ ভাগের এক ভাগ পরিমাণ ইথিলিন গ্যাসও খুবই কার্যকরী দেখা যায়, তবে বিভিন্ন ফলের ক্ষেত্রে বিভিন্ন মাত্রা প্রয়োগ করতে হয়। বিভিন্ন দেশে কৃত্রিম উপায়ে ফল পাকাবার ব্যবস্থা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ঝড়-বৃষ্টি, কীট-পতঙ্গ বা পশুপাখীর জন্যে ফল গাছে অনেক

দিন পর্যন্ত থাকলে তা প্রচুর পরিমাণে বিনষ্ট হবার সম্ভাবনা থাকে। কাজেই এদের হাত থেকে রক্ষা করতে হলে ফল গাছে পাকা অবধি অপেক্ষা না করে আগেই সেগুলি তা তুলে নিয়ে কৃত্রিম উপায়ে পাকানো উচিত। কৃত্রিম উপায়ে পাকা ফল সংরক্ষণের জন্যে আবিষ্কৃতও হয়েছে নানাবিধ কৃত্রিম উপায়; যেমন—নিয়ন্ত্রিত বায়ু-কক্ষ, হিমঘর, বায়ু-সংরক্ষণ প্রভৃতি।

মণ্টু বাগচী*

*কৃষিবিভাগ, বিজ্ঞান কলেজ, 35 বালীগঞ্জ সার্কুলার রোড, কলিকাতা 19

অ্যালার্জি

অনেক সময় দেখা যায় পেঁপে, কাঁঠাল, লঙ্কা, ডিমের কুসুম, চিংড়ি খেলে কারো কারোর সহ্য হয় না—হাঁচি, হিক্কা, জ্বর, আমবাত, গা চুলকানি প্রভৃতি নানা রকমের শারীরিক প্রতিক্রিয়া হয়। ডাক্তারেরা বলেন—অ্যালার্জি।

মানুষকে পরিশ্রম করতে হয়। পরিশ্রমে শরীরের কোষগুলি নিয়মিত ভাঙ্গে, সেগুলিকে গড়তে হয়। শ্রমে শরীরের সঞ্চিত শক্তির ক্ষয় হয়, সেই ক্ষয়ও পূরণ করতে হয়। আবার শরীরের বৃদ্ধির জন্যেও নতুন কোষ গড়তে হয়। এই সব কারণে মানুষের ক্ষুধা পায়। কাজেই খাদ্যোপাদানগুলি এমন হওয়া দরকার, সেগুলি যেন শরীরের কোষ তৈরি ও শক্তি আহরণের কাজ নির্বাহ করতে পারে। শরীরের সর্বাধিক প্রয়োজনীয় উপাদানটির নাম প্রোটিন, সে জন্যে খাদ্যে প্রচুর প্রোটিন থাকা চাই।

মানুষের প্রধানতঃ যে সব খাদ্যের প্রয়োজন, সেগুলি হলো—জল, শর্করা বা চিনিজাতীয় খাদ্য; যেমন—গ্লুকোজ, ফ্রুক্টোজ, ল্যাক্টোজ ইত্যাদি। স্নেহজাতীয় খাদ্য; যেমন—তেল, ঘি, চর্বি ইত্যাদি আর শ্বেতসার বা ষ্টার্চজাতীয় খাদ্য—ভাত, আটা, সুজি প্রভৃতি। অন্যান্যের মধ্যে প্রয়োজন, শসার মত সেলুলোজজাতীয় খাদ্য, যা তুলা আর ঘাসে রয়েছে প্রচুর আর ভিটামিন, বিভিন্ন ধাতব লবণ ও অ্যাসিড প্রভৃতি। এই শেষোক্ত খাদ্য ব্যবহার করা হয় অল্প পরিমাণে। একেবারে না খেলে দেহের সমূহ ক্ষতি হয়। কিন্তু বেশী খেলে বেশী উপকার হয় না। এসব ছাড়া আছে প্রোটিন।

মানুষের শরীরের প্রায় দশ ভাগের ছয় ভাগেই জলীয় পদার্থ। বাকী চার ভাগের এক ভাগ হলো প্রোটিন। প্রোটিন আছে দেহের সর্বাংশে। কোথাও বেশী, কোথাও কম। জীবদেহ মাত্রেই প্রোটিন আছে। তাই প্রোটিন প্রায় সব খাদ্য থেকেই কম বেশী পাওয়া যায়। তবে বেশী পাওয়া যায় ফলমূল, ডাল, মাছ, মাংস, ডিম আর দুধে। প্রোটিন

আছে বহু রকমের। কেন না, এক-এক প্রকার জীবদেহে এক-এক ধরণের প্রোটিনের প্রয়োজন। সেগুলি তারা তৈরি করে নেয় তাদের খাদ্যের অন্যান্য প্রোটিন থেকে। শুধু সবুজ উদ্ভিদ মাটি থেকে জল আর নাইট্রোজেন শোষণ করে, বায়ু থেকে গ্রহণ করে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস। সূর্যের আলোর সান্নিধ্যে অঙ্গার আত্তীকরণের ক্রিয়ায় এসব উপাদান মিলিয়ে প্রথমতঃ তৈরি করে শর্করা এবং তাথেকে প্রোটিন। মানুষ বা অন্যান্য জীবদেহের প্রধান উপাদানগুলির মধ্যে জল সবচেয়ে সরল। মাত্র তিনটি পরমাণু আছে জলের অণুতে। সাধারণ চিনিতে আছে গোটা পঁয়তাল্লিশ পরমাণু। স্নেহ জাতীয় পদার্থে পরমাণুর সংখ্যা আরও বেশী। সাধারণ বনস্পতি ঘিতে আছে প্রায় পৌনে দু-শয়ের মত পরমাণু। আর প্রোটিন অণুতে পরমাণুর সংখ্যা ছয় হাজার থেকে কয়েক লক্ষ হওয়া সম্ভব।

জলের উপাদান—হাইড্রোজেন, অক্সিজেন। চিনির উপাদান হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ও কার্বন। স্নেহজাতীয় পদার্থেরও তাই। প্রোটিনে কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেনের সঙ্গে থাকে নাইট্রোজেন এবং প্রায়শঃ গন্ধক বা সালফার পরমাণু। তাছাড়া কখনও কখনও ফস্‌ফরাস, ক্যালসিয়াম, লোহা, কোবাল্ট ইত্যাদিও থাকে। পরমাণুর সংখ্যা এত বেশী হওয়ায় ও বিভিন্ন ধরণের পরমাণু থাকবার ফলে প্রোটিনের বহু বৈচিত্র্য হয়ে থাকে। কত রকমের যে প্রোটিন হতে পারে, তা শুনলে অবাক হতে হয়। একের পর ছয় শতটি শূন্য বসালে যা হয়, বিভিন্ন রকমের প্রোটিনের মোট সংখ্যা হলো তাই। এত রকম প্রোটিনের সবগুলিই মানুষের কাজে লাগে না—অনেক প্রোটিন একেবারেই সহ্য হয় না। আবার দেখা যায়, কোন কোন মানুষের শারীরিক গঠনই হয়তো এমন যে, কোন বিশেষ প্রোটিনকে ঐ দেহ সহ্য করতে পারে না। এই রকম প্রোটিনকে ইংরেজীতে বলে ফরেন প্রোটিন। সাধারণতঃ যাদের শরীরে ক্যালসিয়ামের অভাব থাকে, তাদের অনেকে ফস্‌ফরাস প্রোটিন বেশী সহ্য করতে পারে না। তাদের তাই চিংড়ি, ডিম প্রভৃতি অর্থাৎ ফস্‌ফরাসযুক্ত খাদ্য বেশী খেলে শারীরিক প্রতিক্রিয়া হতে থাকে এবং শরীর অসুস্থ হয়। আবার ঐ ধরণের প্রোটিন খুব বেশী মাত্রায় খেলেও অন্য আরেক জনের শরীরে কিছু হয় না। মানুষের পক্ষে সব প্রোটিনই ভাল নয়। সাপের বিষের মূল উপাদানও প্রোটিন।

অ্যালার্জির কারণ হলো কোন অবাঞ্ছিত ফরেন প্রোটিন। এই অবাঞ্ছিত প্রোটিন নানাভাবে মানুষের শরীরে প্রবেশ করে; যেমন—নিশ্বাসের সঙ্গে প্রোটিন-অণু ঢুকে যেতে পারে। অনেকের ফুলের গন্ধে অ্যালার্জি হতে দেখা গেছে। কোন রকম জামা-কাপড়ের সংস্পর্শেও অ্যালার্জি হতে পারে। আবার কোন বিশেষ দু-জন মানুষ গা ঘেঁষাঘেঁষি করে বসে থাকলেও একজনের দেহে অ্যালার্জি প্রকাশ পেতে দেখা গেছে। তবে সাধারণতঃ ফরেন প্রোটিনই খাদ্যের মাধ্যমে দেহে প্রবেশ করে অ্যালার্জি প্রকাশের কারণ ঘটায়।

সুধীরকুমার সেন

পারদর্শিতার পরীক্ষা

পদার্থবিদ্যায় তোমাদের মধ্যে কে কেমন পারদর্শী, তা বোঝবার জন্যে 5টি প্রশ্ন দেওয়া হলো। প্রত্যেকটি প্রশ্নের 3টি করে উত্তর দেওয়া আছে—কোন্‌টি ঠিক বলতে হবে। উত্তর দেবার জন্যে মোট সময়ঃ 3 মিনিট। প্রতিটি প্রশ্নের জন্যে নম্বর হচ্ছে 20 ; সবশুদ্ধ নম্বর 100। 100-এর মধ্যে 100 পেলে খুব ভাল, 80 বা 60 পেলে ভাল, 40 বা 20 পেলে মন্দের ভাল আর একেবারে 0 পেলে কিছু না বলাই ভাল।

1. ভূপৃষ্ঠ থেকে 250 কিলোমিটার উচ্চে বৃত্তাকার পথে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণরত কোন মহাকাশযানের একজন আরোহী একটি খালি খাবারের টিন ঐ যানের বাইরে ফেলে দিলে সেই খাবারের টিনটি

(ক) ক্রমাগতই চাঁদের দিকে যেতে থাকবে।

(খ) পৃথিবীর দিকে সোজা নেমে আসবে।

(গ) মহাকাশযানের সঙ্গে সঙ্গে চলবে।

2. একটি দাঁড়িপাল্লার একদিকে একটি বীকারে কিছু জল রয়েছে এবং অন্য দিকে সমান ওজনের বাটখারা চাপানো আছে। কেউ যদি এখন হাতে একটি পেন্সিল নিয়ে পেন্সিলটির কিয়দংশ বীকারের জলের মধ্যে ডুবিয়ে স্থিরভাবে ধরেন, তাহলে

(ক) পাল্লাটি আগের অবস্থাতেই থাকবে।

(খ) বীকারের দিকটি নেমে আসবে।

(গ) বীকারের দিকটি উঠে যাবে।

3. মোটর গাড়ির চালকের সামনে যে দর্পণ থাকে, সেটি হলো একটি

(ক) সমতল দর্পণ।

(খ) উত্তল দর্পণ।

(গ) অবতল দর্পণ।

4. আমরা যে 100 ওয়াটের বৈদ্যুতিক বাল্ব ব্যবহার করি, তা যদি 220 ভোল্টের বৈদ্যুতিক সরবরাহ ব্যবস্থার উপযোগী করে তৈরি হয়ে থাকে, তাহলে ঐ বাল্বের ফিলামেন্টের রোধ হচ্ছে

(ক) 48·4 ওহ্‌ম্‌।

(খ) 484 ওহ্‌ম্‌।

(গ) 4840 ওহ্‌ম্‌।

5. একটি পরমাণুর আয়তন প্রায়

(ক) 10^{-8} ঘন সেন্টিমিটার।

(খ) 10^{-13} ঘন সেন্টিমিটার।

(গ) 10^{-24} ঘন সেন্টিমিটার।

(উত্তর—313নং পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ব্রহ্মানন্দ দাশগুপ্ত ও জয়ন্ত বসু*

* সাহা ইনষ্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, কলিকাতা-9

কতিপয় অজ্ঞাতপ্রায় প্রাণী

আমাদের এই পৃথিবীতে প্রায় লক্ষ লক্ষ প্রাণী বাস করে এবং তাহাদের প্রত্যেকেরই প্রাণিজগতের কোন না কোন পর্বে বা শ্রেণীতে নির্দিষ্ট স্থান আছে। কিন্তু এমন কয়েক জাতীয় প্রাণা আছে, যাহাদের কোন পর্বে বা শ্রেণীতে স্থান নির্দিষ্ট করা হয় নাই। তাহার কারণ, ঐ সকল প্রাণী সম্বন্ধে খুব কম তথ্য জানবার ফলে তাহাদের এমন কোন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায় নাই, যাহার সহিত অন্য কোন পর্ব বা শ্রেণীর বৈশিষ্ট্যের মিল আছে। এখানে আমরা এই প্রকার কয়েকটি প্রায় শ্রেণীবিহীন অমেরুদণ্ডী প্রাণী সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

ব্রায়োজোয়া নামে এক শ্রেণীর সামুদ্রিক প্রাণী আছে, যাহারা দলবদ্ধভাবে বাস করে এবং উহাদের এই উপনিবেশকে অনেক সময় সমুদ্রের মাদুর (Sea-mat) আখ্যা দেওয়া হয়। এই উপনিবেশগুলি চুন বা চট্‌চটে শক্ত আঠাজাতীয় পদার্থের দ্বারা তৈয়ারী হয়। ক্ষুদ্র আয়তনবিশিষ্ট এই সকল প্রাণী বিভিন্ন রঙের হইয়া থাকে। ইহাদের মুখের কাছে প্রচুর কর্ষিকা আছে, যাহা মুখের ভিতর লুকাইতে পারা যায়। যদিও সামুদ্রিক, তবুও কিছু ব্রায়োজোয়া পুষ্করিণী বা হ্রদে পাওয়া যায়। সমুদ্রের প্রায় 3000 ফ্যাদম গভীরতায়ও ব্রায়োজোয়া পাওয়া গিয়াছে। উদাহরণস্বরূপ, বিউগুলা (1নং চিত্র), প্লুম্যাটেলা প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে। ভূতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে, এই সকল প্রাণীর আবির্ভাব হয় ক্যাম্‌ব্রিয়ান যুগে।

কোরোনিডা এমন এক শ্রেণীর প্রাণী, যাহাদের দেহ দৈর্ঘ্যে খুব ক্ষুদ্র হইতে 5 ইঞ্চি পর্যন্ত হয়। ইহারা কীটজাতীয় সামুদ্রিক প্রাণী এবং পাত্‌লা ঝিল্লী অথবা পাত্‌লা চামড়ার নলের মধ্যে বাস করে। দেহের এক প্রান্তে প্রচুর শোঁয়া থাকে। ইহারা অনেক সময়

দলবদ্ধ হইয়া বাস করে। বালি, কাদা, পাথর—এমন কি, শম্বুকজাতীয় প্রাণীর খোলকে গর্ত করিয়া বাস করে। ইহাদের মধ্যে ফোরোনিশ (2নং চিত্র) উল্লেখযোগ্য। এই শ্রেণীর প্রাণী পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র দেখা যায়।

1নং চিত্র
বিউগুলা

2নং চিত্র
ফোরোনিশ

3নং চিত্র
লিঙ্গুলা
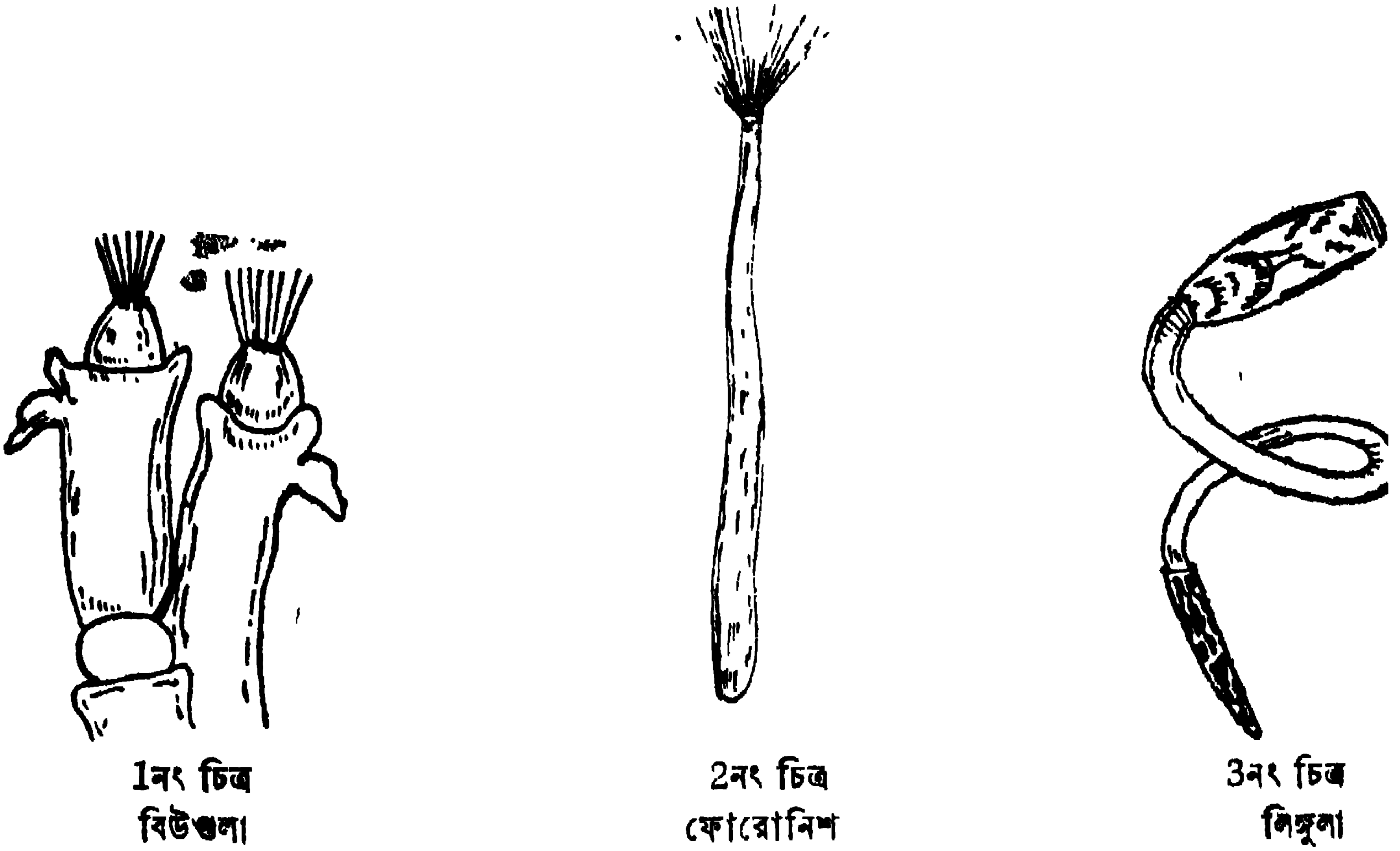
ব্রাকিওপোডা শ্রেণীর প্রাণীদের ঝিনুকের ন্যায় দুইটি শক্ত খোলক আছে। পূর্বে ইহাদের শম্বুকজাতীয় পর্বে স্থান ছিল, কিন্তু আভ্যন্তরীণ কাঠামো অন্যরূপ হইবার ফলে উহা পরিত্যক্ত হয়। ইহাদের দেহের পশ্চাৎ ভাগে ছোট অথবা বড় বৃন্ত থাকে, যাহার সাহায্যে প্রাণীটি নিজেকে অপর বস্তুর সহিত আট্‌কাইয়া রাখে। এই সকল সামুদ্রিক প্রাণী দলবদ্ধভাবে বাস করে না এবং ইহাদের সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে 2,900 ফ্যাদমের মধ্যে পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র পাওয়া যায়। লিঙ্গুলা (3নং চিত্র), ম্যাজেলানিয়া প্রভৃতি এই শ্রেণীর উল্লেখযোগ্য প্রাণী ধীরে ধীরে অবলুপ্তির পথে।

কিটোগ্‌ন্যাথা শ্রেণীর প্রাণীরা চ্যাপ্টা টর্পেডো আকারের এবং 2 হইতে 7 সেন্টিমিটার পর্যন্ত দীর্ঘ হইয়া থাকে। প্রায় স্বচ্ছ এই সকল প্রাণীর ক্ষুদ্র পাখ্‌না আছে, যাহার দ্বারা উহারা সমুদ্রে সাঁতার কাটে। ইহাদের দেহের সম্মুখভাগে শক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শোঁয়া আছে। আশ্চর্যের বিষয়, আয়তনে ক্ষুদ্র হইলেও ইহারা মাংসাশী প্রাণী। এই শ্রেণীর মধ্যে সাজিটা, ইউক্রোনিয়া এবং স্প্যাডেলা—এই তিন প্রকার প্রাণীই এখন জীবিত আছে।

ক্যালিসোজোয়া শ্রেণীর প্রাণীরা একক বা দলবদ্ধভাবে বাস করে। ইহারা চলাচল করিতে অক্ষম বলিয়া স্পঞ্জ, নানা প্রকার কীট প্রভৃতির দেহের সঙ্গে নিজেকে বৃন্তের

সাহায্যে আট্কাইয়া রাখে। দেহ 1 মিলিমিটার অপেক্ষা ক্ষুদ্র কাপের ন্যায়, যাহার চারিধারে কর্ণিকা আছে। এই প্রকার প্রাণীর মধ্যে পেডিসেলিনা, লেক্সোসোমা উল্লেখযোগ্য। ইহারা সকলেই সামুদ্রিক প্রাণী, কেবল আরনাটেলাকে আমেরিকার পুষ্করিণী বা নদীতে পাওয়া যায়।

রটিফেরাজাতীয় প্রাণীও খুবই ক্ষুদ্র, অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া ইহাদের দেখা যায় না। ইহারা পুকুর, নদী বা সমুদ্রে বাস করে। রটিফেরা জলজ উদ্ভিদাণু বা জীবাণু খাইয়া জীবণধারণ করে। রটিফেরা জাতীয় প্রাণীরা ক্ষণজীবী, এক বৎসরের মধ্যে ইহাদের অনেকগুলি বংশ পার হইয়া যায়। ইহাদের মুখের চারিধারে চক্রাকারে শোঁয়া সজ্জিত থাকে। দেহের পশ্চাৎভাগে একটি দ্বিখণ্ডিত লেজ আছে, যাহার মধ্যে সিমেণ্ট গ্ল্যাণ্ড আছে। ঐ গ্ল্যাণ্ড হইতে রস নিঃসরণ করিয়া নিজেকে অপর বস্তুর সহিত আট্কাইয়া থাকে। দেহের মধ্যভাগ চট্‌চটে শক্ত খোলকের দ্বারা আবৃত থাকে। কিছু রটিফেরা সময় সময় পরজীবীরূপে অন্য প্রাণীর দেহে বাস করে। এই শ্রেণীর মধ্যে রটিফার, ব্রাকিওনাস ইত্যাদির নাম করা যাইতে পারে।

একাইনোডেরা শ্রেণীর সামুদ্রিক কীট দৈর্ঘ্যে প্রায় 1 মিলিমিটার হয়। ইহাদের দেহ বাঁকানো ও ছোট ছোট খণ্ডে বিভক্ত। দেহের প্রত্যেক খণ্ডে কাঁটা আছে। ইহারা কাদা বা বালির মধ্যেও বাস করে। এই শ্রেণার উল্লেখযোগ্য প্রাণী একাইনোডারস।

উপরিউক্ত কোন শ্রেণীর প্রাণীর সহিত অপর কোন শ্রেণীর প্রাণীর মিল নাই। কিন্তু কোন কোন বিজ্ঞানী এই সমস্ত প্রাণীগুলিকে মলাস্কয়ডিয়া পর্বে স্থান দিয়াছেন। আবার কোন কোন বিজ্ঞানী মাত্র প্রথম তিনটি শ্রেণী—ব্রায়োজোয়া, ফোরোনিডা ও ব্রাকিওপোডাকে মলাস্কয়ডিয়াপর্বে স্থান দিয়াছেন। বস্তুতঃ প্রাণিজগতে এই সকল প্রাণীর স্থান এখনও সঠিকভাবে নির্ণীত হয় নাই।

শ্রীগৌরচন্দ্র দাস

ভাইরাস ও ডাঃ এন্‌ডার্স

ব্যাধির সঙ্গে সংগ্রামে মানুষের বিজয় অভিযান আর এক ধাপ অগ্রসর হলো—1955 সালের 12ই এপ্রিল ঘোষণা করা হয় যে, শিশু-পক্ষাঘাত রোগে প্রতিষেধক টিকা শতকরা প্রায় ·80টি ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ বলে প্রমাণিত হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই বিষয়ে ব্যাপকভাবে পরীক্ষা করা হয়েছে।

এই টিকা বর্তমানে সল্ক-টিকা নামে সারা পৃথিবীতে খ্যাতিলাভ করেছে। ম্যাসাচুসেট্‌সের অন্তর্গত কেম্ব্রিজের হার্ভার্ড মেডিক্যাল স্কুলের ডাঃ জন. এফ. এন্‌ডার্স

ও তাঁর দু-জন সহকর্মীর মৌলিক গবেষণার ফলেই শিশু-পক্ষাঘাতের প্রতিষেধক এই টিকার উদ্ভাবন সম্ভব হয়েছে। এঁরা অভিহিত হয়েছিলেন এনডার্স টীম নামে। দলের প্রবীণ সদস্য ছিলেন ডাঃ এনডার্স। অপর সদস্যদ্বয়ের নাম ডাঃ ফ্রেডারিক সি. রবিন্স ও ডাঃ টমাস এইচ. ওয়েলার। এঁরা দু-জনেই হার্ভার্ড মেডিক্যাল স্কুলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

বিভিন্ন টিস্যুর কালচারের মধ্যে শিশু-পক্ষাঘাতের ভাইরাস বৃদ্ধি পেতে পারে—এই তথ্য আবিষ্কারের জন্যে 1954 সালে ভেষজ-বিজ্ঞান ও শারীরবৃত্তে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। শিশু-পক্ষাঘাতের গবেষণার ক্ষেত্রে এটি যুগান্তকারী অগ্রগতি। কারণ এর পূর্ব পর্যন্ত একমাত্র প্রাণীর স্নায়ুতন্ত্র নিয়ে কালচারের দ্বারাই শিশু-পক্ষাঘাতের ভাইরাস জন্মানো সম্ভব ছিল। কিন্তু মানুষের ব্যবহারের উপযোগী টিকা উৎপাদনে এই পদার্থটি গ্রহণযোগ্য নয়।

ডাঃ এনডার্স একটি টেষ্ট-টিউবের মধ্যে ভাইরাসকে বহু গুণ বর্ধিত করতে সক্ষম হন। বিজ্ঞানীরা এই প্রথম জানতে পারলেন যে, বিশ্বে এর প্রয়োজন যতই থাকুক না কেন, এইভাবে উৎপাদন করে সেই প্রয়োজন মেটানো সম্ভব। একই সঙ্গে তাঁরা শিশু-পক্ষাঘাতের টিকার সঠিক সূত্রও আবিষ্কার করেন।

এনডার্স গোষ্ঠীর আবিষ্কৃত প্রক্রিয়ায় কালচার করা শিশু-পক্ষাঘাতের ভাইরাস থেকেই ডাঃ জোনাস ই. সল্ক শিশু-পক্ষাঘাতের প্রতিষেধক টিকা আবিষ্কার করেন।

ডাঃ এনডার্স গত কয়েক বছর ধরে যে সমস্ত গবেষণা করেছেন, তার ফলে তাঁর এই ধারণা জন্মেছে যে, নিম্নশ্রেণীর প্রাণীদের মধ্যে কোন কোন ধরণের ক্যান্সার রোগের কারণও ভাইরাস।

তিনি বলেছেন—সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে, ভাইরাস সংক্রমণের পর যে সমস্ত বিকৃত জীবকোষের উদ্ভব হয়, তা যে ভাইরাসকে আঁকড়ে ধরে থাকবে, এমন কোন কথা নেই। ঐ কোষগুলি ভাইরাসটিকে হারায় বটে, কিন্তু নিজেরা ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং ভাইরাস না থাকলেও বিকৃত জীবকোষের বৃদ্ধি হতে পারে। মনে হয় ভাইরাসের কাজই যেন জীবকোষকে বিকৃত করা। ভাইরাস জীবকোষকে বিকৃত করে, কিন্তু তারপর জীবকোষ আপনা থেকেই বিকৃত হতে থাকে।

মানুষের দেহে ক্যান্সারের ক্ষেত্রেও এরকম ঘটতে পারে। অণুসংক্রান্ত জীব-বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ভাইরাস যাতে ক্যান্সারের কারণ হতে না পারে, তার পদ্ধতি আবিষ্কৃত হতে পারে অথবা যে সমস্ত জীবকোষ ভাইরাসের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে বিকৃত হতে সুরু করেছে, তাদের নিয়ন্ত্রণ করা বা সুস্থ করে তোলবার পদ্ধতিও আবিষ্কৃত হতে পারে।

64 বছর বয়স্ক ডাঃ এনডার্স 1897 সালে কানেক্টিকাটের ওয়েস্ট হার্টফোর্ডে

জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালে তিনি মার্কিন নৌবহরের অন্তর্গত রিজার্ভ বিমান বাহিনীতে অফিসাররূপে কাজ করেছেন। যুদ্ধাবসানের পর তিনি পুনরায় ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন সুরু করেন এবং 1920 সালে সাহিত্যে স্নাতক উপাধি লাভ করেন। অতঃপর তিনি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে আসেন। 1922 সালে তিনি এখান থেকে সাহিত্যে স্নাতকোত্তর উপাধি এবং 1930 সালে ডক্টর অব ফিলজফি ডিগ্রী লাভ করেন। ইংরেজী সাহিত্যে পি-এইচ. ডি ডিগ্রী লাভ করাই ছিল তার মূল লক্ষ্য, কিন্তু যখন তিনি ইংরেজী নিয়ে অধ্যয়ন সুরু করেন, তখন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক নতুন প্রভাব এসে পড়লো তাঁর জীবনে। ফলে তাঁর জীবনের গতি সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে যায়। এই গতি পরিবর্তনের মূলে ছিল হান্‌স জিন্‌সারের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ। জিন্‌সার একজন খ্যাতনামা জীবাণুতত্ত্ববিদ্‌। তিনি এন্‌ডার্সকে বলেছিলেন যে, বিজ্ঞানের এই বিশেষ ক্ষেত্রটিতে কত কিছুই করবার রয়েছে। এই সাক্ষাৎকার এনডার্সকে এমনভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল যে, তিনি ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যয়ন ত্যাগ করে জীবাণুতত্ত্বের অনুশীলন সুরু করলেন।

এর পর থেকেই জীবাণুতত্ত্ব ও ভাইরাসতত্ত্বের গবেষণাতেই তাঁর জীবনের সমস্ত সময় নিয়োজিত হয়। পি-এইচ. ডি ডিগ্রী লাভের পর তিনি হার্ভার্ড মেডিক্যাল স্কুলের জীবাণুতত্ত্ব বিভাগে শিক্ষকের কাজ নেন। সেই থেকে তিনি ঐ মেডিক্যাল স্কুলের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন।

বোস্টনের শিশু হাসপাতালে সংক্রামক ব্যাধি গবেষণা বিভাগের প্রধানরূপে এন্‌ডার্স ভাইরাস সম্পর্কে গবেষণার কাজ করেছিলেন, যার ফলে তিনি নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। বর্তমানে তিনি চিলড্রেন্স মেডিক্যাল সেন্টারে কর্মরত রয়েছেন। এখানে তিনি এমন এক টিকা উদ্ভাবনের চেষ্টা করেছেন, যা হাম ও সংক্রামক যকৃৎ-প্রদাহ নিবারণে কার্যকরী হবে।

হান্‌স্ জিন্‌সারের সহকর্মীরূপে ডাঃ এন্‌ডার্স টাইফাস জীবাণু ধ্বংসকারী টিকা প্রস্তুতের পদ্ধতি উদ্ভাবনে সহায়তা করেছিলেন। মানবজাতির কাছে এটিও আশীর্বাদস্বরূপ হয়েছে। চিকিৎসাশাস্ত্রের গবেষণায় তাঁর এই ধারণা জন্মেছে যে, সাফল্যের পিছনে প্রেরণা অপেক্ষা কঠোর ও শ্রমসাধ্য কাজের মূল্য অনেক বেশী।

শিশু-পক্ষাঘাতের প্রতিষেধক টিকা আবিষ্কারের প্রায় সমস্ত কৃতিত্বটুকুই পেয়েছেন ডাঃ জোনাস সক্‌। এমন কি, তাঁর সম্মানে তাঁরই নামে টিকাটির নামকরণও করা হয়েছে। কিন্তু ডাঃ এন্‌ডার্স ও তাঁর দুই সহকর্মী বিজ্ঞানী কঠোর পরিশ্রম ও ধৈর্য সহকারে গবেষণা করেছিলেন বলেই সক্‌-টিকা আবিষ্কার করা সম্ভব হয়েছিল।

বিনয়রঞ্জন দাস

উত্তর

(পারদর্শিতার পরীক্ষা)

1. (গ)

[আমরা জানি, কক্ষপথে প্রারম্ভিক গতিবেগ ও পৃথিবীর অভিকর্ষের সম্মিলিত ফলে মহাকাশযান পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করতে থাকে। ঐ একই কারণে খাবারের টিনটিও মহাকাশযানের সঙ্গে সঙ্গে চলে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করবে।]

2. (খ)

[বীকারের জলে পেন্সিল ডুবানোর ফলে যে পরিমাণ জল অপসারিত হয়, তার ওজনের সমান একটি বল পেন্সিলের উপর উর্ধ্বাভিমুখে কার্যকর হয়। নিউটনের গতিবিদ্যার তৃতীয় সূত্র অনুযায়ী একটি সমপরিমাণ প্রতিক্রিয়া-বল জলের উপর নিম্নাভিমুখে কার্যকর হয়। ফলে, পাল্লার যে দিকে বীকার আছে, সেদিকটি নেমে আসবে।]

3. (খ)

[উত্তল দর্পণ একই আকারের সমতল বা অবতল দর্পণ অপেক্ষা বিস্তৃততর অংশের প্রতিবিম্ব গঠন করতে পারে। মোটর গাড়ির চালকের সামনে যে উত্তল দর্পণ থাকে, সেই দর্পণে গাড়ির পিছনের দৃশ্যের একটি বৃহৎ অংশ প্রতিফলিত হয়ে ক্ষুদ্রাকারে ও সোজাভাবে চালকের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে।]

4. (খ)

[কোন রোধ R-এর দু'ধারের বিদ্যুৎ-বিভবের পার্থক্য V হলে ঐ রোধে ব্যয়িত বৈদ্যুতিক ক্ষমতা

$$P = V^2/R$$

বা $R = V^2/P$

এক্ষেত্রে

$R = 220^2/100 = 484$ ওহ্‌ম্‌।]

5. (গ)

[একটি পরমাণুর ব্যাস প্রায় 10^{-8} সেন্টিমিটার। সুতরাং পরমাণুর আয়তন প্রায় 10^{-24} ঘন সেন্টিমিটার।]

প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন 1। ড্রাই-আইস কি কাজে লাগে?

শ্যামল চক্রবর্তী, পূর্বা চক্রবর্তী, বহরমপুর

প্রশ্ন 2। শ্যাওলা কি? খাদ্যের বিকল্প হিসাবে শ্যাওলাকে ব্যবহার করবার পিছনে শ্যাওলার গুণগত বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে কিছু বলুন।

কবিতা মণ্ডল, কলিকাতা-14

উঃ 1। হিমাঙ্কের বেশ কিছু নীচের তাপমাত্রায় কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসকে চাপ প্রয়োগের দ্বারা কঠিন অবস্থায় রূপান্তরিত করা যায়। এই কঠিন কার্বন ডাই-অক্সাইডকে ড্রাই-আইস বা শুক্‌নো বরফ বলা হয়। এই শুক্‌নো বরফ অবস্থার পরিবর্তনে সোজা-সুজি গ্যাসে পরিণত হয়। এই কারণেই একে শুক্‌নো বরফ বলা হয়।

খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণ, রক্ত হিমায়ন, মানসিক ব্যাধির চিকিৎসা, পরীক্ষাগারে নিম্ন তাপমাত্রা উৎপাদন ইত্যাদি কাজে শুক্‌নো বরফকে বিভিন্ন ভাবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণের ব্যাপারে সাধারণ জল থেকে তৈরি বরফের বদলে শুক্‌নো বরফকে কাজে লাগিয়ে ভাল ফল পাওয়া যায়। সাধারণ বরফের তুলনায় শুক্‌নো বরফের লীন তাপ বেশী, অর্থাৎ শুক্‌নো বরফের বেলায় অবস্থার পরিবর্তনে বেশী তাপের প্রয়োজন। তাই হিমায়নের কাজে জল থেকে তৈরি বরফের তুলনায় শুক্‌নো বরফ বেশী কাজে লাগে।

সাধারণ বরফের সঙ্গে লবণ মিশিয়ে নিম্ন তাপমাত্রার সৃষ্টি করা হয়। কিন্তু এই বরফ তাপ গ্রহণ করে জল হয়ে আধারকে সিক্ত করে। তাছাড়া এই লবণমিশ্রিত জল আধারের ক্ষয় সাধন করে। আগেই বলা হয়েছে যে, শুক্‌নো বরফ কঠিন অবস্থা থেকে সোজাসুজি গ্যাসে রূপান্তরিত হয়। কাজেই এটা পাত্রকে সিক্ত বা পাত্রের ক্ষয় সাধন করে না। তাছাড়া, শুক্‌নো বরফ দিয়ে যথেষ্ট নিম্ন তাপমাত্রা বজায় রাখা যায়। শুক্‌নো বরফ দিয়ে কৃত্রিম ভাবে বৃষ্টিপাতও ঘটানো সম্ভব।

উঃ 2। শ্যাওলা হচ্ছে এক শ্রেণীর উদ্ভিদ। এককোষী ও বহুকোষী—উভয় শ্রেণীর শ্যাওলাই হয়ে থাকে। তবে এককোষীদের অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া দেখতে পাওয়া যায় না। যাদের আমরা সাধারণতঃ দেখে থাকি, তারা বহুকোষী। বিভিন্ন জাতের শ্যাওলা দেখা যায়।

রাসায়নিক পদ্ধতির সাহায্যে শ্যাওলা থেকে জিলেটিন, স্পিরিট, প্লাষ্টিক, আয়োডিন প্রভৃতি পদার্থ পাওয়া যায়, যা বিভিন্ন ভাবে আমরা ব্যবহার করে থাকি।

বহু প্রাচীনকাল থেকেই পৃথিবীর কিছু কিছু দেশ এক শ্রেণীর শ্যাওলা থেকে দৈনন্দিন খাদ্যদ্রব্য তৈরি করে আসছে। এমন কি—জাপান, নিউজিল্যাণ্ড, হনলুলু, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে সামুদ্রিক শ্যাওলা থেকে তৈরি জেলী, আইসক্রীম ইত্যাদি খুবই সমাদর লাভ করেছে।

শ্যাওলাকে বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে, এর মধ্যে মানুষের প্রয়োজনীয় সব রকম প্রোটিনই আছে। কয়েক শ্রেণীর শ্যাওলাতে পরিমাণগতভাবে মাংস, ডিম ও দুধের তুলনায় প্রোটিনের পরিমাণ অনেক বেশী। দেখা গেছে যে, শ্যাওলার মধ্যে শতকরা ষাট ভাগেরও বেশী প্রোটিন থাকে। তাছাড়া এর মধ্যে লোহা, তামা, দস্তা, ম্যাঙ্গানিজ প্রভৃতি খনিজ দ্রব্য, ভিটামিন সি, ভিটামিন বি-12 প্রভৃতি ভিটামিন যথেষ্ট পরিমাণে থাকে। অন্য কোন প্রাকৃতিক দ্রব্যে এত বেশী পরিমাণ ভিটামিন বি-12 পাওয়া যায় না। শরীরের পুষ্টি ও বৃদ্ধির জন্যে যা কিছু প্রয়োজন, শ্যাওলার মধ্যে তাদের আধিক্য রয়েছে। শ্যাওলা থেকে চিকিৎসার জন্যে বিভিন্ন প্রকার অ্যান্টিবায়োটিক্স তৈরি হচ্ছে। শ্যাওলার এসব গুণাগুণ দেখে বিজ্ঞানীরা সাধারণ খাদ্যতালিকার মধ্যে শ্যাওলাকে অন্তর্ভুক্ত করবার চেষ্টা করেছেন। শুধু তাই নয়, এই সব বিরাট সম্ভাবনার দিকে নজর রেখে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় শ্যাওলার চাষও করা হচ্ছে। এমন কি, বিভিন্ন গ্রহ-উপগ্রহে পাড়ি দেবার সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপায়িত করবার প্রয়োজনে এবং মহাকাশ গবেষণায় শ্যাওলা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে চলেছে। বর্তমানে পৃথিবীব্যাপী খাদ্য-সমস্যার দিনে শ্যাওলাকে সাধারণ খাদ্যদ্রব্যের সমপর্যায়ভুক্ত করতে পারলে এই সমস্যার সমাধান হবে।

শ্যামসুন্দর দে*

* ইনস্টিটিউট অব রেডিও-ফিজিক্স অ্যাণ্ড ইলেকট্রনিক্স, বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা-9

বিবিধ

বিজ্ঞানে রবীন্দ্র পুরস্কার

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রদত্ত 1970-'71 সালের বিজ্ঞানে রবীন্দ্র পুরস্কার পেয়েছে শ্রীজিতেন্দ্র কুমার গুহ কর্তৃক রচিত এবং বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত 'মহাকাশ পরিচয়' নামক পুস্তকখানি। 'মহাকাশ পরিচয়' গ্রন্থে জ্যোতির্বিজ্ঞার বিভিন্ন বিষয়, মহাকাশ অভিযান, চন্দ্রপৃষ্ঠে মানুষের প্রথম পদার্পণ প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

রবীন্দ্র পুরস্কারের আর্থিক মূল্য পাঁচ হাজার টাকা।

ভারতের লোকসংখ্যা প্রায় পঞ্চান্ন কোটি

12ই এপ্রিল 1971 সালের লোকগণনার মোটামুটি যে হিসাব ঘোষণা করা হয়েছে, তাতে জানা যায় যে, নেফা, জম্মু ও কাশ্মীর বাদ দিয়ে ভারতের বর্তমান লোকসংখ্যা হচ্ছে 54 কোটি 69 লক্ষ 55 হাজার 945। মহিলা অপেক্ষা পুরুষের সংখ্যা দু-কোটির মত বেশী। 1971 সালে 1লা এপ্রিল ভারতে পুরুষের সংখ্যা হচ্ছে 28 কোটি 30 লক্ষ 55 হাজার 987 আর মহিলার সংখ্যা হচ্ছে 26 কোটি 38 লক্ষ 99 হাজার 959।

1961-71 সাল এই দশ বছরে জন্মের হার হচ্ছে 24'57 শতাংশ, পূর্ববর্তী দশ বছরে এই হার ছিল 21'51 শতাংশ। ভারতের রেজিষ্ট্রার জেনারেল এবং সেন্সাস কমিশনার শ্রী এ. চন্দ্রশেখর 12ই এপ্রিল যে তথ্য প্রকাশ করেন, তাতে জানা যায় যে, সরকারীভাবে ভারতের লোকসংখ্যা যে 56 কোটি 10 লক্ষ ধরা হয়েছিল, প্রকৃত গণনায় এই সংখ্যা তার চেয়ে 1 কোটি 40 লক্ষ কম। সেন্সাস কমিশনারের রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, সমগ্র দেশব্যাপী যে পরিবার পরিকল্পনা অভিযান চালানো হয়েছে, অলক্ষ্যে তার আশাতিরিক্ত ফল পাওয়া গেছে।

1961 সালের লোকগণনার হিসাবে দেখা যায় যে, সে সময়ে ভারতের লোকসংখ্যা ছিল 41 কোটি 90 লক্ষ 72 হাজার 582। গত দশ বছরে লোকসংখ্যা 10 কোটি 78 লক্ষ 83 হাজার 363 বৃদ্ধি পেয়েছে। ভারতের লোকসংখ্যা সমগ্র
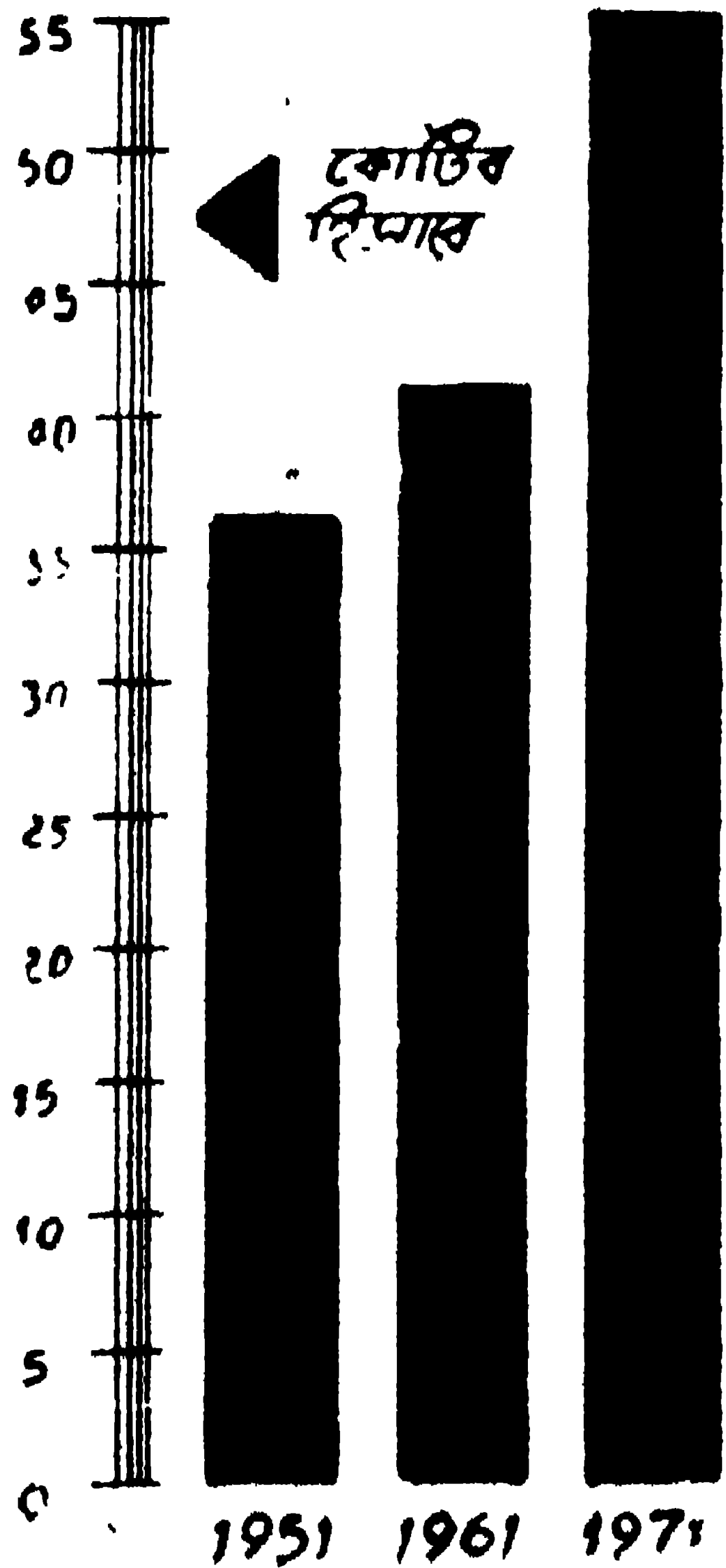
লোকগণনার হিসাব অনুযায়ী প্রতি দশ বছরে ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার চার্টে দেখানো হয়েছে।

বিশ্বের লোকসংখ্যার সাত ভাগের এক ভাগ। বিশ্বের লোকসংখ্যা 371 কোটি বলে আনুমানিক হিসাবে জানা যায়। একমাত্র চীনের লোকসংখ্যা হচ্ছে 75 কোটি। ভারতের পরেই হচ্ছে রাশিয়া। 1970 সালে রাশিয়ার লোকগণনা থেকে জানা যায় যে, রাশিয়ার লোকসংখ্যা হচ্ছে 24 কোটি 30 লক্ষ।

ভারতে লোকবসতি হচ্ছে প্রতি বর্গকিলোমিটারে 182। সাক্ষর ব্যক্তির হার হচ্ছে 29.35 শতাংশ। এর মধ্যে সাক্ষর পুরুষের হার হচ্ছে 39.49 শতাংশ, সাক্ষর মহিলার হার হচ্ছে 18.47 শতাংশ।

1971 সালের লোকগণনার হিসাবে দেখা যায় যে, লোকসংখ্যার দিক থেকে উত্তর প্রদেশ হচ্ছে প্রথম। উত্তর প্রদেশের লোকসংখ্যা হচ্ছে 8 কোটি 82 লক্ষ 99 হাজার 453। এর পরেই বিহারের স্থান—বিহারের লোকসংখ্যা হচ্ছে 5 কোটি 63 লক্ষ 87 হাজার 296। তৃতীয় স্থান মহারাষ্ট্রের—5 কোটি 2 লক্ষ 95 হাজার 1। চতুর্থ স্থান হচ্ছে পশ্চিম বঙ্গের—4 কোটি 44 লক্ষ 40 হাজার 95। পঞ্চম স্থান অন্ধ্রের—4 কোটি 33 লক্ষ 94 হাজার 951। ষষ্ঠ স্থান মধ্য প্রদেশের—4 কোটি 14 লক্ষ 49 হাজার 729। 1961 সালে পশ্চিম বঙ্গের স্থান ছিল পঞ্চম। এবারে পশ্চিম বঙ্গের স্থান চতুর্থ। উত্তর প্রদেশের লোকসংখ্যা মোট লোকসংখ্যার 16.14 শতাংশ, পশ্চিম বঙ্গের লোকসংখ্যা মোট লোকসংখ্যার 8.12 শতাংশ।

কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলগুলির মধ্যে লোকসংখ্যার দিক থেকে দিল্লী হচ্ছে প্রথম। দিল্লীর লোকসংখ্যা—40 লক্ষ 44 হাজার 338। লাক্ষাদ্বীপ, মিনিকয় ও আমিনদিবির লোকসংখ্যা হচ্ছে 31 হাজার 798।

কেরল হচ্ছে সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ রাজ্য। এখানে প্রতি বর্গকিলোমিটারে লোকবসতি হচ্ছে 548। তার পরেই পশ্চিম বঙ্গের স্থান—প্রতি বর্গকিলোমিটারে 507।

1961-71 সালে জন্মের হার সবচেয়ে বেশী নাগাভূমিতে, তার পরেই আসামের স্থান। এর পর স্থান হচ্ছে যথাক্রমে হরিয়ানা, জম্মু ও কাশ্মীর, মধ্য প্রদেশ ও রাজস্থানের। নাগাভূমিতে জন্মের হার হচ্ছে 39.64 শতাংশ, আসামে—33.51, হরিয়ানায়—31.36, জম্মু ও কাশ্মীরে—29.60, মধ্য প্রদেশে—28.04, রাজস্থানে—27.63 শতাংশ।

মহাকাশে বন্দর প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ

মহাকাশে একটি স্থায়ী যন্ত্রাগার প্রতিষ্ঠা এবং মহাকাশে যাতায়াতের জন্যে একটি বন্দর স্থাপনকল্পে সোভিয়েট ইউনিয়ন 16ই এপ্রিল কয়েকটি ধারাবাহিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা সুরু করেছে এবং প্রথম উদ্যোগে পৃথিবীর কক্ষপথে একটি যন্ত্রাগার পাঠিয়েছে। এর নাম দেওয়া হয়েছে স্যালুট।

সংবাদ প্রতিষ্ঠান টাস জানিয়েছেন, কৃত্রিম উপগ্রহটির নির্মাণ-পদ্ধতি এবং যন্ত্রগুলির কার্যকারিতা পরীক্ষা করে দেখা এবং সঙ্গে সঙ্গে বৈজ্ঞানিক গবেষণা চালানোই এই নতুন পরীক্ষার উদ্দেশ্য।

ইংল্যাণ্ডের খ্যাতনামা জ্যোতির্বিজ্ঞানী স্যার বারনার্ড লোভেল বলেছেন, মহাকাশে পৃথিবীর কক্ষপথে সোভিয়েট ইউনিয়ন আজ যে যন্ত্রাগারটি স্থাপন করলো, সেটা হয়তো মহাকাশে আর এক বিস্ময় সৃষ্টির সূচনা।

নাইকুড়িতে বিজ্ঞান প্রদর্শনী ও আলোচনা সভা

মেদিনীপুর জেলায় তমলুকের কাছে নাইকুড়ি ঠাকুরদাস ইনষ্টিটিউশন ও স্থানীয় বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিদের উদ্যোগে এবং বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ ও বিড়লা মিউজিয়ামের সহযোগিতায় বিজ্ঞান-

প্রাঙ্গণে গত 17, 18 ও 19শে এপ্রিল তিন দিন-ব্যাপী বিজ্ঞান প্রদর্শনী ও আলোচনা সভা বিশেষ সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সহ-সভাপতি এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যার প্রাক্তন প্রধান অধ্যাপক ডক্টর জ্ঞানেন্দ্রলাল ভাদুড়ী এবং পৌরোহিত্য করেন মেদিনীপুর কলেজের রসায়ন বিভাগের প্রধান অধ্যাপক শ্রীবিনয়েন্দ্রনাথ সেন। অনুষ্ঠানের সাফল্য কামনা করে বিজ্ঞান পরিষদের সভাপতি জাতীয় অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু এবং প্রবীণ বিজ্ঞানী অধ্যাপক প্রিয়দারঞ্জন রায় শুভেচ্ছা বাণী প্রেরণ করেন।

প্রথম দিনের আলোচনা সভায় বিজ্ঞান পরিষদের কর্মসচিব ডক্টর জয়ন্ত বসু উপস্থিত ছিলেন। এই দিন বিজ্ঞান পরিষদের কার্যকরী সমিতির সদস্য শ্রীশঙ্কর চক্রবর্তী স্লাইড সহযোগে মহাকাশ-বিজয় সম্পর্কে একটি মনোজ্ঞ আলোচনা করেন। বিড়লা ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল অ্যাণ্ড টেকনোলজিক্যাল মিউজিয়াম বিজ্ঞান বিষয়ক চলচ্চিত্র প্রদর্শন করেন এবং সবশেষে '42' চলচ্চিত্রটি প্রদর্শিত হয়। দ্বিতীয় দিনের আলোচনা-সভায় সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকার বিশ্ববিজ্ঞান বিভাগের পরিচালক শ্রীসমরজিৎ কর আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কে এবং বিজ্ঞান পরিষদের সহযোগী-কর্মসচিব শ্রীরবীন বন্দ্যোপাধ্যায় রসায়ন বিজ্ঞানের আধুনিক অগ্রগতি সম্পর্কে আলোচনা করেন। এই সভায় ডক্টর ভাদুড়ী 'কি ভাবে বিজ্ঞানী হওয়া যায়' প্রসঙ্গে একটি মনোজ্ঞ আলোচনা করেন। এই দিন বিদ্যালয়ের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানও হয়। শ্রীশঙ্কর চক্রবর্তী স্লাইড সহযোগে মানুষের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে আলোচনা করেন। অনুষ্ঠানের শেষে বিজ্ঞান বিষয়ক ও 'বীরেশ্বর বিবেকানন্দ' চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়।

বিজ্ঞান প্রদর্শনীতে বিড়লা মিউজিয়ামের লোকরঞ্জক বিজ্ঞান বিষয়ক কার্যকর মডেল, বিজ্ঞান পরিষদের সহযোগী-কর্মসচিব শ্রীশ্যামসুন্দর দে'র পরিচালনায় বিজ্ঞান পরিষদের 'হাতে-কলমে বিভাগ'-এর মডেল এবং বিদ্যালয়ের ছাত্রদের তৈরি পদার্থ-বিজ্ঞান, রসায়ন, প্রাণিবিদ্যা উদ্ভিদবিদ্যাবিষয়ক মডেল ও পরীক্ষা, কৃষিকার্য ও সারসম্পর্কিত তথ্যচিত্র ও নিদর্শন এবং ডি ভি সি-র একটি মডেল প্রদর্শিত হয়। বিড়লা মিউজিয়াম ও কলিকাতার মার্কিন তথ্য সংস্থার সৌজন্যে চন্দ্রাভিযানের চিত্র ও চার্ট প্রদর্শিত হয়। এই সঙ্গে বিজ্ঞান পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত ও অন্যান্য প্রকাশকদের বিজ্ঞান পুস্তকের একটি প্রদর্শনীও হয়। প্রদর্শনী দেখার জন্যে নাইকুড়ি ও আশেপাশের গ্রামের ছাত্রছাত্রী ও সাধারণ লোকের মধ্যে গভীর আগ্রহের সঞ্চার হয়। তার ফলে আরও একদিন প্রদর্শনী বর্ধিত করতে হয়। তিন দিনব্যাপী এই বিজ্ঞান প্রদর্শনী ও আলোচনা সভার আয়োজনে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীপরেশচন্দ্র মালাকার, তমলুক 1নং ব্লকের বি ডি ও শ্রীসতীশচন্দ্র বসু, সর্বশ্রী বলাই লাল মান্না, কানাইলাল মান্না, বীরেন্দ্রনাথ বেরা ও নিরঞ্জন সাহু প্রমুখ স্থানীয় ব্যক্তিরা বিশেষভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা করেন।

রাশিয়ার মহাকাশযান জোণ্ড-10

23শে এপ্রিল মস্কো থেকে রয়টার ও এ পি

জানিয়েছেন, তিনজন মহাকাশচারী—অধিনায়ক কর্নেল শাতালোভ, ফ্লাইট ইঞ্জিনীয়ার ইয়েলিসিয়েভ এবং টেষ্ট ইঞ্জিনীয়ার রুকাভিস্‌নিকোভ—ভারতীয় সময় সকাল 5-15 মিঃ-এ সোয়ুজ-10 মহাকাশযানে চড়ে পৃথিবীর কক্ষপথে উঠে গিয়েছেন।

সোয়ুজ-10 সম্পর্কে বলা হয়েছে, এর প্রত্যেকটি যন্ত্রপাতি স্বাভাবিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে—মহাকাশচারীদের কুঠুরিতে পৃথিবীর অবস্থা সৃষ্টি করে দেওয়া হয়েছে এবং সেখানে তাঁরা স্বাভাবিক জীবনযাপন করে চলেছেন।

'টাস' আরও জানিয়েছেন—সোয়ুজ-10 মহাকাশযান স্যালুট-এর সঙ্গে যুক্তভাবে কয়েকটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাবে।

24শে এপ্রিল সোয়ুজ-10 আরোহীবিহীন মহাকাশযান স্যালুট-এর সঙ্গে মিলিত হয়। দুটি যানকে পরস্পরের সঙ্গে বেঁধে রাখা সম্ভব কিনা এবং উভয়ের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থাটি নির্ভরযোগ্য কিনা, তাও পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে।

25শে এপ্রিল সোয়ুজ-10 নিরাপদে সোভিয়েট মধ্য এশিয়ায় নেমে আসে এবং তিনজন মহাকাশচারী ভালই ছিলেন।

সবুজ বিপ্লব সমগ্র ভারতে প্রসারিত হতে পারে

বর্তমানে ভারতের পাঞ্জাব ও হরিয়ানায় যে সবুজ বিপ্লব দেখা দিয়েছে, তা ভবিষ্যতে সংশ্লিষ্ট সকলের সমবেত প্রচেষ্টায় সমগ্র ভারতের কৃষি-জীবনের সাধারণ বৈশিষ্ট্যে পরিণত হতে পারে। কেন না, এরূপ অন্তর্নিহিত শক্তি ঐ বিপ্লবের আছে।

গত 29শে ও 30শে মার্চ আমেরিকান ইউনিভার্সিটি সেন্টারের উদ্যোগে কলিকাতায় দু-দিনের এক আলোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। আলোচ্য বিষয় ছিল: সবুজ বিপ্লব ও তার সঙ্গে পশ্চিম বঙ্গের সম্পর্ক।

পশ্চিম বঙ্গ সরকারের কৃষি অধিকর্তা ডক্টর কে. সেনগুপ্ত এরূপ আশা প্রকাশ করেছেন যে, সম্প্রতি কয়েক বছরের মধ্যে চাষ-আবাদের ক্ষেত্রে পশ্চিম বঙ্গে যে ক্রান্তি দেখা গেছে, তা এই রাজ্যের কৃষি ও কৃষিভিত্তিক শ্রমশিল্পে দ্রুত পরিবর্তন আনতে সাহায্য করবে।

যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থার (ইউ. এস. এ. আই. ডি.) কৃষি অর্থনীতি বিষয়ক উপদেষ্টা ডক্টর মার্টিন বিলিংস্‌ সবুজ বিপ্লবের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন যে, ভারতের এই নতুন ঘটনাটি প্রকৃত প্রস্তাবে সার ব্যবহার ও পর্যাপ্ত ফলনশীল নতুন ধরণের বীজ ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিপ্লব।

আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থার পরিসংখ্যান বিষয়ক পরামর্শদাতা ডক্টর পল জোনাস অত্যন্ত জোর দিয়ে প্রস্তাব করেন যে, সবুজ বিপ্লবের অঞ্চলগুলিতে কৃষকদের হাতে যে অব্যবহৃত অতিরিক্ত সম্পদ আছে, তা অন্যান্য এলাকায় সবুজ বিপ্লব আনবার জন্যে বিনিয়োগ করতে হবে।

বসু বিজ্ঞান মন্দিরের ডক্টর পি. এন. নন্দী এবং আশুতোষ কলেজের অধ্যাপক পরিমল কর পশ্চিম বঙ্গে এক নতুন জাগরণের আভাস দেখা যাচ্ছে বলে জানান। তাঁরা আশা করেন যে,

সবুজ বিপ্লব যথাসম্ভব সত্বরই পশ্চিম বঙ্গের জীবনে পরিব্যাপ্ত হবে।

কৃষিশিল্পে ভারতবর্ষের সাফল্যের সঙ্গে কেন আমেরিকার মূল নীতির সাফল্য জড়িত আছে, তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের ভারত বিষয়ক সিনিয়র ইকনমিক্স অফিসার মিঃ টাইগার বলেন যে, 1953 সাল থেকে আমেরিকা ভারতবর্ষকে যে সাহায্য দিয়েছে, তার একটা বড় অংশই কৃষিভিত্তিক শিল্প এবং অত্যাবশ্যক ইনফ্রাস্ট্রাকচার বা পশ্চাৎ কাঠামো গড়ে তোলবার জন্যে বিনিয়োগ করা হয়েছে।

পশ্চিম বঙ্গের কৃষি বিভাগের অতিরিক্ত ডিরেক্টর ডাঃ এ. টি. সান্তাল সবুজ বিপ্লবের জন্যে প্রয়োজনীয় সরঞ্জামের কথা আলোচনা প্রসঙ্গে পশ্চিম বঙ্গের চাষীগণ কর্তৃক সার, চাল ও গমের উচ্চ ফলনশীল বীজের ক্রমবর্ধমান ব্যবহারের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, এখন আমাদের প্রয়োজন নতুন উচ্চ ফলনশীল জাতের সরু চাল, যা পশ্চিম বঙ্গের জলবায়ুর উপযোগী হবে।

একর প্রতি উৎপাদনে এবং নতুন পদ্ধতি ও সরঞ্জাম ব্যবহারের দ্বারা পশ্চিম বঙ্গের চাষীরা যে অগ্রগতি লাভ করেছে, পশ্চিম বঙ্গের কৃষি বিভাগের যুগ্ম ডিরেক্টর ডক্টর এস. নাগবিশ্বাস তাতে সন্তোষ প্রকাশ করেন।

বিজ্ঞপ্তি

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত যাবতীয় পুস্তক এখন হইতে কেবল মেসার্স ওরিয়েন্ট লঙম্যান অ্যাণ্ড কোং হইতে (17, চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউ, কলিকাতা-13) বিক্রয় করা হইবে। সদস্যগণ বাদে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ কার্যালয় হইতে এখন আর কাহারো নিকট কোন পুস্তক বিক্রয় করা হইবে না।

সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য
শ্রীমিহিরকুমার ভট্টাচার্য কর্তৃক পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রিট, কলিকাতা-6 হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ 37/7 বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত।

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

চতুর্বিংশ বর্ষ | জুন, 1971 | ষষ্ঠ সংখ্যা

জৈব রসায়নে অতিবেগুনী আলোক বর্ণালীর ব্যবহার

কালীশঙ্কর মুখোপাধ্যায়*

আধুনিক যুগে যে সমস্ত যান্ত্রিক প্রয়োগ-কৌশলগুলি জৈব রসায়ন বিজ্ঞানীমহলে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে, অতিবেগুনী আলোক বর্ণালীবীক্ষণ পদ্ধতি (Ultraviolet spectroscopy) সেগুলির অন্যতম। এই প্রয়োগ-কৌশলের মূলে রয়েছে কিছু কিছু রাসায়নিক যৌগ—বিশেষ করে জৈব যৌগের আলোকশক্তির শোষণ। পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর দেখা গেছে, কোন জৈব যৌগের উপর অতিবেগুনী এলাকার আলোক-শক্তি[1] চালনা করলে তা অবলোহিত (Infra-red) এলাকার আলোক শক্তির মত যৌগের অন্তঃস্থ শক্তির পরিবর্তন ঘটাতে পারে। কিন্তু যেহেতু অতিবেগুনী এলাকার আলোকশক্তির পরিমাণ অবলোহিত এলাকার শক্তির চেয়ে অনেক বেশী, তাই এই আলোকশক্তি শোষণের ফলে পরীক্ষাধীন যৌগের ঘূর্ণন, স্পন্দন এবং ইলেক-ট্রনিক—এই তিন ধরণের অন্তঃস্থ শক্তিরই পরিবর্তন ঘটে। আমরা জানি, কোন অণুর ইলেকট্রনিক শক্তি তার ইলেকট্রনিক বিন্যাস ব্যবস্থার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। সুতরাং ইলেকট্রনিক শক্তির পরিবর্তন হবার সঙ্গে সঙ্গে ঐ অণুর ইলেকট্রন-বিন্যাস ব্যবস্থা পাল্টে যাবে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কি কি ধরণের ইলেকট্রন-বিন্যাস ব্যবস্থা পরিবর্তিত হবে? বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, জৈব যৌগের ক্ষেত্রে (ক) সিগ্‌মা (σ) অর্থাৎ যে সকল ইলেকট্রন সম্পৃক্ত বণ্ড তৈরি

1. বিদ্যুৎ-চুম্বক বর্ণালী হচ্ছে তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য-ভিত্তিক সমগ্র রেডিয়েশনের ক্রমবিন্যাস। এই বর্ণালীর 180-400 মিলিমাইক্রন এলাকাটা অতিবেগুনী এবং 2-16 মাইক্রন এলাকাটা অবলোহিত বলে চিহ্নিত করা হয়। তাদের শক্তির পরিমাণ হচ্ছে, যথাক্রমে 10-250 K Cal/mole এবং 1-10 K Cal/mole। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, অবলোহিত এলাকার আলোক-শক্তি শুধুমাত্র ঘূর্ণন ও স্পন্দন ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম।

* রসায়ন বিভাগ, সরকারী কলেজ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া

করে, (খ) পাই (π) বা যারা অসম্পৃক্ত বণ্ডের উৎপত্তি ঘটায় এবং (গ) অ-বন্ধন (Non-bonding lone pair), অর্থাৎ যারা কোন স্বাভাবিক রাসায়নিক বণ্ডের সঙ্গে যুক্ত থাকে না ইত্যাদি ইলেকট্রনগুলি অতিবেগুনী এলাকার আলোক শক্তি শোষণ করে তাদের স্বাভাবিক স্তর থেকে উচ্চতর ইলেকট্রন-বিন্যাস স্তরে উন্নীত হয়। আণবিক কক্ষ-তত্ত্বে এই উচ্চতর স্তরকে প্রতি-বন্ধন কক্ষ বলা হয় এবং সিগ্‌মা ও পাই স্তরের প্রতি-বন্ধন কক্ষগুলিকে তারকা চিহ্ন দিয়ে প্রকাশ করা হয়; যেমন সিগমা* (σ^*) এবং পাই* (π^*)। কিন্তু অ-বন্ধন (n) স্তরের ইলেকট্রনগুলি প্রত্যক্ষভাবে রাসায়নিক বণ্ডের সঙ্গে জড়িত না থাকায় সেগুলির কোন নিজস্ব প্রতি-বন্ধন কক্ষ দেখা যায় না। তবে তারা সিগ্‌মা এবং পাই স্তরের প্রতি-বন্ধন কক্ষে (σ^* ও π^*) স্থানান্তরিত হতে পারে। এই তিন শ্রেণীর ইলেকট্রনের জন্যে চার প্রকার অবস্থান্তর-স্তর (Transition state) লক্ষ্য করা যাবে, যথা—(এক) $\sigma—\sigma^*$, (দুই) $\pi—\pi^*$, (তিন) $n—\sigma^*$ এবং (চার) $n—\pi^*$

উপরিউক্ত অবস্থান্তরগুলির মধ্যে $\sigma—\sigma^*$ স্থানান্তরের জন্যে যথেষ্ট পরিমাণ শক্তি দরকার এবং সেই পরিমাণ শক্তি অতিবেগুনী এলাকার আলোক-তরঙ্গ থেকে সরবরাহ করা সম্ভব নয়। তাই দেখা যায়, যে সকল জৈব যৌগের যোজন-স্তরের (Valence-shell) সমস্ত ইলেকট্রনগুলি সিগ্‌মা বণ্ড বা সিঙ্গেল বণ্ড তৈরির জন্যে ব্যবহৃত হয়েছে, সেগুলি সাধারণ অতিবেগুনী এলাকার শক্তি শোষণ করে না, যেমন দেখা যায় হাইড্রো-কার্বন জাতীয় যৌগের ক্ষেত্রে। অবশ্য সাইক্লো-প্রপেন শ্রেণীর যৌগগুলি একমাত্র ব্যতিক্রম। এই ব্যতিক্রমের কারণ সাইক্লোপ্রপেন রিং-এর কিছু কিছু ধর্ম অসম্পৃক্ত বা পাই-বণ্ডের অনুরূপ। কিন্তু $n \rightarrow \sigma^*$, $n \rightarrow \pi^*$ এবং $\pi \rightarrow \pi^*$ স্থানান্তরের জন্যে যে পরিমাণ শক্তি প্রয়োজন, তা সাধারণ অতিবেগুনী এলাকার আলোক-তরঙ্গ থেকে সরবরাহ করা সম্ভব বলে এই সকল অবস্থান্তরের জন্যে প্রধানতঃ আলোচ্য শক্তির শোষণ ঘটে। এখানে একটা কথা বলে রাখা ভাল যে, $n \rightarrow \pi^*$ স্থানান্তর সব থেকে কম শক্তির (দীর্ঘ তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের), $n \rightarrow \sigma^*$ অবস্থান্তর বেশী শক্তির (কম তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের) এবং $\pi \rightarrow \pi^*$ পরিবর্তন $n \rightarrow \sigma^*$ ও $n \rightarrow \pi^*$ এর মাঝামাঝি শক্তির আলোক-তরঙ্গ শোষণ করে।

উপরের আলোচনা থেকে এ কথা স্পষ্ট যে, অতিবেগুনী এলাকার যে পরিমাণ আলোক শক্তি শোষিত হবে, তা যদি ঠিকমত পরিমাপ করা যায়, তা হলে পরীক্ষাধীন যৌগটির বণ্ডিং ইলেক-ট্রনগুলি সিগ্‌মা, পাই এবং অ-বন্ধন শ্রেণীর কিনা অর্থাৎ ঐ যৌগটির ক্রমোফোরিকপুঞ্জ[2] কি রকম, সে সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যেতে পারে। সুতরাং অতিবেগুনী এলাকার যে তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যে সর্বোচ্চ পরিমাণ শক্তি শোষিত হবে, সেই তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য (যেটাকে $\lambda_{সর্বোচ্চ}$ বা $\lambda_{maximum}$ বলে অভিহিত করা হয়; λ হচ্ছে তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের সংকেত) এবং শোষণের তীব্রতা খুব নিখুঁতভাবে নির্ধারণ করা একান্ত প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে বিবেচনাধীন যৌগটিকে এমন একটা দ্রাবকে গুলে নিতে হবে, যা সাধারণতঃ অতিবেগুনী এলাকায় তেমন উল্লেখযোগ্য শক্তি শোষণ করে না। বহুল ব্যবহৃত দ্রাবক হচ্ছে 95 শতাংশ কোহল[3]। এখন দ্রবণকে

2. ক্রমোফোরিক পুঞ্জ (Chromophoric group)—সেই সকল বিচ্ছিন্ন কার্যকরীপুঞ্জ, যারা অতিবেগুনী এলাকার আলোক শক্তি শোষণ করতে পারে। আর যে সমস্ত কার্যকরীপুঞ্জ এই এলাকার আলোক শক্তি শোষণ করতে পারে না, তাদের অক্সোক্রোম (Auxochrome) বলে।

3. 95 শতাংশ কোহল ছাড়া অন্য দ্রাবকও

কোয়ার্ট্জ নির্মিত এক ঘনসেন্টিমিটার আয়তনের ছোট্ট একটা পরীক্ষাপাত্রে নেওয়া হয় এবং পাত্রটিকে বর্ণালীবীক্ষণ যন্ত্রস্থিত আলোকের উৎস-স্থলের কাছাকাছি কোন এক নির্দিষ্ট তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যে বসানো হয়। এই পদ্ধতিতে প্রয়োজনীয় আলোকের উৎস হিসাবে হাইড্রোজেন নির্গমন দীপ ব্যবহৃত হয় এবং ঐ দীপ থেকে পরীক্ষাপাত্রের উপর আলোক-তরঙ্গ চালনা করে যে পরিমাণ আলোক শক্তি শোষিত হবে, তা যন্ত্রস্থিত রেকর্ডারে লিপিবদ্ধ করা হয়। অনুরূপভাবে পরীক্ষাপাত্র ও আলোর উৎসস্থলের মধ্যবর্তী দূরত্বে আস্তে আস্তে পরিবর্তন করে পৃথক পৃথক তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যে শোষিত আলোক শক্তির পরিমাণ নির্ণয় করা হয় এবং সেগুলিকে একটা লেখচিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। এই লেখচিত্রটিই (1নং চিত্র) হচ্ছে পরীক্ষাধীন যৌগটির ঈপ্সিত অতিবেগুনী আলোক বর্ণালী। যে সকল বর্ণালীবীক্ষণ যন্ত্রে স্বয়ংক্রিয় রেকর্ডার থাকে, সে ক্ষেত্রে এই লেখচিত্রের এক অক্ষ তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য আর অন্য অক্ষ শোষিত আলোক শক্তির পরিমাণ বা আলোকীয় ঘনত্ব নির্দেশ করে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে এক অক্ষ তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য আর অন্য অক্ষ আণবিক শোষণ সহগ সূচিত করে। আণবিক শোষণ সহগ হচ্ছে শোষণের তীব্রতার পরিমাপক এবং আলোক ঘনত্বের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কযুক্ত। দেখা গেছে, আলোকীয় ঘনত্ব A হলে আণবিক

1নং চিত্র

ব্যবহার করা যেতে পারে, তবে সেক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংশোধন করা দরকার। দেখা গেছে অন্য দ্রাবক ব্যবহারপ্রাপ্ত λ সর্বোচ্চ-এর মান নিম্নরূপ সংশোধন করলে কোহলের অনুরূপ λ সর্বোচ্চ-এর মান পাওয়া যাবে, ইথার, +7 মিঃ মাঃ, ক্লোরোফরম, +1 মিঃ মাঃ, হেক্সেন, +11 মিঃ মাঃ, মেথানল, +0 মিঃ মাঃ, ডায়োক্সেন, +5 মিঃ মাঃ এবং জল, −8 মিঃ মিঃ

শোষণ সহগ ε (এপসাইলন) হবে $\frac{A}{C.l}$; এখানে C নির্দেশ করছে আণবিক ঘনত্ব এবং l হচ্ছে আলোক-অতিক্রমণ পথ। এক ঘন সেণ্টিমিটার আয়তনের পরীক্ষাপাত্র ব্যবহার করলে l-এর মান হবে এক এবং সে ক্ষেত্রে কোন নির্দিষ্ট তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যে আলোকীয় ঘনত্বকে দ্রবণের আণবিক ঘনত্ব দিয়ে ভাগ করলে আণবিক শোষণ সহগ (ε) পাওয়া যাবে। সুতরাং ঐ লেখ-চিত্র থেকে খুব সহজেই শোষণের তীব্রতা নির্ণয় করা সম্ভব। এই লেখচিত্রে পৃথক পৃথক তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যে নির্ণীত সর্বোচ্চ পরিমাণ শোষিত আলোক শক্তিগুলি শৃঙ্গ[4] আকারে অবস্থান করে এবং সেগুলির অবস্থানগুলিকে প্রকাশ করা হয় λ সর্বোচ্চ সংকেতের সাহায্যে; যেমন λ সর্বোচ্চ ২৫০ মিঃ মা., λ সর্বোচ্চ ২৮০ মিঃ মা. ইত্যাদি।

প্রসঙ্গক্রমে এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, 200 মিঃ মা.-এর ঊর্ধ্বসীমার শোষিত আলোক শৃঙ্গগুলিই প্রধানতঃ জৈব যৌগগুলির বৈশিষ্ট্যমূলক ক্রমোফোরের ইঙ্গিত বহন করে। তাই জৈব যৌগের ক্ষেত্রে 200 মিলিমাইক্রনের ঊর্ধ্বসীমার শৃঙ্গগুলির অবস্থানের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয় বেশী। সুতরাং 200 মিলিমাইক্রন ঊর্ধ্বসীমার অতিবেগুনী এলাকার আলোক রশ্মি কোন জৈব যৌগের উপর পূর্বোক্ত পদ্ধতি অনুযায়ী চালনা করে যে বর্ণালী পাওয়া যাবে, তার প্রকৃতি, সর্বোচ্চ পরিমাণ শোষিত আলোক শক্তি-শৃঙ্গের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য (λ সর্বোচ্চ) এবং সেই শৃঙ্গের তীব্রতা (ε) যথাযথ অনুধাবন করতে পারলে পরীক্ষা-যৌগটির ক্রমোফোর ব্যবস্থা ও তার আণবিক কাঠামো সম্পর্কে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া সম্ভব। প্রকৃতপক্ষে জৈব যৌগের ক্ষেত্রে এই বিশেষ যান্ত্রিক পদ্ধতির প্রয়োগের ভিত্তিই হচ্ছে এই মূল সূত্রটি। কয়েকটি উদাহরণ উদ্ধৃত করলে এই বক্তব্যের যাথার্থ্য খুব সহজেই উপলব্ধি করা যাবে।

সরল ক্রমোফোরগুলির মধ্যে অন্যতম হচ্ছে কার্বনীল পুঞ্জ (>C=O)। এই পুঞ্জে একটা পাই (π) বণ্ড এবং অক্সিজেন পরমাণুর অ-বন্ধন ইলেকট্রন-যুগল থাকায় π→π** ও n→π* এই দুটি অবস্থান্তর স্তর লক্ষ্য করা যায়। এদের মধ্যে n→π* অবস্থান্তরের জন্যে যে পরিমাণ আলোক শক্তি শোষিত হয় তার জন্যে 275—290 মিলিমাইক্রন তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যে কম তীব্রতার একটা শৃঙ্গের অবস্থান লক্ষ্য করা যায় এবং তা খুব সহজেই সনাক্ত করা সম্ভব। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, কার্বনীল পুঞ্জের ঐ বিশেষ শৃঙ্গটির অবস্থান ও তার তীব্রতা যৌগের কাঠামোর উপর নির্ভর করে। যেমন কার্বনীল পুঞ্জের কার্বনে হ্যালো-জেন (অ্যাসিড হ্যালাইড, $-\underset{\|}{\overset{}{C}}-X$ with =O), অ্যামিনো (অ্যামাইড, $-C(=O)-NH_2$) বা অ্যালকক্সি (এষ্টার, $-C(=O)-OR$) ইত্যাদি পুঞ্জ যুক্ত থাকলে ঐ শৃঙ্গটি কম তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের দিকে স্থানান্তরিত হয় (1 নং তালিকা)।

4. অতি বেগুনী আলোক বর্ণালীর শৃঙ্গগুলি অবলোহিত আলোক বর্ণালীর শৃঙ্গগুলির মত তেমন তীক্ষ্ণ না হয়ে প্রশস্ত হয়, এর কারণ এই শৃঙ্গগুলি স্পন্দন, ঘূর্ণন ও ইলেকট্রনিক—এই তিন ধরনের অবস্থান্তরজনিত শৃঙ্গগুলির সমন্বয়।

1 নং তালিকা
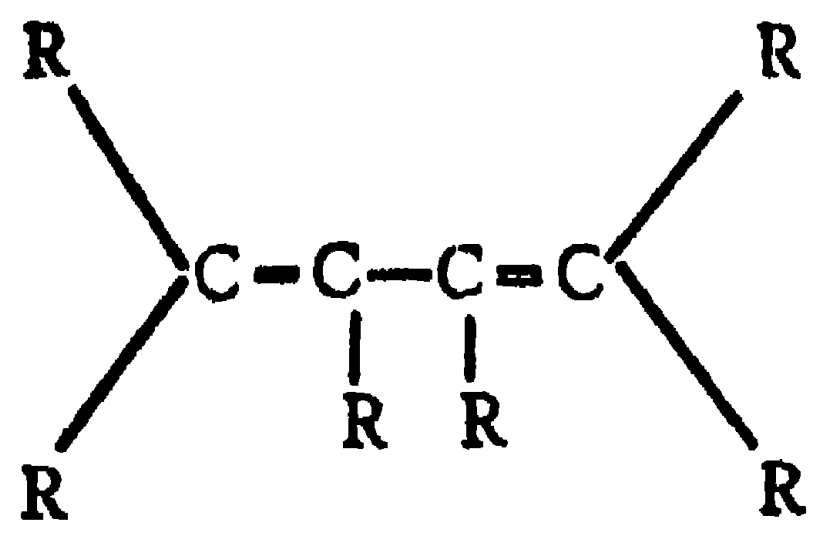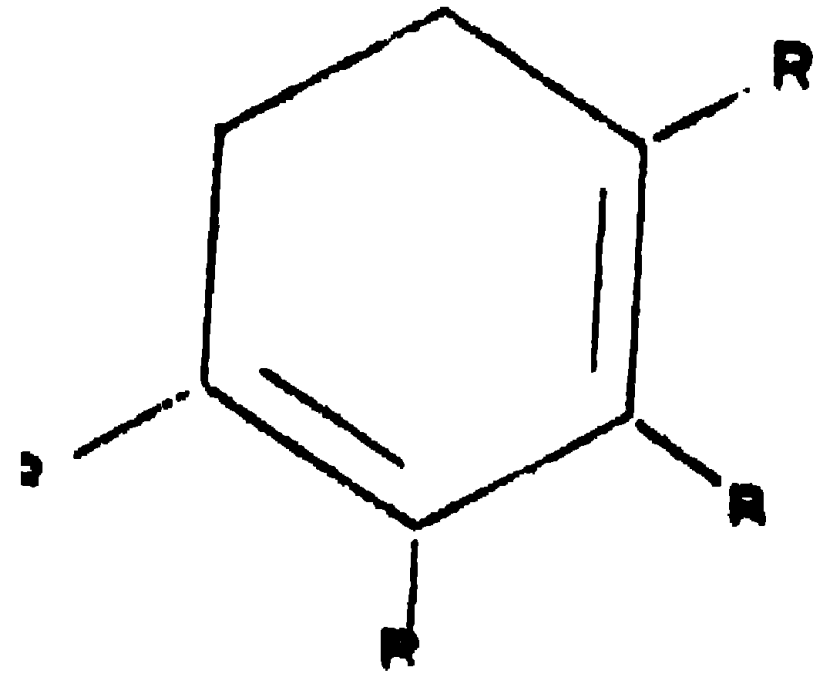
ক্রমোফোর	যৌগ	সর্বোচ্চ পরিমাণ শোষিত আলোক শক্তির তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য (λ সর্বোচ্চ) মিঃ মাঃ	শোষণ সহগ (ε)	দ্রাবক
$>C=O$	অ্যাসিটোন	279	15	হেক্সেন
$-C(=O)-OH$	অ্যাসিটিক অ্যাসিড	208	32	কোহল
$-C(=O)-Cl$	অ্যাসিটাইল ক্লোরাইড	220	100	হেক্সেন
$-C(=O)-NH_2$	অ্যাসিটামাইড	220	63	জল
$-C(=O)-OR$	ইথাইল অ্যাসিটেট	211	57	কোহল

নাইট্রোজেন এবং পরমাণু যখন কোন যৌগে অসম্পৃক্ত বণ্ডের সাহায্যে যুক্ত থাকে ($>C=N-$, $-N=O$), তখন তাদের অতিবেগুনী আলোক বর্ণালীর প্রকৃতি অনেকাংশে কার্বনীল পুঞ্জের মত হয়। সে জন্তে অনেক সময় কার্বনীল যৌগের পরীক্ষা না করে সেটির কোন গৌণ যৌগের বর্ণালী বিশ্লেষণ করা হয়। ডাই-নাইট্রোফিনাইল-হাইড্রোজেন হচ্ছে সেই রকম একটা বহু পরীক্ষিত গৌণ যৌগ। কোহল দ্রাবকে পরীক্ষা চালালে অ্যালডিহাইড এবং কিটোন-এর ঐ বিশেষ গৌণ যৌগটির λ সর্বোচ্চ-এর মান যথাক্রমে 358 ± 2 এবং 364 ± 2 মিলি মাইক্রন পাওয়া যায়।
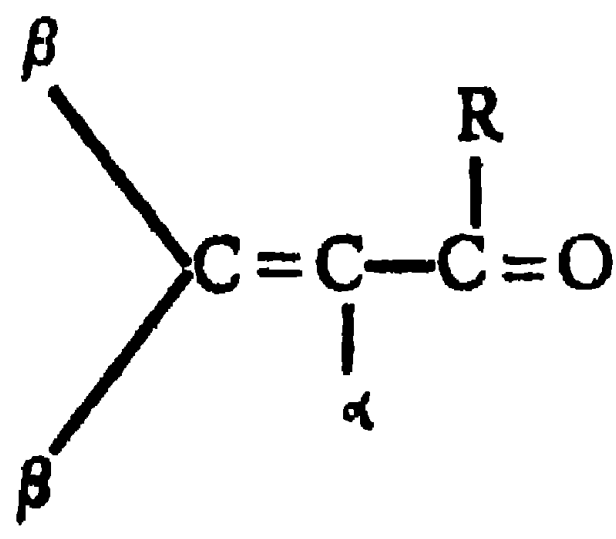
এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, দুই বা ততোধিক ক্রমোফোর কোন যৌগে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় যুক্ত থাকলে বর্ণালীর উপর তাদের প্রভাব হবে সরল যোগকরণ; কিন্তু ঐ ক্রমোফোরগুলির পারস্পরিক সংযোজন ঘটলে উল্লেখযোগ্য প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। উদাহরণস্বরূপ কনজুগেটেড ডায়-ইন এবং কনজুগেটেড কার্বনীল শ্রেণীর যৌগের উল্লেখ করা যেতে পারে। আবার এই উভয় শ্রেণীর যৌগের ক্ষেত্রে বর্ণালীর প্রকৃতি এবং λ সর্বোচ্চ-এর মান বিভিন্ন পরিবর্তপুঞ্জের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। উভয় শ্রেণীর নানান যৌগের বর্ণালী বিশ্লেষণ করে λ সর্বোচ্চ-এর মান এবং পরিবর্তপুঞ্জের মধ্যে একটা আপাতঃ সম্পর্ক স্থাপন করা সম্ভব হয়েছে (2নং এবং 3নং তালিকা)। এই আপাতঃ সম্পর্কগুলি ফ্রায়েজের আপাতঃ নীতি (Fries emperical rule) নামে পরিচিত।

2নং তালিকা

যৌগ	R-এর মান	λ সর্বোচ্চ-এর মান (মিঃ মাঃ)
	(ক) হাইড্রোজেন	217
	(খ) কোন অ্যালকিলপুঞ্জ	217+প্রত্যেকটি অ্যালকিল পুঞ্জের জন্যে 5 মিঃ মাঃ
	(গ) ব্রোমিন বা ক্লোরিন	217+17
	(ক) হাইড্রোজেন	253
	(খ) কোন অ্যালকিল পুঞ্জ	253+প্রত্যেকটি অ্যালিকিলপুঞ্জের জন্য 5 মিঃ মাঃ
	(গ) কোন অ্যালকক্সিল পুঞ্জ	253+0
	(ঘ) এক্সোসাইক্লিক ডাবল বণ্ড	253+প্রত্যেকটি অনুরূপ বণ্ডের জন্যে 5 মিঃ মাঃ

3নং তালিকা

যৌগ	∝ এবং β-এর মান	λ সর্বোচ্চ-এর মান (মিঃ মাঃ)
	(ক) ∝, β উভয় স্থানেই হাইড্রোজেন থাকলে	215
	(খ) ∝-স্থানে কোন পরিবর্তপুঞ্জ থাকলে	215+10
	(গ) β-স্থানে কোন পরিবর্তপুঞ্জ থাকলে	215+প্রত্যেকটি β-পরিবর্তপুঞ্জের জন্যে 12 মিঃ মাঃ
(R-এর মান হাইড্রোজেন বা কোন অ্যালকিল পুঞ্জ)	(ঘ) ∝ এবং উভয় β স্থানে পরিবর্তপুঞ্জ থাক্‌লে	215+10+12+12

পরিশেষে আর একটা কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, অ্যারোমেটিক যৌগের ক্ষেত্রেও এই পদ্ধতিটি প্রযোজ্য। বেঞ্জিনের বর্ণালীতে 202 মিঃ মাঃ স্থানে বেশ বেশী তীব্রতায় এবং 230-270 মিঃ মাঃ এলাকায় কম তীব্রতায় কয়েকটা শৃঙ্গের অবস্থান লক্ষ্য করা যায়। এদের মধ্যে 255 মিঃ মাঃ এলাকায় অবস্থিত শৃঙ্গটি উল্লেখযোগ্য। অবশ্য বেঞ্জিনে কোন পরিবর্তপুঞ্জ থাকলে শৃঙ্গগুলির অবস্থান পরিবর্তিত হতে পারে, যেমন দেখা যায় অ্যানিলিন যৌগে। অ্যানিলিনের বর্ণালীতে 255 মিঃ মাঃ-এর পরিবর্তে 280 মিঃ মাঃ স্থানে ঐ শৃঙ্গটি অবস্থান করে।

বানর ও বনমানুষের সমাজ-ব্যবস্থার ধারা

রেবতীমোহন সরকার*

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ভাষাভাষী জাতি, ধর্ম এবং বিচিত্র রীতি-পদ্ধতি অনুসরণকারী মানুষ বাস করে আপন আপন গোষ্ঠীতে। প্রতিটি মানবগোষ্ঠীই আপন আপন সামাজিক ধ্যান-ধারণা আর বিধিনিষেধের গণ্ডী মেনে চলে সে সব রীতি-নীতি তাদের দৈনন্দিন জীবন পরিচালনার ক্ষেত্রে। কিন্তু মানবেতর প্রাণীদের মধ্যে কি সেই রকম অথবা অন্য রকম কোন সমাজ-ব্যবস্থা রয়েছে? মানবগোষ্ঠীতে পরস্পরের মধ্যে স্নেহ, মায়া-মমতা, স্বামী-স্ত্রী এবং পুত্র-কন্যাদের মধ্যে পরস্পর নির্ভরশীলতা আর প্রতিবেশীদের মধ্যে পরস্পর সহযোগিতার মাধ্যমে যে সমাজ-ব্যবস্থা দানা বেঁধে উঠেছে, এই সকল প্রাণীদের দৈনন্দিন জীবনধারণের মধ্যে কি সেই রকম সমাজ-ব্যবস্থার স্বরূপ প্রতিফলিত হয়? কথাটি জীব-বিজ্ঞানীদের মনে বারে বারে আলোড়িত হয়েছে এবং অনেকেই এই বিষয়টির উপর যথেষ্ট আলোকসম্পাত করতে অগ্রণী হয়েছেন। পিঁপড়ে আর মৌমাছিদের সমষ্টিগতভাবে বাস করবার এক চমৎকার প্রবণতা দেখা যায়। এদের মধ্যে পরস্পর সহযোগিতা এবং শ্রম বিভাগের যে উৎকৃষ্ট উদাহরণ প্রতিফলিত হয়, তা সর্ববিষয়ে মানুষের অনুকরণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছে। নানা ধরণের বল্মীকের আভ্যন্তরীণ গঠন-প্রণালীর বিষয় একটি আদর্শ গ্রাম পরিকল্পনার কথাই মনে করিয়ে দেয়। পাখীদের মধ্যেও সমষ্টিগতভাবে বসবাস করবার একটা সহজ ইচ্ছা লক্ষিত হয়। অসহায় বাচ্চাদের নিয়ে পক্ষিদম্পতির পরিবার গড়ে ওঠে এবং যতদিন পর্যন্ত শাবকগুলি আপন পক্ষনির্ভর না হয়, ততদিন পরিবারের অস্তিত্ব বজায় রাখতে হয়। অনেক সময় দেখা যায়, কতকগুলি পাখী বরাবর একই ঝাঁকে বসবাস করে চলেছে—এরা একই সঙ্গে উড়ে বেড়ায়, আহার খোঁজে আবার সন্ধ্যাবেলায় বাসার অভিমুখে ধাবিত হয়। এই প্রকার পাখীর ঝাঁকের মধ্যে অমার্জিত ধরণের এক শাসন-প্রণালী—এক প্রকার মালিকানার স্বীকৃতি বিদ্যমান। যাহোক, আলোচ্য প্রবন্ধে বানর এবং বনমানুষের জীবনে সমাজ-ব্যবস্থার ধারা আলোচনা করাই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য। বিবর্তনবাদ অনুযায়ী বলা যায় যে, এই বানর এবং বনমানুষেরাই হলো মানুষের নিকটতম সম্পর্কিত প্রাণী। মানুষ এবং এই সকল প্রাণীদের মধ্যে দৈহিক সাদৃশ্য বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। নৃ-তাত্ত্বিকেরা বানর ও বনমানুষের সঙ্গে মানুষের দেহগত প্রতিটি বিষয় সূক্ষ্মভাবে আলোচনা করেছেন এবং এর মধ্যে পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাবের রহস্যটির উপর যথেষ্ট আলোকপাত হয়েছে। দৈহিক সাদৃশ্য ছাড়া মানুষের একটি বিশেষত্ব হলো তার সামাজিক বিন্যাস। বানর ও বনমানুষের ক্ষেত্রে এই সামাজিক বিন্যাস কতটা বিদ্যমান, সে বিষয়টি বহু দিন থেকে আলোচিত হয়েছে, তবে বর্তমান সময়ে এই বিষয়ের প্রতি দেশ-বিদেশের নৃতাত্ত্বিক ও সমাজ-বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছে।

অধিকাংশ বানর গোষ্ঠীভুক্তভাবে বাস করে। এক-একটি গোষ্ঠীতে দশ থেকে পঞ্চাশ বা ততোধিক বানর থাকে। বেবুনদের গোষ্ঠী বেশ কয়েক শত

* নৃতত্ত্ব বিভাগ, বঙ্গবাসী কলেজ; কলিকাতা-9

প্রাণী নিয়ে গড়ে ওঠে। এক-একটা গোষ্ঠী যখন কোন ফলের বাগানে ঢুকে পড়ে অথবা কোন হিংস্র পশুর আক্রমণ প্রতিহত করবার চেষ্টা করে, তখন প্রত্যেকের মধ্যে একটা সুষ্ঠু সহযোগিতার ব্যাপার পরিলক্ষিত হয়। গিবনদের মধ্যেও দলগতভাবে বসবাস করবার প্রবণতা দেখা যায়। ওরাং ওটাংকে বনমানুষদের মধ্যে কম মাত্রায় সামাজিক বলা হয়ে থাকে। কিন্তু অধিকাংশ পর্যবেক্ষকের মতে, ওরাং ওটাং ছোট ছোট পরিবারে বাস করতেই ভালবাসে এবং এদের পরিবার একজন পুরুষ, একজন স্ত্রী ও ছোট ছোট বাচ্চাদের নিয়ে গড়ে ওঠে। অনেকের মতে খাদ্যাভাবই নাকি এদের ছোট ছোট দলে ঘুরতে বাধ্য করেছে। তবে এটা যে কতদূর সত্য, তা ঠিকমত বলা যায় না। গরিলাদের দল চার থেকে পঞ্চাশ জন নিয়ে গঠিত হয়। কখনও কখনও প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের একা ঘুরে বেড়াতেও দেখা যায়। সাধারণতঃ প্রত্যেক দলে একটি প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ গরিলা থাকে। অনেক পর্যবেক্ষকের মতে গরিলা বহু স্ত্রী গ্রহণকারী—আবার কারো কারো মতে, এরা এক স্ত্রী নিয়েই বসবাস করে। এই দুই দল পর্যবেক্ষকই পৃথিবীর গরিলা-অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে গরিলার জীবনযাত্রা প্রণালী পর্যবেক্ষণ করে তাঁদের নিজস্ব সিদ্ধান্তে এসেছেন বলে দাবী করেন। কোরলে নামক একজন বিখ্যাত পর্যবেক্ষক উগাণ্ডার এক জঙ্গলে একটি গরিলা পরিবারে একটি প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ, চারটি প্রাপ্তবয়স্কা স্ত্রী গরিলা এবং দুটি ছোট বাচ্চা লক্ষ্য করেছেন। বিখ্যাত সমাজ-বিজ্ঞানী ওয়েষ্টারমার্ক-এর মতে, একটি গরিলা পরিবারে থাকে একজন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ, এক বা একাধিক প্রাপ্তবয়স্কা স্ত্রী এবং বিভিন্ন বয়সের কয়েকটি বাচ্চা। পুরুষ গরিলাটি পরিবার রক্ষণাবেক্ষণ করে, বিপদের সময় সতর্ক করে দেয় এবং রাত কাটাবার জন্যে বাসা তৈরির ব্যবস্থা করে থাকে। গরিলা পরিবারে একজন পুরুষের অস্তিত্ব, স্ত্রী-গরিলার সংখ্যাধিক্য এবং শিকারীর হস্তে মৃত অথবা মৃত পুরুষ গরিলার দেহে যুদ্ধ অথবা মারামারির প্রমাণস্বরূপ ক্ষতচিহ্ন থেকে একথাই বুঝা যায় যে, গরিলা পরিবারে পুরুষেরই আধিপত্য বিদ্যমান।

উপরিউক্ত বানর ও বনমানুষদের মধ্যে শিম্পাঞ্জীই অধিকতর বুদ্ধিমান। এরা ছোট ছোট পরিবারভুক্ত অবস্থায় অথবা দলভুক্ত অবস্থায় ঘুরে বেড়ায়। এদের দল অনেক সময় গরিলাদের দল অপেক্ষাও বড় আকারের হয়ে থাকে। বিভিন্ন পর্যবেক্ষক এই শিম্পাঞ্জী পরিবার বা দলের বিভিন্ন অবস্থা প্রত্যক্ষ করেছেন। বাক্ নামক জনৈক পর্যবেক্ষক একটি পুরুষ, দুটি স্ত্রী এবং আটটি বাচ্চাসমন্বিত একটি শিম্পাঞ্জী পরিবার পর্যবেক্ষণ করেছেন। স্ত্রী দুটির একজন তখন বাচ্চাদের লালনপালনে নিযুক্ত ছিল। প্রত্যেক পরিবার প্রতি রাত্রে বৃক্ষশাখায় বিশ্রামের জন্যে বাসা তৈরি করে। অ্যাস্‌চেথার নামে অপর একজন পর্যবেক্ষক বিশ্রাম-নীড় রচনাকালীন এক শিম্পাঞ্জী পরিবারকে লক্ষ্য করেছেন। এছাড়া গারনার নামে এক পর্যবেক্ষক একটি শিম্পাঞ্জী দলের আনন্দোৎসবের অপূর্ব বিবরণ দিয়েছেন। প্রথমে দলটির সকলে মিলে কাদামাটি দিয়ে একটি ফাঁকা গর্তের উপর এক ধরণের ঢাক তৈরি করে। ফাঁকা গর্তটি প্রতিধ্বনির গহ্বর হিসাবে কাজ করে। ঢাকটি শুকিয়ে যাবার পর রাত্রি বেলায় শিম্পাঞ্জীরা দলে দলে জমায়েত হতে থাকে এবং পরমুহূর্তেই আনন্দমেলা সুরু হয়। এদের মধ্যে কয়েক জন ঢাক পিটাবার ভার নেয় আর সেই বাজনার তালে তালে অন্যান্য শিম্পাঞ্জীদের বন্য উল্লাস সুরু হয়। বেশ কয়েক ঘন্টা পরে সেই বিরামহীন নাচ ও বাজনার উপর যবনিকা পড়ে এবং শিম্পাঞ্জীরা একে একে বিদায় গ্রহণ করে। এই সকল উদাহরণ থেকে সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, প্রাণী-জগতে অনবিস্তর সামাজিক এবং পারিবারিক

জীবনযাত্রা-প্রণালী বিদ্যমান। "মানুষের বিবাহ-প্রথার ইতিহাস" নামক বিখ্যাত পুস্তকে ডক্টর ওয়েষ্টারমার্ক মন্তব্য করেছেন যে, পারিবারিক জীবন মানুষের মত গরিলা এবং শিম্পাঞ্জীর ক্ষেত্রেও অপরিহার্য। তাঁর মতে, বিবাহ-প্রথা আদিম অভ্যাস থেকে বিকশিত। যাহোক, বিভিন্ন প্রাণীদের আচার-ব্যবহার লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, এখানেও একটা সামাজিক চেতনা রয়েছে। এখানে আছে দলনেতার প্রতি বাধ্যতার মনোভাব, একক কর্মপ্রচেষ্টা, প্রহরী মোতায়েন, বাধা এবং সঙ্কেত জ্ঞাপনের সুচারু ব্যবস্থা। সম্পত্তির চেতনা, কাজ-কর্মের পালাবদল, অনাথ শিশুকে দত্তকরূপে গ্রহণ প্রভৃতিতে প্রাণী-জগতে এক সুন্দর সমাজ-ব্যবস্থার পরিচয় মেলে।

গত কুড়ি বছরের মধ্যে প্রাকৃতিক পরিবেশে প্রকৃত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বানর ও বনমানুষের সমাজ-ব্যবস্থার বেশ কয়েকটি অনুসন্ধান-কার্য অনুষ্ঠিত হয়েছে। এদের মধ্যে মিঃ কার্পেন্টার-এর এক বিশেষ জাতীয় বানরের ব্যবহার এবং সামাজিক সম্পর্কবিষয়ক গবেষণা-কার্যটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গিবনগোষ্ঠীর উপর তাঁর অনুসন্ধান-কার্য কয়েকটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর উপর । তাঁর এই বিশেষ পর্যবেক্ষণে গিবনদের একক ব্যবহার-প্রণালী, খাওয়া-দাওয়ার ধরণ, পুরুষ ও স্ত্রীদের সম্পর্ক, পুরুষে পুরুষে সম্পর্ক, স্ত্রীদের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ, দলগত সংঘর্ষ ও সমন্বয়, যৌথ ধ্যান-ধারণা প্রভৃতি বিষয়ের প্রতি যথেষ্ট দৃষ্টি দেওয়া হয়েছিল। গত কয়েক বছরে বানর ও বনমানুষগোষ্ঠীর সমাজ-ব্যবস্থার ধারা আলোচনার জন্যে দেশ-বিদেশের বিজ্ঞানীরা এগিয়ে এসেছেন। জাপানের কাইয়োটো বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'জাপান বানর গবেষণা কেন্দ্র' বানর ও বনমানুষগোষ্ঠীর সমাজ-ব্যবস্থার উপর যথেষ্ট আলোকপাত করেছে। তাছাড়া ক্যালিফোর্নিয়ার 'Centre for Advanced Studies in the Behavioral Science'-এর উদ্যম এবং কর্মপ্রচেষ্টা লক্ষণীয়। এই সকল গবেষণা সংস্থা দেশ-বিদেশের বিভিন্ন জাতের বানর ও বনমানুষগোষ্ঠীর পারস্পরিক আচার-ব্যবহার এবং সামাজিক জীবনযাত্রা-প্রণালীর প্রতি সজাগ দৃষ্টি রেখে চলেছেন এবং প্রত্যেকেরই গবেষণার ফলাফল নির্দেশ করেছে যে, মানবেতর প্রাণীদের মধ্যেও সুষ্ঠু সমাজ-ব্যবস্থার অস্তিত্ব বিদ্যমান।

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের মনে স্বভাবতঃই এক বিরাট প্রশ্ন উঁকি মারে। মানব-সমাজ আর মানবেতর প্রাণী-সমাজে কি তাহলে কোন মৌলিক পার্থক্য আছে? দলবদ্ধ মানুষ ঘর বেঁধে গ্রাম পত্তনের পর সুষ্ঠু সামাজিক জীবনযাপন করে। ওদিকে আবার দেখা যায়, বাবুই পাখীরাও চমৎকার বাসা বেঁধে দলবদ্ধ জীবনযাপনে অভ্যস্ত। বেবুনদের দলগত জীবন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এরা দল বেঁধে বাস করে, ঘুরে বেড়ায়, শত্রুকে আক্রমণ করে। তাহলে এই দুই সমাজের পার্থক্যের চাবিকাঠি কোথায়? অনেকের মতে, মানুষ কোন কালেই তার পারিবারিক জীবনের ধারণাটা নীচু স্তরের প্রাণীদের নিকট থেকে গ্রহণ করে নি। মানব-সমাজ আর অন্যান্য প্রাণী-সমাজের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান। আজকের গরিলা, শিম্পাঞ্জী অথবা ওরাংওটাং পরিবার যেভাবে বসবাস করে, পাঁচ-শ' বা হাজার বছর পূর্বেও তাদের পূর্বপুরুষের জীবনযাত্রা ছিল ঠিক একই রকমের। পাঁচ-শ' বছর পূর্বের বাবুই পাখীর দল যে ভাবে বাসা বাঁধতো, আজকের বাবুই পাখীর দলও ঠিক একই রকম বাসা বাঁধে। অপর দিকে মানুষের জীবনযাত্রা পরিবর্তনের স্রোতে ভেসে চলেছে। মানুষের জীবনের রূপ দিনে দিনে, ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তনশীল। মানুষের শিক্ষা-

দীক্ষা তার প্রতিবেশী আর বংশধরদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। আদিমতম মানব-সমাজেও দেখা যায়, ছেলেমেয়েরা তাদের নিজস্ব রীতিতে শিক্ষা গ্রহণ করছে এবং সেই শিক্ষাদানের প্রধান ভূমিকায় রয়েছে পিতামাতা অথবা অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন। মানুষের শিক্ষা ও কর্মধারা দৈনন্দিন নূতন নূতন আবিষ্কারের মাধ্যমে পরিবর্তনের ধাপে ধাপে এগিয়ে চলেছে। অপর দিকে মানবেতর প্রাণী-সমাজের শিক্ষা ও কর্মধারা এভাবে প্রবাহিত হয় না। কুকুর, ঘোড়া, গরিলা, শিম্পাঞ্জী প্রভৃতি প্রাণী শিক্ষাপ্রাপ্ত হয় বটে, কিন্তু সেই শিক্ষিত প্রাণীরা তাদের জাতভাইদের শিক্ষিত করে তুলতে সাহায্য করে না। উপরন্তু শিক্ষা-প্রাপ্ত শিম্পাঞ্জীকে বন্য শিম্পাঞ্জীর দলে ছেড়ে দিলে প্রথমটি অচিরেই পূর্বাবস্থায় ফিরে আসবে। মানুষের কর্মপদ্ধতি পারস্পরিক শিক্ষা-দীক্ষার বিনিময়ের উপর মুখ্যতঃ নির্ভরশীল। মানুষের সামাজিক রীতিনীতি গতিশীল—প্রাণীদের রীতি নিশ্চল। প্রাণবন্ত ও রূপান্তরক্ষম রীতি-নীতির নাম সংস্কৃতি। মানুষের সমাজ-ব্যবস্থা সংস্কৃতির ধারায় উচ্ছ্বসিত—বানর ও বনমানুষের সমাজে নেই কোন সংস্কৃতির ব্যাপার, সহজাত প্রবৃত্তির উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে এদের কর্মপদ্ধতি। সে জন্যে যুগের পর যুগ এরা থেকে গেছে একই পর্যায়ে। এখানে নেই কোন পরিবর্তন, নেই কোন এগিয়ে চলবার প্রবণতা। আর মানুষের জীবনযাত্রা সংস্কৃতির জোয়ারের চাপে গতিশীল—যার ফলে মানুষ তার এই নিকটতম আত্মীয় বানর ও বনমানুষের দলকে ছাড়িয়ে আজ অনেক উচুতে উঠে এসেছে।

হলোগ্রাফি

শ্রীপ্রদীপকুমার দত্ত*

সূচনা—প্রাচীন কালে বিজ্ঞান যখন এত উন্নত হয় নি, তখন মানুষ প্রিয়জন বা প্রিয় বস্তুর স্মৃতি আপন মনের মধ্যে সযত্নে রক্ষা করতো, তাছাড়া প্রিয়জন বা প্রিয় বস্তুর স্মৃতি রক্ষার আর কোনও উপায় ছিল না। কালক্রমে বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তৈলচিত্র এবং আরও পরে ফটোগ্রাফির আবিষ্কার হলো। যে কোনও জিনিষের প্রতিবিম্ব ফটোগ্রাফিক প্লেটের উপর দীর্ঘ দিন ধরে রাখবার উপায় মানুষের করায়ত্ব হলো। এই ফটোগ্রাফি কিন্তু মানুষের আশার নিবৃত্তি করতে পারলো না। ফটোতে আমরা দুই মাত্রার প্রতিবিম্ব পাই। তিন মাত্রার কোনও প্রতিবিম্ব সাধারণ ফটোগ্রাফিক প্লেটে পাওয়া সম্ভব নয়। তিন মাত্রার ফটো তোলবার চেষ্টা চলতে লাগলো। আবিষ্কৃত হলো Stereoscopic (3-D) Photo-recombination, যাতে দৃষ্টিবিভ্রমের দ্বারা গভীরতার অনুভূতি আগ্রত করা যায়। এই ভাবে যে তিন মাত্রার ফটোগ্রাফ তৈরি হয়, তাতে বস্তুর প্রতিবিম্ব একটি স্থির মূর্তির মত দেখায়। একজন মানুষকে বিভিন্ন কোণ থেকে দেখলে ভিন্ন ভিন্ন কোণের জন্যে তার দেহের ভিন্ন ভিন্ন অংশ দৃষ্টিগোচর হয় বা দৃষ্টি অগোচরে চলে যায়। কিন্তু উপরিউক্ত ত্রিমাত্রিক ছবিতে তা হয় না। যে কোনও

*পদার্থবিদ্যা বিভাগ; আচার্য বি. এন. শীল কলেজ, কোচবিহার

অবস্থান থেকেই লক্ষ্য করা যাক না কেন, একজন লোককে সামনাসামনি দেখলে যেমন দেখায়, এই ছবিতে তার চেয়ে কিছু বেশী বা কম দেখা যাবে না। তাই বাস্তবোপম ছবি পেতে গেলে ফটোগ্রাফির আরও উন্নতি প্রয়োজন। এই প্রয়োজন মেটাবার তাগিদেই আবিষ্কৃত হলো এক নতুন ধরণের ফটোগ্রাফি, যার নাম হলোগ্রাফি বা পূর্ণলেখন (গ্রীক শব্দ Holos মানে পূর্ণ)। এই ধরণের ফটোতে যে প্রতিবিম্ব দেখা যায়, তা সম্পূর্ণভাবেই বাস্তবোপম অর্থাৎ হলোগ্রাফিতে উৎপন্ন প্রতিবিম্বের সঙ্গে মূল বস্তুর পার্থক্য চোখে দেখে বোঝা যায় না।

মূল তত্ত্ব—হলোগ্রাফির মূল তত্ত্ব আলোক-তরঙ্গের ব্যতিকরণের (Interference) মধ্যেই নিহিত। দুটি সমতল তরঙ্গকে যদি একটি পর্দার উপর অধ্যারোপিত (Superimpose) করা হয়, তবে তারা একটি লব্ধি তরঙ্গের সৃষ্টি করে। পর্দার যে সমস্ত বিন্দুতে তরঙ্গ দুটি একই দশায় আপতিত হয়, অর্থাৎ পর্দার যে সকল বিন্দুতে একটি তরঙ্গের উত্থান (Crest) অপর তরঙ্গের উত্থান বা একটি তরঙ্গের পতন (Trough) অপর তরঙ্গের পতনের উপর আপতিত হয়, তখন সেখানে লব্ধি তরঙ্গের বিস্তার পূর্বোক্ত যে কোনও তরঙ্গের বিস্তার অপেক্ষা বেশী হয় এবং সেই সঙ্গে আলোকের ঔজ্জ্বল্যও বেশী হয়। আর যে সকল বিন্দুতে দুটি তরঙ্গ বিপরীত দশায় অর্থাৎ একটির উত্থান অপরটির পতনের উপর আপতিত হয়, সেখানে লব্ধি তরঙ্গের বিস্তার হয় তরঙ্গ দুটির বিস্তার অপেক্ষা অনেক কম এবং আলোকের ঔজ্জ্বল্যও অনেকটা কম হয়। প্রথমটিকে বলা হয় সংযোজী ব্যতিকরণ (Constructive interference) এবং দ্বিতীয়টিকে বলা হয় বিনাশী ব্যতিকরণ (Destructive interference)। সুতরাং সুসংবদ্ধ উৎস (Coherent source) থেকে দুটি সমতল আলোক-তরঙ্গকে যদি একটি পর্দার উপর অধ্যারোপিত হতে দেওয়া হয়, তবে একটি উজ্জ্বল ও একটি অন্ধকার ডোরা পর্দার উপর পর পর সমান্তরালভাবে সাজানো দেখা যাবে। আলো-আঁধারের এই একান্তর ডোরাকে বলে ব্যতিকরণ আকৃতি (Interference pattern)। এখন যদি এরূপ একটি সমতল তরঙ্গ একটি দর্পণ থেকে প্রতিফলিত হয়ে পর্দার উপর আপতিত হয় এবং আর একটি অনুরূপ তরঙ্গ কোন বস্তু থেকে প্রতিফলিত হয়ে পূর্বোক্ত পর্দার উপর আপতিত হয়, তবে একটি জটিল ব্যতিকরণ আকৃতির সৃষ্টি হবে। কারণ এক্ষেত্রে দ্বিতীয় তরঙ্গটি বস্তু কর্তৃক প্রতিফলিত হবার পর আর সমতল থাকে না বরং বস্তুর তলের বৈশিষ্ট্যানুযায়ী পরিবর্তিত হয়ে যায়। ফলে পর্দার উপর যে জটিল ব্যতিকরণ আকৃতির সৃষ্টি হবে—তা হবে বস্তুর বৈশিষ্ট্যানুযায়ী। পর্দার স্থানে একটি প্লেট (যা ফটোগ্রাফিতে ফিল্মের সঙ্গে তুলনীয়) রাখলে প্লেটের উপর ব্যতিকরণ আকৃতি মুদ্রিত হয়ে যাবে। একেই বলে হলোগ্রাফি আর প্লেটটিকে বলা হয় বস্তুর হলোগ্রাম। ফটোগ্রাফিতে ফিল্মের উপর বস্তুর প্রতিবিম্ব ব্যবহৃত আলোকের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের উপর নির্ভরশীল আর হলোগ্রাফিতে বস্তুর প্রতিবিম্ব ব্যবহৃত আলোক-তরঙ্গের দশার উপর নির্ভর করে।

হলোগ্রাম থেকে বস্তুর প্রতিবিম্ব পুনরুৎপন্ন করতে হলে হলোগ্রামকে একটি সুসংবদ্ধ আলোকের দ্বারা আলোকিত করা হয়। এখন হলোগ্রাম তার উপরকার ব্যতিকরণ আকৃতির জন্যে একটি বিসরণ জালের (Diffraction grating) মত কাজ করে। একটি বিসরণ জালের মত এখানেও প্রথম বর্গীয় (First order) বিসরিত প্রতিবিম্বের (Diffracted image) ঔজ্জ্বল্য সবচেয়ে বেশী হয়। হলোগ্রাম তৈরির সময় যে অবস্থান থেকে আলোকপাত করা হয়েছিল—যদি এখনও সেই অবস্থানে আলোকের উৎসকে রাখা যায়, তবে

প্লেটের উভয় পার্শ্বে মূল বস্তুর দুটি বাস্তবোপম তিন মাত্রার প্রতিকৃতি উৎপন্ন হয়। এদের একটি সদ্ (Real) ও অপরটি অসদ্ (Virtual)। প্লেটের উপর যে দিকে আলোকপাত করা হয়, তার বিপরীত দিকে উপযুক্ত কৌণিক অবস্থান থেকে প্লেটের উপর দৃষ্টিপাত করলে প্লেটের যে পাশে আলোক-উৎস আছে, সেই দিকে তিন মাত্রার অসদ্ প্রতিবিম্বটি দেখা যাবে (অবশ্য একটি লেন্সের দ্বারা ফোকাস করবার পর)। ঐ একই পার্শ্বে দাঁড়িয়ে দর্শক নিজের ও প্লেটের মধ্যেকার ফাঁকা জায়গায় বস্তুটির তিন মাত্রার সদ্ প্রতিবিম্বটি অবলম্বনহীনভাবে বাতাসে ভাসমান দেখতে পাবেন। কোন পর্দা ছাড়াও এই সদ্ বিম্বটিকে দেখা যায়।

আলোক-উৎস—উপরের আলোচনায় দেখা গেল যে, হলোগ্রাফির জন্যে প্রয়োজন একটি সুসংবদ্ধ আলোক উৎস। প্রশ্ন উঠতে পারে, সাধারণ আলোয় হলোগ্রাফি সম্ভব নয় কেন? সংক্ষেপে এসম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। সাধারণ আলোক বিভিন্ন তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের তরঙ্গের সমষ্টি। ফলে হলোগ্রাফির কাজে সাধারণ আলো ব্যবহার করলে বিভিন্ন তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের আলোর জন্যে হলোগ্রামে বিভিন্ন ধরণের ব্যতিকরণ আকৃতির সৃষ্টি হবে এবং এগুলি একে অপরের উপর অধ্যারোপিত হওয়ায় পরস্পরের তীক্ষ্নতা নষ্ট করবে এবং শেষ পর্যন্ত কোন হলোগ্রাম উৎপন্ন করা অসম্ভব হয়ে উঠবে। তাই একটি মাত্র তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের আলোর প্রয়োজন হলোগ্রাফির জন্যে।

উৎস যে অসংখ্য পরমাণুর দ্বারা গঠিত, তাদের কক্ষপথের ইলেকট্রনের স্পন্দনের ফলেই আলোক উৎপন্ন হয়। এই সব ইলেকট্রনের স্পন্দনের দশা বিভিন্ন হওয়ায় তাদের সৃষ্ট আলোর দশাও বিভিন্ন হয়। তাই একটি উৎস থেকে নির্গত আলোক সমদশাসম্পন্ন অর্থাৎ সুসংবদ্ধ হয় না। তবে উৎস একটি বিন্দু হলে উৎসে ইলেকট্রনের সংখ্যা কম হওয়ায় নির্গত আলোক মোটামুটি সুসংবদ্ধ বলা যেতে পারে। সাধারণ আলোক-উৎসকে আমরা অনেকগুলি বিন্দু-উৎসের সমষ্টি হিসাবে ধরতে পারি। ফলে প্রতিটি বিন্দু-উৎস থেকে নির্গত আলো ভিন্ন ভিন্ন দশা-সম্পন্ন হওয়ায় তারা আলাদা আলাদাভাবে তাদের নিজস্ব ব্যতিকরণ আকৃতির সৃষ্টি করবে, যারা একে অপরের উপর অধ্যারোপিত হওয়ায় পরস্পরকে বিনষ্ট করবে, কারণ একটির উজ্জ্বল ডোরা (Maxima) অপরের অন্ধকার ডোরার (Minima) উপর আপতিত হলেই সম্পূর্ণ পদার্থটি সর্বত্র প্রায় সমভাবে আলোকিত হয়ে যাবে। সুতরাং পর্দার উপর কোন ব্যতিকরণ আকৃতি পাওয়া যাবে না। আর ব্যতিকরণ আকৃতি না পাওয়া গেলে হলোগ্রাফি সম্ভব নয়। তাই এমন আলোক-উৎসের প্রয়োজন, যা থেকে নির্গত আলোক-তরঙ্গসমূহ একই দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট এবং সমদশাসম্পন্ন বা সুসংবদ্ধ হবে। এই ধরণের উৎস লেসার আবিষ্কৃত হবার আগে পাওয়া ছিল খুবই কষ্টসাধ্য। লেসার, যা সম্পূর্ণরূপে সুসংবদ্ধ এক ধরণের আলোক-উৎস, হলোগ্রাফির জন্যে অপরিহার্য।

পদ্ধতি—হলোগ্রাফির জন্যে একটি একবর্ণের (Monochromatic) (অর্থাৎ একটিমাত্র তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট) লেসার রশ্মিগুচ্ছ দুটি পরস্পর-আনত দর্পণের সাহায্যে দুটি অংশে বিভক্ত করা হয়। এই অংশ দুটির একটিকে সোজাসুজি একটি ফটোগ্রাফিক প্লেটের উপর পড়তে দেওয়া হয় এবং অপর অংশটি যে বস্তুর হলোগ্রাম করতে হবে, তার উপর আপতিত হয়ে অনিয়মিত প্রতিফলনের ফলে পূর্বোক্ত ফটোগ্রাফিক প্লেটের উপর পড়ে। দর্পণ থেকে প্রতিফলিত যে সমস্ত রশ্মি সোজাসুজি প্লেটে এসে পৌঁছায়, সেগুলি

সবই একই দশাসম্পন্ন থাকে। যে সকল রশ্মি বস্তু থেকে অনিয়মিত প্রতিফলনের পর প্লেটে এসে পড়ে, তারা বিভিন্ন দশাসম্পন্ন হয়। কারণ বস্তুর বিভিন্ন অংশ থেকে প্রতিফলিত হয়ে প্লেটে এসে পড়ায় তাদের বিভিন্ন পথ পরিক্রম করতে হয়েছে। আগেই বলা হয়েছে এর ফলে প্লেটের উপর বস্তুর আকৃতি-নির্ভর একটি জটিল ব্যাতিকরণ আকৃতির সৃষ্টি হবে। এই প্লেটটিই হলো বস্তুর হলোগ্রাম। সাধারণ আলোয় প্লেটটিকে একটি সাধারণ ফটোগ্রাফিক প্লেটের মতই দেখাবে এবং এর উপর বস্তুর কোনও প্রতিবিম্ব দেখা যাবে না। তবে অণুবীক্ষণ যন্ত্রে প্লেটের উপর ব্যতিকরণ আকৃতি দেখা যাবে।

সীমাবদ্ধতা—এপর্যন্ত যে ধরণের হলোগ্রাফির কথা আলোচনা করা হলো, তার দুটি সীমাবদ্ধতা হলো এই যে—(1) এতে বস্তুর প্রতিকৃতি পুনরুৎপন্ন করতে লেসার রশ্মির প্রয়োজন হয়, যা খুবই ব্যয়সাধ্য এবং (2) বস্তুর পুনরুৎপন্ন প্রতিকৃতি একরঙা হয় এবং এই রং হলোগ্রামের জন্যে ব্যবহৃত লেসার রশ্মির রঙের অনুরূপ। বর্তমানে এই দুই সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করা সম্ভব হয়েছে। প্রথমতঃ হলোগ্রাফির প্রতিকৃতি সাধারণ আলোতেই দেখা যায় এবং দ্বিতীয়তঃ বস্তুর রং প্রতিকৃতিতে অক্ষুণ্ণ রূপেই থাকে।

প্রথমটির জন্যে একটি বিশেষ ধরণের ফটোগ্রাফিক প্লেট নেওয়া হয়। এই প্লেটে সাধারণ ফটোগ্রাফিক অবদ্রবের (Imulsion) একটি বেশ পুরু আস্তরণ থাকে। লেসার রশ্মিগুচ্ছকে আগের মতই দুটি দর্পণের সাহায্যে দুই অংশে বিভক্ত করা হয়। কিন্তু দর্পণ থেকে যে অংশটি সরাসরি প্লেটে আসে, সেটিকে প্লেটের যেদিকে অবদ্রবের আস্তরণ আছে, তার বিপরীত দিকে পড়তে দেওয়া হয় এবং সেটি এই আস্তরণের মধ্য দিয়ে প্লেটের সামনের দিকে আসে। লেসার রশ্মিগুচ্ছের আর একটি অংশ যথারীতি বস্তু থেকে প্রতিফলিত হয়ে প্লেটের সামনের দিকে এসে পড়ে। এর ফলে আস্তরণের মধ্যে ব্যতিকরণ আকৃতির সৃষ্টি হয়। এইরূপে প্রাপ্ত হলোগ্রাম যদি সাধারণ আলোয় দেখা হয়, তবে বস্তুর প্রতিকৃতি প্লেটের পিছনে বাতাসে অবলম্বিত (Suspended) অবস্থায় দেখা যাবে। বস্তুর স্বাভাবিক রঙের হলোগ্রাম করতে হলে তিনটি প্রাথমিক রঙের লেসার রশ্মি এক সঙ্গে নেওয়া হয়। এর ফলে যে হলোগ্রাম তৈরি হয়, তা সাধারণ আলোকে বস্তুর স্বাভাবিক রঙের প্রতিকৃতি উৎপন্ন করতে পারে।

সংজ্ঞা—উপরের আলোচনায় দেখা গেল যে হলোগ্রাফিতে ক্যামেরার প্রয়োজন হয় না, সুসংবদ্ধ আলোক হিসাবে লেসার ব্যবহৃত হয় এবং বস্তুর একটি ত্রিমাত্রিক বাস্তবোপম প্রতিকৃতি পাওয়া যায়। সুতরাং হলোগ্রাফি হলো লেসার রশ্মি দিয়ে তোলা এক সম্পূর্ণ অভিনব ফটোগ্রাফি, যাতে কোনও বস্তুর আকৃতিকে ঠিক বাস্তব আকৃতির মতই পুনরুৎপন্ন করা যায়—কোন ক্যামেরা বা লেন্সের সাহায্য ব্যতিরেকেই। এই পদ্ধতিতে উৎপন্ন প্রতিকৃতিকে চোখে দেখে মূল বস্তু থেকে আলাদা করে চেনা যায় না।

ফটোগ্রাফির সঙ্গে পার্থক্য—(ক) ফটোগ্রাফির সঙ্গে হলোগ্রাফির পার্থক্য উপরের আলোচনা থেকে কিছুটা প্রতীয়মান হয়, যথা—(1) ফটোগ্রাফিতে ক্যামেরার লেন্স বা সূক্ষ্ম ছিদ্রের সাহায্যে প্লেটের উপর বস্তুর প্রতিবিম্ব গঠিত হয় এবং প্লেটটিকে আলোতে ধরলে খালি চোখেই বস্তুর আকৃতি বুঝতে পারা যায়। কিন্তু হলোগ্রাফিতে কোনও লেন্স বা ছিদ্রের প্রয়োজন হয় না এবং হলোগ্রাম প্লেটের উপর বস্তুর কোনও প্রতিকৃতি সৃষ্টি হয় না—সৃষ্টি হয় ব্যতিকরণ আকৃতি, যেটা সাধারণ চোখে বোঝা যায় না। (2) ফটোগ্রাফিতে সাধারণ আলোক ব্যবহৃত হয়, কিন্তু হলোগ্রাফিতে ব্যবহৃত হয় লেসার রশ্মি। (3)

ফটোগ্রাফি দুই মাত্রিক, কিন্তু হলোগ্রাফি ত্রিমাত্রিক প্রতিকৃতি গঠন করে। ফটোগ্রাফিতে Stereographic projection-এর দ্বারা ত্রিমাত্রিক প্রতিকৃতি পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তার সঙ্গে হলোগ্রাফির মৌলিক পার্থক্য আছে।

(খ) একটি ফটোগ্রাফকে যদি ছিঁড়ে টুকরা টুকরা করা হয়, তবে সেটি নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু একটি হলোগ্রামকে যতই টুকরা করা যাক না কেন, তার প্রত্যেকটি টুকরা একটি সম্পূর্ণ প্রতিকৃতি গঠন করতে পারে। যেহেতু বস্তুর প্রতিটি বিন্দু থেকে আলো এসে হলোগ্রামের প্রতিটি বিন্দুতে পড়ে এবং হলোগ্রামের প্রতিটি বিন্দুই বস্তুর প্রতিকৃতি ধরে রাখে, তাই হলোগ্রামের যে কোনও টুকরা বস্তুর সম্পূর্ণ প্রতিকৃতি গঠনে সক্ষম। অবশ্য টুকরা যত ছোট হয়, উৎপন্ন প্রতিকৃতির স্পষ্টতা ততই কমে যায়।

(গ) একটি ফটোগ্রাফিক প্লেটে একটি মাত্র ফটোগ্রাফ তোলা যায়, কিন্তু হলোগ্রাফির ক্ষেত্রে একই প্লেটে বিভিন্ন বস্তুর হলোগ্রাম গ্রহণ করা যায় এবং তাদের যে কোনটিকে অন্যগুলি থেকে সম্পূর্ণ পৃথকভাবে পুনরুৎপন্ন করা সম্ভব। লেসার রশ্মি আপতন কোণ অল্প অল্প করে পরিবর্তন করলে একই প্লেটে বিভিন্ন বস্তুর হলোগ্রাম গ্রহণ ও পুনরুৎপন্ন করা যায়।

ব্যবহার—প্রচুর সম্ভাবনা নিয়ে হলোগ্রাফি বিজ্ঞানীদের হাতে ধরা দিয়েছে। আগেই বলা হয়েছে, একটি হলোগ্রাফিক প্লেটে একই সঙ্গে বিভিন্ন বস্তুর প্রতিকৃতি ধরে রাখা যায়। ফলে অল্প সময়ের ব্যবধানে বিভিন্ন কৌণিক অবস্থান (যা হলোগ্রাম করবার সময়ের কোণের সঙ্গে সমান) থেকে আলোকপাত করলে সিনেমার মতই পর পর প্রতিকৃতিগুলি একই অবস্থানে ফুটে উঠবে। এর জন্যে আলো ও প্লেট—এই দুটির যে কোনটিকে স্থির রেখে অন্যটিকে সরানো বা ঘোরানো যেতে পারে। অণুবীক্ষণ যন্ত্রে বস্তুর প্রতিবিম্ব তৈরি করবার জন্যে লেন্সের প্রয়োজন হয়। ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রে বা রঞ্জেন রশ্মি অণুবীক্ষণ যন্ত্রে যে সব লেন্সের প্রয়োজন হয়, সেগুলি তৈরি করা বেশ কঠিন। লেন্স ব্যবহার না করেও প্রতিবিম্ব গঠনের উপায়ের সন্ধান হলোগ্রাফি দিয়েছে। কোন কম্পনশীল বস্তুর কম্পনের ধরণ ও সেই কম্পনের প্রাবল্য নির্ণয় করবার কাজে হলোগ্রাফির ব্যবহার হতে পারে। রক্ত পরীক্ষার কাজও আজ কাল হলোগ্রাফির সাহায্যে সাফল্যের সঙ্গে করা সম্ভব হচ্ছে। সামরিক প্রয়োজনেও হলোগ্রাফির অবদান কম নয়। আগেই বলা হয়েছে, হলোগ্রামের যে কোন টুকরা থেকেই বস্তুর সম্পূর্ণ প্রতিকৃতি পাওয়া যায় এবং হলোগ্রাফির সময়ে ব্যবহৃত লেসারের কৌণিক অবস্থানটি ঠিকমত জানা না থাকলে সহজে প্রতিকৃতি পুনরুৎপন্ন করা যায় না। হলোগ্রামের এই দুটি ধর্ম সামরিক প্রয়োজনে গুপ্ত দৃশ্য বা দলিল পাঠাবার কাজে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া নানা দিকে হলোগ্রাফির প্রয়োগ বিজ্ঞান-জগতে নতুন দিগন্তের উন্মোচন করেছে। বয়সে নবীন হলেও হলোগ্রাফি এক বিরাট সম্ভাবনার বার্তা বহন করে এনেছে।

তিমির কথা

শ্রীহরিমোহন কুণ্ডু*

বর্তমান পৃথিবীর জল ও স্থলে বিচরণকারী প্রাণীদের মধ্যে তিমি হলো বৃহত্তম প্রাণী। দৈহিক আকৃতিতে এরা প্রাগৈতিহাসিক ডাইনোসোরের মত বৃহৎ না হলেও বর্তমান পৃথিবীতে এদের চেয়ে বড় আর কোন প্রাণী নেই। জলচর প্রাণী হলেও এরা কিন্তু মাছ নয়। এরা স্তন্যপায়ী প্রাণীদের একটি বিশেষ গোষ্ঠী এবং সিটসিয়া গণের অন্তর্ভুক্ত। এরা জলে বাস করলেও জলের উপরের বাতাসের সাহায্যে শ্বাসক্রিয়া চালায়। অন্যান্য জন্তুদের মতই স্ত্রী-তিমি সন্তান প্রসব করে এবং স্তন্যপান করিয়ে লালন-পালন করে।

শারীরিক বিশেষত্ব—এপর্যন্ত যত রকম তিমি ধরা পড়েছে, তার মধ্যে সবচেয়ে বড় হলো নীল তিমি। নীল তিমি 100 থেকে 110 ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়ে থাকে এবং দৈহিক ওজন 136 থেকে 140 টনের মত।

জীব-বিজ্ঞানীদের মতে, এক কালের স্থলচর চতুষ্পদ প্রাণীই ছিল এদের পূর্বপুরুষ এবং ক্রমবিবর্তনের ধারায় বর্তমান রূপ পরিগ্রহ করেছে। এর প্রমাণ হিসাবে দেখানো হয়েছে যে, তিমির ভ্রূণের চারিটি পা থাকে, দেহ লোমে আবৃত এবং পিছনের লেজ থাকে না। কিন্তু জন্মাবার আগে দেহ রূপান্তরিত হয়ে অনেকটা মাছের আকৃতি গ্রহণ করে।

তিমির বিশাল দেহ এমনভাবে গঠিত যে, জলের মধ্যে দ্রুতগতিতে বিচরণ করতে কোন অসুবিধাই হয় না। বিরাট মস্তক ও মুখ-গহ্বর তিমির দেহের প্রায় এক-তৃতীয়াংশের মত। ঘাড় নেই এবং দেহটি পিছনের দিকে ক্রমশঃ সরু হয়ে গেছে। সামনের পা দুটি সাঁতার কাটবার জন্যে প্যাড্‌ল্ হিসাবে রূপান্তরিত হয়েছে। পিছনের পা দেহের বাইরে আসে না—তাই দেখা যায় না। শিরদাঁড়ার উপর লম্বা মাংস-পিণ্ডের একটি পাখ্‌না থাকে। লেজটিও একটি বড় পাখ্‌নায় রূপান্তরিত হয়। চোখ দুটি দেহের তুলনায় খুবই ছোট এবং মুখের চোয়াল দুটির কোণে অবস্থিত। বাইরে কোন কান দেখা যায় না। পূর্ণাঙ্গ তিমির দেহে কোন লোম থাকে না। কখনও কখনও উপরের ঠোঁটে কয়েক গাছা লোম দেখা যায়। উষ্ণ রক্তের প্রাণীদের দেহে সাধারণতঃ লোম অথবা পালক থাকে, যার দ্বারা দেহের উত্তাপ রক্ষিত হয়। তিমির দেহে লোম থাকে না, কিন্তু চামড়ার নীচে তিন থেকে দশ ইঞ্চি পুরু চর্বি থাকে, যার সাহায্যে তাদের দেহের উত্তাপ রক্ষিত হয়ে থাকে। নাকে একটি অথবা দুটি গর্ত থাকে। মাথার উপরে নাকের অবস্থান, কাজেই মাথাটি জলের উপরে তুললেই শ্বাসকার্যের জন্যে বাতাস সংগ্রহ করতে পারে। দেহের আকার অনুযায়ী তিমি 10 থেকে 45 মিনিট পর্যন্ত শ্বাস না নিয়ে জলের তলায় থাকতে পারে। যখন শ্বাস ছাড়ে, তখন নির্গত বায়ু দেহের মধ্যে অনেক সময় পর্যন্ত আবদ্ধ থাকবার ফলে খুবই উত্তপ্ত হয় এবং সমুদ্রের উপর ঠাণ্ডা বাতাসের সংস্পর্শে এলে ধোঁয়ার মত ঘনীভূত বাষ্পে পরিণত হয় এবং 12 থেকে 14 ফুট পর্যন্ত ফোয়ারার মত উঁচুতে উঠে যায়। শ্বাস ছাড়বার সময় যে শব্দ হয়, তা কয়েক মাইল দূর থেকেও শোনা যায়। তিমির পায়ুর কাছাকাছি দু-দিকে দুটি স্তন থাকে।

---

*প্রাণিবিদ্যা বিভাগ; বাঁকুড়া সম্মিলনী কলেজ, বাঁকুড়া

এটা এমন মাংসপেশী দিয়ে তৈরি, যাতে ইচ্ছামত স্ত্রী-তিমি সেটাকে সঙ্কুচিত করে বাচ্চাকে প্রচুর দুধ পান করাতে পারে। স্ত্রী-তিমি সাধারণতঃ এক বছর অথবা কিছু বেশী সময় গর্ভ-ধারণ করে একটি করে বাচ্চা প্রসব করে।

তিমি মাংসাশী প্রাণী। এরা প্রধানতঃ প্রচুর পরিমাণ প্ল্যাঙ্কটন উদরস্থ করে এবং সময়ে সময়ে অক্টোপাস, মাছ, সীল, পেঙ্গুইন প্রভৃতি প্রাণীও ভক্ষণ করে থাকে। তিমি অত্যন্ত দ্রুতগতিতে ছুটতে পারে। সাধারণতঃ ঘণ্টায় 30 থেকে 45 সামুদ্রিক মাইল গতিতে এরা ডুবোজাহাজের সঙ্গে সমতা রেখে ছুটতে পারে। শ্বাসক্রিয়ার জন্যে বাতাস সংগ্রহের উদ্দেশ্যে প্রায়ই জলের উপর এদের মাথা তুলতে হয়।

তিমির শ্রেণী বিভাগঃ—তিমির অনেক রকমের জাতি ভেদ আছে। তবে তাদের মোটা-মুটি দুটি Sub-order-এ ভাগ করা হয়েছে।

(ক) Sub-order—Mystacoceti—দন্ত-বিহীন তিমি এই বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। তাদের মধ্যে অ্যাটলাণ্টিক ও মেরুদেশীয় সমুদ্রের নীল তিমি, প্রশান্ত মহাসাগরের ধূসর তিমি, অ্যাটলাণ্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগরের কুব্জপৃষ্ঠ তিমি (1নং চিত্র) এবং মেরুদেশীয় সমুদ্রের রাইট তিমি (2নং চিত্র) ইত্যাদি প্রধান।

(খ) Sub-order—Odontoceti—দন্ত-বিশিষ্ট তিমিকে এই বিভাগের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এদের মধ্যে প্রশান্ত মহাসাগর ও অ্যাটলাণ্টিক মহাসাগরের শিকারী তিমি (3নং চিত্র), প্রশান্ত ও ভারত মহাসাগরের স্পার্ম তিমি (4নং চিত্র) এবং ডলফিন (5নং চিত্র) ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ডলফিন জাতীয় ছোট ছোট তিমি পৃথিবীর প্রায় সব স্থানেই দেখা যায়। কখনও কখনও তারা মোহানা দিয়ে নদীতে উঠে আসে। ভারতবর্ষে গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র নদীতে প্রচুর Gangetic Dolphin দেখা যায়।

তিমির স্নেহ-মমতা ও মানসিকতা—তিমির ভালবাসা সম্বন্ধে অনেক কাহিনী শোনা যায়। এরা কখনও কখনও ঝাঁকে ঝাঁকে, কখনও জোড়া বেঁধে, কখনও বা একাকী বিচরণ করে। জোড়া বেঁধে বিচরণ করবার সময় স্ত্রী-তিমি শিকারী কর্তৃক আক্রান্ত হলে মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত পুরুষ তিমি তার সঙ্গ ছাড়ে না। মৃত্যুর পরেও অনেক সময় মৃতের পিঠে মাথা দিয়ে আঁকড়ে রাখে। বোতল-নাকসদৃশ তিমি কখনও আহত হলে সঙ্গীরা তাকে ফেলে যায় না। দশ-পনেরোটি তিমি তার শুশ্রূষায় লেগে যায়। এতে শিকারীদের সুবিধা হয় বেশী—একটিকে আহত করে তার মৃত্যুর আগেই অন্যটিকে আহত করবার সুযোগ পায়। এভাবে পুরা দলটিকে শিকার করবার সুবিধা হয়।

1নং চিত্র
স্তনদানে রত 50 ফুট দীর্ঘ কুব্জপৃষ্ঠ তিমি

স্ত্রী ও পুরুষ তিমির মিলনের সময় তারা আলিঙ্গনা-

বদ্ধ অবস্থায় সাধারণতঃ আড়াআড়িভাবে জলে ভাসতে থাকে এবং কখনও কখনও খাড়াভাবে পিছনের লেজের উপর ভর করে দাঁড়ায়। মাঝে মাঝে পাখ্‌নার সাহায্যে জলের মধ্যে এমনভাবে আলোড়ন সৃষ্টি করে, যার শব্দ কয়েক মাইল দূর থেকেও শোনা যায়।

স্ত্রী-তিমির সন্তান-বাৎসল্য অতি প্রবল। হঠাৎ যদি কোন বাচ্চা শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হয়, তবে আর রক্ষা নেই। সমুদ্রে বিচরণকারী জেলে নৌকাগুলিকে এমনিতে তারা গ্রাহ্য করে না; কিন্তু খোঁচা দিলে বা অন্যভাবে বিরক্ত করলে তারা নৌকাগুলিকে উল্টে দিয়ে প্রতিশোধ নেয়।

ডলফিন সম্বন্ধে নানা রকম প্রবাদ আছে। Plutarch লিখেছেন—ডলফিন নিঃস্বার্থভাবে মানুষকে ভালবাসে। Jack Denton Scott (1955) লিখেছেন—জিল বেকার নাম্নী একটি 13 বছরের বালিকা হঠাৎ নিউজিল্যাণ্ডের উপকূলে সমুদ্রের জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে ডলফিনের পিঠে চড়ে খেলা সুরু করে দেয়। শত শত দর্শক অবাক বিস্ময়ে এই ব্যাপার লক্ষ্য করেন।

প্রশান্ত মহাসাগর ও ভূমধ্য সাগরের 7 ফুট থেকে 12 ফুট লম্বা ডলফিনদের মুখের গঠন এমনই যে, সব সময়ই যেন তাদের মুখে হাসি লেগে আছে। এদের শব্দগ্রাহী ইন্দ্রিয় এবং এদের বুদ্ধিও বেশ। গর্ভবতী ডলফিনের প্রসবকালে অন্য একটি স্ত্রী-ডলফিন সর্বদা তার পাশে পাশে ধাত্রী হিসাবে ঘুরে বেড়ায়। প্রসবের দীর্ঘ দিন পরেও ধাত্রী তিমি বাচ্চাদের যত্ন করে। এরা ঘণ্টায় ত্রিশ মাইল হিসাবে ছুটতে পারে এবং সমুদ্রের জলে এক রকম সাঙ্কেতিক শব্দ করে। এই শব্দের প্রতিধ্বনি অনুসরণে এরা জলের নীচে লুকানো পাহাড়-পর্বত ও বিপদসঙ্কুল স্থানগুলির অবস্থান নির্ধারণ করে। প্রবাদ আছে—সমুদ্রযাত্রী অনেক জাহাজকে এভাবে তারা পথ দেখিয়ে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যায়। ফ্লোরিডা বিশ্ববিদ্যালয়ের Dr. Winthrop N. Kellog-এর মতে, এদের

2নং চিত্র
45 থেকে 50 ফুট দীর্ঘ রাইট তিমি

3নং চিত্র
30 থেকে 40 ফুট দীর্ঘ শিকারী তিমি

শব্দের প্রতিসরণ নির্ণয়ের ক্ষমতা মানুষের তৈরি যন্ত্রের চেয়ে অনেক শক্তিশালী। Dr. Jhon C. Lilly টেপ-রেকর্ডের সাহায্যে এদের ভাষা অনুশীলনে ব্যাপৃত আছেন।

এতদিন কুকুর, বানর, পায়রা ইত্যাদি প্রাণীকে মানুষ অনেক বুদ্ধিসাধ্য কাজে লাগিয়েছেন। এবার ফরাসী প্রতিরক্ষা দপ্তর বিজ্ঞানীদের সাহায্যে ডলফিনকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে জলের প্রহরীর কাজ করাবার কথা ভাবছেন। শত্রু-পক্ষীয় কোন ডেস্ট্রয়ার অথবা ডুবুরি গুপ্তচর যুদ্ধ বন্দরের আনাচে-কানাচে ঘুরছে কিনা—এই সংবাদ শিক্ষাপ্রাপ্ত ডলফিন আগেই জানিয়ে দেবে। এই ব্যবস্থা সফল হলে প্রাণী-জগতের এই আশ্চর্য জীবটি সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের কৌতূহল আরও বেড়ে যাবে।

তিমির শত্রু মানুষ আর তাদের স্বজাতি—শিকারী তিমি। শিকারী তিমিরা অন্যান্য বড় তিমির মুখের উপর এমনভাবে দংশন করতে থাকে যে, আক্রান্ত তিমি মুখ খুলতে বাধ্য হয় এবং জিভটি তখন কামড়ে টেনে ছিঁড়ে বের করে ফেলে। দেখা গেছে, মৃত তিমিদের মধ্যে অনেকেরই জিভ নেই।

তিমি শিকার—মানুষ নিজেদের প্রয়োজনে তিমি শিকার করে। তিমি-শিকার যদিও প্রায় হাজার বছর ধরে প্রচলিত, তথাপি এটি ভীষণ দুঃসাহসিক কাজ। উপস্থিত বুদ্ধি ও সাহসের দরকার হয় তিমি শিকারে—ডাঙ্গায় বসে বন্য হস্তী, বাঘ, সিংহ শিকার সে তুলনায় অনেক সহজ।
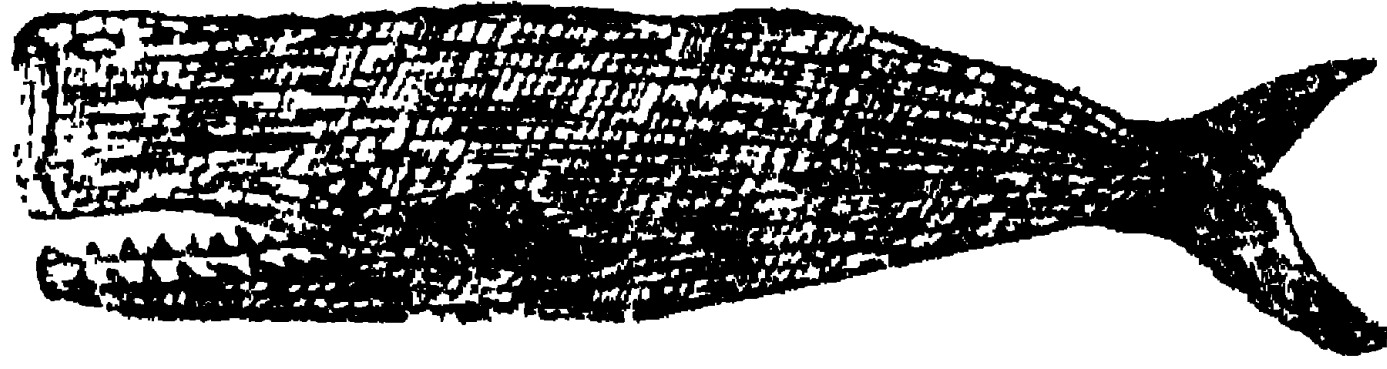
4নং চিত্র
55 থেকে 60 ফুট দীর্ঘ স্পার্ম তিমি

নীল তিমির দেহে অসাধারণ শক্তি। Roy Chapman Andrews লিখেছেন—Captain Melsom একবার সাইবেরিয়ার উপকূলে তিমি শিকারের সময় তিমিটিকে গেঁথে ফেলবার সঙ্গে সঙ্গে সামনের দিকে ঘণ্টায় 40 থেকে 45 মাইল গতিবেগে চলমান জাহাজটিকে পিছনের দিকে ঘণ্টায় 8 সামুদ্রিক মাইল গতিবেগে টেনে নিয়ে 7 ঘণ্টা ছুটে বেড়ায় (1 সামুদ্রিক মাইল—2025 গজ)। আর একবার নরওয়ের উপকূলে

5নং চিত্র
6 থেকে 10 ফুট দীর্ঘ গ্যাঞ্জেটিক ডলফিন

শিকার করতে গিয়ে তিনি বিকেল 5টায় একটি নীল তিমিকে গেঁথে ফেলেন। সামনের দিকে পূর্ণ গতিতে চলমান জাহাজটিকে আহত তিমিটা পিছন দিকে রাত 11টা পর্যন্ত টেনে নিয়ে ছুটে বেড়ায়। তারপর জাহাজের গতি অর্ধেক কমানো হলে রাত একটা পর্যন্ত জাহাজটিকে টানতে থাকে। অবশেষে ক্লান্ত হয়ে রাত ছুটার সময় মৃত্যুবরণ করে।

900 শতাব্দীতে সাধারণতঃ খোঁচ, বল্লম, টাঙ্গী, কুঠার প্রভৃতি অস্ত্র দিয়ে তিমি শিকার করা হতো। তীরের কাছে তিমিরা যখন শ্বাসক্রিয়ার জন্যে বাতাস নিতে ভেসে উঠতো, তখন শত শত আদিবাসী শিকারী ঝাঁপিয়ে পড়তো এবং তাদের হত্যা করে তীরে টেনে আনতো। 1557 থেকে 1700 শতাব্দী পর্যন্ত বৃটিশ ও ডাচ্ শিকারীরা তিমি শিকারের জন্যে বড় বড় নৌকা এবং 200 টন পর্যন্ত মালবাহী জাহাজ ব্যবহার করতো। প্রতিটি শিকারী জাহাজে 50 থেকে 60 জন লোক থাকতো এবং নানারকম অস্ত্রশস্ত্র ও দড়ি প্রভৃতি সঙ্গে নেওয়া হতো। এভাবে শিকারী জাহাজগুলি আটলান্টিক, প্রশান্ত মহাসাগর ও ভূমধ্যসাগরে ঘুরে বেড়াতো। পরবর্তী যুগে আমেরিকাও এই কাজে যোগ দেয়। আধুনিক যুগে নানাভাবে সজ্জিত বড় বড় জাহাজ এই কাজে ব্যবহার করা হয়।

1700-1900 শতাব্দীর মধ্যে তিমিকে মানুষের কাজে লাগাবার জন্যে নূতন নূতন বন্দর ও শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। বর্তমানে সারা বিশ্বে বছরে মোট চল্লিশ হাজার তিমি শিকার করা হয়।

মানব সভ্যতায় তিমি—(1) খাদ্য হিসাবে তিমির মাংস জাপান, নরওয়ে, বৃটেন প্রভৃতি দেশে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। পরীক্ষা করে দেখা গেছে, এদের মাংসে শতকরা 98 ভাগ প্রোটিন আছে।

(2) তিমিশিল্প পরিচালনই তিমি শিকারের মূল উদ্দেশ্য। এই শিল্পের সঙ্গে জড়িয়ে আছে ছোট-বড় কলকারখানা। তিমিশিল্প থেকে সাধারণতঃ তিমির তেল বের করা হয়। একটি বড় তিমি থেকে প্রায় 100 ব্যারেল তেল এবং এক টনের উপর হাড় পাওয়া যায়। শিল্পে এই ছুটিরই প্রয়োজন অত্যন্ত বেশী এবং বাজার দরও যথেষ্ট। তিমির তেলে রান্না, বাতি জ্বালানো, সাবান তৈরি, যন্ত্রপাতি চালানো প্রভৃতি কাজ হয়। তিমির হাড় থেকে সার ও অন্যান্য দ্রব্যাদি প্রস্তুত হয়।

1946 সালে বিশ্বের তিমি-শিকার সংস্থাগুলির এক সভা হয় এবং তিমিকুলকে রক্ষা করবার জন্যে শিকার ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করে কতকগুলি আইন প্রণয়ন করা হয়—যাতে তিমিকুল পৃথিবী থেকে একেবারে অবলুপ্ত না হয়।

গণিতের জন্ম

শ্রীবিশু দাস

গণিত হলো বিজ্ঞানীর হাতের সোনার কাঠি, যার ছোঁয়ায় বিজ্ঞান-জগতের কেউ এগিয়ে যায় সমৃদ্ধির পথে, আবার কারোর উপর আসে দুঃখ আর হতাশা। দেকার্টে বলেছেন—মাপটা সংখ্যায়, শব্দে বা আকারে যে ভাবেই হোক না কেন, বিজ্ঞানীকে গবেষণার শেষ অঙ্কে পৌঁছুতে হলে গণিতের সাহায্য নিতেই হবে কোন না কোন ভাবে। গত সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে গণিতের নতুন কতকগুলি হাতিয়ার এসেছে বিজ্ঞানীদের হাতে।

লগারিদম্ (Logarithm) এমনি একটি হাতিয়ার, যার আবিষ্কারে বিজ্ঞানীর কাজ হয়েছে অনেক হাল্কা। এই প্রক্রিয়ায় গুণ এবং ভাগের কাজ অপেক্ষাকৃত সহজ যোগ ও বিয়োগের সাহায্যে করা সম্ভব। যে কোন সংখ্যার বর্গমূল, ঘনমূল ইত্যাদি নির্ণয় করা যায় কেবল সাধারণ ভাগের সাহায্যে। সাধারণ লগারিদম্ বা ব্রিগস্-এর লগারিদম্ প্রক্রিয়ায় দশ সংখ্যাটিকে বলা হয় আধার বা Base। 100 সংখ্যাটিকে আমরা 10^2 লিখতে পারি অনায়াসে। 10-এর মাথায় 2 শক্তি বা সূচক সংখ্যাটিকে বলা হয় লগারিদম্ বা সংক্ষেপে লগ্ (Log)। 1000 সংখ্যাটিকে লেখা যায় 10^3 এবং 3 সংখ্যাটিকে বলা হয় 1000-এর লগারিদম্। তাহলে 100-কে 1000 দিয়ে গুণ করতে হলে 100-এর লগারিদম্ 2 এবং 1000-এর লগারিদম্ 3 যোগ করলেই হয়ে যাবে; অর্থাৎ গুণফল হবে $10^{2+3}=10^5$ বা 100,000। লগারিদমের তালিকা থেকে আমরা যে কোন সংখ্যার লগারিদম্ বের করতে পারি এবং নানা ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারি সেই ফলাফল।

জন নেপিয়ার নামে মার্সিস্টোনের একজন ব্যারণ প্রথম লগারিদম্ আবিষ্কার করেন। তিনি 1550 সাল থেকে 1617 সাল পর্যন্ত বেঁচেছিলেন। প্রায় ঐ একই সময়তে Joost Buerg নামে একজন সুইজারল্যাণ্ডবাসী গণিতজ্ঞ (জন্ম 1552; মৃত্যু 1632) পৃথকভাবে লগারিদম্-এর আর একটি পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। জন নেপিয়ার তাঁর 'The Description of the marvellous cannon of literature' গ্রন্থে প্রথম নিজের আবিষ্কারটি প্রকাশ করেন 1614 সালে। গ্রেসাম কলেজের গণিতের অধ্যাপক হেনরী ব্রিগস্ জন নেপিয়ারের পদ্ধতিকে চরম উৎকর্ষ দান করবার জন্যে যথেষ্ট সাহায্য করেন। ইনি সম্ভবতঃ 1561 সাল থেকে 1631 সাল পর্যন্ত বেঁচেছিলেন। 1624 সালে প্রকাশিত অধ্যাপক ব্রিগস্-এর 'Arithmetic of Logarithm' বইতে 30,000 সংখ্যার লগারিদম্সমন্বিত একটি সারণী (Table) প্রকাশ করেন। বর্তমানে লগারিদম্ বিজ্ঞানী এবং গণিতজ্ঞদের কাছে বড় বড় অঙ্ক সংক্ষেপিত করবার এটি অপরিহার্য যন্ত্র বিশেষ।

এছাড়া, নেপিয়ার বড় বড় হিসাব সহজে করবার জন্যে আর একটি উপায় আবিষ্কার করেন। এটাকে বলা হয় 'নেপিয়ারের অস্থি'। এতে কতকগুলি খাঁজকাটা দণ্ডের সাহায্যে অতি সহজেই গুণ, ভাগ ইত্যাদি করা যায়।

বর্তমান কালে যন্ত্রের সাহায্যে হিসাবপত্র অত্যন্ত সহজে করবার উপায় আবিষ্কৃত হয়েছে। এদের মধ্যে সবচেয়ে সরল যন্ত্রটির নাম অ্যাবাকাস (Abacus বা Counting Frame)। এটি

আবিষ্কৃত হয়েছে বহু দিন আগেই। হিসাব করবার প্রথম যন্ত্রটি আবিষ্কৃত হয় সপ্তদশ শতাব্দীতে। 1640 সালে প্রকাশিত 'Mathematical Discipline' বইতে Cierman দাবী করেন যে, তিনি একটি হিসাব করবার যন্ত্র উদ্ভাবন করেছেন, কিন্তু বইতে তিনি সে যন্ত্রের কোন বর্ণনা দেন নি। বলে ব্যাপারটা পরবর্তী কালের গণিতজ্ঞদের কাছে সন্দেহজনক বলে মনে হয়েছে। 1642 সালে পাস্কেল যোগ করবার যন্ত্র উদ্ভাবন করেন এবং সেটি এখনও বর্তমান। পাস্কেল এবং পরবর্তী কালে মোরল্যাণ্ড এবং লেবনিজ্ কর্তৃক উদ্ভাবিত যন্ত্রগুলির কোনটাই সূক্ষ্ম বিচারের মাপকাঠিতে চরম উৎকর্ষের আসনে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে নি। উৎকৃষ্ট যন্ত্র আবিষ্কৃত হয় এর অনেক পরে।

দেকার্টের (Reré Descartes) আবিষ্কৃত স্থানাঙ্ক-জ্যামিতি (Analytical Geometry) গণিতের ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। এই জ্যামিতির প্রতিপাদ্য বিষয় হলো দুটি বা তিনটি স্থির তলের সাহায্যে কোন একটি বিন্দুর অবস্থান নির্ণয়। ঘরের দুপাশের দুটি দেয়াল এবং উপরের ছাত, এই তিনটি স্থির তলের সাহায্যে তিনি উড়ন্ত মাছির অবস্থান নির্ণয় করতে গিয়ে উন্মুক্ত করলেন গণিত রাজ্যের এক নতুন দ্বার, অসংখ্য ক্ষেত্রে যার ব্যবহার। লেখচিত্র (Graph) এমনি একটি অতি পরিচিত ক্ষেত্র।

Differential Calculus গণিতের ক্ষেত্রে আর একটি অতি পরিচিত এবং প্রয়োজনীয় হাতিয়ার। এর প্রথম পরিকল্পনার কৃতিত্ব কেপ্লার এবং ক্যাভেলিয়েরের নামে গ্যালিলিওর এক শিষ্যের। পরে নিউটন এবং জার্মেনীর লেব্নিজ একে ব্যবহারের উপযোগী রূপ দান করেন। ক্যালকুলাসের কারবার অতি ক্ষুদ্র সংখ্যা (Infinitesimal) নিয়ে, গণিতের সাধারণ উপায়গুলির সাহায্যে যা করা সম্ভব নয়।

তারপর সপ্তদশ শতাব্দীতে এক জুয়ার টেবিলে প্রথম উৎপত্তি হলো সম্ভাব্যতার সূত্র (Theory of Probability)। পারস্যের এক সম্রান্ত বংশীয় জুয়াড়ী Chevalier de Móré কিভাবে সম্ভাব্য ক্ষেত্রে বাজী রেখে জুয়া খেলায় জেতা যায়, তার উপায় আবিষ্কারের জন্যে পাস্কেলের (Blaise Pascal) সাহায্যপ্রার্থী হন। পাস্কেল প্রথমে সমস্যাটি নিয়ে দিশাহারা হয়ে পড়েন এবং সেকালের একজন বিখ্যাত গণিতজ্ঞ ফারমেটের (Piere Fermat, জন্ম 1601, মৃত্যু 1665) সঙ্গে বিষয়টি আলোচনা করেন চিঠির মাধ্যমে। এই পত্রালাপের ফলেই জন্ম হলো সম্ভাব্যতার নিয়ম (Law of Probability)। আধুনিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সম্ভাব্যতার সূত্র একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ স্থান গ্রহণ করেছে। নানা প্রাকৃতিক ঘটনায় কি ঘটতে পারে, সেই সম্ভাবনা নির্ণয় করা হয় এই সূত্রের সাহায্যে।

পরিসংখ্যান পদ্ধতির (Statistical Method) উৎপত্তি সপ্তদশ শতাব্দীতে। প্রথম দিকে একে বলা হতো রাজনৈতিক পাটীগণিত। এই পদ্ধতির উদ্ভাবক স্যার উইলিয়াম পেটী (জন্ম-1623, মৃত্যু-1687)। শাসন বিভাগ, পার্লিয়ামেন্ট ইত্যাদির কাজের সুবিধার জন্যে সংবাদ সংগ্রহের রূপ নিয়ে রাজনৈতিক পাটীগণিতের ব্যবহার আরম্ভ। এতে ব্যষ্টির চেয়ে সমষ্টিগতভাবে জিনিষের আলোচনাই করা হয় প্রধানতঃ। এটা বুঝতে দেরী হলো না যে, কোন বস্তু বা জাতির প্রত্যেকটি পৃথক পৃথকভাবে বর্ণনা দেবার চেয়ে সমষ্টিগতভাবে সমস্ত জিনিষগুলির বর্ণনা দেওয়া সহজ। অবশ্য একথা ঠিক যে, কোন নির্দিষ্ট অঞ্চলের নির্দিষ্ট সংখ্যক লোক গড়ে এক বছরের বেশী বাঁচবে না। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, বিশেষ কোন এক ব্যক্তি ঠিক এক বছর পরেই মারা যাবে।

পরিসংখ্যান পদ্ধতির একজন প্রধান পথপ্রদর্শক হচ্ছেন লণ্ডনের ক্যাপ্টেন জন গ্রান্ট

(জন্ম 1620, মৃত্যু 1674)। সম্ভবতঃ 1662 সালে স্যার উইলিয়াম পেটীর সাহায্যে ইনি 'Natural and Political Observations on Bills of Mortality' নামে একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ প্রকাশ করেন। মৃত্যুর পরিসংখ্যান বলতে প্রধানতঃ বোঝাতো সাপ্তাহিক জন্ম-মৃত্যুর হার। মৃতের সংখ্যা এবং মৃত্যুর কারণ ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করতো বৃদ্ধা মহিলারা। এঁদের বলা হতো অনুসন্ধানকারী। এই সব বিবরণ 1603 সালের লণ্ডন শহরের প্লেগ মহামারির পর থেকেই রাখা হচ্ছে। এই বিবরণগুলি প্লেগ, মারাত্মক ব্যাধি, হতাহত ইত্যাদি বিভিন্ন শিরোনামার তালিকার আকারে তৈরি করা হতো। ক্যাপ্টেন গ্রাণ্টই প্রথম ব্যক্তি, যিনি এই সমস্ত তালিকা এবং সংখ্যা বিশ্লেষণ করে নগরী এবং গ্রামের মঙ্গলের জন্যে সেগুলি কত দূর সাহায্য করতে পারে, তা নির্ণয় করে দেখানো। অনেকগুলি বড় বড় বিভ্রান্তিকর গ্রন্থকে কতকগুলি সংখ্যাময় তালিকায় রূপান্তরিত করে গ্রাণ্ট বুঝতে পারেন যে, পুরুষের চেয়ে নারীর জন্মহার কত বেশী, শিশুর মৃত্যুর হার গ্রামের তুলনায় শহরে কত বেশী ইত্যাদি। গ্রাণ্ট ঐ তালিকার সাহায্যে হিসাব করে দেখান যে, সপ্তদশ শতাব্দীতে লণ্ডনে শতকরা 36টি শিশুর মৃত্যু হয়, 6 বছর বয়স হবার আগেই।

পেটী এবং গ্রাণ্ট-এর সময় থেকেই বিজ্ঞানের বহু সমস্যা সমাধানের কাজে লাগানো হচ্ছে পরিসংখ্যান পদ্ধতিকে। এঁরা বিজ্ঞানীদের হাতে তুলে দিয়েছেন এমন একটি হাতিয়ার, যার সাহায্যে তাঁরা পদার্থবিদ্যা, রসায়নশাস্ত্র, জীব-বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ের গবেষণালব্ধ ফলাফলগুলি সহজেই পরীক্ষা করে মূল্যবান মন্তব্য করতে পারেন। পরিসংখ্যান পদ্ধতির প্রধান প্রয়োগ 'জীব পরিসংখ্যানে' অর্থাৎ জন্মের হার, মৃত্যুর হার, জনসংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি ইত্যাদি তালিকাভুক্ত করবার কাজে। একটা কথা মনে রাখা দরকার যে, পরিসংখ্যান পদ্ধতি বৈজ্ঞানিক সত্যকে যাচাই করে মাত্র, কিছু আবিষ্কার করে না।

সঞ্চয়ন

যন্ত্রের সাহায্যে জলকে ধাতব পদার্থ থেকে মুক্ত করবার ব্যবস্থা

বহু নদী-নালা থাকলেও এবং কোন কোন অঞ্চলে প্রবল বৃষ্টিপাত হলেও ভারতে যে জলাভাব রয়েছে, তা সামগ্রিক দৃষ্টি নিয়ে বিচার করে দেখলে সুস্পষ্টভাবেই প্রতিভাত হবে। তিন দিকে সমুদ্রবেষ্টিত ভারতের সমুদ্রোপকূলবর্তী এলাকায় জল লবণাক্ত এবং ভূগর্ভে সঞ্চিত জলের মধ্যে রয়েছে নানা প্রকার ধাতব পদার্থ। ভূগর্ভে সঞ্চিত জল ও সমুদ্রের উপকূলবর্তী জলকে সস্তায় লবণ ও ধাতব পদার্থ থেকে মুক্ত করতে পারলে এই জলের সাহায্যে ভারতের শস্য উৎপাদন প্রচুর পরিমাণে বাড়ানো যেতে পারে এবং এর ফলে বিপুল অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিও সম্ভব হতে পারে।

জলকে ধাতব পদার্থ থেকে মুক্ত করবার সহজ পদ্ধতি আমেরিকায় উদ্ভাবিত হয়েছে। সম্প্রতি ভারত সরকারের সেণ্ট্রাল ওয়াটার অ্যাণ্ড পাওয়ার কমিশনের ডেপুটি ডিরেক্টর এন. সি. রাওয়াল এই বিষয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে সকল ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়েছে, তা পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে সে দেশে গিয়েছিলেন। জলসম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে ইনি একজন বিশেষজ্ঞ। লবণাক্ত এবং ধাতব

পদার্থযুক্ত জল বিশুদ্ধ করবার জন্তে মার্কিন বিজ্ঞানীরা 'রেভার্স অসমোসিস প্রোসেস' নামে এক প্রকার পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন। এই পদ্ধতিতে জল বিশুদ্ধ করবার খরচও কম পড়ে। এই পদ্ধতিতে জলকে ধাতব পদার্থ থেকে মুক্ত করবার ছোটখাটো যন্ত্রও তাঁরা তৈরি করেছেন।

মিঃ রাণ্ডাল এই প্রসঙ্গে আরও বলেছেন যে, ভারতের যে সকল অঞ্চলে ভূগর্ভে সঞ্চিত জল লবণাক্ত এবং ধাতব পদার্থযুক্ত, সে সকল এলাকায় নলকূপের সঙ্গে এই যন্ত্রটিকে কাজে লাগানো যেতে পারে। বিশেষ করে রাজস্থান এবং সমুদ্রোপকূলবর্তী এলাকায় এই যন্ত্রটি খুবই কাজে লাগতে পারে বলে তাঁর ধারণা।

আমেরিকায় বিশুদ্ধ জল উৎপাদন ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ জলের ব্যবহার নিয়ে যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণা চলেছে, তা দেখে আসবার এবং এই বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যেই তিনি সেখানে গিয়েছিলেন। কেবলমাত্র পানীয় হিসাবেই নয়, ফসল উৎপাদনে, সেচ পরিকল্পনা রূপায়ণে তাপ-বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনে, কংক্রিট নির্মাণে যে জল ব্যবহৃত হয়, তার বিশুদ্ধতা বজায় রাখা একান্ত প্রয়োজন। এই বিষয়টি বিশ্লেষণ করে তিনি বলেন—অনেক সময়েই দেখা গেছে যে, সেচের জলে নানা রকমের লবণ থাকে। এই সকল লবণ শস্যের পক্ষে ক্ষতিকর। সংরক্ষিত ভাণ্ডারে বহুকাল ধরে জল সঞ্চিত থাকাই এর কারণ। সুতরাং শস্যের ক্ষেতে প্রয়োগ করবার পূর্বে ঐ জলের গুণাগুণ পরীক্ষা করে দেখা কর্তব্য।

জলের গুণাগুণ পরীক্ষা করা ছাড়া জলাধারে যে তলানি পড়ে, নদী ও স্রোতস্বিনীর তলায় যে মাটি ও গাদ জমে, সে সকল বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের জন্তে আমেরিকায় যে সব কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়েছে, মিঃ রাণ্ডল তা দেখেছেন। ঐ সকল বিষয়ে তিনি পর্যালোচনা, তথ্যানুসন্ধান এবং তথ্য সংগ্রহ করেছেন।

এছাড়া ফ্লাই অ্যাশ বা অদাহ্য ছাই সম্পর্কেও তিনি অনেক কিছু জেনে এসেছেন। আমেরিকা ও জাপানে বাঁধ এবং বাড়ীঘর নির্মাণে 'ফ্লাই অ্যাশ' প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করা হচ্ছে। মিঃ রাণ্ডাল বলেন, ঐ দুটি প্রধান শিল্পোন্নত রাষ্ট্র যদি সিমেন্টের বদলে অদাহ্য ছাই ব্যবহার করতে পারে, তবে আমরাই বা পারবো না কেন? তাতে খরচও অনেক কম পড়বে। আমি মিসিসিপির ভিক্সবার্গের জলপথ সংক্রান্ত পরীক্ষা-মূলক কেন্দ্রটি দেখে এসেছি। সেখানে ছাই দিয়ে বিরাট নির্মাণ-কার্য চলছে এবং কিভাবে ছাই কাজে লাগানো যেতে পারে, তার পন্থা উদ্ভাবিত ও মান নিরূপিত হয়েছে।

মিঃ রাণ্ডাল এই প্রসঙ্গে আরও বলেন যে, সিমেন্টের বদলে ছাই ব্যবহার করলে ঘরবাড়ী ইত্যাদির নির্মাণের খরচ শতকরা 30 থেকে 40 ভাগ হ্রাস পাবে এবং ছাইয়ের কংক্রীটে তৈরি বাড়ীঘর ও বাঁধ মজবুতও হবে অনেক বেশী। গত বিশ বছরের মধ্যে ভারতে বহু বাঁধ নির্মিত হয়েছে, এখনও তৈরি হচ্ছে এবং জল উন্নয়ন ও জল-বিদ্যুৎ উৎপাদনের বহু পরিকল্পনাও ইতিমধ্যে করা হয়েছে। এজন্তে প্রচুর পরিমাণে অর্থ বিনি-য়োগ করতে হবে। সুতরাং সেগুলি নির্মাণের খরচ এবং জলাধারের স্থায়িত্বের দিকটাও বিবেচনা করে দেখা প্রয়োজন। এই বিষয়টিও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

লেসার কারিগরীর বিস্ময়কর সম্ভাবনা

কারিগরীর ক্ষেত্রে লেসার রশ্মি নানাভাবে প্রযুক্ত হলেও অদূর ভবিষ্যতেই আরও বিভিন্ন ক্ষেত্রে তার অগ্রগতির সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে।

আশা করা যায়—একবিংশ শতাব্দীতে কারিগরীর বহু ক্ষেত্রেই তার আধিপত্য বিস্তৃত হবে।

সংবাদ পরিবহনের বিস্ময়কর ক্ষমতার ফলে লেসার রশ্মি যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে পুরোভাগে এসে দাঁড়িয়েছে। অনেক শহরের টেলিফোন ব্যবস্থায় ইতিমধ্যেই তারের বদলে হিলিয়াম ও নিওন লেসার রশ্মি ব্যবহৃত হচ্ছে। আর লেসার রশ্মির উপর মহাজাগতিক দৃষ্টি বাস্তব হতে চলেছে। দূর আকাশে প্রেরিত উপগ্রহের সঙ্গে পৃথিবীর যোগাযোগ ব্যবস্থা লেসারের সাহায্যে করা যেতে পারে এবং তা বেশী নির্ভর-যোগ্য এবং তাতে খরচও কম। নিয়মিতভাবে পৃথিবী এবং চাঁদের দূরত্ব নির্ণয়ের ক্ষেত্রেও লেসার রশ্মি ব্যবহৃত হতে পারে।

যানবাহন চলাচলের নিরাপত্তা ও নিরাপদ বিমান অবতরণের জন্যে এবং অন্যান্য প্রয়োজনেও লেসার রশ্মি ব্যবহৃত হতে পারে।

সুদূর মহাকাশে লেসার যোগাযোগ ব্যবস্থার এক রোমাঞ্চকর ভবিষ্যৎ তৈরি হচ্ছে।

সংবাদ প্রেরণের পুরনো প্রথা ক্রমশঃ একটা সীমাবদ্ধতার মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে। তাতে একটা রাস্তাই খোলা আছে—সেটা হলো প্রেরক-যন্ত্র এবং এরিয়ালের ব্যাসের ক্ষমতা বাড়ানো।

কেউ কেউ মহাকাশযানে 30 মিটার এরিয়াল বসাবার এবং 100 ওয়াট ট্রান্সমিটারকে নিয়মিত কাজে লাগাবার কথা ভাবছেন।

অতএব মহাকাশযান মহাশূন্যের যত গভীরে প্রবেশ করবে, লেসার যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা ততই বৃদ্ধি পাবে।

এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, আগামী 20 বছরে মহাকাশে দূরপাল্লার লেসার যোগাযোগ-ব্যবস্থা স্থাপিত হবে।

বিজ্ঞানীরা লেসার বিকিরণ নিয়ন্ত্রিত তাপ-পারমাণবিক একীভবনে সফল হয়েছেন। তাপ-পারমাণবিক একীভবন পারমাণবিক বিভাজনের শক্তি উৎসের চেয়ে বেশী কার্যকরী।

সমন্বয়কে নিয়ন্ত্রিত করবার যে সম্ভাবনা লেসার রশ্মি দেখিয়েছে, তার ফলে বিজ্ঞানীরা বৃহদাকার লেসার তৈরির পরিকল্পনায় উৎসাহিত হয়েছেন, যাতে লেসার বিকিরণের সঙ্গে বস্তুর পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয়ে গবেষণা চালানো যায়।

শল্যবিদ্যা, চক্ষু-চিকিৎসা এবং অন্যান্য চিকিৎসার ক্ষেত্রে লেসার সাফল্যের সঙ্গে প্রযুক্ত হয়েছে। এসব ক্ষেত্রে তার যথেষ্ট ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাও রয়েছে।

তথ্য এবং দলিল ইত্যাদির ক্ষেত্রেও লেসারের কার্যকারিতা প্রমাণিত হয়েছে। এসম্পর্কে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য হলো, তথ্য এবং দলিলকে পুরাপুরি স্মৃতিতে রাখবার পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে যে সব তথ্য ও সংবাদ স্মৃতিতে ধরে রাখা হয়, তা নষ্ট বা বিকৃত হয় না।

পড়া এবং লিপিবদ্ধ করবার শক্তিবৃদ্ধি এবং গতিবৃদ্ধির ফলে মানুষের স্মৃতির হিসেব করবার পদ্ধতিতে বিরাট পরিবর্তন এনেছে।

আধুনিক ইলেকট্রনিক কম্পিউটার খুবই শক্তিশালী যন্ত্র। কিন্তু তার অগ্রগতি ব্যাহত হচ্ছে অন্যান্য উপাদের মন্থরতার জন্যে। সমস্ত তথ্যকে যদি স্মৃতিতে পুরাপুরি ধরে রাখা যায়, তাহলে টেপ, ডিস্ক প্রভৃতি বস্তুর আর প্রয়োজন হবে না।

তার ফলে দলিল পড়া, মূর্তি চেনা, অণুচিত্র, ত্রিস্তর রঙীন চিত্র তৈরি, মেশিন এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি সম্ভব হবে। এই পদ্ধতিতে স্মৃতিকে নানারকম ইঞ্জিনিয়ারিং গবেষণার কাজে লাগানো হচ্ছে; যেমন—কাচ, ইস্পাত এবং বাড়ী তৈরির ক্ষেত্রে।

এই পদ্ধতিতে ধাতুর ক্ষয় অণুবীক্ষণ যন্ত্রের চেয়ে আরো ভালভাবে ধরা যায়, কারণ ক্ষয় সুরু হবার অনেক আগে থেকেই তার লক্ষণগুলি এই পদ্ধতিতে ধরা পড়ে।

এই পদ্ধতিতে নতুন টেলিভিসন সেট তৈরি করা হলে তাতে ত্রিস্তরবিশিষ্ট রঙীন ছবি দেখা যাবে। লেসারের সাহায্যে খুব শক্ত জিনিষ তৈরি করাও সম্ভব।

লেসার কোন কিছু নিয়ন্ত্রণ করতে, জটিল অণুচিত্র তৈরি করতে এবং সবেগে ঘূর্ণায়মান বস্তুকে না থামিয়ে তার ভারসাম্য রক্ষা করতে পারে। লেসার পদ্ধতির উন্নতি নতুন সম্ভাবনার দিক উন্মুক্ত করে দিয়েছে।

স্থানীয় আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণ, হিমানী-সম্প্রপাত আয়ত্তাধীন করা এবং খুব কার্যকরীভাবে দূর-পাল্লার বেতার বৈদ্যুতিক শক্তির মারফৎ সংবাদ প্রেরণের কথাও চিন্তা করা যায়।

অ্যাপোলো-14-এর সাহায্যে সংগৃহীত চান্দ্রশিলার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ

আমেরিকার জাতীয় বিমান বিজ্ঞান ও মহাকাশ সংস্থা একটি ঘোষণায় জানিয়েছেন যে, আমেরিকার তৃতীয় চন্দ্রাভিযান কালে অ্যাপোলো-14 যানের যাত্রী মহাকাশচারী এডগার মিচেল ও স্টুয়ার্ট রুশা চন্দ্রপৃষ্ঠ থেকে যে সকল চান্দ্রশিলা ও ধূলা সংগ্রহ করে পৃথিবীতে নিয়ে এসেছেন, তা ভারত, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, ক্যানাডা, পশ্চিম জার্মেনী, সুইজারল্যাণ্ড, অস্ট্রেলিয়া, জাপান, দক্ষিণ আফ্রিকা, ব্রেজিল, ফিনল্যাণ্ড, হল্যাণ্ড, ইটালী ও নরওয়ে—এই চৌদ্দটি রাষ্ট্রের মধ্যে বণ্টন করা হবে। ঐ সকল রাষ্ট্রের 41টি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের 56টি বৈজ্ঞানিক গোষ্ঠী এই সকল উপ-করণের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ এবং ঐ সকল উপাদান সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান করবেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 65টি বৈজ্ঞানিক গোষ্ঠিকেও গবেষণা ও তথ্যানু-সন্ধানের জন্যে এই সকল উপকরণ সরবরাহ করা হবে। 42.6 কিলোগ্র্যামের মধ্যে মোট 6.8 কিলোগ্র্যাম চান্দ্র উপকরণ মার্কিন ও ঐ চৌদ্দটি রাষ্ট্রের বৈজ্ঞানিক গোষ্ঠীকে দেওয়া হবে।

তাছাড়া 3 আউন্স পরিমাণ চান্দ্র উপকরণ বৈজ্ঞানিক তথ্যানুসন্ধানের উদ্দেশ্যে সোভিয়েট রাশিয়াকেও সরবরাহ করা হবে। মার্কিন যুক্ত-রাষ্ট্র ও সোভিয়েট রাশিয়ার মধ্যে 1971 সালে সম্পাদিত একটি চুক্তি অনুসারে চান্দ্র উপাদান সোভিয়েট রাশিয়াকে সরবরাহ করা হচ্ছে। সোভিয়েট রাশিয়াও 1970 সালে স্বয়ংচালিত লুনিক যন্ত্রের সাহায্যে চন্দ্রপৃষ্ঠ থেকে যে সকল উপাদান সংগ্রহ করে পৃথিবীতে নিয়ে এসেছে, তার মধ্যে তিন আউন্স মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রকে সরবরাহ করবে।

গত ফেব্রুয়ারী মাসের মাঝামাঝি চন্দ্রপৃষ্ঠ থেকে আনা এই সকল উপকরণ প্রাথমিক পরীক্ষার উদ্দেশ্যে হিউস্টন গবেষণাগারে সম্পূর্ণ পৃথক করে রাখা হয়েছে। প্রাথমিক পরীক্ষার

পর প্রমাণিত হয়েছে যে, এই সকল উপাদানের মধ্যে প্রাণের চিহ্নমাত্র (কোন জীবাণু বা ভাইরাস) নেই। পৃথিবীর মানুষের পক্ষে বিপজ্জনক কোন কিছুও এই সকল উপাদানের মধ্যে পাওয়া যায় নি।

সংস্থা এই প্রসঙ্গে বলেছেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বিভিন্ন দেশের 187টি গোষ্ঠীর 700 বিজ্ঞানীর মধ্যে চাঁদের ফ্রা মরো এলাকা থেকে আনা চান্দ্র মৃত্তিকা ও শিলা বন্টন করা হবে। বিজ্ঞানীরা ঐসব উপাদানের ভৌত, রাসায়নিক ও আলোক-বিজ্ঞান সংক্রান্ত গুণাগুণ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাবেন।

1969 সালে অ্যাপোলো-11 চাঁদের নিথর সমুদ্র থেকে এবং 1970 সালে অ্যাপোলো-12 ঝটিকা সমুদ্র এলাকা থেকে যে সকল উপাদান পৃথিবীতে নিয়ে এসেছিল, তাও পৃথিবীর নানা দেশের বিজ্ঞানীদের মধ্যে তথ্যানুসন্ধানের উদ্দেশ্যে বিলি করা হয়েছে।

অ্যাপোলো-14-এর মাধ্যমে ফ্রা মরো এলাকা থেকে তাঁদের সংগৃহীত উপাদানসমূহ বিভিন্ন দেশের বহু বিজ্ঞানী হিউস্টনে এসে সংগ্রহ করছেন অথবা ঐ সকল উপাদান যাতে খোয়া না যায়, তার জন্যে ঐ সকল দেশের মার্কিন দূতাবাসের মাধ্যমেও পাঠানো হচ্ছে।

রাসায়নিক বিশ্লেষণ পদ্ধতির মাধ্যমে অথবা আইসোটোপের সাহায্যে এই সকল উপাদানের বয়স নিরূপণের চেষ্টা করা হচ্ছে।

ব্রেক

দীপ্তিকুমার সেন

যানবাহনে যে ব্রেক ব্যবহার করা হয়, তার বৈজ্ঞানিক যান্ত্রিক কৌশলগুলি খুব সরল হলেও চমকপ্রদ। সাইকেল থেকে আরম্ভ করে লোকোমোটিভ ইঞ্জিন প্রভৃতিতে বিভিন্ন প্রকারের যে সব ব্রেক ব্যবহৃত হয়, সেগুলির মূল কথা হলো এই যে, চলন্ত চাকার সঙ্গে কোনও বস্তুকে চেপে ধরলে ঘর্ষণের ফলে ওই যানের গতি ক্রমশঃ শ্লথ হয়ে আসে। চাকার সঙ্গে যে অর্ধবৃত্তাকার বস্তুটিকে চেপে ধরা হয়—তাকে বলা হয় শু (Shoe)। এই শু-এর সঙ্গে এমন একটি বস্তু লাগানো থাকে, যার সঙ্গে ঘর্ষণের ফলে চাকার কোনও ক্ষয়-ক্ষতি হয় না—ক্ষয় হয় শু-তে লাগানো সেই বস্তুটির। এর নাম দেওয়া হয়েছে শু-লাইনিং। এই লাইনিং নির্বাচনের সময় লক্ষ্য রাখা দরকার, যাতে ঘর্ষণজনিত তাপে চাকার কোন ক্ষতি না হয়; অর্থাৎ ক্ষতির সবটা যেন লাইনিং-এর উপর দিয়েই যায়। ক্ষয়ে গেলে লাইনিং বদল করে নেওয়া যেতে পারে। হাল্কা যানবাহনে রবার অথবা কাপড়ের লাইনিং এবং ভারী যানে ঢালাই লোহা ব্যবহার করা হয়। ব্রেক কি ধরণের হবে, সেটা নির্ভর করে গাড়ীর গতিবেগ ও ওজনের উপর। সাইকেলের মত ব্রেক দিয়ে অবশ্য একটি ট্রাকের বেগ কমানো যায় না। তাছাড়া চালকের গায়ের জোরও সীমিত। একটি মানুষের গায়ের জোরে একটি মোটর গাড়ী বা ট্রেন থামানো সম্ভব নয়। এই অসুবিধা দূর করবার জন্যেই নানা রকম ব্রেক উদ্ভাবিত হয়েছে। তবে এই প্রকারভেদের মূল ব্যাপার হচ্ছে—গাড়ীর চালকের হাত বা পায়ের কাছে ব্রেক প্রয়োগ করবার যে যন্ত্রটি থাকে—সেই যন্ত্রটি থেকে কি ভাবে ব্রেক-শু পর্যন্ত বল পরিবাহিত হয়ে থাকে, তারই রকমফের

এবং চালক কম বল প্রয়োগ করলেও যে ভাবে সেই বল বহুগুণিত হয়ে ব্রেক-শু-তে পৌঁছায়।

হাইড্রলিক ব্রেক—বদ্ধ পাত্রস্থিত জলের কোনও এক জায়গায় চাপ দিলে সেই চাপ জলের সর্বত্র পরিবাহিত হয়ে সমান তীব্রতায় পাত্রের দেয়ালের প্রতিটি অংশে চাপ দেয়। প্যাস্কালের এই সূত্র অনুসারেই করা হয়েছে হাইড্রলিক ব্রেক প্রভৃতি।

হাইড্রলিক ব্রেকের মূল কথা হলো—গাড়ীর চালক যখন ব্রেক-পাদানীতে (পেডালে) পায়ের চাপ দেয়, তখন লিভারের সাহায্যে সেই চাপ একটি পিস্টনের উপর প্রযুক্ত হয়। (চিত্র-1)। যে সিলিণ্ডারের মধ্যে এই পিস্টনটি থাকে, তার নাম মাস্টার সিলিণ্ডার অর্থাৎ প্রধান সিলিণ্ডার। মাস্টার সিলিণ্ডারের মধ্যে থাকে ব্রেক ফ্লুইড বা ব্রেক অয়েল। তাছাড়া প্রতিটি চাকার একটি করে সিলিণ্ডার থাকে—এগুলির নাম হুইল সিলিণ্ডার। প্রতিটি হুইল সিলিণ্ডারে দু-দিকে দুটি পিস্টন থাকে। চার চাকার চারটি হুইল সিলিণ্ডার পাইপের সাহায্যে মাষ্টার সিলিণ্ডারের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে। ব্রেক ফ্লুইড—এই চারটি হুইল সিলিণ্ডার, সংযোগকারী পাইপ ও মাষ্টার সিলিণ্ডারের মধ্যে আবদ্ধ থাকে। ব্রেক-পাদানীতে চাপ দেবার ফলে মাষ্টার সিলিণ্ডারের পিষ্টন অগ্রসর হয় এবং ব্রেক ফ্লুইডের উপর চাপ দেয়। এই চাপ (প্যাস্কালের সূত্র অনুযায়ী) ব্রেক ফ্লুইডের মধ্য দিয়ে প্রতিটি হুইল সিলিণ্ডারে সঞ্চারিত হয় এবং সেগুলির মধ্যে অবস্থিত পিষ্টনগুলির উপর বল প্রয়োগ করে। হুইল সিলিণ্ডারের পিষ্টন দুটি পাশের দিকে সরতে বাধ্য হয় এবং তাদের সঙ্গে সংযুক্ত ব্রেক-শু দুটি চাকার ড্রামের উপর চেপে বসে। এর
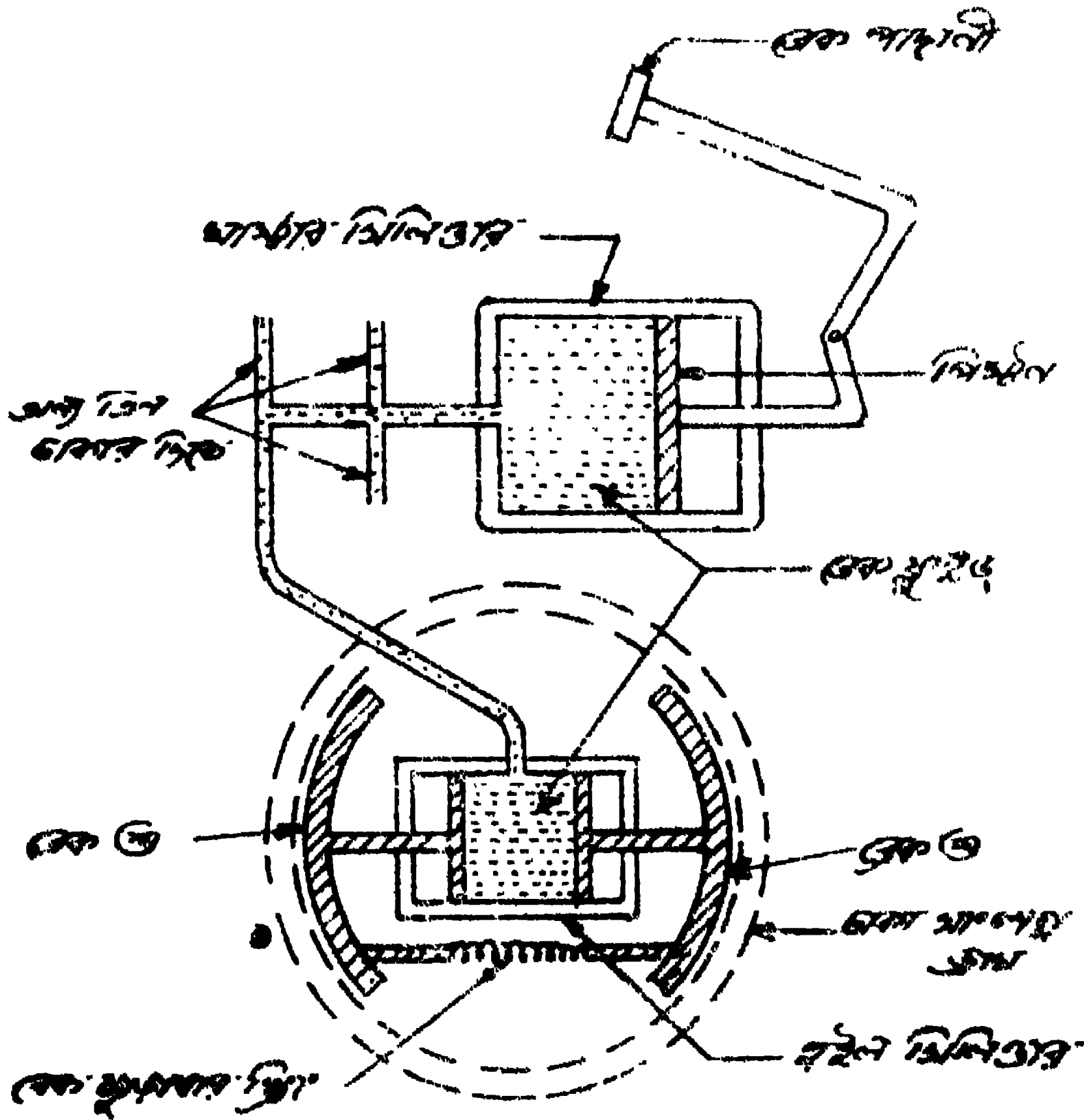
1নং চিত্র—হাইড্রলিক ব্রেক

ফলে ব্রেক-শু ও চাকার ড্রামের মধ্যে ঘর্ষণের ফলে গাড়ীর বেগ হ্রাস পায়।

পাওয়ার ব্রেক—বড় ও ভারী গাড়ী (যেমন—ভারী ট্রাক) থামাবার জন্যে ব্যবহার করা হয় পাওয়ার ব্রেক। এগুলি প্রায় সর্বাংশেই হাইড্রলিক ব্রেক, তফাৎ কেবল এই যে, পাদানীতে চালকের পায়ের চাপ সোজাসুজি মাষ্টার সিলিণ্ডারে প্রযুক্ত না হয়ে শুধুমাত্র একটি ভ্যাকুয়াম সিলিণ্ডারের মুখ খুলে দেয় এবং এই সিলিণ্ডারের পিষ্টন তখন মাষ্টার সিলিণ্ডারের পিস্টনে চাপ দেয়। ভ্যাকুয়াম সিলিণ্ডারের বিকল্প হিসেবে উচ্চ চাপবিশিষ্ট বায়ুপূর্ণ সিলিণ্ডারও ব্যবহার করা হয়। বড় বড় ট্রাকে এজন্যে ব্রেক প্রয়োগের সময় বাতাস নিঃসরণের শব্দ পাওয়া যায়। সাধারণ হাইড্রলিক ব্রেক অপেক্ষা পাওয়ার ব্রেকের ক্ষমতা বেশী; অর্থাৎ হাইড্রলিক ব্রেকে চালকের পায়ের যে পরিমাণ চাপের প্রয়োজন হয়, পাওয়ার ব্রেকে প্রয়োজন হয় তার চেয়ে অনেক কম।

এয়ার ব্রেক—এয়ার ব্রেক ও ভ্যাকুয়াম ব্রেক—এই দুই প্রকার ব্রেকের বিশেষত্ব হচ্ছে এই যে, উভয় ক্ষেত্রেই বায়ুর চাপের ফলেই ব্রেক কার্যকরী হয়, মানুষের হাত বা পায়ের শক্তির ভূমিকা সামান্যই।

বৈদ্যুতিক ট্রেনে সাধারণতঃ এয়ার ব্রেক ব্যবহার করা হয়। প্রতিটি ট্রেনে একটি করে প্রধান বায়ু-আধার থাকে। বায়ু উচ্চ চাপে এই আধারের মধ্যে রাখা হয়। এই চাপের পরিমাণ প্রতি বর্গইঞ্চিতে 80 থেকে 90 পাউণ্ড। ট্রেনের প্রতিটি কোচে একটি করে সহায়ক বায়ু-আধার থাকে। ট্রেনের প্রধান বায়ু-আধার থেকে উচ্চ চাপ-বিশিষ্ট বায়ু ব্রেক পাইপের মাধ্যমে প্রতিটি কোচের সহায়ক বায়ু-আধারে প্রবাহিত হয়ে জমা হয়। সে জন্যে এই ব্রেক-পাইপটি ট্রেনের সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্য,

2নং চিত্র—এয়ার ব্রেক

অর্থাৎ সামনে থেকে পিছন পর্যন্ত প্রসারিত থাকে। ট্রেন থামাবার দরকার হলে ট্রেনের ড্রাইভার বা গার্ড একটি হাতল বা শিকলের সাহায্যে ব্রেক-পাইপে আবদ্ধ উচ্চ চাপবিশিষ্ট বায়ুর বহির্গমনের পথ খুলে দেয়। বৈদ্যুতিক ট্রেনে ব্রেক প্রয়োগ করবার সময় এই বায়ু-নিঃসরণের শব্দ পাওয়া যায়। কোনও কারণে ব্রেক-পাইপের বায়ু কিছুটা বেরিয়ে যাওয়ায় বায়ুর চাপ আর বেশী থাকে না।

প্রতিটি কোচে সহায়ক বায়ু-আধারে যে উচ্চ চাপবিশিষ্ট বায়ু থাকে, সে বায়ু তখন কাজ করবার জন্যে ছুটে আসে। ট্রিপল্ ভাল্ভে (2নং চিত্র) দু-দিক থেকে যে দুটি পাইপ এসেছে—তার একটি সহায়ক বায়ু-আধার থেকে এবং অন্যটি ব্রেক-পাইপ থেকে। এই দুটি পাইপের মধ্যেকার বায়ুর চাপ তখন অসমান। কারণ সহায়ক আধারে বায়ুর চাপ বেশী, ব্রেক-পাইপে (বায়ু-নিঃসরণের ফলে) কম। এই অসমান চাপের ফলে টিপল ভালভ্ কার্যকরী হয় ও চাকার উপর চেপে বসে (চিত্রে দেখানো হয় নি)। স্বয়ংক্রিয় বায়ুপ্রেষক যন্ত্র ব্রেক-পাইপ ও প্রধান আধারের বায়ুতে পুনরায় উচ্চ চাপের সৃষ্টি করে।

ব্রেক ছাড়াবার দরকার হলে যথাযোগ্য হাতলের সাহায্যে প্রধান বায়ু-আধার থেকে ব্রেক-পাইপের মধ্যে উচ্চ চাপবিশিষ্ট বায়ু পাঠানো হয়। ফলে ট্রিপল ভাল্ভ্ আগের অবস্থায় ফিরে আসে, ব্রেক-পাইপ থেকে উচ্চ চাপবিশিষ্ট বায়ু (ট্রিপল ভাল্ভের ভিতর দিয়ে) সহায়ক আধারে প্রবাহিত হয় এবং সহায়ক আধারের বায়ুর উচ্চ চাপের ক্ষয়ক্ষতির পরিপূরণ করে। সেই সঙ্গে ট্রিপল ভাল্ভ্ আরও একটি কাজ করে—সেটি হলো, ব্রেক সিলিণ্ডারের ভিতর যে উচ্চ চাপের বায়ু প্রবেশ করেছিল, তাকে বাইরে যাবার পথ করে দেয়; ব্রেক-সিলিণ্ডারের ভিতর বায়ুর চাপ কমে যাবার ফলে পিস্টনটি স্প্রিং-এর টানে আগের জায়গায় ফিরে আসে এবং গাড়ীর চাকা ব্রেকমুক্ত হয়।
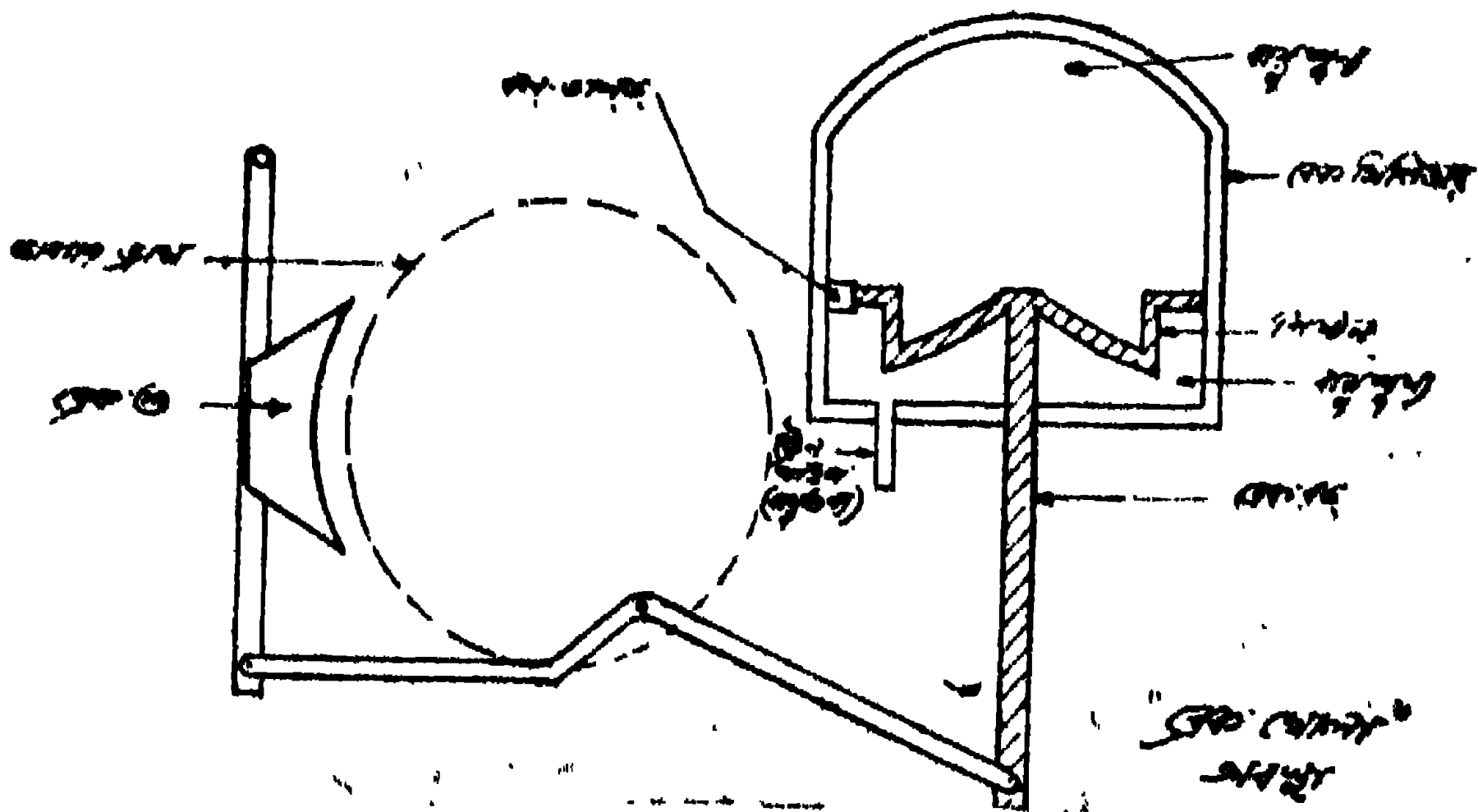
3 (ক) নং চিত্র—ভ্যাকুয়াম ব্রেক : খোলা অবস্থা

সহায়ক আধার থেকে ব্রেক সিলিণ্ডারের মধ্যে উচ্চ চাপবিশিষ্ট বায়ু প্রবাহিত হয়। এই বায়ুর উচ্চ চাপ ব্রেক-সিলিণ্ডারের পিষ্টনকে অগ্রসর হতে বাধ্য করে এবং পিষ্টনের সঙ্গে সংযুক্ত ব্রেক-শু

ভ্যাকুয়াম ব্রেক—ট্রেন ও ট্রাম গাড়ীতে সাধারণতঃ ভ্যাকুয়াম ব্রেক ব্যবহার করা হয়। এই ব্রেকের কার্যপদ্ধতি এয়ার ব্রেকের বিপরীত। ট্রেনের সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্যে প্রসারিত ট্রেন-পাইপটি বায়ুশূন্য থাকে।

এই পাইপটি প্রত্যেকটি কোচের ব্রেক-সিলিণ্ডারের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে। সিলিণ্ডারের ভিতর পিস্টনের দু-পাশের স্থানই বায়ুশূন্য থাকে। দুটি পাশই বায়ুশূন্য হবার ফলে পিস্টনটি নিজের ওজনে নীচে নামা অবস্থায় থাকে ও ব্রেক খোলা থাকে [3 (ক) নং চিত্র]। ড্রাইভার, গার্ড বা যাত্রী হাতল বা শিকলের সাহায্যে যখন ব্রেক প্রয়োগ করে, তখন বাইরের বায়ু বায়ুশূন্য ট্রেন-পাইপে ও পিস্টনের নীচে প্রবিষ্ট হয় [3 (খ) নং চিত্র], সঙ্গে সঙ্গে পিস্টনের নীচের ও মধ্যস্থিত বায়ু বিতাড়িত করে ভ্যাকুয়াম পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হয়। এই কাজটি করবার জন্যে ট্রাম গাড়ীতে একটি স্বয়ংক্রিয় চোষক-পাম্প ব্যবহার করা হয়। স্টিম ইঞ্জিনে স্টিম প্রক্ষেপের দ্বারা এই ভ্যাকুয়াম সৃষ্টি করা হয়। ট্রাম গাড়ী ব্রেকমুক্ত করবার সময় যে বায়ু-নিঃসরণ হয়, সেটা হয়তো অনেকেই লক্ষ্য করে থাকবেন।

উল্লেখযোগ্য যে, ভ্যাকুয়াম ব্রেকে গতিরোধক চাপের উচ্চ সীমা বায়ুমণ্ডলীয় চাপের সমান (প্রতি বর্গইঞ্চিতে 14·7 পাউণ্ড)। এয়ার-ব্রেকে
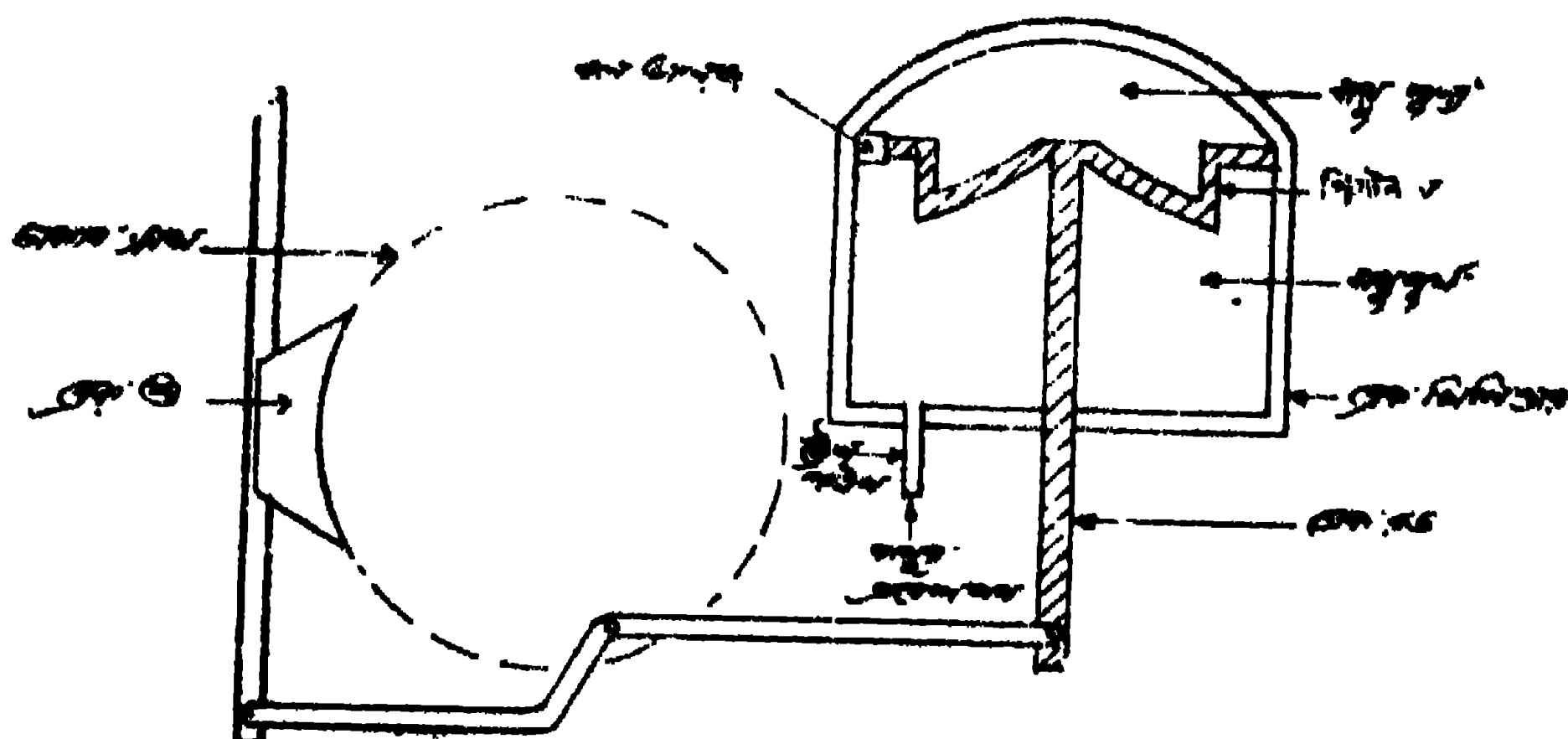
3 (খ) নং চিত্র—ভ্যাকুয়াম ব্রেক : লাগানো অবস্থা

উপরের স্থানের সংযোগকারী বল-ভাল্‌ভ্‌টি বন্ধ হয়ে যায়। পিস্টনের নীচের বায়ু পিস্টনের উপরের বায়ুশূন্য স্থানে যেতে পারে না। পিষ্টনের নীচে বায়ুর চাপ বেশী হবার ফলে পিস্টন উপরের দিকে উঠে যায় এবং গাড়ীর চাকার উপর ব্রেক-শু চেপে বসে।

ব্রেক বিযুক্ত করবার জন্যে ট্রেন-পাইপের

গতিরোধক চাপের পরিমাণ নির্দিষ্ট হয় প্রধান বায়ু-আধারের বায়ুর চাপের মান অনুযায়ী—তার উচ্চ সীমা অনেক বেশী (প্রতি বর্গইঞ্চিতে 80 থেকে 90 পাউণ্ড)।

উপরিউক্ত ব্রেক ছাড়া তড়িৎ-চুম্বকীয় ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল ব্রেক বৈদ্যুতিক মোটরের গতি-রোধে ব্যবহৃত হয়।

ভারতের মন্দির-নগরী

শ্রীঅবনীকুমার দে*

ভারতের হিন্দু মন্দিরগুলিকে প্রধানতঃ তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে ; যথা :—

(1) উত্তর ভারতীয়—600 খৃষ্টাব্দ থেকে এখন পর্যন্ত।

(2) মধ্য ভারতীয়—1000 থেকে 1300 খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত।

(3) দক্ষিণ ভারতীয় (দ্রাবিড়)—625 থেকে 1750 খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। দক্ষিণের দ্রাবিড় শৈলীর মন্দির স্থাপত্যকে আবার এই অঞ্চলের প্রধান প্রধান রাজাদের রাজত্বকালের সময় অনুসারে পাঁচ ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যথা :—পল্লব (600 থেকে 900 খৃষ্টাব্দ); চোল (900 থেকে 1150 খৃষ্টাব্দ); পাণ্ডীয় (1100 থেকে 1350 খৃষ্টাব্দ); বিজয়নগর (1350 থেকে 1565 খৃষ্টাব্দ) ও মাদুরা (1600 খৃষ্টাব্দ থেকে)।

দক্ষিণ ভারতের মন্দির-নগরী—দক্ষিণ ভারতের মন্দির নগরীগুলি দুটি বিশেষ ও আলাদা রকমের ধারায় পরিকল্পিত ও তৈরি হয়েছিল। প্রথম রকমের মন্দির নগরীগুলি মন্দিরের চারধারে বা বিশেষ একটি দিকে সম্প্রসারণ করা হতো, কিন্তু মন্দিরের প্রাধান্য বজায় রাখা হতো। পল্লব রাজাদের কাঞ্চী ও মহাবল্লীপুরম এই রকমের। রামেশ্বরম ও বিজয়নগরও (হাম্পি) এই শ্রেণীর। দ্বিতীয় রকমের মন্দির নগরীগুলিতে মন্দির থাকতো কেন্দ্রস্থলে আর তার চারদিকে সমকেন্দ্রীয় আয়তাকার বা বর্গাকার ভাবে ক্রমে ক্রমে নগরীকে সম্প্রসারিত করা হতো। সম্প্রসারিত নগরের মন্দিরই থাকতো প্রাচীন কেন্দ্র। মাদুরা, শ্রীরঙ্গম ও দক্ষিণ ভারতের বেশীর ভাগ মন্দির নগরীই এই ধরণের।

মহাবল্লীপুরম—মাদ্রাজ শহর থেকে প্রায় 50 মাইল দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের তীরে অবস্থিত মহাবল্লীপুরম সপ্তম শতাব্দীতে পল্লব রাজাদের প্রাচীন সমৃদ্ধিশালী সামুদ্রিক বন্দর-নগরী ও পোতাশ্রয় ছিল। একে মমল্লাপুরমও বলা হয়। এর অপর একটি প্রচলিত নাম সপ্ত প্যাগোডা। ঐ সময়ে এখানকার সুপ্রসিদ্ধ জল-শয়ন স্বামীর মন্দির বা Shore Temple, সপ্ত প্যাগোডা (যেগুলি ছিল পাহাড় কেটে তৈরি মন্দিরের অপূর্ব নিদর্শন), অনেকগুলি পাথর কেটে তৈরি করা মণ্ডপ (এদের মধ্যে মহিষাসুর মণ্ডপ বিশেষ উল্লেখযোগ্য), পাথরের গায়ে উঁচু করে খোদাই করা বহু ভাস্কর্য (এদের মধ্যে অর্জুনের তপস্যা সর্বশ্রেষ্ঠ) ইত্যাদি তৈরি করা হয়েছিল।

সমুদ্রতীর বরাবর 2 বা 3 মাইল লম্বা জায়গা নিয়ে এই নগরী বিস্তৃত ছিল। এখানকার উন্মুক্ত সমুদ্র-সৈকত খুব সম্ভব বন্দর ও পোতাশ্রয়রূপে ব্যবহৃত হতো। পশ্চিম দিকের নীচু জমি বোধ হয় জাহাজ তৈরি ও মেরামতির কাজে ব্যবহৃত হতো। এখানে এখন একটি মাত্র নির্দিষ্ট স্থান আছে। এটি হলো পূর্বদিকে জল-শয়ন স্বামীর মন্দির বা Shore Temple। এখানকার সাতটি মন্দিরের মধ্যে কেবলমাত্র এইটিই সমুদ্রের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে, অন্যগুলি সমুদ্রগর্ভে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এই মন্দিরটি কিন্তু প্রথমে সমুদ্রের এত কাছে ছিল না। ক্রমশঃ সমুদ্র এগিয়ে এসেছে এবং প্রাচীন কালের তৈরি বন্দর ও পোতাশ্রয় এখন সমুদ্রগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে।

---

*নগর ও আঞ্চলিক পরিকল্পনা বিভাগ; বেঙ্গল ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ, শিবপুর।

এই জায়গায় উত্তর ও পশ্চিক দিকে কয়েকটি মন্দির, মণ্ডপ ও পাথরের গায়ে খোদাই করা ভাস্কর্য আছে। দক্ষিণ দিকে এক-একটি মাত্র পাথর থেকে খোদাই করা কয়েকটি রথ-মন্দির প্রধান রাস্তা দিয়ে সমুদ্রতীরবর্তী মন্দির পর্যন্ত যাওয়া যেত। উত্তর দিকের মন্দির ও পুষ্করিণী-গুলিতে যাবার জন্যে অপেক্ষাকৃত ছোট কয়েকটি রাস্তাও ছিল।
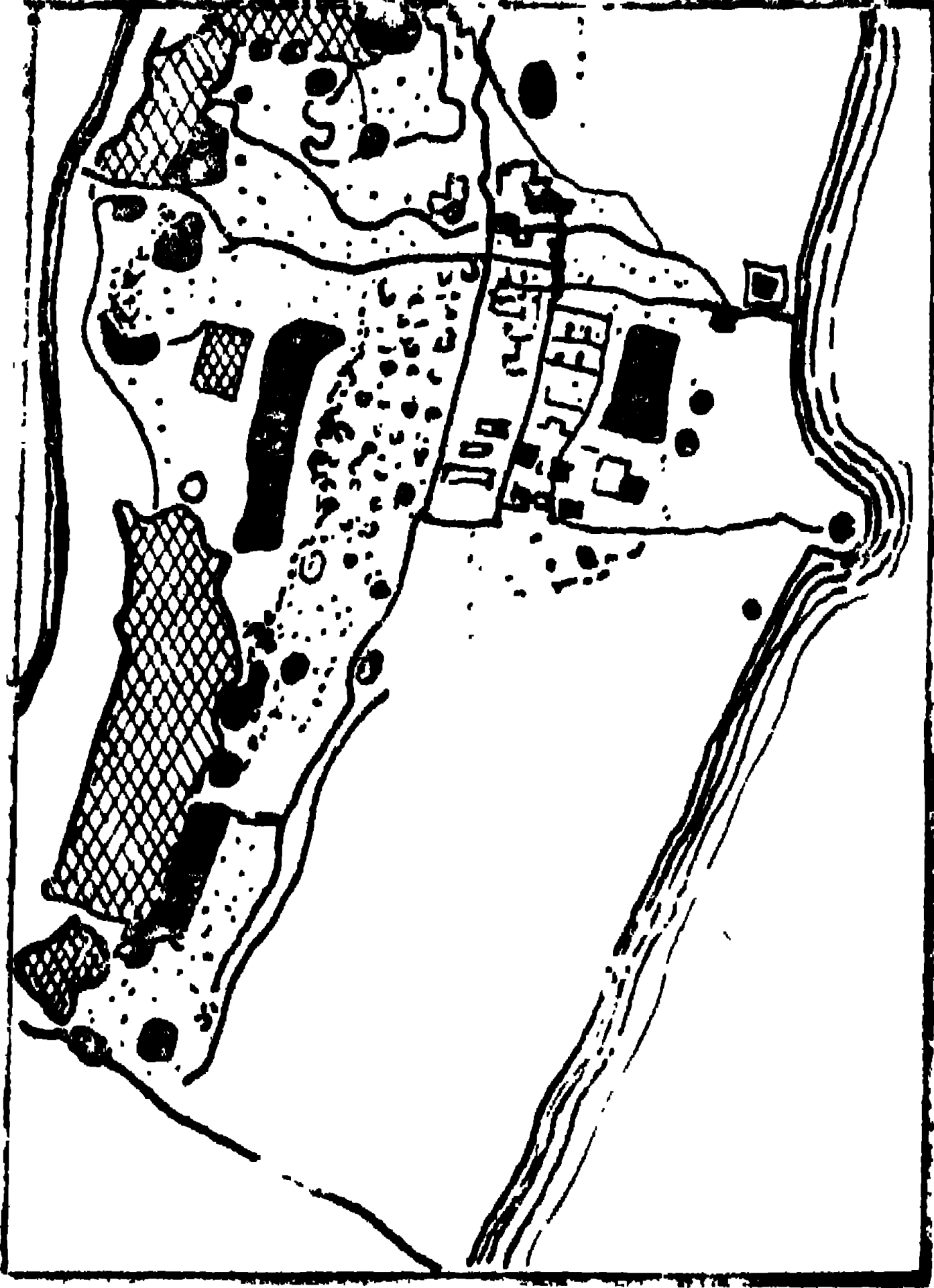
মহাবল্লীপুরম

আছে। সমুদ্র থেকে দূরে আরও পশ্চিম দিকে ছিল প্রাচীন বসবাসের জায়গা। এখন এই জায়গায় জেলে ও মন্দির রক্ষণাবেক্ষণের কাজে নিযুক্ত লোকেরা বাস করেন।

প্রাচীন কালে তৈরি রাস্তাঘাটের এখন আর কোন চিহ্ন নেই। তবে অনুমান করা যেতে পারে যে, প্রথমে সমুদ্র-সৈকতের সমান্তরাল একটি প্রধান রাস্তা উত্তর দিকের মণ্ডপ-অঞ্চল থেকে দক্ষিণ দিকের রথ-অঞ্চলের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল। এই রাস্তার আলম্বভাবে বিস্তৃত অপর একটি

কাঞ্চীপুরম—কাঞ্চীপুরম বা স্বর্ণ-নগর ভারত-বর্ষের প্রাচীন সাতটি পবিত্র নগরীর মধ্যে অন্যতম। এই জন্যে এর আর একটি নাম দক্ষিণ-কাশী। এর আধুনিক নাম কাঞ্জীভরম। ষষ্ঠ শতাব্দীর দাক্ষিণাত্যের পুলকেশীর রাজাদের কবি ভারবির নিম্নোক্ত কবিতা থেকে জানা যায় যে, কাঞ্চী সেই শতাব্দীর সর্বাপেক্ষা সুন্দর নগরীগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল—"পুষ্পেষু যাথী, পুরুষেষু বিষ্ণু, নারীষু রম্ভা, নগরেষু কাঞ্চী"।

মাদ্রাজ সহরের দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রায় পঞ্চাশ

মাইল দূরে চেঙ্গলপুট জেলায় কাঞ্চী অবস্থিত। প্রাচীনকালে পল্লব রাজাদের রাজধানী ছিল এই কাঞ্চী। পল্লব রাজবংশের মহেন্দ্রবর্মণ ও নরসিংহ-বর্মণ বিদ্যোৎসাহী ও কলাবিদ্যার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং বহু মন্দির ও সৌধাদি তৈরি করিয়েছিলেন। সেই জন্যে এই নগরী কলা ও জ্ঞানলাভের মহান কেন্দ্র ছিল। শঙ্করাচার্য, মহান বৌদ্ধ ভিক্ষু বোধিধর্ম প্রভৃতি দার্শনিক ও পণ্ডিতেরা এইখানে বাস করে নিজের নিজের কাজ করেছিলেন।

মন্দির প্রধান। কৈলাসনাথ মন্দিরের স্থাপত্য পল্লব রাজাদের স্থাপত্যকলার বৈশিষ্ট্যের নিদর্শন। একাম্বরেশ্বর মন্দিরের গোপুরম দক্ষিণ ভারতের মধ্যে সবচেয়ে উঁচু। শিবকাঞ্চীর দক্ষিণে বসবাসের জায়গা। নগরের অপর অংশে বরদারাজ পেরুমল মন্দির প্রধান।

প্রাচীন নগর-প্রাচীরের বাইরের দিকে অবস্থিত পরিখাতে নগরের ময়লা জল নিষ্কাশিত হতো। নগরের বাইরে ছিল প্রশস্ত উন্মুক্ত স্থান।
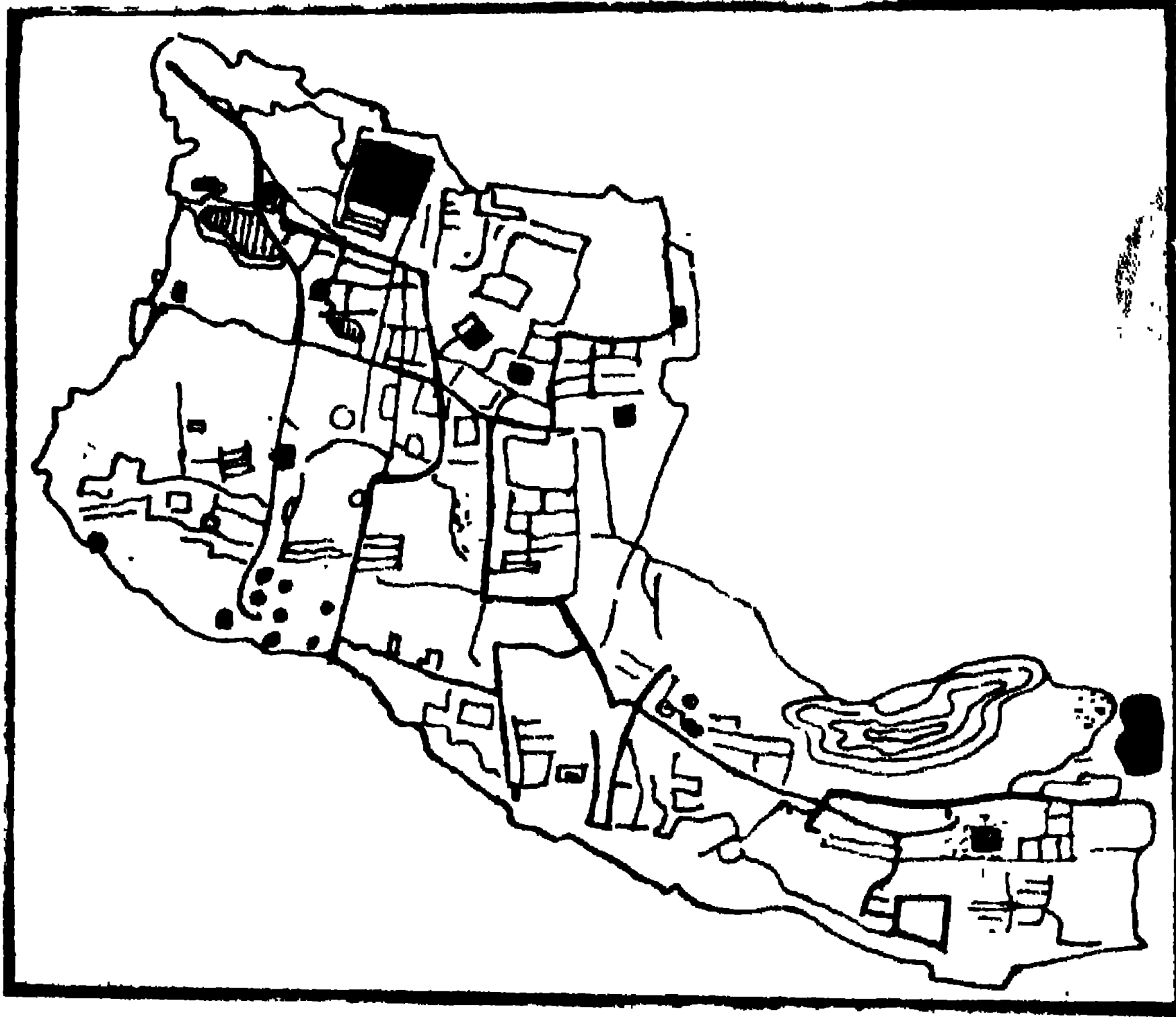
কাঞ্চীপুরম

এই নগরীর দুটি ভাগ—শিবকাঞ্চী ও বিষ্ণু-কাঞ্চী। শিবকাঞ্চী রেল স্টেশনের কাছে অবস্থিত। এর দক্ষিণ-পূর্বদিকে অবস্থিত বিষ্ণুকাঞ্চী। একটি আঁকাবাঁকা প্রশস্ত রাস্তা এই অংশ দুটিকে যোগ করেছে। প্রাচীন নগরের পরিধি ছিল অন্ত-বিস্তর পনেরো মাইল। রাস্তাঘাটগুলি ছিল আঁকা-বাঁকা ও অনিয়মিতভাবে বিন্যস্ত।

শিবকাঞ্চীতে কৈলাসনাথ মন্দির ও একাম্বরেশ্বর

এখানে যুদ্ধের ঘোড়া ও হাতীদের অনুশীলন করানো হতো। এই সব ঘোড়া ও হাতীর পালকদের বাসস্থান এখানেই ছিল। যে সব কারিগরেরা যুদ্ধের তীর-ধনুক ও অস্ত্রশস্ত্রাদি তৈরি করতো, তারাও এইখানে বাস করতো। মন্দিরের চারপাশে চারটি প্রশস্ত রাস্তা ছিল। এই রাস্তাগুলির ধারে মন্দিরের কর্মচারীদের বাসগৃহ ছিল। দেবতার রথ নিয়ে যাবার

রাস্তাটিও ছিল প্রশস্ত। খোলা জায়গার চার-পাশের রাস্তার ধারে বিভিন্ন বর্ণের লোকের বাসস্থান নির্দিষ্ট থাকতো। নগরে বহু পুষ্করিণী ছিল। এগুলির চারধারে ছিল ফুল ও ফলের বাগান। পুষ্করিণীতে পদ্ম ও অন্যান্য ফুল ফুটে থাকতো। নগরবাসীদের গৃহসংলগ্ন নিজস্ব বাগানে কলা, আম ও কাঁঠাল গাছ ছিল।

নগরের প্রধান প্রধান প্রশস্ত রাস্তার দুই ধারে সুবিধাজনক জায়গায় বড় বড় গাছ রোপিত ছিল। রাস্তার ধারে ও সংযোগস্থলে আম ও মাধবীলতা রোপিত ছিল। নগরে প্রধান রাস্তাগুলি ছাড়া সরু ও আঁকাবাঁকা গলিও অনেক ছিল।

গৃহ-নির্মাণ করবার জন্যে আগুনে পোড়ানো লাল ইট ব্যবহার করা হতো। প্রধান রাস্তাগুলির ধারের বাড়ীগুলির ছাদ ছিল সমতল। বাড়ীর মহিলারা এই ছাদে উঠে উন্মুক্ত বায়ু সেবন করতেন।

বিজয়নগর (হাম্পি)—বেলারী জেলার হস্পেট রেল ষ্টেশন থেকে আট মাইল দূরে বিজয়-নগরের ধ্বংসাবশেষ অবস্থিত। খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম তৃতীয় দশকে প্রথম হরিহরদেব বিজয়নগরের প্রতিষ্ঠা করেন। খরস্রোতা তুঙ্গভদ্রা নদীর দক্ষিণ তীরে যুদ্ধের পক্ষে বেশ উপযুক্ত ও সুবিধাজনক স্থানে নগরটি অবস্থিত। প্রথম কৃষ্ণদেব রায় (1509-29) এখানে বিঠলস্বামী মন্দির, কৃষ্ণস্বামী মন্দির প্রভৃতি সুন্দর সুন্দর মন্দির তৈরি করান। ষষ্ঠদশ শতাব্দীর শেষে মুসলমান ও মারাঠা আক্রমণ হয় এবং বিজয়নগরের পতন ঘটে।

ঐশ্বর্যবিলাসের জন্যে প্রাচীন বিজয়নগর একটি বিস্ময়ের বস্তু ছিল। তদানীন্তন পর্যটকদের বিবরণ থেকে বিজয়নগরের বিশদ বর্ণনা পাওয়া যায় এবং এর ঐশ্বর্যের কথা জানতে পারা যায়।

প্রাচীন বিজয়নগরের আয়তন ছিল দশ বর্গ মাইল। নগরে সৈন্যসংখ্যা ছিল নব্বই হাজার। নগরে অসংখ্য দোকান, বাজার ছিল এবং প্রকাণ্ড বাজারে গহনা, কিংখাব ও অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রী ছাড়াও হীরা, মুক্তা, পান্না প্রভৃতি মূল্যবান দ্রব্যাদি বিক্রী হতো।

ইটালীয় পর্যটক নিকোলো কান্তি 1420-21 খৃষ্টাব্দে বিজয়নগর দেখে বলেছিলেন যে, এই নগরের পরিধি ছিল 60 মাইল ও নগরটি পাহাড়ের ধার পর্যন্ত প্রাচীর দিয়ে ঘেরা ছিল। পর্তুগীজ পর্যটক পাএস লিখেছিলেন যে, বিজয়নগর তদানীন্তন রোমের চেয়েও আয়তনে বড় ছিল এবং সেখানে এক লক্ষেরও বেশী বাসগৃহ ছিল। পারস্যের রাজদূত আবদুর রজ্জাক 1442-43 খৃষ্টাব্দে বিজয়-নগরে এসে লিখেছিলেন যে, এই শহরের মত এত সমৃদ্ধিশালী শহর পৃথিবীর আর অন্য কোন দেশে আছে বলে তিনি শোনেন নি। তাঁর লেখা থেকে জানা যায় যে, পর পর সাতটি প্রাচীর দিয়ে শহরটি বেষ্টিত ছিল। রাজপ্রাসাদের চারদিকের পরিখা দিয়ে নদীর মত জলপ্রবাহ বয়ে যেত। এই প্রবাহপথ ঝকঝকে পাথর দিয়ে বাঁধানো ছিল। রাজপ্রাসাদের দক্ষিণ দিকে ছিল দেওয়ানখানা, মন্ত্রীদের মহাকরণ ও চল্লিশটি স্তম্ভবিশিষ্ট বিশাল হলঘর। হলঘরের সামনে ষাট হাত লম্বা, ছয় হাত চওড়া ও এক মানুষের চেয়েও উঁচু গ্যালারীতে রাজকার্যের দরকারী দলিলপত্র রাখা হতো। সেখানে লিপিকারেরা বসে দলিলপত্র লিখতেন। এটিকে বলা হতো দফ্‌তরখানা।

বিজয়নগরের রাজারা প্রাসাদ, অট্টালিকা, দুর্গ, দেবদেউল, সেচনালা, জলাশয় ইত্যাদি নির্মাণ করতে অজস্র অর্থ ব্যয় করেছিলেন। দেবালয়গুলির মধ্যে বিঠলস্বামীর বিষ্ণুমন্দির, হাজাররামের মন্দির, কাঞ্চীপুরমের একাম্বরনাথ ও বরদারাজের মন্দির ইত্যাদি বিখ্যাত। মাদুরার বিখ্যাত সুন্দরেশ্বর-মীনাক্ষী মন্দির ও শ্রীরঙ্গমের রঙ্গনাথের মন্দির বিজয়নগরের শেষ পর্বের কীর্তি।

বিজয়নগরের ধ্বংসাবশেষ জুড়ে স্থানটির উত্তর

দিকে অবস্থিত হাম্পি একটি ছোট গ্রাম। এটিই ছিল নগরের প্রসার ও উন্নতিসাধনের কেন্দ্রস্থল। নগরের উত্তর দিক দিয়ে তুঙ্গভদ্রানদী প্রবাহিত। নদীর তীরে উঁচু উঁচু বড় বড় পাথর থাকায় ঐ দিকটি সাধারণতঃ সুরক্ষিত ছিল। নদীতীরের চেয়ে নগরের অন্যান্য দিকগুলিও আরও বেশী সুরক্ষিত করে তৈরি করা হয়েছিল। এখানকার ধ্বংসাবশেষ দেখে মনে হয় যে, প্রাচীর-ঘেরা নগরের মধ্যে কয়েকটি ছোট ছোট সুরক্ষিত স্থান ছিল। কমপক্ষে দুটি নগর-প্রাচীর ছিল। জায়গাটি উঁচু-নীচু হওয়ায় এবং যুদ্ধের প্রয়োজনে নগরের রাস্তাঘাট-বিন্যাস বেশ অনিয়মিতভাবে করতে হয়েছিল। নগরের কেন্দ্রস্থলে ছিল রাজপ্রাসাদ ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক অট্টালিকার মিশ্রণ, যথা—রাজপ্রাসাদ ও দরবার গৃহ, টাঁকশাল, সৈন্যাধ্যক্ষের বাসভবন, পুলিশ থানা, কমল মহল, জানানা মহল, সঙ্গীতানুষ্ঠানের হলঘর, রাণীর স্নানাগার, রঙ্গস্বামীর মন্দির, হাতীশালা, পর্যবেক্ষণ বুরুজ ইত্যাদি। নগরের প্রধান প্রবেশদ্বার থেকে উত্তরমুখী তিনটি প্রধান রাস্তা ছিল। প্রথম রাস্তাটি রাজপ্রাসাদের কাছ দিয়ে গিয়ে অচ্যুতরায়স্বামী মন্দির ও বাজার হয়ে নদীতীরের কাছ পর্যন্ত চলে গিয়েছিল। দ্বিতীয় রাস্তাটি রাজপ্রাসাদের পশ্চিম প্রাচীর বরাবর চলে উত্তরে নদীর কাছে পম্পাপতি স্বামীর মন্দির পর্যন্ত গিয়েছিল। আর তৃতীয় রাস্তাটি রাজ-প্রাসাদের পূর্বদিক দিয়ে নগরের পূর্বদিক বরাবর নদীর ধারে গিয়ে শেষ হয়েছিল। নদীর ধার বরাবর একটি অপ্রশস্ত রাস্তা পম্পাপতি স্বামীর মন্দির, অনন্তশয়ন মন্দির ও বিঠলস্বামী মন্দিরকে যোগ করেছিল। পুরাতন প্রাচীরের উত্তরে ও

বিজয়নগর (হাম্পি)

পুরাতন খালের দক্ষিণের বাঁধ বরাবর একটি রাস্তা প্রথম তিনটি প্রধান রাস্তাকে আড়াআড়িভাবে যোগ করেছিল। এই রাস্তাগুলির এখন চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট আছে। নগরের সবচেয়ে উঁচু জায়গায় অবস্থিত পম্পাপতি স্বামীর মন্দির ও তার উঁচু গোপুরম নগরের একটি প্রধান অংশ ছিল এবং সহজেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতো। হাম্পি গ্রাম ও পম্পাপতি স্বামীর মন্দির থেকে নগর ক্রমে দক্ষিণে ও পূর্বে সম্প্রসারিত হয়েছিল।

কৃষ্ণদেব রায়ের অনুরোধে গোয়ার তদানীন্তন পর্তুগীজ শাসনকর্তা একজন কুশলী কারিগরকে এখানে পাঠিয়ে দেন। তিনি পাথর দিয়ে তৈরি বাড়ী নির্মাণের কাজে বিশেষ দক্ষ ছিলেন। তিনি বিজয়নগরে ইটের দেয়াল তৈরির কাজে চুনের মশলার ব্যবহার প্রচলন করেন।

নাগালপুর—কৃষ্ণদেব রায় তাঁর মা নাগাম্বার সম্মানার্থে নাগালপুর (নতুন শহর) এবং তাঁর পত্নীর নামানুসারে তিরুমালাদেবীয়ার পত্তম বা হস্পেট নগর তৈরি করান।

বিজয়নগরের কাছেই নাগালপুর অবস্থিত ছিল। এই ধরণের নগরকে বলা হতো বাহিস্থিকা। এটি ছিল বিজয়নগরের শাখা-নগর। প্রধান শহরের লোকসংখ্যা খুব বেড়ে গেলে ঐ বাড়্তি লোকের বসবাসের জন্যে শহরের কাছাকাছি শহরতলীতে এই রকম উপনগরী তৈরি করা হতো। বিজয়নগরের সম্প্রসারণের জন্যে নাগালপুর তৈরি করা হয়েছিল। প্রধান শহরের কাছাকাছি ও চারপাশের পাহাড়ের মাঝে দীর্ঘ সঙ্কীর্ণ গিরিখাতের মুখে অবস্থিত হওয়ায় এটি প্রধান শহরকে রক্ষা করতো। একটি প্রশস্ত রাস্তা প্রধান শহরের সঙ্গে নাগালপুরকে সংযুক্ত করেছিল। পথচারীদের ছায়া দেবার জন্যে এই রাস্তার দু-ধারে অসংখ্য ছায়াবহুল গাছ রোপণ করা হয়েছিল। এই রাস্তার দু-পাশে সারিবদ্ধভাবে গৃহ ও দোকান বিন্যস্ত ছিল। সব রকমের জিনিষপত্র এই সব দোকানে বিক্রী হতো। এই রাস্তার ধারে পাথরের তৈরি একটি মনোরম মন্দির ছিল। এছাড়া আরও অনেক ছোটখাটো মন্দির এই রাস্তার ধারে ছিল।

রামেশ্বরম—ভারতবর্ষের দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্তে পক্ প্রণালীর উপর অবস্থিত রামেশ্বরম একটি দ্বীপ। রামেশ্বরম নগর ও এখানকার বিখ্যাত শ্রীরামনাথ স্বামীর মন্দির দ্বীপটির উত্তর অংশে অবস্থিত।

উত্তর ভারতের বারাণসী ও দক্ষিণ ভারতের রামেশ্বরম হিন্দুদের অতি পবিত্র তীর্থ স্থান। কথিত আছে যে, সেতু বন্ধন করবার আগে শ্রীরামচন্দ্র এখানে ভগবান শিবের পূজা করেছিলেন। পরে লঙ্কার রাজা রাবণকে নিধন করবার পাপ থেকে মুক্ত হবার জন্যে স্বয়ং শ্রীরামচন্দ্র এইখানে আবার দেবাদিদেব শিবের পূজা করেন। সেই জন্যেই নাকি জায়গাটির নাম হয়েছে—রামেশ্বরম।

রামেশ্বরম সমুদ্রতীরবর্তী নগর। এর দৈর্ঘ্য প্রায় $1\frac{1}{2}$ মাইল ও প্রস্থ প্রায় $\frac{1}{2}$ মাইল। মন্দিরের চারধারে প্রাচীন নগর গড়ে উঠেছিল। পূর্ব দিকে সমুদ্র থাকায় সেই দিকে নগরের প্রসার সম্ভব ছিল না। সেই জন্যে নগরটি পশ্চিম দিকে প্রসারিত হয়েছিল।

দক্ষিণ ভারতের অন্যান্য মন্দিরের মত এই মন্দিরটিরও প্রধান প্রধান প্রবেশদ্বার ও মন্দিরের চারদিকে চারটি রাস্তা আছে। নগরের অন্যান্য রাস্তাগুলি এই চারটি রাস্তার সমান্তরাল ও আনত ছিল। মন্দিরের পশ্চিম প্রবেশদ্বার থেকে রেল স্টেশনকে যুক্ত করে একটি রাস্তা ও মন্দিরের পূর্ব গোপুরম ঘিরে সমুদ্র বরাবর অপর একটি রাস্তা আছে। এই দুটি হলো নগরের প্রাচীন রাস্তা। এই দুটি রাস্তার ধারেই ছিল বাসগৃহ, দোকান, বাজার ইত্যাদি।

কথিত আছে যে, 1173 সালে সিংহলের রাজা পরাক্রমবাহু এখানে একটি মন্দির তৈরি করান। সম্ভবতঃ বর্তমান শ্রীরামনাথ স্বামীর মন্দিরের এই ছিল প্রথম অবস্থা। এই মন্দির

এক যুগে তৈরি হয় নি। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে এর নির্মাণ-কার্য সুরু হয়ে তা শেষ করতে প্রায় 350 বছর লেগেছিল।

এই মন্দিরের বিশালতা বিস্ময়ের উদ্রেক করে। এর পূর্ব গোপুরম 126 ফুট উঁচু, বিশাল অঙ্গন লম্বায় 1000 ফুট ও চওড়ায় 650 ফুট এবং সমস্ত প্রদক্ষিণ পথগুলির মোট দৈর্ঘ্য 4000 ফুট। মন্দিরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত রামনাথ স্বামীর সন্নিধি ঘিরে চারদিকের প্রথম প্রদক্ষিণ উঁচু স্তম্ভমূলের উপর অবস্থিত বিশাল স্তম্ভের সারি দেখলে সত্যই বিস্ময় জাগে। পাথরের তৈরি এই স্তম্ভগুলিতে প্রচুর পরিমাণে কারুকার্য করা আছে এবং পৌরাণিক মূর্তিও খচিত আছে। অসীম পরিশ্রম করে ও ধৈর্য ধরে এই মন্দিরের খোদাই কাজ করা হয়েছিল। এই খোদাই কাজের অসামান্য কুশলতা দেখে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে যেতে হয়। এই মন্দিরে দ্রাবিড় শৈলীর স্থাপত্যের সব রকম সৌন্দর্যের চরম উৎকর্ষ দেখা যায়।
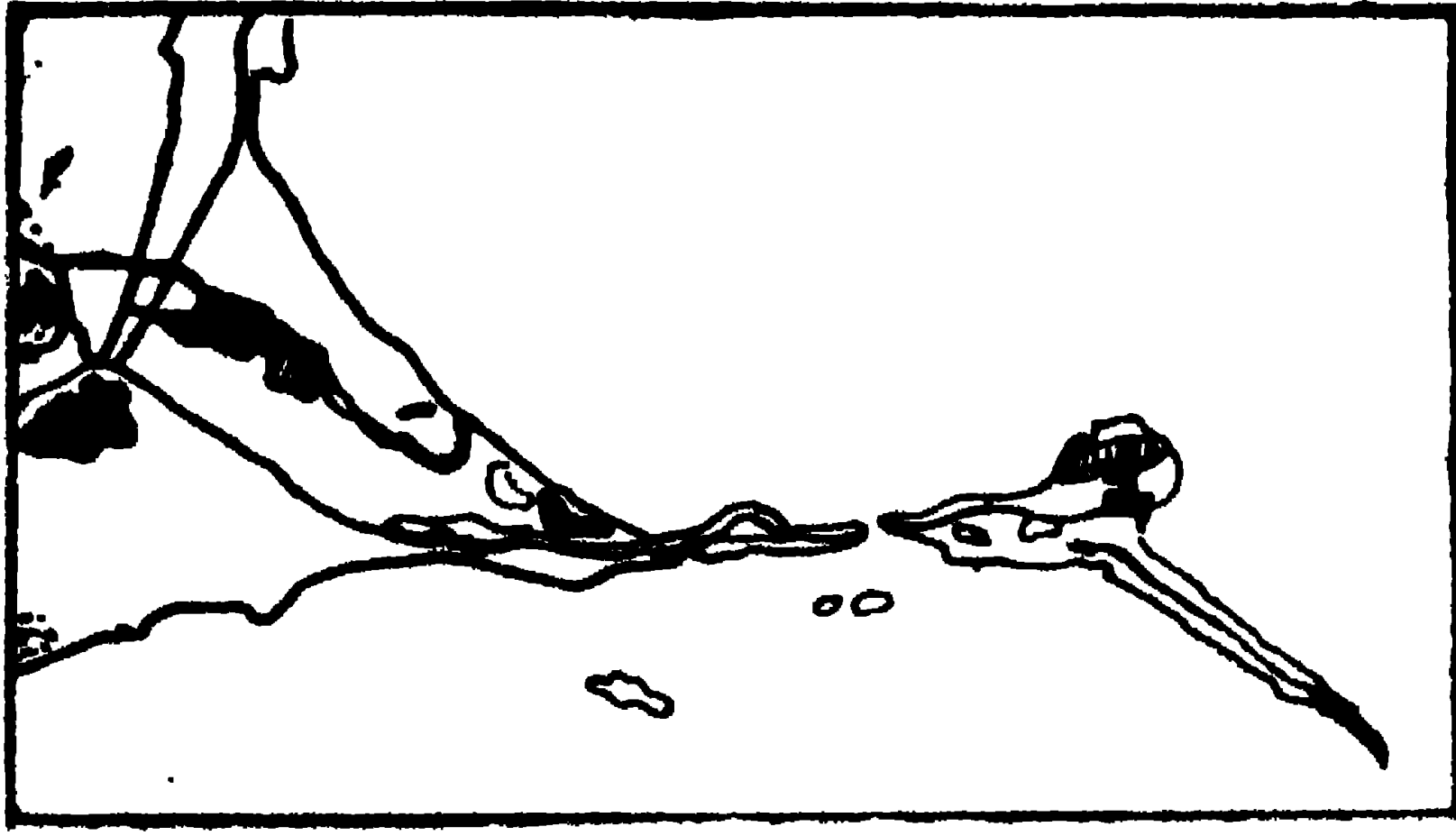
রামেশ্বরম

পথ দৈর্ঘ্যে 171 ফুট 4 ইঞ্চি ও 14 ফুট 7 ইঞ্চি চওড়া এবং প্রস্থে 117 ফুট 11 ইঞ্চি ও 16 ফুট চওড়া। রামেশ্বরম, অম্বাল সন্নিধি এবং নন্দী মণ্ডপমকে ঘিরে রয়েছে 17 ফুট 2 ইঞ্চি চওড়া দ্বিতীয় প্রদক্ষিণ পথ। এটি লম্বার দিকে 352 ফুট 11 ইঞ্চি এবং প্রস্থের দিকে 244 ফুট। মন্দির চত্বরের প্রধান প্রধান দেবস্থান, পবিত্র কূপ ও পুষ্করিণী ঘিরে রয়েছে 642 ফুট লম্বা ও 15 ফুট 6 ইঞ্চি প্রশস্ত এবং 395 ফুট চওড়া ও 15 ফুট 9 ইঞ্চি প্রশস্ত বিশাল তৃতীয় প্রদক্ষিণ পথ। এই প্রদক্ষিণ পথের দুই ধারে পাঁচ ফুট

এই মন্দির নির্মাণে খিলানের ব্যবহার দেখা যায় না। স্তম্ভগুলির উপরে লম্বা লম্বা পুরু পাথরের টালি সমান্তরালভাবে বসিয়ে মন্দিরের ছাদ তৈরি করা হয়েছে। খাড়াভাবে রাখা পাথরের টালির উপর সমান্তরালভাবে রাখা পাথরের টালির সাহায্যে মন্দিরের প্রবেশ দ্বারগুলির ছাদ তৈরি করা হয়েছে।

দক্ষিণ ভারতের দ্বিতীয় প্রকারের মন্দির নগরীর বিশিষ্ট উদাহরণ হলো শ্রীরঙ্গম ও মাদুরা। এই রকমের নগরীগুলির বেলায় মন্দিরের চার-দিকে ক্রমে ক্রমে নগরী সম্প্রসারণ করা হতো।

বিজ্ঞান-সংবাদ

অগ্নি-নির্বাপণের অভিনব ব্যবস্থা

আগুন নেবানোর জন্যে এক নতুন ধরণের জাহাজ তৈরি হয়েছে। আগুন নেবাবার অতি আধুনিক সরঞ্জামে সজ্জিত পলিমার নামক জাহাজটিকে এখন পশ্চিম জার্মেনীর রাইন নদীতে অগ্নি-নির্বাপনের কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। 22·55 মিটার লম্বা ও 5·80 মিটার চওড়া পলিমার-এর 24টি পাইপ 15 মিনিটের মধ্যে 60 মিটার চওড়া ও 1 কিলোমিটার লম্বা একটি ফেনার আবরণ তৈরি করতে পারে। স্রোতের জলেও ফেনার সাহায্যে আগুন নেবানোর এই ব্যবস্থার প্রয়োগ সর্বপ্রথম সম্ভব হলো। এই নতুন অগ্নি-নির্বাপক পদার্থ মানুষের পক্ষে সম্পূর্ণ নিরাপদ। এই জাহাজে $1\frac{1}{2}$ ঘণ্টা অবিরাম ফেনা উদ্গারের মত রাসায়নিক পদার্থ রাখা থাকে। এর সাহায্যে 60 মিটার দূর থেকেও বিপদগ্রস্ত জাহাজকে আগুনের হাত থেকে বাঁচানো যায়।

নতুন ধরণের গৃহ

পশ্চিম জার্মেনীর এসেন শহরে 1971 সালের জার্মান গৃহনির্মাণ শিল্পের প্রদর্শনীতে প্রধান আকর্ষণের বিষয় হয়েছিল—গৃহনির্মাণ পদ্ধতির অবলোপ নামে বিশেষ বস্তু। এর সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ—'টন' নামক ফেনাজাতীয় সিন্থেটিক উপকরণ দিয়ে এস্কিমোদের বাসস্থানের মত ইগ্লু তৈরি করা হয়। এই উপকরণ স্প্রে করে এক ঘণ্টার মধ্যে 8-10 জনের বাসযোগ্য ঘর তৈরি করা যায়। এই তরল পদার্থটি অতি সহজেই স্থানান্তরিত করা যায় বলে কোথাও 2-1 দিনের ছুটি কাটাতে চাইলে বা কোথাও বিপদগ্রস্ত লোকেদের উদ্ধারের পর তাদের বাসের জন্যে এর দ্বারা অতি সহজে ও অল্প সময়ের মধ্যে ঘর তৈরি করে নেওয়া যায়।

কৃষি-সংবাদ

কো-1 জাতের কুমড়ো

কোয়েম্বাটুরে কৃষি গবেষণা বিশ্ববিদ্যালয়ে কো-1 নামের একরকম নতুন জাতের উচ্চফলনশীল কুমড়ো উদ্ভাবিত হয়েছে। হেক্টার প্রতি এই জাতের ফলন হয়েছে প্রায় 28,000 কিলো।

পর্যাপ্ত ফলন তোলবার জন্যে বীজ বোনবার সময় প্রতিটি গর্তে 25 কিলো খামার সার, 100 গ্র্যাম রাসায়নিক সার মিশ্রণ (6 : 12 : 12 অনুপাতে) এবং 50 গ্র্যাম অ্যামোনিয়াম সালফেট চাপান দিতে সুপারিশ করা হয়েছে।

কো-1 জাতের কুমড়ো জুন অথবা ডিসেম্বরে বোনবার পক্ষে উপযুক্ত। আর ফল পাকতে সময় লাগে প্রায় 115 দিন।

তিন রকম নতুন জাতের উচ্চফলনশীল টোম্যাটো

লুধিয়ানার পাঞ্জাব কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার ফলে তিন রকম নতুন জাতের উচ্চফলনশীল টোম্যাটো উদ্ভাবিত হয়েছে। যথাক্রমে তাদের নাম দেওয়া হয়েছে:—1. সিলেকশন 216; 2. কেক রুধ; 3. কেক রুধ-1।

সিলেকশন 216 টোম্যাটো বেশ বড় আকারের

হয়। এর গাছের পাতা ঘন হয় বলে টোম্যাটো-গুলি রোদে কম পোড়ে আর ফাটে কম। এই তিনটি জাতের মধ্যে দেখা গেছে যে, সিলেকশন-1-ই সবচেয়ে বেশী ফলন দেয়। অন্যান্য জাতের চেয়ে এর ফলন প্রায় শতকরা 35 ভাগ বেশী।

কেক রুথ টোম্যাটোও বেশ বড় আকারের হয় আর ফলন দেয় প্রায় শতকরা 15 ভাগ বেশী। আর কেক রুথ-1 টোম্যাটো 5 থেকে 7টি এক সঙ্গে থোকায় থোকায় ফলে আর অন্যান্য জাতের তুলনায় ফলন দেয় প্রায় 30 ভাগ বেশী।

নোনা মাটিতে ধানের চাষ

নতুন দিল্লীর ভারতীয় কৃষি গবেষণা সংস্থার গবেষণার ফলে জানা গেছে যে, নোনা জমি জলের তোড়ে ধুয়ে নিয়ে ধান চাষ করা উচিত। এর ফলে মাটির উপরের নোনা ভাগ জলের সঙ্গে বেরিয়ে গিয়ে মাটিকে ধান চাষের উপযোগী করে তোলে।

তাছাড়া এরকম জমিতে চারা মরে ক গাছ শক্ত হয়ে ভাল ভাবেই বাড়ে এবং বেশী ফলন দেয়। এই সকল জমিতে রাসায়নিক সারের ভাল প্রতিক্রিয়া হয়ে ফলনের হারও শতকরা 21 ভাগ বাড়িয়ে তোলে।

পরীক্ষায় আরও জানা গেছে যে, নোনা জমি জলের তোড়ে ধুইয়ে দেবার ফলে না ধোয়া জমির তুলনায় ফলনের হার শতকরা 22 ভাগ বেশী হয়েছে। আর এই রকম জমিতে রাসায়নিক সার ব্যবহার করায় ফলন হয়েছে প্রায় 58·59 কুইন্টাল আর না ধোয়া জমিতে ফলনের পরিমাণ হয়েছে মাত্র 48·1 কুইন্টাল।

কারবারিল ইনজেকশন নারকেলের পোকা দমন করে

কেরালার কায়ানকুলমে অবস্থিত কেন্দ্রীয় নারকেল গবেষণা সংস্থার একটি সংবাদে জানা গেছে যে, নারকেল গাছের গুঁড়ির চারপাশে কারবারিল ইনজেকশন দিলে সহজেই নারকেল গাছের পোকা দমন করা যায়।

শতকরা 50 ভাগ কারবারিলের 20 থেকে 30 গ্র্যাম জলীয় মিশ্রণ 1000 থেকে 15000 সি. সি. জলের সঙ্গে মিশিয়ে গাছের আক্রান্ত স্থানগুলিতে ইনজেকশন দেবার সুপারিশ করা হয়েছে। প্রতিটি ইনজেকশনের জন্যে গড়ে খরচ পড়ে মাত্র 20 থেকে 40 পয়সা।

পরীক্ষার আরও জানা গেছে যে, কারবারিল মানবদেহের পক্ষেও বিষাক্ত নয় আবার নারকেল গাছের পক্ষেও উপকারী।

উচ্চ ফলনশীল মিষ্টি তরমুজ

লুধিয়ানার পাঞ্জাব কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে এক রকম তরমুজ উৎপাদন করা হয়েছে। তার নাম দেওয়া হয়েছে ইমপ্রুভ্ড্ সিপার।

এই নতুন জাতের তরমুজ আমেরিকার সিপারের সগোত্র। এই ইমপ্রুভ্ড্ সিপার পাঞ্জাবের তরমুজের চেয়ে বেশী মিষ্টি আবার ফলনও প্রায় শতকরা 55 ভাগ বেশী।

পুস্তক-পর্যালোচনা

চল যাই চাঁদের দেশে—শ্রীমৃত্যুঞ্জয় প্রসাদ গুহ। প্রকাশক: অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ, কলিকাতা। মূল্য: 3·50 টাকা।

1969 সালের 21শে জুলাই মানব সভ্যতার ইতিহাসে একটি অবিস্মরণীয় দিন। ঐ দিন ভারতীয় সময় সকাল 8টা 26 মিনিটে চন্দ্রপৃষ্ঠে মহাকাশচারী নীল আর্মস্ট্রং-এর একটি পদক্ষেপের মধ্য দিয়ে মানব জাতির এক বিরাট অগ্রগতি সূচিত হলো, বহু যুগ-সঞ্চিত মানুষের স্বপ্ন রূপায়িত হলো বাস্তবে। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে চন্দ্রাভিযান সম্পর্কে বাংলা পত্র-পত্রিকায় যেমন প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হয়েছে, তেমনি কয়েকটি বাংলা বইও আত্মপ্রকাশ করেছে স্বল্প সময়ের মধ্যে। এই প্রসঙ্গে একটি উল্লেখযোগ্য নাম হলো—'চল যাই চাঁদের দেশে'।

1957 সালে স্পুৎনিকের ভূ-প্রদক্ষিণ থেকে সুরু করে মহাকাশ অভিযান যে বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্য দিয়ে ক্রমশঃ এগিয়েছে, তার প্রথম গুরুত্বপূর্ণ ধাপগুলি বইটির গোড়ার দিকে সাবলীলভাবে বর্ণনা করা হয়েছে; যথা—মেচতা নামক কৃত্রিম গ্রহের সৃষ্টি, দ্বিতীয় লুনিকের চাঁদে পৌঁছানো, তৃতীয় লুনিক কর্তৃক চাঁদের অগোচর দিকের ছবি তুলে পৃথিবীতে তা পাঠিয়ে দেওয়া, ইঁদুর, কুকুর প্রভৃতি জীবজন্তুকে মহাকাশে পাঠিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা এবং সেই মহড়ার শেষে যুরি গ্যাগারিনের মহাকাশ-বিজয়। রাশিয়ার এই কৃতিত্বগুলির সঙ্গে আমেরিকা কর্তৃক কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপণ এবং অ্যালান শেফার্ড ও জন গ্লেনের মহাকাশ অভিযানের কথাও সংক্ষেপে বলা হয়েছে।

অতঃপর মহাকাশ বিজয়ের কয়েকটি মূল সমস্যার আলোচনা করে সেগুলির সমাধানের বিষয় সহজভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। মহাকর্ষ ও অভিকর্ষ সম্বন্ধে কয়েকটি প্রাথমিক তথ্য পরিবেশিত হয়েছে। অভিকর্ষের বাধা পেরিয়ে মহাকাশ অভিযান সম্ভব হয় যে রকেটের সাহায্যে, সেই রকেটের ইতিবৃত্ত ও কর্মপদ্ধতি বইটি থেকে জানা যাবে। মহাকাশ ভ্রমণের সময় মহাকাশচারীদের জন্যে কৃত্রিমভাবে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করবার প্রয়োজনীয়তা এবং তা সৃষ্টি করবার উপায় বর্ণনা করা হয়েছে। মহাকাশচারীদের জন্যে যে বিশেষ ধরণের শিক্ষার বিস্তৃত ব্যবস্থা আছে, সে সম্পর্কেও পাঠক একটা মোটামুটি ধারণা লাভ করতে পারবেন।

চন্দ্রের পরিচয় দান প্রসঙ্গে চন্দ্রপৃষ্ঠের প্রকৃতি ও পরিবেশ এবং সেখানকার বায়ুশূন্যতা, অপেক্ষাকৃত স্বল্প অভিকর্ষজনিত বল, দিন ও রাত্রির সুদীর্ঘ ব্যাপ্তি, বিভিন্ন সময়ে তাপমাত্রার বিস্তর ব্যবধান ইত্যাদি উল্লিখিত হয়েছে। চন্দ্র অভিযানের সার্থকতা সম্বন্ধেও লেখক সংক্ষেপে আলোচনা করেছেন, তবে সেই আলোচনায় গভীরতার কিছুটা অভাব পরিলক্ষিত হয়।

মহাকাশ অভিযানের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসাবে কৃত্রিম উপগ্রহের বাইরে মহাকাশচারীদের পদচারণা এবং পরিক্রমারত অবস্থায় সোয়ুজ 4 ও 5-এর মিলনের পরীক্ষা বর্ণিত হয়েছে। এর পর রয়েছে চাঁদে মানুষ নামবার প্রস্তুতি পর্বের শেষ দুটি অধ্যায়—অ্যাপোলো-8 ও অ্যাপোলো-10 অভিযান। অ্যাপোলো 8-এর মহাকাশচারীরা চন্দ্রকে কয়েকবার প্রদক্ষিণ করে ফিরে আসেন। অ্যাপোলো 10-এর দু'জন মহাকাশচারী মূল

মহাকাশযান থেকে একটি 'চাঁদের ভেলায়' চড়ে চাঁদের 10 মাইলের মধ্যে গিয়ে চাঁদকে ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করে এসেছিলেন।

চাঁদে নামবার জন্যে যাঁরা নির্বাচিত হন, তাঁরা কেমনভাবে কৃত্রিম চান্দ্র পরিবেশে বারবার মহড়া দিয়ে নিজেদের প্রস্তুত করে নেন, সংক্ষেপে তা উল্লেখ করবার পর অ্যাপোলো-11 অভিযানের মাধ্যমে মানুষের চন্দ্রে অবতরণের ঐতিহাসিক ঘটনাটি বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

উপসংহারে লেখক জুল ভার্নের 1865 সালে প্রকাশিত 'পৃথিবী থেকে চাঁদের দিকে' নামক কাহিনীটির অবতারণা করেছেন। চাঁদে যাওয়ার বাস্তব ঘটনার সঙ্গে শতাধিক বছর আগেকার ঐ কাহিনীর এমন মূলগত সাদৃশ্য রয়েছে যে, দূরদর্শিতার একটি আশ্চর্য উদাহরণ হিসাবে তা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

পরিশিষ্টে চাঁদ সম্বন্ধে কয়েকটি তথ্য পরিবেশিত হয়েছে।

লেখকের বর্ণনাভঙ্গী সাবলীল ও চিত্তাকর্ষক—শেষের অধ্যায়গুলি সম্পর্কে একথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। তাঁর বর্ণনার অঙ্গ হিসাবে মহাকাশচারীদের কথোপকথনের উদ্ধৃতিগুলির সার্থক প্রয়োগ লক্ষ্যণীয়। তবে বইটিতে ঘটনাবলীর বর্ণনা যতটা সাবলীল, বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাগুলি সাধারণতঃ তত প্রাঞ্জল নয়—কয়েকটি স্থানে ঐ ব্যাখ্যা খানিকটা অস্পষ্ট থেকে গেছে।

চিত্রবাহুল্য বইটির একটি অন্যতম আকর্ষণ। 'চল যাই চাঁদের দেশে' নামক যে রঙীন চিত্রটি প্রথমেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তার সরস ও সতেজ ভাবটি বইখানির সর্বত্রই প্রায় পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে। চিত্র 32, চিত্র 44 প্রভৃতি চিত্রগুলি সপ্রশংস উল্লেখের দাবী করতে পারে। তবে একথা বলতে হয় যে, চিত্র 1 ও চিত্র 25-এর মত কয়েকটি চিত্রের ব্যাখ্যা যথেষ্ট বা যথাযথ হয় নি। চিত্র 1-এ অ্যান্টিনার কথা বলা হয়েছে, কিন্তু অ্যান্টিনা কাকে বলে বা তার কাজ কী, সে সম্বন্ধে কিছুই বলা হয় নি।

বইটির কয়েকটি অংশে রচনার শৈথিল্য পরিলক্ষিত হয়। সেগুলি সম্পর্কে এখন সংক্ষেপে আলোচনা করা যেতে পারে।

গাছ থেকে আপেল পড়া দেখে তাই নিয়ে চিন্তা করতে করতে নিউটন মহাকর্ষের বিষয় আবিষ্কার করেন (পৃষ্ঠা 18-19)—এই ধরণের অতিসরলীকরণ মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়, বিশেষতঃ বিজ্ঞানের পুস্তকে। বিজ্ঞানের আবিষ্কার সাধারণতঃ ওভাবে হয় না এবং মহাকর্ষ-সূত্রের আবিষ্কারও ঠিক ঐভাবে হয় নি। আপেল পড়বার ঘটনাটি সত্য হোক বা না হোক, একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, কোপার্নিকাস, কেপ্‌লার প্রমুখ পূর্বসূরীদের পর্যবেক্ষণলব্ধ জ্ঞানের যথাযথ বিশ্লেষণই ছিল প্রধানতঃ নিউটনের মহাকর্ষ-সূত্র আবিষ্কারের মূলে।

পৃথিবীর আকর্ষণ বোঝাতে মাধ্যাকর্ষণ ও অভিকর্ষ, দু'টি শব্দই ব্যবহৃত হয়েছে। বিজ্ঞানের বইতে একই অর্থে একটি পরিভাষা ব্যবহার করাই কাম্য।

29নং পৃষ্ঠায় লিখিত "$\omega = m \times g$", এই সূত্রে m যে ভর, তা উল্লেখ করবার দরকার ছিল।

অ্যাপোলো-11 অভিযান শুরু হয় রথযাত্রার দিন এবং ঐ অভিযানের যাত্রীরা পৃথিবীতে

ফিরে আসেন উল্টোরথের দিন। এই সম্পর্কে লেখক বইটির ভূমিকায় লিখেছেন, "কী বিচিত্র যোগাযোগ, আর কী গভীর তাৎপর্যপূর্ণ! এর মধ্যে বিধাতার কী অমোঘ ইঙ্গিত লুকিয়ে রয়েছে তা কে জানে?" যোগাযোগ হয়তো সত্যই বিচিত্র, কিন্তু তার মধ্যে গভীর তাৎপর্য দেখতে পাওয়া বা বিধাতার অমোঘ ইঙ্গিতের সন্ধান করা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচায়ক নয়। বাস্তবিকই যদি তাৎপর্য, ইঙ্গিত ইত্যাদি থাকতো, তাহলে যে দেশে রথযাত্রা-উৎসব পালিত হয়, সেই দেশের মানুষই কি ঐ অভিযানে পাড়ি দিত না? তা না হয়ে ঐ অভিযানের যাত্রী ছিলেন এমন দেশের মানুষ, যে দেশে "মহাপ্রভু জগন্নাথ" স্বীকৃত নন এবং যে দেশের সঙ্গে রথযাত্রা-উৎসবের কোন সম্পর্কই নেই। বিজ্ঞানকে লোকরঞ্জক বা সরস করবার জন্যে হলেও এমন কিছু লেখা কি উচিত, যা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিপন্থী?

যাহোক, বইটির এই সব ত্রুটি অনেকটা চাঁদের কলঙ্কের মত। এই ধরণের বইয়ের প্রধান উদ্দেশ্য সাধারণ মানুষকে বিজ্ঞান সম্পর্কে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করা—সে দিক থেকে লেখকের প্রচেষ্টা বহুলাংশেই সার্থক হয়েছে। বইটি কিশোর-কিশোরীদের উপযোগী করে লিখিত হলেও আবালবৃদ্ধবনিতা এটি পড়ে চন্দ্রাভিযান সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারবেন এবং তা বেশ আনন্দের সঙ্গে, একথা নিঃসংশয়ে বলা যেতে পারে।

জয়ন্ত বসু*

---

*সাহা ইনষ্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, কলিকাতা-9

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

জুন — 1971

চতুর্বিংশ বর্ষ — ষষ্ঠ সংখ্যা
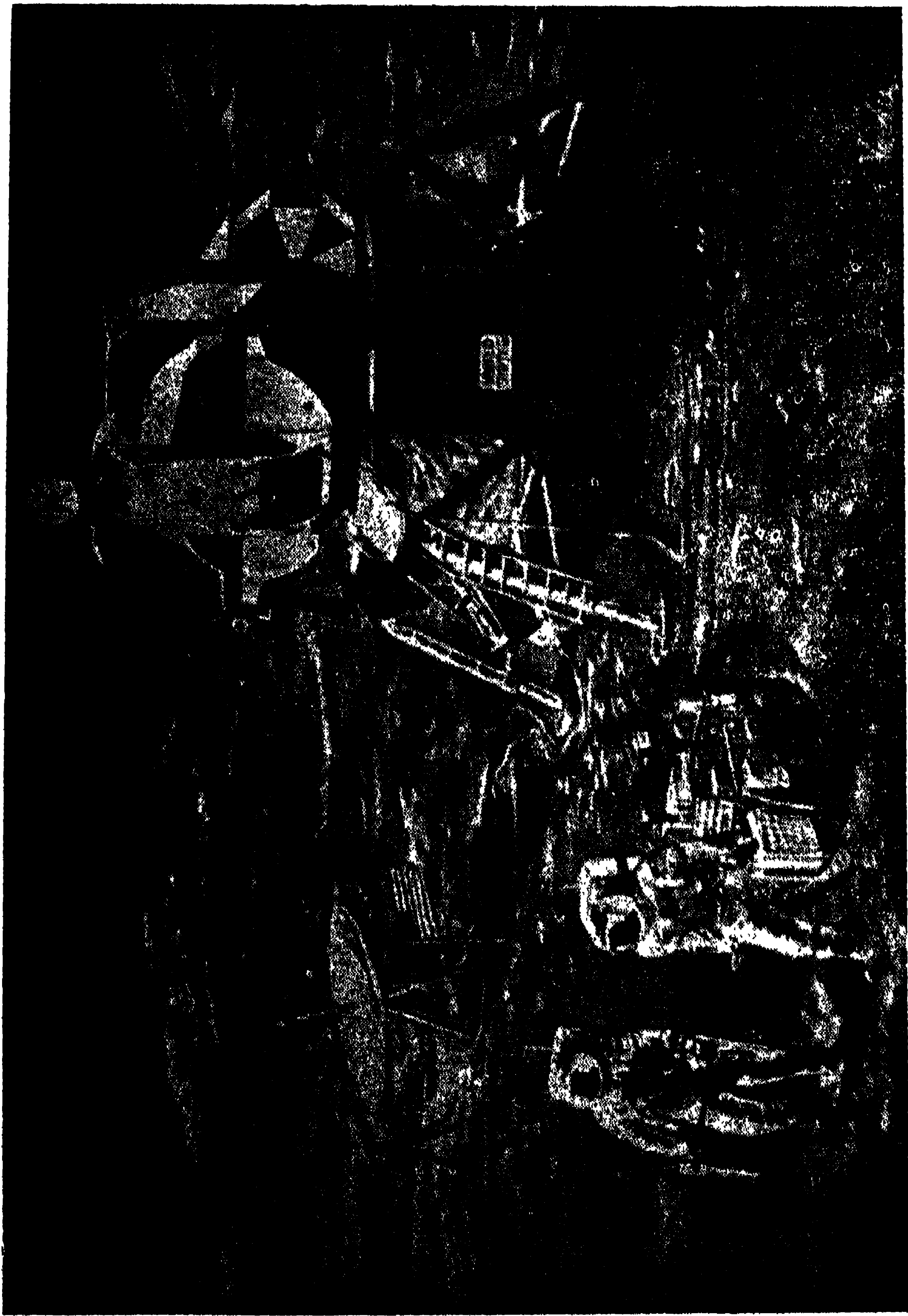
অ্যাপোলো-14 এর মহাকাশচারীদ্বয় অ্যালান সেপার্ড ও এডগার মিচেল ফ্রা মরো এলাকায় পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষাদি চালাবার উদ্দেশ্যে চন্দ্রপৃষ্ঠে পদযাত্রা সুরু করেছেন। পিছনে টেলিভিশন ক্যামেরা, যোগাযোগ ব্যবস্থার অ্যান্টিনা এবং চন্দ্রে অবতরণের যান প্রভৃতি দেখা যাচ্ছে। তৃতীয় মহাকাশচারী স্টুয়ার্ট রুস চন্দ্রকক্ষে কম্যাণ্ড মডিউলে রয়েছেন।

পোষা পায়রার কথা

এক সময়ে আমাদের দেশে অনেকেই সখ করে পায়রা পুষতো, তাছাড়া যুদ্ধ-বিগ্রহের সময় অথবা অগম্য বা দূরবর্তী স্থানে গোপন সংবাদাদি আদান-প্রদানে পোষা পায়রার ব্যবহার প্রচলিত ছিল। আজকাল যোগাযোগ ও সংবাদ আদান-প্রদানের ব্যবস্থার উন্নতি সাধিত হবার ফলে তার অবলুপ্তি ঘটেছে। অবশ্য সময়ে সময়ে এখনও যোগাযোগ করবার জন্যে পোষা পায়রা ব্যবহারের কথা শোনা যায়। তাছাড়া এক সময়ে প্রতিযোগিতামূলক পায়রা ওড়াবার খেলারও বহুল প্রচলন ছিল—আজকালও কোন কোন অঞ্চলে এরূপ প্রতিযোগিতার কথা শোনা যায়।

যাযাবর পাখী অর্থাৎ যে সকল পাখী প্রজনন ঋতুতে হাজার হাজার মাইল দূরবর্তী অন্য দেশে উড়ে গিয়ে ঘর বাঁধে, তারা বছর বছর ঠিক একই স্থানে এসে বসবাস করে। এইরূপ দূরবর্তী স্থানে প্রতি বছর পুরাতন বাসস্থান তারা কেমন করে চিনে নেয়—সেটা এক বিস্ময়কর ব্যাপার। শত শত মাইল দূরে নিয়ে ছেড়ে দিলে পোষা পায়রাও ঠিক এই রকমের অদ্ভুত ক্ষমতার পরিচয় দেয়। পায়রার এই অদ্ভুত ক্ষমতা খুবই কৌতূহলোদ্দীপক।

পোষা পায়রা অনেক সময় যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়ে যাওয়া হতো, যুদ্ধের হার-জিতের খবর পাঠাবার জন্যে। তাছাড়া প্রয়োজনীয় চিঠিপত্র আদান-প্রদানের ব্যাপারেও অনেক সময় পায়রার সাহায্য নেওয়া হতো। এখনও অনেকে পায়রা পোষে এবং এরা খুব পোষও মানে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগেও কলকাতায় পায়রা ওড়াবার প্রতিযোগিতার বহুল প্রচলন ছিল। কিন্তু যুদ্ধের সময় মিলিটারিরা রেসের পায়রা বাজেয়াপ্ত করায় 'হোমার' পালন বন্ধ হয়ে যায়। যুদ্ধের সময় শিক্ষিত পায়রাকে গুপ্তচর-বৃত্তির কাজে লাগানো হতো। পায়রার পায়ে ছোট ছোট হাল্কা ক্যামেরা বেঁধে শত্রুরাজ্যে ছেড়ে দেওয়া হতো। পায়রা যখন শত্রু-রাজ্যের উপর দিয়ে উড়ে নিজের আস্তানায় ফিরে আসতো, তখন পায়ে বাঁধা ক্যামেরা খুলে বের করা হতো বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানের ছবি। যুদ্ধের পর কিছু পায়রা ফেরৎ পাওয়া যায় আর তাদেরই বংশধরেরা এখন রেসে নামছে। মিলিটারিদের ভাল জাতের হোমারের সঙ্গে কলকাতার পায়রার সংমিশ্রণ ঘটায় স্টকের উন্নতি ঘটে।

কলকাতায় পায়রার রেসের ক্লাব আছে। এই ক্যালকাটা রেসিং পিজিয়ন ক্লাব প্রতি বছর পায়রার রেসের ব্যবস্থা করেন। ধরা যাক, হাজারিবাগ থেকে কলকাতায় পায়রার রেস হবে। পথের দূরত্ব 225 মাইল। রেসের আগের দিন ক্যালকাটা রেসিং পিজিয়ন ক্লাবের কয়েক জন সদস্য পায়রাগুলিকে ট্রেনে করে নিয়ে যান হাজারিবাগে।

পায়রাগুলি হাজারিবাগে পৌঁছায় শেষ রাত্রে। তারপর সকালে সাতটার সময় স্টেশন মাষ্টার ও স্থানীয় অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ডেকে সীলকরা বাক্স খুলে দেন। পায়রাগুলি ছাড়া পেয়ে উপরে উঠেই দুই-এক পাক ঘুরে যে যার গতিপথ বেছে নিয়ে উড়তে থাকে। হাজারিবাগ থেকে পায়রাগুলিকে ছেড়ে দিয়ে কলকাতায় টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দেওয়া হয়—'লিবারেটেড ফ্রম হাজারিবাগ অ্যাট সেভেন এ. এম.'। সব পায়রার রেসেই এই রকম করা হয়। যে সকল পায়রার ট্রেনিং ভাল, তারা ঘণ্টায় 50-60 মাইল উড়ে চলে, কিন্তু আবহাওয়া খারাপ হলে এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে। সাধারণতঃ শীতকালে আবহাওয়া ভাল থাকে আর সেই কারণে পায়রা ওড়াবার প্রতিযোগিতা এই সময়েই হয়। প্রতিযোগিতার পায়রা মাটি থেকে 25-30 ফুট উপর দিয়ে উড়ে চলে। বেশী উচুঁতে উঠলে এদের বড় শত্রু বাজপাখীর ভয় থাকে। বাজপাখীরা পায়রা দেখলেই দূর থেকে ছোঁ মারতে আসে এবং পায়রার গতিবেগও ভয়ঙ্কর ভাবে বেড়ে যায়। বাজপাখীর শিকার ফস্‌কালে 25-30 ফুটের মধ্যে নিজেকে সামলাতে না পেরে অনেক সময় মাটিতে আছাড় খেয়ে পড়ে। প্রতিযোগিতার পায়রা জানে, নীচু দিয়ে উড়ে গেলে ভয় অনেক কম থাকে বাজপাখীদের হাত থেকে। পথের মধ্যে এইভাবে বাজপাখী আক্রমণ করলে পায়রার মৃত্যু প্রায় অবধারিত, কিন্তু পায়রা বেশীর ভাগ সময়েই বুঝতে পারে, শত্রু আসছে তিন-চার মাইলের মধ্যে আর সঙ্গে সঙ্গে গতিপথ বদল করে। পথের মধ্যে ঝড়-বৃষ্টি হলে বা ট্রেনিং ভাল না থাকলে রেসের পায়রা অনেক সময় বিপথে উড়ে যায়, আর ফেরে না। এরা কখনো রাত্রিতে পাখা মেলে ওড়ে না, সকালে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত উড়ে আসে নিজের আস্তানার দিকে। উড়ে আসবার সময় এরা পথের মধ্যে কিছুই খায় না কেবল খুব তেষ্টা পেলে একটু জল খায়—এই পর্যন্ত, আর সন্ধ্যার সময় আশ্রয় নেয় বড় গাছের ডালে। দিনের বেলায় আবার উড়ে চলে। এই ভাবে রেসের পায়রা উড়ে আসে দিল্লী, গয়া, কানপুর, আসানসোল প্রভৃতি স্থান থেকে পাল্লা দিয়ে।

হাজারিবাগ থেকে সকাল সাতটায় ছাড়লে হিসাব অনুযায়ী বেলা 11টা নাগাদ পায়রার কলকাতায় পৌঁছাবার কথা। সেই রকম সময় আন্দাজ করে ক্যালকাটা রেসিং পিজিয়ন ক্লাবের একজন করে বিচারক এক-এক পায়রার মালিকের বাড়ী গিয়ে হাজির হন। বিচারকেরা দেখেন, ঠিক কোন্ সময় পায়রা ফিরে এলো এবং ফিরে এসে কখন নিজের ঘরে গেল। এসব সময় টুকে নেন বিচারকেরা। তারপর সেই সব পায়রা নিয়ে বিচারক মিলিয়ে নেন পায়রার পায়ের রিং নম্বর ও গায়ের রং। পরে সবগুলি পায়রার পৌঁছাবার সময় মিলিয়ে কোন্ কোন্ পায়রা বিজয়ী হলো, তাদের নম্বর ও নাম ঘোষণা করেন ক্লাবের সম্পাদক। বিজয়ী পায়রার মালিককে অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পুরস্কার দেওয়া হয়।

বহুদূর থেকে পায়রা ঠিক নিজের ঘরে ফিরে আসে—কলকাতার হাজার হাজার বাড়ীর ছাদের মধ্য থেকে নিজের ঘরের ছাদটিকে ঠিক চিনে নামতে পারে। এই ভাবে রেসের পায়রা দিল্লী থেকে কলকাতা 900 মাইল পথ অতিক্রম করে ঠিক নিজের ঘরে ফিরে এসেছিল—এটা ক্যালকাটা রেসিং পিজিয়ন ক্লাবের পায়রার ভারতীয় রেকর্ডে আছে। পায়রার রেসের বিশ্ব-রেকর্ড আছে 1,091 মাইল—জিব্রালটার থেকে ইংল্যাণ্ডের গিলিংহাম পর্যন্ত।

পায়রাদের উড়ে যাবার সময় নিখুঁৎভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই জন অধ্যাপক—এম. সি. মিচেনার এবং সি. ওয়ালকট। তাঁরা কতকগুলি পায়রা বেছে নিয়ে তাদের প্রত্যেকের গায়ে 25-30 গ্রাম ওজনের রেডিও ট্রান্সমিটার রাবারের সূতা দিয়ে বেঁধে দিলেন। এমনভাবে পায়রার গায়ে বাঁধা হয়েছিল যে, তাতে তাদের উড়তে কোন অসুবিধা হয় নি বা গতিবেগ হ্রাস পায় নি। এই সব পায়রা উড়িয়ে দিয়ে একটি ছোট ধরণের উড়োজাহাজ তাদের অনুসরণ করে উড়ে যায়। উড়োজাহাজের মধ্যে রেডিও রিসিভারে পায়রাগুলির গায়ে লাগানো রেডিও ট্রান্সমিটারের সঙ্কেতগুলি ধরা পড়েছিল। উড়োজাহাজ সঙ্গে সঙ্গে চললেও পায়রাদের ওড়বার পথে কোন ব্যাঘাত ঘটে নি। এই পরীক্ষার দ্বারা দুই জন অধ্যাপক পায়রার ঘরে ফেরবার ব্যাপারে কিছু নতুন তথ্য পান। তাঁরা বলেন—(1) পায়রাগুলিকে উড়িয়ে দিলে নিজেদের ঘরে ফিরে আসবার সময় এরা যে দিকে ওড়বার তালিম পায়, সেই দিকেই উড়তে থাকে। (2) এই সময় সহজাত সংস্কারের বশে সূর্যের অবস্থান ও সময়ের একটা হিসাব বুঝে নিয়ে নিজের ঘরের দিকে উড়তে থাকে। এথেকে বোঝা যায়, পায়রাদের দিক নির্ণয় করবার একটা সহজাত ক্ষমতা আছে। (3) সূর্যের অবস্থান দেখেই এরা দিক নির্ণয় করে। প্রাণী-বিজ্ঞানীরা এদের নিয়ে আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছেন।

শিক্ষিত পায়রার সাহায্য দুর্গম স্থান বা বন্যাপীড়িত এলাকার সংবাদ আদান-প্রদান করা যায়। সম্প্রতি এক খবরে জানা যায়, উড়িষ্যার বিভিন্ন দুর্গম অঞ্চলে গত তিন বছরে পায়রার সাহায্যে 38,4827টি বার্তা পাঠানো হয়েছে। বার্তাবাহী এই পায়রাগুলির সংখ্যা হলো 2428টি। রাজ্য-পুলিস এই সব পায়রা পালন করেন। এই জন্যে প্রতি বছর ব্যয় হয় 28,700 টাকা। যে সব অঞ্চলে তারবার্তা পাঠাবার উপায় নেই, সেই সব অঞ্চলে পুলিসের পায়রাগুলি খবর নিয়ে যায় এবং সেখানে থেকে খবর নিয়ে আসে। বার্তা-বিনিময়ের কাজটা তারা বেশ সন্তোষজনকভাবেই চালায়। উড়িষ্যার পুলিসের মত ভারতের অন্যান্য রাজ্যের পুলিসেরাও পায়রা পুষে অনেক সুবিধা পেতে পারেন।

আশীষ রায়চৌধুরী

কৃত্রিম জলাধার বা অ্যাকোয়ারিয়ামে মৎস্য পালন

জল সম্বন্ধে তোমাদের প্রায় সকলেরই মোটামুটি ধারণা আছে। অবশ্য জল সম্বন্ধে এমন বহু তথ্য আছে—যা আমরা অনেকেই জানি না। আজ তোমাদের কাছে জলের মধ্যে প্রাণী ও উদ্ভিদ কি কারণে বেঁচে থাকে বা মারা যায়—সে সম্বন্ধে কিছু বলবো।

তোমরা তো জান, মাছ জলের পাত্রে বেশী দিন বাঁচে না! দেখা যায় দুই-এক দিন পরেই জল ঘোলাটে হয়ে গেছে, মাছ নীচে মরে পড়ে রয়েছে। কিন্তু অ্যাকোয়ারিয়ামের মাছগুলি তো বেশী দিন বেঁচে থাকে! মাছ তো উভয় ক্ষেত্রে জলেই রয়েছে, তবে এ-রকম কেন হয়?

এই কেনর উত্তর জানতে হলে অ্যাকোয়ারিয়ামের গঠনবৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে জানতে হয়। অ্যাকোয়ারিয়ামেও জলের ভিতরেই মাছ থাকে। কিন্তু তার আর একটি প্রধান অঙ্গ হলো শ্যাওলা, জলজ উদ্ভিদ ইত্যাদি। আমরা সকলেই প্রঃশ্বাসের সঙ্গে বাতাস থেকে অক্সিজেন টেনে নিই ও নিঃশ্বাসে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস ছেড়ে দিই। একে বলা হয় শ্বাসক্রিয়া। মানুষের মত পাখী, পোকা, মাছ, গাছ, শ্যাওলা প্রভৃতি সবারই শ্বাসক্রিয়ার প্রণালী একই রকম। সকলেই শ্বাসক্রিয়ার ফলে অক্সিজেন টেনে নেয় ও কার্বন ডাই-অক্সাইড পরিত্যাগ করে। অ্যাকোয়ারিয়ামের ভিতরের মাছ শ্বাসক্রিয়াকালে অক্সিজেন টেনে নেয় আর জলে ছাড়ে কার্বন ডাই-অক্সাইড। উদ্ভিদ-জগতে আর একটি প্রক্রিয়া আছে, যাকে বলা হয় আলোক-সংশ্লেষণ (Photosynthesis)। এই প্রক্রিয়ার দ্বারা জলজ উদ্ভিদ জল থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে' আলোর সহায়তায় (অ্যাকোয়ারিয়ামের বাল্‌বের আলোয়) আভ্যন্তরীণ নানা রাসায়নিক ক্রিয়াকলাপের দ্বারা নিজেদের খাদ্য প্রস্তুত করে। এই প্রক্রিয়ারই একটি অঙ্গ হিসাবে উদ্ভিদ আবার অক্সিজেন পরিত্যাগ করে। আলোক-সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া একমাত্র উদ্ভিদ-জগতেরই বিশেষত্ব। অ্যাকোয়ারিয়ামের মাছ নিঃশ্বাসের সঙ্গে যে কার্বন ডাই-অক্সাইড জলে ছাড়ছে, সেই কার্বন ডাই-অক্সাইড উদ্ভিদ আবার টেনে নিচ্ছে নিজের খাদ্য প্রস্তুতের জন্যে এবং খাদ্য প্রস্তুতের পর অক্সিজেন জলে ছাড়ছে। মাছ সেই অক্সিজেন টেনে নিচ্ছে শ্বাসক্রিয়ার জন্যে। ফলে এমনি একটা আবর্তের মধ্য দিয়ে মাছ বেঁচে থাকে অ্যাকোয়ারিয়মের জলে। মাছের নিজের কিন্তু খাদ্য প্রস্তুতের ক্ষমতা নেই। তাই তাদের খাবার হিসাবে অ্যাকোয়ারিয়ামে কেঁচো, পোকা ইত্যাদি বাইরে থেকে জোগান দিতে হয়। পাত্রের জল রোজ বদলে দিয়ে জলে কার্বন ডাই-অক্সাইড জমতে না দিলে মাছকে অনেক দিন পর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখা চলে। অ্যাকোয়ারিয়ামের জলে যদি কখনও কার্বন ডাই-অক্সাইড

উদ্বৃত্ত হতে থাকে, তাহলে সেখানেও মাছ মারা পড়ে। অ্যাকোয়ারিয়ামের জলে মাছ ও উদ্ভিদের এক অনুপাত সর্বদা বজায় রাখলে মাছের মৃত্যুর সম্ভাবনা কম।

পুকুরের জলে শ্যাওলা, নানা ছোট গাছ এবং মাছ, শামুক, কেঁচো প্রভৃতি প্রাকৃতিক নিয়মে এক সঙ্গে সহাবস্থান করে। এই জলজ প্রাণী ও উদ্ভিদ যদি সামঞ্জস্যপূর্ণ অনুপাতে জলাশয় বা পুকুরে থাকে, তাহলে এরাই জলকে পরিষ্কার রাখে।

পাহাড়ের গায়ে ঝর্ণার জলে আশপাশের পাতা পড়ে পচ্ছে, ধুলা-ময়লা পড়ছে। তবু এই ঝর্ণার জল কত পরিষ্কার। পাহাড়ী জঙ্গলে এই জলই পানীয় হিসাবে ব্যবহৃত হয়। জলে সর্বদাই অসংখ্য ব্যাক্টিরিয়া থাকে, যাদের কাজই হলো জলে অবস্থিত পচনশীল পদার্থকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ভেঙ্গে মৌলিক পদার্থে পরিণত করা। ফলে এই ব্যাক্টিরিয়াই জলকে পরিষ্কার রাখতে সাহায্য করছে। কিন্তু ব্যাক্টিরিয়ার জীবনধারণের জন্যে অক্সিজেন প্রয়োজন। ঝর্ণার ভিতরে নুড়ি, পাথর ইত্যাদির গায়ে শ্যাওলা জন্মে, তারা তাদের খাবার তৈরির সময় ঐ প্রণালীর অঙ্গ হিসাবে যে অক্সিজেন জলে ছাড়ছে, সেই অক্সিজেনই ব্যাক্টিরিয়ার প্রয়োজন মেটাচ্ছে। কোন কারণে যদি জলে ব্যাক্টিরিয়ার সংখ্যা বেড়ে যায়, তাহলেই শ্যাওলা ও ব্যাক্টিরিয়ার অনুপাত ভঙ্গ হবে এবং জল দূষিত হবার সূচনা দেখা দেবে। হঠাৎ বেড়ে যাওয়া ব্যাক্টিরিয়ার সংখ্যা বিনাশ করে প্রোটোজোয়া নামক এককোষী ক্ষুদ্র প্রাণী। আবার ওদিকে শ্যাওলার প্রাচুর্য বিনাশ করবার জন্যে আবির্ভাব হয় নানা পোকা, শামুক ইত্যাদির। শ্যাওলাই এদের অন্যতম খাদ্য। আবার এদের অনুপাত বজায় রাখবার জন্যে আসে ছোট ছোট মাছ, যারা জলজ পোকা, শামুক ইত্যাদি খেয়ে বেঁচে থাকে। তার পরেই হলো বড় মাছ, যাদের খাদ্যতালিকায় পড়ে ছোট ছোট মাছ। তাহলেই আমরা দেখছি, জলাশয়ে ব্যাক্টিরিয়া, শ্যাওলা, ছোট ছোট গাছ, শামুক, কেঁচো, অন্যান্য পোকা, প্রোটোজোয়া, মাছ ইত্যাদি এক সহাবস্থান নীতির দ্বারা জলকে পরিষ্কার রাখতে মিলিত-ভাবে সাহায্য করে।

নানা কারণেই জলের মধ্যে এদের পারস্পরিক অনুপাত নষ্ট হতে পারে। তখন জল দূষিত বা অপরিষ্কার হবে। এমন কোনও পদার্থ জলের সঙ্গে মিশে যেতে পারে, যেটা জলজ জীবের জীবনধারণের পক্ষে ক্ষতিকর। এর ফলে কোনও প্রাণী বা উদ্ভিদ মারা পড়তে থাকে, নতুবা কোনটার সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং এইভাবে তাদের আনুপাতিক হার নষ্ট হয়। সাধারণ অবস্থায় মানুষই নানা ভাবে জলের এই পরিচ্ছন্নতা নষ্ট করছে। তাছাড়াও দেখা যায় যে, নদীর তীরে যে সমস্ত অঞ্চলে কলকারখানা, গড়ে উঠেছে, সেই সব অঞ্চলের নদীর জল অতিরিক্ত মাত্রায় দূষিত হয়। এর কারণ হলো, এই সব কলকারখানা থেকে নির্গত নানাপ্রকার রাসায়নিক পদার্থ এই জলে নিক্ষিপ্ত হয়। ফলে স্বভাবতঃই সেখানে জলজ জীবের সুস্থ জীবন-

ধারণের পক্ষে এক প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি হয়। আমাদের দেশে হুগলী নদীর তীরবর্তী জুট মিল ও অন্যান্য কলকারখানার অবস্থিতিই এই নদীর জলের পরিচ্ছন্নতা নষ্ট হবার অন্যতম কারণ। গ্রেট বৃটেন, আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি দেশের শিল্পসমৃদ্ধ অঞ্চলেও এই একই কারণে প্রধানতঃ নদীগুলির জল দূষিত হচ্ছে এবং ক্রমশঃই পানীয়ের অনুপযোগী হয়ে উঠছে। আমেরিকার ফিলাডেলফিয়ায় অবস্থিত অ্যাকাডেমি অব ন্যাচারাল সায়েন্সের ডক্টর রুথ প্যাট্রিক নামে একজন মহিলা বিজ্ঞানী কি করে প্রাকৃতিক জলকে দূষিত হওয়া থেকে মুক্ত রাখা যায়, তাই নিয়ে গবেষণা সুরু করেছেন। তাঁর গবেষণার মূলগত ভিত্তি হলো—কোন নির্দিষ্ট জলাশয়ে প্রাকৃতিক পরিবেশে কোন্ কোন্ জলজ প্রাণী বা উদ্ভিদ বেঁচে থাকে, সেটা প্রথমতঃ নির্ণয় করা এবং তারপর পরীক্ষাগারে কৃত্রিম জলাশয় তৈরি করে তাতে বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ বিভিন্ন মাত্রায় মিশিয়ে উপরিউক্ত প্রাণী বা উদ্ভিদের ঐ সব পদার্থের কোন্‌টাকে কতটা সহ্য করবার ক্ষমতা আছে—তার সমীক্ষা করা।

অঞ্জলি রায়

লিউকেমিয়া

লিউকেমিয়া কথাটির সঙ্গে আমরা অনেকেই পরিচিত। রক্তের ক্যান্সারকে লিউকেমিয়া রোগ বলা হয়ে থাকে। শরীরের কোনও অংশের কোষগুলি যদি অন্য কোষগুলির সঙ্গে সামঞ্জস্য না রেখে যথেচ্ছ বেড়ে চলে, তখন তাকে আমরা ক্যান্সার বলি। যে সব জৈব পদার্থ শরীরে ক্যান্সার রোগ বিস্তার করে, তাদের কারসিনোজেনিক পদার্থ বলা হয়। পরীক্ষা করে দেখা গেছে, কতকগুলি রাসায়নিক জৈব পদার্থ এই রোগ বিস্তারে সহায়তা করে। রোগের লক্ষণ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে আলট্রাভায়োলেট রশ্মি অথবা অস্ত্রোপচার ইত্যাদির সাহায্যে প্রাথমিক অবস্থা থেকেই ক্যান্সারের চিকিৎসা সম্ভব।

লিউকেমিয়া কথাটি এসেছে গ্রীক শব্দ থেকে। লিউকস মানে শ্বেত এবং হাইমা কথাটির অর্থ হলো রক্ত। রক্তে শ্বেত কণিকার পরিমাণ অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে গেলে লিউকেমিয়া হয়ে থাকে। লিউকেমিয়া রোগের বিশেষ কোনও বহিঃপ্রকাশ দেখা যায় না। তবে রক্তাল্পতা, অল্প অল্প জ্বর, নাক দিয়ে রক্ত পড়া, ওজন হ্রাস ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দিয়ে থাকে। অবশ্য এই উপসর্গগুলি আরও অনেক রকম রোগের

ক্ষেত্রেও দেখা যায়। কাজেই শুধু এই উপসর্গ দিয়েই রোগীকে চেনা যায় না, বিশদভাবে রক্ত পরীক্ষার দ্বারাই শুধু এই রোগ ধরা সম্ভব।

রক্ত ভাল করে পরীক্ষা করে দেখা গেছে—জল, হর্মোন, প্রোটিন ইত্যাদি বস্তু ছাড়াও এর মধ্যে আছে কতকগুলি জীবন্ত উপাদান। এগুলি হলো লোহিত কণিকা, থ্রম্বোসাইট এবং শ্বেত কণিকা। লোহিত কণিকার ভিতরের হিমোগ্লোবিন অক্সিজেনকে শরীরের নানা স্থানে পৌঁছে দেয় এবং রক্তে এদের সংখ্যা কমে গেলে অ্যানিমিয়া হয়। কোনও জায়গা থেকে রক্তক্ষরণ ঘটতে থাকলে থ্রম্বোসাইট সেখানকার রক্তকে জমাট বাঁধতে সাহায্য করে এবং অধিক রক্তক্ষরণ বন্ধ করে। শ্বেত কণিকাগুলি সৈনিকের মত আমাদের দেহকে বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করে। এদের মধ্যে রয়েছে বেসোফিল, ইয়োসিনোফিল, নিউট্রোফিল, লিম্ফোসাইট এবং মনোসাইট ইত্যাদি।

যে সকল জীবকোষ শরীরে রক্ত উৎপাদন করে থাকে, তারা সব সময় লোহিত কণিকা, শ্বেত কণিকা এবং থ্রম্বোসাইট সৃষ্টির মধ্যে একটা সামঞ্জস্য রেখে চলে। যদি কোনও কারণে শ্বেত কণিকা সৃষ্টিকারী জীবকোষগুলি এই কণিকাগুলির উৎপাদনের উপর তাদের প্রভাব বজায় না রাখতে পারে অর্থাৎ যদি তাদের উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব না হয়, তবে রক্তে শ্বেত কণিকার প্রাচুর্য দেখা দেয় এবং লিউকেমিয়া রোগ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে।

এজন্যে লিউকেমিয়া প্রতিরোধ করতে গেলে রক্তের শ্বেত কণিকা সৃষ্টিকারী কোষগুলির গতিবিধি এবং কার্যকলাপের উপর নজর রাখতে হবে এবং তারা যাতে খুসীমত শ্বেত কণিকা তৈরি করতে না পারে—সেটাও দেখতে হবে। নিউক্লিক অ্যাসিড জীবকোষগুলিকে ভাঙতে সহায়তা করে—তাই শরীরে যাতে নিউক্লিক অ্যাসিড তৈরি হতে না পারে, তার জন্যে অ্যান্টিমেটাবলাইট প্রয়োগ করা দরকার।

আজ পর্যন্ত লিউকেমিয়ার কোনও অব্যর্থ ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নি, তবে ষ্টেরয়েড হর্মোন ইঞ্জেকশন ও নানা প্রকার ঔষধের সাহায্যে রোগীকে সাময়িকভাবে সুস্থ রাখা সম্ভব। লিউকেমিয়া রোগের কারণ সম্বন্ধে এখনও পর্যন্ত সঠিকভাবে কিছু জানা যায় নি। তবে আধুনিক রসায়নবিদেরা মনে করেন যে, এই রোগ ভাইরাস-ঘটিত এবং এর প্রতিষেধকও ভবিষ্যতে আবিষ্কার করা সম্ভব হবে।

পার্থসারথি চক্রবর্তী*

*রসায়ন বিভাগ, কৃষ্ণনগর সরকারী কলেজ; কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

পারদর্শিতার পরীক্ষা

নীচে 5টি রসায়ন বিষয়ক প্রশ্ন দেওয়া হলো। উত্তর দেবার জন্যে মোট সময় 5 মিনিট। এই সময়ের মধ্যে 5টি, 4টি, 3টি, 2টি বা 1টি প্রশ্নের উত্তর সঠিক হলে রসায়নে তোমাদের পারদর্শিতা যথাক্রমে খুব বেশী, বেশী, চলনসই, কম বা খুব কম। কোন প্রশ্নের উত্তর ঠিক না হলে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

1. নিম্নলিখিত মৌলগুলির মধ্যে কোন্‌টি সমপর্যায়ভুক্ত নয়?

   (ক) আর্গন, জেনন, নিয়ন, বোরন, ক্রিপ্‌টন।

   (খ) লিথিয়াম, সোডিয়াম, প্ল্যাটিনাম, পটাসিয়াম, সিজিয়াম।

2. ভূত্বকের গঠনে কোন্‌ মৌলটির পরিমাণ সবচেয়ে বেশী?

   অক্সিজেন, সিলিকন, অ্যালুমিনিয়াম, নাইট্রোজেন, লোহা।

3. নীচের দুটি বন্ধনীর প্রতিটির মধ্যেই একটি করে এমন অক্ষর বসাও যাতে আগের অংশের পরে অক্ষরটি যোগ করলে একটা ধাতুর নাম হয়; তেমনি আবার পরের অংশের আগে ঐ অক্ষর বসালে অন্য একটা ধাতুর নাম হবে।

   (ক) পার ( ) স্তা

   (খ) রূ ( ) রদ

4. কোন্‌টি সঠিক বল।

10 লিটার কার্বন মনোক্সাইড গ্যাসকে নির্দিষ্ট তাপমাত্রা ও চাপে সম্যকভাবে জারিত করতে যে পরিমাণ অক্সিজেনের প্রয়োজন, ঐ তাপমাত্রা ও চাপে তার আয়তন হচ্ছে—

20 লিটার
15 লিটার
10 লিটার
5 লিটার

5. কোন্‌টি সঠিক বল।

এক মোল NH_4Cl-এ যতগুলি পরমাণু আছে, তাদের সংখ্যা :

$6{\cdot}02 \times 10^{23}$

$3 \times 6{\cdot}02 \times 10^{23}$

$6 \times 6{\cdot}02 \times 10^{23}$

$9 \times 6{\cdot}02 \times 10^{23}$

(উত্তর—373নং পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ব্রহ্মানন্দ দাশগুপ্ত ও জয়ন্ত বসু*

* সাহা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, কলিকাতা-9

প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন : 1. দুধ সাধারণতঃ কি কি উপাদানে তৈরি ? দুধের জীবাণু সম্পর্কে বলুন।

তাপ্তী সেন ও কাবেরী মৈত্র, পশ্চিম দিনাজপুর।

প্রশ্ন : 2. অর্শ রোগটা কি ?

সরোজকুমার গুপ্ত ও টুলটুল গুপ্ত, বাঁকুড়া।

উত্তর : 1. দুধ যে খুবই উপকারী একথাটা আমাদের সকলেরই জানা। সুস্থ মানবদেহ গঠনের পক্ষে প্রয়োজনীয় প্রায় সব উপাদানই দুধে আছে। দুধের মধ্যে প্রোটিন, স্নেহজাতীয় পদার্থ, কার্বোহাইড্রেট, বিভিন্ন প্রকার ভিটামিন ছাড়াও ফস্‌ফরাস, ক্যালসিয়াম ও নানা প্রকারের ধাতব লবণ বর্তমান। বিভিন্ন প্রাণীর দুধের মধ্যে গরু, মোষ ও ছাগলের দুধই সাধারণতঃ পান করা হয়। এদের উপাদান মোটামুটিভাবে একই, তবে পরিমাণের দিক দিয়ে উপাদানগুলির মধ্যে কিছু কিছু পার্থক্য দেখা যায়।

দুধের মধ্যে বহু রকমের জীবাণু দেখা যায়। দুধ খুব সহজেই জীবাণুর দ্বারা দূষিত হয়। কোন কোন বিশেষ মাধ্যম আছে যা জীবাণুর বৃদ্ধি ও পুষ্টির সহায়তা করে। দুধ এরূপ একটি মাধ্যম। কাজেই দুধকে বিশুদ্ধ রাখবার জন্যে সতর্ক হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। জীবাণুদের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণী আছে এবং তাদের কার্যকারিতাও বিভিন্ন প্রকার। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই জীবাণু আমাদের উপকার করে।

দুধের ক্ষতিকারক জীবাণু দুধের মাধ্যমে মানবদেহের যে সব রোগের সৃষ্টি করে, তার মধ্যে নানা রকম পেটের অসুখ, টাইফয়েড, যক্ষ্মা, আমাশয়, ডিপ্‌থেরিয়া প্রভৃতির নাম করা যেতে পারে। দুগ্ধবতী গরু, মোষ প্রভৃতি যদি বিশেষ কোনও রোগে আক্রান্ত হয়, তবে তার দুধে ঐ রোগের জীবাণু থাকা খুবই স্বাভাবিক। এছাড়া সংক্রামক ব্যাধিগ্রস্ত গোয়ালার মাধ্যমে বা দূষিত জল মেশানোর ফলে দুধে ক্ষতিকারক জীবাণুর প্রকোপ দেখা দিতে পারে। এই সব জীবাণুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে সাধারণতঃ দুধ ফুটিয়ে নেওয়া হয়। দুধ ফুটিয়ে নিলে এই জীবাণুর বেশীর ভাগই বিনষ্ট হয়, যদিও এই উত্তাপের ফলে দুধের খাদ্যমূল্য কিছুটা হ্রাস পায়। দুধকে পাস্তুরিজেসন পদ্ধতিতে বিশুদ্ধ করা হয়। এই প্রক্রিয়ায় দুধকে প্রায় 60° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রার কাছাকাছি উত্তপ্ত করে খুব দ্রুত সেই উত্তপ্ত দুধকে ঠাণ্ডা করা হয়। তাপমাত্রার দ্রুত পরিবর্তন সহ্য করতে না পেরে জীবাণুদের বেশীর ভাগই মারা যায়। এতে অবশ্য দুধের ভিটামিন-সি খুবই কমে যায়।

উপকারী জীবাণুদের মধ্যে এক জাতীয় জীবাণু দুধে অবস্থিত শর্করাজাতীয়

পদার্থ ল্যাক্‌টোজকে ল্যাক্‌টিক অ্যাসিডে পরিণত করে। এই অ্যাসিডের প্রভাবে দুধ টকে যায়। এই টকে যাওয়া দুধ শরীরের পক্ষে অনিষ্টকর নয় এবং সহজে হজম করা যায়। তাছাড়া কিছু কিছু জীবাণুর প্রভাবে দুধ থেকে চীজ, দই প্রভৃতি তৈরি হয়। কাজেই দুধের বিশুদ্ধতার উপর নজর রাখলে দুধ শরীর গঠনের কাজে অনেক ভাবে সাহায্য করে।

উত্তর: 2. অর্শ রোগটি সাধারণ রোগগুলির মধ্যে একটি পরিচিত নাম। বিভিন্ন কারণে এই রোগের সৃষ্টি হয়। কারণগুলির মধ্যে কোষ্ঠকাঠিন্য, অধিক মদ্যপান, দাঁড়িয়ে কাজ করবার অভ্যাস, লবণ জলের রেচক (Purgative) দিয়ে মলত্যাগের অভ্যাস ইত্যাদি প্রধান। এগুলি ছাড়াও মেদবহুল শরীরে অধিক মেদবৃদ্ধির জন্যে যকৃতের পোর্ট্যাল শিরায় রক্ত চলাচলে বিঘ্ন ঘটবার জন্যেও এই রোগের উদ্ভব হয়। যাদের ব্রঙ্কাইটিস রোগ আছে, অতিরিক্ত কাশির ফলে তাদের তলপেটে চাপ লাগে। এথেকেও অর্শ রোগ দেখা দিতে পারে। তাছাড়া, শরীরের বিশেষ কয়েকটি রোগ, যেমন—টিউমার, কোলাইটিস ইত্যাদির উপস্থিতিতেও অর্শ রোগ হতে পারে।

এই রোগের অন্যতম উপসর্গ হলো মলত্যাগ করবার সময় মলদ্বার দিয়ে রক্ত নির্গমন ও অস্বাভাবিক যন্ত্রণা। শরীরের অভ্যন্তরে মলভাণ্ড বা রেক্টামের পরেই সুরু হয়েছে মলনালী। যেখানটায় সুরু হয়, ঠিক সেখানেই পিউবোরেক্টালিস নামে একটি মাংসপেশী মলনালীকে জড়িয়ে থাকে। মলনালীর উপর ও নীচের কিছু অংশ যথাক্রমে ইণ্টারন্যাল স্ফিংক্টার ও এক্সটারন্যাল স্ফিংক্টার মাংসপেশীর দ্বারা আবৃত। এদের নীচে রয়েছে অপর একটি মাংসপেশী, যার নাম করুগেটর কিউটিস এনাই। মলনালীর ভিতরে দেয়ালের সর্বোচ্চ স্থান থেকে মাঝের অংশকে বলা হয় স্ট্র্যাটিফায়েড স্কোয়ামাস, যেটি এপিথেলিয়াম তন্তুর দ্বারা আবৃত। যে স্থান থেকে এই স্ট্র্যাটিফায়েড স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াম আরম্ভ হয়েছে, সেই স্থানে মলনালীর মাংসপেশী ও মিউকাস মেমব্রেন সম্মিলিত হয়ে একটি ফিতার মত জিনিষ তৈরি করে। এর উপরে ও নীচ দিকে মিউকাস মেমব্রেনের নীচে রয়েছে ঊর্ধ্ব হেমোরয়েড শিরা এবং নিম্ন হেমোরয়েড শিরা, যা মলনালী থেকে দূষিত রক্ত বহন করে। কোনও কারণে এই ঊর্ধ্ব বা নিম্ন হেমোরয়েড শিরা বা তাদের শাখা-প্রশাখায় যদি চাপ লাগে, তবে সেগুলি কুঁচকে গিয়ে কুণ্ডলীর মত হয়ে যায়—যাকে বলা হয় প্লেক্সাস। ঊর্ধ্ব হেমোরয়েড শিরার ক্ষেত্রে এই প্লেক্সাসকে বলা হয় ইণ্টারন্যাল ভেনাস প্লেক্সাস এবং নিম্ন হেমোরয়েড শিরার ক্ষেত্রে একে বলা হয় এক্সটারন্যাল ভেনাস প্লেক্সাস। ঊর্ধ্ব হেমোরয়েড শিরা মেসেনটরিক ও স্পেনিক নামক দুটি শিরার মাধ্যমে যকৃতের পোর্ট্যাল শিরায় গিয়ে মিলিত হয়, কিন্তু নিম্ন হেমোরয়েড শিরা বিভিন্ন শিরার মাধ্যমে হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ অলিন্দের সঙ্গে যুক্ত।

এটা স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে, কোন কারণে পোর্ট্যাল শিরার উপর চাপ সৃষ্টি হলেই এই চাপ ইন্টারন্যাল ভেনাস প্লেক্সাসে সঞ্চালিত হয়, ফলে শিরাগুলি ফুলে ওঠে এবং মলদ্বারের বাইরে বেরিয়ে আসতে চায়। এই শিরা কুণ্ডলীকে ঘিরে থাকে সংযোজক তন্তু। উর্ধ্ব হেমোরয়েড শিরারও একটি শাখা এই কুণ্ডলীর সঙ্গে যুক্ত থাকে। এই সমস্ত অংশগুলি মিলে একটি পিণ্ডের সৃষ্টি হয়। একেই বলা হয় অর্শ। এই পিণ্ড মিউকাস মেম্ব্রেনের দ্বারা আবৃত থাকে। মলদ্বারের বাইরে বেরিয়ে এলে অর্শকে বলা হয় বলি (পাইল্‌স্)। এই বলি দু-ভাবে সৃষ্টি হয়ে থাকে। ইন্টারন্যাল ভেনাস প্লেক্সাস পোর্ট্যাল শিরার মাধ্যমে কোন চাপ পেলে ফুলে ওঠে। এর ফলে যে বলির সৃষ্টি হয়, তাকে বলা হয় অন্তর্বলি। আবার নিম্ন হেমোরয়েড শিরার প্লেক্সাস কোন চাপের ফলে ফেটে গেলে রক্ত জমাট বেঁধে একটি রক্তপিণ্ড তৈরি করে। একে বলা হয় বহির্বলি।

প্রথম অবস্থায় এই রোগে মলদ্বার দিয়ে রক্তপাত সুরু হয়। পরবর্তী অবস্থায় পিণ্ডাকৃতি বস্তুর উপস্থিতি অনুভূত হয় এবং মলত্যাগের সময় অস্বাভাবিক যন্ত্রণা এবং তার সঙ্গে শ্লেষ্মাজাতীয় পদার্থ ও রক্তক্ষরণ হয়। বলির মধ্যে রক্ত জমাট বেঁধে মলনালীতে একটানা চার-পাঁচ দিন পর্যন্তও যন্ত্রণা হয়ে থাকে। মলত্যাগও বন্ধ হয়ে যায়। একে বলা হয় হেমাটোমা।

অর্শরোগ যখন মারাত্মক হয়, তখন মলত্যাগের সময় ছাড়া অন্য সময়েও রক্তক্ষরণ হতে থাকে। এর ফলে রোগীর শরীর রক্তহীন হয়ে পড়ে। মলত্যাগের সময় রোগী খুবই কষ্ট পায় এবং আতঙ্কের মধ্যে মলত্যাগ করে।

শ্যামসুন্দর দে*

* ইনস্টিটিউট অব রেডিও-ফিজিক্স অ্যাণ্ড ইলেকট্রনিক্স ; বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা-9

উত্তর

(পারদর্শিতার পরীক্ষা)

1. (ক) বোরন

[অন্য সব কটি মৌল নিষ্ক্রিয় গ্যাস অবস্থায় থাকে।]

(খ) প্ল্যাটিনাম

[অন্য মৌলগুলি হলো ক্ষার ধাতু (Alkali metal)।]

2. অক্সিজেন

[ভূত্বকের গঠনে অক্সিজেনের পরিমাণ শতকরা প্রায় 47 ভাগ। দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে আছে সিলিকন—এর পরিমাণ শতকরা প্রায় 28 ভাগ।]

3. (ক) দ

[পারদ, দস্তা]

(খ) পা

[রূপা, পারদ]

4. 5 লিটার

[নিম্নলিখিত বিক্রিয়া অনুযায়ী কার্বন মনোক্সাইড গ্যাস জারিত হয়—

$$2\,CO + O_2 = 2\,CO_2$$
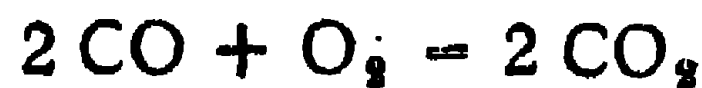
সুতরাং বোঝা যাচ্ছে যে, 2 ভাগ কার্বন মনোক্সাইডের জন্যে 1 ভাগ অক্সিজেনের প্রয়োজন। তাহলে 10 লিটার কার্বন মনোক্সাইডের জন্যে প্রয়োজন 5 লিটার অক্সিজেনের।]

5. $6 \times 6{\cdot}02 \times 10^{23}$

[এক মোল NH_4Cl-এ অণুর সংখ্যা হচ্ছে $6{\cdot}02 \times 10^{23}$ (অ্যাভোগেড্রোর সংখ্যা)। যেহেতু এক-একটি NH_4Cl অণুতে 6টা পরমাণু আছে, এক মোল NH_4Cl-এ পরমাণুর সংখ্যা হলো $6 \times 6{\cdot}02 \times 10^{23}$।]

বিবিধ

কৃত্রিম কর্ণিয়া সংযোজন

নয়া দিল্লী থেকে সংবাদ সরবরাহ সংস্থা পি. টি. আই. ও ইউ. এন. আই. জানাচ্ছেন—এশিয়ার মধ্যে ভারতবর্ষই সকলের আগে কৃত্রিম কর্ণিয়া তৈরি করতে পেরেছে। প্লাস্টিকের তৈরি এই কৃত্রিম কর্ণিয়া 24শে এপ্রিল সকালে দিল্লীর দৃষ্টিহীন যুবক হীরালালের (25 বছর বয়স্ক) চক্ষুকোটরে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে।

দিল্লীর ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ চক্ষুরোগ গবেষণা কেন্দ্রে ডাঃ মদনমোহনের নেতৃত্বাধীনে একদল গবেষক পাঁচ বছর ধরে জীবজন্তুর উপর পরীক্ষা চালিয়ে অবশেষে মানুষের উপর এটা প্রয়োগ করতে সাহসী হলেন।

মঙ্গলগ্রহ অভিমুখে রুশ মহাকাশ ষ্টেশন প্রেরিত

সোভিয়েট রাশিয়া 19. 5. 71 তারিখে রাত 9টা 53 মিনিটে মঙ্গলগ্রহাভিমুখী একটি স্বয়ংক্রিয় মহাকাশ ষ্টেশন উৎক্ষেপণ করেছে বলে 20. 5. 71 তারিখে সরকারীভাবে ঘোষণা করা হয়।

এটির নাম মার্স-2। সোভিয়েট সরকারী সংবাদ সংস্থা টাস জানিয়েছে যে, এটি একটি আন্তর্গ্রহ মহাকাশ ষ্টেশন। মার্স-2 আগামী নভেম্বরে মঙ্গলগ্রহে পৌঁছুবে।

সৌরমণ্ডলের বিভিন্ন গ্রহ এবং মহাকাশ সম্পর্কে গবেষণার যে পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছে, সেই অনুসারেই এই স্বয়ংক্রিয় মহাকাশ ষ্টেশনটি পাঠানো হলো।

মস্কো বেতারে বলা হয় যে, মার্স-2-এর ওজন চার টনেরও বেশী। মঙ্গলগ্রহে পৌঁছুতে মার্স-2-কে সাতচল্লিশ কোটি কিলোমিটার পথ অতিক্রম করতে হবে।

রাশিয়া বিগত 1962 সালের নভেম্বরে মঙ্গল-গ্রহাভিমুখে মার্স-1 স্বয়ংক্রিয় ষ্টেশনটি ছেড়েছিল, কিন্তু মঙ্গলগ্রহে পৌঁছুবার এক মাস আগে 1963 সালের মে মাসে মার্স-1-এর সঙ্গে রুশ কেন্দ্রের বেতার যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে যায়।

মার্স 2 পূর্বের মার্স-1 থেকে আকারে অনেকটা বড়। গত নয় বছরে সোভিয়েট রাশিয়া মহাকাশ বিজ্ঞানে কতটা উন্নত হয়েছে, এথেকে তা বোঝা যায়। মার্স-1-এর ওজন ছিল 893.5 কিলোগ্রাম।

টাস বলেছে, পৃথিবীর কক্ষপথে স্থাপিত একটি কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে মার্স-2-কে ছাড়া হয়েছে।

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

চতুর্বিংশ বর্ষ | জুলাই, 1971 | সপ্তম সংখ্যা

[সম্প্রতি আমাদের দেশে কনজাংক্টিভাইটিস (চোখ-ওঠা) রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে। এই রোগের কারণ, উপসর্গ ও প্রতিকার প্রভৃতি বিষয়ে জনসাধারণের মনে নানা রকম প্রশ্ন রয়েছে। বর্তমান প্রবন্ধে ঐ সব বিষয় সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসক। প্রঃ সঃ]

কনজাংক্টিভাইটিস

হেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

সম্প্রতি কলিকাতা শহরে কনজাংক্টিভাইটিস রোগটি ব্যাপক আকারে দেখা দিয়েছে। সাধারণতঃ যাকে আমরা চোখে ঠাণ্ডা লাগা বা চোখ-ওঠা বলে থাকি, তারই ডাক্তারী নাম কনজাংক্টিভাইটিস (Conjunctivitis)।

চোখ-ওঠা রোগটি প্রাচীন কাল থেকেই আছে এবং পৃথিবীব্যাপী এর প্রসার। সারা বছর ধরেই বিক্ষিপ্তভাবে এই রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। কিন্তু চোখ-ওঠা ব্যাপকভাবে মহামারী-রূপে কোথাও দেখা দেওয়া, বিশেষ করে কলকাতা

শহরে, পূর্বে কখনো ঘটেছে বলে শোনা যায় নি। তাছাড়া মহামারীরূপে যে সব রোগ মাঝে মাঝে দেখা যায়, সে তালিকার মধ্যেও চোখ-ওঠা রোগের নাম কোন দিন স্থান পায় নি। এবারে মহামারীরূপে দেখা দেওয়াটাই এর প্রধান বৈশিষ্ট্য। হঠাৎ কয়েক দিনের মধ্যে শহর ও শহরতলীর লক্ষ লক্ষ লোক এই রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়লো। অফিস, আদালত, রাস্তা প্রভৃতি সর্বত্রই দেখা যায় চোখ লাল অথবা কালো চশমায় চোখ ঢাকা। শহরবাসীর মুখে মুখে এই রোগের কারণ, প্রতিষেধন ও নিরাময়ের ঔষধ প্রভৃতি নিয়ে নানা জল্পনা-কল্পনা এবং তর্কবিতর্ক প্রবল হয়ে উঠলো।

সাংবাদিকদের মতে, এই রোগটা নাকি মধ্য প্রাচ্য থেকে বোম্বাই এবং বোম্বাই থেকে কলকাতায় এসে উপস্থিত হয়েছে। রোগটি যে প্রবলভাবে সংক্রামক সে বিষয়ে দ্বিমত নেই।

চোখ-ওঠা বা কনজাংক্টিভাইটিস হলো কনজাংক্টিভার (Conjunctiva) জীবাণুঘটিত প্রদাহ। অক্ষিগোলকের অচ্ছোদপটল (Cornea) ছাড়া যে সাদা অংশটুকু দেখা যায়, সেই অংশটুকু এবং চোখের পাতার অভ্যন্তর ভাগ একটি স্বচ্ছ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর দ্বারা আস্তরের মত আবৃত থাকে। এই শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর নাম কনজাংক্টিভা এবং এরই প্রদাহকে কনজাংক্টিভাইটিস বলে। এই রোগের প্রধান লক্ষণ হলো, চোখ হঠাৎ লাল হয়ে ওঠে এবং চোখ থেকে ক্রমাগত জল পড়তে থাকে। এই জন্যে আয়ুর্বেদে এই রোগের নাম 'নেত্রাভিষ্যন্দ' (অভিষ্যন্দ অর্থাৎ ক্ষরণ বা বারি-প্রবাহ)। চোখ লাল হয়ে ওঠবার কারণ—কনজাংক্টিভার অভ্যন্তরে যে সূক্ষ্ম শিরা আছে, সেগুলির ভিতর দিয়ে অত্যধিক রক্ত চলাচল সুরু হওয়া। শিরা-ধমনীর স্ফীতির জন্যে চোখ করকর করে, মনে হয় যেন চোখে কিছু পড়েছে। সময়ে সময়ে শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীই স্ফীত হয়ে ওঠে এবং কতকটা থলথলে মত দেখায়। এমন কি, শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর ভিতর দিকে রক্তস্রাব (Conjunctival hæmorrhage) পর্যন্ত হতে দেখা যায়। এই রক্তক্ষরণ দূরীভূত হতে বেশ সময় লাগে। তবে এতে ভয় পাবার কিছু নেই। এতে স্থায়ী কোন ক্ষতি হয় না। রোগের প্রাবল্য অনুসারে চোখ থেকে নিঃসৃত জল গাঢ়তর হয়ে ক্রমশঃ পুঁজের মত এবং আঠালো হয়ে ওঠে। এই অবস্থায় ঘুমাবার পর চোখের পাতা জুড়ে যায়। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে লক্ষণগুলি গুরুতর ও বিশেষ কষ্টদায়ক হতে দেখা গেছে। এমন কি, কোন কোন ক্ষেত্রে শারীরিক অসুস্থতা, গা ম্যাজম্যাজ করা, জ্বরভাব প্রভৃতি লক্ষণও দেখা যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে সারবার পর আবার লক্ষণগুলি ফিরে আসে। কোন কোন ব্যক্তি রোগ সারবার পর কিছুদিন পর্যন্ত চোখে ঝাপসা দেখেন।

নানাপ্রকার জীবাণুর দ্বারাই কনজাংক্টিভাইটিস রোগ উৎপন্ন হয়। কক্-উইক্স ব্যাসিলাস (Koch weeks' bacillus), কক্কাই জাতীয় জীবাণু (Cocci), ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস (Influenza virus) প্রভৃতির দ্বারাই সাধারণতঃ এই রোগের সৃষ্টি হয়। এবারের মহামারী চোখ-ওঠার প্রকৃত দোষী জীবাণু এখনো নিশ্চিতরূপে নির্ণীত হয় নি। আপাততঃ অনুমান করা হচ্ছে, যে কোন ভাইরাসই এই রোগের কারণ।

আক্রান্ত ব্যক্তির চোখ থেকে নিঃসৃত জল ও পিচুটির মধ্যে দোষী জীবাণু বা ভাইরাস যথেষ্ট পরিমাণে থাকে। এই জল বা পিচুটির মধ্যস্থিত জীবাণুগুলি হাওয়ায় সঞ্চালিত হয়ে অন্য কারোর চোখে বাসা বাঁধলে সে রোগাক্রান্ত হয়ে পড়তে পারে। সংক্রমণের এই পন্থাটির কথা মনে রাখলে রোগবিস্তার প্রতিরোধ করা সহজ হয়। রোগাক্রান্ত ব্যক্তি নিজের চোখে হাত দিয়ে (যা সে প্রায়ই করতে বাধ্য হয়) চোখের জল বা পিচুটি যেখানে-সেখানে মোছে বা

দূষিত হাত রাখে (টেবিল, চেয়ার, খবরের কাগজ, বই, চশমা ইত্যাদি) এবং অপর কেউ যদি অনবধানতাবশতঃ ঐ সব জায়গায় হাত দেবার পর নিজের চোখে সেই হাত লাগায় তবে তারও রোগাক্রান্ত হয়ে পড়বার সম্ভাবনা আছে। সে জন্যে আক্রান্ত ব্যক্তি যদি যখন-তখন চোখে হাত না দেয় এবং চোখের জলে ভেজা হাত যেখানে-সেখানে না মোছে, তাহলে রোগ বেশী ছড়াতে পারে না। কাজেই পরিষ্কার রুমাল বা ন্যাকড়া দিয়ে চোখ মুছে সেই ব্যবহৃত রুমাল বা ন্যাকড়া যেন নিরাপদ স্থানে ফেলে দেওয়া অথবা ভাল করে সাবান দিয়ে কেচে নেওয়া হয়—অবশ্য রুমাল বার বার বদ্‌লে ফেলা আরও ভাল।

যারা আক্রান্ত হয় নি, তাদেরও যথেষ্ট সাবধান হওয়া উচিত। যত দিন এই মহামারী চলতে থাকবে, ততদিন যখন-তখন কেউ যেন চোখে হাত না দেয়। যদি চোখে হাত দেবার প্রয়োজন হয়, তাহলে হাত ভাল করে ধুয়ে নেওয়া উচিত। এতদ্‌সত্ত্বেও হাওয়ায় সঞ্চালিত জীবাণু বা ভাইরাস সুস্থ চোখে বাসা বাঁধতে পারে। সেই জন্যে দিনে কয়েক বার করে পরিষ্কার জলের ঝাপ্‌টা দিয়ে চোখ ধুয়ে ফেলা নিরাপদ। সম্ভব হলে আই-ড্রপারে করে পরিস্রুত জল অথবা লবণ জল (Normal saline = 1 আউন্স জলে 1 চিমটি লবণ) দিয়ে ধুয়ে ফেললেও ভাল হয়। এক এক বারে দু-তিন ড্রপার ভর্তি জল দিয়ে ধুতে হবে। চোখ ধোয়ার জলে যেন কোন জীবাণুনাশক ঔষধ ব্যবহার না করা হয়। এই রোগের প্রসার প্রতিরোধ করতে হলে এই নিয়মগুলি প্রতিষেধক হিসাবে বিশেষ ফলপ্রদ। এছাড়া এই রোগের যে ঔষধ ব্যবহার করা হয়, সেই ঔষধগুলি দিনে একবার কি দু-বার করে প্রতিটি চোখে এক ফোঁটা করে দিলেও ফলপ্রদ হবে বলে অনুমান হয়।

এই রোগে নানাবিধ ঔষধ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। রৌপ্য ধাতুর নানা লবণ (Protargol, Argyrol), মার্কিউরোক্রোম, পেনিসিলিন, টেরামাইসিন, ক্লোর্যামফ্যানিকল, সালফাসেটামাইড প্রভৃতি ঔষধ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। শেষোক্ত ঔষধটি নিরাপদ এবং যথেষ্ট ফলপ্রদ। এই প্রসঙ্গে সতর্ক করে দেওয়া সঙ্গত মনে করি যে, এই ঔষধগুলি যেন আপন মতে কেউ ব্যবহার না করে, সর্বদাই চিকিৎসকের পরামর্শ লওয়া উচিত। আপাতদৃষ্টিতে রোগটি মারাত্মক মনে হলেও জনসাধারণ যেন অনর্থক উদ্বিগ্ন বা চিন্তিত না হন। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই এই রোগ সপ্তাহখানেকের মধ্যে নিরাময় হয়ে যায় এবং পরে কোন ক্ষয়-ক্ষতির লক্ষণ থাকে না।

নক্ষত্রের ব্যাস

গিরিজাচরণ ঘোষ

রাতের অন্ধকারে আকাশের দিকে তাকালে যে অসংখ্য নক্ষত্র আমাদের চোখে পড়ে সেগুলির প্রত্যেকটির ব্যাস কত, তা উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগেও সঠিকভাবে জানবার কোন উপায় ছিল না। অনুমান করা হতো, ঐ নক্ষত্রগুলির ব্যাস আমাদের সূর্যের ব্যাসেরই সমান। আমাদের সূর্যের ব্যাস হলো 139×10^5 কিলোমিটার বা 864200 মাইল। নক্ষত্রের ব্যাস পরিমাপের উপায় উদ্ভাবিত হবার পর দেখা গেল, আকাশে এমন অনেক নক্ষত্র রয়েছে, যাদের ব্যাস সূর্যের ব্যাসের চেয়ে বহুগুণ বড়। যেমন, বুটিস নক্ষত্রমণ্ডলীর অন্তর্গত স্বাতী নক্ষত্রের (Arclurus) ব্যাস হলো সূর্যের ব্যাসের সাতাশ গুণ, অর্থাৎ সাতাশটা সূর্য পাশাপাশি রাখলে স্বাতী নক্ষত্রের ব্যাস দাঁড়াবে। বৃষরাশির অন্তর্গত রোহিণী নক্ষত্রের (Aldebaran) ব্যাস হলো সূর্যের ব্যাসের আটত্রিশ গুণ। কালপুরুষ নক্ষত্রমণ্ডলীর অন্তর্গত আর্দ্রা নক্ষত্রের (Betelgeuse) ব্যাস হলো সূর্যের ব্যাসের দু-শ' দশ গুণ। আর বৃশ্চিক রাশির অন্তর্গত জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রের (Antares) ব্যাস হলো সূর্যের ব্যাসের সাড়ে চার-শ' গুণ অর্থাৎ এই নক্ষত্র পৃথিবীর কক্ষপথ সমেত আমাদের সূর্যকে অনায়াসে ঘিরে ফেলতে পারে।

নক্ষত্রের ব্যাস পরিমাপের পদ্ধতির কথা বিজ্ঞানী ফিজু (F.zeau) প্রথম জানান 1868 খৃষ্টাব্দে। পরে 1874 খৃষ্টাব্দে ষ্টিফান (Stephan) ফিজুর উদ্ভাবিত পদ্ধতিতে নক্ষত্রের ব্যাস পরিমাপের চেষ্টা করেন। কিন্তু তখন নভো-দূরবীক্ষণ যন্ত্রের অভিলক্ষ্যের (Objective) পরিসর বেশী না থাকায় ষ্টিফান ঐ কাজে সাফল্য অর্জন করতে পারেন নি। 1890 খৃষ্টাব্দে মাইকেলসন (Michelson) এই পদ্ধতিতে বৃহস্পতির উপগ্রহগুলির ব্যাস পরিমাপ করেন। পরে নভো-দূরবীক্ষণ যন্ত্রের উৎকর্ষ বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে নক্ষত্রের ব্যাস পরিমাপ করা সম্ভব হয়। তবে নক্ষত্রের ব্যাস সঠিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব হয় বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে।

এখন ফিজু কর্তৃক উদ্ভাবিত নক্ষত্রের ব্যাস পরিমাপের পদ্ধতিটি কিরূপ, তা জানানো যেতে পারে। এই পদ্ধতিতে নভো-দূরবীক্ষণ যন্ত্রের অভিলক্ষ্যের সম্মুখে দ্বৈত চিড় (Double slit) ব্যবহার করে আলোর ব্যতিচারের (Interference) সাহায্যে নক্ষত্রগুলির ব্যাস পরিমাপ করা হয়। আলোর ব্যতিচার কাকে বলে, তা পূর্বে জানা প্রয়োজন। স্থির জলাশয়ে যদি একটা ঢিল ফেলা যায় তবে দেখা যাবে, ঐ জলে তরঙ্গ উঠছে। ভাল করে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, ঐ তরঙ্গের মধ্যে কোন অংশ জলের স্থির তলের কিছুটা উপরে রয়েছে এবং কোন অংশ স্থির তলের কিছুটা নীচে রয়েছে। তরঙ্গের যে অংশ স্থির তলের উপরে রয়েছে, তাকে বলা হয় তরঙ্গ-শীর্ষ (Crest) এবং যে অংশ স্থির তলের নীচে রয়েছে, তাকে বলা হয় তরঙ্গ-পাদ (Trough)। তরঙ্গ-শীর্ষ এবং তরঙ্গ-পাদের উত্থান-পতনেই ঢেউ এগিয়ে চলে। পর পর দুটি তরঙ্গ-শীর্ষের দূরত্বকে তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য (Wave length) বলা হয়। এখন মনে করা যাক, কোন স্থির জলাশয়ে পাশাপাশি দুটি ঢিল ফেলা হলো। এই অবস্থায় নিক্ষেপিত দুটি ঢিল থেকেই তরঙ্গ উঠতে থাকবে। এখন লক্ষ্য করলে এমন কতকগুলি স্থান দেখা যাবে, যেখানে

একটির তরঙ্গ-শীর্ষ অপরটির তরঙ্গ-পাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে উত্থান-পতন রহিত অবস্থায় রয়ে গেছে। আবার এমন কতকগুলি স্থান দেখা যাবে, যেখানে একটির তরঙ্গ-শীর্ষ অপরটির তরঙ্গ-শীর্ষের উপর পড়েছে অথবা একটির তরঙ্গ পাদ অপরটির তরঙ্গ-পাদের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। এই অবস্থায় জলাশয়ের ঐ স্থানগুলির দ্বিগুণ উত্থান এবং দ্বিগুণ পতন পরিলক্ষিত হবে। একেই বলা হয় ব্যতিচার (Interference)। যেহেতু আলোও তরঙ্গের আকারে গমন করে, সেহেতু অনুরূপ দুটি বিন্দু আলোক-উৎস যদি পাশাপাশি রাখা যায়, তবে ওদের তরঙ্গের পারস্পরিক উপরিপাতের ফলে কোন কোন বিন্দু সম্পূর্ণ আলোকবিহীন অবস্থায় এবং কোন কোন বিন্দু দ্বিগুণ আলোকিত অবস্থায় দেখা যাবে অর্থাৎ উজ্জ্বল এবং অন্ধকার রেখার ঝালর (Fringe) সৃষ্টি হবে।

এবার ফিরে আসা যাক নক্ষত্রের ব্যাস পরিমাপের পদ্ধতিতে। মনে করা যাক, O হলো একটি নভো-দূরবীক্ষণ যন্ত্রের অভিলক্ষ্য (Objective), যার F হলো ফোকাস-তল (1নং চিত্র)। ঐ অভিলক্ষ্যের সম্মুখে D হলো একটি ঢাকনা, যার মধ্যে S_1 এবং S_2 হলো দুটি সমান্তরাল পরিবর্তনশীল সরু চিড় (Slit)। মনে করা যাক ঐ দূরবীক্ষণ যন্ত্রের অভিলক্ষ্যের সামনে বেশ খানিকটা দূরে একটা সোডিয়াম আলোক-উৎস রাখা হলো। একটা সরু চিড় A দিয়ে ঐ আলো গিয়ে পড়লো D ঢাকনার S_1 এবং S_2 চিড়-এ। এখানে S_1 এবং S_2 দুটি অনুরূপ আলোক-উৎস (Coherent sources) হিসেবে কাজ করবে, ফলে দূরবীক্ষণের F ফোকাস-তলে ওদের ব্যতিচার পরিলক্ষিত হবে। যেহেতু Q হলো S_1 এবং S_2 থেকে সমান দূরবর্তী, সেহেতু উভয় আলোক-উৎস থেকে আগত তরঙ্গের তরঙ্গ-শীর্ষ (অথবা তরঙ্গ-পাদ) ঐ Q বিন্দুতে মিলিত হবে এবং ঐ স্থানে একটি উজ্জ্বল আলোক-রেখার সৃষ্টি হবে। যদি Q-এর পার্শ্ববর্তী R এবং P স্থানে S_1 এবং S_2 উৎস দুটি থেকে আগত তরঙ্গদ্বয়ের একটির তরঙ্গ-শীর্ষ অপরটির তরঙ্গ-পাদের সঙ্গে মিলিত হয়, তবে ঐ R এবং P স্থান দুটিতে অন্ধকার রেখার সৃষ্টি হবে। এইভাবে F ফোকাস-তলে পর পর উজ্জ্বল এবং অন্ধকার রেখা সমন্বিত ঝালর দেখা যাবে। এখন মনে করা যাক, আলোক-উৎসের চিড়টি A স্থানে না রেখে B স্থানে স্থাপন করা হলো। এই অবস্থায় দূরবীক্ষণ যন্ত্রের F ফোকাস-তলে উজ্জ্বল রেখাটি Q স্থানের পরিবর্তে R স্থানে সৃষ্টি হবে এবং Q স্থানে সৃষ্টি হবে অন্ধকার রেখাটি। এবার মনে করা যাক, A এবং B উভয় স্থানেই আলোক-উৎসের দুটি চিড় রাখা হলো। এখন F ফোকাস-তলে একটি উৎসের জন্যে যেখানে অন্ধকার রেখা সৃষ্টি হবে, অপর উৎসের জন্যে সেখানে সৃষ্টি হবে উজ্জ্বল রেখা। ফলে F ফোকাস-তলে আর ঝালর দেখা যাবে

1নং চিত্র

না। ঐ ফোকাস-তল তখন সমভাবে আলোকিত অবস্থায় দেখা যাবে।

যদি AB দূরত্বটুকু অভিলক্ষ্যের O বিন্দুতে ϕ কোণ সৃষ্টি করে, তবে সাধারণ জ্যামিতির সাহায্যে প্রমাণ করা যাবে $\phi = \frac{\lambda}{2a}$, যেখানে λ হলো আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য এবং a হলো S_1 এবং S_2 চিড় দুটির দূরত্ব।

এখন একটা পরীক্ষা করা যেতে পারে। S_1 এবং S_2 চিড় দুটির দূরত্ব (অর্থাৎ a) স্থির রেখে আলোক-উৎসের চিড়টি A থেকে B এর দিকে ধীরে ধীরে প্রসারিত করা হতে লাগলো। এই অবস্থায় ঐ চিড়টিকে অসংখ্য চিড়ের সমষ্টি বলে গণ্য করা হবে। ফলে প্রতিটি চিড়-এর জন্যে F ফোকাস-তলে পাশাপাশি অসংখ্য ঝালর সৃষ্টি হতে থাকবে, অর্থাৎ F ফোকাস-তলের ঝালর অস্পষ্ট হতে থাকবে। উৎসের চিড়টি যখন A থেকে B পর্যন্ত সম্পূর্ণ প্রসারিত হবে, তখন ফোকাস-তলের ঝালর সম্পূর্ণ অদৃশ্য হবে। তবে মনে রাখতে হবে, এক্ষেত্রে AB-এর দূরত্ব খুবই সামান্য।

এবার মনে করা যাক, আলোক-উৎসের ফাঁক AB স্থির রাখা হলো, অর্থাৎ ϕ এর মান নির্দিষ্ট রইলো। উপরের সমীকরণ থেকে দেখা যাচ্ছে, ϕ-এর মান a-এর মানের উপর নির্ভরশীল। ϕ-এর মান কম হলে a-এর মান বাড়াতে হবে। সুতরাং ϕ-এর মান নির্দিষ্ট থাকলে a-র মান অর্থাৎ S_1 এবং S_2 চিড় দুটির দূরত্ব হ্রাস-বৃদ্ধি করে F ফোকাস-তলের ঝালর সম্পূর্ণ অদৃশ্য করা যায়। তবে মনে রাখতে হবে, ϕ-এর মান $\frac{3\lambda}{2a}$, $\frac{5\lambda}{2a}$,......ইত্যাদির জন্যেও ঝালর সম্পূর্ণ অদৃশ্য হবে। কাজেই a-র যে সর্বনিম্ন মানের জন্যে ঐ ঝালর অদৃশ্য হবে, তাই গ্রহণ করতে হবে। আর একটি কথা, AB উৎসটি যদি চিড়-এর পরিবর্তে একটি বৃত্তাকার আলোক-উৎস হয়, তবে বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, ঐ বৃত্তের কৌণিক ব্যাস $\phi = 1{\cdot}22\frac{\lambda}{a}$ হবে।

2নং চিত্র

এখন AB-কে যদি দুরবর্তী কোন নক্ষত্রের ব্যাস হিসেবে ধরা হয়, তবে তার কৌণিক ব্যাস ϕ-এর মান উপরিউক্ত সমীকরণের সাহায্যে নির্ণয় করা যাবে। যদি ঐ নক্ষত্রের দূরত্ব D জানা থাকে তবে ঐ নক্ষত্রের রৈখিক ব্যাস $d=D\phi$ হবে।

সাধারণতঃ স্থির নক্ষত্রগুলির কৌণিক ব্যাস 0·01 সেকেণ্ড কোণের মাপকাঠি অনুসারে পাওয়া যায়। ফলে দূরবীক্ষণ যন্ত্রের অভিলক্ষ্যের পরিসর বেশী হওয়া একান্ত প্রয়োজন। পরিসর বেশী করার উদ্দেশ্য মাইকেলসন উপরিউক্ত পদ্ধতির কিছুটা পরিবর্তন (Modification) করেন। তিনি তাঁর পরিবর্তিত পদ্ধতিতে চারটি দর্পণ M_1, M_2, M_3 এবং M_4 একটি ফ্রেমের উপর স্থাপন করেন (2নং চিত্র) এবং তার সঙ্গে যুক্ত করেন একটি দূরবীক্ষণ যন্ত্র। দূরবর্তী নক্ষত্র থেকে আগত আলো M_1 এবং M_4 দর্পণে প্রথমে আপতিত হয়, পরে সেগুলি M_2 এবং M_3 দর্পণে প্রতিফলিত হয়ে দূরবীক্ষণের অভিনেত্রে (Eye-piece) গিয়ে পড়ে। M_1 এবং M_4 দর্পণ দুটির পারস্পরিক দূরত্ব ইচ্ছামত পরিবর্তন করা যায়। যদি উক্ত দর্পণ দুটির দূরত্ব হয় e, তবে নক্ষত্রের কৌণিক ব্যাস $\phi=1.22\frac{\lambda}{e}$ রেডিয়ান।

মাইকেলসন কালপুরুষ নক্ষত্রমণ্ডলীর অন্তর্গত আর্দ্রা নক্ষত্রের ব্যাস পরিমাপের সময় $e=121''$ দেখলেন। যদি $\lambda=5750$ A. U. হয়, তবে আর্দ্রার কৌণিক ব্যাস $\phi=0.047''$।

শুধু আর্দ্রা নয়, পরে এই পদ্ধতিতে বহু নক্ষত্রের ব্যাস পরিমাপ করা সম্ভব হয়েছে। নক্ষত্রের ব্যাস পরিমাপের আর একটি পদ্ধতি চালু আছে। নক্ষত্রের বর্ণালী থেকে তার তাপের পরিমাণ জানা যায়। তার ফলে নক্ষত্রের এক বর্গ সেন্টিমিটার থেকে বিচ্ছুরিত দীপ্তির পরিমাণ নির্ণয় করা যায়। এই অবস্থায় যদি ঐ নক্ষত্রের দূরত্ব এবং দৃষ্টিগত ঔজ্জ্বল্য জানা থাকে, তবে ঐ নক্ষত্রের উপরিতলের বিকিরণের পরিমাণ নির্ণয় করে ঐ নক্ষত্রের উপরিতলের ক্ষেত্রফল পরিমাপ করা যায় এবং তা থেকে নির্ণয় করা হয় নক্ষত্রের ব্যাস।

কীটনাশক মাটি

প্রশান্ত মৈত্র*

সৃষ্টির আদি থেকে আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে ধূলা, বালি, মাটি, পাথর, কার্বন ইত্যাদি উদ্ভিদ ও জীব জগতের অভ্যুদয়ে ও সভ্যতার ক্রম-বিকাশ সাধনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে আসছে। কীট-পতঙ্গের বিকাশের ক্ষেত্রে মাটির যে অবদান, কীট-পতঙ্গ ধ্বংসের ক্ষেত্রে বিপরীত কি গুণ সে অর্জন করতে পারে, তাই আজ আমাদের বিচার্য। তার আগে সংক্ষেপে বলি মাটি (Clay) কি?

পার্থিব পদার্থ দুটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত—জৈব ও অজৈব। প্রাণী, উদ্ভিদ ইত্যাদি জৈব পদার্থের দ্বারা গঠিত। পাহাড়-পর্বত, পাথর, বালি ইত্যাদি অজৈব গোষ্ঠীভুক্ত। পাহাড়, পাথর ইত্যাদির অন্তর্গত অ্যালুমিনিয়াম ও সিলিকন যৌগ জল-বায়ু ও আবহাওয়ার দ্বারা রাসায়নিক উপায়ে পরি-বর্তিত ও বিশ্লেষিত হয়ে এক নূতন যৌগিক পদার্থে পরিণত হয়, যাকে আমরা মাটি বলে জানি। মাটির বড় গুণ হলো—অল্প জল মিশ্রিত করলে নমনীয়তা আসা।

খনিজ পদার্থ, কার্বন বা অঙ্গার, ধূলা এবং মাটি—এই জাতীয় কয়েকটি পদার্থ রাসায়নিক সংযোগে কীটনাশকে পরিণত হয়। ময়দার পোকার (Trileolium castaneum) উপর পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, একমাত্র রাসায়নিক পদার্থমিশ্রিত মাটি ও কার্বনে কীটনাশক গুণাগুণ বেশী এবং অ্যাসিডমিশ্রিত চীনামাটি (Kaolin) এত ভাল ফল দেয় যে, ডি. ডি. টি-র সঙ্গে তুলনীয়।

বিভিন্ন জাতীয় মাটি, কার্বন ইত্যাদি নিয়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ চাপ, তাপ ও সময়ে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় হাইড্রোক্লোরিক বা সালফিউরিক অ্যাসিড মিশ্রিত করা হয়। তাতে মাটি বা ঐ পদার্থের অনেক গুণ লক্ষ্য করা যায়, যেমন কীট-নাশকতা, আর্দ্রতাশোষণ ইত্যাদি।

পরীক্ষাগারে কাচের আধারে 24 ঘন্টা ধরে শতকরা 60 ভাগ আর্দ্রতায় এবং 81° ফারেন হাইট তাপে কীটের (Insect pest) উপর এই জাতীয় মাটি বা পদার্থের পরীক্ষা করা হয়েছে। ফলাফলস্বরূপ মৃত্যুর শতকরা হিসাব বের করা হয়। নিম্নে কয়েকটি দেখান হলো।

কীটনাশক মাটি বা দ্রব্য	মৃত্যুর শতকরা হার
(1) বালি (Sand)	55
(2) কাঠের ছাই (Wood ash)	7
(3) গোবরের ছাই (Dung ash)	16
(4) তুষের ছাই (Paddy husk ash)	58
(5) নারকেল খোসার ছাই (Cocoanut shell carbon)	100
(6) অঙ্গার (Carbon)	100
(7) মাটি (Earth)	83

অ্যাসিডমিশ্রিত এই জাতীয় মাটিকে আমরা 'রূপান্তরিত মাটি' আখ্যা দিতে পারি। রূপান্তরিত মাটি বা ধূলা শস্যের সঙ্গে মিশিয়ে এবং উপ-যোগিতা দেখবার জন্যে বিশেষ করে এক ধরণের কীট-পতঙ্গ ধ্বংসকারী জীবাণুর (Bacllus thur-ingiensis) সঙ্গে মিশিয়ে প্রয়োগ করা হয়েছে এবং সংরক্ষণাগারের খাদ্যশস্যের বস্তায় প্রতি বর্গফুটে 250 গ্রাম করে ছিটিয়ে দেখা গেছে যে, 4 মাস পর্যন্ত কীট-পতঙ্গ (যেমন চালের পোকা,

*পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সংরক্ষণাগার সংস্থা, 45, গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-13

ময়দার পোকা, মথ) ঐ খাদ্যশস্য আক্রমণ করতে পারে না। বিভিন্ন তাপ ও আর্দ্রতায় কীট-পতঙ্গের উপর এই মাটির ফলাফল নিয়ে পরীক্ষা চলছে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান থেকে কাঁচা মাটি সংগ্রহ করে অ্যাসিড প্রক্রিয়ায় তাদের কীটনাশক হিসাবে গড়ে তোলা হয়েছে। সমস্ত ধরণের মাটির ভিতরে চীনামাটিজাতীয় মাটি এই কাজে সর্বাপেক্ষা ফলপ্রদ। আর্দ্রতা শোষণ, ব্লীচিং ক্ষমতাও এর অনেক বেশী।

কেন্দ্রীয় খাদ্য গবেষণাগারে (মহীশূর) এই জাতীয় এক ধরণের মাটিকে কীটনাশক হিসাবে তৈরি করবার প্রণালী বের করা হয়েছে। এখানে তার সংক্ষিপ্ত পরিকল্পনা দেয়া হলো।

মাটি পেষাইকরণ → সালফিউরিক অ্যাসিড যুক্তকরণ → পাথরের পাত্রে মিশ্রিতকরণ [6 ঘণ্টা ধরে প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে 3 পাউণ্ড চাপে] → ধৌতকরণ → রৌদ্রে শুষ্ককরণ → গরম বায়ুতে শুষ্ককরণ [3 ঘণ্টা ধরে 110° সেন্টিগ্রেড তাপে] → চূর্ণকরণ → তাপ প্রয়োগ।

এখন দেখা যাক রূপান্তরিত মাটি কীট-পতঙ্গের উপর কিভাবে কাজ করে। মাটিকে এইভাবে রাসায়নিকের দ্বারা রূপান্তরিত করলে তার আর্দ্রতা শোষণ করবার ক্ষমতা ভয়ানকভাবে বৃদ্ধি পায়। কীট-পতঙ্গ সংরক্ষণাগারের বস্তার উপর দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় তাদের বহিত্বকে (Cuticle) এই মাটি লেগে বহিত্বকের তৈলাক্ত পদার্থ নষ্ট হয় এবং ধীরে ধীরে এই মাটি কীট-পতঙ্গের শারীরিক আর্দ্রতা (Moisture) শোষণ করে এবং শুষ্কতা-হেতু তাদের বিনাশ হয়। আবহাওয়ার আর্দ্রতা শোষণ করতে করতে অবশ্য কীটনাশকতার গুণ কিছু কমে গেলেও সম্পূর্ণ নষ্ট হয় না। এই প্রক্রিয়ায় রূপান্তরিত মাটি কীট-পতঙ্গ ধ্বংস করে বলে তারা স্ব স্ব প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তুলতে পারে না।

শারীরিক আর্দ্রতাহীনতার জন্যে ময়দার পোকার মৃত্যুর হার এখানে দেখানো হলো। দিনের আর্দ্রতা শতকরা 75 ভাগ ও তাপমাত্রা 78° ফারেনহাইট।

পরীক্ষাকালের সময় (Exposure)	ওজন হ্রাস (শতকরা হিসাব) শারীরিক (Weight loss)	মৃত্যুর হার (শতকরা হিসাব)
4 ঘণ্টা পরে	5·33	0·0
16 ঘণ্টা পরে	23·30	69·0
24 ঘণ্টা পরে	35·22	100·0

সংরক্ষণাগারের খাদ্যশস্যের বস্তায় রূপান্তরিত মাটি ছিটিয়ে দেখা গেছে যে, চালের পোকা, ময়দার পোকা ও খাপ্‌রার ক্ষেত্রে খুব ভাল ফল দেয়। Bacillus thuringiensis নামক জীবাণু মিশিয়ে এই মাটি প্রয়োগ করে দেখা গেছে যে, মথের আক্রমণ থেকে খাদ্যশস্য রক্ষা পায়। তাছাড়া, রবিশস্য, ঔষধ, কফি ইত্যাদির কীট-পতঙ্গের ক্ষেত্রেও এই মাটি ভাল ফল দেয়।

রূপান্তরিত মাটি কীট-পতঙ্গের আক্রমণ থেকে খাদ্যশস্যকে দীর্ঘদিন অক্ষত অবস্থায় রাখে এবং বিশেষ করে বীজ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে ভাল ফল দেয়। ফসল কেটে শুকিয়ে নেবার পর তাতে যদি এই মাটি প্রয়োগ করা হয়, তবে শস্য দীর্ঘ দিন ভাল থাকে।

রূপান্তরিত মাটি সংরক্ষণাগার ছাড়াও গৃহে ব্যবহার করা যায়। শস্যদানা ঝেড়ে চেলে পরিষ্কার করতে হবে, যাতে ধুলা, বালি, খড়-কুটা বা ধানের তুষ না থাকে। এইবার ওই মাটি শস্যে ঢেলে দিয়ে পাত্রটিকে ঝাঁকিয়ে ও নাড়া-চড়া করে শস্য দানার সঙ্গে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। শস্যের পরিমাণ বেশী হলে ঐ প্রক্রিয়ায় ভাগ ভাগ করে মেশাতে হবে। এই মাটি-মিশ্রিত শস্যদানা দীর্ঘদিন কীট-পতঙ্গের কবল থেকে রক্ষা পায়। তবে আটা ময়দাজাতীয় পেষাই করা খাদ্যে এই মাটি মেশানো চলবে না।

[প্রবন্ধটির জন্যে C.F.T.R.I, Mysore-এর নিকট কৃতজ্ঞ। লেখক]

শ্রবণোত্তর শব্দ

সন্তোষকুমার ঘোড়ই

বস্তুর কম্পনই শব্দ সৃষ্টির মূল কারণ। বস্তুর কম্পনজাত তরঙ্গ কানের পর্দায় আঘাত করলে শব্দ শ্রুতিগোচর হয়। তাই বলে সমস্ত কম্পনই শব্দের অনুভূতি জন্মায় না। কম্পনের দ্রুততা বা কম্পনাঙ্কের উপর তা নির্ভর করে। সেকেণ্ডে কম্পনের সংখ্যা কমপক্ষে 20 ও অনধিক প্রায় 20,000 হলে আমরা সাধারণতঃ শব্দ শুনতে পাই। কম্পনাঙ্কের এই সীমানাকে শ্রাব্যতা সীমা বলে। অবশ্য এই সীমা ব্যক্তিবিশেষে কিছুটা পরিবর্তিত হয়। সেকেণ্ডে 20,000-এর উপর কম্পন হলে তাকে আলট্রাসোনিক বা শ্রবণোত্তর কম্পন বলা হয়। শ্রবণোত্তর কম্পন যে তরঙ্গের সৃষ্টি করে, তাকে বলা হয় শ্রবণোত্তর তরঙ্গ। শ্রবণোত্তর কম্পন আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয়ের ক্ষেত্রে কোন অনুভূতি জন্মায় না, সুতরাং তা নীরব তরঙ্গই সৃষ্টি করে। সাধারণ ফড়িং বা ঝিঁঝি পোকার শব্দ শ্রাব্যতার উঁচু সীমানা—সেকেণ্ডে 20,000 কম্পনের কাছাকাছি থাকে অর্থাৎ সরব ও নীরব তরঙ্গের সীমানারেখায়। তাই দেখা যায় আমরা যে ফড়িঙের শব্দ শুনি, অনেকে বিশেষতঃ বয়স্ক ব্যক্তিরা সাধারণতঃ তা শুনতে পান না।

পরীক্ষায় দেখা গেছে কুকুর কম শ্রবণোত্তর কম্পনাঙ্কে সাড়া দিতে পারে, আবার অনেক পাখীর ডাকও 50,000 কম্পনাঙ্ক ছাড়িয়ে যায়। ফড়িং ও ঝিঁঝি পোকার পায়ে শ্রবণেন্দ্রিয় থাকে এবং তা দিয়ে তারা উচ্চ কম্পনাঙ্কের ধ্বনি শুনতে পায়। বাদুড় ডানা দিয়ে প্রায় 30,000 থেকে 50,000 কম্পনাঙ্কের তরঙ্গ সৃষ্টি করে এবং প্রতিবন্ধক থেকে এই তরঙ্গের প্রতিধ্বনির অনুভূতি লাভ করে সহজে পথ চিনে চলতে পারে। অনেক সামুদ্রিক মাছ ও কয়েক জাতীয় প্রাণীও শ্রবণোত্তর তরঙ্গ দিয়ে দূরের স্বজাতীয়দের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে। স্তন্যপায়ী কুব্জপৃষ্ঠ তিমি মাছও নাকি সেতারের তানের মত গান করে এবং এই শব্দের সঙ্গে শ্রবণোত্তর শব্দও মেশানো আছে। সমুদ্রের কোন কোন স্তরে এই শব্দ সহজে হাজার হাজার মাইল পথ অতিক্রম করে।

সাধারণ শব্দ-তরঙ্গের মত শ্রবণোত্তর তরঙ্গেরও বাহন হিসেবে বাস্তব মাধ্যম অপরিহার্য। প্রায় যে কোন স্থিতিস্থাপক বস্তুর দ্বারা শ্রবণোত্তর তরঙ্গ প্রবাহিত হতে পারে। কম্পনাঙ্ক বেশী বলে শ্রবণোত্তর তরঙ্গের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য খুব কম। সাধারণতঃ শ্রবণোত্তর কম্পনের উঁচু সীমায় তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য 10^{-4} সে. মি. অথচ শ্রুতিগোচর শব্দের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য প্রায় 30 সে. মি.। আজ পর্যন্ত পাওয়া সবচেয়ে বেশী শ্রবণোত্তর কম্পনাঙ্ক হলো সেকেণ্ডে 10^{11} কম্পন। শ্রবণোত্তর তরঙ্গের প্রবাহ মাধ্যমের সান্দ্রতা (Viscocity), তাপ পরিবাহিতাঙ্ক, নির্দিষ্ট আয়তনে আপেক্ষিক তাপ এবং দুই আপেক্ষিক তাপের অনুপাতের উপর নির্ভর করে। আবার শ্রুতিগোচর শব্দ-তরঙ্গের মত রুদ্ধতাপ অবস্থায় (Adiabatic condition) এই তরঙ্গ প্রবাহিত হয় এবং তা আলোর মত প্রতিফলিত, প্রতিসরিত, ব্যতিচারিত ও ব্যবর্তিত হয়। বিশোষণের (Absorption) ক্ষেত্রে শ্রবণোত্তর শব্দের আচরণ একটু ভিন্ন প্রকৃতির। নানান উপায়ে এই বিশোষণ পরিমাপ করা যায়। বিশোষিত শব্দশক্তি মাধ্যমের তাপমাত্রা বৃদ্ধি করে। বিশোষণের দ্বারা

কোন মাধ্যমের চলমান অবস্থার তাপীয় ও যান্ত্রিক ধর্মের খবরাখবর পাওয়া যায়।

শ্রবণোত্তর শব্দ স্থষ্টির উপায়

নানা উপায়ে এই শব্দ-তরঙ্গ স্থষ্টি করা যায়।

1. যান্ত্রিক উপায়ে কম্পন স্থষ্টি

যেহেতু শ্রুতিগোচর শব্দ ও শ্রবণোত্তর শব্দের মধ্যে পার্থক্য হলো শুধু কম্পনাঙ্কের, সুতরাং সুর স্থষ্টিকারী সুরশলাকা, বার্টমেন হুইসেল, গ্যালটন হুইসেল কিংবা কম্পমান কাচের বা ধাতুর দণ্ডও শ্রবণোত্তর কম্পান স্থষ্টি করতে পারে। সুরশলাকার কম্পন শলাকার দৈর্ঘ্যের বর্গের ব্যস্তানুপাতে পরিবর্তিত হয়। সুতরাং খুব কম দৈর্ঘ্যের অর্থাৎ প্রায় কয়েক মিলিমিটার দৈর্ঘ্যের সুরশলাকার দ্বারা শ্রবণোত্তর কম্পন স্থষ্টি করা যায়। চার্লস-ডারউইনের সম্পর্কিত এক ভাই গ্যালটনের তৈরি হুইসেল দিয়ে স্থষ্ট শব্দ শ্রাব্যতা সীমা ছাড়িয়ে যায়। এই হুইসেলটি 6 সে. মি. দৈর্ঘ্য ও ·5 সে. মি. ব্যাসার্ধবিশিষ্ট একটি পিতলের চোঙ বিশেষ (1নং চিত্র)।

2. বস্তুর চৌম্বক ধর্মীয় পরিবর্তনের দ্বারা কম্পন স্থষ্টি (Magnetostrictive oscillator)

যদি কোন অয়শ্চৌম্বক (Ferromagnetic) পদার্থের তৈরি দণ্ড চুম্বকত্ব পায়, তাহলে তার দৈর্ঘ্যের পরিবর্তন ঘটে। এই ঘটনাকে ম্যাগ্নেটোষ্ট্রিকশন (Magnetostriction) বলে। অন্য-ভাবে বলা যায়—যদি কোন চুম্বকত্বপ্রাপ্ত দণ্ডের দৈর্ঘ্যের পরিবর্তন করা যায়, তাহলে তার চুম্বকনের পরিমাত্রা পরিবর্তিত হবে। অয়শ্চৌম্বক পদার্থের এই দুটি ধর্মকে কাজে লাগিয়ে স্থিতিশীল শ্রবণোত্তর কম্পন স্থষ্টি করা হয়। বস্তুর আকৃতির পরিবর্তন নির্ভর করবে স্থায়ী চৌম্বকাবেশ রেখাগুচ্ছের ঘনত্ব (Mag. Flux density) এবং তার পরিবর্তনের উপর। [$\Delta L = K. B. dB$;] ΔL আকৃতির পরিবর্তন, B→ চৌম্বকাবেশ রেখাগুচ্ছের ঘনত্ব, ΔB — Bএর পরিবর্তন, K-ধ্রুবক। 2নং ছবিতে অয়শ্চৌম্বকের উপরিলিখিত ধর্মের ব্যবহার করে শ্রবণোত্তর তরঙ্গ স্থষ্টির একটি
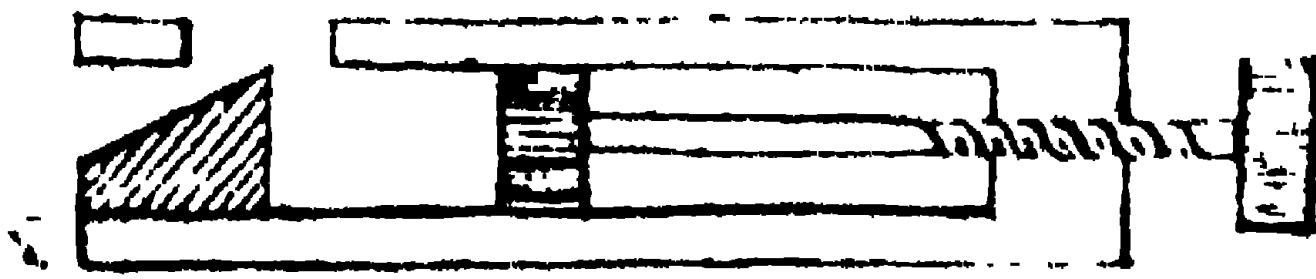
1নং চিত্র
গ্যালটন-হুইসেল

গ্যালটন হুইসেলে সজোরে ফুঁ দিয়েও পিষ্টন-টাকে সরিয়ে সরিয়ে প্রায় 30,000 কম্পনাঙ্ক-বিশিষ্ট শব্দ পাওয়া যায়। তবে এই সব পদ্ধতিতে স্থষ্ট কম্পন নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে আবদ্ধ। সুতরাং বাস্তব ক্ষেত্রে এই সব পদ্ধতির প্রয়োগ প্রায় অচল।

বর্তনী দেওয়া হলো। দণ্ডের অনুদৈর্ঘ্য কম্পন এখানে তরল মাধ্যমের দ্বারা প্রবাহিত হয়।

এই পদ্ধতিতে সেকেণ্ডে 15,000 থেকে 60,000 কম্পন স্থষ্টি করা সুবিধাজনক। এরও উপরে কম্পনাঙ্ক স্থষ্টি করতে হলে অন্য পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে।

3. পিজো ইলেকট্রিক ট্র্যান্সডিউসার (Piezo-Electric Transducer) পদ্ধতি

কোন শব্দায়মান বস্তু যান্ত্রিক শক্তিকে কম্পন-শক্তিতে রূপান্তরিত করে। যে প্রণালীতে এই রূপান্তর ঘটে, তাকে ট্র্যান্সডিউসার বলে। তাই এই পদ্ধতিকে চুম্বকীয় ট্র্যান্সডিউসার পদ্ধতি বলা যেতে পারে। প্রেরক ট্র্যান্সডিউসারগুলির উদ্দেশ্য হলো কম্পনময় পর্যাবৃত্ত গতির দ্বারা শ্রবণোত্তর কম্পন সৃষ্টি করা। যদি কোন কেলাসের উপর চাপ বা টান প্রয়োগ করা হয়, তাহলে কেলাসের তলগুলিতে তড়িৎ সৃষ্টি হয়। কিংবা যদি কেলাসের পরস্পর বিপরীত তলে কোন বিভব পার্থক্য প্রয়োগ করা যায়, তাহলে কেলাসের আকৃতির পরিবর্তন ঘটবে। এই ঘটনাকে পিজো-ইলেকট্রিক প্রক্রিয়া বলা হয়। দ্রুত দিক পরিবর্তনশীল তড়িৎক্ষেত্রে কেলাসের আকৃতি পর্যাবৃত্তভাবে পরিবর্তিত হবে; অর্থাৎ তড়িৎ অক্ষ বরাবর পর্যায়ক্রমে হ্রাস-বৃদ্ধি চলতে থাকবে, যা কম্পন সৃষ্টি করবে। সাধারণতঃ কোয়ার্ট্জ্ কেলাসই ব্যবহৃত হয়। শ্রবণোত্তর শব্দ-প্রবাহ সৃষ্টির জন্যে একটি পিজো-ইলেকট্রিক ট্র্যান্সডিউসারকে শ্রবণোত্তর কম্পনাঙ্কবিশিষ্ট ইলেকট্রনিক অসিলেটরের সাহায্যে পরিচালিত করা হয়। এই ট্র্যান্সডিউসারকে যখন মাধ্যম সংলগ্ন রাখা হয়, তখন মাধ্যমের মধ্য দিয়ে শ্রবণোত্তর শব্দ সাধারণতঃ অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গে প্রবাহিত হয়।

2নং চিত্র

শ্রবণোত্তর তরঙ্গমালাকে কোন একটি স্থানে ফোকাস করতে হলে একটি বক্রতলীয় কেলাস দরকার। এর জন্যে অবতল-কেলাস ব্যবহৃত হয়। তবে বিস্তৃত জায়গায় অনুসন্ধান চালাতে গেলে উত্তল-কেলাস দরকার, যেমন—বিশাল সমুদ্রের

ভিতর ডুবোজাহাজের অবস্থান জানবার জন্যে, যাকে বলা হয় সোনার (SONAR—Sound Navigation & Ranging)। পিজো-ইলেক্‌ট্রিক ধর্ম ব্যবহার করে শ্রবণোত্তর তরঙ্গ জানা ও মাপা যায়। এক্ষেত্রে কেলাসের উপর শব্দ-তরঙ্গ লম্বভাবে পড়লে পর একটি দিক পরিবর্তনশীল বিদ্যুৎচালক বলের সৃষ্টি হয় এবং তা পরিমাপ করেই শ্রবণোত্তর শব্দের গতি-প্রকৃতি জানা সম্ভব। একে বলা যায় গ্রাহক ট্র্যান্সডিউসার।

বাস্তব জীবনে শ্রবণোত্তর শব্দের প্রভাব ও প্রয়োগ

হিসাব করে দেখানো যায় যে, যদি কোন লোক অনর্গল এক-শ' পঞ্চাশ বছর কথা বলে চলে এবং তা থেকে যা শব্দশক্তি পাওয়া যায়, তা মাত্র এক কাপ জল ফুটাতে সক্ষম, অথচ জলের মধ্যে শ্রবণোত্তর তরঙ্গ পাঠিয়ে মাত্র পাঁচ মিনিটে একটি ডিম সিদ্ধ করা যায়। এ থেকেই শ্রবণোত্তর তরঙ্গের শক্তির পরিমাণ অনুমেয়। যত কম্পনাঙ্ক বাড়ে, ততই বিশোষণ বেশী হয় এবং তাপমাত্রাও বৃদ্ধি পায়। সাধারণতঃ দুই বিপরীত ধর্মী মাধ্যমের সংযোগস্থলে এই ঘটনা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়, যেমন—কোন তরল পদার্থের মধ্যে কঠিন জিনিস বা বুদ্‌বুদের উপস্থিতি। কোন তরল পদার্থের মাধ্যমে বেশী ক্ষমতাসম্পন্ন শ্রবণোত্তর তরঙ্গ পাঠালে তরলের মধ্যে বুদ্‌বুদ সৃষ্টি হতে পারে কিংবা সৃষ্ট বুদ্‌বুদ সজোরে বিনষ্ট হতে পারে।

যখন বেশী প্রাবল্যের শ্রবণোত্তর তরঙ্গ কোন তরল ও বাতাসের সংযোগ স্থলে গিয়ে ধাক্কা দেয়, তখন খানিকটা তরল পদার্থ ফিন্‌কি দিয়ে উপরে উঠে পড়ে এবং তা গুঁড়া গুঁড়া হয়ে কুয়াশার সৃষ্টি করে। কুয়াশার ঘনত্ব নির্ভর করবে তরলের পৃষ্ঠটান ও শ্রবণোত্তর তরঙ্গের ক্ষমতার উপর। শ্রবণোত্তর শব্দের সঙ্গে আলোর সংঘাত বিষয়ে রামন ও তাঁর সহকর্মীরা কিছু কাজ করেছেন। দেখা যায় যে, শ্রবণোত্তর তরঙ্গ কোন স্বচ্ছ তরল মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে চাপের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটায় এবং মাধ্যমটি তখন একটি আলো-প্রবেশ্য গ্রেটিং হিসেবে কাজ করে, যার উপরে আলো পড়ে অপবর্তিত হয়।

প্রযুক্তিবিদ্যায় :—তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য খুব কম হওয়ার জন্যে কোন নির্দিষ্ট দিকে শ্রবণোত্তর শব্দ চালনা করা যায় এবং কোন বস্তু থেকে তার প্রতিফলন বা প্রতিসরণ দিয়ে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে বস্তুর অবস্থান প্রভৃতি বিষয় জানা হয়। এজন্যে গ্রাহক ও প্রেরক—উভয় যন্ত্র প্রয়োজন। এই পদ্ধতিতে ডুবোজাহাজে করে সারা সমুদ্রতলদেশের একটা সম্পূর্ণ মানচিত্র তৈরি করা সম্ভব; মাছের ঝাঁক, নিমজ্জিত পাহাড়, ধ্বংসপ্রাপ্ত জাহাজ বা যুদ্ধকালীন শত্রুপক্ষের ডুবোজাহাজের অবস্থানও জানা যায়। মাছের পেটের বায়ু-থলি থেকে শ্রবণোত্তর তরঙ্গের প্রতিফলন মাছের ঝাঁকের অবস্থান জানিয়ে দেয়। যুক্তরাজ্যে জেলেদের মাছধরা জাহাজে এখন এই পদ্ধতি গ্রহণ করা হচ্ছে।

কোন ধাতুতে বা রবার-টায়ারে কোন ফাটল বা ছিদ্র থাকলে তা সহজে শ্রবণোত্তর তরঙ্গ পাঠিয়ে জানা যায়। এই পরীক্ষায় বস্তুটির কোন ক্ষতি হয় না। গ্রাহক ও প্রেরক ট্র্যান্সডিউসার দুটি পরীক্ষার জন্যে আনা বস্তুটির পরস্পর বিপরীত পার্শ্বে রাখা হয়। যদি কোন ত্রুটি বস্তুটির মধ্যে থাকে, তাহলে গ্রাহক যন্ত্রে স্পন্দন কম হবে, কারণ ত্রুটিপূর্ণ জায়গাটি শ্রবণোত্তর তরঙ্গ-প্রবাহ আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে দেয়। এই পদ্ধতির দ্বারা চুলের মত সরু ফাটলও ধরা পড়ে, যা অন্য কোন উপায়ে পাওয়া দুষ্কর। বিমানের পাখা, বাষ্পাধার, দ্রুতচালিত গ্যাস টারবাইন প্রভৃতি অত্যাবশ্যক প্রধান জিনিষগুলি পরীক্ষার জন্যে এই পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়। একইভাবে ভূত্বকের কোথায় কি পদার্থ আছে, তা জানা যায়। অষ্ট্রেলিয়াতে

এই পদ্ধতি প্রয়োগ করে ম্যাকোয়ারী হ্রদের তলায় লক্ষ লক্ষ মণ কয়লার সন্ধান পাওয়া গেছে।

সমুদ্রে জলের নীচে তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গের দ্বারা বেতার যোগাযোগ সম্ভব নয়। এজন্যে 30,000 কম্পনাঙ্কের শ্রবণোত্তর তরঙ্গই বাহক-তরঙ্গের কাজ করে এবং বেতার যোগাযোগ রক্ষা করে।

সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি, যেমন—ঘড়ি, ছোট যন্ত্রের গিয়ার, বলপেনের মুখ, অপারেশন করবার যন্ত্রপাতি, দামী কারুকার্যখচিত গহনাপত্র প্রভৃতি বেশী ক্ষমতা-সম্পন্ন শ্রবণোত্তর তরঙ্গ দিয়ে ভালভাবে পরিষ্কার ও ধৌত করা হয়। কোন কঠিন পদার্থকে তৈলাক্ত পদার্থের বা অন্য কোন খারাপ পদার্থের পাত্‌লা আবরণ থেকে মুক্ত করা যায়। ধৌতকরণ সাধারণতঃ ক্যাভিটেশন (Cavitation) পদ্ধতিতে সংঘটিত হয়। ক্যাভিটেশন হলো শ্রবণোত্তর তরঙ্গ-প্রবাহের ফলে চাপের দ্রুত হ্রাস-বৃদ্ধির দরুণ কোন পদার্থের মধ্যে বুদ্‌বুদ বা ক্ষুদ্র গহ্বরের সৃষ্টি এবং তার সজোরে বিলুপ্তিসাধন। বুদ্‌বুদগুলির তীব্র সঙ্কোচন বা বিলুপ্তিসাধন সেখানকার তাপমাত্রাকে কয়েক-শ' ডিগ্রি এবং চাপকে কয়েক-শ' অ্যাট-মস্ফিয়ারে বাড়িয়ে দেয়। শ্রবণোত্তর তরঙ্গ-প্রবাহের দরুণ মাধ্যমের কণাগুলির বেশী ত্বরণপ্রাপ্তি হেতুও কিছুটা ঘটে থাকে। শ্রবণোত্তর তরঙ্গ দিয়ে তরল বা কঠিন মাধ্যমে লুকিয়ে থাকা গ্যাসকে দূর করা যায়। বর্তমান বিদেশে বহু লণ্ড্রিতে ময়লা জামাকাপড় পরিষ্কার করবার জন্যেও এই তরঙ্গ ব্যবহৃত হয়। শ্রবণোত্তর তরঙ্গ জামাকাপড়ের বিন্দুমাত্র ক্ষতিসাধন না করে জামাকাপড় থেকে তাড়াতাড়ি ধুলা ময়লা ধুয়ে-মুছে সাফ করে দেয়।

বেশী কম্পনাঙ্কের এই শব্দ দিয়ে বাতাসে বা তরলে ভাসমান কণাগুলিকে বিচ্ছুরিত বা জমাট বাঁধানো যায়। বিচ্ছুরণের দরুণ তেলে জলে মিশ খাওয়ানো যায়; কর্পূরকে (যা সাধারণ-ভাবে জলে দ্রবীভূত হয় না) জলে দ্রবীভূত করা যায়। ধোঁয়া ও কুয়াশার মধ্য দিয়ে শ্রবণোত্তর তরঙ্গ পাঠালে বাতাসে ভাসমান ঐ কণাগুলি জমাট বেঁধে বড় হয় এবং মাটিতে পড়ে যায়। ভাসমান কণাগুলির আকৃতি ও শব্দের কম্পনাঙ্কের উপর নির্ভর করবে—বিচ্ছুরণ হবে, না জমাট বাঁধবে। বড় বড় কলকারখানায় এই তরঙ্গ পাঠিয়ে চতু-ষ্পার্শ্বের বায়ুমণ্ডলকে ধূলি ও ধোঁয়ামুক্ত রাখা হয়।

সাধারণভাবে গরম করে ঝাল দেওয়ার সময় বস্তুটির উপর একটি অক্সাইড আবরণ তৈরি হয়, যা অনেক ক্ষেত্রে ঝাল গ্রহণে বাধা প্রদান করে। শ্রবণোত্তর তরঙ্গ দিয়ে ঝাল দিলে এই সমস্ত ঝামেলার সম্মুখীন হতে হয় না। কোন কাচের দণ্ড শ্রবণোত্তর কম্পনে কাঁপতে থাকলে তা লোহা বা কাচের মত শক্ত বস্তুর মধ্যে প্রবেশ করে ছিদ্রের সৃষ্টি করে।

নিশাকালীন দুষ্কৃতকারীদের হাত থেকে কোন বাড়ী বা সম্পত্তি রক্ষা করার ক্ষেত্রেও শ্রবণোত্তর তরঙ্গ ব্যবহৃত হয়। কোন দুষ্কৃতকারী সবার অজান্তে বাড়ী বা ঘেরা এলাকার মধ্যে প্রবেশ করে ভিতরের দিকে এগুতে থাকলে শ্রবণোত্তর তরঙ্গ তার দেহ থেকে প্রতিফলিত হয়ে নির্দিষ্ট একটি বর্তনী সম্পূর্ণ করে এবং তার ফলে সংলগ্ন ঘণ্টাটি বেজে উঠে' সবাইকে সজাগ করে দেয়। দুষ্কৃতকারী ভিতরের দিকে আসতে থাকলে ডপ্‌লারের নিয়ম অনুযায়ী প্রতিফলিত তরঙ্গের কম্পনাঙ্ক আপতিত নির্দিষ্ট কম্পনাঙ্ক থেকে আলাদা হয়, যার ফলে বর্তনী সংযোগ ঘটে ও ঘণ্টা বাজতে থাকে।

বর্তমানে নিউক্লীয় ও মৌলিক কণা সম্বন্ধীয় পদার্থবিজ্ঞার রাজ্যেও এর প্রয়োগবিধি উল্লেখ-যোগ্য। হিলিয়াম বুদ্‌বুদ প্রকোষ্ঠের (Helium Bubble Chamber) প্রয়োজনীয় প্রসারণ শ্রবণোত্তর তরঙ্গ দ্বারা সাধিত হচ্ছে।

রসায়নের ক্ষেত্রে—কেলাসীকরণের সময় গলিত ধাতুতে শ্রবণোত্তর তরঙ্গ পাঠিয়ে ছোট এবং

একই পরিমাণের কেলাস সৃষ্টি করা হয়। জটিল জৈব যৌগগুলিকে ভাঙা, রাসায়নিক বিক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করা, বস্তুর স্ফুটনাঙ্কের পরিবর্তন করা, দ্রুত জারণক্রিয়া ঘটানো প্রভৃতি রাসায়নিক পরিবর্তন শ্রবণোত্তর তরঙ্গের দ্বারা সংঘটিত হয়। রসায়নে অনেক ক্ষেত্রে এই তরঙ্গকে অনুঘটক হিসেবে কাজে লাগানো হয়, যেমন—স্টার্চের দ্রবণে বেশী ক্ষমতাসম্পন্ন তরঙ্গ পাঠালে কিছুক্ষণ পরে স্টার্চকণা ডেক্সট্রিন কণায় পরিবর্তিত হয়। অনেক রসায়নবিদের মতে জল শ্রবণোত্তর তরঙ্গের দ্বারা সহজে জারিত হয়ে হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড গঠন করে।

জীববিদ্যায়—শক্তিশালী শ্রবণোত্তর শব্দ-তরঙ্গ জীবদেহের লোহিত কণিকা নষ্ট করে দেয়। প্রোটোজোয়া ও কয়েক জাতীয় জীবাণুকে এই তরঙ্গ একেবারে মেরে ফেলে বা পঙ্গু করে দেয়। এই তরঙ্গ প্রয়োগে ঈষ্ট তার প্রজনন ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। তামাক গাছের সংক্রামক রোগ-জীবাণু (Tobacco Mosaic Virus) সম্পূর্ণ অক্ষম হয়ে পড়ে।

দুধ বিশুদ্ধিকরণের সময় এই তরঙ্গ পাঠালে কয়েক জাতীয় জীবাণু সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হয়ে যায়। সাধারণতঃ কলেরা, বসন্ত প্রভৃতির বীজাণুগুলিতে শ্রবণোত্তর তরঙ্গ পাঠিয়ে তাদের বেশ কিছুটা দুর্বল করে দিয়ে রোগ প্রতিষেধক বীজাণু তৈরি করা হয়, যা টিকা বা ইঞ্জেকশন প্রভৃতির দ্বারা আমাদের শরীরে ঢুকিয়ে ঐ সব রোগ প্রতি-রোধক ক্ষমতা বাড়ানো হয়। শ্রবণোত্তর তরঙ্গ পাঠিয়ে কোন বীজের অঙ্কুরোদ্গম সাময়িকভাবে বন্ধ করা যায়, কারণ এই তরঙ্গ পাঠালে বীজের কোষ-বিভাজন ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়।

চিকিৎসা-বিজ্ঞান—মানবদেহের উপর শ্রবণোত্তর তরঙ্গ প্রয়োগের প্রতিক্রিয়া হিসাবে দেহের তাপমাত্রা বেড়ে কৃত্রিম জ্বরের সৃষ্টি করে। এই প্রতিক্রিয়া কাজে লাগিয়ে কোন কোন অসুখে অসুস্থ জায়গায় এইভাবে তাপ প্রয়োগ করে তা সুস্থ করা হয়। দেহের কোন অংশের ব্যথা, বিশেষ করে বাতের বা গাঁটের ব্যথা দূর করা যায়।
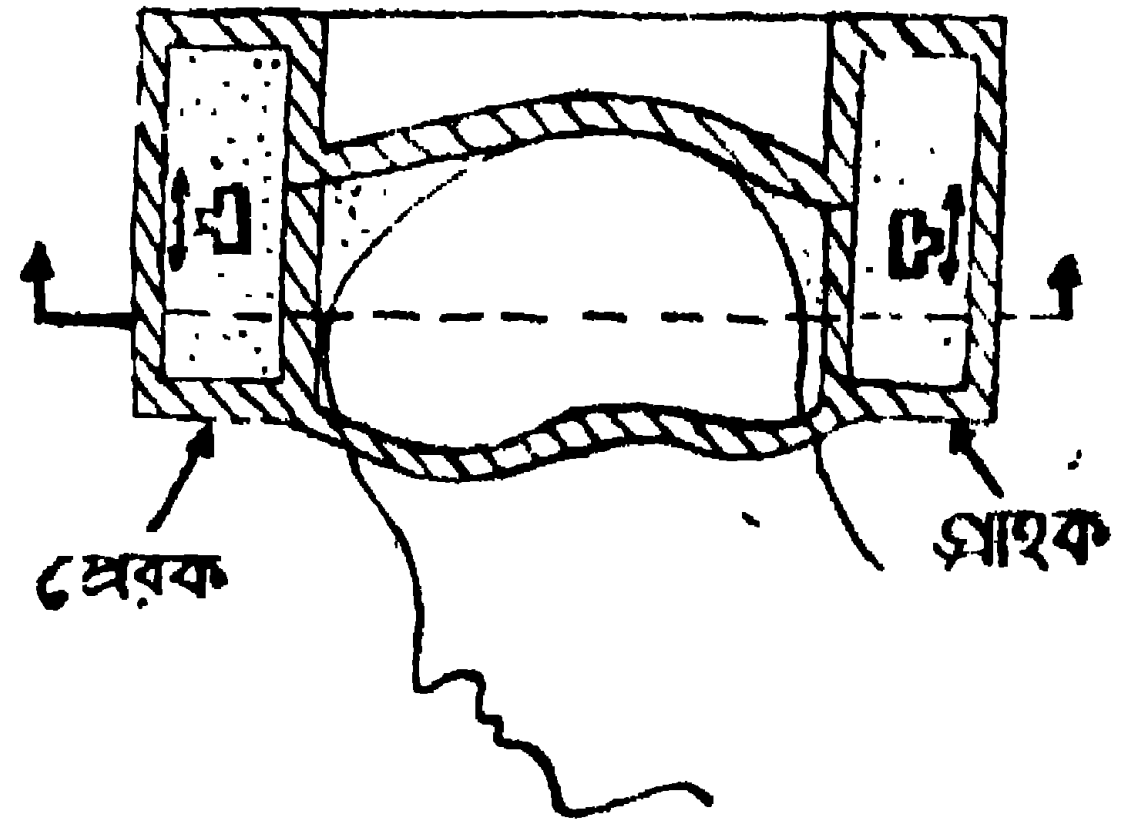
3নং চিত্র
শ্রবণোত্তর তরঙ্গের সাহায্যে মস্তিষ্ক পরীক্ষা

কোন নির্দিষ্ট টিস্যুকে শরীর থেকে বাদ দিতে হলে শ্রবণোত্তর তরঙ্গ ঐ স্থানে ফোকাস করে টিস্যুটিকে নষ্ট করে দেওয়া হয়। এরূপ চিকিৎসাকে অস্ত্রবিহীন শল্যচিকিৎসা বলা হয়। বর্তমানে স্নায়ু-চিকিৎসায়ও এর অবদান উল্লেখযোগ্য। বিশেষভাবে মস্তিষ্কের টিউমার বা শরীরের অভ্যন্তরে কোন অংশে ক্যান্সার বা ফোঁড়া, গলপাথর নির্ধারণের জন্যে এবং অন্ত্রের মিউকোসা (Mucosa) স্তরের ঘনত্ব পরিমাপের জন্যে শ্রবণোত্তর তরঙ্গ ব্যবহৃত হচ্ছে। ডিপ্থেরিয়া, যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগের জীবাণু এই তরঙ্গে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। হুপিং কাশির সিরামও শ্রবণোত্তর তরঙ্গ পাঠিয়ে তৈরি করা হয়।

বেশী শক্তিমাত্রার শ্রবণোত্তর তরঙ্গ গর্ভাশয়ে পাঠিয়ে ভ্রূণ নষ্ট কিংবা মহিলাদের ডিম্বাশয়ে বা পুরুষদের শুক্রাশয়ে পাঠিয়ে বন্ধ্যাত্ব আনয়ন করা যায়। এসব ক্ষেত্রে এই তরঙ্গ ঐ সমস্ত জায়-গার টিস্যুগুলিকে পুড়িয়ে নষ্ট করে দেয়। খুব বেশী শক্তিমাত্রার তরঙ্গ দিয়ে ক্রোমোজোমের মধ্যস্থিত জিনগুলির (যা জীবের কোন না কোন গুণ

বা দোষের জন্যে দায়ী) আভ্যন্তরীণ গঠনে কিছুটা পরিবর্তন ঘটানো যেতে পারে।

কম শক্তিমাত্রার শ্রবণোত্তর তরঙ্গ মহিলাদের গর্ভাবস্থা জানায় সহায়তা করে। গর্ভবতী মহিলাদের জরায়ুতে কম কম্পনাঙ্কের শ্রবণোত্তর তরঙ্গ পাঠানো হয়। জরায়ুর স্থিতিশীল স্থানগুলি থেকে প্রতিফলিত তরঙ্গ গতিশীল স্থানগুলি থেকে ভিন্ন হয়। সুতরাং ভ্রূণটি যদি দশ সপ্তাহের কিংবা তার বেশী হয়, তাহলে ভ্রূণটির গতিশীল হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া প্রতিফলিত শ্রবণোত্তর তরঙ্গের দ্বারা বোঝা যাবে। প্রতিফলিত শ্রবণোত্তর তরঙ্গের তীক্ষ্ণতা থেকে ভ্রূণের হৃৎস্পন্দন ভালভাবে বোঝা ও সঠিকভাবে গর্ভাবস্থা নির্ধারণ করা সম্ভব।

শ্রবণোত্তর শব্দের উপর গবেষণা এগিয়ে চলেছে। দিনের পর দিন নানা ক্ষেত্রে এর নিত্য নতুন ব্যবহার বেড়েই চলেছে। বর্তমান শিল্প-জগতে শ্রবণোত্তর শব্দ এক যুগান্তকারী বিপ্লব এনে দিয়েছে। উন্নত দেশগুলিতে শ্রবণোত্তর শব্দের যন্ত্রপাতি তৈরির জন্যে কারখানা স্থাপিত হয়েছে। আমাদের দেশেও কিছু কিছু কারখানায় শ্রবণোত্তর শব্দ দিয়ে খুঁৎ নির্ধারণ ও সূক্ষ্ম বস্তু পরিষ্কার করবার জন্যে যন্ত্রপাতি তৈরি হচ্ছে। পরিশেষে বলা যায়, ক্রমবর্ধমান উপযোগিতার জন্যে শ্রবণোত্তর শব্দ নিঃসন্দেহে একদিন ব্যবহারিক জীবনে একটা বিরাট স্থান অধিকার করবে।

চর্মরোগে আলোক-সংবেদনের ভূমিকা

সুধাংশুবল্লভ মণ্ডল ও অজিতকুমার দত্ত*

আলোক-সংবেদন (Photosensitisation) শব্দের আক্ষরিক অর্থ হলো আলোক-রশ্মির প্রতি সংবেদনশীলতা। নিদানিক চর্মরোগের ক্ষেত্রে কিন্তু এই শব্দের প্রয়োগ মোটেই অর্থবহ নয় বরং বিভ্রান্তিকর। কারণ এই সংজ্ঞার অপ-প্রয়োগের দ্বারা একটা শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়াকে চর্মে সৃষ্ট এক প্রকার রোগলক্ষণ বলে আখ্যা দেওয়া হয়; অর্থাৎ এর দ্বারা বোঝানো হয় আলোক-রশ্মির প্রভাবে ত্বকের অস্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া, যেখানে অ্যালার্জিঘটিত ব্যাপারগুলি সর্বাবস্থায় বর্তমান নাও থাকতে পারে। আরো বিশদভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, কিছু উদ্ভিদ ও ঔষধাদি আছে, যার মধ্যে এমন কোন বস্তু থাকে, যা ত্বকের কোষবিশেষকে হ্রস্ব-তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলোক-রশ্মির প্রতি অস্বাভাবিকভাবে সংবেদনশীল করে তোলে। আর এই সকল বস্তুর সংস্পর্শের ফলে সূর্য রশ্মির প্রতি ঊর্ধ্বত্বকের জীবকোষের যে অতি সংবেদনশীলতা দেখা দেয়, তারই পরিণতিতে ত্বকে উৎপন্ন হয় বিশেষ রোগ-লক্ষণ। চর্মরোগের ক্ষেত্রে এই রোগকেই বস্তুতঃ আলোক-সংবেদনশীল নামে অভিহিত করা হয়। প্রকৃতপক্ষে একে আলোক-সংবেদজ চর্মরোগ বলে চিহ্নিত করাই সমীচীন বলে মনে হয়।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, আকস্মিক ও কিছু মেয়াদী পর্যায়ভুক্ত Lupus Erythematosus রোগের ক্ষেত্রে সূর্যালোক সম্পাতের ফলে উদ্ভূত চর্মরোগের অস্বাভাবিক প্রাবল্য ঘটে, তাছাড়া আনুষঙ্গিক অন্যান্য ব্যাধির প্রকোপে সময়বিশেষে জীবনসংশয়ও হতে পারে। সে জন্যে Hydroa-vacciniforme, Xeroderma-pigmentosum

*কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর চর্মরোগ-বিজ্ঞান শাখা।

প্রভৃতি কোন কোন চর্মরোগের ক্ষেত্রে সূর্যালোক অথবা অতিবেগুনী আলোকসম্পাত সর্বতোভাবে পরিহার করা দরকার।

আবার এমন কিছু চর্মরোগ আছে, যেখানে চিকিৎসায় প্রত্যাশিত সুফলের আশায় ইচ্ছাকৃতভাবেই আলোক-সংবেদন প্রক্রিয়ার সাহায্য নেওয়া হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ Goeckerman-O' Leary কর্তৃক নির্দেশিত সোরিয়াসিস (Psoriasis) রোগের চিকিৎসা পদ্ধতির উল্লেখ করা যায়।

দুর্ভাগ্যবশতঃ এই সব বিষয়ে চিকিৎসকের যথাযথ জ্ঞানের অভাব অথবা ইচ্ছাকৃত উপেক্ষার জন্যে অনেক সময় সূর্যরশ্মি প্রয়োগের দ্বারা নানা রোগচিকিৎসার ক্ষেত্রে স্বভাবতঃই বিবিধ বিরূপ প্রতিক্রিয়া এমন কি মারাত্মক বিপর্যয় পর্যন্ত ঘটে।

মাত্র কিছু রোগলক্ষণের ভিত্তিতে চর্মরোগের ক্ষেত্রে আলোক-সংবেদন শব্দটি অসংলগ্নভাবে ব্যবহৃত হলেও আসলে এর পশ্চাতে অন্তর্নিহিত প্রকৃত শারীরবৃত্তীয় পরিবর্তন ও ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান খুবই সীমিত। যা হোক, বহু গবেষকের সাধনাপ্রসূত তথ্য এবং আধুনিক চিন্তাধারার পটভূমিকায় এই বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোকপাতের উদ্দেশ্যেই আলোচ্য প্রসঙ্গের অবতারণা করা হয়েছে।

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

আলোক-সম্পাতের ফলে যে সকল চর্মরোগ উৎপন্ন হয়, তা মুখ্যতঃ দ্বিবিধ প্রতিক্রিয়ার দ্বারা নিষ্পন্ন হয়। যেমন—(1) ফটোটক্সিক প্রতিক্রিয়া অথবা (2) ফটোঅ্যালার্জিক প্রতিক্রিয়া। প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে রাসায়নিক বা আলোক-সম্পাতের সূচনাতেই প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। এখানে দূষিত রাসায়নিকের কেন্দ্রীভবন ও আলোক-সম্পাতের স্থিতিকালই প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়। মাত্রাধিক সূর্যতাপের দহনের প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে এর বিশেষ সাদৃশ্য দেখা যায় এবং দেহের অনাবৃত অংশেই রোগলক্ষণ সীমিত থাকে। শেষোক্ত ক্ষেত্রে সংবেদন সৃষ্টির প্রাক্কালে দূষিত বস্তুর সংস্পর্শই প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এখানেও রোগলক্ষণের সঙ্গে সূর্যাতপে দহনের সাদৃশ্য থাকে। তা ছাড়াও আমবাত রূপে, স্থির রক্তাভ চিহ্নাকারে, আবের মত, প্রদাহ আকারে কিংবা স্ফোটকরূপেও রোগলক্ষণ আবির্ভূত হতে দেখা যায়। অনাবৃত ছাড়া আবৃত দেহাংশেও রোগলক্ষণ যথেষ্ট দেখা যায় এবং সেগুলি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘস্থায়ী হয়। শেষোক্ত প্রতিক্রিয়ার ব্যাপারে অতিবেগুনী রশ্মির ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

কারণতত্ত্ব অনুসন্ধান

জীবকোষের ভূমিকা ও লাইসোজোমের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য—কোষের অভ্যন্তরে প্রথম অন্থ-ঘটকের (Enzyme) উপস্থিত নির্ণয় থেকে সুরু করে লাইসোজোমের (Lysosome) আধুনিক আবিষ্কার কাল অবধি—এই সুদীর্ঘ সময়ব্যাপী আলোক-সংবেদন প্রক্রিয়ার অন্তরালে লুপ্ত শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানা ছিল না বললেই চলে। অবশ্য সম্প্রসারিত এই অন্তর্বর্তীকাল-ব্যাপী Van Potter থেকে সুরু করে Elvejhem, Rouiller, de Duve, Harper, Blackwell, Riley, Slater, White, Harper, Braun-Falco, Jarrett, Zelickson, Nordquist, Olson, Spearman, Rees, Allison প্রমুখ বহু কৃতী গবেষক অক্লান্ত সাধনায় এই রহস্য সন্ধানের কাজে ব্রতী হয়েছিলেন। আর এই ব্যাপক অনুসন্ধানের ফলে ইদানীং লাইসোজোম সংক্রান্ত বহু অজ্ঞাত তথ্য উদ্ঘাটিত হয়েছে এবং এই ব্যাপারে লাইসোজোমের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা জানা গেছে।

অন্যান্য বহুবিধ বস্তুর মত এই বস্তুটি জীব-কোষের অভ্যন্তরে অবস্থিত থাকে। মাইটোক-ন্ড্রিয়া ও মাইক্রোজোমের মধ্যবর্তী পর্যায়ভুক্ত এই

বস্তুটি প্রায় মাইটোকণ্ড্রিয়ার মত হলেও বিশেষ কোন আভ্যন্তরীণ আকৃতি এর নেই। এর অভ্যন্তরে এপর্যন্ত সমগোষ্ঠীভুক্ত 14 প্রকার জল-বিধ্বংসী (Hydrolytic) অনুঘটকের সন্ধান পাওয়া গেছে। এই বস্তুকণাগুলি লাইপোপ্রোটিনের পাতলা আবরণের দ্বারা ঢাকা থাকে, যার ফলে এর অভ্যন্তরে অবস্থিত অনুঘটক ও এর বাইরে অর্থাৎ জীবকোষের অভ্যন্তরস্থ সাবস্ট্রেটের মধ্যে পারস্পরিক ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়ার পথ রুদ্ধ থাকে। অন্যথায় এই প্রতিক্রিয়ার ফলে জীবকোষের বিনাশ ও ক্ষয় অবশ্যম্ভাবী। এছাড়া এই বস্তুকণাগুলি আবার জীবকোষের কেন্দ্রীনকে পরিবেষ্টন করে এমনভাবে অবস্থান করে, যার ফলে কার্যতঃ কেন্দ্রীনের চারপাশে অদৃশ্য এক প্রতিরক্ষামূলক আবরণ রচিত হয়। বিশিষ্ট তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যযুক্ত ক্ষতিকর আলোকরশ্মির দ্বারা জীবকোষ তথা লাইসোজোমের বিনাশ ঘটে।

3200 একক পর্যন্ত প্রসারিত এবং সর্বাধিক দহন ঘটে আবার 2500 থেকে 3000 একক তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যযুক্ত আলোকরশ্মির দ্বারা। সুতরাং দিগন্তে উপনীত আলোকরশ্মি স্বভাবতঃই ক্ষতিকর দহন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে সক্ষম হয় না। ঘরের জানালায় ব্যবহৃত মামুলি কাচ 3200 অ্যাংস্ট্রমের কম তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যযুক্ত আলোকরশ্মি প্রতিহত করতে পারে। সুতরাং এর দ্বারা সূর্যাতপ কর্তৃক দহন প্রতিহত হয় ঠিকই, কিন্তু আলোক-সংবেদন প্রতিক্রিয়া উৎপাদন অপ্রতিহত থাকে।

আলোক-সংবেদন প্রক্রিয়ার সম্ভাব্য ক্রিয়াকলাপ

জানা গেছে, আলোক-সংবেদন সৃষ্টিকারী কিছু বস্তু লাইসোজোমের উপরেই আসক্ত ও কেন্দ্রীভূত হয় এবং অন্য শ্রেণীর কিছু বস্তু আবার আসক্ত হয় জীবকোষের বহিরাবরণের উপর।

1 নং চিত্র 2 নং চিত্র
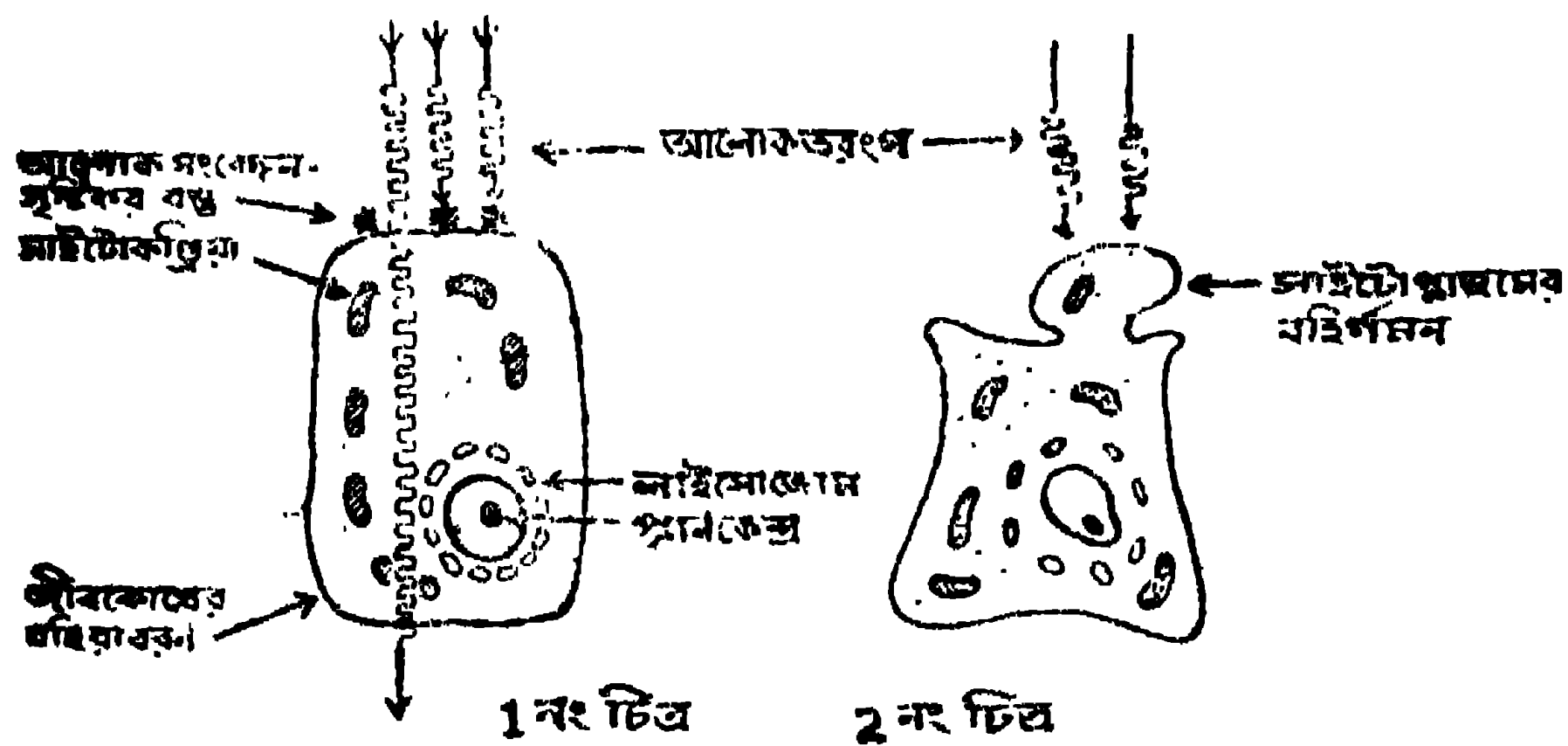
সূর্যরশ্মির ভূমিকা—সূর্য থেকে উৎপন্ন, প্রসারিত আলোকরশ্মি, তার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের বিস্তৃতি প্রায় বর্ণালীযুক্ত যে 2500 থেকে 18500 অ্যাংস্ট্রম পর্যন্ত। কিন্তু মেঘ ধোঁয়া, কুয়াশা প্রভৃতির স্তর ভেদ করে যে রশ্মি দিগন্তে উপনীত হতে সক্ষম হয়, তার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য অবশ্য 3300 এককের মত। দহন-কারী আলোকরশ্মির তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য 2500 থেকে

দুই শ্রেণীর ক্রিয়াকলাপের মধ্যে এক ক্ষেত্রে জীবকোষের মধ্যে লাইসোজোমের ভেদ্যতা বৃদ্ধি ও আনুষঙ্গিক বিধ্বংসী অনুঘটক নিষ্ক্রমণের ফলেই মূল প্রতিক্রিয়ার সূচনা হয়। পক্ষান্তরে অপর ক্ষেত্রে যে প্রতিক্রিয়া হয়, তার জন্যে মুখ্যতঃ দায়ী জীবকোষের নিজস্ব দেহাবরণের অভেদ্যতার হ্রাস-প্রাপ্তি। এখানে উপস্থাপিত রেখাচিত্রের সাহায্যে

উল্লেখিত দুই শ্রেণীর কার্যপদ্ধতির পার্থক্য দেখানো হয়েছে।

1নং চিত্রে স্বাভাবিক জীবকোষের আণুবীক্ষণিক আকৃতি দেখানো হয়েছে। এর মধ্যে সাইটো-প্লাজমের অন্তর্গত বিভিন্ন বস্তুর সঙ্গে লাইসো-জোমের কাল্পনিক অবস্থানও দেখানো হয়েছে। আলোক-সংবেদনের ফলে ঐ একই জীবকোষের বিনাশের সূচনা দেখানো হয়েছে 2নং চিত্রে। অকুস্থানে বিক্ষত জীবকোষের আবরণ ভেদ করে আভ্যন্তরীণ সাইটোপ্লাজমকে আকস্মিকভাবে বহির্গত হতে দেখা যাচ্ছে।

ঘটে। 3200 অ্যাংষ্ট্রম ও তদূর্ধ্ব তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের আলোকরশ্মির দ্বারাই আলোক-সংবেদনজাত চর্মরোগের সৃষ্টি হয়।

3নং চিত্রেও অপর এক স্বাভাবিক জীবকোষ চিত্রিত হয়েছে। অভ্যন্তরে অবস্থিত লাইসো-জোমের মধ্যেই এবার কালো তারকাচিহ্নের দ্বারা আলোক-সংবেদনশীল বস্তুর অবস্থান দেখানো হয়েছে। অকুস্থানে বিধ্বংসী অনুঘটক বিমুক্তির ফলে ঐ জীবকোষের বিনাশপ্রাপ্তির অবস্থা দেখানো হয়েছে 4নং চিত্রে। উভয় চিত্রেই (1নং ও 3নং) তরঙ্গায়িত রেখাচিহ্নের সাহায্যে

আলোকতরঙ্গ

লাইসোজোমের মধ্যে অবস্থিত 'আলোক-সংবেদন' সৃষ্টিকারী বস্তু

লাইসোজোম থেকে বিমুক্ত অনুঘটক

3নং চিত্র

4নং চিত্র
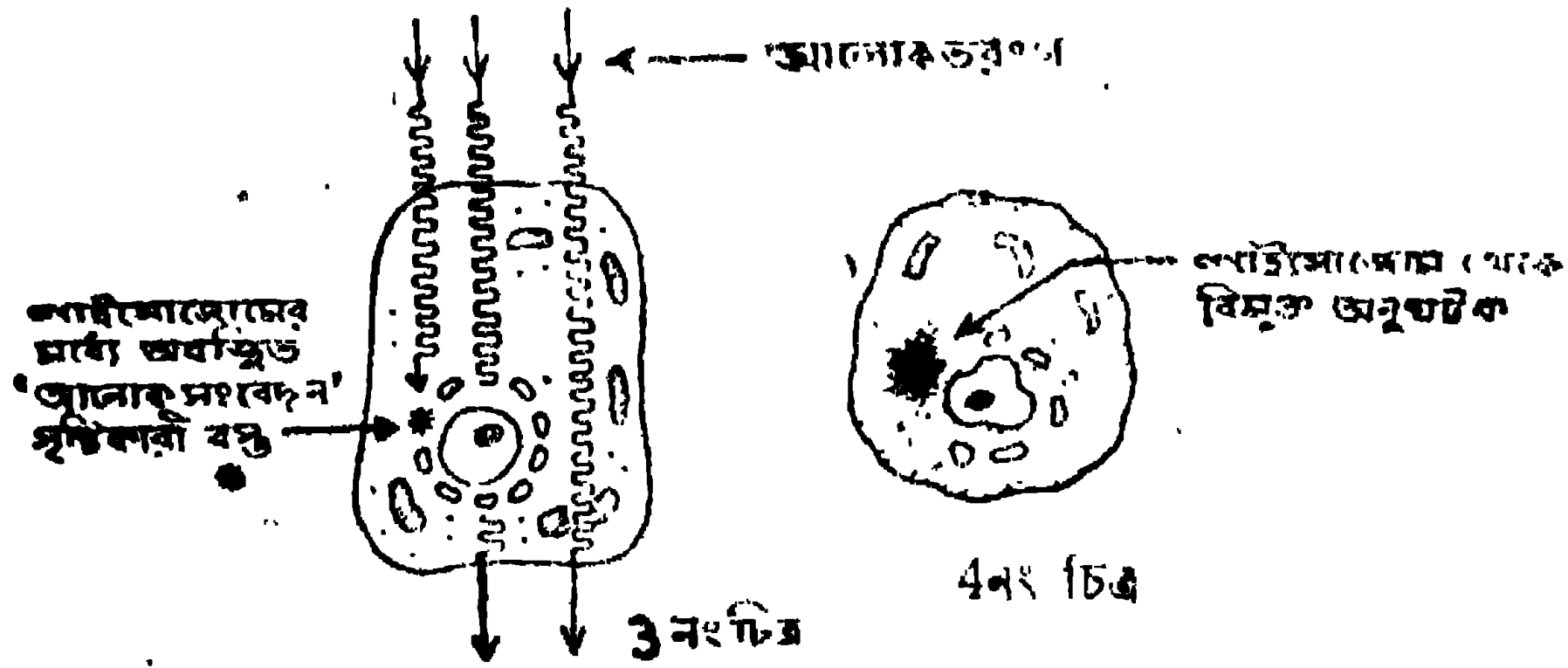
প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য Rose Bengal, Eosin রঞ্জকের উপাদান, Fluoresic acid, আলকাত্‌রা ও আলকাত্‌রাজাত পদার্থসমূহ Rutacae, Umbelliferae-জাতীয় উদ্ভিদ প্রভৃতি বিবিধ উপাদানের মধ্যে আলোক-সংবেদন প্রতিপাদনক্ষম যে বস্তু বর্তমান থাকে, তা মুখ্যতঃ জীবকোষের বহিরাবরণের উপর কেন্দ্রীভূত হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ গাঢ় কালো রঙের তারকা চিহ্নের সাহায্যে এদের অবস্থান 1নং চিত্রে দেখানো হয়েছে। এই বস্তুগুলির দ্বারা ক্ষতিকর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যযুক্ত আলোকরশ্মি বিশোষিত হলে যে তাৎক্ষণিক বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়, তারই ফলস্বরূপ জীব-কোষের আবরণ বিক্ষত হয়। এর পরিণামে আবার কোষের অন্তর্গত পটাসিয়াম বিনষ্ট হয় এবং এইভাবে অবশেষে জীবকোষের মৃত্যু

আলোকরশ্মির গতিপথ চিহ্নিত করা হয়েছে।

Onthracene, Porphyrin ইত্যাদি অন্যান্য কিছু বস্তু আবার জীবকোষের অভ্যন্তরস্থ লাইসোজোমের মধ্যেই কেন্দ্রীভূত হয়। এই বস্তুগুলি ক্ষতিকর আলোকরশ্মি শোষণ করলে লাইসোজোমের আবরণের অখণ্ডতা বিনষ্ট হয়। ফলে কোষের আভ্যন্তরীণ অতীব গুরুত্বপূর্ণ বস্তু-সমূহ বিমুক্ত বিধ্বংসী অনুঘটকের দ্বারা আক্রান্ত হয়। এর উপর ভিত্তি করে আবার একাধিক মধ্যবর্তী পর্যায়ের রাসায়নিক পদার্থও নির্গত হয় (যেমন, আমবাতের ক্ষেত্রে হিষ্টামিন)। যাহোক, চূড়ান্ত পরিণতি হিসাবে আক্রান্ত জীবকোষ স্ফীত হয়ে শেষ পর্যন্ত ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

উভয় ক্ষেত্রেই কিন্তু আলোক-সংবেদন সৃষ্টিকারী বস্তু বর্তমান না থাকলে উল্লিখিত তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যযুক্ত

আলোকরশ্মি বিন্দুমাত্র ক্ষতি না করে, অবলীলাক্রমে ও স্বচ্ছন্দে জীবকোষ ভেদ করে নিষ্ক্রান্ত হতে সক্ষম হয়।

যাহোক, শেষ করবার আগে সচরাচর ব্যবহৃত বস্তুসমূহ, যেগুলির দ্বারা আলোক-সংবেদনজাত চর্মরোগের সৃষ্টি হয়, সেই সকল বস্তুসামগ্রীর সংক্ষিপ্ত একটা তালিকা এখানে সংযোজন করা হলো। তাত্ত্বিক বিচারে এরূপ বস্তুর সংখ্যা অবশ্য অগণিত। সুতরাং বাস্তব ক্ষেত্রে সচরাচর বেশী ব্যবহৃত হয়, এরূপ বস্তুসমূহই এই তালিকায় সংযোজিত হয়েছে।

আলোক-সংবেদনজাত চর্মরোগ সৃষ্টিকারী বস্তুসমূহের তালিকা

1. **প্রণালীবদ্ধ পদ্ধতিতে যেগুলি গ্রহণ করা হয়**

(ক) Sulfonylurea ··· বহুমূত্র রোগের চিকিৎসার্থে ব্যবহৃত ওষুধের মৌলিক উপাদান।

(খ) Tetracyclines ···
(গ) Sulfonamaides } বিভিন্ন জীবাণুঘটিত রোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত।

(ঘ) Griseofulvin ··· বিভিন্ন প্রকার ছত্রাকঘটিত রোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত।

(ঙ) Lamprene ··· কুষ্ঠরোগের চিকিৎসা ও প্রতিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণে ব্যবহৃত ওষুধ।

(চ) Chlorthiazides
(ছ) Phenothiazines } চুলকনা প্রতিরোধ এবং স্নায়বিক উত্তেজনা প্রশান্তকারী ওষুধসমূহের মৌলিক উপাদানসমূহ।

2. **যেগুলি সচরাচর স্থানীয়ভাবে প্রয়োগ করা হয়**

(ক) TCSA (Tetra-chlor-salicylanilide) ও TBS (Tribromo-salicylanilide) } জীবাণু প্রতিষেধকরূপে সাবানের মধ্যস্থিত উপাদান।

(খ) Bithinol ······ ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত জীবাণু-প্রতিষেধক।

(গ) Blankophores ··· রাসায়নিক বিচারে এগুলি Sulfonamide-পর্যায়ভুক্ত। কাপড়, কাগজ, খেলনা প্রভৃতি হরেক রকম বস্তুতে বর্ণের ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধির জন্যে এই সব বস্তু প্রয়োগ করা হয়। এর দ্বারা অতিবেগুনী রশ্মি বিশোষিত হয়ে শুধুমাত্র নীল রশ্মি প্রতিফলিত হওয়ায় এই ঘটনা সম্ভব হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ টিনোপাল উল্লেখযোগ্য, যা কাপড় কাচবার পর ধব্ধবে ফর্সা করবার জন্যে হামেশাই ব্যবহৃত হয়।

(ঘ) আলকাত্রা ও আলকাত্রাজাত (যেমন ন্যাপথলিন) প্রভৃতি—যথাক্রমে চুলকনাযুক্ত কিছু চর্মরোগের চিকিসায় ব্যবহৃত মলমের উপাদান এবং সুগন্ধি বা পোকামাকড়ের উপদ্রব থেকে বিবিধ গৃহসামগ্রী রক্ষার্থে এগুলি ব্যবহার করা হয়।

3. **উদ্ভিদ বা লতাগুল্ম প্রভৃতি**

Umbelliferae এবং Rutaceae-র অন্তর্গত বিভিন্ন উদ্ভিদ, যাদের মধ্যে আলোক-সংবেদনশীল মৌলিক ও যৌগিক পদার্থরূপে Furocoumarin বর্তমান থাকে। শ্বেতিরোগের চিকিৎসায় এর প্রয়োগ ফলদায়ক। গ্রহণযোগ্য বটিকা স্থানীয় প্রয়োগযোগ্য দ্রবণ, প্রলেপ এবং ত্বকের নিম্নে প্রয়োগের উপযোগী ইনজেকশন (তৈলাক্ত) প্রভৃতি বিভিন্ন আকারে এটি ব্যবহৃত হয়।

বিস্ফোরক পদার্থের উৎপাদন ও ব্যবহার

আশিসকুমার সান্যাল

মানুষের দ্বারা এযাবৎ আবিষ্কৃত বস্তুসমূহের মধ্যে বিস্ফোরকই বোধহয় একমাত্র পদার্থ, যা মানুষের কল্যাণকর কাজে যতখানি ব্যবহৃত হতে পারে, ঠিক ততখানিই ব্যবহৃত হতে পারে অকল্যাণকর কাজে—তা সে কয়েক শত বছর আগে আবিষ্কৃত বারুদ বা সাম্প্রতিকতম বিস্ফোরক অ্যাটম বোমা অথবা হাইড্রোজেন বোমা যাই হোক না কেন। বারুদের সাহায্যে ছোট ছোট পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে রাস্তা তৈরির সুবিধার জন্যে পাহাড় ভেঙে ফেলা যায় আবার শত্রুপক্ষের বাড়ীঘরও উড়িয়ে ফেলা যায়। আমেরিকা মাটির নীচে বড় বড় আধার, পাহাড়ের মধ্য দিয়ে সুড়ঙ্গ ইত্যাদি তৈরির কাজে কম শক্তিসম্পন্ন পারমাণবিক বোমা ব্যবহার করা সুরু করেছে। এটা পারমাণবিক বোমার কল্যাণকর ব্যবহারের দিক। আর হিরোসিমা ও নাগাসাকি পৃথিবীর মানুষের চোখের সামনে পারমাণবিক বোমার অকল্যাণকর ব্যবহারের জলন্ত নিদর্শন হয়ে আছে।

রাসায়নিক বিস্ফোরকসমূহের ক্ষেত্রে বিস্ফোরকটি রাসায়নিকভাবে ভেঙে খুব অল্প সময়ের মধ্যে নিজ আয়তনের বহু গুণ বেশী আয়তনের গ্যাসীয় পদার্থ ও প্রচুর তাপ উৎপন্ন করে। এই উৎপন্ন গ্যাসীয় পদার্থ প্রচণ্ড চাপের সৃষ্টি করে, যা হলো বিস্ফোরণের মূল কথা।

মানুষের আবিষ্কৃত প্রথম বিস্ফোরক হচ্ছে বারুদ। এতে শতকরা 75 ভাগ পটাশিয়াম নাইট্রেট (KNO_3), শতকরা 10 ভাগ সালফার বা গন্ধক আর শতকরা 15 ভাগ কাঠকয়লা থাকে। এগুলিকে পৃথকভাবে গুঁড়া করে একটি ঘূর্ণায়মান পিতলের চোঙে মেশানো হয়। মিশ্রিত পদার্থকে এরপর Edge-runner নামক এক প্রকার যন্ত্রে 6 ঘণ্টা ধরে গুঁড়া করা হয়। এই সময় শতকরা 6 ভাগ জল যোগ করা হয়, নচেৎ ঐ সময়েই বিস্ফোরণ ঘটে যেতে পারে। এইভাবে উৎপন্ন ডেলার মত জিনিষটাকে আবার গুঁড়া করে হাইড্রলিক প্রেসে চাপ দিয়ে কেক-এর মত আকার দেওয়া হয়। সাধারণ বারুদের জন্যে এগুলিকে গুঁড়া করে চালুনি দিয়ে ছেঁকে প্রয়োজনীয় আকারের দানা সংগ্রহ করা হয়। সামান্য গ্র্যাফাইট মিশিয়ে ঘূর্ণায়মান কাঠের চোঙে ঝাঁকিয়ে এগুলিকে পালিশ করা হয় এবং এইভাবে মসৃণ ও ছিদ্রবিহীন উজ্জ্বল দানা পাওয়া যায়। তারপর 24 ঘণ্টার জন্যে গরম বায়ু প্রবাহে এই দানাগুলিকে শুকানো হয়।

পটাসিয়াম নাইট্রেট থেকে নির্গত অক্সিজেনে গন্ধক এবং কার্বনের দ্রুত দহনই বারুদের বিস্ফোরণের মূল কারণ। এতে হঠাৎ খুব উচ্চ তাপমাত্রায় প্রচুর পরিমাণ গ্যাসীয় পদার্থ পাওয়া যায়। এই রাসায়নিক ক্রিয়া খুবই জটিল বলে এখনও এর স্বরূপ নির্ধারিত হয় নি। তবে অ্যাবেল ও নোবেলের বিস্তারিত অনুসন্ধান থেকে জানা গেছে যে, উৎপন্ন পদার্থে ওজন অনুযায়ী শতকরা 57 ভাগ কঠিন ও 43 ভাগ গ্যাসীয় পদার্থ থাকে। বিস্ফোরণ সম্পূর্ণ বদ্ধ জায়গায় ঘটলে উৎপন্ন গ্যাসের আয়তন বারুদের 280 গুণ হয় আর তাপমাত্রা হয় 2200° সেন্টিগ্রেড। উৎপন্ন গ্যাস প্রতি বর্গইঞ্চিতে 42 টন চাপ দেয়। এই চাপে বদ্ধ আধার টুকরা টুকরা হয়ে যায়। উৎপন্ন গ্যাসীয় পদার্থের মধ্যে কার্বন ডাই-অক্সাইড, নাইট্রোজেন, কার্বন মনোক্সাইড ও

হাইড্রোজেন সালফাইড প্রধান। উৎপন্ন কঠিন পদার্থে থাকে পটাশিয়ামের কার্বোনেট, থায়ো-সালফেট, সালফেট ও সালফাইড লবণ এবং আরও অনেক কিছু। কঠিন জিনিষগুলি ধোঁয়ার সৃষ্টি করে, যা কোন কোন কাজে অসুবিধাজনক। তাই পরবর্তীকালে ধোঁয়াশূন্য বিস্ফোরক গুঁড়া তৈরির চেষ্টা চালানো হয়।

তুলা, ঘাস, কাঠ, পশম সেলুলোজজাতীয় পদার্থ। সাধারণভাবে সেলুলোজের সঙ্কেত $(C_6H_{10}O_5)n$; 3:1 অনুপাতে গাঢ় নাইট্রিক অ্যাসিড আর গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিডের মিশ্রণের সঙ্গে তুলা নিম্ন উষ্ণতায় সেলুলোজ ট্রাইনাইট্রেট নামক এষ্টার উৎপন্ন করে।

$$C_6H_{10}O_5+3HNO_3=C_6H_7O_2(NO_3)_3+3H_2O$$
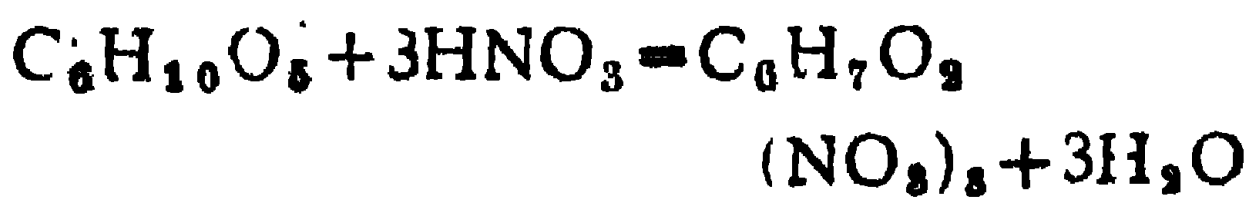
গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড উৎপন্ন জলকে শোষণ করে। একেই বলা হয় গান-কটন। বিশেষ ব্যবস্থায় সমস্ত তুলাকে নাইট্রেটেড করা হয় এবং সম্পূর্ণ অ্যাসিড অপসারিত করা হয়। উৎপন্ন মণ্ডকে আর্দ্র অবস্থাতেই প্রচণ্ড চাপে প্রয়োজনীয় আকার দেওয়া হয় আর তার চারপাশে মোম অথবা অন্য কোন অভেদ্য জিনিষের প্রলেপ দেওয়া হয়, যাতে আর্দ্রতা বজায় থাকে। আর্দ্র গান-কটন পরিবহনের উপযোগী আর সামান্য আঘাতেই এর বিস্ফোরণ ঘটে না। মারকারি ফুলমিনেট ক্যাপ দিয়ে বিস্ফোরণ ঘটালে গান-কটন ভীষণভাবে বিস্ফোরিত হয় এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড, কার্বন মনোক্সাইড, নাইট্রোজেন এবং হাইড্রোজেন উৎপন্ন হয়। এই সকল পদার্থই গ্যাসীয়। টর্পেডো এবং সাবমেরিন মাইনে এর ব্যবহার উল্লেখযোগ্য।

এর পরই আর একটি বহুল-প্রচলিত বিস্ফোরক হিসাবে নাইট্রো-গ্লিসারিনের নাম করতে হয়। গ্লিসারিনের রাসায়নিক সঙ্কেত $C_3H_5(OH)_3$। একে গাঢ় সালফিউরিক এবং গাঢ় নাইট্রিক অ্যাসিডের মিশ্রণের সাহায্যে নাইট্রেশন (Nitration) বিক্রিয়া করলে হরিদ্রাভ, তৈলাক্ত ও জলে অদ্রাব্য যে পদার্থ পাওয়া যায়, তাকেই বলা হয় নাইট্রো-গ্লিসারিন। এর রাসায়নিক নাম অবশ্য গ্লিসারিল ট্রাইনাইট্রেট। লোহা অথবা সীসার আস্তরণযুক্ত একটা আধারে উল্লিখিত দুটি অ্যাসিডের মিশ্রণের সঙ্গে গ্লিসারিন মিশিয়ে নাইট্রো-গ্লিসারিনের পণ্যোৎপাদন করা হয়। আধারটিকে শীতল জলের প্রবাহযুক্ত নলের সাহায্যে ঠাণ্ডা করা হয়। মিশ্রণের মধ্যে দিয়ে শুষ্ক বায়ু-প্রবাহ চালিয়ে মিশ্রণকে আলোড়িত করা হয়। এক্ষেত্রে নিম্নরূপ বিক্রিয়া হয়ে থাকে।

$$C_3H_5(OH)_3+3HNO_3=C_3H_5(NO_3)_3+3H_2O$$
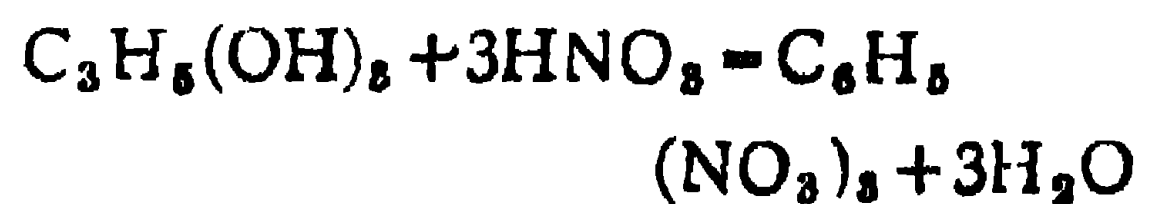
উৎপন্ন পদার্থকে অন্য একটা আধারে নিয়ে অ্যাসিডকে থিতানো হয়। অ্যাসিডের উপর থেকে নাইট্রো-গ্লিসারিন অপসারিত করে জল এবং সোডিয়াম কার্বোনেট দ্রবণে ধুয়ে নেওয়া হয়।

নাইট্রো-গ্লিসারিন খুব সুবেদী ও শক্তিশালী বিস্ফোরক পদার্থ। এর বিস্ফোরণক্রিয়া নিম্নলিখিত সমীকরণ দ্বারা প্রকাশ করা হয়—

$$4C_3H_5(NO_3)_3=12CO_2+6N_2+10H_2O+O_2$$
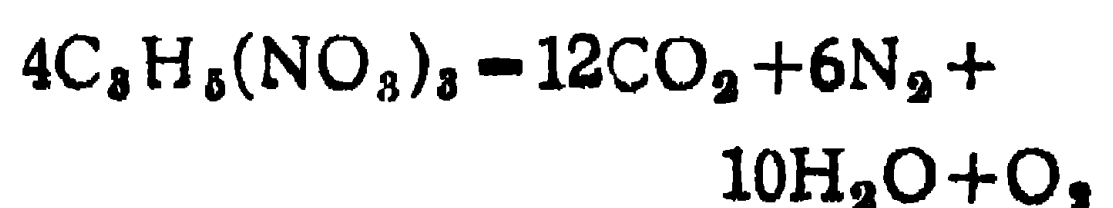
উৎপন্ন গ্যাসের আয়তন বিস্ফোরকের আয়তনের প্রায় 11,000 গুণ। এর বিস্ফোরণের তীব্রতার জন্যে একে অন্য পদার্থের সঙ্গে মিশিয়ে তীব্রতা হ্রাস করে ব্যবহার করা হয়।

কিসেলগাড় (Kieselguhr), কাঠের মণ্ডজাতীয় সচ্ছিদ্র পদার্থে নাইট্রো-গ্লিসারিন শোষণ করিয়ে ডিনামাইট তৈরি করা হয়। এইভাবে প্রাপ্ত নমনীয় পদার্থকে (যাতে শতকরা 75 ভাগ নাইট্রো-গ্লিসারিন থাকে) গোলার আকার দেওয়া হয়। ডিনামাইট খুব সুবেদী নয়, একে ব্যবহার করবার জন্যে ডেটোনেটরের প্রয়োজন হয়। বিশেষ বিশেষ কাজের জন্যে বিশেষ বিশেষ শোষক

ব্যবহার করা হয়; যেমন—কাঠকয়লা, কাঠের তন্তু, কাঠের গুঁড়া ইত্যাদি। বিস্ফোরণের হার নিয়ন্ত্রণের জন্যে সোডিয়াম নাইট্রেট, পটাসিয়াম নাইট্রেট বা সালফার মিশ্রিত অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট যোগ করা হয়।

করডাইট হচ্ছে একটি ধোঁয়াশূন্য সামরিক বিস্ফোরক, কামান থেকে গোলা ছুঁড়তে প্রোপেলেন্ট হিসাবে ব্যবহৃত হয়। খনিতে ব্যবহারের পক্ষে করডাইট অত্যধিক ব্যয়বহুল। বিস্ফোরণের সময় রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে কোন কঠিন পদার্থ উৎপন্ন হয় না বলেই এতে ধোঁয়া উৎপন্ন হয় না। এতে শতকরা 37 ভাগ গান-কটন, 58 ভাগ নাইট্রো-গ্লিসারিন আর 5 ভাগ ভেসেলিন থাকে। নাইট্রো-গ্লিসারিন আর গান-কটন মিশিয়ে অ্যাসিটোন আর ভেসেলিন দিয়ে লেই প্রস্তুত করা হয়। এথেকে অ্যাসিটোন বাষ্পীভূত করিয়ে কঠিন পদার্থ উৎপন্ন করা হয়।

টি. এন. টি. বা ট্রাই-নাইট্রোটলুয়িন আর পিক্রিক অ্যাসিডজাতীয় উচ্চ বিস্ফোরক কামানের গোলা, টর্পেডো, মাইন ইত্যাদিতে ব্যবহৃত হয়।

টি. এন. টি-র রাসায়নিক সঙ্কেত $C_6H_2CH_3(NO_2)_3$। টলুইনকে ($C_6H_5CH_3$) গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিডের উপস্থিতিতে গাঢ় নাইট্রিক অ্যাসিডের সঙ্গে বিক্রিয়া করিয়ে টি. এন. টি. পাওয়া যায়।

$$C_6H_5CH_3+3HNO_3=C_6H_2CH_3(NO_2)_3+3H_2O$$।
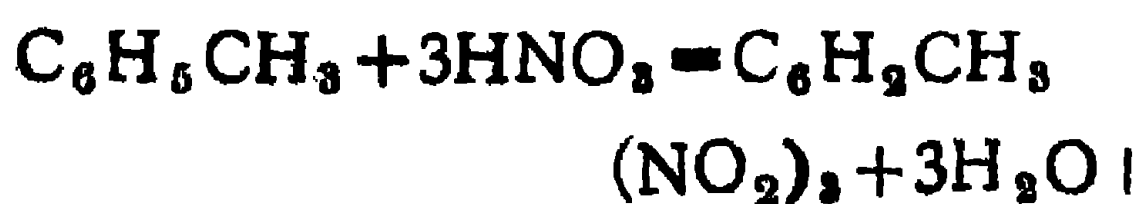
পিক্রিক অ্যাসিডের রাসায়নিক সঙ্কেত $C_6H_2OH(NO_2)_3$; উপরিউক্ত উপায়ে ফিনোলকে (C_6H_5OH) নাইট্রেশন করালে পিক্রিক অ্যাসিড পাওয়া যায়।

$$C_6H_5OH+3HNO_3=C_6H_2(OH)(NO_2)_3+3H_2O$$
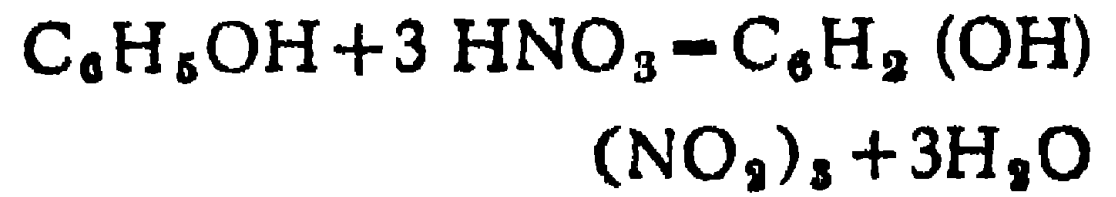
আধুনিক উচ্চ বিস্ফোরকসমূহের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে সাইক্লোনাইট, রাসায়নিক নাম ট্রাই-মেথিলিন ট্রাইনাইট্রামিন। শতকরা 70 ভাগ টি. এন. টি.-র সঙ্গে মিশিয়ে একে টর্পেডো, ক্ষেপণাস্ত্র ইত্যাদিতে ব্যবহার করা হয়। শতকরা 80 ভাগের বেশী অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট আর ডাই-নাইট্রোবেঞ্জিনযুক্ত রোবুরাইট আর বেলাইট খনিতে বিস্ফোরক হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

এতক্ষণ আলোচিত সমস্ত বিস্ফোরকগুলিকে রাসায়নিক বিস্ফোরক বলা যেতে পারে। এর বেশীর ভাগকে বিস্ফোরিত করাবার জন্যে ডেটোনেটরের প্রয়োজন হয়। এটা আর কিছুই নয়, কোন কম শক্তিশালী পদার্থের বিস্ফোরণের সাহায্যে মূল বিস্ফোরকের বিস্ফোরণ ঘটানো। এই সকল পদার্থকে বলা হয় ডেটোনেটর। ডেটোনেটর হিসাবে মারকারি ফুলমিনেট [$Hg(OCN)_2$] বা লেড অ্যাজাইড [$Pb(N_3)_2$] ব্যবহৃত হয়।

পারমাণবিক ও হাইড্রোজেন বোমাকে নিউক্লিয়ার বিস্ফোরক বলা যায়। এদের কার্যপদ্ধতি রাসায়নিক বিস্ফোরকের কার্যপদ্ধতি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। এগুলির বিস্ফোরণের তীব্রতাও ভীষণ। এক একটি পারমাণবিক বা হাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোরণ ক্ষমতা কয়েক মিলিয়ন টন টি. এন. টি. হিসাবে পরিমাপ করা যায়। এথেকেই ঐ সকল বোমার বিস্ফোরণ-ক্ষমতা বোঝা যায়।

উপগ্রহের কথা

শ্রীঅলোককুমার সেন

আমাদের সৌরজগতের গ্রহের সংখ্যা হলো নয়। এদের মধ্যে বুধ, শুক্র আর প্লুটোর কোন উপগ্রহ এখনও আবিষ্কৃত হয় নি, অন্যান্য গ্রহের সম্মিলিত উপগ্রহ সংখ্যা একত্রিশ। বৃহস্পতির রয়েছে বারোটি উপগ্রহ। এর পরেই রয়েছে শনি নয়টি উপগ্রহ নিয়ে। তারপর একে একে আসে ইউরেনাস, নেপচুন ও মঙ্গল। তাদের উপগ্রহের সংখ্যা যথাক্রমে পাঁচ, ছুই ও ছুই। আর পৃথিবী রয়েছে তার একমাত্র উপগ্রহ—চন্দ্রকে নিয়ে। বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য হলো, এসব উপগ্রহের জন্ম-রহস্য, উপাদান ও প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করা।

প্রথমেই ধরা যাক বুধ আর শুক্র গ্রহকে। আমরা জানি যে, এদের কোন উপগ্রহ নেই, কিন্তু গত শতাব্দীতে কেপ্‌লারের সূত্র বিশ্লেষণ করে কোন কোন বিজ্ঞানী সিদ্ধান্ত নেন যে, উপগ্রহ ব্যতীত কোন গ্রহ সূর্যকে উপবৃত্তাকার পথে পরিভ্রমণ করতে পারে না। কারণ সূর্য আর কোন গ্রহের পারস্পরিক আকর্ষণ বলে গ্রহটি বৃত্তাকার পথে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করবে। তাই উপগ্রহের অবস্থানই গ্রহকে উপবৃত্তাকার পথে ঘুরতে বাধ্য করে। এই তত্ত্বের সত্যতা এখনো নিরূপিত হয় নি, তবে অনেকেই এর অনুকূলে মত প্রকাশ করছেন।

কয় বছর আগে থেকেই কেউ কেউ বলেছেন যে, বুধ হলো শুক্রের হারিয়ে-যাওয়া উপগ্রহ। সম্প্রতি এক গুরুত্বপূর্ণ গবেষণায় এই সন্দেহের সত্যতা অনেকাংশে প্রমাণিত হয়েছে। আমরা জানি যে, সূর্য পরিক্রমায় বুধের সময় লাগে 44 দিন আর সে সময়ের মধ্যে সে একবার আপন কক্ষ ঘিরে পাক খায়। তার মানে বুধের বেলায় দিন ও বছর সমান।

1965 সালের এপ্রিল মাসে মার্কিন ভূ-পদার্থ বিজ্ঞানী সংসদের এক অধিবেশনে এই চিরন্তন সত্যের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুললেন কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন অধ্যাপক। এঁদের মধ্যে আছেন গর্ডন পেটেনজিল, রলফ ডাইস ও গোল্ড। এঁরা পুর্টোরিকার আরেসিবো শহরে পৃথিবীর বৃহত্তম রেডিও-রেডার দূরবীনের মাধ্যমে বুধ সম্বন্ধে নানা তথ্যানুসন্ধান করেছেন। তাঁদের অনুসন্ধান থেকে দেখা যায় যে, বুধ তার আপন কক্ষে একবার ঘুরতে সময় নেয় 54 থেকে 64 দিন (যদি তার পাকের গতি সূর্য প্রদক্ষিণের গতির দিকে হয়) অথবা 41 থেকে 51 দিন (পাকের গতি প্রদক্ষিণ গতির বিপরীতমুখী হলে)। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে, সূর্যের এত কাছে থেকেও (সূর্য থেকে বুধের দূরত্ব 3 কোটি 60 লক্ষ মাইল) বুধ কিভাবে তার নিজস্ব গতি বজায় রাখে?

এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন টমাস গোল্ড। তিনি গাণিতিক পদ্ধতিতে প্রমাণ করেছেন যে, বুধের গতি একই কক্ষে 40 কোটি বছরের বেশী থাকতে পারে না। কাজেই অনুমান করা হচ্ছে, এককালে বুধ ছিল শুক্রের উপগ্রহ। পরে সে শুক্র থেকে দূরে সরতে থাকে এবং অবশেষে সূর্যের বন্ধনে বন্দী হয়ে যায়। বুধ হারিয়ে-যাওয়া উপগ্রহ বলে সনাক্ত করবার আর একটি কারণ হলো এই যে, তার কক্ষপথ অন্যান্য গ্রহের তুলনায় বেশী উপবৃত্তাকার।

তাছাড়া রেডারের পরীক্ষায় বুধ ও চাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সাদৃশ্য পাওয়া গেছে। দুই-ই

উষ্ণ, ক্ষুদ্র, এদের ত্বক মোটামুটি মসৃণ, মাঝে মাঝে রয়েছে খাদ ও আগ্নেয়গিরি।

এবার আসা যাক চাঁদের কথায়। চাঁদ হলো আমাদের এক মাত্র উপগ্রহ, পৃথিবী থেকে তার দূরত্ব 2,38,840 মাইল। পৃথিবীর চার পাশে ঘুরতে সে সময় নেয় 27·32 দিন। চাঁদ যে সময়ে পৃথিবীকে একবার প্রদক্ষিণ করে, ঠিক সেই সময়ের মধ্যেই নিজের মেরুদণ্ডের চতুর্দিকে একবার ঘুরে যায়। এই কারণে তার একদিক চিরদিনই অদৃশ্য থেকে যায় পৃথিবীর মানুষের কাছে।

গত কয়েক বছরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট রাশিয়ার বিজ্ঞানীদের প্রচেষ্টায় চাঁদ সম্পর্কে অনেক তথ্য জানা গেছে। অ্যাপেলো-11 ও অ্যাপেলো-12-র চন্দ্রপৃষ্ঠে পদার্পণের পর এই উপগ্রহটি সম্বন্ধে আমাদের ঔৎসুক্য ও কৌতূহলের সীমা নেই।

এতদিন ধরে আমরা জেনে এসেছি যে, চাঁদ হলো পৃথিবীরই বিচ্ছিন্ন অংশ। বহু কোটি বছর আগে কোন এক অজানা জ্যোতিষ্কের আকর্ষণে পৃথিবীর প্রশান্ত মহাসাগরের এক অঞ্চল—উর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হয়ে চাঁদে পরিণত হয়—এটাই হলো সর্বজনস্বীকৃত সিদ্ধান্ত। কিন্তু চাঁদ থেকে প্রাপ্ত শিলার বিশ্লেষণে জানা গেছে যে, তার উৎস পৃথিবী নয়। প্রধানতঃ দুটি কারণে বিজ্ঞানীরা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এই কারণ দুটির প্রথমটি হলো—চান্দ্রশিলার কোন কোনটির বয়স পৃথিবীতে প্রাপ্ত সর্বপ্রাচীন শিলার বয়সের চেয়েও বেশী, দ্বিতীয়টি—চাঁদের পাথরে প্রাপ্ত মৌলিক পদার্থ পৃথিবীতে রয়েছে অত্যন্ত অল্প পরিমাণে, আবার এদের কয়টির অস্তিত্ব আমাদের গ্রহে নেই।

তাহলে চাঁদের জন্ম হলো কিভাবে? অনেকের মতে, প্রাচীনকালে চাঁদ ছিল একটি পৃথক গ্রহ। পরে পৃথিবীর আকর্ষণে তার উপগ্রহে পরিণত হয়।

সৌরজগতের চতুর্থ গ্রহ মঙ্গলের উপগ্রহের সংখ্যা দুই—ফোবোস আর ডিমোস। গ্রীক ভাষায় প্রথমটির অর্থ ভয়, দ্বিতীয়টির মানে ত্রাস। প্রসঙ্গতঃ মঙ্গলের ল্যাটিন নামটিও উল্লেখ করা যায়। মঙ্গলের নাম মার্স, যার মানে যুদ্ধ-দেবতা অর্থাৎ যুদ্ধের দেবতা তাঁর দুই অনুচর 'ভয়' ও 'ত্রাস'-কে নিয়ে বিরাজ করছেন মহাশূন্যে।

1877 সালে আমেরিকার আসফ হল সর্বপ্রথম উপগ্রহ দুটির অস্তিত্বের কথা ঘোষণা করেন। সে বছরেই শিয়াপেরেলি মঙ্গলগ্রহে খালের অস্তিত্বের কথা প্রচার করেন। মঙ্গল থেকে ফোবোসের দূরত্ব 5,823 মাইল, এটির ব্যাস 10 মাইল, কক্ষপরিক্রমার সময় 7 ঘণ্টা 39 মিনিট। ডিমোসের দূরত্ব 15,000 মাইল, ব্যাস 5 মাইল, কক্ষ পরিক্রমা করতে সময় লাগে 30 ঘণ্টা 18 মিনিট

এই উপগ্রহটি আবিষ্কৃত হবার প্রায় দেড়-শ' বছর আগে জোনাথান সুইফ্‌ট্ তাঁর 'গ্যালিভারের ভ্রমণ কাহিনী' গ্রন্থে লিখেছিলেন যে, আপুটা দেশের অধিবাসীরা মঙ্গলের দুটি উপগ্রহ আবিষ্কার করেছে। এদের প্রথমটি গ্রহের চারপাশে ঘোরে 10 ঘণ্টায় আর দ্বিতীয়টি 21·5 ঘণ্টায়। এদের দূরত্ব যথাক্রমে 6,000 ও 12,000 মাইল। অষ্টাদশ শতকের এই লেখার সঙ্গে বৈজ্ঞানিক তথ্যের সাদৃশ্য আমাদের বিস্মিত করে।

মঙ্গল ও বৃহস্পতির মধ্যে রয়েছে অসংখ্য গ্রহাণুপুঞ্জ। তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড়টির নাম সিরিশ। গ্রহাণুপুঞ্জের পর বৃহস্পতি তার এক ডজন উপগ্রহ নিয়ে বিদ্যমান। এই গ্রহের সবচেয়ে বড় উপগ্রহটির নাম গ্যানিমিড, তার আকার বুধের চেয়েও বড়। প্রথম চারটি উপ গ্রহের (1নং তালিকা) ব্যাস 1760 থেকে 3000 মাইলের মধ্যে, বাকী আটটির 10 থেকে 100 মাইলের মধ্যে।

বৃহস্পতির নিকটতম অনামা উপগ্রহটি তার মহাকর্ষীয় টানে এখন প্রায় ডিম্বাকার হয়েছে,

অনুমান করা হয় যে, ভবিষ্যতে সে আরও কাছে আসবে, তারপর হবে দু-টুকরা। ক্রমে এই দুই খণ্ড আবার বিভক্ত হবে—জ্যামিতিক প্রগতিতে (Geometric progression)। এই ভাঙার কাজ চলবে বহুদিন ধরে। অবশেষে বর্তমান উপগ্রহটি বলয় গঠন করবে—যেমন বলয় আমরা দেখি শনির চারপাশে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, চাঁদের পরিণতি সম্পর্কেও অনেকে এই মন্তব্য করেছেন। তাঁরা বলছেন, পৃথিবী ও চাঁদের দূরত্ব নাকি ক্রমশঃ হ্রাস পাচ্ছে। এর ফলে ভবিষ্যতে চাঁদের উপর পৃথিবীর আকর্ষণ বৃদ্ধি পাবে। আমাদের চাঁদও তখন ভেঙ্গে টুকরা টুকরা হয়ে অসংখ্য উপগ্রহে পরিণত হবে। তখন বিপদও দেখা দেবে নানা রকম। ক্ষুদে চাঁদেরা পারস্পরিক সংঘর্ষে অথবা পৃথিবীর আকর্ষণে লাফিয়ে পড়বে বাতাসের উপর, দেখা দেবে চান্দ্রশিলার বর্ষণ। তখনও যদি মানুষ থাকে এই পৃথিবীতে, তাহলে তাদের পক্ষে এই বৃষ্টির মধ্যে বেঁচে থাকা হবে কঠিন ব্যাপার।

সূর্য থেকে 88·8 কোটি মাইল দূরে তিনটি উজ্জ্বল বলয় ও নয়টি উপগ্রহকে সঙ্গে নিয়ে শনির অবস্থান। বলয়ের বাইরে রয়েছে নিকটতম উপগ্রহ—মিমাস, শনি থেকে যার দূরত্ব 1,17,000 মাইল। আশা করা যায় যে, পরবর্তী শতকের মহাকাশচারীরা শনিকে পর্যবেক্ষণ করতে মিমাসের বুকে নামবেন। দ্বিতীয়টির নাম এনসেলাডাস, দূরত্ব 1,57,000 মাইল। এই দুটি উপগ্রহকে দেখলে বরফের তৈরি মসৃণ গোলক বলে মনে হয়।

শনির সবচেয়ে বড় উপগ্রহ হলো টাইটান। বুধের সমান এর আয়তন, মঙ্গলের মত কমলা রং। সৌরজগতের 31টি উপগ্রহের মধ্যে এক মাত্র এরই বায়ুমণ্ডল দেখা যায়, তবে এই অপার্থিব বাতাসের প্রধান উপাদান হলো আলেয়া গ্যাস, যার মধ্যে পার্থিব প্রাণের স্পন্দন কোন দিনই শোনা যাবে না।

শনির দূরতম উপগ্রহ ফোয়েব। সৌরজগতের যে দুটি উপগ্রহের গতি নিজ নিজ গ্রহের আবর্তনগতির বিপরীতমুখী, ফোয়েব তাদের অন্যতম।

1781 সালে বিখ্যাত বিজ্ঞানী উইলিয়াম হার্শেল ইউরেনাস গ্রহ আবিষ্কার করেন। এই গ্রহটির উপগ্রহের সংখ্যা পাঁচ। তাদের মধ্যে সবচেয়ে কাছেরটির নাম আরিয়েল, দূরত্ব 1,20,000 মাইল। সর্বশেষ উপগ্রহ মিরাণ্ডার দূরত্ব 4 লক্ষ মাইলেরও বেশী। এই পাঁচটি উপগ্রহই যে ইউরেনাস থেকে সৃষ্ট, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কারণ এরা সব একই জাতীয় পদার্থে গঠিত।

ট্রাইটন আর নেরেইড নামক দুটি উপগ্রহ নিয়ে গঠিত নেপচুনের সংসার। ট্রাইটনের আবিষ্কর্তা ল্যাসলে। নেপচুনকে খুঁজে পাবার মাত্র একুশ দিন পরে তিনি এই উপগ্রহের অবস্থান প্রমাণিত করেন। নেপচুন থেকে এর দূরত্ব 2,21,500 মাইল, কক্ষ আবর্তনের সময় 5·88 দিন। সৌরজগতের সমস্ত উপগ্রহের মধ্যে এর ভর সবচেয়ে বেশী। ট্রাইটনের ব্যাস মোটামুটি 3,000 মাইল। এখানে মুক্ত-বেগের বেগ উঁচু বলে আবহাওয়া থাকতে পারে। নেপচুনের আকাশে ট্রাইটনকে বেশ বড় দেখায়, কিন্তু অত দূর অঞ্চলে সূর্যের রশ্মির প্রভাব এত কম যে, ট্রাইটনের প্রতিফলন শক্তি থাকা সত্ত্বেও তাকে বিবর্ণ দেখায়।

1949 সালে কুইপার দ্বিতীয় উপগ্রহ নেরেইডকে আবিষ্কার করেন। এর ব্যাস সম্ভবতঃ 200 মাইল, কক্ষপথ অনেকটা ধূমকেতুর মত। নেপচুন থেকে এর নিকটতম ও দূরতম দূরত্ব যথাক্রমে 10 লক্ষ ও 60 লক্ষ মাইল। সবচেয়ে দূরে থাকবার সময় এটিকে কক্ষে একবার পূর্ণ আবর্তিত হতে এক বছর সময় নেয়। নেরেইডের ঔজ্জ্বল্য

যখন সবচেয়ে বেশী, তখন নেপচুনের আকাশে তাকে দেখায় অস্পষ্ট আলোকবিন্দুর মত।

সৌরজগতের নবম গ্রহ প্লুটোকে গ্রহ না বলে নেপচুনের হারিয়ে-যাওয়া উপগ্রহ বলাই বোধ হয় ঠিক হবে। প্লুটোর পরিভ্রমণ পথ বিশ্লেষণ করে সম্প্রতি এক রুশ বিজ্ঞানী বলেছেন যে, এটি হলো নেপচুনের লুপ্ত উপগ্রহ, সৌরলোক সৃষ্টির পর নেপচুন তাকে হারায়। তিনি আরও বলেন, বহু কোটি বছর আগের সূর্য উজ্জ্বল হয়ে নেপচুনের সদ্যোজাত আবহাওয়া থেকে কিছু গ্যাস বের করে দেয়। তার ফলে গ্রহটির ভর ও অভিকর্ষের টান এত কমে যায় যে, প্লুটো তার টান থেকে মুক্ত হয়ে পরিচিত হয় পৃথক গ্রহরূপে। আবার হয়তো সে ধরা পড়বে নেপচুনের বন্ধনে। এখনই এমন সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। প্লুটোর চাপা কক্ষপথ তাকে নেপচুনের কক্ষপথের ভিতর দিকে নিয়ে আসে, তখন ঐ গ্রহের থেকে সে প্রায় 3·5 কোটি মাইল এগিয়ে থাকে সূর্যের দিকে। এই অবস্থায় সে সহজেই আবার উপগ্রহে রূপান্তরিত হতে পারে।

এখানে উল্লেখ করা যায় যে, নেপচুনের উপ-গ্রহ ট্রাইটনও এই রকম মুক্তি পেয়েছিল, কিন্তু পরে কাছে এসে সে আবার ধরা পড়ে। কিন্তু এবার তার প্রদক্ষিণ গতির পথ উল্টে যায়।

বুধকে শুক্রের আর প্লুটোকে নেপচুনের উপগ্রহ হিসাবে ধরলে সৌরজগতের গ্রহের সংখ্যা হবে সাত, তার উপগ্রহের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াবে তেত্রিশ। তবে এই রকম কথা জোর দিয়ে বলা সম্ভব নয়।

1 নং তালিকা

গ্রহ	উপগ্রহের সংখ্যা	উপগ্রহ	গ্রহ থেকে দূরত্ব (মাইলে)	কক্ষ পরিক্রমা (দিনে)
বুধ	0			
শুক্র	0			
পৃথিবী	1	চন্দ্র	2,38,840	27·32
মঙ্গল	2	ফোবোস	5,828	0·32
		ডিমোস	15,000	1·26
বৃহস্পতি	12	আইয়ো	2,61,000	1·77
		ইউরোপা	4,15,000	3·55
		কলিস্তো	11,67,000	16·69
		গ্যানিমিড	6,64,000	7·15
		অনামা	1,12,500	0·50
		”	71,10,000	250·6
		”	1,49,40,000	738·90
		”	1,49,40,000	745·00
		”	71,85,000	254·20
		”	1,40,24,800	652·50
		”	?	?
		”	?	?

গ্রহ	উপগ্রহের সংখ্যা	উপগ্রহ	গ্রহ থেকে দূরত্ব (মাইলে)	কক্ষ পরিক্রমা (দিনে)
শনি	9	মিমাস	1,17,000	0·94
		এনসেলাডাস	1,57,000	1·37
		তেথিস	1,86,000	1·89
		ডিওন	2,34,000	2·74
		রিয়া	3,32,000	4·52
		টাইটান	7,71,000	15·95
		হাইপেরিয়ন	9,34,000	21·28
		আয়াপেটাস	22,25,000	79·33
		ফোয়েব	80,54,000	550·45
ইউরেনাস	5	আরিয়েল	1,20,000	2·52
		আমব্রিয়েল	1,67,000	9·14
		টাইটানিয়া	2,73,000	8·71
		ওবেরোন	3,65,000	13·46
		মিরাণ্ডা	?	1·40
নেপচুন	2	ট্রাইটন	2,21,500	5·88
		নেরেইড	?	?
প্লুটো	0			

সঞ্চয়ন

দৈহিক এবং মানসিক রোগ নিরাময়ে অনশন

মস্কোর মানসিক রোগের চিকিৎসা কেন্দ্রের প্রধান অধ্যাপক ওয়াই. এস. নিকোলায়েভ সম্প্রতি ভারত দর্শনে এসেছিলেন। চিকিৎসা পদ্ধতি সম্পর্কে তাঁর গবেষণামূলক কাজ ডাক্তার এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রবল কৌতূহল জাগিয়ে তুলেছে।

অধ্যাপক নিকোলায়েভ একজন চিকিৎসক, কিন্তু একটু স্বতন্ত্র ধরণের। দৈহিক এবং মানসিক অনেক রোগ নিরাময়কল্পে তিনি অনশন এবং যোগবিদ্যা প্রয়োগ করেন এবং তাতে ফল ভালই হয়। এই মানুষটির বয়স অনেক দিন ষাট পেরিয়ে গেছে। চল্লিশ বছর ধরে তিনি মনোরোগের গবেষণায় গভীরভাবে ব্যাপৃত আছেন। কিভাবে অনশনের দ্বারা রোগমুক্তির সুপ্রাচীন পদ্ধতিকে বিকশিত করা যায় এবং কিভাবে এই চিকিৎসা-পদ্ধতিকে একটা বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর দাঁড় করানো যায়—গত পঁচিশ বছর যাবৎ তিনি সেই চেষ্টা করে চলেছেন। মানসিক রোগ নিরাময়ে পৃথিবীতে তিনিই প্রথম অনশন পদ্ধতি প্রয়োগ করেন। তিনি নিজেই বলেছেন যে, চিকিৎসার

ক্ষেত্রে যদি দৈহিক এবং মানসিক ঔষধের মিলিত প্রয়োগ ঘটে, তবেই তা সবচেয়ে বেশী ফলপ্রসূ হয়।

অধ্যাপক নিকোলায়েভ বলেছেন যে, তাঁর মানসিক রোগ সারাবার পদ্ধতি অন্যান্য পদ্ধতির থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। প্রথমতঃ, এতে রোগ সারাবার দৈহিক পদ্ধতির সঙ্গে যুক্ত হবে অন্যান্য ঔষধ ও পরীক্ষার জন্যে যন্ত্রপাতি।

দ্বিতীয়তঃ, এই পদ্ধতির সঙ্গে আয়ুর্বেদীয় এবং যৌগিক পদ্ধতির মূলগত পার্থক্য আছে। পার্থক্যটা এই যে, রোগ নির্ণয়ের জন্যে সব রকম ব্যবস্থা করা হয়, তাতে সমসাময়িক চিকিৎসা-বিজ্ঞানের সমস্ত পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়, যেমন—রঞ্জেন রশ্মি, আধুনিক গবেষণাগার এবং বৈজ্ঞানিক চিকিৎসাশাস্ত্রের সর্বপ্রকার পদ্ধতি।

অধ্যাপক নিকোলায়েভ বলেছেন যে, ব্যাপকভাবে তাত্ত্বিক গবেষণা-সৃষ্ট এই সমন্বয়ের ফলে মানসিক ব্যাধির বিরুদ্ধে সংগ্রাম অনেক বেশী ফলপ্রসূ হবে। এই সব জটিল ব্যাধি অন্য কোন ভাবে সারানো যায় না।

কিন্তু তবু এখনো অনেক কিছু করবার আছে। নিকোলায়েভ বলেছেন—তাঁর চিকিৎসা কেন্দ্রে 5000 রোগী চিকিৎসিত হন। তার মধ্যে 60 থেকে 80 শতাংশ রোগমুক্ত হয়ে হাসপাতাল ছাড়েন। তিনি জোর দিয়ে বলেছেন যে, এদের প্রতিটি ক্ষেত্রে কোন চিকিৎসায়ই আগে কোন ফল হয় নি।

তিনি এই বিষয়ে নিঃসন্দেহ, যে সব মানসিক ব্যাধি আধুনিক ঔষধে নিরাময় হয়, সেই সব মানসিক ব্যাধি অনশন পদ্ধতিতে অনেক তাড়াতাড়ি ভালভাবে সারে।

তাঁর চিকিৎসা কেন্দ্রের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন যে, সেখানে চিকিৎসার সব রকমের আধুনিক ব্যবস্থা আছে। সেখানে 12 জন ডাক্তার এবং 80টি শয্যা আছে। নিজের দৈনন্দিন কর্তব্য কাজ ছাড়াও প্রতিটি ডাক্তার একটি বিশেষ বিষয়ে গবেষণা চালান।

আসলে অনশনের দ্বারা রোগ নিরাময়ের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে সোভিয়েট ইউনিয়নে চালু ছিল। আর এই পদ্ধতির প্রবক্তা ছিলেন রুশ ডাক্তার পাশুতিন। এখানে উল্লেখ করা যায় যে, অনশন-পদ্ধতির বাস্তব ভিত্তি ভারতবর্ষেই প্রথম সৃষ্টি হয়েছিল এবং তারপর কোন না কোন প্রকারে তা রাশিয়ায়ও চালু হয়েছে।

এই বিষয়ে অনুসন্ধান করবার জন্যে তিনি দ্বিতীয়বার ভারতবর্ষে এসেছেন, কিন্তু ভারতীয় প্রাচীন চিকিৎসা পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞানলাভের জন্যে তাঁকে বারবার ভারতে আসতে হবে।

ভারতে আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা পদ্ধতির উল্লেখ করে অধ্যাপক নিকোলায়েভ বলেন যে. এই চিকিৎসা পদ্ধতি এদেশে ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা হয় না। কিন্তু তিনি মনে করেন তার সম্ভাবনা আছে।

অনশন-পদ্ধতিতে রোগ সারাবার জন্যে ভারতে কয়েকটি চিকিৎসা কেন্দ্র খোলা হয়েছে। তিনি তার প্রশংসা করেন।

অধ্যাপক নিকোলায়েভ অনশন-পদ্ধতিতে রোগমুক্তি সম্পর্কে কিছু মূল্যবান তথ্য নিয়ে যাচ্ছেন। এগুলি তিনি তাঁর চিকিৎসা কেন্দ্রের রোগীদের উপর প্রয়োগ করবেন।

বিমান ও মহাকাশযানের সাহায্যে প্রাকৃতিক সম্পদের সন্ধান

কয়েক বছর আগে আইসল্যাণ্ডের কয়েক জন মৎস্য-শিকারী আটলান্টিকের একটি উপসাগরে বেশ বড় এক ঝাঁক মাছের সন্ধান পেয়ে তাদের পিছনে ধাওয়া করে। কিছু দূর গিয়েই মাছের ঝাঁকটা কোথায় যেন হারিয়ে গেল, অনেক খোঁজা-খুঁজি করেও তাদের সন্ধান পাওয়া গেল না।

কিন্তু একজন বৈমানিক দিলেন সেই পলাতক মাছের ঝাঁকের সন্ধান। আটলান্টিকের জলের যে তাপমাত্রা, তার চেয়ে অন্ততঃ দশ ডিগ্রী উষ্ণতর উপসাগরের জল। সে কারণেই মাছগুলি সাধারণতঃ উপসাগর ছেড়ে যে সমুদ্রে যায় না— ঐ বৈমানিক তা জানতেন। সুতরাং ঐ মাছের ঝাঁক ঐ উষ্ণ জলধারার কোন কিনারায় নিশ্চয়ই লুকিয়ে রয়েছে—এই ছিল তাঁর সুনিশ্চিত ধারণা। সমুদ্র ও উপসাগরের মধ্যে যে অদৃশ্য সীমারেখা রয়েছে, সেখানেও ঐ মাছগুলি থাকতে পারে। ঐ বিমানে উপসাগর ও মহাসাগরের তাপমাত্রা নিরূপণ ও দূরবর্তী স্থানের তথ্যাদি সংগ্রহের যন্ত্রপাতি ছিল। এগুলিকে বলা হয় 'রিমোট সেন্সিং' যন্ত্র। এর সাহায্যে বিমানটি ঐ উপসাগরের উপর দিয়ে উড়ে যাবার সময় জলের তাপমাত্রা নিরূপণ ও ওই সব মাছের অবস্থিতি নির্ণয় করে।

ভূগর্ভে লুক্কায়িত পৃথিবীর প্রাকৃতিক সম্পদের অবস্থান নির্ণয়েও আমেরিকা ঐ সকল যন্ত্রের সাহায্যে নিচ্ছে এবং কেবল বিমানে নয়, মহাকাশযানে রক্ষিত ঐ সকল স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের সাহায্যেও ভূগর্ভে লুক্কায়িত সম্পদের সন্ধানে উদ্যোগী হয়েছে। আশা করা যায়, আগামী বছরেই আমেরিকার একটি সম্পদ-সন্ধানী উপগ্রহ মহাকাশে উৎক্ষিপ্ত হবে।

পৃথিবীর সকল বস্তু থেকেই বিদ্যুৎ-চৌম্বক তেজস্ক্রিয় শক্তি বা ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিক রেডিয়েশন বিচ্ছুরিত হয়, কিন্তু খালি চোখে তা দেখা যায় না এবং অপটিক্যাল ক্যামেরার সাহায্যেও তার ছবি তোলা যায় না। তবে ক্যামেরায় কালার ফিল্টার দিয়ে বিভিন্ন স্তরের অবলোহিত রশ্মির তেজস্ক্রিয়তার ছবি তোলা যায়। বিভিন্ন স্তরের তেজস্ক্রিয়তা থেকে বিভিন্ন বস্তুর অস্তিত্ব নিরূপিত হয়।

সমগ্র পৃথিবীর প্রাকৃতিক সম্পদের সন্ধান নিতে হলে বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের এই ব্যাপারে সহযোগিতা প্রয়োজন। গত মে মাসে আমেরিকার মিচিগান রাজ্যের আনআরবারে জাতীয় বিমান বিজ্ঞান ও মহাকাশ সংস্থা দু-সপ্তাহের জন্যে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করে। ঐ সভায় 37টি দেশের এবং 12টি আন্তর্জাতিক সংস্থার চার শতেরও বেশী বিজ্ঞানী ও পদস্থ কর্মচারীরা অংশগ্রহণ করেন। ভারতের পক্ষে ইণ্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ অর্গ্যানিজেশন-এর ডক্টর টি. এ. হরিহরণ, ইণ্ডিয়ান এগ্রিকালচার্যাল রিসার্চ ইনস্টিটিউটের ডক্টর এ. এস. সম্বানাভার, জিওলোজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার কে. উন্নি, সার্ভে ট্রেনিং স্কুলের কর্ণেল এস. কে. সেন, ইণ্ডিয়ান ফটো ইনটারপ্রিটেশন ইনস্টিটিউটের কর্ণেল আর. কে. আগওয়ালা এবং ফিজিক্যাল রিসার্চ লেবরেটরীর ডক্টর পি. আর. পিশারটি ঐ বৈঠকে যোগদান করেছিলেন।

ঐ সকল বৈঠকে আমেরিকার জাতীয় বিমান বিজ্ঞান ও মহাকাশ সংস্থার বিজ্ঞানী 'রিমোট সেন্সিং' পদ্ধতি বিশ্লেষণ করেন এবং এই পদ্ধতি যে কৃষি-বিজ্ঞান, বন-বিজ্ঞান, ভূ-বিজ্ঞান, জল-বিজ্ঞান, সমুদ্র-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এবং পরিবেশ ও জলবায়ু দূষিতকরণের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যেতে পারে, তা বিশদভাবে ব্যাখ্যা ও প্রতিপাদন করেন।

মার্কিন জাতীয় বিমান বিজ্ঞান ও মহাকাশ

সংস্থার আন্তর্জাতিক বিষয় বিভাগের সহকারী কর্ম পরিচালক আর্নল্ড ফ্রুটকিন ঐ বৈঠকে বলেন যে, পৃথিবীর প্রথম সম্পদ-সন্ধানী উপ-গ্রহের সাহায্যে সংগৃহীত তথ্যাদি ঐ কার্যসূচী সমাপ্ত হবার সঙ্গে সঙ্গেই আগ্রহশীল রাষ্ট্র-সমূহের মধ্যে বন্টন করা হবে। তবে পৃথিবীর যে সকল দেশে মহাকাশযান থেকে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের সাহায্যে প্রেরিত তথ্য সংগ্রহ করবার ব্যবস্থা রয়েছে, সেই সকল দেশ ঐ উপগ্রহ থেকে সরাসরিই তথ্যাদি পেয়ে যাবে। যে সকল দেশে তা নেই, সেই সকল দেশকে মার্কিন জাতীয় বিমান বিজ্ঞান ও মহাকাশ সংস্থা এবং অন্যান্য সরকারী প্রতিষ্ঠান ঐ সকল তথ্য সরবরাহ করবে।

ঐ বৈঠকে প্রধান ভারতীয় প্রতিনিধি ডক্টর পিশারটি 'রিমোট সেন্সিং' টেক্‌নোলজী সম্পর্কে ভারত যে বিশেষ আগ্রহশীল এবং এই বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রবেশ সম্পর্কে ভারতে যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হচ্ছে, তা জ্ঞাপন করেন। দৃষ্টান্ত হিসাবে তিনি দুটি পরীক্ষার কথা উল্লেখ করেন।

প্রথমতঃ, ভারতের কেরল রাজ্যে নারকেল গাছে এক প্রকার ভাইরাসবাহিত রোগ হয়। ঐ সকল ভাইরাসের সন্ধান এবং তাদের ধ্বংস করবার জন্যে এই 'রিমোট সেন্সিং' টেক্‌নোলোজীর সাহায্য নেওয়া হচ্ছে। নারকেল গাছ ঐ রোগে আক্রান্ত হলে ফলন প্রচুর পরিমাণে কমে যায়। বহু বিস্তীর্ণ অঞ্চল এই রোগে আক্রান্ত হবার পর বাইরে তেমন কোন লক্ষণ দেখা যায় না। বাইরের লক্ষণ প্রকাশ হওয়া মাত্র মূলসহ ঐ গাছ উপড়ে ফেলতে হয়।

কিন্তু হেলিকপ্টারে রক্ষিত ক্যামেরায় অব-লোহিত আলোয় গৃহীত আলোকচিত্রের মাধ্যমে নারকেল গাছের ঐ রোগ নিরূপণ এখন আর কঠিন কাজ নয়। বাইরে থেকে একটি সুস্থ ও পীড়িত নারকেল গাছ দেখতে সম্পূর্ণ এক রকম। বিজ্ঞানীরা এই প্রসঙ্গে বলেছেন যে, বিমান থেকে আলোকচিত্র গ্রহণকালে পীড়িত বৃক্ষসমূহের লাল রং সুস্থ বৃক্ষের তুলনায় অনেক কম দেখায়। ভারত সরকারকে এই কাজে আমেরিকার জাতীয় বিমান বিজ্ঞান ও মহাকাশ সংস্থা সাহায্য করছে।

ডক্টর পিশারটি এই প্রসঙ্গে বলেছেন যে, এই 'রিমোট সেন্সিং' পদ্ধতির সাহায্যে উদ্ভিদের রোগ গোড়াতেই ধরা পড়ে, ফলে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা যায়। তবে এই পদ্ধতি কোন চিকিৎসা ব্যবস্থা নয়।

দ্বিতীয়তঃ, এই পদ্ধতির সাহায্যেই ভূগর্ভে সঞ্চিত ধাতব পদার্থের সন্ধান নেবার জন্যে ভারতে আর একটি পরীক্ষামূলক পরিকল্পনাও গৃহীত হয়েছে। বিজ্ঞানীরা এতে ম্যাগ্‌নেটোমিটার ও মাইক্রোওয়েভ যন্ত্র ব্যবহার করছেন। বিমান-বাহিত ঐ সকল যন্ত্রের সাহায্যে ভারতের নানা স্থানে ধাতব পদার্থের সন্ধান নেওয়া হচ্ছে। কোন কোন বিদেশী বেসরকারী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান একাজে ভারত সরকারকে সাহায্য করেছেন।

ডক্টর পিশারটি প্রতিনিধিবর্গকে এই প্রসঙ্গে আরও বলেছেন যে, এই 'রিমোট সেন্সিং' টেক্‌নোলো-জীর সাহায্যে সমুদ্রের উপরিভাগের তাপমাত্রা সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ করে মৌসুমী বায়ুপ্রবাহ বা বর্ষারম্ভের পূর্বাভাস জ্ঞাপন করা যায় কি না, সে বিষয়েও পরীক্ষা চালানো হচ্ছে।

তিনি বলেন যে, মৌসুমী বায়ুপ্রবাহের সঠিক সময় নির্ধারণ করতে পারলে বর্ষারম্ভের অন্ততঃ চার-পাঁচ দিন পূর্বে সঠিক পূর্বাভাস দিতে পারলে ভারতের কৃষিব্যবস্থার খুবই উপকার হতে পারে। এই মৌসুমী বায়ুপ্রবাহ সমুদ্রের উপরিভাগের তাপমাত্রার উপর নির্ভরশীল।

বিমান বা মহাকাশযান থেকে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র-পাতির সাহায্যে প্রাকৃতিক সম্পদের সন্ধানলাভ এবং আবহাওয়া সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান এই সকল ব্যবস্থার দ্বারা পৃথিবীর উন্নতিশীল রাষ্ট্রগুলিসহ সকলেই উপকৃত হবেন। এই পদ্ধতির সাহায্যে ভবিষ্যতে মানুষের জীবনকে সমৃদ্ধতর করবার এবং প্রাকৃতিক সম্পদ অধিকতর পরিমাণে ব্যবহার করবার যে বিশেষ সম্ভাবনা রয়েছে, তা আলোচনা সভায় সমবেত সকলেই স্বীকার করেন।

টায়ারের কথা

রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়*

প্রতিদিন সারা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের পথে পথে মোটরযান ও ট্রাকে লক্ষ লক্ষ মানুষ ও পণ্যসামগ্রী বাহিত হয়ে থাকে। এই স্বয়ংচালিত যানের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে টায়ার। আমাদের দেশে মোটরযান শিল্প যেমন ক্রমশঃ প্রসার লাভ করছে ও স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে উঠছে, তেমনি টায়ার শিল্পও আজ এক বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

গত জানুয়ারী মাসে ব্যাঙ্গালোরে বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশন শেষ হবার পর মার্কিন তথ্য-কেন্দ্রের আমন্ত্রণে মাদ্রাজ শহরের উপকণ্ঠে তিরুবত্তী আয়ার অঞ্চলে মাদ্রাজ রাবার ফ্যাক্টরী দেখবার সুযোগ হয়। এই কারখানায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'ম্যানসফিল্ড' প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় মোটরগাড়ী ও ট্রাকের উন্নত ধরণের টায়ার নির্মিত হচ্ছে। কারখানার ম্যানেজার শ্রীজে. ভি. রামানা এবং টায়ার নির্মাণের ম্যানেজার শ্রী টি. ইয়াপেন কোশী আমাদের কারখানার বিভিন্ন বিভাগ ঘুরিয়ে দেখান এবং টায়ার নির্মাণের সমস্ত কলকৌশলের ব্যাখ্যা করেন।

টায়ারের আদি কথা

মোটরগাড়ীর আদি যুগে গাড়ীতে নীরেট টায়ার ব্যবহৃত হতো। নীরেট টায়ার খুব ভারী বলে আইরিশ বিজ্ঞানী ডানলপ ফাঁপা টায়ারের প্রচলন করেন 1893 খৃষ্টাব্দে। এগুলির গা ছিল সমতল। এজন্যে এই টায়ার পিছ্‌লে যেত অনেক সময়। এই অসুবিধা দূরীকরণের জন্যে আবিষ্কৃত হয় খাঁজ-কাটা (Non-skid) টায়ার। এরপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গুডইয়ার টায়ার জোড়া দেবার ভালকানিজেশন পদ্ধতি (Vulcanisation) আবিষ্কার করেন।

গুডইয়ার ছিলেন ফিলাডেলফিয়ার একজন ব্যবসায়ী। অল্প বয়স থেকেই তিনি রাবারকে এমনভাবে তৈরি করতে চেয়েছিলেন, যাতে সেটা খুব ঠাণ্ডা বা খুব গরমে টেক্‌সই হয়। গুডইয়ার কিন্তু রসায়নবিদ্যা জানতেন না কিছুই। রাবারের সঙ্গে এটা-ওটা মিশিয়ে তিনি পরীক্ষা করতেন, অবশ্য জানতেন না তার ফল কি হবে।

একদিন তিনি রাবারের আঠার সঙ্গে গন্ধক মিশিয়ে পরীক্ষা করছিলেন। মিশ্রিত জিনিষ খানিকটা পড়ে গেল একটা উত্তপ্ত ষ্টোভের উপর। তিনি বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করলেন, ওটা গলে গেল না। গুডইয়ার যা চাচ্ছিলেন, তা-ই আকস্মিকভাবে পেয়ে গেলেন। ফলে আবিষ্কৃত হলো মোটরগাড়ীর আধুনিক টায়ার।

টায়ারের বিভিন্ন অংশ

আজকাল মোটরগাড়ী ও ট্রাকে যে টায়ার ব্যবহৃত হয়, তা প্রধানতঃ তিনটি অংশ নিয়ে গঠিত। এই তিনটি অংশ হচ্ছে—(1) ট্রেড (Tread), (2) প্লাইজ (Plies), (3) বীড্‌স (Beads)। ট্রেড বলতে বোঝায় টায়ারের সেই অংশটি—যা পথের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসে এবং পথে চলাচলের ফলে যা কালক্রমে জীর্ণ হয়। যে ধরণের গাড়ীতে (যাত্রীবাহী বা পণ্যবাহী ট্রাক) টায়ার লাগানো হবে এবং যে ধরণের

---

*দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ, কলকাতা-29।

রাস্তার উপর দিয়ে গাড়ী যাতায়াত করবে, সেই অনুযায়ী টায়ারের আকার ও তার প্রস্তুত-প্রণালীর তারতম্য ঘটে। পথে চলাচলের সময় ট্রেড অংশটি কেটে, ছিঁড়ে বা ফেটে যেতে পারে। একারণে ট্রেড অংশটি যাতে তাড়াতাড়ি জীর্ণ না হয়, সেদিকে দৃষ্টি রেখে টায়ার-বিশেষজ্ঞ রসায়ন-বিজ্ঞানীরা টায়ার প্রস্তুতের সময় যথোপযুক্ত রাসায়নিক পদার্থসমূহ সুষম পরিমাণে ব্যবহার করেন। এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে এমনভাবে টায়ার প্রস্তুত করা, যাতে পিছ্লানো রোধ করা যায়, টায়ার সবচেয়ে কম নমনীয় হয়, অনিয়মিতভাবে জীর্ণ না হয় এবং যতদূর সম্ভব বেশী দিন ভালভাবে চলতে পারে।

টায়ারের প্লাইজ অংশটিকে আমাদের দেহের অস্থি-কাঠামোর সঙ্গে তুলনা করা যায়। সংশ্লিষ্ট মহলে চলতি কথায় এদের বলা হয় ক্যানভাস বা কারক্যাস। টায়ারের এই অংশটি ভারী বোঝা বহনের শক্তি যোগায় এবং সাধারণতঃ এমন শক্ত হয় যে, বাইরের অংশ (ট্রেড) একাধিকবার বদ্লানো যেতে পারে। প্লাইজ হচ্ছে বলতে গেলে একটি তন্তুজ কাঠামো। সাধারণতঃ নাইলন বা কৃত্রিম রেশম দিয়ে এই তন্তু তৈরি হয়। পরপর দুটি তন্তুর মাঝখানে থাকে একটি স্থিতিস্থাপক রাবারের স্তর, যার ফলে তন্তুগুলি পরস্পর থেকে তাপ-অন্তরিত হয়। এই ধরণের কয়েকটি প্লাইজ এমনভাবে সাজানো হয়, যাতে একান্তর প্লাইজ একটা নির্দিষ্ট কোণে ছেদ করে। এই কোণ হচ্ছে টায়ার প্রস্তুতের ক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্লাইজে যে রাবার যৌগগুলি ব্যবহার করা হয়, সেগুলি তন্তুর সঙ্গে এঁটে লেগে থাকতে বিশেষ সাহায্য করে এবং স্থিতিস্থাপকতা অনেকখানি বাড়িয়ে দেয় ও আভ্যন্তরীণ তাপ উৎপাদন যতদূর সম্ভব কমিয়ে আনে।

বীড বলতে টায়ারের সেই অংশকে বোঝায়, যা মোটরযানের চাকার বেড়ের সঙ্গে টায়ারকে ধরে রাখে। বীড তৈরি হয় উচ্চ প্রসারণশীল ইস্পাতের তার দিয়ে। ইস্পাতের তার ছাড়া বীড তৈরির উপকরণে থাকে রাবারের খাদ, রাবারের অংশবিশেষ। এই সমস্ত উপকরণ টায়ারের বীড অংশকে চাপ ও টানের ক্ষতিকারক প্রভাব থেকে রক্ষা করে এবং টায়ারকে সুদৃঢ় থাকবার শক্তি যোগায়।

টায়ারের প্রস্তুত-প্রণালী

যে কোন টায়ারের কারখানায় গেলে প্রথমে চোখে পড়ে বানবারি মিক্সার (Banbury Mixer)। এই মিশ্রণ যন্ত্রে রাবার ও কনভেয়র বেল্টের সাহায্যে বাহিত বিবিধ রাসায়নিক দ্রব্য মেশানো হয় এবং পাঁচ মিনিটের মধ্যে প্রায় 500 পাউণ্ড ওজনের মিশ্রিত রাবার যৌগ বেরিয়ে আসে। উপকরণগুলি যাতে সম্পূর্ণ ও সমভাবে মিশ্রিত হয়, তার জন্যে এরপর একটি খোলা মিলে (মিশ্রণের আধার) মিশ্রণকারী যন্ত্রের সাহায্যে আরও ভালভাবে মেশানো হয়। এই সময় যে সব রাসায়নিক দ্রব্য যোগ করা হয়, সেগুলি হচ্ছে গন্ধক, কার্বন-ব্ল্যাক, জিঙ্ক অক্সাইড, স্টিয়ারিক অ্যাসিড ইত্যাদি। এর মধ্যে কতকগুলি দেওয়া হয় মিশ্রণকার্য ঠিকভাবে সম্পাদনের জন্যে, কতকগুলি দেওয়া হয় রাবারের অক্সিজেন সংযোগ (যা কালক্রমে হবার সম্ভাবনা থাকে) প্রতিরোধের জন্যে এবং বাকীগুলি যোগ করা হয় রাবারের উপর গন্ধকের প্রভাব ত্বরান্বিত করবার জন্যে। প্রত্যেক বার এই সমস্ত উপকরণ মিশিয়ে যে মিশ্র যৌগ প্রস্তুত হয়, তা যথাযথভাবে মিশ্রিত হয়েছে কিনা পরীক্ষা করে দেখা হয়। মিশ্র যৌগের আপেক্ষিক গুরুত্ব, দ্রাঢ্য ইত্যাদি পরীক্ষা করে তা নির্ধারণ করা যায়।

মিশ্রণ আধার থেকে মিশ্র রাবার যৌগ এরপর এক্সট্রুডার (Extruder) নামে একটি যন্ত্রে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। এক্সট্রুডারের কাজ

হচ্ছে অনেকটা মাংস টুক্‌রা করবার দা-র মত। এক্সট্রুডার থেকে যে গরম রাবার যৌগ বেরিয়ে আসে, তা এক্সট্রুডারের মুখে লাগানো নির্দিষ্ট আয়তনের ছাঁচে প্রবেশ করে। এই ছাঁচে রাবার যৌগের পাতের পুরুত্ব নির্ধারিত হয়। এই রাবারের পাত্‌ দিয়ে নির্দিষ্ট আয়তনের টায়ারের ট্রেড অংশ প্রস্তুত হয়। ট্রেডের নীচের দিকে পলিথিন প্রলেপের একটি আবরণ জুড়ে দেওয়া হয়। ট্রেড ও প্লাইজ অংশ দুটিকে ভালভাবে সংযুক্ত করে রাখতে এই পলিথিনের আবরণ সাহায্য করে। আবরণযুক্ত ট্রেড এরপর জলের একটা লম্বা ট্যাঙ্কে এসে পৌঁছয় এবং সেখান থেকে ঠাণ্ডা ও পরিষ্কার হয়ে বেরিয়ে আসে। এরপর এটাকে নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যে কেটে ফেলা হয়। কি আয়তনের টায়ার তৈরি হবে, সেই অনুযায়ী এই দৈর্ঘ্য নির্ভর করে।

টায়ারের তন্তুজ অংশের আলোচনায় এবার আসা যাক। আগেই বলা হয়েছে, তন্তুজ অংশ গঠিত হয় নাইলন বা রেয়ন (কৃত্রিম রেশম) তন্তু দিয়ে। এই তন্তুকে টায়ারের পেশীতন্তুস্বরূপ বলা যায়। তন্তুজ অংশের দ্রাঢ্য গড়ে তোলবার জন্যে (যা ছাড়া টায়ারের দ্রাঢ্য বৃদ্ধি করা যায় না) একরকম নির্যাসের দ্রবণে ডোবানো হয়। এই দ্রবণে থাকে প্রধানতঃ সংশ্লেষিত ভিনাইল পিরিডাইন নির্যাস এবং কিছু পরিমাণ প্রকৃতিজ রাবারের নির্যাস। দ্রবণে ডোবানো তন্তু এরপর সম্পূর্ণ শুষ্ক ও প্রসারিত করা হয়। অতি জটিল যন্ত্রপাতির সাহায্যে তন্তুর ডোবানো, শুকানো ও প্রসারণ-ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। মাদ্রাজ রাবার ফ্যাক্টরিতে এই ধরণের যে যন্ত্রপাতি আছে, তা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মধ্যে সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতির অন্যতম।

দ্রবণে ডোবানো তন্তু এরপর তিনটি রোলারের উপর রাবার যৌগের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়। রাবার মিশ্রণের আধারে যে গরম রাবার যৌগ প্রস্তুত হয়, তা উপরের ও মাঝখানের রোলারের মধ্যে ঢোকানো হয়। যথাযথভাবে শুকিয়ে নেবার পর তন্তুজ অংশ মাঝখানের ও নীচের রোলারের মধ্যে ঢোকানো হয়। রোলারগুলির মধ্যে ব্যবধান বা ফাঁক কমানো-বাড়ানো যায়। যৌগের উপর তন্তুজ আবরণ খুব পাত্‌লা করে দেওয়া হয় এবং এক ইঞ্চির ভগ্নাংশের মধ্যে তা আনা যায়। ইলেকট্রনিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় এটা করা সম্ভব হয়। প্রথমে একদিকে আবরণ দেওয়া হয়, তারপর আরেক দিকে।

তন্তুজ আবরণ দেওয়া রাবার এবার নির্দিষ্ট প্রস্থে কাটা হয়। টায়ার প্রস্তুতের ক্ষেত্রে যে কোণে ও যে প্রস্থে এই কাটা হবে, সেটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই কারণে একটু এদিক-ওদিক যাতে না হয়, সে জন্যে ফটো-ইলেকট্রিক কোষের সাহায্যে এই কাটা নিয়ন্ত্রণ করা হয়। তন্তুজ প্রলেপ দেওয়া কাটা রাবার এরপর টায়ার তৈরির যন্ত্রপাতিতে নিয়ে আসা হয়।

পিতল বা তামার আবরণ দেওয়া উচ্চ প্রসারণশীল ইস্পাতের তারের বীড একটি অতি-ক্ষুদ্র রাবার এক্সট্রুডারের মধ্য দিয়ে চালনা করা হয়। এর ফলে বীডের তারের উপর রাবারের প্রলেপ জুড়ে যায়। রাবারের প্রলেপ দেওয়া বীডের তারগুলি দিয়ে নির্দিষ্ট ব্যাসের বেড় তৈরি করা হয়। যে আয়তনের টায়ার তৈরি হবে, সেই অনুযায়ী বীডের বেড়ের ব্যাস ঠিক করা হয়। বীডের বেড় এরপর তন্তুজ বস্ত্র দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। বেড়গুলিকে যথাস্থানে রাখবার জন্যে এটা করা দরকার হয়।

ট্রেড অংশ এবং তন্তুজ অংশ এভাবে প্রস্তুত করবার পর টায়ার তৈরির যন্ত্রপাতিতে সেগুলিকে জোড়া হয়। টায়ার তৈরির যন্ত্রপাতির সামনে টারেট (Turret) নামে রোলে কাটা তন্তুজ প্লাইজ ঢোকানো হয়। অপারেটর যাতে একটার পর একটা প্লাইজ সহজে ঢোকাতে পারেন, সে জন্যে এই ব্যবস্থা করা হয়। টায়ার তৈরির

যন্ত্রপাতির পিছন দিকে ট্রেড অংশগুলিকে রাখা হয়। এই ব্যবস্থাও অপারেটরের কাজের সুবিধার জন্যে।

টায়ার তৈরির যন্ত্রপাতি

টায়ার তৈরির যন্ত্রপাতির মধ্যে থাকে একটি ঘূর্ণায়মান ড্রাম এবং ড্রামের উপর বিভিন্ন দেন। তার ফলে ড্রামে তন্তুজ অংশ বেশ শক্তভাবে গুটিয়ে যায়। এটি হলো টায়ারের প্রথম প্লাইজ। যে ধরণের টায়ার তৈরি হবে, তার উপর নির্ভর করে প্লাইজের সংখ্যা। ট্রাকের টায়ারের জন্যে দরকার হয় 10 থেকে 16 প্লাইজ, মোটর গাড়ীর জন্যে 4 থেকে 8 প্লাইজ, আর স্কুটারের জন্যে 2 থেকে 4 প্লাইজ।
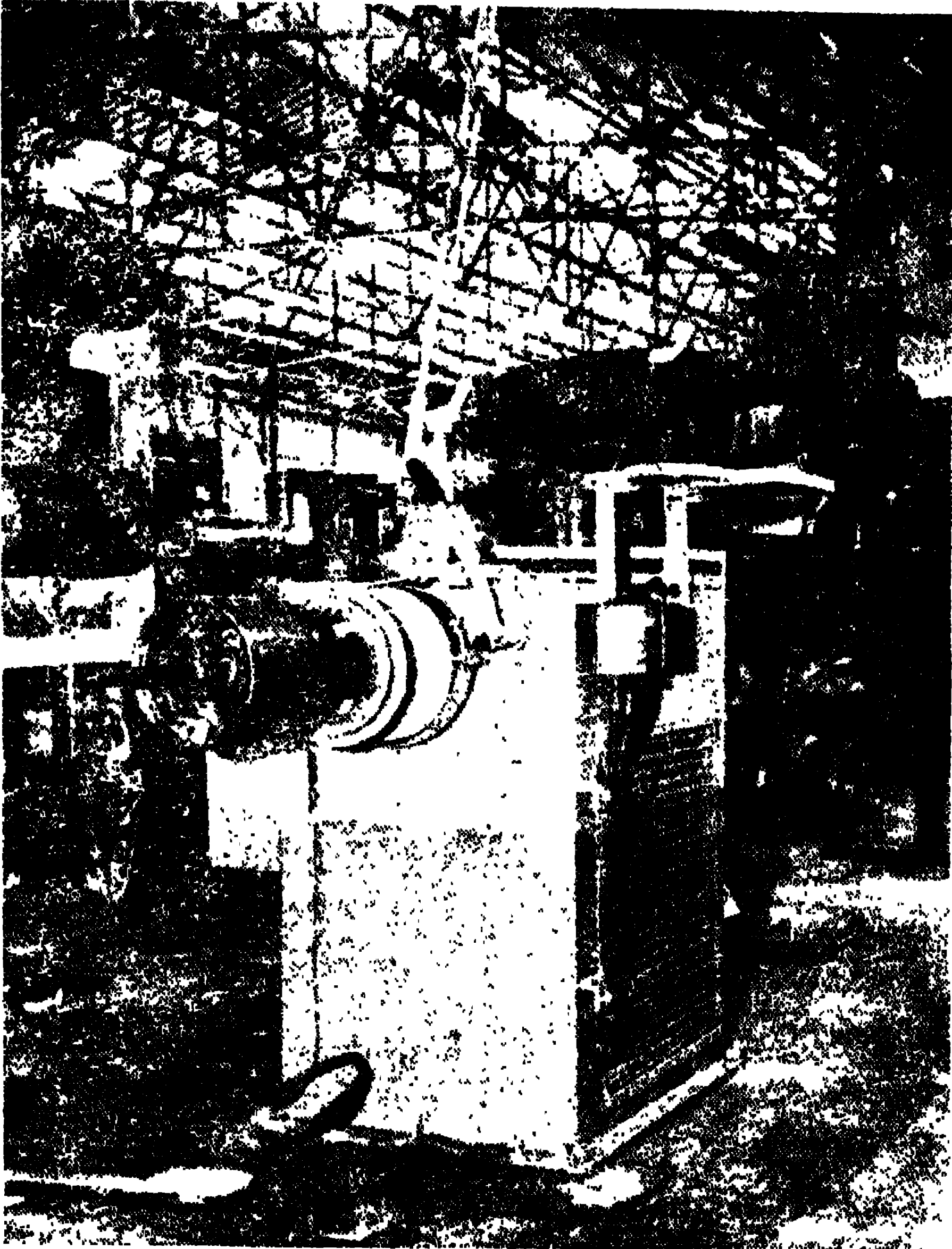
টায়ার তৈরির যন্ত্রপাতি

প্লাইজকে লাগাবার জন্যে একটি গাইড টেবল। তন্তুজ অংশের একটা প্রান্ত অপারেটর ড্রামে ঢুকিয়ে ও গুটিয়ে দেন এবং অপর প্রান্ত পাকিয়ে

প্রথম প্লাইজ দেবার পর অপারেটর দ্বিতীয় প্লাই সাজিয়ে দেন। প্রথম প্লাই যেদিকে দেওয়া হয়, দ্বিতীয়টি দেওয়া হয় তার বিপরীত দিকে।

উত্তর দিকে টায়ারকে মজবুত করে তোলবার জন্যে এই ব্যবস্থা করতে হয়। এভাবে নির্দিষ্ট ধরণের টায়ারের জন্যে নির্দিষ্ট সংখ্যক প্লাই সাজানো হয়। তারপর সেগুলিকে সতর্কতার সঙ্গে মসৃণ এবং বায়ু-চাপের দ্বারা চালিত যন্ত্রের সাহায্যে জোড়া হয়। এর ফলে প্লাইজের মাঝখানে বায়ু থাকলে তা দূরীভূত হয় এবং প্লাইগুলি ঠিকভাবে জুড়ে যায়। বীড তারের পাকানো কুণ্ডলী এরপর প্লাইজের উত্তর প্রান্তে রাখা হয় এবং প্রান্তগুলি ড্রামের দুই দিক থেকে গুটিয়ে বীডের উপর আনা হয়। এভাবে পাউণ্ড বায়ুচাপে চালিত জোড়া লাগাবার যন্ত্রের সাহায্যে ট্রেড যথাযথভাবে জুড়ে দেওয়া হয়। টায়ার তৈরির যে ড্রামের উপর এই সমস্ত কাজ এতক্ষণ সম্পাদন করা হয়েছে, তা থেকে টায়ারটিকে সরিয়ে এনে এবার র‍্যাকে রাখা হয়।

এভাবে যে টায়ার প্রস্তুত হলো, তাকে বলা হয় কাঁচা টায়ার (Green Tyre)। কাঁচা বলবার কারণ, এতক্ষণ পর্যন্ত টায়ারকে ভাল্কানাইজ্‌ড্‌ করা হয় নি। এবার এয়ার ব্যাগ (Air bag) নামে একটি পুরু রাবার টিউব টায়ারের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। ছাঁচের মধ্যে টায়ারকে
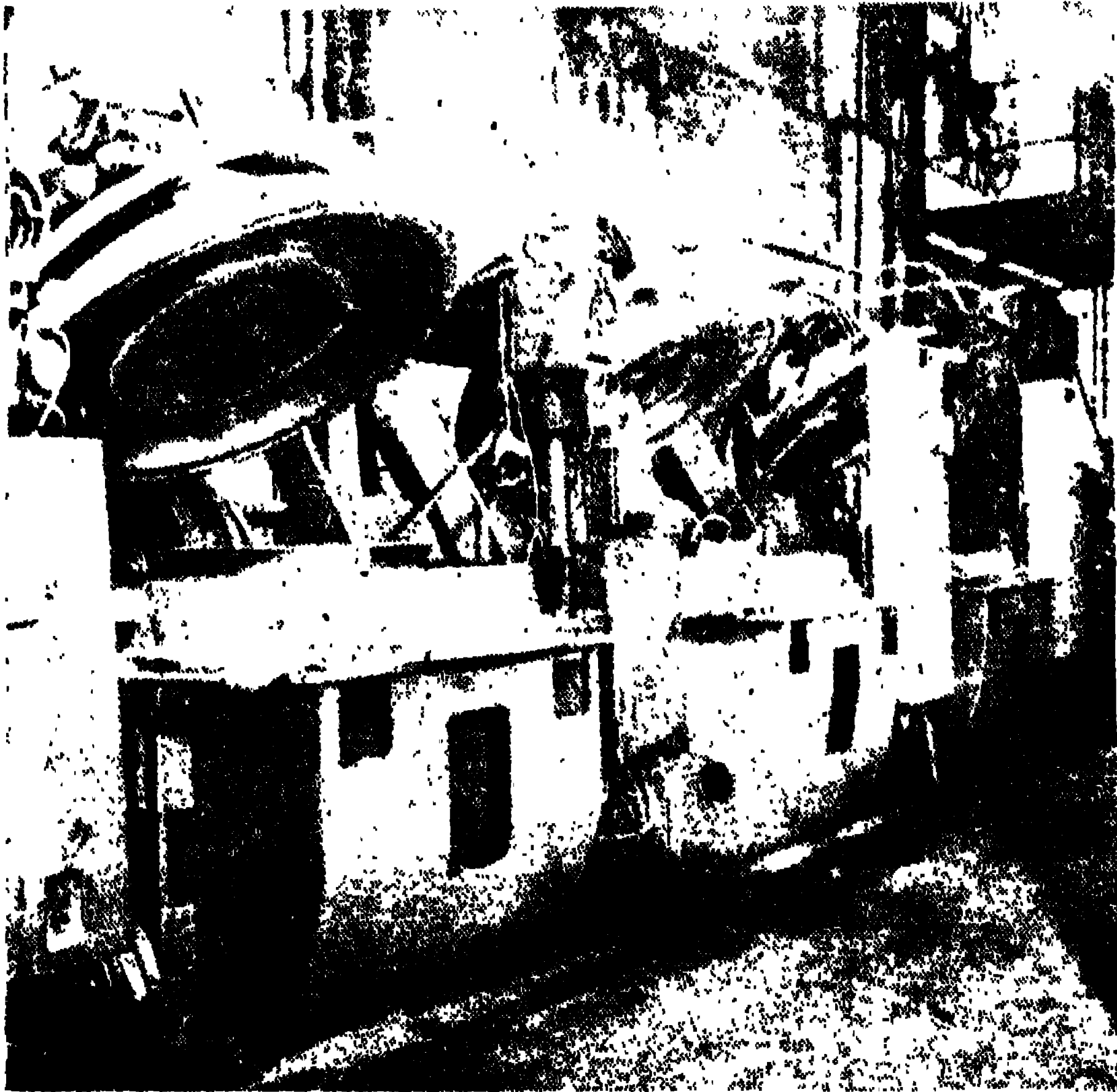
টায়ারের ছাঁচ

প্লাইজের দ্বারা বীডগুলি যথাস্থানে দৃঢ়ভাবে জুড়ে থাকে।

অপারেটরের সামনে যে ট্রেড ছিল, সেটি এবার প্লাইজের উপর চাপানো হয়। 100 সর্বশেষ আকৃতি দেওয়া ছাড়া টায়ার এখন প্রায় সম্পূর্ণ তৈরি হয়ে এসেছে।

ছাঁচ দু-ভাগে বিভক্ত। ট্রেডের প্যাটার্ন ছাঁচে কেটে বসানো হয়। ছাঁচের নীচের দিকে অর্ধাংশে

এয়ার ব্যাগসমেত টায়ার এবার ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। ঢোকাবার পর ছাঁচটি বন্ধ করা হয় এবং টায়ারের ভাল্কানাইজেশন আরম্ভ হয়। তাপের সাহায্যে এই প্রক্রিয়া সম্পাদন করা হয়। এজন্যে 288° থেকে 300° ফাঃ পর্যন্ত তাপমাত্রা প্রয়োজন হয়। টায়ারের মধ্যে এয়ার ব্যাগে 175 পাউণ্ড বায়ু-চাপ দেওয়া হয়। তাপ প্রয়োগের ফলে প্রথমে রাবার নমনীয় হয়ে ওঠে। এয়ার ব্যাগের মধ্যে চাপ এই রাবারকে ছাঁচের ভিতরে কাটা আকৃতির রূপ দেয়। ক্রমশঃ রাবার তার নমনীয়তা হারিয়ে শক্ত হতে থাকে এবং এই প্রক্রিয়াই হলো ভাল্কানাইজেশন। সমস্ত কাজ সম্পাদিত হয় স্বয়ং-চালিত যন্ত্রের সাহায্যে। এই সমস্ত কাজ সম্পাদন করতে সময় লাগে মোটরগাড়ীর টায়ারের জন্যে 45 মিনিট এবং ট্রাকের টায়ারের জন্যে দেড় ঘণ্টা। ছাঁচ থেকে টায়ার বের করবার পর তার গায়ে রাবারের ছোট ছোট খোঁচ দেখা যায়। এগুলিকে যন্ত্রের সাহায্যে ছেঁটে ফেলা হয়। টায়ার তৈরি এখন সম্পূর্ণ হয়েছে। টায়ারে কোনরকম দোষত্রুটি থেকে গেছে কিনা, তা পরীক্ষা করে দেখবার জন্যে এর পর মান নিয়ন্ত্রণ (Quality Control) বিভাগে প্রত্যেকটি টায়ারকে পাঠানো হয়। সেখানে পরীক্ষায় উপযুক্ত বলে প্রমাণিত হবার পরই টায়ারকে বাজারে ছাড়া হয়। এই হলো টায়ার তৈরির সম্পূর্ণ কাহিনী।

ভারতে টায়ার শিল্প

মাদ্রাজ রাবার ফ্যাক্টরিতে বিমানযানের টায়ার ছাড়া অন্য সব রকমের টায়ার তৈরি হয়। এখানে বছরে 4 লক্ষ 50 হাজার টায়ার (সব রকমের) তৈরি হয়ে থাকে। ভারতে বিমানযানের চাকার উপযোগী টায়ার তৈরি হয় একমাত্র ডানলপ রাবার ফ্যাক্টরিতে। ট্রাকের টায়ারের প্রত্যেকটির দাম হচ্ছে এক হাজার টাকা এবং মোটরগাড়ীর টায়ারের প্রত্যেকটির দাম 200 টাকা। ট্রাকের টায়ার সাধারণতঃ স্থায়ী হয় এক বছর এবং মোটরযানের টায়ার দু-তিন বছর।

আন্তর্জাতিক মানের দিক থেকে ভারতের তৈরী টায়ার যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। এই কারণে বহির্ভারতের বহু দেশে ভারতে তৈরী টায়ার রপ্তানী হচ্ছে। শ্রীরামানা আমাদের জানালেন, শুধু গত বছরেই এক-মাত্র মাদ্রাজ রাবার ফ্যাক্টরি থেকে টায়ার-টিউব মিলিয়ে প্রায় 55 লক্ষ টাকার মত সামগ্রী বিদেশে রপ্তানী হয়েছে। তার শতকরা 35 ভাগ গেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, অবশিষ্ট মধ্য প্রাচ্য, পূর্ব আফ্রিকা এবং পূর্ব ইউরোপে। এছাড়া ক্যানাডা, সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র, ইরাক, কোয়াইট, যুগোশ্লাভিয়া, পূর্ব জার্মেনী, ইরান, বার্মা, থাইল্যাণ্ড, সিংহল, ইথিওপিয়া, মরিশাস এবং সুদানেও সম্প্রতি এই কারখানা থেকে টায়ার রপ্তানী হয়েছে। গত কয়েক বছরে উৎ-পাদনের শতকরা 10 ভাগ বিদেশে রপ্তানীর যোগ্যতা অর্জন করায় ভারত সরকার এই প্রতিষ্ঠানকে মেরিট সার্টিফিকেট দিয়েছেন। ভারতীয় শিল্পোদ্যোগের ক্ষেত্রে মাদ্রাজ রাবার ফ্যাক্টরি আজ এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে, একথা আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি।

প্রাণ-পরিপোষক মকরধ্বজ

শ্রীমাধবেন্দ্রনাথ পাল

প্রস্তাবনা

রাসায়নিক বিক্রিয়া বা রূপান্তর সাধন এবং উক্ত বিক্রিয়ার গতি ত্বরান্বিত করিবার জন্য বহুবিধ পদার্থ অতি সামান্য মাত্রায় ব্যবহার করা হয়। এই পদার্থগুলি নিজেরা রূপান্তরিত হয় না বরং উক্ত বিক্রিয়া সাধনের শেষে অপরিবর্তিত অবস্থায় থাকে। এই সকল পদার্থকে বলা হয় ক্যাটালিস্ট বা অনুঘটক। অনুঘটক জৈব বা অজৈব উভয় রকমের পদার্থ হইতে পারে। জীবন্ত বস্তুর মধ্যে এমন অনেক জৈব পদার্থ পাওয়া যায়, যাহারা জীবন্ত বস্তুর মধ্যে যে সকল রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে, তাহা সম্পাদন এবং ঐ সকল বিক্রিয়ার গতি দ্রুততর করিতে পারে। ইহাদিগকে বলে জৈব-অনুঘটক বা এনজাইম।

আবার এমন অনেক পদার্থ পাওয়া যায়, যাহা অতি অল্প মাত্রায় প্রয়োগ করিলে অনুঘটকের কার্যকারিতা বর্ধিত হয়। এই প্রকার পদার্থের নাম অনুঘটক-পরিপোষক বা প্রোমোটার। প্রধানতঃ জৈব অনুঘটক জীবন্ত বস্তুর মধ্যে বর্তমান থাকে বলিয়া উহারা স্বতঃই প্রাণচাঞ্চল্যের সহায়ক। যে পদার্থ এই প্রকার জৈব অনুঘটকের কার্যকারিতা বর্ধিত করিতে পারে, তাহাকে এনজাইম-প্রোমোটার বা প্রাণ-পরিপোষক পদার্থ বলা যায়। পরবর্তী অংশের আলোচনা হইতে লেখকের অনুমান হয় যে, মকরধ্বজ এই প্রকার একটি প্রাণ-পরিপোষক পদার্থ।

মকরধ্বজের কার্য-তৎপরতা

মকরধ্বজ প্রধানতঃ ত্রিবিধ ধারায় ক্রিয়া করিয়া থাকে। প্রথমতঃ, ইহা মুমূর্ষু রোগীর ক্ষেত্রে সঞ্জীবনী শক্তি দ্রুত পুনরুদ্ধার করিয়া থাকে। দ্বিতীয়তঃ, জীর্ণ আহার্য দ্রব্য সুষ্ঠুভাবে পরিপাকের পর দেহের পুষ্টিসাধন করে। রসায়নরূপে সেবন করিলে মকরধ্বজ এই প্রকার দেহ-পোষণের কার্যে বিশেষভাবে সহায়তা করে। তৃতীয়তঃ, বিভিন্ন রোগের উপযুক্ত ভেষজ অনুপান হিসাবে মকরধ্বজের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করিলে ঐ সকল রোগ নিরাময়ে মকরধ্বজ দ্রুত ফলপ্রসূ হইয়া থাকে। শেষোক্ত ক্ষেত্রে মকরধ্বজ উক্ত ভেষজসমূহের কার্যকারিতা বর্ধিত করে বলিয়া মনে হয়। এই প্রসঙ্গে লেখকের "মকরধ্বজের রহস্য" শীর্ষক প্রবন্ধ (জ্ঞান ও বিজ্ঞান, মার্চ 1968, 21শ বর্ষ 3য় সংখ্যা পৃঃ 134-140) দ্রষ্টব্য।

অতি প্রাচীনকালে প্রধানতঃ উদ্ভিজ্জ পদার্থ ভেষজরূপে প্রয়োগ করা হইত। উহারা সাধারণতঃ কাষ্ঠৌষধি নামে পরিচিত। অনেক ক্ষেত্রে উহাদের কার্যকারিতা প্রবল হইলেও উহাদের ভেষজ-ক্ষমতা বেশী দিন থাকে না। কিন্তু খনিজ পদার্থ ভেষজরূপে প্রয়োগ করিলে উহাদের কার্যকারিতা অপেক্ষাকৃত দীর্ঘস্থায়ী হয়। নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসকগণ লক্ষ্য করেন যে, পারদ বা রসের সংযোগে উৎপন্ন খনিজ ভেষজের কার্যকারিতা প্রবল ও দীর্ঘস্থায়ী হয়। এই প্রসঙ্গে পারদ ও গন্ধকের সংমিশ্রণে উৎপন্ন কজ্জলী, পর্পটি ইত্যাদি ভেষজের কার্যকারিতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই শ্রেণীর অন্তর্গত রস বা পারদঘটিত ভেষজ রসৌষধি নামে পরিচিত। বহু চিকিৎসকের দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতালব্ধ তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া কাষ্ঠৌষধি (উদ্ভিজ্জ)

ও রসৌষধির (খনিজ) সংমিশ্রণ ঘটাইয়া দেখা গেল যে, উক্ত মিশ্রিত ভেষজের কার্যকারিতা প্রবলতর ও অপেক্ষাকৃত দীর্ঘস্থায়ী হয়।

অর্জুন ছাল হৃদ্‌রোগ উপশম করে। কিন্তু অভ্র (খনিজ) ও অর্জুন ছালের কাথে (উদ্ভিজ্জ) ভাবনা দিয়া প্রস্তুত নাগার্জুনাভ্র নামক ভেষজটি প্রধানতঃ হৃদ্‌রোগে বিশেষ ফলপ্রদ। ধুতুরা, সিদ্ধি, বৃদ্ধদারক ইত্যাদি উদ্ভিজ্জ এবং পারদ ও অভ্র প্রভৃতি খনিজ পদার্থের সহযোগে প্রস্তুত লক্ষ্মীবিলাস ভেষজ সর্বপ্রকার জ্বর, বিশেষতঃ বাতশ্লৈষ্মিক জ্বরে অত্যন্ত ফলপ্রদ। বিষ (অ্যাকোনাইট), মরিচ ইত্যাদি উদ্ভিজ্জ পদার্থের সহিত হিঙ্গুল (প্রকৃতিজাত পারদ ও গন্ধক যৌগিক পদার্থ) মিশ্রিত করিয়া উৎপন্ন মৃত্যুঞ্জয় নামক ভেষজ সকল প্রকার জ্বর, বিশেষতঃ অজীর্ণজনিত জ্বরে দ্রুত সুফল প্রদান করে। জৈত্রী, লবঙ্গ, ক্ষীরকাকলী, অশ্বগন্ধা ইত্যাদির সহিত লৌহ, অভ্র, রৌপ্য ও রসসিন্দুর (পারদ ও গন্ধকঘটিত) সহযোগে উৎপন্ন রসরাজ রস বাতব্যাধি, হৃদ্‌রোগ ইত্যাদির ক্ষেত্রে বিশেষ কার্যকরী। লক্ষণীয় যে, লক্ষ্মীবিলাস, মৃত্যুঞ্জয়, রসরাজ রস প্রতিটি ভেষজের মধ্যে পারদ—হয় প্রাকৃতিক খনিজ, না হয় কৃত্রিম যৌগিক পদার্থরূপে বিদ্যমান এবং সম্ভবতঃ পারদের সান্নিধ্যে ঐ সকল ভেষজের কার্যকারিতা বর্ধিত হইয়া থাকে।

আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসকের নিকট নবায়স পাণ্ডু বা কামলা (জণ্ডিস) রোগের একটি অমোঘ ভেষজ। ইহার উপাদান হইতেছে—লৌহ, ত্রিকটু (শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ), ত্রিমদ (চিতা, মুথা ও বিড়ঙ্গ) এবং ত্রিফলা (হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া)। শেষোক্ত নয়টি উপাদানের প্রতিটি এক এক ভাগ করিয়া নয় ভাগ এবং উহার সমভাগ লৌহ (আয়স) ভস্মের মিশ্রণে উৎপন্ন বলিয়া ভেষজটি নবায়স নামে পরিচিত। কাষ্ঠৌষধি ও খনিজৌষধির সংমিশ্রণে উৎপন্ন হওয়ায় ইহার কার্যকারিতা প্রবল ও অপেক্ষাকৃত দীর্ঘস্থায়ী।

এই সকল আয়ুর্বেদীয় ধারণা ও জারণ-বিজারণ সংক্রান্ত ইলেকট্রনিক-তত্ত্বের কতকগুলি ধারণার বশবর্তী হইয়া লেখক জনৈক বিশিষ্ট কবিরাজকে প্রস্তাব দেন যে, নবায়সের সহিত মকরধ্বজ মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ-ব্যবস্থা দিলে সম্ভবতঃ নবায়সের কার্যকারিতা বর্ধিত হইতে পারে। কবিরাজ মহাশয় উক্ত প্রস্তাবানুসারে কয়েকটি ক্ষেত্রে মকরধ্বজসহ নবায়সের ব্যবস্থা দেন এবং লক্ষ্য করেন যে, রোগীর রক্তাল্পতা যেরূপ সময়ে সচরাচর দূরীভূত হইয়া সাধারণ পুষ্টি ঘটিয়া থাকে, তদপেক্ষা অল্প সময়ের মধ্যেই তাহা সম্ভব হইয়াছে। ইহাতে লেখকের অনুমান আরও দৃঢ় হইতেছে যে, মকরধ্বজ সহযোগে শুধুমাত্র আয়ুর্বেদোক্ত ভেষজই নয়, অপর যে কোন প্রকার কৃত্রিম ভেষজ (কেমোথিরাপিউটিক ঔষধ) ইত্যাদি প্রয়োগ করিলে উহাদের কার্যকারিতা বর্ধিত হওয়া সম্ভব এবং সে ক্ষেত্রে প্রচলিত মাত্রা অপেক্ষা অল্প মাত্রায় সেই সব ভেষজ সামান্য মকরধ্বজ সহযোগে প্রয়োগ করিয়া বাঞ্ছনীয় ফল পাওয়া যাইতে পারে। কিভাবে তাহা সম্ভব হইতে পারে, সেই বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোকপাতের চেষ্টা করিব।

জীবকোষের কার্য-পদ্ধতি

দেহের ভিতরে কোন ভেষজ সাধারণতঃ কিভাবে কাজ করিয়া থাকে, তাহা বুঝিতে হইলে মনে রাখিতে হইবে যে, কোটি কোটি জীবকোষের সমবায়ে মানুষের দেহ গঠিত। উহাদের তৎপরতার ফলে প্রাণের স্পন্দন চলিতে থাকে। কোন কারণে সেই তৎপরতা ব্যাহত হইলে বা বাধা পাইলে প্রাণের স্পন্দন শিথিল ও স্তিমিত হইয়া আসে এবং অন্য কোন উপায়ে উত্তেজিত করিতে পারিলে তাহা আবার স্বাভাবিক সচল

অবস্থায় ফিরিয়া আসিতে পারে। ভেষজ মূলতঃ এইরূপ উত্তেজনার সহায়ক হইয়া থাকে।

জীবকোষ এতই সূক্ষ্ম যে, অতি শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্র ব্যতীত সেগুলিকে দেখা সম্ভব নয়। জীবকোষের চতুর্দিকে একটি সূক্ষ্ম ঝিল্লীর আবরণ (মেমব্রেন) থাকে। উহার ভিতর দিকে ফ্যাট (স্নেহজাতীয় পদার্থ, যেমন—ঘৃত, মাখন ইত্যাদি), প্রোটিন (আমিষজাতীয় পদার্থ, যথা—অ্যালবুমেন, ছানা ইত্যাদি), কার্বোহাইড্রেট (শর্করাজাতীয় পদার্থ, যথা—চিনি, গ্লুকোজ ইত্যাদি) এবং নানাবিধ আয়ন (তড়িৎ-আহিত পরমাণু, অণু বা অণুগুচ্ছ) মিলিয়া জট পাকাইয়া থাকে। তাহা ছাড়া শ্বাসগ্রহণের পথে আনীত অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ও প্রশ্বাসে উদ্ভূত কার্বন ডাই-অক্সাইড ইত্যাদি নানা জাতীয় গ্যাসীয় পদার্থ ও জল থাকে। জীবকোষের ঝিল্লীর উপরিতলে সুনির্দিষ্ট সজ্জায় ফ্যাট ও প্রোটিনের অণু সন্নিবিষ্ট হইয়া থাকে এবং কোষের ভিতর নানাবিধ প্রোটিন অণুর সমাবেশে যেন এক-একটি বৈচিত্র্যমণ্ডিত বিশেষ চিত্রপট বা প্রোটিন-মোসেইকের সৃষ্টি হয়। ঝিল্লীর সহিত বহিরাগত কোন অণু, যথা ভেষজের অণুর সংঘর্ষ ঘটিলে প্রোটিন মোসেইকের পুনর্বিন্যাস ঘটিয়া থাকে। প্রকৃতপক্ষে প্রডিংগার জোর দিয়া বলিয়াছেন যে, কেলাসের মধ্যে যেমন একটি নির্দিষ্ট নক্সা বার বার ধরিয়া চলিতে থাকে, ঠিক তাহার বিপরীত অবস্থা জীবকোষের ভিতর বর্তমান। বিশালাকার যে সকল অণুর সাহায্যে জীবন্ত পদার্থ গঠিত, তাহাদের সমাবেশে বিচিত্র ভঙ্গীতে রচিত চিত্রপটই (প্রোটিন-মোসেইক) মুখ্য বিষয় এবং বার বার কোন একটি ব্যাপারের পুনরাবৃত্তি এই ক্ষেত্রে আসল রহস্য নহে।

জীবকোষের ফ্যাট, প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট ও আয়ন প্রভৃতি পদার্থ কঠিন, তরল ও গ্যাসীয় অবস্থায় থাকিয়া এমন একটি পরিবেশ রচনা করে, যাহাতে জীবকোষের তৎপরতা চলিতে পারে। তৎপরতা চলিবার জন্য শক্তির প্রয়োজন। জীর্ণ আহার্য হইতে শক্তির সঞ্চার হয়। ফ্যাট, প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্য হইতে আসিয়া থাকে। ইহারা সতত নানাবিধ রাসায়নিক বিক্রিয়া, বিশেষতঃ শ্বাসের সহিত আনীত অক্সিজেনের সাহায্যে জারিত হইবার ফলে ধাপে ধাপে ক্রমশঃ নানাভাবে বিয়োজিত হইয়া থাকে এবং অবশেষে তাহা হইতে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস ও জল উৎপন্ন হয়। রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে ঐ সকল পদার্থ ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। ক্ষয় পূরণের জন্য আবার উহাদের আমদানী হওয়া প্রয়োজন। বস্তুতঃ জীবকোষের ঝিল্লী ও উহার ভিতর দিকে বর্তমান উপাদানসমূহের সতত পরিবর্তন ঘটে এবং উহাদের মধ্যে নিরন্তর বস্তু বিনিময় চলিয়া থাকে। জীর্ণ আহার্য দ্রব্য হইতে উৎপন্ন প্রোটিন ও ফ্যাট ঝিল্লীতে রূপান্তরিত হয় এবং অবশেষে উহারাই কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসরূপে মুক্ত হইয়া যায়।

জীবকোষের রাসায়নিক বিক্রিয়াসমূহ যে কেবলমাত্র ভৌত রাসায়নিক সূত্র ধরিয়া ঘটিয়া থাকে, তাহা ভাবা ঠিক হইবে না অথবা জীবকোষ শুধু যে আহার্য দ্রব্যকে অক্সিজেনের সাহায্যে জারিত করিয়া শক্তি সঞ্চার করিবার একটি মাত্র কৌশল, তাহাও ঠিক নহে। জীবকোষের নিয়ম-কানুন একটু স্বতন্ত্র ধরণের। কোষের অভ্যন্তরে এই সকল রূপান্তরের অধিকাংশই প্রধানতঃ জৈব অনুঘটক (এনজাইম) ও উত্তেজক রসের (হর্মোন) সাহায্যে নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। যে পদার্থটি কোন একটা এনজাইমের নিয়ন্ত্রণে রূপান্তরিত হয়, তাহাকে 'সাবস্ট্রেট বলে। কোন একটি এনজাইম কোন্ কোন্ সাবস্ট্রেটের রূপান্তর সাধন করিবে, তাহার সংখ্যা অত্যন্ত সীমিত। পরিচিত এনজাইম এক

এক ধরণের এক-একটি প্রোটিনবিশেষ। সাধারণতঃ এক এক ধরণের কাজের জন্য এক এক ধরণের এনজাইমের প্রয়োজন। জারণ, আর্দ্রবিশ্লেষণ, ইত্যাদি কার্য সম্পাদনের জন্য পৃথক পৃথক এনজাইম কোষের মধ্যে বর্তমান। স্টার্চ, মল্ট সুগার, প্রোটিন ও চর্বি বা স্নেহজাতীয় পদার্থের আর্দ্রবিশ্লেষণ ঘটাইবার জন্য যথাক্রমে টায়ালিন, মল্টেজ, পেপ্‌সিন ও লাইপেজ নামক এনজাইমগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কিন্তু এক-একটি এনজাইম আবার একাধিক ধরণের কাজ করিতে পারে; যথা—সাল্‌ফ্‌-হাইড্রিল এনজাইম জারণ ও আর্দ্রবিশ্লেষণ—এই দুইটি কাজের সহিত সংশ্লিষ্ট।

জীবকোষের সত্তা ও স্থায়িত্ব অটুট রাখিবার জন্য ধ্বংস ও সৃষ্টি উভয়বিধ কার্যের মধ্যে সাম্য রাখিতে হয়। একদিকে যেমন জারক, আর্দ্রবিশ্লেষক ইত্যাদি ধ্বংস-সহায়ক বিশ্লেষক এনজাইমগুলি ফ্যাট, প্রোটিন ও কার্বোহাইড্রেট প্রভৃতি পদার্থগুলির ধ্বংসসাধন করিয়া শক্তি সঞ্চার করে, অপর দিকে তেমনই অন্যান্য সৃজনশীল সংশ্লেষক এনজাইমসমূহ জীর্ণ আহার্য পদার্থ হইতে উৎপন্ন অপর সকল পদার্থ ও ধ্বংসাবশেষ হইতে কোষের চাহিদামত নূতন নূতন পদার্থ সৃষ্টি করিয়া থাকে। সেই জন্য জীবকোষের সত্তা ও স্থায়িত্ব একটি গতিশীল সাম্যাবস্থাগত ব্যাপার মাত্র। কিন্তু অজৈব পদার্থের সত্তা ও স্থায়িত্ব একই ধরণের অপরিবর্তিত অণুর অস্তিত্বের উপর নির্ভরশীল। অপর পক্ষে জীবকোষের সত্তা ও স্থায়িত্ব উহার ও উহার ভিতরে বর্তমান অণুসমূহের অবিরাম রূপান্তর সাধনের জন্যই সম্ভব হইয়া থাকে। এইরূপ রূপান্তর সাধনের ক্ষেত্রে এনজাইমের ভূমিকা কতখানি, তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে।

এনজাইম ও মকরধ্বজের যৌথ ভূমিকা

জীবকোষে ভেষজ কিভাবে কাজ করিয়া থাকে, সে সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ প্রচলিত। তাহার মধ্যে একটি সাধারণ মতবাদ এই যে, ভেষজ কোন রুগ্ন তন্তুর স্বাভাবিক গঠন ফিরাইয়া আনে না। যখন প্রকৃতির নিজস্ব কৌশলে উক্ত তন্তুর সংস্কারের কাজ চলিতে থাকে, তখন সেই কাজে উদ্দীপনা বা উত্তেজনা দেওয়া অথবা সেই কাজে কোনরূপ অতি-উত্তেজনা ঘটিলে তাহা প্রশমিত করাই ভেষজের অন্যতম কাজ। জীবকোষের রূপান্তর সাধনে এনজাইমের ভূমিকার কথা পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে

অনেক ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা গিয়াছে যে, ভেষজের মাত্রা অতি অল্প হইলে উহার কার্যকারিতা অধিক হইয়া থাকে। এনজাইমের অণুর সহিত ভেষজের অণুর একপ্রকার শিথিল সংযোজন ঘটিবার ফলে ভেষজের কাজ চলিতে থাকে। আরও জানা গিয়াছে যে, ফ্যাট, প্রোটিন ও কার্বোহাইড্রেট পদার্থের রূপান্তর সাধনে সাল্‌ফ্‌-হাইড্রিল এনজাইম জারকও আর্দ্রবিশ্লেষকের ভূমিকা গ্রহণ করে। মারকিউরিক (পারদঘটিত) আয়ন সাল্‌ফ্‌-হাইড্রিল এনজাইমের সহিত সংযোজনের ক্ষমতা রাখে। প্রকৃত পক্ষে 10^{-5} (M) মারকিউরিক ক্লোরাইড দ্রবণ (অর্থাৎ এক লিটার পরিমাণ তরল পদার্থে দ্রবীভূত মারকিউরিক ক্লোরাইডের 171 গ্র্যামের এক লক্ষ ভাগের এক ভাগ মাত্রায়) প্রয়োগ করিলে উক্ত এনজাইমের কার্যকারিতা শতকরা প্রায় নব্বই ভাগ ব্যবহার হয়।

মকরধ্বজের অণুতে পারদঘটিত মারকিউরিক আয়ন বিদ্যমান। কোন ভেষজের সহিত মকরধ্বজ অতি অল্প মাত্রায় মিশাইয়া প্রয়োগ করিলে জীবকোষের মধ্যে বর্তমান এনজাইমের কার্যকারিতা বর্ধিত হওয়া অসম্ভব নয়। এই জন্য

মকরধ্বজকে এনজাইম্-প্রোমোটার বা প্রাণ-পরিপোষক বলা যায়।

'মকরধ্বজের রহস্য' শীর্ষক প্রবন্ধটি (মিকানিজম অব অ্যাকশন অব মকরধ্বজ, Nagarjum, February, 1968, Vol. XI, pp. 309-316 দ্রষ্টব্য) পাঠ করিয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তদানীন্তন আয়ুর্বেদ উপদেষ্টা কবিরাজ মণীন্দ্রলাল দাশগুপ্ত, এম. বি. মহাশয় মন্তব্য করেন: "বহু লোকের কথা আমি জানি, যাহারা অভ্যাস-বশে নিত্য মকরধ্বজ সেবন করে; কিন্তু সে জন্য তাহাদের মধ্যে পারদঘটিত ঔষধের প্রতিকূল প্রতিক্রিয়াজনিত দোষ টায়ালিজম্, জিনজি-ভাইটিস বা নেফ্রাইটিস দেখা যায় না। এই বিষয়ের কারণ অনুসন্ধানের জন্য আমি লেখককে অনুরোধ করিতেছি।" মকরধ্বজ এনজাইম-প্রোমোটার (প্রাণ-পরিপোষক) হিসাবে কাজ করে, এইরূপ অনুমান করিলে উক্ত প্রশ্নের সমাধানের পথ খুঁজিয়া পাওয়া সম্ভব বলিয়া লেখকের ধারণা।

কখনও মধু ছাড়া মকরধ্বজ প্রয়োগের ব্যবস্থা দেওয়া হয় না কেন, লেখকের 'মধুর কথা' শীর্ষক প্রবন্ধে (জ্ঞান ও বিজ্ঞান, মার্চ 1970, 23শ বর্ষ, 3য় সংখ্যা, পৃঃ 174—178 দ্রষ্টব্য) তাহার কারণ বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। মধুর মাধ্যমে কোন ভেষজ ও অতি অল্প মাত্রায় মকরধ্বজ মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করিলে উহার কার্যকারিতা বা ভেষজ-ক্ষমতা আরও বিশেষভাবে বর্ধিত হইবে, ইহাই বর্তমান লেখকের বদ্ধমূল ধারণা। তবে এই সকল অনুমান বা ধারণা সত্য কিনা, তাহা যাচাই করিবার জন্য ব্যাপক পরীক্ষা হওয়া উচিত।

বৃটিশ ইনফরমেশন সার্ভিসের প্রচারিত এক সংবাদে প্রকাশ—সাম্প্রতিক গবেষণায় আভাস পাওয়া যাইতেছে যে, এনজাইমের সাহায্যে একাধিক রোগের চিকিৎসা করা সম্ভব হইবে। বিয়ার নামক এক প্রকার মদ্যের স্থায়িত্ব বিধানে এনজাইমের ব্যবহার হইতেছে। এনজাইমের ভাবী ব্যবহারের সম্ভাবনার কথা বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া ইংল্যাণ্ডের অতি বিশুদ্ধ এন্‌জাইম প্রস্তুতকারক হোয়াইটম্যান বায়োক্যামিক্যালস লিঃ পাঁচ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের অতি আধুনিক একটি এনজাইম উৎপাদনের কারখানা খুলিয়াছে। আরও প্রকাশ, বৃটিশ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের লেবরেটরীগুলির সহিত তাহারা সহযোগিতা করিয়া চলিবে, যাহাতে গবেষণার ফল বাণিজ্যিক স্তরে প্রয়োগ করা সম্ভব হয়।

আশা করা যায়, এনজাইমের পরিপোষক-রূপে মকরধ্বজ কাজ করিয়া থাকে—এই ধারণার সত্যতা সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাইলে ভেষজ, তথা জীব-বিজ্ঞানের একটি নূতন দিগ উদ্ঘাটিত হইবার সম্ভাবনা দেখা দিবে।

রিফামাইসিন

সুশ্বেতা বিশ্বাস*

রিফামাইসিন এক ধরণের প্রতিজীবক (Antibiotic)। 1940 সালে প্রথম পেনিসিলিন আবিষ্কারের পর থেকে এপর্যন্ত আরো অনেক প্রতিজীবক আবিষ্কৃত হয়েছে। হয়তো মনে হতে পারে রিফামাইসিন অন্যান্য অনেক প্রতি জীবকের মতই কোন বিশেষত্ব এর নেই। কিন্তু সেটা ঠিক নয়। সেই জন্যেই এই বিষয়ে আলোচনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি।

পেনিসিলিন আবিষ্কারের পর পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ওষুধের কারখানা এবং বিভিন্ন গবেষণাগারে আরও জোরালো নতুন প্রতিজীবক আবিষ্কারের চেষ্টা চলেছে। রিফামাইসিনের আবিষ্কার হয় ইটালীর (মিলান), লেপেটিট গবেষণাগারে। ফ্রান্সের সেন্ট রাফেলের কাছে ঘন পাইন বনের একটুখানি মাটি ছিল এর উৎস। এই মাটিতে ছিল সহস্র সহস্র ক্ষুদ্র জীবাণু। কিন্তু সকলকে নিয়ে গবেষণা চালানো সহজসাধ্য নয়। সেখান থেকে স্ট্রেপ্টোমাইসিটিসকে পৃথক করা সম্ভব হয়েছিল। এই স্ট্রেপ্টোমাইসিটিস এক ধরণের ক্ষুদ্র এবং সক্রিয় জীবাণু, যা থেকে প্রতিজীবক তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। ওই মাটি থেকে স্ট্রেপ্টোমাইসিস মেডিটারেনিকে পৃথক করে দেখা গেছে যে, ওই ক্ষুদ্র জীবাণুর স্বাভাবিক বৃদ্ধির সময় পাঁচটি পরস্পর অতি নিকট সম্পর্কযুক্ত প্রতিজীবক তৈরি হয়। এই পাঁচটিকে একই সঙ্গে বলা হয় রিফামাইসিন যৌগিক বস্তু। এই রিফামাইসিন থেকে রিফামাইসিন B-কে পৃথক ও বিশুদ্ধ করা সম্ভব হয়েছে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, রিফামাইসিন-B জীবাণুর প্রতিপক্ষ হিসাবে খুব কার্যকরী নয় বরং ওই পদার্থটি খুব ধীরে ধীরে ভেঙে জলের সঙ্গে মিশে একটি ক্রিয়াশীল পদার্থ তৈরি করে, যার নাম রিফামাইসিন SV। এই রিফামাইসিন SV থেকে আবার আর একটি পদার্থ উৎপন্ন হয়, যার নাম দেওয়া হয়েছে সংক্ষেপে রিফামপিসিন (Rifampicin); অর্থাৎ সেটি হলো 3-(4-মিথাইল পাইপার অ্যাজিনিল ইমিনো মিথাইল রিফামাইসিন SV. [3 (4-methyl piper azinyl imino methyl rifamycin SV]

সম্প্রতি রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটিয়ে এই রিফামপিসিন সংশ্লেষণ সম্ভব হয়েছে এবং এই পদ্ধতিই রিফামপিসিন তৈরি করবার উপায়।

রিফামপিসিন নিয়ে গবেষণার প্রথম পর্যায়ে এটি প্রয়োগ করে যে ফল পাওয়া গেছে, তা খুবই আশাপ্রদ। এই প্রতিজীবকটির প্রভাবে যক্ষ্মারোগের জীবাণু মাইকোব্যাক্টিরিয়াম টিউবারকিউলোসিমস বংশবৃদ্ধি করতে পারছে না। কিন্তু গবেষণার এই পর্যায়টি এরপর সীমিত হয়ে যায় প্রধানতঃ একটি কারণে—সেটি

* বসু বিজ্ঞান মন্দির, 93/1, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-9

হলো রিফামপিসিন একমাত্র ইঞ্জেকসনের মাধ্যমে প্রয়োগ করতে হয়। এর ফলে এই ওষুধটি শরীরে খুব ছড়িয়ে পড়ে না এবং খানিকটা সীমাবদ্ধ অবস্থায় থাকে। এই সব অপূর্ণতার জন্যে নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলে। অবশেষে অধ্যাপক পি. সেনসি লেপেটিট গবেষণাগার থেকে পরীক্ষা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, এই ওষুধটি মুখ দিয়ে গ্রহণ করলে ভাল করে সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়া সম্ভব।

এখন কথা হলো—এই ওষুধটি কিভাবে কাজ করে, কেনই বা এর কাজের ভূমিকা অন্যান্য প্রতিজীবক থেকে স্বতন্ত্র ও গুরুত্বপূর্ণ? আমরা জানি অতিকায় ডি এন এ অণুর ছাঁচে আর এন এ অণুর জন্ম হয় এবং এই আর এন এ সৃষ্টি করে নানারকম এনজাইম-প্রোটিন। এখন ডি এন এ-র বার্তা বংশপরম্পরায় চলে আসে আর এন এ-তে এবং এটি সম্ভব হয় বিশেষ এক ধরণের এনজাইমের উপস্থিতির ফলে। এই বিশেষ এনজাইমকে বলা হয় আর এন এ পলিমারেজ (RNA Polymerase)। এই এনজাইমটি ভাইরাস থেকে সুরু করে মানুষ অবধি সকলের কোষে বর্তমান। বংশবৃদ্ধির জন্যে এই এনজাইমের ভূমিকা অনেকখানি। মানুষ বা অন্য কোন জীবদেহ যদি কোন রোগ বহনকারী ভাইরাসের দ্বারা আক্রান্ত হয়, তবে সেই দেহে ক্রমশঃ ভাইরাসের বংশবৃদ্ধি হতে থাকে। বংশবৃদ্ধির জন্যে প্রজননের বার্তা ডি এন এ থেকে আর এন এ এবং আর এন এ থেকে প্রোটিনকে নিতে হয়। প্রথম পদক্ষেপটির জন্যেই প্রয়োজন আর এন এ পলিমারেজ এনজাইমের উপস্থিতি। আর এন এ পলিমারেজ জীবদেহে যেমন বর্তমান, তেমনি যে ভাইরাসের দ্বারা জীবদেহ আক্রান্ত হয়েছে, তাতেও বর্তমান। রিফামপিসিনের বিশেষত্ব এখানেই যে, এই ওষুধটি জীবদেহের আর এন এ পলিমারেজের উপর কোন কাজ করে না, কিন্তু খুব অল্প পরিমাণেই ভাইরাসের আর এন এ পলিমারেজকে সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত করে।

গত কয়েক বছর আণবিক জীব-বিজ্ঞানে ডি এন এ-র উপর নির্ভরশীল এনজাইম আর এন এ পলিমারেজের গুণাগুণ বিচার করবার একটি রীতি চলে আসছে। রিফামপিসিন এই এনজাইমের কার্যপ্রণালী বিজ্ঞানীদের কাছে আরও সহজ ও বোধগম্য করে তুলেছে। দেখা গেছে, আর এন এ পলিমারেজ দিয়ে ডি এন এ থেকে আর এন এ-র সংশ্লেষণ আরম্ভ হবার ঠিক প্রথম পর্যায়কে রিফামপিসিন প্রভাবিত করে; অর্থাৎ রিফামপিসিন দেবার সময় যে আর এন এ-র সংশ্লেষণ ইতিপূর্বেই সুরু হয়ে গেছে, তার উপর ওই ওষুধের কোন ফল হয় না। কিন্তু এর পর আর নতুন আর এন এ সংশ্লেষিত হতে পারে না।

আগেই বলা হয়েছে রিফামপিসিন যক্ষ্মারোগের প্রতিষেধক। এই রোগটি এখনও চিকিৎসা-বিজ্ঞানীদের কাছে একটি সমস্যাস্বরূপ। কারণ এই রোগের চিকিৎসার জন্যে অনেকটা সময়ের প্রয়োজন। এই দীর্ঘমেয়াদী চিকিৎসার ফলে অনেক সময় একাধিক প্রতিজীবক ব্যবহার করা হয়। তার ফলে আর এক প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি হয়। কেন হয় তাই বলি। কোন জীবাণুর বিরুদ্ধে যদি একই সময়ে দুটি প্রতিজীবক ব্যবহার করা হয় এবং দেখা যায় যে, সেই জীবাণুর একটি বিশেষ অবস্থা

যে কোন একটি প্রতিজীবককে নষ্ট করতে সক্ষম, তাহলে অপরটিও নিজে থেকে সেই জীবাণু বৃদ্ধির প্রতিবন্ধক হয় না। এই অবস্থাকে বলা হয় পরস্পর বিরোধিতা (Cross resistance)। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, এই অবস্থা কোন প্রতিজীবকের পক্ষেই অনুকূল নয়। কিন্তু রিফামপিসিনের অদ্বিতীয় গুণ হলো, এটি কখনও জীবাণুর পরস্পর বিরোধিতার সহায়ক হয় না।

এরপর অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গতভাবে এই ওষুধের ব্যবহার হয় কুষ্ঠব্যাধিতে। যক্ষ্মা এবং কুষ্ঠ দুটি রোগের কারণ অনেকটা একই ধরণের জীবাণু। এর নাম মাইকোব্যাক্টিরিয়াম লেপার। লণ্ডনের ন্যাশন্যাল ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল রিসার্চে কুষ্ঠরোগের উপর এই ওষুধটি নিয়ে প্রাথমিক নানারকম গবেষণায় যে ফল পাওয়া গেছে, তা খুবই আশাপ্রদ। কুষ্ঠরোগে ব্যবহৃত অন্য প্রতিজীবকের সঙ্গে রিফামপিসিনের একটি বড় রকম অমিল দেখা যায়। অন্যান্য প্রতিজীবকের উপস্থিতিতে কুষ্ঠরোগের জীবাণুর বৃদ্ধি বন্ধ হয়, কিন্তু রিফামপিসিনের উপস্থিতিতে ওই জীবাণুগুলি মরে যায়।

এরপর ভাইরাসের উপর রিফামপিসিনের প্রভাব নিয়ে কিছু আলোচনা করবো। 1969 সালে দুটি গবেষক দল জেরুসালেমের ই. হেলারের নেতৃত্বে এবং গ্লাসগোর সুবাক সার্পের পরিচালনায় একই সঙ্গে তাঁদের গবেষণালব্ধ ফলের বিবরণ দিয়েছেন। এই রিফামপিসিন সাধারণতঃ জীবদেহের বিশেষ এক ধরণের ভাইরাসের বৃদ্ধিকে প্রতিহত করে। ব্যাপারটি যে কোন প্রতিজীবকের ক্ষেত্রেই খুব আশ্চর্যের। প্রথম দিকে এই কথাই চিন্তা করা যুক্তিযুক্ত ছিল যে, জীবাণুর প্রতিষেধক হিসাবে রিফামপিসিন যে ভাবে কাজ করে, ভাইরাসেও তেমনি কাজ করবে। এখন প্রশ্ন হলো, ভাইরাসের জীবন-পরিক্রমায় রিফামপিসিন ক্ষমতা প্রয়োগ করে কোন্‌খানে? বেথেস্‌ডার ন্যাশন্যাল ইনস্টিটিউট অফ হেল্‌থ থেকে দেখানো হয়েছে যে, ভাইরাসের পূর্ণতাপ্রাপ্তির শেষ ধাপকে রিফামপিসিন প্রভাবিত করে।

ক্যান্সার রোগ রিফামপিসিনের গুরুত্ব আরো বাড়িয়েছে। 1969 সালেই জুরিখের ডিগেলম্যান এবং ওয়াইসম্যান দেখিয়েছেন যে, ক্যান্সার রোগের ভাইরাসের বৃদ্ধি রিফামপিসিন দিয়ে কমানো সম্ভব হয় নি। কিন্তু সে ক্ষেত্রে স্বাভাবিক কোষকে ক্যান্সার রোগাক্রান্ত কোষে পরিণত হবার পথে রিফামপিসিন বাধার সৃষ্টি করে। অনেক ভাইরাস আছে, যা স্বাভাবিক কোষকে ক্যান্সার রোগাক্রান্ত স্ফীতিতে পরিণত করে। এই ধরণের অনেক ভাইরাসের মধ্যে বংশগত বার্তা ডি এন এ থেকে আর এন এ হয়ে প্রোটিনে আসে না। তার কারণ ওই সব ভাইরাসে ডি এন এ অনুপস্থিত থাকে। ওই সব ক্ষেত্রে প্রজননের বার্তা কিভাবে যায়, সেটা বহু দিন বৈজ্ঞানিকদের কাছে একটি বড় প্রশ্ন ছিল। উইসকন্‌সিন বিশ্ববিদ্যালয়ের হাওয়ার্ড টেমিন প্রথম সিদ্ধান্তে আসেন যে, ওই সব আর এন এ ভাইরাসের বৃদ্ধিতে ডি এন এ মধ্যবর্তী বস্তু হিসাবে উপস্থিত হতে পারে, যা তখন খুবই অসম্ভব মনে হয়েছিল। পরে অবশ্য অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর ওই সিদ্ধান্তের সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে। এই গবেষণা ক্যান্সার রোগাক্রান্ত কোষে খুবই প্রাধান্য পেয়েছে। যে

এন্‌জাইম আর এন এ থেকে ডি এন এ সংশ্লেষণ করে, তাকে বলা হয় ডি এন এ পলিমারেজ। এই ডি এন এ পলিমারেজকে দমন করে ক্যান্সার-রোগাক্রান্ত কোষকে স্বাভাবিক কোষে পরিণত করা সম্ভব কি না—সেটাই এখন গবেষণার প্রধান বিষয় বস্তু।

এখন পর্যন্ত ক্যান্সার রোগাক্রান্ত কোষের সঙ্গে একটি স্বাভাবিক কোষের যে পার্থক্য দেখা গেছে, তা উভয়ের প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। এই বিষয়ে এখনও খুব বেশী জানা সম্ভব হয় নি। কিন্তু রিফামপিসিনের আবিষ্কারের পর থেকে এই বিষয়ে একটি নতুন দিকের সূচনা হয়েছে, যেখানে আঘাত করলে হয়তো এই সাংঘাতিক রোগ সম্বন্ধে আরও বেশী জানা সম্ভব হবে। এখন পর্যন্ত বৈজ্ঞানিকদের এই রোগ সম্বন্ধে ধারণা খুবই সীমিত। অনেক গবেষণাগারে এই নিয়ে গবেষণা চলছে সন্দেহ নেই। এখন অনেক বিজ্ঞানী দেখতে চেষ্টা করছেন, রিফামপিসিন সদৃশ অন্য পদার্থে প্রতিজীবকের গুণ কাজ করে কি না এবং তা দিয়ে ডি এন এ পলিমারেজকে দমানো কতখানি সম্ভব। রিফামপিসিনসদৃশ দুটি পদার্থ আবিষ্কার করেছেন ল্যানসিনি ও খারী। তাঁদের প্রাথমিক পরীক্ষার ফল খুবই আশাপ্রদ হয়েছে।

সাধারণতঃ রিফামপিসিন এন্‌জাইম প্রোটিনের সঙ্গে বিক্রিয়া ঘটায়, যার ফলে সেই প্রোটিনের সক্রিয় অবস্থা বা সক্রিয় দিকটির পরিবর্তন ঘটে। এখন কথা হলো, ডি এন এ-র উপর নির্ভরশীল এনজাইম আর এন এ-পলিমারেজকে যে প্রতিজীবক দমন করবে এবং আর এন এ-র উপর নির্ভরশীল এনজাইম ডি এন এ-পলিমারেজকে যে দমন করবে, এই দুটি প্রতি-জীবকের মধ্যে নিশ্চয়ই কিছু পার্থক্য থাকতে হবে। সে জন্যে এখন প্রধান কাজ হলো, প্রচুর রিফামপি-সিনসদৃশ পদার্থ সংশ্লেষণ করা ও তাদের প্রতিজীবক গুণ নিয়ে পরীক্ষা করা। সমগ্র জগতে চিকিৎসা-বিজ্ঞানে যে অভূতপূর্ব আলোড়ন এসেছে, তাতে কারো বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। তবু ক্যান্সার রোগ নিয়ে বিজ্ঞানীরা এখনও প্রায় প্রথম ধাপেই দাঁড়িয়ে আছেন। তাই মনে হয়, রিফামপিসিনসদৃশ পদার্থের সংশ্লেষণের মধ্যেই পাওয়া যেতে পারে সেই মহারোগের ভাবী মহাশত্রুকে। হয়তো রিফামপিসিন দিয়েই সে পথের সুরু, কিন্তু তার শেষ কোথায় আজও জানা নেই।

জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং

রাধাকান্ত মণ্ডল*

ইতিপূর্বে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে' খোরানা কর্তৃক কৃত্রিম জিন সংশ্লেষণ ও জেনেটিক কোডের পাঠোদ্ধার নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে (জ্ঞান ও বিজ্ঞান—ডিসেম্বর, 1968, জানুয়ারী 1969 ও শারদীয়া 1970 দ্রষ্টব্য)। পরীক্ষাগারে জিন সংশ্লেষণ সম্ভব হবার ফলে যে বিষয়ে জীব-বিজ্ঞানী তথা চিকিৎসা-বিজ্ঞানীদের সবচেয়ে বেশী আশা ও ঔৎসুক্য দেখা গেছে, তা হলো ভবিষ্যতে জিনের প্রয়োগ বা জেনেটিক ইঞ্জি-নিয়ারিং-এর ব্যাপক সম্ভাবনা। জিনের গঠন-প্রকৃতি, তাদের উপাদান, জিনের বার্তা-সঙ্কেতের রহস্য, জিনের রদ্‌বদল ঘটানো সবই এখন মানুষের আয়ত্তের মধ্যে। এই জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে ভবিষ্যতে সুস্থ জিন দিয়ে কতকগুলি বংশগত বা জন্মগত রোগের নিরাময় সম্ভব হতে পারে। চিকিৎসকমহলে এটাকেই বলা হচ্ছে জিন থিরাপি বা জেনেটিক সার্জারি। এই জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ও জিন থিরাপি ব্যাপারটা কি, এখনই মানুষ একে কাজে লাগাবার কতটা কাছাকাছি আসতে পেরেছে—সে সম্বন্ধে এই প্রবন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা হচ্ছে।

ইতিমধ্যেই জানা গেছে যে, জীবকোষের কেন্দ্রে অবস্থিত বংশগতির ধারক ও বাহক মূলবস্তু হলো জিন (Gene)। বিভিন্ন জিন-গোষ্ঠীই নিয়ন্ত্রণ করে কোন জীবের রং, রূপ প্রভৃতি বাইরের বৈশিষ্ট্য ও দেহের ভিতরে বিপাক, বৃদ্ধি প্রভৃতি ক্রিয়া। মানুষের মত একটি বহুকোষী জীবের জন্মের সুরুতে ডিম্বাণু ও শুক্রাণুর মিলন প্রকৃতপক্ষে মাতৃজিন ও পিতৃজিনের মিলন, যার ফলে মাতাপিতার গুণাগুণ সন্তানে বর্তায়। সনাতন প্রজননবিদ্যার বিমূর্ত জিনকে এখন আমরা আধুনিক জীব-বিজ্ঞানের আলোকে ধরতে পেরেছি, জেনেছি তার গঠন-রহস্য। রাসায়নিক দৃষ্টিতে জিন হচ্ছে DNA নামক অতিকায় অণু, যা অ্যাডেনিন (A), গুয়ানিন (G), থাইমিন (T) এবং সাইটোসিন (C)—এই চার রকমের ক্ষারকযুক্ত ছোট ছোট নিউ-ক্লিওটাইড এককের সমন্বয়ে তৈরী। কোন জিন বা DNA-র অংশবিশেষে নিউক্লিওটাইডগুলির সজ্জাক্রমের মধ্যেই লুকিয়ে আছে প্রোটিনে অ্যামিনো অ্যাসিডগুলির সজ্জাক্রমের সঙ্কেত। এটাই হলো জেনেটিক কোড।

জীবদেহে প্রোটিনের কাজের গুরুত্ব নিউক্লিক অ্যাসিডের পরেই। পেশীর তন্তু, মজ্জা, কোষ-প্রাচীর, নখ, চুল ইত্যাদির প্রধান গঠনমূলক উপাদান প্রোটিন। রক্তরসে অবস্থিত পুষ্টির যোগানদার বিভিন্ন প্রোটিন, রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতাযুক্ত গ্লোবিউলিন, অক্সিজেন বহনের হিমো-গ্লোবিন ইত্যাদি প্রোটিনজাতীয়। আর জীব-কোষের পক্ষে অপরিহার্য যাবতীয় রাসায়নিক ক্রিয়ায় সাহায্য করে যে জৈব অনুঘটক বা এন্‌জাইম, সেগুলিও প্রোটিন। ইনসুলিন, অক্সি-টোসিন, ভাসোপ্রেসিন প্রভৃতি বহু হর্মোনও প্রোটিনজাতীয়। বার্তাবহ RNA-র মাধ্যমে DNA-ই ঠিক করে দেয় দেহের কোথায় কখন কোন্ এন্‌জাইম কি পরিমাণে তৈরি হবে। কাজেই জিনের মধ্যে কোন ত্রুটি থাকলে (অর্থাৎ DNA অণুর কোথায় ও উল্টাপাল্টা নিউক্লিওটাইড থাকলে অথবা এক বা একাধিক

* বসু বিজ্ঞান মন্দির, কলিকাতা-9

নিউক্লিওটাইড কোন কারণে অন্তর্হিত হলে) তার সঙ্কেতে হয় ত্রুটিপূর্ণ এন্‌জাইম বা প্রোটিন তৈরি হবে (দু-একটি জায়গায় ভুল অ্যামিনো অ্যাসিড থাকবার জন্যে) বা আদৌ তৈরি হবে না। জিনের এই রকম ত্রুটির জন্যে অনেক বংশ-গত ও জন্মগত ব্যাধি দেখা যায়। যেমন, গ্যালাক্টোসিমিয়া রোগে একটি এন্‌জাইমের অভাবে গ্যালাক্টোজ শর্করার (এই শর্করা দুধের ল্যাক্টোজে বর্তমান) বিপাক হয় না, ফলে রক্তে ঐ শর্করা সঞ্চিত হয়। আবার সিক্‌ল্ সেল অ্যানিমিয়া রোগে অস্বাভাবিক ত্রুটিপূর্ণ হিমো-গ্লোবিন তৈরি হয়, যার ফলে রক্ত তার স্বাভাবিক অক্সিজেন পরিবহনের কাজ করতে পারে না, আর লাল রক্তকণিকা গোলাকার না হয়ে কাস্তের মত দেখায়। যদি কোন কৃত্রিম উপায়ে স্বাভাবিক প্রোটিন তৈরির উপযোগী সুস্থ জিন দেহে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে ঐ ত্রুটি সংশোধন হতে পারে। কৃত্রিম জিন প্রস্তুতি, জিনের বার্তার ইচ্ছামত পরিবর্তন, জীবদেহের জিন সংযোজন, কোন জিনের ক্রিয়া ইচ্ছামত ব্যক্ত বা সুপ্ত রাখা ইত্যাদিই হচ্ছে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর কাজ।

বর্তমানে আমরা এমন একটা যুগে পৌঁচেছি, যখন মানুষের (অন্যান্য প্রাণী ও উদ্ভিদের ক্ষেত্রেও) জিনের গঠনের ইচ্ছামত পরিবর্তন সাধন আর অসম্ভব কল্পনাবিলাস নয়। খোরানা পরীক্ষা-গারে ছোট জিন সংশ্লেষণ করতে সক্ষম হয়েছেন। ভবিষ্যতে এভাবে আরও অনেক জটিল জিনের সংশ্লেষণও সম্ভব হবে। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বেকউইথ একটি প্রাকৃতিক জিন ই. কোলাই জীবাণু থেকে বের করতে সক্ষম হয়েছেন। ভবিষ্যতে যে ভাবেই হোক, আমরা অনেক সুস্থ স্বাভাবিক জিন প্রকৃতি থেকে বা কৃত্রিম উপায়ে তৈরি করতে সক্ষম হবো। নিরেনবার্গের মতে, পঁচিশ বছরের মধ্যেই জিনের প্রয়োগ মানুষের আয়ত্তের মধ্যে এসে যাবে। এখন কথা হচ্ছে, কিভাবে জীবদেহে এই জিনের প্রয়োগ হবে? এই জিনকে তো সাধারণ ওষুধের মত জীবদেহে ইঞ্জেকশন দিলে হবে না। অতিরিক্ত প্রবিষ্ট জিন জীবকোষের কেন্দ্রে অবস্থিত আদি জিনের সঙ্গে স্থায়ীভাবে সংযোজিত হওয়া দরকার।

কয়েকটি সম্ভাব্য উপায়ের সন্ধান পাওয়া গেছে। কতকগুলি ভাইরাসকে এই কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। ভাইরাস হচ্ছে জড় ও জীবের সীমারেখায় অতি আণুবীক্ষণিক বস্তু। এতে আছে মাঝখানে একটি নিউক্লিক অ্যাসিড দণ্ড (DNA বা RNA), আর তার চারদিকে প্রোটিনের আবরণ। এরা পরাশ্রয়ী। অন্য কোন জীবকোষের মধ্যেই এদের বংশবৃদ্ধি সম্ভব। কোন ভাইরাস জীবকোষকে আক্রমণ করবার সময় প্রোটিনের খোলস বাইরে পড়ে থাকে, শুধু ভিতরের নিউক্লিক অ্যাসিড কোষের ভিতরে প্রবেশ করে। ঐ নিউক্লিক অ্যাসিড বা ভাইরাস জিন তার সঙ্কেত অনুযায়ী ভাই-রাসের দেহের উপযোগী নিউক্লিক অ্যাসিড ও প্রোটিন তৈরি করিয়ে নেয় আশ্রয়দাতা কোষের কলাকৌশল নিজের কাজে লাগিয়ে। এইভাবে ভাইরাসের বৃদ্ধি ঘটে। অধিকাংশ ভাইরাসের বেলায় প্রতিটি কোষে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক ভাই-রাস সৃষ্টি হলেই তারা ঐ কোষকে ফাটিয়ে বেরিয়ে পড়ে, আবার নূতন নূতন কোষকে আক্রমণ করে; অর্থাৎ এই ভাইরাসগুলি যে কোষে জন্মাচ্ছে তাকেই ধ্বংস করছে। কিন্তু কতক-গুলি ভাইরাস আছে, যারা শুধুমাত্র 'যাত্রী'র মত দেহকোষের আশ্রয়ে কোষ থেকে কোষান্তরে যায়, দেহকোষের কোন স্থায়ী ক্ষতিসাধন করে না। SV40 ও শোপে প্যাপিলোমা ভাইরাস (SPV) এরূপ দুটি DNA-যুক্ত ভাইরাস, যারা মানুষের কোন ক্ষতি করে না। এই দুটির যে

কোন ভাইরাসের DNA-তে যদি একটি অতিরিক্ত কৃত্রিম DNA জিন রাসায়নিকভাবে সংযুক্ত করা যায়, তাহলে সেই ভাইরাসের সঙ্গে ঐ কৃত্রিম জিন দেহকোষে প্রবেশ করানো যাবে।

উদাহরণস্বরূপ ফিনাইলকিটোনিউরিয়া একটি বংশগত ব্যাধি। এই রোগে ফিনাইল অ্যালানিন নামক অ্যামিনো অ্যাসিডের বিপাক হয় না একটি গুরুত্বপূর্ণ এনজাইম না থাকবার ফলে। যদি SV-40 ভাইরাসে ফিনাইল অ্যালানিন হাইড্রক্সিলেজ এনজাইম তৈরির উপযোগী বার্তা বা জিন যোগ করে ঐ ভাইরাস দিয়ে রোগীকে সংক্রামিত করা যায়, তাহলে রোগীর দেহে ঐ এনজাইম তৈরি হবে এবং বংশগত রোগটি সেরে যাবে। যতদিন ঐ ভাইরাস দেহে থাকবে, ততদিনই রোগটির কোন লক্ষণ থাকবে না। SPV ভাইরাসের জিন মানবদেহে একবার প্রবেশ করিয়ে দিলে কুড়ি বছর পর্যন্ত তার কার্যকারিতা থাকতে দেখা গেছে। SPV দিয়ে আরও একপ্রকার সহজ জিন থিরাপির উদাহরণ আছে। আর্জিনিমিয়া রোগে রক্তে আর্জিনিন অ্যামিনো অ্যাসিডের মাত্রা বেড়ে যায়। এর ফলে মানসিক অপূর্ণতা ও আরও অনেক উপসর্গ দেখা দেয়। SPV দিয়ে সংক্রামিত করলে কোষে আর্জিনেজ এনজাইম প্রস্তুত হয়। ঐ এনজাইম আর্জিনেনকে ভেঙে ফেলে।

DNA ও RNA-যুক্ত উভয় শ্রেণীর ভাইরাসের জিনেই অতিরিক্ত DNA বা RNA জিন যোগ করে দেবার পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে। RNA-ভাইরাসে কোন DNA থাকে না। RNA-ই হলো তার জেনেটিক পদার্থ। প্রকৃতি থেকে কোন বিশেষ এনজাইমের উপযোগী বার্তাবহ RNA আহরণ করে RNA-ভাইরাসের মাধ্যমে প্রাণীর দেহে ঐ জিন প্রবেশ করানো সম্ভব। শুধু প্রয়োজন, ইচ্ছামত এনজাইমের জিন ও তার বহনোপযোগী ভাইরাস খুঁজে পাওয়া—যারা ক্ষতিকর নয়। পোলিও ভাইরাস, অ্যাডেনো ভাইরাসকেও পরিব্যক্ত (Mutated) করে তার রোগ সৃষ্টির ক্ষমতা কমিয়ে দিয়ে বাহক হিসাবে ব্যবহারের সম্ভাবনা আছে।

উদ্ভিজ্জ খাদ্যের পুষ্টিগুণও এইভাবে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর সাহায্যে বৃদ্ধি করা যেতে পারে। গাছের বেলায় কৃত্রিম RNA জিন RNA-ভাইরাসের সাহায্যে ঢুকিয়ে দেওয়া খুবই সহজ। পরীক্ষায় দেখা গেছে, তামাক পাতার ভাইরাস TMV (Tabacco Mosaic Virus) RNA-তে খানিকটা poly A (শুধু অ্যাডেনিন নিউক্লিওটাইড পর পর জুড়ে তৈরি) জুড়ে ঐ RNA দিয়ে তামাক পাতাকে আক্রান্ত করা হলে ঐ কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত RNA আবার TMV সৃষ্টি করে চলে। ঐ নবজাত TMV-তে অতিরিক্ত poly A বার্তা থাকবার দরুণ পলিলাইসিন (পর পর লাইসিন অ্যামিনো অ্যাসিড জুড়ে প্রোটিনের মত বস্তু) তৈরি হয় উপরি পাওনা হিসাবে, কারণ AAA হচ্ছে লাইসিনের সঙ্কেত। উদ্ভিজ্জ প্রোটিনে লাইসিন কম থাকবার দরুণ তার পুষ্টিগুণ প্রাণীজ প্রোটিনের তুলনায় কম। যদি উপরিউক্তভাবে ফলনশীল গমের গাছের পক্ষে ক্ষতিকর নয়, এমন RNA ভাইরাসে এভাবে poly A যোগ করে সংক্রামিত করা হয়, তাহলে ঐ গমেও পলিলাইসিন তৈরি হতে পারে। ফলে গমের পুষ্টিমূল্য বেড়ে যাবে। এইভাবে ভাইরাস একবার তৈরি করলেই চলবে। তাথেকে উদ্ভূত প্রজন্ম ভাইরাসেও ঐ জেনেটিক বার্তা থাকবে, যাদের দিয়ে আবার নতুন নতুন ফসলকে সংক্রামিত করা যাবে।

আরও সম্ভাব্য একটি উপায় হলো, একেবারে কৃত্রিম ভাইরাস সৃষ্টি করা। প্রকৃতিতে ভাইরাস জীবকোষে বংশবৃদ্ধি ঘটাবার সময় কখনও কখনও ভুল করে কতকগুলি ভুল ভাইরাস

(Pseudovirion) তৈরি হয়, যার বাইরে থাকে ভাইরাসের প্রোটিনের আবরণ, কিন্তু মাঝখানে ভাইরাস জিনের বদলে খানিকটা আশ্রয়-কোষের জিন। আশা করা যাচ্ছে, এইভাবে কৃত্রিম নিউক্লিক অ্যাসিড জিনের চারদিকে কোন ভাইরাসের প্রোটিনের আবরণ দিয়ে ঐ কৃত্রিম ভাইরাসের মাধ্যমে জিনকে দেহকোষে জিন সংযোগ করা সম্ভব হবে।

সম্প্রতি ডেনিয়েলি কৃত্রিম অ্যামিবা-কোষ তৈরি করেছেন। তিনি একটি অ্যামিবার কোষ থেকে সূক্ষ্ম নলের সাহায্যে ভিতরের সমস্ত সাইটোপ্লাজম ও নিউক্লিয়াস বের করে নিয়ে অন্য একটি অ্যামিবার অভ্যন্তরস্থ সাইটোপ্লাজম ও নিউক্লিয়াস ঢুকিয়ে দিয়েছেন। এইভাবে সৃষ্ট কৃত্রিম অ্যামিবা শুধু বেঁচেই থাকে না, প্রজননেও সক্ষম। একটি জীবকোষে তার নিউক্লিয়াসের বদলে অন্য নিউক্লিয়াস প্রতিরোপণ করা (Transplant) এখন সহজ ব্যাপার। এই জ্ঞানকে জেনেটিক ইঞ্জিনীয়ারিং-এ কাজে লাগানো যেতে পারে। ধরা যাক, জন্মগত কোন ত্রুটির জন্যে কারও লিভার বা প্লীহাতে কোন দরকারী এনজাইম তৈরি হয় না। এখন অবশ্য অসুস্থ প্রত্যঙ্গের বদলে সদ্যমৃত ও সুস্থ দাতার দেহ থেকে সংগৃহীত অঙ্গ সংযোজনের চেষ্টা চলছে। সে ক্ষেত্রে অসুবিধা প্রধানতঃ দুটি। প্রথমতঃ সময়মত দাতার প্রত্যঙ্গ পাওয়া; দ্বিতীয়তঃ গ্রহীতার দেহ অপরের প্রত্যঙ্গ কিছুদিন পরেই প্রত্যাখান করে। এই প্রত্যাখানের মূলে রয়েছে বিজাতীয় বস্তুর প্রতি আমাদের দেহের আভ্যন্তরীণ প্রতিরোধশক্তি (Immuno-response)। অঙ্গ প্রত্যাখানে মূলতঃ কোষের উপরস্থ অ্যান্টিজেনগুলি আছে। যদি আমরা রোগীর নিজের প্রত্যঙ্গের কিছু কোষ নিয়ে পরীক্ষাগারে টিস্যু কালচারে তাদের বর্ধিত করি এবং পরে তাদের নিউক্লিয়াসের বদলে সুস্থ ব্যক্তির নিউক্লিয়াস ঢুকিয়ে দিয়ে ঐ কোষ অঙ্গে সংযোজন করতে পারি, তাহলে রোগীর দেহ ঐ কোষ প্রত্যাখান করবে না। অথচ সুস্থ নিউক্লিয়াস (নিউক্লিয়াসই জিনের আবাসস্থল) থাকবার ফলে বাঞ্ছিত এনজাইম তৈরি হতে পারবে।

উপরে যতগুলি উদাহরণ আলোচিত হয়েছে, প্রায় সবগুলিতেই আক্রান্ত ব্যক্তির ত্রুটি সারাবার উপায় বর্ণিত হয়েছে। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংকে অন্য একটি দিকেও নিয়ে যাওয়া যেতে পারে। সেটি হলো, জন্মের আগেই ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জিন-সমাবেশ নির্ধারণ করে দেওয়া, যাতে ইচ্ছামত বৈশিষ্ট্য ও নিপুণতাসম্পন্ন মানব গোষ্ঠী তৈরি করা যায়। ক্লোনিং বা একটি কোষ থেকে ঠিক একই মানুষের প্রতিরূপ অবিকল এক মানব গোষ্ঠী তৈরি করা তার একটি উদাহরণ (জ্ঞান ও বিজ্ঞান, জানুয়ারী, 1971 দ্রষ্টব্য)। এই সব কাজে হাত দেবার আগে অনেক সামাজিক ও মানবিক সমস্যার কথা ভাবতে হবে। সমাজ-বিজ্ঞানী, রাষ্ট্র-বিজ্ঞানী ও জীব-বিজ্ঞানীদের একযোগে এই সব সমস্যার আলোচনার বিষয় ও তার সমাধানের কথা চিন্তা করতে হবে। এই প্রবন্ধের ক্ষুদ্র পরিসরে সে আলোচনা করা সম্ভব নয়।

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

জুলাই — 1971

চতুর্বিংশ বর্ষ — সপ্তম সংখ্যা
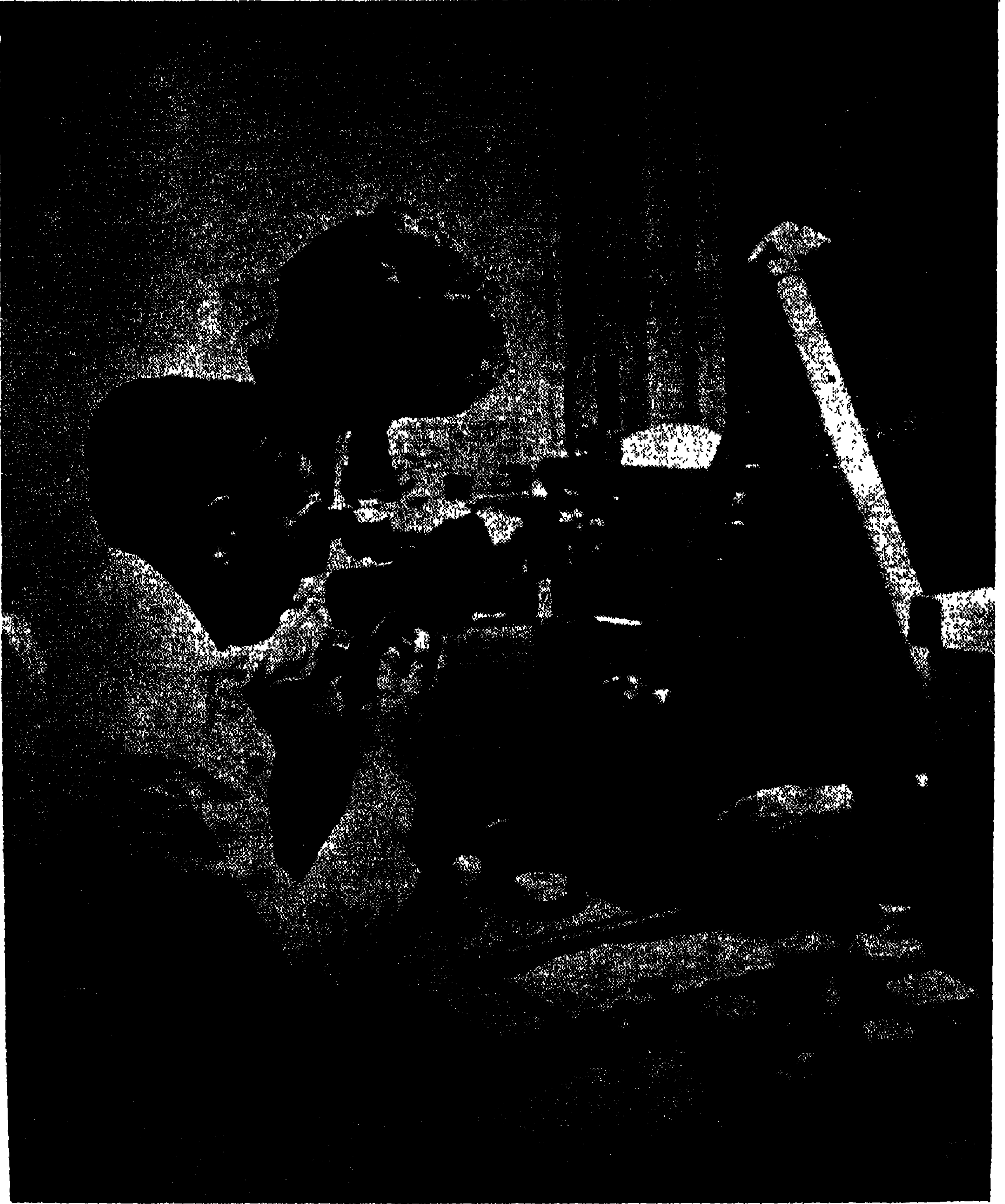
অস্ত্রোপচারের পরিবর্তে লেসার রশ্মির সাহায্যে চোখের রেটিনার চিকিৎসার ব্যবস্থা। ডাক্তার ও তাঁর সহকারী রোগীর চোখের অভ্যন্তর ভাগ পরীক্ষা করে দেখছেন। কোনরূপ যন্ত্রণা বা অসুবিধার সৃষ্টি না করে লেসারের অতি সূক্ষ্ম রশ্মি চোখের লেন্সের মধ্য দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করে রেটিনার ত্রুটি সংশোধন করে।

চাঁদ ও অন্যান্য জ্যোতিষ্কের আকাশ

পৃথিবীর কোন মানুষ চাঁদে পা দিলে প্রথমেই তার চোখে পড়বে চাঁদের আকাশের দিকে। পৃথিবীর মত সুনীল আকাশ সেখানে নেই, প্রচণ্ড রোদ থাকা সত্ত্বেও সেখানকার আকাশকে মাথার উপর একটা কালো ঢাক্‌নার মত মনে হবে। তার কারণ সেখানে বাতাস নেই, কাজেই বাতাসে ভাসমান ধূলিকণাও নেই। এই কারণেই ভোরে বা সন্ধ্যায় পৃথিবীর মত সেখানে আলো-আঁধারির ভাবটাও নেই। সেখানে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সেই আলোকচ্ছটাও নেই। হঠাৎ সেখানে দিন আসে আবার হঠাৎ রাতও আসে। সূর্যের আলো যেখানে সোজাসুজি পড়ে, সেই জায়গাটাই কেবল আলোকিত হয়, অন্যান্য জায়গাগুলি কালো আঁধারে ঢেকে থাকে।

চাঁদ থেকে পৃথিবীকে দেখা যাবে একটা বড় থালার মত, যার ব্যাস হবে পৃথিবী থেকে চাঁদের যে ব্যাস দেখা যায়, তার প্রায় চারগুণ। তবে চাঁদ থেকে পৃথিবী-পৃষ্ঠের খুঁটিনাটি কিছুই চোখে পড়বে না। এর কারণ পৃথিবীতে সূর্যের আলো পড়বার আগেই তার অনেক অংশই পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে বিচ্ছুরিত হয়ে যায়।

আমাদের আকাশে যেমন চাঁদের কলা দেখতে পাই, চাঁদের আকাশেও পৃথিবীর সেরূপ কলা দেখা যাবে। তবে একটা অন্যটার বিপরীত। আমরা যখন পৃথিবীতে পূর্ণিমার চাঁদ দেখি, চাঁদ থেকে তখন দেখা যাবে শুক্ল প্রতিপদের পৃথিবী। তেমনি এখানে যখন শুক্লপক্ষের প্রতিপদ চাঁদ থেকে পৃথিবীকে থালার মত দেখাবে; অর্থাৎ সেখানে পূর্ণ পৃথিবী। এখান থেকে আমরা যখন দেখছি শুক্লপক্ষের চাঁদ পূর্ণিমার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, চাঁদের আকাশে দেখা যাবে কৃষ্ণপক্ষের পৃথিবী ধীরে ধীরে ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে। চাঁদে যখন পূর্ণ পৃথিবী, সেখানে তখন আলোর প্লাবন বয়ে যাবে—মনে হবে নব্বুইটা পূর্ণিমার চাঁদ যেন আলো দিচ্ছে। তখন অনায়াসেই সেখানে ছোট ছোট অক্ষরে লেখা বই পড়া যেতে পারে। আমাদের আকাশে চাঁদ ওঠে আর ডোবে। কিন্তু চাঁদের আকাশে পৃথিবীকে উঠতে বা ডুবতে দেখা যায় না—দেখা যাবে আকাশের এক জায়গায় স্থির হয়ে ভেসে থাকতে। আর তারাগুলিকে দেখা যাবে আকাশে তার পিছন দিয়ে ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে। এর কারণ হলো, চাঁদ পৃথিবীর দিকে তার একটা মুখই ফিরিয়ে রাখে। তবে একেবারে স্থির হয়ে থাকে বললে ভুল হবে। কারণ চাঁদের যে সব জায়গা থেকে পৃথিবীকে দিগন্ত রেখার কাছাকাছি দেখা যাবে, সেখানে মনে হবে, আকাশ প্রদক্ষিণ না করেও পৃথিবী এক আঁকাবাঁকা পথে ভেসে চলেছে আর একবার উঠছে আর ডুবছে।

চাঁদের আকাশেও সৌর আর পার্থিব—এই দুই রকম গ্রহণ দেখতে পাওয়া যাবে। আমরা পৃথিবীতে যখন চন্দ্রগ্রহণ দেখি, চাঁদে তখনই সূর্যগ্রহণ হয়। পৃথিবী তখন সূর্য আর চাঁদের মাঝখানে এসে পড়ে আর চাঁদ পৃথিবীর ছায়ায় ডুবে যায়। চাঁদে সূর্যগ্রহণ পৃথিবীর মত কয়েক মিনিটের জন্যে নয়, তা চার ঘণ্টারও বেশী স্থায়ী হয়।

চাঁদের আকাশে পৃথিবীর গ্রহণ অতি সামান্য ব্যাপার। তখন চাঁদ থেকে দেখা যাবে, পূর্ণ পৃথিবীর বিরাট চাকার গায়ে একটা ছোট বৃত্তাকার অন্ধকারাচ্ছন্ন স্থান। এটা আর কিছুই নয়, পৃথিবীর বুকের উপর চাঁদের ছায়া আর যে জায়গা দিয়ে এই বৃত্তটি যাবে, সেখান থেকেই পৃথিবীর সূর্যগ্রহণ দেখা যাবে।

এবার শুক্রে আসা যাক। এখানকার আকাশে সূর্যকে দেখা যাবে দ্বিগুণ বড় আকারে—তার উত্তাপ আর আলোও হবে পৃথিবীর চেয়ে দ্বিগুণ বেশী। শুক্রের রাতের আকাশে পৃথিবীকে দেখতে পাওয়া যাবে অত্যন্ত উজ্জ্বল একটা তারা হিসাবে। পৃথিবী আর শুক্র আকারে প্রায় সমান অথচ পৃথিবী থেকে শুক্রকে যতটা উজ্জ্বল দেখায়, তার চেয়ে অনেক বেশী উজ্জ্বল দেখায় শুক্র থেকে পৃথিবীকে। এর কারণ আছে। শুক্র পৃথিবীর চেয়ে সূর্যের বেশী কাছে। তাই শুক্র যখন পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে আসে, তখন তার আঁধারে ঢাকা দিকটাই আমাদের দিকে ফেরানো থাকে। তারপর একটু দূরে সরে যেতেই শুক্রের একটা ছোট অংশ বা কলা আমরা দেখতে পাই। অথচ শুক্র থেকে দেখা যাবে পৃথিবী যখন শুক্রের সবচেয়ে কাছে, তখনই পৃথিবীর সবটা আলোকিত অর্থাৎ পূর্ণ পৃথিবী। এই জন্যেই উজ্জ্বলতার এই বৈষম্য।

শুক্রের আকাশে একটা চিত্তাকর্ষক দৃশ্য হলো, পৃথিবী ও চাঁদের মিলিত পরিক্রমা। মনে হবে, একটা ফুটবল আর একটা পিংপং বল নেহাৎই খামখেয়ালিভাবে লাফা-লাফি করছে। আকাশে দেখা যাবে অসংখ্য তারার মেলা—যেমন আমরা দেখি পৃথিবীর আকাশে। শুধু শুক্র কেন—বুধ, বৃহস্পতি, শনি, নেপচুন বা প্লুটো সব গ্রহ থেকেই একই নক্ষত্র-জগৎ দেখতে পাওয়া যাবে। কারণ গ্রহমণ্ডলীর মধ্যেই দূরত্বের অনুপাতে তারাগুলি রয়েছে আরো অনেক অনেক দূরে।

শুক্রের পালা শেষ করে এবার বুধে পা দেওয়া যাক। সে এক আশ্চর্য জগৎ। চাঁদের অর্ধাংশের সঙ্গে পৃথিবীর যে ধরণের আড়ি, তেমনি বুধের অর্ধাংশ সূর্যের দিক থেকে সারা বছর মুখ ফিরিয়ে থাকে। সুতরাং সূর্য আকাশে স্থির হয়ে ঝুলতে থাকে—নেই দিন-রাত্রির পালা।*

বুধের সূর্য পৃথিবীর সূর্য থেকে ছয় গুণেরও বেশী বড়। আমাদের আকাশে শুক্রের

*সম্প্রতি জানা গেছে বুধের আহ্নিক গতি আছে। বুধ গ্রহটি 59 দিনে নিজের অক্ষের উপর আবর্তিত হয়। আমাদের পৃথিবীর মত ওখানেও সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্ত হয়।

উজ্জ্বলতায় বুধের আকাশে পৃথিবীকে দেখা যাবে। বুধের কালো মেঘমুক্ত আকাশে শুক্রের দীপ্তি সৌর মণ্ডলীর অপর গ্রহ বা তারার ঔজ্জ্বল্যকে ম্লান করে দেয়।

এবার মঙ্গলে আসা যাক। এখানকার আকাশে সূর্যকে পৃথিবী থেকে দেখা সূর্যের দুই-তৃতীয়াংশ আয়তনে দেখা যাবে। 24 ঘঃ 37 মিঃ অন্তর সূর্যোদয় দেখতে পাওয়া যাবে। মঙ্গলের আকাশে পৃথিবীকে শুকতারা আর সন্ধ্যাতারার ভূমিকাতেই দেখতে পাওয়া যাবে—যেমন আমাদের আকাশে দেখি শুক্রকে। পৃথিবীর চাঁদের কলা পরিবর্তন সেখানকার আকাশে দেখা যাবে। তবে পৃথিবীর এক-চতুর্থাংশ সেখানে সব সময়ই অদৃশ্য থেকে যাবে। চাঁদকে খালি চোখেই বেশ উজ্জ্বল দেখতে পাওয়া যাবে। মঙ্গলের নিকটতম উপগ্রহ ফোবোস আকারে ছোট (16 কিঃ মিঃ ব্যাস) হলেও খুব কাছে থাকায় তার কলাগুলি স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যাবে। ফোবোসের বুকে দাঁড়ালে দেখা যাবে আকাশের 85° জুড়ে আমাদের চাঁদের চেয়ে কয়েক হাজার গুণ বেশী উজ্জ্বল একটা থালা অতি দ্রুত তার কলা বদ্‌লে চলেছে—এটাই হলো মঙ্গলগ্রহ।

মঙ্গল ছেড়ে এবার বৃহস্পতিকে ধরা যাক। বৃহস্পতির আকাশ পরিষ্কার থাকলে সূর্যকে দেখা যাবে আয়তনে আমাদের আকাশের সূর্যের পঁচিশ ভাগ ছোট। পাঁচ ঘণ্টায় দিন সহজেই শেষ হয়ে রাত এসে পড়ে। সেখানে বুধ অদৃশ্য আর মঙ্গলকেও অদৃশ্য বলা চলে। শুক্র আর পৃথিবীকে কেবলমাত্র গোধূলিতে দূরবীনের সাহায্যে দেখা যাবে—তারা সূর্যের সঙ্গে সঙ্গে আবার অস্ত যায়। তবে শনিকে বেশ উজ্জ্বল দেখাবে।

বৃহস্পতির বায়ুমণ্ডল অত্যন্ত ঘন আর উঁচু। আলোকরশ্মি ট্যারছাভাবে বায়ুমণ্ডল ভেদ করে বৃহস্পতির বুকে পড়ে; ফলে দৃষ্টিভ্রম ঘটে। অনেকে মনে করেন—বৃহস্পতির বুকে দাঁড়ালে মনে হবে যেন একটা বিরাট গামলার ভিতর দাড়িয়ে আছেন। মাথার উপর বিশাল আকাশ গামলার শেষ প্রান্তে অস্বচ্ছ ধোঁয়াটে পাড়ে শেষ হয়ে গেছে। তবে এই সব কল্পনার সত্যতা সম্পর্কে সঠিক কিছু বলা যায় না।

এখন শনির কথায় আসা যাক। শনির বিখ্যাত বলয়গুলিকে শনি-পৃষ্ঠের সব জায়গা থেকে দেখা যায় না। মেরু থেকে 640° অক্ষাংশ থেকে তারা অদৃশ্য। 50° অক্ষাংশে বলয়গুলি পুরো দেখা যাবে। বলয়গুলির একটি পাশ মাত্র আলোকিত, অন্য দিকটা অন্ধকারে ঢাকা।

শ্রীচঞ্চলকুমার রায়

পারদর্শিতার পরীক্ষা

শারীরতত্ত্ব ও জীববিদ্যা বিষয়ক পাঁচটি প্রশ্ন নীচে দেওয়া হলো। উত্তর দেবার জন্যে মোট সময় 2 মিনিট। ঐ সময়ের মধ্যে 5টি, 4টি, 3টি, 2টি বা 1টি প্রশ্নের উত্তর সঠিক হলে উল্লিখিত বিষয়গুলিতে পারদর্শিতা যথাক্রমে খুব বেশী, বেশী, চলনসই, কম বা খুব কম। কোন প্রশ্নেরই উত্তর ঠিক না হলে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

1. কোন্‌টি ঠিক, বল—

সুস্থ মানবদেহের রক্তে শ্বেত কণিকা ও লোহিত কণিকার অনুপাত মোটামুটিভাবে

1 : 5

1 : 50

1 : 500

1 : 5000

2. কোন্‌টি শীতল রক্তবিশিষ্ট প্রাণী ?

মানুষ

ছাগল

বানর

সাপ

3. কোন্‌টি ঠিক, বল—

মানবদেহে যে পৃথক অস্থিগুলি নানাভাবে যুক্ত হয়ে আছে, তাদের সংখ্যা মোটামুটিভাবে—

20

200

2000

20000

4. কোন্ প্রাণীটি স্তন্যপায়ী নয় ?

তিমি

বাদুড়

উটপাখী

প্ল্যাটিপাস

5. জীবকোষের কোন্ অংশে ক্রোম্যাটিন (Chromatin) দেখা যায় ?

নিউক্লিয়াস

সাইটোপ্লাজম

ক্রোমোজোম

কোষ-আবরণ

(উত্তর— 444 নং পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ব্রহ্মানন্দ দাশগুপ্ত ও জয়ন্ত বসু*

---

* সাহা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, কলিকাতা-9

অ্যালকেমিষ্টদের পরশপাথর

অ্যালকেমি কথাটা এসেছে গ্রীক শব্দ কিমিয়া থেকে—যার অর্থ সোনা তৈরির কৌশল। খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর প্রথম ভাগে প্লেটো ও তাঁর শিষ্য অ্যারিস্টটল—এই দুই বিখ্যাত গ্রীক পণ্ডিত প্রচার করেন যে, সকল জড় বস্তুই কয়েকটি মৌলিক ধর্ম বা গুণের বিভিন্ন আনুপাতিক সমাবেশে গঠিত এবং সেই গুণাবলী এক বস্তু থেকে অপর বস্তুতে অপসারিত করা যায়; অর্থাৎ সহজ কথায় কোন রাসায়নিক বা ভৌত প্রক্রিয়ার দ্বারা একটি মৌলিক পদার্থকে অপর একটি মৌলিক পদার্থে রূপান্তরিত করা সম্ভব। প্লেটো ও অ্যারিস্টটলের এই মতবাদ বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানী ও দার্শনিকদের প্রভাবিত করে এবং তখন থেকেই বিজ্ঞানীদের মনে এই ধারণা গড়ে ওঠে যে, কোনও নিকৃষ্ট ধাতুকে হয়তো রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় সোনাতে পরিণত করা সম্ভব হতে পারে। এর ফলে খৃঃ পূঃ প্রথম শতাব্দীর গোড়ার দিকে পঃ এশিয়া ও ইউরোপে গড়ে ওঠে এক বিজ্ঞানী সম্প্রদায়, যাঁদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল—লোহা, সীসা প্রভৃতি নিকৃষ্ট ধাতুকে সোনায় পরিণত করবার কৌশল আবিষ্কার করা। এঁদের বলা হতো অ্যালকেমিস্ট।

অ্যালকেমিস্টদের মতে, সোনাই হলো সকল ধাতুর শেষ পরিণতি। লোহা, সীসা, তামা, পারদ প্রভৃতি বিভিন্ন ধাতু ভূগর্ভে সৃষ্ট হয়, বৃদ্ধি পায় ও প্রাকৃতিক নিয়মে পরিণত অবস্থায় সোনায় রূপান্তরিত হয়। এই ভ্রান্ত ধারণার বশে অ্যালকেমিস্টরা ভাবতে সুরু করেন যে, কোন কৌশলে যদি তাঁরা প্রাকৃতিক এই রূপান্তরকে ত্বরান্বিত করতে পারেন, তবে অতি অল্প সময়ে পৃথিবীর অন্যান্য সমস্ত ধাতুকে সোনায় পরিণত করা সম্ভব হবে। অ্যালকেমিস্টদের এই মতবাদ আজ হাস্যকর মনে হলেও তাঁদের এই সোনা তৈরির প্রচেষ্টার

মধ্য দিয়েই রসায়নবিদ্যার বহু তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে। অ্যালকেমিস্টরা আবিষ্কার করেন সালফিউরিক অ্যাসিড, নাইট্রিক অ্যাসিড ও হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড—যেগুলি রাসায়নিক গবেষণার অপরিহার্য অঙ্গ। গন্ধক ও পারদের বিভিন্ন যৌগ এবং সোনাকে দ্রবীভূত করবার একমাত্র দ্রাবক অ্যাকোয়া রিজিয়া (Aqua Regia)—এক ভাগ HNO_3 ও তিন ভাগ HCl-এর মিশ্রণ। দু-একটি সঙ্কর ধাতু, কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ রাসায়নিক পদার্থও এই সময় আবিষ্কৃত হয়। আজকাল আমরা যে এত রকমের ফুলের নির্যাস ও আতর ব্যবহার করি, সেগুলির অধিকাংশই অ্যালকেমিস্টদের দান। অবশ্য কিছু সংখ্যক অ্যালকেমিস্ট রাসায়নিক গবেষণায় উৎসাহী না হয়ে তন্ত্রমন্ত্র এবং ঝাড়ফুঁকের সাহায্যেই সোনা তৈরির স্বপ্ন দেখতেন। তাঁরা পরশপাথরের (Philosopher's stone) অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিলেন এবং প্রত্যেকেই নিজস্ব মতবাদ প্রচার করে লোকের মনে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করতেন।

সে যুগে রাজারা সোনার লোভে অ্যালকেমিস্টদের সাহায্য করতেন। কথিত আছে, সম্রাট দ্বিতীয় চার্লস-এর শয়নকক্ষের তলায় অ্যালকেমির একটি গুপ্ত পরীক্ষাগার ছিল। রোজার বেকন, নিউটন, অ্যালবার্টাস ম্যাগনাস প্রমুখ বিখ্যাত বিজ্ঞানী ও দার্শনিকেরাও অ্যালকেমির চর্চায় উৎসাহী ছিলেন।

অ্যালকেমি-চর্চার প্রধান কেন্দ্র ছিল মিশর, সিরিয়া, পারস্য, আরব, চীন ও ইউরোপের ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে। ভারতবর্ষে অ্যালকেমির চর্চা প্রায় হয় নি বলা যায়—কারণ প্লেটো ও অ্যারিস্টটলের মতবাদ এবং গ্রীক দর্শন ছিল অ্যালকেমি চর্চার ভিত্তিস্বরূপ। যে কারণেই হোক, ভারতের বিজ্ঞানীরা সে যুগে ঐ গ্রীক দর্শন ও বিজ্ঞানে বিশ্বাসী ছিলেন না। অন্যান্য দেশগুলিতে কিন্তু খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত কয়েক শত বছর ধরে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অ্যালকেমিস্টদের প্রতিপত্তি অব্যাহত ছিল। তবে জনসাধারণ ক্রমশঃ তাদের সন্দেহের চোখে দেখতে সুরু করে। কারণ অ্যালকেমির চর্চা কেবল বিজ্ঞানীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে ক্রমশঃ প্রতারকদের হাতিয়ার হয়ে উঠেছিল। ফলে জনসাধারণের মনে রসায়নবিদ্যার প্রতি সন্দেহের উদ্রেক হয় এবং অ্যালকেমির চর্চা প্রায় বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হয়। এই সময় খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে প্যারাসেলসাস নামে একজন রসায়নবিদ প্রচার করেন যে, অ্যালকেমিস্টরা এতদিন কিছুটা ভ্রান্ত পথে চালিত হয়েছেন, অ্যালকেমি-চর্চার প্রকৃত উদ্দেশ্য—বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধের ঔষধ প্রস্তুত করা—স্বর্ণোৎপাদন করা নয়। প্যারাসেলসাসের প্রভাবে এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে অ্যালকেমিস্টরা দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েন। অল্প সংখ্যক বিজ্ঞানী তখনও কৃত্রিম সোনা তৈরির জন্যে গবেষণা চালিয়ে যান, কিন্তু অধিকাংশ অ্যালকেমিস্টদেরই কয়েক শতাব্দীর নৈরাশ্যের ফলে অ্যারিস্টটলের মতবাদের উপর আস্থা কমে আসে এবং তাঁরা চিকিৎসা-রসায়ন বা আয়েট্রো কেমিষ্ট্রিতে উৎসাহী হয়ে ওঠেন। এরপর থেকে বিভিন্ন রোগের ঔষধ প্রস্তুতি, নতুন নতুন রাসায়নিক যৌগের গুণাগুণ নির্ণয় ও সেগুলিকে মানুষের উপকারে লাগাবার প্রচেষ্টাই

ছিল অ্যালকেমিস্টদের প্রধান কাজ। অবশেষে সপ্তদশ শতাব্দীতে আয়ার্ল্যাণ্ডের বিজ্ঞানী রবার্ট বয়েল মৌলিক ও যৌগিক পদার্থের প্রভেদ বুঝিয়ে দেন এবং মৌলিক পদার্থের সুস্পষ্ট সংজ্ঞা নির্দেশ করেন। ফলে অ্যারিস্টটলের বহু বিতর্কিত চতুর্মৌলিক মতবাদ সম্পূর্ণ ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়। বিজ্ঞানীরা বুঝতে পারেন যে, কোনও ভৌত বা রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় মৌলিক পদার্থের রূপান্তর সম্ভব নয়। এর পর সোনা তৈরির প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায় এবং রসায়ন-বিজ্ঞান অনেকটা আধুনিক রূপ লাভ করে।

অবশ্য আজ এই বিংশ শতাব্দীতে ইলেট্রন তত্ত্ব আবিষ্কার হওয়ায় প্রাচীন অ্যালকেমিস্টদের স্বপ্ন আমাদের কাছে অসম্ভব বা অবাস্তব মনে হবার কোনও কারণ নেই। আমরা জানি, মৌলিক পদার্থের পরমাণুতে আছে প্রধানতঃ প্রোটন, ইলেকট্রন ও নিউট্রন কণিকা। এর মধ্যে প্রোটনের সংখ্যা পদার্থের মৌলিকত্ব বজায় রাখে, অর্থাৎ কোনও মৌলিক পদার্থের পরমাণুতে যদি প্রোটনের সংখ্যা কমানো বা বাড়ানো যায়, তবে সেটা অন্য এক মৌলিক পদার্থে পরিণত হবে। যেমন—একটা সোনার পরমাণুতে প্রোটন আছে 79 আর একটা পারদের পরমাণুতে প্রোটন আছে 80, এখন যদি কোনও উপায়ে পারদের পরমাণু থেকে একটা প্রোটন কমিয়ে দেওয়া যায়, তবে সেটা সোনার পরমাণুতে পরিণত হবে। এইভাবে বর্তমানে আবিষ্কৃত সাইক্লোট্রন, বিভাট্রন, কস্‌মোট্রন প্রভৃতি যন্ত্রের সাহায্যে মৌলিক পদার্থের রূপান্তর ঘটানো সম্ভব হচ্ছে। এই সব যন্ত্রের সাহায্যে আমরা কৃত্রিম উপায়ে সোনাও পেতে পারি। এথেকে মনে হতে পারে যে, এর ফলে সোনার মূল্যও বোধ হয় খুব কমে যাবে। কিন্তু তা হবে না, কারণ এই পদ্ধতিতে সোনা তৈরি করা অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য এবং এই ব্যয় উৎপন্ন সোনার মূল্যের চেয়ে অনেক বেশীই হবে। সুতরাং অ্যালকেমিস্টদের পরশপাথর আজ আমাদের হাতে এলেও আর্থিক দিক দিয়ে লাভবান হবার সম্ভাবনা নেই।

বুলবুল বন্দ্যোপাধ্যায়

মুক্তার কথা

মুক্তার সঙ্গে মানুষের পরিচয় প্রাচীন কাল থেকেই। বস্তুতঃ প্রাচীন কাল থেকেই মুক্তাকে অলঙ্কার হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। ভারতের প্রাচীন অথর্ববেদে ও সুপ্রাচীন মিশরীয় সভ্যতায় মুক্তার উল্লেখ দেখা যায়।

ইতিহাস থেকে জানা যায়, জুলিয়াস সিজার তাঁর প্রিয়পাত্রী সারভিলিয়াকে একটি দামী মুক্তা উপহার দিয়েছিলেন, যার দাম ছিল প্রায় পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড। সৌন্দর্যের রাণী ক্লিওপেট্রা একটি মুক্তা গলাধঃকরণ করেছিলেন, যার দাম ছিল প্রায়

আশি হাজার পাউণ্ড। টাভার্নিয়ার নামে এক পর্যটক একটি আশ্চর্য সুন্দর মুক্তা এক-শ' আশি হাজার পাউণ্ড মূল্যে পারস্যের সম্রাটকে বিক্রয় করেছিলেন। মুক্তা সম্বন্ধে আরও বিস্ময়কর কাহিনীর সন্ধান ইতিহাসে পাওয়া যায়। তাছাড়া ভারতের মুঘল বাদশা সাজাহানের মণিমুক্তার ভাণ্ডারের কথা কে না জানে ?

মুক্তার জন্মকথা—সমুদ্রে ছোট বড় নানা জাতের ঝিনুক পাওয়া যায়। তার মধ্যে এক জাতীয় বড় ঝিনুকের ভিতর মুক্তা জন্মায়। এই ঝিনুকের নাম শুক্তি (Meleagrina)। এটা মোলাস্কা বা শম্বুক পর্বের অন্তর্গত পেলিসাইপোডা (Pelecypoda) শ্রেণীর প্রাণী। ঝিনুকের দেহের দু-পাশে শক্ত খোলস থাকে। সমান দুটি পার্শ্বীয় অংশে বিভক্ত এই খোলসটি ঝিনুকের কোমল দেহটাকে আবৃত করে রাখে। খাদ্য-গ্রহণ করবার সময় মাঝে মাঝে প্রাণীটিকে ঐ শক্ত খোলসটির কিছুটা খুলতে হয়। সে সময় কোন রকমে যদি কোন কঠিন কণা তার ভিতরে ঢুকে যায়, তবে সেটা তার নরম দেহে কাঁটার মত বিঁধতে থাকে। তখন সেই শুক্তি তার দেহ থেকে এক প্রকার রস নির্গত করে এবং কণাটির চতুর্দিকে সেই রসের প্রলেপ দিয়ে কণাটিকে সহনীয় করে নেয়। তারপর শুক্তির দেহের ভিতর কণাটি ক্রমাগত রসের প্রলেপে মোটা হতে থাকে। যখন শুক্তি মারা যায়, তখন তার দেহের শক্ত খোলকটি আপনা থেকেই শিথিল হয়ে যায় এবং তার দেহের ভিতর থেকে শক্ত ডেলাটি বেরিয়ে এসে সমুদ্রতলে পড়ে থাকে। ঐ ডেলাটির রং হয় অদ্ভুত সুন্দর—লাল, নীল, হলদে, সাদা প্রভৃতি ঝকঝকে রঙে সে যেন সূর্যের আলোয় জ্বলতে থাকে। এরাই স্বভাবজ খাঁটি মুক্তা।

কিন্তু এই স্বভাবজ মুক্তার দাম অনেক—সাধারণ মানুষের ক্রয়-সীমার বাইরে। কিন্তু সাধারণ ঘরের মেয়েদেরও ইচ্ছা হয় মুক্তার মালা পরবার। কাজেই প্রয়োজন হলো অপেক্ষাকৃত সস্তাদরের মুক্তার। বাজারে বের হলো নকল মুক্তা। কিন্তু এর মধ্যে কতকগুলি একেবারেই নকল—পুতি অথবা কাচগোলকের উপর নানা প্রকার রঙের প্রলেপ দিয়ে এগুলি তৈরি করা হয়, কিন্তু কিছুদিন বাদেই এর উপরের রং উঠে যায়।

বহুদিনের চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের ফলে আর একটি উপায়ে মানুষ কৃত্রিম মুক্তা উৎপাদনে আসল মুক্তার নিকটবর্তী হতে সক্ষম হয়েছে। এই মুক্তার নাম কালচার্ড বা কর্ষিত মুক্তা। ডুবুরীরা খুঁজে বের করে সমুদ্রের তলদেশে কোন্ গোপন স্থানে ঝাঁকে ঝাঁকে শুক্তি বাস করে। তারপর বছরের যে সময় সেই স্থানের সমুদ্র অপেক্ষাকৃত শান্ত থাকে, সে সময়ে বেছে বেছে তারা শুক্তি সংগ্রহ করে আনে এবং শুক্তির মধ্যে একটি সূক্ষ্ম প্রক্রিয়ার সাহায্যে শক্ত কণা ঢুকিয়ে শুক্তিগুলিকে তাদের স্বস্থানে ছেড়ে দেয়। মুক্তা-গবেষকগণ জানেন যে, কতদিনে শুক্তির দেহের রস দিয়ে ঐ কঠিন কণিকাগুলিকে

ঘিরে প্রলেপের পর প্রলেপ জমে তৈরি হবে একটি সুগোল ও সুদৃশ্য মুক্তা। হিসাবমত নির্দিষ্ট সময় পরে শুক্তিগুলকে তুলে এনে তার ভিতর থেকে বের করে নেওয়া হয় কর্ষিত মুক্তা।

কিন্তু কর্ষিত মুক্তার চাষে বাধা অনেক। সময় সময় টাইফুন নামে যে প্রচণ্ড ঝড় ওঠে, তার প্রবল প্রকোপে সমুদ্র অশান্ত হয়ে ওঠে। অনেক সময় ঝড়ের দাপটে কর্ষণ-করা শুক্তির ঝাঁক নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। কখনো কখনো মড়ক লেগে শুক্তিগুলি মরে যায়। ফলে এই সব ক্ষেত্রে মুক্তা-ব্যবসায়ীদের অনেক ক্ষতি হয়। তাছাড়া সমুদ্রে মুক্তার চাষে ডুবুরীদের প্রাণহানির সম্ভাবনাও থাকে প্রচুর।

এই সকল অসুবিধা দূরীকরণের জন্যে জাপানী মুক্তা-গবেষকগণ এক নূতন পদ্ধতির উদ্ভাবন করেছেন। কয়েক বছর পূর্বে জাপানের কাশিকোজিমার মুক্তা-গবেষণাগারে গবেষক কুওয়াতালি ও তাঁর সহকর্মীরা আরও সহজে কর্ষিত মুক্তা সৃষ্টি করবার এক উপায় উদ্ভাবন করেছেন। তাঁরা বড় বড় কাচের চৌবাচ্চা তৈরি করে তাতে সমুদ্রের জল পূর্ণ করে প্রথমে ঐ চৌবাচ্চায় শুক্তির আহার্য এক প্রকার সামুদ্রিক উদ্ভিদ উৎপন্ন করেন। তারপর সেখানে ছেড়ে দেন এক ঝাঁক শুক্তি। প্রতিদিন চৌবাচ্চায় সমুদ্রের জল বদ্‌লে দিতে হয়। তা না হলে শুক্তিগুলি মরে যাবার সম্ভাবনা প্রচুর। ক্যালসিয়াম, অ্যামোনিয়া প্রভৃতি শুক্তির বৃদ্ধির অনুকূল রাসায়নিক পদার্থ প্রয়োগ করা হয় তাদের সুস্থ সবল ও দীর্ঘায়ু করতে। তারপর উপযুক্ত সময়ে শুক্তির দেহাবরণে অতি সূক্ষ্ম অস্ত্রোপচার করে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় একটি কঠিন কণিকা। এই কণিকা তাদের দেহে সর্বদাই অস্বস্তি জাগায়। তখন তাদের দেহ থেকে প্রচুর রস নির্গত হয়ে কণিকাটিকে প্রলেপের পর প্রলেপ দিয়ে ঘিরে ফেলতে থাকে। অস্ত্রোপচারের পর শুক্তিগুলিকে আবার চৌবাচ্চার জলে ছেড়ে দেওয়া হয়। তারপর নির্দিষ্ট সময় পরে তাদের তুলে দেহের ভিতর থেকে মুক্তা সংগ্রহ করে নেওয়া হয়।

কর্ষিত মুক্তা দুষ্প্রাপ্য স্বভাবজ মুক্তার প্রায় সমকক্ষ। কিন্তু এর দাম স্বভাবজ মুক্তা অপেক্ষা অনেক কম। স্বভাবজ মুক্তার সঙ্গে কর্ষিত মুক্তার তফাৎ শুধু রঙের ঔজ্জ্বল্যে। কারণ, স্বভাবজ মুক্তার ক্ষেত্রে কণিকাটির উপর শুক্তি তার সারাজীবন ধরে রস নিঃসরণ করায় প্রলেপটি হয় অনেক পুরু। কর্ষিত মুক্তায় ঐ প্রলেপ অপেক্ষাকৃত কম পুরু হওয়ায় রঙের বাহারও হয় কম। তবুও মূল্যের দিক দিয়ে সাধারণের নাগালের মধ্যে থাকায় কর্ষিত মুক্তার চাহিদা খুব বেশী।

শ্রীশঙ্করলাল সাহা

লাক্ষার কথা

সভ্যতার বিভিন্ন পর্যায়ে লাক্ষার বিভিন্ন ব্যবহার আজও অনেকেরই অজানা। এই পদার্থটি মানুষের কাজে লেগে আসছে প্রাচীনকাল থেকেই। মহাভারতে পঞ্চ পাণ্ডবদের হত্যা করবার জন্যে দুর্যোধনের যতুগৃহে অগ্নিসংযোগের পরিকল্পনায় লাক্ষা ব্যবহারের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। মোগল দরবারে আসবাবপত্রের পালিশ হিসাবে লাক্ষা ব্যবহারের কথা মোগল যুগের গ্রন্থাবলীতে বর্ণিত হয়েছে। খৃঃ পূঃ 1200 শতকেও আর্যগণ কর্তৃক ভারতে লাক্ষা ব্যবহারের কথা জানা যায়। ভারতে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্বকালে ইউরোপে লাক্ষার ব্যবহার প্রচলিত হয়। তখন অবশ্য আসবাবপত্রের পালিশ তৈরি করবার জন্যেই প্রধানতঃ লাক্ষা ব্যবহার করা হতো।

লাক্ষার ইতিবৃত্ত থেকে এই পদার্থটি যে কি—অনেকেরই তা জানবার কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক। লাক্ষা হলো একটি কীটজাত রেজিন জাতীয় পদার্থ। এক বিশেষ ধরণের কীটের শরীর থেকে নির্গত রস জমাট বেঁধে লাক্ষার সৃষ্টি হয়। এই কীট-গুলিকে বলা হয় লাক্ষাকীট। ইংরেজীতে এদের বলা হয় Laccifer lacca। এই লাক্ষাকীট পলাশ, কুল প্রভৃতি বৃক্ষের নরম শাখায় আশ্রয় গ্রহণ করে এবং এই কীট-জাত রস জমাট বেঁধে বেশ কিছুটা কঠিন লাক্ষায় পরিণত হয়। যে সব বৃক্ষে এই লাক্ষাকীট আশ্রয় গ্রহণ করে, সেই সব বৃক্ষগুলিকে বলা হয় আশ্রয়দাতা বৃক্ষ। অসংখ্য কীট এক জায়গায় একত্রে আশ্রয় নেয় বলেই ভারতীয় শব্দ 'লাখ' থেকে লাক্ষা নামের উৎপত্তি। এক পাউণ্ড লাক্ষা তৈরি করবার জন্যে প্রায় 17,000 থেকে 90,000 লাক্ষাকীটের প্রয়োজন।

পৃথিবীতে খুব অল্প কয়েকটি স্থানেই লাক্ষা উৎপন্ন হয়। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো—ভারত, থাইল্যাণ্ড ও ব্রহ্মদেশ। ভারতের মধ্যপ্রদেশ ও বিহারেই সবচেয়ে বেশী লাক্ষা উৎপন্ন হয়। ভারত হলো পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ লাক্ষা উৎপাদন কেন্দ্র।

প্রাকৃতিক লাক্ষাকে আজকাল রাসায়নিক দ্রব্যের সাহায্যে বিশুদ্ধ পর্যায়ে আনা সম্ভব হয়েছে বলে এর প্রয়োগও হচ্ছে বিভিন্ন শিল্পে; যেমন—গ্রামোফোনের রেকর্ড তৈরির কাজ, চীনামাটির বাসনপত্র ও খেলবার তাসের মসৃণতা সম্পাদন, বিদ্যুৎ-অপরিবাহী পদার্থ নির্মাণ এবং অন্যান্য বহুবিধ কাজে লাক্ষার ব্যবহার হয়ে থাকে।

সুনীল সরকার

উত্তর (পারদর্শিতার পরীক্ষা)

1. 1 : 500
2. সাপ
3. 200
4. উটপাখী
5. নিউক্লিয়াস

প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন : 1. বিভিন্ন পাখী বিভিন্ন রঙের হয়ে থাকে—এই রঙের উৎস কি ?

চন্দন বন্দ্যোপাধ্যায়, কামারহাটি

প্রশ্ন : 2. জমির উর্বরতা কিসের উপর নির্ভর করে ?

সন্দীপ হাজরা ও দিলীপ বসু, গোবরডাঙা

উত্তর : 1. বিভিন্ন পরিবেশে বিচিত্র রং ও আকৃতির পাখী আমাদের সকলেরই চোখে পড়ে। পাখীর গায়ের রং সাধারণতঃ তার পালকের রঙের উপরই নির্ভরশীল। পাখাদের পালকে এই রঙের উৎপত্তি নিয়ে বিজ্ঞানীরা অনেক গবেষণা করেছেন এবং অবশেষে এই সিদ্ধান্তে পৌচেছেন যে, এই রংগুলির পিছনে সক্রিয় রয়েছে কতকগুলি রাসায়নিক রঞ্জক দ্রব্য। এই রাসায়নিক দ্রব্যগুলির কোনটি পাখীদের দেহের অভ্যন্তরে সৃষ্ট হয়, আবার কোনটি বা পাখীর খাদ্যদ্রব্য থেকে আহৃত হয়।

সাধারণভাবে পাখীর পালকের মধ্যে যে সব রং থাকে, তাদের বলা হয় বাইক্রোম। এগুলি আবার তিন রকমের—মেলানিন, ক্যারোটিনয়েড ও পরফাইরিন। এদের এক-একটির উপস্থিতিতে পাখীর পালকের রং বিশেষ বিশেষ ধরণের হয়ে থাকে। মেলানিনজাতীয় রঞ্জক দ্রব্যের উপস্থিতিতে পাখীর পালকের রং হয় সাধারণতঃ হাল্কা হলদে থেকে বাদামী, ঘন বাদামী ও কালো। ক্যারোটিনয়েডজাতীয় রঞ্জক দ্রব্যের উপস্থিতিতে পাখীর পালকের রং হয় হলদে, কমলা অথবা লাল। পরফাইরিনজাতীয় রঞ্জক পদার্থের উপস্থিতিতে পালকের রং সবুজ, গোলাপী অথবা উজ্জ্বল লাল রঙের হয়ে থাকে। মেলানিনজাতীয় রঞ্জক পদার্থ অপেক্ষাকৃত দীর্ঘস্থায়ী রঙের সৃষ্টি করে। অনেক সময় পাখীর পালকের রং পরিবর্তন চোখে পড়ে! এর মূলে রয়েছে রঞ্জক পদার্থসমূহের রাসায়নিক পরিবর্তন।

পাখীর পালকে রঙের উৎপত্তি নিয়ে এখনও বিশদভাবে গবেষণা চলছে। আমরা ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই এই বিষয়ে আরও অনেক কিছু জানতে পারবো।

উত্তর : 2. জমির উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষমতা প্রধানতঃ জমির উর্বরতার উপর নির্ভর করে। উর্বরতা ছাড়া জমির উৎপাদিকা শক্তি যথোচিত জলসেচন, জলবায়ু ও মাটির নীচে স্থায়ী জলস্তরের গভীরতা ইত্যাদির উপরও নির্ভরশীল।

জমির উর্বরতা বৃদ্ধির জন্যে আমরা সাধারণতঃ সার প্রয়োগ করে থাকি। উদ্ভিদের পুষ্টির জন্যে নাইট্রোজেন, ফস্‌ফরাস, পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম, জল ইত্যাদি অধিক মাত্রায় ও চুন, লোহা, ম্যাগনেসিয়াম, গন্ধক প্রভৃতি অল্প মাত্রায় প্রয়োজন। এই সমস্ত প্রয়োজনীয়

উপাদান উদ্ভিদকে সারের মাধ্যমে সরবরাহ করা হয়। বর্তমানে প্রাকৃতিক সারের সঙ্গে সঙ্গে রাসায়নিক সার, যথা—নাইট্রোজেন সার, ফস্‌ফরাস সার, পটাস সার ও মিশ্র সার ইত্যাদির প্রয়োগও খুব বেড়ে গেছে। প্রাকৃতিক সারের মধ্যে গোবর, পচা পাতা, ছাই ইত্যাদি অন্যতম। রাসায়নিক সারের প্রয়োগে জমির উর্বরতা আপাতঃ বৃদ্ধি হয় বটে, কিন্তু এই সারের ক্রমাগত ব্যবহারে জমির উৎপাদিকা শক্তি কমে যায়। এই কারণে রাসায়নিক সার খুব সতর্কতার সঙ্গে ব্যবহার করা উচিত। সার প্রয়োগের ফলে শুধুমাত্র যে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি পায় তা নয়, এর ফলে শক্ত মাটি নরম হয় আবার বেলে মাটি দৃঢ় সংবদ্ধ হয়।

সার প্রয়োগ জমির উর্বরতা বৃদ্ধির মূল কথা হলেও আরও অনেক আনুষঙ্গিক ব্যাপারের উপর এটা নির্ভর করে। জমিতে আগাছা জন্মালে এরা জমি থেকে খাদ্য গ্রহণ করে, এর ফলে জমি অনুর্বর হয়ে পড়ে। এই কারণে জমি থেকে আগাছা তুলে ফেলা দরকার। উদ্ভিদের বীজ বপনের আগে জমি ভালভাবে কর্ষণ করলে মাটি ঝুরঝুরে হয়ে যায় এবং জল, হাওয়া ইত্যাদি প্রবেশের পথ পায়। এর ফলে শস্যের ফলনও বাড়ে। একই জমিতে পর পর একই শস্যের চাষ করলেও জমির উর্বরতা হ্রাস পায়। বিভিন্ন উদ্ভিদ ধ্বংসকারী কীট-পতঙ্গের প্রভাবে শুধুমাত্র জমির ফসলই নষ্ট হয় না, জমির উর্বরতাও কমে যায়। এই কারণে ওষুধ প্রয়োগে কীট-পতঙ্গের আক্রমণ প্রতিরোধ করা দরকার। এগুলি ছাড়াও জমিতে জল দাঁড়াবার ফলে জমির ক্ষয় হয় ও জমি অনুর্বর হয়ে পড়ে।

ধানের চাষে নাইট্রোজেন খুবই প্রয়োজনীয়। একই জমিতে বার বার ধান চাষ করলে জমিতে নাইট্রোজেনের পরিমাণ হ্রাস পায়। সে জন্যে ঐ জমিতে শিমজাতীয় উদ্ভিদ, যথা—ছোলা, কলাই, বরবটি ইত্যাদি চাষ করে জমিতে নাইট্রোজেনের সমতা বজায় রাখা হয়।

মাটির অম্লত্ব ও ক্ষারত্বের উপর বিভিন্ন ফসলের ফলন নির্ভর করে। যে সব জমির মাটি সামান্য পরিমাণে অম্লধর্মী, সে সব জমিতে ধান, গম, আলু ইত্যাদির ভাল ফলন হয়। আবার সামান্য ক্ষারধর্মী জমিতে টোম্যাটো, বীট ইত্যাদি ভাল জন্মায়। মাটিতে অম্ল অথবা ক্ষারের পরিমাণ বেশী হলে শস্যের ভাল ফলন হয় না। এই কারণে 2-1 বছর অন্তর অম্লাত্মক মাটিতে চুন প্রয়োগ করে ও ক্ষারাত্মক মাটিতে জলসেচ ও গন্ধক ইত্যাদির প্রয়োগের দ্বারা মোটামুটিভাবে মাটিকে নিরপেক্ষ অবস্থায় রাখতে চেষ্টা করা হয়।

শ্যামসুন্দর দে *

* ইনস্টিটিউট অব রেডিও-ফিজিক্স অ্যাণ্ড ইলেকট্রনিক্স, বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা-9

বিবিধ

পৃথিবীর কক্ষপথে তিনজন সোভিয়েট মহাকাশচারী

মস্কো থেকে রয়টার ও এ. পি. কর্তৃক প্রচারিত খবরে প্রকাশ—সোভিয়েটের স্বয়ংক্রিয় মহাকাশ গবেষণাগার স্যালিউটকে গত 19ই এপ্রিল পৃথিবীর কক্ষপথে পাঠানো হয়। সেদিন থেকেই সেটি অবিরাম পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে চলছে।

6ই জুন মস্কো থেকে সোভিয়েট সংবাদ প্রতিষ্ঠান টাস জানিয়েছে, স্যালিউট-এর সঙ্গে মিলিত হবার জন্যে তিন মহাকাশচারী—কর্নেল দব্রোভলস্কি, ফ্লাইট ইঞ্জিনিয়ার ভল্কভ এবং টেস্ট ইঞ্জিনিয়ার ভিক্টর পাটাসায়েভ—সোয়ুজ-11 মহাকাশযানে চড়ে মহাকাশে পাড়ি দিয়েছেন।

এর আগে সোয়ুজ-10 গত 24শে এপ্রিল স্যালিউট-এর সঙ্গে মিলিত হয়ে যুক্তভাবে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেছে।

যাত্রার পূর্ব মুহূর্তে চলতি অভিযানের অধিনায়ক দব্রোভলস্কি এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন, সোয়ুজ-10-এর তুলনায় তাঁদের কাজ হবে আরও ব্যাপক ও আরও জটিল। পৃথিবীর কক্ষপথে যে যন্ত্রাগারটি প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, তাঁরা সেটির সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে যুক্তভাবে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিবিদ্যা সংক্রান্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাবে এবং সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্য নিয়ে মহাকাশে এই সকল গবেষণা চলবে। সোয়ুজ-10 মহাকাশযান যে কাজ সুরু করেছিল, তার দ্বিতীয় পর্যায় শেষ করবার দায়িত্ব নিয়ে তাঁরা মহাকাশে যাচ্ছেন।

সোয়ুজ-10 যখন মহাকাশে পাড়ি দিয়েছিল, তখন মস্কোর প্রায় সকলেই আশা করেছিলেন, এক বা একাধিক মহাকাশচারী স্যালিউটে চড়ে বসবেন এবং সেটাই হবে সোভিয়েটের মহাকাশ-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার পরম সাফল্য। কিন্তু 48 ঘণ্টার মধ্যে সোয়ুজ-10 পৃথিবীতে প্রত্যা-বর্তন করে।

প্রত্যাবর্তনের আগে অবশ্য দুটি মহাকাশ-যান পরস্পরের সঙ্গে গাঁথা অবস্থায় বার কয়েক পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেছিল। কিন্তু মহাকাশচারীরা স্যালিউটে চড়ে বসবার চেষ্টা করেছেন বলে শোনা যায় নি।

টাস অবশ্য এবারও বলেছে যে, সোয়ুজ-10 যে কাজ আরম্ভ করেছিল, সোয়ুজ-11 তা চালিয়ে যাবে।

আটলান্টিক মহাসাগরে মোতায়েন সোভিয়েট বিজ্ঞান অ্যাকাডেমীর তিনখানা জাহাজ সোয়ুজ-11-র গতিবিধির দিকে নজর রাখছে।

পরবর্তী খবরে প্রকাশ—7ই জুন মস্কো থেকে ঘোষণা করা হয়েছে যে, সোয়ুজ-11-এর আরোহী তিনজন মহাকাশচারী যন্ত্রাগার স্যালিউটে চড়ে বসেছেন।

গত এপ্রিল মাস থেকে স্যালিউট টেলিস্কোপ, স্পেকট্রোস্কোপ ও অন্যান্য নানাবিধ বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি নিয়ে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে চলছিল।

সোভিয়েট সংবাদ প্রতিষ্ঠান টাস ঘোষণা করেছে, মহাকাশে বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তি-বিদ্দের নিয়ে একটি গবেষণাগার চালু হলো। মহাকাশ-যানে করে পৃথিবীর কক্ষপথে প্রদক্ষিণরত একটি গবেষণাগারে উঠে বসা এবং সেখানে বসে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা সংক্রান্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাবার চেষ্টা এই প্রথমবার সফল হলো।

সোয়ুজ-11-র তিনজন মহাকাশচারীর মৃত্যু

মস্কো থেকে টাস কর্তৃক প্রচারিত সংবাদে প্রকাশ যে, 30শে জুন ভোরে রুশ মহাকাশযান

সোয়ুজ-11-কে পৃথিবীতে নামিয়ে আনলে দেখা যায়—তিন জন মহাকাশচারী দব্রোভলস্কি, ভলকভ ও পাটাসায়েভ মারা গিয়েছেন। এঁদের মৃত্যুর কারণ সম্বন্ধে মস্কোর 2রা জুলাইয়ের খবরে প্রকাশ—পৃথিবীর আবহমণ্ডলে পুনঃপ্রবেশের সময় রক্ত ডেলা বেঁধে রক্ত-চলাচলে ব্যাঘাত সৃষ্টির ফলেই মহাকাশচারীদের মৃত্যু ঘটেছে বলেই স্থানীয় কমিউনিষ্ট মহলের অনুমান।

পৃথিবীর কক্ষপথে সোভিয়েট-যান

বোচাম (পশ্চিম জার্মেনী) থেকে ইউ. পি. আই. কর্তৃক প্রচারিত সংবাদে প্রকাশ—বোচাম মানমন্দিরের কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন যে, সোভিয়েট ইউনিয়ন 22শে জুন সকালে এক মহাকাশযান কক্ষপথে উৎক্ষেপণ করেছে। সোয়ুজ মহাকাশ গবেষণা প্রকল্পের সঙ্গে এটি জড়িত। এই মহাকাশযান থেকে যে সঙ্কেত ধ্বনি ধরা পড়েছে তাতে বোঝা যায় যে, যানটি এখন কক্ষপথে পৃথিবী পরিক্রমণ করছে।

স্যালিউটের গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা

মস্কো থেকে টাস কর্তৃক প্রচারিত সংবাদে প্রকাশ—সোভিয়েট ইউনিয়নের মহাকাশ গবেষণাগার স্যালিউটের তিনজন আরোহী 22শে জুন তাঁদের গবেষণাগারটিকে জ্যোতির্বিদ্যা-সংক্রান্ত এমন সব গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা-নিরীক্ষার উদ্দেশে চালিয়ে নিয়ে যান, যাতে নক্ষত্র সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞানের ভাণ্ডার বৃদ্ধি পাবে।

সোয়ুজ-11-এর আরোহী তিনজন—জর্জি দব্রোভলস্কি, ভ্লাদিস্লাভ ভলকভ ও ভিক্টর পাটাসায়েভ—তাঁদের যন্ত্রগুলিকে দুটি নক্ষত্রের দিকে ঘুরিয়ে নক্ষত্র দুটি যে ধরণের আলো সৃষ্টি করে, তার সুন্দর ছবি তোলেন।

একটি নক্ষত্র হচ্ছে আলফা-লিরে—আকাশের দ্বিতীয় উজ্জ্বলতম নক্ষত্র, আর একটি অপেক্ষাকৃত স্বল্পালোক নক্ষত্র—জিটা-উরসা মেজর নক্ষত্র-পুঞ্জের একটি ক্ষুদ্র নক্ষত্র।

মহাকাশে চারাগাছ

মস্কো থেকে সোভিয়েট সংবাদ সংস্থা টাস জানিয়েছে যে, সোভিয়েট টেলিভিশন দর্শকেরা প্রদক্ষিণরত মহাকাশ স্টেশন স্যালিউটে দুটি চারাগাছ দেখেছেন। চারাগাছ দুটি মহাকাশে ভারশূন্য অবস্থায় গজিয়েছে এবং পাতা ধরেছে।

স্যালিউটের একটি কক্ষে গ্রীনহাউসটি অবস্থিত। একটি পাত্রে থলেয় করে বিভিন্ন গাছের বীজ মহাকাশে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

চাঁদের বয়স

বোম্বাই থেকে ইউ. এন. আই. কর্তৃক প্রচারিত খবরে প্রকাশ—গবেষণায় জানা গেছে যে, চাঁদের বয়স 450 কোটি বছরের কাছাকাছি—প্রায় পৃথিবীর বয়সের সমান। বোম্বাই শহরের একজন বিজ্ঞানী ডক্টর দিনকর পি. খারকার একথা বলেছেন।

ডক্টর খারকার মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে চাঁদ সম্পর্কে গবেষণা করছেন।

প্রধান সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য
শ্রীমিহিরকুমার ভট্টাচার্য কর্তৃক পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-6 হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ 37/7 বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত।

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের ত্রয়োবিংশ প্রতিষ্ঠা-বার্ষিকী অনুষ্ঠানে বিজ্ঞান পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু (বাম দিক হইতে), অনুষ্ঠানের সভাপতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ সেন, প্রধান অতিথি বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পর্ষদের প্রধান অধিকর্তা ডক্টর আত্মা রাম এবং বিশিষ্ট অতিথি কলিকাতাস্থিত বাংলাদেশ কূটনৈতিক মিশনের প্রধান জনাব এম, হোসেন আলি।

প্রতিষ্ঠা-দিবস সংখ্যা

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

চতুর্বিংশ বর্ষ | অগাষ্ট, 1971 | অষ্টম সংখ্যা

নিবেদন

গত 28 জুলাই, 1971 পরিষদের নিজস্ব ভবনের বক্তৃতা-কক্ষে এক মনোরম পরিবেশে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের ত্রয়োবিংশতিতম প্রতিষ্ঠা-দিবসের অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হইয়াছে। এই অনুষ্ঠানের বিশদ বিবরণাদি পত্রিকার বর্তমান সংখ্যার অন্যত্র প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট বিজ্ঞানী, শিক্ষাবিদ্‌ ও বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিগণের উপস্থিতি আমাদিগকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করিয়াছে। এই উপলক্ষে তাঁহাদের প্রতি আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

বর্তমানে বিজ্ঞান-শিক্ষার সর্বস্তরে মাতৃভাষাকে মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করিবার চেষ্টা দ্রুত গতিতে অগ্রসর হইতেছে। ইহাতে বিজ্ঞান পরিষদের মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান শিক্ষাদানের বহুল প্রচারিত নীতিরই যৌক্তিকতা প্রমাণিত হইয়াছে এবং নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, ইহা পরিষদের পরিকল্পনাসমূহের সার্থক রূপায়ণে অবিচল নিষ্ঠা ও দৃঢ় প্রতীতীর সহিত অগ্রসর হইবার প্রেরণা যোগাইবে।

পরিষদের আদর্শ ও উদ্দেশ্য এবং গত বৎসরের কার্যবিবরণী বর্তমান সংখ্যায় 'কর্মসচিবের নিবেদনে' বিবৃত হইয়াছে।

মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞানবিষয়ক তথ্যাদি পরিবেশনে বিজ্ঞান পরিষদ যে ঐকান্তিক নিষ্ঠার সহিত যথাসাধ্য কাজ করিয়া যাইতেছে—এই কথা সকলেই অবগত আছেন, তথাপি প্রতি বৎসরই পরিষদের উদ্দেশ্য এবং কর্মপদ্ধতির বিষয় জনসাধারণকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া কর্তব্য বলিয়া মনে করি।

এই উপলক্ষে পরিষদের উদ্দেশ্য সর্বপ্রকারে সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তুলিবার জন্য আমরা ইহার ভবিষ্যৎ কর্মসূচীতে সর্বস্তরের জনগণের সহযোগিতা ও আনুকূল্য কামনা করিতেছি।

আর্যভট, কোপার্নিকাস ও গ্যালিলিও

প্রিয়দারঞ্জন রায়

জ্যোতির্বিজ্ঞানের তিনজন অগ্রণী মহারথীর অবদানের বর্ণনা বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। প্রাচীন ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্ আর্যভট হলেন এঁদের মধ্যে পূর্ববর্তী। পোলাণ্ডদেশীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানী কোপার্নিকাস এবং বিশ্ববিখ্যাত ইটালিয়ান জ্যোতির্বিজ্ঞানী গ্যালিলিও যথাক্রমে তাঁর হাজার ও বার-শ' বছরের পরবর্তী। অথচ এই তিনজনকেই জ্যোতির্বিজ্ঞানের পুরোধা ও প্রতিষ্ঠাতা বললে বিশেষ অত্যুক্তি হয় না। এই প্রসঙ্গে গ্রীক জ্যোতির্বিজ্ঞানী হিপার্কাস (খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দী) এবং টলেমীর (খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী) অবদানও বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

পাটলিপুত্র নগরের নিকটস্থ কুসুমপুরে খৃষ্টীয় পঞ্চম শতকে আর্যভটের জন্ম ও কার্যকাল নির্ধারিত। মাত্র 23 বছর বয়সে (499 খৃষ্টাব্দে) তিনি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'আর্যভটীয়' রচনা করেন। তাঁরই অনুপ্রেরণায় ও পরিচালনায় পাটলিপুত্র নগরে ঐ সময়ে জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং গণিতশাস্ত্রের একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং গোষ্ঠী গড়ে ওঠে। জ্যোতির্বিজ্ঞানে তাঁর বিশিষ্ট অবদানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে :

1. সূর্যের চারিদিকে পৃথিবীর আবর্তনের ধারণা

আর্যভটীয় গ্রন্থে গতিশীল বস্তুমাত্রেরই আপেক্ষিক গতির ধারণা দেখতে পাই।

অনুলোমগতির্নৌস্থঃ পশ্যত্যচলং বিলোমগং যদ্বৎ।
অচলানি ভানি তদ্বৎ সমপশ্চিমগানি লঙ্কায়াম্॥

অর্থাৎ, পূর্বদিকে গতিযুক্ত নৌকায় আসীন ব্যক্তি নদীর উভয় পার্শ্বস্থ তটবর্তী অচল বৃক্ষাদি যেমন পশ্চিমগামী দেখেন, তেমনই লঙ্কাতে অচল নক্ষত্রসমূহকে সমবেগে পশ্চিম দিকে ধাবমান দেখা যায়।

এই বৈজ্ঞানিক তথ্যকে ভিত্তি করেই তিনি সূর্যকে কেন্দ্র করে পৃথিবীর আবর্তনের গতি সিদ্ধান্ত করেন। তথাপি তিনি তাঁর আর্যভটীয় গ্রন্থের যাবতীয় গণনায় পৃথিবীকেন্দ্রিক সূর্যের গতির ধারণা অব্যাহত রেখেছেন। এথেকে মনে হয় যে, উভয় ক্ষেত্রেই গতির আপেক্ষিকতা-হেতু গণনার কোন ব্যতিক্রম ঘটে না—সম্ভবতঃ এই তাঁর ধারণা ছিল। দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য এই কথাটি তাঁর 'সিদ্ধান্ত শিরোমণি' গ্রন্থে পরিস্ফুট-ভাবে প্রকাশ করেন। এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে, আইনস্টাইন প্রবর্তিত বিশেষ আপেক্ষিকতা তত্ত্বের (Special relativity theory) অঙ্কুর আর্যভট ও ভাস্করাচার্যের ধারণার মধ্যে প্রচ্ছন্ন রয়েছে। গ্রীক দার্শনিক হীরাক্লিদিজ খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে পৃথিবীর অক্ষের উপরে তার দৈনিক আবর্তনের কথা লিখে গেছেন এক প্রকার কল্পনা থেকে। হীরাক্লিদিজের কিছু পরে খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে অ্যারিস্টার্কাস অব সামোস সর্বপ্রথম সূর্যকেন্দ্রিক পৃথিবীর আবর্তনের কথা ঘোষণা করেন। পৃথিবীর অক্ষের উপরে দৈনিক আবর্তন—তাঁর এই পরিকল্পনার বিশেষত্ব ছিল। এসব মতামত বেশীর ভাগই কাল্পনিক, সুতরাং এদের সঠিক মূল্যায়ন করা যায় না। আর্যভটের বহু শতাব্দী পরে জ্যোতির্বিজ্ঞানী কোপার্নিকাস (1473-1543) সূর্যকেন্দ্রিক পৃথিবী এবং অন্যান্য গ্রহের আবর্তনের সিদ্ধান্ত প্রচার করেছেন বিশিষ্ট তথ্যের উপরে নির্ভর করে এবং আপেক্ষিক

গতির ধারণা থেকে। কিন্তু তাঁর গ্রন্থের মুখবন্ধে লিখেছেন, কোন নিগূঢ় কারণে (সম্ভবতঃ তৎকালীন ধর্মযাজকদের অসন্তোষের আশঙ্কায়) ধারণাটিকে বাস্তব সত্য বলে বিশ্বাস করতে পারেন নি।

2. পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি

ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্গণের মধ্যে আর্যভট, ব্রহ্মগুপ্ত এবং ভাস্করাচার্য বিভিন্ন প্রকারের গতির বর্ণনা ও তাদের কারণ নির্দেশ করতে গিয়ে পতনশীল বস্তুর গতি পৃথিবীর আকর্ষণজনিত এবং সেই গতি ইচ্ছাশক্তির সাহায্যে প্রতিরোধ করা সম্ভব বলে উল্লেখ করেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা হয়েছে যে, পতনশীল বস্তুকে হাত দিয়ে ধরে রাখা যায়, কিম্বা কোন আশ্রয় বা অবলম্বনের সাহায্যে তার পতন নিবারণ করা চলে। গ্রীক জ্যোতির্বিদ্ টলেমী বহু পূর্বে মাধ্যাকর্ষণ ও মহাকর্ষণ শক্তির অস্তিত্ব সম্বন্ধে আভাস দিয়ে গেছেন। গ্রহগণের যুগ্মবৃত্তাকারে (Epicycle) আবর্তনের কল্পনায় বোঝা যায় যে, আর্যভট মহাকর্ষণ শক্তি সম্বন্ধেও অবহিত ছিলেন।

আর্যভটকে ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানের পথিকৃৎ ও প্রতিষ্ঠাতা বললে অত্যুক্তি হয় না। তাঁর গ্রন্থে পূর্ববর্তী বা ভিন্ন দেশীয় কোন জ্যোতির্বিদের সিদ্ধান্তের ঋণের লক্ষণ আমরা দেখতে পাই না। ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানে আর্যভটের স্থান গ্রীক জ্যোতির্বিজ্ঞানে টলেমীর স্থানের সঙ্গে তুলনা করা চলে। পরবর্তী কালের ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা শুধু আর্যভটের সিদ্ধান্তসমূহকেই সংশোধিত করেছেন বলা চলে। এঁদের রচনার মধ্যে বিশেষ কোন মৌলিক চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায় না। গণিতশাস্ত্রেও আর্যভটের অবদান অতুলনীয় বলা চলে। এক্ষেত্রেও তাঁকে পথিকৃৎ হিসেবে গণ্য করা যায়।

কোপার্নিকাস (1473-1543)

মিকোলা কোপার্নিগ, ল্যাটিন নিকোলাস, কোপার্নিকাস পোলাণ্ডের পোমেরানিয়া প্রদেশের অন্তর্গত ভিশ্চুলার তীরবর্তী থর্ন নামক স্থানে 1473 খৃষ্টাব্দের 19শে ফেব্রুয়ারী এক সম্ভ্রান্ত ধনীবংশে জন্ম গ্রহণ করেন। শৈশব থেকেই তাঁর জ্যোতিষ ও

কোপার্নিকাস

গণিতে গভীর অনুরাগ ছিল। তিনি ইটালিতে বিদ্যাশিক্ষা করেন। তাঁর মতবাদের একটি সংক্ষিপ্ত সার 'Commentariolus' প্রথম প্রকাশিত হয় 1529 খৃষ্টাব্দে এবং মূল ও সম্পূর্ণ গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে 1543 খৃষ্টাব্দে।

সম্প্রতি পোলাণ্ড দেশীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানী কোপার্নিকাসের পঞ্চম জন্ম-শতবার্ষিকী উৎসবের আয়োজন চলেছে। তিনি প্রথমে সূর্যকেন্দ্রিক পৃথিবী এবং অন্যান্য গ্রহের আবর্তনের ধারণাকে ভিত্তি করে জ্যোতির্বিজ্ঞানের যাবতীয় গণনা করে গেছেন। এর ফলে গ্রহগণের অতিকেন্দ্রিক বিষম গতির এক সন্তোষজনক সমাধান পাওয়া যায়।

পরবর্তীকালে কেপ্‌লারের গ্রহগণের উপবৃত্তাকার পথে আবর্তনের সিদ্ধান্তের সাহায্যে এই গণনা আরও সূক্ষ্মভাবে নির্ধারিত হয়। কোপার্নিকাস আর্যভটের মত গতিশক্তির আপেক্ষিকতা তথ্যের উপর ভিত্তি করেই জ্যোতিষ্কগণের সূর্যকেন্দ্রিক আবর্তনের ধারণা করেন। আর্যভট তাঁর গণনায় পৃথিবীকেন্দ্রিক ধারণাই বলবৎ রেখেছিলেন। কিন্তু কোপার্নিকাস সূর্যকেন্দ্রিক সিদ্ধান্তকে অবলম্বন করেই তাঁর যাবতীয় গণনা করায় অধিকতর নির্ভরযোগ্য ও সন্তোষজনক ফলাফল লাভ করেছিলেন। এখানে কোপার্নিকাসের অবদান অধিকতর মূল্যবান বলে স্বীকার করতে হয়। এই কারণেই তাঁকে আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের জন্মদাতা বললে অত্যুক্তি হয় না। সূর্যের চারদিকে পৃথিবীর আবর্তনের ধারণার ফলে কোপার্নিকাস অয়নচলনের প্রকৃত কারণ নির্দেশ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি বিভিন্ন গ্রহ, উপগ্রহ ও চন্দ্রের সম্বন্ধে সূর্যকেন্দ্রিক ধারণার ভিত্তিতে অনেক আলোচনা করেন। পূর্ববর্তী জ্যোতির্বিদ্‌দের সিদ্ধান্ত থেকে তাঁর সিদ্ধান্তের অনেক উৎকর্ষের প্রমাণ পাওয়া যায়। কোপার্নিকাসের মতবাদে পৃথিবী নিজের অক্ষের উপরে ঘূর্ণায়মান এবং একদিনে একটি আবর্তন সম্পূর্ণ করে ও পৃথিবীর চারদিকে চন্দ্র বৃত্তাকার পথে আবর্তনরত। চন্দ্রসমেত নিজের অক্ষের উপরে আবর্তনশীল পৃথিবী যে সূর্যের চারদিকে আবর্তনরত—কোপার্নিকাসের এই মতবাদের সত্যতা পরবর্তী কালে গ্যালিলিও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে প্রমাণ করেন। পর্যবেক্ষণের ফলে মহাকাশে শুক্রগ্রহে চন্দ্রের মত কলার অস্তিত্ব আবিষ্কার করেই তিনি এই সত্যতা সমর্থন করেছিলেন। পৃথিবীকেন্দ্রিক সূর্য ও গ্রহগণের আবর্তনের মতবাদে শুক্রগ্রহের এরূপ পরিপূর্ণ কলার অস্তিত্ব সম্ভব হয় না।

তা সত্ত্বেও কোপার্নিকাসের মতবাদের সঙ্গে অনেক নতুন আবিষ্কৃত তথ্যের অমিল দেখা যায়। এর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য, কেপ্‌লার কর্তৃক মহাকাশে গ্রহগণের গতি নির্ধারণ। কোপার্নিকাসের গ্রহগণের বৃত্তাকার বা সূক্ষ্মবৃত্তাকার আবর্তনের পরিবর্তে তাদের উপবৃত্তাকার পথে আবর্তনের মতবাদ প্রতিষ্ঠা করে কেপ্‌লারএর সংশোধন করেন এবং নিউটন দেখালেন যে, গ্রহগণের উপবৃত্তাকার পথে আবর্তনের কারণ, গ্রহদের পারস্পরিক আকর্ষণ (মহাকর্ষণ) শক্তি।

গ্যালিলিও (1564-1642)

1564 খৃষ্টাব্দের 15ই ফেব্রুয়ারী পিসায় গ্যালিলিও গ্যালিলি এক সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি গণিতশাস্ত্র এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানে
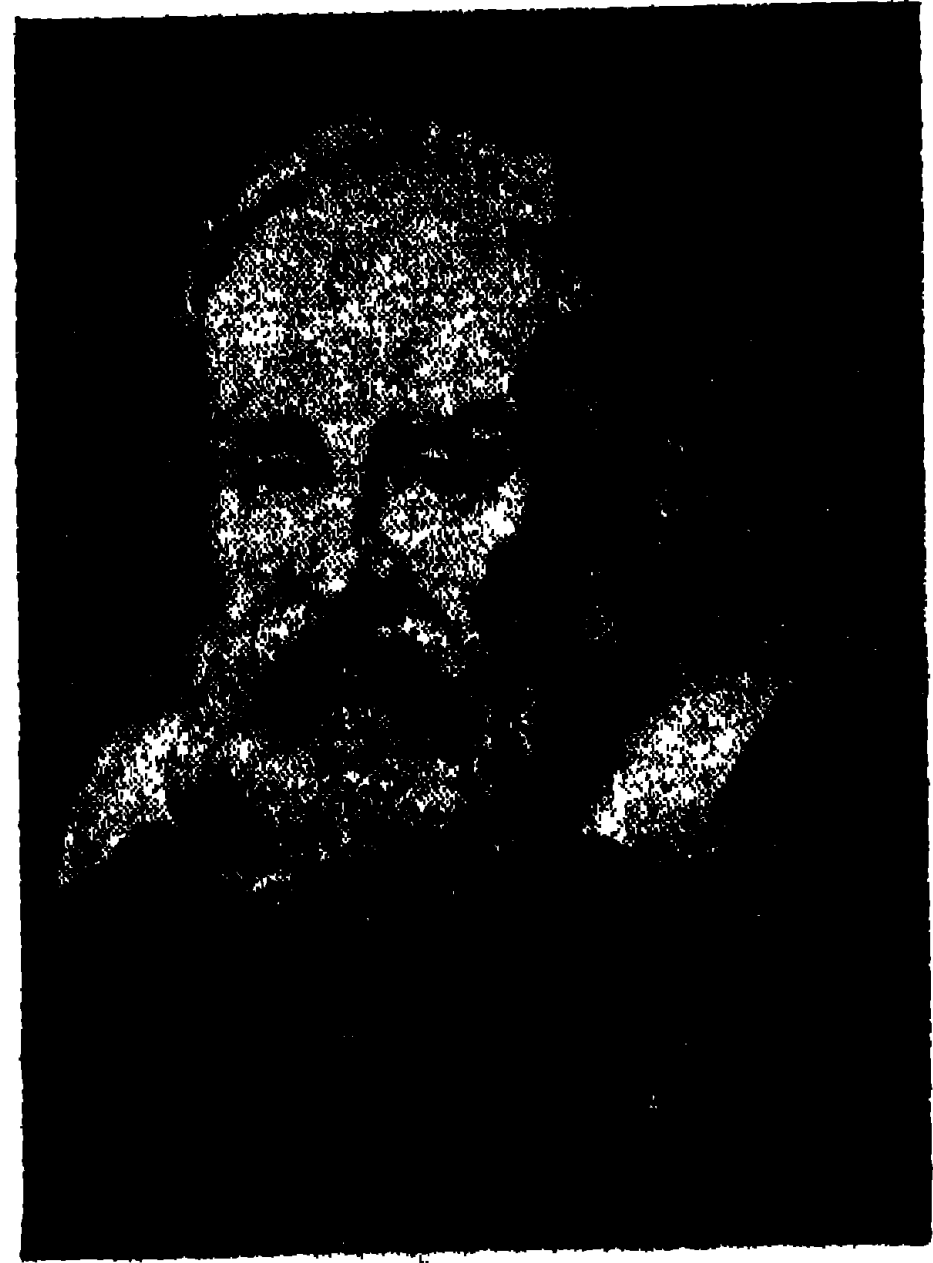
গ্যালিলিও

বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন। মাত্র 25 বছর বয়সেই তিনি পিসা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন।

তিনি কোপার্নিকাসের সূর্যকেন্দ্রিক গ্রহগণের আবর্তনের পরিকল্পনাকে দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে মহাকাশ পর্যবেক্ষণ করে সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করেন।

উন্নত ধরণের দূরবীক্ষণ যন্ত্র নির্মাণ ও মহাকাশ পর্যবেক্ষণে তার প্রয়োগ জ্যোতির্বিজ্ঞানে গ্যালিলিওর একটি অক্ষয় অবদান। পদার্থবিদ্যায় তাঁর বহু উচ্চাঙ্গের আবিষ্কার বিজ্ঞানের ভাণ্ডারে অপূর্ব সম্পদ হিসাবে চিরকাল অক্ষুণ্ণ থাকবে।

জ্যোতির্বিজ্ঞানে তাঁর অন্যবিধ বিশেষ অবদান হচ্ছে, বৃহস্পতির চারটি উপগ্রহের আবিষ্কার, কৃত্তিকা নক্ষত্রপুঞ্জের মধ্যে 36টি নক্ষত্রের পর্যবেক্ষণ, ছায়াপথে অসংখ্য নক্ষত্রের অস্তিত্বের প্রমাণ, যুগ্ম নক্ষত্রের আবিষ্কার, চন্দ্রের কলঙ্কের কারণ আবিষ্কার, সূর্যপৃষ্ঠে সৌরকলঙ্কের অবস্থিতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট নির্দেশ ইত্যাদি।

কোপার্নিকাসের প্রবর্তিত সূর্যকেন্দ্রিক গ্রহগণের আবর্তনের মতবাদ সমর্থনের জন্যে 1633 খৃষ্টাব্দে ধর্মযাজকদের বিচারালয়ে তাঁকে অভিযুক্ত করা হয় এবং তিনি কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। স্বাধীনভাবে জ্ঞান সাধনার জন্যে গ্যালিলিওর আত্মদান বিজ্ঞানের ইতিহাসে একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা।

জরা

শ্রীদেবব্রত নাগ*

'জন্মিলে মরিতে হইবে'—একথা স্বতঃস্বীকার্য। জন্ম থেকে ক্রমশঃ বয়োবৃদ্ধি এবং পরিণামে মৃত্যু—এই ঘটনাকে একটি একমুখী প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া বলা যায়। কিন্তু আজকাল মানুষ এই একমুখী প্রক্রিয়ার গতিরোধ করে চির-যৌবন লাভের কামনা পোষণ করে আসছে এবং হাজার হাজার বছর ধরে এই রহস্যের অনুসন্ধান মানুষকে অনেক নতুন তথ্য যুগিয়েছে সন্দেহ নেই। বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায়, যেমন—আণবিক জীববিদ্যা, প্রাণ-রসায়নবিদ্যা এবং শারীরবিদ্যায় যে সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে, তা চিরযৌবন লাভের রহস্য সন্ধানে অনেক নতুন পথের নিশানা দেবে।

জরা ও দেহভিত্তিক পরিবর্তন

জন্মগ্রহণ করবার পর প্রাণীরা বৃদ্ধি এবং ক্ষয়—এই দুটি বিপরীত প্রণালীর মধ্য দিয়ে চলতে থাকে। মানুষের ক্ষেত্রে সাধারণতঃ 25 বছর বয়স পর্যন্ত বিভিন্ন দেহগ্রন্থি ক্রমশঃ পরিণতি লাভ করতে থাকে। সে সময় কর্মক্ষমতাও বৃদ্ধি পায়। তারপর 35 বছর বয়সে বৃদ্ধি এবং কর্মক্ষমতা উভয়ই স্থিতিশীল হয়ে যায়। এরপর বিভিন্ন দেহগ্রন্থির প্রাণশক্তি এবং কর্মক্ষমতা হ্রাস পেতে থাকে। ইদানীং আরও কিছু নতুন তথ্য পাওয়া গেছে। কোন কোন বৈজ্ঞানিকের ধারণা, 28 বছর বয়সে বৃদ্ধি এবং কর্মক্ষমতা উভয়ই স্থিতিশীল হয়ে যায় এবং তারপরই ক্ষয় সুরু হতে থাকে। বয়সের সীমারেখা যাই হোক না কেন, এটা জানা গেছে যে, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে হৃৎপিণ্ডের রক্ত-সঞ্চালন ক্ষমতা, মূত্রাশয়ের পরিস্রাবণ ক্ষমতা, বিভিন্ন পেশীর কর্মক্ষমতা এবং দেহের আরও অন্যান্য সাম্যবস্থার ক্রমশঃ ব্যাঘাত ঘটতে থাকে। দেহের বিভিন্ন গ্রন্থির বৃদ্ধি এবং কার্যক্ষমতাও বিভিন্ন সময়ে কমে যেতে সুরু করে। কেবল তাই নয়, দেহের জীবাণু প্রতিরোধ এবং ক্ষয়িত অবস্থা থেকে আরোগ্য লাভ করবার ক্ষমতাও বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে কমে যেতে থাকে। দেহের

* চারুচন্দ্র কলেজ, কলিকাতা

সমস্ত ক্ষমতা লোপ পেলে মৃত্যু অবধারিত; অর্থাৎ যে কোন দেহরোগের আরোগ্যলাভ অসম্ভব হলে তবেই মৃত্যু হয়। অপঘাত মৃত্যু বাদ দিলে সমস্ত প্রাণীর জন্ম থেকে মৃত্যুর বিভিন্ন ধাপগুলি প্রায় একই ধারায় অতিক্রান্ত হয়। জরার দেহভিত্তিক নানা রকম ব্যাখ্যা হয়েছে। সাধারণভাবে জরা (Aging) হলো এমন একটি জৈবিক প্রণালী, যা প্রাণীদের রোগাক্রান্ত হবার প্রবণতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি করে।

জরাসংক্রান্ত গবেষণা

জরা সংক্রান্ত গবেষণাকে মূলতঃ তিনটি ভাগে আলোচনা করা চলে।

1. জৈবিক অর্থাৎ জরার আণবিক, প্রাণ-রাসায়নিক এবং দেহভিত্তিক পরিচয়গুলি সঠিক-ভাবে অনুসন্ধান করা এবং যে যে প্রণালীর সাহায্যে জরা প্রতিরোধ করা যায়, তা ভাল ভাবে জানা।

2. রোগ সম্পর্কিত অর্থাৎ বৃদ্ধকালে রোগাক্রমণের কারণ এবং আরোগ্য লাভের উপায় সম্পর্কে অনুসন্ধান করা।

3. সমাজ এবং মনস্তত্ত্ব সম্পর্কিত অর্থাৎ অবসরপ্রাপ্ত এবং বৃদ্ধ লোকেদের নানান সমস্যা জানা এবং কিভাবে তাদের সমাজের কাজে লাগানো যায়, তা পরীক্ষা করে দেখা।

জরা রোধের যে কোন প্রচেষ্টার সুরুতেই কয়েকটি প্রশ্নের আলোচনা করা প্রয়োজন বলে মনে হয়। প্রথমটি হলো. কোন বিশেষ কারণে বা কিসের প্রভাবে জরার সূত্রপাত? দ্বিতীয়টি হলো প্রাণীর জীবনকাল কি কি বিশেষ কারণের উপর নির্ভরশীল? তৃতীয়টি হলো, একই এবং বিভিন্ন প্রাণীর জীবনকালে তারতম্য হবার মূল-গত কারণ কি?

প্রাণ-রাসায়নিক পর্যবেক্ষণ

জরাসংক্রান্ত বহুমুখী গবেষণা সত্ত্বেও এর সর্বজনগ্রাহ্য কোন কারণ খুঁজে পাওয়া এখনও সম্ভব হয় নি। দেখা গেছে—হৃৎপিণ্ড, মস্তিষ্ক এবং করোটি যে সকল কোষ দিয়ে গঠিত, তাদের বিভাজন একটি নির্দিষ্ট বয়ঃসীমা পর্যন্ত ঘটে এবং তারপর বন্ধ হয়ে যায়। তাই Szilarard-এর (1959) মতে, জরা হলো Post-mitotic কোষের ক্রোমোজোমস্থ জিনের (Gene) পরিবর্তন।

এরপর জৈবরসায়নবিদ্ Curtis (1961) পরীক্ষাগারে ইঁদুরের উপর রঞ্জেনরশ্মি ফেলে দেখতে পেলেন, ইঁদুরের সাধারণ আয়ু রঞ্জেনরশ্মির প্রভাবে কমে যায়, এমন কি—মস্তিষ্ক, হৃৎপিণ্ড প্রভৃতি গ্রন্থিগুলির কোষের ক্রোমোজোমের নানা রকম পরিবর্তন ঘটে। রঞ্জেনরশ্মির পরিমাণ আরও বাড়ালে ইঁদুরের আয়ু আরও কমতে দেখা গেছে। যদিও বিভিন্ন রাসায়নিক পরিবর্তক (Chemical mutagens), যা ক্রোমোজোমকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে, তা ব্যবহার করে পরি-বর্তকের পরিমাণের অনুপাতে আয়ু কমতে দেখা যায় নি। এর সঠিক ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব হয় নি।

Hyflick (1961) দেখতে পান যে, মানুষের Diploid embryonic কোষগুলি পরীক্ষা-নলে উপযুক্ত পরিবেশে জন্মাবার (Culture) ব্যবস্থা করলে 50±10 Generation পর্যন্ত বিভাজন হবার পর সেগুলি ধ্বংস হয়ে যায়। সুতরাং কোষের একটি নির্দিষ্ট আয়ুষ্কাল আছে। এর কারণ মনে হয়, ক্রমাগত পরিব্যক্তি (Mutation) ঘটবার ফলে ক্রোমজোমের বিভাজন ক্ষমতা লোপ পায়।

জিনের পরিব্যক্তি সম্পর্কিত বিভিন্ন পরীক্ষা থেকে এখনও জানা যায় নি—কিসের প্রভাবে এই পরি-ব্যক্তি ঘটে এবং কিভাবে প্রতিটি প্রাণীর জীবনকাল স্থিরীকৃত হয়। Orgel-এর (1963) মতে, প্রোটিনকে

দু-ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমটি হলো, যে সব প্রোটিন কোষ গঠনে (যেমন—কোলাজেন, কেরোটিন ইত্যাদি) এবং পাচন-প্রক্রিয়ায় (যেমন—জৈব অনুঘটক) অংশ গ্রহণ করে। আর দ্বিতীয়টি হলো, যে সব প্রোটিন অন্য প্রোটিন সংশ্লেষণে অংশ গ্রহণ করে; যেমন—RNA-পলিমারেজ, অ্যামিনো অ্যামাইল পরিবাহক RNA-সিন্থেটেজ ইত্যাদি। যদি প্রথম প্রকৃতির প্রোটিনে কোন রকম ত্রুটি দেখা দেয়, যেমন—কোন একটি জৈব অনুঘটকের একটি অ্যামিনো অ্যাসিড বদলে গেলে জৈব অনুঘটকটির সক্রিয়তা আংশিক বা পুরাটাই নষ্ট হয়ে যায়। যদিও এই ত্রুটি কখনও কখনও সংশোধন করে দেওয়া যায়। সামান্য ত্রুটিযুক্ত প্রোটিন বা ভ্রমাত্মক প্রোটিনের পরিমাণ খুব সামান্য থাকায় ঐ প্রোটিনের ধ্বংসাত্মক প্রতিক্রিয়াগুলি খুব সামান্যই হবার কথা। যদিও দ্বিতীয় প্রকৃতির প্রোটিন যেমন একটি ভ্রমাত্মক RNA-পলিমারেজ কোষে দেখা দিলে সেটি বহু সংখ্যক ভ্রমাত্মক পরিবাহক-RNA এবং ভ্রমাত্মক Ribosomal-RNA তৈরি করবে। আবার ঐ ভ্রমাত্মক RNA-গুলি প্রোটিন সংশ্লেষণে অংশ গ্রহণ করে বহু সংখ্যক ভ্রমাত্মক প্রোটিন এবং ভ্রমাত্মক জৈব অনুঘটক তৈরি করবে; অর্থাৎ ত্রুটির পরিমাণ কোষের বিভিন্ন খাতে বেড়েই যাবে, যতক্ষণ না কোষের সমস্ত ত্রুটিমুক্ত পদার্থগুলি থেকে ভ্রমাত্মক পদার্থগুলি বেশী হয়। এর ফলে কোষের জীবনকাল এবং সক্রিয়তা ক্রমশঃ লোপ পেয়ে কোন এক সময় পুরাপুরি শেষ হয়ে যায়।

Holliday (1968) উপরিউক্ত অনুমানের উপযুক্ত তথ্য দিতে সক্ষম হলেন। সাধারণ অ্যামিনো অ্যাসিড ব্যবহার না করে কয়েকটি সমজাতীয় অ্যামিনো অ্যাসিডের উপস্থিতিতে Podospora নামক উদ্ভিদটিকে বাড়তে দিলেন। দেখা গেল ঐ অবস্থায় Podospora-র জীবনকাল সাধারণ অবস্থা থেকে অনেক কমে গেছে। এমন কি, পুরনো Podospora আক্রান্ত Podospora-র সঙ্গে জন্মাতে দিলে সাধারণ অবস্থা থেকে আরও দ্রুত প্রথমটির মৃত্যু ঘটে। এই ধরণের পরীক্ষা অ্যামিবার ক্ষেত্রেও করে দেখা গেছে। এই পরীক্ষা থেকে মনে হয় আক্রান্ত কোষের সাইটোপ্লাজমে হয়তো এমন কোন ভ্রমাত্মক প্রোটিন আছে, যা সাধারণ উদ্ভিদকে ধ্বংস করে দিতে পারে।

সুইস বিজ্ঞানী Verzar কোলাজেন নামক অধিক আণবিক ওজনসম্পন্ন প্রোটিনের উপর কাজ করে দেখালেন যে, কোলাজেন প্রোটিন অণুগুলির মধ্যে সংযোগ বন্ধনী বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকে। বিভিন্ন কোষের মধ্যেকার ফাঁকা স্থানে ঐ প্রোটিনগুলি জমতে থাকে। ফলে কোষের প্রয়োজনীয় আহার কোষাভ্যন্তরে সহজে সরবরাহ হতে পারে না। ঐ কারণে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কোষের পুষ্টির অভাব দেখা দেয়। Verzar-এর মতে, কোষের মৃত্যু ঘটে অনাহারে।

এছাড়াও Harman, Burnet প্রমুখ বিজ্ঞানীরা আরও বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে জরার কারণ বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা করেছেন। ইদানীং যদিও জরার কারণ হিসাবে প্রজনন-সঙ্কেত জিনের উপরই বেশী গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

জরা এবং প্রজনন-সঙ্কেত জিনের সম্পর্ক

ভারতীয় বিজ্ঞানী M. S. Kanungo-এর (1969) মতে, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে জিনের পরিবর্তন হয়ে থাকে। জিনে ত্রুটি বা পরিবর্তন দেখা দিলে নতুন প্রোটিন বা ভ্রমাত্মক প্রোটিনের সৃষ্টি হতে পারে। তিনি দেখিয়েছেন, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে ইঁদুরের বিভিন্ন গ্রন্থির কোষে অবস্থিত কিছু কিছু জৈব অনুঘটকের সক্রিয়তা বিভিন্ন হারে বাড়ে বা কমে।

পরীক্ষার উপাদান হিসাবে ল্যাক্টিক ডিহাইড্রোজিনেজ বা সংক্ষেপে LDH নামক জৈব অনুঘটকটিকে তিনি বেছে নিয়েছেন। এর কারণ হলো—

1. LDH-এর আণবিক গঠন-প্রকৃতি এবং এর সংশ্লেষণে অংশ গ্রহণকারী প্রজনন-সঙ্কেত মোটামুটি জানা গেছে।

2. শর্করাজাতীয় পদার্থ থেকে পেশী সঞ্চালনের প্রয়োজনীয় শক্তির মূলে LDH অনেকটা দায়ী। শর্করাজাতীয় পদার্থ প্রথমে অক্সিজেনের অনুপস্থিতিতে এবং পরে অক্সিজেনের উপস্থিতিতে ভেঙ্গে কার্বন ডাই-অক্সাইড এবং জলে পরিণত হয়। অক্সিজেনের অনুপস্থিতিতে শর্করাজাতীয় পদার্থ ধাপে ধাপে বিভিন্ন জৈব অনুঘটকের সাহায্যে বিক্রিয়ার প্রায় শেষ সীমায় পাইরুভিক অ্যাসিডে পরিণত হয়। অক্সিজেনের উপস্থিতিতে পাইরুভিক অ্যাসিড কার্বন ডাই-অক্সাইড এবং জলে পরিণত হয়। কিন্তু অক্সিজেনের অনুপস্থিতিতে LDH পাইরুভিক অ্যাসিডকে ল্যাক্টিক অ্যাসিডে পরিণত করে। এই বিক্রিয়া থেকে যে শক্তি নির্গত হয়, তা পেশী-সঞ্চালনে ব্যবহৃত হয়।

3. LDH আসলে পাঁচ রকমের। এগুলিকে বলা হয় সম-জৈবঅনুঘটক (Isozyme)। প্রত্যেকটিই পাইরুভিক অ্যাসিডকে ল্যাক্টিক অ্যাসিডে পরিণত করে, যদিও ওগুলির মধ্যে সক্রিয়তার তারতম্য যথেষ্ট লক্ষণীয়।

প্রতিটি LDH অণু চারটি প্রোটিন শৃঙ্খলের সমন্বয়ে গঠিত। দু-রকমের প্রোটিন শৃঙ্খল পাওয়া গেছে—H এবং M। H এবং M এককগুলির মধ্যে সমন্বয়ের ফলে H_4, H_3M_1, H_2M_2, H_1M_3 এবং M_4—এই পাঁচটি LDH জৈব অনুঘটক পাওয়া যায়। বিভিন্ন গ্রন্থির কোষে পাঁচটি LDH-এর পরিমাণগত পার্থক্যও দেখা গেছে। H_4-LDH অনুঘটকটি প্রধানতঃ যে সব কোষে অক্সিজেনের চাহিদা বেশী, যেমন—হৃৎপিণ্ড এবং মস্তিষ্ককোষে বেশী থাকে। M_4-LDH কিন্তু যে সব কোষে অক্সিজেনের চাহিদা কম অর্থাৎ Skeletal muscle-এ বেশী থাকে। হৃৎপিণ্ডে যেটি বেশী থাকে, তাকে সংক্ষেপে H একক এবং যেটি পেশীতে বেশী থাকে, তাকে M একক দিয়ে সংক্ষেপে প্রকাশ করা হয়। জানা গেছে H এককটির সংশ্লেষণের মূলে যে জিনটি আছে, তা M এককটির জিন থেকে ভিন্ন। কেবল তাই নয়, অক্সিজেনের অনুপস্থিতিতে পাইরুভিক অ্যাসিডকে ল্যাক্টিক অ্যাসিডে পরিণত করতে M_4-LDH, H_4-LDH অপেক্ষা অনেক বেশী সক্রিয়। বিভিন্ন বয়সের ইঁদুরের হৃৎপিণ্ড, মস্তিষ্ক এবং পেশীকোষের সংখ্যা গুণে দেখা গেছে যে, জন্মের 10 সপ্তাহ পরে ঐ গ্রন্থিগুলির কোষ-বিভাজন বন্ধ হয়ে যায়। সুতরাং কোষ-বিভাজন বন্ধ হয়ে গেলে মৃত্যু পর্যন্ত ঐ গ্রন্থিগুলির কোষ-সংখ্যা প্রায় একই থেকে যায়—লিভারে যদিও কিছু শতাংশ কোষের ভাঙ্গা-গড়া সব সময়ই চলতে থাকে। সুতরাং বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্ক, হৃৎপিণ্ড, Skeletal muscle-এ যদিও আর নতুন কোষ জন্মলাভ করে না, কিন্তু লিভারে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে কিছু সংখ্যক নতুন কোষ জন্মলাভ করায় সেখানে পুরনো এবং নতুন—দু-রকমের কোষই পাওয়া যায়। উল্লেখযোগ্য পর্যবেক্ষণ হলো—বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে M_4-LDH প্রায় সমস্ত কোষেই H_4-LDH-এর তুলনায় কমতে থাকে। হয়তো শর্করাজাতীয় পদার্থ থেকে যে শক্তি পেশী-সঞ্চালনে প্রয়োজন, তা M_4-LHD-এর অভাবহেতু লোপ পেতে থাকে। বৃদ্ধ বয়সে পেশী-সঞ্চালন ক্ষমতা হ্রাস পাওয়ার এটাই হয়তো মূল কারণ। মস্তিষ্ক এবং হৃৎপিণ্ডে অক্সিজেনের চাহিদা বেশী, তা আগেই বলা হয়েছে। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে এই সব গ্রন্থিতে M_4-LDH-এর পরিমাণ সবচেয়ে বেশী কমে যায়। সুতরাং বৃদ্ধকালে অক্সিজেনের অভাবে ঐ গ্রন্থিগুলি বেশী

ক্ষতিগ্রস্ত হয়। হয়তো Heart এবং Brain failure-এর মূলে উপরিউক্ত কারণটি অন্যতম।

এখন জানা গেছে, যে জিনটি M_4-LDH সংশ্লেষণে অংশ গ্রহণ করে, তা বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে অধিক পরিমাণে দমিত থাকে; অর্থাৎ যে জিনগুলি পাঁচটি বিভিন্ন LDH সম-অনুঘটক সংশ্লেষণে অংশগ্রহণ করে, সেই জিনগুলি বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে কতটা প্রকাশিত বা অপ্রকাশিত থাকে, তার উপর নির্ভর করবে বিভিন্ন কোষে অবস্থিত বিভিন্ন LDH-এর পরিমাণ এবং সক্রিয়তা।

LDH ছাড়া আরও কয়েকটি, যেমন—ম্যালেট ডিহাইড্রোজিনেজ (MDH), কোলিন এস্টারেজ (ChE), টাইরোসিন অ্যামিনো ট্র্যান্সফারেজ (TAT), আরজিনেজ প্রভৃতি জৈব-অনুঘটকগুলির ক্ষেত্রেও বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে ওগুলির সক্রিয়তা বিভিন্ন গ্রন্থিতে ভিন্ন হারে বাড়ে বা কমে। এসব অনুঘটকগুলি সম্পর্কে পরীক্ষা সবে সুরু হয়েছে।

জরা থেকে রেহাই পাবার পথ আজও অজানাই রয়ে গেছে। আধুনিক বিজ্ঞানের অগ্রগতি হয়তো এই পথের নিশানা দেবে। জরা হয়তো বা রোধ করা যাবে। কিন্তু জরা সমস্যার সমাধান মানুষকে আরও বহু সমস্যার জালে ঘিরে ফেলবে সন্দেহ নেই। ক্রমবর্ধমান লোকসংখ্যা পৃথিবীতে শান্তির চেয়ে অশান্তিই হয়তো ডেকে আনবে। এত সব অনিশ্চয়তা থাকা সত্ত্বেও মানুষ জরার কারণ জানতে এত ব্যস্ত হয়ে উঠেছে কেন? বৈজ্ঞানিকদের ধারণা—জরা রোধ হয়তো বা মানুষকে সুস্থ জীবনযাপনে সাহায্য করবে। প্রাণীকে মরতে দেওয়া হবে না—এমন ধারণা পোষণ করা নিশ্চয়ই উচিত হবে না।

সমুদ্রের অভিযান

শ্রীশচীনাথ মিত্র*

সমুদ্র-অভিযান নয়—সমুদ্রের অভিযানের যুগে আমরা বাস করছি; অর্থাৎ সমুদ্র বিজয়ী বীরের মত সদর্পে পৃথিবীর স্থান জয় করে এগিয়ে আসছে এবং সমুদ্রের আয়তনের হচ্ছে ক্রমপ্রসার। এই অভিযানের গতি অবশ্য খুবই ধীর, তবুও একজন মানুষের জীবনেই সমুদ্রের প্রসার ও স্ফীতি নজরে আসবার মত।

এই ঘটনা পৃথিবীর ইতিহাসে নূতন নয়। ভূ-ইতিহাসে দেখা যায়, উত্তর আমেরিকার বিশাল স্থলভূমি সমুদ্র বহুবার গ্রাস করেছে আবার ছেড়ে চলে গেছে বহু বার বিজিত সাম্রাজ্যে নিজস্ব ইতিহাস পলিপড়া প্রস্তরের গায়ে নিখুঁতভাবে লিখে রেখে। আমেরিকা ছাড়াও বহু অঞ্চলে সমুদ্রের এই স্থলভাগ বিজয়ের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে একাধিকবার।

বর্তমান সত্য পৃথিবী আবার এই সমুদ্রের আক্রমণের কবলে। সমুদ্রগুলি আজ অনেকক্ষেত্রেই তটসীমা ছেড়ে এগিয়ে আসছে দেশের মধ্যে। এখনই মহাদেশের উপকূলে অবস্থিত অগভীর সাগরগুলি ভর্তি হয়ে ছাপিয়ে উঠেছে। আজকের বেরেন্ট, বেরিং ও চীন সাগর এইভাবেই জলপূর্ণ হয়েছে। তাছাড়া এখানে-সেখানে দেশের মধ্যস্থিত

* প্ল্যানিং কমিশন, নতুন দিল্লী

সাগর যথা—হডসন উপসাগর, সেণ্ট লরেন্স, বাল্টিক ও সুন্দা সাগরেও সমুদ্রের লোনা জল এগিয়ে এসেছে এবং আটলাণ্টিকের উপকূলের বহু নদীর মোহানা অঞ্চল আজ গভীর সমুদ্রের নীচে। বর্তমান হডসন নদী ও সাস্কুইহানা নদীর মোহানা অঞ্চল কয়েক শ' বছর আগেও বর্তমান সমুদ্রের মধ্যে বহু দূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। অতীতকালের অনেক খাল ও তটভূমি আছে কেসাপিক ও দেলাওর উপসাগরের তরঙ্গ-উচ্ছ্বাসের নীচে সমাধিস্থ। কোথায় এবং কখন এই তরঙ্গ-উচ্ছ্বাস শান্ত হবে বলা কঠিন।

গত তুষার-যুগের বরফ মানব-সভ্যতার সুরু থেকেই গলতে সুরু করেছিল, এখনও গলছে এবং আরও বহু কাল ধরে গলবে। হিমালয়ের হিমবাহ-গলা জলে শত শত নদীর পুষ্টি, সে নদীর জলে সমুদ্রের পুষ্টি আর পুষ্টির তুলনায় বাষ্পীভবনের পরিমাণ কম হওয়ায় সমুদ্রের ক্ষতি বহু গুণ কম। বাষ্পের জল আবার জমে সমুদ্রের বুকে—নদীনালা বেয়ে পৃথিবী-ধোয়া জল আবার তারই কাছে ফিরে আসে। হিমালয়, আল্পস, আন্দিজে এই ঘটনা ঘটছে, ঘটছে পৃথিবীর হাজার হাজার হিম-শৈল থেকে। উত্তরে গ্রীনল্যাণ্ডের তুষার গলছে, সাইবেরিয়ার বরফ গলছে, ক্যানাডায় থ (Thaw) হচ্ছে। মোট ফল, সমুদ্রের হচ্ছে স্ফীতি। তার পরিধির মধ্যে জল-সঙ্কুলান হচ্ছে না। আজ যদিও কোনও রকমে এঁটে যায় আগামীকাল আর আঁটবে না। পৃথিবীর আবহাওয়া গত প্লেইস্টোসিন তুষার যুগের শীতলতা থেকে শেষ প্রহরে উষ্ণ থেকে উষ্ণতর হতে চলেছে। বরফ তাই গলছে। যত গলছে, তত জমছে না। তাই জল বেড়েই চলেছে।

পারমাণবিক বিস্ফোরণে আবহাওয়া আরও পরিবর্তিত হয়ে উষ্ণ হয়ে উঠছে। রাশিয়া আজ বরফ গলিয়ে জমি তৈরি করছে। সাইবেরিয়ার জমাট-বাঁধা তুষার তাদের বিজ্ঞানের কুঠারের আঘাতে ছিন্নমূল হয়ে নেমে পড়েছে সাগরে সাগরে। প্রশান্ত মহাসাগর, বাল্টিক, আর্কটিকে হিমবাহ গলে উপকূল ছাপিয়ে জল এগিয়ে আসছে অন্য দেশের উপর। রুশ বিজ্ঞানীদের প্রচেষ্টার ফলে সেখানকার মেরু-তুষার অন্য দেশের উপকূলে গিয়ে আশ্রয় নিচ্ছে।

এমন ঘটনা যে পৃথিবীতে বহু বার ঘটেছে, তা আগেই বলা হয়েছে। এই ঘটনা আবার ঘটছে, তাই আমাদের সভ্যতার আশঙ্কা। আশঙ্কা বিশেষতঃ উপকূলবর্তী দ্বীপবাসীদের, যারা নীল জলের তাড়া খেয়ে পাহাড়ে চড়তে জায়গা পাবে না। নীল মৃত্যু 'সুনামি' (Tsunamis) এক বিধ্বংসী তরঙ্গ-প্লাবন—যা কয়েক ঘণ্টায় 80-100 ফুট উঁচু হয়ে দেশে প্রবেশ করে ধ্বংস ও হাহাকারের চূড়ান্ত ইতিহাস সৃষ্টি করে রেখে যায়। সেই সুনামির দেশ—জাপানের তাই ভয়। সুমাত্রা, বোর্নিও ও অন্যান্য পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জেরও এই ভয়।

বর্তমান পৃথিবীর তাপমাত্রা আরও কিছু বৃদ্ধি পেলেই যা তুষার গলবে, তাতে প্রশান্ত মহাসাগরের জল 100 ফুট উঁচু হবার সম্ভাবনা যথেষ্ট প্রবল। সেই তাপমাত্রায় বর্তমান আটলাণ্টিকের তীরের সমস্ত বাণিজ্য কেন্দ্র, নগর, শহর সব কিছু সমুদ্রের নীচে বিলীন হয়ে যাবে। সে সমুদ্রের জল এসে আপালেসিয়ান পর্বতমালার পায়ে আছাড় খেয়ে পড়বে—আছাড়-খাওয়া জলের ফেনায় আপালেসিয়ানের চারদিক সাদা হয়ে যাবে, আর মেক্সিকো উপসাগর ও মিসিসিপি নদীর পার্শ্ববর্তী নীচু অঞ্চল জলের নীচে প্রহর গুণবে।

বরফ যদি আরও বেশী গলে?—তারও সম্ভাবনা আছে—তা হলে? সমুদ্রের জল উঁচু হবে 600 ফুট কি আরও অনেক বেশী—আমেরিকা মহাদেশের পূর্ব উপকূল মানব-সভ্যতার ইট-কাঠ-ঐতিহ্য নিয়ে অগাধ জলের নীচে নেমে যাবে ফসিল হয়ে থাকবার জন্যে। উত্তুঙ্গ আপালেসিয়ান অসীম সমুদ্রের মাঝে পর্বতসঙ্কুল দ্বীপপুঞ্জে পরিণত হবে।

আর্কটিক সমুদ্র ও হডসনের জল এসে ক্যানাডাকে আবৃত করবে। আর মধ্য-ইউরোপ, আরব, পারস্য, ভারত, চীন ও সোভিয়েটের বিরাট অঞ্চল জুড়ে আর্কটিক, আটলাণ্টিক, ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগরের সংঘাত চলবে—আর সে সংঘাতে সৃষ্ট ঢেউ সাদা ফেনা হয়ে ছিটিয়ে পড়বে আল্‌স্‌ ও হিমালয়ের বিস্তৃত পর্বতের গায়ে।

আমাদের চিরপরিচিত পৃথিবীর এই রূপ আমাদের কাছে অচিন্তনীয়—জ্ঞানের বাইরে। পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা যাবে এমন ঘটনা বহু বার ঘটেছে, তার পরে ওলট-পালট হয়ে গেছে পৃথিবীর রূপ, স্থল-ভাগের পরিধি ও বিস্তার। এই পরিবর্তন এখনও চলছে।

আটলাণ্টিকের তলদেশ ফুঁড়ে গজিয়ে উঠেছে বারমুডা দ্বীপ, উঠেছিল চিরকম্প এসসেনসন দ্বীপ। 1830 সালে এক অগ্ন্যুৎপাতের সঙ্গে সিসিলি ও আফ্রিকার মাঝখানে ভূমধ্য-সাগরে এক দ্বীপ হঠাৎ জেগে ওঠে সমুদ্র-পৃষ্ঠ থেকে দু-শ' ফুট উঁচু মাথা তুলে। তার পরে কয়েক বছরে সে দ্বীপটি অগাধ জলের নীচে নেমে গেছে।

অষ্ট্রেলিয়া থেকে দু-হাজার মাইল পূর্বে প্রশান্ত মহাসাগরে চিরপরিচিত ফালকান দ্বীপ 1913 সালে হঠাৎ ডুবে হারিয়ে যায় অতল সমুদ্রের তলায়। 1949 সালে কয়েক দিনের জন্যে পৃথিবী-পৃষ্ঠে দেখা দিয়ে আবার লুকিয়ে পড়ে জলের নীচে।

1883 সালের 27শে অগাষ্ট সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে 1400 ফুট উঁচুতে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে-থাকা ক্রাকাতোয়া কয়দিনের অগ্ন্যুৎপাতে ফেটে চৌচির হয়ে সমুদ্রের কয়েক হাজার ফুট গভীরে নেমে যায়। সে দিনটি ছিল মানুষের ইতিহাসে একটি বিস্ময়কর আতঙ্কের দিন। আতঙ্ক ছিল বিস্ময়কর ক্রাকোতোয়ার জলে ফেটে চৌচির হয়ে লুপ্ত হয়ে যাবার কাহিনীর মধ্যে। আতঙ্ক জেগেছিল যখন ক্রাকোতোয়ার দ্বারা আক্রান্ত সমুদ্রজল তপ্ত হয়ে শত ফুট উঁচু ঢেউয়ের মত ফণা তুলে সুন্দা দ্বীপপুঞ্জের শত শত গ্রামের উপর দিয়ে ছুটে গিয়েছিল ধ্বংসের প্লাবন ডেকে। কয়েক লক্ষ মানুষের প্রাণহানি ঘটিয়েছিল এক-দিনে এই সুনামি—জাপানী অর্থ যার নীল মৃত্যু।

আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ফলে সৃষ্ট তরঙ্গ ছাড়াও বরফগলা জলের তরঙ্গ পৃথিবীকে আক্রমণ করে কবলিত করেছে। সবচেয়ে বড় প্লাবন ঘটেছিল 10 কোটি বছর আগে ক্রিটেশাস যুগে। তখন সমুদ্রজল উত্তর আমেরিকাকে গ্রাস করেছিল উত্তর, দক্ষিণ এবং পূর্ব দিক থেকে এবং ঐ অঞ্চল জুড়ে এক আন্তর্দেশীয় সমুদ্র ছিল, যা চওড়ায় 1000 মাইল আর আর্কটিক থেকে মেক্সিকো উপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। তার পর ক্রমে পূর্ব দিকের মেক্সিকো উপসাগর থেকে নিউ জারসি পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়লো এই সমুদ্র। জল বাড়তে বাড়তে বর্তমান উত্তর আমেরিকার অর্ধেকের বেশীই এই সমুদ্রের অধিকারে চলে গেল।

এই সময়ে পৃথিবীব্যাপী প্লাবন ঘটে এবং বর্তমান বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জ জলের নীচে লোপ পায়। শুধুমাত্র কয়েকটি উত্তুঙ্গ পর্বতশিখর ছাড়া দক্ষিণ ইউরোপের কোনও স্থলভাগ সে সময়ে জলের উপরে দেখা যেত না। এই সমুদ্র আফ্রিকায় প্রবেশ করে বালুকণার পলিমাটি ফেলে। এই বালুকণা বিধৃত অঞ্চলেই পরে সৃষ্টি হয় ঊষর মরু প্রান্তর সাহারার। সুইডেন, রাশিয়া, সাইবেরিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চল, ভারতের কিছু অংশ, জাপান ও অষ্ট্রেলিয়া এই সমুদ্রের কবলে পড়ে যায়। আর এই সময়ে দক্ষিণ আমেরিকার সুউচ্চ আন্দিজ পর্বত তখন সবেমাত্র জন্মলাভ করে সমুদ্রের গভীর অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসবার সুযোগের অপেক্ষায় ছিল।

ঠিক এই রকমের বিস্তৃত প্লাবন ঘটেছিল আরও আগে ডেভোনিয়ান, সিলুরিয়ান ও অর্ডো-

ডিনিয়ান (40 কোটি বছর আগেকার) যুগে। বিভিন্ন যুগে বিচিত্র জল ও স্থল বিন্যাসের মাঝে হয়েছিল এই জলপ্লাবন। সেই সকল প্লাবনের ধারণা পূর্বোল্লিখিত ক্রিটেশাস যুগের প্লাবনের ধারণা থেকে পাওয়া যাবে।

হিমালয়ের 20,000 ফুট উচ্চতায় সামুদ্রিক চুনাপাথর এবং জীবাশ্ম এক অতীত সমুদ্রের স্বাক্ষরিত ইতিহাস বহন করে। এই সমুদ্রের জল ছিল উষ্ণ এবং পরিষ্কার। দক্ষিণ ইউরোপ এবং উত্তর আফ্রিকা থেকে সুরু করে দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়া পর্যন্ত ছিল এই সমুদ্রের বিস্তার। 5 কোটি বছরের স্বাক্ষরিত ইতিহাস বহন করে নুমুলাইট—যার দেহাস্থিতে গঠিত পাথর হিমালয়ে কয়েক হাজার ফুট উচ্চতায় দেখা যায়। মিশরীয়েরা এই পাথর কেটে স্ফিংক্স তৈরি করেছিল, পিরামিডের ইমারত তুলেছিল।

ইংল্যাণ্ডের ডোভার থেকে সুরু করে ডেনমার্ক, জার্মেনী হয়ে রাশিয়া পর্যন্ত সমুদ্রজাত চুনাপাথর বিস্তৃত। এই চুনাপাথর পূর্বোল্লিখিত ক্রিটেশাস যুগের প্লাবনের সময় পলি পড়ে সৃষ্ট হয়েছিল।

আচমকা ঝাঁপ দিয়ে পড়া নির্ঝর নায়াগ্রার সৃষ্টি হয়েছিল সেই সিলুরিয়ান যুগে (অর্থাৎ প্রায় 33 কোটি বছর আগে)। উত্তর থেকে আর্কটিক সাগর চুপিসারে দক্ষিণের দেশ দেখবার জন্যে চলে এসেছিল ঐ সময়ে। তার তীর ছিল নীচু আর জল ছিল স্ফটিক স্বচ্ছ, ফলে খুব কম কাদামাটিই দেশের মধ্যে বহন করে নিয়ে যেতে পেরেছিল। শুধু ক্যালসিয়াম ও ম্যাগ্-নেসিয়াম কার্বনেটে গঠিত ডলোমাইট পাথর সৃষ্টি হলো এর জলের নুন জমে এবং বর্তমান ক্যানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রের ধার দিয়ে খাড়াই সৃষ্টি করলো। তার পরে কেটে গেছে লক্ষ লক্ষ বছর। দক্ষিণ দেশ দেখে আর্কটিক আবার উত্তরে ফিরে গেছে। এই খাড়াইয়ের উপর দিয়ে বরফগলা জল ঝাঁপ দিয়ে পড়তে সুরু করলো সুদীর্ঘকাল ধরে। কঠিন ডলোমাইটের নীচে নরম প্রস্তরীভূত কাদামাটি ক্ষয়ে ক্ষয়ে সুড়ঙ্গপথ সৃষ্টি করে এগিয়ে চললো ভূ-অভ্যন্তরে, উপরে ডলোমাইটের এক আবরণস্তর রেখে। তার পরে এক সময়ে ধ্বসে পড়লো উপরের ডলোমাইটের ছাদ নীচের গহ্বরে। তার ফলে বরফগলা জলের স্রোতপথে এক গভীর খাদের সৃষ্টি হলো। গড়িয়ে চলা নদী এই খাদে ঝাঁপ দিয়ে দিয়ে এগিয়ে চললো। পৃথিবীতে এক বিস্ময় সৃষ্টি করলো এই সুউচ্চ নায়াগ্রা জলপ্রপাত।

সমুদ্র-উচ্ছ্বাসের সময় সমুদ্র-স্রোতও পরিবর্তিত হয় এবং এমনও প্রমাণ আছে যে, নিরক্ষীয় অঞ্চলের তাপ এই সমুদ্র-স্রোতই উত্তরে বয়ে নিয়ে গিয়ে আবহাওয়া উষ্ণ করে তুলেছিল, বরফ গলিয়ে মাটি বের করে-ছিল। ক্রিটেশাস যুগে দারুচিনি, লরেলগুল্ম, ডুমুর ইত্যাদি গাছ প্রচুর পরিমাণে গ্রীনল্যাণ্ডে জন্মায়, তা থেকে গ্রীনল্যাণ্ডের অতীত উষ্ণ আবহাওয়া সম্বন্ধে ধারণা করা যায়।

ভূতত্ত্ববিদ্দের মতে পৃথিবীর ইতিহাসের প্রধান অধ্যায়গুলি তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত। প্রথম পর্যায়ে দেখা যায় মহাদেশগুলি উঁচু, দেশের ক্ষয় বেশী এবং সমুদ্রগুলি নিজেদের নীচু স্থানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। দ্বিতীয় পর্যায়ে দেখা যায় মহাদেশগুলি সবচেয়ে নীচু এবং সমুদ্র তটভূমির সীমারেখা অতিক্রম করে তাদের গ্রাস করছে। তৃতীয় পর্যায়ে পৃথিবীর স্থলভাগ সমুদ্রের অধীনতা থেকে বেরিয়ে এসে মাথা উঁচু করে তোলে।

পৃথিবীর সমুদ্রের এই সীমালঙ্ঘন ও স্থলজয়ের ইতিহাস খুঁজে দেশে দেশে ঘুরে বেড়িয়ে বিখ্যাত ভূ-বিজ্ঞানী সুকার্ট একদিন এই বিংশ শতাব্দীর পৃথিবীর মানুষকে জানালেন—আমরা এখন নূতন পর্যায়ের সুরুতে বাস করছি। পৃথিবীর দেশগুলি এখন অতীতের চেয়ে অনেক বেশী উঁচু এবং

সর্বাপেক্ষা মনোরম। কিন্তু নূতন পর্যায়ের সমুদ্র-গ্রাস ইতিমধ্যেই সুরু হয়ে গেছে, বিশেষতঃ উত্তর আমেরিকায়।

নীল সমুদ্রের সফেন তরঙ্গ ছুটে আসছে প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলে। পৃথিবীর সমুদ্র আজ বুঝি ফুলে ফুঁসে উঠছে একটু একটু করে বছরের পর বছর। এই তরঙ্গ যখন আরও উঁচু হবে? পৃথিবীর পুরনো ইতিহাসের পাতা আবার উল্টে এগিয়ে আসবে—পুনরাবৃত্তি ঘটবে ঘটনার? সভ্য মানুষ কোন্ অস্ত্রবলে সেই তরঙ্গ রুখবে?

ভারতের মন্দির-নগরী

শ্রীঅবনীকুমার দে*

ভারতের মন্দির-নগরী সম্বন্ধে পূর্বে এক প্রবন্ধে (জ্ঞান ও বিজ্ঞান—জুন, 1971) বলা হয়েছিল যে, দক্ষিণ ভারতের এক শ্রেণীর মন্দির-নগরীর ক্ষেত্রে মন্দিরের চারদিকে ক্রমে ক্রমে নগরীকে সম্প্রসারিত করা হতো। এই প্রকারের মন্দির-নগরীর উদাহরণ হলো—শ্রীরঙ্গম ও মাদুরা।

শ্রীরঙ্গম

ত্রিচিনাপল্লী জংশন স্টেশন থেকে পাঁচ-ছয় মাইল উত্তরে কাবেরী নদীর ব-দ্বীপের অগ্রভাগে শ্রীরঙ্গম দ্বীপ অবস্থিত। কাছেই কাবেরী নদী ও উঁচু উঁচু নারিকেল গাছের সারি থাকায় এই জায়গাটির দৃশ্য খুবই মনোরম। এখানের শ্রীরঙ্গনাথজীর মন্দির ভারতের মধ্যে সবচেয়ে বড় ও বিত্তশালী মন্দির। শৈবদের কাছে যে রকম চিদাম্বরমের মন্দির পবিত্র, বৈষ্ণবদের কাছে শ্রীরঙ্গমের মন্দিরও সেই রকম পবিত্র।

খৃষ্টীয় ষষ্ঠ বা সপ্তম শতাব্দীতে এই নগরীর প্রথম পত্তন হয়েছিল। কয়েক শতাব্দী ধরে এই রাজ্যের উত্থান-পতন হওয়া সত্ত্বেও এই নগরীর নন্দ্যাবর্ত পদ্ধতিতে প্রথম পরিকল্পিত ও নির্মিত নগর-বিন্যাস আজও সুরক্ষিত আছে।

155 একর জমির উপর নগরীটি নির্মিত। সর্বপ্রথম শুধু মন্দিরের পত্তন করা হয়েছিল। পরে মন্দিরের চত্বরগুলি যোগ করা হয়। মন্দিরকে ঘিরে মোট সাতটি চত্বর আছে। প্রথম চারটি চত্বর দেবতাদের জন্য নির্দিষ্ট ও পরের তিনটিতে মন্দিরের কাজে নিযুক্ত লোকেদের বাসস্থান আছে। সবচেয়ে বাইরের চত্বর এক হাজার গজ দীর্ঘ ও আট শত গজ প্রশস্ত। বাইরের চত্বরগুলি কালক্রমে দোকান ও বাজারে পরিণত হয়েছে। পূজার্থী ও স্থানীয় বাসিন্দাদের গৃহগুলিও এইখানে অবস্থিত। চতুর্থ চত্বরটি 412 গজ দীর্ঘ ও 283 গজ প্রশস্ত। এই চত্বরে এক হাজার স্তম্ভবিশিষ্ট একটি বৃহৎ মণ্ডপ আছে। এখান থেকে ভিতরের দিকে প্রধান মন্দির সুরু হয়েছে। এই চত্বরের প্রবেশ দ্বারগুলির উপর তিনটি গোপুরম আছে। এদের মধ্যে পূর্বদিকের গোপুরম সবচেয়ে বড় ও সুন্দর। কোনও কোনও গোপুরমের উচ্চতা 150 থেকে 160 ফুট। ভিতরের চত্বরে প্রধান দেবতা শ্রীরঙ্গনাথজী ও তাঁর অর্ধাঙ্গিনীর মন্দির ও অন্যান্য সহগামী দেবতাদের মন্দির আছে। এই পবিত্র মন্দিরের উপরের বিমান স্বর্ণ-নির্মিত। মূল বিগ্রহের মূর্তিতে শ্রীভগবান পঞ্চফণাবিশিষ্ট শেষনাগের উপর বিশ্রাম করছেন। এই মন্দিরের রত্ন-সংগ্রহ অদ্বিতীয়।

* নগর ও আঞ্চলিক পরিকল্পনা বিভাগ, বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, শিবপুর।

প্যাট্রিক গেড্ডিস শ্রীরঙ্গম নগরীর ক্রমোন্নয়ন ও সম্প্রসারণের যে বিবরণ লিখে গেছেন, তাথেকে জানা যায় যে, অতি প্রাচীনকালে এই দ্বীপের ও এর গ্রামগুলির মাঝে একটি স্থানীয় দেবস্থান ছিল। ক্রমে এই দেবস্থানে একটি মন্দির তৈরি হলো এবং এর চত্বরে সশিষ্য সাধুরা বাস করতে লাগলেন। ক্রমে এই চত্বরের বাইরে আরও বাড়ী, শস্যাগার ইত্যাদি তৈরি হলো। সমস্ত জায়গাটিকে আরও বড় একটি প্রাচীর (কেন্দ্রস্থল অপেক্ষাকৃত বড় ও সুপ্রশস্ত নতুন নতুন গৃহ তৈরি হলো। আরও নতুন নতুন মন্দিরও তৈরি হলো। অনেক কাল পরে এর উত্তর পূর্ব দিকে এক হাজার স্তম্ভবিশিষ্ট একটি মণ্ডপ তৈরি হলো। এই চত্বরের বাইরের দিকে একটি নতুন আয়তাকার প্রাচীর তৈরি করা হলো। প্রাচীরের মধ্যে তিনটি গোপুরম নির্মিত হলো। এইগুলির মধ্যে পূর্বদিকের গোপুরমটি সবচেয়ে বড়। এই প্রাচীরের বাইরে চারদিকে একটি নতুন রাস্তা তৈরি করা হলো।
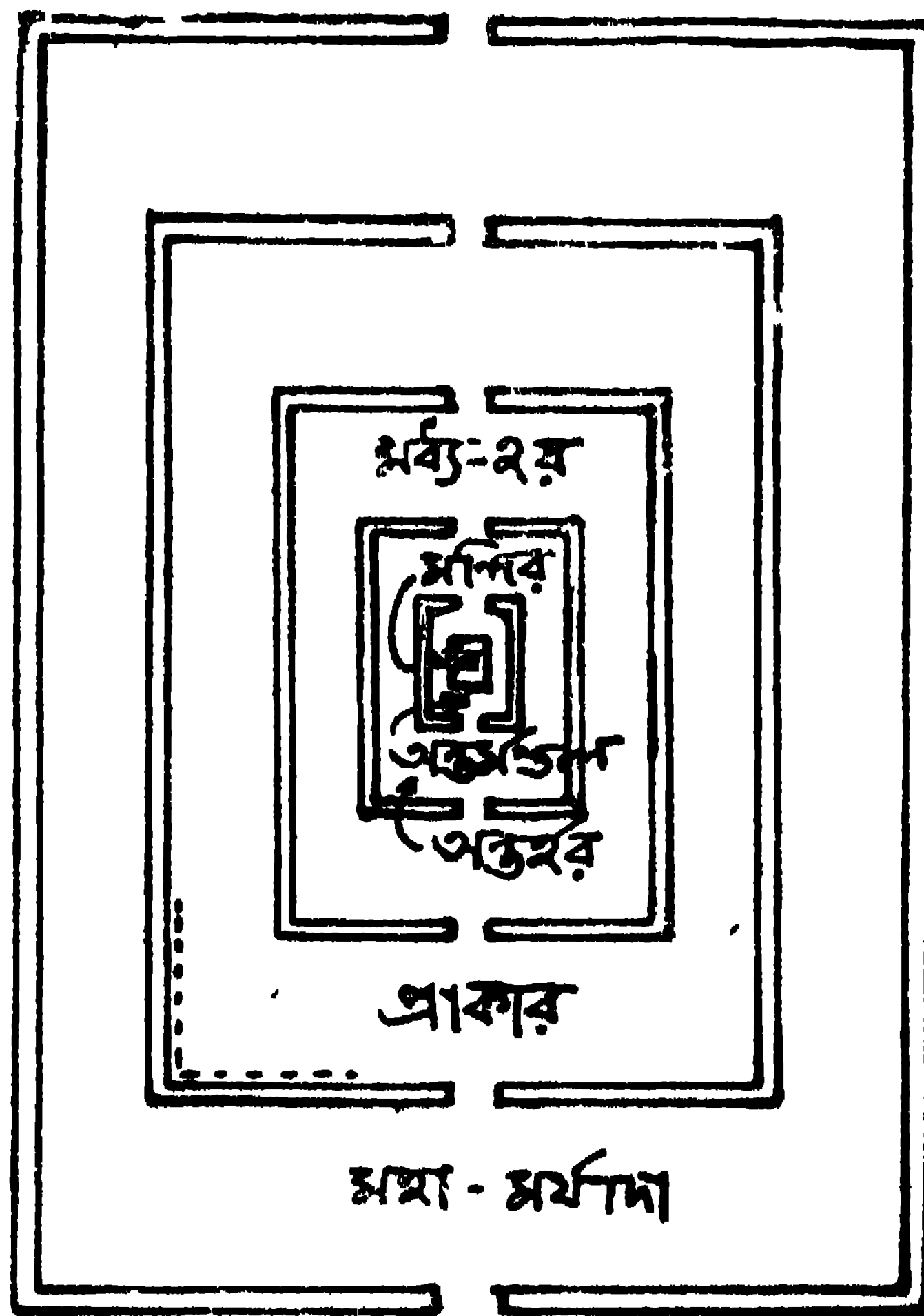
মন্দিরের চত্বর বিন্যাস

থেকে তৃতীয় প্রাচীর) দিয়ে ঘেরা হলো। এই প্রাচীরের মধ্যে দক্ষিণ দিকে প্রবেশদ্বার রাখা হলো। ক্রমশঃ এই ঘেরা জায়গার ভিতরে ও বাইরে আরও মন্দির, গৃহ, শস্যাগার ইত্যাদি তৈরি হতে লাগলো। প্রাচীরের বাইরের দিকে সম্ভবতঃ রথ টেনে নিয়ে যাবার জন্যে এই রাস্তাটি ব্যবহৃত হতো। এই রাস্তার অপর দিকে বাসগৃহ রাখা হলো। আয়তাকার জায়গা জুড়ে বিস্তৃত এই বাসগৃহগুলির বাইরের দিকে আর একটি প্রাচীর তৈরি করা হলো। এই প্রাচীরে উত্তর,

দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিম দিকে চারটি অপেক্ষাকৃত ছোট প্রবেশদ্বার রাখা হলো। ক্রমশঃ এই প্রাচীরের বাইরে নগরী আরও সম্প্রসারিত হলো। সম্প্রসারিত নতুন নগরের রাস্তাঘাটগুলি আগেকার রাস্তাঘাটগুলির সঙ্গে সমান্তরাল ও আনম্ভাবে বিন্যস্ত। রাস্তাঘাটের এই বিন্যাসের আকৃতি দাবার ছকের মত দেখতে। রথ টেনে নিয়ে যাবার জন্যে নতুন রাস্তা তৈরি হলো। এই রাস্তার দু-পাশে নতুন নতুন গৃহ নির্মিত হলো। নগরের সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে ধনী ও দরিদ্রদের বাসস্থান বিভিন্ন জায়গায় নির্দিষ্ট হলো এবং বিভিন্ন বর্ণের লোকেদের মধ্যে প্রভেদ আরও বেশী হয়ে উঠল। অপেক্ষাকৃত দরিদ্র শ্রেণীর ও নিম্ন বর্ণের লোকেদের বাসগৃহ ঐ প্রাচীরের বৃহৎ প্রবেশদ্বারগুলির বাইরের দিকে, বিশেষ করে দক্ষিণ ও পূর্ব দিকে রাখা হলো। দক্ষিণের বাজার এলাকায় দক্ষিণ দিকের প্রাচীরসংলগ্ন সরু রাস্তার ধারের উত্তরমুখী গৃহগুলি ভেঙে ফেললে আবার ক্ষতিপূরণ দিতে হতো ও ব্যবসা-বাণিজ্যেরও ক্ষতি হতো। সুতরাং এই গৃহগুলিকে রেখে দিয়ে পরিবর্তে পূর্ব ও পশ্চিম দিকের খোলা জায়গায় নতুন বাজারের রাস্তা তৈরি করা হলো। প্রত্যেক বাসগৃহের জমির পরিমাপ আরও বাড়ানো হলো। উত্তর দিকের নতুন রাস্তার দুই ধারে গৃহ নির্মিত হলো। এই নতুন স্থানটির চারদিকে আয়তাকার একটি প্রাচীর তৈরি করা হলো এবং আগেকার গোপুরমগুলির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিম দিকে চারটি বড় গোপুরম তৈরির কাজ শুরু করা হলো, কিন্তু এই সম্প্রসারণ কাজের নির্মাতা তিরুমুলুর অকালমৃত্যুতে এই গোপুরমগুলির নির্মাণকার্য অসমাপ্ত রয়ে গেল। পরে তাঁর উত্তরাধিকারীদের এই গোপুরমগুলির তৈরির কাজ শেষ করবার মত আগ্রহ ও অর্থ দুই-ই ছিল না।

শ্রীরঙ্গমের কাছে প্রায় এক মাইল পূর্ব দিকে জম্বুকেশ্বরের ভগবান শিবের অপেক্ষাকৃত ছোট মন্দির-নগরী একই রীতিতে নির্মিত। মন্দিরের তিনটি প্রাচীরের বাইরের দিকে রথ চলবার রাস্তা আছে। এই রাস্তাগুলির ধারে ধারে বিভিন্ন বর্ণের লোকদের বাসগৃহ আছে। এই সবগুলি ঘিরে আর একটি উঁচু প্রাচীর ও তাতে চারটি গোপুরম আছে। এই চতুর্থ প্রাচীরের চার দিকে আর একটি রাস্তা আছে।

মাদুরা

মাদ্রাজ শহরের 350 মাইল দক্ষিণে মাদুরা শহর অবস্থিত। তামিল ভাষায় এর নাম মাদুরাই বা উৎসব-নগরী। এখানকার মীণাক্ষী দেবীর মন্দিরকে কেন্দ্র করে সমকেন্দ্রীয় ভাবে নগরটি গড়ে উঠেছিল এবং ক্রমে ক্রমে সম্প্রসারিত হয়েছিল। সর্বতোভদ্র পদ্ধতি অনুযায়ী নগরের পরিকল্পনা করা হয়েছিল। এই মন্দিরের দ্বিতীয় চত্বরে মীণাক্ষীদেবীর মন্দির ও প্রথম চত্বরে তাঁর স্বামী সুন্দরের মন্দির আছে।

প্রথমে নগরের চারদিকে প্রশস্ত প্রাচীর ছিল। পরে এই প্রাচীর ভেঙে ফেলা হয়েছে। মন্দিরের বাইরের প্রাচীরের সঙ্গে সমান্তরাল ও সমকেন্দ্রীকভাবে মন্দিরকে বেষ্টন করে নগরের রাস্তাগুলি বিন্যস্ত ছিল। এই রকম তিনটি বেষ্টনকারী রাস্তার নিদর্শন এখনও পাওয়া যায়। এদের মধ্যে বাইরের দিকের রাস্তাটি জায়গায় জায়গায় ভগ্ন। এই রাস্তাগুলি অনেক জায়গায় পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত থাকায় রাস্তাগুলির মধ্যে মধ্যে যে সব সঙ্কীর্ণ স্থান হয়েছে, সেই সব জায়গায় গৃহাদি আছে। মন্দিরের চারদিকের প্রাচীরে নয়টি গোপুরম আছে। নগরে প্রবেশ করবার অনেক দূর থেকেই এই উঁচু গোপুরমগুলি দেখা যায়।

মাদুরার অপর একটি নাম কদম্ব বন। পুরাণে

বর্ণিত আছে যে, এই নগর প্রথম নির্মাণের আগে এখানকার রাজাদের রাজধানী ছিল কদম্ব বনের পূর্বদিকে একটি জায়গায়। এই বনের মধ্যে একটি পুষ্করিণী ও তার নিকটবর্তী ভগবান শিবের প্রাচীন মন্দিরের চারপাশের দৃশ্যে মুগ্ধ হয়ে তখনকার রাজা এইখানে নতুন নগর তৈরি করান। কদম্ব বন পরিষ্কার করিয়ে মন্দিরকে কেন্দ্রস্থলে রেখে চারদিকে পর পর যথাক্রমে পদ্মমণ্ডপ (এখানে বেদপাঠ করা হতো), অর্ধমণ্ডপ (এখানে ধর্মীয় উৎসবাদি অনুষ্ঠিত হতো) ও নৃত্যমণ্ডপ এবং মন্দিরের রন্ধনশালা ও অন্যান্য ছোটখাটো মন্দির তৈরি করা হলো। মন্দিরে প্রবেশ করবার জন্যে সুদৃশ্য গোপুরম তৈরি হলো। এরপর বাজারের রাস্তা, রথ চলবার রাস্তা ও বাসস্থান নির্মিত হলো। চওড়া রাস্তাগুলি থেকে মাঝে মাঝে ছোট ছোট রাস্তা তৈরি করা হলো। নগরের মধ্যে অনেক খোলা জায়গা ও জনসাধারণের সভাস্থল ছেড়ে রাখা হলো। নতুন নতুন পুষ্করিণী খনন করা হলো। ভাল ভাল পুষ্করিণী ও স্রোতস্বিনীকে সংরক্ষণ করা হলো। শাস্ত্রমতে এই দুর্গ-নগরীর চারপাশে প্রাচীর, পরিখা ইত্যাদি তৈরি করা হলো। নগরের উত্তর-পূর্ব দিকে রাজপ্রাসাদ তৈরি হলো। এক্ষেত্রে লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, এই নগর একটু একটু করে পরিকল্পিত ও নির্মিত হয় নি বরং নগরের ভবিষ্যৎ লোকসংখ্যা ও সেই অনুপাতে এর প্রয়োজনীয় আয়তন কত হবে, সে বিষয়েও চিন্তা করা হয়েছিল। নগরের মধ্যে জায়গায় জায়গায় যথেষ্ট খোলা জায়গা ছেড়ে রাখা হয়েছিল এবং নগরে যাতে ভবিষ্যতে ঘন বসতি না গড়ে ওঠে, সেই দিকেও লক্ষ্য রাখা হয়েছিল।

পুরাণে আরও লিখিত আছে যে, এই নগর বহুদিন সমৃদ্ধশালী ছিল। পরে সর্বনাশা বন্যায় সমস্ত নগর ধ্বংস হয়ে যায়। কেবলমাত্র প্রাচীন মন্দির ও তার চারপাশের অল্পস্থান রক্ষা পায়। ক্রমে এই জায়গার জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে তখনকার রাজা পুরনো নগরের সীমানার মধ্যেকার জায়গা আবার জরিপ করালেন এবং মন্দিরকে কেন্দ্রস্থলে রেখে আবার নতুন করে নগর নির্মাণ করালেন। সমস্ত সহরটি দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে ছিল নয় মাইল করে। পাণ্ড্যীয় রাজাদের রাজধানী মাদুরা ছিল সুরক্ষিত দুর্গ-নগরী। দুর্গের চারটি প্রধান প্রবেশদ্বার ছিল এবং এদের উপর ছিল উঁচু বুরুজ। শহরের দক্ষিণ দিকে ছিল প্রধান প্রবেশদ্বার এবং বাইরে যাবার জন্যে শহরের উত্তর দিকে একটি ছোট দ্বার ছিল। উত্তর দিকে প্রবাহিত বৈকাশী নদী ছিল শহরের প্রাকৃতিক সীমা। হঠাৎ আক্রমণের হাত থেকে এই নদী শহরকে রক্ষা করতো। যে রকম জমির অবস্থান ও পরিবেশ ছিল, সেই রকম ভাবেই শহর-প্রাচীর তৈরি করা হয়েছিল বলে মাদুরা দুর্গের চারদিকের প্রাচীররেখা ছিল আঁকাবাঁকা। এই প্রাচীর ছিল চওড়া, খুব উঁচু এবং অসমান ভাবে কাটা পাথর দিয়ে তৈরি। শহরের প্রবেশদ্বারগুলিকে যোগকরা প্রধান প্রধান রাস্তাগুলি এত চওড়া ছিল যে, এই সব রাস্তা দিয়ে কয়েকটি হাতী এক সঙ্গে পাশাপাশি চলতে পারতো। প্রধান প্রবেশদ্বারগুলির পাশের প্রাচীরের উপর নানা রকমের অস্ত্রশস্ত্র ও ক্ষেপণাস্ত্র লুকিয়ে রাখা হতো। প্রয়োজনের সময় আক্রমণকারী শত্রুর উপর এই সব অস্ত্রশস্ত্র নিক্ষেপ করা হতো। প্রধান প্রবেশদ্বারগুলিতে যবন সৈনিকেরা খোলা তরবারি হাতে পাহারায় নিযুক্ত থাকত।

দুর্গ-প্রাচীরের বাইরে ছিল গভীর পরিখা এবং পরিখার পর চারপাশে ছিল কাঁটাগাছের গভীর জঙ্গল। শহরের চারদিকে এই রকম ঘন বন থাকবার ফলে শত্রুর হাত থেকে শহরকে

রক্ষা করা খুবই সুবিধাজনক হতো। পরিখার মধ্যে নগরের ময়লা জল নিষ্কাশিত হতো।

শহরের বাইরে ছিল পল্লী-অঞ্চল। সেখানে ছায়াপ্রদ গাছ, সেচের জন্তে জলবাহী নালা এবং সবুজ কৃষিক্ষেত্র ছিল। যেখানে শহর শেষ হয়েছিল, সেখান থেকে সুরু হয়েছিল এই পল্লী-অঞ্চল। দরকার হলে ভবিষ্যতে এইখানে শহরতলী সম্প্রসারণ করা চলতো। এতে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সুবিধাও ছিল। কৃষকেরা গ্রামাঞ্চলের কৃষিক্ষেত্রে কৃষিকার্য করতো ও নিকটবর্তী শহরে তাঁদের কৃষিজাত দ্রব্যাদি বিক্রী করতো। এর ফলে তাঁরা কৃষিকার্যে অধিক শক্তি ও উত্তম নিয়োগ করতে পারতো। পরিখার ময়লা জল সেচের কাজে ব্যবহার করা হতো। এই ব্যবস্থার ফলে সেচের জলও সহজে পাওয়া যেত এবং পরিখার ময়লা জল এইভাবে ব্যবহৃত হবার ফলে শহরের স্বাস্থ্যকর পরিবেশের কোনও ক্ষতি হতো না।

দক্ষিণ দিকে শহরের প্রধান প্রবেশদ্বারের কাছে পরিখার উপর মজবুত সেতু ছিল। পূর্বদিকের প্রবেশদ্বার থেকে কিছু দূরে দুর্গ-প্রাচীরের বাইরে সাধু ও তপস্বীদের বাসের জন্তে প্রশস্ত তপোবন ছিল। পূর্ব দ্বারের অপর দিকে ছিল শহরের পশ্চিম দ্বার। পশ্চিম দিক থেকে ঠাণ্ডা বাতাস এই দ্বার দিয়ে শহরে প্রবেশ করতো। পশ্চিম দ্বারের কাছে প্রাচীরের নিকটে ছিল বারনারীদের বাসস্থান। তাদের শহরের অন্তান্ত অংশে যাতায়াত করতে দেওয়া হতো না। শহরের এই অংশে দুটি প্রশস্ত রাস্তার ধারে নৃত্যশিল্পী, সঙ্গীতজ্ঞ ও শিল্পীদের বাসস্থান ছিল।

এই শহর ছিল বৃত্তাকার। শহরের প্রশস্ত প্রধান প্রধান রাস্তাগুলির দুই পাশে ছিল উঁচু ইমারত। রাজপ্রাসাদের চারধারের রাস্তা ও অন্তান্ত রাস্তার ধারে জায়গায় জায়গায় আবর্জনা ফেলবার জন্তে ইঁটের তৈরী ও তার উপর চুনের প্লাষ্টার করা আধার থাকতো।

শহরে দুটি বাজার ছিল। একটিতে দিনের বেলায় বাজার বসতো। অপর বাজারটি রাত্রিবেলায় বসতো ও সারারাত্রি খোলা থাকতো। এই বাজার দুটি কাছাকাছি অবস্থিত হলেও দুটি পৃথক রাস্তার ধারে ছিল। এই বাজার দুটি ছাড়া অন্তান্ত রাস্তাতেও রাস্তার ধারে ছোটখাটো ব্যবসায়ী ও তাঁতীদের ছোট ছোট দোকান ছিল। বড় বাজারে রাস্তার দুই ধারেই দোকান ছিল। এগুলির মধ্যে পাল্কী, গরুর গাড়ী, রথ, সেগুলির চাকা ইত্যাদি তৈরি করবার কারখানাও ছিল। এসব ছাড়া পিতল ও তামার জিনিষ, হাতীর দাঁতের জিনিষ, কাজকর্মের যন্ত্রপাতিও তৈরি হতো। এই বাজারের কাছেই আলাদা আলাদা রাস্তায় স্বর্ণ-ব্যবসায়ী, স্বর্ণ-শিল্পী এবং মূল্যবান পাথরের ব্যবসায়ীদের কারখানা, খাদ্যশস্য, মরিচ, মশলা ইত্যাদির ব্যবসায়ীদের দোকানও ছিল। দোকানের সামনে খোলা জায়গায় এই সব খাদ্যদ্রব্য রৌদ্রে স্তুপীকৃত করে রাখা হতো। আলো-বাতাসহীন অন্ধকার ঘরে মজুদ থেকে এই সব জিনিষ যাতে খারাপ হয়ে না যায়, সে জন্তে এই রকম ব্যবস্থা ছিল।

ভান্জি

চেরা রাজাদের প্রাচীন রাজধানী ভান্জি ছিল একটি দুর্গ-নগরী। নগরটি মাদুরার মত একই প্রথায় বিন্যস্ত এবং নগরের পরিখা, প্রাচীর, প্রাসাদ, বাজার, রাস্তাঘাট ইত্যাদি সব কিছুই ছিল।

নগর পরিখার বাইরে ছিল বন, যেখানে নগর রক্ষার কাজে নিযুক্ত সৈনিকেরা বাস করতো। বনের গাছগুলিতে জনসাধারণের হাত দেওয়া নিষিদ্ধ ছিল। দুর্গ-প্রাচীরের বাইরে ছিল পরিখা। রাজপ্রাসাদ, অন্তান্ত ইমারত ও জনসাধারণের

বাসগৃহ থেকে পাইপ দিয়ে ময়লা জল প্রধান প্রবেশদ্বারের কাছে পরিখার মধ্যে নিষ্কাশিত হতো। পরিখায় মাছ ছাড়া হতো এবং পদ্মফুল ইত্যাদি জন্মানো হতো। ইট ও পাথর দিয়ে তৈরী দুর্গ-প্রাচীর ছিল মজবুত, চওড়া ও উঁচু। প্রাচীরের উপর আক্রমণকারী শত্রুর উপর নিক্ষেপ করবার জন্যে আক্রমণ ও আত্মরক্ষা করবার অস্ত্র-শস্ত্রাদি, যথা—তীর ও প্রস্তর নিক্ষেপের অস্ত্রশস্ত্র, ক্ষেপণাস্ত্র, গরম তেল, গলিত তামা ও লোহা ইত্যাদি রাখা থাকতো। প্রাচীরের কাছে সৈনিকদের ও প্রবেশদ্বারগুলির কাছে দ্বার-রক্ষীদের বাসস্থান ছিল। তার পরে ছিল সমান্তরালভাবে বিন্যস্ত নগরের সব রাস্তা। এখানে বিভিন্ন পেশার লোকেরা বাস করতো। এই স্থান ও নগরের মধ্যবর্তী অঞ্চলের মধ্যে ছিল প্রধান বাজার। বাজারের অপর দিকে নটি, তাঁতী, স্বর্ণব্যবসায়ী ও মূল্যবান প্রস্তরের ব্যবসায়ীদের বাসস্থান ছিল।

প্রাসাদের চারদিকের চারটি রাস্তার ধারে ব্রাহ্মণ, মন্ত্রী, সৈন্যাধ্যক্ষ ও প্রাসাদ-কর্মচারীরা বাস করতেন। প্রাসাদের পিছন দিকে হস্তী ও অশ্বদের শিক্ষাদানকারীদের বাসস্থান ছিল। এখানে প্রশস্ত রাস্তার ধারে যথেষ্ট খোলা জায়গা ছিল। এখানে হস্তী ও অশ্বদের শিক্ষা দেওয়া হতো। প্রাসাদ, হস্তী ও অশ্বপালকদের বাসস্থানের মধ্যে ছিল রাজপরিবারের ব্যবহারের জন্যে পুষ্করিণী। প্রাসাদের চারদিকে ফুল ও ফলের বাগান, পুষ্করিণী, জনসাধারণের জন্যে হলঘর ও বিশ্রামাগার ইত্যাদি বিন্যস্ত ছিল।

নগরের প্রধান প্রবেশদ্বারগামী রাজপথ ছিল সোজা ও প্রশস্ত। জনসাধারণের জন্যে নির্দিষ্ট বাসস্থানগুলিতে জায়গায় জায়গায় ফলের গাছের নীচে ছিল বেদী। এখানে সাধারণ লোকেরা বসে গল্প করতেন। সাধারণের জন্যে নির্দিষ্ট বাসস্থানের অঞ্চলগুলিতে জায়গায় জায়গায় ত্রিকোণাকার ও আয়তাকার খোলা জায়গা ছেড়ে রাখা ছিল।

উত্তর ভারতের মন্দির-নগরী

উত্তর ভারতের মন্দিরগুলির মধ্যে ভুবনেশ্বর, খাজুরাহো, গোয়ালিয়র, বৃন্দাবন, রাজপুতনা, গুজরাট ও পশ্চিম ভারতের মন্দিরগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ভুবনেশ্বর

পূর্ব ভারতের উড়িষ্যার ভুবনেশ্বর ভগবান শিবের একটি মন্দির-নগরী। প্রধানতঃ এটি হিন্দুদেরই মন্দির-নগরী। কলকাতার 272 মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে মাদ্রাজ যাবার প্রধান রেলপথের উপর ভুবনেশ্বর রেল স্টেশন অবস্থিত। কালক্রমে প্রাচীন নগরীর বহু পরিবর্তন হয়েছে। এখন ভুবনেশ্বরে উড়িষ্যার নতুন রাজধানী স্থাপিত হয়েছে।

পুরাতন ভুবনেশ্বরে কলিঙ্গ স্থাপত্যের ভাস্কর্যের বহু নিদর্শন আছে। ভারতের অন্যান্য স্থানের মত এখানেও স্থাপত্য ও কলাশিল্প, ধর্মের সঙ্গে নিবিড়ভাবে মিশে আছে।

ভুবনেশ্বরের বৃহৎ লিঙ্গরাজ মন্দির ও তার নিকটবর্তী মন্দিরগুলি সবই ভগবান মহাদেবের পূজার জন্যে তৈরি হয়েছিল। কেশরী বংশের এক রাজা এগুলি তৈরি করিয়েছিলেন। 1872 সালে হাণ্টার গণনা করে দেখেছিলেন যে, ভুবনেশ্বর ও তার আশেপাশে মোট প্রায় চার হাজার ছোট-বড় মন্দির ছিল। এখন কিন্তু নগরে প্রায় একশতটি মাত্র মন্দির আছে। এখনকার মন্দিরগুলির মধ্যে নবম শতাব্দীর নির্মিত মুক্তেশ্বর মন্দির সবচেয়ে সুন্দর।

এই প্রাচীন মন্দির নগরীটি মোটামুটি দুটি প্রধান রাস্তার ধারে লম্বালম্বিভাবে (Linear type) বিন্যস্ত। উত্তর থেকে দক্ষিণ পশ্চিমগামী একটি প্রধান রাস্তার আশেপাশে প্রধান প্রধান মন্দিরগুলি অবস্থিত। দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে একত্রে অনেকগুলি মন্দির অবস্থিত আছে। এই অঞ্চলের

আগেই এই প্রধান রাস্তাটি থেকে আর একটি রাস্তা পূব দিকে চলে গেছে। এর কিছু দূরে পরশুরামেশ্বর মন্দির, কেদার-গৌরী ও মুক্তেশ্বর মন্দির নিয়ে কয়েকটি মন্দির অবস্থিত। পূব দিকে আরও কিছু দূরে রাজরাণী মন্দির অবস্থিত। উত্তর-দক্ষিণগামী প্রধান রাস্তাটি সুবিশাল বিন্দু সরোবরের পূব দিক দিয়ে 180 ফুট উঁচু লিঙ্গরাজ মন্দিরের সামনে দিয়ে চলে গেছে। প্রাচীন কালে এখানে এই রাস্তার পূর্ব দিকের অঞ্চলে মন্দিরের কাছাকাছি প্রধানতঃ পুরোহিতদের বাসস্থান ছিল। মন্দিরসংলগ্ন বিন্দু সরোবর এই মন্দির-নগরীর প্রাণকেন্দ্রস্বরূপ ছিল। লিঙ্গরাজ ও পাশাপাশি অন্যান্য ধর্মীয় কাজের জন্যে এবং নিকটবর্তী স্থানের স্থায়ী বাসিন্দাদের দৈনিক প্রয়োজনের জন্যে এই সুবৃহৎ বিন্দু সরোবরের জল অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ছিল। লিঙ্গরাজ মন্দির ও বিন্দু সরোবরের পশ্চিম দিকে বেতাল দেউল ও প্রাচীন শিশুপাল গড়ের সুরক্ষিত ধ্বংসাবশেষ আছে। এই অঞ্চলে মাঝে মাঝে সাধারণের বাসস্থানও আছে।

খাজুরাহো

মধ্যভারতের ছত্তরপুর জেলার হরপালপুর স্টেশন থেকে 61 মাইল দূরে খাজুরাহো অবস্থিত। এটি ছিল চাণ্ডেলা রাজাদের রাজধানী। এখানকার প্রায় আট বর্গমাইলব্যাপী ধ্বংসস্তূপ দেখে মনে হয় যে, এক সময় এটি একটি বড় শহর ছিল। এখন কিন্তু নিনোরা-তাল বা খাজুরাহো সাগর নামে একটি হ্রদের দক্ষিণ পূর্ব কোণে অবস্থিত খাজুরাহো একটি ছোট গ্রাম মাত্র।

নবম থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত রাজপুত উপজাতির চাণ্ডেলারা বুন্দেলখণ্ডে রাজত্ব করেছিলেন। রাজা যশোবর্মণের সময় এঁরা খুব শক্তিশালী হয়েছিলেন। যদিও এই দুর্গ-নগরী অত্যন্ত সুরক্ষিত ও দুর্ভেদ্য ছিল, তবুও 1022 খৃষ্টাব্দে গজনীর মামুদের আক্রমণে এর পতন ঘটে। এরপর থেকেই খাজুরাহোর প্রাধান্য কমে যায়।

1335 খৃষ্টাব্দে পর্যটক ইবন-ই-বটুটা এই স্থানে আসেন। তাঁর লেখা থেকে জানা যায় যে, তখন এখানে প্রায় এক মাইল লম্বা একটি হ্রদ ছিল। এর ধারে অনেকগুলি মন্দির ছিল। এই মন্দির-গুলিতে বিগ্রহ স্থাপিত ছিল। হ্রদের মধ্যস্থলে তিনটি গম্বুজ ও প্রত্যেক কোণে একটি করে গম্বুজাকৃতি সৌধ ছিল। তাঁর লেখা থেকে সমসাময়িক শহরের আর কোনও বিবরণ পাওয়া যায় না।

এই প্রাচীন নগরটি প্রধানতঃ উত্তর-দক্ষিণে প্রসারিত ছিল। অন্যান্য মন্দির-নগরীর মত এরও একই রকমের বৈশিষ্ট্য ছিল। ধ্বংসস্তূপ থেকে অনুমান করা যায় যে, নগরের বেশীর ভাগ বসতি ছিল উত্তর দিকের অংশে। নিনোরা-তালের পাশাপাশি অংশ প্রশাসনিক, ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পসংক্রান্ত কেন্দ্র ছিল বটে, কিন্তু এই ইমারতগুলিকে প্রাধান্য দেওয়া হয় নি। মনে হয়, বাণীগঞ্জ যাবার রাস্তার ধারে প্রাচীন রাজপ্রাসাদ অবস্থিত ছিল, কিন্তু সঠিকভাবে এর কোন নিদর্শন পাওয়া যায় নি। প্রধান প্রধান মন্দিরগুলির বেশীর ভাগই রাস্তা দিয়ে যুক্ত ছিল। উত্তর দিকে পুরনো রাস্তার দুই ধারে অবস্থিত মন্দিরগুলি তিনটি সমষ্টিতে বিভক্ত। এই স্থানটির পশ্চিম দিকে প্রধান হিন্দুমন্দিরগুলি অবস্থিত। এদের মধ্যে কাণ্ডারীয় মহাদেব মন্দির সবচেয়ে উঁচু ও সুন্দর। এই স্থানের দক্ষিণ দিকে প্রাচীন নিনোরা-তাল। এটির দক্ষিণ পূর্বে আর একটি বৃহৎ পুষ্করিণীর ধারে খাজুরাহো গ্রাম ও তার দক্ষিণ দিকে জৈন মন্দির-গুলি অবস্থিত। এই মন্দিরগুলির মধ্যে আদিনাথ পার্শ্বনাথের মন্দির সবচেয়ে বড় ও সুন্দর। এই

স্থানটির দক্ষিণাংশেও কয়েকটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আছে।

950 থেকে 1050 খৃষ্টাব্দের মধ্যে তৈরী খাজুরাহোর মন্দিরগুলি মন্দির-স্থাপত্যকলার এক অপূর্ব নিদর্শন। এদের সৌন্দর্য ও সুনিপুণ ভাস্কর্য ভারতের অন্যান্য মন্দিরগুলির তুলনায় অনেক উৎকৃষ্ট। এখানকার মন্দিরগুলির একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। মন্দিরগুলি উঁচু চত্বরের উপর অবস্থিত। অন্যান্য জায়গার মন্দিরের মত চারদিকে প্রাচীর ঘেরা নয়। এখানে প্রথমে মোট 85টি মন্দির ছিল, কিন্তু এখন মাত্র কুড়িটি মন্দির অবশিষ্ট আছে।

জৈন মন্দির-নগরী

জৈনদের মন্দির-নগরীকে তীর্থ বলা হয়। এই মন্দির-নগরীগুলি বিশেষ কোনও রীতি অনুযায়ী বিন্যস্ত ছিল না। প্রধানতঃ পাহাড়ের উপর সমতল স্থানে মন্দির স্থাপনা করা হতো। কোনও কোনও তীর্থে কয়েক শত পর্যন্ত মন্দির ছিল। এই সব তীর্থে কেবলমাত্র মন্দিরই ছিল, কোনও লোক এখানে বাস করতো না। রাত্রিতে এই সব তীর্থ জনমানবশূন্য হয়ে যেত। কেবলমাত্র কয়েকজন রক্ষী ছাড়া আর কেউই রাত্রিবেলায় এই সব তীর্থে থাকতো না।

মাউন্ট আবু

মাউন্ট আবু জৈন মন্দির-নগরীর একটি বিশিষ্ট নিদর্শন। 1032 খৃষ্টাব্দে তৈরী এখানকার দিলওয়ারা মন্দিরের ভাস্কর্য ভারতবিখ্যাত। এই মন্দির সাদা মার্বেল পাথরের তৈরি। এর গম্বুজাকৃতি ছাদের ভিতরের দিকে সাদা মার্বেল পাথরে সূক্ষ্ম ও অতি মনোহর জালির মত কাজ করা আছে।

জৈনদের ধর্মীয় নগরগুলি সাধারণতঃ উঁচু পাহাড়ের উপর অবস্থিত হতো। মাউন্ট আবুর দুটি মন্দির কাছাকাছি দুটি পাহাড়ের উপর অবস্থিত। মন্দির দুটির দক্ষিণ ও পশ্চিমে নীচু জমিতেও আরও নীচে 'নাকি হ্রদ'-এর ধারে বসবাসের স্থান আছে। ইংরেজ আমলে এই জায়গাটি সামরিক ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহৃত হতো। এখানকার পুরনো অংশগুলির প্রচুর সংস্কার ও পরিবর্তন করা হয়েছে। এখানকার পুরনো নগরী-বিন্যাসের বিশেষ কিছু বিবরণ পাওয়া যায় না।

সর্প-দংশনের চিকিৎসায় গাছগাছড়া

শ্রীঅবনীভূষণ ঘোষ

সর্প-দংশনের চিকিৎসা প্রসঙ্গে অনেককেই বলতে শুনি—মন্ত্রের কথা। মন্ত্রের কথা না হয় বাদ দিলাম, কিন্তু দ্রব্যগুণ? দ্রব্যগুণ তো অস্বীকার করবার উপায় নেই! সত্যই এমন কেউ নেই, যে দ্রব্যগুণের কথা অস্বীকার করবে। কিন্তু ব্যাপারটা সেখানেই শেষ হয়ে যায় না। দ্রব্যের অন্তর্নিহিত গুণ এক কথা, আর দ্রব্যের রহস্যময় অলৌকিক গুণ আর এক কথা। অধিকাংশ ক্ষেত্রে শেষোক্ত অর্থেই দ্রব্যগুণ শব্দ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। সেখানেই আপত্তি।

প্রচলিত ভেষজ দ্রব্যের মধ্যে গাছগাছড়াই প্রধান। বিভিন্ন গাছগাছড়ার নানা ধরণের রোগ সারাবার ক্ষমতা আছে। বস্তুতঃ আয়ুর্বেদশাস্ত্র গড়ে উঠেছে ভেষজ উদ্ভিদের গুণাগুণের উপর ভিত্তি করে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে—এমন কোন গাছ জানা আছে কিনা, যা সর্পবিষ নিবারক ক্ষমতা রাখে? আয়ুর্বেদে উক্ত এবং সাধারণ্যে প্রচলিত বহু গাছের পক্ষে এই দাবী করা হয়। এই দাবীর পিছনে কোন সত্য আছে কি? এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার আগে আমাদের দেশে সাপ ও সর্প-দংশনকে ঘিরে যে রহস্যময়তা বিরাজ করছে, তার একটু আভাস দিই। সাধারণ লোকের কাছে—এমন কি, অনেক শিক্ষিত লোকের কাছেও সাপ একটি রহস্যময় জীব। সে জন্যে তার চিকিৎসাও হওয়া উচিত রহস্যময়। গাছগাছড়া দিয়ে চিকিৎসা করলে কি হবে, ঐ গাছগাছড়া কেউ পেয়েছেন হিমালয় থেকে আগত কোন সন্ন্যাসীর কাছ থেকে, কারও গাছগাছড়া স্বপ্ন-প্রদত্ত, কোন গাছগাছড়া বংশপরম্পরায় প্রাপ্ত—কোন্ সে অতীতে তা জানা গিয়েছিল, আজ তা রহস্যাবৃত!

সর্পবিষ নিবারক গাছগাছড়ার সন্ধান পাওয়ার ব্যাপারে কেউ কেউ অবশ্য একটু বাস্তব ঘেঁষা কথাও বলে থাকেন। সাপে ও নেউলে লড়াই বেঁধেছিল। ঐ ব্যক্তি লক্ষ্য করলেন, লড়াইয়ের ফাঁকে ফাঁকে নেউলটি পাশের ঝোপে ঢুকে একটি গাছের শিকড় খেয়ে আসছে। শিকড়টি খাওয়াতে সাপ ছোবল দেওয়া সত্ত্বেও নেউলটির কিছু হচ্ছিল না। সেই গাছের শিকড় তিনি সংগ্রহ করে রেখেছেন। সমাজে মানসিক ব্যাধিপ্রবণ লোক থাকে। আধপাগলা বলে সাধারণতঃ এরা পরিচিত। রহস্যময়তা এদের আকর্ষণ করে। অনুরূপ অনেক ব্যক্তিকে—সর্পাঘাত চিকিৎসার ওষুধের সন্ধান পেয়েছে বলে দাবী করতে দেখেছি। তবে এরা গাছটির নাম প্রকাশ করতে চায় না। সর্পবিষ নিবারক গাছের সন্ধানে এদের কথায় বিশ্বাস করে অনেক বারই বেশ নাজেহাল হয়েছি।

সর্পাঘাতে মৃত্যু আকস্মিকভাবে হয়ে থাকে। সে জন্যে এই মৃত্যু খুবই বেদনাদায়ক। অসহায় মানুষ অগাধ জলে কুটো ধরবার প্রয়াস পায়। কেউ জোর করে বা কৌশল দেখিয়ে কোন গাছের সর্পবিষ নিবারক ক্ষমতা আছে বললে তার কথা সত্য বলে লুফে নিতে মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতা দেখা যায়, ভেষজটি যে যথাযোগ্যভাবে পরীক্ষিত হওয়া দরকার, তা নিয়ে মাথা ঘামায় না। সর্প-দংশনের জড়ি-বুটি বিক্রি বেদেদের পয়সা রোজগারের একটি বড় উপায়। বেদেদের কেউ সর্পাহত হলে তারা কেন ঐ জড়িবুটি ব্যবহার করে না? এই প্রশ্নের উত্তরে তারা সাফাই দেয়, যার

জড়িবুটি, তার আধিব্যাধিতে তা কার্যকর হয় না।

এখন আমাদের মূল কথায় ফিরে আসা যাক —কোন গাছগাছড়ার সর্পবিষ নিবারক ক্ষমতা আছে কিনা? দুর্ভাগ্যবশতঃ এর উত্তর হচ্ছে—না। আজ পর্যন্ত এমন কোন ভেষজ উদ্ভিদ জানা যায় নি, যা সর্পবিষ নিবারণ করতে পারে। বোম্বাইয়ের হপ্‌কিন্স ইনস্টিটিউটের দু-জন বিশিষ্ট গবেষক—মাসঘর ও কেয়স—সর্পবিষ নিবারক বলে গণ্য বিভিন্ন আয়ুর্বেদ গ্রন্থে উক্ত এবং সাধারণ্যে প্রচলিত তিন শতাধিক ভেষজ উদ্ভিজ ও বিচিত্র উপকরণে গঠিত প্রায় দুই শত সংমিশ্রণ প্রাণী-দেহে পরীক্ষা করে দেখেছেন, কিন্তু প্রতি ক্ষেত্রেই তাঁরা নিরাশ হয়েছেন। সংশ্লিষ্ট উদ্ভিদের যে অংশ সর্পবিষ নিবারক বলে কথিত, গবেষকদ্বয় তা নিয়েই পরীক্ষা করেছেন। সাধারণতঃ গাছটির মূলের কথাই বলা হয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে গাছটির বীজ, ফুল, ফল, পাতা, ছালের কথাও বলা হয়েছে। বলা বাহুল্য, এই সব পরীক্ষা যেমন জটিল, তেমনি ব্যয়সাধ্য। কিন্তু বিশিষ্ট গবেষকদ্বয় অতি ধৈর্যের সঙ্গে নিরলসভাবে পরীক্ষাগুলি চালিয়ে গেছেন—সর্পদষ্ট ব্যক্তিদের চিকিৎসার যদি কোন সুবিধা হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁরা কোন উদ্ভিদেরই সর্পবিষ নিবারক ক্ষমতা দেখতে পান নি। সাধারণের অবগতির জন্যে তাঁদের পরীক্ষিত কয়েকটি উল্লেখ্য উদ্ভিদের নাম দিলাম: সর্পগন্ধা বা ছোট চাঁদড় (Rauwolfia serpentina), ইষর মূল (Aristolochia indica), দ্রোণপুষ্পী বা দণ্ডকলস (Leucas linifolia), অপরাজিতা (Clitoria ternatea), পাতাল-গরুড় (Corallocarpus epigoea), অপামার্গ (Achyranthes aspera), পুনর্নবা (Boerhaavia diffusa), আয়াপান (Eupatorium ayapana), মুথা (Cyperus rotundus), পলাশ (Butea frondosa), মনসা-সিজ (Euphorbia nerllfolia), কুম্ভী (Careya arborea).

একটি কথা এখানে স্মরণ করা যেতে পারে—সর্পবিষ দেহের রক্তের সঙ্গে মিশে সক্রিয় হয়। সুতরাং সর্পবিষ নিবারক গুণ আছে বলে গণ্য ভেষজটি সর্পদষ্ট ব্যক্তির রক্তে সরাসরি মিশ্রিত হওয়া কাম্য। মুখবিবর দিয়ে গৃহীত কোন ভেষজ হজম্‌ হয়ে রক্তে মিশ্রিত হবার আগেই সর্পবিষ তার কার্য সমাধা করতে পারে—সর্পাহত ব্যক্তিটি মারা যেতে পারে। অথচ সর্পবিষ নিবারক ক্ষমতা আছে বলে গণ্য অধিকাংশ গাছগাছড়াই মুখ দিয়ে গ্রহণের ব্যবস্থা রয়েছে। পরন্তু কর্ণ-কুহর, নাসা-ছিদ্র ও চক্ষু-গোলকেও ঐ সব ভেষজ দেবার ব্যবস্থা আছে। ইদানীং অবশ্য কেউ কেউ চিরাচরিত ব্যবস্থা পরিবর্তন করে সর্পক্ষত স্থানেই ভেষজটি লাগাবার কথা বলে থাকেন।

কেবল আমাদের দেশে নয়—পৃথিবীর অন্যত্র যে কোন সর্পসঙ্কুল অঞ্চলে কোন কোন উদ্ভিদকে সর্পবিষ নিবারক বলে গণ্য করা হয়ে থাকে। কেন এরূপ মনে করা হয়, তার জন্যে কৌতূহল জাগা স্বাভাবিক। আজকের মত অতীতের মানুষ বৈজ্ঞানিক গবেষণায় তত উন্নত ছিল না। সত্যাসত্য নির্ণয়ে তাদের প্রধান সম্বল ছিল অভিজ্ঞতা। অভিজ্ঞতা সব সময়ে অভ্রান্ত হয় না। তাছাড়া আদিম মানবসুলভ চিন্তাধারাও প্রাচীন মানুষকে প্রভাবিত করেছিল। কোন দুটি বস্তুর সাদৃশ্য দেখলে আদিম মানুষ ভেবে নিত, ঐ দুই বস্তুর মধ্যে কোন না কোন ভাবে গূঢ় সম্পর্ক আছে—আজও কোন কোন মানুষ তাই ভেবে নেয়। ইষর মূল চলমান সাপের চেহারার মত স্পষ্টতঃ আঁকা-বাঁকা; তাই সর্পবিষ নিবারক গুণ আছে বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। মনসা-সিজের আকারে সর্পাবয়বের সাদৃশ্য আছে। তাই তার মূলও সর্পবিষ নিবারক। উত্তরআমেরিকা সর্পসঙ্কুল অঞ্চল। এখানকার কৃষ্ণ অহি-মূল (Cimicifuga

racenosa) সর্পবিষ নিবারক ক্ষমতাসম্পন্ন বলে গণ্য করা হয়, এরও মূলের আকৃতি চলিষ্ণু সাপের মত।

তবে একটি কথা। কোন কোন গাছগাছড়ার সর্পবিষ নিবারক ক্ষমতা আছে—এরূপ ভাবার পিছনে বাস্তব-ঘেঁষা যুক্তিও থাকতে পারে এবং আছেও। অতীতে মারাত্মক বিষধর সাপের দংশনে দেহে মৃত্যুকারক মাত্রায় বিষ প্রবেশ করলে মরণ ছিল অবধারিত, তার কোন চিকিৎসাই ছিল না। তবে সাপ দংশন করেছে বা করে নি, এই ভয়ে ভীত মানুষের দেহে কোন কোন ক্ষতিকারক লক্ষণ প্রকাশ পায়। অতীতে এদের ক্ষেত্রে ঐ সব গাছগাছড়া সাহায্য করতো—কার্যতঃ সাহায্য করতো বলে মনে করা হতো। কারণ এসব কোন কোন গাছের ঘর্মকারক, কোন কোন গাছের মূত্রকারক ক্ষমতা আছে; কোনটা বলকারক, কোনটা বা আরামদায়ক গুণসম্পন্ন।

এখনও একটি প্রশ্ন রয়ে যায়। সর্পবিষ নিবারক বলে গণ্য এই গাছগাছড়ার সাহায্যে আজও অনেক গুণিন সর্প-দংশনে প্রায় মৃত—এমন কি, মৃত ব্যক্তিকেও নাকি বাঁচিয়ে তুলছে, প্রত্যক্ষদর্শীরা এরূপ বিবরণ দেন। আমিও শুনেছি অনেক এই বিবরণ। প্রত্যক্ষদর্শীরা মিথ্যা কথা বলেন না। মৃত ব্যক্তি অবশ্য আর ফিরে আসে না। তবে "মৃত" বলে গণ্য বক্তি বেঁচে ওঠে—বেঁচে ওঠে গাছ-গাছড়ার সাহায্য ব্যতিরেকেই। আমাদের স্মরণ রাখা দরকার, বিষধর সাপ—এমন কি মারাত্মক বিষধর সাপ দংশন করলেই মানুষ মরতে বাধ্য নয়। মারাত্মক বিষধর সাপে দংশন করেছে, কিন্তু ঠিকমত দংশন করতে পারে নি। ঠিকমত দংশন করতে না পারায় মৃত্যুকারক মাত্রায় বিষ সর্পাহত ব্যক্তির দেহে প্রবেশ করতে পারে নি। এমনও হতে পারে, সে সময় দংশক সাপটির বিষগ্রন্থিতে মৃত্যুকারক পরিমাণ বিষই ছিল না। নানা কারণে তা ঘটতে পারে। এসব ক্ষেত্রে বাহ্যতঃ ক্ষতিকারক লক্ষণ প্রকাশ পেতে পারে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত লোকটি নিজের অন্ত-র্নিহিত জীবনীশক্তির জোরে—কখনও কখনও বা সামান্য সেবা-শুশ্রূষায় বেঁচে ওঠে। অপরপক্ষে এমন ঘটনাও দেখা যায়, বিষহীন সাপে কাউকে দংশন করেছে—হয়তো তাকে দংশন করতেও পারে নি, কিন্তু সাপে দংশন করেছে, এই ভয়েই লোকটি জ্ঞান হারিয়েছে। নিছক ভয়ে আপাত-দৃষ্টিতে যে মৃত্যুর লক্ষণ প্রকাশ পেতে পারে, তা আমরা সাধারণ লোক বুঝি না। এসব ক্ষেত্রেও রোগী শেষ পর্যন্ত নিজের অন্তর্নিহিত জীবনীশক্তির জোরে অথবা সামান্য সেবা-শুশ্রূষায় বেঁচে উঠতে পারে। গুণিনেরা দাবী করে, গাছগাছড়ার সাহায্যেই বেঁচে উঠেছে।

হ্যালোজেনগোষ্ঠীর আবিষ্কার

অরূপ রায়

মৌলিক পদার্থ নাইট্রোজেন, ফস্ফরাস, আর্সেনিক ইত্যাদির মধ্যে বিভিন্ন রাসায়নিক ও ভৌত ধর্মের সাদৃশ বর্তমান থাকায় এই মৌলগুলিকে সমগোত্রীয় বা এক পরিবারের সভ্য বলা হয়। ফ্লোরিন (At. No. 9), ক্লোরিন (At. No. 17), ব্রোমিন (At. No. 35) ও আয়োডিন (At. No 53)—এই চারিটি মৌলের মধ্যেও ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য বর্তমান। তাই ইহাদেরও সম পরিবারভুক্ত বলা হয়। F, Cl, Br ও I মৌলগুলির লবণ সমুদ্রজলে পাওয়া যায় বলিয়া ইহাদের হ্যালোজেন (Halogen : Halo-sea salt, genas to produce) বলা হয়। তাই ইহাদের গোষ্ঠীকে হ্যালোজেন পরিবার বলে। উল্লেখযোগ্য যে, 100 gms. সমুদ্র জলে 2·6 gms. NaCl লবণ থাকে। হ্যালোজেন গোষ্ঠীর সভ্যদের আবিষ্কার দুই-একজন বৈজ্ঞানিকের দুই-এক দশকের সাধনার ফল নয়, ইহাদের আবিষ্কারের পিছনে বহু বিজ্ঞানীর প্রায় আড়াই শত বৎসরের পরিশ্রমের ইতিহাস জড়িত।

ফ্লোরিন গ্যাসটির রাসায়নিক সক্রিয়তা ও জারণ-ক্ষমতা উল্লেখযোগ্য। গ্যাসটির আবিষ্কারের পিছনে রহিয়াছে শত বর্ষাধিকব্যাপী গবেষণার কাহিনী। ফ্লোরিন আবিষ্কারের বহু পূর্বেই ইহার যৌগ হাইড্রোফ্লোরিক অ্যাসিড (HF)-এর সন্ধান পাওয়া যায়। 1771 সালে সুইডিশ বিজ্ঞানী শীলে ফ্লুয়োরস্পার খনিজকে গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিডের সহিত পাতিত করিয়া HF অ্যাসিড তৈরি করিতে সক্ষম হন। তিনি উহার নামকরণ করেন ফ্লোর অ্যাসিড। কিন্তু গ্যাসটি যৌগিক কি মৌলিক—তাহা নিরূপণে অসমর্থ হন। অর্ধশতাব্দী পরে শীলের প্রস্তুত গ্যাসটি সম্পর্কে বৃটিশ বিজ্ঞানী সার হ্যাম্ফ্রে ডেভি 1831 সালে নূতন করিয়া আলোকপাত করেন। ডেভিই প্রমাণ করেন যে, হাইড্রোফ্লোরিক অ্যাসিডের ন্যায় হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডও হাইড্রোজেন ও অপর একটি মৌলের যৌগ। তিনি মৌলটির নাম রাখেন ফ্লোরিন। কিন্তু ডেভি HF হইতে ফ্লোরিন মৌল অবস্থায় আলাদা করিতে ব্যর্থ হন। তাঁহার পরবর্তী বৈজ্ঞানিকগণ কর্তৃক ফ্লোরিন আবিষ্কারের চেষ্টাও বিফলতায় পর্যবসিত হয়। কারণ ফ্লোরিন প্রস্তুতিতে বাধা প্রচুর যথা—

1) ফ্লোরিন সর্বোচ্চ ইলেকট্রো-নেগেটিভ মৌল বলিয়া ইহা একটি তীব্র জারক পদার্থ। সুতরাং HF-কে জারিত করিয়া ফ্লোরিন প্রস্তুত সম্ভব নয়।

2) HF-এর জলীয় দ্রবণ তড়িৎ-বিশ্লেষিত করিলে অ্যানোডে উৎপন্ন ফ্লোরিন জলের সহিত বিক্রিয়া করিয়া অক্সিজেন ও জল উৎপন্ন করে। $2F_2+2H_2O=4HF+O_2$, $3F_2+3H_2O=6HF+O_3$.

3) অনার্দ্র HF তড়িৎ-অপরিবাহী, সুতরাং ইহার তড়িৎ-বিশ্লেষণ সম্ভব নয়।

4) ইহা খুব সক্রিয় মৌল বলিয়া প্রস্তুত করিবার পাত্রের সঙ্গেই (যেমন—কাচ, কার্বন, প্ল্যাটিনাম ইত্যাদি) উৎপন্ন ফ্লোরিন বিক্রিয়া করে।

5) ফ্লোরিন ও HF খুব বিষাক্ত।

6) HF অত্যন্ত উদ্বায়ী, ইহার স্ফুটনাঙ্ক 9·5 সে., তাই তড়িৎ-বিশ্লেষণের সময় হিমায়ক পদার্থের (Refrigerant) প্রয়োজন। উপযুক্ত হিমায়ক পদার্থের সেই কালে অভাব ছিল।

এই সকল কারণগুলির জন্য 1886 সাল পর্যন্ত মৌলরূপে ফ্লোরিনের উৎপাদন সম্ভব হয় নাই। 1869 সালে বিজ্ঞানী গোর অনার্দ্র HF-এর সহিত 20% পটাসিয়াম হাইড্রোজেন ফ্লোরাইড (KHF_2) মিশ্রিত করিয়া উহাকে তড়িৎ-পরিবাহী করিতে সক্ষম হন। 1886 সালে ফরাসী বিজ্ঞানী ময়সা উক্ত অনার্দ্র HF ও KHF_2-এর মিশ্রণ বিশেষভাবে প্রস্তুত যন্ত্রে তড়িৎ-বিশ্লেষণ করিয়া সর্বপ্রথম মৌল হিসাবে ফ্লোরিন প্রস্তুত করিবার গৌরব লাভ করেন। তিনি তড়িৎ-বিশ্লেষণের পাত্র হিসাবে প্ল্যাটিনাম-ইরিডিয়াম সঙ্কর ধাতু-নির্মিত পাত্র ব্যবহার করেন। সঙ্কর ধাতুটি ফ্লোরিনের দ্বারা অনাক্রান্ত। হিমায়ক দ্রব্য হিসাবে ব্যবহার করেন মিথাইল ক্লোরাইড (CH_3Cl)। এইভাবে দীর্ঘ এক শত বৎসরের অধিককাল চেষ্টার ফলে ফ্লোরিন আবিষ্কৃত হইয়াছিল।

হ্যালোজেন পরিবারের দ্বিতীয় সভ্য ক্লোরিন। ইহার আবিষ্কারও এক বিরাট ইতিহাস বহন করে। বিজ্ঞানী গ্লবার সপ্তদশ শতাব্দীতে সমুদ্রের জলকে বাষ্পীভূত করিয়া প্রাপ্ত লবণকে গাঢ় H_2SO_4 দ্বারা পাতিত করিয়া একপ্রকার গ্যাস পান। উহার নামকরণ করেন তিনি 'লবণের গ্যাস'। 1772 সালে বৃটিশ বিজ্ঞানী প্রিস্টলী লক্ষ্য করেন যে, গ্যাসটি জলে অত্যন্ত দ্রবণীয় এবং দ্রবণটি অম্লাত্মক। তিনি উহাকে সামুদ্রিক অ্যাসিড বা মিউরিয়াটিক অ্যাসিড বলেন। ইহার দুই বৎসর পরে অর্থাৎ 1774 সালে শীলে ম্যাঙ্গানিজ ডাই-অক্সাইডকে মিউরিয়াটিক অ্যাসিড সহযোগে উত্তপ্ত করিয়া একটি ফিকে হরিদ্রাভ সবুজ রঙের গ্যাস পান। মিউরিয়াটিক অ্যাসিডের জারিত পদার্থ মনে করিয়া ইহার নাম দেওয়া হয় অক্সি-মিউরিয়াটিক অ্যাসিড। ফরাসী বিজ্ঞানী ল্যাভয়-সিয়ার বলিলেন—গ্যাসটি একটি অক্সাইড। সহযোগী ফরাসী বিজ্ঞানী বার্থোলে শীলের প্রাপ্ত হরিদ্রাভ সবুজ গ্যাসটি জলের মধ্যে দ্রবীভূত করিয়া সেই দ্রবণে সূর্যরশ্মি ফেলিয়া দেখিলেন যে, দ্রবণ হইতে অক্সিজেন উৎপন্ন হইতেছে। বার্থোলের পরীক্ষায় অক্সিজেন উৎপন্ন হয় সত্য, কিন্তু উহা আসে জল হইতে, শীলের প্রাপ্ত গ্যাস হইতে নয়। 1781 সালে ক্যাভেণ্ডিস প্রথম প্রমাণ করেন, জল হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের যৌগ। বার্থোলে জলকে যৌগ হিসাবে ধরিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন ল্যাভয়সিয়ারের সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত। ইহার পর প্রায় পঁয়ত্রিশ বৎসর আর কোন উল্লেখযোগ্য পরীক্ষা গ্যাসটির উপর হয় নাই। 1810 সালে বৃটিশ বিজ্ঞানী হামফ্রে ডেভি ভাবেন—শীলের প্রস্তুত গ্যাসটি যদি প্রকৃতই একটি অক্সাইড হয়, তবে গ্যাসটির মধ্যে কার্বন, সালফার বা ফস্‌ফরাস পোড়াইলে নিশ্চয়ই উহাদের অক্সাইড উৎপন্ন হইবে। তিনি পরীক্ষা চালাইয়া দেখেন যে, কোন ক্রমেই এইভাবে অক্সাইড তৈয়ারী করা যায় না। তিনিই সর্বপ্রথম ঘোষণা করেন যে, এই তথাকথিত অক্সি-মিউরিয়াটিক অ্যাসিড একটি মৌলিক পদার্থ। সবুজ বর্ণের জন্য ডেভি ইহার নাম দেন ক্লোরিন (গ্রীক Chloros—ফিকে সবুজ)। তাহার পর তিনি প্রমাণ করেন, মিউরিয়াটিক অ্যাসিড ক্লোরিন ও হাইড্রোজেনের যৌগ এবং নাম দেন হাইড্রো-জেন ক্লোরাইড ও উহার জলীয় দ্রবণের নাম দেন হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড। অতএব ক্লোরিন আবিষ্কারের প্রধান কৃতিত্ব বিজ্ঞানী শীলের এবং ইহাকে একটি মৌলিক পদার্থ হিসাবে প্রমাণিত করিবার গৌরব বিজ্ঞানী ডেভির।

ফ্লোরিন ও ক্লোরিন গ্যাসের আবিষ্কারের ইতিহাস সুদীর্ঘ হইলেও হ্যালোজেন গোষ্ঠীর অপর দুই সভ্যের আবিষ্কারের ইতিহাস খুব দীর্ঘ নয়।

হ্যালোজেন পরিবারের তৃতীয় সভ্যের আবি-ষ্কারের গৌরব বিজ্ঞানী ব্যালার্ডের 1826 সালে। সমুদ্রজল হইতে সাধারণ লবণ (NaCl) কেলাসিত করিয়া লইবার পর যে শেষ দ্রব পড়িয়া থাকে, তাহার মধ্যে ক্লোরিন গ্যাস পরিচালনা করিয়া

তিনি একটি তীব্র গন্ধযুক্ত গাঢ় রক্তিম বর্ণের পদার্থ আবিষ্কার করেন। তীব্র গন্ধের জন্ম পদার্থটির নাম হয় ব্রোমিন।

বিজ্ঞানী কুর্তোয়া 1812 সালে চতুর্থ হ্যালোজেন আয়োডিন আবিষ্কার করেন। সামুদ্রিক উদ্ভিদ-ভস্মকে সাধারণতঃ কেল্প বলে। কুর্তোয়া এই কেল্পকে গাঢ় H_2SO_4 অ্যাসিডসহ উত্তপ্ত করিয়া সুন্দর বেগুনী রঙের একপ্রকার গ্যাস পান। বস্তুতঃ ইহাই আয়োডিন। আয়োডিন যে মৌলিক পদার্থ, তাহা প্রমাণ করেন বিজ্ঞানী ডেভি ও গে-লুসাক। ডেভি হাইড্রো-আয়োডারিক (HI) অ্যাসিডও আবিষ্কার করেন। সুন্দর বেগুনী বর্ণের জন্ম মৌলটির নাম হয় আয়োডিন।

হ্যালোজেন পরিবারের আরেকটি মৌলের নাম অ্যাসটেটাইন। ইহা তেজস্ক্রিয়তা উৎপাদক ও অস্থায়ী।

সংক্ষিপ্তভাবে ইহাই হইল হ্যালোজেন পরিবারভুক্ত সন্তানদের আবিষ্কারের কাহিনী।

সঞ্চয়ন

ভারত প্রভৃতি রাষ্ট্রে কৃষি-বিপ্লব

সাম্প্রতিক কালে পৃথিবীর বহু দেশে কৃষিশস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটেছে। নতুন ধরণের ধান ও গম উদ্ভাবিত হওয়ায় এবং উন্নততর পদ্ধতিতে চাষ-আবাদের ফলে নানা দেশে ফসল উৎপাদনের পরিমাণ এরূপ বৃদ্ধি পেয়েছে যে, এরকম বৃদ্ধি এর আগে আর দেখা যায় নি। ভারতের বিহারে খাদ্যাভাব প্রায় লেগেই থাকতো। ঐ রাজ্যে যেখানে পূর্বে প্রতি একর জমিতে 720 পাউণ্ড গম উৎপন্ন হতো, আজ সেখানে এক নতুন ধরণের গম চাষের ফলে 1300 পাউণ্ডেরও বেশী গম উৎপন্ন হচ্ছে। সিংহলে গত দু-বছরে ধান্যোৎপাদন বেড়েছে শতকরা 34 ভাগ। তুরস্কে যেখানে প্রতি একর জমিতে মাত্র 22 বুশেল গম উৎপন্ন হতো, সেখানে বর্তমানে 52 বুশেল গম উৎপন্ন হচ্ছে। পশ্চিম পাকিস্তান ছিল চিরকালের খাদ্যাভাবগ্রস্ত অঞ্চল। সেখানে বাইরে থেকে খাদ্য আমদানী করে এই অভাব মেটাতে হতো। বর্তমানে ঐ এলাকাও খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে উঠেছে।

আমেরিকার রকফেলার ফাউণ্ডেশন এই নতুন ধরণের গম ও ধান উদ্ভাবনে বিভিন্ন দেশের শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধিতে গত পঁচিশ বছরের মধ্যে প্রচুর সাহায্য করেছে। এক্ষেত্রে তাদের বহু অবদান রয়েছে।

ফাউণ্ডেশনের প্রেসিডেণ্ট ডাঃ জে. জর্জ হারার তথাকথিত এই সবুজ বিপ্লব সম্পর্কে সম্প্রতি বলেছেন যে, পৃথিবীর নানা দেশের খাদ্যোৎপাদন বহুল পরিমাণে বৃদ্ধির ফলে বিপ্লব ঘটলেও এই দুনিয়ায় এখনও 150 কোটি লোক খেতে পায় না, প্রতিদিনই অপুষ্টির জন্ম দশ হাজার লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তারপর কোন কোন অঞ্চলে পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব রয়েছে। কিন্তু সেই সব অঞ্চলে জনসংখ্যা দিন দিন বেড়েও যাচ্ছে। ফলে খাদ্যাভাব দূর হচ্ছে না, অবস্থা আরও সঙ্গীন হয়ে পড়ছে। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করা, স্থিতিশীলতা বজায় রাখা যে একান্ত কর্তব্য, এই বিষয়ে ঐ সকল অঞ্চলবাসী এবং তাদের সরকার অবহিত না হলে, কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন না করলে অবস্থার আরও অবনতি ঘটবে।

1970 সালে রকফেলার ফাউণ্ডেশনের যে সকল কাজকর্ম হয়েছে, সে বিষয়ে একটি প্রতিবেদন সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। ডাঃ হারার এই প্রতিবেদনেই এই সকল কথা লিখেছেন।

তিনি এই প্রসঙ্গে খাদ্যবন্টন এবং জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ—এই দুটি নিদারুণ সমস্যার কথা স্বীকার করেছেন। কিন্তু তিনি আরও বলেছেন যে, পরবর্তী তিন দশকের মধ্যে দুনিয়ার সকল মানুষের উপযোগী যথেষ্ট পরিমাণে খাদ্যোৎপাদনের ক্ষমতা বর্তমান পৃথিবীর রয়েছে। তবে তার জন্যে 1970 সালে যে পরিমাণ খাদ্য উৎপন্ন হয়েছে, তার তিন থেকে চারগুণ বেশী খাদ্য উৎপাদন করতে হবে।

সবুজ বিপ্লব ধনীকে আরও ধনী এবং দরিদ্রকে আরও দরিদ্র করেছে—এই অভিযোগ সম্পর্কে ডাঃ হারার বলেছেন যে, পল্লীর প্রগতিশীল বর্ধিষ্ণু কৃষকেরাই প্রথম নতুন বীজ রোপণের এবং নতুন পদ্ধতিতে চাষ করবার সুযোগ নিয়েছে। ছোট-খাটো কৃষকেরা পরে তাদের অনুসরণ করেছে। ভারতে প্রায় আড়াই কোটি খামার এই সবুজ বিপ্লবের ফলে উপকৃত হয়েছে। এর মধ্যে শতকরা 62টিতে জমির পরিমাণ ছিল পাঁচ একর অথবা তারও কম।

নতুন পদ্ধতিতে চাষ-আবাদের ফলে পল্লী-অঞ্চলে বেকার সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে বলেও অনেকে বলে থাকেন। ডাঃ হারার এই প্রসঙ্গে বলেছেন যে, সবুজ বিপ্লব নয়, জনসংখ্যা বৃদ্ধিই এই বেকার সমস্যার কারণ। নতুন ধরণের বীজ রোপণের ফলে ভারতের উত্তর প্রদেশে এবং ফিলিপাইনসে কাজকর্মের ক্ষেত্র বহুল পরিমাণে প্রসারিত হয়েছে, ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিমাণ এবং ভোগ্যপণ্যের লেনদেন বেড়ে গেছে। নতুন ধরণের শস্যের চাষে পরিশ্রম অনেক বেশী করতে হয়। তার জন্যে প্রয়োজন হয় উপযুক্ত বীজ, সার, চাষ-আবাদের সাজসরঞ্জাম, উপযুক্ত পরিমাণ কৃষিঋণ ও বন্টন ব্যবস্থার। তারপর ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে সেই অঞ্চলে সমৃদ্ধি আসে, নতুন নতুন কাজ কর্মের সৃষ্টি হয়, ব্যবসা-বাণিজ্য বেড়ে যায়। সুতরাং সবুজ বিপ্লবের ফলে বেকারীর বৃদ্ধি হয় নি, বরং নতুন নতুন কাজ-কর্মের সৃষ্টি হয়েছে।

অনেকে এই প্রসঙ্গে আরও বলে থাকেন যে, এর ফলে বাজারের চাহিদার তুলনায় অতিরিক্ত খাদ্যশস্য সরবরাহ করবার সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। ডাঃ হারার এর উত্তরে বলেছেন যে, এরকম কোন সমস্যার সৃষ্টি হয় নি। ভারত প্রভৃতি রাষ্ট্রে জনসংখ্যা বৃদ্ধিই আসল সমস্যা। বর্তমানে যে হারে জনসংখ্যা ঐ সকল দেশে বাড়ছে, তারই পরিপ্রেক্ষিতে দুর্ভিক্ষের কবল থেকে রক্ষা পেতে হলে ঐ সকল দেশে 1985 সালের মধ্যে খাদ্যোৎপাদনের পরিমাণ শতকরা 80 ভাগ বাড়াতে হবে।

ডাঃ হারার ঐ প্রতিবেদনের উপসংহারে বলেছেন যে, কৃষি-বিপ্লবে সুফল সকলেই যাতে পেতে পারে, তার জন্যে ছোটখাটো কৃষকেরা যাতে অধিকতর পরিমাণে কৃষিঋণ পায় এবং শস্যের বাজার দরের ওঠা-নামার জন্যে তারা যাতে ক্ষতি-গ্রস্ত না হয়, তার ব্যবস্থা করতে হবে এবং কৃষি-পণ্যের কেনাবেচা ও বন্টনের সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্র আরও প্রসারিত ও আরও উন্নত করতে হবে। তাছাড়া কৃষি উৎপাদনের নতুন পদ্ধতি নতুন নতুন ক্ষেত্রে প্রয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে, কৃষি সম্প্রসারণে কর্মীদের কাজে লাগাতে হবে, কৃষক-দের কঠোর পরিশ্রমী হতে হবে এবং পল্লী অঞ্চলে ক্ষুদ্র শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার জন্যে উদ্যোগী হতে হবে।

আমেরিকার মহাকাশ কার্যসূচী

জুলাই (1971) থেকে 1972 সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত অ্যাপোলো 15, অ্যাপোলো 16 এবং অ্যাপোলো 17 আমেরিকার এই তিনটি চন্দ্রাভিযান পরিকল্পনা রূপায়িত হবে বলে স্থির হয়েছে। গত 26শে জুলাই অ্যাপোলো 15 চন্দ্রাভিযান সুরু করেছে এবং আগামী বছরের (1972) মার্চ মাসে অ্যাপোলো 16 এবং ঐ বছরের ডিসেম্বর মাসে সুরু হবে অ্যাপোলো 17-এর অভিযান। এই তিনটি অভিযানের পর চন্দ্রলোকে তথ্যানুসন্ধানী অভিযান চালানোর পরিকল্পনা অ্যাপোলো কার্যসূচীর পরিসমাপ্তি ঘটবে।

তারপরে সুরু হবে মহাশূন্যে গবেষণাগার বা স্কাইল্যাব ও মহাকাশকেন্দ্র বা স্পেস স্টেশন স্থাপনের এবং পৃথিবী ও মহাকাশের মধ্যে যাতায়াতের জন্যে বিশেষ ধরণের মহাকাশযান নির্মাণের প্রস্তুতি, অজানাকে জানবার জন্যে বৃহত্তর মহাকাশ পরিকল্পনার রূপায়ণ।

মহাশূন্যের গবেষণাগার বা স্কাইল্যাব—বর্তমানে আমেরিকার আলাবামা রাজ্যের হান্টসভিলের মার্শাল স্পেসফ্লাইট সেন্টারের সুউচ্চ বিশাল ভবনে এই গবেষণাগার নির্মাণের কাজ চলছে। মহাশূন্যের এই গোলাকার গবেষণাগারে বা স্কাইল্যাবে আসবাবপত্র, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম বসানো হচ্ছে।

1973 সালের মার্চ মাসে এই গবেষণাগারটি পৃথিবীর কক্ষপথে স্থাপন করা হবে। এটি হবে পাঁচ কামরা বিশিষ্ট একটি বেশ বড় বাড়ী। এতে তিনজন মানুষের উপযোগী একটি শয়ন ঘর, একটি রান্না ঘর, একটি স্নানের ঘর এবং একটি বড় গবেষণাগার থাকবে অর্থাৎ মহাশূন্যে বসবাসের এবং কাজ করবার সকল রকম সুযোগ-সুবিধাই এতে থাকবে।

সম্প্রতি সোভিয়েট রাশিয়া স্যালিউট-সয়ুজ 11 কসমোড্রোম নামে যে গবেষণাগারটি পৃথিবীর কক্ষপথে স্থাপন করেছিল, তার সঙ্গে অনেকেই এই স্কাইল্যাবের তুলনা করে থাকেন। সোভিয়েটের ঐ মহাশূন্যের গবেষণাগারেও বসবাসের এবং কাজকর্ম করবার জন্যে পৃথক পৃথক কামরা ছিল। 40 ফুটের মত জায়গা নিয়েছিল ঐ সকল কামরা এবং বাসগৃহ। গবেষণাগার প্রভৃতি সবকিছু নিয়ে কসমোড্রোমের ওজন 28 টন। কিন্তু স্কাইল্যাবের মোট ওজন 90 টন এবং মহাকাশচারীদের জন্যে তাতে জায়গা থাকবে কসমোড্রোমের তুলনায় তিনগুণ বেশী।

মহাকাশে স্থাপিত কৃত্রিম উপগ্রহের স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতির সাহায্যে আবহাওয়া সম্পর্কে নানা তথ্য, যেমন—সমুদ্রপৃষ্ঠের তাপমাত্রা, সমুদ্রে স্রোতের পরিমাণ প্রভৃতি তথ্যাদি পৃথিবীতে সরবরাহ করা হয়। ঐ সকল উপগ্রহের যন্ত্রপাতি ভূগর্ভে সঞ্চিত ধাতব সম্পদ এবং সামুদ্রিক মৎস্যের সন্ধান দিয়ে থাকে। তাছাড়া কৃষি এবং ধনসম্পদ সম্পর্কে নানা তথ্যও ঐ সকল যন্ত্রপাতি পৃথিবীতে সরবরাহ করে। ঐ সকল সাজসরঞ্জাম এবং যন্ত্রপাতি ঐ গবেষণাগার বা স্কাইল্যাবে থাকবে। স্কাইল্যাবের বিজ্ঞানীরা ঐ সকল যন্ত্রপাতির কার্যকারিতা পরীক্ষা করে দেখবেন এবং এজন্যে পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলবেন। ঐ সকল যন্ত্রপাতি পরীক্ষা করে দেখা এবং সংশোধনের পর স্বয়ংক্রিয় কৃত্রিম উপগ্রহে ঐ সকল তথ্যসন্ধানী যন্ত্রপাতি স্থাপন করা হবে।

পৃথিবীর আবহমণ্ডলের জন্যে অতি শক্তিশালী দূরবীক্ষণের সাহায্যেও সূর্যের সম্পর্কে সঠিক তথ্য ও চিত্রাদি গ্রহণ সম্ভব হয় না। স্কাইল্যাব থাকবে পৃথিবীর আবহমণ্ডলের বহু উর্ধ্বে এবং তাতে থাকবে অতি শক্তিশালী দূরবীক্ষণ যন্ত্র। ঐ যন্ত্রের

সাহায্যে এই পৃথিবীর শক্তির প্রধান উৎস সূর্য সম্পর্কে বহু তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হবে, আবহাওয়া সৃষ্টিতে সূর্যের প্রভাব এবং পৃথিবীর অবস্থা সম্পর্কে অনেক কিছু জানা যাবে।

সূর্যের মধ্যে অনন্ত শক্তি উৎপন্ন হচ্ছে কি প্রক্রিয়ায়? এই তথ্যানুসন্ধানের ফলে তা জানা গেলে পৃথিবীতে সেই প্রক্রিয়ায়ই সস্তায় ও সহজে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন করা সম্ভব হতে পারে।

ভারশূন্য পরিবেশে গলিত পদার্থসমূহ সমানভাবে ঘনীভূত ও বিস্তৃত হয়ে থাকে। পৃথিবীতে কিন্তু তা হয় না। এখানে বহু রকমের পদার্থের যখন মিশ্রণ করা হয়, তখন ভারী পদার্থসমূহ তলায় এসে জমা হয়। মহাশূন্যে তা হবে না। তাই মহাশূন্যের পরিবেশে নানা বস্তুর নির্মাণ সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হবে।

ভারশূন্য অবস্থায় বেশী দিন থাকলে মানবদেহের উপর কি প্রতিক্রিয়া হতে পারে, সে বিষয়েও ঐ গবেষণাগারের মহাকাশচারীদের মাধ্যমে অনেক কিছু জানা যাবে। তাদের স্বাস্থ্য ও রোগ সম্পর্কে এর মাধ্যমে যে সকল তথ্য সংগৃহীত হবে, তা ভবিষ্যতে গ্রহান্তর যাত্রার উপযোগী মহাকাশযান নির্মাণের পক্ষে বিশেষ সহায়ক হবে। এই সকল তথ্যের ভিত্তিতে সুদীর্ঘ গ্রহান্তর যাত্রায় মহাকাশযাত্রীদের স্বাস্থ্যের উপযোগী মহাকাশযান নির্মাণ সম্ভব হবে।

যাত্রীবাহী মহাকাশযান—এছাড়া ছোট যাত্রীবাহী মহাকাশযান নির্মাণেরও পরিকল্পনা করা হয়েছে। এই সকল যান মহাকাশকেন্দ্র বা স্পেস স্টেশনে ও মহাকাশস্থিত গবেষণাগারে যাত্রী ও গবেষকদের পৌঁছে দিবে। দু-জন চালক, বারোজন যাত্রীকে ঐ সকল মহাকাশযানে পৃথিবীর কক্ষপথ পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারবেন। ঐ সকল যান সোজাসুজি রকেটের মত মহাকাশ অভিমুখে উঠে যাবে। তারপর পৃথিবীর সমান্তরালভাবে বিমানের মত চলবে। বিজ্ঞানীরা ঐ সকল যান থেকে গবেষণা চালাতে পারবেন এবং তাদের পক্ষে সাতদিন পর্যন্ত ঐ যানে অবস্থান করা সম্ভব হবে। তারপর তারা পৃথিবীস্থিত গবেষণাকেন্দ্রসমূহে ফিরে আসবেন।

ভবিষ্যতে নানাদিক থেকেই এই সকল যাত্রীবাহী মহাকাশযান খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করবে। বর্তমানে কোন রকেট বা মহাকাশযানকে একবারের বেশী মহাকাশে প্রেরণ করা যায় না। কিন্তু এই সকল মহাকাশযান একশো বারেরও বেশী পৃথিবী ও মহাকাশের মধ্যে চলাচল করতে পারবে। ফলে মহাকাশযাত্রার খরচ খুবই হ্রাস পাবে। তখন বর্তমানে যা খরচ পড়ে, তার দশভাগের একভাগ খরচে মহাকাশ সফর করে আসা যাবে।

এছাড়া ঐ সকল মহাকাশযানের যে অংশে মালপত্র থাকে, সেই অংশ থেকে স্বয়ংক্রিয় তথ্যসন্ধানী উপগ্রহও মহাকাশে ছাড়া যাবে। এখন পৃথিবী থেকে রকেটের সাহায্যে এই সকল উপগ্রহ মহাকাশে প্রেরিত হয়ে থাকে।

এই সকল মহাকাশযান মহাকাশে বহু রকমের ভূমিকাই গ্রহণ করবে। মহাকাশে পৃথিবী প্রদক্ষিণরত কোন উপগ্রহের ব্যাটারী নষ্ট হয়ে গেলে অথবা যন্ত্রপাতি বিকল হয়ে গেলে ঐ মাল ও যাত্রী চলাচলকারী মহাকাশযান ব্যাটারী বদল করে দিয়ে আসবে, নষ্ট যন্ত্রপাতি সারাবে এবং ইন্ধন ফুরিয়ে গেলে নতুন ইন্ধন সরবরাহ করবে। কেবল তাই নয়, কোন মহাকাশযান অকেজো হয়ে গেলে, মহাকাশে কোন নষ্ট যন্ত্রপাতি সারানো সম্ভব না হলে, সেই মহাকাশযানটিকেও এই চলাচলকারীযান পৃথিবীতে ফিরিয়ে নিয়ে আসবে। তবে মহাকাশে এর কাজ হবে খেয়াতরীর মত বা ট্যাক্সির মত। এই সকল যান পৃথিবী ও আধাস্থায়ী মহাকাশকেন্দ্রের মধ্যে যাত্রী ও

মাল পারাপার করবে—এই হবে এদের প্রধান ভূমিকা।

ঐ সকল মহাকাশকেন্দ্র বহু বছর ধরে পৃথিবীর কক্ষপথে থেকে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করবে। আর এই সকল যান ট্যাক্সি ও বাসের মত যাত্রী, নানা কাঁচা মাল ও উপকরণ ঐ সকল কেন্দ্রে পৌঁছে দেবে। তারপর ঐ সকল কেন্দ্রে যে সকল গবেষণা হবে, ঐ সকল কাঁচামাল দিয়ে যে সকল উপকরণ তৈরি হবে, সে সকল নিয়ে আসবে পৃথিবীতে।

মহাকাশকেন্দ্র বা স্পেস স্টেশন—মহাকাশের ঘাঁটি বা স্পেস স্টেশনসমূহ গোলাকার বহু অংশ জুড়ে তৈরি হবে। প্রত্যেকটি অংশ হবে একটি বাড়ীর মত। একটি অংশের সঙ্গে আর একটির যোগ থাকবে, যেমন বড় বড় অফিসে থাকে, সঙ্কীর্ণ পথের মাধ্যমে। প্রত্যেকটি অংশকে বলা হবে মডিউল। বিভিন্ন অংশের বা মডিউলের কাজ হবে বিভিন্ন রকম। কোন অংশে হয়তো থাকবে পৃথিবীর সম্পদ-সন্ধানী যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম, কোন অংশে গ্রহ-নক্ষত্র সম্পর্কে তথ্য-সন্ধানী শক্তিশালী দূরবীক্ষণ ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি। আর কোন অংশে হয়তো থাকবে ওষুধপত্র, প্লাস্টিক এবং ধাতুনির্মিত নানা উপকরণ ও লেন্স তৈরির কারখানা। সেই কারখানায় ভারশূন্য পরিবেশে বহু নতুন ধরণের জিনিষপত্র তৈরি হবে। রসায়ন, পদার্থ ও জীববিজ্ঞান সম্পর্কে গবেষণার জন্যেও সেখানে পৃথক পৃথক গবেষণাগার থাকবে। আর কোন অংশে থাকবে গ্রন্থাগার, প্রেক্ষাগৃহ ও ব্যায়ামাগার। এক-একটি কেন্দ্র হবে এক-একটি ছোট সহর।

সেখানে কাজকর্ম পালাক্রমে নির্বাহিত হবে। বিজ্ঞানী ও শ্রমিকেরা সপ্তাহান্তে বা ছুটিতে পৃথিবীতে ফিরে আসবেন। যাত্রীবাহীযানই তাদের পৃথিবীতে ফিরিয়ে নিয়ে আসবে।

স্কাইল্যাব যে দিন মহাকাশে উৎক্ষিপ্ত হবে, তারপর থেকে অ্যাপোলো পরিকল্পনার নাম আর শোনা যাবে না। তাহলেও অ্যাপোলো পরিকল্পনাই মানুষের মহাকাশ যাত্রার পথ রচনা করেছে বলে মানুষের গ্রহান্তরে প্রথম পদক্ষেপের কাহিনী ইতিহাসে অক্ষয় হয়ে থাকবে।

বিশ্ব-জ্যামিতি ও মহাকর্ষ-রহস্য

হীরেন্দ্রকুমার পাল*

এই সংসারে মাপজোখের অন্ত নেই। বাস্তব জগতের একটা বৈশিষ্ট্য হলো—ঘটনা। নীতিগত ভাবে এটা কল্পনা করা যায় যে, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বস্তুবিন্দুর গতির দ্বারাই হয় ভৌত ঘটনার উৎপত্তি এবং তা ঘটে দেশ (Space) ও কাল (Time)-কে আশ্রয় করে। ঘটনা নিরীক্ষণ আমাদের নিত্য কর্ম। ঘটনার কার্য-কারণ সম্বন্ধ খুঁজতে গেলে কোথায় এবং কখন ঘটনা ঘটলো, তা জানতে হবে। সে জন্যে দেশ ও কালের মধ্যে ঘটনার অবস্থানই বর্তমান প্রবন্ধে বিবেচ্য, তার প্রকৃতি নয়।

নিউটনীয় গতি-বিজ্ঞানে 'দেশ' সম্পর্কে জ্ঞান দ্রষ্টা-সাপেক্ষ হলেও 'কাল'-এর জ্ঞানকে দ্রষ্টা-নিরপেক্ষ (Absolute) মনে করা হয়; অর্থাৎ আপেক্ষিক গতিসম্পন্ন বিভিন্ন দ্রষ্টার নিকট ঘটনা সংশ্লিষ্ট কাল-এর প্রতীতিতে কোন পার্থক্য হবে না, যেন সবার ঘড়ি সমান তালেই চলবে। অধিকন্তু একের দৃষ্টিতেও যুগপৎ সংঘটিত দুটি ঘটনা অন্যের দৃষ্টিতেও যুগপৎ বলেই প্রতীয়মান হবে। এখানে নিউটনের সঙ্গে আইনষ্টাইনের মতবিরোধ আছে।

কারণ আইনষ্টাইন বলেন, আমাদের দেশ ও কাল-এর জ্ঞান সর্বাবস্থায়ই আপেক্ষিক ও অনির্দেশ্য; অর্থাৎ দ্রষ্টার নিজস্ব গতির একটা নিশ্চিত প্রভাব থাকবে দুই ঘটনার স্থান ও উপলব্ধিতে। একের দৃষ্টিতে যা নিকটে, অন্যের দৃষ্টিতে তা দূরে—একের দৃষ্টিতে যা সূক্ষ্ম, অন্যের দৃষ্টিতে তা স্থূল—একের কাছে যা অতীত, অন্যের কাছে তা ভবিতব্য—এইরূপ। দর্শনের ব্যাপারে যা অপরিবর্তিত, দ্রষ্টা-নিরপেক্ষ থাকে, তা হলো শুধু দর্শন-প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যে আলো, তার গতিবেগ c। এই দৃষ্টিকোণ থেকে ঘটনার দেশ ও কাল পরস্পরের উপর নির্ভরশীল, পরস্পরের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য সূত্রে গ্রথিত। দেশ ও কাল-কে বিযুক্তভাবে গ্রহণ করলে তাদের সম্পর্কে জ্ঞানের ভ্রান্তি আসা অনিবার্য।

মহাবিশ্বের জ্যামিতিক চিত্র আঁকতে গেলে আগে সাধারণ প্রচলিত জ্যামিতি সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলে নেওয়া প্রয়োজন। এই জ্যামিতি অনুযায়ী দেশ-এর অভ্যন্তরে কোন বিন্দুর অবস্থান নির্ণয় অথবা নির্দেশ করতে হলে একটা সুনির্দিষ্ট ত্রিমাত্রিক কাঠামোর (Framework) সাহায্য নিতে হয়। কাঠামোর পরিকল্পনা নানা ভাবেই হতে পারে। দে কার্তে (Des Cartes) প্রবর্তিত প্রণালীতে প্রথমতঃ কোন মূল বিন্দু O থেকে পরস্পরের সঙ্গে লম্বভাবে তিনটি নির্দিষ্ট সরল রেখা OX_1, OX_2 ও OX_3 টানতে হয়। এগুলিকে বলা হয়, উল্লেখন-অক্ষ (Axes of reference)। এতে প্রতি দুই অক্ষের দ্বারা রচিত হয় একটি করে সমতল। এভাবে পাই তিনটি সমতল। এই সমতলগুলি থেকে বিবেচ্য বিন্দুর ক্ষুদ্রতম দূরত্ব মেপে নিলেই তার যথার্থ অবস্থানের ধারণা মিলবে। যদি (OX_2, OX_3)-সমতল থেকে ঐ দূরত্ব হয় x_1, (OX_3, OX_1)-সমতল থেকে x_2 এবং (OX_1, OX_2)-সমতল থেকে x_3, তাহলে x_1, x_2, x_3-কে ঐ বিন্দুর স্থানাঙ্ক (Co-ordinates) বলে। এক্ষণে মনে করা যাক, P এবং Q এই দুই বর্ণনাতীত কাছাকাছি বিন্দুর স্থানাঙ্ক যথাক্রমে (x_1, x_2, x_3) এবং $(x_1+dx_1, x_2+$

*পদার্থবিদ্যা বিভাগ, বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির, বেলুড়।

dx_2, x_3+dx_3)। তা হলে ইউক্লিডীয় জ্যামিতির অন্তর্গত পিথাগোরাস-সূত্রানুযায়ী বিন্দু দুটির পারস্পরিক দূরত্ব ds' পাওয়া যাবে নিম্নোক্ত সমীকরণের সাহায্যে—

$$ds^2 = dx_1^2 + dx_2^2 + dx_3^2 \cdots\cdots(1)$$

এই কাঠামোর জন্যে ইউক্লিডীয় জ্যামিতির ধারা এবং সূত্র প্রযোজ্য; তাই একে ইউক্লিডীয় কাঠামো বলে। অতঃপর একে বক্রতাহীন (Flat) বা সরল কাঠামো বলেও অভিহিত করা হবে।

আপেক্ষিক জ্ঞানময় জগৎ যে সত্যকার জগৎ থেকে নিশ্চিতই ভিন্নরূপী, তা না বললেও চলে। এই মন্তব্যকে স্বীকৃতি দিয়েই বিশ্বের যথার্থ স্বরূপ অন্বেষণ করতে হবে। তদনুযায়ী মিনকৌস্কি এক চতুর্মাত্রিক কাঠামোর পরিকল্পনা করেছেন। আইনষ্টাইন একেই তাঁর বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদে অবলম্বন করেছেন। এতে পূর্বোক্ত ইউক্লিডীয় কাঠামোর তিন দেশ-মাত্রার সঙ্গে চতুর্থ আর এক মাত্রা জুড়ে দেওয়া হয়েছে। সেটা হলো 'কাল'। এই কাল-মাত্রা OX_4 অন্য তিন মাত্রার প্রত্যেকের সঙ্গে লম্ব, এরূপ কল্পনা করতে হবে। দেশ ও কাল-মাত্রার সমন্বয়ে গঠিত বলেই একে 'নিরবচ্ছিন্ন দেশ-কাল' (Space-time continum) বলে। মিনকৌস্কি একে আখ্যা দিয়েছেন 'চতুর্মাত্রিক জগৎ'। সত্যের খাতিরে নিরীক্ষিত ভৌত ঘটনাকে এই জগতেই স্থাপন করতে হবে। এতে অবস্থিত প্রতিটি বিন্দু একটি ঘটনা বা ঘটনাংশের প্রতীক; কেন না ঐ বিন্দুর স্থানাঙ্কের দ্বারা তার দেশ ও কাল নির্ণীত হতে পারে। এই ব্যবস্থায় দেশ-মাত্রা ও কাল-মাত্রার জ্যামিতিক ভূমিকায় মৌলিক কোন প্রভেদ নেই। তারা পরস্পরের মধ্যে রূপান্তরসাধ্যও বটে। কাল (t)-কে এক রহস্যময় অঙ্ক $C\sqrt{-1}$ দিয়ে গুণ করলেই দেশ-এ রূপান্তরিত হবে। কাল-এর এক সেকেণ্ড দেশ-এর তিন লক্ষ কিলোমিটারের সমতুল্য। বস্তুতঃ ভৌত ঘটনার জগৎ এই চতুর্মাত্রিক কাঠামোতেই রূপায়িত। তবে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এই কাঠামো যে কার্যতঃ ত্রিমাত্রিক দেশ এবং অন্য-নিরপেক্ষ কাল-এ বিশ্লিষ্ট হয়ে যায়, তার মূলে রয়েছে আলোর অনতিক্রম্য প্রচণ্ড গতিবেগ, $c = 3 \times 10^{10}$সে. মি/সেকেণ্ড, যার তুলনায় অন্যান্য সচরাচর লভ্য গতিবেগগুলি অকিঞ্চিৎকর। গতানুগতিকভাবে মিনকৌস্কি-জগৎকে চতুর্মাত্রিক ইউক্লিডীয় 'দেশ' রূপেও গণ্য করা যায় এবং বলা বাহুল্য এই কাঠামোও সরল। (1)নং সমীকরণের অনুকরণে এক্ষেত্রে পাই,

$$ds^2 = dx_1^2 + dx_2^2 + dx_3^2 + dx_4^2$$
$$= dx_1^2 + dx_2^2 + dx_3^2 - c^2dt^2$$
$$\cdots(2),\ \text{যেহেতু}\ dx^4 = c\sqrt{-1}dt$$

এই ds-কে বলা হয় ব্যবধান (Interval)। স্থির অথবা চলন্ত দ্রষ্টা নির্বিশেষে ব্যবধানে পরিমাপ হবে এক অভিন্ন অঙ্ক, অতএব চরম সত্য।

মিনকৌস্কি-জগৎটা যেন একখানা মানচিত্র। এতে ঘটনা সংঘটিত হয় না; শুধু 'আছে'। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কাল এতে একাধারে বিধৃত। এই ভুবনে জন্ম, মৃত্যু নেই, সবাই শাশ্বত, চিরন্তন। কাল প্রবাহমান, তাই এই জগতে দ্রষ্টা এবং দৃষ্ট সবাই কাল-মাত্রায় আদি, অন্তহীন যাত্রার পথিক। সবাই স্ব স্ব বর্ত্ম অনুসরণ করে চলেছে। এই বর্ত্মের নাম বিশ্ব-রেখা (World-line)। ঘটনার প্রকাশ মানে, দ্রষ্টা এবং ঘটনার বিশ্ব-রেখাদ্বয়ের অন্তচ্ছেদ। এই পরিপ্রেক্ষিতে ঘটনা সংঘটিত হয়েছে, এই কথার তাৎপর্য আর কিছু নয়, দ্রষ্টা ঘটনার ভবিষ্যতে প্রবেশ করেছেন, এই মাত্র। বিশ্ব-রেখাসমূহ যথাযথ বিন্যস্ত হলে তাদের অন্তচ্ছেদ বিন্দুগুলিই বিশ্বের সম্পূর্ণ ইতিহাস বহন করবে। তবে কার কাছে, কখন এবং কোথায় সে ইতিহাস প্রকটিত হবে, সে হলো নিছক ব্যক্তিগত এবং আপেক্ষিক ব্যাপার।

প্রত্যেক দ্রষ্টারই নিজ নিজ অভিরুচি অনুযায়ী তার কাঠামো রচনা বা সংস্থাপন করবার স্বাধীনতা

আছে। তবে কেউ-ই নিজের কাঠামোকে অপরের কাঠামোর চেয়ে অধিকতর মৌলিক অথবা নিজের নিরীক্ষণকে অপরের চেয়ে অধিকতর সত্য বলে দাবী করতে পারেন না। দ্রষ্টা স্থির থাকলে স্বভাবতঃ তার কাঠামোও স্থির থাকবে; আর চলমান হলে কাঠামো তার সঙ্গে সঙ্গেই চলবে। মাপজোখ যা, তা ঐ কাঠামোর পটভূমিতেই হবে। এই কারণে ঐ সব পরিমাপ দ্রষ্টার কাছে আপেক্ষিক হতে বাধ্য। কিন্তু কাঠামো স্থির অথবা সমবেগান্বিত (অবশ্য ঘূর্ণনহীন) যা-ই হোক না কেন, প্রতি ক্ষেত্রেই দেখা যাবে, একই প্রাকৃতিক নিয়ম কার্যকরী—এটাই হলো আইনষ্টাইনের বিশেষ আপেক্ষিকতা বাদের মূল নীতি। এই নীতির পরিপোষক যাবতীয় কাঠামোকে গ্যালিলিয়ান কাঠামো বলে। দ্রষ্টা নির্বিশেষে অনন্ত সত্য দর্শনের উপায় হলো, দেশের সঙ্গে কাল-কে এবং কালের সঙ্গে দেশ-কে অবিচ্ছিন্নভাবে পরিগ্রহণ করা। অবশ্য ব্যবহারিক জগতে সত্যান্বেষণের মূল্য বা সুবিধা কতটুকু তা স্বতন্ত্র প্রশ্ন।

চতুর্মাত্রিক কাঠামো প্রসঙ্গে গোড়াতেই একটা আপত্তি এই উঠতে পারে যে, এর প্রত্যক্ষ রূপায়ণ বা ধারণা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। আপত্তি নিরসনের জন্যে আইনষ্টাইন বলেন—এই অক্ষমতার কারণ, আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতির দৈন্য, কাঠামোর কোন মৌলিক ত্রুটি বা অসঙ্গতি নয়। আমরা নিজে ত্রিমাত্রিক জীব বলেই নিরীক্ষিত জগৎকে ত্রিমাত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে অভ্যস্ত; তার চতুর্থ মাত্রা আমাদের চেতনায় ধরা দেয় না, বিচ্ছিন্ন না হয়ে। স্যার অলিভার লজ একস্থলে বলেছেন—আমাদের যা কিছু ইন্দ্রিয়ের পরিস্ফূর্তি, তা নিছক জীবন-সংগ্রামের তাড়নাতেই, দার্শনিক চিন্তার সহায়ক হবার জন্যে নয়।

ইন্দ্রিয়ানুভূতির সীমাবদ্ধতা কি ভাবে পরিপ্রেক্ষিতকে প্রভাবিত করে, তার একটা উদাহরণ-স্বরূপ মনে করা যাক, একটা কাল্পনিক দ্বিমাত্রিক জীবাণু কোন সমতল ক্ষেত্রের উপর দ্রষ্টারূপে অবস্থিত আছে। ঐ দ্বিমাত্রিক সমতলই তার একমাত্র বিচরণ ক্ষেত্র, তার সম্পূর্ণ জগৎ। এর বাইরে অবস্থিত যে তৃতীয় মাত্রা, অর্থাৎ ঐ সমতলের উপর লম্ব যে দিক, তার সম্বন্ধে জীবাণুর কোন জ্ঞানই নেই। এমতাবস্থায় উপর থেকে কোন বস্তুর পতনের ঘটনা তার নিকট কিরূপ প্রতিভাত হবে? বলা নিষ্প্রয়োজন যে, এই পতন সম্বন্ধে সে একেবারে অজ্ঞ থাকবে এবং ঘটনাটিকে সমতলের উপর সেই বস্তুর আকস্মিক আবির্ভাব বলেই মনে হবে তার কাছে। এই দর্শন ত্রিমাত্রিক দ্রষ্টার দর্শন থেকে কত ভিন্ন!

নিরবচ্ছিন্ন দেশ-কাল-এ অবাধ পরিক্রমারত যাত্রীর ভ্রমণ-পথকে বিশ্ব-বর্ত্ম (Geodesic) বলে। দেশ-কাল-এ অবস্থিত ক-বিন্দু থেকে খ-বিন্দু অবধি প্রসারিত অসংখ্য পথের কল্পনা করা যেতে পারে। তবু একটি মাত্র পথই হবে সত্যকার পথ। গতি-বিজ্ঞানের বিধানানুসারে সেই পথই হবে বিশ্ব-বর্ত্ম, যার দৈর্ঘ্য স্থির (Stationary)। গণিতের ভাষায় বিশ্ব-বর্ত্মের সমীকরণ হবে $\delta \int ds = 0$ এবং এই ধারণার ভিত্তিতেই যাবতীয় বিশ্ব-বর্ত্মের রূপ উন্মোচিত হতে পারে।

উপরিউক্ত ভূমিকান্তে এবার মহাকর্ষ-তত্ত্বের কথা অবতারণা করা যেতে পারে। কথিত আছে, গাছ থেকে একটি আপেলের মাটিতে পড়বার সাধারণ ক্ষুদ্র একটা ঘটনাই নিউটনকে তাঁর সুবিখ্যাত মহাকর্ষবাদ প্রণয়নে প্রেরণা জুগিয়েছিল। এই তত্ত্বের বক্তব্য হলো—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতি দুটি বস্তুকণা একে অন্যকে আকর্ষণ করে। সর্বভূতে বিরাজমান এই আকর্ষণ বলের নাম মহাকর্ষ। এর পরিমাণ সংশ্লিষ্ট কণাদ্বয়ের ভর-

এর সমানুপাতিক এবং তাদের মধ্যস্থ যে দূরত্ব, তার বর্গের বিপরীত অনুপাতে বাড়ে-কমে। মহাকর্ষের এক মৌলিক এবং গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, তজ্জনিত উদ্ভূত ত্বরণ (Acceleration) আকৃষ্ট বস্তুর ভর অথবা ভৌত অবস্থার উপর বিন্দুমাত্রও নির্ভর করে না। এখানেই চৌম্বক অথবা বৈদ্যুতিক আকর্ষণের সঙ্গে মহাকর্ষের পার্থক্য। পৃথিবী নামক বস্তুপিণ্ডের আকর্ষণকে মাধ্যাকর্ষণ বা অভিকর্ষ বলে। বস্তুর ওজন মানে, তার উপর এই অভিকর্ষের একটা পরিমাপ ছাড়া অন্ত কিছু নয়।

সুপ্রাচীন কাল থেকেই জানা ছিল যে, সৌর-গ্রহগুলি সূর্যের চারদিকে নিজ নিজ কক্ষপথে ঘোরে। নিউটনের জন্মের বহু পূর্বেই জ্যোতির্বিদ্ কেপ্‌লার মহাকাশে সৌরগ্রহ-পরিক্রমার নিম্নলিখিত তিনটি নিয়মসূত্র আবিষ্কার করেছিলেন। (1) প্রত্যেক গ্রহের কক্ষপথ হচ্ছে এক উপবৃত্ত (Ellipse), যার একটি নাভিতে থাকে সূর্য। (2) ঐ নাভি (সূর্য) এবং গ্রহ-সংযোগকারী ব্যাসার্ধ-রেখা সমান সময়ে সমান ক্ষেত্রায়তন রচনা করে চলে এবং (3) গ্রহ-পরিক্রমার পর্যায়কালের বর্গাঙ্ক উক্ত উপবৃত্ত-সংশ্লিষ্ট অর্ধ-পরাক্ষের (Semi major axis) ঘনাঙ্কের সমানুপাতিক। নিউটনের মহাকর্ষ-তত্ত্ব এই নিয়মত্রয়ের সুষ্ঠু গাণিতিক ব্যাখ্যা প্রদানে সফল হয়েছিল। ফলে এই মতবাদটি পদার্থ-বিজ্ঞানী এবং জ্যোতির্বিদ্ মহলে পরম সমাদরেই সম্বর্ধিত হয়েছিল।

নিউটনের মতে, গ্রহ-পথের বক্রতার জন্যে দায়ী গ্রহের উপর সূর্যের মহাকর্ষ-বল। কেন না, গতি-বিজ্ঞানে তাঁরই প্রদত্ত প্রথম গতি-সূত্রে পাই—প্রত্যেক বস্তুই নিজ নিজ অচল কিংবা সমবেগান্বিত এবং সরল রৈখিক গতিশীল অবস্থায় অটুট থাকবে, যদি না কোন বল সে অবস্থার পরিবর্তন সাধনে তাকে বাধ্য করে। অতএব বলের সংজ্ঞা হলো—সেই প্রভাব, যা অচল বস্তুকে সচল করে অথবা সচল বস্তুর গতিতে পরিবর্তন ঘটায়। কাজেই চলন্ত বস্তু তার স্বাভাবিক সরল রৈখিক চলার পথ থেকে বিচ্যুত হলে বুঝতে হবে, এর পশ্চাতে কোন বলের ক্রিয়া রয়েছে। সৌরজগতে গ্রহগুলি আদিতে সরল রেখায় যাত্রা আরম্ভ করেছিল, কিন্তু সূর্যের কেন্দ্রাভিমুখী মহাকর্ষ-বলের টানে পড়েই এলো তাদের ক্রান্তিপথের এই বক্রতা।

বলের অনুপস্থিতিতে বস্তুর স্বকীয় অচল অথবা সমবেগান্বিত সরল রৈখিক গতিশীল অবস্থা সংরক্ষণের যে প্রবণতা, তাকে তার জাড্যধর্ম (Inertia) বলে।

প্রায় দুই শতাব্দী ধরে নিউটনের উপরিউক্ত চিন্তাধারা অবিসম্বাদী সত্য বলে পদার্থ-বিজ্ঞান ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের আসরে একচ্ছত্র আধিপত্যে অধিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু বর্তমান শতকের সূচনায় এতেও সংশয় দেখা দিল। আইনষ্টাইন হলেন সেই প্রথম ব্যক্তি, যাঁর মনে প্রশ্ন জাগলো—এক বস্তু কি অন্ত বস্তুকে সত্যই টানে? কেনই বা টানবে? এই কেন-র উত্তর মহাকর্ষ বাদের প্রবক্তা নিউটনের কোন উক্তিতে নেই। মহাকর্ষ যদি নিউটন-প্রদত্ত সংজ্ঞানুযায়ী একটা বল হয়, তা হলে ক্রমবর্ধমান বেগে মাটিতে পড়বার সময় আপেল সত্যই কোন টান অনুভব করে কিনা (যদি তার অনুভব শক্তি থাকতো) কে জানে? সন্দেহ যখন ক্রমশঃ ঘনীভূত হচ্ছিল, তখন তার নিরসনেরও একটা সুযোগ দৈবাৎ এসে গেল। কিম্বদন্তী আছে, তাঁরই চোখের সামনে একদা এক রাজমিস্ত্রি কোন বাড়ীর ছাদ থেকে হঠাৎ পড়ে যায়। অমনি আইনষ্টাইন তার কাছে ছুটে গিয়ে শুধালেন—আচ্ছা, তুমি পড়তে পড়তে নীচের দিকে কোন টান অনুভব করেছিলে কি? উত্তর—না। পুনরায় প্রশ্ন করলেন,—তোমার তা হলে, তখন কিরূপ মনে হচ্ছিল? উত্তর—আমার মনে হচ্ছিল, আমি যেন দোলনায় চড়ে আরামেই নীচে

নামছি। এই জবাবের মধ্যে আইনষ্টাইন তাঁর সন্দেহের সমর্থন খুঁজে পেলেন।

মহাকর্ষ ব্যাপারটা তাহলে আসতে কি? কেমন করেই বা উদ্ভূত? এই জিজ্ঞাসা আইনষ্টাইনের চিন্তায় অশান্ত আবেগে তোলপাড় হতে লাগলো। অবশেষে এর ব্যাখ্যায় তাঁর মানসলোকে উদ্ভাসিত হলো সেই মহাসত্য, যা সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্ব নামে পরিচিত। এই তত্ত্বে বিশেষ আপেক্ষিকতা বাদের মূল নীতিকেই সম্প্রসারিত অর্থে বলা হয়েছে—কাঠামোগুলির গতিপ্রকৃতি যা-ই হোক না কেন, তারা সকলেই প্রাকৃতিক ঘটনা প্রকাশের জন্যে সমতুল্য। আইনষ্টাইন যথাযথ দৃষ্টান্তের সাহায্যে এটাও দেখিয়ে দিলেন যে, ক্রমবর্ধিষ্ণু বেগে ধাবিত (Accelerated) কাঠামোতে মহাকর্ষ ক্ষেত্রের অনুরূপ ক্ষেত্র আবির্ভূত হয়ে থাকে, যদিও গ্যালিলিয়ান কাঠামোর পরিপ্রেক্ষিতে সেটা আদৌ সম্ভব নয়।

এই তত্ত্বের প্রয়োজনে আইনষ্টাইন বললেন, পূর্বোক্ত দেশ-কাল নামধেয় চতুর্মাত্রিক জগৎ সর্বত্র সুষম (Uniform) এবং সরল (Flat) নয়। এই জগতের জ্যামিতিক প্রকৃতি নির্দিষ্ট হবে বস্তুর দ্বারা। কেন না, তার বস্তু-সন্নিহিত অঞ্চলগুলি হবে বক্র। প্রত্যেক বস্তুকে ঘিরে সে জগতে থাকে এক কুব্জতা (Hummock)। বস্তু-সন্নিধানে জগতের যে অংশ, তাকে খাঁটি গ্যালিলিয়ান বলা চলে না এবং তার জন্যে ইউক্লিডীয় জ্যামিতির ধারাগুলি, অর্থাৎ পূর্বোক্ত (1) নং ও (2) নং সমীকরণদ্বয়ও অচল। জগতের এহেন অঞ্চলের জন্যে গাউস (Gauss)-প্রবর্তিত সাধারণ রূপ হবে :—

$$ds^2 = \Sigma g_{ik}\, dx_i\, dx_k, \cdots (3)$$

যেখানে $i = 1, 2, 3, 4$
$k = 1, 2, 3, 4$

এবং g_{ik} = এমন এক গুণাঙ্ক, যা সাধারণভাবে দেশ ও কালের উপর নির্ভরশীল এবং মহাকর্ষক্ষেত্রের পরিচায়ক প্রতিনিধিস্বরূপ। এই সমীকরণে ব্যবহৃত সাংকেতিক চিহ্ন Σ-র তাৎপর্য এই যে, i এবং k-র সর্বপ্রকার-সম্ভাব্য মান গ্রহণান্তে উৎপন্ন রাশিসমূহের যোগফল নিতে হবে। এস্থলে উল্লেখ্য, সরল কাঠামোর বেলায় সমীকরণ (3) (2)-তেই রূপান্তরিত হবে।

বস্তু থেকে বহু দূরবর্তী শূন্য অঞ্চলই শুধু সরল, গ্যালিলিয়ান হতে পারে; তখন উপরিউক্ত গুণাঙ্ক g_{ik} দেশ ও কালের উপর নির্ভর না করে ধ্রুবরাশির দ্বারাই সূচিত হবে। প্রকৃত পক্ষে আইনষ্টাইন নিজেই অবশেষে এই অভিমতও ব্যক্ত করেছেন যে—বস্তুবিহীন শূন্যাঞ্চলেও স্বল্পমাত্রায় একটা স্বাভাবিক বক্রতা থাকা অসম্ভব নয় এবং এই সর্বব্যাপী সাধারণ বিকৃতির উপরই বস্তুজনিত কুব্জতা সমারূঢ় থাকে আর বস্তু-মাত্রা যত অধিক হবে, তজ্জনিত বিকৃতিও হবে তত বেশী। অবশ্য স্থূলদৃষ্টিতে বিকৃতির পরিমাণ সাধারণতঃ এতই কম যে, ইউক্লিডীয় জগৎ থেকে সত্যকার জগতের পার্থক্য সেখানে সামান্যই।

তবু বক্র জগতের গায়ে বিশ্ব-বর্ত্ম বক্র হলে, তা হবে জ্যামিতিক কারণেই। এতে কোন অস্বাভাবিকতা নেই। সূর্যের বৃহৎ বস্তুপিণ্ডের সন্নিধানে বক্র জগতে আছে বলেই গ্রহগুলির ক্রান্তিপথও হয়েছে বক্র। আর নক্ষত্রসমূহ বহু দূরের জ্যোতিষ্ক, শূন্যাঞ্চল বিহারী; তাই তাদের বিশ্ব-বর্ত্মগুলিও (প্রায়) সরল। অতএব যাত্রাপথের বক্রতা বা সরলতা একই ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত।

নিউটন ও আইনষ্টাইনের দৃষ্টিভঙ্গী তুলনা করলে দেখা যাবে, আইনষ্টাইনের দৃষ্টিভঙ্গীই অধিকতর মৌলিকতার দাবী করে এবং তা কৃত্রিমতা-দোষ থেকেও মুক্ত। বক্র জগতের সমর্থনে আইনষ্টাইন আরও বলেন যে, এই জগতে শুধু বস্তু কেন, আলোক রশ্মিকে পর্যন্ত বস্তু-সন্নিকটে

তার স্বাভাবিক সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে বক্র বিশ্ব-বত্মেই চলতে হবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বললেন, সুদূর তারকানিঃসৃত আলোক রশ্মি সূর্যের পাশ দিয়ে পৃথিবীতে আসবার সময় তার সরল রৈখিক পথ থেকে ঈষৎ স্খলিত হয়ে পড়বে। রোমাঞ্চকর উক্তি সন্দেহ নেই, তবু এটা স্পষ্টতঃই নিরীক্ষণসাধ্য ব্যাপার।

এমন বিপ্লবাত্মক একটা মতবাদ পরীক্ষার কষ্টি-পাথরে যাচাই করবার প্রয়োজন অবশ্যই আছে। কেন না, বিজ্ঞানের আসরে এর গুরুত্ব হবে অপরিসীম। এর উপরই নির্ভর করছে আইন-ষ্টাইন পরিকল্পিত তত্ত্বের যাথার্থ্য। তখন সর্ব-গ্রাসী প্রথম ইয়োরোপীয় মহাসমরের তাণ্ডব চলেছে। তাই সেই পরীক্ষার জন্যে অনুকূল পরিস্থিতি বর্তমান ছিল না। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয়, 1919 সালে মহাসমরের অবসানে তার এক চমৎকার সুযোগ উপস্থিত হয়েছিল। সেই বছর 29শে মে, দক্ষিণ আমেরিকা এবং পশ্চিম আফ্রিকায় পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ হবার কথা। পূর্ণগ্রাসের সময় যখন অন্ধকার নেমে আসবে পৃথিবীর বুকে, তখনই সূর্যের সন্নিহিত তারকা-নিঃসৃত আলোক রশ্মির বত্মানুধাবনের প্রকৃষ্ট সময়। রয়েল সোসাইটি এবং রয়েল অ্যাষ্ট্রো-নমিক্যাল সোসাইটির উদ্যোগে দুই বৃটিশ অভি-যাত্রীদল তাঁদের নিখুঁৎ প্রস্তুতি নিয়ে জাহাজে করে যথাসময়ে রওনা হলেন। দলে ছিলেন এডিংটন, কটিংহাম, ক্রমেলিন, ডেভিডসন প্রভৃতি ইংল্যাণ্ডের সেরা জ্যোতির্বিদ্‌গণ। এক দল গেলেন ব্রেজিলের সোব্রাল নামক স্থানে এবং অন্য দল গিনি উপসাগরে অবস্থিত প্রিন্সাইপ দ্বীপে। পূর্ণগ্রাসের বহু-আকাঙ্খিত ঐতিহাসিক লগ্নটি উপস্থিত হওয়ামাত্রই তাঁদের ক্যামেরা ক্লিক্, ক্লিক্ করে উঠলো। তাঁরা সূর্যের আশেপাশে পরিচিত সাতটি তারকার পর পর অনেক ছবিই ক্যামেরার পটে বন্দী করে ফেললেন। ফটোগুলি পরিস্ফুটনের পর মাপজোখ করে দেখা গেল, সত্য সত্যই ঐ তারকাগুলির পরিজ্ঞাত অবস্থানের স্বল্প পরিবর্তন ঘটেছে এবং তার মাত্রাও আইনষ্টাইনের গণনার খুব কাছাকাছি।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, মহাকর্ষ যদি নিউটনের ধারণানুযায়ী বল-ই হয়, তাহলে আলোক-তরঙ্গের গতিপথের উপর তার কোন প্রভাব মোটেই সম্ভব নয়। তবে যদি আলোর স্বীকৃত তরঙ্গ-রূপ মিথ্যা হয় এবং (নিউটনের) কণিকাবাদ অনুযায়ী আলো ভরসম্পন্ন কণিকাসমষ্টির প্রবাহ হয়, তাহলে সূর্যের আকর্ষণ ক্ষেত্রে পড়ে তার গতিপথের কিঞ্চিৎ বিচ্যুতি (বক্রতা) সম্ভব হলেও পরিমাণের দিক দিয়ে তা হবে আইনষ্টাইন-বর্ণিত পরিমাণের অর্ধেক মাত্র। তুলনার জন্যে বিচ্যুতির তাত্ত্বিক ও নিরীক্ষিত হিসাবগুলি যথাক্রমে নিয়ে প্রদত্ত হলো :—

তাত্ত্বিক		নিরীক্ষিত
মহাকর্ষবাদ { আলোর তরঙ্গ-রূপ	—0″·0	সোব্রাল অভিযান— 1″·98 ± 0″·12
মহাকর্ষবাদ { আলোর কণিকা-রূপ	—0″·88	প্রিন্সাইপ অভিযান—1″·61 ± 0″·30
সাধারণ আপেক্ষিকতা বাদ	—1″·75	

এভাবে বাস্তব পরীক্ষায় প্রথমতঃ 1919 সালে এবং পরে পুনর্বার 1923 সালে আইনষ্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্ব সংশয়াতীতরূপে সমর্থিত হলো এবং তৎসঙ্গে এটাও প্রমাণিত হলো যে, মহাকর্ষকে বল মনে করা অনাবশ্যক। বিশ্বের জ্যামিতিক গঠন-সম্পর্কীয় ভ্রান্ত ধারণা থেকেই

এই বলের ধারণার উৎপত্তি। আইনষ্টাইন দেখিয়ে দিলেন যে, নিউটনীয় পদ্ধতিতে জগৎকে ইউক্লিডীয় এবং মহাকর্ষকে বল ধরে গণনায় কেপ্‌লার-সূত্রের যে সিদ্ধান্ত আসে, অবিকল সেই একই সিদ্ধান্তে আসা যায়, ঐ বলকে অস্বীকার করেও কেবলমাত্র মহাকর্ষ-ক্ষেত্ররূপ বক্র বিশ্বের অনুধ্যান থেকেই। বল এক্ষেত্রে বহিরাগত বাহুল্য মাত্র। অধিকন্তু, নয়া পরিকল্পনার মস্ত বড় একটা সুবিধা এই যে, এতে তথাকথিত মহাকর্ষ-বলকে যথাস্থানে প্রেরণের জন্যে ঈথার জাতীয় কোন কাল্পনিক মাধ্যমের আমন্ত্রণ কিংবা 'স্থানান্তরে প্রতিক্রিয়ার সরাসরি আবির্ভাব (Direct action at a distance) অপরিহার্যতা—এরূপ সঙ্কট এড়ানো চলে।

সাধারণ আপেক্ষিকতা বাদের সমর্থনে 1924 সালে অ্যাডাম্‌স্‌ কর্তৃক নিরীক্ষিত অতিকায় নক্ষত্রনিঃসৃত বর্ণালীর উপলোহিত পরিসরণকেও (Redshift) সাক্ষ্যরূপে উপস্থিত করা যায়। এই পরিসরণের হেতু এই যে, সংশ্লিষ্ট আলোক রশ্মিকে উৎস-নক্ষত্রেরই মহাকর্ষ-ক্ষেত্র ভেদ করে আসতে হয় বলে তার শক্তির কিছু অপচয় ঘটে এবং ফলে ফটোন-কম্পাঙ্ক হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। এই ব্যাখ্যা বিতর্কাতীত হলে উক্ত পরিসরণের মাপজোখ থেকে সেই নক্ষত্রের বস্তুমাত্রা সম্পর্কেও জ্ঞান জন্মাতে পারে। নিম্নলিখিত তৃতীয় সাক্ষ্যটি আরো জোরালো। লেভেরিয়ার নামক জ্যোতির্বিদ্‌ লক্ষ্য করেছিলেন যে, সূর্যের নিকটতম গ্রহ বুধের ক্রান্তি-পথ মহাকাশে একেবারে স্থির নয়। তার অনুসূর বিন্দুটি (Perihelion) অতি মন্থর গতিতে—প্রতি শতাব্দীতে প্রায় 43″ হারে অগ্রসর হচ্ছে। নিউটনীয় তত্ত্ব এই সমস্যা সমাধানের জন্যে পর্যাপ্ত নয়। একমাত্র সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্বই এর সদুত্তর দিতে পারে।

অতএব দেখা যাচ্ছে, যে জগৎ যথার্থতঃ চতুর্মাত্রিক এবং বক্র, তাকে আপন খেয়ালখুসী-মত বা অজ্ঞতাবশতঃ ত্রিমাত্রিক ও সরল ধরে নিয়ে তদুপরি ইউক্লিডীয় জ্যামিতির ধারাগুলি অবাধে প্রয়োগ করে চললে সে ভ্রান্ত পরিপ্রেক্ষিতে সিদ্ধান্তনিচয় নির্ভুল হতে পারে না। বিশ্ব-কাঠামোর প্রকৃত জ্যামিতি এবং আরোপিত মন-গড়া জ্যামিতির মধ্যে আছে যে ফারাক বা গরমিল, তাই তথাকথিত বল-রূপে এসে উপস্থিত হয় দ্রষ্টার নিকটে। অধ্যাপক এডিংটন এক স্থলে বলেছেন—বিদ্যালয়ে ইউক্লিডীয় জ্যামিতি শেখার প্রচলন বলেই কি বিশ্বজ্যামিতিকেও ইউক্লিডীয়ই হতে হবে?

সুতরাং বলতে হয়, গ্রহ-পথের বক্রতা কোন বলসঞ্জাত নয়। মহাকর্ষ আদতে অবিচ্ছিন্ন দেশ-কাল-এর গঠনের প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত। এটি তার (দেশ-কাল-এর) অন্তরের ব্যঞ্জনা। এক-তারার অন্তরে যেমন তার নিজস্ব সুরটি প্রচ্ছন্ন থাকে এবং টঙ্কার মাত্রই স্পন্দনের মাধ্যমে ফুটে বেরোয়, মহাকর্ষও তেমনি চতুর্মাত্রিক বিশ্ব-দেহে ওতপ্রোতভাবেই মিশে আছে। বস্তুর উপস্থিতিতে সে দেহে বিকৃতির মাধ্যমে হয় তার প্রকাশ। মহাকর্ষ নিয়মসূত্রে শৃঙ্খলিত, সুতরাং দেশ-কালরূপ বিশ্বের জ্যামিতিও বিশিষ্ট ধরণেরই হতে বাধ্য। সাধারণ আপেক্ষিকতা বাদের শিক্ষা এই যে, বিশ্ব-বর্ত্মকে সরল জগতের গায়ে বক্ররেখা মনে না করে, বক্র জগতের গায়ে সরল রেখারূপে জ্ঞান করাই বিধেয়।

নতুন দৃষ্টিভঙ্গীতে জাড্যনীতির বয়ানেও কিঞ্চিৎ অদলবদল প্রয়োজন। সংশোধিত বক্তব্য হলো—অচল বস্তু অচল থাকবে এবং সচল বস্তু বিশ্ব বর্ত্মেই চলবে ক্রমাগত। জড়তা বস্তুর অপরিহার্য ধর্ম বিধায় কখনো কখনো বস্তু ও জড়তাকে সমার্থবোধক বলেও ধরা যায়। বস্তু বা তার জড়তার কারণেই বিশ্ব-বক্রতার উৎপত্তি আর মহাকর্ষ রূপেই তার অভিব্যক্তি। অতএব বলা যায়, জড়তা ও মহাকর্ষ এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ।

তাদের ভৌত নিয়মাবলীও অভিন্ন। বল-বিজ্ঞানের কোন কোন ব্যাপারে মহাকর্ষকে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হলেও বস্তু বা জড়তার উপস্থিতি সর্বত্রই আবশ্যিক। তাই অন্ততঃ গৌণভাবেও আইনষ্টাইনের মহাকর্ষ-সূত্রই বল-বিজ্ঞানের প্রাণকেন্দ্র।

মহাকর্ষকে বিশ্ব-বক্রতারই একটা লক্ষণ বলে গণ্য করা উচিত। আর বস্তুকে মহাকর্ষ ক্ষেত্রে বিকৃতি সৃষ্টিকারীরূপে না দেখে বিকৃতিটাকেই বস্তু জ্ঞান করা আপেক্ষিকতা বাদের নীতি। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বস্তু কোন কারণ নয়, একটা উপসর্গ মাত্র। বিশ্বের জ্যামিতিক গঠন-প্রণালীর গুরুত্বই সমধিক। বস্তু গৌণ এবং স্বতন্ত্রভাবে তার কোন অর্থও হয় না। এই কথার তাৎপর্য এই যে, দেশ-কাল-এর জ্যামিতিই মহাকর্ষ ক্ষেত্র রচনা করে এবং ঐ ক্ষেত্র থেকে পৃথক সত্তা হিসাবে বস্তুকে চিন্তা করা যুক্তিযুক্ত নয়। মহাকর্ষ ক্ষেত্রের অনুপস্থিতিতে ($g_{ik}=0$) দেশ-কাল-এর কোন বাস্তব অস্তিত্বই থাকে না। দার্শনিক দে কার্তের চিন্তাধারার সঙ্গে এই উক্তির বেশ মিল দেখা যায়। কেন না, তাঁর ভাবনাতে দেশ ব্যাপ্তি (Extension) ছাড়া কিছু নয় এবং ব্যাপ্তি বস্তুরই বৈশিষ্ট্য। অতএব বস্তু ছাড়া দেশ হয় না; অর্থাৎ শূন্য দেশ অবাস্তব, অলীক কল্পনা। আইনষ্টাইন আরো বলেন—মহাকর্ষ-নিয়মই বিশ্বের মোট বস্তুমাত্রা নিয়ন্ত্রিত করবে। যদি তা-ই হয়, তবে নৈসর্গিক সংবিধানে নিশ্চয়ই এমন একটা সুসঙ্গত ব্যবস্থা থাকা উচিত, যাতে হয়, মহাকর্ষই বস্তু সৃষ্টি করবে, নচেৎ বিশ্বের সমুদয় বস্তু একজোট হয়ে মহাকর্ষের নিয়মাবলী নির্দিষ্ট করবে।

বস্তুর পটভূমিতে বিশ্বের রূপ-রহস্য উদ্‌ঘাটিত হতে পারে না। যেহেতু পরিচিত বস্তুমাত্রই অত্যন্ত জটিল ধরণের সত্তা এবং তার আসল চেহারাও দ্রষ্টার নেপথ্যে বা অগোচরে থেকে যায়। প্রকৃতির লীলাভূমি বস্তু বা বিদ্যুৎ নয়, সেটা মুখ্যতঃ জগতের যে শূন্যাঞ্চলে বস্তু বা বিদ্যুৎ অবস্থিত, সেখানেই নিবদ্ধ। এমতাবস্থায় বিশ্বতত্ত্বের চরম, গভীরতম আখ্যানও দুর্বোধ্য এবং ভাষায় প্রকাশের পক্ষে দুরূহ হতে বাধ্য।

বিশ্ব-বক্রতা সম্বন্ধে আবার দুটি সমান্তরাল চিন্তাধারা বর্তমান। একটির প্রবক্তা হলেন স্বয়ং আইনষ্টাইন এবং অন্যটির ওলন্দাজ জ্যোতির্বিদ্ দ্য সীটার (De Sitter)।

আইনষ্টাইনের মতে, দেশ-কাল-এর শুধু দেশটাই বক্র (গোলাকার), কিন্তু কাল-মাত্রা সরল। অতএব আইনষ্টাইন-বিশ্ব এক চতুর্মাত্রিক স্তম্ভ (Cylinder)-স্বরূপ। এতে কাল-এর আদি, অন্ত কল্পনাতীত। পক্ষান্তরে দেশ বা ব্রহ্মাণ্ডের বিস্তৃতি অনন্ত নয় এবং মজার কথা এই যে, তার কোন কেন্দ্রবিন্দু নেই। ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক বিন্দুর সঙ্গে অবশিষ্টাংশের একই সম্বন্ধ। তার কোন প্রান্ত বা সীমারেখাও নেই। সুতরাং তার পরপারে কি আছে?—এরূপ প্রশ্ন অবান্তর। ব্রহ্মাণ্ড প্রান্তহীন অথচ সসীম, এই স্ববিরোধী উক্তি হেঁয়ালীর মত শোনালেও এতে অসঙ্গতি কিছু নেই। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, ফুটবলের দ্বিমাত্রিক, গোলাকার পৃষ্ঠদেশও তো সসীম, তবু সেই পৃষ্ঠতলের কোন প্রান্ত অথবা কেন্দ্রবিন্দু আছে কি? আইনষ্টাইনের গণনায় ব্রহ্মাণ্ডের বস্তুমাত্রা তার সর্বাধিক দূরত্বের সঙ্গে সমানুপাতিক। পর্যবেক্ষণে যতদূর জানা গেছে, ঐ দূরত্ব 10^{18} কিলোমিটারের কম নয়। এতে ব্রহ্মাণ্ডের তাবৎ বস্তুমাত্রা হয় এক ট্রিলিয়ন (10^{18}) সূর্যের সমান, যা জ্যোতির্বিদ্‌দের অনুমিত পরিমাণ থেকে অনেক বেশী। প্রাকৃতিক নিয়মে বিশ্বের কিছু পদার্থ নিত্য লয় হয়ে শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে; তাই বিশ্বের সর্বাধিক দূরত্বও ক্রমশঃ কমে আসছে এবং ফলে আইনষ্টাইন-কল্পিত বিশ্ব ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হচ্ছে।

দার্শনিক মাক্ (Mach) বলেন, দেশ-কাল-এর বিস্তার নির্ভর করবে ব্রহ্মাণ্ডের বস্তুসমষ্টির উপর,

অতএব মহাকর্ষ-নিয়মের উপরও বটে। যদি কখনো ঐ বস্তুসমষ্টি বর্ধিত হয়, তা হলে তাকে ধারণ করবার জন্যে ব্রহ্মাণ্ডের অতিরিক্ত দেহ-পরিসরও সৃষ্টি হবে। বস্তু না থাকলে ব্রহ্মাণ্ডও টিকতে পারতো না এবং তৎসঙ্গে মহাকর্ষ ও যাবতীয় বস্তু-আশ্রিত ঘটনার সম্ভাব্যতা লুপ্ত হতো। অতএব এখানে দেখতে পাই, আইনষ্টাইন ও মাক্ উভয়ের ভৌত দর্শনই মূলতঃ অভিন্ন। ইতিপূর্বে দেশ-কাল মানচিত্রে বস্তু অবিনশ্বর বলে বর্ণিত হয়েছে, কাজেই সেখানে ব্রহ্মাণ্ডকেও শাশ্বত বলে স্বীকার করতে হয়।

ড সীটার-কল্পিত বিশ্বের বেলায় কিন্তু দেশ ও কালমাত্রা উভয়েই বক্র, গোলাকার। সুতরাং তার চেহারা হবে অতি-বর্তুলাকৃতি (Hyper-sphere like)। এহেন বিশ্বের প্রধান ধর্ম হলো—মূল বিন্দুতে (Origin) অবস্থিত না থাকলে বস্তু-নিচয় স্বতঃবিকৃষ্ট হয়ে ক্রমাগত দূর হতে দূরান্তরে বিক্ষিপ্ত হতে থাকবে, যদি না পারস্পরিক আকর্ষণ সেগুলিকে একত্রে ধরে রাখে। ফলে এই জগতের পরিধিতেই মাত্র বলয়ের মত বস্তুর অবস্থান সম্ভব, তার অভ্যন্তরে নয়। সচরাচর একে শূন্য-জগৎ বলা হয়। এই জগৎও সসীম। তবে স্বতঃস্ফূর্ত বিকর্ষণের জন্যে বুদ্বুদের মত ক্রমশঃ বিস্ফারিত হচ্ছে। ডপ্‌লার প্রক্রিয়া-ভিত্তিক নক্ষত্র-বর্ণালীর নিরীক্ষিত উপলোহিত পরিসরণ এই সম্প্রসারণের সমর্থনে একটি অকাট্য প্রমাণ। সম্প্রসারণশীল বিশ্বের স্বপক্ষে রাশিয়ান গণিত-বিশারদ ফ্রীড্‌মানও (Friedman) আর একটি তত্ত্ব উপস্থিত করেছেন। ড সীটার-বিশ্বের কাল-মাত্রা আবদ্ধ বৃত্ত হওয়াতে কোথায় কালের আরম্ভ ও শেষ—জানবার উপায় নেই। কাল-প্রবাহে যাত্রা-বিন্দুতে বার বার প্রত্যাবর্তন, অর্থাৎ ঘটনার পুনরাবৃত্তি সম্ভব। কাল-এর আচরণও অদ্ভুত। যেমন, ঘটনাস্থল দ্রষ্টার দিগন্ত-রেখায় যত নিকট-বর্তী হবে, কালের গতি হবে ততই মন্থর এবং পরিশেষে দিগন্তে এলে কাল-প্রবাহ একেবারে থেমে যাবে, যেন সে ঘটনার কোন সমাপ্তি নেই।

আইনষ্টাইন-কল্পিত বিশ্ব অতিমাত্রায় বস্তুতে ভরপুর, আর ড সীটার-কল্পিত বিশ্ব প্রায় শূন্যগর্ভ। প্রথমটি সঙ্কোচনশীল, দ্বিতীয়টি সম্প্রসারণশীল। এমতাবস্থায়, বিশ্বের প্রকৃত রূপটা কি? অনেকের ধারণা, বিশ্ব দোদুল্যমান অর্থাৎ পর্যায়ক্রমে সঙ্কোচন ও সম্প্রসারণশীল।

একথা অনস্বীকার্য যে, বিশ্বের চতুর্মাত্রিক রূপ, ততোধিক তার বক্রতা সাধারণ সহজ কল্পনায় ধরা দেয় না এবং পরিশেষে গণিতের ক্রূর আবর্তে নিজেকে হারিয়ে ফেলে। এর জ্যামিতিক সমস্যা-গুলি স্বভাবতঃই দুর্দান্ত জটিল; কিন্তু তা বলে সমাধানে উর্ধ্বে নয়। সৌভাগ্যের বিষয়—গাউস, রীমান ও খৃষ্টফেল প্রমুখ গণিত-পারঙ্গমেরা অসাধারণ কৃতিত্বের সঙ্গেই সেগুলির মোকাবেলা করেছেন।

আইনষ্টাইনের মতে, মহাকর্ষ ছাড়াও বলশাস্ত্রে ব্যবহৃত অন্যান্য অনেক অভিধা, যথা—ভর, শক্তি, ভর-বেগ, টান, চাপ প্রভৃতি দেশ-কাল-এর বক্রতা সম্ভূত বিশেষ বিশেষ উপসর্গ, অথবা বক্রতাদ্যোতক বিশেষ বিশেষ গণনাঙ্ক ছাড়া অন্য কিছু নয়। সুতরাং এগুলি মহাকর্ষ ক্ষেত্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবেই জড়িত। ভর-সংরক্ষণ ও ভর-বেগ সংরক্ষণ নামক নিউটনীয় বল-বিজ্ঞানের দুই প্রধান নীতি আইনষ্টাইনের মহাকর্ষ-নিয়ম থেকে স্বভাবতঃই এসে পড়ে। তবে এই সংরক্ষণকে চতুর্মাত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে হবে। সুতরাং তা হবে আরো ব্যাপক। ব্যাপক অর্থে, শক্তি-সংরক্ষণ নীতি ও ভর-সংরক্ষণ নীতির অঙ্গীভূত থেকে বিশ্ব-বক্রতার মধ্যেই অভিব্যক্ত রয়েছে। আপেক্ষিতা বাদে অবশ্য তথাকথিত স্থিতি শক্তির (Potential energy) কোন স্বাভাবিক স্থান নেই।

আদ্যোপান্ত বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে যে, গোটা বলশাস্ত্রটাই, অন্ততঃ তার একটা বৃহদংশ, বিশ্ব-

জ্যামিতির মধ্যে অন্তর্লীন হয়ে আছে। পদার্থবিদ্যার ক্ষেত্রে আজ আমরা এক বৈপ্লবিক পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছি। নবতর আলোকে এটাই প্রতিভাত হচ্ছে যে, ঐ বিজ্ঞানের অনেক তথ্য, সূত্র এবং নীতি প্রকারান্তরে আমাদের চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত বিশ্বের গঠন-চিত্রই বহন করে আনছে। অবস্থার চাপে পদার্থবিদ্যাকে আপেক্ষিকতা বাদের ছাঁচে ঢালাই করে নতুনভাবে গড়ে তোলবার একান্ত আবশ্যকতা দেখা দিয়েছে। এটা উপলব্ধি করে বিজ্ঞানীরাও ত্বরিত গতিতে এই ব্যাপারে এগিয়ে চলেছেন। আইনষ্টাইনের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, মহাকর্ষের মতই ইলেকট্রন ও প্রোটোনের আবির্ভাব এবং বিদ্যুৎ-চৌম্বক ক্ষেত্র-রহস্যও বিশ্ব-জ্যামিতির মধ্যেই নিহিত, যদিও তাত্ত্বিক পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বিশ্ব-বক্রতার ব্যাপারে বিদ্যুৎ-চৌম্বক ক্ষেত্রের কোন অবদান নেই। সে যাই হোক, মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, পদার্থবিদ্যা তার স্বাধীন, স্বতন্ত্র সত্তা হারিয়ে ক্রমশঃ বিশ্ব-জ্যামিতির সঙ্গে একাত্ম হতে চলেছে। এটা অগৌরবের নয়—কেন না, যতই এই জ্যামিতির স্বরূপ অবারিত হতে থাকবে, ততই পদার্থবিদ্যার আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য বিশ্ব-ছবিও স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে আমাদের মানসপটে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে।

অধ্যাপক পুলিনবিহারী সরকার

রমাপ্রসাদ সরকার*

14ই জুলাই (1971) অধ্যাপক পুলিনবিহারী সরকার পরলোকগমন করেছেন। ডক্টর পুলিনবিহারী সরকার রসায়নক্ষেত্রে একটি স্মরণীয় নাম।

কয়েক বছর আগের কথা। সত্তর বছরের বৃদ্ধ অধ্যাপক সরকার একদিন এক কিলো গম নিয়ে বিজ্ঞান কলেজের লেবরেটরীতে এলেন ছাত্রদের অবাক করে দিয়ে। স্ক্যাণ্ডিয়ামের একটি ভাল বিকারক (Reagent) হচ্ছে ফাইটিক অ্যাসিড। গমের মধ্যে সেই ফাইটিক অ্যাসিডের অস্তিত্ব থেকে অধ্যাপকের ধারণা হয় গমের মধ্যে স্ক্যাণ্ডিয়াম থাকলেও থাকতে পারে। ছাত্রদের উপর নির্দেশ পড়লো গম-বিশ্লেষণের। ছাত্রেরা কিন্তু হচ্ছে-হবে করে বেশ কিছু দিন ব্যাপারটা এড়িয়ে গেলেন। একদিন সকাল দশটায় কলেজে এসে তাঁরা সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলেন, বৃদ্ধ অধ্যাপক নিজেই গম নিয়ে উঠেপড়ে লেগেছেন। ছাত্রেরা লজ্জিত হলেন। বেশ কিছুদিন পণ্ডশ্রম করে শেষ পর্যন্ত স্ক্যাণ্ডিয়াম আর পাওয়া গেল না। কিন্তু একটুও বিচলিত না হয়ে অধ্যাপক সহাস্যে বলে উঠলেন—আরে কেমিষ্ট্রিতে অমন হয়েই থাকে।

সত্তর বছর বয়স পর্যন্ত জীইয়ে রাখা এই উৎসাহ-উদ্দীপনার সূচনা কিন্তু অনেক আগে থেকেই। বস্তুতঃ অজৈব রসায়নের জটিল প্রকৃতিকে করায়ত্ত করবার ক্ষমতা অধ্যাপক সরকারের যেন সহজাত ছিল। তাঁর রাসায়নিক-জীবনের প্রথম পর্যায়ে যখন তিনি ফ্রান্সে অধ্যাপক য়ুরবাঁর (Urbain) কাছে গবেষণা করতে যান, তখন য়ুরবাঁ তাঁর হাতে কোন ছকবাঁধা কাজ তুলে দেন নি, তুলে দিয়েছিলেন একখণ্ড খনিজ—থরতাইটাইট।

*রসায়ন বিভাগ, নিউ আলিপুর কলেজ, কলিকাতা-27

স্ক্যানডিয়ামের এই আকরিক থেকে বিশুদ্ধতম স্ক্যাণ্ডিয়াম আহরণ করে তারপর অধ্যাপক সরকারকে নিজের গবেষণা করতে হয়েছিল। শুধু তাই নয়, গবেষণার শেষে তাঁর তৈরি যৌগ পদার্থগুলি থেকে বিভিন্ন উপাদান-ধাতু, প্রধানতঃ স্ক্যাণ্ডিয়াম ও গ্যাডোলিনিয়াম তিনি প্রায় পুরামাত্রায়ই

অধ্যাপক পুলিনবিহারী সরকার

পুনরুদ্ধার করেছিলেন। তরুণ গবেষকের এই নিষ্ঠা এবং দক্ষতায় অধ্যাপক য়ুরবাঁ সেদিন বিস্মিত না হয়ে পারেন নি।

অথচ ভাবলে অবাক হতে হয়, পরবর্তী কালে ভারতবর্ষে বিশ্লেষণী অজৈব রসায়নের (Analytical Inorganic Chemistry) গোড়াপত্তনকারী অধ্যাপক সরকারের রসায়নবিদ্ হওয়াটাই একটা অনিশ্চয়তার মধ্যে অঙ্কুরিত হয়েছে। বামাপুকুরের মামাবাড়ীতে 1894 সালে তাঁর জন্ম হয়েছিল। ঠাকুর্দা ৺যাদবচন্দ্র সরকার ছিলেন সোনারপুর-যাদবপুর অঞ্চলের প্রচুর ভূ-সম্পত্তির মালিক। অধ্যাপক সরকারের বাবা ৺বসন্তকুমার সরকার অবশ্য তমলুকে গিয়ে বসবাস সুরু করেন। সেখানে তিনি ছিলেন একজন প্রথিতযশা আইনজীবী। ছেলে পুলিনবিহারীও একজন বড় আইন-বিশারদ হবে, এই ছিল বাবার ইচ্ছা। পুলিনবিহারীর মা কিন্তু এর ঘোর বিপক্ষে ছিলেন। ছেলের অধ্যয়নশীল নিবিষ্টচিত্ত প্রকৃতির স্বরূপ উপলব্ধি করে তিনি বুঝেছিলেন, অর্থাগমের চেয়ে বিদ্যার্জনেই এই ছেলে বড় হতে পারবে। অধ্যাপক সরকারের পরবর্তী জীবনে তাঁর মায়ের এই ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হয়ে উঠেছিল।

বিজ্ঞানব্রতে উদ্বুদ্ধ করতে অধ্যাপক সরকারের ছাত্র-জীবনের পরিবেশের অবদানও বড় কম নয়। আচার্য জগদীশচন্দ্র-প্রফুল্লচন্দ্রের আদর্শে অনুপ্রাণিত তাঁর অপরাপর সহপাঠীরাও পরবর্তী জীবনে বিজ্ঞানের সেবায় আত্মনিয়োগ করে গেছেন—মেঘনাদ সাহা, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, সত্যেন্দ্রনাথ বসু—এঁরা সবাই ছিলেন তাঁর সমসাময়িক। কৃতিত্বের সঙ্গে এম. এস-সি. পাশ করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়নের অধ্যাপক হিসাবে যোগ দেবার কিছুদিন পরেই তিনি সহকর্মী হিসাবে পেয়েছিলেন আর একজন নিবেদিতপ্রাণ রসায়নবিদ্‌কে—অধ্যাপক প্রিয়দারঞ্জন রায়। 1916 সালে সেই যে তিনি বিজ্ঞান কলেজের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন, জীবনের শেষ পর্যন্ত তার কোন ব্যতিক্রম ঘটে নি। 1925 থেকে 1928, এই তিন বছর ফ্রান্সে কাটানো ছাড়া 1969 সাল পর্যন্ত বিজ্ঞান কলেজই ছিল তাঁর সাধনক্ষেত্র। 1960 সালে বিভাগীয় প্রধান হিসাবে চাকুরী থেকে অবসর নেবার পরেও 1969 পর্যন্ত তিনি সক্রিয়ভাবে গবেষণা পরিচালনা করেছেন। তার পরেও ছিয়াত্তর বছর বয়স পর্যন্ত বহু বার এই বৃদ্ধ অধ্যাপককে বিজ্ঞান কলেজে দেখা গেছে, রসায়ন-

চর্চায় অদম্য উৎসাহ তাঁর বয়সকে হার মানিয়েছিল।

অধ্যাপক সরকার নিজে ছিলেন নিষ্ঠাবান রাসায়নিক, রসায়ন ছিল তাঁর ধ্যান-জ্ঞান। অন্যেরাও রসায়নকে তাঁদের জীবনে নিষ্ঠার সঙ্গে গ্রহণ করবে, এই ছিল তাঁর একান্ত কাম্য। আপাত জ্ঞানান্বেষী হাল্কা স্তরের ছাত্রেরা যাতে রসায়নের দরবারে এসে ভীড় করবার সুযোগ না পায়, সেদিকে ছিল তাঁর সতর্ক দৃষ্টি। এতে অনেক সময়ই তাঁকে সকলের অপ্রিয় হতে হয়েছে, কিন্তু রসায়নের সরস্বতী তাতে খুশীই হয়েছেন। আজ ফার্স্ট ক্লাশ আর ডি-ফিল-এর ছড়াছড়ি সত্ত্বেও সারা দেশে রসায়ন বিদ্যার পঠন-পাঠনের সামগ্রিক মান ও তার ভবিষ্যৎ পর্যালোচনা করলে অধ্যাপক সরকারের অভাব বড় বেশী প্রকট হয়ে ওঠে।

আপাতকঠিন তীক্ষ্ণদৃষ্টি অধ্যাপকের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের আতঙ্ক কাটিয়ে যাঁরা তাঁর নিকটে আসতে পেরেছেন, তাঁদের কাছে কিন্তু অধ্যাপক সরকারের ছাত্রবৎসল মধুর রূপটি অচিরেই ফুটে উঠেছে। যে কোন বিষয়েই হোক, লাইব্রেরীতে গিয়ে হাতড়ানোর আগে ছাত্রেরা প্রথম তাঁর কাছেই যেত যে কোন হদিশ নেবার জন্যে। বিপুল উৎসাহে অধ্যাপক তাঁদের সাহায্য করতেন। কখনো বা নিজেই ছুটে যেতেন লাইব্রেরীতে, সিঁড়ি বেয়ে আলমারীতে উঠে নিজের হাতে বই নামিয়ে পড়তে বসে যেতেন—প্রয়োজন হলে জার্মান বা ফরাসী ভাষা থেকেও তর্জমা করে দিতেন। এমন অনেক দিন গেছে—সন্ধ্যার পরে লেবরেটরী থেকে বেরিয়ে ছাত্রদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে শেয়ালদা পর্যন্ত পৌঁছে সেখানেই দাঁড়িয়ে পড়েছেন। রাত ন'টা বাজে, দশটা বাজে, ছাত্রেরা উসখুস করছে—অথচ অধ্যাপকের কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। ছাত্রদের সঙ্গে কথা বলবার এই নেশা তাঁর এমনই প্রবল ছিল যে, অধ্যাপনা থেকে অবসর নেবার পরেও প্রতি বছর সেসনের সুরুতে তিনি একবার করে এম. এস-সি. ক্লাশের ছাত্রদের সঙ্গে আলাপ করতে আসতেন, বুঝতে চাইতেন তাঁদের সুখ-দুঃখের কথা। তমলুকে নিজের গ্রামের কলেজেও তিনি বহু দিন ছাত্রদের পড়ানোর দায়িত্ব কাঁধে নিয়েছেন, কিম্বা রাস্তার ধারে পানওয়ালাকে চুন-খয়েরের রহস্য বোঝাতে চেয়েছেন, সেও ঐ একই নেশায়।

এই নেশার বৈচিত্র্য উপলব্ধি করাও বড় সহজ কর্ম নয়। যেখানে যা পাওয়া গেছে অবিশ্লেষিত অবস্থায়, তাকেই তিনি বিশ্লেষণ করেছেন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে, তার উপাদানগুলির সঠিক মাত্রা নিরূপণ করেছেন সন্দেহাতীতভাবে। আর এই ব্যাপারে তাঁর কোন বাছবিচারের বালাই ছিল না। কোন এক ডাক্তার পাঠিয়েছেন কয়েক ফোঁটা চোখের জল, কোন জীব-বিজ্ঞানী হয়তো সংগ্রহ করেছেন মাতৃদুগ্ধ। অক্লেশে তাঁদের জিনিষের বিশ্লেষণ করে দিয়েছেন অধ্যাপক সরকার। আমাদের নিত্যখাদ্য আতপ চাল, কাঁচাকলা, মুগের ডাল, পান—এমন কি, উচ্ছে-করলার উপাদানগুলিও তিনি বিশ্লেষণ করে সেগুলির মাত্রা নিরূপণ করেছেন সন্দেহাতীতভাবে। এসব তো গেল খেয়ালী বিজ্ঞানীর কথা। আমাদের দেশের খনিজ ভাণ্ডার থেকে বিভিন্ন মূল্যবান ধাতু নিষ্কাশন করে দেশকে সম্পদশালী করবার পিছনেও অধ্যাপক সরকারের ভূমিকা কম নয়।

বিভিন্ন খনিজ পদার্থ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করে অধ্যাপক সরকার অনুসন্ধান করেছেন—ইউরেনিয়াম, থোরিয়াম, জার্মেনিয়াম প্রভৃতি মূল্যবান ধাতু। এই সব খনিজের তেজস্ক্রিয়তা নির্ণয়, ভূতাত্ত্বিক বয়স নির্ধারণ, সঙ্কেত স্থিরীকরণ—এ সবই ছিল তাঁর গবেষণার অঙ্গ। বস্তুতঃ পক্ষে ভারতবর্ষে খনিজ পদার্থ সম্বন্ধে পারদর্শী রসায়নবিদ্ তখন আর কেউ ছিলেন না। CSIR-এর তদানীন্তন ডিরেক্টর শান্তিস্বরূপ ভাটনগর তাই খনিজ পদার্থের রাসায়নিক প্রকৃতি সম্বন্ধে গবেষণার জন্যে

কলকাতায় একটি জাতীয় গবেষণাগার স্থাপন করে অধ্যাপক সরকারকে তার প্রধান বিজ্ঞানী নিযুক্ত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সরকারী আনুকূল্যের দায়িত্ব ঘাড়ে নিয়ে পাছে তাঁর গবেষণা ব্যাহত হয়—এই ভেবে অধ্যাপক সরকার এতে রাজী হন নি। উল্লেখ করা যেতে পারে, এই ধরণের একটি জাতীয় গবেষণাগার আজও স্থাপিত হয় নি।

খনিজ পদার্থ ছাড়াও অধ্যাপক সরকারের গবেষণার ক্ষেত্র বিচিত্র এবং বহুমুখী। তেজস্ক্রিয়তার সংক্রমণ নিয়ে গবেষণা থেকে সুরু করে বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় প্রায় দু-শ' গবেষণা-প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। স্ক্যাণ্ডিয়াম, গ্যাডোলিনিয়াম ইত্যাদি বিরল ধাতুর বিভিন্ন যৌগ, রেনিয়াম-এর প্রকৃতি, বিভিন্ন জটিল যৌগের গঠন, অজৈব যৌগের সমধর্মী কেলাস উৎপাদন—এমন কি, কোন কোন ক্ষেত্রে জৈব যৌগের উপরও তাঁর গবেষণা বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, Analytical Chemistry-তে তাঁর অবদানের জন্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় স্বর্ণপদক লাভ করেন।

রসায়নের বাইরের কোন কিছুতে অধ্যাপক সরকারের আসক্তি ছিল খুবই কম। সব রকম আলোচনার মধ্যেই ঘুরেফিরে তিনি রসায়নে এসে পড়তেন। শুধু খেলাধূলার ব্যাপারে তাঁর কিছুটা আগ্রহ ছিল—তিনি নিজেও ছিলেন একজন ভাল খেলোয়াড়। টেনিসে সমসাময়িককালে তাঁর জুড়ি মেলা ভার ছিল। বিলাতে থাকবার সময়ও অনেক নামকরা খেলোয়াড়ের সঙ্গে তিনি খেলাধূলা করতেন বলে শোনা যায়।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে Analytical Chemistry-র একটি ভাল পঠন-পাঠন কেন্দ্র গড়ে তোলাই ছিল অধ্যাপক সরকারের সারা জীবনের স্বপ্ন। এজন্যে প্রথম থেকেই তিনি উদ্যোগী হয়ে কাজ করেছেন। বিলাতে তিন বছর থাকাকালীন নিজের স্কলারশিপ ও অন্যান্য অর্জিত অর্থ সঞ্চয় করে তিনি বহু মূল্যবান (প্রায় কুড়ি হাজার টাকা, 1929 সালে) যন্ত্রপাতি কিনে এনেছিলেন। নিজের রসায়ন-চর্চার পীঠস্থান কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কেই তিনি সেগুলি দান করে গেছেন। তাঁর দান যে যোগ্যপাত্রেই অর্পিত হয়েছে, সেটা প্রতিপন্ন করবার দায়িত্ব তাঁর উত্তরসূরীরা অবশ্যই পালন করবেন আশা করি।

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের ত্রয়োবিংশ প্রতিষ্ঠা-বার্ষিকী

গত 24শে জুলাই অপরাহ্ণে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ ভবনে 'কুমার প্রথমনাথ রায় বক্তৃতা-কক্ষে' বহু বিশিষ্ট বিজ্ঞানী, বিজ্ঞান-কর্মী ও বিজ্ঞানানুরাগী-দের উপস্থিতিতে পরিষদের ত্রয়োবিংশ প্রতিষ্ঠা-বার্ষিকী অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডক্টর সত্যেন্দ্রনাথ সেন, প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পর্ষদের প্রধান অধিকর্তা ডক্টর আত্মা রাম এবং বিশিষ্ট অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন কলিকাতাস্থ বাংলাদেশ কূট-নৈতিক মিশনের প্রধান জনাব মহম্মদ হোসেন আলী।

অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে শ্রীমঞ্জু ভট্টাচার্য কর্তৃক উদ্বোধন সঙ্গীত পরিবেশনের পর সভাপতি ও বিশিষ্ট অতিথিদের মাল্যদান করা হয়।

পরিষদের কর্মসচিব ডক্টর জয়ন্ত বসু সমবেত সুধীমণ্ডলীকে স্বাগত অভ্যর্থনা জানান এবং পরিষদের সাংবাৎসরিক কাজের বিবরণ প্রদান করেন ('কর্মসচিবের নিবেদন' দ্রষ্টব্য)।

প্রধান অতিথি ডক্টর আত্মা রাম তাঁর ভাষণে জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞান প্রচারে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, এই ধরণের প্রতিষ্ঠানকে সরকারের পক্ষ থেকে সর্বতোভাবে সাহায্য করা বাঞ্ছনীয়। এই সাহায্য পাওয়ায় তাঁদের নৈতিক অধিকার আছে। দুঃখের বিষয়, সরকারের তরফে সব সময় এই বিষয়ে যথেষ্ট সচেতনতা আছে বলে মনে হয় না। ডক্টর আত্মা রাম দ্ব্যর্থহীনভাবে মন্তব্য করেন, মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান প্রচার ছাড়া শিল্প ও প্রযুক্তিবিস্তার ক্ষেত্রে উন্নয়ন সম্ভব নয়। এই প্রসঙ্গে তিনি জাপানের কথা উল্লেখ করেন। ডক্টর আত্মা রাম বাংলাতেই তাঁর ভাষণ প্রদান করেন।

বিজ্ঞান পরিষদের সভাপতি জাতীয় অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু বক্তৃতা প্রসঙ্গে গত 23 বছর যাবৎ জনসাধারণের মধ্যে বাংলা ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান প্রচারে পরিষদের ভূমিকার বিষয় উল্লেখ করেন এবং যাঁরা পরিষদের কাজে নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন, তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। ডক্টর আত্মা রামের অভিমত সমর্থন করে তিনি বলেন, মাতৃভাষার মাধ্যমে সর্বস্তরে বিজ্ঞানের পঠন-পাঠন ও প্রচার ছাড়া দেশের সত্যকার প্রগতি কখনও সাধিত হতে পারে না। যুদ্ধোত্তর জাপান ও জার্মানীর অভূতপূর্ব উন্নতির মূলে আছে মাতৃ-ভাষার মাধ্যমে ব্যাপক বিজ্ঞান-চর্চা। পশ্চিম বঙ্গে সর্বোচ্চ স্তরেও বাংলা ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া সম্ভব। তিনি নিজে এম. এস-সি. ক্লাসে বাংলায় পড়িয়েছেন এবং তাতে কোন অসুবিধা হয় নি। আমাদের দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিজ্ঞান শিক্ষায় মাতৃভাষার প্রয়োগ কাম্য। কেন্দ্রে হিন্দী ভাষাভাষীদের প্রাধান্য থাকায় তাঁরা কখনো কখনো হিন্দীকে অত্যধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। কিন্তু সব আঞ্চলিক ভাষাকেই যথাযোগ্য মর্যাদা দেওয়া উচিত।

বাংলাদেশের মুক্তি-সংগ্রামের প্রতি সহানু-ভূতির প্রতীক হিসাবে বিজ্ঞান পরিষদের পক্ষ থেকে অধ্যাপক বসু বাংলাদেশের সাহায্যার্থে জনাব হোসেন আলীর হস্তে 500 টাকা প্রদান করেন। প্রত্যুত্তরে জনাব আলী তাঁর ভাষণে বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলন ও মুক্তি-সংগ্রামের পটভূমিকার কথা উল্লেখ করে বলেন, বাংলা-

দেশে পশ্চিম পাকিস্তানের জঙ্গী শাসকগোষ্ঠীর নৃশংস অত্যাচারের মধ্যে বিজ্ঞানের চরম অপপ্রয়োগ ঘটছে। সুতরাং এই ব্যাপারে প্রতিবাদ জানাতে বিজ্ঞানীদেরও একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। তিনি সমবেত বিজ্ঞানীদের নিকট আবেদন জানান, তাঁরা যেন বিশ্বের বিজ্ঞানী-সমাজকে এই বিষয়ে সচেতন করে তোলেন।

সভাপতি ডক্টর সেন তাঁর ভাষণে বলেন, অধ্যাপক বসুর নেতৃত্বে বিজ্ঞান পরিষদ বাংলা ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞানশিক্ষা প্রচলনের যে প্রয়াস করে এসেছেন, আজ তা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তরে গৃহীত হতে চলেছে। সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাকাডেমি কাউন্সিলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে যে, আগামী বছরে যাঁরা এম. এস-সি.

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু পরিষদের পক্ষ থেকে কলিকাতাস্থিত বাংলাদেশ কূটনৈতিক মিশনের প্রধান জনাব হোসেন আলীর হস্তে বাংলাদেশের সাহায্যার্থে সংগৃহীত অর্থ প্রদান করছেন।

ক্লাসে ভর্তি হবেন, তাঁরা বাংলা ভাষায় পরীক্ষা দিতে পারবেন। এই প্রসঙ্গে স্নাতকোত্তর শ্রেণীর উপযোগী বিজ্ঞানবিষয়ক বাংলা পাঠ্যপুস্তকের অভাবের কথা উল্লেখ করে তিনি প্রস্তাব করেন, অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপকেরা যেন তাঁদের মাতৃভাষায় নিজ নিজ বিষয়ে অন্ততঃ একখানি পাঠ্যপুস্তক রচনা করে এই অভাব দূর করতে সাহায্য করেন। এই বিষয়ে সহযোগিতার জন্যে তিনি সমবেত সুধিগণের নিকট আবেদন জানান। গোঁড়ামি ত্যাগ করে পরিভাষার সমস্যার সম্মুখীন হলে বাংলায় উচ্চস্তরের পাঠ্যপুস্তক রচনায় বিশেষ কোন অসুবিধা হবে না বলে তিনি মনে করেন।

অনুষ্ঠান শেষে বিজ্ঞান পরিষদের পক্ষ থেকে ডক্টর রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল সভাপতি, বিশিষ্ট অতিথি-বর্গ ও সমবেত সুধীমণ্ডলীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

'মহেঞ্জোদারো ও প্রাচীন আর্য সভ্যতা' শীর্ষক আলোচনা

বিজ্ঞান পরিষদের প্রতিষ্ঠা-বার্ষিকী উপলক্ষে অভেদানন্দ অ্যাকাডেমী অব কালচার-এর উদ্যোগে স্বামী শঙ্করানন্দ 31শে জুলাই পরিষদ ভবনে 'মহেঞ্জোদারো ও প্রাচীন আর্য সভ্যতা' সম্পর্কে মনোজ্ঞ আলোচনা করেন এবং এই সঙ্গে সিন্ধু সভ্যতা ও প্রাগৈতিহাসিক বৈদিক বৃহত্তর ভারত সম্পর্কে চিত্রাবলী প্রদর্শিত হয়। এই সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন জাতীয় অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু।

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের ত্রয়োবিংশ প্রতিষ্ঠা-বার্ষিকী উপলক্ষে কর্মসচিবের নিবেদন

মাননীয় সভাপতি অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়, শ্রদ্ধেয় প্রধান অতিথি ডক্টর আত্মারাম মহাশয়, মান্যবর বিশিষ্ট অতিথি জনাব হোসেন আলি, উপস্থিত সভ্যবৃন্দ ও সমবেত ভদ্রমণ্ডলী, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের ত্রয়োবিংশ প্রতিষ্ঠা-বার্ষিকী অনুষ্ঠানে পরিষদের পক্ষ থেকে আমি আপনাদের স্বাগত অভ্যর্থনা জানাচ্ছি। আজকের এই সম্মেলনে যোগদান করে আপনারা পরিষদের দেশগঠনমূলক সাংস্কৃতিক প্রয়াসের প্রতি যে শুভেচ্ছা ও সহযোগিতা প্রদর্শন করেছেন, তার জন্যে আপনাদের জানাচ্ছি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ।

এই অনুষ্ঠানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়কে সভাপতিরূপে পেয়ে আমরা বিশেষ আনন্দ ও অনুপ্রেরণা লাভ করছি। অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ সেন একদিকে যেমন একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ অর্থনীতিবিদ্, অন্যদিকে তেমনি উচ্চ শিক্ষার ধারক ও বাহক হিসাবে তাঁর নাম সুবিদিত। নিরত কর্মব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও তিনি যে আমাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে আজকের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন, এজন্যে আমরা তাঁর নিকট কৃতজ্ঞ। আমরা আশা করি, পরিষদের আদর্শের বাস্তব রূপায়ণের পরিকল্পনাকে কিভাবে অধিকতর সার্থক করে তোলা যায়, সে বিষয়ে নির্দেশ দান করে তিনি আমাদের উৎসাহিত করবেন।

এই সম্মেলনে বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পর্ষদের প্রধান অধিকর্তা ডক্টর আত্মারাম মহাশয়কে প্রধান অতিথিরূপে পেয়ে আমরা অত্যন্ত গৌরব বোধ করছি। বিশিষ্ট বিজ্ঞানসাধকরূপে ডক্টর

আত্মা রামের নাম সুপরিচিত। আবার বিজ্ঞান শিক্ষা ও সাধারণভাবে বিজ্ঞান প্রসারের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিজ্ঞান পরিষদের প্রতি তাঁর যে সহমর্মিতা রয়েছে, তা আমাদের একটি মূল্যবান পাথেয়। পরিষদের কর্ম-প্রচেষ্টাকে কিভাবে আরও ব্যাপক ও বিস্তৃত করে গড়ে তোলা যায়, সেই সম্পর্কে তাঁর সুচিন্তিত মতামত জানতে পারলে আমরা অনুগৃহীত হব।

কলিকাতাস্থিত বাংলাদেশ মিশনের প্রধান জনাব হোসেন আলিকে আমাদের বিশিষ্ট অতিথি রূপে পেয়ে আমরা অত্যন্ত গর্বিত ও উৎসাহিত বোধ করছি। বাংলা ভাষা ও বাংলা সংস্কৃতির জন্যে প্রবহমান যে আন্দোলন বর্তমানে বাংলা দেশের মুক্তি-সংগ্রামের মধ্যে প্রমত্তা পদ্মার রূপ নিয়েছে, তার প্রতিভূ হিসাবে জনাব আলিকে পরিষদের পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

আদর্শ ও উদ্দেশ্য

দেশের সামগ্রিক উন্নতির জন্যে জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞানের জ্ঞান ও ভাবধারার বিস্তার যে একান্ত আবশ্যক এবং একমাত্র মাতৃভাষার মাধ্যমেই যে তা সুষ্ঠুভাবে করা সম্ভব, এই উপলব্ধি থেকেই বহু খ্যাতনামা বিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিদ্‌দের প্রচেষ্টায় এবং অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর সভাপতিত্বে 1948 সালে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের প্রতিষ্ঠা হয়। বাংলা ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞানের প্রচার ও প্রসার সাধনই হলো বিজ্ঞান পরিষদের আদর্শ। এই আদর্শ পালনের জন্যে ঐ ভাষায় বিজ্ঞানবিষয়ক সাময়িক পত্রপত্রিকা প্রকাশ ও বৈজ্ঞানিক গ্রন্থাদি প্রণয়ন, বিজ্ঞানের গ্রন্থাগার, পাঠাগার, সংগ্রহশালা প্রভৃতি স্থাপন, বিজ্ঞান প্রদর্শনী, বিজ্ঞান-সম্মেলন এবং বিজ্ঞান-বিষয়ক বক্তৃতা ও আলোচনার ব্যবস্থা প্রভৃতি বিবিধ কর্মপন্থা নির্ধারিত করা আছে। গত 23 বছর যাবৎ পরিষদ এই কর্মপন্থা যথাসাধ্য অনুসরণ করবার কাজে ব্যাপৃত রয়েছে।

কার্য-বিবরণী

আলোচ্য বছরে (1970-71) পরিষদের আদর্শানুযায়ী বিভিন্ন কাজে আমরা কতখানি সাফল্য লাভ করেছি ও কিরূপ প্রতিবন্ধতার সম্মুখীন হয়েছি, সে বিষয়ে পরিষদের বার্ষিক কার্য-বিবরণী এখন আমি সংক্ষেপে বিবৃত করবো।

'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকা

পরিষদের প্রতিষ্ঠাকাল 1948 সাল থেকেই পরিষদের পরিচালনায় 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' নামক মাসিক পত্রিকাটি নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। 'কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর' এর একটি উল্লেখযোগ্য অংশ। বিজ্ঞানের নানাবিধ বিষয়ে প্রবন্ধ ও আলোচনা, বিজ্ঞান সংবাদ, প্রশ্নোত্তর প্রভৃতি বিভিন্ন পর্যায়ে বিজ্ঞানের তত্ত্ব ও তথ্যাদি পত্রিকা-টিতে নিয়মিত পরিবেশিত হচ্ছে। কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তরে 'পারদর্শিতার পরীক্ষা' নামে একটি নূতন বিভাগ সম্প্রতি খোলা হয়েছে। পত্রিকাটির বর্তমান প্রকাশ-সংখ্যা 2300 কপি। নিছক বিজ্ঞানের একটি মাসিক পত্রিকার পক্ষে এই প্রকাশ-সংখ্যা নেহাৎ অকিঞ্চিৎকর নয়। অধ্যাপক চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রামনের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার মার্চ '71 সংখ্যা 'রামন-স্মৃতি' সংখ্যারূপে প্রকাশিত হয়েছিল। এই সংখ্যাটিতে অধ্যাপক রামনের বহুমুখী প্রতিভার একটি সম্পূর্ণ চিত্র উপস্থাপিত হয় এবং সংখ্যাটি বিদ্বৎসমাজের বিশেষ সমাদর লাভ করে।

গত পাঁচ বছর যাবৎ 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার শারদীয় সংখ্যা বহু মূল্যবান প্রবন্ধ ও আকর্ষণীয় চিত্রের দ্বারা সুসমৃদ্ধ হয়ে নবকলেবরে প্রকাশিত হচ্ছে। এই সংখ্যার বৈশিষ্ট্য ও

উপযোগিতা লক্ষ্য করে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা বিভাগ প্রতি বছর এর 1,400 কপি ক্রয় করে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও গ্রন্থাগারে বিতরণের ব্যবস্থা করছেন। এই ব্যবস্থার জন্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা বিভাগের নিকট পরিষদ কৃতজ্ঞ; কেবল আর্থিক সাহায্যই নয়, পত্রিকাটির প্রচার ও প্রসারেও এরূপ সরকারী আনুকূল্য বিশেষ সহায়ক হয়েছে।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট থেকে পত্রিকা প্রকাশ খাতে 1948 সাল থেকে প্রতি বছর 3,600 টাকার অর্থসাহায্য পরিষদ পেয়ে আসছে। গত 23 বছরে প্রকাশনের বিভিন্ন স্তরে মূল্য বৃদ্ধির ফলে পত্রিকা প্রকাশনের ব্যয় বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে, কিন্তু আমাদের বহু আবেদন সত্ত্বেও বাৎসরিক অনুদানের পরিমাণ এযাবৎ বৃদ্ধি পায় নি। তবে আলোচ্য বছরে পশ্চিমবঙ্গ সরকার পরিষদকে পত্রিকা খাতে 5.000 টাকার এককালীন অনুদান মঞ্জুর করেছেন। এজন্যে আমরা সরকারকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পর্ষদ (C S I R) আলোচ্য বছরে পরিষদকে পত্রিকা প্রকাশনের জন্যে 5,000 টাকা অনুদান দিয়েছেন। এই সহযোগিতার জন্যে ঐ পর্ষদ পরিষদের বিশেষ ধন্যবাদার্হ। আমরা একান্তভাবে আশা করি, পত্রিকাটি গুরুত্ব উপলব্ধি করে এর নিয়মিত প্রকাশ অব্যাহত রাখবার জন্যে এবং বিশেষতঃ এর মানোন্নয়নের উদ্দেশ্যে পর্ষদ বর্তমান বছরে অনুদানের পরিমাণ বৃদ্ধি করবেন।

শিক্ষাবিষয়ক গবেষণা ও শিক্ষণের জাতীয় সংস্থা (N C E R T) এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আলোচ্য বছরে পরিষদকে যথাক্রমে 2,000 টাকা ও 500 টাকার অনুদান দিয়ে আমাদের ধন্যবাদভাজন হয়েছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর একটি অর্ধপৃষ্ঠাব্যাপী বিজ্ঞাপন পত্রিকার কয়েকটি সংখ্যায় পরিবেশিত হয়েছে। যে সকল সংস্থা পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে পরিষদের কার্যে সহযোগিতা করছেন, তাঁদের সকলকেই আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

উল্লিখিত সাহায্য সত্ত্বেও পত্রিকাটিকে আরও উন্নত করবার পথে আর্থিক অনটনই প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এজন্যে আপনাদের সকলের নিকট আমাদের আবেদন এই যে, পত্রিকার গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি, বিজ্ঞাপন সংগ্রহ, অনুদান প্রাপ্তি প্রভৃতি বিষয়ে আপনারা আমাদের যথাসাধ্য সাহায্য করুন। আপনাদের সক্রিয় সহযোগিতায় আমরা তাহলে পত্রিকাটিকে আরও শিক্ষাপ্রদ, আরও আকর্ষণীয় এবং আরও জনপ্রিয় করতে পারবো।

বিজ্ঞানবিষয়ক পুস্তক প্রকাশ

লোকরঞ্জক পুস্তক:—বিজ্ঞানবিষয়ক লোকরঞ্জক পুস্তক প্রকাশ ও সেগুলি স্বল্পমূল্যে পাঠকগণকে পরিবেশন করা পরিষদের একটি উল্লেখযোগ্য কাজ। বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের উদ্দেশ্যে এই সব পুস্তক ব্যয়ানুপাতে অতি স্বল্পমূল্যে বিক্রয় করা হয়ে থাকে। এটা সম্ভব হয় প্রধানতঃ সরকারী অর্থানুকূল্যে। পরিষদ এযাবৎ বিজ্ঞানের মোট 29 খানি পুস্তক প্রকাশ করেছে।

আমরা আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, শ্রীজিতেন্দ্রকুমার গুহ কর্তৃক রচিত ও পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত 'মহাকাশ পরিচয়' শীর্ষক পুস্তকটি বর্তমান বছরে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রবীন্দ্র পুরস্কার লাভ করেছে। এই পুস্তকটিতে জ্যোতির্বিজ্ঞান ও মহাকাশ অভিযান সম্পর্কিত বিবরণাদি লিপিবদ্ধ হয়েছে। বার্ষিক 'রাজশেখর বসু স্মৃতি' বক্তৃতায় অধ্যাপক সতীশরঞ্জন খাস্তগীর কর্তৃক প্রদত্ত 'মেঘ ও বিদ্যুৎ' বিষয়ে ভাষণটি পুস্তকাকারে প্রকাশের কাজ প্রায় সম্পূর্ণ হয়েছে। ঐ বক্তৃতামালায় অধ্যাপক মহাদেব দত্ত কর্তৃক প্রদত্ত 'যোগ সংখ্যা-

য়ন' শীর্ষক ভাষণটিও শীঘ্রই পুস্তাকাকারে প্রকাশিত হবে। শ্রীদ্বিজেশচন্দ্র রায় কর্তৃক রচিত 'অ্যালবার্ট আইনষ্টাইন' নামক গ্রন্থটি প্রকাশের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

আলোচ্য বছরে কলিকাতার সুবিখ্যাত প্রতিষ্ঠান ওরিয়েণ্ট লংম্যান্স কোম্পানী পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত লোকরঞ্জক পুস্তকাবলী পরিবেশনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। তবে পরিষদের সদস্যগণ যথারীতি 25% কমিশনে পরিষদের দপ্তর থেকে পুস্তকগুলি ক্রয় করতে পারেন।

পাঠ্যপুস্তক :—পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের নির্ধারিত পাঠ্যসূচী অনুসারে মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের নবম ও দশম শ্রেণীর জন্যে পরিষদ কর্তৃক প্রণীত 'বিজ্ঞান বিকাশ' নামক সাধারণ বিজ্ঞানের একটি পাঠ্যপুস্তক গত দু'বছর যাবৎ প্রচলিত হয়েছে। বিদ্যালয়গুলিতে বিজ্ঞান-শিক্ষার মান উন্নত করবার উদ্দেশ্যে এই পুস্তক রচনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। পুস্তকটি প্রকাশ করেছেন কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ প্রকাশক প্রতিষ্ঠান ম্যাকমিলান কোম্পানী। আনন্দের বিষয়, গত দু'বছরে পুস্তকটির প্রায় 24,400 কপি বিক্রয় হয়েছে এবং বর্তমান বছরে এর তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, পশ্চিম-বঙ্গ সরকার ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক বাংলা ভাষায় উচ্চশিক্ষার উপযোগী পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন বা পরিভাষা রচনার প্রচেষ্টার কথা প্রায়শঃ শুনতে পাওয়া যায়। বিজ্ঞান পরিষদের আদর্শানুগ এই সব প্রচেষ্টায় পরিষদ আনন্দিত এবং বিজ্ঞান-বিষয়ক পাঠ্যপুস্তক বা পরিভাষা প্রণয়নের ক্ষেত্রে সক্রিয় সহযোগিতা করবার জন্যে পরিষদ সর্বদাই আগ্রহী।

গ্রন্থাগার ও পাঠাগার

বিজ্ঞানবিষয়ক বিভিন্ন পুস্তক ও পত্রিকাদি পাঠে জনসাধারণকে সুযোগ দানের উদ্দেশ্যে পরিষদ কর্তৃক একটি গ্রন্থাগার ও একটি পাঠাগার বহুদিন যাবৎ পরিচালিত হচ্ছে, তবে অর্থাভাব ও স্থানাভাবের জন্যে পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থাগার বা পাঠাগার স্থাপন করা পূর্বে সম্ভব হয় নি। 1969 সালে পরিষদের নিজস্ব ভবন নির্মিত হবার পর পর-লোকগত ব্যারিষ্টার অমরেন্দ্রনাথ বসুর স্মৃতির উদ্দেশ্যে তাঁর পরিবারের দানে পরিষদের পাঠা-গারটি গত বছর থেকে 'অমরেন্দ্রনাথ বসু স্মৃতি' পাঠাগাররূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। পাঠাগারটিতে বিজ্ঞানবিষয়ক বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও সংবাদপত্রাদি নিয়মিত রাখবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। পরিষদের গ্রন্থাগারটিকেও সম্প্রতি নূতনভাবে সজ্জিত করা হচ্ছে।

একথা আমরা সকলেই জানি যে, পাঠ্যপুস্তকের অভাবে অনেক দরিদ্র অথচ মেধাবী ছাত্রের উচ্চ শিক্ষার ব্যাঘাত ঘটে। বিজ্ঞানশিক্ষার ক্ষেত্রে এই অসুবিধা দূর করবার জন্যে আগামী বছর পরিষদের গ্রন্থাগারে একটি পাঠ্যপুস্তকের বিভাগ খোলবার পরিকল্পনা করা হয়েছে।

বক্তৃতা, আলোচনা ও চলচ্চিত্র-প্রদর্শন

গত বছর 19শে জুন পরিষদ ভবনে নবম বার্ষিক 'রাজশেখর বসু স্মৃতি' বক্তৃতায় 'ভারতের কৃষি সমস্যা' শীর্ষক ভাষণ প্রদান করেন কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন উপাচার্য ডক্টর সুশীল কুমার মুখোপাধ্যায়। 5ই আগষ্ট, '70 তারিখে ডাক্তার যোগেন্দ্রনাথ মৈত্র 'করোনারী অক্লুশন' সম্পর্কে একটি বক্তৃতা দেন এবং কলিকাতাস্থিত মার্কিন তথ্য কেন্দ্রের (U S I S) সৌজন্যে ঐ বিষয়ে চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়। পশ্চিম বঙ্গের বহরমপুর থেকে 'বিজ্ঞান জিজ্ঞাসা' নামক যে পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে, তার বর্ষপূর্তি উপলক্ষে গত ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত বিজ্ঞানবিষয়ক আলোচনা-সভা ও আলোচনা-চক্রে পরিষদের পক্ষ থেকে বর্তমান বক্তার যোগদান করবার সৌভাগ্য হয়েছিল।

বর্তমান বছরের 16ই ফেব্রুয়ারী কলিকাতায় চিত্তরঞ্জন জাতীয় ক্যান্সার গবেষণা-কেন্দ্রের অধি-কর্তা ডক্টর সন্তোষ মিত্র পরিষদ ভবনে স্লাইড সহযোগে 'ক্যান্সার ও তার প্রতিকার' শীর্ষক একটি লোকরঞ্জক বক্তৃতা প্রদান করেন। মেদিনীপুর জেলার তমলুকের নিকট নাইকুড়ি ঠাকুরদাস ইনষ্টিটিউশনে বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ ও স্থানীয় বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিদের উদ্যোগে এবং বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ ও বিড়লা ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল অ্যাণ্ড টেক্‌নলজিক্যাল মিউজিয়ামের সহযোগিতায় গত এপ্রিল মাসে তিন দিনব্যাপী যে বিজ্ঞানবিষয়ক আলোচনা-সভা ও বিজ্ঞান-প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়,

বিজ্ঞান পরিষদের পক্ষ থেকে সেখানে অংশ গ্রহণ করেন পরিষদের অন্যতম সহ-সভাপতি অধ্যাপক জ্ঞানেন্দ্রলাল ভাদুড়ী, সহযোগী কর্মসচিব শ্রীরবীন বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীশ্যামসুন্দর দে, কার্যকরী সমিতির অন্যতম সদস্য শ্রীশঙ্কর চক্রবর্তী এবং পরিষদের কর্মসচিব হিসাবে বর্তমান বক্তা। সম্প্রতি 16ই জুলাই, '71 তারিখে পরিষদ ভবনে দশম বার্ষিক 'রাজশেখর বসু স্মৃতি' বক্তৃতায় 'সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্ব' সম্পর্কে ভাষণ দেন খড়্গপুরের ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনলজির অধ্যাপক গগনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়।

বাংলাদেশে পশ্চিম পাকিস্তানের জঙ্গীশাহীর নৃশংস বর্বরতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে এবং বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের প্রতি সম্পূর্ণ সহানুভূতি ও সমর্থন জ্ঞাপন করে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের উদ্যোগে গত 16ই এপ্রিল পরিষদ ভবনে পশ্চিম বঙ্গের বিজ্ঞানী, বিজ্ঞান-কর্মী ও বিজ্ঞানানুরাগী জনসাধারণের একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। পরিষদের তত্ত্বাবধানে যে বাংলাদেশ সাহায্য তহবিল খোলা হয়, তাতে সংগৃহীত মোট 500 টাকা বাংলাদেশের সাহায্যার্থে আজ কলিকাতাস্থিত বাংলাদেশ মিশনের প্রধান জনাব হোসেন আলির হস্তে অর্পণ করা হবে।

হাতে-কলমে বিভাগ

পরিষদের হাতে-কলমে বিভাগে বিজ্ঞানের সহজ পরীক্ষা-নিরীক্ষা, বৈজ্ঞানিক মডেল তৈরি প্রভৃতি কাজের জন্যে সুযোগ-সুবিধা আছে। গত এপ্রিল মাসে তমলুকের নিকট নাইকুড়ি ঠাকুরদাস ইনস্টিটিউশনে অনুষ্ঠিত যে বিজ্ঞান-প্রদর্শনীর কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, সেই প্রদর্শনীতে এই বিভাগের পক্ষ থেকে যোগদান করা হয়। বিড়লা ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল অ্যাণ্ড টেক্‌নলজিক্যাল মিউজিয়ামের বার্ষিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে গত মে মাসে আয়োজিত বিজ্ঞান-প্রদর্শনীতেও উক্ত বিভাগ থেকে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করা হয়েছিল। অনিবার্য কারণবশতঃ কিছুকাল যাবৎ বিভাগটি নিয়মিত খোলা রাখা সম্ভব হচ্ছিল না। যাহোক, বর্তমানে বিভাগটির কাজকর্ম আবার স্বাভাবিকভাবে চলতে সুরু করেছে।

পরিষদ ভবন নির্মাণ

1969 সালের ফেব্রুয়ারী মাসে পরিষদ ভবনের ভূ-গর্ভতল ও প্রথম তলের নির্মাণ-কার্য সমাপ্ত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কুমার প্রমথনাথ রায় চ্যারিটেবল ট্রাষ্ট, পরলোকগত অধ্যাপক নীরেন রায় এবং অন্যান্য শুভেচ্ছার্থীদের দানে এই নির্মাণ-কার্য সম্ভব হয়েছে। এযাবৎ যাঁরা পরিষদের গৃহ-নির্মাণের জন্যে দান করেছেন, তাঁদের সকলকে আমাদের কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই।

পরিষদের পরিকল্পিত গৃহের অনুমোদিত নক্সা অনুযায়ী দ্বিতল ও ত্রিতল সুসম্পন্ন করবার জন্যে প্রয়োজন হবে আরও প্রায় 1,25,000 টাকা। এই অর্থ যাতে অবিলম্বে সংগৃহীত হয়, তার জন্যে পরিষদের গৃহ-নির্মাণ তহবিলে মুক্তহস্তে দান করতে আপনাদের নিকট আমরা সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাচ্ছি।

উপসংহার

আধুনিক জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য ও উন্নতি বিজ্ঞানের জ্ঞান ও ভাবধারার উপর নির্ভর করে। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী ও শিল্পসমৃদ্ধিই জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের নিয়ামক। সে জন্যে জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞানের প্রচার ও প্রসারের আদর্শ নিয়েই বিজ্ঞান পরিষদ তার সাংস্কৃতিক কর্মপ্রচেষ্টাগুলি পরিচালিত করছে। দেশের ভবিষ্যৎ গঠনে পরিষদের মত জনশিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব ও কর্তব্য যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বলে আমরা মনে করি। আর সেই সঙ্গে আমরা নিশ্চিতভাবে এই বিশ্বাস রাখি যে, আপনাদের শুভেচ্ছা ও সহযোগিতায় পরিষদের ভবিষ্যৎ কর্মপ্রচেষ্টা আরও সুদৃঢ় ও ব্যাপক হয়ে উঠবে এবং পরিষদ অদূর ভবিষ্যতে একটি সুপ্রতিষ্ঠিত জাতীয় কল্যাণকর প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে।

আপনাদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য এইখানে শেষ করছি।

জয়ন্ত বসু
কর্মসচিব
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

কলিকাতা
28 জুলাই, 1971

পুস্তক-পরিচয়

পরমাণু জিজ্ঞাসা—এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায় ও শান্তিময় চট্টোপাধ্যায়। প্রকাশক: ওরিয়েন্ট লংম্যান লিমিটেড, 17, চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউ, কলিকাতা-13 ; মূল্য: ছয় টাকা।

পরমাণু-বিজ্ঞান বর্তমান সভ্যতার একটি অপরিহার্য অঙ্গ। সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে বিজ্ঞানের যে প্রগতি আবহমানকাল থেকে চলে আসছে—বিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই দ্রুত-গতিতে তার মোড় ফিরে গেছে। এই দ্রুত পরিবর্তন সম্ভব হয়েছে তেজস্ক্রিয়তা, পরমাণুর নিউক্লিয়াস্ তথা পরমাণু-বিজ্ঞানের বহু যুগান্তকারী আবিষ্কারের সহায়তায়। জটিল সেই সব আবিষ্কারের অন্তর্নিহিত বৈজ্ঞানিক ধ্যানধারণা মানুষের কাছে কিছুটা দুরধিগম্য হলেও এই সব আবিষ্কারের ফলাফল সাধারণ মানুষের কাছে দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় উপকরণের মাধ্যমে অতি-পরিচিত হয়ে পড়েছে। আমরা যখন বিদ্যুৎ ব্যবহার করি, তা জলশক্তি থেকে আসছে, না পরমাণুশক্তি থেকে—এসব চিন্তা করি না। কিন্তু বিজ্ঞ ব্যক্তিরা যখন বলেন ভারতের কয়লা সম্পদ ক্রমশঃ ফুরিয়ে আসছে, পরমাণুশক্তির উপরই ভরসা রাখতে হবে, তখন আমাদের একটু ভাবতে হয়। দেশের উন্নয়নে বিজ্ঞানী যন্ত্রবিদ্‌দের সঙ্গে সাধারণ মানুষও বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের চিন্তায় অংশীদার না হলে দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন সম্ভব হয় না। তাই অধুনা সব দেশেই সঙ্গীত, কলা বা শিল্পের মত বিজ্ঞান সংস্কৃতির অঙ্গীভূত হয়ে পড়েছে। বিজ্ঞানের জটিল দিকটা বাদ দিয়ে সাধারণ মানুষের বোধগম্য ভাষায় বিজ্ঞানের প্রচার তাই অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। বিদেশে বড় বড় বিজ্ঞানীরা জনপ্রিয় বিজ্ঞান-সাহিত্য রচনায় যথেষ্ট সময় দেন. মানবসমাজের কল্যাণে সেই সমস্ত রচনার গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান রচনার ইতিহাসও কিছুটা প্রাচীন সন্দেহ নেই—তবু জনসংখ্যার তুলনায় বাংলায় বিজ্ঞানের বই যথেষ্ট নয়। সাধারণের হৃদয়গ্রাহী করে বিজ্ঞানের জটিল তত্ত্ব বাংলায় উপস্থাপিত করা, পরিভাষার দুর্লভতা প্রভৃতি অসুবিধাই এর কারণ বলা যেতে পারে। বর্তমান 'পরমাণু জিজ্ঞাসা' পুস্তকটি বাংলায় বিজ্ঞান-সাহিত্যে একটি উৎকৃষ্ট সংযোজন সন্দেহ নেই, পরন্তু ভাষার লালিত্যে ও রচনাশৈলীর সরসতায় এই বইখানি দুরূহ পরমাণু-বিজ্ঞানের আধুনিকতম সমস্যাগুলিকে সাধারণের কাছে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরতে সক্ষম হবে।

'পরমাণু জিজ্ঞাসা' পুস্তকে বারোটি অধ্যায় রয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে পরমাণু-বিজ্ঞানের অতি প্রাচীন ঐতিহাসিক পটভূমিকাটি আলোচিত হয়েছে। গ্রীক ও ভারতীয় দর্শনে পরমাণু পরি-কল্পনার যে ধাঁচ ছিল, ইতিহাস হিসাবে তার কিছু মূল্য রয়েছে। কিন্তু দর্শনের পরমাণু ও আধুনিক বিজ্ঞানের পরমাণুতে আকাশপাতাল গরমিল। বৈশেষিক দর্শনের একটি সূত্র হলো 'অন্ত্যান্ত্যোভ্যো বিশেষেভ্যঃ' অর্থাৎ ক্ষুদ্রতম যে অন্তঃদ্রব্য (পরমাণু সকল) তা কেবল বিশেষ, তা সামান্য হয় না। দার্শনিক মননে একে পরমাণুর অস্তিত্বের আভাস বলা যায়। কিন্তু এখন যে পরমাণু অমিত শক্তির উৎস হয়ে বিশ্বমঞ্চে অবতীর্ণ হয়েছে, তার সঙ্গে দর্শনের এই পরমাণুর মিল নেই বললেই চলে, তবু এই প্রাচীন ইতিহাস অনেকের কৌতূহল চরিতার্থ করবে। তৃতীয় অধ্যায়ে আধুনিক পরমাণু-বিজ্ঞান ও প্রাচীন কল্পনার মধ্যবর্তীকালের সেতুবন্ধনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের আলোচনায় আধুনিক বিজ্ঞা-

নের গোড়াপত্তন কি করে হলো পাঠকেরা তা অনায়াসে বুঝতে পারবেন।

পরমাণু নয়, পরমাণুর কেন্দ্রীন হলো আসল নায়ক। এর ভূমিকা স্পষ্টতঃ আরম্ভ হয়েছে বেকেরেলের স্বাভাবিক তেজস্ক্রিয়তা আবিষ্কারের পর। চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়ে তেজস্ক্রিয়তা ও পরমাণু সম্পর্কে মনোজ্ঞ আলোচনা থেকে পরমাণু ও তার কেন্দ্রীন সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। চতুর্থ অধ্যায়ে মৌলিক পদার্থের তালিকা বাংলাভাষী পাঠকদের কাছে বিশেষ আকর্ষণীয়। তেজস্ক্রিয় ও স্বাভাবিক সমস্ত আইসোটোপগুলির বিশদ তালিকা সংযোজনসহ অবশ্যই একটি পূর্ণাঙ্গ পুস্তক রচনার অবকাশ আছে। ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়ে কি ভাবে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ তৈরি করা যায়, ত্বরণ যন্ত্র ও রিয়্যাক্টর প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম কলিকাতায় যে ত্বরণ যন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়—ভারতের পরমাণু-বিজ্ঞান গবেষণায় তার অবদান অপরিসীম। ট্রম্বের রিয়্যাক্টর ও কলিকাতায় পরিকল্পিত বৃহত্তর ত্বরণ যন্ত্র ভারতের পরমাণু-বিজ্ঞানের প্রসারে কি ভূমিকা নিয়েছে ও ভবিষ্যতে নেবে—তার ইঙ্গিত দেশবাসীর কাছে সুস্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। এই অধ্যায়গুলিতে তার গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা রয়েছে। নবম অধ্যায়ে পরমাণু বোমার ভয়াবহতা ও তা-থেকে আত্মরক্ষার উপায় সম্পর্কে যে মনোজ্ঞ তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে, তা কেবল সাধারণের কাছে নয়, অনেক বিজ্ঞানীদের কাছেও অজানা ছিল। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, অন্যতম লেখক শ্রী চট্টোপাধ্যায় পরমাণু বোমাজনিত তেজস্ক্রিয়তার পরীক্ষা হাতে-কলমে করেছেন, তাই এই সম্পর্কে তাঁর বিজ্ঞতা আলোচনায় সুপরিস্ফুট হয়েছে। দশম ও একাদশ অধ্যায়ে ভয়াবহ পরমাণুশক্তির মানবহিতে ব্যবহার ও সেই পরিকল্পনায় ভারতের অগ্রগামিতা সম্পর্কে যে আলোচনা রয়েছে, তাতে ভরসা হয়, যে বিজ্ঞানী গোষ্ঠী এই দুরূহ গবেষণায় নিয়োজিত থেকে দেশকে সামগ্রিক উন্নয়নে সচেষ্ট, তাঁদের কাজের সুফল ভারতকে জগৎ সভায় পরমাণু-বিজ্ঞানে একদিন প্রতিষ্ঠিত করবে।

উপসংহারে কেন্দ্রীন সংযোজন প্রক্রিয়ায় হাইড্রোজেন বোমা এবং প্লাজ্‌মা গবেষণায় এই প্রক্রিয়াকে পরমাণুশক্তি আহরণে নিয়োজিত করা, প্লাজ্‌মা থেকে সোজাসুজি বিদ্যুৎ আহরণের কিছুটা আভাস দেওয়া হয়েছে। এই সব গবেষণা এখনও এমন সাফল্য নিয়ে আসে নি, যা থেকে ভবিষ্যতের জন্যে কিছু ভরসা পাওয়া যেতে পারে। তবু এই বিষয়গুলি সম্পর্কে আলোচনা আর একটু বিশদ হলে চিত্তাকর্ষক হতো সন্দেহ নেই। পরিশিষ্টে সন্নিবেশিত পরিভাষা ও বিজ্ঞানীদের পরিচয় একটি প্রয়োজনীয় সংযোজন।

বাংলা ভাষায় এরকম স্বচ্ছন্দ ও সাবলীলভাবে লেখা অনেক জটিল তত্ত্বের সমাবেশ রয়েছে—এরকম বই দুর্লভ। লেখকদ্বয় রচনাশৈলীতে যে মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন, তা বাংলার বিজ্ঞান-সাহিত্যে পথপ্রদর্শক হবে সন্দেহ নেই। পাঠক-সাধারণ তথা বিজ্ঞানীরা বইটি পড়ে যথেষ্ট উপকৃত হবেন। এই ধরণের বই পাঠকের কাছে যতই সমাদৃত হবে, ততই মঙ্গল।

শ্রীমতী চট্টোপাধ্যায়ের লেখা সাহিত্যে সুপরিচিত। বিজ্ঞানের রচনাতেও যে তিনি সমান পারদর্শিনী, এই পুস্তকটি তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

বইটিতে 2/1টি ছাপার ভুল লক্ষ্য করা গেল। আশা করি পরবর্তী সংস্করণে সেগুলি সংশোধিত হবে। বইটির প্রচ্ছদপট, বাঁধাই ও রেখাচিত্রগুলি চমৎকার হয়েছে।

সূর্যেন্দুবিকাশ কর*

---

*সাহা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, কলিকাতা-9

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

ডাইনোসোরের অবলুপ্তির কারণ

জীব-বিজ্ঞানীদের মতে আজ থেকে প্রায় 50 কোটি বছর আগে পৃথিবীতে স্থলচর প্রাণীর আবির্ভাব ঘটেছিল, যদিও জলে প্রাণ সৃষ্টি হয়েছিল আরও অন্ততঃ 150 কোটি বছর আগে। বিবর্তন বাদ অনুসারে বিজ্ঞানীরা এই 50 কোটি বছরকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন :—(1) পুরাজীবীয় (Palaeozoic) যুগ, (2) মধ্যজীবীয় (Mesozoic) যুগ এবং (3) নবজীবীয় (Cainozoic) যুগ। পুরাজীবীয় যুগের আয়ু প্রায় 30 কোটি বছর। এই সময়ে ডাঙ্গার জীব বলতে ছিল শক্ত খোলসধারী কাঁকড়াজাতীয় প্রাণী এবং কেঁচোজাতীয় অমেরুদণ্ডী প্রাণী আর ডানাওয়ালা নানা প্রকার পতঙ্গ। আর ছিল ফার্নজাতীয় নানা রকম উদ্ভিদ। এই যুগের শেষের দিকে এবং মধ্যজীবীয় যুগের প্রারম্ভে দেখা দিল সরীসৃপজাতীয় মেরুদণ্ডী প্রাণী। জীবন-সংগ্রামে অমেরুদণ্ডী প্রাণীরা শক্তিশালী সরীসৃপদের কাছে পরাজিত হলো এবং তাদের সংখ্যাও ক্রমে কমতে সুরু করলো। সুরু হলো মেরুদণ্ডী সরীসৃপদের আধিপত্য। প্রথম দিকে এরা ছিল আকারে বেশ ছোট—আধুনিক টিকটিকি বা গিরগিটির কিছু বড় সংস্করণ মাত্র। কিন্তু ক্রমশঃ এদের আকার

ভীষণভাবে বাড়তে লাগলো। ফলে বেশ কিছুকাল পরে এই সব ক্ষুদ্রাকৃতির সরীসৃপজাতীয় প্রাণীরা পরিণত হয় এক শ্রেণীর অতিকায় প্রাণীতে। এরাই ডাইনোসোর নামে পরিচিত। মধ্যজীবীয় যুগে এদেরই ছিল আধিপত্য। এদের মত বিশালাকার বলশালী হিংস্র জীব পৃথিবীতে আর কোনও দিন জন্মায় নি। এই সময়ের উদ্ভিদগুলিও যেন প্রাণীদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়ে উঠেছিল। পৃথিবী জুড়ে ছিল এই বিরাটাকৃতির গাছ আর অতিকায় প্রাণীদের রাজত্ব। কেবল ডাঙ্গাতেই নয়, জলে এবং আকাশেও এই সব দানব-সরীসৃপেরা আধিপত্য বিস্তার করেছিল। এদের মধ্যে পাখীর মত যারা আকাশে উড়ে বেড়াতো, তাদের বলা হতো টেরোড্যাক্‌টিল। মধ্যজীবীয় যুগ চলেছিল প্রায় 10 থেকে 12 কোটি বছর ধরে। এই যুগের শেষের দিকে স্তন্যপায়ী জীবের আবির্ভাব ঘটে। এর পর থেকেই তাদের প্রাধান্য বিস্তার সুরু হয়। স্তন্যপায়ী জীবের আবির্ভাবের কিছুকাল বাদেই অর্থাৎ মধ্যজীবীয় যুগের শেষভাগ থেকেই ডাইনোসোরেরা ক্রমশঃ পৃথিবী থেকে অদৃশ্য হতে থাকে। 100 ফুট লম্বা ডিপ্লাডোকাস বা জাইগাণ্টোসোরাস, উড়ন্ত টেরোড্যাক্‌টিল ও আর্কিওপ্‌টেরিক্স, অতিকায় মাছ ইক্‌থিওসোরাস, যাদের দাপটে পৃথিবী টলমল করতো, সকলেই পৃথিবী থেকে লুপ্ত হয়ে গেল। জীবজগতে এতবড় দুর্ঘটনা আর ঘটে নি। ডাইনোসোরদের আবির্ভাব ছিল যেমন বিস্ময়কর ঘটনা, অবলুপ্তিও তার চেয়ে কিছু কম নয়। প্রাগৈতিহাসিক জীবেরা কেন পৃথিবী থেকে লুপ্ত হয়ে গেল, এই সম্পর্কে নানা মুনির নানা মত। আজ পর্যন্ত এই বিষয়ে বিজ্ঞানীরা যতগুলি কারণ দেখিয়েছেন, সেগুলিকে ছয় ভাগে ভাগ করা যায়—(1) প্রাকৃতিক বিপর্যয়, (2) জলবায়ু, (3) রোগ, (4) খাদ্যের স্বল্পতা, (5) স্তন্যপায়ীদের আবির্ভাব, (6) প্রাকৃতিক নির্বাচন।

(1) অনেকে মনে করেন প্রাকৃতিক দুর্যোগই সরীসৃপদের অবলুপ্তির প্রধান কারণ; অর্থাৎ ভূমিকম্প, অগ্ন্যুৎপাত, নতুন জলভাগ বা স্থলভাগের জন্ম—এ সবই ঐ দুর্ঘটনার জন্যে দায়ী। এই মতবাদ বহু-প্রচলিত হলেও এর বিপক্ষে অনেক যুক্তি দেখানো যায়। প্রথমতঃ ভূ-বিজ্ঞানীদের মতে—ভূ-কম্পন, অগ্ন্যুৎপাত প্রভৃতি দুর্যোগের সম্ভাবনা বর্তমানের তুলনায় সে যুগে বেশী ছিল—একথা বলা যায় না। কাজেই এর ফলে সারা পৃথিবীর সরীসৃপ-জগৎ ধ্বংস হওয়াও অসম্ভব। অবশ্য এর মধ্যে পৃথিবীর স্থলভাগ ও জলভাগের প্রচুর পরিবর্তন হয়েছে এবং বহু নতুন পর্বত, সমুদ্র ও মহাদেশের সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু এই সম্পর্কে একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, ভূপৃষ্ঠের কোনও পরিবর্তনই হঠাৎ আসে না। তার প্রস্তুতি চলে লক্ষ লক্ষ বছর ধরে। কাজেই সরীসৃপেরা যে ধীরে ধীরে এই পরিবর্তনের সঙ্গে নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারে নি—একথা মনে করবার কোনও কারণ নেই। তাছাড়া এই সমস্ত দুর্যোগ সব যুগেই সমান ছিল। অপেক্ষাকৃত দুর্বল পুরাজীবীয় যুগের প্রাণীরা এই সব বিপর্যয়ের মধ্য দিয়েও তাদের বংশধারা অক্ষুণ্ণ রেখেছিল। আজকের চিংড়ি, কাঁকড়া, মাকড়সা, কেন্নো, ফড়িং এদেরই উত্তর

পুরুষ। সুতরাং কেবল প্রাকৃতিক বিপর্যয়ই ডাইনোসোর গোষ্ঠীর অবলুপ্তির একমাত্র কারণ নয়।

(2) এরপর জলবায়ু। মধ্যজীবীয় যুগের শেষের দিকে ডাইনোসোরদের বিলুপ্তির সময়ে পৃথিবীর উষ্ণযুগ শেষ হয়ে আসছিল এবং আসন্ন হিমযুগের প্রস্তুতি চলছিল। কিন্তু এই হিমযুগ আসবার আগেই ডাইনোসোরেরা পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়। কাজেই দেখা যাচ্ছে, খুব বড় রকমের জলবায়ুর পরিবর্তন তাদের সহ্য করতে হয় নি। তাছাড়া বর্তমানে রবডাভ প্রমাণ করেছেন যে, শীতল-রক্তের প্রাণীদের মস্তিষ্কেও তীক্ষ্ণ অনুভূতিশীল তাপকেন্দ্র বর্তমান আছে। সুতরাং পৃথিবীর জলবায়ু ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হতে সুরু করলেও সে যুগের সরীসৃপদের খুব একটা অসুবিধা হবার কথা নয়।

(3) আমরা জানি, অনেক সময় সংক্রামক ব্যাধিঘটিত মড়কের ফলে বহু জীব ধ্বংস হয়। সে যুগের ডাইনোসোরেরাও যে অনেক রোগে আক্রান্ত হতো, একথা জানা যায় তাদের জীবাশ্ম থেকে। কিন্তু একথা মনে রাখতে হবে, মধ্যজীবীয় যুগের শেষের দিকে যে স্তন্যপায়ী জীবদের আবির্ভাব হয়, তারাও নিশ্চয়ই এই সব রোগের হাত থেকে মুক্তি পায় নি। সুতরাং সে যুগে যদি পৃথিবীতে সত্যিই কোনও সাংঘাতিক মড়কের সৃষ্টি হতো, তবে তার ফলে স্তন্যপায়ী জীবেরাও লুপ্ত হয়ে যেত। কাজেই রোগ-জীবাণুর আক্রমণে কেবল সরীসৃপ শ্রেণী বিলুপ্ত হয়ে গেল—এই মতবাদ গ্রহণযোগ্য নয়।

(4) অনেকে বলেন, পৃথিবীতে খাদ্যের অভাব ঘটায় অতিকায় প্রাণীরা জীবনধারণ করতে পারে নি। একথা সত্য যে, ফার্নজাতীয় গাছের অভাবে ডাইনোসোরেরা কোষ্ঠবদ্ধতা রোগে আক্রান্ত হয়েছিল। ডাঙ্গার প্রাণীদের পক্ষে খাদ্যের অপ্রাচুর্য দেখা দিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু এই অভাব ছিল পৃথিবীর কয়েকটি অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ। পৃথিবীর সমস্ত সরীসৃপদের কাছে এটা মারাত্মক হয়ে ওঠে নি। তাছাড়া সমুদ্রের অধিবাসী ইক্‌থিওসোরাস, প্লেসিওসোরাস প্রভৃতি সরীসৃপদের খাদ্য হিসাবে মাছ বা জলজ উদ্ভিদের কিছুমাত্র অভাব ঘটে নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের সংখ্যা দ্রুত হারে কমতে সুরু করেছিল।

(5) কোন কোন জীব-বিজ্ঞানী বলেন, স্তন্যপায়ী জীবদের সঙ্গে সরীসৃপেরা এঁটে উঠতে পারে নি বলেই তাদের পতন। যেমন, পুরাজীবীয় যুগের শেষভাগে সরীসৃপেরা পতঙ্গদের পরাস্ত করে পৃথিবী দখল করেছিল। আবার কারও কারও মতে, স্তন্যপায়ীরা সরীসৃপদের ডিম খেয়ে ফেলতো বলেই সরীসৃপদের জন্মের হার ভীষণভাবে কমে যায়।

প্রথমতঃ মধ্যজীবীয় যুগের শেষ ভাগে যখন স্তন্যপায়ী প্রাণীর প্রথম আবির্ভাব ঘটে, তখন তারা ছিল নিতান্তই দুর্বল। যদিও পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে তারা যতটা খাপ খাওয়াতে পেরেছিল, সরীসৃপেরা তা পারে নি। তবুও ক্ষুদ্রাকৃতি স্তন্যপায়ীদের কাছে অতিকায় সরীসৃপদের হেরে যাবার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। বরং বর্তমানে প্রমাণ পাওয়া

গেছে যে, স্তন্যপায়ীরা পাহাড়ের গুহা প্রভৃতি আশ্রয় করে কোন রকমে ডাইনোসোরদের হাত থেকে আত্মরক্ষা করে বেঁচে থাকতো। দ্বিতীয় কথা—এখনও বনে-জঙ্গলে বিভিন্ন জন্তু একে অপরের ডিম খেয়ে ফেলে। কিন্তু তার জন্যে কোনও জীববংশ লুপ্ত হয়ে যায় না। তাছাড়া ইক্‌থিওসোরাস ও এই জাতীয় আরও সরীসৃপদের সরাসরি বাচ্চা হতো; ডিম পাড়বার প্রয়োজন ছিল না। তাছাড়া সে যুগের বিশালাকৃতির টেরোড্যাক্টিলেরা দলবেঁধে তাদের ডিম পাহারা দিত বলে জানা গেছে। কাজেই সরীসৃপদের বিলুপ্তির জন্যে স্তন্যপায়ীদের আক্রমণ আংশিক দায়ী হলেও পুরাপুরি নয়।

(6) আধুনিক বিজ্ঞানীদের মতে, জীবের বিবর্তনের নিয়ম অনুযায়ী স্বাভাবিক ভাবেই ডাইনোসরদের অবলুপ্তি ঘটেছে। বাইরের কোনও কারণ এর জন্যে দায়ী নয়। বিজ্ঞানী উড্‌ওয়ার্ড বলেন যে, জাতি হিসাবে তাদের জীবনীশক্তিতে ঘুণ ধরেছিল বলেই তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। মধ্যজীবীয় যুগের শেষ ভাগে সরীসৃপদের মধ্যে কয়েকটি অস্বাভাবিক লক্ষণ দেখা যায়, যেমন—অতি বৃদ্ধি, পাখ্‌নার আকারে মেরুদণ্ডের বিস্তার, দন্তহীনতা প্রভৃতি। বিজ্ঞানীরা বলেন, পিটুইটারী এবং হর্মোন-নিঃসারক অন্যান্য গ্রন্থি-গুলির কর্মকারিতায় বিশৃঙ্খলার জন্যেই এরূপ ঘটেছিল। এর ফলে ক্রমে সরীসৃপদের প্রজনন ক্ষমতা হ্রাস পায় ও তারা দ্রুত অবলুপ্তির পথে এগিয়ে চলে। প্রত্যেক প্রাণীর জীবনে যেমন শৈশব-যৌবন-বার্ধক্য আছে, তেমনি আছে জাতির জীবনে। বংশ-বৃদ্ধির অক্ষমতা ডাইনোসোর গোষ্ঠীর বার্ধক্যের নিদর্শন। ডারউইনের মতবাদ অনুসারে প্রাকৃতিক নির্বাচনে অধিকতর সক্ষম স্তন্যপায়ী প্রাণীদের আবির্ভাবের ফলে পৃথিবীতে সরীসৃপদের প্রয়োজন ফুরিয়ে গিয়েছিল। ফলে প্রাকৃতিক নিয়মে তাদের জাতিগত জীবনে এলো বার্ধক্য; অর্থাৎ ডাইনোসোরদের অবলুপ্তি কোনও অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়, বিবর্তনের স্বাভাবিক নিয়মেই এটা ঘটেছে। বর্তমান বিজ্ঞানীমহলে এই মতবাদেরই প্রাধান্য দেখা যাচ্ছে।

শ্রীচন্দন বন্দ্যোপাধ্যায়

পারদর্শিতার পরীক্ষা

বুদ্ধির সমস্যা সমাধানে তুমি কত পারদর্শী, তা বোঝবার জন্যে নীচে 5টি প্রশ্ন দেওয়া হলো। উত্তর দেবার জন্যে মোট সময় 8 মিনিট। প্রতিটি প্রশ্নে 20 করে নম্বর আছে। যে প্রশ্নগুলির দু'টি ভাগ রয়েছে, তাদের প্রত্যেকটি ভাগে 10 নম্বর। তোমার পারদর্শিতার পরিমাণ এইভাবে বুঝতে পারবে—80 বা তার বেশী নম্বর পেলে পারদর্শিতা খুব বেশী, 60 বা 70 পেলে বেশী, 40 বা 50 পেলে চলনসই, 20 বা 30 পেলে কম আর 20-এর নীচে পেলে খুবই কম।

1. ফাঁকা ঘর দু'টিতে এমন সংখ্যা বসাও, যা আগেকার সংখ্যাগুলির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

4	5	3	6	
19	21	17	25	

2. —চিহ্নিত স্থানে কোন্ অক্ষর উপযোগী ?

(i) গ জ ড — ব

(ii) ক ছ — ধ ম

3. নীচের ঘড়ির ছবিটিকে এমন 6টি ভাগে ভাগ করতে হবে, যাতে প্রত্যেক ভাগের 2টি সংখ্যার যোগফল একই হয়।

12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

4. প্রথম দু'টি ছবির সংখ্যাগুলির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ফাঁকা ঘরে সঠিক সংখ্যা বসাও।

(I)
7 8 5
23 10 11
4 5

(II)
63 27 7
45 15 9
78 13

5. 1 থেকে 6 পর্যন্ত নম্বর দেওয়া যে তীর-চিহ্নগুলি রয়েছে, সেগুলির মধ্যে কোনটি ফাঁকা ঘরে বসবার পক্ষে উপযোগী ?

1 2 3 4 5 6

(উত্তর—509নং পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ব্রহ্মানন্দ দাশগুপ্ত ও জয়ন্ত বসু*

*সাহা ইনষ্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, কলিকাতা-9
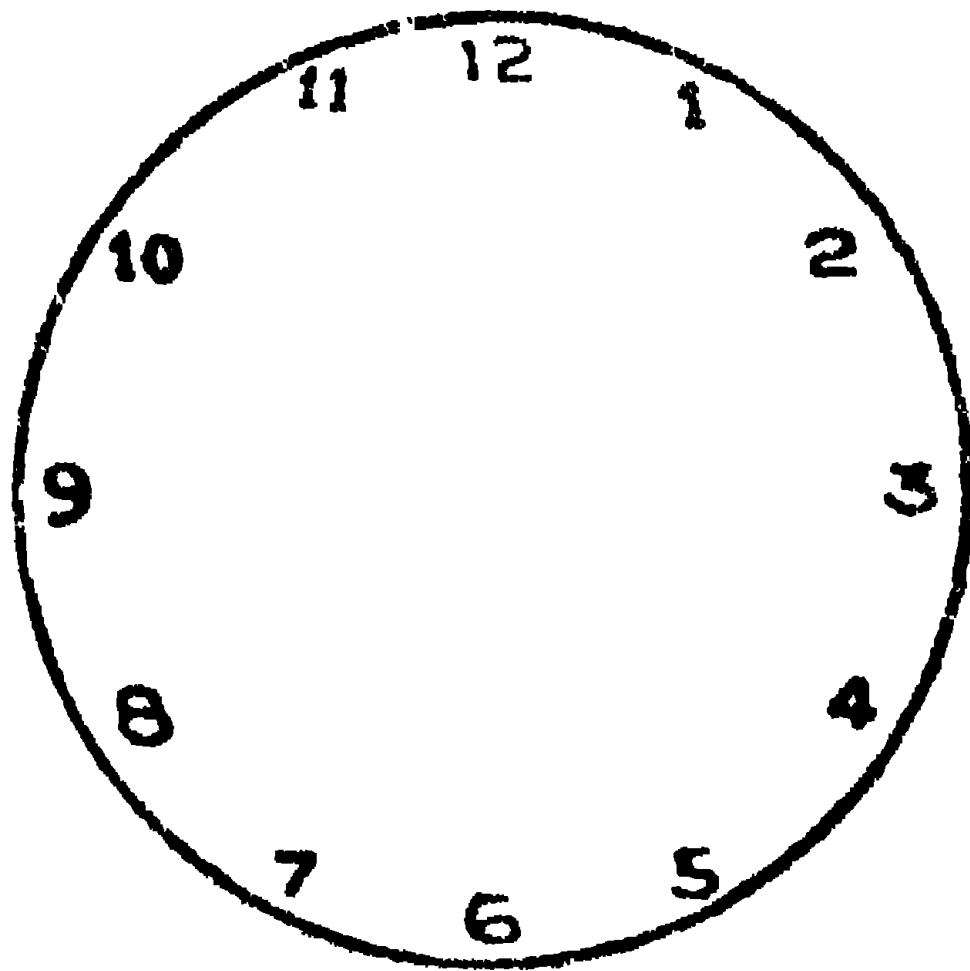
আম

আমাদের দেশের ফলের মধ্যে আমকে অত্যুৎকৃষ্ট ফল বললে অত্যুক্তি হয় না। এজন্যেই আমকে বলা হয় অমৃত ফল। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে আম বিভিন্ন নামে পরিচিত। দক্ষিণ ভারতের তামিলভাষী লোকেরা আমকে বলে মাঙ্গা। এই মাঙ্গা থেকে আমের ইংরেজী নাম ম্যাঙ্গো হয়েছে, কিন্তু অনেকের ধারণা, মালয়ের লোকেরা আমকে মাঙ্গা বলে এবং এথেকেই আমের ইংরেজী নাম হয়েছে ম্যাঙ্গো। উদ্ভিদ-বিজ্ঞানীরা বলেন আমের আসল জন্মভূমি ভারত নয়, মালয় দ্বীপপুঞ্জ।

সাধারণ বৃষ্টিপাত হয় অথচ জল দাঁড়ায় না এবং বালির ভাগ কম—এরূপ জমিই আম গাছের পক্ষে উপযোগী। আমাদের দেশে হাজারেরও বেশী বিভিন্ন জাতের আমগাছ আছে। এই গাছগুলি দুই ভাবে অর্থাৎ বীজ ও কলম থেকে জন্মলাভ করে। বীজ গাছের আমগুলি সাধারণতঃ আকারে ছোট, আঁটি বড় এবং তাতে আঁশের অংশ বেশী, কিন্তু কলমী গাছের আমগুলি আঁশশূন্য এবং তাদের আঁটি পাৎলা হয়ে থাকে। অবশ্য ক্ষেত্রবিশেষে এর ব্যতিক্রমও আছে।

অনুমান করা হয়, আলেকজেণ্ডারই প্রথম (খৃঃ পূঃ 327) সিন্ধু-উপত্যকায় আমের বাগান লক্ষ্য করেছিলেন। চীনা পর্যটক হুয়েন সাং (খৃঃ 633-45) আমের সঙ্গে পরিচিত হন এবং তিনিই বিদেশে আম রপ্তানী করবার চেষ্টা করেন। তবে পর্তুগীজ, ইংরেজ ও ফরাসীরা পৃথিবীর নানা দেশে আম চালান দিতেন এবং তারাই পৃথিবীর নানা দেশে আমগাছ জন্মাবার ব্যবস্থা করেন। ভারত ছাড়াও বর্তমানে অষ্ট্রেলিয়া, ব্রহ্মদেশ, ফিলিপাইন, ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ, ব্রেজিল, মেক্সিকো, মিশর প্রভৃতি দেশে আম উৎপন্ন হয়, কিন্তু ভারতবর্ষের আমের মত এত সুস্বাদু ও ভাল জাতের আম পৃথিবীর আর কোথাও উৎপন্ন হয় না। এই কারণে ভারত থেকে প্রতি বছর প্রচুর আম বিদেশে রপ্তানী হয় এবং ভারতীয় আমের অনুরাগীর সংখ্যা বিদেশে দিন দিন বেড়েই চলেছে।

সংস্কৃত সাহিত্যে আমের অনেক নাম আছে। তার মধ্যে কয়েকটি হলো—রাজকীয়, আম্র, রসাল, মধুদূত, অতি-সৌরভ, কোকিলবধূ প্রভৃতি। আমাদের দেশের আধুনিক কলমী আমের সঙ্গে রাজা-বাদশা, বিভিন্ন দেশ ও উৎপাদকের নাম জড়িয়ে আছে, যেমন—মালদা, সিঙ্গাপুরী, বারমাসী, দোফসলা, বৈশাখিয়া, শ্রাবণা, সিরাজদ্দৌল্লা, জাহাঙ্গীর প্রভৃতি।

আমের মধ্যে ল্যাংড়া খুব সুস্বাদু এবং ল্যাংড়া অনেক জাতের আছে, যেমন—ল্যাংড়া হাজিপুর, ল্যাংড়া মীরাট, ল্যাংড়া পাটনা প্রভৃতি। কিন্তু সবচেয়ে উৎকৃষ্ট হলো বেনারসী ল্যাংড়া। ফজলী আম আকারে বড় এবং ওজনে প্রায় এক থেকে দেড় কিলোগ্রাম

পর্যন্ত হয়। এক সময় দেড় কিলোগ্রাম থেকে পাঁচ কিলোগ্রাম পর্যন্ত এক-একটি আম মালদহে পাওয়া যেত। পশ্চিম বঙ্গে মালদহ ও মুর্শিদাবাদেই ফজলীর ফলন হয় বেশী। শোনা যায়, আবুল ফজলের নাম থেকেই ফজলী নামের উৎপত্তি।

ইতিহাস থেকে জানা যায়, মুঘল সম্রাট আকবর বিহারে দ্বারভাঙ্গা অঞ্চলে বিখ্যাত লাখ-বাগ বা লক্ষ আম গাছের বাগান প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আবুল ফজলের 'আইন-ই-আকবরী'তে সেই যুগের আমের সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়। সেকালের নবাব-বাদশাহরা আম খেতে খুবই পছন্দ করতেন এবং বড় বড় আমের বাগান তৈরি করিয়েছিলেন।

কাঁচা ও পাকা আম আমাদের শরীরের পক্ষে বিশেষ হিতকর এবং নানান স্নেহজ পদার্থে সমৃদ্ধ থাকে। কাঁচা আমের মধ্যে থাকে জলীয় পদার্থ-80%, কার্বোহাইড্রেট-10·2%, প্রোটিন-4·7%, লৌহ-4·5%, অন্যান্য খনিজ পদার্থ-4%, ক্যালসিয়াম 1%, আর পাকা আমের মধ্যে জলীয় পদার্থ ও প্রোটিনের ভাগ কাঁচা আম অপেক্ষা একটু বেশী থাকে। পাকা আমে থাকে—জলীয় পদার্থ-86%, কার্বোহাইড্রেট-9·6%, প্রোটিন 6%, লৌহ-3%, অন্যান্য খনিজ পদার্থ-3%, ক্যালসিয়াম-2%। তাছাড়া আমের মধ্যে ভিটামিন-এ ও সি বেশ পর্যাপ্ত পরিমাণে এবং ভিটামিন-বি সামান্য পরিমাণে থাকে।

কাঁচা আম দাঁতের পক্ষে খুবই ক্ষতিকর এবং বায়ু, বাত ও পিত্ত বৃদ্ধি করে, কিন্তু পাকা আম সুস্বাদু, পুষ্টিকর, লঘুপাক ও বলকারক। তাছাড়া অম্ল, পিত্ত ও ক্ষয় রোগীদের পক্ষেও আম খুব উপকারী এবং রক্তের নানাবিধ রোগ দূরীকরণের ক্ষমতা আমের আছে।

গ্রীষ্মকালে রৌদ্র লেগে বা লু লাগবার ফলে জ্বর হলে কাঁচা আম পুড়িয়ে তার সঙ্গে নুন মাখিয়ে খেলে লু-এর প্রভাব আস্তে আস্তে চলে যায় অথবা কাঁচা আম পুড়িয়ে বা সিদ্ধ করে সমস্ত শরীরে মাখলেও লুয়ের প্রভাব কেটে যায়। মধুর সঙ্গে আম ভক্ষণ করলে ক্ষয়রোগ, প্লীহা ও বাতের রোগ সারে এবং কচি আমের সঙ্গে জাম পাতার রস পান করলে আমাশয় শীঘ্র আরোগ্য হয়। বহুমূত্র রোগীদের পক্ষে আম একটি ভাল ফল। রৌদ্রে শুকানো কাঁচা আমের পুরনো আমশী খেলে আমাশয়ে উপকার পাওয়া যায়। শিশুদের আমাশয় রোগে আমের আঁটির শাঁসের প্রলেপ নাভির চতুষ্পার্শ্বে দিলে সুফল পাওয়া যায়। সামান্য মাত্রায় আমে আঁটির শাঁসের সঙ্গে মধু মিশিয়ে খেলে বমি বন্ধ হয়। এছাড়া আমের আরও অনেক উপকারক গুণ আছে।

আশিষ রায়চৌধুরী

(পারদর্শিতার পরীক্ষা)

1. উপরের ঘরে 2 এবং নীচের ঘরে 9।

[উপরের লাইনের পর পর সংখ্যাগুলির মধ্যে পার্থক্য যথাক্রমে +1, −2, +3। সুতরাং এর পরের পার্থক্যটি হবে −4 এবং সংখ্যাটি হবে 6−4=2।

নীচের লাইনের পর পর সংখ্যাগুলির মধ্যে পার্থক্য যথাক্রমে +2, −4, +8। সুতরাং পরের পার্থক্যটি হবে −16 এবং সংখ্যাটি হবে 25−16=9]

2. (i) দ

[গ, জ, ড ও ব হচ্ছে ব্যঞ্জনবর্ণের তালিকায় যথাক্রমে 1ম, 2য়, 3য় ও 5ম লাইনের মাঝের অক্ষর। 4র্থ লাইনের মাঝের অক্ষর হলো দ। এটাও লক্ষণীয় যে, পর পর অক্ষরগুলির মধ্যে 4টি করে অক্ষরের ব্যবধান থাকছে।]

(ii) ড

[ক, ছ, ধ ও ম হচ্ছে ব্যঞ্জনবর্ণের তালিকার যথাক্রমে 1ম লাইনের 1ম অক্ষর, 2য় লাইনের 2য় 2য় অক্ষর, 4র্থ অক্ষর ও 5ম লাইনের 5ম অক্ষর। 3য় লাইনের 3য় অক্ষর হলো ড। এটাও লক্ষণীয় যে, পর পর অক্ষরগুলির মধ্যে 5টি করে অক্ষরের ব্যবধান থাকছে।]

3.
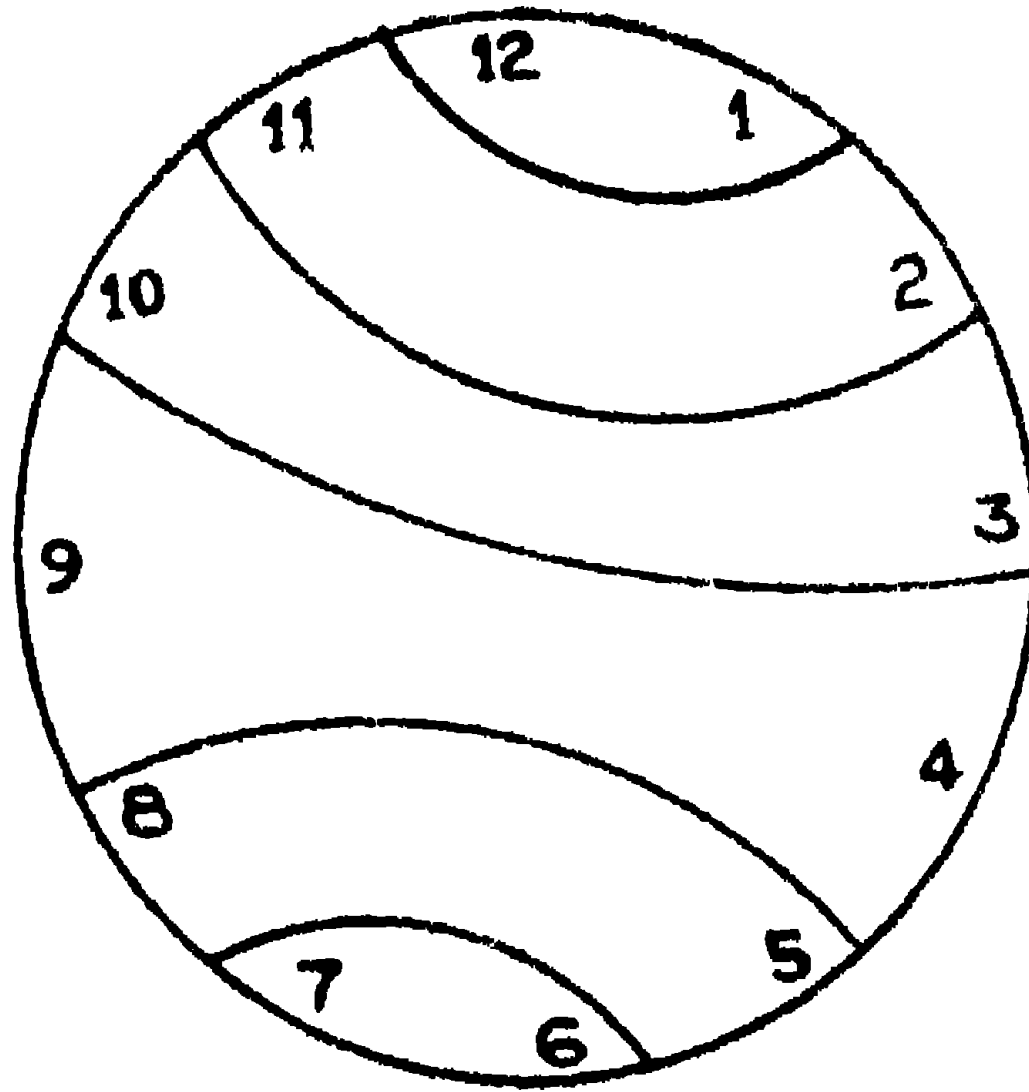
[প্রত্যেকটি ভাগের 2টি সংখ্যার যোগফল 13।]

4. (i) 3

[প্রথম ছবিটিতে (7+8)/3=5 ; দ্বিতীয় ছবিটিতে (23+10)/3=11 ; সুতরাং তৃতীয় ছবিটির ফাঁকা ঘরে হবে (4+5)/3=3।]

(ii) 18

[প্রথম ছবিটিতে (63/7)×3=27 ; দ্বিতীয় ছবিটিতে (45/9)×3=15 ; সুতরাং তৃতীয় ছবিটির ফাঁকা ঘরে হবে (78/13)×3=18।]

5. 4

[উপরের দুটি লাইনের প্রত্যেকটিতেই পর পর তীর-চিহ্নগুলি ঘড়ির কাঁটার গতির অভিমুখে (Clockwise) 90 ডিগ্রী করে ঘুরে গেছে ; তাছাড়া তাদের পালকের সংখ্যা কমেছে একটি করে। এই দু'টি বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী তৃতীয় লাইনের ফাঁকা ঘরে 4 নম্বরের তীর চিহ্নটি বসবে।]

প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন 1. : মকরধ্বজ কি ?

তড়িৎকুমার চক্রবর্তী, জলপাইগুড়ি

প্রশ্ন 2. : টি. এন. টি. কি ?

ডলি তলাপাত্র, শ্যামল চক্রবর্তী, মুর্শিদাবাদ

উত্তর 1. : মকরধ্বজ হচ্ছে একটা আয়ুর্বেদীয় ঔষধ। প্রাচীন কাল থেকেই মুমূর্ষু রোগীকে বাঁচাবার উদ্দেশ্যে মধুর সঙ্গে মেড়ে মকরধ্বজ খাওয়াবার প্রথা প্রচলিত আছে।

রাসায়নিকভাবে মকরধ্বজ হচ্ছে মারকিউরিক সালফাইড। মকরধ্বজ তৈরি করবার সময় প্রথমে ছোট ছোট সোনার পাত ও পারদ একসঙ্গে পিষে নিয়ে অ্যামালগাম তৈরি করা হয়, পরে এই অ্যামালগামের সঙ্গে গন্ধক মিশিয়ে আবার পিষে নেওয়া হয় এবং শেষে পদার্থটিকে ঊর্ধ্বপাতিত করা হয়। ঊর্ধ্বপাতনের সাহায্যে পাওয়া পদার্থটাই মকরধ্বজ।

এই ভাবে প্রাপ্ত মকরধ্বজে সোনার উপস্থিতি সম্পর্কে দ্বিমত আছে। কেউ কেউ ভাবেন, ছোট ছোট সোনার পাত ঊর্ধ্বপাতনের সময় পাত্রের নীচে থেকে যায়। ফলে মকরধ্বজে সোনার অনুপস্থিতিই স্বাভাবিক। তবে সে ক্ষেত্রে সোনার পাত পারদ ও গন্ধকের রাসায়নিক মিলনের ক্ষেত্রে অনুঘটকের কাজ করে থাকে। আবার কেউ বা মনে করেন, মকরধ্বজে সোনার উপস্থিতি থাকে এবং সোনার এই উপস্থিতি পারদের রোগ নিরাময় ক্ষমতাকে বাড়িয়ে দেয়।

পারদের সঙ্গে গন্ধকের পরিমাণ কম বা বেশী করে বিভিন্ন ক্ষমতার মকরধ্বজ তৈরি করা হয়ে থাকে। আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা-পদ্ধতিতে বিভিন্ন ক্ষমতার মকরধ্বজ বিভিন্ন রোগ নিবারণের কাজে প্রয়োগ করা হয়। হৃদ্‌রোগ, যক্ষ্মা, পেটের রোগ, জ্বর প্রভৃতি রোগে মকরধ্বজ বেশ কার্যকরী। বিভিন্ন রোগের বেলায় মকরধ্বজকে মধু ও নানা রকম অনুপানের সঙ্গে মেড়ে নিয়ে রোগীকে খাওয়ানো হয়।

উত্তর 2. : ট্রাইনাইট্রোটলুইন কথাটার সংক্ষিপ্ত নাম হচ্ছে টি. এন. টি.। এর রাসায়নিক সঙ্কেত হচ্ছে $C_6H_2(CH_3)(NO_2)_3$। কয়লা থেকে প্রাপ্ত কোলটারজাতীয় পদার্থের সঙ্গে নাইট্রিক অ্যাসিডের বিক্রিয়ায় টি. এন. টি. তৈরি করা হয়। বিস্ফোরক পদার্থ হিসাবেই টি. এন. টি. সবচেয়ে বেশী কাজে লাগে।

শ্যামসুন্দর দে*

---

* ইনস্টিটিউট অব রেডিও-ফিজিক্স অ্যাণ্ড ইলেকট্রনিক্স, বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা-9

বিবিধ

দশম বার্ষিক 'রাজশেখর বসু স্মৃতি' বক্তৃতা

গত 16ই জুলাই (1971) বৈকাল সাড়ে পাঁচ ঘটিকায় বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ ভবনের 'কুমার প্রমথনাথ রায় বক্তৃতা-কক্ষে' বিজ্ঞান পরিষদ কর্তৃক আয়োজিত দশম বার্ষিক 'রাজশেখর বসু স্মৃতি' বক্তৃতা প্রদান করেন খড়্গপুরের ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব টেকনোলজির অধ্যাপক গগনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়। বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল 'সাধারণ আপেক্ষিতা তত্ত্ব'। ঐ সভায় সভাপতিত্ব করেন বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সভাপতি জাতীয় অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু।

খাদ্যশস্যের রেকর্ড ফলন

1970-71 সালে 10 কোটি 50 লক্ষ মেট্রিক টন থেকে 10 কোটি 60 লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য উৎপন্ন হবে।

এটা সর্বকালের রেকর্ড। এই সব শস্যের অধিকাংশই ধান, বাজরা, ভুট্টা ও গম। গত বছরের উৎপাদন ছিল 9 কোটি 95 লক্ষ মেট্রিক টন। গত বছরের চেয়ে এই বছর উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। কেন্দ্রীয় কৃষি মন্ত্রকের বার্ষিক রিপোর্টে এই তথ্য জানা গেছে।

অন্যান্য ফসলের উৎপাদনের হিসাব দিতে গিয়ে রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, 1970-71 সালে আখের (গুড়ের হিসাবে) উৎপাদন গত বছরের মতই হবে—1 কোটি 34 লক্ষ মেট্রিক টন। গত বছর তৈলবীজের উৎপাদন হয়েছিল 76 লক্ষ মেট্রিক টন। এই বছর বেশ কিছু বেশী হবে বলে আশা করা যায়। তুলা ও পাটের ক্ষেত্রে রিপোর্টে স্বীকার করা হয়েছে যে, ফলন আশানুরূপ বৃদ্ধি পায় নি।

গত বছর পাট উৎপন্ন হয়েছিল সাড়ে 56 লক্ষ গাঁট, 1970-71 সালে তা কমে হয়েছে 49 লক্ষ 10 হাজার গাঁট।

অ্যাপোলো-15-এর মহাকাশচারীদ্বয়ের চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণ

26শে জুলাই তিনজন আমেরিকান মহাকাশ-চারী কর্ণেল স্কট (অধিনায়ক), জেমস্ আরউইন ও মেজর ওয়ার্ডেন অ্যাপোলো-15 মহাকাশযানে চড়ে চন্দ্রাভিমুখে যাত্রা করেন।

30শে জুলাই স্কট ও আরউইন চান্দ্রযান ফ্যালকন-এ চড়ে চাঁদের অ্যাপেনাইন-হ্যাডলী রিলে এলাকায় অবতরণ করেন এবং 15 ঘণ্টা বিশ্রাম করেন। 31শে জুলাই ফ্যালকন থেকে স্কট ও আরউইন চাঁদে পদার্পণ করেন। মেজর ওয়ার্ডেন চাঁদের কক্ষপথে মূলযানটি চালান। অ্যাপেনাইন হচ্ছে 13 হাজার ফুট উঁচু পর্বত এবং হ্যাডলী রিলে হচ্ছে 60 মাইল দীর্ঘ বিশুষ্ক নদীখাত। চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণকারী মহাকাশ-চারীদ্বয় চন্দ্রপৃষ্ঠে মোটর গাড়ীতে চড়ে ঘুরে বেড়ান। মোটরে চড়বার আগে তাঁরা কিছুক্ষণ হেঁটে ঘুরে বেড়ান।

ভ্রম সংশোধন ঃ

জ্ঞান ও বিজ্ঞানের জুন '71 সংখ্যায় পুস্তক-পর্যালোচনায় প্রকাশিত 'চল যাই চাঁদের দেশে' পুস্তকের প্রকাশকের নাম 'অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশি কোং প্রাইভেট লিঃ'-এর পরিবর্তে 'ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ' হবে।

শোক-সংবাদ

অধ্যাপক পুলিনবিহারী সরকার

14ই জুলাই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ঘোষ অধ্যাপক ও খ্যাতনামা বিজ্ঞানী অধ্যাপক পুলিনবিহারী সরকার 77 বছর বয়সে পরলোকগমন করেন। তিনি দীর্ঘদিন অন্ত্রের রোগে ভুগছিলেন। স্বর্গতঃ অধ্যাপক সরকার আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের খুব প্রিয় ছাত্র ছিলেন। আজীবন নিষ্ঠাবান শিক্ষাব্রতী হিসাবে তিনি শিক্ষা-জগতে অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

রসায়নে এম. এস-সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজে রসায়নের লেকচারার নিযুক্ত হন। 1925 সালে তিনি ইউরোপে যান এবং সরবন বিশ্ববিদ্যালয়ে (প্যারিস) অধ্যাপক জি. য়ুরবাঁর তত্ত্বাবধানে স্ক্যাণ্ডিয়াম, গ্যাডোলিনিয়াম ও ইউরোপীয়াম সম্পর্কে গবেষণা করেন।

1946 সালে ডক্টর সরকার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নের স্যার রাসবিহারী ঘোষ প্রোফেসর নিযুক্ত হন এবং 1952 সালে তিনি বিভাগীয় প্রধান হন। 1960 সালে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর গ্রহণ করেন। অ্যানালিটিক্যাল কেমিস্ট্রিতে তাঁর অবদানের জন্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে স্যার পি. সি. রায় স্বর্ণপদক দেন। তিনি বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের প্রাক্তন সদস্য ছিলেন।

ডক্টর বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের প্রাক্তন সদস্য ও মার্কিন প্রবাসী রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপক ডক্টর বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় গত 7ই জুলাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিসিসিপিতে হঠাৎ হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোকগমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র 41 বছর এবং তিনি তাঁর বৃদ্ধ পিতামাতা, স্ত্রী ও বোনেদের রেখে গেছেন।

ডক্টর বন্দ্যোপাধ্যায় 1953 সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিশুদ্ধ রসায়নশাস্ত্রে এম. এস-সি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং 1956 সালে অধ্যাপক প্রিয়দারঞ্জন রায়ের অধীনে অজৈব রসায়নশাস্ত্রে গবেষণা করে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি যাদবপুরে ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর কাল্টিভেশন অফ সায়েন্স-এ কিছু-

ডক্টর বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়
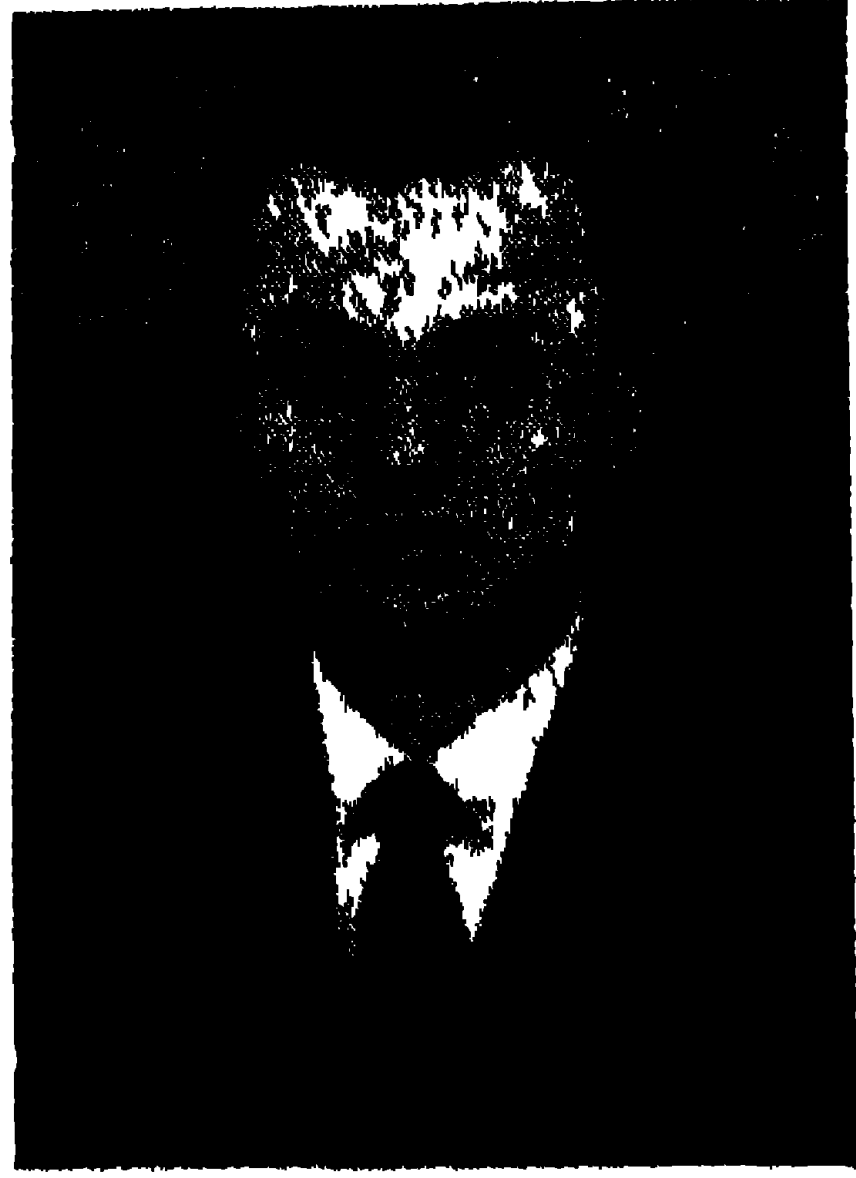
কাল গবেষণা করেছিলেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কর্নেল এবং ইণ্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি কয়েক বছর গবেষণা ও অধ্যাপনা করেন। সর্বশেষে 1967 সাল থেকে মিসিসিপির অ্যালকর্ন এগ্রিকালচারাল অ্যাণ্ড মিকানিক্যাল কলেজে রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপকরূপে তিনি কাজ করেন। বাংলাভাষায় বিজ্ঞান বিষয়ে একজন সুলেখক হিসাবে তিনি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। বিশ্বভারতী কর্তৃক প্রকাশিত 'অ্যান্টিবায়োটিক্স', বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত 'সুবাস ও সুরভি' প্রভৃতি একাধিক লোকরঞ্জক বিজ্ঞান গ্রন্থের তিনি রচয়িতা। এছাড়া, এদেশের সাময়িক পত্র-পত্রিকাতেও তিনি বিজ্ঞান বিষয়ে লিখতেন।

প্রধান সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য
শ্রীমিহিরকুমার ভট্টাচার্য কর্তৃক পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-6 হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ 37/7 বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত।
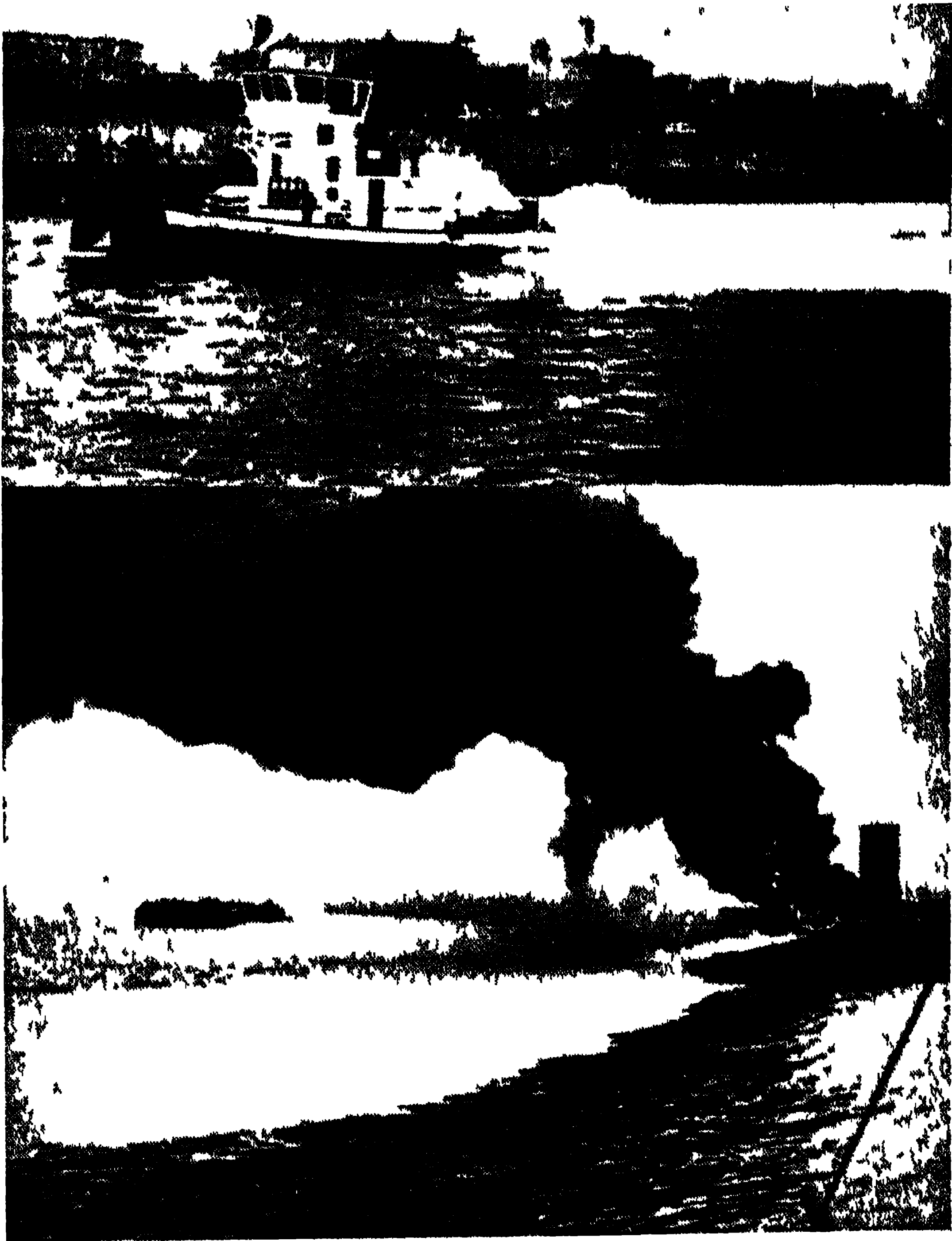
অগ্নিনির্বাপক জাহাজ

আধুনিক সরঞ্জামে সজ্জিত পর্ণিমান নামের অগ্নিনির্বাপক জাহাজটিকে পশ্চিম জার্মেনীর রাইন নদীতে আগুন নেবানোর কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। জাহাজটি 15 মিনিটের মধ্যে 60 মিটার চওড়া ও এক কিলোমিটার লম্বা ফেনার আবরণ তৈরি করতে পারে। জাহাজটিতে দেড় ঘণ্টা ধরে অবিরাম ফেনা উৎপাদনের জন্যে রাসায়নিক পদার্থ সঞ্চিত থাকে। এর সাহায্যে 60 মিটার দূর থেকেও বিপদগ্রস্ত জাহাজকে আগুনের কবল থেকে বাঁচানো যায়। ফেনা উৎপাদক এই রাসায়নিক পদার্থ মানুষের পক্ষে সম্পূর্ণ নিরাপদ।

শারদীয়

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

চতুর্বিংশ বর্ষ | সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, 1971 | নবম-দশম সংখ্যা

আমাদের কথা

আবার শরৎ আসিয়াছে। সেই সঙ্গে এই রাজ্যে আসিয়াছে প্লাবন, মানুষের দুঃখ-দুর্দশা বাড়িয়া গিয়াছে বহু গুণ। হৃতসর্বস্ব আর্ত নর-নারীর হাহাকারে রাজ্যের আকাশ-বাতাস আজ ভারাক্রান্ত। দুর্যোগের ঘনকৃষ্ণ মেঘ দিগন্ত ছাইয়া ফেলিতেছে; তথাপি আমরা পুরাতন প্রথা অনুসরণ করিয়া শরতের স্মারক বর্তমান শারদীয় সংখ্যাটি প্রকাশ করিলাম। 'মেঘ দেখে কেউ করিসনে ভয়, আড়ালে তার সূর্য হাসে'—আজ মানবতা বিপন্ন, তাই আশা হয় নব মানবতার অভ্যুদয় সমাসন্ন।

আমরা বাংলাভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান-শিক্ষার জন্ম ব্রতী হইয়াছি। ওপার বাংলার মানুষ বাংলাভাষাকে বুকের রক্ত ঢালিয়া নূতন মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করিতেছেন। দুর্ভিক্ষ, মহামারী, প্লাবন প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্বিপাকজনিত ক্ষয়-ক্ষতি, দানবীয় হিংসার রক্তলোলুপ যুদ্ধোন্মাদনা—কোন কিছুই আজ মানুষের অগ্রগতিকে রুদ্ধ করিতে পারিতেছে না। প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তি, চরম আত্মত্যাগের প্রস্তুতির সঙ্গে বিজ্ঞানশক্তির শুভ সম্মিলন হইলে মানুষের অসাধ্য কিছুই থাকিতে পারে না। সে চন্দ্রলোক জয় করিয়াছে, গ্রহান্তরে যাত্রার পথ সুগম করিতেছে, বংশানুক্রম নিয়ন্ত্রণের রহস্য আজ তাহার অধিগত-প্রায়। দিকে দিকে বিজ্ঞানের জয়যাত্রা।

বিজ্ঞানের এই আনন্দযজ্ঞে আজ সবার নিমন্ত্রণ। বিদেশী ভাষা আর যাহাতে বিজ্ঞান-ভাণ্ডার ও আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যবধানের দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর হইয়া না দাঁড়ায়—তাহারই উদ্দেশ্যে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান'-এর প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। সেই প্রচেষ্টা বিশেষ ভাবে প্রকাশ পায় শারদীয় সংখ্যার মধ্যে। বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে লোকরঞ্জক প্রবন্ধ, সচিত্র সংবাদ ইত্যাদি সন্নিবেশিত করিয়া বর্তমান সংখ্যাটিকেও পাঠক-সাধারণের নিকট সবিশেষ আকর্ষণীয় করিবার জন্ম যথাসাধ্য চেষ্টা করা হইয়াছে। এই প্রচেষ্টা কিছুমাত্র সফল হইলে আমাদের সকল শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

জিন-প্রযুক্তিবিদ্যা ও মানুষের ভবিষ্যৎ

শ্রীসুভাষচন্দ্র বসাক ও শ্রীজগৎজীবন ঘোষ*

বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে জিন সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান ছিল সীমিত। জিনের প্রকাশ তো দূরের কথা, জিনের প্রকৃতি সম্পর্কেই কোন সঠিক ধারণা ছিল না। কিন্তু বিগত কয়েক দশকে জিন সম্পর্কে বিপুল ও বিস্ময়কর তথ্যাদি আমাদের হাতে এসেছে। এখন গবেষণাগারে চিনির বোতলের পাশে 'জিনের বোতল' আমাদের মনে কোন সাড়াই জাগায় না। যেহেতু জীব-কোষের প্রতিটি বিক্রিয়ার জন্যে একটি করে এনজাইম দরকার এবং এনজাইমের প্রকৃতি সম্পূর্ণরূপে জিনেরই উপর নির্ভর করে, তাই জীবকোষ তথা প্রাণীর উপর জিনের প্রভাব অপরিসীম। সাধারণতঃ জিন বংশপরম্পরায় প্রায় অবিকৃতভাবেই বাহিত হয়। সুতরাং যদি কোন কারণে জিনের কোন পরিবর্তন হয়, তবে ঐ পরিবর্তিত জিনও অবিকৃতভাবেই বংশপরম্পরায় বাহিত হয়ে থাকে। আর এই পরিবর্তন যদি কোন রোগের কারণ হয়, তবে সে রোগ বংশপরম্পরায় চলতে থাকে। যেহেতু এতদিন জিন ছিল ধরাছোঁয়ার বাইরে, সেহেতু জিনবাহিত রোগেরও কোন প্রতিকার ছিল না। কিন্তু সম্প্রতি প্রাকৃতিক উৎস থেকে জিনের পৃথকীকরণ, জিনের নিয়ন্ত্রিত পরিব্যক্তি এবং জিনের কৃত্রিম সংশ্লেষণের ফলে আমাদের জ্ঞান যে স্তরে এসে পৌঁচেছে, তাতে জিনের পরিবর্তনের মাধ্যমে জিনবাহিত রোগ সারাবার সম্ভাবনা বাস্তবে পরিণত হতে চলেছে। জিন-প্রযুক্তিবিদ্যার এটাই হলো এক শ্রেষ্ঠ অবদান।

জিন-এনজাইম এবং জিন-প্রোটিনের সম্পর্ক

জীবকোষের যাবতীয় প্রক্রিয়াই সরাসরি জিনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। কোষের নিউক্লিয়াসে প্রথমে জিন থেকে তৈরি হয় বার্তাবাহী আর-এন-এ (Messenger RNA)। অতঃপর এই আর-এন-এ নিউক্লিয়াস থেকে যায় সাইটোপ্লাজমে এবং সেখানে একাধিক রাসায়নিক ক্রিয়ার মাধ্যমে তৈরি হয় প্রোটিন বা এনজাইম।

পরিবহন

জিন ———→ আর-এন-এ ——→ আর-এন-এ ———→ প্রোটিন বা এনজাইম
(নিউক্লিয়াস) (সাইটোপ্লাজম)

কোন কোষের জিন মোট যে সঙ্কেত বহন করে, তার অতি সামান্য অংশ প্রোটিন তৈরির কাজে লাগে। প্রাণিদেহের সব অপ্রজনন-শীল (Somatic) কোষের জিনের দৈর্ঘ্য, অর্থাৎ মোট সংকেতের পরিমাণ এক। কিন্তু একটা বিশেষ ধরণের কোষে জিনের একটা বিশেষ অংশ প্রোটিন তৈরির কাজে লাগে।

যদি জিন থেকে প্রোটিন পর্যন্ত দীর্ঘ প্রক্রিয়ার কোথাও কোন ত্রুটির ফলে প্রোটিন তৈরি না হয় বা ভুল প্রোটিন তৈরি হয়, তবে রোগ দেখা দেয়। এই প্রকার জিনবাহিত বা বংশগত রোগ দূর করবার জন্যে জিনের সংকেত এবং জিনের প্রকাশের নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন এবং নিম্নলিখিত বিভিন্ন উপায়ে তা করা যেতে পারে—

*প্রাণরসায়ন বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা-19

জিনের নিয়ন্ত্রণ
↓
জিনের স্তরে নিয়ন্ত্রণ (Genetic control) | জিন-বহির্ভূত নিয়ন্ত্রণ (Non-genetic control)

জিন-বহির্ভূত নিয়ন্ত্রণ → জিনের প্রকাশের নিয়ন্ত্রণ

জিনের স্তরে নিয়ন্ত্রণ →
প্রাকৃতিক জিনের পরিবর্তন | উপযুক্ত সঙ্কেতবাহী জিনের সংশ্লেষণ ও ব্যবহার
↓
জিনের নিয়ন্ত্রিত পরিব্যক্তি (Directed Mutation) | জিনের দূরীকরণ (Removal) সংযোজন (Addition) ও পুনর্বিন্যাস (Recombination)
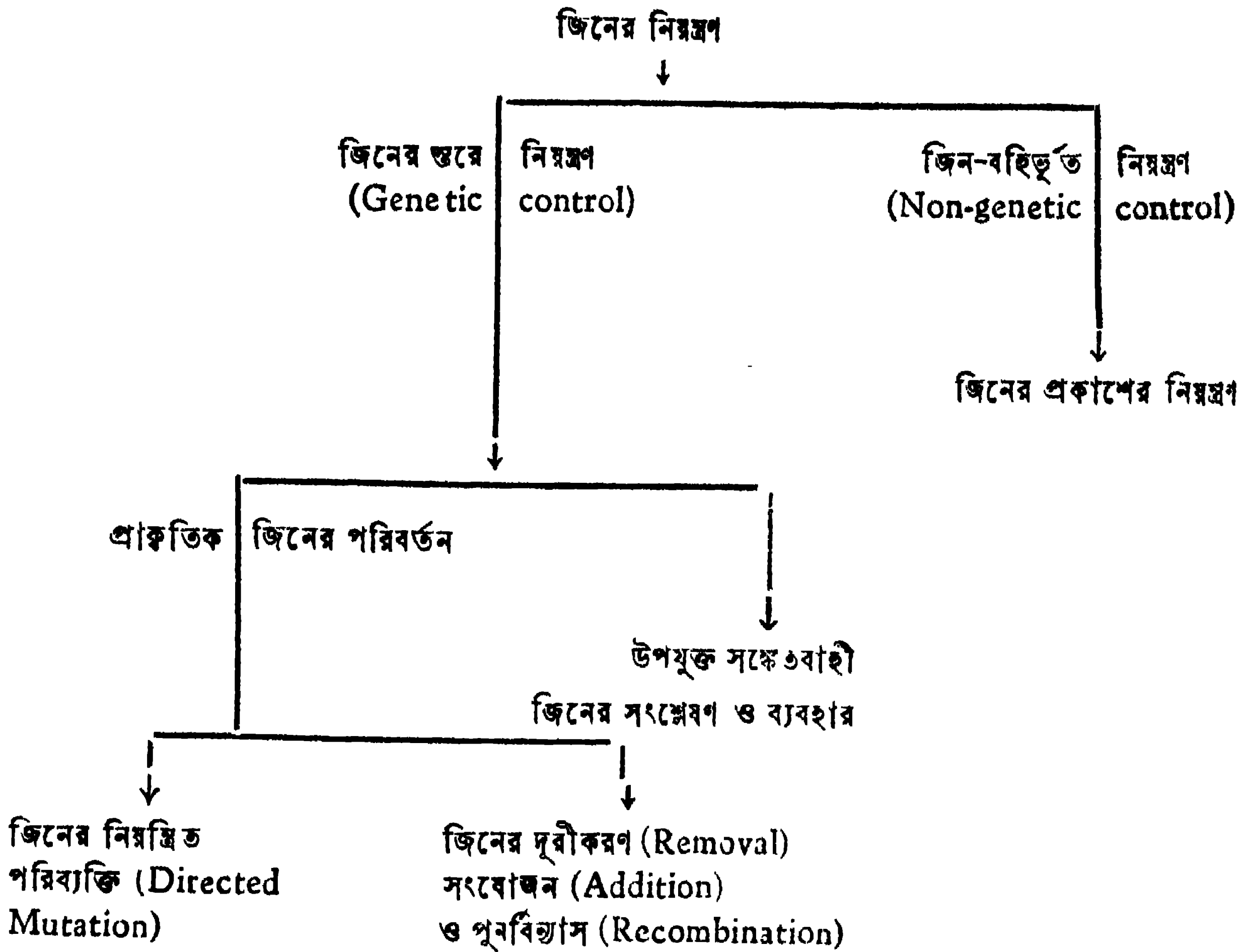
জিনের স্তরে নিয়ন্ত্রণ

(ক) জিনের দূরীকরণ, সংযোজন ও পুনর্বিন্যাস—

ব্যাক্টিরিয়ার ক্ষেত্রে ক্রোমোসোমের বাইরেও বাড়তি জিন (Accessory genetic elements) থাকে এবং এই সব জিন কোষের সংস্পর্শের সময় কোষ থেকে কোষান্তরে স্থানান্তরিত হয়। বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ এই ধরণের জিনের দ্বিত্বকরণ (Replication) বন্ধ করতে পারে এবং তার ফলে এই সব জিন বিলুপ্ত হয়ে যায়। প্রোটোজোয়ার এই ধরণের জিন আছে। যদি মানুষের ক্ষেত্রেও এই ধরনের জিন থাকে এবং এই জিনগুলি বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্যের জন্যে দায়ী হয়, তবে তাদের মাধ্যমে জিনবাহিত বৈশিষ্ট্যের নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে।

বিশেষ কোন ব্যাক্টিরিয়ার DNA উপযুক্ত অবস্থায় অন্য কোন ব্যাক্টিরিয়ার সংস্পর্শে এলে ঐ DNA ব্যাক্টিরিয়ার কোষে প্রবেশ করে গ্রাহক-কোষকে পরিবর্তিত করতে পারে। যদি প্রবেশকারী DNA-এর সঙ্গে গ্রাহক-কোষের DNA-এর কোন বৈশিষ্ট্যের পার্থক্য থাকে, তবে গ্রহক-কোষে প্রবেশকারী DNA-এর ধর্ম দেখা দেয়। এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় Transformation। সাধারণ অবস্থায় এই প্রক্রিয়ায় প্রাপ্ত পরিবর্তিত কোষের সংখ্যা খুবই কম, কারণ প্রবেশকারী DNA-তে সব সময়েই নানা ধরণের জিন থাকে। কিন্তু প্রাকৃতিক উৎস থেকে বিশুদ্ধ জিন পাওয়া গেলে এই প্রক্রিয়ায় উন্নতিসাধন করা যেতে পারে।

ভাইরাসকে মোটামুটি দু-ভাগে ভাগ করা যায়। কতকগুলি ভাইরাস আক্রান্ত কোষকে মেরে ফেলে, কিন্তু অন্য এক প্রকার ভাইরাস আক্রান্ত কোষের কোন ক্ষতি করে না। এক্ষেত্রে ভাইরাসের জিন ও আক্রান্ত কোষের জিন পাশাপাশি প্রকাশিত হয়। ভাইরাসবাহিত সঙ্কেত পাওয়ার ফলে

কোষের মোট সঙ্কেতের পরিমাণ বেড়ে যায়। এই ঘটনাকে বলা হয় Transduction। সম্প্রতি এমন অনেক ভাইরাস পাওয়া গেছে, যেগুলি প্রাণিকোষে প্রবেশ করে কোষের সঙ্কেতের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়। মাছির ক্ষেত্রে ভাইরাসের মত এক প্রকার 'Infective particle' পাওয়া গেছে, যা মাছির CO_2-এর প্রতি সংবেদনশীলতা বাড়িয়ে তোলে। এরা মাছির দেহে প্রবেশ করে সোজা জনন-গ্রন্থিতে গিয়ে প্রজননশীল কোসকে আক্রমণ করে। ফলে মাছি একবার আক্রান্ত হলে এই ধর্ম বংশানুক্রমে চলতে থাকে।

Transformation ও Transduction পরীক্ষা চালানো হয়েছে ব্যাক্টিরিয়ার সাহায্যে। ব্যাক্টিরিয়ার সঙ্গে মানুষের কোষের তফাৎ এই যে, মানুষের কোষের মত ব্যাক্টিরিয়ার কোন স্পষ্ট নিউক্লিয়াস নেই এবং মানুষের কোষে প্রতিটি ক্রোমোসোম এক জোড়া করে থাকে, কিন্তু ব্যাক্টিরিয়ার ক্ষেত্রে প্রতিটি জিনই একটি করে আছে। তাই মানুষের ক্ষেত্রে যদি কোন জিনগত পরিবর্তন করতে হয়, তবে সমধর্মী এক জোড়া বা দুটি ক্রোমোসোমেরই পরিবর্তন প্রয়োজন। সুতরাং মানুষের ক্ষেত্রে অপ্রজননশীল কোষের চেয়ে প্রজননশীল কোষের (Germ cells) পরিবর্তন অনেক বেশী সুবিধাজনক।

সাম্প্রতিক কালে কিছু কিছু ভাইরাস পাওয়া গেছে, যেগুলি মানুষের কোষকে আক্রমণ করে কোন ক্ষতি করে না, বরং আক্রান্ত কোষের মোট সঙ্কেতের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়। এই ধরণের ভাইরাসকে কখনও কখনও Passenger virus বলা হয়। Shope Papillpma virus একটি পর্যটক ভাইরাস। এই ভাইরাস কোন লোককে আক্রমণ করলে তার রক্তে আর্জিনিন নামক অ্যামিনো অ্যাসিডের পরিমাণ কমে যায়। এর কারণ হলো এই ভাইরাসটি রক্তে আর্জিনেজ (Arginase) এনজাইমটির পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়, কিন্তু অন্য কোন ক্ষতি হয় না। রক্তে আর্জিনিন বেশী হলে মানসিক অপটুতা (Mental retardation) এবং অন্যান্য শারীরিক ও মানসিক অস্বাভাবিকতা দেখা দেয়। এই ধরণের রোগীকে শোপ ভাইরাসের সাহায্যে রোগমুক্ত করা যেতে পারে। আরও আশার কারণ এই যে, শোপ ভাইরাস আক্রমণের দীর্ঘ কুড়ি বছর পরেও আক্রান্ত ব্যক্তির অঙ্গে সাধারণের তুলনায় কম আর্জিনিন থাকে।

(খ) জিনের নিয়ন্ত্রিত পরিব্যক্তি—ব্যাক্টিরিয়ার ক্ষেত্রে জিনের পরিবর্তনকে বাইরে থেকে ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রণ করা যায়। কিন্তু ব্যাক্টিরিয়ার DNA-এর কোন কোন অংশকে অতি সহজেই পরিবর্তিত করা যায়। এই সব অংশকে বলা হয় Hot Spot। এই সব অংশগুলির প্রকৃতি এখনও ভালভাবে জানা যায় নি। এগুলির প্রকৃতি জানা গেলে বাইরে থেকে বিশেষ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় জিনকে ইচ্ছামত পরিবর্তন করা যেতে পারে।

প্রতি কোষেরই জিনের দ্বিত্বকরণ একটা বিশেষ সময়ে হয় এবং এই সময়ে জিনের রূপান্তরিত হবার ক্ষমতা (Mutability) বেড়ে যায়। দ্বিত্বকরণ জিনের একপ্রান্ত থেকে আরম্ভ হয় এবং অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত চলে। তাই কোন একটা বিশেষ জিনের দ্বিত্বকরণের সময় রাসায়নিক পদার্থের ব্যবহারের মাধ্যমে একমাত্র ঐ জিনকে রূপান্তরিত (Mutation) করা যায়।

রূপান্তরকারী পদার্থের ক্ষমতা দু-ভাবে বৃদ্ধি করা যেতে পারে। প্রথমতঃ ঐ পদার্থের অণুর সঙ্গে যদি এমন কোন প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম অণু জুড়ে দেওয়া যায়, যার জিনের একটা বিশেষ অংশের প্রতি আসক্তি আছে, তবে রূপান্তরকারী পদার্থের ক্ষমতা বহু গুণ বেড়ে যায়। অ্যাক্টিনোমাইসিন জাতীয় পদার্থগুলি DNA-এর গুয়ানিন-সমৃদ্ধ অংশের সঙ্গে যুক্ত হয়। দ্বিতীয়তঃ রূপান্তর-

কালীন পরিবেশের নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে বিশেষ বিশেষ জিনকে পরিবর্তন করা যেতে পারে। কোন কোন পদার্থের DNA-এর প্রতি একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে। Repressor ও Antibiotic এই ধরণের পদার্থ। দ্বিত্বকরণের সময় এই সব পদার্থের উপস্থিতি DNA-এর উপর রূপান্তরকারী পদার্থের (Mutagen) ক্রিয়াকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। এই কাজে Purine বা Pyrimidine জাতীয় পদার্থের Antibody-কে ব্যবহার করা যেতে পারে।

এই পদ্ধতির সাহায্যে জিনে বর্তমান সঙ্কেতের পরিবর্তন করা সম্ভব। কিন্তু কোন বিশেষ সঙ্কেতের অনুপস্থিতি যদি কোন রোগের কারণ হয়, তবে এই রূপান্তরের মাধ্যমে সে রোগের নিরাময় সম্ভব নয়। বিজ্ঞানী হলডেনের ভাষায় বলতে গেলে, "জিনের রূপান্তরের মাধ্যমে মানুষকে কখনই দেবদূত করা সম্ভব নয়, কারণ নৈতিকতা ও পাখার জন্য প্রয়োজনীয় দুটি জিন মানুষের নেই!"

(গ) সঙ্কেতবাহী জিনের কৃত্রিম সংশ্লেষণ ও ব্যবহার—জিনের নিয়ন্ত্রিত রূপান্তর এখনও নিছক তত্ত্বীয় স্তরেই সীমাবদ্ধ। জিনবাহিত রোগের প্রকৃতি অতি বিচিত্র এবং সংখ্যায়ও নেহাৎ কম নয়। এখন ব্যবহারযোগ্য একমাত্র পদ্ধতি হলো Tranduction-এর সাহায্যে জিনের পরিবর্তন। কিন্তু প্রকৃতিতে এত বিভিন্ন জিনবাহিত রোগের জন্য এত বিচিত্র ধরণের ভাইরাস না পাওয়াই স্বাভাবিক। তাই সম্প্রতি জীববিজ্ঞানীরা কৃত্রিম সঙ্কেতের (Synthetic code) উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। আণবিক জীব-বিজ্ঞানের গত দশ বছরের আবিষ্কারের ফলে ইচ্ছামত DNA বা RNA তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। বিজ্ঞানী হরগোবিন্দ খোরানা বিশেষ প্রোটিনের জন্যে প্রয়োজনীয় সঙ্কেতবাহী জিন গবেষণাগারে সংশ্লেষণ করতে সক্ষম হয়েছেন।

বিশেষ প্রক্রিয়ায় কৃত্রিম উপায়ে সংশ্লেষিত সঙ্কেত আক্রমণকারী ভাইরাসের সঙ্কেতের সঙ্গে যোগ করে দেওয়া যায়। এই পরিবর্তিত ভাইরাস স্বাভাবিকভাবেই কোষকে আক্রমণ করে এবং আক্রান্ত কোষে কৃত্রিম সঙ্কেতও প্রোটিন তৈরির কাজে লাগে। Shope virus-এর DNA চক্রাকার, সুতরাং এই ভাইরাসের DNA-এতে কৃত্রিম সঙ্কেত যোগ করবার পর স্বাভাবিক আক্রমণ ক্ষমতা (Infective power) ফিরিয়ে আনবার জন্যে রৈখিক DNA-কে চক্রাকার DNA-তে রূপান্তরিত করা প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে বিজ্ঞানী কর্ণবার্গ (Kornberg) Polynucleotide ligase এবং Kinase ব্যবহার করেছেন। সম্প্রতি বিজ্ঞানী J. M. Burnett Simian Virus (Sa-F) নামক একটি ভাইরাস খুঁজে পেয়েছেন, যার DNA রৈখিক এবং এই ভাইরাস মানুষের কোষকে আক্রমণ করতে পারে। সুতরাং এই DNA-কে আর চক্রাকার করবার কোন প্রয়োজন নেই, সঙ্কেত যোগ করবার পর সরাসরি এই ভাইরাসকে ব্যবহার করা যেতে পারে।

জিন-বহির্ভুত নিয়ন্ত্রণ

সরাসরি জিনের সঙ্কেতের পরিবর্তন না করে জিনের প্রকাশের পরিবর্তন অনেক সহজ। তবে এই পদ্ধতিতে প্রোটিনের গুণগত পরিবর্তন করা সম্ভব নয়, এতে যে পরির্তন হবে তা হলো পরিমাণগত। জিন থেকে RNA কিম্বা RNA থেকে প্রোটিন—এই দুই স্তরেই জিনের প্রকাশের নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে।

যদি কোষে কোন অপ্রয়োজনীয় প্রোটিন তৈরি হয়, তবে বিশেষ Repressor-এর সাহায্যে ঐ প্রোটিনের জিনকে অকেজো করে প্রোটিন তৈরি বন্ধ করা যায়। যদি কোন কোষে বিশেষ কোন সঙ্কেত অপ্রকাশিত থাকে, তবে বিশেষ প্রকাশক অণুর (Inducer) সাহায্যে ঐ সঙ্কেতকে প্রকাশিত

করা যেতে পারে। প্রকাশক অণু Repressor-এর সঙ্গে বিক্রিয়া করে Repressor-কে অকেজো করে দেয়।

RNA-র সঙ্কেতকে প্রোটিনে পরিণত করতে একাধিক এনজাইমের প্রয়োজন হয়। যদি কোন প্রোটিন বেশী পরিমাণে তৈরি হওয়ার ফলে কোন রোগের সৃষ্টি হয়, তবে RNA থেকে প্রোটিন তৈরির জন্যে প্রয়োজনীয় এনজাইমগুলির যে কোন একটির অ্যান্টিবডি ব্যবহার করে প্রোটিন তৈরির কাজ ব্যাহত করা যেতে পারে।

কোন কোন ক্ষেত্রে জিন বা RNA-তে কোন ভুল না থাকলেও ভুল প্রোটিন তৈরি হয়। এর কারণ হলো, প্রতিটি অ্যামিনো অ্যাসিডকে বিক্রিয়ার স্থানে বহন করবার জন্যে এক-একটি পরিবাহী RNA-র (Transfer RNA) প্রয়োজন হয় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে পরিবাহী RNA ভুল অ্যামিনো অ্যাসিডকে বহন করে নিয়ে যায়। সম্প্রতি Suppressor gene নামক এক প্রকার জিনের সন্ধান পাওয়া গেছে, যার পরিবর্তনের মাধ্যমে পরিবাহী RNA-এর পরিবর্তন করে সঠিক প্রোটিন তৈরি করা যায়।

আমাদের জীনে মোট যে পরিমাণ সঙ্কেত আছে, তার 5 শতাংশ বা আরও কম অংশ প্রকাশিত হয়। প্রকাশযোগ্য জিন থেকে যে RNA তৈরি হয়, তার অংশবিশেষ নিউক্লিয়াস থেকে সাইটোপ্লাজমে পরিবাহিত হয়। আবার যেটুকু RNA সাইটোপ্লাজমে এসে পৌঁছয় তারও সবটুকু প্রোটিন তৈরির কাজে লাগে না। আমাদের শরীরের প্রতিটি কোষেই ইনসুলিন তৈরির সঙ্কেত আছে, কিন্তু Pancreas-এর বিশেষ এক ধরণের কোষেই ইনসুলিন তৈরি হয়। তার কারণ, ভ্রূণাবস্থায় কোষ-বিভাজনের সময় বিশেষ প্রক্রিয়ায় অন্যান্য সব কোষে ইনসুলিন তৈরির সঙ্কেত চাপা পড়ে থাকে। ইনসুলিন তৈরির কাজ নিম্নোক্ত কয়েকটি স্তরে হয়ে থাকে।

$$\underbrace{DNA \rightarrow RNA}_{\text{নিউক্লিয়াস}} \rightarrow \underbrace{RNA \rightarrow Proinsulin \xrightarrow{Enzyme} Insulin}_{\text{সাইটোপ্লাজম}}$$

যদি কোন কারণে Pancreas-এর ইনসুলিন তৈরির ক্ষমতা কমে যায় বা নষ্ট হয়ে যায়, তবে রক্তে ইনসুলিনের পরিমাণ হ্রাস পায় এবং গ্লুকোজের পরিমাণ বেড়ে যায়। এটাই বহুমূত্র রোগের (Diabetes) কারণ। বহুমূত্র রোগ হবার নিম্নোক্ত কারণগুলির যে কোন একটিই যথেষ্ট।

(1) DNA থেকে RNA তৈরির ব্যর্থতা

(2) RNA থেকে Proinsulin তৈরির ব্যর্থতা

(3) Proinsulin থেকে Insulin তৈরির ব্যর্থতা

(4) Insulin-কে জীবকোষের ভিতর থেকে বাইরে পরিবহনের জন্যে প্রয়োজনীয় এনজাইমের অনুপস্থিতি।

যদি কোন উপায়ে কোষের ইনসুলিন তৈরির সঙ্কেতকে প্রকাশিত করা যায়, তবে বহুমূত্র রোগ সারানো অসম্ভব হবে না। কর্টিজোনের প্রভাবে যকৃৎ কোষ (Liver Cell) Tryptophan pyrrolase এবং Tyrosine-α-Ketoglutarate transaminase নামক দুটি নতুন এনজাইম তৈরি করতে পারে। কিন্তু ইনসুলিনের সঙ্কেতকে প্রকাশিত করবার মত কোন পদার্থ আজ পর্যন্ত জানা যায় নি।

জিন-প্রযুক্তিবিদ্যা ও সমাজ

আজকের দিনের নব জাতকের মধ্যে প্রায় চার শতাংশের মধ্যে কোন না কোন জিনবাহিত রোগের স্পষ্ট লক্ষণ দেখতে পাওয়া যায়। তাছাড়া

প্রত্যেকের মধ্যেই আরও কয়েকটি ক্ষতিকর জিন অপ্রকাশিত থাকে। যদিও আণবিক জীব-বিজ্ঞানে গবেষণার ফলে জিন সম্পর্কে অনেক তথ্য আমাদের হাতে এসেছে, তবুও মানুষের ক্ষেত্রে আজ পর্যন্ত এই জ্ঞানের বিশেষ কিছু প্রয়োগ হয় নি। বর্তমানে অনেক বিজ্ঞানী জিনের নিয়ন্ত্রিত পরিব্যক্তির কথা ভাবছেন। তবে এই পদ্ধতির অসুবিধা এই যে, রূপান্তরকারী পদার্থ সব জিনকেই সমানভাবে প্রভাবিত করে। ফলে ভাল জিনের ক্ষতিকর জিনে রূপান্তরিত হওয়া এবং ক্ষতিকর জিন থেকে ভাল জিন তৈরি—এ দুই-ই সমানভাবে সম্ভব। তাছাড়া আমাদের পরিবেশ ক্রমাগত পরিবর্তিত হচ্ছে। যে জিন এক পরিবেশে ক্ষতিকর, সেই জিনই অন্য পরিবেশে বিশেষ উপযোগী হয়ে পড়ে। সুতরাং আজকের দিনে জিনের নিয়ন্ত্রিত পরিবর্তনের মাধ্যমে যে জাতি তৈরি হবে, সে জাতি আগামী দিনের পরিবেশে নিজেকে মানিয়ে চলতে পারবে কিনা—সে কথা হলফ্ করে বলা কারও পক্ষে সম্ভব নয়। অনেক সময়েই মনীষীদের মধ্যে পরস্পরবিরোধী ধর্মের সমন্বয় দেখা যায়। তাঁদের পরস্পরবিরোধী ধর্মের সঙ্গে মনীষার কতটা সম্পর্ক, তা আজও জানা নেই। সমাজের চোখে খারাপ, এমন কোন ধর্মের পরিবর্তন করতে গিয়ে আমরা যদি আজ মনীষাকেও নষ্ট করে ফেলি—তবে সে দায়িত্ব কার? তখন সমাজকেই ভেবে ঠিক করে নিতে হবে, কাকে সে অগ্রাধিকার দেবে, সে কাকে চায়—'তথাকথিত অসামাজিক, কুৎসিত বেটোফেন, না সামাজিক হরিপদ কেরাণী?' এতদিন পর্যন্ত মানুষই ছিল তার বিবর্তনের একমাত্র নিয়ন্ত্রা, কিন্তু আজ মানুষ এমন এক স্তরে এসে পৌঁচেছে, যখন সে নিজেই নিজের বা ভবিষ্যৎ বংশধরদের ধর্ম নিয়ন্ত্রণে সক্ষম।

শেষ কোথায়? কি আছে শেষে?

কিন্তু কল্যাণের চেয়েও ক্ষতি করবার জন্যে জীব-বিজ্ঞানের অপব্যবহার ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে! যুদ্ধের কাজে রসায়ন ও জিন-বিজ্ঞানকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে আমরা ভিয়েৎনামে নিষ্পত্রকারী পদার্থের (Defoliant) ধ্বংসলীলা প্রত্যক্ষ করেছি। জিনের অপব্যবহারের ফল হবে এর চেয়েও অনেক বেশী ভয়ঙ্কর ও স্থায়ী। প্রথম মহাযুদ্ধ ছিল রাসায়নিক যুদ্ধ, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ছিল পদার্থ-বিজ্ঞানের যুদ্ধ, হয়তো তৃতীয় মহাযুদ্ধ হবে জীব-বিজ্ঞানের যুদ্ধ। কিন্তু মনে স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগে—তারপর চতুর্থ কোন মহাযুদ্ধের জন্যে মানবজাতি বেঁচে থাকতে পারবে কি? হয়তো বা কোন এক অজানা 'যুদ্ধ ভাইরাস' মানবজাতিকে নিঃশব্দে ও ধীরে ধীরে প্রকৃতির বুক থেকে মুছে দেবে।

বিজ্ঞানীরা প্রায় সকলেই এই প্রশ্নে নীরব। যাঁরা মুখ খোলেন, তাঁদের কথার সারমর্ম হলো (সেন্ট অগাষ্টিনের ভাষায়)—"If you do not ask me, I know; if you ask me, I know not." আজ তাই শুধুমাত্র বিজ্ঞানই যথেষ্ট নয়—বিজ্ঞান মানুষের হাতে ক্ষমতা তুলে দেয়, কিন্তু ব্যবহারের পথ শেখায় না। আজ তাই Power-ই যথেষ্ট নয়, আজ প্রয়োজন Wisdom-এর মানবজাতির জন্যে Biology-ই যথেষ্ট নয়, আমাদের প্রয়োজন Humanistic Biology-র, যা গবেষণালব্ধ জ্ঞানকে মানবিকভাবে ব্যবহারের পথ শেখায়।

বেতার টেলিফোনি ও ব্রডকাস্টিং-এর আদি পর্ব

সতীশরঞ্জন খাস্তগীর*

বেতার টেলিফোনি ও ব্রডকাস্টিং-এর জন্যে প্রয়োজন—অবিচ্ছিন্ন (Continuous) ও সমান বিস্তারের বিদ্যুৎ-তরঙ্গ। বিদ্যুৎ-স্ফুলিঙ্গের সাহায্যে বিশেষ সার্কিটের ব্যবস্থায় পর-পর ক্রম-বিলীয়মান বিদ্যুতের ঢেউ পাওয়া যায়, সেই ব্যবস্থার নাম হলো স্পার্ক-ট্রান্সমিটার। স্পার্ক-ট্রান্সমিটারের বিলীয়মান বিদ্যুৎ-তরঙ্গ দিয়ে শুধু সংকেত পাঠানোই সম্ভব—তা দিয়ে বেতারে কথাবার্তা বা ব্রডকাস্টিং চলে না। 1903 সনে ডেনমার্কের বিজ্ঞানী Poulsen আর্ক-বাতি জ্বালিয়ে অবিচ্ছিন্ন ও সমবিস্তারের বিদ্যুৎ-তরঙ্গ উৎপাদন করবার এক অভিনব ব্যবস্থা করেন। এই ভাবে নির্মিত প্রেরক-যন্ত্রকে আর্ক-ট্রান্সমিটার বলা হয়। এর দু-বছর আগে ইংল্যাণ্ডের Duddell এই ব্যবস্থার সূচনা করেছিলেন। ডাইনামো যন্ত্রের সাহায্যেও অবিচ্ছিন্ন ও সমবিস্তারের বিদ্যুৎ-তরঙ্গ উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছিল—তবে এই তরঙ্গের স্পন্দনাঙ্ক অপেক্ষাকৃত কম। এই প্রসঙ্গে Alexanderson ও Goldsmidt প্রভৃতি এঞ্জিনিয়ারদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এর পর 1904 সনে বিখ্যাত বিজ্ঞানী Fleming কর্তৃক থার্মিয়নিক (Thermionic) ভাল্‌ভের প্রবর্তন হয়। ভাল্‌ভের সাহায্যে বেতার প্রেরক-যন্ত্রে যখন সমবিস্তারের বিদ্যুৎ-তরঙ্গ অবিচ্ছিন্ন ভাবে পাওয়া সম্ভব হলো, তখন শুধু প্রেরক-যন্ত্র নয়, গ্রাহক-যন্ত্র ও বেতার-সম্পর্কিত অন্যান্য অনেক ব্যবস্থায় থার্মিয়নিক ভাল্‌ভ নানাভাবে আশ্চর্য কাজে লেগেছে। সে জন্যে সেকালে একে বেতার-জগতে 'আলাদীনের প্রদীপ' বললে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না।

ভাল্‌ভ প্রবর্তনের আগে থেকেই বেতার-টেলিফোনির আরম্ভ হয়। 1900 সনে আমেরিকার বিজ্ঞানী Fessenden এক মাইল দূর পর্যন্ত বিনাতারে কথাবার্তা চালাতে সক্ষম হয়েছিলেন। 1907 সনে তিনিই আবার ডাইনামোর সাহায্যে সমবিস্তারের অবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ-তরঙ্গ উৎপাদন করে তার সাহায্যে কথা ও গান এক শত মাইল পর্যন্ত পাঠিয়েছিলেন। প্রায় একই সময়ে জার্মেনীর Telefunken Co, নাউয়েন (Nauen) থেকে বার্লিন—এই বিশ মাইল পর্যন্ত আর্ক-ট্রান্সমিটারের সাহায্যে বিনাতারে কথাবার্তা চালিয়েছিলেন। 1913 সনে এই কোম্পানীই আবার ডাইনামো ব্যবহার করে সাড়ে পাঁচ-শ' মাইল বিনাতারে কথাবার্তা পাঠিয়েছিলেন। 1912 সনে Vanni নামে একজন ইটালীয় বিজ্ঞানী এক নূতন ধরণের সময়ানুবর্তী স্পার্ক-ট্রান্সমিটার ব্যবহার করে রোম থেকে ত্রিপোলি—এই ছয় শত পঁচিশ মাইল পর্যন্ত বেতারে কথাবার্তা চালাতে সক্ষম হয়েছিলেন। এখানে বলা দরকার যে, ভাল্‌ভের সাহায্যে সমবিস্তারে অবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ-তরঙ্গ পাওয়া যেমন খুব সহজ হয়ে গেল, তেমনি মাইক্রোফোনের সামনে কথা বললে বা গান গাইলে, তাতে ধ্বনির জোর অনুযায়ী মাইক্রোফোন সার্কিটে যে অতি ক্ষীণ বিদ্যুতের প্রবাহ হয়, তা ভাল্‌ভের সাহায্যে বহু সহস্র গুণ বিবর্ধন করাও সম্ভব হলো। এই ভাবে ভাল্‌ভের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বেতার-টেলিফোনি ও ব্রডকাস্টিং-এর উন্নতি হয়েছে।

1913 সনে জার্মান বিজ্ঞানী A. Meissner, ভাল্‌ভের সাহায্যে সর্বপ্রথম অবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ-

*বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন।

তরঙ্গ উৎপাদন করেন। Meissner-এর এই প্রেরক-যন্ত্রের সাহায্যে এক বছরের মধ্যেই মার্কোনি অ্যাণ্ড কোম্পানী পঞ্চাশ মাইল পর্যন্ত বিনাতারে কথাবার্তা প্রেরণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ইউরোপে প্রথম মহাযুদ্ধের দু-বছরের মধ্যেই 1916 সনে, ভাল্‌ভের সাহায্যে বেতার ও গ্রাহক-যন্ত্র নির্মাণ করে আমেরিকার Arlington থেকে Honolulu পর্যন্ত প্রায় পাঁচ হাজার মাইল দূরত্বে কথাবার্তা সম্ভব হয়েছিল। 1923 সনে যুক্তরাষ্ট্রের লং আইল্যাণ্ডের Rocky point থেকে উত্তর লণ্ডনের South Gate-এ প্রেরক ও গ্রাহক-যন্ত্রে বহু শক্তিসম্পন্ন ভাল্‌ভের সাহায্যে আমেরিকা থেকে বক্তৃতা হেড-ফোন বা লাউড-স্পীকারে খুব স্পষ্টভাবে শোনা গিয়েছিল।

1924 সনে ইংল্যাণ্ড ও অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে বেতার-টেলিফোনিতে সর্বপ্রথম যোগাযোগ হয়। ইংল্যাণ্ডের Cornwall ও Poldhu-তে মার্কোনি অ্যাণ্ড কোম্পানীর প্রেরক-কেন্দ্র থেকে বেতারে যে কথাবার্তা হয়, তা অস্ট্রেলিয়ার Sydney-তে বেশ ভালই শোনা যায়। 1926 সনে ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকার দু-দিক থেকেই বেতারে কথাবার্তা চালাবার ব্যবস্থা সুরু হয়। এই ব্যবস্থায় ইংল্যাণ্ডের Rugby-তে ও আমেরিকার Rocky point-এ প্রেরক ও গ্রাহক-যন্ত্র চালু রাখা হয়। 1933 সনে যখন লণ্ডন শহরে Post Office International Telephone Exchange প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন থেকেই মিশর, ভারতবর্ষ, যুক্তরাষ্ট্র, ক্যানাডা, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, আরজেন্টাইন, ব্রেজিল প্রভৃতি দেশ এবং ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে বেতার টেলিফোনি নিয়মিতভাবে আরম্ভ হয়। এই গেল বেতার টেলিফোনির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

এবার রেডিও-ব্রডকাস্টিং-এর ইতিহাস অতি সংক্ষেপে দেওয়া যাক। মার্কোনি অ্যাণ্ড কোম্পানী Essex-এ Chelmsford নামক স্থানে যে বেতার প্রেরক-কেন্দ্র স্থাপন করেন, 1920 সনে সেই কেন্দ্র থেকেই ইংল্যাণ্ডে সর্বপ্রথম নিয়মিতভাবে রেডিও-ব্রডকাস্টিং আরম্ভ হয়। এই বছরেই ডেনমার্কের Hague-স্টেশন থেকে নিয়মিত রেডিও-প্রোগ্রাম সুরু হয়। এই বছরেই যুক্তরাষ্ট্রের Westnghouse Electric Co. সর্বপ্রথম Pittsburg থেকে রেডিও-ব্রডকাস্টিং-এর নিয়মিত ব্যবস্থা করেন। এর পর থেকেই আমেরিকা, ইউরোপ ইংল্যাণ্ডের অনেক স্থানে ব্রডকাস্টিং কেন্দ্র স্থাপিত হয়। 1923 থেকে 1926 সন পর্যন্ত বৃটিশ ব্রডকাস্টিং কোম্পানীর পরিচালনায় ইংল্যাণ্ডের বড় বড় স্থানে ব্রডকাস্টিং-কেন্দ্র ও অন্যান্য কতকগুলি স্থানে ধ্বনি-সম্প্রসারণ* কেন্দ্র (Relay centre) প্রতিষ্ঠিত হয়। এর আগে ইংল্যাণ্ডে মার্কোনি অ্যাণ্ড কোম্পানী কর্তৃক চালিত ব্রডকাস্টিং-স্টেশন ছিল মাত্র দুটি—চেম্‌সফোর্ড ও লণ্ডন। 1927 সনে বৃটিশ ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন (B. B. C.) নামে অন্য এক কোম্পানী রয়াল চার্টার নিয়ে গ্রেট-বৃটেন ও উত্তর আয়ল্যাণ্ডে রেডিও-ব্রডকাস্টিং-এর ভার নেন। ইংল্যাণ্ডে যেমন বি. বি. সি. আমেরিকায় তেমনি এন. বি. সি. (National Broadcasting Co.) ও Columbia Broadcasting System। ইউরোপের বড় বড় শহরেও এই সময় অনেক বেতার-কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। 1932 সনের ডিসেম্বর মাসে বৃটিশ সাম্রাজ্যের জন্যে এক নূতন বেতার-প্রতিষ্ঠান বি. বি. সি-র পরিচালনায় আরম্ভ হয়। তখন থেকেই Daventry স্টেশন থেকে বৃটিশ সাম্রাজ্যের জন্যে নিয়মিতভাবে গান-বজনা, বক্তৃতা, ঘোষণা ইত্যাদি চলে আসছে।

ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম রেডিও-ব্রডকাস্টিং আরম্ভ হয় মাদ্রাজ শহরে। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর

*ঢাকা বেতার কেন্দ্রের ভূতপূর্ব অধিকর্তা ডক্টর অমূল্যচন্দ্র সেন, রেডিও-ব্রডকাস্টিং ও রিলের (Relay) বাংলা করেছিলেন—ধ্বনি-বিস্তার ও ধ্বনি-সম্প্রসারণ।

রেডিও ক্লাব 1924 সনে নিয়মিতভাবে মাদ্রাজ থেকে রেডিও-প্রোগ্রাম পাঠাতে সুরু করেন। এই সময়ে কয়েকজন বেসরকারী বেতার-বিজ্ঞানীর চেষ্টায় কলিকাতা ও বোম্বাই শহর থেকেও নিয়মিতভাবে রেডিও-ব্রডকাস্টিং আরম্ভ হয়। 1927 সনে ইণ্ডিয়ান ব্রডকাস্টিং কোম্পানী স্থাপিত হয়, ভারতবর্ষে সুনিয়মিত-ভাবে রেডিও ব্রড্‌কাস্টিং এই বছর থেকেই সুরু হয় বলা চলে। বোম্বাই ও কলিকাতাই ছিল এই কোম্পানীর প্রেরক-কেন্দ্র। 1926-27 সনে স্বর্গীয় অধ্যাপক শিশিরকুমার মিত্র কলিকাতা বিজ্ঞান কলেজের লেবরেটরিতে একটি বেতার-প্রতিষ্ঠানের স্থাপনা করেন। এই বেতার কেন্দ্রটির সাংকেতিক নাম (Call sign) ছিল 2CZ। নিয়মিতভাবে অধ্যাপক মিত্রের গবেষক ছাত্রগণ এই বেতার কেন্দ্রটি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করেন। এই বেতার-কেন্দ্র থেকে গান-বাজ্‌না, বক্তৃতা প্রভৃতি পৃথিবীর সর্বত্র খুব স্পষ্টভাবেই গৃহীত হতো। কলিকাতা বিজ্ঞান কলেজের এই বেতার প্রেরক কেন্দ্রটি প্রায় দুই বছর বেশ ভাল ভাবেই চলেছিল। 1930 সনে রেডিও-ব্রডকাস্টিং ভারত গভর্নমেণ্টের অধীনে আনীত হয় এবং Indian State Broadcasting Service নামে কলিকাতা ও বোম্বাই থেকে বেতার-অনুষ্ঠান চলতে থাকে। 1936 সনে বি. বি. সি-র মিঃ কার্ক (H. L. Kirke) নামে একজন অভিজ্ঞ কর্মচারী ভারত গভর্নমেণ্টের নির্দেশে ভারতবর্ষে আসেন। এই পরিকল্পনা অনুসারে বি. বি. সি.-র সুদক্ষ রেডিও-এঞ্জিনিয়ার মিঃ গয়ডার-এর (C. W. Goyder) তত্ত্বাবধানে ভারতবর্ষে প্রথমে বড় বড় নয়টি স্থানে বেতার-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এর পরে অবশ্য ভারতবর্ষের ছোট-বড় নানা স্থানে উচ্চশক্তি-সম্পন্ন বেতার কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। 1936 সনে Indian State Broadcasting Service নাম বদ্‌লে All India Radio নাম দেওয়া হয়। 1930-1938 সন পর্যন্ত মাদ্রাজ কর্পোরেশন মাদ্রাজ বেতার কেন্দ্রটি নিয়মিতভাবে চালিয়ে এসেছিলেন। 1938 সন থেকে অল ইণ্ডিয়া রেডিও মাদ্রাজ রেডিও-স্টেশনের ভার গ্রহণ করেন।

ভারত গভর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধান ছাড়াও বরোদা, মহীশূর, ত্রিবাঙ্কুর, হায়দরাবাদ ও গোয়ালিয়র—এই কয়েকটি স্বাধীন রাজ্যেও বেতার-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বৃটিশ ভারতের অন্যান্য স্থানেও বেতার কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছিল। এদের মধ্যে এলাহাবাদের Experimental Station, দেরাদুন ব্রডকাষ্টিং অ্যাসোসিয়েশন ও লাহোর Y. M. C. A. ব্রডকাস্টিং স্টেশন উল্লেখযোগ্য।

চীন, জাপান, শ্যাম প্রভৃতি প্রাচ্য দেশের বড় বড় শহরগুলিতেও বহু বেতার-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ইউরোপের দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর বেতার-বিজ্ঞান ও টেক্‌নোলজির প্রভূত উন্নতি হয়েছে। আধুনিক কালের দূরেক্ষণ বা Television কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে ভূপৃষ্ঠের এক স্থান থেকে বহু দূরে অবস্থিত অন্য স্থানে রেডিও-ব্রডকাস্টিং ও টেলিভিশন এবং অন্যান্য অনেক আশ্চর্য টেক্‌নোলজি সম্ভব হয়েছে। বেতার-বিজ্ঞানের অতি দ্রুত প্রগতি বিজ্ঞান-জগতে বিস্ময়কর নব নব আবিষ্কারের সম্ভাবনা এনেছে সন্দেহ নেই।

আফ্রিকার তৈলপ্রদায়ী পাম গাছ

বলাইচাঁদ কুণ্ডু

তাল, নারিকেল, সুপারি প্রভৃতি শাখাবিহীন একবীজপত্রী গাছগুলিকে ইংরেজীতে palm বা palm tree বলা হয়। এই সকল গাছের মধ্যে নারিকেল গাছ ভারতবর্ষ ও অন্যান্য অনেক দেশে প্রভূত পরিমাণে দেখতে পাওয়া যায়। নারিকেল গাছকে কেরালা প্রদেশবাসিগণ কল্পবৃক্ষ বলেন। এর ফলের শাঁস থেকে মূল্যবান তৈল, খইল ও ছোব্‌ড়া থেকে খুব মজবুত আঁশ পাওয়া যায়। তাছাড়া পাতা ও কাণ্ড নানা দরকারী কাজে লাগে। নারিকেল তৈল আমাদের দেশে বহু কাজে, বিশেষতঃ রন্ধন ও প্রসাধনের জন্যে প্রচুর পরিমাণ ব্যবহৃত হয়। নারিকেল ফলের কাষ্ঠল অন্তস্তকের বাইরের ছোব্‌ড়া থেকে যে তন্তু পাওয়া যায়, তা দিয়ে নারিকেল দড়ি, সতরঞ্চি, পাপোশ প্রভৃতি নিত্য-ব্যবহার্য দ্রব্য উৎপন্ন হয়। কচি নারিকেলের (ডাবের) মধ্যে যে জল থাকে, তার ভৈষজ্য গুণাবলী সর্বজনবিদিত। বাংলাদেশের জনসাধারণ ডাবের জল খুবই আগ্রহসহকারে পান করেন।

ভারতবর্ষে নারিকেলের সকল প্রকার উন্নতি সাধনের জন্যে কেরালার কেন্দ্রীয় নারিকেল গবেষণা কেন্দ্রে নানাবিধ উন্নয়ন পরিকল্পনা নিয়ে বহুদিন থেকেই গবেষণা চলছে।

নারিকেল গাছ সম্বন্ধে বিশদভাবে আরো অনেক কিছু বলা যেতে পারে। আলোচ্য প্রবন্ধে নারিকেল গাছের মত তৈলপ্রদায়ী আফ্রিকা-দেশীয় পাম গাছ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করবো।

দেশের লোকসংখ্যা প্রভূত বৃদ্ধি পাবার ফলে নারিকেল তৈলের চাহিদাও খুব বেড়েছে। সে জন্যে এই তৈলের দাম অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে গেছে ও সাধারণ লোকের ক্রয়-ক্ষমতার বাইরে চলে গেছে। অবশ্য ভারতবর্ষে নারিকেলের চাষ বাড়াবার চেষ্টা হচ্ছে, কিন্তু আশাপ্রদভাবে চাষ বাড়ে নি। নারিকেল ব্যতীত Elaeis guinensis বা oil palm আর

1নং চিত্র
অয়েল পাম গাছ

এক প্রকার তৈলপ্রদায়ী গাছ। এই পাম গাছ চাষের অনেক সুবিধা আছে এতে বীজের শাঁস (Kernel) ছাড়া ফলের মধ্যস্তক

(Mesocarp) থেকেও প্রচুর তৈল পাওয়া যায়। এজন্যে একরপ্রতি তৈলের উৎপাদন নারিকেলের চেয়ে অনেক বেশী।

Elaeis guinensis—একে সাধারণতঃ আফ্রিকা দেশীয় তৈল উৎপাদনকারী পাম গাছ বলা হয়। এই গাছ দেখতে অনেকটা নারিকেল ও খেজুর গাছের মত। এর কাণ্ড প্রায় খেজুর গাছের মত (1নং চিত্র)। পশ্চিম আফ্রিকার সমুদ্র-কূলের জঙ্গল ও কঙ্গো নদীর অববাহিকা অঞ্চলে

এই পাম গাছের ফল নারিকেলের মত বড় হয় না। ফলগুলি অনেক ছোট, বৃন্তহীন—2·5 থেকে 5 সেন্টিমিটার লম্বা ও 2 থেকে 4 সেন্টিমিটার ব্যাসবিশিষ্ট। ফলগুলি ডিম্বাকার এবং শীর্ষদেশ বেশ তীক্ষ্ণ। বিভিন্ন উপজাতির ফলগুলি হলুদ, লাল, কমলা বা উজ্জ্বল কালো রঙের হয়ে থাকে। এক-একটি কাঁদিতে অনেকগুলি করে ফল ধরে এবং একটি মাত্র গাছ থেকে বছরে প্রায় 3000-4000 ফল (ওজনে প্রায় 30/40 কিলোগ্রাম) পাওয়া যায়।
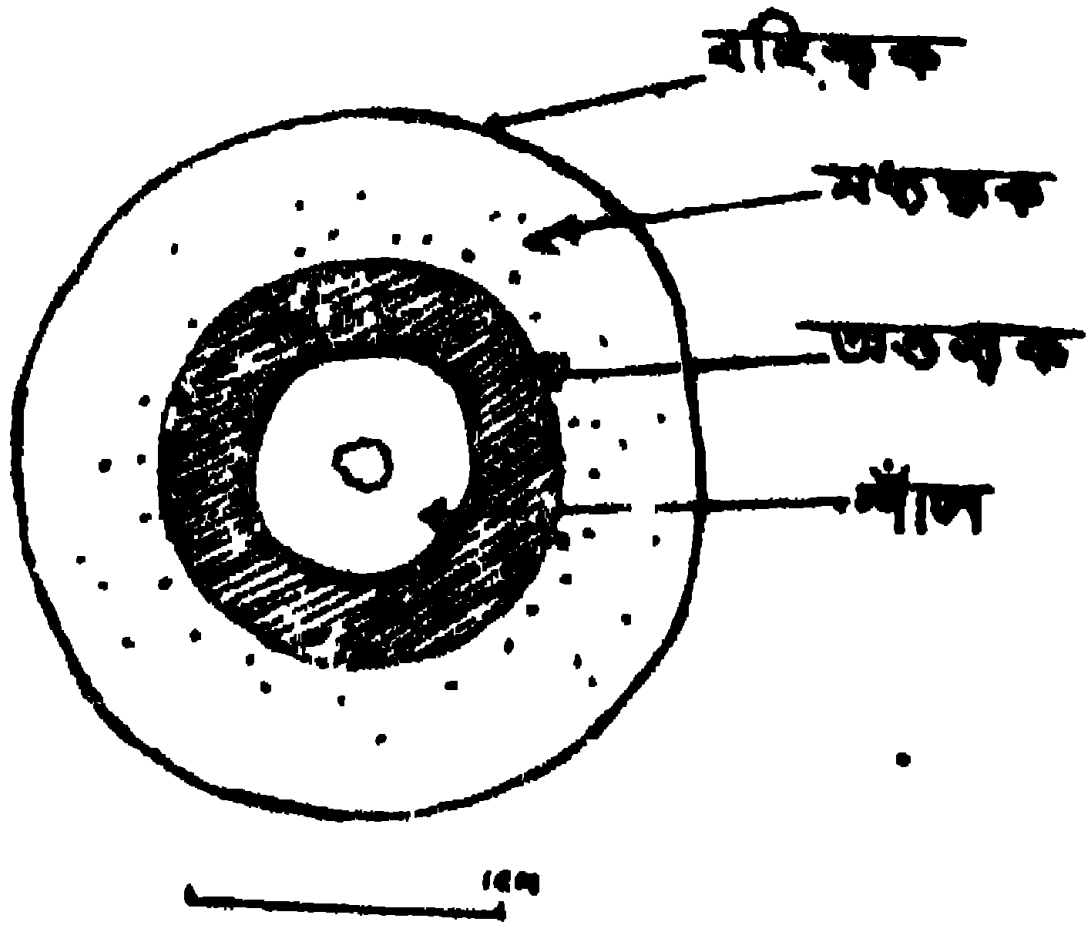
2 (ক) নং চিত্র

2 (খ) নং চিত্র

অয়েল পাম গাছের ফলের প্রস্থচ্ছেদ ও লম্বচ্ছেদ। অন্তস্ত্বক ও শাঁসের মধ্যে যে পাতলা আবরণ দেখা যাচ্ছে, তা বীজ-ত্বক (Seed coat)।
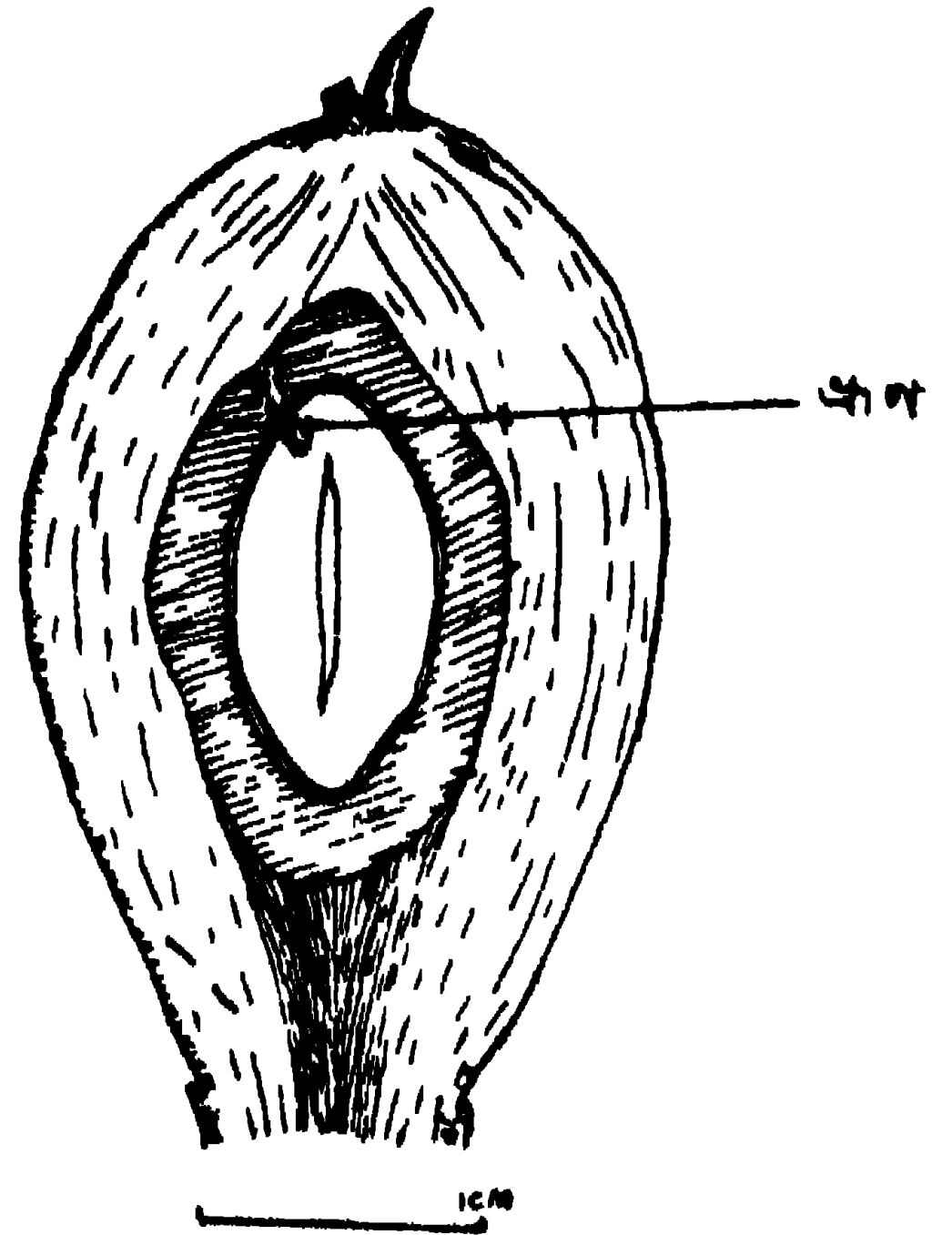
এই গাছ প্রচুর পরিমাণে জন্মায়। তৈল উৎপাদন-কারী পাম গাছের স্বাভাবিকভাবে উৎপন্ন জঙ্গল আফ্রিকার পূর্বদিকে উগাণ্ডা ও টাঙ্গানিকা পর্যন্ত বিস্তৃত। তাছাড়া দক্ষিণ আমেরিকার বৃটিশ গায়না, ব্রেজিল, পেরু, ভেনেজুয়েলা এবং ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দ্বীপপুঞ্জেও এই গাছ স্বাভাবিকভাবে জন্মায়। বর্তমানে আফ্রিকা মহাদেশের পশ্চিম উপকূলের প্রায় সকল দেশেই এবং মালয় ও ইন্দোনেশিয়ায় এর প্রচুর চাষ হয়ে থাকে।

2নং (ক ও খ) চিত্রে আড়াআড়ি ও লম্বভাবে কর্তিত ফলের আকৃতি দেখানো হয়েছে। ফলগুলি Drupe বা Stony fruit বলে পরিচিত। ফলত্বকে তিনটি স্তর আছে। বহিস্ত্বক বা ছাল পাতলা ও অন্তস্ত্বক (Shell বা Stone) অত্যন্ত শক্ত ও কাঠিন, মধ্যত্বক মাংসল। এই মধ্যত্বক থেকে প্রচুর তৈল পাওয়া যায়। তাছাড়া বীজের শাঁস থেকেও তৈল পাওয়া যায়।

পাম তৈল—আন্তর্জাতিক বাজারে মধ্যত্বক

থেকে পাওয়া তেলকে palm oil ও বীজের শাঁস থেকে পাওয়া তেলকে palm kernal oil বলা হয়। এই দুই প্রকার তেলের ব্যবহার-বিধি অনেকটা এক রকমের হলেও এদের প্রকৃতি ও স্বাভাবিক গুণ ভিন্ন প্রকারের। পৃথিবীর বিভিন্ন উদ্ভিজ্জ তৈলের মধ্যে palm oil এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। এটি রন্ধনের কাজ ব্যতীত বাতি, সাবান ও টিনপ্লেট শিল্পে ব্যবহৃত হয়। Palm kernel বা শাঁসের তেল নারিকেল তেলের সমজাতীয় এবং রন্ধনের কাজ, প্রসাধন ও সাবান তৈরির কাজে ব্যবহৃত হয়।

পাম তৈলে প্রচুর পরিমাণে ক্যারোটিন (Carotine) থাকে। এটি একমাত্র উদ্ভিজ্জ তৈল, যা থেকে ভিটামিন A পাওয়া যায়। এজন্যে পাম তৈল উৎকৃষ্ট পর্যায়ের কড্‌লিভার অয়েলের সমজাতীয় এবং মাখন থেকেও অনেক উচ্চ গুণসম্পন্ন। শাঁসের তৈল সাদা বা একটু হল্‌দে রঙের হয়। এর স্বাদ ও গন্ধ প্রায় নারিকেল তেলের মত এবং নারিকেল তেলের সমস্ত গুণ এতে আছে। উভয় রকমের তৈল থেকে, বিশেষতঃ পাম তৈল থেকে প্রচুর margarine বা কৃত্রিম মাখন তৈরি হয়। ইউরোপীয় দেশসমূহে, বিশেষতঃ হল্যাণ্ড ও জার্মেনীতে এজন্যে এর খুবই চাহিদা।

এক একর জমিতে উৎপন্ন নারিকেল গাছ থেকে বছরে 250 থেকে 350 কিলোগ্রাম তৈল পাওয়া যায়। সমপরিমাণ জমির অয়েল পাম গাছ থেকে 700 থেকে 1700 কিলোগ্রাম পাম অয়েল পাওয়া যায়। তাছাড়া শাঁস থেকেও প্রায় সমপরিমাণ তৈল পাওয়া যায়। যে কোন তৈলবীজ থেকেও একর প্রতি অনেক বেশী তৈল অয়েল পাম গাছ থেকে উৎপন্ন হয়।

শাঁস থেকে তৈল নিষ্কাশনের পর যে খইল পাওয়া যায়, গবাদি পশুর খাদ্য হিসাবে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে তা প্রচুর ব্যবহৃত হয়। খেজুর বা নারিকেল গাছের মত এদের কাণ্ড বা অপরিণত পুষ্পগুচ্ছ থেকে যে রস নিষ্কাশিত করা হয়, পশ্চিম আফ্রিকায় তা থেকে এক প্রকার মদ ও চিনি প্রস্তুত হয়। পাতা থেকে ঝুঁড়ি ও ঝাড়ু এবং পাতার ডাঁটার গোড়া থেকে যে আঁশ পাওয়া যায়, সেগুলি গদি, কুশন ইত্যাদির জন্যে ব্যবহৃত হয়। ফলের অন্তস্ত্বক (Shell) খোদাই করে নানাবিধ সৌখীন দ্রব্য তৈরি হয়। এর কয়লায় (Charcoal) নারিকেল shell-এর কয়লার সমস্ত গুণ আছে।

অয়েল পাম গাছের উপজাতি

ফলের আকৃতি ও গঠন অনুযায়ী (3নং চিত্র) পাম অয়েল গাছের তিনটি প্রধান উপজাতি আছে :—

(1) ডুরা (Dura)—এর অন্তস্ত্বক অত্যন্ত পুরু। এই উপজাতিও দুই প্রকারের হয়—আফ্রিকার ডুরা—এদের মধ্যস্ত্বক পাত্‌লা, অন্তস্ত্বক পুরু ও শাঁস বেশী। ডেলি ডুরা (Deli dura)—এদের ফলের আকৃতি অপেক্ষাকৃত বড়, আফ্রিকান ডুরা থেকে মধ্যস্ত্বক অনেক বেশী। এই জাতীয় ডুরা পামের চাষ সাধারণতঃ মালয় প্রভৃতি দেশে হয়।

(2) টেনেরা (Tenera)—এদের ফল অনেক বড় ও অন্তস্ত্বক অনেক পাত্‌লা।

(3) পিসিফেরা (Pisifera)—এদের ফল অপেক্ষাকৃত ছোট। ফলের ত্বক পুরু হয়, কিন্তু অন্তস্ত্বক খুবই পাত্‌লা। এজন্যে এদের অন্তস্ত্বকহীন (shellless) বলা হয়।

3নং চিত্রে তিন জাতীয় ফলের মধ্যস্ত্বক, অন্তস্ত্বক, (Shell) ও শাঁসের (Kernel) শতকরা ভাগ দেখানো হয়েছে।

বর্তমান কালে প্রায় অধিকাংশ দেশেই টেনেরা জাতীয় পাম গাছের চাষ সমধিক প্রচলিত,

কারণ এরূপ পাম থেকে সর্বাধিক পরিমাণ তেল পাওয়া যায়। আফ্রিকান বা ডেলি ডুরা ও পিসিফেরার সংমিশ্রণে এক সঙ্কর (Hybrid)
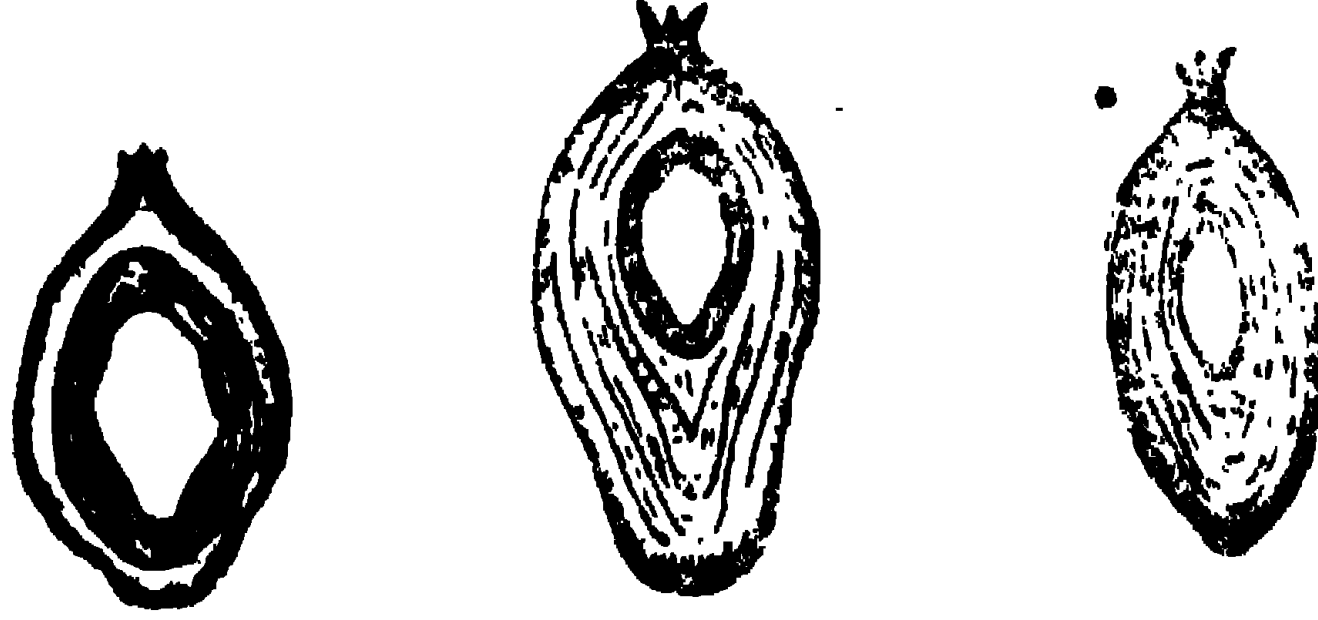
3নং চিত্র
বাঁয়ে—আফ্রিকান ডুরা, মধ্যে—টেনেরা, দক্ষিণে—পিসিফেরা
45-40-15 75-15-10 92-0-88
তিন প্রকার গাছের ফলের আকৃতি ও বিভিন্ন অংশ। সংখ্যাগুলির দ্বারা বিভিন্ন অংশের বহিস্ত্বকসহ মধ্যত্বক, কঠিন অন্তত্বক ও শাঁসের শতকরা হার দেখানো হয়েছে।

পাম গাছ কৃষি-বিজ্ঞানীরা উৎপাদন করেছেন। এর গুণাবলী অনেকটা টেনেরার মত। আজকাল এই গাছের চাষ অনেক জায়গায় হচ্ছে।

তৈল পাম চাষের উপযুক্ত আবহাওয়া

এই গাছ সাধারণতঃ গ্রীষ্মপ্রধান দেশসমূহে জন্মায়। এদের চাষ করবার জন্যে নিম্নলিখিত আবহাওয়া আবশ্যক।

(1) বৃষ্টিপাত—সারা বছর সমভাবে বণ্টিত 1250 থেকে 3000 মিলিমিটার (50 থেকে 120 ইঞ্চি) বৃষ্টিপাত। 3 মাসের বেশী অনাবৃষ্টি বা খরা হলে গাছের বৃদ্ধি স্বাভাবিক হয় না।

(2) উষ্ণতা (Temperature)—24°-28° ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেড উষ্ণতা গাছের সুষ্ঠু বৃদ্ধির পক্ষে অনুকূল। উষ্ণতা 18°C-এর নীচে বা 32°C-এর উপরে হলে গাছের ক্ষতি হয়।

(3) বাতাসের আর্দ্রতা (Humidity)—যে সব দেশে বাতাসের আর্দ্রতা বেশী, সেখানে এই গাছ ভালভাবে জন্মায়। এই আর্দ্রতা অন্ততঃ 75 শতাংশ হওয়া আবশ্যক।

(4) সূর্যালোক—বারো মাস সমভাবে বণ্টিত বছরে অন্ততঃ 1500 ঘণ্টা সূর্যালোক গাছের বৃদ্ধির পক্ষে অনুকূল।

নিম্ন অম্লতাযুক্ত (p-H 8-0 থেকে 6-0) দোআঁশ মাটিতে এই গাছ ভালভাবে জন্মায়। বেলেমাটি বা কঙ্করময় মাটিতে এই গাছ জন্মাতে পারে, তবে বৃদ্ধি আশানুরূপ হয় না। যে সব স্থানে বৃষ্টিপাত অপেক্ষাকৃত কম বা বারো মাস সমভাবে বণ্টিত হয় না, সে সব স্থানে মাটির জলধারণ ক্ষমতা বেশী থাকলে চাষের ক্ষতি হয় না।

তৈলপ্রদ প্রচুর ফল উৎপাদন করে বলে এই পাম গাছ মাটি থেকে অধিক পরিমাণে নাইট্রোজেন ও ফস্ফরাসঘটিত উদ্ভিদ-খাদ্য শোষণ করে। এই কারণে প্রতি বছর গাছগুলিতে যথেষ্ট পরিমাণ জৈব বা অজৈব বা উভয় প্রকার সার প্রয়োগ করা আবশ্যক।

অয়েল পামের চাষ

এই জাতীয় গাছের চাষ নারিকেল চাষের মত নয়। নারিকেল ফল (ছোব্‌ড়াসহ) লাগিয়ে তা-

থেকে অঙ্কুরোদ্গমের ব্যবস্থা করা হয়। অয়েল পাম গাছের বীজ (ফলের কাঠিন অন্তস্ত্বকসহ) পাকা ফল থেকে সংগ্রহ করে বীজতলায় লাগানো হয়। সেখানে দু-তিন মাসের মধ্যে বীজগুলির অঙ্কুরোদ্গম হয় (4নং চিত্র)। 6 থেকে 12 মাসের চারাগুলি যখন 25 থেকে 50 সেন্টি-মিটার লম্বা হয়, তখন সেগুলি তুলে নিয়ে অন্য স্থানে রোপণ করা হয়। প্রত্যেক গাছের জন্যে বেশ বড় গর্ত করে তাতে সার দিতে হয়। একটি গাছ থেকে অপর গাছের দূরত্ব সাধারণতঃ 8 থেকে 10 মিটারের মত রাখা হয়। মধ্যে মধ্যে গর্তগুলির চারধারে যথেষ্ট সার দিতে হয়। নিয়মিত সার প্রয়োগ করলে ফলনও বেশী হয়।

এই গাছের পাতা নারিকেল গাছের পাতার মত কাণ্ড থেকে স্বাভাবিকভাবে পড়ে যায় না। খেজুর গাছের মত পাতাগুলিকে মধ্যে মধ্যে কেটে দিতে হয়। 4 থেকে 6 বছর বয়স হলে গাছগুলিতে ফল ধরতে আরম্ভ করে এবং 25-30 বছর ধরে খুব ফল দেয়। তার পর থেকে ফলন কমতে থাকে।

তৈল উৎপাদনের পরিমাণ

সম্প্রতি আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে এই গাছের চাষের অনেক উন্নতি হয়েছে। আগে হেক্টর প্রতি 1 টন তৈল উৎপন্ন হতো, এখন দেখা যাচ্ছে যে, উন্নত পদ্ধতিতে চাষ করলে ফলের ত্বক থেকে 3 থেকে 4 টন পাম অয়েল উৎপন্ন হতে পারে। সাধারণতঃ ফলের মধ্যত্বক থেকে 15-16 শতাংশ তৈল উৎপন্ন হয়। উন্নত পদ্ধতিতে চাষ করলেও নব উদ্ভূত সঙ্কর জাতীয় গাছের ফলের মধ্যত্বক থেকে 20 থেকে 23 শতাংশ তৈল পাওয়া সম্ভব হয়েছে। নিম্নে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের তৈলের উৎপাদনের পরিমাণ দেখানো গেল।
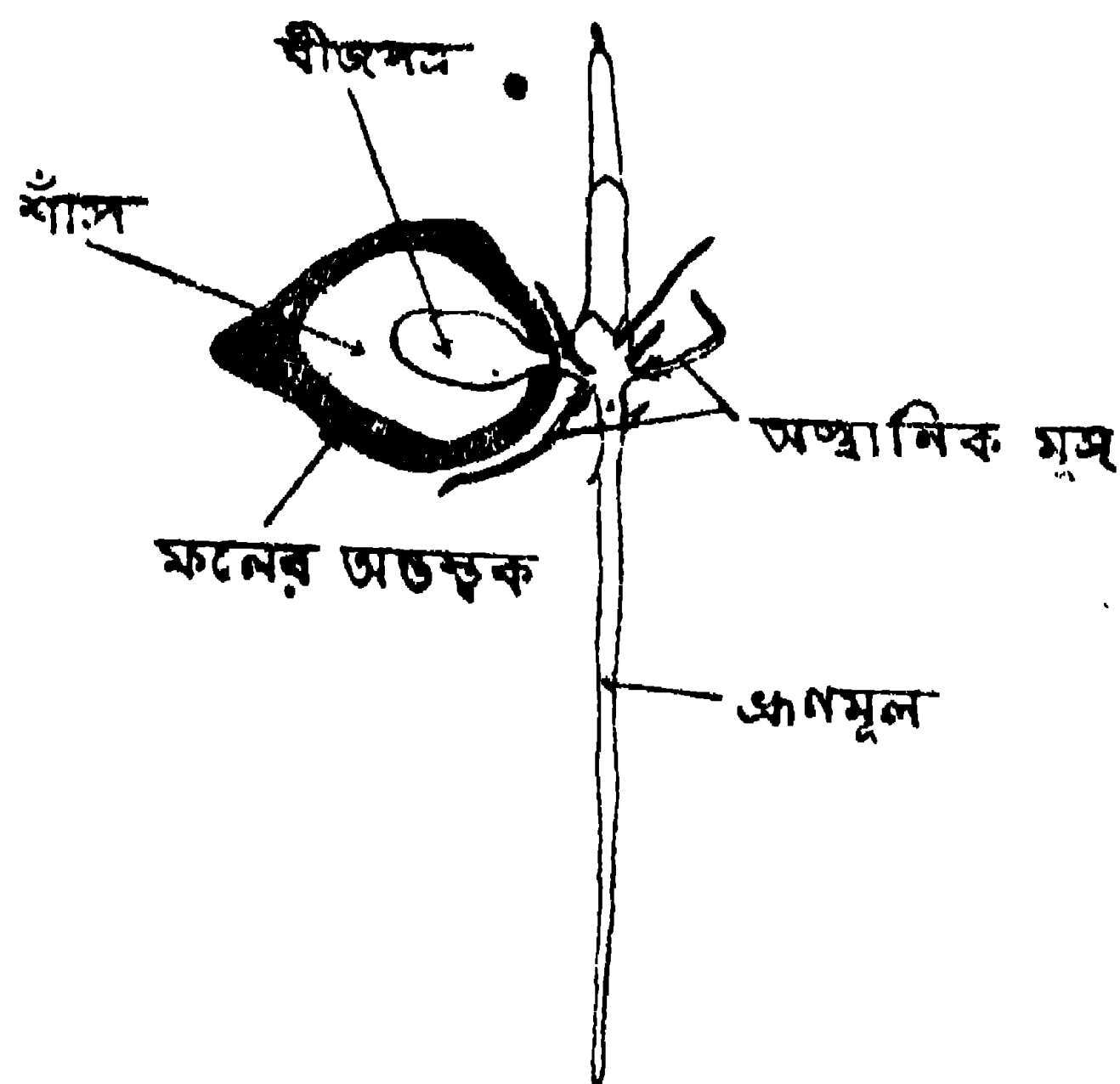
4নং চিত্র

অয়েল পাম বীজের অঙ্কুরোদ্গম। ফলের কঠিন অন্তস্ত্বকের দ্বারা বীজটি আবৃত। চিত্রে অন্তস্ত্বক ও শাঁস (Kernel বা Endosperm)-এর মধ্যে যে পাতলা বীজত্বক আছে, তা দেখানো হয় নি

পাম তৈলের উৎপাদন-পরিমাণ 1000 মেট্রিকটন

	পাম অয়েল						শাঁসের তৈল					
	1948-49	1958-59	1959-60	1960-61	1961-62	1962-63	1948-49	1958-59	1959-60	1960-61	1961-62	1962-63
আফ্রিকা	800	930	910	890	900	860	750	870	840	820	800	730
দূর প্রাচ্য	163	218	210	233	241	250	39	54	53	57	59	61
ল্যাটিন আমেরিকা	...	21	22	...	...	...	100	150	150	160	180	190
মোট উৎপাদন	963	1169	1142	1123	1141	1110	889	1074	1043	1037	1039	981

উপরে 1962-63 সাল পর্যন্ত উৎপাদনের পরিমাণ দেখানো হয়েছে। গত কয়েক বছরে উন্নত ধরণের চাষের ফলে উৎপাদনের পরিমাণ অনেক বেড়েছে। দুঃখের বিষয় বর্তমান উৎপাদনের পরিমাণের সংবাদ আমার কাছে নেই। 1966 সালে লেখক ল্যাটিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশে ভ্রমণকালে পেরু ও ব্রেজিলে অয়েল পাম চাষের উন্নতির জন্যে সরকারী প্রচেষ্টা দেখে এসেছেন। এই গাছের চাষ খুবই লাভজনক। ঐ সব দেশের সরকার ফরাসী ও ডাচ বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করে চাষের উন্নতির ব্যবস্থা করেছেন। তাছাড়া ঐ সব দেশে চাষ বাড়াবার চেষ্টাও হচ্ছে।

ভারতে অয়েল পাম চাষের সম্ভাবনা

প্রায় 40 বছর আগে এই পাম গাছ ভারতের আবহাওয়ায় জন্মাতে পারে কিনা, তা দেখবার জন্যে বিভিন্ন বোটানিক গার্ডেনে আনীত হয়েছিল এবং এই গাছের চাষ লাভজনক হয় কিনা, তা দেখবার জন্যে কেরালার কয়েকটি স্থানে পরীক্ষামূলকভাবে চাষের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। বোটানিক গার্ডেনসমূহে রোপিত গাছগুলির বৃদ্ধি ভালভাবে হয়েছে এবং ফলের উৎপাদনও ভাল হয়েছিল। কিন্তু এর চাষ তখন লাভজনক বলে মনে হয় নি। তখনকার কর্তৃপক্ষের ধারণা হয়েছিল যে, দেশে নারিকেল তৈল যথেষ্ট সুলভ ও সহজলভ্য—এই কারণে বিদেশ থেকে আনীত এই গাছের চাষের চেষ্টার আবশ্যক নেই। এই কারণে ঐ প্রকল্প পরিত্যক্ত হয়।

40 বছর আগে দেশের লোকসংখ্যা অনেক কম ছিল। তৎকালে উৎপন্ন নারিকেল তৈল সুলভ ও সহজলভ্য ছিল। বর্তমানে দেশের লোকসংখ্যার অস্বাভাবিক বৃদ্ধির ফলে নারিকেল তৈলের উৎপাদন কিছু বাড়লেও তা সুলভ নয়। সিংহল থেকে আমদানী করেও দেশের চাহিদা মেটানো যাচ্ছে না। এই কারণে এখন থেকে আফ্রিকা দেশীয় এই পাম গাছ চাষের চেষ্টা আবার করা আবশ্যক। ভারতের কয়েকটি স্থানে এই গাছ চাষ করবার উপযুক্ত আবহাওয়া আছে। বর্তমান অয়েল পামের চাষের যে সব উন্নতি হয়েছে, তা অনুসরণ করলে ভারতে এই গাছের চাষ সফল ও লাভজনক হবে। দেশে বিভিন্ন খাদ্যবস্তুর উৎপাদন বৃদ্ধির জন্যে নানা প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। আশা করি, সরকার শীঘ্রই পাম অয়েল চাষের একটি প্রকল্প চালু করে এই খাদ্যতৈল, তথা সাবান তৈরির উপযুক্ত ও প্রসাধনে ব্যবহৃত তৈলের উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থা করবেন।

অপরাধ-বিজ্ঞানে সনাক্তকরণ

জীমূতকান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়

অপরাধ তদন্তের প্রাথমিক প্রয়োজনই হচ্ছে, অপরাধী ও সন্দেহভাজন ব্যক্তির সঠিক পরিচয় নির্ণয় করা—তাকে উপযুক্ত ভাবে সনাক্ত করা। কারণ এর দ্বারাই সম্ভব হয় সংঘটিত কোন অপরাধের সঙ্গে সম্ভাব্য অপরাধীর অপ্রাপ্ত যোগ-সূত্র নির্ধারণ করা, যা অপরাধ তদন্তের মূল কথা।

সঠিক ব্যক্তি পরিচয় নির্ণয় (Personal identificatin) তাই অপরাধ তদন্তে অপরিহার্য। এর দ্বারা শুধু যে প্রকৃত অপরাধী ধরা পড়ে তাই নয়, নির্দোষ ব্যক্তিও নিষ্কৃতি পায়। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে সারা পৃথিবীর পুলিশ আজ ক্রমেই বেশী করে নির্ভর করছে বস্তুনিষ্ঠ বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির সাহায্যে ভ্রান্তি ও ত্রুটিমুক্ত সনাক্তকরণ বা অভ্রান্ত পরিচয় নির্ণয়ের উপর।

এই উদ্দেশ্যে প্রথম সুসংবদ্ধ প্রচেষ্টা করেন আলফানসো বার্টিলোন (Alfanso Burtillon), যিনি অ্যানথ্রোপোমেট্রি (Anthropometry) নামক এক পদ্ধতির উদ্ভব করেন। এই প্রথা মূলতঃ নির্ভর করতো অপরাধীর শারীরিক মাপজোখের ভিত্তিতে প্রস্তুত বিস্তৃত তথ্যতালিকার উপর—যা সন্দেহ-ভাজন ব্যক্তির অনুসন্ধানে কাজে লাগানো হতো। গত শতকের শেষ অবধি সারা পৃথিবী জুড়ে ছিল এই পদ্ধতির প্রচলন। কিন্তু এই পদ্ধতিতে বিস্তর ভুলভ্রান্তি ধরা পড়তো। তাছাড়া সব ক্ষেত্রে এটা প্রয়োগ করাও সম্ভব হতো না।

এই সময়ে ফটোগ্রাফিও ততটা উৎকর্ষ ও কার্যকারিতা লাভ করে নি, যার দরুণ ফটোগ্রাফির তথ্য-প্রমাণকেও নস্যাৎ করে দেওয়া চতুর অপরাধীর পক্ষে খুব অসম্ভব ছিল না।

এই অবস্থার প্রতিকারে বিশ্বব্যাপী পুলিশ কর্তৃক নিয়মিত অপরাধ তদন্তের কাজে প্রচলিত হলো আঙুল-ছাপের (Finger print) ভিত্তিতে সনাক্ত-করণ প্রথা। এই শতকের গোড়া থেকে এটাই সারা পৃথিবীতে গৃহীত হয়েছে এক অবিসংবাদিত তদন্তসহায়ক রূপে। আদি আঙুল-ছাপ পদ্ধতিতে ক্রমে ক্রমে এসেছে অনেক পরিবর্তন ও পরিবর্ধন। ঐ সংযোজন ও সংস্করণের কাজ এখনো শেষ হয়ে যায় নি। বর্তমানেও আঙুল-ছাপই অপরাধ তদন্তের অন্যতম প্রধান নির্ভরযোগ্য উপাদান।

অপরাধ তদন্তে উত্তরোত্তর উন্নত বৈজ্ঞানিক কলা-কৌশল প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তি সনাক্ত-করণ সমস্যাও বেশী করে মনোযোগ আকর্ষণ করছে। দেখা গেছে যে, আঙুল বা আলোকচিত্র সব সময় সুলভ না হওয়ায় অপরাধী বা অপরাধের ঘটনা অথবা দুর্দৈবে কবলায়িত ব্যক্তিদের সঠিক পরিচয় নির্ধারণ অনেক সময় বেশ দুরূহ সমস্যারূপে দেখা দেয়। আর ভুল সনাক্তকরণ বা পরিচয় নির্দোষ ব্যক্তির পক্ষে বিস্তর দুর্ভোগ ও বিপদের কারণ হতে পারে।

তাই এই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজে শুধু প্রচলিত পদ্ধতির উপর নির্ভর না করে থেকে চললো নিত্য নতুন উপায় উদ্ভাবন ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং অনেকগুলিতে আশাতীত সাফল্য লাভ করা গেল।

পরিচয়জ্ঞাপক সরঞ্জাম বা আইডেনটিটি কিট্ (Identity Kit)

আলোকচিত্র গ্রহণ যদিও অপরাধ তদন্তে প্রচুর সাহায্য করে থাকে, তথাপি এর ত্রুটিও রয়েছে কম নয়। ভুল সনাক্তকরণের সম্ভাবনাও এতে রয়েছে। অবশ্য ভিডিও (Video) টেপ-

রেকর্ডার পদ্ধতিসহ টেলিভিশন এই ফটোগ্রাফির কাজে যুক্ত হওয়ায় অপরাধীর পরিচয় সংক্রান্ত তথ্য সুষ্ঠুতরভাবে গ্রহণ ও সংরক্ষণের চেষ্টা হচ্ছে। এই সব তথ্য আদালতে প্রমাণ হিসাবে গ্রাহ্য হচ্ছে ও পুলিশ বিভাগে অপরাধী সনাক্তকরণের (Identification parade) গতানুগতিক অনুষ্ঠানের বদলে এই পদ্ধতির সাহায্য নেওয়া হচ্ছে। এই পদ্ধতি যদিও বর্তমানে বেশ কিছুটা ব্যয়সাধ্য, তথাপি এর দ্বারা বিপুল পরিমাণ তথ্য-প্রমাণ সঞ্চিত করে রাখা সম্ভব। দেখা গেছে, উদ্দিষ্ট ব্যক্তির পরিচয় নির্ণয়ের কাজে প্রতি মিনিটে প্রায় 66,000 আলোকচিত্রের অনুসন্ধান ও পরীক্ষা এর দ্বারা করা সম্ভব। অধিকন্তু এর সাহায্যে কোন ফটোগ্রাফের অতি উৎকৃষ্ট নকল বা কপি দ্রুত প্রস্তুত করে বিশেষ টেলিফোন লাইন বা বেতারের মাধ্যমে নিমেষে স্থানান্তরে পাঠানো সম্ভব। বহু দূরের ষ্টেশনেও তার মারফৎ পাঁচ মিনিটেরও কম সময়ে এই ফটোবার্তা পাঠানো সম্ভব। এছাড়া এই ফটোবার্তাকে সুসংবদ্ধ স্থায়ী নথি বা তথ্যরূপে সংরক্ষণ করা সম্ভব, যাতে দরকারমতই তা ব্যবহার করা চলে। বিদেশে পুলিশ সংস্থা এখন তাদের কাজে এই সব আধুনিক পদ্ধতি বেশী করে ব্যবহার করছেন।

সাম্প্রতিক ফটোগ্রাফির সরঞ্জামের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, ইনফ্রারেড-রে ক্যামেরা, যার সাহায্যে রাতের অন্ধকারে ফ্লাশগানের সাহায্য ছাড়াই লুকিয়ে থাকা বা পলায়মান অপরাধীর ফটো তোলা বা সন্ধান পাওয়া সম্ভব।

তাছাড়া আলোকচিত্রের ভিত্তিতে ব্যক্তি পরিচয়জ্ঞাপক তথ্য গ্রহণের উদ্দেশ্যে সম্প্রতি প্রচলিত হয়েছে আইডেনটিটি কিট্ সিস্টেম বা সনাক্তকরণ সরঞ্জামের ব্যবহার। এতে কাজে লাগানো হয় একই জিনিষের—যেমন মানুষের মুখের কতকগুলি স্বচ্ছ সান্নিবদ্ধ বহিরাবণ খোলসকে (Overlays)। এই বহিরাবণ খোলসগুলিই মানুষের মুখের বিভিন্ন অংশের এক-একটি নমুনা। 6টি থেকে 9টি এমন বহিরাকৃতির যুক্ত খোলস মিলে তৈরি হয় এক একটি সম্পূর্ণ মুখাকৃতির নমুনা—কোন ক্যামেরা বা শিল্পীর সাহায্য ছাড়াই।

এই ভাবে কয়েক মিনিটের মধ্যেই গড়ে তোলা যায় কোন মানুষের সম্পূর্ণ মুখাবয়ব, যার সাহায্যে তদন্তকারী অফিসার সন্দেহভাজন অপরাধীকে ধরে ফেলতে সক্ষম হন।

হাতের আঙুল ও পায়ের ছাপ

হাতের আঙুল-ছাপ ও তার শ্রেণী বিচারের বিশেষ মৌলিক উন্নতি কিছু হয় নি, যদিও বিভিন্ন দেশের সংগ্রহশালায় রক্ষিত বহু লক্ষ আঙুল-ছাপ বাছাই ও পরীক্ষার কাজে সুবিধার জন্যে চালু হয়েছে নানা উপশ্রেণী বিভাগ। এখনকার সমস্যা হচ্ছে, অনেক বেশী সংখ্যক আঙুলের ছাপের তালিকাভুক্তি করা ও তাদের ভিতর থেকে যথাসম্ভব দ্রুততা ও নির্ভুলতার সঙ্গে উদ্দিষ্ট কোন আঙুল-ছাপ সম্পর্কে অনুসন্ধান চালানো। টেলিভিশন ভিডিও-টেপ (Vision+odeo) শোনা ও দেখা যায়, এমন ফিতা সঞ্চালিত টেলিভিশন পদ্ধতির সাহায্যে সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় তথ্যসহ প্রতিটি আঙুলের ছাপ নথিভুক্ত করে রাখা সম্ভব হয়েছে। পাঁচ লক্ষের উপর আঙুল-ছাপ সংরক্ষণ ও সর্বদা ব্যবহারের কাজে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছে। আঙুল-ছাপের শ্রেণী বিচার, বাছাই ও তল্লাসীর কাজে কম্পিউটারের সাহায্য নেবার চেষ্টাও করা হয়েছে এবং তদনুযায়ী আঙুল-ছাপের ক্ষেত্রে ইলেকট্রনিক ডেটা প্রোসেসিং বা ইলেকট্রনিক পন্থায় তথ্য সাজাবার ব্যাপারে এযাবৎ সাফল্য লাভ হয়েছে অসামান্য।

টেলিফোন মারফৎ আঙুল-ছাপের কপি পাঠানো আজকাল সব অগ্রসর দেশে প্রচলিত

হচ্ছে। এই উদ্দেশ্যে উপযুক্ত সাজসরঞ্জামও বিভিন্ন জায়গা থেকে পাওয়া সম্ভব হচ্ছে। নতুন ফটো-টেলিগ্রাফি পদ্ধতিতে প্রতি ইঞ্চিতে 200 লাইন পর্যন্ত পরিষ্কারভাবে গ্রহণ ও প্রেরণ করা যাচ্ছে। রেডিও প্রেরণ পদ্ধতিতে খরচা একটু বেশী, কিন্তু কার্যকারিতাও সেই সঙ্গে বেশী। সে যাই হোক, এই সব পদ্ধতিতে আঙ্গুলের ছাপ অল্প সময়ের মধ্যে দীর্ঘ দূরত্বে পাঠিয়ে সত্বর অনুসন্ধান ও পরীক্ষা চালানো সম্ভব হয়েছে। শিল্পবিজ্ঞানে উন্নত দেশগুলিতে ইতিমধ্যেই এই পদ্ধতির যথেষ্ট প্রচলন হয়েছে।

অনেক গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে এবং কয়েকটি পদ্ধতিও প্রচলিত হয়েছে। পেরিফটো-গ্রাফি ক্যামেরার সাহায্যে এখন যে কোন ছোট বৃত্তাকার বস্তুর উপর পরিপূর্ণ আঙ্গুল-ছাপের ছবি গ্রহণ সম্ভব।

চামড়ার খাঁজ (Ridges) সহ অনাবৃত পায়ের ছাপ বা পাদুকা-ছাপের ও হাতের আঙ্গুলের ছাপের পাশাপাশি মূল্যবান ভূমিকা রয়েছে ব্যক্তির পরিচয় নির্ধারণে—অর্থাৎ সনাক্তকরণে। কারো ব্যবহার করা পায়ের জুতা আজকাল বিশেষভাবে কাজে লাগছে তুলনামূলক বিচারের ভিত্তিতে সনাক্তকরণের কাজে।
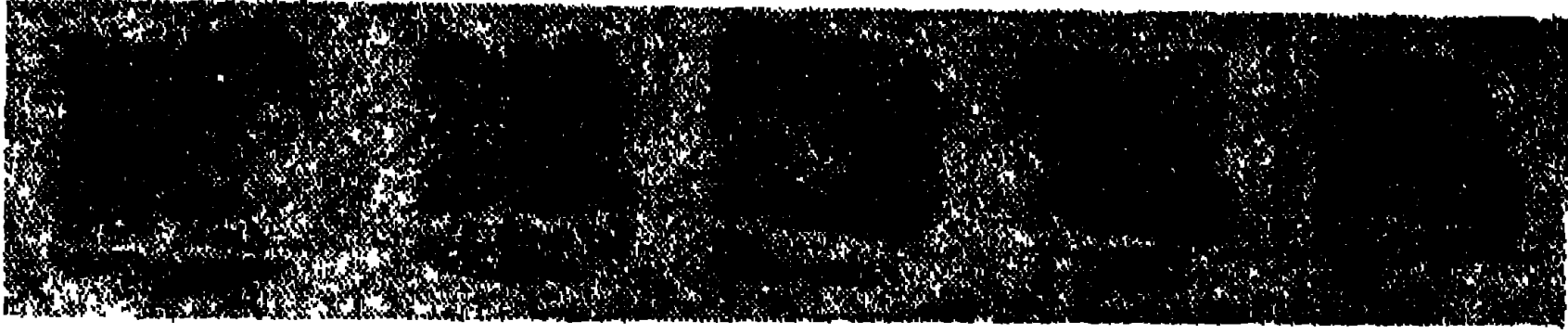
পুলিশের নথীভুক্ত আঙ্গুল-ছাপের এক সারির প্রতিলিপি।

কঠিন ও জটিল পরিস্থিতিতে আঙ্গুল-ছাপ উদ্ধারের জন্যেও নানা কৌশল উদ্ভাবিত হচ্ছে; যেমন—আক্রান্ত, আহত বা মৃত ব্যক্তির গায়ের চামড়ার উপর থেকে অপরাধীর বা মৃতের আঙ্গুল-ছাপ উদ্ধারের জন্যে ইলেকট্রনোগ্রাফি কৌশলের ভিত্তিতে রঞ্জেন-রশ্মি প্রয়োগের এক পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে। এই পদ্ধতিতে আহতের বা মৃতের গায়ের চামড়া বা আঙ্গুলের মাথার উপর সীসার গুঁড়া ছড়িয়ে দিয়ে রঞ্জেন-রশ্মির সাহায্যে উপযুক্ত ছবি নেওয়া হয়। আবার একই উপায়ে বাষ্পীভবন প্রক্রিয়ায়ও কাগজের উপর ছড়িয়েদেওয়া ধাতব গুঁড়ার সাহায্যে দু-বছর পর্যন্ত সময়ের ব্যবধানেও আঙ্গুলের ছাপ উদ্ধার করা যায়।

গলিত, বিদগ্ধ ও শুকিয়ে যাওয়া (Mummified) দেহ থেকে হাতের আঙ্গুলের ছাপ গ্রহণ সম্পর্কে

আঙ্গুল-ছাপ ও পায়ের ছাপ ছাড়াও আজকাল মানুষের অন্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, যেমন—কান এমন কি, ঠোঁটও ব্যক্তিবিশেষকে সনাক্তকরণের ব্যাপারে অপরাধ তদন্তে খুব কাজে লাগছে।

বিশেষ করে কান—কানের নক্সা নাকি মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত অপরিবর্তনীয়। সম্প্রতি কানের 12টি অংশের এক তুলনামূলক বিচার-পদ্ধতি প্রস্তুত হয়েছে। এই পদ্ধতি অনুযায়ী কানের সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য ও তার প্রামাণ্য সব তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে, যাতে কানের তুলনামূলক মিল বা প্রভেদ ধরা পড়ে। তবে বিষয়টি এখনও অধিকতর গবেষণাসাপেক্ষ।

অপরাধ তদন্তে ঠোঁটের ছাপের এক অভিনব প্রয়োগের কথা শোনা গেছে সম্প্রতি জাপান থেকে। চা বা পানীয়ের পেয়ালায় আমরা সবাই চুমুক দিয়ে থাকি। সেই পেয়ালায় যদি

দৈবাৎ অপরাধীর ঠোঁটের ছাপ লেগে যায়, তবে তা অপরাধীর পক্ষে প্রায় মৃত্যুপরোয়ানার সামিল হতে পারে।

দু-জন বিশিষ্ট জাপানী দন্তচিকিৎসক ডাঃ কাজুও সুজুকী এবং ডাঃ ইয়াসুৎসুচিহাশি সম্প্রতি আঙুলের ছাপের মত মানুষের ঠোঁটের ছাপেরও এক শ্রেণী বিভাগ বের করেছেন—যা ব্যক্তিবিশেষকে সনাক্তকরণে আঙুলের ছাপের মতই অভ্রান্ত বলে তাঁরা মনে করেন। এই শ্রেণী বিভাগ প্রস্তুত হয়েছে ঠোঁটের উপরের চামড়ার খাঁজকাটা ধরণের (Ridge pattern) মোট পাঁচটি সুস্পষ্ট নমুনার উপর নির্ভর করে। তাঁরা নমুনা হিসাবে প্রায় 1000 পাঁচমিশালী লোক নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন। এদের মধ্যে ছিল প্রায় 15 জোড়া অভিন্ন আকৃতির যমজ লোক। গবেষকদ্বয় দেখেছেন, এদের প্রত্যেকেরই ঠোঁটের ছাপ অন্যের চেয়ে স্বতন্ত্র ও চিনে বের করবার মত।

গত জানুয়ারী মাসেই (1971) টোকিও শহরে সংঘটিত এক রাহাজানিতে অপরাধী সচিত্র ম্যাগাজিনের ছবির গায়ে ঠোঁটের চুম্বন চিহ্ন রেখে যায়। তদন্তকালে সুজুকী সেই ঠোঁটের ছাপের সাহায্যে পুলিশকে খুঁজে বের করতে সাহায্য করে সেই ঠোঁটের ছাপের অধিকারী অপরাধীকে। শেষ অবধি তার অপরাধ প্রমাণিত হয় ও সাজা হয়ে যায়।

পুলিশের কাজে ঠোঁটের ছাপ-বিজ্ঞানের মূল প্রবক্তা হচ্ছেন আমেরিকার লস এঞ্জেলস্-এর পুলিশ বিভাগের ভূতপূর্ব অপরাধ-বিজ্ঞানী লেফটেন্যান্ট লী জোন্‌স, যিনি 1954 সালে কোন এক মোটর দুর্ঘটনায় আহত জনৈকা নারীর ঠোঁটের ছাপের উপর নির্ভর করে দুর্ঘটনার জন্যে দায়ী ড্রাইভারকে খুঁজে বের করতে সক্ষম হন। গাড়ীর গায়ে পাওয়া আহত নারীর ঠোঁটের ছাপ ছিল তদন্তের প্রধান সূত্র। অবশ্য এই বিষয়টি বহু গবেষণাসাপেক্ষ।

মৃত্যুর পরে মৃত ব্যক্তিকে ঠিকমত সনাক্ত করা অনেক সময়ই বেশ কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। মাটির নীচে পুঁতে ফেলা বা কবর দেওয়া খণ্ডবিখণ্ড গলিত বিকৃত শবের দেহাবশেষ বা কঙ্কালের অংশবিশেষ পরীক্ষা করে তার আসল পরিচয় উদ্‌ঘাটন প্রায়ই অপরাধ তদন্তের একটি অত্যাবশ্যকীয় অথচ দুরূহ অঙ্গ।

চিকিৎসা ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক মূল বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতির ফলে এই ব্যাপারে পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা অভ্রান্ত রায় পাওয়া সম্ভব হচ্ছে। নিহতের বয়স সঠিকভাবে নির্ধারণে করোটির অংশবিশেষ কার্নিয়াল ষ্ট্যাচার (Carnial statures) পরীক্ষা, ব্যাপক হতাহতের ক্ষেত্রে দেহের ফিমার (Femur) হাড়ের মজ্জায় লাল ও হলদে অংশের পরীক্ষা এবং এছাড়া ডায়াফিসিস (Diaphysis) হাড়ের টুকরা পরীক্ষা—এসব হচ্ছে কয়েকটি সাম্প্রতিক অনুসৃত পদ্ধতি। এছাড়া সম্ভাব্য ইস্‌ট্রোমেট্রিক বা বলকারক চেতনা সঞ্চার পদ্ধতির সাহায্যও এই ব্যাপারে অধিকতর ফল লাভের চেষ্টা করা হচ্ছে।

মস্তিষ্কের করোটির হাড়ের সঙ্গে মৃতের ফটোগ্রাফ সুপারইমপোজিশন পদ্ধতিতে—একটার উপর অন্যটা রেখে—মিলিয়ে তুলনামূলক বিচারের দ্বারা মৃতের সনাক্তকরণ একটা পরীক্ষিত সফল কৌশল। মৃতদেহকে রঞ্জেন-রশ্মির দ্বারা পরীক্ষা করে সেই ফটো—মৃতের জীবিতাবস্থায় কোন সময় চিকিৎসাকালীন গৃহীত—কোন রঞ্জেন-রশ্মির ফটোর সঙ্গে তুলনামূলক পরীক্ষা করে অনেক সময় মৃতদেহ সনাক্তকরণের মূল্যবান সূত্র পাওয়া সম্ভব হয়েছে।

এছাড়াও আছে আর এক বিচিত্র পদ্ধতি যার নাম ফটো-রোবট পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে কোন ব্যক্তিবিশেষকে যে চেনে বা চোখে দেখেছে, এমন কোন ব্যক্তির শুধু মাত্র স্মৃতিশক্তির উপর নির্ভর করে তার সাহায্যে উদ্দিষ্ট ব্যক্তির চেহারার বৈশিষ্ট্য

সঙ্কলিত করে একটা সম্ভাব্য আকৃতি দান করা হয় বিভিন্ন নমুনার সংগৃহীত ফটোগ্রাফ থেকে মিলিয়ে। এই ভাবে প্রস্তুত ছবির সাহায্যে সহজেই উদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে চিনে বের করা বা সনাক্ত করা সম্ভব।

ফরেনসিক ওডোনটোলজি (Forensic-odontology) বা অপরাধ তদন্তসম্পর্কিত দন্ত-বিজ্ঞান ব্যক্তি চেনায় বিশেষ সাহায্য করছে। এই বিজ্ঞানে দাঁতের উৎপত্তি ও অভিন্নতা বিচার করা হয় পরীক্ষা ও গবেষণার সাহায্যে।

কয়েকটি গুরুতর নরহত্যা মামলায় ফটোগ্রাফের সাহায্যে—সুপারইমপোজিশন পদ্ধতিতে অর্থাৎ একটির উপর আর একটি রেখে মিলিয়ে ব্যক্তি-বিশেষের দাঁতের সনাক্তকরণ সম্ভব হয়েছে এবং তা আদালতে অপরাধীর বিরুদ্ধে নির্ভরযোগ্য তথ্য-রূপে স্বীকৃত হয়েছে। সম্প্রতি যুক্তরাজ্যের একটি হত্যা মামলায় নিহতের দেহে তিনটি দাঁতের কামড়ের চিহ্নই ছিল হত্যার প্রধান প্রমাণ। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তুলনামূলক বিচারের দ্বারা শেষ অবধি প্রমাণিত হয় যে, এই কামড় অপরাধীরই দাঁতের কামড়। বিভিন্ন মানুষের দাঁতে থাকে বিভিন্ন রকমের বৈশিষ্ট্য বা বিকৃতি ; যেমন—কারো দাঁতে থাকে হয়তো সোনা বা রূপার ঝালাই, কারো দাঁত কৃত্রিম বা বাঁধানো, কারো কোন দাঁত নেই বা দাঁতে পোকাধরা বা অন্য রোগ—যার দ্বারা নিঃসন্দেহে বোঝা যায়, কোন্ দাঁতের মালিক কে বা কোন্ কামড় কার মুখের দাঁতের। শুধু যে আসল অপরাধী এতে ধরা পড়ে তাই নয়, ভুল বা সন্দেহবশতঃ ধৃত নির্দোষ ব্যক্তিও এর দ্বারা রেহাই পেয়ে যায়। এই তুলনামূলক দাঁতের পরীক্ষায় দাঁতের রঞ্জেন-রশ্মির চিত্র বা সাধারণ আলোকচিত্র খুব অভ্রান্তভাবে কাজে লাগে।

কৃত্রিম দাঁত প্রস্তুতকারকের বিশেষ চিহ্ন (Trade বা manufacturing marks) দিয়ে দাঁত ও সেই সঙ্গে দাঁতের মালিককে চিনে বের করা সম্ভব। বাস্তবিক পক্ষে এখন দাঁতের দ্বারা
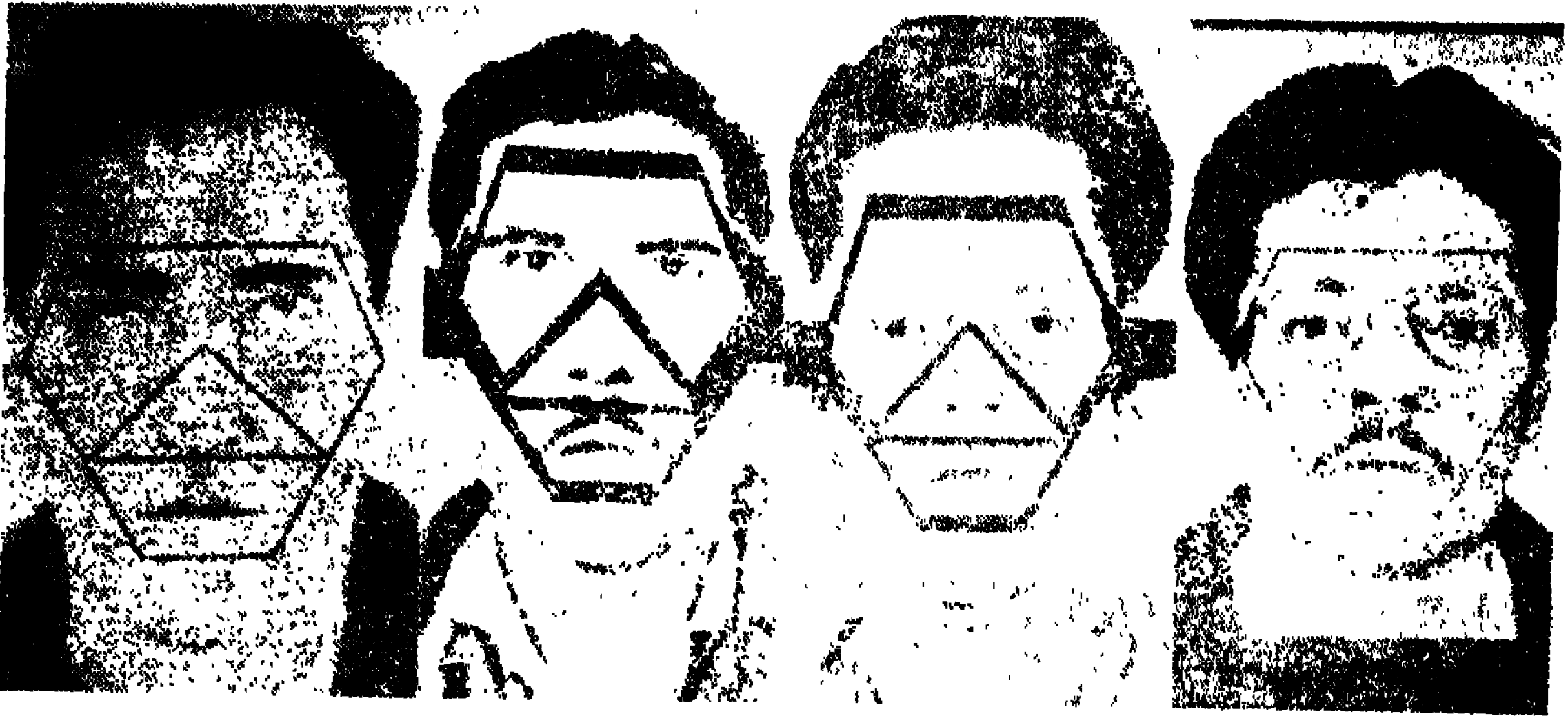
ফটো-রোবট পদ্ধতিতে প্রস্তুত আলোকচিত্র। সর্ববামের চিত্রটিতে মুখের মূল আদলের নক্সা চিহ্নিত হয়েছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় ছবিতে (বাম দিক থেকে) মুখাকৃতির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য সমন্বিত করে সম্ভাব্য আকৃতিটি তৈরী করবার চেষ্টা করা হয়েছে। সর্ব দক্ষিণের চিত্রটি এই প্রচেষ্টার ফল। এর দ্বারা উদ্দিষ্ট লোককে বের করা সম্ভব।

সনাক্তকরণ পদ্ধতি এতদূর সঠিক ও নির্ভরযোগ্য হয়ে উঠেছে যে, আজকাল বহু দেশের যাত্রী বিমান সংস্থা ও পুলিশ বিভাগে তাদের কর্মীদের দাঁতের বিধিসম্মত পূর্ণ বিবরণ সংরক্ষণ করছেন, যাতে দরকারমত তা সনাক্তকরণের কাজে লাগানো যায়। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, যে দাঁত আগে শুধুমাত্র ব্যক্তিবিশেষের আনুমানিক বয়স নির্ধারণের কাজে ব্যবহৃত হতো, তা আজকাল ব্যক্তি সনাক্তকরণের অন্যতম এক নির্ভরযোগ্য অবলম্বন।

জৈব নির্যাস ও চুল

মানুষের দেহের জৈব নির্যাসের মধ্যে ব্যক্তির পরিচয় নির্ধারণে যে জিনিষের ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, তা হচ্ছে দেহের রক্ত। অবশ্য বর্তমানে রক্ত শুধু কোন জিনিষের অস্তিত্বের চেয়ে অনস্তিত্ব প্রমাণ করতেই বেশী সক্ষম, অর্থাৎ নেতিবাচক (Negative) প্রমাণ হিসাবেই রক্তের তথ্যমূল্য অকাট্য। সচরাচর এ, বি ও ও—রক্তের এই তিনটি শ্রেণী বিভাগের দ্বারা ব্যক্তিবিশেষকে তার দেহের রক্তের প্রকৃতি অনুযায়ী এ, বি, এ+বি এবং ও—এই চারটি আলাদা শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। তাই অপরাধ-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই শ্রেণী বিভাগের উপযোগিতা ও প্রয়োগক্ষেত্র সীমাবদ্ধ।

সম্প্রতি রক্তের স্বরূপ বিচারে অন্য ভিত্তিতে রক্তের শ্রেণী বিভাগ প্রচলিত হয়েছে ; যেমন—এম এন (M N) ও আর এইচ (R H) বিভাগ। এগুলি অপরাধসংক্রান্ত নিয়মমাফিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। সর্বাধুনিক জৈব রসায়নিক ও রোগ প্রতিষেধক (Biochemical and Immunological) পদ্ধতিতে ব্যক্তিবিশেষের রক্তের গঠন, উপাদান ও বিস্তারিত বৈশিষ্ট্য নিয়ে গবেষণা চলছে। একটি বিবরণে জানা যায় যে, এর দ্বারা শেষ অবধি হয়তো 5 কোটি লোকের মধ্যেও যে কোন এক বিশেষ উদ্দিষ্ট ব্যক্তির দেহের রক্তের বিশেষ উপাদানের ভিত্তিতে—তাকে বেছে বের করা সম্ভব হবে। রক্তের শ্রেণী বিভাগের পদ্ধতিতেও হয়েছে প্রভূত উন্নতি এবং তাকে অপরাধ-বিজ্ঞানের কাজে বিশেষ উপযোগী করে তোলা হয়েছে।

বাস্তবিক পক্ষে আজকাল শুধুমাত্র কয়েকটি ছোট রক্তেভেজা আঁশ বা চুলের সাহায্যেই রক্ত-বিশেষজ্ঞ পারেন রক্তের সঠিক শ্রেণী বলে দিতে।

একই পদ্ধতিতে চামড়া, মাংসপেশীর আঁশ, শুক্র, লালা বা থুথুর সাহায্যেও ক্ষেত্রেবিশেষে রক্তের শ্রেণী নির্ণয় করা সম্ভব। বৈদ্যুতিক ও তেজস্ক্রিয় বিশ্লেষণ পদ্ধতি আজকাল অপরাধ-বিজ্ঞান সংক্রান্ত রক্ত বিচার-বিশ্লেষণের প্রায় অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর দ্বারা আসল অপরাধী নির্ণয় যেমন সম্ভব, তার চেয়ে বেশী সম্ভব নির্দোষ

মানুষের মাথার চুল বহু গুণ পরিবর্ধিত আকারে। লক্ষণীয় ভিতরের কালো রঙের মূল শাঁস (Medula), যার বাইরে আছে আর একটি আবরণ।

ব্যক্তিকে সন্দেহের আওতা থেকে যত শীঘ্র সম্ভব অব্যাহতি দান।

বহু বছরের গবেষণার ফলে মানুষের মাথার চুল ব্যক্তির পরিচয় নির্ণয়ে, তথা সনাক্তকরণে এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। চুলের চিরাচরিত গঠন ও বয়স বিচার ছাড়াও সম্প্রতি চুলের সাহায্যে মানুষের লিঙ্গ নির্ণয় এবং রক্তের মত মানুষের চুলেরও শ্রেণী বিভাগ করবার প্রয়াস করা হয়েছে। উপরিউক্ত কৌশল ছাড়াও নিউট্রন অ্যাকটিভেশন অ্যানালিসিস পদ্ধতিতে পারমাণবিক বিশ্লেষণের সাহায্যে সন্দেহভাজন ব্যক্তির চুল ও অপরাধসংক্রান্ত ঘটনায় প্রাপ্ত চুল নিয়ে তুলনামূলক পরীক্ষার দ্বারা উভয়ের অভিন্নতা নির্ণয় করা হয়ে থাকে।

তেজস্ক্রিয় বিশ্লেষক কৌশলে নির্ধারিত চুলের নানা অতি সূক্ষ্ম মৌল উপাদানের লেশ, যেমন—ম্যাঙ্গানিজ, সোডিয়াম, ক্লোরিন, আয়রন কোবাল্ট, নিকেল প্রভৃতির সাহায্যে অপচয় বা বিকৃতি না ঘটিয়ে চুলের তুলনামূলক সূক্ষ্ম বিচার ও বিশ্লেষণ সম্ভব। বিষয়টি যথেষ্ট সম্ভাবনাময়।

হস্তাক্ষর

ব্যক্তিবিশেষের হাতের লেখায় তার নিজস্ব রীতি ও বৈশিষ্ট্যের বিচারই হচ্ছে হস্তলিপি বিশারদের পরীক্ষার ভিত্তি। এক্ষেত্রেও যথেষ্ট সফলতা লাভ করা গেছে—বস্তুনিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে পাওয়া সূত্রকে বিধিবদ্ধভাবে ব্যবহার করে। আজকাল হস্তলিপির তুলনামূলক বিচারে, একের সঙ্গে অন্যের অভিন্নতা নির্ণয়ে, জ্যামিতিক মাপজোখের সাহায্য নেওয়া হচ্ছে। হস্তলিপি সংক্রান্ত তথ্যকে বিভিন্ন ভাষার বর্ণমালার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা ও বিচার করা হয়েছে, যাতে এই কৌশল বিশ্বের সর্বত্র সমানভাবে কার্যকরী হয়।

ইচ্ছাকৃতভাবে হাতের লেখা বদলানো বা গোপন করা ছাড়াও আছে বয়োবৃদ্ধি, রোগ, মত্ততা বা মানসিক উত্তেজনাজনিত হস্তাক্ষরের রূপ পরিবর্তিত হবার সমস্যা। এই ব্যাপার নিয়েও গবেষণা চলেছে এবং সাফল্য লাভ করা গেছে অনেকটা। যেমন একই লোকের ইচ্ছাকৃত দুই সম্পূর্ণ বিপরীত ঢঙের লেখাতেও নির্ণয় করা সম্ভব হয়েছে মূল ঐক্যসূত্র। উভয় লেখায় এই সূক্ষ্ম সাদৃশ্য সাধারণের চোখে ধরা না পড়লেও বিশেষজ্ঞের চোখে ধরা পড়বেই।

এছাড়া জালিয়াতি বা অন্য উদ্দেশ্যে তুলে-ফেলা বা মুছে ফেলা হাতের লেখাও পুনরুদ্ধার সম্ভব নানা কৌশলে, যার মধ্যে রয়েছে পিন ফোঁড়া কৌশল—অসুদ্দেশ্যে কোন এক পত্র লেখক জনৈকা ভদ্রমহিলাকে একখানা আপত্তিকর চিঠি লিখে নিজের নাম ঠিকানা ভুলক্রমে লিখে ফেলে। অবশেষে সে তা রাবার দিয়ে ঘষে তুলে ফেলে। কিন্তু তাতেও সে নিষ্কৃতি পায় নি। বিশেষজ্ঞের সাহায্যে সেই ঘষে তোলা ঠিকানার পাঠোদ্ধার হয়ে শেষ পর্যন্ত সে ধরা পড়ে যায়।

তুলে বা মুছে ফেলা লেখার সীমারেখা বরাবর কৌশলে এমনভাবে আলপিন দিয়ে পর পর ছিদ্র করে সাজিয়ে যাওয়া হয়, যাতে সেটা আলোর সামনে ধরলে তুলে বা মুছে ফেলা লেখাটা ফের পড়া এবং তার ফটো তোলা সম্ভব হয়। এর নাম পিনফোঁড়া কৌশলে হস্তাক্ষর পুনরুদ্ধার।

ভয়েস প্রিণ্ট

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ডাঃ কেরসটারের যুগান্তকারী আবিষ্কার এই স্বর-মুদ্রণ বা ভয়েস প্রিণ্ট। এই পদ্ধতিটা হচ্ছে—ব্যক্তিবিশেষের কণ্ঠস্বর স্পেকট্রোগ্রাফ (Spectograph) নামক ইলেকট্রনিক যন্ত্রের সাহায্যে রেকর্ড থেকে কাগজের বুকে শব্দের অঙ্কিত নক্সা বা ছবিরূপে স্থানান্তরিত ও লিপিবদ্ধ করা—যার দরুণ কানে-শোনা শব্দের একটা অঙ্কিত দৃশ্যগোচর রূপ লাভ

করা যায়। এটা আবার অনেক সংখ্যায় ছাপিয়েও নেওয়া চলে। এই জাতীয় স্পেকট্রোগ্রাম বা দৃশ্যগোচর শব্দের আকৃতি হয় সাধারণতঃ বিভিন্ন পরিসরের অনিয়মিত আকৃতির কতকগুলি খাড়া (Vertical) এবং আড়াআড়ি (Horizontal) রেখার (Band) সমন্বয়। এই স্বর-মুদ্রণকে ধরা টনে। টেলিফোন ইত্যাদি মারফৎ ভয় দেখানো, অর্থ ইত্যাদি দাবী করা, তঞ্চকতা করা, মহিলাকে অশ্লীল ও আপত্তিকর সম্ভাষণ করা, কাউকে অহেতুক হয়রানি ও বিরক্তি উৎপাদন আজকাল বিশ্বব্যাপী এক সাধারণ সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভয়েস প্রিন্ট এই সব ক্ষেত্রে অপরাধীর কণ্ঠস্বরের

পাঁচজন পুরুষের কণ্ঠে 'ইউ' উচ্চারণের ভয়েস প্রিন্ট। উপরের দক্ষিণে এবং নিম্নের বামে একই ব্যক্তির ভয়েস প্রিন্ট।

হয় ব্যক্তিবিশেষের কণ্ঠস্বরের এক অকাট্য প্রমাণ রূপে, কারণ কোন দু-জন বক্তারই কণ্ঠস্বরের নক্সার (Pattern) পরিমাপ ও বৈচিত্র্য অবিকল এক হওয়া সম্ভব নয়। বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা গেছে, সনাক্তকরণে এই পদ্ধতির সাফল্যের পরিমাণ শতকরা প্রায় 99·75 ভাগ। এই কৌশল সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহার করা হয়েছে 'ভুতুড়ে' টেলিফোন সংলাপে অজ্ঞাত ব্যক্তির পরিচয়ের রহস্য উদ্‌ঘা- এক অভ্রান্ত স্বরলিপি রূপে প্রায় নির্ভুলভাবে তার পরিচয় নির্ণয়ে সক্ষম।

ওলফ্যাকট্রনিক্স বা আঘ্রাণ তত্ত্ব

ওলফ্যাকট্রনিক্স (Olfactronics) বা আঘ্রাণ তত্ত্বের সাহায্যে মানুষের ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের দ্বারা বা অন্য উপায়ে যে কোন গন্ধের উৎস নির্ণয় ও পরিমাপ করা যায়। বস্তুবিশেষের গন্ধের পরিমাপ ও

ঘনত্ব নির্ভর করে, কি পরিমাণ বিশেষ গুণ ও বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন বাষ্প বস্তুবিশেষ থেকে নির্গত হচ্ছে—তার উপর। গন্ধের পরিমাণ নির্ণয় করতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে উপযুক্ত বাষ্প ও তরল বিশ্লেষক ক্রোম্যাটোগ্রাফ যন্ত্র, যার সঙ্গে যুক্ত থাকে উচ্চশক্তিসম্পন্ন ডিটেকটর বা নির্ধারক যন্ত্র। মাদক বা বিস্ফোরক দ্রব্যাদির উৎস নির্ণয় ছাড়াও এই যন্ত্র ব্যবহৃত হচ্ছে ব্যক্তিবিশেষের দেহের স্বকীয় ঘ্রাণ নির্ণয়ের কাজে। তাছাড়া দেখা গেছে, কোন ব্যক্তিবিশেষ কোন ঘ্রাণ-বস্তুর সংশ্রবে বেশ কিছুক্ষণ কাটালে তার দেহ থেকেও সেই ঘ্রাণের রেশ খুঁজে পাওয়া সম্ভব। এই উপায়েই অপকর্মের সঙ্গে অপরাধীর সংশ্রব নির্ণয়ও সম্ভব। এতে প্রমাণিত হতে পারে অপরাধীর অপরাধ। এ নিয়ে আরও বিস্তর গবেষণা চলেছে।

এই সব কারণে আশা করা যায় যে, সে দিন খুব বেশী দূরে নয়, যে দিন সনাক্তকরণের মাধ্যমে অপরাধী নির্ণয়ের আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত কলাকৌশল শুধু পৃথিবীর উন্নত দেশগুলিতেই সীমাবদ্ধ থাকবে না—তা ছড়িয়ে পড়বে পৃথিবীর সর্বদেশে; ফলে সভ্য সমাজের জটিলতর ও ক্রমবর্ধমান অপরাধের মোকাবেলাও সেই অনুপাতে সাফল্য লাভ করবে।
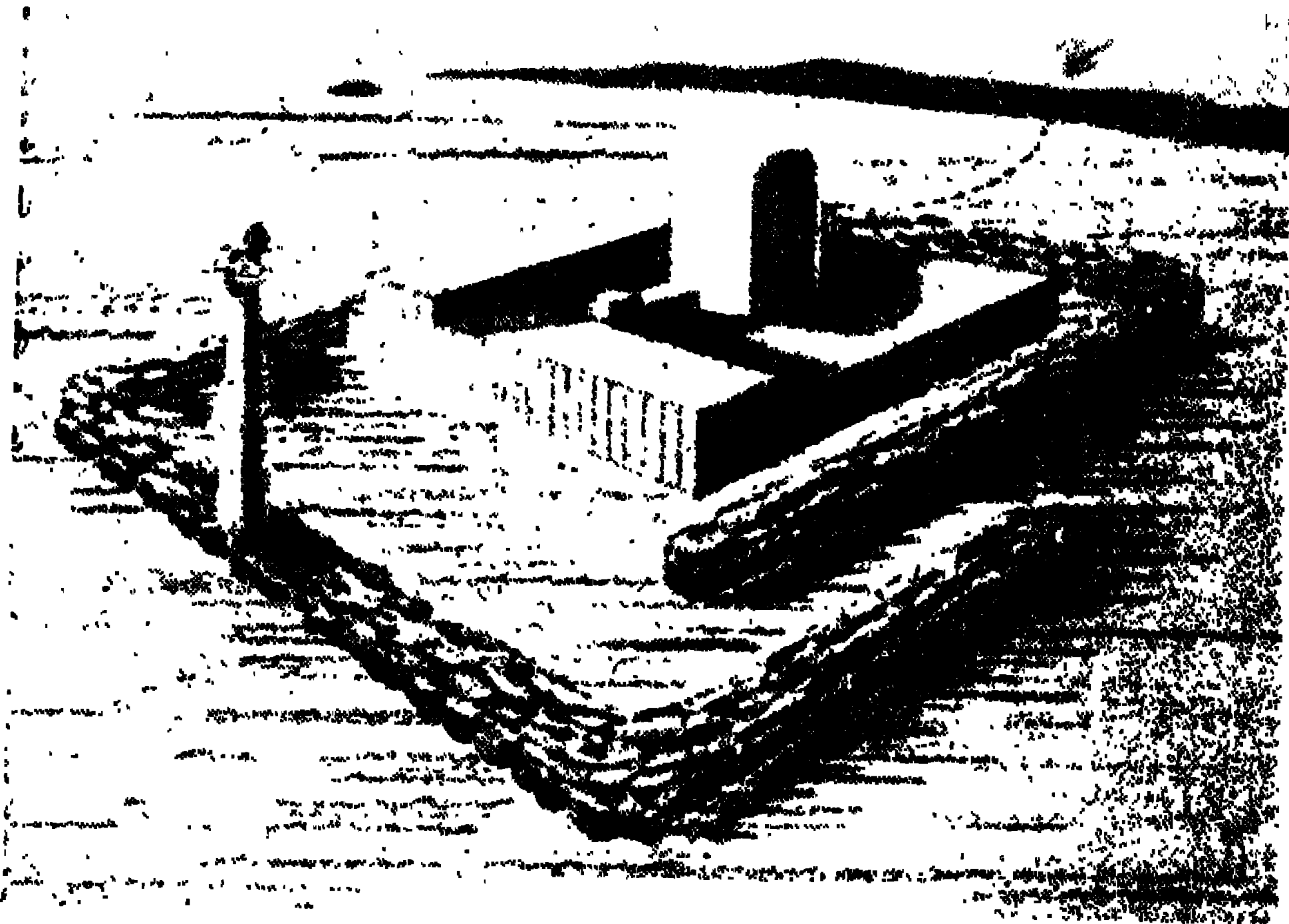
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউজার্সির উপকূলের কাছে অ্যাটলান্টিক মহাসাগরে এই রকম একটি ভাসমান পরমাণুশক্তি উৎপাদন কেন্দ্র গড়ে তোলবার পরিকল্পনা আছে। কেন্দ্রটি বিরাট একটি বজরার উপর ভাসমান থাকবে। এখানে 11 লক্ষ কিলোওয়াট বিদ্যুৎশক্তি উৎপন্ন হবে। প্রস্তাব কার্যকরী হলে 1980 সালের গোড়ার দিকে একে রূপদান করা হবে। ছবিটি প্রস্তাবিত কেন্দ্রের নক্সা।

বৈজ্ঞানিক শিল্প প্রবর্তনে দূষিত পরিবেশ এবং তার প্রতিকার

প্রিয়দারঞ্জন রায়

জনকয়েক প্রাচীনপন্থী আদর্শবাদী ব্যতিরেকে আর সকলে একবাক্যে স্বীকার করবেন যে, বৈজ্ঞানিক শিল্পের কারখানা প্রতিষ্ঠায় মানুষের জীবনযাত্রার মান ও সুখ সুবিধা বেড়ে গেছে অভাবনীয় রূপে। কিন্তু এ-ও মানতে হবে যে, মানুষকে তার প্রত্যেক সুখ-সুবিধা বাড়াবার জন্যে প্রকৃতির দরবারে অনেক মূল্য ও মাশুল দিতে হয়। বিজ্ঞানীদের পরীক্ষায় এর প্রমাণ পাওয়া যায়।

জীবনযাত্রার দুটি প্রধান ও অপরিহার্য উপকরণ হচ্ছে—বায়ু এবং জল। এই দুটিই প্রকৃতির অকৃপণ দান। বায়ুর অভাবে মানুষ কয়েক মিনিটের বেশী বাঁচতে পারে না। তৃষ্ণায় জল না পেলেও বেশীক্ষণ বাঁচা যায় না। কিন্তু এরা আবার দূষিত হলেও মানুষের স্বাস্থ্য ও জীবন হানির সম্ভাবনা ঘটে।

বায়ু দূষিতকরণ

বায়ুর উপাদান আয়তনে শতকরা 78 ভাগ নাইট্রোজেন, 21 ভাগ অক্সিজেন, 0·9 ভাগ কার্বন ডাই-অক্সাইড, 0·03—6·04 ভাগ বিরল গ্যাস এবং বাকীটা জলীয় বাষ্প। কোন কারণে যদি বায়ুতে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বেড়ে যায় (শতকরা 0·1 ভাগ), তাতে মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়ে। সেরূপ অক্সিজেনের পরিমাণ যদি অনেক কমে যায়, তাতেও মানুষের শ্বাসরোধ হতে পারে। এছাড়া, কোন কোন দূষিত পদার্থ, যথা—কার্বন মনোক্সাইড গ্যাস অতি অল্প মাত্রাতে (আয়তনে শতকরা 0·125) থাকলেও বায়ু বিষাক্ত হয়। তাতে মানুষের মৃত্যু ঘটে। অনেকে জানেন যে, রাত্রে ঘরের দরজা, জানালা সব বন্ধ করে কয়লার আগুন জ্বালিয়ে রেখে ঘুমুলে মানুষ মারা যায়। কারণ বদ্ধ বায়ুতে কয়লা জ্বলতে থাকলে শুধু কার্বন ডাই-অক্সাইড নয়, কার্বন মনোক্সাইডেরও উৎপত্তি হতে পারে। বড় বড় শিল্প কারখানার চুল্লীতে অহরহ প্রচুর পরিমাণে কয়লা জ্বলতে থাকে (কোক ওভেন, ব্লাষ্ট ফার্নেস ইত্যাদি)। ফলে বায়ুতে বিপুল পরিমাণ কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস মিশ্রিত হয়। বড় বড় শহরে যেখানে বহু মোটর গাড়ী ও বাস চলাচল করে, তাতে যে পেট্রোল পোড়ে তাতেও কার্বন ডাই-অক্সাইড ও জৈব রাসায়নিক গ্যাসীয় পদার্থের (কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ঘটিত) সৃষ্টি হয়ে বায়ুকে দূষিত করে। মানুষের স্বাস্থ্যের পক্ষে এই সব গ্যাস বিশেষ ক্ষতিকর। কয়লাতেও অল্প-বিস্তর সালফার থাকে। কয়লা পোড়বার সময় সালফার ডাই-অক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন হয়ে বায়ুতে মিশে যায়। এটি মানুষের পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর। কারখানার চিম্‌নি থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড, সালফার ডাই-অক্সাইড, জলীয় বাষ্প এবং কয়লার সূক্ষ্ম ধূলিকণা নিঃসৃত হয়ে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে। বাড়ীর উনুনে কয়লা জ্বললেও কার্বন ডাই-অক্সাইড, কার্বন মনোক্সাইড, সালফার ডাই-অক্সাইড ইত্যাদি গ্যাস ও কয়লার ধূলিকণা ঐভাবে বায়ুকে দূষিত করে। শীতকালে কলকাতার মত শহরে নাকে কাপড়

দিলে কয়লার ধূলিতে কালো হয়ে যায়। H_2SO_4, HCl, HNO_3 ইত্যাদি অ্যাসিডের কারখানার চিমনি থেকেও SO_2, HCl গ্যাস, Oxides of Nitrogen অল্পবিস্তর পরিমাণে বেরিয়ে আসে। Cl_2 গ্যাস, ব্লিচিং পাউডার ইত্যাদির কারখানা থেকে Chlorine বায়ুকে দূষিত করে। এর প্রতিকারের জন্যে প্রত্যেক শিল্পপ্রধান দেশে নানাবিধ আইন বিধিবদ্ধ করা হয়েছে, যাতে কারখানার চিমনি থেকে নির্ধারিত পরিমাণের অধিক স্বাস্থ্যহানিকর গ্যাস বেরিয়ে এলে কারখানার কর্তৃপক্ষ দণ্ডনীয় হবেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও বড় বড় শিল্পপ্রধান নগরে এই জাতীয় ক্ষতিকর পদার্থের অস্তিত্ব বায়ুতে পরীক্ষায় বহুল পরিমাণে দেখা গিয়েছে। এসব শহরে CO_2, CO, SO_2, H_2S, ধাতু ও কয়লার ধূলিকণার বহু টন প্রতি বছরে কয়লা, পেট্রোল, তেল ইত্যাদির প্রজ্বলন থেকে এবং নানাজাতীয় কারখানার চিমনি থেকে বায়ুমণ্ডলে নিঃসৃত হতে থাকে।

শিল্প-প্রতিষ্ঠানের অঙ্গারসঞ্জাত ধূলিকণার দ্বারা বায়ু বিশেষভাবে দূষিত হয়ে থাকে।

আরও একটি ভয়াবহ ক্ষতিকর পদার্থ বায়ুতে বর্তমান যুগে দেখা গিয়েছে। এটি হলো পরমাণু-বোমার বিস্ফোরণ থেকে প্রক্ষিপ্ত তেজস্ক্রিয় পদার্থ। এগুলি মানুষের পক্ষে দারুণ ক্ষতিকর। অনেকে এদের দুরারোগ্য ক্যান্সার প্রভৃতি রোগের কারণ বলে নির্দেশ করেন। বৃষ্টির জলে ধৌত হয়ে এরা মাটিতে মেশে এবং মাটি থেকে মানুষের খাদ্য শাকসব্জিতে প্রবেশ করে। বায়ু থেকে, এবং এসব শাকসব্জি থেকে মানুষের দেহে অনুপ্রবেশ করে। বলা বাহুল্য পৃথিবীর সবকয়টি শক্তিশালী জাতিই পরমাণুবোমা বিস্ফোরণের পরীক্ষা করছেন সময়ে সময়ে।

জল দূষিতকরণ

জীবনধারণের একটি প্রধান উপকরণ হচ্ছে জল। বহু বৈজ্ঞানিক শিল্প প্রবর্তনে পানীয় জলও কিভাবে দূষিত হচ্ছে, তার কিছু সংক্ষেপে বর্ণনা করা হবে এখানে।

কলকারখানার অপজাত পদার্থবাহী নর্দমার জল এবং শহরের মলমূত্র ও আবর্জনাবাহী পয়ঃ-প্রণালীর জল ইত্যাদি জলাশয়ে ও নদীতে গিয়ে পড়ে। তাতে এগুলির জল দূষিত হয় এবং ঐ জলে মৎস্যাদিও রোগগ্রস্ত হয়। এই সব মৎস্য থেকে নানাবিধ রোগের বীজ মানুষের দেহে প্রবেশ করে। এখানে একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক—কানাডা হাডসন নদীর উপর ক্ষার ও ক্লোরিন তৈরির একটি বিরাট কারখানা আছে। বেশী পরিমাণ পারদযুক্ত মাছ সমূহ ক্ষতি করে। কানাডা সরকার হাডসন নদীর মাছ নিষিদ্ধ খাদ্য বলে ঘোষণা করেছেন।

পরমাণু বোমা ও পারমাণবিক শক্তি সৃষ্টির জন্যে যে সব প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে, তাদের পয়ঃ-প্রণালী থেকেও সমুদ্রের জল অহরহ নানাবিধ তেজস্ক্রিয় পদার্থের সংমিশ্রণে দূষিত হয়। ঐ জলের মৎস্যাদিও এই কারণে মানুষের খাদ্য হিসাবে বিশেষ ক্ষতিকর হবার সম্ভাবনা।
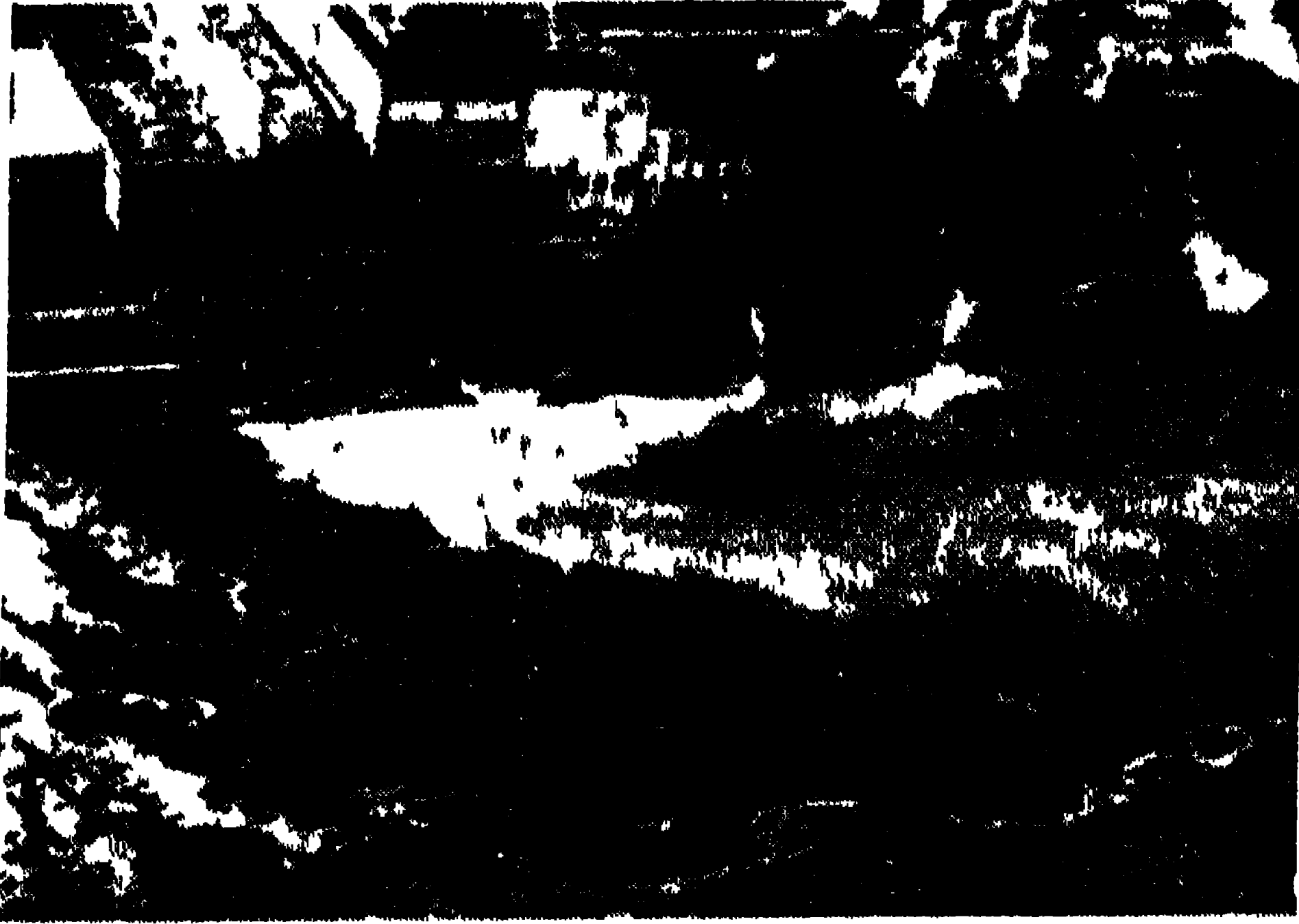
2নং চিত্র
জলের দ্বারা পরিবেশ দূষিতকরণের তিনটি প্রধান উৎস পৌর সংস্থা, শিল্প-প্রতিষ্ঠান ও কৃষিকার্যের আবর্জনা।

ঐ কারখানায় বহুল পরিমাণে পারদের ব্যবহার হয় Na-amalgam তৈরির জন্যে। তা থেকে কারখানার পয়ঃপ্রণালীতে পরিত্যক্ত ধোয়া জলে প্রতি বছর প্রচুর পরিমাণে পারদ ধাতু পালিয়ে গিয়ে হাডসন নদীতে পড়ে। সম্প্রতি বিজ্ঞানীদের পরীক্ষায় দেখা গেছে, হাডসন নদীর মৎস্যাদির দেহে শতকরা 5 ভাগ পারদঘটিত পদার্থ রয়েছে। মানুষের খাদ্য হিসাবে খুব

বহু কীটঘ্ন ও রোগবীজাণুনাশক রাসায়নিক পদার্থ এবং সার কৃষির কাজে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হচ্ছে। এদের অপব্যবহার বা অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার জমি ও ফসলের পক্ষে যেমন ক্ষতিকর, তেমনি পশুপাখী ও মানুষের পক্ষেও কম ক্ষতি-কর নয়। এভাবে দেখা যায় যে, বৈজ্ঞানিক শিল্পে মানুষের সুখসুবিধা ও স্বাস্থ্যরক্ষার উপায় যেমন একদিকে অপরিমিতভাবে বেড়ে উঠেছে,

তেমনি সঙ্গে সঙ্গে এথেকেও নানা বিপদ ও রোগের আশঙ্কা কম বাড়ে নি। একথা হয়তো অনেকে স্বীকার করবেন যে, শহরের অবস্থাপন্ন লোকদের শিশুরা জন্ম থেকে নানাবিধ রোগে ভুগতে থাকে। প্রায় প্রত্যেক পরিবারে দেখা যায়, ডাক্তার ও বিবিধ ওষুধপত্রের ব্যবহার যেন বাড়ীতে লেগেই আছে। এর তুলনায় পল্লী-গ্রামে গরীব লোকদের শিশুদের স্বাস্থ্য দারিদ্র্য সত্ত্বেও অপেক্ষাকৃত ভাল। মুক্ত ও বিশুদ্ধ বায়ু এর একটি প্রধান কারণ।

দূষিত পরিবেশের প্রতিকার

দূষিত পরিবেশের প্রতিকারকল্পে নানাবিধ উপায় নির্দেশ বর্তমানে করা হচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই সম্বন্ধে বহু গবেষণা ও অনুসন্ধান চলেছে। এখানে এর কিঞ্চিৎ আলোচনা করে প্রবন্ধের উপসংহার করছি।

(1) জ্বালানী কয়লা থেকে গন্ধক অপসৃত করতে পারলে SO_2 গ্যাস উৎপন্ন হয়ে বায়ুকে দূষিত করবার কোন সম্ভাবনা থাকবে না। এই সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরা বর্তমানে পরীক্ষা সুরু করেছেন।

(2) মোটর গাড়ী ও বাসের ইঞ্জিনে তেল না পুড়িয়ে বৈদ্যুতিক শক্তি প্রয়োগের ব্যবস্থা করতে পারলে বড় বড় শহরে বায়ু দূষিত হবার সম্ভাবনা কিছু কমে যাবে।

(3) শহরাঞ্চলের গৃহস্থের বাড়ীতে কয়লার ব্যবহার ও প্রজ্বলন সুনিয়ন্ত্রিত করতে পারলে বায়ুতে অঙ্গারের ধূলিকণা শরীরে প্রবেশের সম্ভাবনা কমে যাবে।

(4) বায়ুকে বিশোধিত করবার জন্যে বৈজ্ঞানিক শিল্প কারখানাবহুল শহরে নানাবিধ গাছপালা রোপণ একটা প্রশস্ত উপায়। এর ফলে বায়ুতে অক্সিজেনের পরিমাণের ব্যতিক্রম ঘটবার সম্ভাবনা কমে যায়।

(5) কলকারখানার পরিত্যক্ত জল ও শহরের পয়ঃপ্রণালীর জল জলাশয় ও নদীতে গিয়ে পড়বার আগে বৈজ্ঞানিক উপায়ে তাদের পরিশুদ্ধ করবার প্রয়োজন আছে। শহরের পয়ঃপ্রণালীর জল পচনক্রিয়ার সাহায্যে অনেক সময় জমিতে সারের কাজ করে। এভাবে তার ব্যবহার করতে পারলে নদীর জল দূষিত হবার সম্ভাবনা কমে যায়।

(6) কীটঘ্ন রাসায়নিক পদার্থগুলির সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার এবং চাষের ক্ষেতে জীবাণু নষ্ট করবার জন্যে জীব-বিজ্ঞানের নির্দেশিত উপায় অবলম্বন দূষিত পরিবেশের প্রতিকারে সহায়তা করে।

(7) শহরের লোকসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও তাদের বিকেন্দ্রীকরণ দূষিত পরিবেশ প্রতিকারের একটি আবশ্যকীয় অঙ্গ।

আণবিক জীববিদ্যা

অঞ্জলি মুখোপাধ্যায়*

বৈজ্ঞানিক গবেষণার এক উচ্চতম পর্যায়ে পৌঁছে বৈজ্ঞানিকেরা এখন দেখছেন যে, আগেকার দিনে বিজ্ঞানকে যে ভাবে আলাদা আলাদা করে দেখা হতো—যেমন প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বা Natural sciences বলতে পদার্থ-রসায়ন-ভূবিদ্যা বোঝায়, যার মারফৎ আমরা জড় জগতের খবর পাই, আর প্রাণ-বিজ্ঞান বা Life sciences বলতে প্রাণিবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা বোঝায়, যার মারফৎ আমরা জীবন্ত জগতের খবর পাই—এমন পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগহীন, বিচ্ছিন্ন ভাবে বিজ্ঞানকে আর দেখা যায় না বা ব্যবহারও করা যায় না।

দৃষ্টিভঙ্গীর এই পরিবর্তনের ফলেই সকল বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নতুন ভাবধারার সঙ্গে সঙ্গে নতুন পথেরও প্রবর্তন হয়েছে। জীববিদ্যার
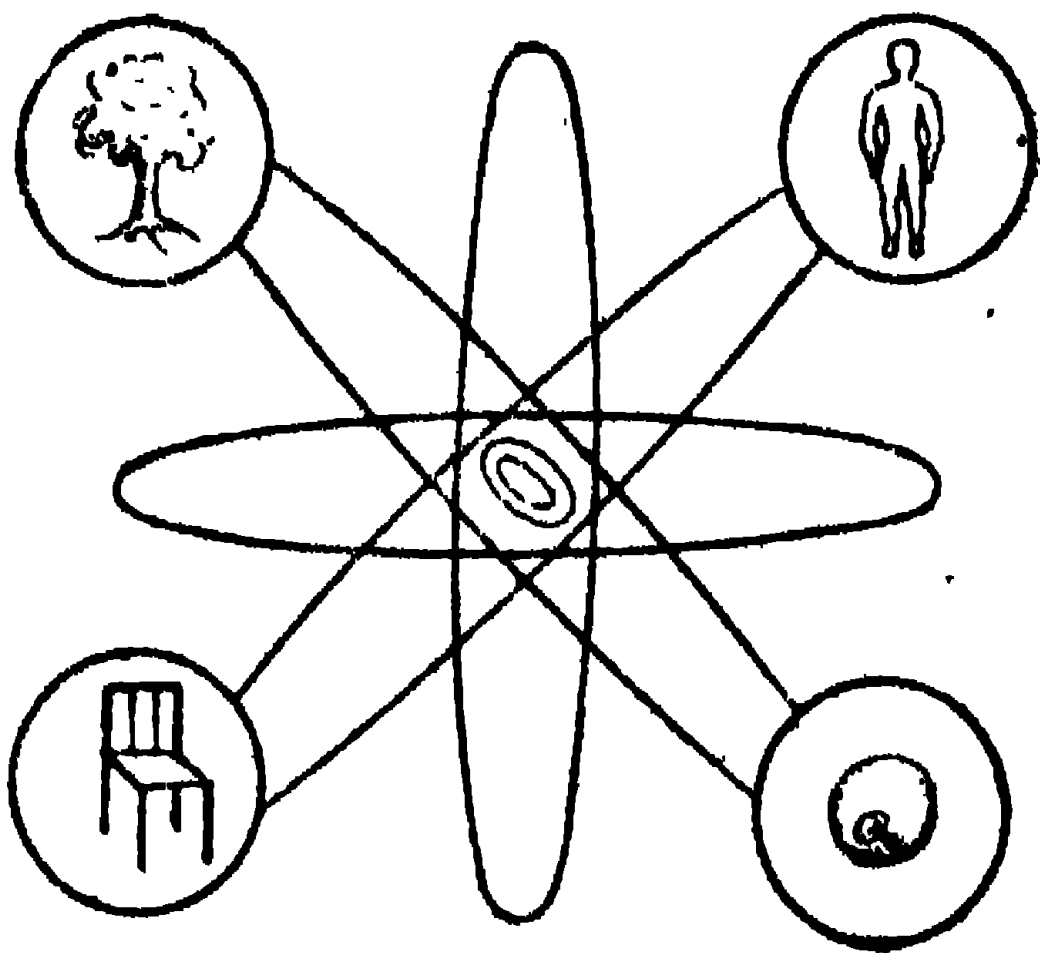
1নং চিত্র
সকল বস্তুই অণু-পরমাণু দিয়ে তৈরি।

বেলায় গবেষণায় যে সব নতুন নতুন উৎসমুখ উন্মোচিত হয়েছে, সেগুলির মধ্যে অন্যতম এবং গুরুত্বপূর্ণ হলো আণবিক জীববিদ্যা বা Molecular biology-র গবেষণা।

এই বিশ্বের সকল বস্তুই—সে জীবন্ত বা জড়, জৈব বা অজৈব যাই হোক না কেন, মূলতঃ অণু-পরমাণু দিয়েই তৈরি (1নং চিত্র)। জড়ের সঙ্গে জীবনের ঘনিষ্ঠ সংযোগ আছে, কারণ জড়ের উপাদানেই জীবনের সৃষ্টি। জড়-উপাদানের গঠনশৈলীর আণবিক বিশ্লেষণ বহু দিন ধরেই পদার্থ ও রসায়নবিদ্যার সাহায্যে করা হয়েছে ও হচ্ছে।

আণবিক জীববিদ্যার মূল উদ্দেশ্য

আণবিক জীববিদ্যার মূল উদ্দেশ্য হলো, জীবনের যেগুলি অবিভাজ্য (Irreducible) লক্ষণ, আণবিক স্তরে সেগুলিকে জানতে বা বুঝতে চেষ্টা করা। এই লক্ষণগুলি হলো, বংশপরম্পরায় বয়ে আসা প্রাণধারার যে প্রবাহ বা জিন-সম্পৃক্ত বস্তুর বিভাজন, প্রাণিদেহের প্রধান উপাদান প্রোটিন সংশ্লেষণ ও প্রোটিনের ক্রিয়া এবং আণবিক স্তরে শক্তির সঞ্চালন। এই ক্রিয়াগুলিকে জৈব রসায়ন ও জৈব পদার্থবিদ্যার সাহায্যে রাসায়নিক ও ভৌতিক গুণাগুণ মারফৎ আণবিক পর্যায়ে বিশ্লেষণ করাই হলো আণবিক জীববিদ্যার গবেষণার অন্যতম প্রধান ধারা।

জীববিদ্যার সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার বোধ হয় জীবন্ত জিনিষের এত বৈচিত্র্য। সংখ্যা দিয়ে বোঝাতে হলে বলা যায়, পৃথিবীতে অন্ততঃ 15 লক্ষের মত জীবের প্রজাতির অস্তিত্ব আছে।

*সাহা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, কলিকাতা-9

কিন্তু আণবিক জীববিদ্যার গবেষণা দেখিয়ে দিয়েছে যে, আরও বিস্ময়কর ঘটনা হলো, এত প্রচণ্ড বিভিন্নতার মাঝেও—সে হোক না কেন উচ্চস্তরের প্রাণী বা উদ্ভিদ, ব্যাক্টিরিয়া বা ভাইরাস—আণবিক স্তরে কতকগুলি মৌলিক একতা বা সাম্যও সেখানে আছে।

জীবদেহের সাংগঠনিক মালমশলা

জীবদেহে যে যে মৌলিক পদার্থগুলি পাওয়া যায়, সেগুলি খুব জটিল আণবিক যৌগ হিসাবেই বর্তমান থাকে। এদের জৈব ও অজৈব দুই ভাগে ভাগ করা যায়। অজৈব যৌগের প্রধান হলো জল, যা জীবদেহে থাকে শতকরা 66-90 ভাগ। জৈব পদার্থগুলি হলো 1—কার্বোহাইড্রেট, 2—লিপিড, 3—প্রোটিন, 4—নিউক্লিওটাইড, 5—ভিটামিন। এছাড়াও থাকে জৈব অ্যাসিড, অ্যালকোহল ও স্টেরয়েড।

সকল জীবদেহই তৈরি হয় কোষ দিয়ে (2নং চিত্র)। আর এই কোষগুলি তৈরির প্রধান মালমশলা হলো বিভিন্ন প্রোটিন। এককোষী প্রাণী—যেমন অ্যামিবা—তার দেহে থাকে একটি কোষ, সেই একটি কোষই সর্ব-কর্মবিশারদ। আর বহুকোষী প্রাণী—যেমন আমরা—এখানে বহু রকমারী কোষের সমষ্টিতে গড়ে উঠেছে আমাদের জটিল দেহযন্ত্র। বৈজ্ঞানিকেরা দেখিয়েছেন—প্রতিটি জীবের এই যে বিভিন্নতা, এক বিশেষ ধারায় গড়ে ওঠা—কে কি হবে এবং কেমন ভাবে হবে—এ সবই ঠিক করে দেয় জীবদেহের কোষের কেন্দ্রীনে (Nucleus) অবস্থিত নিউক্লিক অ্যাসিড। এই অ্যাসিড দু-রকমের হয়, ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড বা ডি এন এ (D N A) আর রাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড বা আর এন এ (R N A)। এই D N A, R N A এবং প্রোটিন হলো জীবদেহের অতি প্রয়োজনীয় বৃহদণু (Macromolecule)।

D N A থেকে প্রোটিন সংশ্লেষণ

এই প্রবন্ধে D N A থেকে প্রোটিন সংশ্লেষণ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা হয়েছে। আগেই বলা হয়েছে যে, জীবদেহ তৈরির প্রধান মালমশলা হলো বিভিন্ন প্রোটিন। এই যে প্রোটিনের রকমারিত্ব—তার সমস্ত রাসায়নিক সংকেত কিন্তু নিহিত আছে D N A-র মধ্যে। আমরা যে নিউক্লিওটাইডের কথা উল্লেখ করেছি আগে, সেই
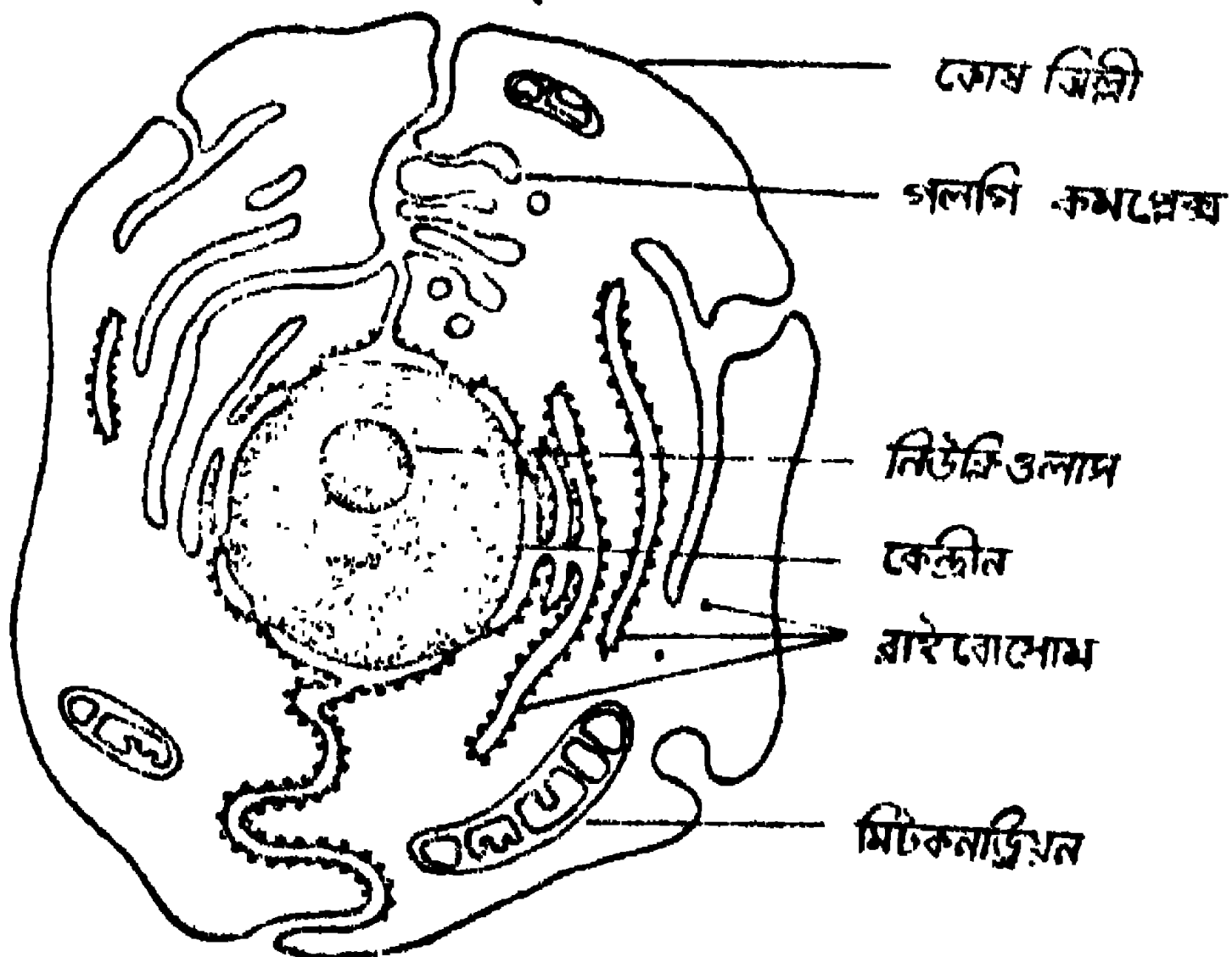
2নং চিত্র
একটি জীবকোষ।

একাধিক নিউক্লিওটাইডের সংযোগে একটি D N A-র অণু তৈরি হয়।

আবার একটি নিউক্লিওটাইডে আছে একটি নাইট্রোজেনঘটিত বেস, একটি শর্করা এবং একটি ফস্‌ফরিক অ্যাসিডের অণু (3নং চিত্র)।
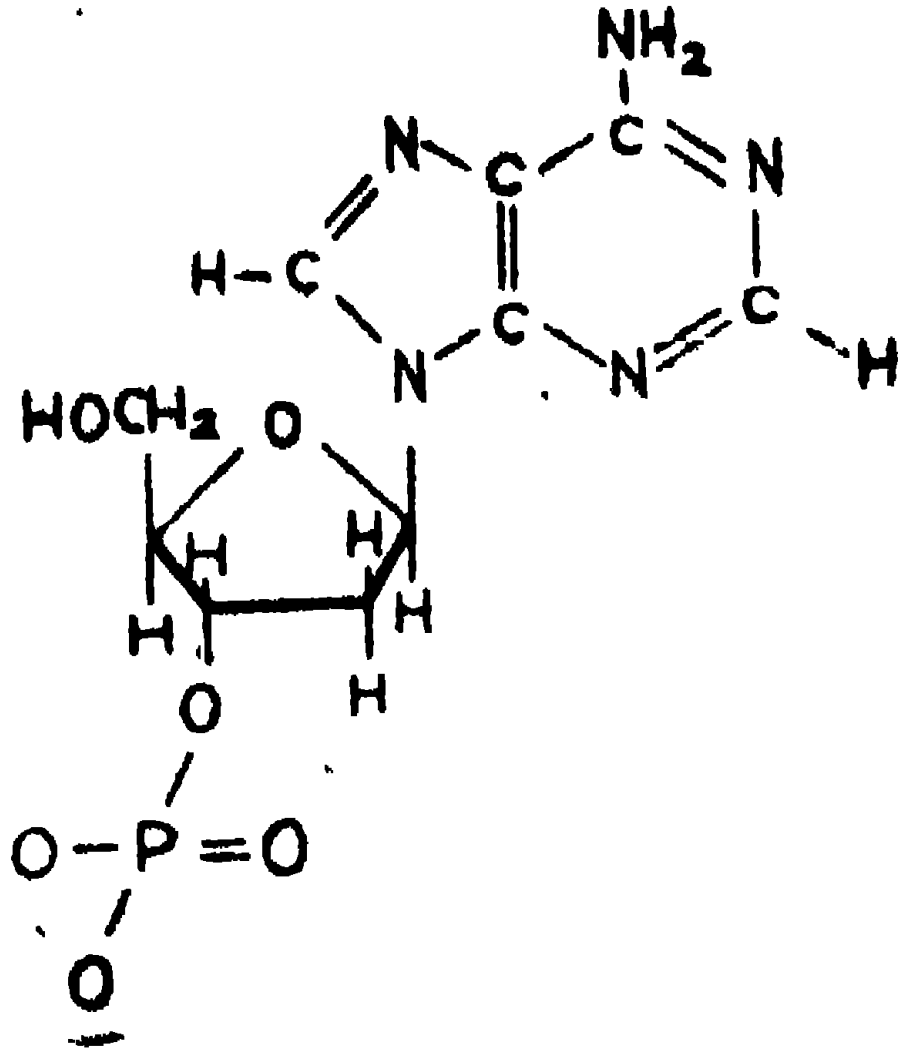
3নং চিত্র

একটি নিউক্লিওটাইড—এতে আছে বেস (Adenine), শর্করা (Deoxyribose) এবং একটি ফস্‌ফরাস অ্যাসিডের অণু।

D N A-র শর্করা হলো deoxyribose আর R N A-র শর্করা হলো ribose। একটি D N A অণু খুব লম্বা সুতার মত হয় এবং তাতে 60 থেকে 100,000টিরও বেশী নিউক্লিওটাইড থাকতে পারে। বেশীর ভাগ D N A অণুতেই দু-নরী (Double strand) সুতার মত পরস্পরের সঙ্গে পাকিয়ে থাকে। D N A-র ফস্‌ফরিক অ্যাসিড এবং শর্করা একই রকম হয়, কিন্তু বেস থাকে চার রকমের—Adenine, Cytosine, Guanine, এবং Thymine—ছোট করে বলা হয় A, C, G, T। এক নরীতে A থাকলে তার অপর দিকের নরীতে থাকবে T এবং একদিকে C থাকলে অপর দিকে থাকবে G। পরস্পরের সঙ্গে এরা হাইড্রোজেন বর্ন্ধনী (Hydrogen band) দিয়ে আঁটা থাকে। সব মিলিয়ে দেখতে হয় অনেকটা দড়ির মৈ-কে যেন পাকিয়ে দেওয়া হয়েছে ঘোরানো সিঁড়ির মত (4নং চিত্র)। কি ভাবে পর পর এই A C G T সাজানো আছে, তার উপরই বিভিন্ন জীবের D N A-র বিভিন্নতা নির্ভর করে।
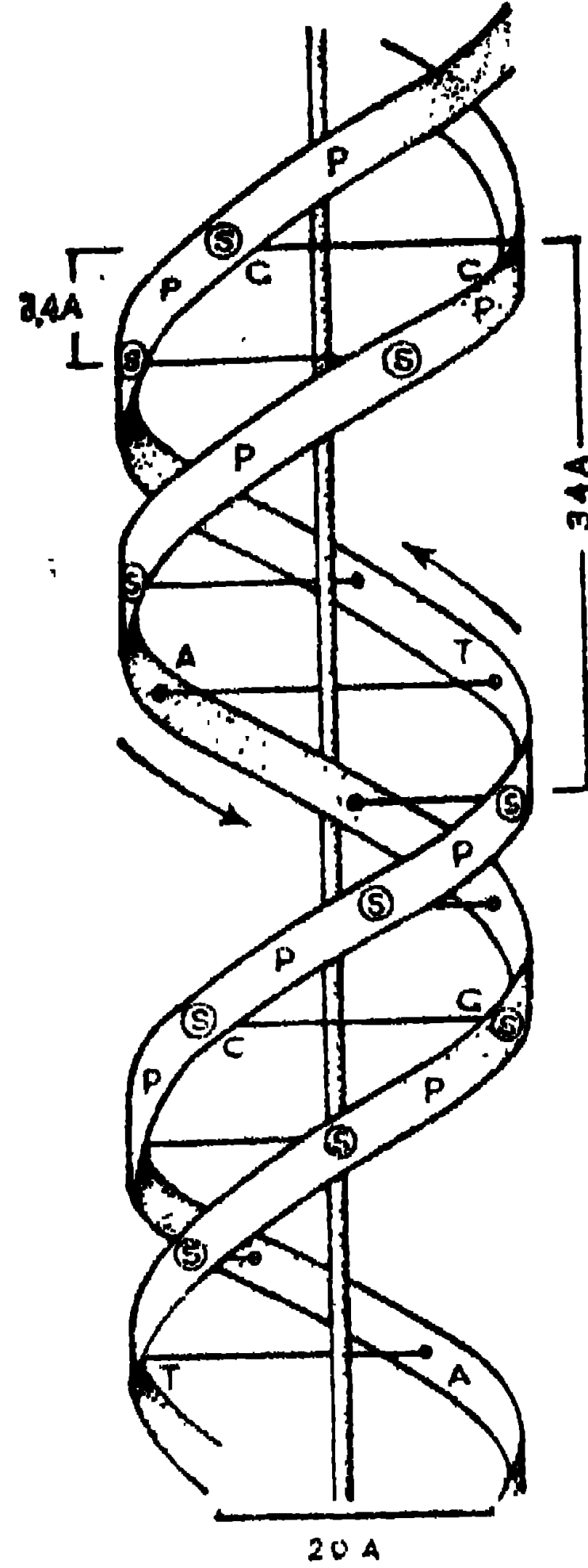
4নং চিত্র

ঘোরানো সিঁড়ির মত দু-নরী DNA। পাকের একমাথা থেকে আর একমাথার দূরত্ব 34 অ্যাংষ্ট্রম (34A) এবং পাশাপাশি দুটি বেসের দূরত্ব হলো 3·4 অ্যাঃ। দুটি নরীর পরস্পরের মাঝের দূরত্ব হলো 20 অ্যাঃ। S এবং P হলো শর্করা ও ফস্‌ফরিক অ্যাসিড এবং ACGT হলো বেস।

একে বলা হয় বেস সজ্জাক্রম বা base sequence। যে কোন জীবদেহের D N A-তে A-র পরিমাণ সকল সময়েই T-র সমান হয় এবং C-র পরিমাণ G-র সমান। একটি D N A অণুতে বহু-

সংখ্যক A C G T থাকে এবং তাদের combination-এ বহু রকম D N A হতে পারে।

কোষের কেন্দ্রীনে যে বংশসূত্র (Chromosome) থাকে, তা হলো বিরাট লম্বা D N A অণু (এই D N A-র সঙ্গে প্রোটিনও যুক্ত থাকে) এবং এক-একটি জিন হলো এই অণুরই ছোট ছোট অংশবিশেষ। প্রোটিন তৈরির কাজের নির্দেশ দেয় জিনগুলিই এবং জীবের যা কিছু দৈহিক এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, তা নিয়ন্ত্রিত হয় এই জিনের সাহায্যে।

কোষ-বিভাজনের সময় A-T এবং C-G-র মাঝের হাইড্রোজেন বন্ধনীগুলি ভেঙ্গে যায় এবং D N A-র দুটি নরী আলাদা হয়ে যায়। এর পর এক-একটি নরী পারিপার্শ্বিক থেকে মুক্ত-নিউক্লিওটাইড গ্রহণ করতে থাকে এবং তার ফলে দুটি নতুন পূর্ণাঙ্গ D N A নরী তৈরি হয়। এদের একটি করে অংশ পুরনো D N A অণু থেকে এসেছে, অপরটি নতুন তৈরি হলো (5নং চিত্র)। এভাবেই D N A অতি বিশ্বস্তভাবে জিন-সম্পর্ক যাবতীয় খবর নতুন কোষের মধ্যে পাঠিয়ে দেয়। এখন দেখা যাক, D N A-র সঙ্গে প্রোটিনের সঙ্গে কি সম্পর্ক। প্রোটিন বহু রকমের হয় এবং জীবদেহে তাদের ক্রিয়া-বিক্রিয়াও অনেক রকমের। যেমন, আমাদের চোখের কোষগুলি যে প্রোটিন দিয়ে তৈরি, তাথেকে আমাদের পেশী বা কিড্‌নীর কোষের প্রোটিন উপাদান সম্পূর্ণ ভিন্ন। কতকগুলি বিশেষ প্রয়োজনীয় প্রোটিনকে বলা হয় এন্‌জাইম (Enzymes)—এগুলি জৈব অনুঘটকের কাজ করে থাকে। সব প্রাণীই পারিপার্শ্বিক থেকে এই রকম কতকগুলি এন্‌জাইম অণুঘটিত রাসায়নিক বিপাকের মাধ্যমে তাদের শক্তি আহরণ করে থাকে। Adenosine triphosphatase নামে একটি এন্‌জাইমের সাহায্যে পেশী-সঙ্কোচন ক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত হয় আর দেহের মধ্যে অক্সিজেনের মত ছোট অণুর চলাচলে সাহায্য করে haemoglobin নামে একটি প্রোটিন। DNA অণু তৈরির কাজে DNA-polymerase নামে এন্‌জাইমটি খুবই প্রয়োজনীয়।

প্রোটিন তৈরি হয়েছে কতকগুলি ছোট ছোট একক দিয়ে—তাদের বলা হয় peptides—আবার এগুলি তৈরি হয়েছে অ্যামিনো অ্যাসিড (Amino acid) দিয়ে। আবশ্যকীয় (Essential)
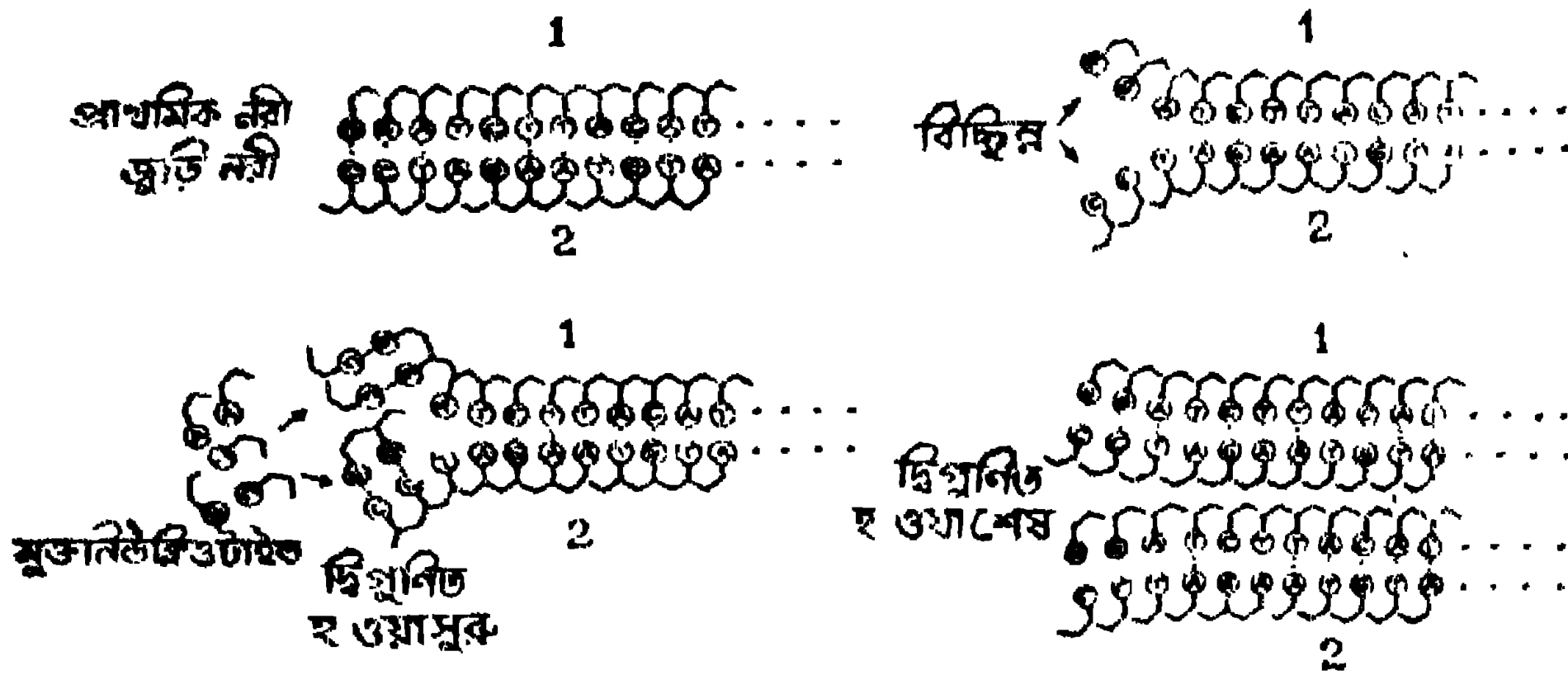
5নং চিত্র

পুরনো DNA থেকে নতুন DNA তৈরি হচ্ছে। এখানে শেষের ছবির (1) ও (2) সংখ্যা পুরনো DNA নরীকে বোঝাচ্ছে। ঐ (1) ও (2) চিহ্নিত নরীর সঙ্গে নতুন তৈরি নরী যুক্ত হয়ে দু-জোড়া DNA নরী তৈরি হলো।

অ্যামিনো অ্যাসিডের সংখ্যা হলো 20। অ্যামিনো অ্যাসিডগুলি পরস্পরের সঙ্গে পেপ্‌টাইড বন্ধনীর সাহায্যে যুক্ত থাকে। এই রকম পর পর দুটি যুক্ত থাকলে বলা হয় dipeptide, তিনটিকে tripeptide (6নং চিত্র) এবং আরও বেশী হলে polypeptide। একটি প্রোটিন অণুতে একটি বা অনেকগুলি polypeptide chain থাকে।

অ্যামিনো অ্যাসিড 1 অ্যামিনো অ্যাসিড 2 অ্যামিনো অ্যাসিড 3
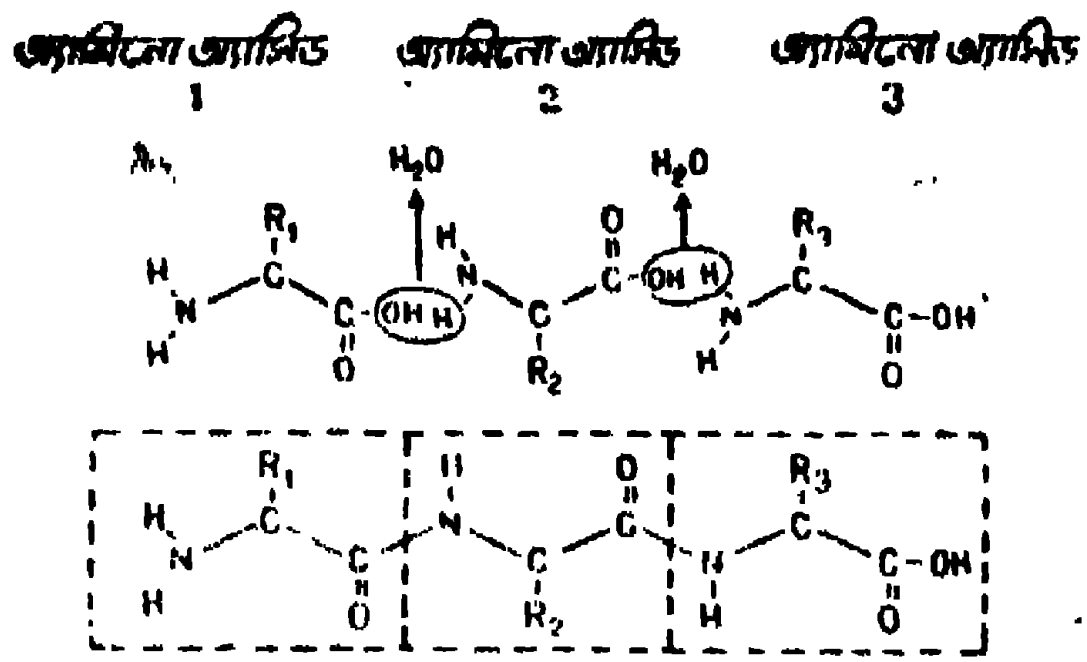
6নং চিত্র
একটি ট্রাইপেপ্‌টাইড শেকল।

DNA-র মধ্যেই কোন্ কোষে কেমন প্রোটিন হবে, তার সঙ্কেত নিহিত আছে। অনেক গবেষণার পর বৈজ্ঞানিকেরা দেখেছেন, DNA-র যে ACGT বেসগুলি আছে, সেগুলির তিনটি করে একত্রে নিলে বিশেষ একটি অ্যামিনো অ্যাসিড তৈরির সঙ্কেত হয়। এখন অনেক রকমভাবে এই 'ত্রয়ী'কে সাজানো যায়—যার ফলে সব অ্যামিনো অ্যাসিডের সঙ্কেতই এর মধ্য থেকে পাওয়া গেছে। এই ত্রয়ীকে বলা হয় triplet code।

RNA-র দৌত্য

DNA সরাসরি কেন্দ্রের বাইরে এই সঙ্কেত পাঠাতে পারে না—তাকে আগে একটি এক নরী (Single strand) RNA তৈরি করতে হয়। RNA-এর বেসগুলির মধ্যে T-র জায়গায় থাকে Uracil বা U, আর শর্করার (Ribose sugar) তফাতের কথাও বলা হয়েছে। এই RNA-কে তার কাজ অনুসারে 2/3 রকম নাম দেওয়া হয়েছে; যেমন—messenger RNA (m-RNA), transfer RNA (t-RNA) ইত্যাদি। DNA-র একটি নরীর ছাঁচের অনুলিপি হয়ে (যেখানে TTG আছে, সেখানে হবে AAC) একটি m-RNA কেন্দ্রীনের ঝিল্লী ছিদ্র (Membrane pore) দিয়ে বেরিয়ে আসে এবং কোষের মধ্যে সাইটোপ্লাজমে অবস্থিত রাইবোসোম নামে অতি ক্ষুদ্র এক রকম বস্তুর সঙ্গে যুক্ত হয়। এই রাইবোসোমের মধ্যেও একরকম RNA আছে। একগুচ্ছ রাইবোসোমকে বলা হয় পলিসোম (Polysome)। প্রোটিন সংশ্লেষণ এখানেই সুরু হয়, বলা যায় এরা প্রোটিন তৈরির কারখানা। এখন এই কাজে সাহায্য করে t-RNA। একটি করে অ্যামিনো অ্যাসিড সঙ্কেতের একক (Coding unit) এই t-RNA-র সঙ্গে যুক্ত থাকে। এখন যে polypeptide chain-টি তৈরি হচ্ছে, t-RNA-র সাহায্যেই একটি করে অ্যামিনো অ্যাসিড তার কাছে পৌঁছে যায়। একটি অ্যামিনো অ্যাসিডের সাঙ্কেতিক বেস ত্রয়ীকে বলা হয় একটি কোডন (Codon) (7নং চিত্র)। তাহলে দেখা যাচ্ছে DNA-র সঙ্কেত থেকে অ্যামিনো অ্যাসিড তৈরি হয়, আবার এই অ্যামিনো অ্যাসিডগুলি যুক্ত হয়ে polypeptide chain তৈরি করছে এবং তারপর তৈরি হচ্ছে প্রোটিন। পারিপার্শ্বিক প্রতিকূলতা, যেমন—অতিবেগুনী রশ্মির বা তেজস্ক্রিয় বিকিরণের প্রভাব কিম্বা কোন রাসায়নিক ক্রিয়ায়—যদি এই সঙ্কেতে কোন ভুল হয়, তখন ঘটে পরিব্যক্তি বা gene mutation।

DNA-ই যে বংশগতির (তথা জীবদেহের) মূল ধারক, তা ব্যাক্টিরিয়া এবং ভাইরাস নিয়ে বহু গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে এবং একথা উচ্চতর প্রাণীর ক্ষেত্রেও বহুলাংশে ঠিক বলেই দেখা গেছে।

পূর্বের ধারণা অনুযায়ী DNA একমাত্র

কোষের কেন্দ্রীনেই থাকতে পারে, কিন্তু আধুনিক গবেষণায় দেখা যাচ্ছে যে, কেন্দ্রীনের বাইরেও—কোষের ভিতরে সাইটোপ্লাজমে—DNA পাওয়া যায়। কোষের এক রকম ক্ষুদ্র অঙ্গ (Organelle) আছে, যাকে মিটকণ্ড্রিয়া (Mitochondria) বলে—এরা Oxygen reduction-এ সাহায্য করে। এদের মধ্যে এক রকম DNA পাওয়া গেছে, যেগুলি দুই মুখ বন্ধ মালার মত হয়—খোলা মুখ থাকে না। ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে কোষবিমুক্ত DNA-র ছবি দেখতে পাওয়া সম্ভব হয়েছে (8নং চিত্র)। Ultracentrifuge যন্ত্রের সাহায্যে বহু DNA, RNA এবং প্রোটিনের আণবিক ওজনও জানতে পারা গেছে।

DNA অণুর সম্ভাব্য গঠন সম্পর্কে গবেষণার জন্যে যে তিনজন বৈজ্ঞানিকের নাম সবচেয়ে বেশী উল্লেখযোগ্য, তাঁরা হলেন J. D. Watson, T. H. C. Crick এবং M. H. F. Wilkins। কোষবিমুক্ত DNA নিয়ে Wilkins-এর X-ray diffraction-এর কাজের উপর ভিত্তি করেই DNA-এর Watson-Crick model আজ বিশ্ববিখ্যাত।

জৈব অণুর মধ্যে শক্তির সঞ্চালন

উদ্ভিদ-জগতের একটি খুব প্রয়োজনীয় ঘটনা আলোক-সংশ্লেষণ (Photosynthesis) সম্পর্কে আণবিক জীববিদ্যার গবেষণা অনেক নতুন তথ্য দিয়েছে। উদ্ভিদ-কোষের সাইটোপ্লাজমের মধ্যে ক্লোরোপ্লাস্ট নামে ছোট ছোট কতকগুলি অঙ্গ আছে, আর তাতে আছে ক্লোরোফিল নামে এক রকম লিপিড অণু। আলোক-সংশ্লেষণের কাজে ক্লোরোফিল অণুই সাহায্য করে। ক্লোরো-
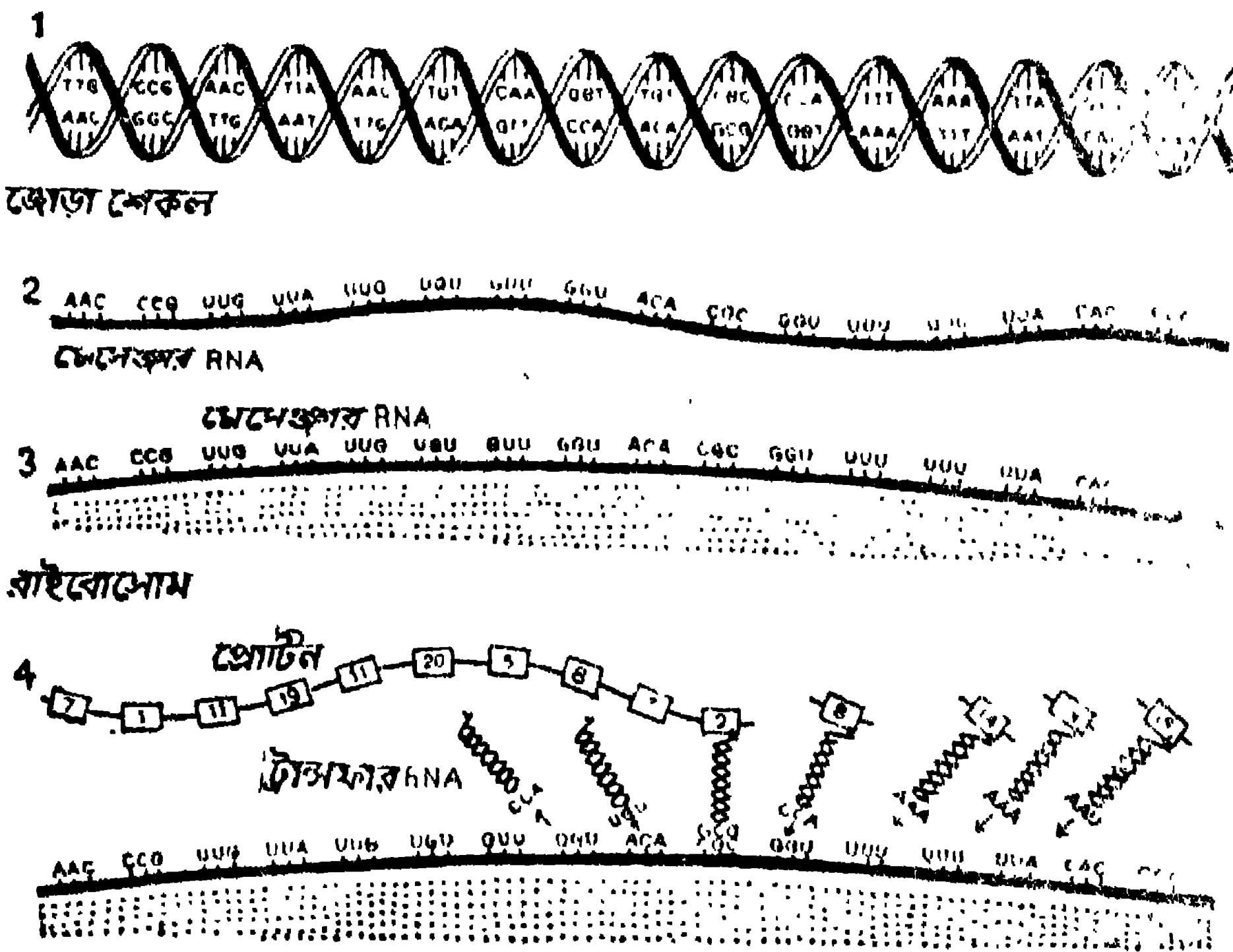
7নং চিত্র

DNA থেকে RNA মারফৎ প্রোটিন সংশ্লেষণ। (1) DNA-র জোড়া শেকল থেকে (2) মেসেঞ্জার RNA-র একটি শেকল তৈরি হয়ে (3) রাইবোসোমের সঙ্গে মিলিত হলো। (4) এথেকে এবার তিনটি করে বেস নিয়ে তৈরি অ্যামিনো অ্যাসিডের সঙ্কেত ট্র্যান্সফার RNA পৌঁছে দিচ্ছে পলিপেপ্‌টাইড শেকলের কাছে। এবার তৈরি হলো প্রোটিন অণু।

ফিল যখন আলোক শোষণ করে, তখন তাদের অন্তর্নিহিত শক্তির পরিমাণ স্বাভাবিক অবস্থার চেয়ে বেশী হয়ে যায় এবং এই অণুগুলিকে তখন উত্তেজিত অণু বলা হয়। এর ফলে অণুগুলি খুব প্রতিক্রিয়াশীল অবস্থায় থাকে এবং সহজেই অন্য যৌগে তাদের শক্তি সঞ্চালিত করে দিতে পারে। এসব প্রতিক্রিয়ার একটি প্রধান ফল হলো কার্বন ডাই-অক্সাইড এবং জলকে শক্তিসমৃদ্ধ জৈব পদার্থে (Organic matter) রূপান্তরিত করা।

চিকিৎসা-বিজ্ঞানে আণবিক জীববিদ্যার প্রয়োগ

আণবিক জীববিদ্যার গবেষণা প্রযুক্তি-বিজ্ঞানেও নানাভাবে সাহায্য করছে। এর মধ্যে অন্যতম হলো চিকিৎসায়। আণবিক রোগের (Molecular disease) মধ্যে কর্কটরোগ আজ সব দেশের বৈজ্ঞানিকদের ভাবিয়ে তুলেছে। এই রোগের কারণ জানবার জন্যে যে গবেষণা চলেছে, তাতে নানাভাবে আণবিক জীববিদ্যার প্রয়োগ করা হচ্ছে। কর্কটরোগের প্রধান লক্ষণ হলো জীবকোষের অনিয়ন্ত্রিত বিভাজন—আর কোষ-বিভাজনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত হলো DNA, RNA এবং প্রোটিন। কোন কোন বৈজ্ঞানিক মনে করেন যে, একমুখী প্রবাহ হয়তো কোন কারণে বিপরীতমুখী হয়ে যায়, DNA-র কোন ভুল সংকেতের জন্যে কোষ-বিভাজনের বল্গা আল্গা হয়ে যায়। কেমন করে তাকে আবার নিয়ন্ত্রণে আনা যাবে? এই প্রশ্নের জবাব দেবার চেষ্টা বৈজ্ঞানিকেরা এখন করছেন।

খোরানার জিন সংশ্লেষণের সফল গবেষণা বৈজ্ঞানিকদের মনে এখন এই আশাই জাগ্রত করেছে যে, খুব নিকট না হোক, সুদূর ভবিষ্যতেও এই সংশ্লেষিত বা কৃত্রিম জিন অনেক দুরারোগ্য ব্যাধি সারিয়ে তুলতে সাহায্য করবে।

8 (ক) নং চিত্র 8 (খ) নং চিত্র
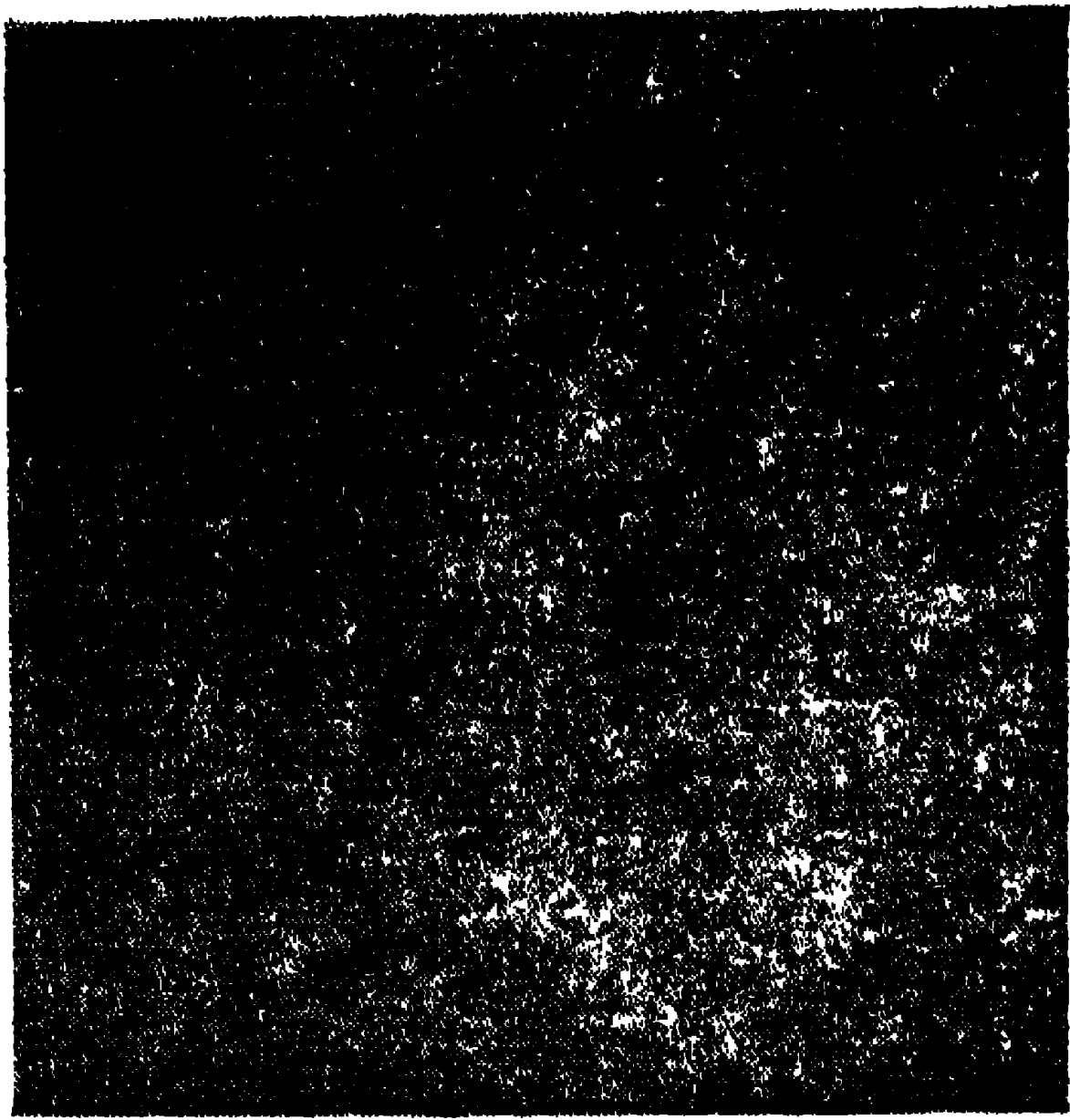
শঙ্খ-কোষ থেকে নিষ্কাশিত DNA-র চিত্র। ইলেকট্রন অণুবীক্ষণে গবেষণাগারে লেখিকা কর্তৃক গৃহীত। (ক) লম্বা DNA-র ছবিটি প্রায় 12,000 গুণ এবং (খ) মালার মত DNA-র ছবিটি 23,000 গুণ বর্ধিত করে দেখানো হয়েছে।

অলৌকিক সংখ্যা ও পাই

ক্ষমা মুখোপাধ্যায়

আমরা যখন প্রথম সংখ্যা গুণতে শিখি—সুরু করি পূর্ণ সংখ্যা দিয়ে। তারপর শিখি সরল ভগ্নাংশ। মানব ইতিহাসের শৈশবেও আদি মানব প্রথম পূর্ণ সংখ্যা দিয়েই সংখ্যা গণনা সুরু করেছিল; তারপর এসেছিল ভগ্নাংশ। আজকাল স্কুলে পঞ্চম বা ষষ্ঠ শ্রেণীতেই ঋণাত্মক সংখ্যা শেখানো হয়। গণিতশাস্ত্রের কালানুক্রমিক সূচীতে ঋণাত্মক সংখ্যার স্থান কিন্তু অনেক পরে। তার আগে করণী (Surd) এসে গেছে।

পূর্ণ সংখ্যা আর ভগ্নাংশ (ধনাত্মক এবং ঋণাত্মক) নিয়ে যে সংখ্যাগোষ্ঠী তৈরি হলো, তাকে বলা হয় মূলদ রাশি (Rational number)। এক কথায় বলা যায়, যে সংখ্যাকে $\frac{p}{q}$ রূপে—যেখানে p এবং q উভয়েই পূর্ণ সংখ্যা—লেখা যায়, তাকে মূলদ সংখ্যা বা রাশি বলে। তারপর গণিতজ্ঞরা দেখলেন বাস্তব ক্ষেত্রে আমরা এমন কতগুলি সংখ্যা পাই, যাদের $\frac{p}{q}$ রূপে লেখা যায় না, যেমন $\sqrt{2}$। পিথাগরাসের উপপাদ্য (একটি সমকোণী ত্রিভুজের দৈর্ঘ্য হবে $\sqrt{2}$ একক। যে কোন মূলদ রাশিকে একটি সসীম বা আবৃত্ত দশমিকরূপে প্রকাশ করা যায়; যেমন—

$\frac{1}{2}=\cdot 5,\ \frac{1}{3}=\cdot \dot{3}$ অর্থাৎ $\cdot 3333\ldots\ldots$

$\frac{1}{25}=\cdot 04\ \ \frac{1}{7}=\cdot \dot{1}4285\dot{7}$

কিন্তু $\sqrt{2}$-কে দশমিকের সাহায্যে প্রকাশ করতে গেলে দশমিক বিন্দুর পরের অঙ্কগুলি কখন শেষ হয় না বা পৌনঃপুনিক হয় না।

$\sqrt{2}=1\cdot 414248\ldots\ldots$

এই জাতীয় রাশিগুলিকে বলা হয় অমূলদ রাশি।

$\sqrt[3]{3},\ \sqrt[5]{45},\ \sqrt{\sqrt{2}+\sqrt{3}}$ ইত্যাদি সব অমূলদ রাশি। এই রাশিগুলির অদ্ভুত চরিত্র বোধ হয় সে যুগের গণিতজ্ঞদের খুব বিস্মিত করেছিল। তাই তাঁরা এদের নাম দিলেন সার্ড (Surd)। কথিত আছে করণী বা সার্ডের আবিষ্কারকে অভিনন্দিত করবার জন্যে পিথাগরাসের শিষ্যেরা এক-শ'টি ষাঁড় বলি দিয়েছিলেন তাঁদের দেবতার কাছে।
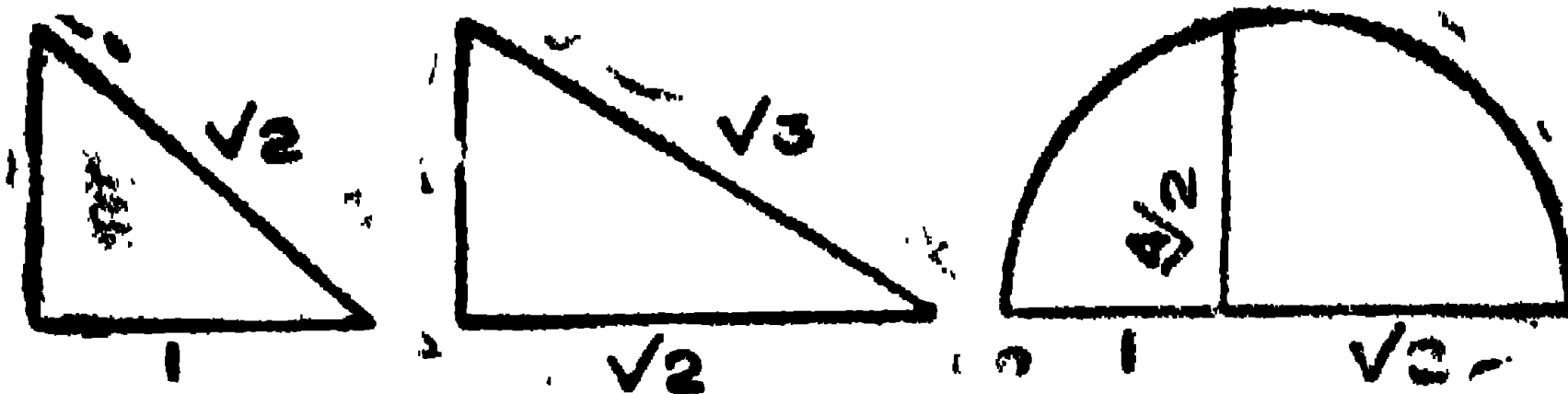
1নং চিত্র

অতিভুজের উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্র অপর দুই বাহুর উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রের সমষ্টির সমান) অনুসারে কোন সমকোণী ত্রিভুজের দুই বাহুর দৈর্ঘ্য যদি এক একক করে হয়, তবে অতিভুজের

এই দুই শ্রেণীর মূলদ ও অমূলদ রাশি নিয়ে যে সংখ্যাগোষ্ঠী তৈরি হলো, তাদের বলা হয় বাস্তব রাশি।

সেই যুগে করণী বলতে $\sqrt{2},\ \sqrt{3},\ \sqrt{\sqrt{2}+\sqrt{5}},$

$\sqrt[4]{2}$, $\sqrt{7\sqrt{6}}$ এই ধরণের রাশিগুলিকেই বোঝাতো, যাদের রুলার এবং কম্পাসের সাহায্যে আঁকা যায় (1নং চিত্র)।

$\sqrt[3]{2}$ বা $\sqrt[5]{26}$ ধরণের করণী সংখ্যাগোষ্ঠীতে স্থান পায় আরও পরে।

জ্যামিতিকভাবে বাস্তব রাশিগুলিকে বাস্তব বা X-অক্ষের বিন্দুগুলির ভুজের দ্বারা প্রকাশ করা যায়। মনে করা যাক, যে কোন একটি অনুভূমিক সরল রেখার উপর O একটি ধ্রুববিন্দু (2নং চিত্র)।

O P X

2নং চিত্র

এখন O থেকে যে কোন মূলদ বা অমূলদ করণী রাশির দূরত্বে OX-এর উপর একটি বিন্দু পাওয়া যায়। বিপরীত দিক থেকে, যদি P, OX-এর উপর যে কোন একটি বিন্দু হয়, তাহলে OP-এর দূরত্ব কি সব সময়ে মূলদ বা অমূলদ রাশির দ্বারা প্রকাশ করা যাবে? সাধারণভাবে, OX-এর উপর সমস্ত বিন্দুই কি মূলদ বা করণীর দ্বারা প্রকাশ করা যায়? মূলদ ও করণীগুলি পাবার পরে গণিতজ্ঞরা ভেবেছিলেন OX-এর উপরে সব বিন্দু-গুলিই বুঝি পাওয়া গেছে। কিন্তু পরে দেখা গেল, মূলদ রাশি ও করণী ছাড়া এমন কতকগুলি অমূলদ রাশি আছে, যাদের অস্তিত্ব পণ্ডিতেরা আগে জানতেন না।

সমস্যাটা কোথা থেকে সুরু হলো বলি। অতি প্রাচীন একটি সমস্যা বহু শতাব্দী ধরে গণিতজ্ঞদের ভাবিয়েছে—সেটি হলো রুলার আর কম্পাসের সাহায্যে একটি বৃত্তের সমান ক্ষেত্রফল-বিশিষ্ট একটি বর্গক্ষেত্র অঙ্কিত করা যায় কিনা। অসুবিধা ঘটাচ্ছিল বৃত্তের ক্ষেত্রফলের π রাশিটি। সকলেই জানেন, বৃত্তের পরিধি ব্যাসের সঙ্গে যে অনুপাত সৃষ্টি করে, তাকে বলা হয় π (পাই)।

$$\pi = \frac{\text{পরিধি}}{\text{ব্যাস}}$$

বহুকাল ধরেই π-এর মান নির্ণয় আর বৃত্তকে বর্গায়িত করবার চেষ্টা গণিতজ্ঞেরা করে আসছেন। এই সম্বন্ধে একটু ঐতিহাসিক অনুসন্ধান বোধ হয় ক্লান্তিকর হবে না।

এই বিষয়ে সর্বপুরাতন যে দলিল পাওয়া যায়, তা হলো রিণ্ড প্যাপাইরাস, খৃঃ পূঃ 1650 অব্দের। প্যাপাইরাসের লেখক বলেছেন—বৃত্তের ব্যাস থেকে $\frac{1}{9}$ অংশ কেটে বাদ দিয়ে অবশিষ্টাংশের উপর বর্গক্ষেত্র অঙ্কিত করলে তার ক্ষেত্রফল বৃত্তের ক্ষেত্রফলের সমান হবে। এই সূত্র অনুসারে π-এর মান পাওয়া যায় 3·16। [বর্তমানে π-এর মান 1000 দশমিক স্থান পর্যন্ত নির্দিষ্ট হয়েছে। 10 দশমিক স্থান পর্যন্ত মান $\pi = 3·1415926535\cdots$] বাইবেলে π-এর মান 3। আর্কিমিডিস (খৃঃ পূঃ 300 অব্দ) দেখালেন π $3\frac{1}{7}$ আর $3\frac{10}{71}$-এর মধ্যে; অর্থাৎ π = 3·1408⋯থেকে 3·1428-এর মধ্যে: আর্কিমিডিস থেকে নিউটন-লাইবনিৎসের (সপ্তদশ শতাব্দী) আগে পর্যন্ত π-এর মান নির্ণয়ের চেষ্টা হয়েছে বৃত্তের অন্তর্লিখিত ও পরিলিখিত সুষম বহুভুজের সাহায্যে। আমাদের দেশেও π-এর মান নির্ণয়ের চেষ্টা হয়েছে। আর্যভট্ট দিলেন $\pi = 3·14161$। ভাস্করাচার্য দুটি আসন্ন মান দেন $\frac{3927}{1250} = 3·1416$ ও $3\frac{177}{1250} = 3·1416$। নিউটন ও লাইবনিৎসের দ্বারা ক্যালকুলাস আবিষ্কৃত হবার পরে অসীম যোগ ও গুণশ্রেণীর দ্বারা π-এর মান নির্ণয়ের চেষ্টা সুরু হয়। ইংরেজ গণিতজ্ঞ

জন ওয়ালিসের দেওয়া একটি গুণশ্রেণী খ্যাতি অর্জন করে। সেটি হলো—

$$\frac{\pi}{2}=\frac{2}{1}\times\frac{2}{3}\times\frac{4}{3}\times\frac{4}{5}\times\frac{6}{5}\times\frac{6}{7}\times\cdots\cdots$$

লাইবনিৎস দিলেন একটি যোগশ্রেণী—

$$\frac{\pi}{4}=1-\frac{1}{3}+\frac{1}{5}-\frac{1}{7}+\frac{1}{9}-\frac{1}{11}\cdots\cdots$$

আরো দ্রুত অভিসারী (Convergent) শ্রেণীর সাহায্যে ইংরেজ গণিতজ্ঞ শ্যাঙ্কস 707 দশমিক স্থান পর্যন্ত π-এর মান নির্ণয় করেন। কিন্তু একটা কথা এখানে অবান্তর হবে না যে, ফলিত বিজ্ঞানে এই পরিশ্রমের বিশেষ কোন মূল্য নেই। দশ দশমিক পর্যন্ত π-এর মানের সাহায্যে পৃথিবীর পরিসীমা এক ইঞ্চির অতি ক্ষুদ্রাংশ পর্যন্ত নির্ণয় করা যায় এবং সমগ্র বিশ্বের জন্যে প্রয়োজন মাত্র ত্রিশ দশমিক স্থান পর্যন্ত।

π-এর মান আসন্ন ফলে তো নির্ণীত হলো, কিন্তু এখন প্রশ্ন হলো, বাস্তবরাশি গোষ্ঠিতে π-এর স্থান কোথায় হবে? বহু বছরের প্রচেষ্টাতেও যখন রুলার আর কম্পাসের সাহায্যে বৃত্তকে বর্গায়িত করা গেল না, তখন পণ্ডিতদের মনে হলো π নিশ্চয় এমন এক রাশি, যাকে করণীর দ্বারা প্রকাশ করা যায় না; অর্থাৎ π কোন বীজ-গাণিতিক সমীকরণের মূল হতে পারে না। বিষয়টি বুঝিয়ে বলি।

একটি সমীকরণ, যার রূপ এই রকম—

$$a_0x^n+a_1x^{n-1}+a_2x^{n-2}+\cdots+a^n=o$$

যেখানে a_0, a_1,$\cdots a_n$ এবং n সব পূর্ণ সংখ্যা, তাকে বলা হয় বীজগাণিতিক সমীকরণ। $x+1=0$, $x^2+2x-3=0$, $3x^{20}+5x^{10}+x+2=0$ ইত্যাদি বীজগাণিতিক সমীকরণের উদাহরণ। যে সব রাশি বীজগাণিতিক সমীকরণের মূল হতে পারে, তাদের বলা হয় বীজগাণিতিক রাশি। যাবতীয় মূলদ ও করণী এই শ্রেণীভুক্ত। 1794 খৃষ্টাব্দে গণিতজ্ঞ লেজেণ্ডার দেখালেন, π একটি অমেয় (Incommeasurable) অমূলদ রাশি; অর্থাৎ করণীর মত π কে যদি দশমিকে প্রকাশ করা যায়, তাহলে যতই অগ্রসর হই না কেন, কখন শেষ হবে না বা আবৃত্ত হবে না। তারপর 1882 খৃষ্টাব্দে লিণ্ডেমান দেখালেন যে, শুধু তাই নয় π একটি বীজগাণিতিক রাশিও নয়। সুতরাং π শ্রেণীভুক্ত হলো এমন এক রাশিগোষ্ঠীতে, যাকে বলা হয় অলৌকিক বা ট্রানসেনডেণ্ট্যাল (Transcendental) রাশি। এখন প্রশ্ন হলো এই—অলৌকিক রাশি কোন্‌গুলি? এক কথায়, যে বাস্তব রাশি বীজগাণিতিক নয়, তাই অলৌকিক।

এই অলৌকিক রাশির অস্তিত্বের কথা পণ্ডিতেরা আগে থাকতেই জানতেন। প্রশ্নটা উঠেছিল একটি সরল রেখা বা তলের উপর যত বিন্দু আছে, সবগুলিকেই কি বীজগাণিতিক রাশির দ্বারা প্রকাশ করা যায়? উত্তর দিলেন প্রথম ল্যুভিল (1844) অবিচ্ছিন্ন ভগ্নাংশের সাহায্যে অলৌকিক রাশির অস্তিত্ব প্রমাণ করে। কয়েক বছর পরে রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হলেন অসীম জোটের (Infinite set) যাদুকর ক্যাণ্টর। অনেক সহজ উপায়ে তিনি অলৌকিক রাশির অস্তিত্ব প্রমাণ করলেন।

বিষয়টি বুঝতে হলে আগে অন্য কয়েকটি বিষয়ের অবতারণা করতে হবে। আমরা জানি, পূর্ণ সংখ্যার সংখ্যা অসীম, ভগ্নাংশেরও তাই। কিন্তু আমাদের মনে হয়, যেহেতু যে কোন দুটি পূর্ণ সংখ্যার মধ্যে অসীম সংখ্যক ভগ্নাংশ আছে, [যেমন 1 আর 2 এর মাঝখানে, 1, $1\frac{1}{2}$, $1\frac{1}{3}$, $1\frac{1}{4}$, $1\frac{1}{5}$,$\cdots\cdots$2]। সুতরাং ভগ্নাংশের সংখ্যা নিশ্চয় পূর্ণ সংখ্যার চেয়ে বেশী। ক্যাণ্টর বললেন—না, পূর্ণ সংখ্যা আর ভগ্নাংশের সংখ্যা সমান। সমগ্র তার একটি অংশের চেয়ে বড়—একথা সসীম জোটের বেলায় খাটে, অসীমের বেলায় নয়। কি করে হলো? মনে করা যাক, S এবং S^1 দুটি জোট আছে, যাদের পদগুলি যথাক্রমে a, b, c, d,$\cdots\cdots$এবং a^1, b^1, c^1, $d^1\cdots\cdots$। এখন, S এবং S^1-এর পদসংখ্যা সমান বলা হবে তখনই

যখন S-এর একটি পদের জন্যে S^1-এর একটি এবং একটি মাত্র পদ পাওয়া যাবে, আবার S^1-এর একটি পদের জন্যে S-এর একটি মাত্র পদ পাওয়া যাবে। গণিতের ভাষায় একে বলা হয় ওয়ান-টু-ওয়ান করেস্‌পণ্ডেন্স বা ঐকৈক সম্বন্ধ (3নং চিত্র)।

S X ———→←——— x' S'
a, b, c, ·   a', b', c', ··
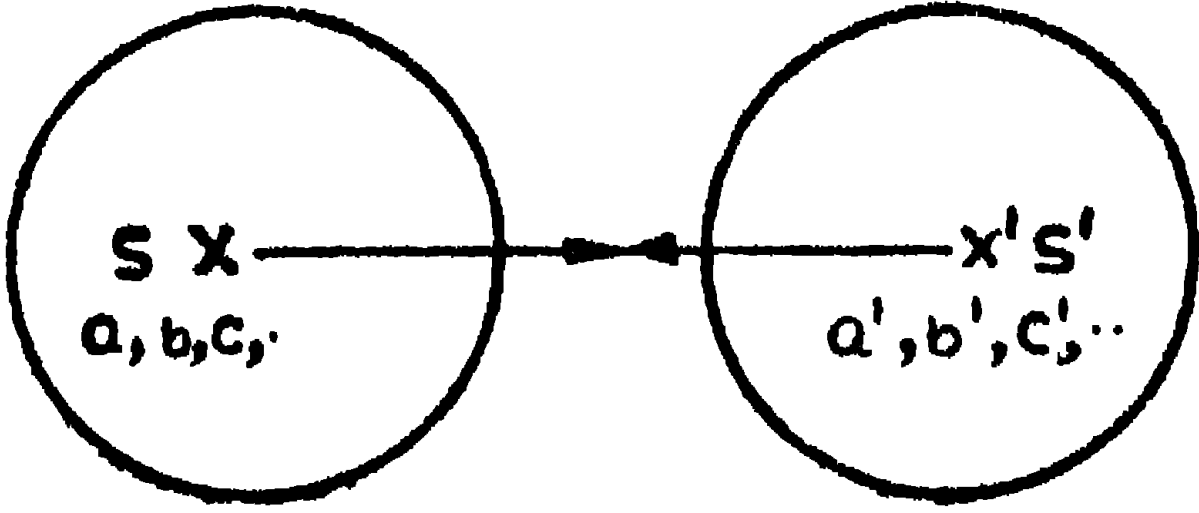
3নং চিত্র

সমস্ত পূর্ণ সংখ্যা এবং সমস্ত যুগ্ম সংখ্যা এরূপ দুটি জোট উৎপন্ন করে। নীচের ছকটি থেকেই বিষয়টি পরিষ্কার হবে—

1	2	3	4	5
↕	↕	↕	↕	↕
2	4	6	8	10

অনুরূপে পূর্ণ সংখ্যার বর্গগুলির সংখ্যা পূর্ণ-সংখ্যার সঙ্গে সমান।

1	2	3	4
↕	↕	↕	↕
1	4	9	16

এর উপর ক্যাণ্টর দেখালেন, সমস্ত মূলদ সংখ্যার দ্বারা উৎপন্ন জোটের পদসংখ্যা পূর্ণ সংখ্যার জোটের পদসংখ্যার সমান। কারণ এই দুটি জোটের পদগুলির মধ্যে ঐকৈক সম্বন্ধ দেখানো যায়। এর জন্যে সমস্ত মূলদ রাশিগুলিকে নিম্নলিখিতরূপে সাজাতে হবে—

$$\begin{matrix} \frac{1}{1} & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \frac{1}{4} & \cdots \\ \frac{2}{1} & \frac{2}{2} & \frac{2}{3} & \frac{2}{4} & \cdots \\ \frac{3}{1} & \frac{3}{2} & \frac{3}{3} & \frac{3}{4} & \cdots \\ \frac{4}{1} & \frac{4}{2} & \frac{4}{3} & \frac{4}{4} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \end{matrix}$$
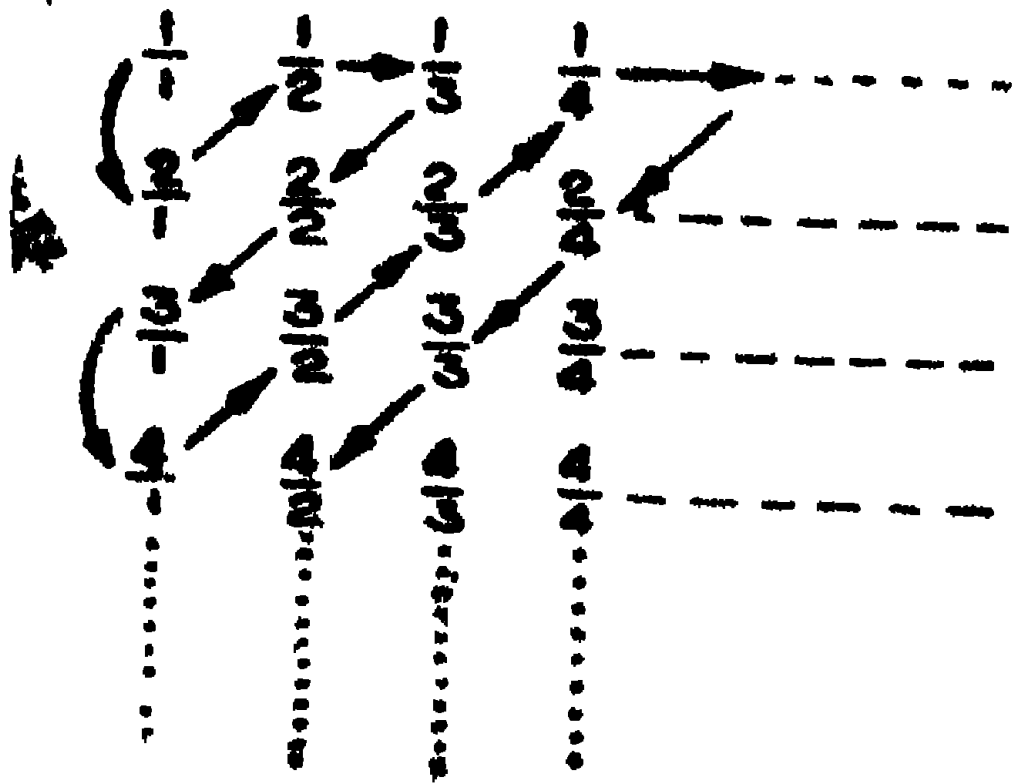
উপরের ছকে প্রত্যেক পংক্তিতে লবগুলি সমান এবং প্রতি স্তম্ভে হরগুলি সমান। এখন পূর্ণসংখ্যার সঙ্গে ঐকৈক-সম্বন্ধ স্থাপিত হবে পরপর তীর প্রদর্শিত পথে। অর্থাৎ—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕
1	$\frac{2}{1}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{2}$	$\frac{3}{1}$	$\frac{4}{1}$	$\frac{3}{2}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{4}$

কাজেই প্রমাণিত হলো পূর্ণ সংখ্যা ও মূলদ-রাশির পদসংখ্যা সমান। ক্যাণ্টর এই সংখ্যার নাম দিলেন S (আলেফ)। আলেফ হিব্রু বর্ণমালার প্রথম বর্ণ (আমরা এখানে আলেফকে S দ্বারা প্রকাশ করছি)। কিন্তু ক্যাণ্টর দেখলেন আরও এমন অসীম জোট আছে, যাদের পদসংখ্যা আলেফের চেয়ে বেশী; অর্থাৎ অসীম জোটগুলির মধ্যে পূর্ণ সংখ্যা বা মূলদ রাশির পদসংখ্যা ক্ষুদ্রতম। তাই সংখ্যাগুলির বিভিন্নতা প্রকাশের জন্যে S-কে করে দিলেন S_0, আর অন্যগুলিকে প্রকাশ করলেন S_1, S_2 রূপে। ক্যাণ্টর আবার দেখালেন কেবল মূলদ রাশিই নয়, সমস্ত বীজগাণিতিক রাশিগোষ্ঠীর পদসংখ্যাও S_0; অর্থাৎ সমস্ত বীজগাণিতিক রাশি পূর্ণ সংখ্যার সঙ্গে ঐকৈক সম্বন্ধবিশিষ্ট। তাই যদি হয়, তাহলে বীজগাণিতিক রাশিগুলিকে প্রথম, দ্বিতীয় তৃতীয় ইত্যাদিভাবে সাজানো যাবে। মনে করা যাক—

প্রথম $x_1 \cdot a_1 b_1 c_1 d_1$ - - - -
দ্বিতীয় $x_2 \cdot a_2 b_2 c_2 d_2$
তৃতীয় $x_3 \cdot a_3 b_3 c_3 d_3$ - - - -
চতুর্থ: $x_4 \cdot a_4 b_4 c_4 d_4$ - - - - - -

[এখানে $x_1, x_2 \cdots$ পূর্ণাংশ, a_1 b_1... ভগ্নাংশের অঙ্কগুলি]

এখন আমরা এমন একটি রাশি তৈরি করবো, যা এই যাবতীয় বীজগাণিতিক রাশি থেকে ভিন্ন। মনে করা যাক, রাশিটি Y। Y-এর দশমিক বিন্দুর পরের প্রথম অঙ্কের জন্যে প্রথম বীজগাণিতিক রাশির প্রথম অঙ্ক থেকে ভিন্ন একটি অঙ্ক নেব; অর্থাৎ a_1 থেকে ভিন্ন অঙ্ক,

মনে করা যাক, m_1 নিলাম। দ্বিতীয় অঙ্কের জন্যে দ্বিতীয় রাশির দ্বিতীয় অঙ্ক, অর্থাৎ b_2 থেকে ভিন্ন n_2 নিলাম। এভাবে কর্ণ (Diagonal) বরাবর অঙ্কগুলি বদলে বদলে নিলে আমরা যে রাশিটি পাব, সেটি প্রথম বীজগাণিতিক রাশি থেকে প্রথম অঙ্কে ভিন্ন, দ্বিতীয় থেকে দ্বিতীয় অঙ্কে ইত্যাদি। অর্থাৎ নবনির্মিত Y।

$Y = y'm_1n_2l_3......$

রাশিটি যাবতীয় বীজগাণিতিক রাশি থেকে ভিন্ন।

কাজেই এটি একটি অলৌকিক রাশি। এই ভাবে অলৌকিক রাশির অস্তিত্ব প্রমাণিত হলো। এই পদ্ধতিকে ক্যান্টরের তীর্যক-পদ্ধতি বলা হয়। ক্যান্টর আরও দেখালেন—এই অলৌকিক রাশিগোষ্ঠী পূর্ণ সংখ্যার সঙ্গে একৈক সম্বন্ধবিশিষ্ট নয়, এদের সংখ্যা উন্নততর অসীম বা S_1।

এখন π যে অলৌকিক রাশি, তার প্রমাণের জন্যে আর একটি অলৌকিক রাশির উল্লেখ অপরিহার্য, সেটি হলো প্রাকৃত লগারিথ্‌মের নিধান e। e-কে প্রকাশ করা হয় একটি অসীম অভিসারী শ্রেণীর দ্বারা—

$$e = 1 + \frac{1}{\angle 1} + \frac{1}{\angle 2} + \frac{1}{\angle 3} + \cdots$$

[$\angle n = n \times (n-1) \quad (n-2) \times \cdots \times 2 \times 1$]

1873 সালে গণিতজ্ঞ হারমাইট দেখালেন যে, e একটি অলৌকিক রাশি। তিনি প্রমাণ করলেন e

$$a_0X^n + a_1X^{n-1} + ... + a_n = o$$

এরূপ একটি বীজগাণিতিক সমীকরণের মূল হতে পারে না। এমন কি, তিনি এও দেখালেন—a_0, a_1, a_2...ইত্যাদি এবং n যদি পূর্ণ সংখ্যা না হয়ে বীজগাণিতিক রাশি হয়, তবু—

$$a_0e^n + a_1e^{n-1} + a_2e^{n-2} + ... + a_n = o$$

হবে না।

হারমাইটের এই তত্ত্ব এবং অয়লারের প্রসিদ্ধ সূত্র $e^{2\pi i} - 1 = 0$ থেকে 1885 সালে লিণ্ডেমান অবিসংবাদীভাবে প্রমাণ করলেন যে, π একটি অলৌকিক রাশি। $e^{2\pi i} - 1 = 0$-এর রূপ বীজগাণিতিক সমীকরণের অনুরূপ। সুতরাং π বীজগাণিতিক রাশি হলে $e^{2\pi i} - 1 = 0$ হবে না।

বহু যুগের সমস্যার সমাধান হলো। যেহেতু π একটি অলৌকিক রাশি, রুলার-কম্পাস তো দূরের কথা, বহু জটিল বক্ররেখার সাহায্যেও এমন কোন লেখ অঙ্কিত করা যায় না, যার বিন্দুগুলির কোটি (Ordinate) π-এর অপেক্ষক হবে। অতি সম্প্রতি একজন রুশদেশীয় যন্ত্রবিদ্‌ ইন্টেগ্রাফ নামে একটি যন্ত্র আবিষ্কার করেছেন, যার সাহায্যে π-এর লেখ অঙ্কিত করা যায়।

সদা পরিচিত বক্ররেখাগুলির মধ্যে বৃত্ত সরলতম। কিন্তু এই সরলতার মধ্যে π নামক জটিলতাটি এমন ভাবে লুকানো আছে যে, ভিতরে অনুসন্ধান না করলে ধরা যায় না। এর মহিমায় বৃত্তও অলৌকিকত্ব প্রাপ্ত হয়েছে।

মহাকর্ষের তরঙ্গ

বিমলেন্দু মিত্র*

মহাকর্ষ বললেই যে নাম দুটি প্রথমেই মনে পড়ে, তা হলো গ্যালিলিও ও নিউটন। মহাকর্ষের জন্যে আপেল মাটিতে পড়ে। মহাকর্ষের জন্যেই মহাবিশ্বে গ্রহ-নক্ষত্র কক্ষপথে ঘুরছে, অর্থাৎ মহাকর্ষই মহাবিশ্বের কাঠামো খাড়া রেখেছে। নিউটন মহাকর্ষের দরুণ আকর্ষণের যে নিয়ম খাড়া করলেন, তা সকলেরই জানা। নিয়মটির বিশেষত্ব হচ্ছে—তা প্রায় কুলম্ব্-প্রবর্তিত স্থির-বিদ্যুতের ক্ষেত্রের আকর্ষণের নিয়মের মতই।

তারপরে 1916 সালে আইনষ্টাইন প্রকাশ করলেন তাঁর সার্বজনীন আপেক্ষিকতাতত্ত্ব (Generalized Relativity)। সে যেন এক বিরাট বৈজ্ঞানিক বিস্ময়। Gamow-র ভাষায়—তা যেন উত্তুঙ্গ-শীর্ষ এক তাজমহল, বিজ্ঞান-জগতে নিজস্ব মহিমায় স্বতন্ত্র হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তিনি দেখালেন, বিশ্বের বক্র কাঠামোর জন্যেই মহাকর্ষ। মজা এই যে, আইনষ্টাইনের তত্ত্বের চেহারা আবার অনেকটা ম্যাক্স্ওয়েলের গড়া বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গের চেহারার মতই। আশ্চর্য নয় যে, আপেক্ষিকতাবাদ অনুযায়ী তত্ত্বের আঁকযোগ করতে গিয়ে আইনষ্টাইন প্রমাণ পেলেন, মহাকর্ষ কেবল স্থির বলক্ষেত্র নয়, বরং যেমন বৈদ্যুতিক আলোড়নে আলোক-তরঙ্গের উদ্ভব হয়, তেমনই পদার্থের স্বরণশীল হলে মহাকর্ষ-তরঙ্গের জন্ম দেয়। আলোক-তরঙ্গ বিদ্যুৎ-চৌম্বক শক্তিকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যায়—মহাকর্ষ-তরঙ্গ মহাকর্ষ-শক্তিকে ছড়িয়ে দেয়। স্বীকার করতে ক্ষতি নেই যে, ব্যাপারটা বেশ দুর্বোধ্য।

কথা হলো, এই যে মহাকর্ষ-তরঙ্গ কি মহাআঙ্কিকের কল্পনা মাত্র, না এর অস্তিত্ব বস্তুজগতে রয়েছে? এর সম্ভাব্য উৎস কি কি হতে পারে? আইনষ্টাইন নিজে বলেছিলেন—একটি ঘুরন্ত লাঠির কথা। একটি লাঠি মাঝখান বরাবর ধরে ঘোরালে এর বস্তুনিচয় ক্রমাগতই স্বরণশীল। এরকম ঘুরন্ত লাঠি থেকে মহাকর্ষ-তরঙ্গের উদ্ভব হবে। ঐ তরঙ্গ খুবই ক্ষীণ শক্তি (মহাকর্ষ-শক্তি) শূন্যে ছড়িয়ে দেবে। ঐ ক্ষীণতার মাত্রা কতটা? একটি হিসেবে দেখা যায় যে, এক মিটার লম্বা লাঠিকে যদি সম্ভাব্য বেগে ঘোরানো যায়, তবে তাথেকে প্রতি সেকেণ্ডে মাত্র 10^{-80} আর্গ পরিমাণ শক্তি বিকিরিত হবে।

1918 সালের প্রবন্ধে আইনষ্টাইন দেখালেন যে, মহাকর্ষ-তরঙ্গের গতিবেগ কিন্তু আলোর গতিবেগেরই সমান। এই ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করে প্রধানতঃ বৃটিশ বিজ্ঞানী এডিংটন অনেক প্রবন্ধ লিখেছিলেন। কিন্তু প্রমাণিত হয়েছে যে, ওদের গতিবেগ একই। আলোক-তরঙ্গ শূন্যের মধ্যে যখন ছড়িয়ে পড়ে, বহন করে নিয়ে যায় সে বিদ্যুৎ-চৌম্বক শক্তি। মহাকর্ষ-তরঙ্গ বহন করে নিয়ে যাচ্ছে মহাকর্ষীয় শক্তি। হিসাবে দেখা যায় যে, পৃথিবী সূর্যপ্রদক্ষিণকালে 0·001 ওয়াট শক্তি তরঙ্গাকারে ছড়িয়ে দিয়ে ব্যয় করে। আলোর কোয়াণ্টা বা শক্তিকণার চেহারা বৈজ্ঞানিকেরা জানেন। বিজ্ঞানী Dirac দেখালেন যে, মহাকর্ষ-শক্তিও শক্তি-কণিকা বা কোয়াণ্টার চেহারার কল্পনা করা যায়। Dirac ঐ শক্তিকণার নাম দিলেন গ্র্যাভিটন (Graviton)।

*বসু বিজ্ঞান মন্দির, কলিকাতা-9

আলোর কোয়ান্টার মতই গ্র্যাভিটনের শক্তিও ($h\nu$) এই ধাঁচে প্রকাশ করা যায়—h হচ্ছে প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবক ও ν হচ্ছে তরঙ্গের কম্পন-সংখ্যা।

এখন কথা হচ্ছে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সত্যই মহাকর্ষ-তরঙ্গের কোন জোরালো উৎস আছে কিনা? সে ইঙ্গিতও আইনষ্টাইন দিয়েছিলেন। মহাকাশে জোড়া নক্ষত্র বা Binary Star এরকম শক্তির উৎস হতে পারে। জোড়া নক্ষত্র যেন লম্বা বারবেলের দুই প্রান্তের দুটি ওজন, মাঝের লাঠিটি কাল্পনিক। বারবেল মাথার চারদিকে ঘোরালে যেমন ওজন দুটি নিজেদের মধ্যের দূরত্ব বজায় রেখে পরস্পরে ঘূর্ণায়মান হয়, তেমনই জোড়া নক্ষত্র ঘুরে চলেছে। তাহলে এদের আইনষ্টাইনের ঘূরন্ত লাঠি হিসেবেও কল্পনা করা যাচ্ছে। \

আরও একটি জোরালো উৎসের কথাও বলা হয়েছে। একটি বিশেষ অবস্থায় নক্ষত্রের অভ্যন্তর ভাগ হঠাৎ সঙ্কুচিত হতে থাকে। তার ঘনত্ব প্রচণ্ডভাবে বেড়ে যায়। ফল এই যে, ঐ নক্ষত্রটি ভেঙ্গে পড়ে, যাকে বলা হয় Gavitational collapse। তারপরই আবার অবশ্য বিস্ফোরণ ঘটে বা Supernova-র সৃষ্টি হয়। যাহোক, নক্ষত্রের অভ্যন্তর ভাগ যখন সঙ্কুচিত হতে থাকে, তখন ঐ অবস্থায় প্রচুর মহাকর্ষ-শক্তি ছাড়া পায়। মহাকর্ষ-শক্তিই নক্ষত্রটির বাইরের উত্তাপ বাড়াতে থাকে এবং ছাড়া পাওয়া শক্তি তরঙ্গাকারেও বিকিরিত হতে পারে।

অন্য একটি উৎসের কথাও কল্পনা করা হয়েছে। মহাবিশ্ব যদি একদা বিরাট বিস্ফোরণের ফলে সৃষ্টি হয়ে থাকে—যাকে পণ্ডিতেরা Big Bang Origin বলে থাকেন—তবে আদিতে সেই ব্রহ্মার অণ্ড বিস্ফোটনের মহা আলোড়নে প্রচুর মহাকর্ষ-তরঙ্গ ছড়িয়ে পড়েছিল নিশ্চয়। তারই অবশিষ্ট বিশ্বজুড়ে এখনও হয়তো প্রবাহিত হচ্ছে।

আমরা আগেই ইঙ্গিত দিয়েছি যে, মহাকর্ষ-তরঙ্গের তীব্রতা অতিশয় ক্ষীণ হতে বাধ্য। অন্যান্য শক্তির ক্রিয়ার তুলনায় মহাকর্ষ-শক্তির ক্রিয়া কত ক্ষীণ, তার একটা সহজ হিসেব তুলে ধরা যায়। ধরা যাক, আমাদের কাছে প্রোটন ও ইলেকট্রনের মাঝামাঝি ভরযুক্ত দুটি ক্ষুদ্র কণিকা রয়েছে, যাদের মধ্যে বিপরীত আধান। আধানের পরিমাণ—ইলেকট্রন-আধানের সমান বা 4.77×10^{-10} e. s. u.। ওদের মধ্যে বৈদ্যুতিক আকর্ষণ $\frac{e^2}{r^2}$, কারণ কুলম্-এর (Coulomb) আইন তাই বলছে। আবার নিউটনের আইন অনুযায়ী মহাকর্ষের দরুণ আকর্ষণ $G\frac{M^2}{r^2}$. M হচ্ছে ভর—নেওয়া হয়েছে 4×10^{-20} গ্র্যাম। G হচ্ছে নিউটনীয় অভিকর্ষী ধ্রুবক 6.67×10^{-8}। সুতরাং বৈদ্যুতিক শক্তির তুলনায় মাধ্যাকর্ষণ-শক্তির পরিমাণ $G\frac{M^2}{e^2}$, অর্থাৎ প্রায় 10^{-40}। এই সংখ্যাটি যে কত ছোট, তা প্রায় ধারণার বাইরে।

এখন কথা হচ্ছে যে, মহাকর্ষ-তরঙ্গ এত ক্ষীণশক্তির, তাকে কি করে হাতে-কলমে ধরা যাবে? কোন পার্থিব জিনিষে কতটুকু বিক্রিয়া সে ঘটাবে, যার ফলে অন্য সব শক্তির বহুগুণে জোরালো প্রতিক্রিয়ার মধ্যে থেকে মহাকর্ষ-তরঙ্গের দরুণ সংঘটিত ব্যাপারস্যাপার চিনে নেওয়া যাবে? বহুদিন ধরেই বৈজ্ঞানিক মহল একরকম মেনেই নিয়েছিলেন যে, মহাকর্ষ-তরঙ্গ যদি বাস্তবিকই থাকে, তবুও তার অস্তিত্ব পরীক্ষাগারে প্রমাণ করা প্রায় অসম্ভব।

একটি মানুষ কিন্তু বরাবর বিশ্বাস করেছেন যে, এই অতিক্ষীণ তরঙ্গও যন্ত্রপাতি দিয়ে ধরা সম্ভব এবং এর জন্যে উপযুক্ত যন্ত্রপাতিও তৈরি করা সম্ভব। ইনি হচ্ছেন আমেরিকার মেরীল্যাণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক যোসেফ ওয়েবার।

1958 সাল থেকে এই ভদ্রলোক নীরবে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন ঐ দুর্বল তরঙ্গের প্রতিক্রিয়ার প্রমাণ পাবার জন্তে, যার ফলে সন্দেহাতীতভাবে বলা যাবে—আছে, মহাকর্ষ-তরঙ্গের অস্তিত্ব আছে—এ কেবল আইনষ্টাইনের কল্পনামাত্র নয়।

ওয়েবার চিন্তা করতে লাগলেন, সরাসরি কিভাবে তিনি ঐ তরঙ্গ ধরবেন। মহাকর্ষ-তরঙ্গ কঠিন বস্তুতে তার বিক্রিয়ায় স্থিতিস্থাপক তরঙ্গের (Elastic waves) সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু ঐ বিক্রিয়ার পরিমাপ যে খুবই কম, তা আমরা দেখেছি। তবুও ওয়েবার স্থির করলেন, তিনি এমন যন্ত্র তৈরি করবেন, যা ঐ Elastic waves-কে ইলেকট্রনিক উপায়ে বহুগুণে তীব্র করে তার সাড়া গ্রহণযোগ্য করে তুলবে। তিনি মহাকর্ষ-তরঙ্গের গ্রাহক-যন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করলেন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি ড্রামের আকৃতির ঘন বস্তুর। ঐ ঘন (Solid) ড্রামগুলির আকার যদি এমন হয় যে, তা আগত মহাকর্ষ-তরঙ্গের কম্পনে অনুরণিত (Resonating) হবে, তবে এগুলিকে ঐ তরঙ্গের গ্রাহক-যন্ত্র বা এরিয়েল হিসেবে ভাবা চলবে। অন্তভাবে বলতে গেলে বলতে হয় যে—ঐ ড্রামগুলির ভর এমন হওয়া প্রয়োজন যে, আগত তরঙ্গের কম্পন-সংখ্যার সমান হবে ঐ বস্তুটির নিজস্ব (স্থিতিস্থাপকতার দরুণ) কম্পন-সংখ্যা (Natural frequency)।

ঐ ড্রাম এরিয়েলগুলির মাপজোখ কি রকম হবে স্থির করতে গিয়ে ওয়েবারকে চিন্তা করতে হলো, তিনি কোন উৎস থেকে উৎসারিত তরঙ্গ ধরবেন। তিনি স্থির করলেন যে, ছায়াপথে সুদূরস্থ নক্ষত্রের সঙ্কোচনের (Collapse) ফলে উৎসারিত তরঙ্গই সবচেয়ে সম্ভাবনাময়। জানা আছে যে, বিশ্বের বেশীর ভাগ নক্ষত্রের ভর আমাদের সূর্যের ভরের চেয়ে বেশী নয়। জানা আছে যে, সূর্যের সমান ভরের নক্ষত্রের ভগ্নদশা বা collapse ঘটলে যে তরঙ্গের জন্ম হবে, তার কম্পন-সংখ্যা সেকেণ্ডে কয়েক হাজার বার। ওয়েবার স্থির করলেন, তিনি তাঁর গ্রাহক-যন্ত্র ড্রাম এমন ভর ও আয়তনের করবেন যে, সেটি 1660 হাজার (1660 Kilo Hertz) কম্পনের তরঙ্গে অনুষ্ঠিত হবে। 1660 Kilo Hertz (বা সংক্ষেপে KHz) মাপের রেডিও-তরঙ্গ একটি Supernova-র বেলায় আগেই ধরা পড়েছিল। আশা করা অন্যায় নয় যে, ঐ একই কম্পন-সংখ্যার মহাকর্ষ-রশ্মিও বিকিরিত হচ্ছে ঐ সঙ্কুচিত নক্ষত্র থেকে।

1969 সালে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে ওয়েবার ছয়টি এরকম মহাকর্ষ-এরিয়েলের বর্ণনা করেছেন। তাদের মধ্যে চারটি অ্যালুমিনিয়ামের solid ড্রাম, প্রত্যেকটি লম্বায় 153 সে. মি. ও ব্যাসের মাপ 96 সে. মি.। প্রত্যেকটির ওজন প্রায় 1400 কি. গ্রা.। অন্য দুটি ড্রামের পরিমাপ 61 সে. মি. ×61 সে. মি.। হিসেব মত এরা মহাকর্ষ-তরঙ্গের সুরে বাঁধা (Tuned) হবার দরুণ সামান্য মাত্রায় সঙ্কুচিত প্রসারিত হয়ে নিজেদের দেহে কম্পন সৃষ্টি করবে। কিন্তু ঐ মাত্রা এত সামান্য যে, তা 10^{-14} সেণ্টিমিটারের চেয়ে হয়তো বেশী হবে না।

বুঝুন ব্যাপারটা। এই অকল্পনীয় ক্ষুদ্রতার মান কোন যন্ত্রে ধরা পড়বে? ঐ আলোড়ন জানবার জন্তে কোন রকম আলোর সাহায্য (Optical device) নেওয়া চলবে না, কারণ আলোক-তরঙ্গ (বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গ) নিজেই এর চেয়ে ঢের বেশী আলোড়ন ঘটাবে। ওয়েবার তারও সমাধান করেছেন। বিশেষ ধরণে কাটা কোয়ার্ট্জ একটি পীজোইলেকট্রিক ক্রিষ্টাল (Piezoelectric)। এর উপর সামান্য চাপের পরিবর্তন ঘটলে দু-দিকে একটু বিদ্যুৎ-চাপের সৃষ্টি হয়। পীজোইলেকট্রিক ক্রিষ্ট্যালের ঐ ধর্মটি কাজে লাগালেন ওয়েবার।

তিনি অনেকগুলি পীজোইলেকট্রিক কৃষ্ট্যাল তাঁর অ্যালুমিনিয়ামের ড্রামগুলির গায়ে পর পর লাগিয়ে বেড় দিয়ে দিলেন। এখন যে যন্ত্রটি দাঁড়ালো, সেটি খুবই অনুভূতিশীল। ড্রামটির আয়তনের মোটামুটি 10^{-13} সে. মি. এবং ব্রাউনীয় গতিও (Brownian motion) ওটিতে 10^{-14} সে. মি. পরিবর্তন ঘটাতে পারে।

ওয়েবার 1958 সাল থেকেই এই বিষয়টি নিয়ে

যোসেফ ওয়েবার ও তাঁর বিরাট অ্যালুমিনিয়ামের ড্রাম। মাঝ বরাবর পীজোইলেকট্রিক কৃষ্ট্যালের বেড় দেওয়া রয়েছে।

ক্ষুদ্রতম সংকোচন-প্রসারণও বৈদ্যুতিক সাড়া হিসেবে পাওয়া সম্ভব। তারপর ঐ বৈদ্যুতিক সাড়া ইলেকট্রনিক উপায়ে বহুগুণে বাড়ানো যেতে পারে। এভাবে তৈরি ওয়েবারের নতুন যন্ত্রের অনুভূতিশীলতা নাকি 10^{-16} সে. মি. অর্থাৎ ঐ প্রকাণ্ড ড্রামের চেহারায় যদি 10^{-16} সেন্টিমিটার পরিবর্তন ঘটে, তবে তাও ঐ যন্ত্রে ধরা পড়বে। ব্যাপারটি বিশেষভাবে অনুধাবনযোগ্য, কারণ পরমাণুর নিউক্লিয়াসের বেধ হচ্ছে কাজ করছেন। প্রথম যখন তিনি প্রকাশ করলেন যে, তাঁর যন্ত্রে তিনি মহাকর্ষ-তরঙ্গের অস্তিত্বের প্রমাণ পেয়েছেন, তখন দুনিয়ার কোন বিজ্ঞানীই তাঁর কথা বিশ্বাস করেন নি। যে কারণগুলির জন্যে বিশ্বাসযোগ্যতার অভাব ঘটতে পারে, তা নিয়ে আলোচনা করা যাক।

প্রথমতঃ—এত সূক্ষ্ম অনুভূতিশীল যন্ত্রে, যেখানে আসল ক্রিয়াটির সাড়া এত ক্ষীণ, সেখানে অন্যান্য সর্ববিধ পার্থিব কম্পন অনেক বেশী সাড়া

তুলবে। এদের মধ্যে আছে শব্দের দরুণ কম্পন (Acoustic) এবং ভূপৃষ্ঠের নানারকম কম্পন (Seismic)। তাছাড়া আছে জটিল যন্ত্রাংশের বিচিত্র ইলেকট্রনিক ও বৈদ্যুতিক আলোড়ন (Noise)। এই আলোড়ন আসল সাড়ার চেয়ে বহুগুণে প্রবল সাড়া তুলবে। ষ্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের এক দল বিজ্ঞানী বললেন—মহাজাগতিক রশ্মির (Cosmic Rays) দরুণও বেশ জোর আলোড়ন হবে।

ওয়েবারের বৃহদাকার ড্রামগুলি প্রথমতঃ বায়ুশূন্য কক্ষে ঝোলানো। চারদিকের শব্দের সাড়াতে যাতে কোন আলোড়ন না জাগে, সে জন্যে ওয়েবার ভাল করে রবারের প্যাড দিয়ে জুড়েছিলেন ড্রামগুলিকে। ব্যবস্থা এমন ভাল হলো যে, বাইরে থেকে ঐ ভ্যাকুয়াম ট্যাঙ্কের গায়ে হাতুড়ির ঘা মারলেও Acoustic কম্পন ভিতরে সাড়া তোলে না। ভূমির আন্দোলনের (Seismic vibration) হিসেব রাখবার জন্যে ভূকম্পনজ্ঞাপক যন্ত্রের সাহায্য নেওয়া হলো। এর ফলে দেখানো যেতে পারে যে, ভূপৃষ্ঠের কোন কম্পনের ঠিক একই সময়ে বা একই তালে ঐ যন্ত্রে সাড়া জাগছে কি জাগছে না। ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতির নানারকম আলোড়ন বা যাকে Noise বলা হয়, তাকে কমাবার জন্যে বিশদ ব্যবস্থা নেওয়া হলো। সমস্ত ইলেকট্রনিক যন্ত্রগুলিকে খুবই ঠাণ্ডায় রাখা গেল—প্রায় তরল হাইড্রোজেনের তাপে। উত্তাপ কমালে Noise-ও কম হয়। এরপর আরও যে ব্যবস্থাটি নেওয়া হলো, সেটি হলো সাড়ার সমাপতনের পরিমাপ (Coincidence measurement); অর্থাৎ এমন ব্যবস্থা যে, দুটি সাড়া যদি একেবারে একই সময়ে আসে, তবেই যন্ত্র তাকে লিপিবদ্ধ করবে, এলোমেলো সাড়াকে সে অগ্রাহ্য করবে। ওয়েবার Argonne National Laboratory ও মেরীল্যাণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়—এই দুটি জায়গাতেই যন্ত্র বসালেন। জায়গা দুটির মধ্যে তফাৎ প্রায় 1000 কিলোমিটার। এত তফাতে এই দুটি জায়গার যে সব সাড়া একই সময়ে দুটি যন্ত্রকে আলোড়িত করবে, শুধু সেগুলিরই হিসেব নেওয়া হবে—এই ব্যবস্থা হলো। ওয়েবার আরও দেখালেন যে, মহাজাগতিক রশ্মি তাঁর যন্ত্রে কোন সাড়া জাগায় না। এভাবে সর্বরকমের ভুলভ্রান্তির সম্ভাবনাকে এড়িয়ে প্রায় দশ বছর কাজ করবার পর যে সব ফলাফল ওয়েবার প্রকাশ করলেন, তাতে আর সন্দেহ করবার অবকাশ রইলো না যে, সত্যই মহাকাশের সুদূরস্থ Supernova-র পাঠানো মহাকর্ষ-তরঙ্গ পৃথিবীতে ধরা গেছে।

ইতিমধ্যেই ওয়েবারের এই পরীক্ষা অনেকগুলি সুদূরপ্রসারী ফলাফল এনে হাজির করেছে। তিনি দেখিয়েছেন যে, ঐ তরঙ্গ আসছে আমাদের ছায়াপথ বা Galaxy-র মোটামুটি কেন্দ্রস্থল থেকে। আর ঐ তরঙ্গের তীব্রতা থেকে হিসেব করে দেখা যায় যে, প্রতি বছরে সূর্যের সমান প্রায় 200টি নক্ষত্র ছায়াপথের কেন্দ্রে ভেঙে পড়ছে (Gravitational collapse)। এতগুলি নক্ষত্রের ভেঙে পড়া সম্ভব কিনা, সে সম্বন্ধে তর্কবিতর্ক হয়েছে। কেম্ব্রিজের বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী D. W. Sciama বলেছেন যে, এই সংখ্যা অবিশ্বাস্য নয়। এখন আবার কেউ কেউ চেষ্টা করছেন দেখাতে যে, পৃথিবীর কাছাকাছি মহাশূন্যে নক্ষত্রাদির অবস্থানের এমনই বিচিত্র জ্যামিতিক ছক রয়েছে যে, তার ফলে পৃথিবীর বুকে আসলে গ্র্যাভিটনসমূহ কেন্দ্রীভূত ও তীব্রতর হয়ে পড়ছে (Focussed হচ্ছে)। ওয়েবারের পরীক্ষার দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য ফল এইভাবে বর্ণনা করা যায়:—Carl Brans ও Robert Dicke তত্ত্ব প্রচার করেছিলেন যে, মহাকর্ষীয় বলক্ষেত্র শুধুমাত্র আইনষ্টাইন-বর্ণিত Tensor-ক্ষেত্র নয়, বরং Tensor ও Scalar-এর মিশ্রিত ক্ষেত্র (এই অংশটি অন্যভাবে

সহজ করে বোঝানো লেখকের সাধ্যাতীত)। কিন্তু সে রকম হলে ওয়েবারের ড্রামে কম্পনের অন্যরকম চেহারা হতো। পরীক্ষার ফল প্রমাণিত করলো, মহাকর্ষ আইনষ্টাইন-বর্ণিত Tensor-ক্ষেত্রই, Scalar অংশ তাতে নেই।

যাহোক, যোসেফ ওয়েবারের এক যুগের ধৈর্য ও পরীক্ষায় যে চমকপ্রদ জ্ঞান আহৃরিত হলো, তাতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিজ্ঞানী ও বৈজ্ঞানিক সমাজের এই দিকে নজর পড়েছে। ইংল্যাণ্ডে রেডিং বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক W. D. Allen একটি অনুরূপ যন্ত্র তৈরি করছেন, যাতে আশা করা যাচ্ছে, মেরীল্যাণ্ডে ওয়েবারের যন্ত্রের সঙ্গে একযোগে (Coincidence-এ) সাড়া পাওয়া যাবে। বৃষ্টলে Aplin-ও (রেডিং থেকে 100 কিলোমিটার দূরে) এরকম যন্ত্র বসাচ্ছেন। আমেরিকার অন্যান্য লেবরেটরীও এগিয়ে এসেছে। ষ্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে চেষ্টা চলেছে—শুধুমাত্র ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতিগুলিই নয় বরং ঐ বিরাট ড্রামগুলিকেও তরল হিলিয়ামের ঠাণ্ডায় রাখবার। ব্রাউনীয় গতি (যা 10^{-14} সে. মি. আয়তন কমাতে-বাড়াতে পারে) কমাবার জন্যেই এই কাণ্ড। ওঁরা বলছেন, এই উপায়ে ওয়েবারের যন্ত্র প্রায় 10^{-21} সেণ্টিমিটার তফাৎও ধরতে পারবে।

সমস্ত পৃথিবীর ভরটাকেই এরিয়েল করে তার কম্পন ধরবার ব্যবস্থার কথা কেউ কেউ বলেছেন। কিন্তু প্রথমতঃ ভূত্বকের কম্পন তুলনায় এত বেশী হয়ে দাঁড়াবে যে, এতে হয়তো ভাল ফল পাওয়া যাবে না। ওয়েবার পরামর্শ দিয়েছেন NASA-কে যে, চাঁদের বুকে একটি যন্ত্র যেন বসিয়ে আসা হয়, কারণ চন্দ্রপৃষ্ঠে এরূপ কম্পন (Seismic vibration) কম বা নেই—এখনও সে বিষয়ে কিছু করা হয় নি। Dr. Levine, Boulder-এ (Colorado, আমেরিকা) গভীর খনিগর্ভে লেসার বসিয়ে মহাকর্ষ-তরঙ্গাঘাতে সমগ্র পৃথিবীর প্রতিক্রিয়া ধরবার কাজে লেগে রয়েছেন। সোভিয়েট রাশিয়াও এই কাজে উপযুক্ত যন্ত্র বসাচ্ছে।

দেখা যাচ্ছে, বিশ্বজোড়া (পৃথিবীজোড়া) ফাঁদ পাতা হয়েছে। আশা করা যায়, মহাকর্ষ-তরঙ্গ ফাঁকি দেবে না, সন্দেহাতীত ভাবেই ধরা দেবে।

মনে রাখতে হবে, এর মূলে একজন বিজ্ঞানীর, যোসেফ ওয়েবারের একযুগব্যাপী একনিষ্ঠ পরিশ্রম। সহস্র প্রতিকূলতা, অবিশ্বাস—এমন কি, বিদ্রূপও সহ্য করে তিনি ক্রমাগত একমনে নিজের বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরে ধীরে ধীরে নিজের যন্ত্রকে আরও সক্রিয়, আরও অনুভূতিশীল করে অবশেষে পৃথিবীর জনসমাজে এক বিচিত্র সফল পরীক্ষার নজির তুলে ধরেছেন। আপেক্ষিকতাবাদ বিষয়ে এত সুন্দর, এত কৌতূহলোদ্দীপক পরীক্ষা বর্তমানকালে আর হয় নি।

আধুনিক জীব-বিজ্ঞান ও মানব সমাজের ভবিষ্যৎ

শ্রীরাধাকান্ত মণ্ডল*

জন্মসূত্রে ভারতীয় বিজ্ঞানী বর্তমানে আমেরিকার নাগরিক হরগোবিন্দ খোরানার নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির সময় এদেশের পত্র-পত্রিকা ও বেতারে যতটুকু আলোচনা হয়েছিল, তাতে জনসাধারণের অন্ততঃ এটুকু ধারণা হয়েছিল যে, জীব-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে একটা বিরাট অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। তার পরে সংবাদপত্রের পাতায় আরও কয়েকটি চমকপ্রদ সংবাদ ছোট আকারে প্রকাশিত হয়েছে; যেমন—হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের শাপিরো ও বেকউইথ কর্তৃক একটি জীবাণু থেকে সম্পূর্ণ একটি জিন নিষ্কাশিত করা, খোরানা কর্তৃক প্রথম পরীক্ষা-নলে একটি কৃত্রিম জিন সংশ্লেষণ, বাফেলোর নিউইয়র্ক স্টেট ইউনিভার্সিটির ডেনিয়েলি কর্তৃক কৃত্রিম জীবকোষ তৈরি, অক্সফোর্ডের হেনরি হ্যারিস কর্তৃক সঙ্কর জীবকোষ তৈরি, লণ্ডনের ডাঃ স্টেপ্‌টো কর্তৃক পরীক্ষা-নলে প্রথম মানব-ভ্রূণ সৃষ্টি এবং ম্যাসাচুসেট্‌সের বাল্টিমোর ও উইসকন্‌সিনের টেমিন কর্তৃক জিনের বার্তার বিপরীত প্রতিলেখন প্রভৃতি। অ্যাপোলো ও সয়ুজ শ্রেণীর মহাকাশযানের চন্দ্রবিজয়ের চমকের আড়ালে অনেকটা চাপা পড়ে থাকলেও আধুনিক জীব-বিজ্ঞানের এই আবিষ্কারগুলি তা থেকে কম তাৎপর্যপূর্ণ তো নয়ই, বরং এগুলির সুদূরপ্রসারী ফলাফল মহাকাশজয়ের চেয়ে অনেক বেশী ব্যাপক ও ভবিষ্যৎ মানবজাতির পক্ষে অধিক সম্ভাবনাপূর্ণ। জীব-বিজ্ঞানের এই আবিষ্কারগুলি এখন বিজ্ঞানীদের সামাজিক দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন হতে বাধ্য করবে।

গত তিন দশকের গবেষণার ফলে শুধুমাত্র বর্ণনাভিত্তিক জীব-বিজ্ঞানকে (Descriptive biology) আজ অণু-পরমাণুর স্তরে দেখা ও ব্যাখ্যা করা সম্ভব হচ্ছে। জীবনের রহস্য, বিভিন্ন জীবের প্রবহমান ধারার মূল বস্তু, জীবদেহের কার্যাবলী প্রভৃতি সম্বন্ধে আমরা অনেক কিছু জানতে পেরেছি। সাধারণভাবে দেখতে গেলে চিকিৎসা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি প্রভৃতি বিষয়ে এই লব্ধ-জ্ঞান মানুষের মঙ্গলেই লাগছে। তবে আধুনিক জীব-বিজ্ঞানের বর্তমান অগ্রগতি এত দ্রুত ও মানবিক, তথা সমাজ-বিজ্ঞানসমূহের তুলনায় এই গবেষণার ব্যাপ্তি এত ভারসাম্যহীন যে, এই অগ্রগতিতে ভীত হবার কারণও যথেষ্ট আছে। আবিষ্কারের ঘটনার পাশাপাশি আরও কয়েকটি খবর বিজ্ঞানী ও জনসাধারণের মধ্যে আলোড়ন তুলেছে। তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো—তাঁদের আবিষ্কারের ভবিষ্যৎ অপপ্রয়োগের সম্ভাবনা সম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতন করবার জন্যে জীবাণু থেকে ল্যাক্টোজ জিন বের করবার কৃতিত্বের অন্যতম অধিকারী শাপিরোর নাটকীয় ভাবে জীব-বিজ্ঞানের গবেষণা পরিত্যাগ করে সমাজকল্যাণমূলক কাজে যোগদান। প্রায় বছর খানেক আগে বৃটিশ সোসাইটি ফর সোশ্যাল রেস্পন্‌সিবিলিটি অব সায়েন্সের 'জীব-বিজ্ঞানের সামাজিক প্রভাব' সংক্রান্ত আলোচনা-চক্রে এই ব্যাপারে দু-ধরণের মতের বিরোধ দেখা যায়। প্রবীণ ও প্রাচীনপন্থী বিজ্ঞানীরা এখনও বিজ্ঞান গবেষণাকে স্বাধীন ও গজদন্তমিনারে আবদ্ধ বিজ্ঞানীর নিজের বিচার-বিবেচনার উপরই ছেড়ে দেবার পক্ষপাতী। কিন্তু আর একদল তরুণ (এঁরা সকলেই বয়সে তরুণ তা নয়, অনেকে

*বসু বিজ্ঞান মন্দির কলিকাতা।

মনের দিক দিয়ে তরুণ) বিজ্ঞানীর মত হচ্ছে—যেহেতু বিজ্ঞানের গবেষণা জনসাধারণের অর্থেই পরিচালিত হয়, সেই জন্যে বিজ্ঞানের গবেষণার বিষয়বস্তু সমাজের দিকে লক্ষ্য রেখে স্থির করতে হবে এবং গবেষণালব্ধ ফলাফলের সম্পূর্ণ প্রয়োগ, তথা অপপ্রয়োগের সম্ভাবনার কথা সাধারণের কাছে প্রচার করতে হবে। আশার কথা, সংখ্যায় এঁরা অনেক বেশী। যান্ত্রিক সভ্যতার চরমে উন্নীত আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে সাধারণ লোকও আজ কলকারখানা ও মোটর গাড়ীর দূষিত বর্জদ্রব্যে (Waste Product) মানুষের পরিবেশ ও আবহাওয়া দূষিতকরণের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেমেছেন। প্রায় একই কারণে সেখানে বিজ্ঞানীরা ভিয়েৎনামে রাসায়নিক যুদ্ধাস্ত্র ব্যবহারের জন্যে সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করছেন।

মানব সভ্যতার ইতিহাসে এমন অনেক সময় এসেছে, যখন মানুষ বিশেষ একটি বিষয়ে এমন জ্ঞান ও ক্ষমতার অধিকারী হয়েছে, যার সম্যক ব্যবহারের অধিকারী তখনও মানুষ হতে পারে নি। যেমন বলা যায় পারমাণবিক শক্তির বেলায়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে পারমাণবিক শক্তিকে ব্যবহারের পূর্ণ সম্ভাবনা সম্পর্কে যেমন মানুষের সম্যক ধারণা ছিল না, তেমনি একে ব্যবহারের অধিকার পাওয়ার মত যথেষ্ট সভ্য হতে মানব সমাজ পারে নি। হিরোসিমা, নাগাসাকিতে ধ্বংসলীলা দেখে বোমার আবিষ্কর্তা বিজ্ঞানীরাও বিস্মিত হয়েছিলেন। ঠিক কতটা ভয়াবহ এই অস্ত্র হতে পারে, সে সম্বন্ধে সঠিক ধারণা তাঁদের তখন ছিল না। 1971 সালেও আমরা সেই অধিকার অর্জন করতে পেরেছি কিনা জানি না। তবে পারমাণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ কাজে ব্যবহারের অনেক সম্ভাবনাই এখন বাস্তবে রূপায়িত হচ্ছে। ভারতের মত দরিদ্র দেশেও আজ তারাপুরে পারমাণবিক শক্তিকে বিদ্যুৎ উৎপাদনে লাগানো হচ্ছে। যাই হোক, এ থেকে বোঝা যায় যে, বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন যথেষ্ট সাবালকত্ব আসবার আগেই বিজ্ঞানীরা মানুষের হাতে এক মারাত্মক অস্ত্র তুলে দিয়েছিলেন। যার ফল হিরোসিমা, নাগাসাকিতে প্রত্যক্ষ, অপ্রত্যক্ষ ফল কত যুগ ধরে দেখতে হবে কে জানে? ঠিক এই ধরণের আশঙ্কাই আছে জীব-বিজ্ঞানকে নিয়ে।

এখন আমরা বংশগতির ধারক ও বাহক যে জিন বা DNA, তার গঠন-প্রণালী, তার মধ্যে লুকিয়ে থাকা জিনের বার্তাসঙ্কেত (Genetic code), DNA থেকে RNA-তে বার্তা পাঠানো, RNA থেকে প্রোটিন সংশ্লেষণের কৌশল ইত্যাদি জানতে পেরেছি। খোরানা এবং আরও অনেকের কাজের ফলে এখন পরীক্ষা-নলে ইচ্ছামত অর্থবাহী নিউক্লিক অ্যাসিড তৈরি করা সম্ভব। দু-বছর আগে কর্ণবার্গ কৃত্রিম উপায়ে জীবনের ক্ষুদ্রতম অভিব্যক্তিযুক্ত ভাইরাস প্রস্তুত করতে সক্ষম হয়েছেন। আণবিক বংশগতিবিদ্যার (Molecular genetics) অগ্রগতির ফলে এখন কোন জীবকোষের জিনের বার্তার রদবদল বা প্রয়োজনমত কৃত্রিম উপায়ে সংশ্লেষিত জিন জীবকোষে ঢুকিয়ে দেবার সম্ভাবনা আজ বাস্তবে পরিণত হতে চলেছে। নিরেনবার্গের মতে, আগামী পঁচিশ বছরের মধ্যেই মানুষ জীবকোষে বার্তা নিয়ন্ত্রণের ও কৃত্রিম জিনকে কাজে লাগাবার ক্ষমতার অধিকারী হবে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, তখন কি মানব সমাজ এই অগ্রগতিকে গ্রহণ করবার জন্যে সম্পূর্ণ প্রস্তুত হতে পারবে? এর পরিপূর্ণ সম্ভাবনা, ভবিষ্যৎ বিপদাশঙ্কা ইত্যাদি সম্পর্কে সম্যকরূপে সচেতন হবে মনে হয় না।

ঠিক পারমাণবিক বোমার মতই অবিবেচক সরকার বা রাষ্ট্রনায়কের হাতে এই জৈবিক নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার অপব্যবহার হতে পারে। মানবজাতির এক বৃহৎ অংশের বা কোন বিশেষ গোষ্ঠীর কর্মক্ষমতা, চিন্তাধারা—এক কথায় সব-

কিছু হয়তো একজন নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। উদাহরণস্বরূপ, কোন সরকার ইচ্ছা করলে কোন জাতি বা উপজাতির সমস্ত জনসংখ্যাকে ভাই-রাসের সাহায্যে এমন একটি কৃত্রিম জিন দিয়ে প্রভাবিত করতে পারে—যার ফলে তাদের কাজ করবার ক্ষমতা থাকবে, কিন্তু স্বাধীন চিন্তা করবার ক্ষমতা থাকবে না, অর্থাৎ তাদের পশুর স্তরে নামিয়ে দেওয়া যাবে। পারমাণবিক বোমা বা সাধারণ যুদ্ধের চেয়ে তা আরও খারাপ এই জন্যে যে, এই ক্ষেত্রে পরিবর্তন বা ক্ষতি ঘটানো হবে জিনের, যা সন্তানসন্ততিক্রমে চলতেই থাকবে। তাছাড়া আরও অনেক ভাববার বিষয় আছে। এর সঙ্গে সমাজ, রীতিনীতি, রাজনীতির প্রশ্নও জড়িত। মানুষ এখন নিজের ভবিষ্যৎ—এমন কি, তার বিবর্তন, পারিপার্শ্বিক জীবজগতের সঙ্গে তার সহাবস্থান (Ecology) প্রভৃতি নিজের হাতে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। তাই সেটা করবার আগে মানুষের লক্ষ্য কি হবে বা হওয়া উচিত, সেটা ভেবে ঠিক করা দরকার। আর এই জন্যেই মানবিক বিজ্ঞান ও সমাজ-বিজ্ঞানসমূহের (Humanities and Social sciences) যথেষ্ট অনুশীলন প্রয়োজন, যাতে জীব-বিজ্ঞানের অগ্র-গতি একপেশে ও ভারসাম্যহীন না হয়ে পড়ে।

অবশ্য ইতিমধ্যেই সুদূর ভবিষ্যতে কি দাঁড়াবে, তা না জেনেই জীব-বিজ্ঞানের অনেক জ্ঞানের ব্যাপক প্রয়োগ আমরা সুরু করেছি আশু ফললাভের জন্যে। যেমন কীটঘ্ন ও প্রতিজীবক ওষুধের (Insecticides ও Antibiotics) ও তেজস্ক্রিয় বিকিরণের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহারের ফলে জীবজগতের ভবিষ্যৎ সাম্যাবস্থা আমরা অনেকটা পাল্টে ফেলেছি। মৎস্যহীন নদী, হ্রদ, পশুপক্ষীহীন বনস্থলী, বৃক্ষলতাহীন প্রান্তর ইত্যাদির প্রভাব মানুষের উপর কতটা হবে, তা ভবিষ্যতেই জানা যাবে। উদাহরণস্বরূপ ভিয়েৎনামে শস্যক্ষেত্র পত্রশূন্য করবার জন্যে ব্যাপকভাবে রাসায়নিক পদার্থ (Defoliant) ব্যবহার করবার কুফল এখনই বোঝা যাচ্ছে। তেমনি, জীবাণু ও ভাইরাস-জনিত রোগের টিকার (কোন কোন ক্ষেত্রে জীবিত ভাইরাসসমন্বিত) ব্যাপক ব্যবহারে রোগনিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ আশু আশীর্বাদরূপেই আমরা দেখতে পাচ্ছি। তবে এদের সুদূর-প্রসারী ফলাফল সম্পর্কে ব্যাপক গবেষণার অবকাশ আছে। তেমনি গবেষণার অবকাশ রয়েছে হর্মোনজাতীয় জন্মনিরোধক ওষুধের দীর্ঘ ব্যবহারের ফল সম্বন্ধে। আশার কথা, বিজ্ঞানীরা এই বিষয়ে সচেতন।

সাধারণ পাঠককে শঙ্কিত করা বা জীব-বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে লব্ধ শুভ ফলগুলি থেকে তাঁদের বঞ্চিত থাকতে বলা এই আলোচনার উদ্দেশ্য নয়। এর উদ্দেশ্য সমাজ-বিজ্ঞানীদের আরও বেশী সচেতন ও অনুসন্ধিৎসু করা মানব সমাজের ভবিষ্যৎ লক্ষ্য সম্বন্ধে। যেহেতু মানুষ নিজেরাই নিজেদের ভবিষ্যৎ এখন বহুল পরিমাণে নির্ধারিত করতে পারে, সেহেতু সময় থাকতেই ভাবা দরকার, ভবিষ্যতে এই আধুনিক জীব-বিজ্ঞানের কি কি ব্যবহার, তথা অপব্যবহার হতে পারে। তার জন্যে প্রস্তুত থাকতে হবে সমাজকে। এই প্রসঙ্গে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একবারে নিরাশ না করে দু-একটি শুভ সম্ভাবনার কথাও বলা যেতে পারে। রোগ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে টিকার কথা আগেই বলা হয়েছে। ভবিষ্যতে প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম নিউক্লিক অ্যাসিড বার্তার সাহায্যে অনেক জন্মগত বা বংশগত ত্রুটির নিরাময় (Genetic surgery) সম্ভব হবে। কোষ বা কলাকৃষ্টির (Tissue culture) উন্নতির ফলে ভবিষ্যতে ইচ্ছামত বিশেষ ধরণের জীবকোষ বা কলা ও প্রত্যঙ্গ পরীক্ষাগারে বর্ধিত করে দেহে সংযোজন করা যাবে। ভ্রূণবিদ্যার (Embryology) অগ্রগতির ফলে প্রতিভাবান ব্যক্তির শুক্রাণু এবং প্রতিভা-

শরীরের ডিম্বাণু সঞ্চয় করে রেখে প্রয়োজনমত বিশিষ্ট প্রতিভা বা নিপুণতাসম্পন্ন নাগরিক সৃষ্টি করা যেতে পারে পরিকল্পিত মানব সমাজে। এসব সম্ভাবনার ফলে অনিবার্যভাবেই সামাজিক ও নৈতিক অনেক বড় বড় সমস্যা দেখা দেবে। সম্পূর্ণ বস্তুতান্ত্রিক দৃষ্টিতে দেখলে যান্ত্রিক সভ্যতার চরমে মানুষ মানুষকে শ্রম উৎপাদনের যন্ত্র বা একক হিসাবে ভাববে। তখন কৃত্রিম শিশু (Test-tube baby) উৎপাদন করতে তার হয়তো দ্বিধা থাকবে না—যদি সমাজ ও আইন সেটা অনুমোদন করে। এতে মানুষের মনোজগতের মূল্যবোধ, স্নেহ, প্রীতি প্রভৃতি সুকুমার মনোবৃত্তি কমে যেতে পারে। সে সম্বন্ধে এখনই চিন্তা করা দরকার। বৈজ্ঞানিক সভ্যতা আমাদের স্বাভাবিক ন্যায়বোধ ও ঈশ্বরকেন্দ্রিক ধর্মবোধ (Spiritualism) হরণ করেছে। কিন্তু তার পরিবর্তে অন্য কোন মানবকেন্দ্রিক মূল্যবোধ দিতে পারে নি। পৃথিবীতে আজ মানুষে মানুষে হানাহানি, নূতন প্রজন্মের সঙ্গে পুরাতন দ্বন্দ্ব তারই পরিণতি। বিজ্ঞানের তথাকথিত পবিত্রতা ও স্বাধীনতার খাতিরে আজ তাই বিজ্ঞানীদের গজদন্ত-মিনারে বসে আবিষ্কারের আনন্দেই মশগুল হয়ে থাকলে চলবে না। আজ তাঁদের বাস্তব পৃথিবীতে নেমে এসে যে সব নূতন সমস্যা তাঁরা এনে দিয়েছেন, তার সমাধানের কথা ভাবতে হবে—কারণ, তাঁরাও মানব সমাজের অংশ।

"বিজ্ঞানের ইতিহাস ব্যাখ্যায় আমাকে বহু দেশবাসী মনস্বিগণের নাম স্মরণ করাইতে হইত। কিন্তু তাহাদের মধ্যে ভারতের স্থান কোথায়? শিক্ষাকার্যে অন্যে যাহা বলিয়াছে সেই সকল কথাই শিখাইতে হইত। ভারতবাসী যে কেবলই ভাবপ্রবণ স্বপ্নাবিষ্ট, অনুসন্ধান কার্য কোনদিনই তাহাদের নহে, এই এক কথাই চিরদিন শুনিয়া আসিতাম। বিলাতের ন্যায় এদেশে পরীক্ষাগার নাই, সূক্ষ্ম যন্ত্র নির্মাণও এদেশে কোন দিন হইতে পারে না, তাহাও কতবার শুনিয়াছি। তখন মনে হইল যে ব্যক্তি পৌরুষ হারাইয়াছে, কেবল সেই বৃথা পরিতাপ করে। অবসাদ দূর করিতে হইবে। ভারতই আমাদের কর্মভূমি, সহজ পন্থা আমাদের জন্য নহে"।

আচার্য জগদীশচন্দ্র

উপজাতি সমাজে পরিবর্তনের ইঙ্গিত

প্রবোধকুমার ভৌমিক*

আমাদের ভারতভূমি যেমন বিচিত্র, তেমনি বিচিত্র এর জনসমষ্টি। বর্তমান ভারতের জনসমষ্টির দিকে তাকালে দেখা যাবে, প্রায় তিন কোটির মত অনগ্রসর গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় রয়েছে, যাদের আমরা উপজাতি, খণ্ডজাতি (Tribe) বা আদিবাসী (Aboriginal) বলে অভিহিত করে থাকি। রাজনৈতিক মাপকাঠিতে বা প্রশাসনিক ক্ষেত্রে যদিও তাদের সবাইকে তফশিলভুক্ত (Scheduled) উপজাতি হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়ে থাকে, তবুও তারা বিচ্ছিন্ন। তাদের শারীরিক বৈশিষ্ট্যে অথবা সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে, দৈনন্দিন জীবনযাত্রার বহু ক্ষেত্রে দুস্তর প্রভেদ রয়েছে। তফশিলভুক্ত করবার অর্থ অন্য গোষ্ঠী থেকে পৃথকীকরণ বা চিহ্নিত করে নেওয়া। কেন না, জীবনযাত্রার প্রতিটি পদক্ষেপে তাদের যে অনগ্রসরতা রয়েছে, স্বাধীন দেশের গণতান্ত্রিক সরকার নানাভাবে

আদিবাসী মেয়ে-পুরুষ ধানের বোঝা নিয়ে ফিরছে।

*নৃতত্ত্ব বিভাগ, বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা-19

তা পূরণ করে অন্যান্য জাতি বা সম্প্রদায়ের মধ্যে সরল সমতা আনবার চেষ্টা পাবে।

এই উপজাতি গোষ্ঠীদের ভারতের আদিম বাসিন্দা (Autochthons) বলে ধরে নেওয়া হয়। কেন না, আর্যপূর্ব ভারতের তারাই ছিল প্রথম বা আদিম অধিবাসী। আমাদের দেশে বহু জায়গায় প্রস্তর যুগের সভ্যতার (Stone age culture) নানা নিদর্শন পাওয়া গেছে, যা দেখে আমরা অতি সহজেই অনুমান করতে পারি যে, ভারতের নানাস্থানে এককালে আদিম জীবনাবদ্ধ বহু গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় ছিল—প্রস্তর-নির্মিত আয়ুধ বা হাতিয়ার ছিল তাদের জীবনযাত্রার প্রধান অবলম্বন। তাদের কেউ কেউ হয়তো পশুপালন করেছে, আর করেছে শিকার বা অরণ্যের ফলমূল আহরণ। কালক্রমে তাদের অর্থনৈতিক জীবনযাত্রার পরিবর্তন হয়েছে, সমাজ ও সংস্কৃতির রূপরেখার বিবর্তন হয়েছে। ধীরে ধীরে সেই শিকারজীবী ভবঘুরে মানুষের জীবনে আদিম কৃষি-ব্যবস্থা রূপ নেয়। পাথরের হাতিয়ারের বদলে কাঠের তৈরি চাষের যন্ত্রপাতি এবং ভূগর্ভে নিহিত আকরিক লৌহের সদ্ব্যবহার করে তারা জীবনযাত্রার মান উন্নীত করবার প্রয়াস পায়।

ভারতের উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলকে মোটামুটি তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়;—(1) হিমালয় পর্বতের পাদদেশ থেকে আরম্ভ করে উত্তর ও উত্তর-পূর্বাঞ্চল [ডাফ্‌লা, ভোট, আপাটানি, নাগা, কুকি, কাছাড়ি, খাসিয়া, গারো, রাভা, লেপ্‌চা প্রভৃতি]; (2) মধ্যভারত বা ছোটনাগপুরের পার্বত্য অঞ্চল, বিশেষভাবে পশ্চিম বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, রাজস্থান, উত্তর বোম্বাই ও মধ্যপ্রদেশ [শবর, জুয়াং, খাড়িয়া, খন্দ, ভূমিজ, ভুইয়া, মুণ্ডা, সাঁওতাল, ওঁরাও, লোধা, মহালি, বীরহড়, হো, কোল, অসুর, মালের, বাইগা, গন্দ প্রভৃতি]; (3) দক্ষিণাঞ্চলের অর্থাৎ কেরল, তামিল নাড়ু, অন্ধ্র প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চল [চেন্‌চু, রেড্ডি, টোডা, ভুগতা, কোটা, ইরুলা, কাদার, কানিকর, মাল করুভান প্রভৃতি]; এর সঙ্গে আন্দামান, নিকোবর, স্পিটি প্রভৃতি অঞ্চলও উল্লেখযোগ্য। আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলগুলির বৈশিষ্ট্য হলো অস্বাস্থ্যকর জঙ্গলাকীর্ণ পরিবেশ। প্রকৃতি সেখানে কঠোর আর অনগ্রসর উপজাতি গোষ্ঠীর জীবনসংগ্রামের পার্থিব হাতিয়ার অতি নগণ্য। সেই বিরুদ্ধ পরিবেশে প্রতিনিয়ত আপোষহীন সংগ্রাম ধীর অভিযোজনে (Adaptation) তাদের সাধারণ জীবনের স্বাভাবিক গতি বিকশিত হবার চেয়ে সঙ্কুচিতই হয়েছে বেশী। তাই অনগ্রসরতা এবং প্রকৃতি-নির্ভরতা তাদের জীবনযাত্রার বৈশিষ্ট্য। এই সকল অনগ্রসর উপজাতি গোষ্ঠীকে তথাকথিত সভ্য মানুষ অথবা বহিরাগত উন্নত গোষ্ঠী এই ক্লিষ্ট পরিবেশে বাস করতে বাধ্য করেছে। পরাজিত এই সকল গোষ্ঠীও নিরুপদ্রবে নিজ অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখবার জন্যে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে অতি সঙ্গোপনে বাঁচবার চেষ্টা করছে। সে বাঁচবার মধ্যে রয়েছে প্রাণ-চঞ্চলতা, আনন্দমুখর নৃত্যগীত, সমবেত উৎসব, আর হাসিমুখে সকল দুঃখ-কষ্ট-বঞ্চনা সহ্য করবার স্বাভাবিক প্রচেষ্টা। তবুও ইতিহাসের নিষ্ঠুর পরিহাস—একদিন এই স্বাধীন অরণ্যচারী মানুষকে বহিরাগত শক্তিশালী সভ্য মানুষের কাছে পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছিল। এই জয়ের মহিমা নানাভাবে ঘোষিত হয়েছিল। এই জয়ের মহিমার বিবরণ ভাগবত পুরাণে রয়েছে।

"কাক-কৃষ্ণ হ্রস্বক হ্রস্বাবাহ মহাহনু
হ্রস্বপানি নিম্ননাসাগ্র রক্তাক্ষ তাম্রমূর্দ্ধজ।"

প্রাক-আর্য গোষ্ঠীর আদিম গোষ্ঠীগুলিকে প্রাচীন সাহিত্যে দস্যু, নিষাদ, শবর প্রভৃতি আখ্যায় অভিহিত করা হয়েছে।

এর দ্বারা সহজে প্রমাণিত হয় যে, আদিম গোষ্ঠীগুলি যদিও নিরুপদ্রবে বিচ্ছিন্নভাবে বাঁচবার

প্রয়াস পেয়েছে, তথাপি তারা বিজিত গোষ্ঠীর কাছে একেবারে অপরিচিত ছিল না। দীর্ঘ সহাবস্থানে এই সকল বিজিত আদিম গোষ্ঠীর জীবনযাত্রারও বেশ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। আমরা যদি মুণ্ডা উপজাতির ইতিহাসের বিভিন্ন অধ্যায় অনুধাবন করি, তাহলে অতি সহজেই বুঝতে পারি যে, কেমনভাবে তারা ধীরে ধীরে প্রতিবেশী হিন্দুদের অনুকরণ করতে সক্ষম হয়েছিল। কেবল প্রশাসনিক ব্যবস্থায় নয়, সমাজের অন্যান্য ক্ষেত্রেও। প্রশাসনিক ব্যবস্থায় দেখা যায়, মুণ্ডাদের মধ্যে প্রথম জঙ্গল কেটে যারা বসতি স্থাপন করেছে, তাদের বলা হয় ভুঁইহার। এই ভুঁইহারী মুণ্ডাদের পুরুষেরা নিজেদের সমাজ পরিচালনার জন্যে পঞ্চায়েৎ গঠন করেছে, প্রতিটি প্রাপ্তবয়স্কই হলো এর সভ্য। যিনি প্রধান হিসাবে বিভিন্ন আলোচনা বা সভাকে পরিচালনা করেন, তিনি পাড়হা রাজা (Parha Raja), তাঁকে সাহায্য করতো দু-জন সিপাহী, একজন দেওয়ান এবং তাঁর দু-জন সিপাহী। এছাড়া ঠাকুর, লাল, পাঁড়ে ও কর্তা প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর প্রশাসক রয়েছে। কর্তা বা পাহানের কাজ পুরোহিতের মত। পাঁড়ের কাজ সংবাদ দেওয়া—অর্থাৎ হিন্দু রাজাদের দরবারের অনুকরণে এসব গঠিত। খাসিয়া উপজাতির মধ্যেও এমনি মন্ত্রী বা দরবার রয়েছে। বিশেষভাবে

একটি সমবেত উৎসবের আঙিনায়।

এই সকল উপজাতি গোষ্ঠীর মধ্যে যারা হিন্দুদের নিকট প্রতিবেশী হিসাবে বসবাস করবার সুযোগ পেয়েছে, তাদের জীবনযাত্রার প্রতিটি দৃশ্যে এমনি ভাবে আর্য সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটেছে—যাকে আমরা আর্যীকরণ (Aryanisation) বলে অভিহিত করি। সমাজের অন্যান্য ক্ষেত্রে ও কোন কোন উপজাতি তাদের গোত্রদেবতার (Totem) নামে যে কৌলিক (Clan) পরিচয় দিত, তারও পরিবর্তন ঘটেছে। কোন কোন উপজাতির কচ্ছপ টোটেম; অর্থাৎ ঐ উপজাতির মধ্যে অনেক কুল রয়েছে অনেকটা আমাদের গোত্রের মত। সেই সকল কুলের কোন কোনটি কচ্ছপকে গোত্রদেবতা বলে স্বীকার করে থাকে, অর্থাৎ তারা কচ্ছপ কখনও খায় না বরং

দেখতে পেলে তাকে শ্রদ্ধা বা প্রণাম জানায়। কিন্তু অন্য গোত্রের লোক প্রয়োজন হলে কচ্ছপ খেতে পারে—কেন না, কচ্ছপ তাদর কুলদেবতা

মেদিনীপুর অঞ্চলের এক মুণ্ডা কৃষক।

নয়। এর দ্বারা আদিম মানুষ তার ভক্ষ্যবস্তুর উপর কিছু কিছু বাধানিষেধের গণ্ডী (Taboo) দাঁড় করিয়ে প্রাকৃতিক খাদ্যসম্ভার বৃদ্ধির চেষ্টা করেছে। যাহোক, ঐ কচ্ছপ গোত্রের লোকেরা এখন বলেন, তাদের গোত্র কাশ্যপ; অর্থাৎ হিন্দু সমাজের মুনি-ঋষির নামে যে গোত্র, অনেকটা সেই রকম। মুণ্ডারা চাণ্ডিল অর্থাৎ উল্কাকে তাদের সমাজের কুলের (Clan) পরিচায়ক হিসাবে ধরে। সাম্প্রতিক কালে তারা চাণ্ডিলকে শাণ্ডিল্য বলে অভিহিত করতে চায়। এই ধরণের সমাজের বিভিন্ন স্তরের পরিবর্তনকে আর্যসংস্কৃতির ধীর অনুপ্রবেশ বলে স্বীকার করা হয়।

ফলে তাদের মধ্যে হিন্দুয়ানীর ভাব দেখা যায়। এখানে এটা মনে রাখতে হবে যে, যেখানে এই হিন্দুয়ানী বা আর্যীকরণ ঘটেছে, সেখানে তারা ভারতের বৃহত্তর সমাজের দেহে তত বেশী অনুপ্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছে। আর্যসংস্কৃতির ধারাকেও তারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করেছে। আমরা বহু লৌকিক দেবদেবীর আরাধনা বা পূজার্চনায় যে সব উপকরণ দিই, তার মধ্যে এই সকল প্রাক-আর্য বা অনার্য সংস্কৃতির প্রভাব দেখা যায়। যেমন ধরা যাক, মাতৃতান্ত্রিক প্রাক-আর্য-গোষ্ঠীর দেবী হলেন কালী। যাঁর পূজা হয় রাত্রিতে, তাঁর কাছে উৎসর্গ করা হয় জীবজন্তুর রক্ত। চর্ম বাদ্য উৎসবের এক অঙ্গ অথচ আর্যসংস্কৃতির দেবতা বিষ্ণুর পূজায় এসব নিষিদ্ধ। কাংস্য, ঘণ্টা, ঘৃত, দুগ্ধ ইত্যাদি উন্নততর জীবনযাত্রায় সংস্কৃতির রূপ-রেণু এর মধ্যে বিদ্যমান। এমনিভাবে বর্তমানের হিন্দুধর্মের মধ্যে প্রাগার্য সংস্কৃতির অনেক রূপ-রেণু (Cultural traits) ছড়িয়ে আছে, সকলের যাই নজরে পড়ে—যাকে আমরা আর্য-অনার্য সম্পর্কের সংস্কৃতির লেন-দেনের (Acculturation) নিদর্শন হিসাবে স্বীকার করি। এও দেখা গেছে, যেখানে এই সকল উপজাতি গোষ্ঠী ভারতীয় সংস্কৃতির ঐক্য থেকে দূরে সরে গেছে, যাদের মধ্যে হয়তো খৃষ্টীয় বা ইসলাম ধর্ম প্রভাব বিস্তার করেছে, সেই সকল উপজাতি বৃহত্তর ভারতীয় ঐক্যকে ভুল বোঝবার চেষ্টা করেছে। দীর্ঘ সহাবস্থানে ও পারস্পরিক সম্পর্কের নিগূঢ়তায় এক দিকে আর্যীকরণ যেমন দৃঢ় হয়ে ওঠে, অপর দিকে তেমনি বহু উপজাতি সরাসরি নিজেদের হিন্দু বলে অথবা হিন্দু সমাজের অন্তর্ভুক্ত কৌলিক উপজীবিকায় নির্ভরশীল জাতি বলে পরিচয় দেবার প্রয়াস পায়। মধ্যপ্রদেশের গন্দ উপজাতি-উদ্ভূত গোষ্ঠীগুলি কালক্রমে এক⋯একটি জাতিতে (?) পরিগণিত হয়েছে। ভূমিজ, লোধা,

শবর, রাজবংশী, বাগ্‌দী, বাউড়ী প্রভৃতি তথাকথিত গোষ্ঠীগুলি বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে হিন্দু সমাজের অন্তর্ভুক্ত এক জাতি বলে পরিচিত হবার দাবী রাখে। এই ভাবে উপজাতি সমাজের মধ্যে যে মৌলিক পরিবর্তন ঘটছে, তাকে আমরা উপজাতি বিলুপ্ততা (De-Tribalisation) বলে অভিহিত করি। যেমন—সাঁওতালদের 'সাফা হড়' আন্দোলন, অর্থাৎ চিরাচরিত সাঁওতালী উপজাতীয় জীবনযাত্রার কোন কোন রীতিকে অপবিত্র, অশুচি বলে ধরে নিয়ে সাফা অর্থাৎ পবিত্র হবার আন্দোলনই হলো 'সাফা হড়' আন্দোলন। এমনিভাবে সাঁওতাল গোষ্ঠীর দেশওয়ালী মাঝি সাঁওতাল গোষ্ঠীসম্পৃক্ত একটি

যার ফলে তারা শূকর বা গোমাংস পরিত্যাগ করে, উপবীত বা শিখা ধারণ করে এক পবিত্র জীবনাদর্শের পথপ্রান্তে জীবন-পতাকা উড্ডীন করে সমাজের মৌলিক আকার বা মূল্যবোধের নূতন ভাষ্য দিতে পেরেছিল। ঠিক এমনিভাবে মুণ্ডাদের মধ্যেও আন্দোলন হয়েছে বিরসা মুণ্ডার অভ্যুত্থানে। বিরসাকে তারা বিরসা ভগবান বলে অভিহিত করে। মুণ্ডা বা কোল গোষ্ঠীর ক্রমান্বয়ে হিন্দুয়ানীর পথে এগিয়ে যাওয়াই বা আদিমতা পরিত্যাগই হলো ভূমিজ সংস্কৃতির বুনিয়াদ। লোধা উপজাতি নিজেদের শবর অর্থাৎ রামায়ণে বর্ণিত অরণ্যচারীর গোষ্ঠী হিসাবে পরিচিত করবার গর্ব রাখে।
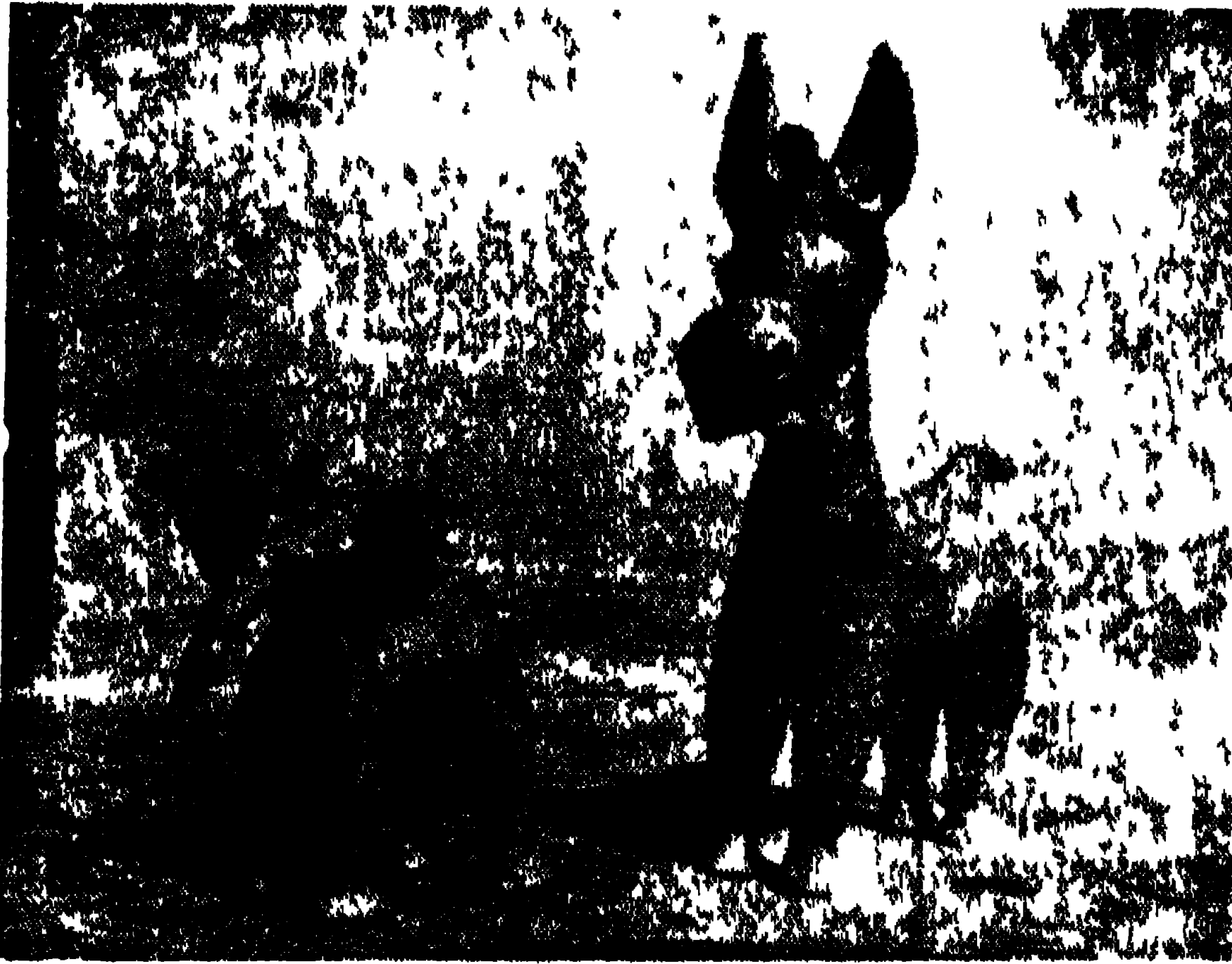
বড়াম বা চণ্ডীর থানে উৎসর্গীকৃত পোড়ামাটির হাতী ও ঘোড়া।

গোষ্ঠী। ওরাওঁ উপজাতির মধ্যে যে ভকত (ভক্ত) আন্দোলন ঘটে, তাতে হিন্দু অনুপ্রবেশ বা আর্যীকরণের স্বাক্ষর বহন করে। ওরাওঁদের টানা ভকত আন্দোলন তাদের সমাজের দেহে প্রচণ্ড আঘাত দিয়েছিল, প্রসারিত করেছিল জীবন-বোধের নতুন দিগন্ত।

তারা শীতলা ও চণ্ডীর পূজা করে, হিন্দুদের মত পূজক ব্রাহ্মণ দিয়ে নয়, নিজেদের দেউড়ী বা দেহেরী দিয়ে। আর শীতলা বা চণ্ডীর কাছে কেবল পাঁঠা নয়, মুরগীও বলি দেয় তাঁদের প্রীতি সাধনের জন্যে।

এমনিভাবে আর্যসংস্কৃতিরও এক বিরাট

রূপান্তর ঘটে। লোকায়ত বিশ্বাসের ধারা ও জীবনযাত্রা আর্যসংস্কৃতির জীবনযাত্রার রূপ-রেখা পাল্টে দেয়। ভারতীয় হিন্দু ধর্মের এই সদাপ্রসারী শক্তিই ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির বুনিয়াদকে শক্ত করেছে। নানা বিভেদ বা বৈষম্যের মধ্যে ঐক্যভাবকে সদামুখর করে তুলেছে। যতই ভারতের বহুধা বিভক্ত অনগ্রসর সমাজের কাঠামো নিয়ে আলোচনা করা যাবে, ততই আমাদের কাছে ভারতীয় সংস্কৃতির এই চিত্র বার বার উদ্ভাসিত হবে।

মুসলমান রাজত্বে ভারতীয় উপজাতিদের মধ্যে কিছু কিছু অর্থনৈতিক পরিবর্তন আসে। উপজাতি-অধ্যুষিত অঞ্চলে অনেক মুসলমান ব্যবসায়ী নতুন ব্যবসায়ের তাগিদে বসবাস করে। এর ফলে এদের পুরনো অর্থনৈতিক কাঠামো এবং ব্যক্তিসম্পর্কের হের-ফের ঘটে। উপজাতি-অধ্যুষিত অঞ্চলে মুসলমান ব্যবসায়ীর সঙ্গে অন্যান্য হিন্দু ব্যবসায়ীরাও ঐ সকল অঞ্চলে যেতে সুরু করে। উপজাতি সমাজের যে স্বনির্ভর অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বলবৎ ছিল, তার কাঠামো পরিবর্তিত হতে থাকে। আগে যেখানে বদলী ব্যবস্থায় (Barter) জিনিষপত্র কেনাবেচা হতো, কোন প্রয়োজনীয় দ্রব্যের সঙ্গে অপর প্রয়োজনীয় দ্রব্যের পাল্টা বদল চলতো, সেই আদিম অর্থনৈতিক বুনিয়াদ ধ্বসে যাওয়ায় সেখানে নগদ অর্থমূল্যের (Cash money) চলন এল। তাছাড়া সংশ্রব ও সংশ্লেষণের ফলে জীবনযাত্রায় বিবিধ দ্রব্যসম্ভারের প্রয়োজনও অনুভূত হলো। এসব যোগান দিতে প্রকৃতি-নির্ভর উপজাতি সমাজের কাঠামো জীর্ণ হতে আরম্ভ করে। ভীল প্রভৃতি উপজাতির জীবনে ইসলাম ধর্ম প্রভাব বিস্তার করলেও বৃহত্তর উপজাতি সমাজ ধর্মান্তরিত হবার চেষ্টা করে নি। তাদের কাছে চিরাচরিত বাহুল্যময় উৎসব ও আড়ম্বরময় পূজা ও অশরীরী শক্তির আরাধনা অনেক বেশী আকর্ষণীয় ছিল। বিশেষ ভাবে মুসলমান শাসক গোষ্ঠী উপজাতি-অধ্যুষিত অঞ্চলগুলির পুনর্বিন্যাস না করে সামন্ত রাজা বা জমিদারদের উপর বেশী নির্ভরশীল ছিলেন।

দু-শ' বছরের বৃটিশ শাসনে যেমন ভাবে সর্বভারতীয় মানচিত্রের পরিবর্তন ঘটেছে, সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন গোষ্ঠী বা সমাজের মানচিত্রেরও অভাবনীয় পরিবর্তন ঘটেছে। বৃটিশ শাসক প্রথমে উপজাতি অঞ্চল বা উপজাতি গোষ্ঠীকে ভারতীয় সমাজ-সংস্কৃতির এক বিচ্ছিন্ন অংশ বলে ধরে শাসন ব্যবস্থা সুরু করেছিল। যদিও কিছু কিছু স্বনামধন্য বিদগ্ধ প্রশাসক ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের উপজাতিদের জীবন-যাত্রার বিবরণ লিখে গেছেন, তবুও বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে উপজাতিদের বিচ্ছিন্ন করে রাখবার জন্যে যে সব ধূর্ত ব্যবসায়ী, সুদখোর, অত্যাচারী জমিদার এদের উপর নির্মম শোষণ চালিয়ে যেত, তারা সবাই সমানে আগের মত অত্যাচার বা শোষণ চালাতে থাকেন। বৃটিশ শাসক তাদের সমর্থকদের বা সাহায্যকারীদের সমর্থন বা সাহায্য করতে লাগলেন। ফলে নিপীড়িত মানুষ আরও বেশী অত্যাচারিত হতে লাগলো। এর ফলে এই সকল বহিরাগত গোষ্ঠী বা ব্যক্তি উপজাতি সমাজকে দুঃখ-কষ্টে জর্জরিত করে দিতে থাকে। এদের মধ্যে ক্রীতদাস প্রথার মত টাকা ধার দিয়ে সুদের বাবদ কোন ব্যক্তিকে বা তার বংশধরকে দীর্ঘ দিন ধরে বিনা মজুরীতে খাটিয়ে নেবার প্রথা চালু হয়। এই ঋণ-দাসত্ব (Bonded labour) ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন নামে পরিচিত। সাগড়ি, গোঠী, ভেট্টি প্রভৃতি মধ্য ভারত এবং দক্ষিণ ভারতে ক্রীত-দাস প্রথার মতই সুপরিচিত। বিশেষভাবে গোষ্ঠী প্রথায় কেবল সুদের বাবদ ঋণীকে বা তাদের বংশধরদের আমরণ খাটতে হতো।

স্বাধীন অরণ্যচারী উপজাতি কোথাও কোথাও

জঙ্গল কেটে চাষ-আবাদ বা বন্ধ প্রথায় চাষ-আবাদ করেছে। এখনও উপজাতি গোষ্ঠীর এক বিরাট অংশ এই আদিম প্রথায় চাষ করে। এর ফলে জঙ্গল ও স্বাভাবিক অরণ্য সম্পদ নষ্ট হয়ে থাকে এবং ভূমির ক্ষয় সাধিত হয়। বৃটিশ শাসনে উপজাতিদের অরণ্যের উপর এই অবাধ বিচরণ ও অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়। এর ফলে অরণ্যকে কেন্দ্র করে তাদের যে অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে উঠেছিল অথবা শিকার বা অন্য উপায়ে যে জঙ্গলের সম্পদ পরিপূরক অর্থনীতির অঙ্গ হিসাবে প্রসারিত হয়েছিল, তার পথ রুদ্ধ হয়। উপজাতি সমাজে অর্থনৈতিক কাঠামো বিধ্বস্ত হলে অরণ্যের অধিকার হারিয়ে পশ্চিমে বাংলার লোধা উপজাতি জীবিকাহীন দস্যু-তস্কর বা স্বভাবদুর্বৃত্ত গোষ্ঠীতে রূপান্তরিত হয়। ছোটনাগপুরের উপজাতি-অধ্যুষিত অঞ্চলে যখন বৃটিশের অবসরপ্রাপ্ত সেনাদের পুনর্বাসন করবার ব্যবস্থা হয়, তখন সেখানে প্রচণ্ড বিক্ষোভ ধূমায়িত হতে থাকে। পরে বিপ্লবের বহ্নি নানা অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। উল্লেখযোগ্য উপজাতি বিদ্রোহ হলো 1831-32 সালের কোল বিদ্রোহ। ছোটনাগপুরের বেগার খাটার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ প্রচণ্ডতা ধারণ করে। এই সময় মেদিনীপুর অঞ্চলের পাইক বা চুয়াড় হাঙ্গামাও উল্লেখযোগ্য। পাইকদের পাইকান জমি বাজেয়াপ্ত করবার ফলে এই আন্দোলন ঘটে। 1857 সালে সিপাহী বিদ্রোহের প্রাক্কালে সাঁওতাল বিদ্রোহ (1855) ঘটে। Thompson and Garratt এই সম্পর্কে বলেছেন—

"Then without warning, a Santal inundation swept over the outlying regions of Bengal, reaching to within a hundred miles of Calcutta, clearing open the skulls of European and Indian alike, pouring out poisoned arrows, burning huts and bungalows. All *ended, however, as it was bound to end* in massacre and executions."

1887 সালে সরদারি বিক্ষোভ ঘটে, যার প্রধান কারণ নিরিখ বৃদ্ধি, বাধ্যতামূলক বেগার খাটা ইত্যাদি। এমনিভাবে বৃটিশের শাসন ব্যবস্থা কৃষিজীবী মানুষের, মেহনতী মানুষের দুঃখ-দুর্দশাকে আরও গভীর করে দেয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে অনেক আদিবাসীর ধারণা হয়েছিল যে, যদি তারা ধর্মান্তরিত হয়, বিশেষভাবে খৃষ্টান হয়, তবে মিশনারীদের চেষ্টায় বৃটিশ শাসকের অত্যাচার থেকে রেহাই পাবে। ফলে ছোটনাগপুর অঞ্চলে ধর্মান্তরিত হবার এক হিড়িক পড়ে যায়। ঠিক ঐ সময়ে অন্ধ্রপ্রদেশে কয়া উপজাতিদের মধ্যে এই বিদ্রোহের বহিঃপ্রকাশ হয় শাসকগোষ্ঠীর উপর সমবেত আক্রমণে।

রাঁচি অঞ্চলে মুণ্ডাদের মধ্যে বিরসা মুণ্ডার নেতৃত্বে যে বিরাট গণ-অভ্যুত্থান ঘটে, তা বর্তমানের বাংলা দেশের গণ-আন্দোলনের মত। 1895 সালের এই বিরসা আন্দোলন অনেকটা ধর্মীয় আন্দোলনের মত হলেও তা ছিল প্রধানতঃ বৃটিশ শাসক, হিন্দু জমিদার ও মুনাফাখোরদের বিরুদ্ধে। 1911 সালে ওড়িসার কন্দ উপজাতিদের মধ্যে বিক্ষোভ দেখা যায়। 1911 সালে ওরাঁও উপজাতিদের ভকত আন্দোলন সুরু হয়। এই ভকত আন্দোলনগুলির মধ্যে টানা ভকতের আন্দোলন উল্লেখযোগ্য। এছাড়া হায়দরাবাদ, আদিনাবাদ প্রভৃতি অঞ্চলে বৃটিশ শাসনে নানাভাবে উপজাতিদের গণ-অভুত্থান বা বিদ্রোহ ঘটেছিল।

এমনিভাবে বৃটিশ শাসনে নিরীহ উপজাতি গোষ্ঠীদের মধ্যে শোষণ ও নির্যাতনের মাত্রা প্রচণ্ডভাবে বেড়ে ওঠে, ফলে তাদের বিদ্রোহের পথে পা বাড়াতে হয়েছিল। বৃটিশ শাসনের অবসানে স্বাধীন গণতান্ত্রিক ভারত সরকার সংবিধানের 339 অনুচ্ছেদে বলেছেন,—

"The President may at any time and shall at the expiration of ten years from the commencement of the Constitution by order appoint a commission to report on the administration of the Scheduled Areas and the welfare of the Scheduled Tribes in the States."

ক্রমবর্ধমান সমাজ ব্যবস্থায় পিছিয়ে থাকা উপজাতি গোষ্ঠীদের জীবনের পথকে অনেক সহজ ও সুগম করে বর্ধিষ্ণু, বৃহত্তর প্রতিবেশী অন্যান্য সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীজীবনের সঙ্গে সংযুক্তির মাধ্যমে এক প্রবাহ তৈরি করে জাতীয় জীবনে একীকরণ বা সংহতির প্রচেষ্টা হলো উপজাতি উন্নয়ন।

আর্থিক সাহায্য বা ক্ষুদ্র-বৃহৎ অনেক উন্নয়ন প্রকল্প, চাকুরী, লোকসভা বা বিধানসভায় নির্দিষ্ট বা সংরক্ষিত আসনের মাধ্যমে এদের অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হলো। শোষণের বিরুদ্ধে, অবিচারের বিরুদ্ধে রক্ষা করবার জন্যে হলো আইন প্রণয়ন। উপজাতিরা যাতে তাদের কৃষি জমি না হারায় তারও ব্যবস্থা হলো। মোট কথা, জীবনের পরিবর্তন মানে কোন রক্তক্ষয়ী আন্দোলন নয় বরং তাদের সংস্কৃতি ও প্রতিভার দৃপ্ত বিকাশের পথে শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও অন্যান্য উন্নয়নধর্মী কাজের সঙ্গে প্রতিবেশী মানুষের সহযোগিতা, মানসিকতাই হবে এর পাথেয়। তবুও স্বাধীনতার পর আমাদের দেশে উপজাতিদের মধ্যে নানা আন্দোলন হয়। বিশেষ করে উপজাতি-অধ্যুষিত আসাম সীমান্তে তা অন্য রূপ নেয়। মিজো এবং নাগাদের অভ্যুত্থান, স্বতন্ত্র নাগাভূমি ও মেঘালয় রাজ্যের প্রতিষ্ঠা, ঝাড়খণ্ড পার্টির অভ্যুত্থান উপজাতির সমাজ ও জীবনে অনেক উন্মাদনা ও আলোড়ন এনে দিয়েছে। এর মধ্যে স্বভাব-শান্ত, প্রকৃতিমুগ্ধ, নিরীহ উপজাতিদের মানসিকতার ঘটেছে পরিবর্তন। সংবিধানে সিডিউলড অঞ্চল (Scheduled areas) বলে বহু রাজ্যের আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলকে চিহ্নিত করা হয়েছে। যে সব অঞ্চলে উপজাতিরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ, সে সব অঞ্চলে শাসনের ধারা ও উন্নয়নের কার্যক্রম স্বাভাবিক অঞ্চল থেকে অনেকটা ভিন্ন। ভারতের রাজ্যগুলির মধ্যে অন্ধ্র প্রদেশ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, গুজরাট, উড়িষ্যা, পাঞ্জাব ও রাজস্থানে প্রায় 90 লক্ষ উপজাতি লোকেরা 99,693 বর্গমাইল জায়গায় ছড়িয়ে রয়েছে।

বিভিন্ন উন্নয়নের সুযোগে দীর্ঘ এই কয় বছরে উপজাতি সমাজে শিক্ষার যেমন প্রসার ঘটেছে, তেমনি কর্মসংস্থানও হয়েছে। এর ফলে যে সকল উপজাতি আন্দোলনের মাধ্যমে নিজেদের জাতি বলে পরিগণিত করেছিল, তাদের কেউ কেউ পুনরায় উপজাতীয় এবং তফশিলী তালিকাভুক্ত হবার প্রয়াস পাচ্ছে। আমরা এই ফিরে আসবার মানসিকতাকে মাধ্যমিক উপজাতীয়তা (Secondary tribalisation) বলে অভিহিত করে থাকি। সংবিধানের এই সংরক্ষণ তাদের সঙ্কুচিত হবার মদৎ জুগিয়েছে।

জীবন-জিজ্ঞাসা

সূর্যেন্দুবিকাশ কর*

পৃথিবী ছাড়া বহির্বিশ্বে আর কোথাও জীবনের অস্তিত্ব আছে কিনা, এই পৃথিবীতে আদিম জীবের সৃষ্টি কিভাবে হলো—এই দুটি প্রশ্নই প্রাচীন কাল থেকে মানুষের মনকে নাড়া দিয়েছে। আমাদের ছায়াপথেই রয়েছে কোটি কোটি নক্ষত্র আর তাদের গ্রহ-উপগ্রহ—সারা বিশ্বে আবার ছড়িয়ে আছে অনুরূপ ছায়াপথ। তাই এই বিশাল বিশ্বে শুধু পৃথিবীতেই জীব-জগতের অনন্য অধিকার থাকবে, এই কল্পনা বাস্তব নয়। তাত্ত্বিক বিচারে বিজ্ঞানীরা অনুমান করেছেন, সারা বিশ্বে প্রায় 10^{17}টি গ্রহে জীবনের অস্তিত্ব থাকা সম্ভব আর আমাদের ছায়াপথে খুব কম করে ধরলেও অন্ততঃ 40টি অথবা বেশী হলে সর্বোচ্চ 5 কোটি গ্রহে জীবনের অস্তিত্ব থাকা উচিত। আমাদের সৌরজগতে অন্ততঃ মঙ্গল ও শুক্রগ্রহে জীবের বসবাস আছে, এরকম সযত্ন-লালিত ধারণাটুকুও মহাকাশ গবেষণার এই প্রথম যুগেই প্রায় নস্যাৎ হয়ে গেছে। তবে এই সব গ্রহে পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়ে হয়তো কিছু জীবাণু টিকে থাকতে পারে, কিন্তু মানুষ বা মানুষের চেয়ে উন্নততর জীব কখনো নয়। তবে হ্যাঁ—অতীতের কোন জীব-জগতের সাক্ষ্য নিয়ে এই সব গ্রহে যদি কোন ফসিল আবিষ্কৃত হয়, তাতে আশ্চর্য হবার কিছু থাকবে না। বাইরের কোন সৌরজগতে আমাদের চেয়ে অসভ্য বা আরো সভ্য জীব থাকতে পারে, এই সিদ্ধান্ত খুব দুঃসাহসের নয়।

বিজ্ঞানীরা যে এই সব ধারণা নিশ্চিত বলেই মনে করেছেন, তার কারণস্বরূপ বলা যায় যে, গত বিশ বছর ধরে জীবন সম্পর্কিত এই প্রশ্নগুলি আর অনুমানভিত্তিক নয়—রীতিমত বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষায় সামিল হয়ে গেছে। ফলে গ্রহ সম্পর্কে আমাদের ধারণা যেমন স্পষ্ট হয়েছে, তেমনি জীব-বিজ্ঞানের মৌলিক রহস্যও গবেষণার ফলে ক্রমশঃ পরিষ্কার হয়ে উঠেছে। মহাকাশ ও জীব-বিজ্ঞানের গবেষণায় অগ্রগতিতে উল্লিখিত দুটি প্রশ্নের উত্তর সঠিকভাবে পাওয়া সম্ভব হয়।

বর্তমানে যে সামান্য ফলাফল পাওয়া গেছে, তার উপর নির্ভর করে পৃথিবীর প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন, পুরাণ, গাথা প্রভৃতির সাহায্য নিয়ে দানিয়েন (Danien) প্রমুখ কেউ কেউ বলছেন, গ্রহান্তরের সভ্যতর জীবগোষ্ঠীই পৃথিবীতে বর্তমান সভ্যতার পত্তন করেছে। উড়ন্ত চাকী (Flying saucer) সম্পর্কে অনুসন্ধানের মধ্যে সেই সভ্যতর জীবগোষ্ঠীর সূত্র ধরবার চেষ্টা কেউ কেউ করে চলেছেন, যেমন ইয়েতির সন্ধানও করা হচ্ছে বর্তমান মানুষের পূর্বপুরুষ কি ছিল, সেই হারানো সূত্র (Missing link) পাওয়ার জন্যে। এই সমস্যাগুলিও বৈজ্ঞানিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। ইয়েতি বা উড়ন্ত চাকী যত দিন না সরাসরি ধরা পড়ছে, সে সম্পর্কে গবেষণা চলতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে জীব-বিজ্ঞান ও মহাকাশ গবেষণা থেকে এই প্রশ্নগুলির কিছু উত্তর পাওয়ার চেষ্টা করা যেতে পারে।

এই উত্তর পাওয়ার চেষ্টা আরম্ভ হয়েছে প্রায় 2000 বছর আগে, যখন লুক্রেটিয়াস (Lucretius) বিশ্ব, নক্ষত্রজগৎ, জীবজগৎ প্রভৃতি

---

*সাহা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, কলিকাতা-9

সৃষ্টির মতবাদ এক সঙ্গে খাড়া করবার চেষ্টা করেছিলেন। সে মতবাদ গৃহীত হয় নি বরং অ্যারিষ্টটলের (Aristotle) স্বতঃজনন (Spontaneous generation) মতবাদ বেশ চালু হয়েছিল কিছুদিন। তাঁর মতে, অজৈব পদার্থ থেকেই হঠাৎ আপনা-আপনি জীবনের সৃষ্টি হয়। সুতেরো শতকে পাস্তরের (Pasteur) আবিষ্কারে এই মতবাদ নস্যাৎ হলো। নির্বীজ (Sterile) কোষে তো জীবনের সৃষ্টি হয় না! পাস্তরের পর অনেক বছর কেটে গেল। টিণ্ড্যাল (Tyndal), হাক্সলি (Huxley) প্রমুখ বিজ্ঞানীরা বললেন, জীবন হলো রাসায়নিক পরিবর্তন ও নির্বাচনের জটিল প্রক্রিয়ার ফল এবং তা ধীরে ধীরে পৃথিবীর পরিবর্তনশীল কাঠামোর অণুজগৎ থেকেই সৃষ্টিলাভ করেছে। 1928 খৃঃ-অব্দে হলডেন (Haldane) ও ওপারিন (Oparin) প্রথম এই প্রশ্নের বিজ্ঞানভিত্তিক মীমাংসা করেন, যা পরীক্ষা-নিরীক্ষায় সত্যতা নির্ধারণের অপেক্ষা রাখে। তাঁদের প্রেরণার উৎস হলো উনিশ শতকের ডারুইন (Darwin) ও লামার্কের (Lamarck) অভিব্যক্তিবাদ। তাঁদের মতবাদের মূল কথা হলো, পৃথিবীর প্রাথমিক আবহমণ্ডলে ছিল না অক্সিজেন, তাতে ছিল শুধু হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, মিথেন, অ্যামোনিয়া, জল ও কিছু কার্বন মনো- ও ডাই-অক্সাইড। আন্তগ্রহ মহাকাশে এই সব বায়ব পদার্থ উড়ে যাওয়ায় এবং জলের ফটোডিসোসিয়েশন (Photodissociation) ও ক্লোরোফিলের বিশ্লেষণে অক্সিজেন সৃষ্টি হলো—ফলে আমাদের বর্তমান আবহমণ্ডলের সৃষ্টি। বিদ্যুৎ, সূর্য ও নভোরশ্মির নানান বিকিরণ এই সব আদিম অণু থেকে জীবন সৃষ্টির ভিত্তিভূমি নিউক্লিক অ্যাসিড ও প্রোটিনের সৃষ্টি করেছে। উরে (Urey), বার্নাল (Bernal) প্রমুখ বিজ্ঞানীরা এই সিদ্ধান্ত প্রমাণ করেছেন। পরবর্তী কালে ফটোকেমিষ্ট্রি (Photo-chemistry) ও রেডিও কেমিষ্ট্রির (Radio-chemistry) বিভিন্ন পরীক্ষা এই দ্বি-আবহমণ্ডল মতবাদ সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করেছে।

এ তো গেল পার্থিব জীবন সৃষ্টির কথা, কিন্তু বহির্বিশ্বে জীবনের সন্ধান তো দূর অস্ত্। সে যুগে প্রথম যে বস্তুখণ্ড বহির্বিশ্ব থেকে পড়েছিল, তা হলো উল্কা। 1806 খৃঃ-অব্দে বিজ্ঞানী বায়োট (Biot) প্রথম প্রমাণ করলেন যে, এই সব উল্কা অপার্থিব। 1834 থেকে 1865 খৃঃ-অব্দ পর্যন্ত বিভিন্ন গবেষকেরা উল্কাপিণ্ডের পরীক্ষায় স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন যে, উল্কায় জৈব পদার্থ বর্তমান। এই জৈব পদার্থ হলো হাইড্রোকার্বন—যা অন্ত গ্রহজগতের জীবনের অবক্ষয়িত অবশেষ হওয়া বিচিত্র নয়। কিন্তু পাস্তরের পরীক্ষায় দেখা গেল যে, উল্কা থেকে কোন ব্যাক্টিরিয়া জাতীয় জীবাণু পাওয়া যায় না।

উল্কাপিণ্ড পরীক্ষার এখানেই ইতি হয় নি। পরবর্তী কালে ক্রোম্যাটোগ্রাফী, নিউক্লিয়ার ম্যাগ্নেটিক রেজোনেন্স (N. M. R.)। মাস্‌স্পেক্ট্রোস্কোপি (Mass-spectroscopy) প্রভৃতি উন্নততর যান্ত্রিক কৌশলে উল্কাপিণ্ডে যে সব জৈব পদার্থ পাওয়া গেছে, তার মধ্যে আছে প্যারাফিন হাইড্রোকার্বন, অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন (Aromatic hydrocarbon), ফেনল (Phenol), ফ্যাটি অ্যাসিড, শর্করা, অ্যামিনো অ্যাসিড (Amino acid)—যা পৃথিবীতে প্রোটিনের উপাদান বলে বিবেচিত হয়, নিউক্লিক অ্যাসিডের কিছু উপাদান, ক্লোরোফিল-জনিত কিছু যৌগিক পদার্থ। ফলে পৃথিবীর বাইরে জীবনের অস্তিত্ব সম্পর্কে সুদৃঢ় প্রমাণ আমাদের হাতে এসেছে। তাছাড়া ইলেকট্রন স্পিন রেজোনেন্স (E. S. R.) পরীক্ষায় জানা গেছে যে, এই সকল উল্কাপিণ্ডে জৈব বস্তুর বিন্যাস সারা দেহে ছড়িয়ে থাকে। ফলে পৃথিবীপৃষ্ঠের জৈব পদার্থ যে উল্কাপিণ্ডের দেহে মিশে যায় নি, তার প্রমাণ পাওয়া যায়। আর একটি পরীক্ষারও চেষ্টা হচ্ছে, তা হলো

উল্কাপিণ্ডের কার্বনের ছুটি আইসোটোপ C^{12} ও C^{13}-এর আপেক্ষিক পরিমাণ নির্ধারণ। কারণ জৈব কার্বনে এই অনুপাত অজৈব কার্বন থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

উল্কাপিণ্ড থেকে পাওয়া এসব তথ্য ছাড়াও মহাকাশ গবেষণায় জীবনের সন্ধানে অনেক কিছু তথ্য পাওয়া গেছে। ফলে অ্যাস্ট্রোবায়োলজি (Astrobiology) একটি নতুন রূপ নিতে চলেছে। কিন্তু পৃথিবীর বাইরে জীবনের অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রমাণ এখনও আমাদের হাতে নেই। জেট প্রোপালসন লেবরেটরীর বিজ্ঞানী নর্মান হরোইৎজ্ একটি পরীক্ষায় মঙ্গলগ্রহে জৈব অণুর অস্তিত্বের সম্ভাবনাটুকু শুধু প্রমাণ করতে পেরেছেন। আগামী 1975 খৃঃ-অব্দে ভাইকিং পরিকল্পনায় মঙ্গলগ্রহে নামবার চেষ্টা হবে, তাতে ঐ গ্রহে কোন জীবন আছে কিনা, তা পরীক্ষা করবার যন্ত্রপাতি থাকবে। মহাকাশে সায়েনাইড, ফরম্যালডিহাইড প্রভৃতি জৈব রাসায়নিক পদার্থের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে। তা থেকে মনে হয়, মহাকাশের অতি বিরুদ্ধ পরিবেশেও এদের অস্তিত্ব যখন সম্ভব, তখন জীবন সৃষ্টিতে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় এরা অংশীদারও হতে পারে। মঙ্গলগ্রহের পৃষ্ঠদেশের তাপমাত্রা পৃথিবীর চেয়ে প্রায় 50° কম, আবহমণ্ডলের চাপ মাত্র 6 মিলিবার ও তার উপাদান জলীয় বাষ্প, কার্বন মনো- ও ডাই-অক্সাইড। হরোইৎজ্ অনুরূপ একটি আবহমণ্ডল গবেষণাগারে তৈরি করে ফর্মালডিহাইড তৈরি করতে পেরেছেন।

1975 খৃঃ-অব্দে ছুটি ভাইকিং মহাকাশযান পৃথিবী থেকে যাত্রা করে কয়েক মাস সময়ের মধ্যে মঙ্গলগ্রহে নামতে পারবে। তাদের একটি নামবে গভীর উপত্যকা অঞ্চলে, যেখানে তরল জল ও ও আনুষঙ্গিক জীবন থাকা সম্ভব। যানগুলিতে জীবের বংশবৃদ্ধি, ফটোসিন্থেসিস প্রভৃতি প্রক্রিয়া ঘটাবার যান্ত্রিক কৌশল থাকবে, যাতে মঙ্গলগ্রহে জীবনের অস্তিত্ব সম্পর্কে সঠিক ধারণা পাওয়া সম্ভব হয়।

এই সব পরীক্ষা-নিরীক্ষায় যদি সত্যই প্রমাণিত হয় যে, মঙ্গলগ্রহে জীবের অস্তিত্ব নেই, তবু কোন দিন ছিল কি না, সে প্রশ্নের সমাধান অন্ততঃ হতে পারবে। তখন ভরসা বৃহস্পতি। বিজ্ঞানী সাগানের মতে, বৃহস্পতির আবহমণ্ডলে প্রচুর মিথেন, অ্যামোনিয়া, হাইড্রোজেন ও সম্ভবতঃ জলীয় বাষ্প আছে। বিজ্ঞানী পোন্নামপেরুমা (Ponnamperuma) বৃহস্পতির কৃত্রিম আবহমণ্ডলে পরীক্ষা করে রক্তিমাভ তরল পদার্থ পেয়েছেন, যার উপাদান হলো নাইট্রাইল-এর মিশ্রণ। এই মিশ্রণ হাইড্রোলিসিস প্রক্রিয়ায় অ্যামিনো অ্যাসিডের জন্ম দিতে পারে। 1972 এবং 1973 খৃঃ-অব্দে পাইওনীয়ার এফ ও জি মহাকাশযানগুলি বৃহস্পতির গা ঘেঁষে যাবে। তারাও কিছু কিছু তথ্য দিতে পারবে আশা করা যায়। 1979 খৃঃ-অব্দে বৃহস্পতিগ্রহে স্বনিয়ন্ত্রিত মহাকাশযান পাঠাবার পরিকল্পনাও রয়েছে। জীবনের অস্তিত্ব খুঁজতে এই সব পরিকল্পনা তো আমাদের সৌরজগতের মধ্যেই আবদ্ধ। দূর বিশ্বে কোথাও জীবন আছে কি না, তার হদিশ কি কখনো পাওয়া যাবে? কোটি কোটি আলোক বছর দূরে কোনও গ্রহে যদি সত্যই সভ্য জীব থাকে আর তারা যদি কোন সঙ্কেতও পাঠায়, আমরা পৃথিবীর মানুষ কি কখনো সে সঙ্কেত ধরতে পারবো আর আমাদের পাঠানো কোন সঙ্কেত কি তারা কোন দিন পাবে? বিভিন্ন কণিকা ও বিকিরণ ছড়ানো রয়েছে সারা বিশ্বে—তার কোন্ অংশটুকু জীবের সৃষ্টি আর কোনটিই বা উত্তপ্ত নক্ষত্রের স্বাভাবিক উৎস—সে প্রশ্নের উত্তর কোথায়?

ভবিষ্যতের সংশ্লেষিত খাদ্য ও রসায়ন

রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়*

এক সময় ছিল যখন প্রকৃতির উপর একান্ত-ভাবে নির্ভর করে মানুষকে খেয়ে-পরে বেঁচে থাকতে হতো। কিন্তু বিজ্ঞানের, বিশেষ করে রসায়ন-বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ আজ এমন অবস্থায় উপনীত হয়েছে যে, প্রকৃতির দাক্ষিণ্য ছাড়াই সে তার জীবনযাত্রার প্রায় সমস্ত সামগ্রীর প্রয়োজন নিজেই মেটাতে পারে। বস্ত্র তৈরির তন্তু, রঞ্জক দ্রব্য, রাবার, তরল জ্বালানী, চামড়া, ভেষজ দ্রব্য ইত্যাদি সামগ্রী মানুষ আজ কৃত্রিম উপায়ে সংশ্লেষণ করতে পারে। অবশ্য যুদ্ধের দরুণ অথবা কোন অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের ফলে প্রকৃতিজ উপকরণের অভাবের সম্মুখীন হয়েই মানুষকে এসব সামগ্রী কৃত্রিম উপায়ে উদ্ভাবন করতে হয়। এসব সংশ্লেষিত দ্রব্যের প্রত্যেকটি আজ প্রকৃতিজ উপকরণের সঙ্গে গুণগত প্রতিযোগিতায় পাল্লা দিতে পারে। আজ পৃথিবীতে লোকসংখ্যা যেরূপ দ্রুত হারে বেড়ে চলেছে, তার ফলে মানুষের খাদ্য-সমস্যা ক্রমশঃ প্রকট হয়ে উঠছে। এজন্যে বিজ্ঞানীদের আজ মানুষের প্রয়োজনীয় খাদ্য কৃত্রিম উপায়ে সংশ্লেষণ করবার কথা বিশেষভাবে চিন্তা করতে হচ্ছে। তারই ফল হচ্ছে সম্পূর্ণ সংশ্লেষিত খাদ্য।

কৃত্রিম উপায়ে কিভাবে খাদ্য সংশ্লেষণ করা যায়, তার বৈজ্ঞানিক জ্ঞান মানুষ ইতিমধ্যেই আয়ত্ত করেছে। এখানে খাদ্য সংশ্লেষণ বলতে কোন প্রচলিত খাদ্যদ্রব্যকে অন্য কোন খাদ্যে রূপান্তরের প্রক্রিয়ার কথাই শুধু বলছি না, রাসায়নিক উপায়ে খাদ্য সংশ্লেষণের বিষয়ই আমরা উল্লেখ করছি। উদাহরণস্বরূপ তথাকথিত বিকল্প মাংসের কথা বলা যায়। এই বিকল্প মাংস সয়াবীনজাত প্রোটিন থেকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত হয়ে থাকে। প্রোটিনকে প্রথমে ক্ষারীয় দ্রবণে দ্রবীভূত করা হয়, তারপর একটি তঞ্চন আধারে (Coagulating bath) সূচীনলমুখে অনুপ্রবিষ্ট করিয়ে অন্যান্য উপকরণের সঙ্গে মিশিয়ে মাংসের স্বাদসম্পন্ন করা হয় এবং গরু বা ভেড়া, মুরগী, মাছ বা শূকরের মাংসের অনুকল্প হিসাবে বাজারে ছাড়া হয়। বস্তুতঃ এই উপায়ে প্রস্তুত শূকরের মাংসের যথেষ্ট চাহিদা বিদেশী বাজার দেখা দিয়েছে। কিন্তু এই জিনিষগুলি যথার্থ সংশ্লেষণ জাত নয়, কারণ এই মাংস বা মাছের অনুকল্প বস্তুটির মূল উপকরণ হচ্ছে কোন প্রকৃতিজ খাদ্যদ্রব্য। ঈষ্ট বা ব্যাক্টিরিয়ার দেহ থেকে এখন একক-কোষ প্রোটিন (Single-cell protein, সংক্ষেপে SCP) নিষ্কাশন করা হচ্ছে। এই ঈষ্ট বা ব্যাক্টিরিয়া এমন ধরণের খাদ্যদ্রব্যের উপর জন্মায়, যার মূল উপকরণ হচ্ছে তরল বা গ্যাসীয় পেট্রোলিয়ামের একটি ভগ্নাংশ।

একক-কোষ প্রোটিন, পাতা থেকে নিষ্কাশিত প্রোটিন, মাছের অনুকল্প খাদ্য এবং এই ধরণের অন্যান্য সামগ্রীগুলি সম্পর্কে আজ বিদেশী লোকদের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি হলেও তাদের ব্যবহার তেমন প্রসার লাভ করে নি। সেই সঙ্গে একথাও আমরা বলতে পারি, সম্পূর্ণ খাদ্য না হলেও খাদ্যের প্রধান প্রধান উপকরণের রাসায়নিক সংশ্লেষণের প্রতি আজও তেমন দৃষ্টি পড়ে নি। ভিটামিন-A, ভিটামিন-B কমপ্লেক্স-এর থিয়ামিন, রিবো-ফ্ল্যাবিন, নিয়াসিন, ভিটামিন-C বা অ্যাস্কর্বিক অ্যাসিড, ভিটামিন-D এবং অন্যান্য ভিটামিন

* দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং, কলকাতা-29

সামগ্রী আজকাল ব্যাপক হারে রাসায়নিক উপায়ে প্রস্তুত হচ্ছে। ভিটামিন-A এবং ভিটামিন-D আজকাল মার্গারিনের (Margarine) সঙ্গে ব্যাপকভাবে মেশানো হয়। পাশ্চাত্য দেশসমূহে রুটি প্রস্তুতের সময় ময়দার সঙ্গে B-ভিটামিন-মেশানো হয় এবং প্রাচ্য দেশগুলিতে চালের খাদ্যমান বৃদ্ধির জন্যে তা মেশানো হয়। ভিটামিন-C আজকাল অপেক্ষাকৃত কম দামে টন টন প্রস্তুত হচ্ছে এবং ঠাণ্ডা পানীয়, নির্জল আলুর গুঁড়া ও অন্যান্য অনেক খাদ্যসামগ্রীর সঙ্গে মেশানো হয়। এই সব ভিটামিনের সনাক্তীকরণ, তাদের কার্যকলাপ আবিষ্কার এবং অপেক্ষাকৃত কম দামে তাদের প্রস্তুতের উপায় উদ্ভাবন রসায়ন-বিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ কৃতিত্ব। আরও উল্লেখযোগ্য যে, আমাদের জীবনকালের মধ্যেই এই কৃতিত্ব এবং শিল্পভিত্তিক সাফল্য অর্জিত হয়েছে।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, পাশ্চাত্য দেশ-গুলিতে আজকাল পাঁউরুটিতে ভিটামিন-B, ক্যালসিয়াম ও লোহা মেশানো হয়। এর কারণ হচ্ছে জনসাধারণের মধ্যে এমন অনেক দরিদ্র ও অসচ্ছল লোক আছে, যারা দেহরক্ষার জন্যে প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর উপাদানগুলি তাদের খাদ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে পায় না। দেহরক্ষার জন্যে ভিটা-মিন ইত্যাদি উপাদান যেমন প্রয়োজনীয়, তেমনি প্রোটিনও পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রয়োজন। পাশ্চাত্য দেশগুলিতে মানুষের খাদ্যে প্রোটিনের অভাব তেমন দেখা যায় না। কিন্তু প্রাচ্য দেশগুলিতে মানুষের খাদ্যে, বিশেষ করে শিশুদের খাদ্যে প্রোটিনের অভাব খুবই প্রকট। তবে অভাবটা ঠিক প্রোটিনের না-ও হতে পারে। সাধারণতঃ একটি অ্যামিনো অ্যাসিডের অভাব বিশেষভাবে দেখা যায় এবং সেটি হচ্ছে লাইসিন (Lysine)। উচ্চমানের (এবং উচ্চ মূল্যের) প্রাণিজ খাদ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে লাইসিন বিদ্যমান থাকে। খাদ্যশস্যের প্রোটিনেও ...সিনের পরিমাণ কম নয়। মানুষের খাদ্যে লাইসিনের অভাব দূরীকরণের জন্যে লাইসিন এবং অন্য কয়েকটি অ্যামিনো অ্যাসিড আজকাল ব্যাপকহারে কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত করা হচ্ছে।

কিন্তু ভিটামিন এবং অ্যামিনো অ্যাসিড দেহের পুষ্টির জন্যে অপরিহার্য হলেও মানুষের সামগ্রিক খাদ্যের তারা হচ্ছে অংশবিশেষ মাত্র। রসায়ন-বিজ্ঞানীরা কি মানুষের সামগ্রিক খাদ্য সংশ্লেষণ করতে পারেন না? এর উত্তরে বিজ্ঞানীরা বলবেন—হ্যাঁ, তাঁরা তা পারেন।

বছর দুই আগে খাদ্য-বিজ্ঞানীরা মার্গারিন বা কৃত্রিম মাখন আবিষ্কারের শতবার্ষিকী পালন করেছেন। আমরা জানি, মার্গারিন হচ্ছে মাখনের অনুকল্প। বাজারে প্রাপ্ত যে কোন চর্বিকে শোধন, গন্ধমুক্ত ও হাইড্রোজেন সংযোগ করে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় যে ক্ষুদ্রাকার কেলাসিত বস্তু পাওয়া যায়, তাই হলো মার্গা-রিন। মার্গারিনকে যদিও সাধারণতঃ কৃত্রিম মাখন বলা হয়, তথাপি এটি কিন্তু প্রাণিজ চর্বি থেকে তৈরি হয়। তবে পেট্রোলিয়াম থেকেও মার্গারিন প্রস্তুত করা হয়েছে। 1884 সালে পেট্রোলিয়ামের হাইড্রোকার্বন অংশ (যা খাওয়া চলে না) থেকে স্নেহজ অ্যাসিড (যা খাওয়া চলে) প্রথম প্রস্তুত করা হয়। গোড়ার দিকে যে সব পদ্ধতি অনুসরণ করে এই স্নেহজ অ্যাসিড প্রস্তুত করা হতো, তাতে স্নেহজ অ্যাসিডের মিশ্রণের সঙ্গে আরও অনেক জিনিষ মিশ্রিত থাকতো এবং অবাঞ্ছিত অন্যান্য পদার্থ থেকে স্নেহজ অ্যাসিডকে পৃথক করা সহজসাধ্য ছিল না। এমন কি, 1917 ও 1918 সালে জার্মেনী ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই উপায়ে যে স্নেহজ অ্যাসিড প্রস্তুত হতো, তাতেও এক বিশেষ ধরণের গন্ধ থেকে যেত। গত 20 বছরে এই সব সমস্যার অনেক-খানি সমাধান করা গেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার আগে জার্মেনীতে চারটি বড় কারখানায় অঙ্গার-জাত পেট্রোলিয়ামের একটি হাইড্রোকার্বন অংশ থেকে চর্বি বা স্নেহদ্রব্য প্রস্তুত করা হতো।

এই চর্বি থেকে মার্গারিন বা কৃত্রিম মাখন প্রস্তুত করা হতো। ইঁদুর, গিনিপিগ, খরগোস, কুকুর ও ভেড়াকে এই মার্গারিন খাইয়ে পরীক্ষা করে দেখবার পর ডুবোজাহাজের নাবিকদের খাদ্যে এই মার্গারিন ব্যবহার করা হয়। এই সংশ্লেষিত মাখন দুধের প্রোটিন থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হওয়ায় মানুষের দেহের বিপাকে সহজে গৃহীত হতো। কিছুদিন রেখে দিলে এই মাখনে একটা গন্ধ সৃষ্টি হয় বলে খবর পাওয়া যায়। তবে এই গন্ধ (যদিও সুগন্ধ নয়) পেট্রোলের গন্ধ থেকে ভিন্ন রকমের।

সম্পূর্ণ সংশ্লেষিত খাদ্যের প্রথম সফল উদাহরণ হচ্ছে এই কৃত্রিম মাখন। যখন এই মাখন বাজারে প্রথম ছাড়া হয়, তখন এতে তিনটি ত্রুটি ছিল। প্রথম ত্রুটি হলো, এর রাসায়নিক সংযুতি স্বাভাবিক মাখনের সংযুতির চেয়ে কিছুটা ভিন্ন ধরণের। স্বাভাবিক স্নেহজ অ্যাসিডের আণবিক দৈর্ঘ্যে জোড় সংখ্যক কার্বন পরমাণু থাকে, কিন্তু সংশ্লেষিত মাখনের আণবিক দৈর্ঘ্য জোড় ও বিজোড় উভয় সংখ্যক কার্বন পরমাণু নিয়ে গঠিত। সংশ্লেষিত মাখনের আণবিক শৃঙ্খল (Molecular chain) কখনও আবার শাখায় বিভক্ত হয় এবং এই শাখার কোন কোনটিতে ডাই-কার্বোক্সিলিক অ্যাসিড-বর্গ থাকতে পারে। এই তারতম্যের ফলে সংশ্লেষিত মাখন ব্যবহারকারীদের সামান্য পেটের গোলমাল হতে পারে। তবে গবেষণার সাহায্যে এই ত্রুটি দূর করা যেতে পারে।

সংশ্লেষিত মাখনের দ্বিতীয় ত্রুটি হচ্ছে গন্ধ। এই ক্ষেত্রে রাসায়নিক সংশ্লেষণের সাহায্য নিয়ে n-Propyl acetate, λ-undecalone এবং methyl-3-methyl thiopropionate ব্যবহার করে জাশপাতি, পীচফল ও আনারসের স্বাদ এবং iso-pentyl isovalerate-এর সাহায্যে আপেলের স্বাদ সৃষ্টি করা যায়।

সংশ্লেষিত চর্বির তৃতীয় ত্রুটি হচ্ছে স্বাভাবিক চর্বির তুলনায় এর দাম অত্যন্ত বেশী। যুদ্ধের প্রয়োজনে সংশ্লেষিত বা কৃত্রিম রাবার যখন প্রথম ব্যবহার করা হয়, তখন প্রাকৃতিক রাবারের তুলনায় এর দাম ছিল খুব বেশী। কিন্তু আজ কৃত্রিম রাবারের দাম যেমন অনেক কমে গেছে, তেমনি এর ব্যবহারও অনেক বেড়েছে। গত দশ-পনেরো বছরের মধ্যে সংশ্লেষিত ভিটামিন এবং অ্যামিনো অ্যাসিডেরও দাম অনেক কমেছে। অনুরূপভাবে আমরা আশা করতে পারি, কৃত্রিম চর্বি প্রস্তুতের গবেষণায় যদি যথোচিত গুরুত্ব আরোপ করা হয়, তাহলে আগামী কয়েক বছরের মধ্যে কৃত্রিম চর্বির দামও অনেক কমে যাবে।

কৃত্রিম চর্বি সংশ্লেষণের প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও কারিগরী কৌশল বিজ্ঞানীরা ইতিমধ্যেই আয়ত্ত করেছেন। তবে কৃত্রিম উপায়ে প্রোটিন সংশ্লেষণের পথে এখনও অনেক বাধা আছে। প্রোটিনের আণবিক গঠনের ত্রিমাত্রিক জ্যামিতি অতীব জটিল এবং এই ধরণের অণু এক-একটা করে গড়ে তোলা প্রায় অসম্ভব। এক্ষেত্রে মুশকিল-আসান হিসাবে ফ্লোরিডা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সিড্নি ফক্স একটি বিকল্প পন্থার সন্ধান দিয়েছেন। অধ্যাপক ফক্স দেখিয়েছেন, মিথেন গ্যাস (CH_4) এবং অ্যামোনিয়ার (NH_3) মধ্যে যখন যথোপযুক্ত তাপমাত্রায় ও চাপে বিক্রিয়া সংঘটিত হয়, তখন একাধিক অ্যামিনো অ্যাসিড একসঙ্গে সংশ্লেষিত হয়ে থাকে। এরপর অ্যামিনো অ্যাসিডের একটি উপযুক্ত মিশ্রণ নির্বাচন করে যদি উচ্চ তাপমাত্রায় তিন-চার ঘণ্টা ধরে উত্তপ্ত করা যায়, তাহলে একটি পলিমার (Polymer) বা বহুগুণক অণুবিশিষ্ট পদার্থের সৃষ্টি হয়। এই পলিমারে প্রোটিনের বহু বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। একই উপায়ে প্রায় এক শতাব্দী আগে রসায়ন-বিজ্ঞানী বার্থেলো (Berthelo) ফস্ফরিক অ্যাসিডের সান্নিধ্যে গ্লু-

গ্লোজকে (Glucose) উত্তপ্ত করে ডেক্সট্রিন (Dextrin) প্রস্তুত করেছিলেন। ডেক্সট্রিন হচ্ছে একটি কার্বোহাইড্রেট। মানুষের খাদ্য প্রস্তুতের জন্যে এই বিক্রিয়া এখনও পর্যন্ত কাজে লাগানো হয় নি। তবে রসায়ন-বিজ্ঞানে আমাদের বর্তমান জ্ঞানের ভিত্তিতে আমরা বলতে পারি, বার্থেলোর পদ্ধতি সম্পর্কে আরও ব্যাপক গবেষণা চালানো নিরর্থক হবে না। এমন কি, এই বিক্রিয়ার মূল উপকরণ গ্লুকোজ ও ফরমোজ বিক্রিয়ার (Formose reaction) সাহায্যে ফরম্যালডিহাইড থেকে সংশ্লেষণ করা যেতে পারে। এক শতাব্দীরও আগে 1861 সালে রসায়ন-বিজ্ঞানী বাটলরো (A. Butlerow) এই ফরমোজ বিক্রিয়া উদ্ভাবন করেন।

উদ্ভিজ্জ রঞ্জক, উদ্ভিজ্জ ও প্রাণিজ বস্ত্রতন্তু, প্রকৃতিজ রাবার এবং সাবান প্রধানতঃ তোজ্য চর্বি থেকে প্রস্তুত হয়। কিন্তু এখন এদের স্থান অধিকার করেছে কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত পরিপূরক-গুলি। কৃত্রিম উপায়ে চর্বি, প্রোটিন এবং কার্বো-হাইড্রেট প্রস্তুতের মৌলিক জ্ঞান বিজ্ঞানীরা ইতিমধ্যেই আয়ত্ত করেছেন। এখন যা প্রয়োজন, তা হলো খাদ্য-বিজ্ঞানীদের উপযুক্ত কারিগরী পদ্ধতি উদ্ভাবন—যার সাহায্যে সম্পূর্ণ সংশ্লেষিত খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করা সম্ভব হবে। তার এই সংশ্লেষিত খাদ্য প্রস্তুতের পথ প্রশস্ত হলে মানুষের ক্রমবর্ধমান খাদ্য-সমস্যার প্রকৃতিজ খাদ্যদ্রব্যের পরি-পূরক হিসাবে তা নিঃসন্দেহে অনেকখানি সহায়তা করতে পারবে।

অভিনব প্রোটিনসমৃদ্ধ খাদ্য

মার্কিন কৃষি-বিজ্ঞানীরা স্নেহজাতীয় পদার্থের মধ্যে দই ভেজে অতি উচ্চ প্রোটিনসমৃদ্ধ খাদ্য প্রস্তুত করেছেন। এই জিনিষটি খেতে অনেকটা মাংসের মত। অনেকক্ষণ ধরে ভাজলেও এর গুণাগুণের খুব একটা পরিবর্তন হয় না। তারপরে রুচি অনুযায়ী একে সুগন্ধিযুক্তও করা যেতে পারে। পৃথিবীর স্বল্পোন্নত রাষ্ট্রসমূহে অনুপূরক পুষ্টিকর খাদ্য হিসাবে এই জিনিষটি ব্যবহার করা যেতে পারে। দইয়ের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন আছে। তাহলেও দুধ ও দুগ্ধজাত অন্যান্য বস্তুর মধ্যে যে প্রোটিন থাকে, তার সঙ্গে দইয়ের প্রোটিনের পার্থক্য অনেক।

ওয়াশিংটনের মার্কিন কৃষি-গবেষণা কৃত্যকের পুষ্টি-বিভাগের রসায়ন-বিজ্ঞানী নোবল পি. ওং এবং ওয়েন ডব্লিউ. পার্কস এই নতুন খাদ্যবস্তুটি তৈরি করেছেন। তাঁরা প্রথমতঃ মাখনতোলা দুধে সামান্য পরিমাণ ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড মিশিয়ে দই তৈরি করেন। তারপর সেই দইকে জ্বাল দেওয়া হয়। জল টেনে যাবার পর নামিয়ে ঐ জিনিষকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে কেটে নেবার পর সেই সকল খণ্ডকে ঘি প্রভৃতি স্নেহজাতীয় পদার্থে ভাজা হয়।

এই ভাজা দই জলের মধ্যে ডুবিয়ে হিমাধারে প্রায় দু-সপ্তাহ অবিকৃত রাখা যেতে পারে। আর বীজাণুমুক্ত করে ঘরের তাপমাত্রায় প্রায় তিন মাস রাখা চলে। এই খাদ্যবস্তুটিকে নিয়ে আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হচ্ছে।

সবুজ বিপ্লব

দীর্ঘকাল অক্লান্ত গবেষণার ফলে তিন বছর পূর্বে মেক্সিকোতে অতি উচ্চ ফলনশীল গম উদ্ভাবিত হয়েছে। ভারত, পাকিস্তান ও এশিয়ার অন্যান্য দেশে এই গমের বীজ ব্যবহারের ফলে ফসলের উৎপাদন আশাতিরিক্ত হারে বৃদ্ধি ভারত, পাকিস্তান প্রভৃতি বিভিন্ন দেশে যে সব ক্রিয়াপদ্ধতি অনুসৃত হচ্ছে, নিঃশব্দ বিপ্লবরূপে মেক্সিকোতে তার সূচনা হয়েছিল 20 বছরেরও আগে। 1943 সালে মেক্সিকো সরকারের আমন্ত্রণে ও রকফেলার ফাউণ্ডেশনের অর্থ-সাহায্যে

পাঞ্জাবে কৃষকদের সঙ্গে সবুজ বিপ্লবের উদ্গাতা ডক্টর নরম্যান বোরলগ (বামে)।

পেয়েছে। এথেকেই 'সবুজ বিপ্লব' কথাটার উৎপত্তি। কৃষি-বিজ্ঞানী ডক্টর নরম্যান ই. বোরলগ এর উদ্গাতা। ধান, গম প্রভৃতি ছাড়াও উচ্চ ফলনক্ষম অন্যান্য শস্যাদি উৎপাদনের জন্যে আজ মেক্সিকোর খাদ্য-সমস্যার সমাধানে ডক্টর বোরলগ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার যৌথ প্রয়োগে উদ্যোগী হন। মেক্সিকোতে এসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছিল কতকটা মন্থর গতিতে দীর্ঘ সময় ধরে।

মেক্সিকোর চাহিদা মেটাবার উপযোগী খাদ্যশস্য উৎপাদনে প্রায় 12 বছর অতিক্রান্ত হয়ে যায়। তারপর থেকেই মেক্সিকো গমের ব্যাপারে স্বয়ম্ভর তো বটেই, অন্যান্য প্রধান খাদ্যশস্যের ব্যাপারেও স্বাবলম্বী হয়ে উঠেছে।

1960 সালে রাষ্ট্রসংঘের খাদ্য ও কৃষি-সংস্থা ডক্টর বোরলগকে মরক্কো থেকে ভারত পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে কোথায় কতটা গম উৎপাদনের প্রয়োজন, সে বিষয়ে সমীক্ষার কাজ চালাতে অনুরোধ করেন। এই ব্যাপারে বহু দেশ সফর করবার সময় তিনি ঐ বিষয়ে বহুবিধ তথ্যাদি সংগ্রহ করেন।

1964 সালে মেক্সিকো থেকে অল্প পরিমাণ বীজ আমদানী করা হয় ভারতের গবেষণা কেন্দ্রগুলিতে পরীক্ষার জন্যে। পরের বছর আমদানী করা হয় আরও বেশী পরিমাণে। দু-বছর পরীক্ষা চালাবার পর ভারত সরকার প্রচুর বীজ আনাবার ব্যবস্থা করেন। এর ফলেই খাদ্যোৎপাদন অসম্ভব রকম বেড়ে যায়। গত তিন বছরে ভারত, পাকিস্তান ও ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে উচ্চ ফলনশীল ধান, গম প্রভৃতি ছাড়াও উচ্চ ফলনশীল রবিশস্যাদি উৎপাদনেও উন্নতি পরিলক্ষিত হয়েছে। তাছাড়া আফগানিস্তান, সিংহল, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, কোরিয়া, মালয়, মরক্কো, থাইল্যাণ্ড, টিউনিসিয়া ও তুরস্ক প্রভৃতি দেশেও উচ্চ ফলনশীল রবিশস্যাদি উৎপাদনে অগ্রগতি দেখা যাচ্ছে। বিশ বছর অক্লান্ত সাধনার ফলে মেক্সিকো আজ গম উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে এবং এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশেও উচ্চ ফলনক্ষম গম উৎপাদনে প্রেরণা জোগাচ্ছে। অতি উচ্চ ফলনশীল গম উদ্ভাবনের জন্যে ডক্টর বোরলগকে 1970 সালের নোবেল শান্তি পুরস্কার দানে সম্মানিত করা হয়েছে।

ভারতে বর্তমানে প্রতি বছর 4% হারে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বাড়ছে, সেই সঙ্গে লোকসংখ্যা বাড়ছে বছরে 2·5% হারে। যে হারে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, তার মোকাবেলা করা সম্ভব না হলে কেবল উচ্চ ফলনশীল শস্যাদি উৎপাদনেই খাদ্য-সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান সম্ভব নয়। তাছাড়া কেবল উচ্চ ফলনশীল জাতের বীজ হলেই হবে না, উপযুক্ত পরিবেশ (আবহাওয়া ইত্যাদি), উপযুক্ত সার, সংরক্ষণ ও কীটঘ্ন ঔষধাদির যথোপযুক্ত ব্যবস্থা হলেই তবে সবুজ বিপ্লব সার্থকতার পথে দ্রুত অগ্রসর হতে পারবে।

পাঞ্জাবে সবুজ বিপ্লব অর্থাৎ গমের উৎপাদন অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করেছে। এমন কি, মেক্সিকো 'বামন গমের' সাহায্যে ভারত 5 বছরে যা উৎপাদন করেছে, সেই লক্ষ্যে পৌঁছুতে মেক্সিকোতেও 15 বছর লাগতো। গবেষণার ফলে প্রচুর ফলনশীল বীজের উৎপাদন এবং ব্যাপকভাবে সেই বীজের ব্যবহারে পাঞ্জাব এবং তার দেখাদেখি উত্তর ভারতের অনেক জায়গায় গমের ফলনের পরিমাণ বিস্ময়করভাবে বেড়ে গেছে। ফলে আমাদের দেশে হালআমলে গমের উৎপাদনের দিক থেকে একটা যে বিপ্লব সাধিত হয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই। অবশ্য এই সবুজ বিপ্লব এখনও আমাদের সম্পূর্ণ করায়ত্ত হয় নি। বিদেশ থেকে (পি. এল. 480) এখনও আমাদের গম আনতে হচ্ছে এবং দেশের দুর্দিনের আশঙ্কায় তা মজুদ করে রাখতে হচ্ছে।

নতুন ধরণের ভুট্টা ও গম প্রভৃতি শস্য উৎপাদনের ফলে বিভিন্ন দেশে সবুজ বিপ্লবের সূচনা হয়। 1963 সালে ভারত রকফেলার ফাউণ্ডেশনকে অনুরোধ করেন ডক্টর বোরলগকে এদেশে পাঠাতে। তিনি ভারতে এক মাস অতিবাহিত করে মেক্সিকো জাতের গম এদেশে রোপণের অভিমত প্রকাশ করেন। এই নতুন ধরণের গমের চাষ ইতিমধ্যেই ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, তুরস্ক, ইস্রায়েল, জর্ডন, টিউনিসিয়া, সুদান, আফগানিস্তান প্রভৃতি দেশে হয়েছে—বিশেষ

করে ভারত, পাকিস্তান ও মেক্সিকোতে এই ধরণের গম ও ভুট্টার চাষ করে যে পরিমাণ ফসল পাওয়া গেছে, সেই পরিমাণ ফসল অন্য জাতের ভুট্টা ও গম চাষ করে এর আগে আর কখনও পাওয়া যায় নি।

বেশী ফলনের জন্যে সারের সঙ্গে দরকার উন্নত জাতের বীজ। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে উদ্ভাবিত সঙ্কর জাতের বীজ কৃষিতে বিপ্লব এনে দিয়েছে। এগুলির সার গ্রহণের ক্ষমতা যেমন বেশী, তেমনি বিশেষ বিশেষ আবহাওয়া ও পরিবেশের উপযোগী করে তৈরি করাও সম্ভব। উন্নত ধরণের বীজ নিয়ে গবেষণা ও উৎপাদনের জন্যে 1960 সালে ন্যাশ-ন্যাল সীড কর্পোরেশনের সৃষ্টি হয়েছে। এরা ইণ্ডিয়ান এগ্রিকালচার রিসার্চ ইনষ্টিটিউশনের সহ-যোগিতায় ও আমেরিকার সহায়তায় অনেক নতুন জাতের সঙ্কর বীজ তৈরি করেছেন। জয়া, পদ্মা, গঙ্গা—101, 233-রঞ্জিত, ডেকান, হিমালয়-123 প্রভৃতি ভুট্টার বীজ, সি. এস. এইচ-1 ও 2 জোয়ার, এইচ. বি-1 বজরা, সোনারা গম-64, লারমা রোজো-64 ও সরবতী সোনারা গম, এ. ডি. টি-27, তাইচুং নেটিভ-1, তাইনান-3, আই. আর.-7 ও 8 ধান, অ্যাসিরিয়া মিটুণ্ডে বাদাম, পুসা সাওয়ানি ঢ্যাড়স এবং নেগেভিল ছোলা ইত্যাদি বহু রকমের সঙ্কর বীজ নিয়ে গবেষণা চলছে। তাছাড়াও এই কর্পোরেশন পুসা রুবি টোম্যাটো, পুসা পার্পল বেগুন, পুসা কাট্‌কি ফুলকপি, পুসা লঙ্কা প্রভৃতি নতুন জাতের উচ্চ ফলনক্ষম সব্‌জীর বীজও তৈরি হয়েছে। ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব এগ্রিকালচার রিসার্চের তত্ত্বা-বধানে উন্নত ধরণের আম, শসা, লেবু, আঙুর, পেয়ারা, আনারস ও আপেলের বীজ উৎপাদনের কাজও চলছে। বেশী ফলন ছাড়াও অন্যান্য উৎকর্ষ আনবারও চেষ্টা হচ্ছে। রন্টগেন রশ্মি প্রয়োগে অধিকতর প্রোটিনসমৃদ্ধ গমের বীজও তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। তাছাড়া পারমাণবিক রশ্মি প্রয়োগেও অধিক ফলনশীল উন্নত জাতের ধান, গম, বার্লি, সয়াবিন, পীচ প্রভৃতির উন্নত ধরণের বীজ উৎপাদন করা হয়েছে। উন্নত বীজের সুফল একটা উদাহরণ থেকেই বোঝা যাবে—উপযুক্ত সার প্রয়োগে তাইচুং নেটিভ-1 ধান হেক্টর প্রতি প্রায় 6000 কেজি পাওয়া গেছে, যেখানে প্রচলিত জাতের বীজ থেকে পাওয়া যেত 700 থেকে 1000 কেজি মাত্র।

কেবল ফলন বৃদ্ধি পেলেই সমস্যার সমাধান হবে না—উপযুক্ত সংরক্ষণ ব্যবস্থা ও বিলি-ব্যবস্থার প্রয়োজন। হরিয়ানার রেওয়া বাজারে গম বিক্রয় করতে এসে চাষীরা মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছে। চাষীরা এবার প্রচুর গম ফলিয়েছে। উটের পিঠে চাপিয়ে সেই গম তারা বাজারে বিক্রয়ের জন্যে নিয়ে আসছে। প্রতিদিন গমের বন্যায় বাজার ছেয়ে যাচ্ছে। কিন্তু যে পরিমাণ গম আসছে, তার তুলনায় খরিদ্দারের অভাব। ব্যাপারী ও ফড়েরা গমের যে দাম দিতে চাইছেন, তাতে চাষীরা হতাশ হয়ে পড়েছে। যে গমের জন্যে গত বছর কুইন্টাল পিছু 84 টাকা দাম পাওয়া গেছে, এবার তার জন্যে কুইন্টাল পিছু 60 টাকার বেশী দাম উঠছে না। আরও আশ্চর্য খবর এই যে, নির্ধারিত মূল্যে বাজার থেকে গম কিনে নিয়ে যাবার জন্যে চণ্ডী-গড়ে ফুড কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়ার অফিসে খবর পাঠানো হয়েছিল। এর উত্তরে জানানো হয়েছে, ফুড কর্পোরেশন ঐ গম কিনতে উৎসুক নয়। অথচ বেশী ফসল উৎপন্ন করে পড়্‌তি বাজার দরের ধাক্কায় চাষীরা যাতে মার না খায়, সে জন্যে ফসলের নিম্নতম দাম বেঁধে দেওয়া আছে এবং ফুড কর্পোরেশনের এই দামে ফসল কিনে বাজার দর ঠিক রাখবার কথা। অধিক ফসল উৎপাদনে উৎসাহ দেওয়া যেখানে সরকারী নীতি, সেখানে বাস্তবে তার বিপরীত কাজেই করা হচ্ছে।

বর্তমানে কৃষি পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে দ্রুত উন্নতি ঘটছে। একে বলা হয় সবুজ বিপ্লব।

এর মূলে যে ক'জন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী রয়েছেন, তাঁদেরই অন্যতম হচ্ছেন নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত ডক্টর নরম্যান আর্নেষ্ট বোরলগ। দূরপ্রাচ্য ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে যে অতিরিক্ত ফলনশীল ধান উদ্ভাবিত হয়েছে, তাও বোরলগ কর্তৃক এই নব উদ্ভাবিত গম উৎপাদনের কার্যপদ্ধতি অনুসরণেরই ফল। ভারত, নেপাল, আফগানিস্তান, পাকিস্তান, সুদান, ইজরায়েল প্রভৃতি রাষ্ট্র এই ধরণের গম ও ধান চাষ করে খুবই লাভবান হয়েছে।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অধিবাসীদের বেঁচে থাকবার জন্যে খাদ্যশস্যের উপরই নির্ভর করতে হয়। প্রোটিনসমৃদ্ধ সুষম খাদ্য সংগ্রহ তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। কিন্তু কার্বন, হাইড্রোজেন ও নাইট্রোজেনের সমবায়ে গঠিত প্রোটিনের অন্যতম উপাদান লাইসিন নামে এক প্রকার অ্যামিনো অ্যাসিড দেহের পুষ্টির পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। ডক্টর বোরলগ বর্তমানে এই ধরণের অ্যামিনো অ্যাসিড বা প্রোটিনসমৃদ্ধ ভুট্টা উৎপাদনে ব্যাপৃত রয়েছেন। তিনি মেক্সিকোর আন্তর্জাতিক গম ও ভুট্টা উন্নয়ন কেন্দ্রের (International maize and wheat improvement centre) ডিরেক্টর। তাঁর ধারণা, আগামী কয়েক বছরের মধ্যেই এই নূতন ধরণের অতি পুষ্টিকর ভুট্টা উৎপাদন সম্ভব হবে। খাদ্যশস্যে সাধারণতঃ প্রোটিনের অন্যতম মূল উপাদান অ্যামিনো অ্যাসিড, লাইসিন থাকে না বললেই হয়।

তিনি এই প্রসঙ্গে বলেছেন যে, অপেক-2 নামে একজাতীয় ভুট্টার মধ্যে অন্যান্য খাদ্যশস্যের তুলনায় বেশী পরিমাণে লাইসিন রয়েছে। অপেক-2 জাতীয় ভুট্টার উৎপাদন খুব কম হয়ে থাকে এবং কীট পতঙ্গের দ্বারা অনেক বেশী আক্রান্ত হয়। এই কেন্দ্রের গবেষকদের ধারণা, অপেক-2 জাতীয় ভুট্টা এবং অন্য জাতীয় ভুট্টার সংমিশ্রণে তাঁরা লাইসিন-সমৃদ্ধ অতি উচ্চ ফলনশীল এক-প্রকার অভিনব ভুট্টা উৎপাদনে সক্ষম হবেন। কীট-পতঙ্গ এদের নষ্ট করবে না। প্রোটিন-সমৃদ্ধ খাদ্যের অভাব পূরণে এই জাতীয় ভুট্টা খুবই সহায়ক হবে।

বিশ্বের খাদ্যাভাব দূরীকরণে যাঁরা প্রয়াসী হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য হচ্ছেন এই একনিষ্ঠ বিজ্ঞানী। তিনি সবুজ বিপ্লব সম্বন্ধে বলেছেন—গতি পরিবর্তিত হয়েছে, আমরা কয়েকটি খণ্ডযুদ্ধে জয়লাভ করেছি, কিন্তু বৃহৎ যুদ্ধে এখনও বিজয়ী হতে পারি নি।

এশিয়ার বিভিন্ন দেশে কম-বেশী সবুজ বিপ্লবের কর্মপদ্ধতি অনুসরণের ফলে চাল উৎপাদনের মোটামুটি বিবরণ ('ডেপ্‌থ্‌ নিউজ, 12.6.71 থেকে সংগৃহীত) দেওয়া হলো।

এশিয়ার চাল উৎপাদনকারী দেশগুলিতে 1970 সালে চালের ফলন বৃদ্ধির যে লক্ষণ দেখা গিয়েছিল, 1971 সালেও তা বজায় আছে।

রাষ্ট্রসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা এখন এই বলে হুঁসিয়ার করে দিয়েছে যে, এই দেশগুলিতে অত্যধিক উৎপাদনে একাধিক সমস্যা দেখা দিয়েছে। সমস্যাগুলি হলো—পড়তি বাজার দর ও রপ্তানীর জন্যে রেষারেষি। চালের রপ্তানী মূল্যের যে সূচক সংখ্যা এই সংস্থা প্রস্তুত করেছে, তাতে দেখা যাচ্ছে, 1969 সালের ডিসেম্বর মাসে এই সূচক সংখ্যা ছিল 123 এবং 1970 সালের অগাষ্ট মাসে এই সংখ্যা কমে গিয়ে 106-এ এসে দাঁড়িয়েছে।

দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, রেকর্ড উৎপাদনের ফলে জাপান এখন চাল আমদানীকারী দেশ থেকে চাল রপ্তানীকারী দেশে পরিণত হয়েছে এবং 1970 সালের মধ্যে চাল রপ্তানীর আন্তর্জাতিক বাজারে জাপানের অংশ শতকরা পাঁচ ভাগে এসে দাঁড়িয়েছে। আগে অনুমান করা হয়েছিল যে, এই বছর জাপানের মোট 70 লক্ষ টন চাল উদ্বৃত্ত হবে। আসলে দেখা যাচ্ছে, উদ্বৃত্তের পরিমাণ 80 লক্ষ টন। জাপান সরকার এই বিপুল পরিমাণ

চাল নিয়ে কি করবেন, ভেবে পাচ্ছেন না এবং ভবিষ্যতের জন্যে চালের ফলন কমাবার চেষ্টা করছেন। ধান চাষ না করে অন্য ফসল বুনলে জাপানী চাষীরা সরকারের কাছ থেকে এই ক্ষতিপূরণ বাবদ 150 কোটি টাকা পাবেন। তাদের লক্ষ্য হচ্ছে 3 লক্ষ 54 হাজার হেক্টার ধান-জমিকে অন্য কাজে লাগানো।

ব্রহ্মদেশ, কাম্বোডিয়া, থাইল্যাণ্ড, পাকিস্তান ও চীন—এশিয়ার এই পাঁচটি দেশ থেকে রপ্তানী করবার মত উদ্বৃত্ত চাল রয়েছে 36 লক্ষ 15 হাজার টন; অর্থাৎ জাপানের উদ্বৃত্ত সমেত মোট 1 কোটি 16 লক্ষ 15 হাজার টন চাল রপ্তানীর অপেক্ষায় রয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইটালী, ব্রেজিল, অষ্ট্রেলিয়া ও সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্র যে চাল রপ্তানী করে, সেটা যদি হিসাবে ধরা হয়, তাহলে এই অঙ্কটা আরও অনেক বেশী হবে, অথচ আশেপাশের যে সব দেশ চাল রপ্তানী করে, তাদের চাহিদা 31 লক্ষ 14 হাজার টনের বেশী নয়।

1970 সালে এফ. এ. ও-র (F.A.O.) চাল সংক্রান্ত রিপোর্টে এশিয়ার বিভিন্ন দেশে চালের অত্যধিক উৎপাদনের সমস্যাটা সংক্ষেপে এভাবে দেখানো হয়েছে—

থাইল্যাণ্ড—চাল রপ্তানীর পরিমাণের দিক থেকে এই দেশের স্থান পৃথিবীর মধ্যে দ্বিতীয়—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরেই। গত বছরের তুলনায় এবার তার চালের উৎপাদন দশ লক্ষ টনের বেশী বেড়েছে। 1969 সালে তার চালের উৎপাদন (1 কোটি 34 লক্ষ 10 হাজার টন) পূর্বেকার রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে এবং তার রপ্তানীযোগ্য চালের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে 15 লক্ষ টন। থাইল্যাণ্ডের চালের প্রধান প্রধান বাজার হচ্ছে সিঙ্গাপুর, ভারতবর্ষ, মালয়েশিয়া, হংকং ও জাপান।

চীন—যতটুকু খবর জানা যায়, তাতে প্রকাশ যে, 1969 সালে চীনে চালের উৎপাদন আগের বারের তুলনায় 46 লক্ষ টন বৃদ্ধি পেয়ে সাড়ে নয় কোটি টনে এসে দাঁড়িয়েছে এবং 1970 সালে উৎপাদনের অঙ্ক আরও বৃদ্ধি পেয়ে 9 কোটি 60 লক্ষ টনে এসে পৌঁচেছে। 1969 সালে চীন 7 লক্ষ 30 হাজার টন চাল রপ্তানী করেছে। খাদ্য ও কৃষি সংস্থার অনুমান, এই বছরেও চীনের রপ্তানী করবার মত চাল একই পরিমাণের হবে। জাপান চীন থেকে চাল আমদানী বন্ধ করায় 1968 সাল থেকে সে দেশের রপ্তানীর পরিমাণ দুই লক্ষ টন কমে গেছে।

ব্রহ্মদেশ—1968 সালের রেকর্ড ফলনের তুলনায় কিছু কম (79 লক্ষ 96 হাজার টন) উৎপাদন হয়েছে। রপ্তানীর জন্যে রাখা হয়েছে সাড়ে সাত লক্ষ টন।

কাম্বোডিয়া—রেকর্ড উৎপাদন। মোট উৎপাদন 36 লক্ষ টন। রপ্তানীর অপেক্ষায় আছে সাড়ে চার লক্ষ টন।

পাকিস্তান—1969 সালে রেকর্ড উৎপাদন 2 কোটি 13 লক্ষ টন। রপ্তানীর জন্যে ছিল 1 লক্ষ 85 হাজার টন। বাংলা দেশে অশান্তির ফলে এই বছর ও পরের বছরে চাল আমদানী করতে হতে পারে।

তাইওয়ান—ধানের জমি অন্য কাজে লাগিয়ে তাইওয়ান তার চাল রপ্তানীর পরিমাণ কমিয়ে ফেলছে। 1969 সালে মাত্র 39 হাজার টন রপ্তানী করেছে। এটা আগের বছরের তুলনায় এক ষষ্ঠাংশ মাত্র। 1969 সালে তার চাল উৎপাদনের পরিমাণ ছিল 30 লক্ষ 41 হাজার টন। এটা তার নিজের চাহিদা মেটাতেই লেগে যাবে।

অন্য দিকে এশিয়ার চাল আমদানীকারী দেশগুলির চাহিদা একই আছে বা কমছে। দেশ অনুযায়ী হিসাবটা এই রকম—

ইন্দোনেশিয়া—চাল উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ছিল 1 কোটি 70 লক্ষ টন। হয়েছে 1 কোটি 66 লক্ষ টন। চাল আমদানীকারী দেশগুলির মধ্যে

প্রথম স্থান। এই বছরের চাহিদা সাড়ে ছয় লক্ষ টন।

দক্ষিণ কোরিয়া ও দক্ষিণ ভিয়েৎনাম—রেকর্ড ফলন সত্ত্বেও উভয়কেই 5 লক্ষ টন করে চাল আমদানী করতে হবে। 1969 সালে দক্ষিণ কোরিয়ায় চালের উৎপাদন ছিল 57 লক্ষ টন, দক্ষিণ ভিয়েৎনামে 51 লক্ষ টন। 1970 সালেও দক্ষিণ ভিয়েৎনামের চালের ফলন একই থাকবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। এই দেশের চাল আমদানীর চাহিদা ইতিমধ্যে অর্ধেক হয়েছে এবং ত্রিশ বছরব্যাপী যুদ্ধ সত্ত্বেও অদূর ভবিষ্যতে এই দেশ চালের ব্যাপারে স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

হংকং—চিরকালই তাকে চাল আমদানী করতে হবে। গত দু-বছর ধরে তার চাহিদা তিন লক্ষ ত্রিশ হাজার টনের অঙ্কে স্থির হয়ে আছে। এই বছরেও সেটাই থাকবার সম্ভাবনা। খাদ্য ও কৃষি সংস্থার রিপোর্টে বলা হয়েছে, অধিবাসীদের আয় ও জীবনযাত্রার মান বেড়ে যাবার ফলে সরেস জাতের চালের চাহিদা বাড়তে পারে।

ভারতবর্ষ—ফলন 6 কোটি 6 লক্ষ টন। আমদানীর চাহিদা তিন লক্ষ টন। 1969 সালে ছিল 12 লক্ষ 87 হাজার টন।

ফিলিপাইন—1968 সালে চাল রপ্তানী করেছিল। চালের ফলন বেড়ে 1969 সালে 49 লক্ষ 97 হাজার টন ও 1970 সালে 58 লক্ষ 44 হাজার টন হওয়া সত্ত্বেও এই বছরের মাঝামাঝি থাইল্যাণ্ড, জাপান ও তাইওয়ান থেকে 1 লক্ষ 10 হাজার টন আমদানী করতে হয়েছে।

সিংহল—14 লক্ষ টন ফলন হওয়া সত্ত্বেও তিন লক্ষ টন চাল আমদানী করতে হচ্ছে।

মোটের উপর এশিয়ার দেশগুলি একে একে সবাই চালের ব্যাপারে স্বয়ং নির্ভরশীল হয়ে ওঠবার আশা করছে। এই বছরের মাঝামাঝি নাগাদ ভারত, 1972 সালের মধ্যে মালয়েশিয়া, বড় জোর 1974 সাল নাগাদ ইন্দোনেশিয়া, 1975 সাল নাগাদ দক্ষিণ কোরিয়া চাল উৎপাদনের ব্যাপারে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে ওঠবার সম্ভাবনা আছে।

"বড়ো অরণ্যে গাছতলায় শুকনো পাতা আপনি খসে পড়ে, তাতেই মাটিকে করে উর্বরা। বিজ্ঞানচর্চার দেশে জ্ঞানের টুকরো জিনিষগুলি কেবলি ঝরে ঝরে ছড়িয়ে পড়ছে। তাতে চিত্তভূমিতে বৈজ্ঞানিক উর্বরতা জীবধর্ম জেগে উঠতে থাকে। তারি অভাবে আমাদের মন আছে অবৈজ্ঞানিক হয়ে। এই দৈন্য কেবল বিদ্যার-বিভাগে নয়, কাজের ক্ষেত্রেও আমাদের অকৃতার্থ করে রাখছে।"

রবীন্দ্রনাথ

ভারত মহাসাগর সম্পর্কিত গবেষণা

শঙ্কর চক্রবর্তী

সুদীর্ঘ কাল ভারত মহাসাগর ছিল পৃথিবীর একটি বিরাট রহস্যাবৃত অঞ্চল। প্রশান্ত ও আটলান্টিক—পৃথিবীর এই দুটি বৃহত্তম মহাসাগর সম্বন্ধে সমুদ্র-বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন অনুসন্ধানকার্যের মধ্য দিয়ে বিস্তৃত তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। এমন কি, উত্তর ও দক্ষিণ মেরুসাগরে বিভিন্ন অভিযানের মধ্য দিয়ে সেখানকার বেশ কিছু রহস্যও উদ্‌ঘাটিত হচ্ছিল। কিন্তু ভারত মহাসাগররূপী তৃতীয় বৃহত্তম মহাসাগরটি ছিল অনাবিষ্কৃত। ফলে অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্যের মত এখানকার আবহাওয়া সংক্রান্ত জ্ঞানও ছিল নিতান্তই অসম্পূর্ণ। এই মহাসাগরের তীরবর্তী দেশগুলির আবহাওয়ার পূর্বাভাসও স্বভাবতঃই ত্রুটিপূর্ণ থেকে যেত।

ভারত মহাসাগরের মোট আয়তন হলো 4 কোটি 48 লক্ষ বর্গ কিলোমিটার—পৃথিবীর মোট আয়তনের এক-সপ্তমাংশ। এর তীরবর্তী দেশগুলিতে পৃথিবীর মোট অধিবাসীর এক-চতুর্থাংশের বাস। এই দেশগুলির জনসংখ্যা যেমন ক্রমবর্ধমান, তেমনি খাদ্য উৎপাদনের ব্যাপারেও এরা স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। এদের ক্ষেত্রে খাদ্যের সম্ভাবনাপূর্ণ একটি নতুন এলাকার অনুসন্ধান ছিল অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। প্রোটিন খাদ্যের ভাণ্ডাররূপে ভারত মহাসাগর স্বভাবতঃই ছিল এজাতীয় একটি এলাকা।

আন্তর্জাতিক ভারত মহাসাগর অভিযান

1957 থেকে 1958 সাল—এই এক বছরব্যাপী আন্তর্জাতিক ভূপদার্থতাত্ত্বিক বছরের কার্যক্রমের সাফল্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীদের বিপুলভাবে অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করেছিল। এই পরিকল্পনার মাধ্যমে তাঁরা পৃথিবী-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়, মহাকাশ এবং সূর্যদেহজাত বিভিন্ন ঘটনা সম্বন্ধে বিপুল তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। এই আন্তর্জাতিক কর্মপ্রচেষ্টাকে তাঁরা ভারত মহাসাগরের সামগ্রিক অনুসন্ধানের কাজে নিয়োগের জন্যে উৎসাহী হয়ে উঠলেন।

1961 সালে ইউনেস্কোর (UNESCO) উদ্যোগে আন্তর্জাতিক ভারত মহাসাগর অভিযানের (International Indian Ocean Expedition) কার্যক্রম সুরু হলো। এই অভিযানের বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনার কর্মসূচীর মধ্যে ছিল—ভারত মহাসাগরের বিভিন্ন সমুদ্রস্রোত এবং বায়ুস্রোতের পর্যবেক্ষণ এবং সঠিক গতিপথ নিরূপণ, সাগর ও বায়ুমণ্ডলের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ও বস্তুবিনিময় সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ, সাগরে বিভিন্ন প্রাণিজ সম্পদের রাসায়নিক গঠন ও পরিমাণ নির্ণয় এবং ভারত মহাসাগরের তলাবর্ত (Submarine topography) ও উপকূলভাগের গঠনবিন্যাস, মহীসোপান (Continental shelf) ও মহাদেশের ঢাল (Continental slope) সম্বন্ধে সুবিস্তৃত অনুসন্ধান কাজ পরিচালনা।

এছাড়াও বিভিন্ন জ্ঞাতব্য প্রশ্ন ছিল। যেমন—প্রশান্ত, আটলান্টিক এবং ভারত—এই তিনটি মহাসাগরের তলাবর্তের গঠন কি অভিন্ন? প্রশান্ত মহাসাগরের অনুরূপ ভারত মহাসাগরেও কি নিরক্ষীয় সমুদ্রস্রোতের একটি বিপরীতমুখী স্রোত প্রবাহিত হচ্ছে? মৌসুমী বায়ু এবং ক্রান্তীয় অঞ্চলের ঝড়-তুফানগুলিরই বা কি ভাবে সৃষ্টি হচ্ছে?

ভারতের উপকূলভাগের দৈর্ঘ্য প্রায় 4800 কিলোমিটার এবং ভারত মহাসাগরের তীরবর্তী

প্রধান দেশরূপে ঐ মহাসাগরের গবেষণাসংক্রান্ত প্রতিটি কার্যক্রমের সঙ্গে ভারতের সংযুক্ত হয়ে পড়া ছিল খুবই স্বাভাবিক। ভারতসহ 32টি দেশ এই আন্তর্জাতিক তথ্যানুসন্ধান অভিযানে অংশ-গ্রহণ করে। প্রায় দু-ডজনের মত গবেষণাকারী জাহাজ এই তথ্য সংগ্রহের কাজে নিযুক্ত হয়। ওয়াশিংটন, মস্কো এবং বোম্বাইতে একটি করে আবহাওয়া কেন্দ্র এবং কোচিনে একটি প্রাণিবিদ্যা-সংক্রান্ত গবেষণা-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। 1961 থেকে 1965 সালব্যাপী এই কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে যে বিপুল পরিমাণ তথ্য সংগৃহীত হয়েছিল, তার বিশ্লেষণের কাজ আজও চলেছে।

আমেরিকার সমুদ্র-গবেষণাকারী জাহাজ পায়োনিয়ার।

ভারত মহাসাগরসংক্রান্ত আন্তর্জাতিক কার্য-ক্রমের অংশ হিসেবে ভারতীয় বিজ্ঞানীরা সমুদ্র-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণার জন্যে যে কর্ম-সূচীটি গ্রহণ করেছিলেন, তার পর্যবেক্ষণের এলাকা ছিল আরব সাগর এবং বঙ্গোপসাগর—নিরক্ষীয় অঞ্চল ছিল মোটামুটিভাবে এর দক্ষিণ প্রান্ত। সামগ্রিক অনুসন্ধান কাজের মধ্য দিয়ে ভারত মহাসাগর সম্বন্ধে যা জানা গিয়েছিল, তারই কিছু তথ্য নিয়ে আমরা আলোচনা করবো।

মহাসাগরের তলাবস্থা

আমেরিকার সমুদ্র-গবেষণাকারী জাহাজ পায়োনিয়ার এবং সোভিয়েট ইউনিয়নের ভিতিয়াজ ভারত মহাসাগরের গর্ভে গ্রীনীচের পূর্বে 90 ডিগ্রী মধ্যরেখা বরাবর 4800 কিলোমিটার দীর্ঘ ও 1500

থেকে 3000 মিটার উঁচু একটি বিরাট সরলরেখাকৃতি পর্বতমালার সন্ধান লাভ করেছিল। পরে দেখা গেল, ঠিক সরলরেখা নয়, অনেকটা সারিবদ্ধ সমান্তরাল ভাঙাভাঙা শিলাস্তূপের সমবায়ে এটি গড়ে উঠেছে। এই পর্বতমালাটির বিভিন্ন তথ্য সমুদ্রতলের বিস্তার সংক্রান্ত তত্ত্বটিকেই নাকি জোরদার করে তুলছে। এই তত্ত্বটি আবার চলমান মহাদেশ (Continental drift) ধারণাটির সঙ্গে যুক্ত, যে ধারণার মোদ্দা কথা হলো, বর্তমানে 10 থেকে 15 কোটি বছর আগে ভারতবর্ষ, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, অ্যান্টার্কটিকা এবং দক্ষিণ আমেরিকা গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ড নামে একটি মহাদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল। গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ড ভেঙ্গে যাবার সময়, 20 কোটি বছর আগে সমুদ্রগর্ভে এক বিরাট ফাটলের সৃষ্টি হয় এবং ভারত মহাসাগরের তলবর্তী পর্বতমালাটির উদ্ভব ঐ সময়ের ক্রিয়াশীল মূল শক্তিগুলির সঙ্গে জড়িত। এই পর্বতমালার শিলাস্তূপ প্রতি বছর কয়েক সেন্টিমিটার করে নাকি মহাদেশের উপকূলভাগের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। এই ধারণাটি অবশ্য কিছু তর্কের সৃষ্টি করেছে।

পৃথিবীর সবচেয়ে সমতল এলাকা সমুদ্রগর্ভের সমভূমিগুলি। ভারত উপমহাদেশ যথাক্রমে 34000 ও 51000 মিটার সমুদ্রগর্ভে অবস্থিত এই জাতীয় দুটি সমতল ক্ষেত্রের দ্বারা বেষ্টিত। একটি রয়েছে আরব সাগরে—সিন্ধু নদের দ্বারা সৃষ্ট; অপরটি বঙ্গোপসাগরে গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের দ্বারা গড়ে উঠেছে। এদের গঠনের মূলে রয়েছে Turbidity current—কাদা, মাটি এবং অন্যান্য বস্তু যে প্রবাহ সমুদ্রের তলদেশের উপর দিয়ে বিপুলবেগে প্রবাহিত হয়ে থাকে। সমুদ্রগর্ভে ভূমিকম্পের ফলেও এই সব স্রোত প্রায়ই বিধ্বংসী হয়ে ওঠে।

1963 সালের মে মাসে আমেরিকান গবেষণামূলক জাহাজ অ্যানটন ব্রুনের সাহায্যে ভারতীয় ও মার্কিন বিজ্ঞানীরা অন্ধ্র প্রদেশের উপকূলের কাছে বিশাখাপত্তনমের উত্তরে তিনটি গভীর খাদ (Canyon) আবিষ্কারে সক্ষম হন। এদের গভীরতা 1300 থেকে 1500 মিটারের মত।

সমুদ্রে ঊর্ধ্বমুখী জলস্রোত

ভারতের সমগ্র উপকূলভাগ থেকে সারা বছরে যে পরিমাণ মাছ ধরা হয়, তার দুই-তৃতীয়াংশ সংগৃহীত হয় পশ্চিম উপকূল থেকে। এথেকে স্বভাবতঃই প্রমাণিত হচ্ছে, আরব সাগরে মৎস্য উৎপাদনের পরিমাণ বঙ্গোপসাগরের তুলনায় বেশী। এই ঘটনাটা কিভাবে ঘটছে, তার সঠিক বৈজ্ঞানিক কারণ সম্বন্ধে বিভিন্ন মতামত রয়েছে। অনেকের একটি মত হলো, সমুদ্রের গভীর প্রদেশ থেকে মাছের পক্ষে পুষ্টিকর পদার্থবাহিত জলস্রোত সমুদ্রপৃষ্ঠে এসে পৌঁছাবার ফলে এটা ঘটছে। আফ্রিকার উপকূলভাগ থেকে প্রবাহিত দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে সোমালিল্যাণ্ডের কাছে জোরালো বায়ুস্রোত সমুদ্রপৃষ্ঠের জলরাশিকে উপকূলভাগ থেকে সরিয়ে দেয় এবং প্রায় 200 মিটার নীচের জলরাশি তাদের স্থান গ্রহণের জন্যে উপরে এসে হাজির হয়। এই জাতীয় ব্যাপারকে বলা হচ্ছে ঊর্ধ্বমুখী জলস্রোত। এর অস্তিত্বের প্রমাণ মেলে জলের তাপমাত্রা নিরূপণের দ্বারা। নিরক্ষীয় অঞ্চলে সমুদ্রজলের তাপমাত্রা যেখানে 24 থেকে 27 ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড, সেখানে ঊর্ধ্বমুখী জলস্রোতের জন্যে নিরক্ষরেখার মাত্র পাঁচ ডিগ্রী উত্তরে জলের তাপমাত্রা হলো 18 ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড।

মৌসুমী বায়ুতাড়িত উল্লিখিত বিরাট ও বিপুল জলস্রোত উত্তর-পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়ে সোমালি-স্রোত নামে সমুদ্রবিদ্‌দের কাছে পরিচিতি লাভ করেছে। যে ঊর্ধ্বমুখী জলস্রোত এর দ্বারা সৃষ্ট হচ্ছে, তা সমুদ্রের গভীর থেকে নাইট্রেট এবং ফস্‌ফেটজাতীয় পুষ্টি-উপাদানগুলিকে এনে

হাজির করছে সমুদ্রপৃষ্ঠে। এই ব্যাপারটা অনেকটা যেন পরবর্তী ফসল ফলানোর জন্যে জমি কর্ষণের মত একটা ব্যাপার। ঐ পুষ্টি-উপাদানগুলি সমুদ্রের উপরিভাগে এক বিপুল পরিমাণ উদ্ভিদকে বংশবিস্তারে সাহায্য করে—এককোষী শ্যাওলা (Algae) বা ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটন হলো যার মধ্যে প্রধান। সমুদ্রের মৎস্যজাতীয় প্রাণীরাও এই উদ্ভিদগুলিকে আশ্রয় করে বিপুল পরিমাণে বেড়ে ওঠে।

প্রাণিজ সম্পদের সন্ধান

অনুসন্ধানের ফলে জানা গেছে, আরব সাগরের উপকূলভাগে বঙ্গোপসাগরের তুলনায় জলে ফস্‌ফেটের পরিমাণ প্রায় পাঁচগুণ বেশী। ভারতের মালাবার উপকূলে অনেক বেশী পরিমাণে মাছের উপস্থিতির মূলে ঊর্ধ্বমুখী জলস্রোত যেমন একটি কারণ, এছাড়া আরো কিছু কারণের সমবেত প্রভাব রয়েছে কিনা, এটা ভারতীয় বিজ্ঞানীরা জানতে চেয়েছিলেন। অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল সমুদ্রবিদ্ ওয়ালটেয়ারের উপকূলের কাছাকাছি একটি ঊর্ধ্বমুখী জলস্রোতের সন্ধান পেয়েছেন, তার ফলে বঙ্গোপসাগরে মাছের সংখ্যা বৃদ্ধি কি পরিমাণে ঘটেছে, তা অনুসন্ধান করছেন বিজ্ঞানীরা।

সমুদ্রের উপকূলভাগে অগভীর জলে মৎস্য-চাষের ক্ষেত্র (Aquatic farm) তৈরি করে উৎপাদন বৃদ্ধির উপায় নির্ধারণ করতে চেয়েছিলেন ভারতীয় বিজ্ঞানীরা। মালাবার উপকূলে সমুদ্রের প্রতি একর পরিমাণ এলাকায় 900 পাউণ্ড পরিমাণ মাছ উৎপন্ন হয়; কোচিন উপকূলে এর পরিমাণ হচ্ছে 1500 পাউণ্ড। বঙ্গোপসাগরের পূর্বভাগে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের কাছাকাছি প্রচুর পরিমাণ মাছের ঝাঁক মার্কিন জাহাজ অ্যানটন ব্রুনের অনুসন্ধানে ধরা পড়ে। এই অঞ্চলটিও অদূর ভবিষ্যতে মৎস্যচাষের একটি বড় ক্ষেত্র হয়ে উঠতে পারে।

আন্তর্জাতিক ভারত মহাসাগর অভিযানের সময় দেখা যায়, সমুদ্রের গভীরে 1000 মিটার অঞ্চলের মধ্যেই বেশীর ভাগ জৈব ফস্‌ফরাস অবস্থিত রয়েছে, শতকরা 75 ভাগ রয়েছে প্রথম 200 মিটারের মধ্যেই। এর নীচেকার যে অঞ্চল, সেখানে অজৈব ফস্‌ফেটের প্রাধান্য এবং জলে অক্সিজেনের পরিমাণও অতি সামান্য। ভারত মহাসাগরে এই জাতীয় বেশ কিছু নিম্নতম অক্সিজেনের এলাকা (Oxygen minimum zones) আবিষ্কৃত হয়েছে। এসব অঞ্চলে প্রাণিজ সম্পদ খুব বেশী পরিমাণে থাকে না। দক্ষিণ মেরু সাগরের জৈব এবং অজৈব পুষ্টি-উপাদান-সমৃদ্ধ জল কিছু পরিমাণে ভারত মহাসাগরের দক্ষিণ অঞ্চলে মিশ্রিত হয়, কিন্তু তা নিরক্ষীয় অঞ্চল পর্যন্ত এসে পৌঁছুতে পারে না। ভারত মহা-সাগরের উত্তর ভাগ স্থলবেষ্টিত এবং পৃষ্ঠভাগের লঘু, উষ্ণ জল মিশ্রণের কাজ সম্পূর্ণভাবে ব্যাহত করে।

ভারতের উপকূলভাগে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব হলে সারা দেশে প্রোটিন খাদ্যের চাহিদা অনেকখানি মিটবে। মাছের অবস্থানের এলাকাগুলিও ভালভাবে ছকে ফেলা দরকার। ভারতের সমুদ্র-গবেষক জাহাজ কৃষ্ণ কেরালার উপকূলের কাছে সমুদ্রের গভীর প্রদেশে বিপুল পরিমাণ কাঁকড়া ও গলদা চিংড়ির সন্ধান পেয়েছিল। বিজ্ঞানীদের হিসেব অনুযায়ী, বর্তমানে যে পরিমাণ প্রাণিজ সম্পদ ভারতের উপকূলভাগ থেকে সংগৃহীত হচ্ছে, তার পরিমাণ পাঁচগুণ বাড়ালেও বর্তমান সঞ্চয় বা মাছের প্রজননের ক্ষেত্রে কোন বিপর্যয় ঘটবার সম্ভাবনা নেই।

খনিজ সম্পদ

ভারতের মহীসোপান এবং মহাদেশের ঢাল অঞ্চলের আয়তন হলো 10 লক্ষ বর্গ কিলোমিটারের কাছাকাছি। এই বিরাট অঞ্চলের ভূবিন্যাসংক্রান্ত

তথ্য খুবই সামান্য, একমাত্র পূর্ব উপকূলের মহীসোপান অঞ্চলে কিছু কিছু অনুসন্ধানের কাজ হয়েছে।

আন্তর্জাতিক ভারত মহাসাগর অভিযানের সময় ভারতের উপকূলভাগের মহীসোপান এবং মহাদেশের ঢাল অঞ্চলে খনিজ সম্পদের অনুসন্ধান চালিয়েছিলেন ভারতীয় বিজ্ঞানীরা। এই অঞ্চলে ইলমেনাইট, মোনাজাইট, ম্যাগ্‌নেটাইট এবং গারনেট জাতীয় ভারী খনিজ পদার্থ, ফস্‌ফোরাইট, ব্যারিয়াম, সিমেন্ট তৈরির কাজের উপযোগী চুনাপাথরের বালুকা এবং কাদার অস্তিত্বের সন্ধান ইতিপূর্বেই পাওয়া গিয়েছিল। অন্যান্য খনিজ পদার্থের অনুসন্ধানের কাজ তেমন বিস্তৃতভাবে করা হয় নি।

কেরালার উপকূলে কৃষ্ণ বালুকার (Black sand) যথেষ্ট সঞ্চয় রয়েছে। নদী যে সব পলি বহন করে নিয়ে এসে সমুদ্রে ঢেলে দেয়, তাই উপকূলের কাছে কৃষ্ণ বালুকার স্তূপরূপে জমা হতে থাকে। এই কৃষ্ণ বালুকা স্তূপের কিছু কিছু নমুনার মধ্যে মোনাজাইট, ইলমেনাইট এবং জারকন রয়েছে প্রচুর পরিমাণে, যাদের অর্থনৈতিক উপযোগিতা রয়েছে নানাভাবে। কেরালার কুইলনের উপকূলের কাছে কৃষ্ণ বালুকার সঞ্চয়ের মধ্যে প্রায় 1 কোটি 70 লক্ষ টন ইলমেনাইট, 10 লক্ষ টন রিউটাইল, 12 লক্ষ টন জারকন এবং 1 লক্ষ 20 হাজার টন মোনাজাইট রয়েছে বলে অনুমান করা হচ্ছে।

ভারতের উপকূল থেকে দূরে সাগরের অভ্যন্তরে মোনাজাইটসমৃদ্ধ বালুকার অস্তিত্বের সম্ভাবনার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে, বিশেষ করে কেরালার উপকূলভাগের সমুদ্র অঞ্চলকেই বিজ্ঞানীরা এই জাতীয় একটি ক্ষেত্ররূপে বেছে নিয়েছেন।

ভারতের উপকূলভাগে জৈবিক খনিজ সম্পদের মধ্যে রয়েছে শামুক, প্রবাল এবং চুনাপাথর প্রভৃতি। কেরালার উপকূলভাগেই 17 থেকে 25 লক্ষ টনের মত চুনাপাথরের সঞ্চয় রয়েছে বলে অনুমান করা হচ্ছে। লাক্ষা দ্বীপপুঞ্জের লেগুনগুলিতে প্রায় 200 কোটি টনের মত চুনাপাথরের কাদা, বালুকা এবং স্তূপ রয়েছে। ভারতের পূর্ব উপকূলের মহীসোপান অঞ্চলেও শতকরা 50 ভাগ ক্যালসিয়াম কার্বনেটসমৃদ্ধ পলির সন্ধান পাওয়া গেছে।

সমুদ্রের গভীরে খনিজ সম্পদ আহরণের ব্যাপারে বিজ্ঞানীরা কর্মসূচী গ্রহণ করতে চলেছেন। উত্তর আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের উপকূলের কাছে ফস্‌ফেটের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্তূপের সন্ধান ইতিপূর্বেই পাওয়া গিয়েছিল। সোভিয়েট সমুদ্র-গবেষক জাহাজ ভিতিয়াজ বঙ্গোপসাগরের গভীর প্রদেশ থেকে ম্যাঙ্গানিজের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্তূপ সংগ্রহ করেছিল। সমুদ্রের গভীরে খনিজ সম্পদ সন্ধানের কাজ ব্যয়বহুল, তবে অর্থনৈতিক বিচারে যুক্তিযুক্ত হলে সে জাতীয় পরিকল্পনা গ্রহণে কোন বাধা নেই।

সমুদ্রে তেলের সন্ধান

ভারতের 3 লক্ষ বর্গ কিলোমিটার বিস্তৃত মহীসোপান অঞ্চলে যথেষ্ট পরিমাণে তেলের সঞ্চয় রয়েছে বলে বিজ্ঞানীদের ধারণা। 1971 সালের 20শে মার্চ কাম্বে উপসাগরের ভিতরে সর্বপ্রথম ভারতের উপকূলের অনতিদূরে আলিয়াবেত (পশ্চিম) তৈলকূপে তেল পাওয়া গেছে। আন্তর্জাতিক ভারত মহাসাগর অভিযানের সময় 1963 সালে ভারতীয় সমুদ্র-গবেষক জাহাজ মহেন্দ্র থেকে বিশেষজ্ঞেরা যে প্রাথমিক ভূকম্পন সংক্রান্ত জরিপ করেছিলেন, তাথেকে প্রমাণিত হয়েছে, কাম্বের যে পাললিক অববাহিকায় বর্তমানে তেল আবিষ্কৃত হলো, তা সমুদ্রের অভ্যন্তর পর্যন্ত বিস্তৃত। 1964-66 সালে অ্যাকাডেমিক আর্খানগেলস্কি নামক বিশেষভাবে যন্ত্রীকৃত সোভিয়েট গবেষক জাহাজে যে ভূকম্পন সংক্রান্ত জরীপের অভিযান

পরিচালিত হয়েছিল, তার বিস্তৃত তদন্ত থেকেও একথা সমর্থিত হয়েছে। এই জরীপের সময়ে অনেকগুলি সম্ভাবনাপূর্ণ বড় তেলের কাঠামো আবিষ্কৃত হয়েছিল। এগুলির মধ্যে একটি হলো বম্বে হাই সেক্টি, যা 1200 বর্গ কিলোমিটার বিস্তৃত এবং পৃথিবীর অন্যতম বৃহত্তম কাঠামো। এপর্যন্ত জমির উপরে একমাত্র গুজরাটের আংক্লেশ্বরে যে বিরাট তৈলক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে, তার চেয়েও বম্বের কাঠামোটি অনেক গুণ বড়। করমণ্ডল উপকূলে, কারিকল ও কচ্ছের উপকূল অঞ্চলে এবং পক প্রণালীতে যে সব জরীপ করানো হয়েছিল, তাথেকে একথা বোঝা গিয়েছে যে, এখানে ভূখণ্ড থেকে সমুদ্রের অভ্যন্তরে মাইলের পর মাইল বিস্তৃত এরকম কাঠামো রয়েছে।

আরব সাগরের ভিতরে উপকূলের অনতিদূরে মহীসোপান অঞ্চলে বহুল পরিমাণে লভ্য মাইওসিন যুগের (পৃথিবীর বিবর্তনের সর্বশেষ পর্ব কেনোজোয়িকের একটি অধ্যায়, যে পর্ব সুরু হয়েছিল আজ থেকে 7 কোটি বছর আগে) শিলাতে যে প্রকৃতই তেল আছে, এই বছর আলিয়াবেতে ধরা-পড়া হাইড্রোকার্বনগুলি সমুদ্রের তলায় সেই লুকানো সম্পদের প্রথম নির্দিষ্ট খোঁজ দিল। এই জাতীয় অনুসন্ধান ভবিষ্যতে আরো ফলপ্রসূ হবে, সন্দেহ নেই।

আন্তর্জাতিক ভারত মহাসাগর অভিযানের সময় মৌসুমী বায়ুর গতি-প্রকৃতি, সমুদ্রগর্ভ থেকে তাপের প্রবহন প্রভৃতি বিষয়ে বহু গবেষণা পরিচালিত হয়েছে এবং মেঘলোকের আলোক-চিত্র গৃহীত হয়েছে ও সমুদ্রগর্ভের বিস্তৃত মানচিত্র রচিত হয়েছে। এই মহান আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক কর্মপ্রচেষ্টার কিছু কিছু সুফল আমরা ইতিমধ্যেই লাভ করেছি এবং ভবিষ্যতে যে আরো বেশী পরিমাণে সেটা সম্ভব হবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

"আমাদের দেশে বিজ্ঞানশিক্ষা যে কতদূর প্রয়োজনীয় তাহা কি নূতন করিয়া বলিতে হইবে? প্রয়োজনীয় বলিলে বরং কম বলা হয়। বিজ্ঞান ব্যতীত আমাদের গতি নাই, রক্ষা নাই। * * * মনে করিও না, বিজ্ঞান হইতে কেবল অর্থলাভই হয়। সংসারে মানুষের বড় কে? মানুষের মনের চেয়ে বড় কি আছে? মানবমন বিজ্ঞান বলে মার্জিত, উন্নত ও শক্তিশালী হয়। সমাজনীতি, ধর্মনীতি সমস্তই নানাপ্রকারে বিজ্ঞানের নিকট ঋণী। তাই বলি, যদি বাঁচিতে চাও, সভ্য মানবমণ্ডলীর মধ্যে মুখ দেখাইতে চাও, বিজ্ঞানের সেবা কর।"

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র

এভারেষ্টই কি সর্বোচ্চ পর্বত?

সমীরকুমার ঘোষ*

সারা পৃথিবীতে ছোট-বড় যে কত রকমের পাহাড়-পর্বত আছে, তার সঠিক হিসাব বলা শক্ত। কিন্তু কারো মনে যদি কখনো এরকম প্রশ্ন ওঠে যে, পৃথিবীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ এভারেষ্ট (29028 ফুট বা প্রায় 9 কিলোমিটার) কেন, তার চেয়েও কি উঁচু শৃঙ্গ হওয়া সম্ভব ছিল না!—তাহলে আপাতদৃষ্টিতে প্রশ্নটি হয়তো অনেকের কাছেই অযৌক্তিক বলে মনে হতে পারে। সমতলভূমি থেকে সুরু করে এভারেষ্টের মত উচ্চ শৃঙ্গ পর্যন্ত সব রকমের উচ্চতার পর্বতশৃঙ্গ যদি এই পৃথিবীতে হওয়া সম্ভব হয়, তবে এভারেষ্টের চেয়েও উঁচু পর্বতশৃঙ্গ না থাকাটা কি শুধুই এক আকস্মিক ব্যাপার! কিন্তু না, প্রমাণ করে দেখানো যেতে পারে যে, ঘটনাটা মোটেই আকস্মিক নয়। পৃথিবী যে ধরণের শিলা দিয়ে সাধারণতঃ গঠিত, সেই শিলার উপাদান, গঠন, প্রকৃতি এবং পৃথিবীর অভিকর্ষজ ত্বরণ ইত্যাদির জন্যে পৃথিবীপৃষ্ঠে এভারেষ্টের চেয়ে উচ্চ পর্বতশৃঙ্গ থাকা কোনমতেই সম্ভব নয়। হ্যাঁ, কথাটা যদিও একটা বলিষ্ঠ দুঃসাহসিক মন্তব্যের মত মনে হতে পারে, তবুও গাণিতিক নিয়মে এই মন্তব্যের সত্যতা প্রমাণ করা যেতে পারে।

কি কি কারণে পর্বতের সৃষ্টি হতে পারে, তার আলোচনার মধ্যে না গিয়ে যে কোন কারণেই সৃষ্ট পর্বত যে কোন সীমাহীন উচ্চতাবিশিষ্ট হতে পারে না, সে প্রশ্নটা অনেকেরই মনে উদয় হতে পারে। আসলে পর্বত যদি খুব বেশী উঁচু হয়ে পড়ে, তাহলে তা মাটির মধ্যে আস্তে আস্তে বসে যায়, কারণ পৃথিবীর ত্বকে, পর্বতের নীচে, গ্র্যানিট, কোয়ার্টজ, সিলিকা প্রভৃতি যে সব উপাদান থাকে, সেগুলি বিশাল উচ্চ পর্বতের ভার সহ্য করতে পারে না। পর্বতের বিশাল চাপে তার তলদেশের উপাদান শিলাগুলি তরলীকৃত হয়ে পাশের দিকে সরে যায়, যার ফলে পর্বতের উচ্চতা কমে এসে একটা নির্দিষ্ট মাত্রায় দাঁড়ায়। আর ঐ শিলাগুলির গলনের জন্যে যে শক্তির প্রয়োজন হয়, তা পর্বতের উচ্চতা কমে যাওয়ার জন্যে যে স্থিতিশক্তির উদ্ভব হয়, তাথেকেই পাওয়া যায়। গাণিতিক ভাষায় প্রকাশ করলে ব্যাপারটা বোধ হয় আরো সহজবোধ্য হবে।

মনে করা যাক, যে কোন এক পর্বতের প্রাথমিক উচ্চতা ছিল h এবং নিজের ওজনের চাপে পর্বতটির x পরিমাণ উচ্চতা মাটিতে বসে গিয়েছে। চিত্রে ক খ রেখাটি পর্বতশীর্ষের প্রাথমিক অবস্থান এবং গ ঘ রেখাটি পর্বতটি বসে
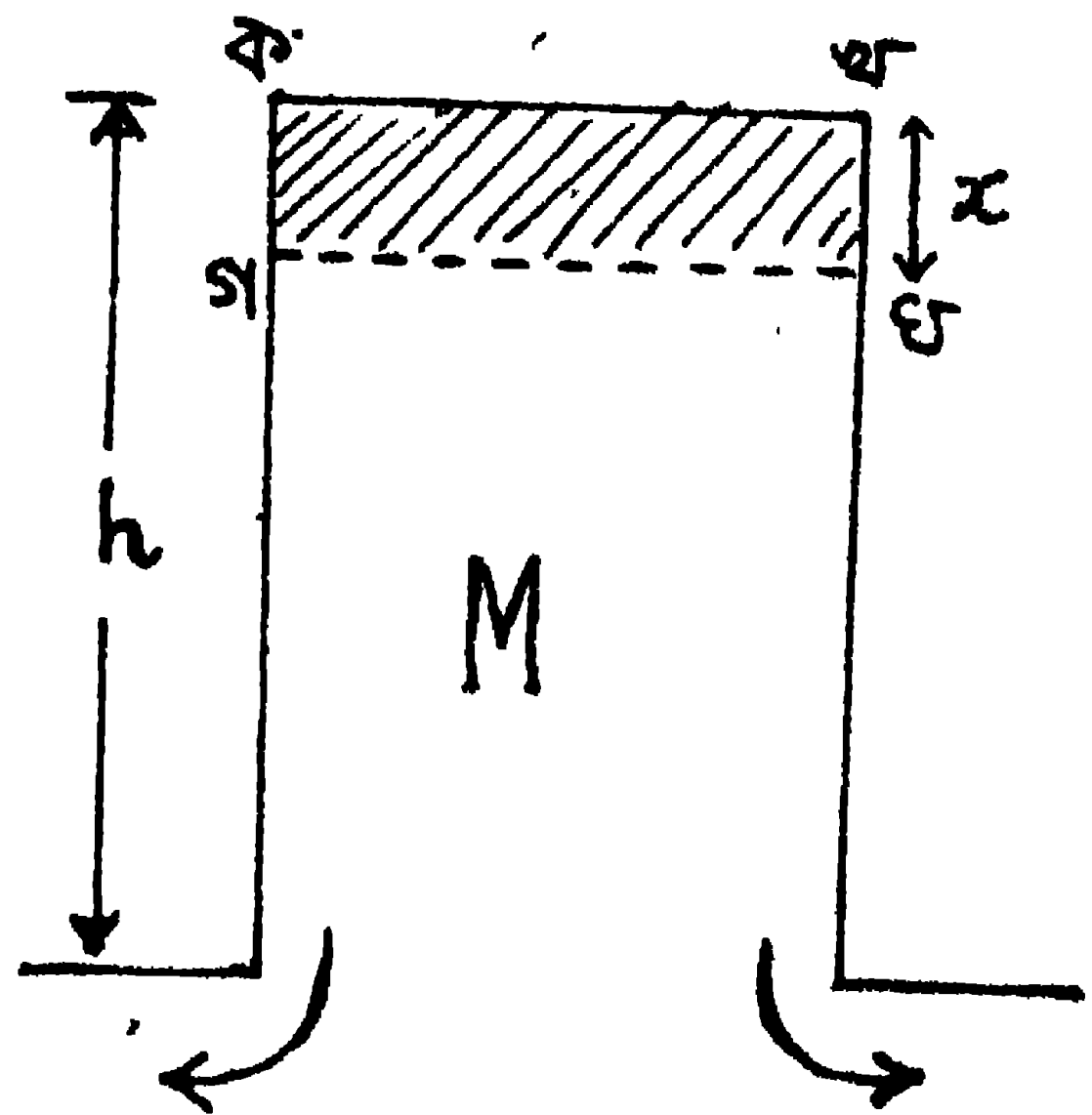
*পদার্থবিদ্যা বিভাগ, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন।

যাবার পরের অবস্থান নির্দেশ করছে। পর্বতটির উচ্চতা x পরিমাণ কমে যাওয়ার ফলে যে পরিমাণ মহাকর্ষীয় স্থিতিশক্তির (Gravitational potential energy) উদ্ভব হবে, সেই শক্তির সাহায্যে x উচ্চতার মধ্যে যতখানি শিলা ছিল (চিত্রে দাগ দেওয়া অংশটুকু), ঠিক সেই পরিমাণ শিলাকে নিজের পাদদেশে পর্বতটিকে গলিয়ে নিজের জায়গা করে নিতে হবে ; অর্থাৎ পর্বত থেকে মুক্ত স্থিতিশক্তি এবং পর্বতের তলদেশে শিলা গলনের জন্যে প্রয়োজনীয় শক্তি পরস্পর সমান হবে। সুতরাং সমস্ত পর্বতটির ভর যদি M গ্র্যাম হয় এবং তার তলদেশের প্রস্থচ্ছেদ A বর্গসেন্টিমিটার, পর্বতের উপাদানের একক আয়তনে অণুর সংখ্যা n এবং ঐ উপাদানের প্রতি অণুর গলনের জন্যে শক্তির পরিমাণ (Latent heat of melting per molecule) যদি Lliq হয়, তবে—

$$Mgx = nx\,ALliq.$$

অথবা, $Mg = nALliq$...... (i)

(i) নং সমীকরণের ডানপাশের অংশটির একটি নির্দিষ্ট সামগ্রিক মান আছে। সে জন্যে পর্বতটি নিজের চাপের জন্যে মাটিতে যাতে বসে যেতে না পারে (অর্থাৎ চাপে তলদেশের যাতে গলন না হতে পারে) সে জন্যে M-এর একটি নির্দিষ্ট মান থাকবে। M-এর মান তার বেশী হলে পর্বতটি অপ্রতিষ্ঠ (Unstable) হয়ে তলদেশে কিছু বসে যাবে। সুতরাং কোন পর্বত সুপ্রতিষ্ঠ (Stable) হতে হলে—

$$Mg \leqslant nALliq \text{......(2)}$$

কিন্তু ভর $M = nAhm$ (m = পর্বতের উপাদান-শিলার প্রতিটি অণুর ভর)

$= nAh\text{-}Z\text{-}mp$. ($m = \text{-}Z\text{-}mp$; -Z- = পারমাণবিক সংখ্যা, mp = প্রোটনের ভর)

সুতরাং (2) সমীকরণ থেকে—

$$nAh\ Z\text{-}.mpg \leqslant nALliq$$

বা, $$h \leqslant \frac{Lliq}{g\text{-}Z\text{-}.mp} \text{......(3)}$$

সুতরাং পর্বতের তলদেশ যাতে পৃথিবীতে বসে না যায়, তার জন্যে পর্বতের উচ্চতার সঙ্কট মান (Critical value) হবে (3) নং সমীকরণ থেকে $\frac{Lliq}{g\text{-}Z\text{-}mp}$-এর সমান। এখন এই রাশিমালার মধ্যেকার বিভিন্ন রাশির মান নির্ণয় করতে পারলেই পৃথিবীপৃষ্ঠে সুপ্রতিষ্ঠ পর্বতের উচ্চতার সর্বোচ্চ সীমা বের করতে পারা যাবে।

প্রথমেই ধরা যাক, Lliq-এর মানের কথা। এর মান নির্ণয় করতে হলে প্রথমেই মনে রাখতে হবে যে, তরল পদার্থের অণুগুলি পারস্পরিক মধ্যে বেশ সুদৃঢ়ভাবেই বন্ধনযুক্ত, অবশ্য গ্যাসের তুলনায়। যখন কোন কঠিন পদার্থের গলন হয়ে তরলে রূপান্তরিত হতে থাকে, তখন সেই পদার্থের অণুগুলির মধ্যেকার পারস্পরিক দৃঢ়বন্ধন (Bonds) সম্পূর্ণভাবে ছিন্ন হয় না, বরং বন্ধনগুলির দিকাভিমুখ (Directionality) শুধু পরিবর্তিত হয়। এই কারণেই কোন তরল পদার্থের পক্ষে তরলীকৃত হওয়ার পর প্রবাহিত হওয়া সম্ভব হয়, যেটা কঠিন পদার্থের পক্ষে সম্ভব নয়। এখন কোন কঠিন পদার্থকে তরলীকৃত করতে, অর্থাৎ তার ভিতরকার অণুর বন্ধনগুলির দিকাভিমুখ পরিবর্তন করলে যে পরিমাণ শক্তির প্রয়োজন হয়, তা সেই অণুর বন্ধনশক্তির (Binding energy) চেয়ে কম। অবশ্য এই কমের পরিমাণ যে কতটা, তা সঠিক বলা শক্ত। তবে জল ও বরফের কথা বিবেচনা করলে দেখা যায় যে, বরফের গলনের লীন তাপের পরিমাণ, জলের স্ফুটনের লীন তাপের প্রায় এক-সপ্তমাংশ। অবশ্য গলনাঙ্কে বরফের বন্ধনশক্তি, স্ফুটনাঙ্কে স্ফুটনশক্তির (লীন তাপ) থেকে কিছু বেশী ধরে নিলে মোটামুটিভাবে আমরা বলতে পারি যে, গলনের শক্তি (লীন তাপ) গলনের বন্ধনশক্তির প্রায় এক-দশমাংশ। সুতরাং গণিতের ভাষায় লেখা যেতে পারে—

$L_{liq} = \frac{1}{10} \times B$ (B—বন্ধনশক্তি)

$= \frac{1}{10} \times \alpha \times Ry$ ($B = \alpha\ Ry$; Ry—রিডবার্গ ধ্রুবক এবং α একটি ধ্রুবক, যা শিলার প্রকৃতির উপর এবং তার উত্তাপের উপর নির্ভরশীল)

এখন, পর্বতশিলার আভ্যন্তরীণ উপাদানের অধিকাংশটাই সাধারণতঃ সিলিকন ডাই-অক্সাইড (SiO_2) এবং সে ক্ষেত্রে α-র মান গণনাক্কে প্রায় 0·2-এর কাছাকাছি ধরা যেতে পারে। সুতরাং (3) নং সমীকরণ থেকে আমরা পাই—

$$h \leqslant \frac{\frac{1}{10} \times \frac{1}{5} \times Ry}{g\text{-}Z\text{-}m_p} \quad \ldots\ldots(4)$$

SiO_2-এর ক্ষেত্রে -Z- $= 28 + 2{\cdot}16 = 60$.

$$\text{সুতরাং } h \leqslant \frac{\frac{1}{10} \times \frac{1}{5} \times 109678}{980 \times 60 \times 1{\cdot}67 \times 10^{-24}}$$

($Ry = 109678$ সেমি$^{-1}$ $= 13{\cdot}53$ ইলেকট্রন ভোল্ট, 1 ই. ভো. $= 1{\cdot}6 \times 10^{-12}$ আর্গ)

$$\leqslant \frac{13{\cdot}53}{5 \times 98 \times 6 \times 1{\cdot}67 \times 10^{-21}} \text{ সে. মি.}$$

$\leqslant$ 46 কিলোমিটার

এথেকে প্রমাণিত হয় যে, ভূপৃষ্ঠে কোন পর্বত সুপ্রতিষ্ঠিতভাবে পৃথিবীতে দাঁড়িয়ে থাকতে গেলে তার উচ্চতা 46 কিলোমিটারের কম হতেই হবে। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে এই সীমারেখার চেয়ে প্রকৃত উচ্চতা আরো অনেক কম হবে, কারণ পর্বতশিলার অভ্যন্তরভাগ, বিশেষ করে ভূপৃষ্ঠে মাটির কাছে যথেষ্ট উষ্ণ এবং সে জন্যে শিলার গলনের জন্যে প্রয়োজনীয় শক্তির পরিমাণ (L_{liq})—বাস্তব ক্ষেত্রে, উপরে যে মান ধরা হয়েছে, তার চেয়ে অনেক কম। সে জন্যে পৃথিবীপৃষ্ঠে সুদৃঢ় পর্বতের উচ্চতার সর্বোচ্চ সীমাও 46 কিলোমিটারের চেয়ে অনেক কম হবে। এই সব প্রসঙ্গ বিবেচনা করলে গাণিতিক হিসাবে দেখা যায় যে, ভূপৃষ্ঠে সুদৃঢ় পর্বতের উচ্চতা 10-11 কিলোমিটারের মধ্যে হবেই। বাস্তব ক্ষেত্রেও আমরা যে সব পর্বত দেখতে পাই, তারা সকলেই এই সীমারেখার নীচে আছে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, পৃথিবী ছাড়া অন্য কোন গ্রহ-উপগ্রহেও যদি অনুরূপভাবে হিসাব করা যায়, তাহলে সেখানেও ঠিক একইভাবে সম্ভাব্য পাহাড়-পর্বতের উচ্চতার সীমারেখা নির্ণয় করা সম্ভব হবে। অবশ্য সেখানে উচ্চতার সীমারেখা পৃথিবীর ক্ষেত্রের সীমারেখা থেকে আলাদা হবে, কারণ প্রথমতঃ সেখানে অভিকর্ষজ ত্বরণের মান, পৃথিবীর মানের চেয়ে ভিন্ন এবং দ্বিতীয়তঃ গ্রহান্তরের আভ্যন্তরিক গঠনে ভিন্ন প্রকার শিলা ও অন্যান্য বস্তুসামগ্রীর উপস্থিতি।

গাণিতিক হিসাবের সাহায্যে (4) নং সমীকরণ থেকে অভিকর্ষজ ত্বরণের মানকে বিলোপ করে। উচ্চতার সর্বোচ্চ সীমারেখার মানকে এমন এক রাশির সাহায্যেও প্রকাশ করা যেতে পারে, যাতে লব্ধ সমীকরণ সকল ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হতে পারে। অবশ্য সেই জটিলতার মধ্যে আলোচ্য প্রবন্ধে আর প্রবেশ করা হলো না।

ত্বকের কথা

রমেন দেবনাথ*

প্রাণিদেহের পঞ্চেন্দ্রিয়ের অন্যতম হলো ত্বক। দেহের বহির্ভাগ ত্বকের দ্বারা আবৃত থাকে, যাতে কোন অংশ নষ্ট না হয়। সে জন্যে ত্বকের আর এক নাম রক্ষাবরণী (Protective covering)। ত্বক শুধুই একটি আবরণী নয়—পরিপাকতন্ত্র, শ্বসনতন্ত্র, স্নায়ুতন্ত্র ইত্যাদির ন্যায় এটিও একটি প্রয়োজনীয় তন্ত্র বিশেষ। বিভিন্ন তন্ত্র (System) মিলে একটি জীবের দেহ গঠিত হয়ে থাকে। জীব-বিজ্ঞানের দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায়, একটি জীবের দৈহিক গঠনপ্রণালীর মূলে আছে জীবকোষ। কতকগুলি কোষ মিলে তৈরি হয় টিস্যু, কতকগুলি টিস্যুর সমষ্টি হলো যন্ত্র (Organ), আর যন্ত্রের সমষ্টি হলো তন্ত্র। যেমন মুখগহ্বর, গ্রাসনালী, অন্ত্র, পাকস্থলী, পায়ু, যকৃৎ ইত্যাদি যন্ত্রের সমবায়ে গঠিত হয় পরিপাকতন্ত্র, তেমনি ত্বক এবং ত্বকজাতযন্ত্রাদি নিয়ে গঠিত হয়েছে ত্বকসম্পর্কিত তন্ত্রাদি (Integumentary system)।

শরীরের সবচেয়ে বড় অংশ হচ্ছে ত্বক। বিশেষজ্ঞদের মতে, একজন প্রাপ্তবয়স্ক লোকের ত্বকের আয়তন 3000 বর্গ ইঞ্চি, ওজন 10 পাউণ্ড এবং পুরু হচ্ছে $\frac{1}{100}$ থেকে $\frac{1}{8}$ ইঞ্চি। পায়ের পাতা এবং হাতের চেটোতে ত্বক সবচেয়ে পুরু, অক্ষিগোলকের আবরণীতে ত্বক সবচেয়ে পাত্‌লা। ত্বকের প্রস্থচ্ছেদ করে অণুবীক্ষণ যন্ত্রে পরীক্ষা করলে দেখা যায়—এর দুটি স্তর—বহিত্বক (Epidermis) এবং অন্তত্বক (Dermis) [1নং চিত্র]।

বহিত্বক—এটি স্তরে স্তরে সজ্জিত কোষের দ্বারা গঠিত। বহিত্বক আবার দুটি ভাগে বিভক্ত—নীচেরটির নাম গঠনকারী স্তর (Germinative layer) বা ম্যালপিঘিয়ান স্তর (বিজ্ঞানী Malpighi-র নাম অনুসারে) এবং উপরের স্তরের নাম হলো করনিয়াম স্তর (Corneum layer)। গঠনকারী স্তর থেকে অবিরত কোষ তৈরি হতে থাকে—ঐগুলি স্তরে স্তরে সজ্জিত হয়ে করনিয়াম স্তর তৈরি করে। গঠনকারী স্তর এবং করনিয়াম স্তরের কোষগুলির আকৃতি এবং প্রকৃতি ভিন্ন। গঠনকারী স্তরের লম্বা ধরণের কোষগুলি স্থান-ত্যাগ করে উপরে গিয়ে করনিয়াম স্তর তৈরি করে। ঐ কোষগুলির স্থানান্তরের সময় Keratinisation প্রক্রিয়া সাধিত হয়, যার ফলে কোষের প্রোটো-প্লাজম একটি শক্ত পদার্থে রূপান্তরিত হয়—যার নাম কেরাটিন (Keratin)। করনিয়াম স্তরের কেরাটিনযুক্ত কোষগুলি আস্তে আস্তে চ্যাপ্টা এবং আঁশের মত হয়ে যায়। এই কেরাটিন খুব শক্ত, মজবুত এবং জলে অদ্রাব্য—যার মধ্যে করনিয়াম স্তর একটি আদর্শ রক্ষাবরণীর কাজ করতে পারে।

উপরিউক্ত স্তরের কোষ প্রতিনিয়ত ধ্বংস হচ্ছে—এই মৃত কোষ স্তূপাকারে সজ্জিত থাকে এবং অনবরত বহিত্বক থেকে খসে পড়ে সে জায়গায় নতুন কোষ যোজিত হয় গঠনকারী স্তর থেকে। মৃত কোষের জায়গায় নতুন কোষ গঠনের এই প্রক্রিয়াকে নির্মোচন (Moulting) বা খোলস পাল্টানো বলা হয়। সাপের ক্ষেত্রে মৃত কোষের গোটা স্তরটাই অর্থাৎ পুরনো খোলসটা খসে পড়ে এবং নতুন কোষের স্তর গজিয়ে ওঠে। কিন্তু অন্যান্য প্রাণীদের ক্ষেত্রে টুকরা টুকরা অথবা আংশিকভাবে নির্মোচন প্রক্রিয়া সাধিত হয়।

* প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, টি. ডি. বি কলেজ, রাণীগঞ্জ।

আমাদের শরীর থেকে অনবরতই পুরনো চামড়া খসে গিয়ে নতুন চামড়া গজায়, কিন্তু তা এতই অল্প পরিমাণে যে, আমাদের নজরে সব সময় পড়ে না। খুস্কি, মরামাস ইত্যাদি হচ্ছে মৃত কোষ। ঘর্মাক্ত শরীর রগড়ালে মৃত কোষ বেরিয়ে আসে—একে বলা হয় শরীরের ময়লা।

1নং চিত্র
চর্মের প্রস্থচ্ছেদ

মৃত কোষের জায়গা প্রতিনিয়ত নতুন কোষ দখল করছে বলে ত্বক সর্বদা সজীব এবং উজ্জ্বল থাকে। ফলে কাটা, পোড়া, ঘাজনিত ক্ষতচিহ্ন শরীরে বড় একটা দেখা যায় না, আস্তে আস্তে মিলিয়ে যায়।

অন্তস্ত্বক—বহিস্ত্বকের নীচের অংশটির নাম অন্তস্ত্বক। অনেকের মতে এটি প্রাণীর আসল চামড়া। এটি পুরু সংযোজক টিস্যু দিয়ে তৈরি। এতে আছে রক্তনালী, স্নায়ুকোষ, চর্বি, পেশী ইত্যাদি। তাছাড়া আছে নানারকম গ্রন্থি, চুল, আঁশ প্রভৃতি। অন্তস্ত্বকের পেশীর মধ্যে দুই রকম পেশীতন্তুর কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য—কঠিন পেশীতন্তু (Callogen fibre) এবং স্থিতিস্থাপক তন্তু (Elastic fibre); প্রথমটি ত্বকের কাঠিন্য এবং দ্বিতীয়টি স্থিতিস্থাপকতা বজায় রাখে। বৃদ্ধ বয়সে শেষোক্ত তন্তুটি অকেজো হয়ে পড়ে বলে শরীরের চামড়া ঢিলে হয়ে যায় আর তারই জন্যে মুখমণ্ডল, গণ্ডদেশে বলিরেখা বা কুঁচ্কানো চর্ম দেখা দেয়।

চামড়ার স্যুটকেস, ব্যাগ, জুতা, ফুটবল এবং ঢাক-ঢোল-তবলা নির্মাণে চামড়ার অন্তস্ত্বকটিকেই কাজে লাগানো হয় এবং চামড়াটিকে ভিজিয়ে রেখে বহিস্ত্বককে আগে ছাড়িয়ে ফেলে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় অন্তস্ত্বককে ট্যান করে পছন্দমত চামড়া তৈরি করা হয়। মানুষের অন্তস্ত্বকটিও খুব মজবুত এবং এর দ্বারা মজবুত জুতা তৈরি করা যায়। প্রাচীন কালে যুদ্ধে নিহত শত্রু সেনাদের চামড়া নিয়ে জুতা তৈরি করা হতো।

ত্বকের রং—দৈহিক বর্ণের পার্থক্যের মূলে আছে দেহের রঞ্জক কোষ (Chromatophore)—যা ত্বকের মধ্যে ছড়িয়ে আছে। মানুষের গায়ের রঙের জন্যে দায়ী যে কোষ, তার নাম হলো মেলানোসাইট (Melanocyte), যা থেকে মেলানিন কণা (Melanin granule) তৈরি হয়। সাধারণতঃ ফরসা লোকের চেয়ে কালো লোকের মধ্যে মেলানিন কণা বেশী থাকে। মেলানোসাইট ভ্রূণাবস্থায় স্নায়বিক অংশ থেকে তৈরি হয়ে পরে বহিত্বক গঠনকারী স্তরে এসে জমায়েত হয় এবং ঐ স্তরের কোষের মধ্যে মেলানিন কণা ছড়িয়ে পড়ে, যা ত্বকের রংকে প্রভাবিত করে। কিছু কিছু মেলানোসাইট অন্তত্বকের মধ্যেও থাকে। সাদা-কালোতে ভেদাভেদ থাকলেও রক্তের রং যেমন সকল মানুষের এক—তেমনি শরীরে যে ফোস্কা (Blister) পড়ে, তাও সাদা কালো মানুষের একই রকম, কারণ যে চামড়া ফোস্কাটি ঘিরে রাখে, তা রঞ্জক কোষবিহীন।

হস্তরেখা—হাতের চেটো এবং পায়ের পাতা সর্বাধিক ঘর্ষণের সম্মুখীন হয় বলে ঐ জায়গা দুটি সবচেয়ে পুরু। ঐ জায়গা দুটি যাতে পুরু হয় সে জন্যে বহিত্বক এবং অন্তত্বকের দুটি অংশ ঐসব জায়গায় কতকগুলি লাইন বরাবর যুক্ত থাকে। ঐ যুক্ত লাইনগুলিই হাতের ভাঁজ, যাকে হস্তরেখা বলা হয়। আঙুলের ছাপের গঠন-প্রক্রিয়াও একই রকম। দু-জন লোকের হাতের ছাপ কখনও একরকম নয়, প্রত্যেকের প্রত্যেকটি ছাপই আলাদা।

এপর্যন্ত ত্বক সম্পর্কে অনেক কিছু আলোচনা হলো—এবার ত্বক যে যে জিনিষ তৈরি করে অর্থাৎ ত্বকজাত দৈহিক যন্ত্রাদির কথা (Integumental derivatives) কিছু আলোচনা করা হচ্ছে।

বহিত্বকজাত যন্ত্রাদি (Epidermal derivatives)—সরীসৃপের দেহের আঁশ, পাখীর পালক, স্তন্যপায়ী প্রাণীর লোম ইত্যাদি বহিত্বক থেকে তৈরি হয়। এছাড়া হাত ও পায়ের নখ, চতুষ্পদ প্রাণীর পায়ের খুর, শিং ইত্যাদিও তা থেকে তৈরি হয়, আর তৈরি হয় শরীরের বিভিন্ন গ্রন্থি, তার মধ্যে স্তন্যপায়ী প্রাণীর ঘর্মগ্রন্থি, তৈল-গ্রন্থি ও দুগ্ধগ্রন্থি (স্তন) উল্লেখযোগ্য। এই গ্রন্থি তিনটির কথা আলোচনা করা হচ্ছে।

ঘর্মগ্রন্থি—ঠোঁট ও নখের গোড়া প্রভৃতি ছাড়া শরীরের সমস্ত অংশে এই গ্রন্থি প্রচুর পরিমাণে থাকে। রেচনকার্য এবং দৈহিক উত্তাপের সমতা রক্ষা করা হলো ঘর্মগ্রন্থির মূল কাজ। বিজ্ঞানী-দের হিসাবে দেখা যায় যে, মানুষের ত্বকে প্রায় 2½ মিলিয়ন ঘর্মগ্রন্থি আছে এবং 24 ঘন্টায় একজন প্রাপ্তবয়স্ক লোকের 2-3 লিটার ঘাম বেরোয়। এই ঘামের সঙ্গে শরীরের 8-10 ভাগ বর্জ্য পদার্থ ইউরিয়া বেরিয়ে যায়। শারীর-বিজ্ঞানী ক্রজ-এর হিসাব অনুযায়ী ত্বকের বিভিন্ন স্থানে (প্রতি বর্গসেন্টিমিটারে) ঘর্মগ্রন্থির সংখ্যা এরূপ—হাতের চেটো—275, কপাল, গলা—175, বুক, পেট—155, কাঁধ, পিঠ, পা—80।

ঘর্মগ্রন্থির ঘাম ঘর্মনালীর সাহায্যে ত্বকের বাইরে বেরোয় (1নং চিত্র)। বিশেষজ্ঞদের বিশ্লেষণ থেকে নিম্নলিখিত উপাদানগুলি ঘামের মধ্যে পাওয়া যায়—

জল—99%, ইউরিয়া—0·03%, ল্যাকটিক অ্যাসিড 0·07%, চিনি—0·004%, ক্লোরিন—1·15% সোডিয়াম—0·15%, পটাসিয়াম—0·017%, সালফেট—0·004%।

তৈলগ্রন্থি—পায়ের পাতা এবং হাতের চেটো ছাড়া ত্বকের সমস্ত অংশে এই গ্রন্থি আছে। লোমের সঙ্গে এগুলি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। ত্বককে মসৃণ, সজীব এবং তৈলাক্ত রাখা হলো এই গ্রন্থির কাজ। প্রত্যেক মানুষের নিজস্ব একটা গন্ধ থাকে। এই গন্ধের জন্যেও তৈলগ্রন্থি দায়ী।

দুগ্ধগ্রন্থি—মেরুদণ্ডী প্রাণীর অন্তর্গত এক

শ্রেণীর প্রাণীর এই গ্রন্থি অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যমূলক একটি লক্ষণ। উক্ত গ্রন্থির নামানুসারেই ঐ শ্রেণীটির নাম হয়েছে—ম্যামেলিয়া (Mammelia ; Mamma-breast-স্তন) বা স্তন্যপায়ী শ্রেণী। এক-একটি স্তন অনেকগুলি ছোট ছোট খণ্ডে (Lobule) বিভক্ত থাকে, প্রত্যেকটি খণ্ড আবার অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র থলির (Alveolus) সমষ্টি। তার মধ্যেই থাকে দুগ্ধ-ক্ষরণকারী কোষ। স্তন থেকে দুগ্ধনালীর সাহায্যে দুগ্ধ বাইরে নির্গত হয়। মূল দুগ্ধনালীটি অসংখ্য ছোট দুগ্ধনালীর সমবায়ে তৈরি। স্তনের যে জায়গায় দুগ্ধনালী এসে বের হয়, তাকে স্তন-বৃন্ত বলে। উপরে বর্ণিত দুগ্ধগ্রন্থির চার দিকে প্রচুর পরিমাণে চর্বি-জাতীয় টিসু জমায়েত থাকে, যার ফলে দুগ্ধগ্রন্থি বা স্তন মাংসবহুল হয়।

একটি করে দুগ্ধাধার (Cistern) থাকে, যার মধ্যে দুগ্ধনালী থেকে দুধ এসে জমা হয়। এই দুগ্ধাধার থেকে বাঁটের মাধ্যমে (2নং চিত্র) একটি দ্বিতীয় নল দিয়ে দুধ বাইরে আসে।

অন্তস্ত্বকজাত যন্ত্রাদি (Dermal derivatives)—অন্তস্ত্বক থেকে মাছের আঁশ তৈরি হয়। সাপ, গিরগিটি ইত্যাদি সরীসৃপজাতীয় প্রাণীর আঁশ তৈরি হয় বহিস্ত্বক থেকে, তাই ঐ দুই শ্রেণীর প্রাণীদের আঁশ এক নয়। মৎস্য-শ্রেণীকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা হয়—তরুণাস্থি (Cartilaginous) ও কঠিনাস্থি (Bony)। প্রথমোক্ত বিভাগের মাছের গায়ে শুধু এক ধরণের আঁশ থাকে—যার গঠন-পদ্ধতি দাঁতের ন্যায়। ঐ আঁশের নাম প্ল্যাকয়েড আঁশ (Placoid scale)। মাছের কঠিনাস্থির আঁশ

2নং চিত্র

রোমন্থক প্রাণীর স্তন মনুষ্যস্তন
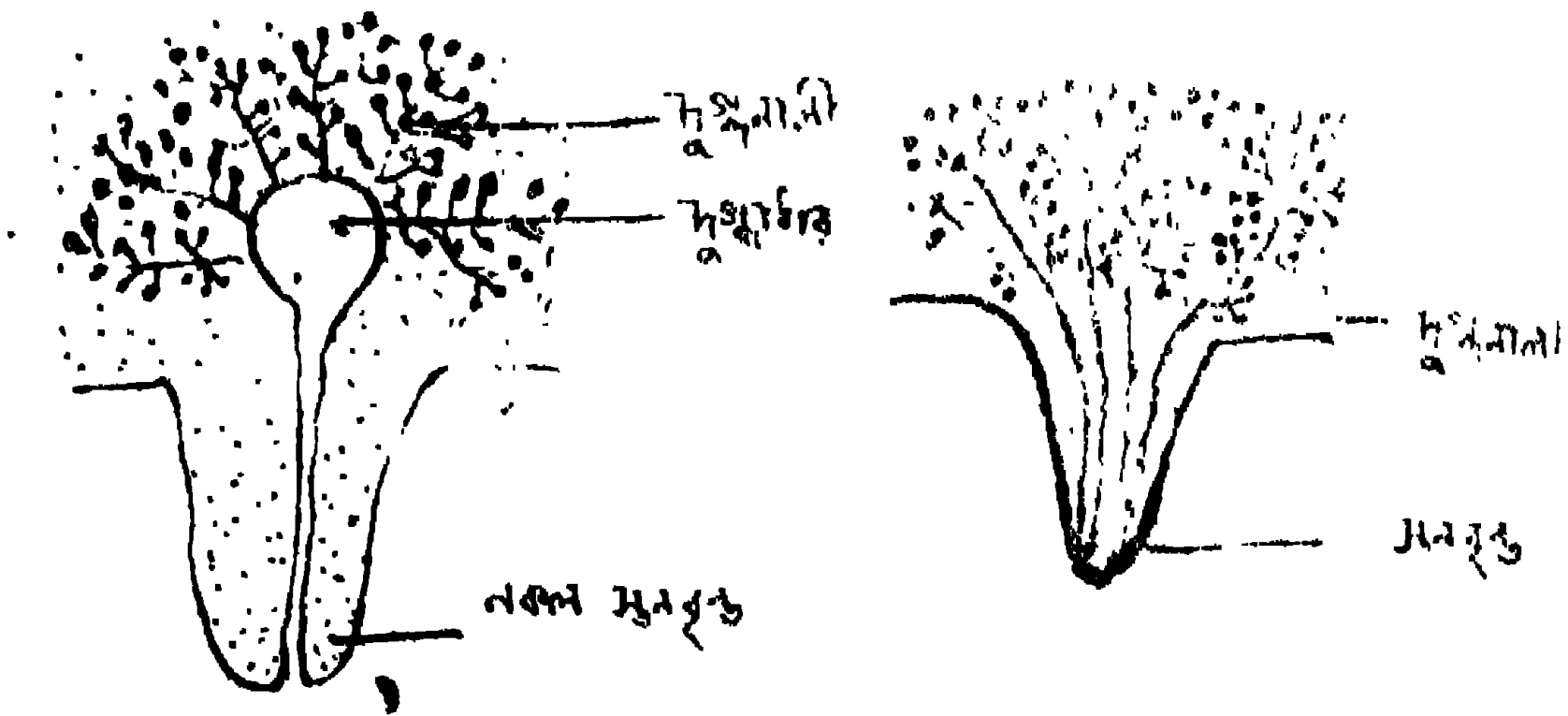
মানুষ, তিমি, বাদুর, ঘোড়া প্রভৃতির একজোড়া করে স্তনবৃন্ত থাকে। ওপোসামের 12 জোড়া, মাংসাশী প্রাণীর 3-4 জোড়া এবং গরু, মহিষ, ছাগল ইত্যাদি রোমন্থক প্রাণীর দুই জোড়া করে স্তনবৃন্ত থাকে। মানুষের স্তনবৃন্তে অনেকগুলি দুগ্ধনালী এসে জমা হয়, যার মাধ্যমে দুগ্ধ বাইরে নির্গত হয়। গাভী-মহিষের স্তনবৃন্তকে বাঁট বা নকল স্তনবৃন্ত (Falsenipple) বলা হয়। এদের বাঁটের গোড়ায়

একটি সাধারণতঃ দুই রকমের হয়—গোলাকার (Cycloid) ও চিরুণী (Ctenoid) আকারের (3নং চিত্র)। হাঙর প্রভৃতি মাছের সারা শরীরে প্ল্যাকয়েড আঁশ সমানভাবে বিস্তৃত থাকে, কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে শরীরের বিভিন্ন জায়গায় সেগুলি ভিন্ন ভিন্ন আকারের হয়ে থাকে। করাত মাছের করাতের দুই দিকে যে ধারালো দাঁতের মত অংশ (3নং চিত্র) থাকে, সেগুলি আসলে দাঁত

নয়, রূপান্তরিত প্ল্যাকয়েড আঁশ। কচ্ছপের দৈহিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি যে দুটি খোলকের (Shell) মধ্যে আবদ্ধ থাকে, তাও অন্তস্ত্বক থেকে তৈরি হয় (4নং চিত্র)। কুমীরের গায়ে শক্ত প্লেটের মত অংশ, যার উপর বড় বড় আঁশ থাকে, সেই প্লেটগুলিও অন্তস্ত্বক থেকে তৈরি হয়।

সঞ্চিত থাকে, যা দরকারের সময় ব্যবহৃত হয়, (3) দৈহিক তাপের সমতা রক্ষা, (4) রেচন, (5) ক্ষরণ, (6) শ্বসন—উভচর প্রাণী ফুল্কা ও ফুসফুস ছাড়া ত্বকের সাহায্যেও শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া চালায়, (7) চলন-প্রক্রিয়া—মাছ, পাখী এবং বাদুড় প্রকারান্তরে ত্বকের সাহায্যেই চলাফেরা করে,
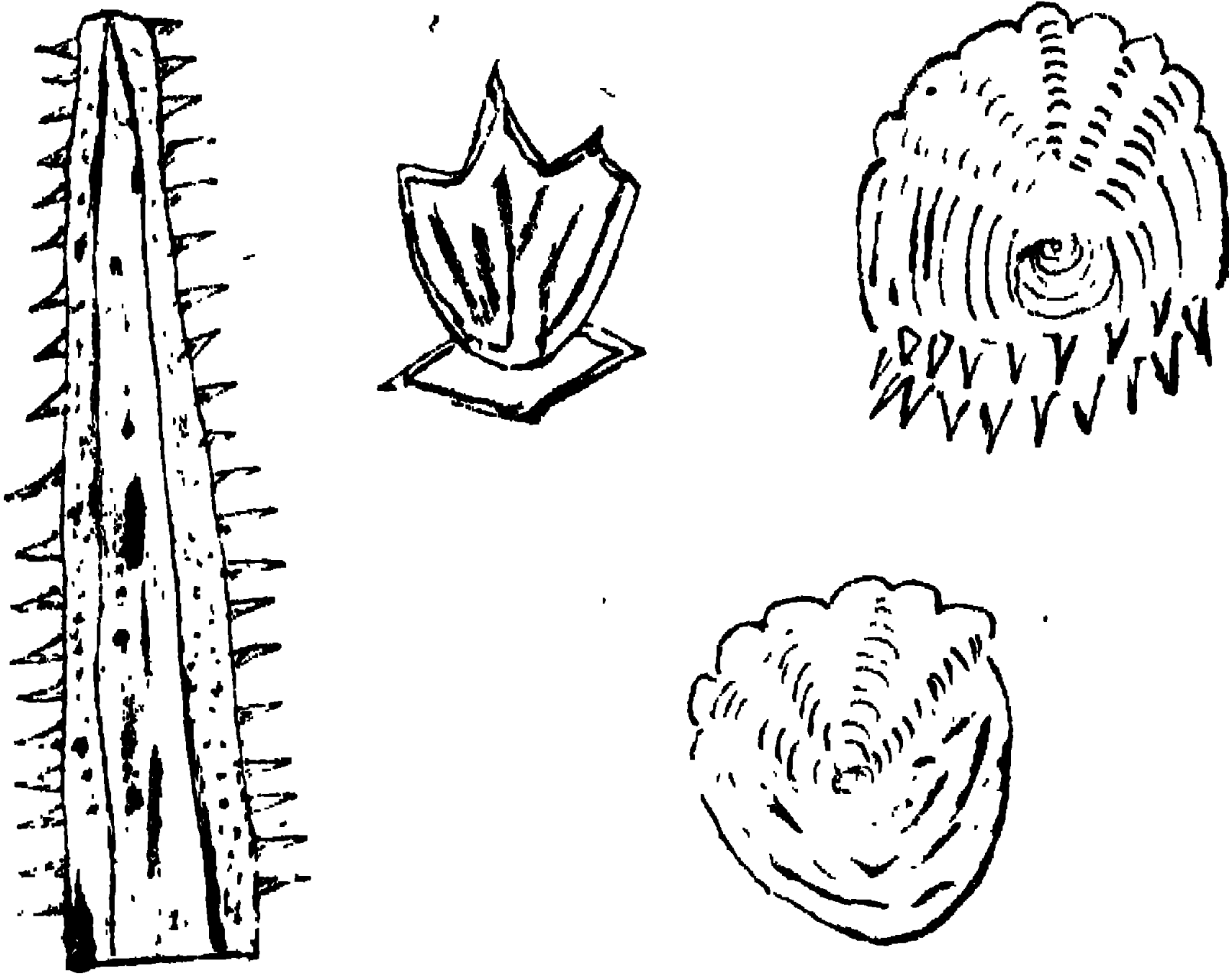
3নং চিত্র
সর্ববামে—করাত-মাছের করাত, উপরে বামে—প্ল্যাকয়েড আঁশ, উপরে দক্ষিণে—চিরুণী আঁশ, নীচে—গোলাকার আঁশ।
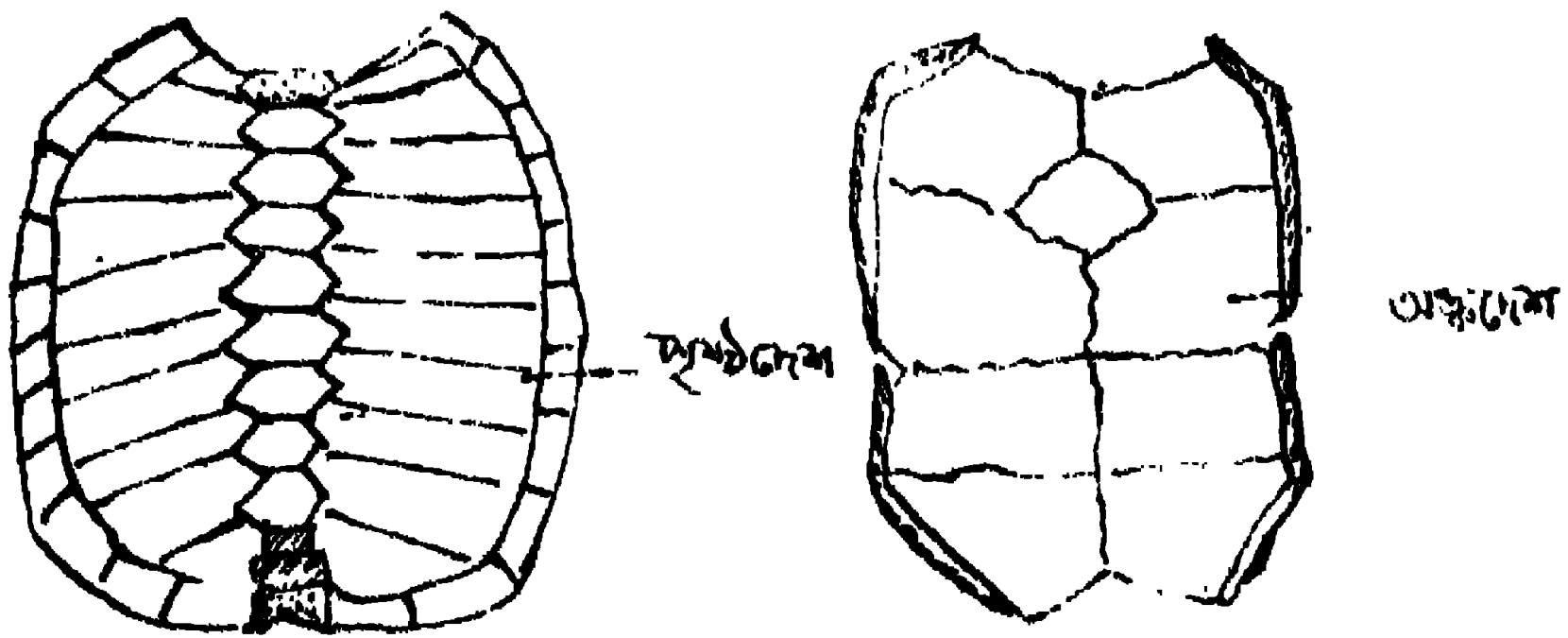
4নং চিত্র
কচ্ছপের অন্তস্ত্বকীয় খোলস

ত্বকের কাজ—শরীরের একটি অপরিহার্য অংশ হলো ত্বক। এই ত্বকের সাহায্যে দেহের এই সব কাজ সম্পন্ন হয়—(1) রক্ষাবরণী, (2) খাদ্যসঞ্চয়ন—ত্বকের মধ্যে যে চর্বি থাকে, তার মধ্যেই খাদ্য

কারণ মাছের পাখ্না, পাখীর পালক ও ডানা এবং বাদুড়ের ডানা ত্বক থেকেই তৈরি হয়, (8) অনুভূতি—ত্বকের মধ্যে স্পর্শেন্দ্রিয় বিদ্যমান, সে জন্যে স্পর্শসংক্রান্ত সমস্ত অনুভূতি ত্বকের মাধ্যমে আমরা পেয়ে থাকি।

সঞ্চয়ন

চাঁদের গঠন সম্পর্কে অ্যাপোলো-15 কর্তৃক প্রেরিত তথ্য

অ্যাপোলো-15-এর মহাকাশচারীরা চন্দ্রপৃষ্ঠের হেড্‌লী খাদ এলাকায় বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি স্থাপন করে এসেছেন। ঐ সকল যন্ত্র এবং অ্যাপোলো-15-এর ক্যামেরা ও অন্যান্য সাজসরঞ্জাম মাত্র কয়েক দিনের মধ্যেই বহু তথ্য পৃথিবীতে সরবরাহ করেছে। হিউস্টনে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মিলনে বিজ্ঞানীরা ঐ সকল তথ্যের ভিত্তিতে চন্দ্র সম্পর্কে নতুন নতুন অভিমত প্রকাশ করেছেন।

গত 4ঠা অগাষ্ট যে সকল বিজ্ঞানী চন্দ্রবক্ষের গবেষণা সম্বন্ধে পরিকল্পনা করেছিলেন, তাঁদের এবং চান্দ্র পরিকল্পনার প্রধান পরিচালকদের উদ্যোগে এই সাংবাদিক সম্মিলন অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সম্মিলনে বিজ্ঞানীরা চন্দ্র সম্পর্কে যে সকল অভিমত ব্যক্ত করেন, তার মধ্যে ডক্টর গ্যারি ল্যাথামের অভিমতই সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য।

চন্দ্রগর্ভ পৃথিবীর মতই নানা স্তরে বিভক্ত

নিউইয়র্কের লামণ্ট ডোহার্টি ভূ-পদার্থ-বিজ্ঞান সংক্রান্ত মানমন্দিরের বিশিষ্ট ভূকম্প-বিজ্ঞানী ডক্টর ল্যাথাম বলেন যে, চন্দ্রগর্ভ পৃথিবীর মতই হয়তো নানা স্তরে বিভক্ত। চাঁদের উপরিভাগের কঠিন 25 কিলোমিটার পরিমিত স্তরটি নানা উপাদানে গঠিত। তারপরে আরম্ভ হয়েছে এর দ্বিতীয় স্তর। এই স্তর অন্ততঃ 100 কিলোমিটার পর্যন্ত গভীর।

এখানে চাঁদের গঠনে আকস্মিক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাবে। নানা অজ্ঞাত উপকরণ দিয়েই এই স্তর গঠিত।

ডক্টর ল্যাথামের নির্দেশে 1969 সালের মাঝা-মাঝি সময়ে অ্যাপোলো 11-এর মহাকাশচারীরা চন্দ্রবক্ষে যে সকল কম্পন-নির্দেশক যন্ত্রপাতি স্থাপন করে এসেছিলেন, সেই সকল যন্ত্রপাতি সেই সময় থেকেই চন্দ্রপৃষ্ঠের কম্পন সম্পর্কে তথ্যাদি পৃথিবীতে সরবরাহ করে এসেছে। সেই সকল কম্পন এবং অ্যাপোলোযানের অংশবিশেষের চন্দ্রবক্ষে পতনের ফলে যে কম্পনের সৃষ্টি হয়েছিল, সেগুলি পরীক্ষা করে তিনি তখন বলেছিলেন যে, চন্দ্রগর্ভে কোন স্তর নেই।

ডক্টর ল্যাথাম তাঁর পুরাতন অভিমত সম্পর্কে বলেছেন যে, তারপরে অ্যাপোলো-12, অ্যাপোলো-14 এবং বর্তমানে অ্যাপোলো-15-এর মহাকাশ-চারীরা চাঁদের বিভিন্ন স্থানে আরও সূক্ষ্ম কম্পন-নির্দেশক যন্ত্রপাতি স্থাপন করে এসেছেন। চন্দ্রপৃষ্ঠে কম্পনের উৎপত্তি স্থল সম্পর্কে এই তিনটি কেন্দ্রের যন্ত্রপাতির সাহায্যে যে সকল নতুন নতুন তথ্য সংগৃহীত হয়েছে, সেগুলির ভিত্তিতেই তাঁর পূর্ব অভিমতের পরিবর্তন করতে হয়েছে।

অ্যাপোলো-15 কর্তৃক প্রেরিত অ্যাপেনাইন পর্বতের চিত্র

হিউস্টন মহাকাশকেন্দ্রের চন্দ্র ও অন্যান্য গ্রহ সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধানী পরিকল্পনা পর্যালোচনা বিভাগের প্রধান ডক্টর পল গ্যাস্ট অ্যাপোলো-15 কর্তৃক প্রেরিত টেলিভিশন চিত্র সম্পর্কে বলেছেন যে, এগুলি সবই চাঁদের অ্যাপেনাইন পাহাড়ের প্রথম ছবি। চাঁদের সৃষ্টির প্রথম পর্যায়ে একটি গ্রহাণুর সংঘাতে তার বুকে সৃষ্টি হয়েছিল ইমব্রিয়াম উপসাগর এবং তাঁর নিকটস্থ ক্রা মরো এলাকা থেকে যে সকল উপকরণ ছিটকে পড়েছিল, সেগুলি দিয়েই তৈরি হয়েছে অ্যাপেনাইন পর্বতের চূড়া।

ঐ পর্বতের মধ্যভাগটি তৈরি হয়েছে এর চেয়েও প্রাচীন শিখর সমুদ্র বা সী অব সেরিনিটির উপকরণ দিয়ে। আর এর পাদদেশ গঠিত হয়েছে চাঁদ-সৃষ্টির প্রথম দিনের উপকরণ দিয়ে। অ্যাপেনাইন পর্বতের সম্মুখভাগ হেড্‌লী খাদ ওই পার্বত্য অঞ্চলেরই অন্যতম অংশ। মহাকাশচারী স্কট ও আরউইন ঐ অঞ্চলে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তথ্যাদি সংগ্রহ করেছেন।

চাঁদের চৌম্বক ক্ষেত্র

মার্কিন মহাকাশ সংস্থার ক্যালিফোর্নিয়ার এমজ গবেষণা কেন্দ্রের ডক্টর পল ডায়েল চাঁদের চৌম্বক ক্ষেত্র সম্পর্কে বলেছেন যে, অ্যাপোলো-15 চন্দ্রবক্ষে চৌম্বক শক্তি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্যে একটি ম্যাগনেটোমিটার স্থাপন করে এসেছে। এই যন্ত্রটি যে সকল তথ্য পৃথিবীতে প্রেরণ করেছে, তাতে জানা যায়—যে স্থানে ঐ যন্ত্রটি বসানো হয়েছে, সেখানকার চৌম্বক ক্ষেত্রের শক্তির পরিমাণ চাঁদের অন্যান্য স্থানের গড়পড়তা শক্তির তুলনায় কম।

ডক্টর ডায়েল এই প্রসঙ্গে আরও বলেন যে, চাঁদের গভীরে যে বৈদ্যুতিক সঙ্কেত পাঠানো হচ্ছে, সে সম্পর্কে তথ্যাদি ঐ ম্যাগ্‌নেটোমিটারের সাহায্যে সংগৃহীত হচ্ছে। ঐ সকল তথ্যের সাহায্যে আলোক বিজ্ঞানীরা চন্দ্রগর্ভের কেন্দ্রস্থল পর্যন্ত তাপমাত্রা সম্পর্কেও একটা আঁচ করতে পারবেন।

চাঁদের আয়নমণ্ডল সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান

টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর কেন হিলস বলেন যে, চাঁদের আয়নমণ্ডল বা আয়নোস্ফিয়ার সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে যে ডিটেক্টর যন্ত্রটি স্থাপন করা হয়েছে, তাতে অ্যাপোলো-15 চান্দ্রযানটিকে চন্দ্রবক্ষে নিক্ষেপ করবার ফলে সেখান থেকে কয়েক মিনিট ধরে কার্বন ডাই-অক্সাইড প্রভৃতি যে সকল রাসায়নিক পদার্থ উৎক্ষিপ্ত হয়েছিল, তাও ধরা পড়ে। এটি অতিরিক্ত লাভ, কারণ ঐ যন্ত্রটি চাঁদের অতি সূক্ষ্ম আয়নমণ্ডল সম্পর্কেই মাত্র তথ্য সংগ্রহের জন্যে স্থাপন করা হয়েছে।

চাঁদে তাপ-প্রবাহ নিরূপণের প্রথম উদ্যোগ

ল্যামণ্ট ডোহার্টি মানমন্দিরের বিজ্ঞানী ডক্টর মার্কাস ল্যাংসেথ বলেন, অ্যাপোলো-15-এর মহাকাশচারীরাই প্রথম চাঁদে তাপ-প্রবাহ নিরূপণের যন্ত্র স্থাপন করে এলেন। চাঁদের অভ্যন্তর থেকে কি হারে তাপমাত্রা মহাকাশে ছড়িয়ে পড়েছে, তা প্রত্যক্ষভাবে ঐ যন্ত্রের সাহায্যে নিরূপণ করা সম্ভব হবে। চাঁদের গর্ভ কি পরিমাণে উত্তপ্ত বা শীতল, তা সঠিকভাবে জানবার ব্যাপারে এই সকল তথ্য খুবই সহায়ক হবে। ডক্টর গ্যাস্ট সকলের শেষে বলেন যে, অ্যাপোলো-15 যে সকল তথ্য সংগ্রহ করেছে, সেই তথ্যাদি এসে পৌঁছুলে প্রকৃত তথ্য নিরূপিত হবে। তবে বিজ্ঞানীদের অভিমত, চাঁদ অতি দ্রুত গঠিত হয়েছে। এর অভ্যন্তর ভাগ শীতল এবং উপরিভাগ উত্তপ্ত। পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহে এর উল্টোটাই দেখা যায়। রাসায়নিক গঠনের দিক থেকে চাঁদ পৃথিবী এবং সৌর-মণ্ডলীর অন্যান্য গ্রহ থেকে ভিন্ন।

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

সেপ্টেম্বর-অক্টোবর — 1971

চতুর্বিংশ বর্ষ — নবম-দশম সংখ্যা

ক্যালিফোর্নিয়ার জঙ্গলে দুটি বাচ্চাসহ ঝুঁটিওয়ালা হুতোম প্যাচা।

আমাদের ঘ্রাণ-যন্ত্র ও গন্ধ-রহস্য

নাক যাঁদের সুন্দর, অনেক সময় তাঁদের চলাফেরায় একটু নাক-উঁচু ভাব দেখা যায়। যাঁদের নাক বেশ উঁচু, সৌন্দর্যের বিচারে তাঁরা একটু উপরে স্থান পেয়ে থাকেন। আর যাঁদের নাক নিতান্তই রেলগাড়ী-চলে-যাওয়া কিংবা কামান দাগা, তাঁরা স্বভাবতঃই কিছুটা হীনমন্যতায় ভোগেন। বর্ণনায় শোনা যায়—কারোর নাক টিয়াপাখীর ঠোঁটের মত, কারোর বা তা বাঁশির মত। আসলে বর্ণনায় যা-ই বলা হোক না কেন, কাজের দিক থেকে খাঁদা কিংবা টিকালো নাকের কোন ভেদ নেই—তবে সৌন্দর্যের বিচারে আলাদা কথা।

নাকের যে বৈশিষ্ট্য নিয়ে আমরা আলোচনা করি, সে হলো তার বহিরঙ্গ। নাসিকা-রহস্যের চাবিকাঠি লুকিয়ে আছে দেহের অভ্যন্তরে। তাই ভিতরের গঠন ও তার কার্যক্রম বিচার করলে টিকালো বা খাঁদা নাকের তারতম্য ঘুচে যাবে, তখন আর উঁচু নাকের জন্যে গর্ব করা চলবে না।

নাকের আসল কাজ দুটি। শ্বাস-প্রশ্বাস ও গন্ধের অনুভূতি। অবশ্য স্বাদ গ্রহণের ব্যাপারটিও এর সঙ্গে যুক্ত। তবে সে সব কথা পরে। শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যাপারে নাকের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যোগাযোগ ফুসফুসের। আর গন্ধের অনুভূতি ও স্বাদ গ্রহণের ব্যাপারটি এক জটিল ব্যবস্থার মাধ্যমে সরাসরি যুক্ত মস্তিষ্কের বহিস্তক বা Cortex-এর সঙ্গে।

ঘ্রাণ-যন্ত্রের সংক্ষিপ্ত একটি অংশ রয়েছে বাইরের দিকে। এই অংশটিকে বহির্নাসিকা বা সাধারণভাবে নাক বলা হয়। বহির্নাসিকা দু-মুখ খোলা একটি দু-নলা চোঙ, অনেকটা দু-নলা বন্দুকের ব্যারেলের মত। দুটি নলের মাঝে আছে বিভেদ প্রাচীর, যাকে ইংরেজীতে বলে সেপ্টাম (Septum)। সেপ্টাম লাঙ্গলের আকারের এক বিশেষ ধরণের হাড় দিয়ে তৈরী। হাড়গুলি নরম ও জীব-বিজ্ঞানের ভাষায় একে বলা হয় তরুণাস্থি। বহির্নাসিকার সম্মুখভাগ মূলতঃ বায়ুর প্রবেশ ও নির্গমনের কাজ করে থাকে। সমগ্র বহির্নাসিকাটি তরুণাস্থির দ্বারা গঠিত। নলের শেষ প্রান্ত দুটি যেখানে মুখের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে, ঠিক সেখানে আছে একজোড়া ছোট শক্ত হাড়ের কাঠামো। এদের নাম নাসিকাস্থি। সেপ্টামের দু-পাশে সুড়ঙ্গের মত যে দুটি নল অগ্রভাগ পর্যন্ত প্রসারিত, তাকে বলে নাসিকাগহ্বর (Vestibule)। নাসিকাগহ্বরের সম্মুখ প্রান্তে ভিতরের দিকের দেয়ালে থাকে বেশ কিছু লম্বা লোম। এরা নাসিকাগহ্বরের ভিতরে জটিল জালের সৃষ্টি করে। নিশ্বাসবায়ুর সঙ্গে পর্যাপ্ত পরিমাণে ধূলিকণা ও কোন কঠিন বস্তুর ছোট ছোট কণা নাকের মধ্যে ঢুকলে এই লোমের জালে সহজেই ধরা পড়ে।

বাম ও দক্ষিণ নাসিকাগহ্বরের বাইরের দিকের দেয়াল থেকে বেরোনো ভোমার (Vomer), এথময়েড (Ethmoid) প্রভৃতি অস্থিগহ্বরকে মোট তিনটি অপরিসর কক্ষে বিভক্ত করেছে। এথময়ডীয় অস্থির উপরাংশে আছে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র। এগুলির মধ্য দিয়ে ঘ্রাণবাহী স্নায়ুগুলি (Olfactory nerve) মস্তিষ্কে প্রবেশ করে। দুই নাসিকা-গহ্বরের ভিতর দিকের দেয়ালে আবরণীর নীচে আছে অসংখ্য গন্ধগ্রাহী কোষ (Olfactory receptor cell)। কোষগুলির সঙ্গে যুক্ত ঘ্রাণবাহী স্নায়ু মস্তিষ্কে বার্তা নিয়ে যায়। নাসিকাগহ্বরের শেষ প্রান্তে মূল গহ্বর (Nasal foosa), তার সঙ্গে শ্বাসনালীর সংযোগ [1, 2 চিত্রে দ্রষ্টব্য]।
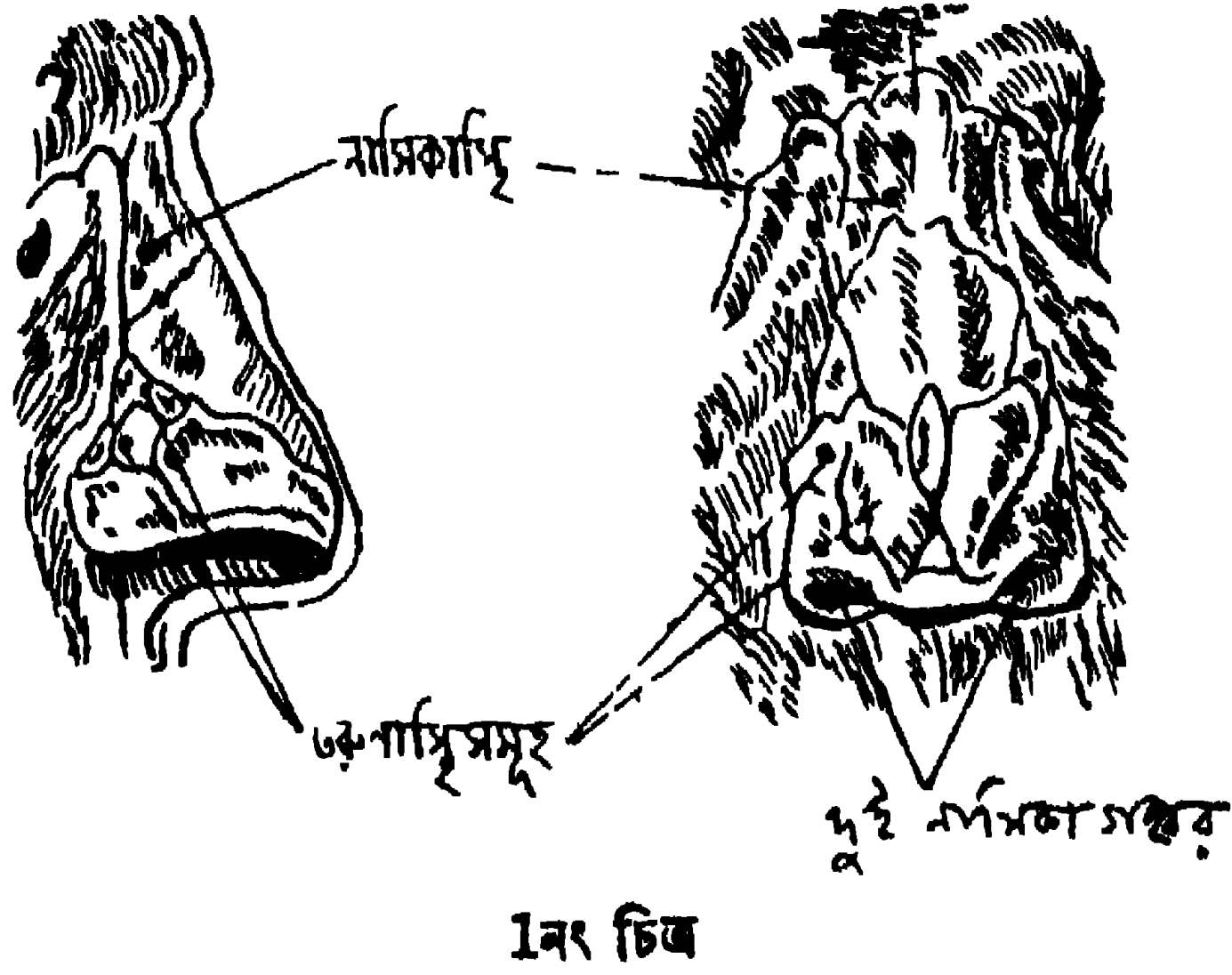
1নং চিত্র

আমাদের যে কোন অনুভূতিকে জীবনের পথপ্রদর্শক বলা চলে। শব্দ, আলো ইত্যাদি অনুভূতির ক্ষেত্রে মানুষে মানুষে অনেক পার্থক্য দেখা যায়। গন্ধানুভূতিতে এই পার্থক্য আরও বেশী। কোন একটি গন্ধ কারোর ভাল লাগে, কারোর বা লাগে না। মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, আমাদের পুরনো অভিজ্ঞতার উপরই কোন গন্ধ ভাল-লাগা বা না-লাগা নির্ভর করে। কোন দুঃখজনক ঘটনার সঙ্গে কোন গন্ধের স্মৃতি যদি জড়িত থাকে, তবে অন্যেরা পছন্দ করলেও আমরা সচেতন বা অচেতনভাবে সেই গন্ধটিকে অপছন্দ করে থাকি। অনেক সময় আমরা অনেক বিরক্তিকর গন্ধের সঙ্গেও দিব্যি সন্ধি করে ফেলি। রাসায়নিক কারখানা বা চামড়ার কারখানার আশেপাশে যাঁদের বাড়ী, তাঁরা দিনের পর দিন ঐ দুর্গন্ধের মধ্যে বাস করা ছাড়া অন্য উপায় না পেয়ে গন্ধটিকে সহ্য করে নেন এবং দুর্গন্ধের মধ্যে নির্বিবাদে বাস করেন।

বিভিন্ন সময়ে একই ব্যক্তির শারীরিক ও মানসিক অবস্থার উপর গন্ধের অনুভূতি নির্ভর করে। বয়স-বৃদ্ধি, মানসিক পরিবর্তন, শারীরিক সুস্থতা বা অসুস্থতা আমাদের এই অনুভূতিতে প্রভাব বিস্তার করে। সুস্থ অবস্থায় যে গন্ধটি ভাল লাগে, অসুস্থ অবস্থায়

সেই গন্ধই বিরক্তিকর মনে হতে পারে। গন্ধানুভূতির ক্ষেত্রে এক ধরণের বিভ্রম (Hallucination) লক্ষ্য করা যায়। মন খারাপ থাকলে বা অসুখে ভুগে ভুগে দেহ ও মন ক্লান্ত হয়ে পড়লে তখনকার নিঃসঙ্গ অবস্থায় শৈশবের আনন্দময় নানা ছবি আমাদের স্মৃতিতে উজ্জল হয়ে ওঠে। এই ছবিগুলি দেখতে দেখতে আমরা কখনো বা সুগন্ধের অনুভূতিতে চমকে উঠি। মনে হয় কই এই রকম ফুল বা গন্ধ কাছাকাছি কোথাও তো নেই। শৈশবজীবনের কোন সুগন্ধের স্মৃতিই বাস্তবকে উপেক্ষা করে এই অনুভূতির সৃষ্টি করতে পারে। অপরাধীদের ক্ষেত্রেও এরকম ঘটনা দেখা যায়। কারাগারের নির্জন ঘরে পুরনো ঘটনা ভাবতে ভাবতে খুনী ব্যক্তিটি হঠাৎ চমকে ওঠেন। কয়েক বছর আগে যাকে খুন করেছিলেন, তার দেহের গন্ধটিই এতদিন বাদে ফিরে আসে অবিশ্বাস্যভাবে। তবে মানুষের ক্ষেত্রে এই গন্ধস্মৃতি খুব সক্রিয় নয়। মানুষের উন্নত ধরণের দৃষ্টি ও শ্রবণ-শক্তি আর তারই সঙ্গে কল্পনাশক্তি, বাস্তববোধ, বয়সবৃদ্ধি, শিক্ষা, রুচি, কর্মব্যস্ততা ইত্যাদি
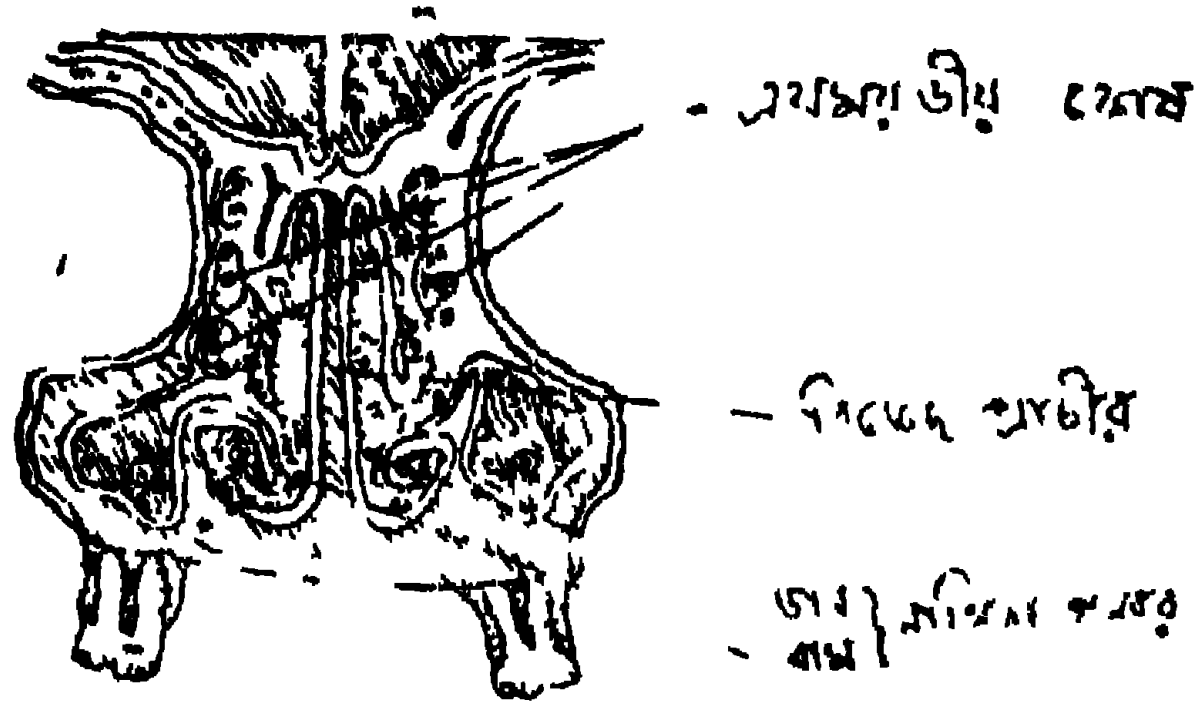
2নং চিত্র
মানুষের নাক সোজাসুজি কাটা হয়েছে।

প্রায়শঃই এই স্মৃতিকে মুছে দেয়। পশুদের ক্ষেত্রে এই গন্ধস্মৃতি অত্যন্ত সক্রিয়। কোন ব্যক্তি বা বস্তুর কোন বিশেষ গন্ধ কুকুরের স্মৃতিতে চিরকাল উজ্জল হয়ে থাকে। তাই বেশ কয়েক বার হাত বদলের পরেও প্রাক্তন প্রভুকে চিনতে তার কষ্ট হয় না। কোন ব্যক্তির ব্যবহৃত জিনিষের গন্ধ শুঁকে বহু লোকের মধ্যে থেকেও নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে খুঁজে বের করে অনায়াসে। পুলিশ-কুকুরের সাহায্যে অপরাধী খুঁজে বের করবার কথা কারও অজানা নয়। আশ্চর্যের বিষয়, একই ব্যক্তির দেহে বিভিন্ন সময়ে নানা ধরণের গন্ধ সৃষ্টি হতে পারে। আবার একই ব্যক্তির দেহে একই সময়ে বিভিন্ন অংশের গন্ধও এক নয়। সে ক্ষেত্রে কুকুর যে কিভাবে কোন একটি অংশের গন্ধের সূত্র ধরে মানুষটিকে চিনে বের করে, বিজ্ঞানীদের তা আজও অজানা। তবে কি প্রতিটি ব্যক্তির নিজস্ব একটি গন্ধ আছে, যা একেবারে স্বতন্ত্র ও মৌলিক? যদি তা থাকে, তবে এরই সঙ্গে আরও একটি সত্য বেরিয়ে আসবে—মানুষে মানুষে দেহগন্ধের মিল নেই। বিজ্ঞানী হান্স ক্যালমাস

বলেছেন—ছুটি মানুষের দেহের গন্ধ একেবারে আলাদা। তিনি পরীক্ষা করে দেখেছেন—হুবহু এক রকমের ছুটি যমজ শিশুর ক্ষেত্রেই কেবল দেহগন্ধের মিল দেখা যায়। তিনি অবশ্য কুকুরের পরীক্ষা দিয়েই তা প্রমাণ করেছেন। এই তথ্য যদি সত্য বলে বিজ্ঞান কোনদিন মেনে নেয়, তবে হাতের ছাপ ইত্যাদির মত অপরাধীর গায়ের গন্ধও রেকর্ড করে রাখা হবে, যাতে অপরাধীকে সহজে ধরা যায়। মহাভারতের কাহিনীতে দেখা যায়—দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীমসেন তীব্র রকমের গন্ধ-সচেতন ছিলেন। পাণ্ডবদের পুড়িয়ে মারবার জন্যে ছুর্যোধন যে জতুগৃহ তৈরি করেছিলেন, ভীমসেন গন্ধ শুঁকেই নাকি তার মধ্যে বিপদের সঙ্কেত পেয়ে যান এবং সপরিবারে পালিয়ে আত্মরক্ষা করেন।

গন্ধ আমাদের স্বাভাবিক শান্ত জীবনে হঠাৎ কখনো উৎসাহ-উত্তেজনা, কখনো বা ক্লান্তি-অবসাদ এনে দিতে পারে। সুগন্ধি যেমন মনকে প্রফুল্ল রাখে, ঠিক তেমনি কুৎসিত বা ছুর্গন্ধ মনকে বিষাদ ও বিরক্তিতে ভরে দেয়। আবার কোন বিশেষ গন্ধানুভূতি শান্ত ও ধীর মস্তিষ্ককে হঠাৎ উত্তেজিত করে তুলতে পারে অতি সহজে। মানুষের ক্ষেত্রে এই প্রভাব ততটা কার্যকর হয় না রুচিবোধ, শিক্ষা, সংযম ইত্যাদির জন্যে। কিন্তু পশুদের ক্ষেত্রে এটি যথেষ্ট প্রকট হয়ে দেখা দেয়। প্রজননের সময় স্ত্রী-পশুরা তাদের যৌনাঙ্গ থেকে এক ধরণের গন্ধ বের করে। গন্ধটি অন্য প্রজাতির উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। কিন্তু নিজ প্রজাতির পুরুষ পশুরা ঐ বিশেষ গন্ধে যৌন উত্তেজনা বোধ করে। শরীরের এই পরিবর্তন সাধনে গন্ধ এখানে হর্মোনের কাজ করে। এক্ষেত্রে তাই গন্ধকে বায়ুবাহী হর্মোন বলা চলে।

উপদান ও রাসায়নিক গঠনের পার্থক্যের জন্যে বিভিন্ন পদার্থের গন্ধ বিভিন্ন হয়ে থাকে। রসায়নের ভাষায় যাদের Isomer বলে, অর্থাৎ যে সব পদার্থের অণুগুলি সমসংখ্যক সমজাতীয় পরমাণু দিয়ে গঠিত হলেও পরমাণুগুলির পারস্পরিক সংযোগ বা সংস্থান এক নয়, তাদের ক্ষেত্রে অন্যান্য ধর্মের মত গন্ধ ও স্বাদে বৈচিত্র্য দেখা যায়; যেমন অ্যামোনিয়াম সায়ানেট (NH_4CNO) এবং ইউরিয়া [$CO(NH_2)_2$]। ছুটি পদার্থের গন্ধ সম্পূর্ণ আলাদা।

একসময় মনে করা হতো, গন্ধবাহী বস্তুকণা কিংবা অদৃশ্য গন্ধরশ্মিই বুঝি এই অনুভূতির কারণ। কিন্তু ইদানীং কালের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় এই তত্ত্বগুলি অসার প্রমাণিত হয়েছে। গন্ধবিশিষ্ট কোন উদ্বায়ী পদার্থের সূক্ষ্ম অণু বাতাসে বাহিত হয়ে বা ব্যাপনক্রিয়ায় (Diffusion) পদার্থতল থেকে বেরিয়ে যখন নাকের মধ্যে ঘ্রাণবাহী কোষগুলিকে স্পর্শ করে, তখন ঘ্রাণবাহী স্নায়ুর সাহায্যে বার্তা পৌঁছয় মস্তিষ্কের Cortex-এ। মস্তিষ্ক এই গন্ধগুলির বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করে। মস্তিষ্কের উপলব্ধি অনুসারেই গন্ধটিকে ভাল বা খারাপ লাগে।

বিজ্ঞানী লর্ড অ্যাড্রিয়ানের মতে, এই গন্ধগ্রাহী কোষগুলি কয়েক ডজন শ্রেণীতে বিভক্ত। এক-একটি শ্রেণী এক এক ধরণের গন্ধের জন্যে উপযোগী। কোন শ্রেণীর অন্তর্গত প্রত্যেকটি সদস্য তাদের জন্যে নির্ধারিত গন্ধবিশিষ্ট অণুর আগমনবার্তা পৌঁছে দেয় মস্তিষ্কে। তাদের পাঠানো খবর থেকেই মস্তিষ্ক গন্ধটিকে অনুভব করে। পৃথিবীতে গন্ধ অসংখ্য রকমের। আর তাদের জন্যে সক্রিয় রয়েছে গন্ধগ্রাহী অসংখ্য কোষশ্রেণী। এরকম কোষের সংখ্যা এখন নির্ণয় করা গেছে। দুই নাকের ভিতর দিকের দেয়ালে রয়েছে মোট দশ লক্ষ কোষ [3নং চিত্র]।

একই গন্ধ অনেক শুঁকলে ঐ গন্ধের অনুভূতি ক্রমশঃ কমে আসে। এ রহস্যটিও চিত্তাকর্ষক। আসলে ঐ বিশেষ গন্ধটির জন্যে যে গন্ধবাহী কোষগুলি কাজ করে। অনেকক্ষণ একটানা পরিশ্রমে তারা ক্লান্ত হয়ে পড়ে, ঠিক যেমন একটানা পরিশ্রমে আমরাও ক্লান্তি বোধ করি। ঐ ক্লান্ত কোষগুলি তখন আর মস্তিষ্কে খবর পাঠাতে পারে না। ফলে বার্তা সরবরাহের অভাবে আমাদের ঘ্রাণশক্তি ঐ বিশেষ গন্ধটির ক্ষেত্রে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে অথচ তখন অন্য গন্ধ দিব্যি অনুভব করা যায়। আমরা সবাই সব গন্ধ অনুভব করতে পারি না। কোন বিশেষ গন্ধ অনুভবের জন্যে যে কোষশ্রেণী আছে, তাদের অক্ষমতার ফলেই এরকম হয়ে থাকে। পশুদের ক্ষেত্রেও এর মিল আছে। গরু, মোষ প্রভৃতি
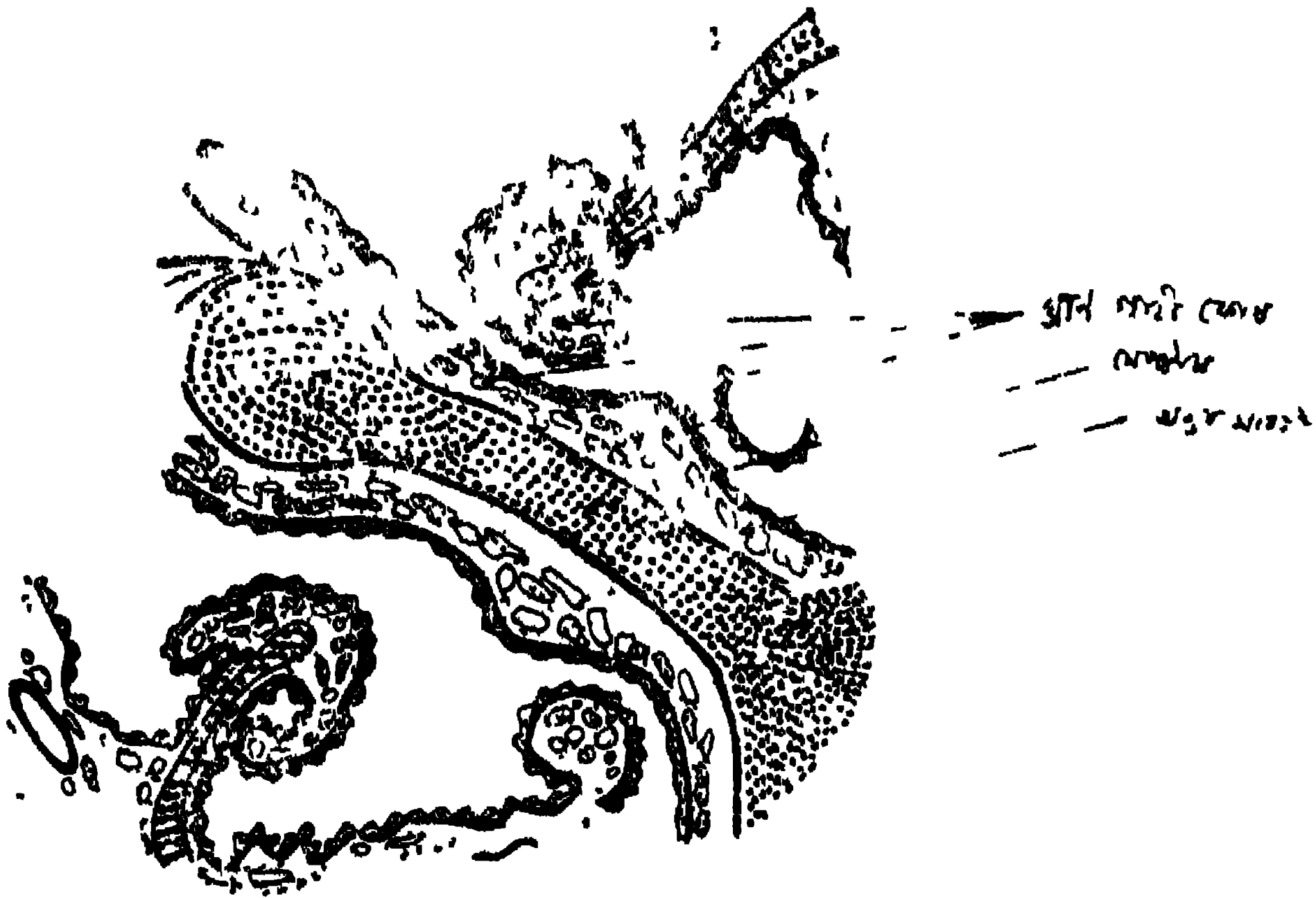
3নং চিত্র
নাকের ভিতরের অংশ—তির্যকচ্ছেদ।

পশু ঘাস, পাতা ইত্যাদি ছাড়া অন্য কোন গন্ধ বিশেষ বুঝতে পারে না। সর্দি বা নাকের অন্য রোগে ঘ্রাণশক্তি সাময়িক বা স্থায়ীভাবে নষ্ট হয়ে যায়। নস্য ব্যবহার, ধূমপান ইত্যাদিও ঘ্রাণশক্তিকে অনেকাংশে নষ্ট করে দেয়।

গন্ধগ্রাহী কোষগুলি এবং মস্তিষ্কের মধ্যে পারস্পরিক যে সম্বন্ধ, তার সঙ্গে তুলনা চলে কোন শহরের টেলিফোন এক্সচেঞ্জের। গ্রাহকদের সঙ্গে এক্সচেঞ্জের যেমন সংযোগ থাকে, এক্ষেত্রেও ঠিক তাই। ঘ্রাণগ্রাহী কোষগুলি ঘ্রাণবাহী স্নায়ুর সাহায্যে সংযুক্ত রয়েছে মস্তিষ্কের সঙ্গে। অন্তর্মুখী স্নায়ু খবর পৌঁছে দেয় মস্তিষ্কের Cortex-এ। সেখানে চলে গন্ধ-বিশ্লেষণ। মস্তিষ্কের অনুভূতি বহির্মুখী স্নায়ুর সাহায্যে পৌঁছে যায় দেহের বিভিন্ন অংশে। কোন সুগন্ধ আরও বেশী করে উপভোগ করবার জন্যে মস্তিষ্কের হুকুমে আমরা জোরে জোরে শ্বাস টানি, নিঃশ্বাসের সঙ্গে উদ্বায়ী গন্ধ-অণুকে নাকের মধ্যে এনে গন্ধগ্রাহী কোষগুলির সঙ্গে সংযোগ ঘটিয়ে দিই আবার বিরক্তিকর গন্ধ থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্যে মস্তিষ্কের আদেশেই নাক বন্ধ করি বা রুমাল চাপা দিই। কাজেই একথা নির্বিবাদে বলা যায়, নাক দিয়ে গন্ধ শুঁকলেও গন্ধটি আসলে পায় মস্তিষ্ক।

অলোক সেন

জেনে রাখ

আমেরিকায় আদি বসবাসকারী ইংরেজরা সর্বপ্রথম যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর পূর্ব কোণে যে জায়গায় বসতি স্থাপন করেছিল, সেই জায়গাটা এখন নিউ ইংল্যাণ্ড নামে পরিচিত। সে স্থানে খাদ্যাভাব দেখা দিলে সেখানকার আদিম অধিবাসী রেড ইণ্ডিয়ানরা তাদেরকে ক্লাম নামক প্রচুর সেল-

ফিসের সন্ধান বলে দেয় এবং সেগুলিকে চৌকা গর্তের মধ্যে রেখে তার চতুর্দিকে উত্তপ্ত প্রস্তরখণ্ড সাজিয়ে কেমন করে সেগুলিকে খাদ্যোপযোগী করা যায়, তাও দেখিয়ে দেয়। ক্লাম পুড়িয়ে খাওয়া এখন একটা প্রচলিত রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং নিউ ইংল্যাণ্ডে প্রত্যেক বছর জুন থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ক্লামকে ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

তিনটি গাছ

বারো বছর বয়স পর্যন্ত শহরের প্রভাবের বাইরে একেবারে প্রকৃতির নিজের রাজ্যে কাটিয়েছিলাম। তাকে তখন এড়িয়ে যাবার জো ছিল না। সে তার হাড়-কাঁপানো শীত, তার মন-ভোলানো বসন্ত আর গ্রীষ্ম, তার আশ্চর্য বর্ষা আর ফল-পাকানো শরৎ-হেমন্তের কুয়াশা, ফুলের বাহার, মেঘ, রামধনু, ছোট ছোট বন্যার সঙ্গে মৌমাছি, গুটিপোকা, প্রজাপতি, পাখী, জোঁক, সাপ, শোঁয়াপোকা, চামচিকা, বাদুড়, শেয়াল, খ্যাঁকশেয়াল নিয়ে আমাদের চারদিকের দৃশ্যমান আর অদৃশ্য জগতে এমন ভিড় করতো যে, তার মধ্যে নিজেদের পা রাখবার জায়গা খুঁজে বের করাও মাঝে মাঝে মুস্কিলের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াতো। কেবলি মনে হতো এটা ওদেরি জায়গা, আমাদের একটু দেখেশুনে চলতে হবে।

যেই না এই কথা মনে হওয়া, অমনি দেখলাম আমরাও দিব্যি ওদের রাজ্যে জায়গা পেয়ে গেছি। তার উপর বড়রা কেবলি সাবধান করে দিতেন—ঠ্যাং নেই, লম্বা গড়নের—ওগুলি সাপ, কামড়ালেই মানুষ মরে যায়, কাছে যাস নি। মেটে রঙের ছুটো শিং-ওয়ালা, পিঠে শামুক, যেখানে যায় চটচটে দাগ টেনে যায়—ওকেও এড়িয়ে চলিস। আর খবরদার ব্যাঙের ছাতার ধারেকাছেও যাবি না। বিলেতে প্রতি বছর বহু লোক নাকি ব্যাঙের ছাতা খেয়ে মরে যায়, তাছাড়া ওতে হাত দিলেও হাতে ঘা হয়। এই সব সাবধানী কথা কানে নিয়ে প্রকৃতির রাজ্যের ঠিক মাঝখানে আমরা বাস করতাম।

গাছপালাগুলি ছিল আমাদের বন্ধু—যেমন তাদের স্নিগ্ধ ছায়া, তেমনি মিষ্টি তাদের ফল, আর সবচেয়ে মনোহর তাদের ডালপালার রহস্য। কত পাখীর বাসা, কত অদ্ভুত কোটর, কত আশ্চর্য পোকার গুটি, কত সুগন্ধি আঠার টুপ্‌লি। একবার গাছে চড়লে আর নামতে ইচ্ছা করতো না।

সবচেয়ে অন্তরঙ্গ ছিল আমাদের বাড়ীর হাতার মধ্যে তিনটি বড় বড় ন্যাসপাতি গাছ। সেগুলিকে সারা বছর ধরে দেখে দেখে আমাদের আশ মিটতো না। কলকাতা থেকে মাসী গেলেন, তাঁকে ফলের বাহার দেখিয়ে বললাম—কলকাতায় নাকি তোমরা পয়সা দিয়ে এসব ফল কেন, তাও অনেক ছোট, অনেক শুকনো, অনেক কম মিষ্টি? মাসী নাক সিঁটকে বললেন—দূর্. এগুলিকে আবার ন্যাসপাতি বলে নাকি, এই ঢাউস বড়, কামড়ালেই রস গড়ায়, জামায় লাগলে তার দাগ ওঠে না, চিবুতে ক্যাচ-ক্যাচ করে। আসল ন্যাসপাতি দেখতে চাস, কলকাতার মার্কেটে যাস। কেমন ছোট,

হলদে, লম্বাটে গড়ন, পাকলে নরম তুলতুল করে। এগুলি আমাকে দিলেও খাবো না। তাঁর দেখাদেখি তাঁর মেয়েও বললো—ছ্যা-ছ্যা-ছ্যা, দিলেও খাব না। আমরা এমনি অবাক হয়ে গেলাম যে, ভাল করে কোন উত্তর দিতেও পারি নি। তবে সত্যিই যে খেতেন না, তাও নয়। প্রত্যেক বছর ঐ গাছে ফল হতো, কখনো বাদ যেত না। কিন্তু পঞ্চাশ বছর পরেও আজ পর্যন্ত ঐ তিনটি ন্যাসপাতি গাছ আমার মনের মাটিতে তেমনি উজ্জ্বল সরস চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এই লেখা তাদেরি বিষয়ে।

যতদূর মনে হয়, গাছগুলির গা খুব মোলায়েম ছিল না। ওখানকার উচ্চতা ছিল পাঁচ হাজার ফুটেরও বেশী, শীতকালে এত ঠাণ্ডা হতো যে, ছোট ছোট ঢেউশুদ্ধ অনেক নদী-নালা জমে যেত। শুধু যেগুলির স্রোত বেশী, সেগুলি জমতো না। কন্‌কনে ঠাণ্ডা একটা হাওয়া বইতো। বেজায় কষ্ট হতো। কষ্টটা শুধু শরীরের ছিল না, গাছগুলির অবস্থা ভেবে মনেও বড় কষ্ট হতো। মাছগুলি বরং অনেক বেশী আরামে থাকতো। নদী-নালা ছোট ছোট পুকুরের উপরে হয়তো জল জমে এক পরত বরফ হয়ে থাকতো, তার নীচে দিব্যি বরফের ছাদের তলায় মাছেরা আনন্দে সাঁতার কেটে বেড়াতো—একথা আমাদের পাহাড়ী ধাই-মা'রা প্রায়ই আমাদের বলতো।

ন্যাসপাতি গাছগুলির কথা আর কি বলবো! শীতের হাওয়া লাগতেই তাদের পাতাগুলি প্রথমে ফিকে সবুজ, তারপর হলুদ, তারপর পাটকিলে, লালচে, কোন কোন গাছে কুচকুচে কালো হয়ে গিয়ে ঝরে পড়তো। গাছের তলায় শুকনো পাতা-গুলি স্তূপাকার হয়ে থাকতো। এমন একটা সোঁদা গন্ধ বেরুত যে, স্পষ্টই বোঝা যেত ওরা সব মরে গেছে।

শুকনো ঘূর্ণী হাওয়ায় মরা পাতাগুলি বাগানের ঘাস-জমিতে উড়ে উড়ে বেড়াতো, চারদিক নোংরা দেখাতো। মালি সেগুলিকে লম্বা বাঁশের হাতল লাগানো কাঁটা দিয়ে আঁচড়ে আঁচড়ে এখানে-ওখানে—যেখানে হাওয়া লাগতো না, এমন জায়গায় জড়ো করতো। তারপর সবগুলিকে একসঙ্গে করে বাড়ী থেকে একটু দূরে প্রকাণ্ড এক ঢিপি বানাতো। সন্ধ্যার আগে তাতে আগুন লাগানো হতো। দেখতে দেখতে সে আগুন উঁচু হয়ে জ্বলে উঠতো। মালি আর অন্য চাকরেরা বালতি করে জল, গাছের ডাল ইত্যাদি নিয়ে তৈরি থাকতো, যাতে আগুন ছড়িয়ে না পড়ে আর আমরা আগুনের যতটা কাছে যাওয়া সম্ভব, ততটা এগিয়ে তাকে ঘিরে থাকতাম। কান ভরে যেত আগুনের গানে। সে গান কাঠ-ফাটা আগুনের আওয়াজ দিয়ে তৈরি নয়, চাপা একটা গন-গন সুর। এখনো সে আমার কানে লেগে আছে। আর কি সুন্দর গন্ধ। পাকা ফল, শুকনো খড় কিম্বা ঝিঁঝি একটু কস্তুরির গন্ধ নাকে এলো—সে গন্ধের কথা মনে পড়ে।

যখন সারা মুখ আর শরীরের সামনের দিকটা তেতে আগুন হয়ে যেত, তখন সরে দাঁড়াতে বাধ্য হতাম। সকলের মুখ লাল, চোখ চকচকে। তারপর সব পাতা পুড়ে ছাই

হয়ে যেত, আগুনের হল্‌কা নেমে যেত, তবু অনেকক্ষণ পর্যন্ত ছাইগুলির মধ্যে লাল্‌চে রং দেখা যেত। রাত বাড়লে আমাদেরও ঘরে যেতে হতো। সামনেটা গরম, পিঠটা ঠাণ্ডা, সারা গায়ে পোড়া পাতার মিষ্টি গন্ধ নিয়ে যখন খেতে বসতাম, মনটা যেন কেমন করতো।

আস্তে আস্তে ন্যাসপাতির ডাল একেবারে ন্যাড়া হয়ে যেত। নীল আকাশের গায়ে হাত-পা মেলে কত দিন গাছগুলি কেমন যেন একটা বেপরোয়া ভাব নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতো। শীত এগুতে থাকতো। ন্যাসপাতি গাছ তাদের এবড়ো-খেবড়ো ছালে ঢাকা গুঁড়ি আর ডালপালা নিয়ে শীতের শেষের জন্যে অপেক্ষা করে থাকতো। ডিসেম্বর কাটতো, জানুয়ারী কাটতো, ফেব্রুয়ারীতে খুব নজর করে দেখলে মনে হতো—খোঁচা খোঁচা ডালপালার খাঁজে খাঁজে আর ডগায় যেন খোঁচার বদলে একটুখানি গোলভাব দেখা যাচ্ছে। ফেব্রুয়ারীর শেষে আর কোন সন্দেহই থাকতো না। ডালপালা আর গাছের গুঁড়িকে কালো দেখাতো, কিন্তু খাঁজের মধ্যে আর ডালের আগায় যেন লাল্‌চে আভা। আরো কিছুদিন কাটতো। মার্চের গোড়ায় আমাদের লম্বা শীতের ছুটি ফুরিয়ে যেত। রোজ ঘুম থেকে উঠে একবার করে গাছের তলায় গিয়ে দাঁড়াতাম। এখন আর চিনতে ভুল হতো না। ছোট ছোট ডালের আগায় গোছা গোছা কুঁড়ি দেখা দিচ্ছে। প্রথমে ইটের মত শক্ত, ছোট ছোট গুটি যেন। কিন্তু ক্রমে যখন চারদিকে বসন্তকাল সাড়া দিত, শুক্‌নো ঘাসে সবুজ দেখা যেত, তার মধ্যে সাদা, গোলাপী ক্রোকাস ফুল ফুটতো, তখন কুঁড়িগুলিও যেন আগ্রহে অধীর হয়ে উঠতো।

হয়তো মার্চের শেষে কিম্বা এপ্রিলের গোড়ায় হঠাৎ একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখতাম, রাতারাতি ন্যাসপাতি গাছের ন্যাড়া ডাল সাদা ফুলের থোপায় ঢেকে গেছে। তখন ফুল ছাড়া আর কিছু চোখে পড়তো না। সে ফুলের তুলনা হয় না, ভাষায় তার বর্ণনা দেওয়া যায় না, মনের সম্পদ হয়ে থাকে সে। তার মৃদু গন্ধ গাছতলায় না গেলে টের পাওয়া যায় না। কয়েক সপ্তাহ ধরে ফুটে ফুটে সব ফুল যখন ঝরে পড়ে যেত, তখনো মন খারাপ করবার অবকাশ থাকতো না। দেখতাম ক্ষুদে ক্ষুদে গুটির মত ছোট্ট ছোট্ট ফল। মাথার উপরে অনেক উঁচুতে। কেউ যদি বা সাহস করে গাছে উঠে টিপে দেখতো, বলতো—উঃ, পাথরের মত শক্ত। আরো সাহস করে যদি কামড়ে দেখতো, বলতো বেজায় কষা।

অবশ্য দুঃখ করবার কিছু থাকতো না। কারণ এই সময় আরেকটা জিনিষ লক্ষ্য করতাম। গাছে আরো অনেক কুঁড়ি দেখা দিচ্ছে, ছোট ছোট ডালের খাঁজ থেকে একটু লম্বাটে গড়নের থাক থাক দাগকাটা কুঁড়ি। দেখতে দেখতে সেগুলিও খুলে যেত। দেখতাম হাজার হাজার কোমল কচি পাতা। চোখের সামনে পাতাগুলি বড় হয়ে সমস্ত কচি ফলকে আড়াল করে ফেলতো। তখন গাছটার আরেক রকম বাহার হতো।

কিন্তু অনেক দিন ধরে যেন আর কোন পরিবর্তন চোখে পড়তো না। খুব ভাল করে নজর করলে অবশ্য চোখে পড়তো ক্ষুদে ফলগুলি কেমন বাড়ছে। অনেকগুলি ছোট অবস্থায় খসে গিয়ে গাছতলায় পড়ে থাকতো। গাছের মাথার উপর দিয়ে গ্রীষ্ম কাটতো, বর্ষা কাটতো। আর সে কি প্রবল বর্ষা! কিন্তু পাতার ছাতার নীচে আমাদের হ্যাসপাতি ফলগুলি নিরাপদেই থাকতো।

তারপর বর্ষাও শেষ হয়ে যেত। গাছ যেন মাথা ঝাড়া দিয়ে আরো সবুজ, আরো সতেজ হয়ে উঠতো। তখন আমরা খেয়াল করতাম গাছের ডালপালাগুলি কত নীচে নেমে এসেছে। তাকেই বলে ফলের ভারে নুইয়ে পড়া। শরৎকালের ফল দেখতে বেশ বড়, লোভনীয়ও বটে। কিন্তু তাকে বাদুড়েও খেত না, পাখীতেও ঠোক্‌রাতো না। শরতের শেষে ফলে হল্‌দে রং ধরতো, সুগন্ধে চারদিক ম'-ম' করতো। রাতে বাদুড়েরা মহা ঝগড়াঝাটি করতো, দিনে পাখীরা ঝাঁক বেঁধে আসতো। আমরা তাদের সঙ্গে ভাগাভাগি করে ফল খেতাম। পাখীতে ঠোক্‌রানো, বাদুড়ে আঁচড়ানো ফলগুলিই সবচেয়ে মিষ্টি লাগতো। একটুও ঘেন্না হতো না। জখম হওয়া জায়গাটুকু কেটে ফেলে দিতাম।

মাঝে মাঝে রাতে ধুপ্‌ করে শব্দ হতো। বুঝতাম বড় একটা ফল পেকে পড়ে গেল। সকালে অমনি ছুটাছুটি। পৃথিবীতে এত আনন্দ কম জিনিষেই পাওয়া যায়।

লীলা মজুমদার

জেনে রাখ

শেষ বরফযুগের সুরু হয়েছিল প্রায় 50,000 বছর পূর্বে। এই বরফস্তর উত্তর আমেরিকার প্রায় 27,820,000 বর্গ কিলোমিটার জায়গা ঢেকে ফেলেছিল। উইসকনসিনও সেই সময় বরফ-স্তূপের নীচে চাপা পড়েছিল। আজ সেখানে একটি সংগ্রহশালা স্থাপিত হয়েছে। সেখানে হাজার হাজার বছর পূর্বেকার সেই হিমযুগের হিমবাহ কর্তৃক স্বাভাবিক কারণেই সৃষ্ট নানাপ্রকার অদ্ভুত প্রস্তরসামগ্রী রক্ষিত আছে।

ছাপা সার্কিট

কাগজের উপর ছাপা অক্ষর তো তোমরা হামেশাই দেখেছ (এখনো তো দেখছো), আর ছাপা কাপড়ের সার্ট বা ছাপা শাড়ির সঙ্গে তোমাদের অনেকেরই নিশ্চয় ভাল রকম পরিচয় আছে। কিন্তু ছাপা সার্কিটের (Printed circuit) বিষয়টা হয়তো তোমাদের কাছে নতুন। ঐ সার্কিট সম্বন্ধে কিছুটা প্রাথমিক আলোচনা করবার জন্যে বর্তমান প্রবন্ধের অবতারণা।

প্রচলিত সার্কিট বনাম ছাপা সার্কিট

আধুনিক যুগে প্রগতির অন্যতম বাহক যে ইলেকট্রনিক্স, সেই ইলেকট্রনিক্সের ব্যাপক ও সূক্ষ্ম ব্যবহারে ছাপা সার্কিটের অবদান অনেকখানি। রেডিও, টেলিভিসন, কম্পিউটার প্রভৃতি ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতির ভিতর রোধক (Resistor), আবেশক (Inductor), ধারক (Capacitor), ভাল্‌ব বা ট্র্যানজিস্টর, পরিবর্তক (Transformer) প্রভৃতি বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের জন্যে ধাতব তারের ব্যবহার বহুকাল ধরে প্রচলিত রয়েছে। এই সব উপাদান এবং সংযোগকারী তার দিয়ে গড়ে ওঠে ইলেকট্রনিক সার্কিট, যার ভিতরের তড়িৎ-প্রবাহ ঈপ্সিতভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। ঐ সার্কিটে প্রত্যেকটি তারের প্রান্তকে আলাদা আলাদা ভাবে নির্দিষ্ট উপাদানের প্রান্তের সঙ্গে সযত্নে ঝালাই (Solder) করে লাগিয়ে দিতে হয়। যে কোন জটিল সার্কিটে বহুসংখ্যক তার ব্যবহার করতে হয় বলে সেই সার্কিট তৈরি করতে প্রচুর সময় ও পরিশ্রম ব্যয়িত হয় এবং যন্ত্রের মধ্যে ঐ সার্কিটের জন্যে জায়গাও লেগে যায় অনেকখানি। সবচেয়ে অসুবিধা হলো, এই ধরণের সার্কিট স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থায় প্রস্তুত করা সম্ভব নয়। এই সব অসুবিধা দূর করবার জন্যে ছাপা সার্কিটের উদ্ভাবন হয়েছে। ঐ সার্কিটে প্লাস্টিক বা সিরামিক জাতীয় অপরিবাহী পদার্থের একখানি বোর্ডের সমতল পৃষ্ঠের উপর প্রয়োজন অনুযায়ী পাত্‌লা ধাতব পাত মুদ্রিত করে সেই সব পাত দিয়ে বৈদ্যুতিক সংযোগের কাজ করানো হয়; অর্থাৎ পাতগুলি ধাতব তারের কাজ করে। এই পাত এক ইঞ্চির কয়েক শ' ভাগের এক ভাগ মাত্র পুরু হয়। প্রত্যেকটি পাতের প্রান্তে নির্দিষ্ট উপাদান জুড়ে দিয়ে ডোবানো ঝালাই (Dip soldering) প্রক্রিয়ায় সমস্ত ঝালাইয়ের কাজ একসঙ্গে করবার ব্যবস্থা থাকে। আবার অনেক ক্ষেত্রে রোধক, আবেশক, ধারক প্রভৃতি কয়েকটি উপাদান পৃথকভাবে সংগ্রহ না করে বোর্ডটির উপর নির্দিষ্ট স্থানে ঐ সব উপাদান তৈরি করা হয় উপযুক্ত কোন পদার্থের পাত্‌লা পাত বা অপরিবাহী বোর্ডের অংশবিশেষকে যথাযথ ভাবে ব্যবহার করে।

ছাপবার জন্যে যে সব পদ্ধতি প্রচলিত আছে, বোর্ডের উপর পাতলা পাত তৈরি করবার কাজে তাদের বেশ কয়েকটির সাহায্য নেওয়া হয়। ঐ বোর্ডটি দেখে মনে হয়, পাতগুলি যেন তার উপর মুদ্রিত করা হয়েছে। ছাপবার কাজে যেমন কাগজ
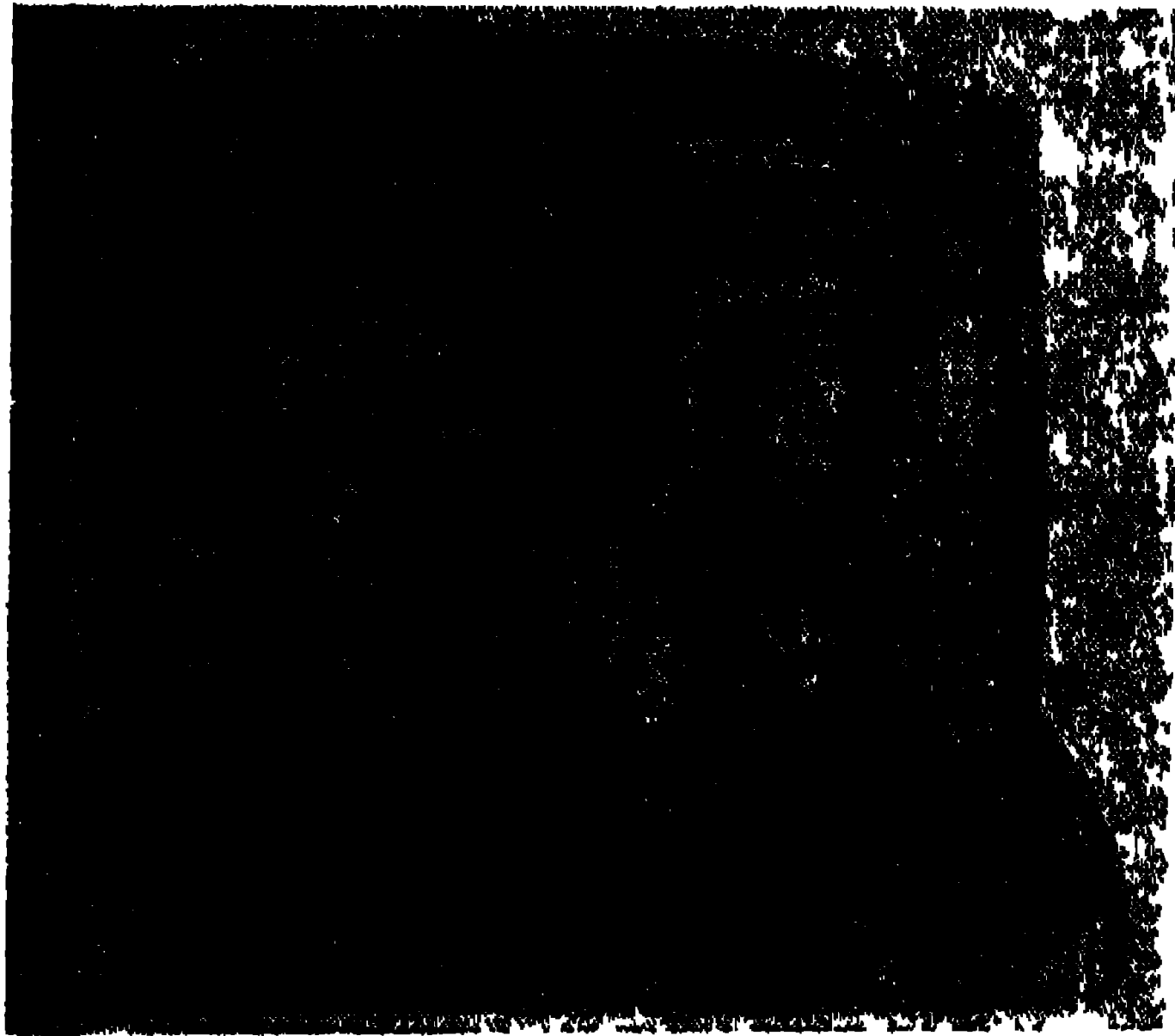
1 নং চিত্র—একটি ট্র্যানজিষ্টর রেডিওর ভিতরের ছাপা সার্কিট। উপরের চিত্রে ছাপা সার্কিটের ধাতব পাতগুলি এবং লাউড-স্পীকার দেখা যাচ্ছে। নীচের চিত্রে দেখা যাচ্ছে ছাপা সার্কিট বোর্ডের অপর পৃষ্ঠের সঙ্গে সংযুক্ত বিভিন্ন ইলেকট্রনিক উপাদান।

বা কাপড়ের উপর হুবহু একই নক্সা অনেকগুলি আঁকা যেতে পারে, এক্ষেত্রেও তেমনি বোর্ডের উপর পাতলা পাতের একেবারে একই ধাঁচে অনেকগুলি তৈরি করা সম্ভব হয়। এই সব কারণে পাতলা পাত সমেত বোর্ডকে ছাপা বোর্ড বলা যেতে পারে এবং ঐ

বোর্ড ব্যবহার করে যে ইলেকট্রনিক সার্কিট তৈরি হয়, তাকে বলা যেতে পারে ছাপা সার্কিট। তবে সাধারণতঃ ছাপা বোর্ডকেই ছাপা সার্কিট নামে অভিহিত করা হয়। 1 নং চিত্রে একটি ছাপা সার্কিটের নমুনা দেখানো হয়েছে।

ইতিবৃত্ত

ছাপা সার্কিট সম্পর্কে ধারণা খুব নতুন কিছু নয়। 1903 সালে বৃটেনে এই বিষয়ে একটি পেটেন্ট গৃহীত হয়। তারপর মাঝে মাঝে এ নিয়ে বেশ কিছুটা গবেষণা হয়েছে। তবে ছাপা সার্কিটের সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য ব্যবহার ঘটে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় মর্টারের
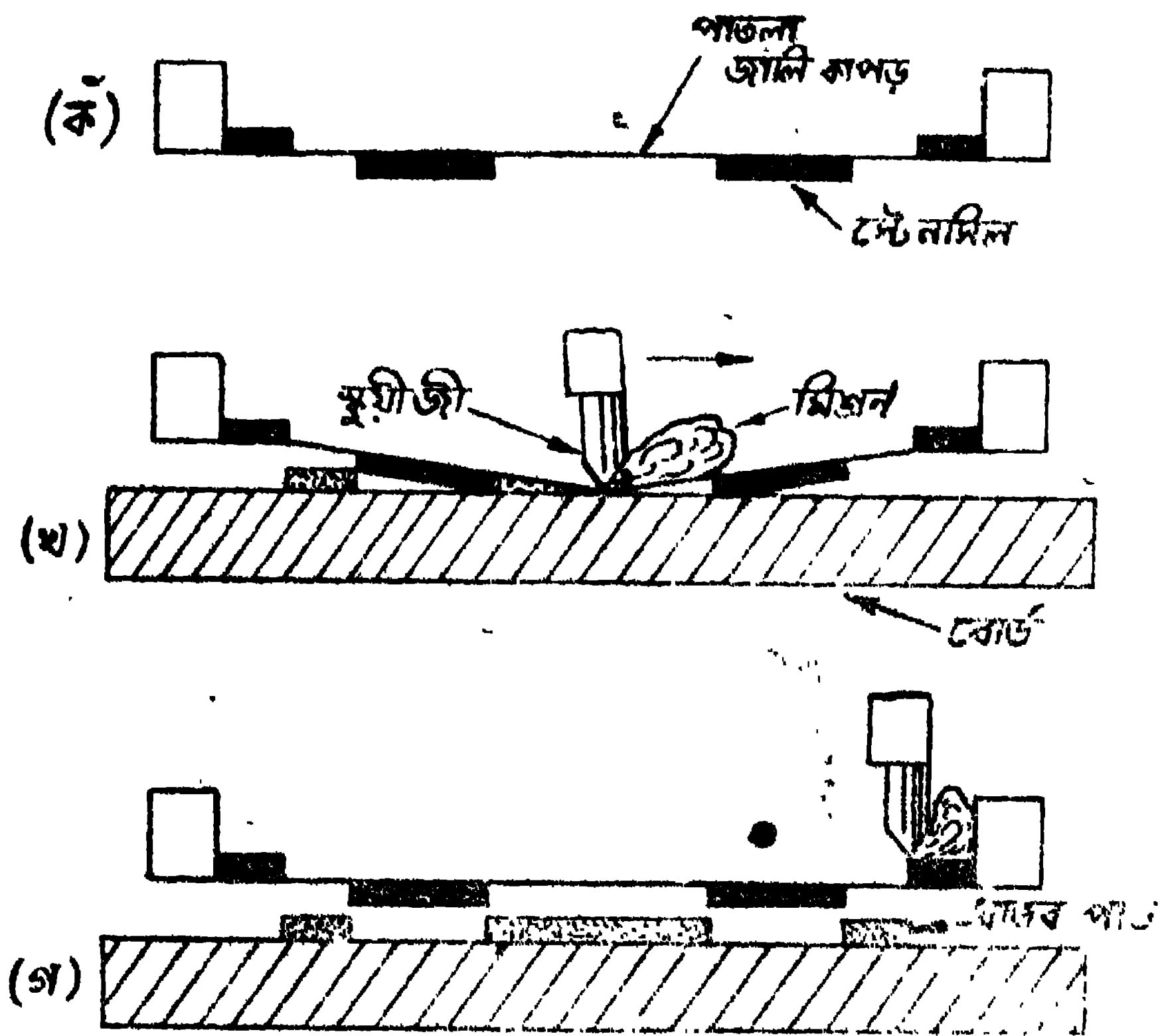
2 নং চিত্র—ছাপা সার্কিট গঠনের প্রথম পদ্ধতির বিভিন্ন পর্যায়।

গোলা বিস্ফোরণের ব্যাপারে। এই সময় আমেরিকায় নৈকট্য ফিউজ (Proximity fuse) নামে এমন একটি ইলেকট্রনিক যন্ত্রের বিষয় পরিকল্পনা করা হলো, যা মর্টারের গোলার অগ্রভাগে বসিয়ে দিলে লক্ষ্যবস্তু থেকে একটি নির্দিষ্ট দূরত্বে গোলাটি আপনা থেকেই বিস্ফোরিত হবে—এর আগে পর্যন্ত মর্টারের গোলা লক্ষ্যবস্তুতে গিয়ে আঘাত করলে তবে তা বিস্ফোরিত হতো। কিন্তু নৈকট্য ফিউজ তৈরি করবার সমস্যা হলো—মর্টারের গোলার অগ্রভাগের স্বল্পমাত্র স্থানে এটিকে ধরাতে হবে, একে যথেষ্ট মজবুত হতে হবে, যাতে মর্টারের গোলা ছোঁড়বার ধাক্কা সে সামলাতে পারে এবং এই ফিউজ তৈরি করবার পদ্ধতি এমন হতে হবে যে, বহুল ব্যবহারের জন্যে একই ধাঁচের যথেষ্ট সংখ্যক ফিউজ যাতে অল্প

সময়ের মধ্যে উৎপাদন করা সম্ভব হয়। এই সব সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান করা হয় নৈকট্য কিউজে ছাপা সার্কিট ব্যবহার করে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তী কালে ছাপা সার্কিটের বহুল প্রচলন হয়েছে। আমাদের দেশেও এই সার্কিট তৈরি হচ্ছে এবং ইলেকট্রনিক যন্ত্রাদিতে এর ব্যবহার ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে।

গঠন পদ্ধতি

ছাপা সার্কিট তৈরির জন্যে অপরিবাহী পদার্থের বোর্ডের উপর ধাতব পাত বসানোর যে তিনটি মূল পদ্ধতি আছে, সেগুলি এখন সংক্ষেপে বর্ণনা করছি।

প্রথম পদ্ধতিতে (2নং চিত্র) একটি পাতলা জালি কাপড়ের সঙ্গে ঈপ্সিত সার্কিটের নক্সা অনুযায়ী তৈরি স্টেন্সিল জোড়া থাকে এবং কাপড়টি টান করে বাঁধা থাকে একটি

(ক)

(খ)

(গ)

(ঘ)

প্লাস্টিক প্রতিরোধক কালি তামা
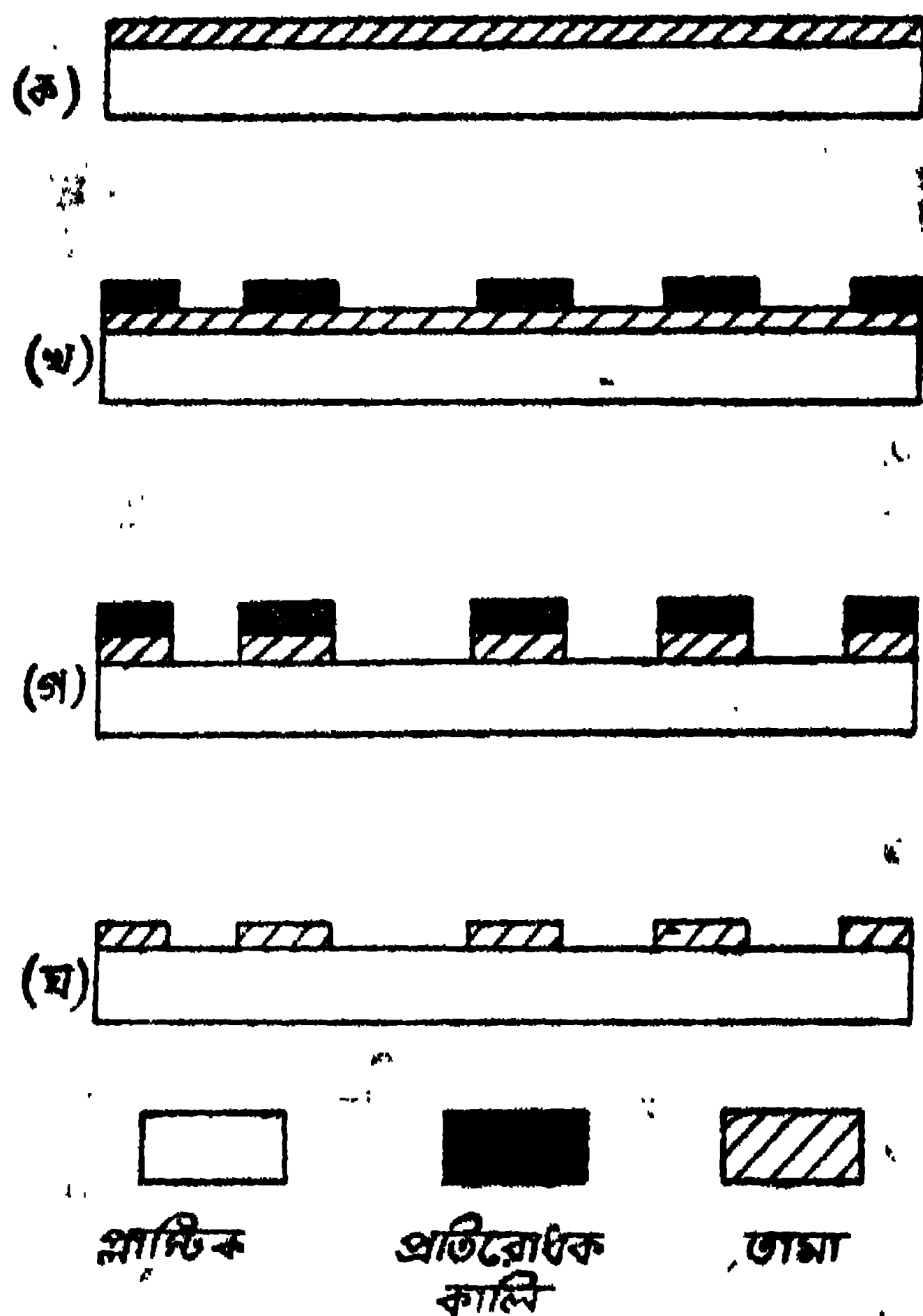
3 নং চিত্র—ছাপা সার্কিট গঠনের দ্বিতীয় পদ্ধতির বিভিন্ন পর্যায়।

কাঠামোর সঙ্গে। উপযুক্ত কোন ধাতব পদার্থকে গুঁড়া করে ধুনা-সদৃশ এক ধরণের দ্রব্যের সঙ্গে মেশানো হয় ও সেই মিশ্রণকে স্কুয়ীজী নামক তলায় রবার দেওয়া পেষকের সাহায্যে স্টেন্সিলের ফাঁকা স্থানগুলির মধ্য দিয়ে অপরিবাহী বোর্ডের তলদেশের উপর লাগিয়ে দেওয়া

হয়। ফলে অপরিবাহী তলদেশের উপর যে ধাতব পাতগুলি গড়ে ওঠে, সেগুলির বিন্যাস হয় ঈপ্সিত সার্কিটের নক্সা অনুযায়ী। নৈকট্য ফিউজের প্রস্তুতিতে এই পদ্ধতিটির সর্বপ্রথম প্রয়োগ হয়েছিল। স্টিয়েটাইট নামক সিরামিক পদার্থের বোর্ডের সমতল পৃষ্ঠের উপর রূপার পাত দিয়ে ঐ সার্কিট তৈরি করা হয়েছিল এবং সেই সার্কিটের রোধক ও ধারকগুলিও ছিল মুদ্রিত।

দ্বিতীয় পদ্ধতিতে (3 নং চিত্র) অপরিবাহী পদার্থের বোর্ডের একটি সম্পূর্ণ তলদেশের উপর ধাতব পদার্থের সূক্ষ্ম আস্তরণ দেওয়া হয়। ছাপবার জন্যে যে সব সুপরিচিত প্রক্রিয়া আছে, সেগুলির সাহায্যে একটি বিশেষ ধরণের প্রতিরোধক কালি (Ink resist) ঈপ্সিত নক্সা অনুযায়ী ধাতব আস্তরণের উপর মুদ্রিত করা হয়। অতঃপর রাসায়নিক পদার্থ দিয়ে তলদেশটি চাঁচা হলে ঐ কালির প্রতিরোধ ক্ষমতার ফলে তার নীচের ধাতব আস্তরণ অপরিবর্তিত থাকে, কিন্তু বাকী অংশের আস্তরণ উঠে যায়। এর পর কালিটুকু তুলে ফেললে ছাপা সার্কিট তৈরির কাজ সম্পূর্ণ হয়। বর্তমানে এই পদ্ধতিটিরই সবচেয়ে ব্যাপক ব্যবহার হচ্ছে। 1941 সালে ডক্টর পল আইজ্‌লার পদ্ধতিটির প্রবর্তন করেছিলেন।
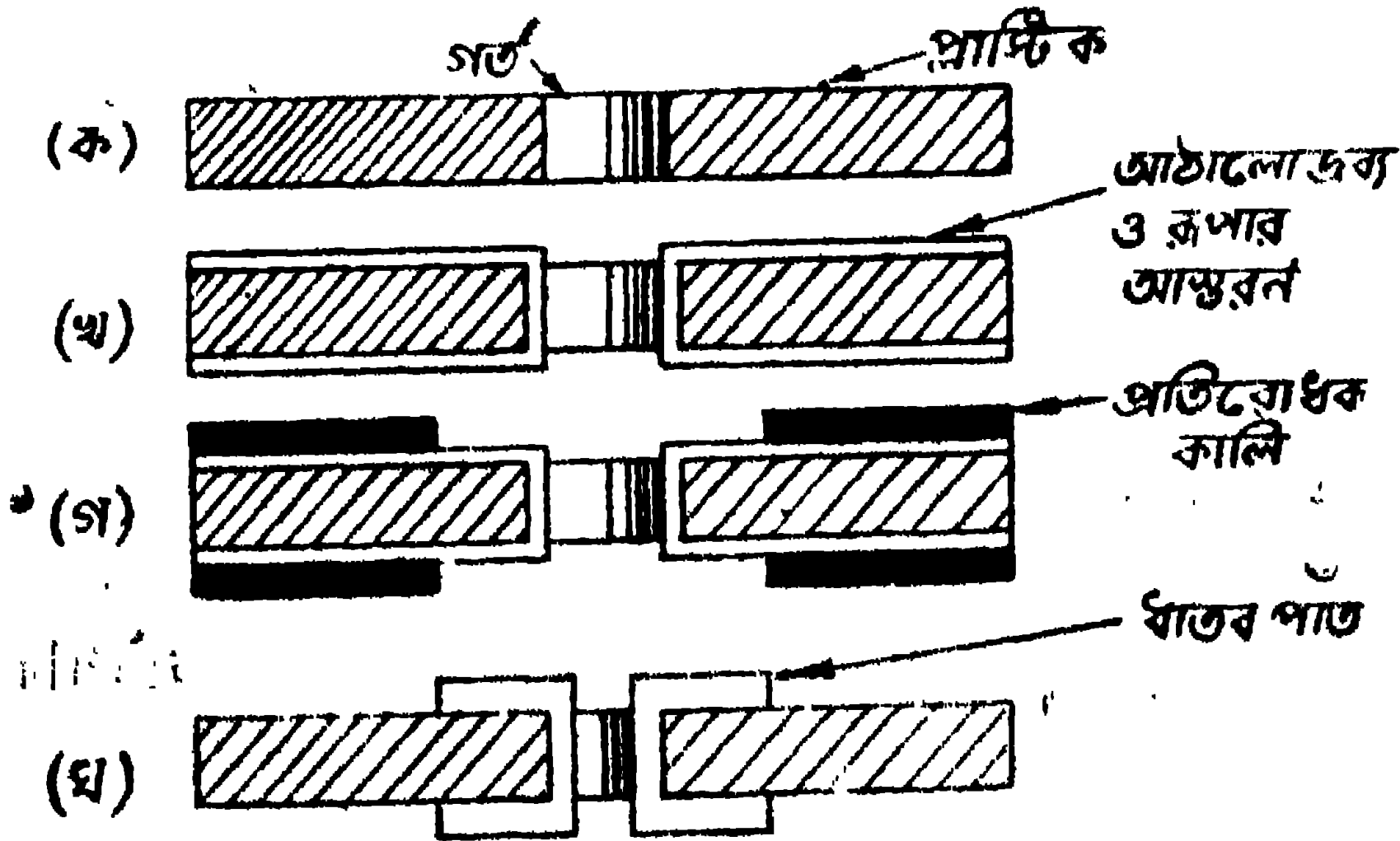
4 নং চিত্র—ছাপা সার্কিট গঠনের তৃতীয় পদ্ধতির বিভিন্ন পর্যায়।

তৃতীয় পদ্ধতিতে (4 নং চিত্র) তড়িৎপ্রলেপণের সাহায্য নেওয়া হয়। এই পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য হলো, বোর্ডের দু-পিঠের মধ্যে প্রয়োজনীয় বৈদ্যুতিক সংযোগ করবার জন্যে যে সব গর্ত করা হয়, তলদেশের উপর ধাতব পাত লাগাবার সঙ্গে সঙ্গে ঐ গর্তগুলির ভিতরও পাত দিয়ে মোড়া হয়ে যায় এবং বোর্ডের দু-পিঠেই সাধারণতঃ ধাতব পাত বসানো হয়ে থাকে। এই পদ্ধতিতে প্রথমে অপরিবাহী বোর্ডের উপর একটি আঠালো দ্রব্যের আস্তরণ দিয়ে তার উপর স্প্রে করে রূপার অতি সূক্ষ্ম (এক ইঞ্চির কয়েক লক্ষ ভাগের এক ভাগ) আবরণ দেওয়া হয়, যাতে তড়িৎপ্রলেপণের সময় ঐ রূপার মাধ্যমে তড়িৎ-প্রবাহ সঞ্চালিত

হতে পারে। অতঃপর ঈপ্সিত সার্কিটের ধাতব পাতগুলির নক্সার বিপরীতভাবে প্রতিরোধক কালি রূপার আবরণের উপর মুদ্রিত করা হয়, অর্থাৎ যেখানে যেখানে ধাতব পাত থাকবে, সেখানে কালি মুদ্রিত হয় না। এইবার তামা প্রলেপণের উপযোগী কোন দ্রবণে বোর্ডটিকে ডুবিয়ে ঐ বোর্ডকে ক্যাথোডের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়। গর্তগুলির অভ্যন্তরভাগ সমেত যে সব অংশে প্রতিরোধক কালি নেই, সেই অংশগুলিতে তড়িৎ-প্রবাহের ফলে তামা সঞ্চিত হয়ে ধাতব পাতের সৃষ্টি করে। এই পদ্ধতির শেষ পর্যায়ে রাসায়নিক পদার্থের সাহায্যে বা যান্ত্রিক উপায়ে কালি ও রূপার আবরণ তুলে ফেলা হয়।

ছাপা সার্কিট তৈরির পর তাতে রোধক, ধারক প্রভৃতি উপাদান সংযোগের জন্যে ডোবানো ঝালাইয়ের কথা আগেই বলেছি। এই ডোবানো ঝালাই ব্যাপারটা কি? এক্ষেত্রে প্রত্যেকটি সংযোগস্থলে আলাদা আলাদাভাবে ঝালাই করতে হয় না, উপাদান-গুলিকে বোর্ডের উপর যথাস্থানে বসিয়ে এবং বোর্ডটিতে প্রয়োজনীয় ফ্লাক্স লাগিয়ে সেটিকে গলিত ও উত্তপ্ত ঝালের (60 ভাগ টিন ও 40 ভাগ সীসা) মধ্যে নির্দিষ্ট সময় ডুবিয়ে রাখলে সব ঝালাইয়ের কাজই একসঙ্গে হয়ে যায়। পরে কোন উপযুক্ত দ্রবণের সাহায্যে বা অন্য কোন ভাবে অতিরিক্ত ফ্লাক্স সরিয়ে ফেললে উপাদান সমেত ছাপা সার্কিট তৈরির কাজ শেষ হয়।

উপসংহার

ছাপা সার্কিটের মাধ্যমে ইলেকট্রনিক্সে যে ক্ষুদ্রীকরণ ও স্বয়ংক্রিয়তার সূত্রপাত হয়, নানা ভাবে তা অনেকখানি এগিয়ে গেছে। এই প্রসঙ্গে সলিড স্টেট ইন্টিগ্রেটেড সার্কিটের উল্লেখ করা যেতে পারে। সিলিকন বা জার্মেনিয়াম নামক আধা-পরিবাহী পদার্থের একটি কেলাস ব্যবহার করে কয়েকটি প্রক্রিয়ায় তার বিভিন্ন অংশের ধর্মকে এমন ভাবে নিয়ন্ত্রিত করা হয় যে, ঐ একটি কেলাসই ট্রানজিষ্টর, রোধক, ধারক প্রভৃতি উপাদান ও সেগুলির সংযোগকারী ব্যবস্থা সমেত একটি সম্পূর্ণ সার্কিটের কাজ করতে পারে। সলিড স্টেট সার্কিট এত ক্ষুদ্র যে, এক ঘন ইঞ্চিতে যেখানে সাধারণ ট্রানজিস্টর সার্কিটের প্রায় 20টি উপাদান ধরতে পারে, সেখানে ঐ সার্কিটের উপাদান ধরে প্রায় 20,000। সলিড স্টেট সার্কিট ইলেকট্রনিক্সের ক্ষেত্রে একটি যুগান্তর সূচিত করছে বললে বোধহয় অত্যুক্তি হয় না।

জয়ন্ত বসু*

* সাহা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, কলিকাতা-9

হিম-কপোতের খোঁজে

দূরদেশের এক পাখীওয়ালা একবার আমাকে বলেছিল, হিমালয়ের চূড়া যেখানে মেঘ ফুঁড়ে উঠেছে, তার বরফ জড়ানো গা থেকে সে হিম-কপোতকে উড়ে আকাশে মিলিয়ে যেতে দেখেছে। সে পাখী কেউ জ্যান্ত ধরতে পারে না।

পাখীওয়ালার কথা রূপকথা বলেই ভাবতাম, যদি বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে পাখা দেখবার বাতিক আমাকে না পেয়ে বসতো। দেশ-বিদেশের পাখীর বইয়ের পাতা ওলটাতে ওলটাতে একদিন হিম-কপোত (Snow pigeon) নামটি চোখে পড়লো। বইতে পাখীটির ছবি ছিল না। শুধু লেখা ছিল—পাখীটির পালকের সবটাই প্রায় সাদা, হিমালয়ের তুষার অঞ্চলে তার বাস। এতটুকু বিবরণে আমি খুশী হতে পারি নি। হিমালয়ের আকর্ষণ আমার ছোটবেলা থেকেই। পাখীটির জন্যে সে আকর্ষণ আরো বেড়ে গেল।

হিমালয়ে বরফ-সীমার সুরু সাধারণতঃ চৌদ্দ হাজার ফুট থেকে, সে খবর নিয়ে নিলাম। আর বরফের কাছাকাছি সহজে পৌঁছুবার উপায়—তীর্থযাত্রীদের পথ ধরে

হিম-কপোত

হিমালয়ের তীর্থের যে কোনটাতে পৌঁছে যাওয়া। বরফ যখন তীর্থের কাছাকাছি, হিম-কপোতের দেখা সেখানে পেলেও পেতে পারি। হৃষীকেশ থেকে গঙ্গার ধার ধরে আমাদের বাস চললো ঘন বনের ভিতর দিয়ে। তখন শ্রাবণের শেষাশেষি, তের-শ' পচাত্তর সাল।

হিমালয়ে উঠতে গেলে সুরুতে এমন বনের দেখা মিলবে সবখানে। তরাই বনের নাম শুনেছ সবাই। শাল, শিশু, শিরীষ, কাঞ্চন গাছগুলি দেখেই চিনলাম। উচু গাছগুলির তলায় বেত আর ল্যাপ্‌টানার ঝোপ, মাঝে মাঝে দু-একটি খেজুর গাছ মাথা তুলে আছে। এমনটি চললো হাজার তিনেক ফুট পর্যন্ত।

কিছু পথ উঠতেই ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপ্‌টা এসে কাঁপিয়ে দিল বাসশুদ্ধু সবাইকে। বাইরের হাওয়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে গাছের চেহারা পাল্টে গেছে বিলকুল। মাটি আর হাওয়ার গুণে গাছের প্রকৃতি ঠিক হয় জানি, কিন্তু এত তাড়াতাড়ি চোখের সামনে এমন পরিবর্তন দেখবো ভাবি নি। সারি সারি চির গাছ (Pine), পথের পাশে শাল-শিশুরা জায়গা দখল করে নিয়েছে। হিমালয়ের নিম্ন বা গ্রীষ্মবলয় ছেড়ে যে নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে উঠে এসেছি, বুঝতে পারলাম। সরলবর্গের গাছ ছাড়াও চওড়া পাতার গাছ দেখছি, তবে উচু থেকে উঁচুতে ওঠবার সঙ্গে সঙ্গে গাছের গড়ন-ধরণ যেন বদ্‌লে গেল। টেহরী শহরে এসে দেখি পাহাড়ের গড়নও যেন একটু বদ্‌লেছে। হিমালয়ের প্রথম সারি, যাকে ভূতাত্ত্বিকেরা শিবালিক শ্রেণী নাম দিয়েছেন, সেটা পেরিয়ে এবার মধ্য সারির ভিতর দিয়ে চলেছি—টেহরীর পর কিছু পথ ন্যাড়া পাহাড়ের গা বেয়ে। পাহাড়গুলির চূড়া অবধি কোথাও গাছ বলতে কিছু নেই। আর তাতেই আগাগোড়া পাহাড়গুলির খাঁজ, ফাঁটল স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। পাহাড়ের উচ্চতা অবশ্য এমন নয়, যেখানে গাছের সীমানা শেষ হয়ে যেতে পারে। টেহরীতে গাছপালা, চাষ-আবাদ দেখলাম। কিন্তু তারপরেই এই পথটুকুর দু-পাশের পাহাড়গুলি শুধু ঘাসে ঢাকা রয়েছে কেন—বাসে বসে অনেক ভেবেও তার কারণ খুঁজে পেলাম না। আসলে হয়তো বড় গাছের শিকড় ধরে রাখবার মত মাটি ছিল না পাথরের উপর, আর নয় তো মাটির গুণই এমন, যাতে ঘাস ছাড়া আর কিছু হয় নি। সব কিছু খুঁটিয়ে দেখবার সুযোগ পাই নি। একটা পাহাড়ের বাঁক ঘুরতেই আবার গাছের দেখা পেলাম। এবার চওড়া পাতার শাল গাছের মাঝে মাঝে চির-ঝাউ মিশে গেছে। এই বনের শেষে ধরাসু গ্রাম। বাস দাঁড়ালো। জড়তা কাটাতে নেমে এলাম পথে।

খুব কাছ থেকে ভাগিরথীকে এবার দেখতে পেলাম। সাদা ঘোলা জলের স্রোত বয়ে চলেছে। নদীর জলের রং এমন সাদা কি করে হলো বুঝতে পারলাম না। পাশেই ঝর্ণার জল কিন্তু পরিষ্কার। ঝর্ণার জল যেখানে ফেনা হয়ে নদীর বুকে পড়ছে, তার কাছেই একটি হলদে খঞ্জন (Yellow wagtail) লেজ নাচিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। টেলিগ্রাফের তারের উপর বসে ছিল যে পাখীটা, ঝুপ করে জলে পড়েই আবার উঠে এলো। তাকে চিনলাম—ফট্‌কা মাছরাঙা (Pied kingfisher)। মনে মনে খুসী হলাম—হিমালয়ের পাখীর দেখা পাচ্ছি বলে।

ধরাসু থেকে চড়াই বেয়ে বাস ছুটলো উত্তরকাশীর দিকে। যে পথ ধরে এসেছি, ভেবেছিলাম সামনের পথও তেমনি, কিন্তু তা নয়। পাহাড়ের গায়ে ঝোপ-ঝাড় কমে এসেছে। পাহাড়ের গায়ের খাঁজ এক পাহাড় থেকে অন্য পাহাড়ে হামেশাই পাল্টে যাচ্ছে—এমন কি, চূড়াও। তীরের ফলার মত—তাবুর মত চূড়া দেখলাম, দেখলাম টেবিলের মত চ্যাপ্টা চূড়া। পাহাড়ের গায়ের রঙেরও কত রকমফের! লাল্‌চে, নীল, সাদাটে, কালো কত রঙের পাহাড়। কেন এমন হয়? গাছপালার জন্যে—না, পাথরের রঙের পাহাড়ে হেরফের হয় বলে? পাহাড়ের রূপ নিয়ে এমন ভাবনায় পড়েছিলাম যে, বাস কখন বনের পথে ঢুকে পড়েছে, খেয়াল করি নি। সূর্যাস্তের আগেই পৌঁছে গেলাম উত্তরকাশী।

গঙ্গোত্রী-গোমুখ যাবার অনুমতি নেবার জন্যে থাকতে হলো সেদিন সেখানে। সন্ধ্যায় হোটেলের বারান্দায় বসে চোখ বুজে অলস সময় কাটাচ্ছিলাম। সামনেই ছোট্ট সব্‌জী বাগান। বুলবুলির ডাক শুনে কানখাড়া করে চোখ মেললাম। দেখি সাদা গাল ছুটি বুলবুল ঢ্যাড়স গাছে বসে ডাকাডাকি সুরু করেছে। এই জাতের বুলবুল সমতলে দেখি নি আগে। ভাল করে দেখবো বলে একটু নড়তেই উড়ে গেল।

উত্তরকাশীর পর ঝালা অবধি পথের দু-পাশের পাহাড় দেখি শক্ত কাল্‌চে পাথরের। এমনটি তার আগের পথে দেখি নি। নদী এই পাথরের বুক কেটে গভীর খাত বানাতে পারে নি। ঝালার কাছেই সুখা পাহাড়—নরম মাটি আর পাথরের টুক্‌রা অনবরত ঝুরঝুর করে ঝরে পড়ছে। ভাগীরথী বিশাল চওড়া হয়েছে পাড় ভেঙ্গে ভেঙ্গে। ঝালা থেকে পা বাড়ালাম চির-দেওদার বনের ভিতর দিয়ে।

হিমালয়ের পথ চলতে গাছপালা ও পশুপাখী দেখে উচ্চতার আন্দাজ করা যেতে পারে। দেওদার আর চির গাছের সুন্দর গন্ধ পাচ্ছি। দেওদারের এমন ঘন বন ছয় হাজার ফুটের নীচে দেখি নি। আর দেখি নি থিরথিরা পাখীটিকে (Whiteheaded Red Start)। একটি সাদা-মাথা থিরথিরা পাখী ঝর্ণার ধারে পাথরের পর পাথরে ঘুরে ঘুরে খাবার খুঁজে বেড়াচ্ছে।

পেরিয়ে গেলাম হরসিল, ধরালী গ্রাম। পেরুলাম জংলা চটি। তারপর দিনের শেষে প্রায় হামা দিয়ে উঠে এলাম ভৈরবঘাঁটি। ছয় হাজার থেকে ন' হাজার ফুট। নদীর ক্ষয়ের জন্যে হরসিল ও ধরালী বরাবর বিরাট এক উপত্যকা গড়ে উঠেছে। জংলা চটির কাছে ভাগীরথী সরু নালার মত পথে বেরিয়েছে। ছোট পুলের উপর দিয়ে পার হলাম। তারপর বুকভাংগী চড়াই উৎরে ভৈরবঘাঁটি। দেওদার ঘেরা। বাতাসে তেমন ঠাণ্ডা ভাব নেই। জলে যেন একটু গন্ধকের গন্ধ। আমার চোখে হিমালয়ের ধরণ-ধারণটাই

কেমন যেন অচেনা ঠেকছে। যত উঁচুতে উঠছি, সবকিছুই যেন নীচের থেকে বদ্‌লে যাচ্ছে। সামনে আরও নতুন কত কি যে দেখবো! উঠে দাঁড়ালাম। গঙ্গোত্রী আর মাত্র সাত মাইল।

এই সাত মাইল পথ যেন হাওয়ায় ভেসে চ'লে এলাম। প্রায় সবটা পথই চির আর দেওদার বনের ভিতর দিয়ে চ'লে গেছে। মাঝে মাঝে কয়েকটি ভূর্জ (Birch) আর মন্দার বা রডোডেনড্রনগাছ। ভূর্জ গাছ জীবনে এই প্রথম দেখলাম। পরতে পরতে বাদামী বাকল জড়ানো, কিন্তু উপরের বাকল সাদা ও মসৃণ। পাতা চওড়া। চওড়া পাতার আর কোন গাছ নজরে পড়লো না। ঝরে-পড়া শুকনো চির-দেওদারের পাতার উপর দিয়ে হাঁটবার সময় মনে হলো, সারা পথ যেন কার্পেট বিছানো। গঙ্গোত্রী পৌঁছে এক আশ্রমিকের কুটীরে গরম কম্বলের নীচে শুয়ে আরামে ঘুমিয়ে পড়লাম।

পরদিন সকালেই এক আশ্রমিককে হিম-কপোতের কথা জিজ্ঞেস করলাম। ইনি হিমালয়ের প্রাণী ও উদ্ভিদের একজন সার্থক পর্যবেক্ষক। বললেন, গঙ্গোত্রী থেকে আরও উঁচুতে প্রায় এগারো হাজার ফুটেরও উপরে, যেখানে মেষপালকেরা ভেড়া চরায়, সেখানে কোন কোন সময় তিনি হিম-কপোতের ঝাঁক দেখেছেন। ধৈর্য ধরলে আমিও দেখতে পাব। পথ দেখাবার সঙ্গী ঠিক করে দিলেন বিখ্যাত পাহাড়-চড়ুয়া দলীপ সিংজীকে।

পিঠের ঝোলায় দিনের খাবার আর কাঁধে দূরবীন ঝুলিয়ে গোমুখের পথে রওনা হলাম। যত এগুলাম গাছপালা কমে এলো। মাইলের পর মাইল নেড়া বালু বালু পাহাড় শুধু ঘাস গায়ে জড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পাহাড়গুলির রং সাদাটে, মনে হয় যেন চুন মেশানো। হয়তো জুরাসিক যুগ থেকেই এখানে এমনি দাঁড়িয়ে রয়েছে। ভূর্জবাসায় যখন পৌঁছুলাম তখন পড়ন্ত বিকেল। চারদিক নিঝুম। দূর থেকে এক মেষপালকের শিস্ শুনতে পেলাম। তারপরেই কুকুরের ডাক। সেদিকে দূরবীন ফেরাতেই এক ঝাঁক পায়রা দেখতে পেলাম। গলা ও মাথা কালো। পালকের রং নীলাভ সাদা। ওড়বার ভঙ্গী পায়রার মত। বরফের চূড়া পেরিয়ে কোথায় যেন মিলিয়ে গেল।

সেই রাত ভূর্জবাসায়। ডুমো ডুমো পাথরের চাঁই ডিঙ্গিয়ে মাইল দুই হেঁটে পরদিন এক বিরাট বরফের চাঁইয়ের উপর দাঁড়িয়ে গোমুখ দেখলাম। বরফের বিরাট এক গুহা থেকে রাশি রাশি জল ঘর্ঘর শব্দে বেরিয়ে আসছে। আশেপাশের ছাই রঙের মাটি মিশে মিশে জল ঘোলাটে সাদা হয়ে গেছে। দলীপ সিং বললেন, গঙ্গোত্রী হিমবাহ আরও উপরে। এই জল আসছে রক্তবরণ, চতুরঙ্গী, গঙ্গোত্রী, কীর্তিবামক প্রভৃতি হিমবাহ থেকে। তিনি আমাকে সুদর্শন, শিবলিঙ্গ, কেদারনাথ শৃঙ্গগুলি চিনিয়ে দিলেন। তারপর ঘরের দিকে রওনা হলাম। আমার চোখ খুঁজে বেড়াচ্ছিল একটি সাদা পাখী—হিম-কপোত।

ভূর্জবাসার কুটির থেকে পথ একটু উঁচুতে। কয়েকটি বেঁটে বেঁটে দেওদার কিম্বা চিরগাছ একটি সাদা পাথরের পাশেই উঠেছে, যার উপর ভর দিয়ে আমাকে পথে উঠতে হবে। হাত বাড়াবো কি, পাথরের গায়ে মিশে আছে ধবধবে সাদা পায়রা একটি। লেজের প্রান্তটুকু কালো। এমন করে ডানা গুটিয়ে বসে আছে যে, তার কালচে পিঠ গাছের ছায়া আর পাথরের রং তাকে প্রায় অদৃশ্য করে রেখেছে। আমাকে দেখবামাত্র ধবধবে সাদা ডানা মেলে সেটা উড়ে গেল। সেদিন ছিল রবিবার, পাঁচই আশ্বিন, তেরো-শ' পচাত্তর সাল।

জীবন সর্দার

জেনে রাখ

ক। এক সময়ে বজ্রপাত সম্বন্ধে অনেক রকমের কুসংস্কার প্রচলিত ছিল। অনেকেই বিশ্বাস করতো, দানা-দৈত্য ও অশুভ শক্তির প্রভাবে বজ্রপাত ঘটে থাকে। যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতিক-বিজ্ঞানী বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনই আকাশে ঘুড়ি উড়িয়ে প্রমাণ করেন যে, বজ্রপাত বিদ্যুৎশক্তিরই এক প্রকার অভিব্যক্তি মাত্র। বজ্রপাতের প্রকৃত কারণ ও তার প্রকৃতি সম্বন্ধে সব কিছুই জানা যায় নি। যুক্তরাষ্ট্রের বনবিভাগের কর্তৃপক্ষ যান্ত্রিক উপায়ে ঝড়-ঝঞ্ঝার সময় নির্দোষ ও অগ্নিপ্রজ্বালক বজ্রপাতের পার্থক্য নির্ণয়ের চেষ্টা করছেন।

ক   খ   গ

খ। এই বিষয়ে সাফল্যলাভ করা সম্ভব হলে সর্বাধিক বিপজ্জনক এলাকায় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা করা সম্ভব হতে পারে। অপরাহ্নের পরেই সাধারণতঃ বিপজ্জনক বজ্রপাত ঘটে থাকে। তখন যে দাবানল প্রভৃতি গুরুতর অবস্থার সূত্রপাত হয়, তা অনেক ক্ষেত্রেই প্রথমে জানা যায় না। পরের দিন যখন আগুন বিপজ্জনক অবস্থায় উপনীত হয়, তখন প্রতিকারের উপায় থাকে না। এখন ইনফ্রারেড স্ক্যানিং-এর সাহায্যে সামান্যতম আগুনের উত্তাপও সহজেই জানা যেতে পারে। বনবিভাগের কর্তৃপক্ষ এখন ইনফ্রারেড সরঞ্জামসহ এরোপ্লেনের সাহায্যে বজ্রপাতের ফলে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড ঘটবার অনেক পূর্বেই তা জানতে পারে।

গ। এইসব পর্যালোচনার ফলে বোঝা যায়—পজিটিভ এবং নেগেটিভ বিদ্যুৎআধান শূন্যস্থানের মধ্যদিয়ে লাফিয়ে যাবার মতন শক্তিশালী না হওয়া পর্যন্ত সঞ্চিত হতে থাকে। বজ্রাগ্নি দৈর্ঘ্যে অনেক মাইল পর্যন্ত হতে পারে, কিন্তু পাশের দিকে এক ইঞ্চি থেকে ছয় ইঞ্চির বেশী হয় না। এই বজ্রপাত এক মেঘ থেকে অন্য মেঘে এবং মেঘ থেকে পৃথিবীতে অথবা পৃথিবী থেকে মেঘেও যেতে পারে। বজ্রপতনের গতিবেগ সেকেণ্ডে 55 মাইলের মতন।

পারদর্শিতার পরীক্ষা

বিভিন্ন ধরণের বুদ্ধির সমস্যার সমাধানে তোমরা কে কেমন পারদর্শী, তা বোঝবার জন্যে নীচে 5টি প্রশ্ন দেওয়া হলো। প্রত্যেকটি প্রশ্নের জন্যে নম্বর হচ্ছে 20। কোন প্রশ্নের মধ্যে ভাগ থাকলে প্রত্যেকটি ভাগেই সমান নম্বর। উত্তর দেবার জন্যে মোট সময় 10 মিনিট। তোমরা যে যেমন নম্বর পাবে, সেই অনুযায়ী পারদর্শিতার পরিমাপ এইভাবে করা যেতে পারে :—

নম্বর	পারদর্শিতা
80—100	খুব বেশী
60—79	বেশী
40—59	চলনসই
20—39	কম
0—19	খুব কম

প্রশ্ন 1—মনে করো, তোমার এক বন্ধুকে বলা গেল, তার পকেটে যত পয়সা আছে, তাকে 2 দিয়ে গুণ করে তার সঙ্গে 5 যোগ করতে এবং সেই যোগফলকে আবার 50 দিয়ে গুণ করতে। তারপর তার বয়স যত বছর, সেই সংখ্যাকে যোগ করতে বলা হলো ঐ গুণফলের সঙ্গে। এবার যে সংখ্যা পাওয়া গেল, তা থেকে বিয়োগ করতে বলা হলো 1971 সালের মোট দিনের সংখ্যা। বন্ধু জানালো, ফল দাঁড়াচ্ছে 2100। বলো তো তোমার ঐ বন্ধুর পকেটে কত পয়সা ছিল এবং তার বয়সই বা কত ?

প্রশ্ন 2—24 জন সৈন্যকে কি ভাবে 6টা সারিতে দাঁড় করানো যেতে পারে, যাতে প্রত্যেক সারিতে সৈন্য থাকবে 5 জন করে ?

প্রশ্ন 3—(ক) ধরা যাক, a ও b দুটি ধনাত্মক সংখ্যা এবং $a>b$। এখন, একজন লিখলো

$$ab>b^2$$

$$\therefore \quad (ab-a^2)>(b^2-a^2)$$

অর্থাৎ $a\,(b-a)>(b+a)\,(b-a)$

সুতরাং $\quad a>(b+a)$

কিন্তু তা তো হতে পারে না। উপরের ধাপগুলির মধ্যে কোথায় ভুল হচ্ছে, বলতে পারো ?

(খ) আমরা জানি

$\frac{1}{4}$ টাকা = 25 পয়সা

দু-দিকেরই বর্গমূল নিয়ে যদি আমরা লিখি

$\frac{1}{2}$ টাকা = 5 পয়সা,

তাহলে সেটা তো আর ঠিক হতে পারে না! বলতে পারো, ভুলটা কোথায় হচ্ছে?

প্রশ্ন 4—50 পয়সা, 25 পয়সা ও 5 পয়সার মোট 20টি মুদ্রায় যদি কাউকে 4 টাকা দিতে হয়, তাহলে তাকে কোন্ মুদ্রা ক'টি দিতে হবে?

প্রশ্ন 5—নীচের অঙ্কগুলি কি ভাবে ব্যবহার করলে প্রতি ক্ষেত্রেই 100 পাওয়া যাবে?

(ক) 5টি 1

(খ) 5টি 3

(গ) 5টি 5

(উত্তরের জন্যে 627 নং পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

ব্রহ্মানন্দ দাশগুপ্ত ও জয়ন্ত বসু*

---

* সাহা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, কলিকাতা-9

জানবার কথা

খাদ্যের সন্ধানে হাতী যখন দলবদ্ধভাবে বনে বিচরণ করে, তখন তারা ভীষণ শব্দ করে সারা বন তোলপাড় করে তোলে। কিন্তু এই সময়ে তারা যদি কোন বিপদের সম্ভাবনা দেখে—তখন তারা আত্মরক্ষার জন্যে নিঃশব্দে প্রস্থান করে—সামান্য একটু পাতার শব্দও শোনা যায় না।

সোনা

আদিম প্রস্তর যুগ থেকে সুরু করে আজকের নিউক্লিয়ার যুগ পর্যন্ত সোনাই একমাত্র ধাতু—যা মানুষকে সবচেয়ে বেশী আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়েছে। সোনার সন্ধানে মানুষ ঘর ছেড়ে দুর্গম পথে পাড়ি দিয়েছে—এমন কি, অমানুষিক কষ্ট স্বীকার করতেও ইতস্তত: করে নি।

সোনা শুধু ধাতুর মধ্যে শ্রেষ্ঠ নয়—ব্যবহারের দিক দিয়েও খুবই প্রাচীন—যদিও স্বর্ণযুগের সঠিক হিসাব এখনো ঐতিহাসিকেরা নির্ধারণ করতে পারেন নি।

তোমরা শুনলে আশ্চর্য হবে যে, পীরেনীজ পর্বতের একটি গুহার মধ্যে পাথরের নীচে চাপা পড়া অবস্থায় নব্য প্রস্তর যুগের পাথরের হাতিয়ারের সঙ্গে পাওয়া গেছে প্রচুর সোনা এবং সেই সঙ্গে আবিষ্কৃত হয়েছে একটি সোনার হার—যা একটি যুবতী মেয়ের কঙ্কালের গলায় পরানো ছিল। এথেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে—সেই সুদূর নব্য প্রস্তর যুগ—যে যুগ আরম্ভ হয়েছিল আজ থেকে প্রায় বারো-চৌদ্দ হাজার বছর আগে—তখনো মানুষ সোনা সংগ্রহ করবার কৌশল জানতো এবং পাথরের পালিশ করা অলঙ্কারের সঙ্গে সোনার অলঙ্কারও ব্যবহার করতো। তবে সকলেই নয়—কারণ বর্তমানের মত তখনো সোনা ছিল দুষ্প্রাপ্য এবং সংগ্রহ করাও ছিল কঠিন।

এছাড়া সাত-আট হাজার বছর আগের যে সব প্রত্ন-সামগ্রী আবিষ্কৃত হয়েছে, তার সঙ্গে সোনার গহনাও পাওয়া গেছে। খুব প্রাচীন গ্রীক গাথায়—বিভিন্ন জায়গায় পাওয়া মিশরীয় প্যাপিরাসে লেখা কাহিনীতে সোনার উল্লেখ পাওয়া যায়। খৃষ্টের জন্মের 6000 হাজার বছর আগেও এশিয়া মাইনরের লিডিয়াতে রাজার ছবিসমেত সোনার শীলমোহর ব্যবহারের প্রথা চালু ছিল। এর জের কিছুদিন আগে পর্যন্ত কয়েকটি দেশে চলেছিল। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে, পৃথিবীর প্রাচীনতম সোনার খনিগুলিতে খৃষ্টের জন্মের 3000 হাজার পূর্বেও কাজ চলতো।

সোনা সাধারণতঃ কোয়ার্ট্জ্ নামক খনিজের সঙ্গে সংলগ্ন থাকে। এরূপ স্বর্ণধর (Auriferous) কোয়ার্ট্জ্ যখন প্রাকৃতিক কারণে চূর্ণিত হয়ে জলস্রোতের সঙ্গে প্রবাহিত হয়, তখন সোনার কণা বালি ও নুড়ির সঙ্গে নদীপথে কিংবা নদীপ্লাবিত ভূমিতে ছড়িয়ে পড়ে। এই রকম বালি আর নুড়ি থেকে এককালে সোনা সংগ্রহ করা হতো—এখনো হয়। তবে এই স্রোতবাহিত সোনার পরিমাণ সাধারণতঃ খুবই কম—বিস্তর বালি ধুয়ে সামান্য কিছু স্বর্ণকণা পাওয়া যেতে পারে। অবশ্য দৈবক্রমে গুটিকতক বড় ডেলাও মিলতে পারে।

আসাম, বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ এবং মহীশূরের অনেক নদীর বালিতে স্বর্ণকণা আছে। স্থানীয় দরিদ্র অধিবাসীরা এখনো কিছু কিছু স্বর্ণকণা উদ্ধার করে থাকে। পদ্ধতি অতি সরল। পাতলা একটি ডালা—তাতে কিছু বালি রেখে জল মিশিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ধোয়া হয়। সোনার কণা বালির চেয়ে ভারী—সে জন্যে নাড়ানোর ফলে বালি জলের সঙ্গে মিশে ক্রমশঃ বেরিয়ে যায় এবং বার বার ধোয়ার পর অবশেষে ডালাতে শুধু সোনার কণা পড়ে থাকে। সুবর্ণরেখা নদীর বালি থেকে এখনো এই উপায়ে সোনা সংগ্রহ করা হয়।

এ তো গেল নদীর বালিকণা থেকে স্বর্ণকণা সংগ্রহ করবার পদ্ধতির কথা। এবার শোন, খনিজ পদার্থ থেকে সোনা বের করবার আধুনিক পদ্ধতির কথা। প্রথমেই বলেছি, যে খনিজ আকরের মধ্যে সোনা পাওয়া যায় তার নাম কোয়ার্ট্‌জ্‌। স্বর্ণধর কোয়ার্ট্‌জ্‌ পাথরের সূক্ষ্ম চূর্ণ জলের সঙ্গে মিশিয়ে বড় বড় তামার চাদরের উপর দিয়ে স্রোতের মত প্রবাহিত করানো হয়। তামার চাদরে পারদ মাখানো থাকে। তাতে সোনার কণা আটকে যায়। তারপর পারা চেঁচে নিয়ে পাতন যন্ত্রে রেখে তাপ দেওয়া হয়। পারা বাষ্পাকারে পৃথক হয়ে অন্য পাত্রে জমা হয় এবং পাতন যন্ত্রে শুধু সোনা পড়ে থাকে। পাথরের গুঁড়া থেকে সব সোনা পারায় আটকে থাকে না—কিছু পাথরের সঙ্গে থেকে যায়। পটাসিয়াম বা সোডিয়াম সায়ানাইড মিশ্রিত জলে সোনা দ্রবীভূত হয়। সে জন্যে সায়ানাইড যৌগের সাহায্যে পাথরের গুঁড়া থেকে অবশিষ্ট সোনা বের করা হয়। কোন কোন কোয়ার্ট্‌জের সঙ্গে কিছু পরিমাণ রূপা মিশ্রিত থাকে—তাও বিশেষ প্রক্রিয়ায় পৃথক করা হয়।

ধাতু হিসাবে সোনা যেমন শ্রেষ্ঠ, তেমনি তার এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে, যা অন্যান্য অনেক ধাতুরই নেই। যেমন—সাধারণ অ্যাসিডে এর কোন ক্ষতি হয় না। সে জন্যেই বিজ্ঞানীরা একে নোবেল মেটাল বলে থাকেন। একমাত্র ক্লোরিন, অ্যাকোয়া রিজিয়া মিশ্র অ্যাসিড আর কয়েকটি বিষাক্ত অ্যাসিড ছাড়া অন্য কিছুতেই এই ধাতু দ্রবণীয় নয়।

সোনা যেমন নমনীয় তেমনই ঘাতসহ। আর এজন্যেই সোনাকে পিটিয়ে 1 ইঞ্চির 250,000 ভাগ পাতলা করা যায়। শুধু কি তাই, তোমরা শুনলে আশ্চর্য হবে যে, এক আউন্স সোনা থেকে 35 মাইল লম্বা তার করা যায়। এই বৈশিষ্ট্যের জন্যে খুব অল্প পরিমাণ সোনাও রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ধরা শক্ত নয়। আধুনিক রসায়নবিদেরা অন্য ধাতুর 1,000,000,000 অণুর সঙ্গে সোনার একটি অণু মেশানো থাকলেও সেটা ধরতে পারেন। সোনা সাধারণতঃ 1063° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় গলতে সুরু করে এবং এর বেশী তাপ প্রয়োগ করলে বেশ তরল হয়ে যায়। স্বর্ণকারেরা এই তরল সোনাকে ছাঁচে

ফেলে প্রথমে সোনার বাট তৈরি করে, তারপর সেই বাটকে পুনরায় উত্তাপ প্রয়োগে নরম করে পিটিয়ে পিটিয়ে তৈরি করে নানারকম অলঙ্কার।

পৃথিবীতে সোনার যেরূপ চাহিদা, সে তুলনায় সোনা খুব কমই আছে। এত হাজার বছর ধরে চেষ্টা করে মানুষ আজ পর্যন্ত মাত্র 50,000 হাজার টন সোনা উদ্ধার করেছে। এখন সমগ্র বিশ্বে বছরে আনুমানিক 2000 হাজার টন সোনা বিভিন্ন খনি থেকে উত্তোলন করা হয়। এই পরিমাণের শতকরা 70 ভাগ আসে দক্ষিণ আফ্রিকার 11000 ফুটের বেশী গভীর র‍্যাণ্ড নামক খনি থেকে। মোট শতকরা 25 ভাগ আসে সোভিয়েট রাশিয়া থেকে। ভারতবর্ষে সবচেয়ে বড় সোনার খনি আছে মহীশূরের কোলার অঞ্চলে। তাছাড়া নিজাম রাজ্যের হট্টি অঞ্চলের খনি থেকেও সোনা উত্তোলন করা হয়, তবে পরিমাণে কম।

ভূতাত্ত্বিকদের মতে, ভূত্বকের উপাদানের মধ্যে গড়ে শতকরা 0·000,0005 ভাগ সোনা আছে, রূপা আছে এর দ্বিগুণ। অথচ চাহিদা আর মূল্যের হিসাবে এই সম্পর্ক মেলানো যায় না। আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের মতে, সমুদ্রের জলে 1 ঘন কিলো-মিটারে 5 টন সোনা পাওয়া যেতে পারে। শুধু পৃথিবীতেই নয়, সূর্যের চতুষ্পার্শ্বে—এমন কি, উল্কার মধ্যেও সোনার অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া গেছে। হয়তো বা অদূর ভবিষ্যতে বিভিন্ন গ্রহ-উপগ্রহে পৃথিবীর মানুষের চাহিদা মেটাবার জন্যে সোনার খনি খোলা সম্ভব হবে।

চাহিদা অনুযায়ী সোনা কম বলে মানুষ অন্য ধাতু থেকে সোনা তৈরি করবার চেষ্টা বহু প্রাচীনকাল থেকেই করে আসছে—অবশ্য কৃত্রিম সোনা। এই ব্যাপারে আজকের মানুষ কিছুটা এগিয়েছে—আধুনিক বিজ্ঞানীরা সাইক্লোট্রন যন্ত্রে পরমাণুর ভাঙনের সাহায্যে সেই স্বপ্ন সফল করতে প্রয়াসী। হয়তো এমনি করেই বৈজ্ঞানিকদের স্বপ্ন একদিন বাস্তবে রূপায়িত হবে।

সুনীল সরকার

জানবার কথা

একটি গরিলার দৈহিক শক্তি কুড়িটি মানুষের দৈহিক শক্তির সমান। মজার কথা হলো—গরিলারা সিংহের মত গর্জন করে না—তারা চীৎকার করে।

উত্তর

(পারদর্শিতার পরীক্ষা)

1. বন্ধুটির পকেটে পয়সা ছিল 22 এবং তার বয়স 15 বছর।

[ধরা যাক, বন্ধুটির পকেটে পয়সার সংখ্যা x এবং তার বয়স y বছর।

তাহলে

$$(2x+5)\times 50+y-365=2100$$

বা $100x+y=2100+115=2\ 15$

$\therefore\ x=22$ ও $y=15$

সুতরাং বোঝা যাচ্ছে, বন্ধু যে ফল বললো, তার সঙ্গে 115 যোগ করে যে সংখ্যা পাওয়া যাবে, তার শেষের দু'টি অঙ্ক নির্দেশ করবে তার বয়স আর আগের অঙ্ক বা অঙ্কগুলি নির্দেশ করবে পয়সার সংখ্যা।]

2. সৈন্যদের সারিগুলি নীচের ছবির মত একটি সুষম ষড়ভুজ গঠন করবে।
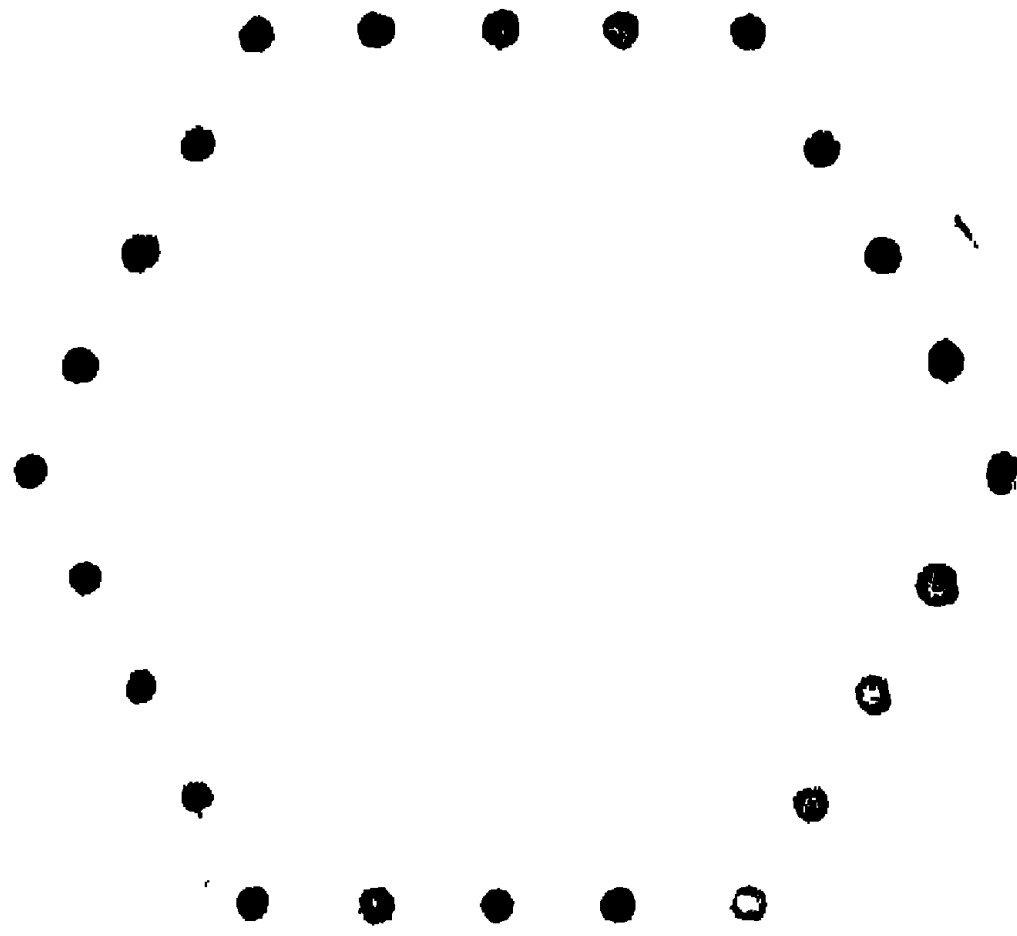
• — সৈন্য

3. (ক) $(b-a)$ হচ্ছে একটি ঋণাত্মক সংখ্যা। সে জন্যে $a(b-a) > (b+a)(b-a)$ হলে $a<(b+a)$ হবে।

[একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি পরিষ্কারভাবে বোঝা যাবে। $-6>-10$ অর্থাৎ $3\times(-2) >5\times(-2)$। এক্ষেত্রে $3<5$।]

(খ) বর্গমূল নির্ণয় করাটা ভুল হচ্ছে, কারণ এককেরও বর্গমূল নিতে হবে।

[প্রথম সমীকরণটির দু-দিকের সঠিক বর্গমূল লিখলে দাঁড়ায়

$$\tfrac{1}{2}\sqrt{\text{টাকা}} = 5\sqrt{\text{পয়সা}}$$

এটা ঠিক আছে, কেন না

$$\sqrt{\text{টাকা}} = \sqrt{100 \text{ পয়সা}} = 10\sqrt{\text{পয়সা}} \text{ ।}$$

4. 50 পয়সার 4টি মুদ্রা, 25 পয়সার 6টি মুদ্রা ও 5 পয়সার 10টি মুদ্রা।

[ধরা যাক 50 পয়সা, 25 পয়সা ও 5 পয়সার মুদ্রাসংখ্যা যথাক্রমে x, y ও z।

তাহলে

$$x+y+z=20 \cdots\cdots\cdots (1)$$

আবার পয়সার হিসাবে

$$50x+25y+5z=400$$

$$\text{বা} \quad 10x+5y+z=80 \cdots\cdots (2)$$

(2) থেকে (1) বিয়োগ করলে

$$9x+4y=60 \cdots\cdots\cdots (3)$$

যেহেতু x ও y দুটি পূর্ণসংখ্যা, (3)-এর সমাধান হচ্ছে

$$x=4 \text{ ও } y=6$$

$$\therefore \quad z=20-(4+6)=10 \text{]}$$

5. (ক) $111-11$

(খ) $33\times3+\frac{3}{3}$

(গ) $(5+5+5+5)\times5$

বা $(5\times5\times5)-(5\times5)$

জানবার কথা

নিশাচর প্রজাপতিকে মথ বলা হয়। এদের ডানা ভারী এবং সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শোঁয়ায় আবৃত। মথেরা কোন জায়গায় বসবার সময় ডানা মেলে রাখে। মথের শোঁয়া-পোকার গুটি থেকে রেশম, তসর, মুগা, এণ্ডি, মটকা প্রভৃতি কাপড়ের সুতা প্রস্তুত করা হয়। এদের বাচ্চাদের ভোজন ক্ষমতার কথা শুনলে বিস্মিত হতে হয়। মাত্র ছয়টা মথের বাচ্চা এক বছরের মধ্যে যে পরিমাণ খাদ্য খায় তার ওজন হচ্ছে একটা ঘোড়ার সমান।

বিভিন্ন উদ্ভিদের বিস্তৃতি

প্রাচীনকালে ভারতের বিচিত্র গাছপালা বিশ্বের কাছে আকর্ষণীয় ছিল। ভারতবর্ষ থেকে অনেক গাছপালা পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে গেছে। আবার কোন কোন গাছ বিদেশ থেকে ভারতে বিস্তার লাভ করেছে।

ধান :—ধানের চাষ আজকাল পৃথিবীর সব গ্রীষ্মপ্রধান দেশেই করা হয়। অতি প্রাচীনকাল থেকেই ভারতবর্ষ ও চীনে ধানের প্রচলন আছে—তার প্রমাণ আমরা পাই হিন্দুশাস্ত্রে এবং বিভিন্ন প্রাচীন নিদর্শন থেকে। সর্বাপেক্ষা প্রাচীন যে নিদর্শন পাওয়া যায়, সেটা খৃষ্টপূর্ব 1000-750 সালের। এই নিদর্শন পাওয়া গেছে হস্তিনাপুরে (উত্তর প্রদেশ)।

আলেকজাণ্ডারের ভারতে আসবার পরেই গ্রীকরা এর সন্ধান পায়। তারা আরব-বণিকদের আরও আগে ভারতের পশ্চিম উপকূলে আসে এবং ধানের সন্ধান লাভ করে।

তুলা :—হেরোডটাসের বর্ণনায় আছে—ভারতে এক রকম গাছ পাওয়া যায়, যার ফল থেকে ভারতীয়েরা কাপড়-চোপড় তৈরি করে। এই বর্ণনায় শিমুল গাছের তুলার কথাই বলা হয়েছে।

সবচেয়ে প্রাচীন লিখিত নিদর্শন পাওয়া যায় ঋক্‌বেদে— ঋক্‌বেদের রচনাকাল খৃষ্টপূর্ব পঞ্চদশ সাল। পাঁচ হাজার বছর আগে মহেঞ্জোদারোর যুগেও এর প্রচলন ছিল এবং সেখানে তুলার তৈরি কাপড়ের টুক্‌রার কথাও জানা গেছে, যার মধ্যে পাওয়া গেছে প্রাচীন রৌপ্য মুদ্রা। তুলার চাষ, কাপড় তৈরি, কাপড়ে রং করা—মধ্যযুগে এগুলি এত তাড়াতাড়ি উন্নতির পথে এগিয়ে চলেছিল যে, ভারতবর্ষ কিছুদিনের মধ্যেই এদিক থেকে একাধিপত্য অর্জন করে এবং সুদূর ভিনিসের সঙ্গেও তার বাণিজ্য চলে।

দক্ষিণ আমেরিকায়ও প্রাচীনকালে তুলার প্রচলন ছিল। পেরু এবং দক্ষিণ-পশ্চিম যুক্তরাষ্ট্রের কোন কোন অঞ্চলের সমাধিক্ষেত্রে তুলা দিয়ে তৈরি কাপড়ের সন্ধান পাওয়া গেছে। কিন্তু একথা ঠিক যে, তুলার প্রচলন সর্বপ্রথম হয় ভারতবর্ষে। ইজিপ্টে শণ গাছের আঁশ থেকে কাপড় বোনা হতো, তুলার চাষ আরম্ভ হয় অনেক পরে।

চা :—চা আজ পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশের লোকেরই পানীয়। চা-এর চাষ প্রথম আরম্ভ হয় চীনে। ভারত চীন থেকে প্রথম বীজ আমদানী করে' চা-এর চাষ আরম্ভ করে। ভারতের উত্তরাংশে চা-এর প্রাচুর্য থাকা সত্ত্বেও এখানকার লোকেরা পরে তা জানতে পারে। আসাম ও বর্মার উত্তরাংশে এখন প্রচুর চা জন্মায়, যা পৃথিবীর সব জায়গায় আজ রপ্তানী করা হচ্ছে।

/

চা-এর প্রসার হয়েছে খুব ধীরে ধীরে। চা-এর প্রচলন হয় জাপানে—দশম শতাব্দীতে, ইউরোপে ষোড়শ শতাব্দীর শেষের দিকে। সপ্তদশ শতাব্দীতে বৃটেনে চা বিক্রী হয় এক পাউণ্ড দশ গিনিতে। 1664 খৃষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডের দ্বিতীয় চার্লসের স্ত্রী রাণী ক্যাথেরিনকে কিছু চা উপহার দেওয়া হয়। তিনি চায়ের প্রশংসা না করে পারেন নি এবং তারপর থেকেই ইংল্যাণ্ডের অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে চায়ের প্রচলন বেড়ে যায়। চীন, জাপান, ইন্দোনেশিয়া, সিংহল, ফরমোসা প্রভৃতি স্থানেও এখন যথেষ্ট পরিমাণ চা উৎপন্ন হয়। ভারতই পৃথিবীতে চা উৎপাদনে প্রথম।

আম ঃ—প্রাচীন ভারতীয় কবির বর্ণনায় আমের উল্লেখ অনেক জায়গায় আছে; যেমন—কামদেবের বাসস্থান আম্রকুঞ্জ। চতুর্দশ শতাব্দীতে আমির খসরু বলেছিলেন, ভারতে এমন একটা ফল (অর্থাৎ আম) জন্মায়, যা কাঁচা-পাকা সব অবস্থাতেই উৎকৃষ্ট।

শোনা যায়, সম্রাট আকবর দ্বারভাঙ্গার নিকটে বাগান তৈরি করে সেখানে দশ হাজার আমগাছ লাগিয়েছিলেন। আইন-ই-আকবরীতে আম সম্বন্ধে অনেক কথা লিপিবদ্ধ আছে।

আজ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার একটা প্রধান ফল বলতে আমকেই বোঝায়। মালয়, ইন্দোনেশিয়া এবং ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে প্রচুর আম জন্মায়। হাওয়াই ও ফ্লোরিডা অঞ্চলেও যথেষ্ট আমের চাষ হয়।

কলা ঃ—ভারত, থাইল্যাণ্ড, মালয়ে প্রচুর পরিমাণে কলা জন্মায়। বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থে খৃষ্টপূর্ব 500-600 সালে কলার উল্লেখ আছে। তাই অনেক জায়গায় দেখা যায়, কলাকে 'Horn Plantain' বলা হয়েছে—কারণ এর আকৃতি শিং-এর মত।

খুব অল্প সময়ের মধ্যেই বিভিন্ন দেশে কলা বিস্তৃতি লাভ করে। অনুমান করা হয়, আরবীয়দের দ্বারা ভারত থেকে প্যালেষ্টাইন ও মিশরে কলার প্রচলন হয় সপ্তম শতাব্দীতে। মিশর থেকে কিছু দিনের মধ্যেই গোটা মহাদেশে কলার প্রচলন হয়, কারণ পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইউরোপীয়ানরা যখন আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে যায়, তখন সেখানে কলার প্রচলন ছিল। আমেরিকায় কলার চাষ হয় 1516 খৃষ্টাব্দে। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই এত প্রসার লাভ করে যে, আজ আমেরিকা পৃথিবীর মধ্যে কলা উৎপাদনে প্রথম স্থানের অধিকারী।

কলার জনপ্রিয়তার কারণ দুটি—প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় এবং পুষ্টিকারক তো বটেই। এর মধ্যে আছে 22% কার্বোহাইড্রেট। ভিটামিন A এবং C।

আখ ঃ—অতি প্রাচীনকালে পাশ্চাত্য দেশে মিষ্টি জিনিষ বলতে ছিল শুধু মৌচাকের মধু। আখের প্রচলন হয় স্পেনে অষ্টম শতাব্দীতে, মাদেইরা, আজোর, কেপ ভার্ডে দ্বীপে পঞ্চদশ শতাব্দীতে। সপ্তদশ শতাব্দীতে পৃথিবীর সমস্ত গ্রীষ্মপ্রধান দেশেই আখের চাষ আরম্ভ হয়। এক-শ' বছর আগে চিনি তৈরির একমাত্র উপায় জানা ছিল আখ

থেকে। আজকাল বিট থেকেও চিনি তৈরি হয়। আজ পৃথিবীতে চিনি উৎপাদনে ভারতের স্থান উল্লেখযোগ্য।

মরিচ ঃ—মালাবার ও কেরালায় প্রচুর মরিচ জন্মায়। বহু বছর ধরে এটা ছিল পশ্চিমের সঙ্গে ভারতের প্রয়োজনীয় বাণিজ্য পণ্যের মধ্যে একটি।

মরিচ ইউরোপে আসে পারস্য উপসাগর, মেসোপটেমিয়া, সিরিয়া কিংবা লোহিত সাগর ও সুয়েজ উপসাগরের মধ্য দিয়ে। আলেকজান্দ্রিয়ায় 176 খৃষ্টাব্দে রোমানরা মরিচ দিত রাজস্ব হিসাবে। ভিনিসের উন্নতির মূলে তাদের মরিচের উপর একচেটিয়া ব্যবসায়। তাদের ব্যবসায় নষ্ট করবার জন্যেই পর্তুগীজরা চেয়েছিল জলপথে ভারতের সঙ্গে যোগাযোগের একটা পথ। ক্রমে তাদের অনুসরণ করে ওলন্দাজ, ফরাসী ও বৃটিশ। সকলের কাছেই ব্যবসায়টি লোভনীয় হয়ে উঠেছিল। পর্তুগীজদের সেই স্মৃতি আমরা আজ দেখতে পাই—গোয়ায়।

এছাড়া আরও যে সব উদ্ভিদ ভারতবর্ষ থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে গেছে তার মধ্যে আছে, অড়হর ডাল, বেগুন, শশা, পাট, নীল, নারকেল, আদা, দারুচিনি, হলুদ, শন, জায়ফল, খাম আলু ইত্যাদি। কাজুবাদাম, আলু, বাদাম, টোম্যাটো, সাগু, আনারস, পেয়ারা, মিষ্টি আলু, লঙ্কা, অ্যারারুট, ভুট্টা, খরমুজ প্রভৃতি আজ বাজার ছেয়ে গেছে, কিন্তু ভারত এগুলির কোনটারই জন্মস্থান নয়—সুদূর আমেরিকা হচ্ছে এদের আদি বাসভূমি।

শ্রীচঞ্চল রায়

প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন 1. : ধ্রুবতারা স্থির থাকে অথচ অন্য সব নক্ষত্র আকাশে দিক পরিবর্তন করে—এর কারণ কি?

জীবনকৃষ্ণ মণ্ডল, ঊষারঞ্জন সিংহ, বহরমপুর

প্রশ্ন 2. : অ্যাপেণ্ডিসাইটিস রোগটা কি?

অভিজিৎ দেবনাথ, কলিকাতা-37

উত্তর 1. : পৃথিবী নিজের অক্ষের উপর পশ্চিম দিক থেকে পূর্ব দিকে আবর্তিত হচ্ছে। তাই পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে দূরের স্থির নক্ষত্রদের মনে হয় যেন এগুলি পূর্ব দিক থেকে পশ্চিম দিকে সরে যাচ্ছে। উপরের আকাশে ঠিক পৃথিবীর অক্ষ বরাবর রয়েছে

ধ্রুবতারা। এই কারণেই পৃথিবীর আবর্তন সত্ত্বেও ধ্রুবতারাকে দিক পরিবর্তন না করে একই জায়গায় স্থির থাকতে দেখা যায়। ধ্রুবতারার এরূপ অবস্থানের জন্যে দক্ষিণ মেরু থেকে একে দেখা যায় না। অবশ্য নক্ষত্রদের আপেক্ষিক গতি থাকা সত্ত্বেও নিজস্ব একটা গতি আছে; কিন্তু পৃথিবী থেকে এদের অবস্থান অনেক দূরে হওয়ায় এদের মোটামুটি স্থির বলে ধরে নেওয়া হয়।

উত্তর 2. আমাদের দেহের অভ্যন্তরে ½ ইঞ্চি মোটা ও 4 ইঞ্চি লম্বা একটা নলের মত বস্তু বৃহদন্ত্রের সিকাম নামক অংশের গা থেকে নীচের দিকে ঝুলে থাকে। এই বস্তুটিকে বলা হয় অ্যাপেনডিক্স। শরীরে অ্যাপেনডিক্সের উপস্থিতির প্রয়োজনীয়তা এখনও আমাদের অজানা। তবে এই অ্যাপেনডিক্স রোগাক্রান্ত হলে শরীরে যথেষ্ট অসুবিধা ও যন্ত্রণার সৃষ্টি হয়। অ্যাপেনডিক্স রোগাক্রমণের ফলে যে যন্ত্রণা বা প্রদাহের সৃষ্টি হয়, তাকেই বলা হয় অ্যাপেণ্ডিসাইটিস। সাধারণতঃ শিশু, বৃদ্ধ ও স্ত্রী লোকেরা এই রোগে কম সংখ্যায় আক্রান্ত হয়। যুবকদের ক্ষেত্রেই এই রোগাক্রমণের সংখ্যা বেশী। নিরামিষাশীদের তুলনায় মাংসাশী ব্যক্তিদের ক্ষেত্রেও এই রোগের প্রাদুর্ভাব বেশী।

কোনও কারণে যদি অ্যাপেনডিক্সের ভিতর খাদ্যকণা ঢুকে পড়ে, তবে তা আর বেরিয়ে আসতে পারে না এবং অ্যাপেনডিক্সের ভিতরে থেকে পচতে থাকে। এই বস্তুকণার উপস্থিতির জন্যে অ্যাপেনডিক্সের আয়তন বাড়তে থাকে এবং এই বর্ধিত আয়তন প্রদাহের সৃষ্টি করে। বিভিন্ন রোগজীবাণু আক্রমণের ফলেও অনেক সময় অ্যাপেনডিক্স রোগগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এই সব জীবাণুর মধ্যে ষ্ট্রেপ্টোকক্কাস ও কোলন ব্যাসিলাসের নাম উল্লেখযোগ্য। যে কোনও কারণে রোগাক্রান্ত হবার ফলে অ্যাপেনডিক্সের রক্ত সরবরাহকারী ধমনীগুলিতে বাধার সৃষ্টি হয়। যদি অ্যাপেনডিক্সটি সম্পূর্ণভাবে রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে, তবে অ্যাপেনডিক্সের রক্ত চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায় এবং গ্যাংগ্রিনের সৃষ্টি হয়। এর ফলে তীব্র যন্ত্রণা ও প্রদাহের সৃষ্টি হয়। কোন কোন সময় অ্যাপেনডিক্স রোগাক্রান্ত হয়ে ফেটে যায়, যার ফলে সমস্ত শরীরই রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় জীবনহানির সম্ভাবনাও থাকে।

শ্যামসুন্দর দে*

* ইনস্টিটিউট অব রেডিও-ফিজিক্স অ্যাণ্ড ইলেকট্রনিক্স, বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা-9

প্রধান সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য
শ্রীমিহিরকুমার ভট্টাচার্য কর্তৃক পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-6 হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ 37/7 বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত।

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

চতুর্বিংশ বর্ষ | নভেম্বর, 1971 | একাদশ সংখ্যা

[পাইনিয়েলের সঙ্গে দেহভিত্তিক বহু পরিবর্তনের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা সবে স্থুরু হয়েছে, কিন্তু গত কয়েক বছর ধরে স্নায়ুরসায়নে যে সব কাজ হচ্ছে, তাথেকে মনে হয়, পাইনিয়েল মানুষের ইন্দ্রিয়বিষয়ক গবেষণায় বিশেষ আলোড়ন স্থষ্টি করবে।]

মস্তিষ্কের নিয়ন্ত্রক পাইনিয়েল গ্রন্থি

শ্রীদেবব্রত নাগ ও শ্রীজগৎজীবন ঘোষ*

ভূমিকা

বহু পূর্বে অনেকের ধারণা ছিল, পাইনিয়েল গ্রন্থি মস্তিষ্কের বিভিন্ন কোটরে চিন্তার প্রবাহ নিয়ন্ত্রক। গ্রীক দার্শনিক Descartes তাঁর লেখা এক বইতে (De Homine) উল্লেখ করেছিলেন যে, আত্মানুভূতির পীঠস্থান হলো পাইনিয়েল গ্রন্থি। তাঁর মতে, দেহ হলো যন্ত্রস্বরূপ এবং দেহরূপ যন্ত্রকে পরিচালনা করছে পাইনিয়েল গ্রন্থি। প্রাচীন গ্রীকদের ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি বললেন যে, বহির্বিশ্বের ঘটনাগুলি, যা মনুষ্যদৃষ্টির অন্তরালে অনবরত হয়ে চলেছে, তা কতকগুলি ফাঁপা স্নায়ুপথে দেহপেশীতে সাড়া জাগায়। এসব ধারণার সত্যতা যাচাই করবার বৈজ্ঞানিক প্রস্তুতি তখন সবে স্থুরু হয়েছে। মাত্র আট বছর আগেও পাইনিয়েল সম্পর্কে বহু ধারণা ছিল রহস্যাবৃত। উল্লেখযোগ্য হলো, পাইনিয়েল দেহভিত্তিক বিভিন্ন ঘটনায় সময় নিয়ন্ত্রকরূপে কাজ করে।

*প্রাণরসায়ন বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা-19।

পাইনিয়েলের পরিচয়

পাইনিয়েল গ্রন্থি (Pineal gland) মস্তিষ্কের দুই অর্ধগোলকের মধ্যে অবস্থিত একটি অতি ক্ষুদ্র বস্তু। জানা গেছে একজন প্রাপ্তবয়স্কের পাইনিয়েল গ্রন্থি মোটামুটি দৈর্ঘ্যে 5-9 মি. মি, প্রস্থে 3-6 মি. মি. এবং উচ্চতায় 3-5 মি. মি.। ওজন 100 থেকে 180 গ্রাম। এখন পর্যন্ত এই গ্রন্থিটির বিষয় খুব কমই জানা গেছে। মস্তিষ্কের অধিকাংশ গ্রন্থি যদিও যুগ্ম অবস্থায় থাকে, কিন্তু গ্রীক বৈজ্ঞানিকেরা বহুদিন আগেই এটির অযুগ্ম গঠন-প্রকৃতির পরিচয় জানিয়েছিলেন।

স্তন্যপায়ী জীবদের পাইনিয়েল গ্রন্থি বিভিন্ন সময়ে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, পাইনিয়েল গ্রন্থিতে তিনটি মুখ্য পরিবর্তন লক্ষ্য করবার মত।

(ক) পাইনিয়েলে প্যারেনকাইম্যাল (Parenchymal) কোষ নামে এক নতুন কোষের আবির্ভাব হয়। এই কোষগুলির বৈশিষ্ট্য হলো, অতি কঠিন আবরণ দিয়ে ঢাকা না থাকায় সাধারণতঃ এরা গোলাকৃতির হয়ে থাকে। এক-একটি কোষে বহু সংখ্যক subcellular organelles থাকে। আর ঐ organelles-এর মধ্যে উত্তেজক রস (Hormones) প্রস্তুতকারক উপাদান এবং উত্তেজক রস নিঃসৃত হবার ব্যবস্থাও আছে।

(খ) পাইনিয়েল গ্রন্থিতে কোষবিন্যাস বিশেষ প্রকৃতিতে হয়ে থাকে।

(গ) স্তন্যপায়ী জীবের পাইনিয়েল গ্রন্থি যদিও মাতৃগর্ভে মস্তিষ্কের অন্যান্য অংশের মতই প্রথমে যুগ্ম অবস্থায় থাকে, কিন্তু ক্রমশঃ অযুগ্ম গ্রন্থিতে পরিবর্তিত হয়। জন্মের ঠিক পরেই পাইনিয়েল গ্রন্থি মস্তিষ্কের অন্যান্য অংশের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক হারায়। মস্তিষ্কের কোন খবরই তখন সরাসরি পাইনিয়েল গ্রন্থিতে পৌঁছে না। এখন জানা গেছে, কোন একটি বিশেষ স্নায়ুপথে বিভিন্ন ঘটনা পাইনিয়েলে প্রবাহিত হয়, যদিও মস্তিষ্কের অন্যান্য স্থানে সাধারণতঃ রক্তের মাধ্যমেই তা হয়ে থাকে।

পাইনিয়েলের দেহভিত্তিক পরিচয়

1898 সনে নিদানশাস্ত্রবিদ্ (Pathologist) O. Heubner প্রথম পাইনিয়েলের দেহভিত্তিক পরিচয় দিতে সক্ষম হন। তিনি দেখালেন যে, একটি ছয় বছরের ছেলের পাইনিয়েল গ্রন্থি টিউমারের সাহায্যে নষ্ট করে দিলে তার যৌনপ্রাবল্য প্রচণ্ডরূপে বেড়ে যায়। এর পর গোনাডের সঙ্গে পাইনিয়েলের সম্পর্ক জানবার চেষ্টা অনেকেই করেছেন। অনেক মতপার্থক্যও দেখা দিল। জানা গেল, পাইনিয়েল গ্রন্থি বয়ঃসন্ধিস্থলে ক্যালসিয়ামে ভরে যায়। অনেকের ধারণা হলো, পাইনিয়েল একটি অকেজো গ্রন্থি। পরে দেখা গেল calcified পাইনিয়েল গ্রন্থি যথেষ্ট সক্রিয়।

1918 সালে শারীরবিদ্ N. Holmgren কতকগুলি উভচর প্রাণী এবং মাছের পাইনিয়েল গ্রন্থিতে বিশেষ অনুভূতি বহনক্ষম কোষ খুঁজে পেলেন। এগুলি দেখতে অনেকটা প্রাণীদের চোখের আলোকগ্রাহী (Photoreceptor) কোষের মত। এরপর Lamprey জাতীয় মাছ এবং টিকটিকি জাতীয় প্রাণীদের পাইনিয়েল গ্রন্থিতেও অনুরূপ আলোকগ্রাহী কোষের সন্ধান পাওয়া গেল। D. E. Kelly ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ ব্যবহার করে ব্যাঙের অক্ষিপট এবং পাইনিয়েলের আলোকগ্রাহী কোষগুলির মধ্যে একটা অত্যাশ্চর্য মিল দেখতে পেলেন। স্নায়ু-শারীরবিদ্ (Neurophysiologist) E. Dodt এবং তাঁর সহকর্মীরা দেখালেন যে, ব্যাঙের পাইনিয়েল গ্রন্থি বিভিন্ন তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের আলোর প্রভাবে বিভিন্ন রকম স্নায়বিক সাড়া দেয়। তাঁরা দেখতে পেলেন, গরুর পাইনিয়েল নির্যাস (Pineal extract) যদি ব্যাং এবং ব্যাঙাচিদের খাওয়ানো যায়, তবে তাদের চামড়া ফ্যাকাশে হয়ে যায়।

1958 সালে একাধারে প্রাণরসায়নবিদ্ এবং চর্মবিদ্ A. B. Lerner গবাদি পশুর পাইনিয়েল নির্যাস থেকে উভচর প্রাণীদের চর্মকে সাদা করে দেবার মূল বস্তুটি পেতে সক্ষম হলেন। নানা পরীক্ষা থেকে প্রমাণ হলো, বস্তুটি ইন্ডোল শ্রেণীভুক্ত, 5-হাইড্রোক্সি-N-অ্যাসিটাইল ট্রিপ্-টাসিন, যদিও মেলাটোনিন নামেই বেশী পরিচিত। পাইনিয়েল গ্রন্থিতে এই বস্তুটি আবিষ্কারের পর মস্তিষ্কে এই গ্রন্থিটির মূল্য আরও অনেক বেড়ে গেল।

পাইনিয়েলের প্রাণরসায়ন—মেলাটোনিনের ভূমিকা

জানা গেছে মেলাটোনিন একটি উচ্চক্ষমতা-সম্পন্ন রাসায়নিক পদার্থ। এটি ব্যাঙের চামড়ার কালোর মাত্রা সংকোচনে অংশগ্রহণ করে। নর-অ্যাড্রিন্যালিন (Noradrenaline) বস্তুটি সম্পর্কেও এরকম জানা ছিল। এখন দেখা যাচ্ছে, মেলাটোনিন নরঅ্যাড্রিন্যালিন অপেক্ষা প্রায় 10^5 গুণ বেশী ক্ষমতাসম্পন্ন। মাত্র 10^{-13} গ্র্যাম/সি.সি. মেলাটোনিনেই উপরিউক্ত ফল পাওয়া যায়। অত কম মেলাটোনিন প্রয়োগ করলেই অন্ধকারে বহু মাছ এবং উভচর প্রাণীদের চর্মের রং খুব দ্রুত ফ্যাকাশে হয়ে যায়। Xenopus ব্যাঙাচি কিংবা গিরগিটি (Salamander) জাতীয় প্রাণীদের পাইনিয়েল গ্রন্থি কিংবা পাইনিয়েলসংলগ্ন স্থানগুলি অপসারণ করলে ঐ প্রাণীগুলি অন্ধকারে ফ্যাকাশে হবার ক্ষমতা হারায়। উভচর প্রাণীদের পাইনিয়েল গ্রন্থিতে মেলাটোনিন তো আছেই—এমন কি, মেলাটোনিন সংশ্লেষণক্ষম প্রয়োজনীয় জৈব অনুঘটক-গুলিও আছে। চর্মের উপর মেলাটোনিনের প্রভাব সম্পর্কিত বিভিন্ন পরীক্ষা এবং উপরিউক্ত পর্যবেক্ষণগুলি থেকে মনে হচ্ছে, আলোর প্রভাবে মেলাটোনিন সংশ্লেষণের সঙ্গে চর্মের রং পরিবর্তনের একটা সম্পর্ক আছে। এও জানা গেছে যে, প্রাণীদের গোনাডে (Gonad) মেলাটোনিনের বিশেষ ক্ষতিকারক প্রভাব আছে। মেলাটোনিন স্বল্পবয়সী বলিষ্ঠ ইঁদুরগুলির যোনিনালী উন্মুক্ত করতে বিলম্ব ঘটায় এবং ডিম্বকোষের (Ovary) ওজন কমিয়ে দেয়। দৈনিক vaginal smear নিয়ে দেখা গেছে, মেলাটোনিন স্ত্রী-ঋতুচক্রের (Estrous cycle) সময় কমিয়ে দেয়। মেলাটোনিন ইঁদুরের মস্তিষ্কে median of eminence নামক স্থানটিতে প্রয়োগ করে দেখা গেছে যে, মস্তিষ্কে পিটুইটারি গ্রন্থিতে lutenising উত্তেজক রসের সঞ্চয় কমিয়ে দেয়। কেবল তাই নয়, চর্মের রং যে সব উত্তেজক রসের উপর নির্ভরশীল, মেলা-টোনিন সেই সব উত্তেজক রসের ঘনত্ব পিটুই-টারিতে কমিয়ে দেয়। পাখীদের ক্ষেত্রে দেখা গেছে, মেলাটোনিন ওদের অণ্ডকোষ (Testis), ডিম্বকোষ (Ovary) এবং ডিম্বনালীর (Oviduct) ওজন কমায়। এও দেখা গেছে, মেলাটোনিন মস্তিষ্কের পিটুইটারি গ্রন্থিতে MSH (Melanophore Stimulating Hormone) নামক উত্তেজক রসের পরিমাণ কমিয়ে দেয়। কেবল তাই নয়, থাইরয়েড গ্রন্থিতে তেজস্ক্রিয় আয়োডিন এবং হাইড্রোজেন গ্রহণক্ষমতা হ্রাস করে দেয়। লোহিত কণিকা বাদ দিলে রক্তের জলীয় দ্রবণকে serum বা রক্তমস্তু বলে। রক্তমস্তুতে বীজকোষ উত্তেজক রসের (Follicle Stimulating Hormone পরিমাণও কমে যায়। পেনসিল মাছে দেখা গেছে, মেলাটোনিন কতকগুলি রঙের বৃদ্ধি এবং অন্য কতকগুলির সংকোচনে অংশগ্রহণ করে।

পুরুষ তীক্ষ্ণ দন্তবিশিষ্ট বড় ইঁদুর (Hamstar) এবং নকুলজাতীয় জন্তুদের (Ferrets) ক্ষেত্রে দেখা গেছে, ওদের গোনাডের উপর পাইনিয়েল গ্রন্থির বিশেষ প্রভাব আছে। ঐ প্রাণীগুলিকে অন্ধ করে দিলে ওদের অণ্ডকোষের ওজন কমে যায়, কিন্তু পাইনিয়েল গ্রন্থি অপসারণ করলে কিংবা

পাইনিয়েলের স্নায়ু-যোগ ছিন্ন করলে ঐ পরিবর্তনগুলি দেখা যায় না। Lamprey জাতীয় মাছে মনে হয়, পাইনিয়েল গ্রন্থি ওদের গঠন-প্রকৃতির নিয়ন্ত্রকরূপে কাজ করে। চড়ুই পাখীর পাইনিয়েল গ্রন্থি একটি অতি প্রয়োজনীয় সময়-নির্ধারক যন্ত্রের কাজ করে।

মেলাটোনিন সংশ্লেষণ

পাইনিয়েলে মেলাটোনিনের আবিষ্কার এবং তার পরিচয় জানবার পর বস্তুটি কিভাবে সেখানে বিভিন্ন জৈব অনুঘটকের দ্বারা সংশ্লেষিত হয়, তা জানবার চেষ্টা সুরু হয়। প্রাণরাসায়নিক পদ্ধতিটি সংক্ষেপে দেখানো হলো।

f ট্রিপটোফ্যান

↓ f ট্রিপটোফ্যান হাইড্রক্সিলেজ (1)

5-হাইড্রোক্সি ট্রিপটোফ্যান

↓ অ্যামিনো অ্যাসিড ডিকার্বক্সিলেজ (2)

সেরোটোনিন

↓ সেরোটোনিন অ্যাসিটাইলেজ (3)

N-অ্যাসিটাইল সেরোটোনিন

↓ O-মিথাইল ট্রান্সফারেজ (4)

মেলাটোনিন

মেলাটোনিন সংশ্লেষণের (1) থেকে (4) পর্যন্ত বিভিন্ন ধাপগুলি প্রাণরাসায়নিক নানা পরীক্ষা থেকে জানা গেছে।

পাইনিয়েলের প্রাণরাসায়নিক নিয়ন্ত্রণ

পাইনিয়েল সম্পর্কিত উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার হলো গ্রন্থিটির রাসায়নিক বিক্রিয়াগুলি পরিবেশ-জনিত আলোকের দ্বারা প্রভাবিত হয়। এই প্রভাব বিশেষ স্নায়ুপথে পরিচালিত হয়; অর্থাৎ স্নায়ুরাসায়নিক পরিবর্তকরূপে এই গ্রন্থিটি আলোক-সংবাদকে রাসায়নিক সংবাদে রূপান্তরিত করে। 1960 সালে V. Fiske এবং তাঁর সহকর্মীরা প্রথম দেখালেন যে, ক্রমাগত আলোকের প্রভাবে ইঁদুরের পাইনিয়েলের ওজন ক্রমশঃ কমে যায়। প্রথমে দেখা গিয়েছিল যে, অপরিবর্তিত আলোক-উজ্জ্বলতায় ইঁদুরের স্ত্রী-ঋতুচক্রের নিয়মিত পরিবর্তন ঘটে না। এর পর দেখা গেল, Bovine পাইনিয়েল গ্রন্থির নির্যাস ইঁদুরে প্রয়োগ করলে অপরিবর্তিত আলোক-উজ্জ্বলতায় থাকা অবস্থাতেও স্ত্রী-ঋতুচক্রের পরিবর্তন হয়। এসব পর্যবেক্ষণ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, পাইনিয়েল গ্রন্থিতে এমন বস্তু আছে, যা গোনাডকে ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং যার সংশ্লেষণ ও নিঃসরণ অপরিবর্তিত আলোক-উজ্জ্বলতায় কমে যায়। 1960 সালে Axelrod পাইনিয়েল গ্রন্থিতে মেলাটোনিন সংশ্লেষক জৈব অনুঘটকের সন্ধান দিলেন। এর কিছু দিন পরে তাঁরা দেখালেন, মেলাটোনিন স্ত্রী-ঋতুচক্রের সময় মন্দীভূত করে দেয়। এসব পরীক্ষা পাইনিয়েলে মেলাটোনিনের সংশ্লেষণ এবং নিঃসরণের উপর পরিবেশজনিত আলোর প্রভাব এবং স্ত্রী-ঋতুচক্র নিয়ন্ত্রণে পাইনিয়েল গ্রন্থির উল্লেখযোগ্য ভূমিকা স্মরণ করিয়ে দেয়; অর্থাৎ ক্রমাগত অপরিবর্তিত আলোক-উজ্জ্বলতায় গোনাড নিরোধক বা মেলাটোনিন সংশ্লেষণে বাধাদানই স্ত্রী-ঋতুচক্রের পরিবর্তন না হবার কারণ।

এখন প্রশ্ন হলো, আলোক পরিবেশ প্রাণীদের পাইনিয়েল গ্রন্থিতে বিশেষ বার্তা কিভাবে পৌঁছে দেয় এবং প্রাণরাসায়নিক যন্ত্রগুলিই বা কিভাবে প্রভাবিত হয়?

Lamprey জাতীয় মাছ, উভচর প্রাণী (যেমন, ব্যাং) এবং সরীসৃপজাতীয় প্রাণী (যেমন, টিকটিকি) ইত্যাদির মস্তিষ্কের উপরিভাগের কাছাকাছি একটি পাইনিয়েল সহযোগী গ্রন্থি দেখা যায়। এটিকে বলা হয় প্যারা-পাইনিয়েল গ্রন্থি। এই গ্রন্থিটি আলোর প্রভাবে সাড়া দেয়। পাখীদের পাইনিয়েল গ্রন্থিতেও এমন কোষ আছে, যে আলোর প্রভাবে সাড়া দেয়।

submammalian vertebrate-দের মত স্তন্যপায়ী প্রাণীদের পাইনিয়েলে কোন আলোক-গ্রাহী কোষ পাওয়া যায় নি। sympathetic স্নায়ুকোষের প্রান্তভাগগুলি সরাসরি parenchymal কোষের সঙ্গে যুক্ত থাকে। সবচেয়ে সম্ভাব্য যে পথে আলো পাইনিয়েলের প্রাণ-রাসায়নিক যন্ত্রকে প্রভাবিত করে, তা মনে হয় sympathetic nerves-এর মাধ্যমে হয়ে থাকে। এর সম্ভাব্যতা প্রমাণ করবার জন্যে ইঁদুরের পাইনিয়েল গ্রন্থি থেকে উর্ধ্বতন cervical ganglia অপসারণ করে দেখা গেল, সাধারণ ইঁদুরের মত উপরের ইঁদুরটিকে সর্বক্ষণ আলো অথবা অন্ধকারে রেখে দিলে 5-হাইড্রোক্সি ইন্ডোল-O-মিথাইল ট্রান্সফারেজ বা সংক্ষেপে HIOMT নামক জৈব অনুঘটকটির সক্রিয়তার কোন রকম পরিবর্তন হয় না। অন্য একটি পরীক্ষায়—যে সব স্নায়ুকোষগুলি উত্তেজিত হলে নরঅ্যাড্রিনালিন কিংবা সেরোটোনিন উত্তেজক রস নিঃসৃত হয়, তা কেটে যোগাযোগ নষ্ট করে দেওয়া হলো। দেখা গেল, এর ফলে আলোর প্রভাবে পাইনিয়েলে HIOMT-এর কোন রকম পরিবর্তন হয় না। আলো মস্তিষ্কের কোন্ স্নায়ু-পথে পাইনিয়েলে সাড়া জাগায় তবু জানা গেল না। প্রাণরসায়ন পদ্ধতির সাহায্যে যদিও এখন অনেকটা জানা গেছে।

বিভিন্ন স্তন্যপায়ী প্রাণী—যেমন, তীক্ষ্ণ দন্তবিশিষ্ট বড় ইঁদুর, নকুলজাতীয় জন্তু এবং বাঁদর প্রভৃতিতে দেখা গেছে—পরিবেশজনিত আলোক-সঙ্কেত sympathetic nervous system-এর পথে পাইনিয়েলে পৌঁছে। ইঁদুরের স্ত্রী-ঋতুচক্রের, তীক্ষ্ণ-দন্তবিশিষ্ট বড় ইঁদুরের অণ্ডকোষের ওজন, গোনাডের কার্যপ্রণালী ইত্যাদি পরিবেশজনিত আলোর দ্বারা পরিচালিত হয়। আলো অক্ষিপটকে উত্তেজিত করে এবং স্নায়ুসঙ্কেত নির্দিষ্ট স্নায়ু-পথে পাইনিয়েল গ্রন্থিতে পৌঁছে। এর ফলে স্নায়ুসঙ্কেতের প্রকৃতি অনুযায়ী পাইনিয়েলে মেলাটোনিন সংশ্লেষণ ত্বরান্বিত বা মন্দীভূত হয়।

স্তন্যপায়ী প্রাণীদের ক্ষেত্রে আলো যে পথে পাইনিয়েলে সাড়া জাগায়, পাখীদের ক্ষেত্রে কিন্তু এই কাজটি ভিন্ন পথে হয়। দেখা গেছে, মুরগীর পাইনিয়েল গ্রন্থিতে মেলাটোনিন প্রস্তুতকারক জৈব অনুঘটকগুলি নিয়মিত অপরিবর্তিত আলোকে অনেক বেশী উত্তেজিত থাকে। মুরগীর চোখ অন্ধ করে দিলে কিংবা তাদের sympathetic ganglia অপসারণ করলেও নিয়মিত আলো বা অন্ধকারে ওদের পাইনিয়েল গ্রন্থিতে HIOMT-এর পরিবর্তন হয়। সুতরাং পাখীদের ক্ষেত্রে অক্ষিপট এবং sympathetic nerve কোনটাই পাই-নিয়েলে আলোক এবং মেলাটোনিন সংশ্লেষণের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত নয় বলেই মনে হয়। বিশেষ একটি পরীক্ষায় এক ধরণের জাপানী শিকারী পাখীর মাথার ঠিক উপরিভাগে তেজস্ক্রিয় প্রলেপ দিয়ে দেখা গেল, উচ্চ তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের আলো ঐ পাখীর পাইনিয়েল গ্রন্থিতে সাড়া জাগায়, কিন্তু স্বল্প তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের আলোতে সেরূপ হয় না। এও দেখা গেল যে, সদ্যোজাত ইঁদুরের পাইনিয়েল গ্রন্থিতে আলো অক্ষিপট ছাড়া অন্য পথে সেরো-টোনিনের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়। যদিও 27 দিন পরে ইঁদুরের অক্ষিপট ছাড়া অন্য পথটি আলোর প্রভাবে আর সাড়া দেয় না।

স্তন্যপায়ী জীবদের ক্ষেত্রে মেলাটোনিন সংশ্লেষণকে প্রভাবিত করে sympathetic transmitter, যেমন—নরঅ্যাড্রিনালিন। ট্রিপটো-ফ্যান থেকে মেলাটোনিন সংশ্লেষণের পথটি আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। দেখা গেছে, নর-অ্যাড্রিনালিন, cyclic AMP ইত্যাদি পদার্থগুলি ট্রিপটোফ্যান থেকে মেলাটোনিন সংশ্লেষণ বাড়িয়ে দেয়। এথেকে মনে হয়, আলোর প্রভাবে যে স্নায়ুস্পন্দনের সূচনা হয়, তা স্নায়ুকোষে বিশেষ পরিবর্তন ঘটিয়ে নরঅ্যাড্রিনালিন আরও বেশী

নিঃসৃত করে। অতিরিক্ত নরঅ্যাড্রিনালিন তখন মেলাটোনিন সংশ্লেষণকে পরিবর্তিত করে। হয়তো মেলাটোনিন সংশ্লেষণে সরাসরি অংশগ্রহণ না করে নরঅ্যাড্রিনালিন অধিক পরিমাণ cyclic AMP সংশ্লেষণে অংশগ্রহণ করে। Wurtman এবং Axelrod 14C-ট্রিপটোফ্যান ব্যবহার করে দেখিয়েছেন যে, নরঅ্যাড্রিনালিন পাইনিয়েল কোষের দুটি পৃথক স্থানে কাজ করে। একটি কেন্দ্রে নরঅ্যাড্রিনালিন ট্রিপটোফ্যান-এর পরিবহন ক্ষমতা বাড়ায় আর অন্য একটি কেন্দ্রে cyclic AMP সংশ্লেষণে অংশ গ্রহণ করে। অতিরিক্ত cyclic AMP তখন বিভিন্ন ধাপে কাজ করে অধিক পরিমাণ মেলাটোনিন তৈরি করে।

প্রাত্যহিক ছন্দ

স্তন্যপায়ী প্রাণীদের পাইনিয়েল গ্রন্থিতে সেরোটোনিন খুব বেশী পরিমাণে থাকে। parenchymal কোষ এবং sympathetic স্নায়ু-প্রান্তের মধ্যে এই সেরোটোনিন সমানভাবে ছড়িয়ে আছে—কোথাও কম বা বেশী নেই। সাধারণতঃ দেখা গেছে, দিনের বেলায় সেরোটোনিনের পরিমাণ পাইনিয়েল গ্রন্থিতে সবচেয়ে বেশী থাকে, কিন্তু দিনের আলো কমে যাবার সঙ্গে সঙ্গে সেরোটোনিনের পরিমাণ কমতে থাকে। কোন্ বিশেষ কলকাঠির মাধ্যমে পাইনিয়েল গ্রন্থিতে দিনের আলো এবং অন্ধকারের সঙ্গে সেরোটোনিনের পরিমাণ যথাক্রমে বাড়ে বা কমে, তা জানবার জন্যে কয়েকটি পরীক্ষা করা হলো। কতকগুলি ইঁদুরকে অনবরত হয় সম্পূর্ণ অন্ধকারে, নয়তো সম্পূর্ণ আলোতে রেখে পাইনিয়েলে সেরোটোনিনের পরিমাণ মেপে দেখা গেল—যদি ইঁদুরগুলিকে সম্পূর্ণ অন্ধকারে সর্বক্ষণ রাখা যায় কিংবা ইঁদুরগুলিকে অন্ধ করে দেওয়া হয়, তবু দিনের সঙ্গে সেরোটোনিনের পরিমাণগত পরিবর্তন হতে দেখা যায়। সুতরাং মনে হয়, সেরোটোনিনের বাড়া বা কমা নির্ভর করছে একটি অন্তঃস্থ জৈবিক ঘড়ির (Biological clock) উপর। যদি বিশেষ অবস্থা সৃষ্টি করে জৈবিক ছন্দের (Biological rhythm) পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব হয়, অর্থাৎ দিনের বেলায় অন্ধকার পরিবেশে রেখে কিংবা রাত্রি বেলায় আলোর পরিবেশ সৃষ্টি করে দেখা গেছে, সেরোটোনিনের পরিমাণগত পরিবর্তন সাধারণ দিন বা রাত্রির বিপরীত নিয়মে বাড়ে বা কমে। পরীক্ষা থেকে এই প্রমাণ হয় যে, যদিও সেরোটোনিনের বাড়া বা কমা নির্ভর করছে একটি কেন্দ্রস্থ জৈবিক পরিচালন ব্যবস্থার উপর, কিন্তু ঐ পরিচালন ব্যবস্থা পরিবেশজনিত আলো এবং অন্ধকারের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। HIOMT-এর উপর যে সব কাজ হয়েছে, তাথেকে বোঝা যাচ্ছে যে, সেরোটোনিনের বাড়া বা কমার যে ছন্দ নিয়ন্ত্রিত হয়, তা স্নায়ুপথেই নির্দেশিত হয়। স্নায়ুপথ রোধ করে দিলে কিংবা স্নায়ুপথ ছিন্ন করে দিলে দেখা যায়, নিয়মিত সেরোটোনিনের বাড়া বা কমার ছন্দে পতন ঘটে। সদ্যোজাত ইঁদুরে এই ধরণের প্রাত্যহিক ছন্দ দেখা যায়, যদিও ছয় দিন পরে তা প্রকাশ পায়।

পাইনিয়েলে নরঅ্যাড্রিনালিনও ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে একটি নিয়মিত নিয়মে বাড়ে বা কমে। স্নায়ুপ্রান্তে এই বস্তুটি প্রচুর পরিমাণে থাকে। নরঅ্যাড্রিনালিন রাত্রি বেলায় সবচেয়ে বেশী, কিন্তু দিনের বেলায় সবচেয়ে কম থাকে। যদি ইঁদুরগুলিকে সম্পূর্ণ অন্ধ করে আলো কিংবা অন্ধকারে রাখা যায়, তবে ওদের নরঅ্যাড্রিনালিনের বাড়া বা কমার ছন্দে পতন ঘটে। সুতরাং সেরোটোনিনের সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যাচ্ছে, নরঅ্যাড্রিনালিনের বাড়া বা কমা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে বাইরে থেকে। পরিবেশজনিত বার্তা পাইনিয়েলে পৌঁছাবার পর HIOMT-এর মত নরঅ্যাড্রিনালিনেরও পরিবর্তন ঘটায়।

পাইনিয়েল গবেষণার ভবিষ্যৎ

পাইনিয়েলের উপর বর্তমান পরীক্ষা এবং পর্যবেক্ষণ থেকে মনে হচ্ছে, পাইনিয়েল মস্তিষ্কের একটি অতি ক্ষুদ্র স্থান অধিকার করা সত্ত্বেও এটি নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে বহু প্রাণ-রাসায়নিক ঘটনার মূলে কাজ করছে। মানসিক রোগ, নিদ্রা, চর্মের রং, স্ত্রী-ঋতুচক্রের পরিবর্তন, আলোর প্রভাব প্রভৃতি পাইনিয়েলের সঙ্গে উল্লেখযোগ্যভাবে জড়িত। স্বতঃস্ফূর্ত তেজস্ক্রিয় পদার্থের ন্যায় পাইনিয়েলও মনের বিভিন্ন প্রকাশ সৃষ্টি করে কিনা, জানা নেই। এও জানা নেই, মস্তিষ্ক থেকেই মনের সৃষ্টি, না মন বহি জগতের কোন বস্তু এবং মস্তিষ্করূপ যন্ত্রে ধরা পড়ছে। দুইয়ের মধ্যে মতপার্থক্য যাই হোক না কেন, দেখা যাচ্ছে পাইনিয়েল শব্দ, আলো, তাপ এবং সময়ের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। সুতরাং পরিবেশজনিত অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে মস্তিষ্কে যে সব প্রাণরাসায়নিক ঘটনা ঘটছে, তার মূলে যে পাইনিয়েল গ্রন্থি কাজ করছে, তা অস্বীকার করা যায় না। বিশেষ করে মানসিক রোগগুলি কোন্ কোন্ স্তরে পরিবর্তন ঘটায় এবং তা পাইনিয়েল গ্রন্থির সঙ্গে কতটা জড়িত, তাও পরীক্ষা করে দেখা উচিত। কারণ আগেই বলেছি, পাইনিয়েল যেন বিভিন্ন চিন্তার প্রবাহ নিয়ন্ত্রক যন্ত্র। আবার যেহেতু পাইনিয়েল প্রাত্যহিক জৈবিক ছন্দ নিয়ন্ত্রক যন্ত্র, সেহেতু বিভিন্ন ঔষধ দিনের কোন্ সময়ে, কতটা, কিভাবে কার্যকরী হবে, সে বিষয়ে পরীক্ষা করে তবে প্রয়োগ করা উচিত। আমরা যখন অতি দ্রুত গতিতে এক দেশ ছেড়ে অন্য দেশে যাওয়া-আসা করি, তখনও কিন্তু কিছু সময়ের জন্যে পাইনিয়েলের নিয়মিত জৈবিক ঘড়ির বিপরীত দিকে কাজ করি। পাইনিয়েল যে এর জন্যে খানিকটা ক্ষতি-গ্রস্ত হতে পারে, তা বলাই বাহুল্য। তাই মনে হয়, যান্ত্রিক উন্নতি যদিও মানুষের সময় বাঁচিয়ে দিয়েছে, কিন্তু মানুষের জীবনে আরও অনেক সমস্যার সৃষ্টি করেছে। মানুষের সুখ-দুঃখ এবং ভালবাসার জীবনে ভাটা পড়ুক, বিজ্ঞান কখনই তা চায় না। দৈনন্দিন জীবনে যে সব কারণ মানুষের সুস্থ জীবনযাপনে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, তা সংশোধনের পথই আজ সবাই খুঁজছে। মানসিক রোগগ্রস্ত মানুষেরা সমাজে কিভাবে সুস্থ জীবনযাপন করতে পারে, সেই জন্যেই মস্তিষ্কের প্রতিটি কলকাঠি ভাল করে পরীক্ষা করে দেখবার সময় হয়েছে। এই ক্ষেত্রে পাইনিয়েলের মূল্য যথেষ্ট বলেই আমাদের ধারণা।

পদার্থ ও জীবন

শ্রীপ্রদীপকুমার দত্ত*

কোনো এক সুদূর অতীতে পৃথিবীতে প্রথম প্রাণের প্রকাশ ঘটে। তার পর থেকে পৃথিবীর কত পরিবর্তন হয়েছে, কত প্রাণীর মৃত্যু হয়েছে, নতুন প্রাণী জন্ম নিয়েছে। প্রাণের বিকাশের পথে একদিন জন্ম হয়েছে মানুষের। আজ পর্যন্ত মানুষই পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ জীব। মানুষের আবির্ভাবের পর থেকে আজ পর্যন্ত যে প্রশ্নের মীমাংসা সর্বজনগ্রাহ্য হয় নি, তা হলো জীবনকে কেন্দ্র করেই—জীবনের অস্তিত্বের সূচনা নিয়ে। এই সম্বন্ধে দেশে দেশে, যুগে যুগে দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকেরা নানাভাবে চিন্তা করেছেন এবং তাঁদের সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেছেন। প্রাচীন দার্শনিকদের সিদ্ধান্ত হলো এই যে, প্রাণের সৃষ্টির পিছনে রয়েছে এক অজ্ঞেয় সর্বশক্তিমান পুরুষ—ঈশ্বর। তিনিই সমগ্র জীব-জগতের স্রষ্টা। তারপর থেকে ঈশ্বরের ধারণা আজও মানুষের মনে বদ্ধমূল হয়ে বসে আছে। আর যুগে যুগে প্রতিক্রিয়াশীল শোষক শ্রেণী মানুষের এই ধারণাকে তাদের শোষণ অব্যাহত রাখবার হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করেছে। কিন্তু আজ দিন পাল্টেছে। বিজ্ঞান হয়েছে উন্নত। আর তাই আজকের বিজ্ঞানীরা দেখিয়েছেন যে, জীবজগৎ ঈশ্বর নামক অলৌকিক কোনও শক্তি বা পুরুষের সৃষ্টি নয়। জীবনের অস্তিত্ব ও তার নানা ক্রিয়াকলাপ ব্যাখ্যা করবার জন্যে ঈশ্বরের ধারণা সম্পূর্ণরূপে বাতিল করে দিয়ে তাঁরা বলেছেন যে, পদার্থ-বিজ্ঞান, রসায়ন ও জীব-বিজ্ঞানই সম্পূর্ণরূপে জীবনের নানা ক্রিয়াকলাপ ব্যাখ্যা করতে সক্ষম। জীবনের সৃষ্টি আমাদেরই চেনা পরিচিত পদার্থ থেকে। নানা জটিল রাসায়নিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার দ্বারাই পদার্থের রূপান্তরের মধ্য দিয়ে প্রাণের সৃষ্টি। প্রাণিদেহের ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার সঙ্গে আমাদের জানা পরীক্ষাগারের ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার মূলগত কোনও পার্থক্য নেই, পার্থক্য শুধু এই যে, প্রথমটি দ্বিতীয়টি অপেক্ষা অনেক জটিল।

অতি প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ নানা জৈব পদার্থের ব্যবহার করে এসেছে। এই সকল জৈব পদার্থ তখন কেবলমাত্র প্রাণিদেহ থেকে পাওয়া যেত। প্রাণিদেহ ছাড়া কৃত্রিম উপায়ে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকেও এদের পাওয়া সম্ভব ছিল না। তাই এদের বলা হতো জৈব পদার্থ। মানুষের ধারণা ছিল, জীবদেহে কোন অজ্ঞাত প্রাণশক্তির সাহায্যেই এই সকল জৈব পদার্থের সৃষ্টি হয়। প্রাণহীন বস্তু থেকে ধাতু, লবণ, ক্ষার প্রভৃতি যে সমস্ত জিনিষ পাওয়া যেত, তাদের বলা হতো অজৈব পদার্থ। অজৈব পদার্থের সংযুতি বা গঠন (Structure) জৈব পদার্থের গঠন অপেক্ষা অনেক সরল। তাই তখন বৈজ্ঞানিকদের ধারণা ছিল যে, জৈব পদার্থের সৃষ্টি অজৈব পদার্থ থেকে হওয়া সম্ভব নয়। এই ধারণার মূলে প্রথম কুঠারাঘাত হয় 1828 সালে, যখন অজৈব পদার্থ অ্যামোনিয়াম সায়ানেট থেকে জৈব পদার্থ ইউরিয়া প্রস্তুত করা সম্ভব হয়। এর পর থেকে বৈজ্ঞানিকেরা পরীক্ষাগারে আরও যে কত জৈব পদার্থ প্রস্তুত করেছেন, তার ইয়ত্তা নেই; অর্থাৎ জড় পদার্থ থেকে জৈব পদার্থের সৃষ্টি হতে কোনও

* পদার্থ-বিজ্ঞান বিভাগ, আচার্য বি. এন. শীল কলেজ, কোচবিহার।

বাধা নেই এবং তা হওয়া একান্তভাবেই সম্ভব। একই নিয়মের সূত্রে জৈব ও অজৈব উভয় পদার্থের রাসায়নিক ক্রিয়া গ্রথিত।

জীবন-রহস্যের উদ্‌ঘাটন আজও সম্পূর্ণ হয় নি। এর কারণ বিজ্ঞানের তিন শাখার (পদার্থ-বিজ্ঞান, রসায়ন ও জীব-বিজ্ঞান) মধ্যে দীর্ঘদিন পর্যন্ত কোন সংযোগসূত্র ছিল না। তিন শাখার বৈজ্ঞানিকেরা পৃথক পৃথকভাবে নিজেদের শাখায় গবেষণা করতেন, অন্য শাখাগুলি সম্বন্ধে তাঁরা বিশেষ আগ্রহান্বিত ছিলেন না, অথচ এক শাখার প্রগতি অন্য শাখার উপর নির্ভরশীল। একের সঙ্গে অপরের সম্পর্ক নিবিড়। প্রাসঙ্গিক একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। প্রাণিদেহের অণুগুলির মধ্যে যে পারস্পরিক বল ক্রিয়া করে, তা করে পদার্থ-বিজ্ঞানের মূল তত্ত্বানুযায়ী। তাই অণুগুলির মধ্যেকার বল সম্বন্ধে জানতে হলে পদার্থ-বিজ্ঞানের সাহায্য নিতেই হবে। এখানেই জীব-বিজ্ঞানী ও পদার্থ-বিজ্ঞানীর মধ্যে একাত্মতা। এরকম আরও অসংখ্য উদাহরণ দেওয়া যায়। সুখের বিষয় বর্তমানে বৈজ্ঞানিকেরা বিভিন্ন শাখার মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করে নানা রহস্য উদ্‌ঘাটনে ব্রতী হয়েছেন।

জীবনের কথায় ফিরে আসা যাক। প্রশ্ন হতে পারে, জীবনের প্রধান ধর্ম কি? জীবনের অস্তিত্ব কিভাবে বোঝা যাবে? এই সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনায় না গিয়ে এটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, যার জীবন আছে, তার জনন ক্ষমতা (Reproduction) ও বৃদ্ধি থাকবে। প্রাণিদেহের বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ এই দুটি সংঘটিত করে। প্রাণিদেহে অসংখ্য রাসায়নিক পদার্থ আছে। সেগুলির সব কয়টির ভূমিকা বা ক্রিয়া সম্বন্ধে আলোচনা করা বর্তমান প্রবন্ধের পরিসরে সম্ভব নয়। বোধ হয় বর্তমান প্রবন্ধে তার বিশেষ প্রয়োজনও নেই। কারণ প্রাণিদেহে প্রাণের প্রকাশ ও প্রাণের ধর্মাবলী নিয়ন্ত্রিত হয় দুই বা তিন শ্রেণীর রাসায়নিক পদার্থের দ্বারা। সেগুলির সব কয়টিই উচ্চ পলিমার (High polymer)। উচ্চ পলিমারের সঙ্গে সাধারণ রাসায়নিক পদার্থের পার্থক্য হলো এই যে, এদের আণবিক গঠন অপেক্ষাকৃত জটিল এবং এদের অণুসমূহ অনেকগুলি পরমাণুর (কোনও কোনও ক্ষেত্রে দশ লক্ষেরও বেশী) দ্বারা গঠিত। প্রাণিদেহের অন্যতম প্রধান উপাদান হলো প্রোটিন। প্রোটিন অণুতে দীর্ঘ শৃঙ্খলের ন্যায় মূলকগুলি (Units) সজ্জিত থাকে। নিম্নে একটি প্রোটিন অণুর সজ্জা দেখানো হলো। বন্ধনীর মধ্যেকার পরমাণুগুলি এক-একটি মূলক। R_1, R_2, R_3 ইত্যাদি হলো বিভিন্ন পরমাণুসমষ্টির (Group) দ্যোতক।

$$—(CHR_1-CO-NH)—(CHR_2-CO-NH)—(CHR_3-CO-NH)—$$
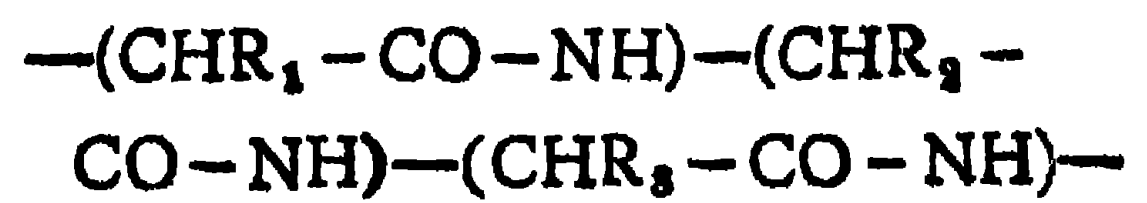
R_1, R_2, R_3-এর বিভিন্নতার জন্যেই প্রোটিনের বিভিন্নতা দেখা যায়। এই পরমাণুসমষ্টিগুলির বিভিন্ন ধর্মাবলীর জন্যে প্রোটিনের ধর্মের বিভিন্নতা দেখা যায়। তাছাড়া প্রোটিনের মূলকগুলির পার্থক্যের জন্যেও বিভিন্ন ধরণের প্রোটিন পাওয়া যায়। তবে এই মূলকগুলির সংখ্যা খুব বেশী নয়। কিন্তু বিভিন্ন মূলক ও পরমাণু-সমষ্টিগুলির বিভিন্ন সমবায়ে অসংখ্য প্রোটিন অণু গঠিত হতে পারে। এদের ধর্মাবলীও স্বভাবতঃই বিভিন্ন হবে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, প্রকৃতিতে জীবনের নানা বৈচিত্র্যের জন্যে অণুগুলির মূল গঠন-কাঠামো বা সংযুক্তির বৈচিত্র্যতার প্রয়োজন নেই; অর্থাৎ একই শ্রেণীর অণুর দ্বারাই জীবনে নানা বৈচিত্র্যের প্রকাশ ঘটতে পারে, সে জন্যে সম্পূর্ণ নতুন ধরণের অন্য কোনও অণুর প্রয়োজন নেই। প্রাণী-জগতে এখানেই বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য বিরাজ করছে।

প্রাণিদেহের মূল উপাদান প্রোটিন জীবদেহে বিচিত্ররূপে কাজ করে। অনেক পশুদেহে তারা দেহাংশ গঠনে অংশগ্রহণ করে। আর

এক ধরণের প্রোটিন, যার নাম হিমোগ্লোবিন—পূর্বোক্ত মূলকগুলি ছাড়াও যাদের মধ্যে কিছু লৌহ পরমাণু থাকে। দেহের বিভিন্ন স্থানে এরা অক্সিজেন পৌঁছে দেয়। এক কথায় প্রাণিদেহে হাজার হাজার প্রোটিন তাদের নিজেদের বিচিত্র কর্মসাধনে তৎপর রয়েছে।

প্রাণের অস্তিত্বের জন্যে প্রোটিন অপরিহার্য। উদ্ভিদ-জগৎ, প্রাণী-জগৎ—এমন কি, ক্ষুদ্র জীবাণু বা ততোধিক ক্ষুদ্র ভাইরাস প্রভৃতি সকলের ক্ষেত্রেই একথা সত্য। প্রোটিন ছাড়াও জীবনের প্রকাশের জন্যে আর একটি অপরিহার্য জিনিষ হলো নিউক্লিক অ্যাসিড (Nucleic acid)। জীবকোষের কেন্দ্রীনের (Nucleus) গঠনে এদের ভূমিকা থেকেই এই পদার্থটির নামকরণ হয়েছে। যদিও জীব-বিজ্ঞানীরা জানতেন যে, জীবজগতের বংশগতির জন্যে জীবকোষের কেন্দ্রীন দায়ী এবং কেন্দ্রীনে নিউক্লিক অ্যাসিড প্রচুর পরিমাণে থাকে, তবুও কেবলমাত্র বর্তমান শতাব্দীর পঞ্চদশ দশকের বৈজ্ঞানিকেরা নিশ্চিতভাবে সিদ্ধান্তে আসেন যে, বংশগতির জন্যে নিউক্লিক অ্যাসিডই প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, নিউক্লিক অ্যাসিডও একটি উচ্চ পলিমার এবং এদের মূলকগুলি প্রোটিনের মূলক অপেক্ষা আরও জটিল। এখানে মূলক হলো ফস্‌ফেট ও শর্করা (Sugar) শৃঙ্খল। প্রোটিনের R-পরমাণুসমষ্টির মত এখানেও একটি উপাদানের বিভিন্নতা আছে—যেটিকে বলা হয় বেস (Base)। বেসের বিভিন্নতার জন্যেই নিউক্লিক অ্যাসিডের ধর্মের বিভিন্নতা দেখা দেয়। তবে এখানে বিভিন্ন বেসের সংখ্যা বেশী নয়—মাত্র চার ধরণের বেস আছে। DNA বা Deoxyribonucleic acid এবং RNA বা Ribonucleic acid হলো দুই ধরণের নিউক্লিক অ্যাসিড, যাদের পার্থক্য শুধু উভয়ের শর্করার পার্থক্যের জন্যে। নিম্নে একটি নিউক্লিক অ্যাসিডের শৃঙ্খল দেখানো হলো।

```
          বেস                 বেস                 বেস
           |                   |                   |
—( ফস্‌ফেট—শর্করা )—( ফস্‌ফেট—শর্করা )—( ফস্‌ফেট—শর্করা )—
```
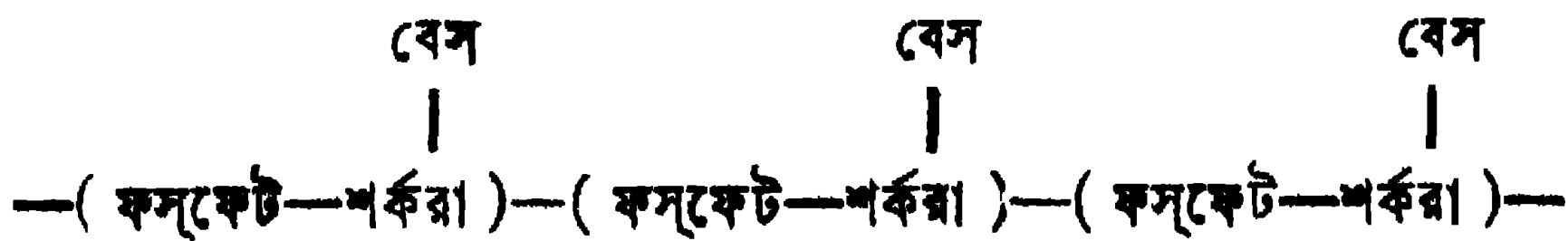
জননকারী নিউক্লিক অ্যাসিড শৃঙ্খল খুবই দীর্ঘ এবং তাতে দশ লক্ষেরও বেশী সংখ্যক বেস থাকে। সুতরাং সহজেই বুঝতে পারা যায় যে, মাত্র চারটি বিভিন্ন রকমের বেসের দ্বারাই প্রাণিদেহে কত বৈচিত্র্যের সমাবেশ ঘটতে পারে। বর্তমানে বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন যে, ক্রোমোসোমে DNA-এর ক্রিয়াকলাপের দ্বারাই জীবন ও জীবজগৎ নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে।

আগেই বলা হয়েছে যে, জীবনের প্রধান লক্ষণ হলো তার বৃদ্ধি ও জননক্ষমতা। গভীরভাবে বিচার-বিবেচনা করলে দেখা যাবে, এই দুটি লক্ষণ একই বিষয়ের দুটি ভিন্ন প্রকাশরূপ মাত্র এবং বৃদ্ধিকে জননক্ষমতার দ্বারা ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। ব্যাক্টিরিয়া এককোষী প্রাণী। এই কোষটি জীবনের ক্রিয়াগুলি সম্পন্ন করে এবং কোষটি বৃদ্ধি পেতে পেতে উপযুক্ত সময়ে একদিন দুটি অংশে বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং অংশ দুটিতে তাদের পূর্ববর্তীদের যাবতীয় বৈশিষ্ট্য বজায় থাকে। এই ভাবেই তাদের বংশবৃদ্ধি ঘটে। আর উচ্চ-শ্রেণীর জীবের ক্ষেত্রেও জীবনের সুরু একটি মাত্র কোষ থেকেই। কিন্তু এখানে কোষগুলি বিভক্ত হবার পর নিম্নস্তরের জীবের কোষের ন্যায় প্রাথমিক (Parent) কোষ থেকে পৃথক হয়ে যায় না বরং প্রাথমিক কোষের সঙ্গে সংযুক্ত থেকে প্রাণী-দেহের আকৃতি গড়ে তোলে। জননকারী পদার্থের (Genetic material) একটি অবশ্য কর্তব্য হলো নতুন কোষের সৃষ্টি। সুতরাং DNA-এর দুটি কাজ—(1) প্রয়োজনীয় প্রোটিন তৈরি

করা ও (2) নিজের বৃদ্ধি ঘটানো। 1952 সালে DNA-এর আণবিক গঠন আবিষ্কৃত হবার পরেই DNA-এর বৃদ্ধির (Duplication) প্রক্রিয়াটি জানা সম্ভব হয়। সে সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা বর্তমান প্রবন্ধের পরিধি বহির্ভূত। DNA থেকে প্রোটিন সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া সম্বন্ধেও বর্তমানে জানা গেছে।

জীবজগতে প্রাণীর বৈচিত্র্য ও বিবর্তন (Evolution) DNA-এর পরিবর্তনের জন্মেই হয়ে থাকে। কোনও রাসায়নিক ক্রিয়া বা সৌর বিকিরণের ফলে DNA-এর মধ্যে কিছু পরিবর্তন সংঘটিত হলে জীবের স্থায়ী পরিব্যক্তি (Mutation) ঘটতে পারে। DNA-এর মধ্যে পরিবর্তন বলতে এই কথাই বোঝানো হচ্ছে যে, DNA-এর মধ্যেকার কোনও বেসের অন্য কোনও বেসে রূপান্তরিত হওয়া কিংবা কোন মূলকের যোগ বা বিয়োগ ঘটা। এর ফলে সংশ্লেষণের পর উৎপন্ন প্রোটিনের মধ্যে কোন পরিবর্তন দেখা দিতে পারে। আর এর ফলেই প্রাণীর বৈশিষ্ট্যেরও পরিবর্তন দেখা দিতে পারে—এমন কি, সম্পূর্ণ পৃথক জীবকোষের সৃষ্টি বা জীবকোষের মৃত্যু হতে পারে। সুতরাং পৃথিবীতে এমন সব প্রাণীই টিকে থাকবে, যারা প্রকৃতির সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পারবে। আর তা না হলে তাদের পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হবে—যেমন সৃষ্টির আদিকাল থেকে হয়ে এসেছে।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, DNA ও প্রোটিন যখন জীবদেহের মূল উপাদান এবং তারাই যখন প্রাণের প্রকাশে মূল ভূমিকা পালন করে, তখন পরীক্ষাগারে প্রাণ সৃষ্টির সম্ভাবনা কতটুকু? প্রশ্নটি নিয়ে আলোচনা করবার আগে আরও একটি বিষয় আলোচনা করা প্রয়োজন। প্রাণের অস্তিত্ব আছে, ক্ষুদ্রতম এমন জিনিষ হলো ভাইরাস। ভাইরাসকে প্রাণী ও জড়ের মাঝামাঝি একটা অবস্থা বলা যেতে পারে—কারণ প্রাণীর মূল একটি ধর্ম এদের নেই, এরা নিজে থেকে বংশবৃদ্ধি করতে পারে না, এর জন্মে অন্য জীবদেহের সাহায্যের প্রয়োজন। কিন্তু প্রাণিদেহের পক্ষে অপরিহার্য অঙ্গ দুটি জিনিষ, যথা—নিউক্লিক অ্যাসিড ও প্রোটিন এদের মধ্যে আছে। প্রায় দশ বছর আগে ভাইরাসের নিউক্লিক অ্যাসিড ও প্রোটিন পৃথক করবার জন্মে পরীক্ষা চালানো হয়। তা থেকে জানা যায় যে, নিউক্লিক অ্যাসিডই প্রাণের মূল চাবিকাঠি। পরীক্ষা থেকে এটা প্রতীয়মান হয় যে, ভাইরাসের নিউক্লিক অ্যাসিড শৃঙ্খল কৃত্রিম উপায়ে সংশ্লেষণের (Synthesis) দ্বারা আমরা কৃত্রিমভাবে ভাইরাসের জন্ম দিতে পারি। নিউক্লিক অ্যাসিড শৃঙ্খলের বৃদ্ধির জন্মে উপযুক্ত ব্যবস্থা জীবকোষের মধ্যে থাকে। কোষ থেকে সেই সব রাসায়নিক পদার্থ কোষের বাইরে এনে পরীক্ষা-নলের মধ্যে রেখেও বৃদ্ধির কাজ করা সম্ভব হয়েছে। এইভাবে কৃত্রিম উপায়ে পুনঃসংশ্লেষিত ভাইরাসের নিউক্লিক অ্যাসিডকে জীবদেহের কোষে অনুপ্রবিষ্ট করিয়ে দেখা গেছে যে, প্রাকৃতিক ভাইরাসের মতই এরা জীবদেহের অভ্যন্তরে বংশবৃদ্ধি করে। এভাবে পরীক্ষা-নলে সৃষ্ট ভাইরাসকে অনেকাংশে কৃত্রিম উপায়ে উৎপন্ন ভাইরাস বলা যেতে পারে। ভবিষ্যতে হয়তো কোষের রাসায়নিক পদার্থের সাহায্য ছাড়াই সম্পূর্ণ কৃত্রিম উপায়ে ভাইরাসের নিউক্লিক অ্যাসিড শৃঙ্খল সংশ্লেষণ করা সম্ভব হবে। তত্ত্বগত ভাবে তা সম্ভব। ডক্টর খোরানা নিউক্লিক অ্যাসিড শৃঙ্খল সংশ্লেষণ করবার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। অবশ্য তিনি ভাইরাসের নিউক্লিক অ্যাসিড নয়—জিন সংশ্লেষণের চেষ্টা করছেন। জিন হলো DNA শৃঙ্খলের একটি অংশ, যা একটি প্রোটিন শৃঙ্খল তৈরি করে। ভাইরাসের সম্পূর্ণ DNA শৃঙ্খল সংশ্লেষণের সমস্যা হলো এই যে, এই শৃঙ্খলে দশ লক্ষের মত মূলক আছে। সেই সমস্যার সমাধান একদিন

হবেই। সুতরাং আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, পরীক্ষাগারে কৃত্রিম উপায়ে প্রাণ সৃষ্টি করা সম্ভব।

সর্বশেষে যে প্রশ্ন উঠতে পারে, তা হলো পৃথিবীতে প্রথম প্রাণের প্রকাশ কিভাবে সম্ভব হয়েছিল? ঈশ্বর বিশ্বাসীরা তা ঈশ্বরের সৃষ্টি বলে মনে করে। বিজ্ঞান তা স্বীকার করে না। বিজ্ঞান বলে পৃথিবীতে বর্তমানে যে সব গ্যাস পাওয়া যায়, পৃথিবীর আদিকালে তা ছিল না। তখন ছিল মার্স গ্যাস, অ্যামোনিয়া, জলীয় বাষ্প প্রভৃতি। এই সব গ্যাস থেকে কিভাবে প্রথম প্রাণের সৃষ্টি হয়—সেটা দেখবার জন্যে একটি বদ্ধ পাত্রে কৃত্রিম উপায়ে প্রাচীন পৃথিবীর আবহাওয়া সৃষ্টি করে তার মধ্যে বৈদ্যুতিক স্ফুলিঙ্গ উৎপন্ন করা হয়। উৎপন্ন পদার্থগুলিকে পরীক্ষা করে দেখা যায় যে, সেগুলি প্রোটিন ও নিউক্লিক অ্যাসিডের পূর্বগামী (Precursors) কয়েকটি সরল রাসায়নিক পদার্থ। সুতরাং সুদূর অতীতে কোনও এক সময় পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে বিদ্যুৎ-চমকের ফলে এই সব পদার্থের সৃষ্টি হয় এবং সেগুলি চাপ, তাপ প্রভৃতির কোনও বিশেষ অনুকূল অবস্থায় মিলিত হয়ে উচ্চ পলিমারে পরিণত হয়। এই রকম পরিস্থিতির উদ্ভব একবার হবার পর রাসায়নিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এগুলি থেকে প্রথম প্রাণী-কোষের সৃষ্টি হয়। যে সকল বৈজ্ঞানিক এই বিষয় নিয়ে গবেষণা করছেন, তাঁরা পরীক্ষাগারে অতীত পৃথিবীর পরিবেশ সৃষ্টি করে আদি প্রাণিকোষ গঠনের উপরিউক্ত তত্ত্বের সমর্থনে তথ্য সংগ্রহ করছেন। হয়তো অদূর ভবিষ্যতেই এই তত্ত্বের সত্যতা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হবে।

প্রাকৃতিক নানা ঘটনা মানুষের মনে যে ভয় ও বিস্ময়ের সঞ্চার করেছিল, তা মানুষের অজ্ঞতার সুযোগে ঈশ্বরের ধারণার জন্ম দিয়েছিল। নানা ঘটনার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ধীরে ধীরে মানুষের সেই ধারণা অনেকটা দূর করতে সক্ষম হয়েছে। জীবন-রহস্য উদ্ঘাটনের প্রচেষ্টাকেও তা ত্বরান্বিত করবে।

সমুদ্র-বিজ্ঞান

অলকরঞ্জন বসুচৌধুরী

মানুষ আজ চন্দ্রজয়ী হয়েছে। সুদূর মঙ্গলগ্রহ আর শুক্রগ্রহ থেকে উড়ে আসা ইঙ্গিত শুনতেও সে সক্ষম হয়েছে। আবহমণ্ডল ও তার বাইরের অন্তহীন মহাশূন্যের বহু রহস্য আজ তার সন্ধানী দৃষ্টির সামনে উদ্ঘাটিত। জনহীন দুর্গম মেরুপ্রদেশ, তুষারমণ্ডিত পাহাড়-চূড়া—সর্বত্রই মানুষের পদচিহ্ন পড়েছে, কিন্তু যে তিন ভাগ জলরাশির উপর তার একভাগ বাসভূমি ভেসে রয়েছে, সেই মহাসমুদ্র সম্পর্কে তার জ্ঞানের পরিধি খুবই সীমিত।

সমুদ্র-সম্পদ ও সমুদ্র-বিজ্ঞান

অতীতে একদিন সমুদ্র থেকে স্থলভূমি উঠে এসেছিল কিনা বা ভবিষ্যতে কোন দিন সেই স্থলভূমি আবার সমুদ্রের অতলগর্ভে চলে যাবে কিনা, সে সব বিজ্ঞানীদের বিতর্কের বিষয়। তবে এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, সৃষ্টির প্রথম প্রত্যূষে আদি প্রাণের বিকাশ হয়েছিল সমুদ্রেরই বুকে, আর সৃষ্টির শেষ দিন পর্যন্ত হয়তো প্রাণধারণের জন্যে নির্ভর করতে হবে সমুদ্রের উপরেই। সর্বত্রই স্থলভাগকে ঘিরে রেখেছে সমুদ্র এবং সে

কারণে সমুদ্রের সঙ্গে মানুষের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক, সমুদ্রকে জানা তার পক্ষে অপরিহার্য। দক্ষিণ গোলার্ধের চার পঞ্চমাংশ এবং উত্তর গোলার্ধের তিন পঞ্চমাংশই সমুদ্র। ভূমণ্ডলে সমগ্র সমুদ্র জলের পরিমাণ 137 কোটি কিউবিক কিলোমিটার আর গভীরতা প্রায় তিন থেকে ছয় কিলোমিটারের মধ্যে।

এই সমুদ্রের কাছে মানুষের ঋণের অন্ত নেই। মানুষের খাদ্য, পরিবহন ইত্যাদি বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে সমুদ্র তাকে সহায়তা করে এসেছে। জলপথে যাতায়াত ও ব্যবসা-বাণিজ্যের কথা ছেড়ে দিলেও আমাদের খাদ্যের অন্যতম মূল উপাদান প্রোটিন আমরা সমুদ্রজল থেকে সংগ্রহ করে থাকি। গৃহপালিত পশুদের জন্যে আমিষ খাদ্য ও নানা ওষুধপত্র তৈরির উপাদানও সমুদ্র থেকে সংগৃহীত হয়। বিভিন্ন রকমের মাছ, তিমি, চিংড়ি, কাঁকড়াজাতীয় প্রাণী, শামুক, গুগ্‌লি ইত্যাদি মানুষ সমুদ্র থেকে লাভ করে। বছরে কোটি কোটি টাকার তেল ও গ্যাস উৎপন্ন করা হয় সমুদ্র থেকে।

কৃষি-উন্নয়নেও সমুদ্রের দান অপরিসীম। সমুদ্রের জলে যে জোয়ার-ভাটা খেলে, তা পৃথিবীর নদীগুলিকেও প্রভাবিত করে। সমুদ্র তার বিরাট জলসম্পদ, লবণসম্পদ ও সমুদ্রতলে ছড়ানো খনিজসম্পদও মানুষকে দান করছে। তাছাড়া সমুদ্রগর্ভ থেকে বিভিন্ন রাসায়নিক লবণ, সালফার, পটাশ, কিছু পরিমাণে ধাতব পদার্থ, আর সমুদ্র ও উপকূল থেকে কয়লা ও আকরিক লৌহ ইত্যাদি সামগ্রী আহৃত হবার ফলে মানবসভ্যতার অগ্রগতিতে উল্লেখযোগ্য সহায়তা হয়েছে। বিজ্ঞানীদের মতে আমাদের পরিচিত যত রকম খনিজ পদার্থ আছে, তার সবচেয়ে বড় আকর হলো সমুদ্র।

সমুদ্র সম্পর্কে আমাদের সামান্য জ্ঞানই যখন এত রকম সম্পদের সন্ধান দিয়েছে, তখন তাকে আরও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জানতে পারলে না জানি আরও কত সম্পদের সন্ধান মিলবে! সমুদ্রগর্ভের বিভিন্ন সম্পদ আহরণ করবার জন্যে চাই ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা, পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান ও শক্তিশালী প্রযুক্তিবিদ্যা। সমুদ্রতলের উদ্ভিদ বা শ্যাওলা ইত্যাদি থেকে প্রতিজীবাণু ওষুধপত্র তৈরির বিরাট সুযোগ, দুষ্প্রাপ্য জলজ উদ্ভিদ ইত্যাদি থেকে নূতন ওষুধ তৈরির সম্ভাবনা—এসবের সদ্ব্যবহারের জন্যে চাই পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে বিজ্ঞানী সমাজের অনলস সাধনা। সমুদ্রগর্ভের রহস্য-সন্ধান ও তাকে মানবকল্যাণে নিয়োগের এই লক্ষ্য নিয়েই গড়ে উঠেছে বিজ্ঞানের এই আধুনিক শাখা—সমুদ্র-বিজ্ঞান বা Oceanography। অবশ্য এই বিজ্ঞান এখনও তার প্রাথমিক স্তরেই রয়েছে।

সমুদ্রচর্চার ইতিহাস

সমুদ্র সম্পর্কে জানবার জন্যে মানবমনের স্বাভাবিক অভীপ্সার প্রথম প্রকাশ দেখা যায় সমুদ্রযাত্রার মধ্যে। গত শতাব্দীতেও ইউরোপীয়েরা এরকম বহু জাহাজী অভিযান চালিয়েছেন। এই রকমেরই এক অভিযানে ডারুইন তাঁর 'প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্ব' আবিষ্কার করেন।

আধুনিক কালে সমুদ্রের উপকূলবর্তী দেশগুলির বিজ্ঞানীদের আগ্রহে সমুদ্র-বিজ্ঞান গড়ে উঠেছে এবং এর পরিধি বিস্তৃত হয়েছে। তবে দু-তিন দশক আগেও পৃথিবীর সমুদ্র-বিজ্ঞানীদের সংখ্যা সীমিত হওয়ায় বিজ্ঞানীরা সবাই সবার সঙ্গে যোগাযোগ রেখে কাজ চালাতে পারতেন। কিন্তু তারপর এই সংখ্যা ক্রমশঃ বর্ধিত হওয়ায় যোগাযোগ রক্ষার জন্যে আন্তর্জাতিক সংগঠন গড়ে ওঠে। ইউরোপে কয়েকটি সংস্থা বিভিন্ন সমুদ্র-বিজ্ঞানীর সংগৃহীত তথ্যাদি বিনিময়ের মাধ্যমে সমুদ্রবিদ্যা গবেষণায় সাহায্য করে আসছে। এই রকমেরই একটি সংস্থা—Hydrographic Service of the International Council for the

Exploration of the Sea—1902 সাল থেকে কাজ করে আসছে। 1957-'58 সালে আন্তর্জাতিক ভূপদার্থ-বিজ্ঞান বর্ষে সমুদ্র-বিজ্ঞানীদের তথ্যাদি বিনিময়ের সুসংগঠিত আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টার জন্ম হয়। রাষ্ট্রপুঞ্জের UNESCO-এর অধীনস্থ একটি শাখা Oceonographic Commission রূপে সরকারী প্রচেষ্টায় প্রচুর কাজ করছে, মস্কো আর ওয়াশিংটনে সমুদ্রবিদ্যার তথ্যকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। আমেরিকার বিভিন্ন দেশের প্রায় 1700 জাহাজ ভ্রাম্যমান স্টেশনরূপে সমুদ্র থেকে নানাবিধ নমুনা সংগ্রহ করেছে। রাষ্ট্রপুঞ্জের বাইরেও এই বিষয়ে নানা প্রতিষ্ঠান কাজ করছে; যেমন—International Hydrographic Organisation, Scientific Committee on Oceanic Research, International Association of Oceanic Biography, Commission of Marine Geology প্রভৃতি। বর্তমানে রাশিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, জার্মেনী, জাপান ফ্রান্স, ক্যানাডা প্রভৃতি দেশ সমুদ্র-বিজ্ঞানে উন্নতি করেছে। সাম্প্রতিক কালে মার্কিন নৌবাহিনীর ব্যাথিস্কিয়ার 'ত্রিয়েস্ত'-এর আরোহী হয়ে ঐ বাহিনীর লেঃ ওয়াল্‌শ ও ডক্টর পিকার্ড পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরের প্রায় 11 কি. মিঃ গভীরে নেমেছিলেন, পরীক্ষার জন্যে। এত গভীরে এর আগে কেউ নামতে পারেন নি। সমুদ্রতলের অভ্যন্তরের ভূগর্ভ সম্পর্কে জানবার জন্যে সমুদ্রের তলদেশে ড্রিলের সাহায্যে গর্ত করবার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। মার্কিন বিজ্ঞানীরা ইতিমধ্যেই প্রশান্ত মহাসাগরে একাধিক গর্ত করেছেন। রাশিয়াতেও এই ব্যাপারে ব্যাপক তোড়জোড় চলছে।

আন্তর্জাতিক সহযোগিতা

সমুদ্রবিদ্যা এমনই একটি বিজ্ঞান, যাতে একক প্রচেষ্টায় কোন দেশের উন্নতি বিশেষ সম্ভব নয়। কারণ সমুদ্র বিশাল হবার ফলে যে কোন একটি দেশের পক্ষে সেখানে সব রকম পরীক্ষা চালানো সম্ভব নয়। তাছাড়া একই সমুদ্র একাধিক দেশের সঙ্গে যুক্ত। সে জন্যে সমুদ্র-বিজ্ঞান প্রথম থেকেই মহাকাশ-বিজ্ঞানের মত প্রতিযোগিতা-মূলক না হয়ে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। এই আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টায় সহায়তা করছে রাষ্ট্রপুঞ্জ। সমুদ্রের বিষয় গবেষণার রাজনৈতিক বাধা দূর করবার জন্যে 1958 সালে জেনেভাতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, প্রত্যেক দেশের সমুদ্র-উপকূল থেকে 200 মিটার এলাকা বাদ দিয়ে বাইরের সমুদ্রে যে কোন দেশের বিজ্ঞানী স্বাধীনভাবে পরীক্ষা চালাতে পারবেন। সংশ্লিষ্ট দেশের বিজ্ঞানীরা অবশ্য ঐ সীমানার ভিতরে পরীক্ষা চালাতে পারেন।

সমুদ্রের উপকূলবর্তী দেশগুলির আগ্রহ সমুদ্র-বিজ্ঞানের অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করতে পারে। এই বিষয়ে তাই ভারতের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। ভারতের উপকূল সংলগ্ন রয়েছে বঙ্গোপসাগর, আরব সাগর ও সুবিশাল ভারত মহাসাগর। ভারত মহাসাগরের অনেক সম্পদই এখনও অনুদ্‌ঘাটিত রয়েছে। 1960 সালে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সমুদ্র-বৈজ্ঞানিক সম্মেলনে ভারত মহাসাগরে 1960 থেকে 1964 সাল পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সামুদ্রিক গবেষণা চালাবার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল। তাছাড়া নিজস্ব উন্নতির খাতিরেও ভারতের সমুদ্র-বিজ্ঞান গবেষণায় অগ্রণী হওয়া উচিত।

মহাকাশ-বিজ্ঞান ও সমুদ্র-বিজ্ঞান

মহাকাশ-বিজ্ঞান সমুদ্র-বিজ্ঞানকেও নানাভাবে সহায়তা করছে। যোগাযোগ ও আবহবিদ্যা—এই দুটি শাখার মাধ্যমেই সমুদ্র-বিজ্ঞান লাভবান হচ্ছে। 1965 সালের আগষ্ট মাসে জেমিনি-5 মহাকাশযানে ভূপরিক্রমারত দু-জন মার্কিন

মহাকাশচারী কুপার ও কনরাড মহাকাশ থেকে সমুদ্রতলে অবস্থানরত আর একজন মার্কিন মহাকাশচারী কার্পেন্টারের সঙ্গে বেতারযোগে কথাবার্তা বলেন। উনিশ-শ' বাষট্টির মহাকাশচারী কার্পেন্টার উনিশ-শ' পঁয়ষট্টিতে প্রশান্ত মহাসাগরের 205 ফুট নীচে নেমে একটি ক্যাপসুলে আরও কয়েকজনের সঙ্গে তিরিশ দিন বসবাস করেন—মানবদেহের উপর সমুদ্রজলের তাপ ও চাপ ইত্যাদির প্রতিক্রিয়া পরীক্ষার জন্যে। সমুদ্রের অভ্যন্তরের পরিবেশ বর্ণনা করতে গিয়ে কার্পেন্টার বলেছেন—অসম্ভব, অবিশ্বাস্য অন্ধকার। জলের উষ্ণতা মাত্র 50 ডিগ্রি ফারেনহাইট এবং বিশেষভাবে তৈরি রবারের পোষাক পরে থাকা সত্ত্বেও শীতের প্রভাবে ভীষণ কাঁপুনি লাগে। তবে দু'-তিন দিনে এই অবস্থা সয়ে যায়।

সমুদ্রের আবহাওয়ায় অভিযাত্রীদের প্রত্যেকেরই হঠাৎ মাথা ধরবার উপসর্গ দেখা দিত। কেউ কেউ হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে যেতেন, কেউ বা কথা বলবার সময় যুক্তি খুঁজে পেতেন না। যদিও তাঁরা সমুদ্রের উপরের পৃথিবীতে সবাই যুক্তিবাদী মানুষ। রাত্রিতে হঠাৎ সারা শরীর ঘেমে উঠতো আর ঘুম ভেঙে যেত। এই সমুদ্রবাস থেকে কার্পেন্টার এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, সমুদ্রগর্ভে বসবাস করা সম্ভব।

কিন্তু এ তো গেল মহাকাশচারীর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা। পরোক্ষভাবেও মহাকাশ অভিযান থেকে সমুদ্রবিদ্যা নানাভাবে উপকৃত হচ্ছে। সামুদ্রিক আবহাওয়া লোকালয়ের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে থাকে। সমুদ্রের উপরের মেঘ ও আবহমণ্ডল সম্পর্কে কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে নানা তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে এবং হচ্ছে। এর ফলে সমুদ্র সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান ক্রমশঃ বাড়বে ও সমুদ্রসম্পর্কিত প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর কার্য-কারণ সূত্র ও সাধারণ নিয়মাবলী উদ্‌ঘাটন করে সে সব ঘটনা আমরা নিয়ন্ত্রণও করতে পারবো। সামুদ্রিক ঝড়ের পূর্বাভাস দিয়ে কৃত্রিম উপগ্রহ একাধিক ক্ষেত্রে জীবন ও সম্পত্তি রক্ষা করেছে।

সমুদ্র থেকে মৎস্য-আহরণের ব্যাপার বর্তমানে একটি বিরাট বাণিজ্যে পরিণত হয়েছে। এই ব্যাপারেও কৃত্রিম উপগ্রহ মানুষকে সাহায্য করে থাকে। মহাসাগরের গভীরে কোথায় মাছের ঝাঁক ঘুরে বেড়াচ্ছে, তা কয়েক মিনিটের মধ্যেই একটি কৃত্রিম উপগ্রহ বলে দিতে পারে। অবলোহিত রশ্মির ফটোগ্রাফির সাহায্যে মাছ ও জলজ উদ্ভিদবাহী স্রোত ও অন্য স্রোতের মিলন সীমান্ত এবং মাছের দেহ থেকে নির্গত তেল কৃত্রিম উপগ্রহের চোখে—এমন কি, রাত্রিবেলাতেও স্পষ্ট ধরা পড়ে। সমুদ্রগর্ভে বা সমুদ্রতলেরও নীচে কোন তৈল বা গ্যাসবাহী স্তর থাকলে তা কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে তোলা ফটোর সাহায্যে ধরা যায়। সমুদ্রের মানচিত্র রচনার কাজেও ঐ ফটো খুব ভাল কাজ দেয়। আর সমুদ্রের লুকানো বরফপিণ্ড ইত্যাদি সম্পর্কে কৃত্রিম উপগ্রহ সচেতন করে দিলে সমুদ্রযাত্রা আরও নিরাপদ হয়।

তাছাড়া মহাকাশের অজানা পরিবেশে পরীক্ষার জন্যে নির্মিত বিভিন্ন তাপ-চাপ সহনক্ষম মহাকাশযানের যন্ত্রগুলিকে মহাসমুদ্রের বিভিন্ন তপ-চাপের পরিবেশে গবেষণার জন্যেও ব্যবহার করা যেতে পারে। রাশিয়ার সাম্প্রতিক চান্দ্রযান লুনোখোদ সম্পর্কে জনৈক রুশ বিশেষজ্ঞ একথা বলেছেন।

উপসংহার

সমুদ্র-বিজ্ঞান একটি নূতন বিজ্ঞান এবং এর সামনে রয়েছে বিরাট সম্ভাবনা। সমুদ্র সম্পর্কে মানুষের বিস্তৃত জ্ঞান তার জীবনকে আরও সুখ-সমৃদ্ধিতে ভরে তুলবে সন্দেহ নেই। সামুদ্রিক

ঝঞ্ঝাবাত্যা যদি মানুষ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, তবে মহাসাগরের বিরাট এলাকা জুড়ে শান্ত আবহাওয়া বিরাজ করবে, ফলে বিমান ও জাহাজ চলাচল ও বেতার যোগাযোগ ব্যবস্থা নির্বিঘ্ন হবে। সমুদ্রতলের অনেক অনাবিষ্কৃত সম্পদ হয়তো আবিষ্কৃত হয়ে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের আরও অনেক চাহিদা মেটাবে, তৈরি হবে নানারকম শক্তিশালী ওষুধ। গভীর সমুদ্রে যে সব আলোক-উদ্ভাসী মাছ আছে, তাদের সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করে মানুষ হয়তো পৃথিবীতেই জৈব আলো ব্যবহারোপযোগী করতে পারবে।

কিন্তু এই উজ্জ্বল সম্ভাবনার একটি নেতিবাচক দিকও আছে। বিভিন্ন দেশ নিজের রাজনৈতিক স্বার্থে সমুদ্রের অপব্যবহার করছে। সমুদ্রগর্ভে পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটাবার ফলে তেজস্ক্রিয় পদার্থ সমুদ্রজলকে দূষিত করছে। তাছাড়া নানারকম আবর্জনা ও কীটনাশক পদার্থ সমুদ্রজলে ফেলার ক্রমশঃ সমুদ্রজল বিষাক্ত হয়ে পড়ছে। এর ফলে সমুদ্র থেকে খাদ্যবস্তু ও লবণ সংগ্রহ করা বিপজ্জনক হয়ে পড়ছে। তাই নানা অনাবিষ্কৃত শুভ ফল, সম্ভাব্য ওষুধ ও রত্নরাজি—সমুদ্রমন্থনের এই অমৃতের অধিকার লাভ করবার জন্যে যেমন বিজ্ঞানকে অনলস প্রচেষ্টা চালাতে হবে, তেমনই নানা অনাবিষ্কৃত অশুভ ফল, মহাসাগরের দুরন্ত ঝটিকার তাণ্ডবলীলা ও সমুদ্রজলের বিষাক্ত প্রতিক্রিয়া—সমুদ্রমন্থনের এই বিষকে ধারণ করবার সামর্থ্যও বিজ্ঞানকে অর্জন করতে হবে।

প্রাচীন মৌর্য যুগের নগর-বিন্যাস

শ্রীঅবনীকুমার দে*

পাটলীপুত্র

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র বিন্দুসার এবং বিন্দুসারের পর অশোক মগধের রাজা হন। বিম্বিসারের পুত্র অজাতশত্রু শোণ ও গঙ্গানদীর সঙ্গমস্থলে যে প্রাচীন পাটল নগর তৈরি করেছিলেন, তা কি ভাবে ক্রমে ক্রমে সম্প্রসারিত হয়ে সম্রাট অশোকের সময়ের রাজধানী পাটলীপুত্রে পরিণত হয়েছিল, তার বিবরণ পাওয়া যায় না।

সেলুকাসের গ্রীক দূত মেগাস্থিনিস চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের রাজধানী পাটলীপুত্র শহরে (আধুনিক পাটনা) দীর্ঘকাল বাস করেছিলেন। মেগাস্থিনিস ভারতবর্ষ সম্বন্ধে একখানি বই লিখেছিলেন। মূল বইখানি এখন আর পাওয়া যায় না। কিন্তু প্রাচীন লেখকেরা সেই বই থেকে অনেক বিবরণ নিজেদের লেখা বইয়ে উদ্ধৃত করেছেন। এই সব বিবরণ থেকে প্রাচীন পাটলীপুত্র শহরের ঐশ্বর্য ও সৌন্দর্যের কিছু আভাস পাওয়া যায়।

তদানীন্তন ভারতবর্ষের এই সর্বপ্রধান শহরটি হিরণ্যবতী (আধুনিক শোণ) ও গঙ্গার সঙ্গমস্থলে অবস্থিত ছিল। পাটলীপুত্র শহর দৈর্ঘ্যে নদীতীর বরাবর প্রায় দশ মাইল প্রসারিত ছিল। শহরটি প্রস্থে ছিল প্রায় দেড় মাইল বিস্তৃত। নদীর ধার বরাবর বাঁধ নির্মিত ছিল। শহরের চারদিকে অল্প দূর অন্তর অবস্থিত পর পর তিনটি ইট-বাঁধানো জলপূর্ণ পরিখা ছিল। রাজধানীর প্রাচীর ছিল সুদৃঢ় ও কাষ্ঠনির্মিত।

---

* নগর ও আঞ্চলিক পরিকল্পনা বিভাগ, বেঙ্গল ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ, শিবপুর।

শহর-প্রাচীরের মধ্যে চৌষট্টি বৃহৎ তোরণ-দ্বার ও তাদের উপর সুউচ্চ বুরুজ ছিল। প্রধান দ্বারগুলির মধ্যে মধ্যে প্রাচীরে কয়েক শত ছোট ছোট দরজাও ছিল। শহরের কেন্দ্র-স্থলে রাজপ্রাসাদ অবস্থিত ছিল। প্রাসাদের চারদিক সুন্দর বাগান ও বনভূমি দিয়ে ঘেরা ছিল। বাগানে ছিল বহু ফোয়ারা ও মাছপূর্ণ পুষ্করিণী। প্রাসাদের স্তম্ভগুলি ছিল সোনার পাত দিয়ে মোড়া এবং তার উপর সোনা-রূপার কারুকার্যকরা পাখী ও লতাপাতার নক্সা দিয়ে অলঙ্কৃত। সিংহাসন, বহুমূল্য প্রস্তর-খচিত ও সোনা, রূপা ও তামার তৈরি বড় বড় পাত্র এবং অন্যান্য জাঁকজমকপূর্ণ আসবাবপত্র দিয়ে প্রাসাদ সুসজ্জিত ছিল।

আধুনিক পাটনা শহরের কাছে বুলন্দিবাগে প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যের ফলে পাটলীপুত্র শহরের কাঠের বেড়ার কিছু অংশ ও কাঠের তক্তার দ্বারা তৈরি ভূনিম্নস্থ পথের নিদর্শন পাওয়া গেছে। এই জায়গা থেকে কিছু দক্ষিণে আধুনিক কুমরাহার গ্রামেও প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্য করে সুসমঞ্জস-ভাবে বিন্যস্ত কয়েকটি স্তম্ভের ভিতের নিদর্শন পাওয়া গেছে। মনে হয় এই স্তম্ভগুলি প্রাচীন রাজপ্রাসাদের ভিতরে অবস্থিত একটি হলঘরের মধ্যে ছিল। মেগাস্থিনিসের বিবরণ থেকেও এই রকম একটি হলঘরের বর্ণনা পাওয়া যায়। এই সব নিদর্শন থেকে প্রাচীন পাটলীপুত্র শহরের অবস্থান অনুমান করা যায়। প্রাচীন শহরের আকৃতি বা রাস্তা-ঘাট বিন্যাসের আর কোনও নিদর্শন এখন পাওয়া যায় না। বিগত প্রায় আড়াই হাজার বছরের মধ্যে এই জায়গা থেকে নদীও উত্তরে এবং পূর্বে এখন এক মাইলেরও বেশী দূরে সরে গেছে।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র

খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের সমকালীন চাণক্য বা কৌটিল্য নামে তক্ষশীলার এক কূট-বুদ্ধি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত 'অর্থশাস্ত্র' রচনা করেন। এই গ্রন্থের রচনাকাল সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। যাহোক, অর্থশাস্ত্রে তদানীন্তন গ্রাম ও নগর সন্নিবেশ রীতির যে সব বিবরণ দেওয়া আছে, সেগুলি সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো।

গ্রামে কেবলমাত্র কুটিরই থাকতো। নগরে বা শহরে বপ্র, সেতু, বিভিন্ন প্রকারের রাস্তাঘাট, হ্রদ, প্রমোদ-উদ্যান, গৃহ, সৌধ ইত্যাদি থাকতো।

এই সময়ের আগেই রাজ্য পরিচালনার জন্যে শাসন-কেন্দ্রে, বাণিজ্যের জন্যে বন্দরে ও বাণিজ্যকেন্দ্রে এবং ধর্মানুষ্ঠানের জন্যে তীর্থস্থানে নানা রকমের নগর গড়ে উঠেছিল। এই নগর-গুলি সাধারণতঃ পরিখা, প্রাকার ও প্রাচীর দিয়ে ঘেরা থাকতো।

অর্থশাস্ত্রের মতে, প্রথমে নগরের জন্যে স্থান নির্বাচন করবার পর নগর সীমানার চারদিকে গভীর পরিখা খনন করতে হবে এবং ঐ পরিখা-কাটা মাটি দিয়ে বপ্র তৈরি করতে হবে। সম-কেন্দ্রিকভাবে ঐ রকম একাধিক পরিখা খনন করা যেতে পারে। পরিখা 60 ফুট থেকে 84 ফুট চওড়া এবং এই প্রস্থের $\frac{1}{2}$ থেকে $\frac{3}{4}$ অংশ গভীর হবে। ইট বা পাথর দিয়ে পরিখার ধার বাঁধাতে হবে। পরিখা জলপূর্ণ করে রাখা হতো, কিন্তু প্রয়োজনমত এই জল বদল করবার কোন রকম বন্দোবস্ত ছিল না।

পরিখাগুলির মধ্যে শহরের দিকের সবচেয়ে ভিতরের পরিখা ও তার বপ্রের মধ্যে 24 ফুট পরিমাণ চওড়া জমি ছেড়ে রাখতে হবে। বপ্রের মাপ উপরের দিকে 72 ফুট চওড়া এবং উঁচুর দিকে হবে 36 ফুট। বপ্রের উপর ইট বা পাথর দিয়ে উঁচু নগর-প্রাচীর তৈরি করা হবে। সহজেই কাঠে আগুন লেগে যাবার সম্ভাবনা থাকায় নগর-প্রাচীর কখনই কাঠ দিয়ে তৈরি করা হবে না। প্রাচীর 18

ফুট থেকে 36 ফুট চওড়া এবং 36 ফুট থেকে 72 ফুট উঁচু হবে। তীর নিক্ষেপ করবার জন্যে প্রাচীরের মধ্যে অনেক গর্ত থাকবে এবং প্রাচীরের উপর অনেকগুলি ছোট ছোট গম্বুজ বা ঘর থাকবে। প্রাচীরের উপর 180 ফুট দূরত্ব অন্তর বর্গাকার পর্যবেক্ষণ বুরুজ থাকবে। প্রাচীরের মধ্যে সুবিধাজনক জায়গায় নগরের ভিতর লোকজনের যাতায়াতের জন্যে বারোটি প্রবেশদ্বার থাকবে। এইগুলির মধ্যে চারটি হবে প্রধান প্রবেশদ্বার। প্রধান প্রবেশদ্বার 30 ফুট থেকে 48 ফুট পর্যন্ত চওড়া হতে পারে এবং এদের উচ্চতা প্রস্থের $1\frac{1}{2}$ থেকে $1\frac{1}{6}$ গুণ হবে। প্রবেশদ্বারের উপর গোপুরম (উঁচু মাটির ঢিবির আকারে) থাকবে। এর ভিতরে সিঁড়ি থাকবে এবং তীর নিক্ষেপ করবার জন্যে দেয়ালে ছোট ছোট গর্ত থাকবে।

মহাদ্বারের একদিকে মহাদ্বারাধীপ বা নগরপালের কর্মচারী ও দ্বাররক্ষীদের বাসগৃহ থাকতো এবং অপরদিকে থাকতো শুল্কাধ্যক্ষের দপ্তর ও শুল্কশালা। নগরের ভিতরে আসবার ও বাইরে যাবার সময় দ্বারপাল প্রত্যেককে জিজ্ঞাসাবাদ করতেন। আগন্তুকদের মুদ্রা বা পাসপোর্ট দেখাতে হতো।

Grid-iron বা Chess board বা দাবার ছকের আকৃতিতে নগরের রাস্তা-ঘাট বিন্যাস করতে হবে। নগরের মধ্যে পূর্ব-পশ্চিমমুখী তিনটি ও উত্তর-দক্ষিণমুখী তিনটি দীর্ঘ রাজপথ থাকবে। প্রশস্ত প্রধান প্রধান পথ ছাড়াও ছোট ছোট অনেক পথ থাকবে। প্রধান প্রধান রাস্তাগুলি নগর-প্রাচীরে গিয়ে শেষ হবে এবং এদের শেষে নগর-প্রাচীরে থাকবে প্রবেশদ্বার। বিভিন্ন প্রয়োজনে ব্যবহারের জন্যে রাস্তাগুলির বিভিন্ন নাম ছিল, যথা—দেবপথ, মহাপথ, রাজপথ, রাজমার্গ, রথ্য এবং চর্ব। কোন কোন প্রকার রাস্তা দিয়ে কেবলমাত্র রথ চলাচল করতে দেওয়া হতো এবং কোন কোন প্রকার রাস্তা কেবলমাত্র পশুদের জন্যে নির্দিষ্ট থাকতো। পথচারীদের রাস্তাসংলগ্ন ফুটপাথ ব্যবহার করতে হতো।

নগরের কেন্দ্রস্থলে থাকবে রাজপ্রাসাদ ও মন্দির। সমগ্র দুর্গের $\frac{1}{9}$ অংশ জুড়ে থাকবে রাজপ্রাসাদ। রাজপ্রাসাদের চারদিকে থাকবে চার বর্ণের লোকজনের বাসগৃহ। প্রাসাদের উত্তর দিকে রাজবংশের শিক্ষাগুরু, পুরোহিত ও মন্ত্রীদের বাসস্থান নির্দিষ্ট থাকবে। প্রাসাদের পূর্বদিকে থাকবে সুগন্ধি দ্রব্যের ব্যবসায়ী ও কুশলী কারিগর এবং ক্ষত্রিয়দের বাসস্থান। নগরপাল, সৈন্যাধ্যক্ষ, বাণিজ্য ও শিল্প তত্ত্বাবধায়ক, সঙ্গীতজ্ঞ এবং বৈশ্যেরা প্রাসাদের দক্ষিণ দিকে বাস করবেন। শূদ্রেরা প্রাসাদের পশ্চিম দিকে বাস করবেন। শ্রমিকদের বাসস্থান নগরের কোণার দিকে নির্দিষ্ট করতে হবে। নগরে রাজকর্মচারীদের অধিকরণ, বিচারালয়, নগররক্ষকের দপ্তর ইত্যাদি থাকবে। কোষাগারের প্রধান অংশ মাটির উপরে থাকবে ও ইট দিয়ে তৈরি হবে। এই ইমারতের তিন তলার মত অংশ মাটির নীচে থাকতো। মাটির নীচের এই অংশের বাইরের দেয়াল এবং সবচেয়ে নীচের তলার দেয়াল বড় বড় পাথরের খণ্ড দিয়ে তৈরি হতো। আর ভিতর দিকের অংশ কাঠ দিয়ে তৈরি হতো। অস্ত্রাগার এবং কয়েদখানা ও কোষাগারের মত একই পদ্ধতিতে তৈরি হতো।

সাধারণ গৃহগুলিও সময় সময় পরিখার দ্বারা সুরক্ষিত থাকতো। বাড়ীর দেয়াল ইট দিয়ে তৈরি করা হতো। বাড়ীতে প্রবেশদ্বার ও ভূ-গর্ভস্থ সুড়ঙ্গপথ থাকতো। সুনিয়ন্ত্রিত বিধি অনুযায়ী ও স্বাস্থ্যসম্মতভাবে গৃহগুলি পরিকল্পিত ও নির্মিত হতো। কেউ এই সকল নিয়মাবলী লঙ্ঘন করলে সরকার কর্তৃক দণ্ডনীয় হতেন।

নর্দমার ব্যবস্থা রাখা, ময়লা ও আবর্জনা ফেলবার জন্যে নির্দিষ্ট স্থান ছেড়ে রাখা, পাশাপাশি দুটি বাড়ীর মাঝে ছেড়ে রাখবার জন্যে খোলা জমির পরিমাণ, ঘরের মধ্যে বাতাস চলাচল করবার ব্যবস্থা রাখা ইত্যাদি বিষয়ে পৌরসংস্থার উপবিধি বলবৎ ছিল।

সাধারণ বাড়ীতে দুটি পাশাপাশি ঘরের মাঝের দেয়াল বাঁশ দিয়ে তৈরি করা হতো। বাঁশের সঙ্গে শর ও খড় একসঙ্গে ঘনভাবে বয়ন করে সংযুক্ত করা হতো এবং সর্বশেষে তার উপরে কাদার প্রলেপ বা প্লাস্টার করা হতো।

নগরের মধ্যে বিভিন্ন পল্লীতে মাঝে মাঝে দোকান, বাজার ইত্যাদির স্থান নির্দিষ্ট থাকতো। যে কোন লোক ইচ্ছামত যে কোন স্থানে দোকান খুলতে বা কোন রকম ব্যবসা-বাণিজ্য সুরু করতে পারতো না, এর জন্যে পণ্যাধ্যক্ষের অনুমতি নিতে হতো। এই থেকে দেখা যায় যে, আধুনিক নগর-পরিকল্পনা রীতির ন্যায় প্রাচীন মৌর্য যুগেও নগরের মধ্যে দোকান, বাজার বা ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্যে ব্যবহারের এলাকা (Zone) নিয়ন্ত্রণ করা হতো।

প্লাষ্টিকের কথা

মনমোহন ঘোষ

প্লাষ্টিক বিশেষ একটি রাসায়নিক পদার্থের নাম নয়। প্লাষ্টিক বলতে কতকগুলি বিশেষ ধর্মবিশিষ্ট একশ্রেণীর জৈব যৌগকে বোঝায়; অর্থাৎ প্লাষ্টিক শব্দটা একটি রাসায়নিক জাতীয় পদার্থের সাধারণ নাম, যেগুলি একটি বিশেষ পর্যায়ে তাপে নমনীয়, কিন্তু সাধারণ অবস্থায় দৃঢ়। কাচের মত প্লাষ্টিকও আজ তৈরি হচ্ছে—ওজনে হাল্কা কিন্তু প্রয়োজনানুসারে ভারীও করা যায়। কোন তেল, অ্যাসিড বা ক্ষারের সংস্পর্শে প্লাষ্টিক অবিকৃত থাকে; তাছাড়া প্লাষ্টিক তাপ ও বিদ্যুৎ-অপরিবাহী। এর আরও সুবিধা এই যে, প্রয়োজনানুসারে মূল প্লাষ্টিকজাতীয় পদার্থের সঙ্গে ফিলার অথবা প্লাষ্টিসাইজার নামক বিশেষ কতকগুলি সাহায্যকারী পদার্থ মিশিয়ে অথবা যে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় প্লাষ্টিক তৈরি হয়, তাকে বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত করে ইচ্ছামত প্লাষ্টিকের গুণ ও ধর্ম পরিবর্তিত করা যায়। প্লাষ্টিকজাতীয় পদার্থের সূতা থেকে তৈরি পোষাক-পরিচ্ছদও এখন খুবই প্রচলিত। তাপ ও চাপের প্রভাবে প্লাষ্টিকের এই নমনীয়তার জন্যে সেগুলিকে বিশেষ পর্যায়ে ছাঁচে ফেলে যে কোন আকার দেওয়া যায়। তাপ ও চাপের প্রভাবে প্লাষ্টিকের নমনীয়তার ভিত্তিতে সেগুলিকে দু-ভাগে ভাগ করা হয়। এক শ্রেণীর প্লাষ্টিক, যেগুলি তাপ ও চাপের প্রভাবে নমনীয় হয়, ঠাণ্ডা হলে শক্ত হবার পর সেগুলিকে পুনরায় তাপ ও চাপে নমনীয় করে বার বার ব্যবহার করা যায়—সেগুলিকে থার্মোপ্লাষ্টিক বলে। আর এক শ্রেণীর প্লাষ্টিক তাপ ও চাপে একবার মাত্র নমনীয় হয়; অর্থাৎ বিশেষ আকৃতিতে এগুলি একবার ঠাণ্ডা হয়ে শক্ত হবার পর তাদের আর তাপের প্রভাবে নমনীয় করা যায় না। সেগুলিকে থার্মোসেটিং প্লাষ্টিক বলে। সংশ্লেষণী রসায়নের বিরাট অবদান এই প্লাষ্টিক—শৃঙ্খলাকারে অবস্থিত বৃহৎ অণুর যৌগ। যে প্রক্রিয়ায় এই বৃহৎ

অণুশৃঙ্খল গঠিত হয়, রাসায়নিক বিচারে সেগুলি দুটি ভাগে বিভক্ত। একটি হচ্ছে পলিমারিজেসন, যে বিক্রিয়ায় ক্ষুদ্র অণু রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে কিছুটা পরিবর্তিত হয়ে নূতন রূপে পরস্পর শৃঙ্খলাকারে জুড়ে যায়—যেমন পলিথিন প্লাষ্টিকের ক্ষেত্রে—একটি ইথিলিন অণু নিয়মপে শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়।

$$n(CH_2=CH_2) \xrightarrow[\text{200°C তাপ ও অক্সিজেন অনুঘটক}]{\text{অতি উচ্চ চাপ}} (-CH_2-CH_2-CH_2-)n$$
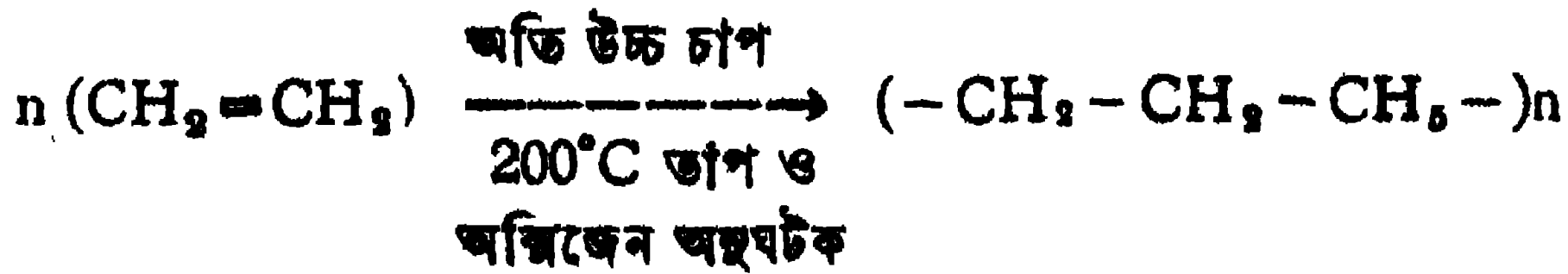
অপরটির নাম কণ্ডেনসেসন পলিমারিজেসন। এই বিক্রিয়ায় দুটি ক্ষুদ্র অণু রাসায়নিক বিক্রিয়ায় এক অণু জল অপসারিত করে যে নূতন অণু সৃষ্টি করে, সেই নূতন অণু পরস্পর শৃঙ্খলাকারে জুড়ে গিয়ে একটি বৃহৎ-অণুর প্লাষ্টিক তৈরি করে। উদাহরণস্বরূপ নাইলন প্রস্তুতির কথা বলা যেতে পারে। এখানে অ্যাডিপিক অ্যাসিড ও হেক্সা-মিথিলিন ডাইঅ্যামিন পারস্পরিক বিক্রিয়ায় যে মধ্যবর্তী যৌগ তৈরি করে, সেটাই এক অণু জল অপসারিত করে বৃহৎ নাইলন অণুশৃঙ্খলের একটি অণু তৈরি করে

যদিও রসায়নবিদ্‌দের সঙ্গে প্লাষ্টিকের পরিচয় ঘটেছিল অনেক আগেই, কিন্তু সাধারণের সঙ্গে এর পরিচয় ঘটবার প্রথম সুযোগ করে দেন বেল-জিয়ামের রসায়নবিদ্ ডক্টর এল. ডব্লিউ. বেক্‌ল্যাণ্ড। তাঁর বৈজ্ঞানিক জীবন কাটে আমেরিকায়। তিনিই 1908 সালে প্লাষ্টিক শিল্পের গোড়াপত্তন করেন। কার্বলিক অ্যাসিড, ফর্মালডিহাইডের জলীয় দ্রবণ ফরম্যালিনের সঙ্গে মিশিয়ে তাতে অনুঘটক হিসাবে সামান্য অ্যামোনিয়া দিয়ে উত্তপ্ত করেন। এই রাসায়নিক বিক্রিয়ায় দুটি স্তরের সৃষ্টি হয়, তন্মধ্যে একটি জল ও অন্যটি হলুদ রঙের একটি আঠালো পদার্থ। এই আঠালো পদার্থটিই হলো বেক-ল্যাণ্ডের তৈরি প্রথম প্লাষ্টিক, যা শিল্পজগতে তাঁর নামানুসারে বেকেলাইট নামে পরিচিত। একক ভাবে ফিনল অথবা ফর্মালডিহাইডের কথা চিন্তা করলে প্লাষ্টিক আমাদের ধরাছোঁয়ার বাইরে, কিন্তু তাদেরই সংমিশ্রণে যে বিশেষ প্রক্রিয়ায় এই নতুন পদার্থটি আমাদের সামনে হাজির হলো, সেটাই রসায়নবিদের কৃতিত্ব। ফিলার হিসাবে তুলার ছাট অথবা কাঠের গুঁড়া মিশিয়ে এই বেকেলাইট আজ নানাভাবে ব্যবহৃত হয়, যথা—বৈদ্যুতিক সাজসরঞ্জাম, টেলিফোন যন্ত্র, ছুরির বাঁট, বোতাম ইত্যাদি। বর্তমানে অবশ্য প্রায় সমস্ত ফিন-লিক পদার্থ ও অ্যালডিহাইডিক পদার্থ মিশিয়ে এবং অনুঘটক হিসাবে সালফিউরিক অ্যাসিড ব্যবহার করে বেকেলাইটজাতীয় প্লাষ্টিক তৈরি করা হয়। এগুলি সাধারণতঃ উত্তাপে গলে না এবং সাধারণ কোন দ্রাবকে দ্রবীভূত হয় না এই বিশেষ গুণের জন্যে জীবজন্তুর হাড় ও এবোনাইটের তৈরি জিনিষপত্রে আজকাল এই বেকেলাইট-জাতীয় প্লাষ্টিক ব্যবহার করা হয়।

আর একটি থার্মোসেটিং প্লাষ্টিক 1929 সালে ইউরিয়া ও ফর্মালডিহাইডের বিক্রিয়ায় আমেরিকায় প্রথম তৈরি হয়। এর একটি বিশেষ গুণ হচ্ছে এই যে, এটি কাচের মত কঠিন ও স্বচ্ছ। কিন্তু কাচের মত কতকগুলি গুণ থাকা সত্ত্বেও একে কাচের বদলে ব্যবহার করা গেল না। কারণ এই জাতীয় প্লাষ্টিক ঠাণ্ডা হবার সঙ্গে সঙ্গে সঙ্কোচনের টান সহ্য করতে না পেরে ফেটে যায়। বৃটিশ বিজ্ঞানী রোসিটার ইউরিয়ার $[CO(NH_2)_2]$ বদলে থায়োইউরিয়া $[CS(NH_2)_2]$ ব্যবহার করে এই সমস্যার সমাধান করেন, কিন্তু এর স্বচ্ছতা নষ্ট হলো। পরবর্তী পর্যায়ে ইউরিয়া ও থায়োইউরিয়া মিশ্রণের সঙ্গে ফর্মালডিহাইডের বিক্রিয়া ঘটিয়ে আরও উন্নত ধরণের প্লাষ্টিক তৈরি করা হয়। এই মিশ্র

প্লাষ্টিক কাচের মত স্বচ্ছ, বর্ণহীন এবং একে নানা রঙে রঞ্জিত করা যায়।

পারপেক্স—কাচ তৈরির প্রধান উপাদান সিলিকা ও সোডা বিন্দুমাত্র ব্যবহার না করেই সম্পূর্ণ জৈব উপাদানে গঠিত কাচের মত স্বচ্ছ একটি নূতন প্লাষ্টিকজাতীয় পদার্থের (পারপেক্স) উদ্ভাবন করেন ইংল্যাণ্ডের ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রির রসায়নবিদ্‌গণ। মিথাইল মিথাক্রাইলেট নামক একটা জটিল জৈব যৌগ থেকে এই প্লাষ্টিক জাতীয় পদার্থটি তৈরি করা হয়। এর ব্যবসায়িক নাম পারপেক্স। আমেরিকায় এটি লুসাইট নামেও পরিচিত। থার্মোপ্লাষ্টিক বলে একে কাচের মত একাধিক বার ছাঁচে ফেলা যায়। সাধারণ কাচ আঘাতে ভেঙ্গে গেলে তার টুকরা যেমন বিপজ্জনক হতে পারে, এর ক্ষেত্রে সে ভয় নেই। কাচের চেয়ে হাল্কা কিন্তু সমান মোটা কাচ অপেক্ষা এর কাঠিন্য ও দৃঢ়তা অনেক বেশী। এর কাঠিন্য এত বেশী যে, বুলেটও এতে প্রতিহত হয়। এসব গুরুত্বপূর্ণ গুণের জন্যে পারপেক্স আজ অনেক ক্ষেত্রেই অপরিহার্য হয়ে উঠেছে।

সেলুলয়েড—বিজ্ঞানী জন ওয়েলেস্‌লি হায়াট 1869 সালে জীবজন্তুর হাড়ের মত সাদা ও শক্ত এক রকম নূতন ধরণের প্লাষ্টিকজাতীয় পদার্থ আবিষ্কার করেন। নাইট্রোসেলুলোজ থেকে তৈরি এই প্লাষ্টিকজাতীয় পদার্থটিই বর্তমানে সেলুলয়েড নামে পরিচিত। নাইট্রোসেলুলোজ একটি অতি বিস্ফোরক পদার্থ, তাই আংশিক নাইট্রেটেড সেলুলোজ (যাকে পাইরোক্সিলিনও বলা হয়) অ্যালকোহলে গুলে তার সঙ্গে প্লাষ্টিসাইজার হিসাবে কর্পূর মিশিয়ে ও প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন রং মিশিয়ে উত্তপ্ত করলে মিশ্রিত রঙে রঞ্জিত সেলুলয়েড তৈরি হয়। সেলুলয়েড থার্মোপ্লাষ্টিকধর্মী—তাই সেলুলয়েডের তৈরী অকেজো ও পরিত্যক্ত জিনিষ পুনরায় গলিয়ে নূতন জিনিষ তৈরি করা যায়। হাতীর দাঁতের বিকল্প হিসাবে অনেক ক্ষেত্রে এই সেলুলয়েড ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া ছুরির বাঁট, সাবানদানী ও বহুবিধ নিত্যব্যবহার্য জিনিষ এর সাহায্যে প্রস্তুত হয়। সেলুলয়েড প্লাষ্টিকের অতি সূক্ষ্ম পাত ফটোগ্রাফীর ফিল্ম তৈরির জন্যে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু বিশুদ্ধ সেলুলয়েড সহজদাহ্য পদার্থ। এর উপর কিছুক্ষণ সূর্যরশ্মি পড়লে জ্বলে উঠতে পারে।

নাইট্রোসেলুলোজের পরিবর্তে সেলুলোজ অ্যাসিটেট ব্যবহার করলে যে প্লাষ্টিক তৈরি হয়, তা কিন্তু সেলুলয়েডের মত দাহ্য নয়, উপরন্তু স্বচ্ছ এবং সেলুলয়েডের বিকল্প হিসাবে ব্যবহারযোগ্য। এর সাহায্যে রঙীন চশমা, বাদ্যযন্ত্রপাতি প্রভৃতি তৈরি করা হয়। অবশ্য সেলুলয়েডের চেয়ে এর দাম বেশী।

পলিথিন—ইথিলিন নামক একটি অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন অতি উচ্চ চাপে (প্রায় 2000 গুণ বায়ুমণ্ডলীয় চাপে) অক্সিজেনের উপস্থিতিতে প্রায় 200°C তাপমাত্রায় রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে একটি প্লাষ্টিকজাতীয় পদার্থের সৃষ্টি করে। এই প্লাষ্টিককে পলিথিলিন বা পলিথিন বলে। থার্মোপ্লাষ্টিক শ্রেণীর মধ্যে সবচেয়ে সরল বৃহৎ অণুর যৌগ এই পলিথিন, কিন্তু এর প্রস্তুতি যতটা সরল মনে হচ্ছে, মোটেই তা নয়—বেশ কঠিন। বিভিন্ন রঙে একে রঞ্জিত করা যায়। সবচেয়ে হাল্কা প্লাষ্টিক জলে ভাসে। থার্মোপ্লাষ্টিকের বিশেষ দৃঢ়তা থাকা সত্ত্বেও পলিথিন এত নমনীয় যে, সাধারণ অবস্থাতেও একে ইচ্ছামত বাঁকানো যায়। এটি জলে ভেজে না, অ্যাসিড ও ক্ষারের সংস্পর্শে অবিকৃত থাকে। তাই এর সাহায্যে পাইপ, টিউব, অ্যাসিডের পাত্র ও গৃহস্থালীর নানারকম জিনিষপত্র তৈরি করা হয়।

প্লাষ্টিকের বস্ত্র—আমরা আগেই জেনেছি, প্লাষ্টিক সুতার আকারেও তৈরি করা সম্ভব এবং বস্ত্রশিল্পে যে বিভিন্ন প্লাষ্টিক ব্যবহৃত হয়, তার মধ্যে নাইলন ও টেরিলিনই উল্লেখযোগ্য।

নাইলন—নাইলন প্লাষ্টিককে তরল অবস্থায় অতি সূক্ষ্ম ছিদ্রপথে উচ্চচাপে পরিচালিত করে নাইলনের সুতা তৈরি করা হয়। নাইলনের তৈরি সুতাই বর্তমানে সবচেয়ে দৃঢ় ও টান-শক্তিবিশিষ্ট সুতা। তাই এর সাহায্যে প্যারাসুটের কাপড় ও দড়ি তৈরি করা হয়। তাছাড়া নাইলন থেকে দাঁত মাজা ও রং করবার ব্রাসও তৈরি করা হয়। নাইলনের পোশাক-পরিচ্ছদও বাজার ছেয়ে ফেলেছে।

টেরিলিন—টেরিলিন একটি পলিএষ্টার। টেরাপথ্যালিক অ্যাসিড ও ইথিলিন গ্লাইকলের বিক্রিয়ায় অতি উচ্চ তাপে বায়ুশূন্য অবস্থায় তৈরি হয় এই (পলিএষ্টার যৌগ) প্লাষ্টিকজাতীয় পদার্থ টেরিলিন। নাইলন ও টেরিলিন উভয়েই থার্মোসেটিং প্লাষ্টিক ও দাহ্য। এথেকে তৈরি পোশাক-পরিচ্ছদে ভাঁজ পড়ে না, সহজে ময়লা হয় না এবং এগুলি বেশ টেকসই। বিভিন্ন রঙে এদের রঞ্জিত করা যায়। সহজদাহ্যতার জন্যে সহজেই এতে আগুন লাগবার ভয় থাকে।

স্বরনালী

সত্যব্রত দাশগুপ্ত

স্বরনালী মানবদেহের একটি আশ্চর্য যন্ত্র। স্বরনালী থেকে নির্গত শব্দই ওষ্ঠ, তালু, জিহ্বা ইত্যাদির সাহায্যে কথার আকারে মনের ভাব প্রকাশ করে। স্বরনালীর সম্পূর্ণ পরিণতি হয়েছে স্তন্যপায়ীদের ক্ষেত্রে। মানবদেহে স্বরনালীর গঠনপ্রণালী এবং তার কাজ সম্বন্ধে আলোচনা করবার আগে স্বরনালীর বিবর্তনের ইতিহাস সম্বন্ধে কিছু আলোচনার প্রয়োজন।

স্বরযন্ত্রের প্রথম ক্ষুদ্র সংস্করণ দেখা যায় একরকম মাছের মধ্যে, যার নাম লাং-ফিস (Lung-fish)। এই মাছ ফুসফুসের সাহায্যে শ্বাসকার্য চালায়। এদের স্বরনালী অত্যন্ত সরল এবং সংক্ষিপ্তভাবে গঠিত। গলবিলের (Pharynx) সামনের দেয়ালে যেখানে ফুসফুসের প্রবেশদ্বার, তার দুই পাশে মাত্র ভাঁজের আকারে স্বরনালী অবস্থিত। এখানে স্বরনালীর কাজ ফুসফুসে বাতাসের আগমন ও নির্গমন নিয়ন্ত্রণ করা। এতে কোন স্বরের প্রকাশ হয় না।

স্বরপ্রকাশ প্রথমে হয় উভচর প্রাণীদের ক্ষেত্রে অর্থাৎ বিবর্তনের পরের ধাপে। এদের স্বরযন্ত্রে একটি দ্বিধাবিভক্ত প্রকোষ্ঠ আছে। প্রকোষ্ঠের দুটি কক্ষের মাঝখানে স্বরযন্ত্রটি অবস্থিত। এদের স্বরযন্ত্রে এরিটিনয়েড (Arytenoid) নামে একটি তরুণাস্থির সংযোজন হয়েছে।

আরও উন্নতি দেখা যায় সরীসৃপজাতীয় প্রাণীদের মধ্যে। সাধারণতঃ সরীসৃপের স্বর নেই, কিন্তু কোন কোন সরীসৃপের শব্দ করবার ক্ষমতা আছে; যেমন—গেকো (Gecko), বার্কিং বার্ড, টিকটিকি ইত্যাদি। এদের স্বরযন্ত্রে এরিটিনয়েড ছাড়া ক্রুকয়েড (Cricoid) তরুণাস্থিও পাওয়া যায়। পাখীদের ক্ষেত্রে স্বরযন্ত্রের বিবর্তন একটু বিশেষ ধরণের। এখানে স্বরনালী আছে, তবে তা থেকে কোন স্বর নির্গত হয় না। এই স্বরনালীর গঠনপ্রণালী সরীসৃপদের মতই অর্থাৎ এখানেও এরিটিনয়েড এবং ক্রুকয়েড তরুণাস্থি পাওয়া যায়। কিন্তু এদের স্বরনালীতে আর একটি নূতন সংযোজন হয়েছে, যার নাম সিরিংস (Syrinx)। এই সিরিংস্ একমাত্র পাখীদের দেহেই পাওয়া যায়। স্তন্যপায়ীদের দেহে এর আবার অবলুপ্তি ঘটেছে। এই সিরিংস স্বরনালী থেকে আলাদা-

ভাবে আছে এবং এখান থেকেই পাখীদের স্বরের প্রকাশ হয়। প্রধান শ্বাসনালী দুটি ফুসফুসে প্রবেশ করবার জন্যে যেখানে দ্বিধাবিভক্ত হয়, সিরিংস সেখানে অবস্থিত।

স্বরনালীর সর্বশেষ এবং সম্পূর্ণ পরিণতি লাভ করেছে স্তন্যপায়ী প্রাণীতে। এখানে শ্বাসনালীর অনেক উন্নত ধরণের পরিবর্তন দেখা যায়। স্বরনালী এবং শ্বাসনালী অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্মিলিত হয়ে এখানে আছে। শ্বাসপথের সুরু হয়েছে নাসিকা থেকে এবং শেষ হয়েছে ফুসফুসে। এই পথেরই একটি মধ্যবর্তী অংশের নাম স্বরনালী বা স্বরযন্ত্র। এই স্বরযন্ত্র গলার উপরিভাগে অবস্থিত। স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মধ্যে মানুষের স্বরযন্ত্রের গঠনপ্রণালী এবং তার কাজ সম্বন্ধে এখানে আলোচনা করা হয়েছে।

শ্বাসনালীটি আমাদের খাদ্যনালীর সামনের দিকে রয়েছে। যদিও নাসিকা থেকে শ্বাসনালীর এবং মুখগহ্বর থেকে খাদ্যনালীর আরম্ভ, তবুও এই দুটি পথই একটি সাধারণ পথ গলবিলে (Pharynx) এসে পড়েছে। গলবিলটি মুখ-গহ্বর এবং নাসিকার পিছন দিকে আছে। ঐ দুটি বিভিন্ন নালীর অন্তর্বর্তী পথ হিসাবে গলবিল কাজ করে। খাদ্যনালীতে গলবিলের পরের অংশের নাম অন্ননালী (Oesophagus) এবং তার পরের অংশই পাকস্থলী (Stomach)। গলবিলের সামনের দেয়ালের নীচের দিক থেকে শ্বাসনালীর বাকী অংশ আলাদাভাবে স্বরযন্ত্র নামে ভিন্ন নালী দিয়ে নীচের দিকে নেমে গেছে। গলবিলের সামনেই স্বরযন্ত্র অবস্থিত। গলার নীচের দিকে

লম্বভাবে দ্বিখণ্ডিত নাসিকা, মুখগহ্বর, গলবিল এবং স্বরনালী।
1—গলবিল, 2—এপিগ্লটিস, 3—কৃকয়েড, 4—স্বররজ্জু, 5—থাইরয়েড, 6—প্রধান শ্বাসনালী

স্বরযন্ত্র নামে শ্বাসনালীর এই অংশটুকু শেষ হয় এবং তার পরের অংশ প্রধান শ্বাসনালী (Trachea) সুরু হয়।

গলবিলের সামনের দেয়ালে যেখানে স্বর-নালীর সুরু, সেই ছিদ্রপথকে স্বরনালীর প্রবেশদ্বার বলে। প্রধান শ্বাসনালী কণ্ঠ থেকে বক্ষে প্রবেশ করে এবং তারপর দুই ভাগে ভাগ হয়ে যায়। এই দুটি ভাগ দু-পাশের দুটি ফুস্‌ফুসে প্রবেশ করে। সুতরাং বাতাস নাক থেকে গলবিলে প্রবেশ করে। তারপর স্বরযন্ত্রের প্রবেশদ্বার দিয়ে প্রধান শ্বাসনালীতে এবং সেখান থেকে ফুস্‌ফুসে যায়।

এদিকে খাদ্য আবার মুখগহ্বর থেকে গলবিল, গলবিল থেকে অন্ননালী এবং তারপর পাকস্থলীতে পৌঁছায়। তবে খাদ্য চলাচলের সময় স্বরনালীর প্রবেশদ্বার বন্ধ থাকে, নতুবা খাদ্যের কণা শ্বাসনালীতে ঢুকে পড়তে পারে।

স্বরনালীর প্রবেশদ্বারের উপরে ও সামনের দিকে এবং জিহ্বার পিছনে একটি তরুণাস্থি আছে। তার নাম এপিগ্লটিস (Epiglottis), এর কাজ ঢাক্‌নার মত। খাদ্য বা অন্য কোন বাইরের কিছু যাতে স্বরনালীতে ঢুকে না পড়ে, তার জন্যে এই এপিগ্লটিস ঠিক সময়মত প্রবেশ-দ্বারের উপর পড়ে স্বরনালীর মুখ বন্ধ করে দেয় এবং সেই মুহূর্তের জন্যে শ্বাসক্রিয়া বন্ধ থাকে। এপিগ্লটিসের নীচে এবং সামনের দিকে আর একটি তরুণাস্থি আছে। তার নাম থাইরয়েড (Thyroid) —ইংরেজী V অক্ষরের মত। এই V-টি এমনভাবে আছে যে, তার কোণটি সামনের দিকে এবং বাহু দুটি পিছনের দিকে (<) অর্থাৎ V-টি যেন শোয়ানো অবস্থায় রয়েছে। কৈশোর উত্তীর্ণ পুরুষের ক্ষেত্রে গলায় যে উঁচু মত কণ্ঠহাড় দেখা যায়, সেটাই থাইরয়েড তরুণাস্থি। এর নীচে ক্রিকয়েড নামে আংটির মত আর একটি তরুণাস্থি আছে। এর পরেই প্রধান শ্বাসনালীর সুরু। শ্বাসনালীর এই অংশ যাতে সব সময় খোলা থাকে, সে জন্যেই ক্রিকয়েড সম্পূর্ণ গোলাকার।

এই তরুণাস্থিগুলি ছাড়া আরও তিন জোড়া তরুণাস্থি আছে। তাদের নাম এরিটিনয়েড, কিউনিফর্ম (Cuneiform) এবং করনিকিউলেট (Corniculate)। এই সব তরুণাস্থি বিভিন্ন গ্রন্থি (Joint) এবং বন্ধনীর (Ligament) দ্বারা পরস্পর দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ। তাছাড়া অনেক মাংসপেশীও পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করে রয়েছে। এই তরুণাস্থিগুলিকে মাংসপেশীর সঙ্কোচন ও প্রসারণের দ্বারা নানাভাবে নাড়ানো যায়।

থাইরয়েড তরুণাস্থির ভিতর দিকে দুটি স্বরতন্ত্রী (Vocal cord) পাশাপাশি অবস্থিত। এই দুটি তন্ত্রীর মাঝখানের জায়গাটিকে বলে গ্লটিস (Glottis)। প্রতিটি স্বরতন্ত্রীর আকৃতি একটি রজ্জুর ন্যায়। তার একটি প্রান্ত সামনের দিকে থাইরয়েডের ভিতর দিকে এবং অপর প্রান্ত পিছন দিকে এরিটিনয়েড তরুণাস্থিতে আটকানো আছে। যখন মাংসপেশীর সঙ্কোচন বা প্রসারণের দ্বারা বিভিন্ন তরুণাস্থিকে নাড়ানো হয়, তখন তার ফলে স্বরতন্ত্রীর অবস্থা এবং স্থানের পরিবর্তন ঘটে অথবা স্বরযন্ত্রের প্রবেশদ্বারের প্রসারণ বা সঙ্কোচন ঘটতে পারে। স্বরপ্রকাশ বা শ্বাস-প্রশ্বাসের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী এই সব পরিবর্তন ঘটানো হয়।

স্বরনালীর দৈর্ঘ্য পুরুষদের ক্ষেত্রে—44 মিঃ মিঃ এবং স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে—36 মিঃ মিঃ। এই দুটি মাপই প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে। শৈশব এবং কৈশোরে স্ত্রী এবং পুরুষের স্বরনালীর সামান্যই তফাৎ থাকে। কিন্তু কৈশোর এবং যৌবনের সন্ধিস্থলে স্বরনালীর দ্রুত পরিবর্তন ঘটতে থাকে, বিশেষ করে পুরুষের ক্ষেত্রে যখন স্বর গভীর হতে গিয়ে স্বরভঙ্গ হয়। তখন এই পরিবর্তন অত্যন্ত দ্রুত এবং লক্ষণীয়। এরই ফলে পুরুষের কণ্ঠহাড় তখন উঁচু হয়ে দেখা দেয় এবং গলার স্বর পরিবর্তিত হয়।

এই স্বরনালীকে আবার বিবর্তন অনুসারে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়—

1. স্বরতন্ত্রীর উপরের অংশ—একমাত্র স্তন্যপায়ীদেরই এই অংশটি আছে। অন্য কোন প্রাণীতে এর প্রতিরূপ দেখা যায় না; অর্থাৎ স্তন্যপায়ীদের এটা নূতন সংযোজন।

2. স্বরতন্ত্রী ও তার নীচের অংশ—বিবর্তনের যে স্তর থেকে স্বরতন্ত্রীর উদ্ভব, সেই স্তর থেকে স্তন্যপায়ী পর্যন্ত প্রত্যেক প্রাণীতেই এই অংশটি নানা ভাবে দেখা যায়। একথা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে।

স্বরতন্ত্রীর উপরের অংশ কেবলমাত্র স্তন্যপায়ীদের মধ্যেই দেখা যায়। কারণ বিবর্তনের ফলে স্বরনালীর অবস্থানের কিছু পরিবর্তন ঘটে এবং খাদ্যনালীর সঙ্গে এমনভাবে যুক্ত থাকে যে, বহিরাগত কোন বস্তুর হঠাৎ প্রবেশ ঘটতে পারে। এই প্রবেশ বন্ধ করবার জন্যেই উপরের অংশটির উদ্ভব।

এপর্যন্ত যে স্বরনালী সম্বন্ধে এসব কথা বলা হলো সেই আশ্চর্য যন্ত্রের কাজ কি শুধুই স্বরসৃষ্টি করা? প্রশ্নটা একেবারেই অবান্তর মনে হতে পারে। কিন্তু বিবর্তনের ইতিহাসে স্বরযন্ত্রের প্রথম প্রকাশ থেকে আজ পর্যন্ত বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, এর সৃষ্টির প্রয়োজন হয়েছিল স্বরসৃষ্টির উদ্দেশ্যে নয়, অন্য কোন প্রয়োজনে। স্বরসৃষ্টি যেন অনেকটা উপজাত (Bye-product)। তাহলে স্বরযন্ত্রের কাজ কি?

স্বরযন্ত্রের কাজ

(1) শ্বাসনালী, ফুসফুস ইত্যাদি রক্ষা করবার প্রহরী হিসাবে কাজ করে। দুই ভাবে বা দুই উদ্দেশ্যে এই কাজ হয়।

(ক) খাদ্যগ্রহণ করবার সময় খাদ্যকণা বা অন্য কিছু বা অন্য সময়ে বাইরের কোন কিছু যাতে শ্বাসনালীতে প্রবেশ করে শ্বাসনালীর কোন ক্ষতি বা শ্বাসরোধ না করতে পারে।

খাদ্যনালী শ্বাসনালীর ঠিক পিছনেই আছে। খাদ্যনালীর সামনের দেয়ালে খাদ্যনালী এবং স্বরনালীর একটি যোগাযোগের পথ রয়েছে। তাকে স্বরনালীর প্রবেশপথ বলে (Inlet of larynx)। খাদ্যগ্রহণ করবার সময় এই প্রবেশদ্বার বন্ধ থাকে। ফলে খাদ্যদ্রব্য খাদ্যনালী থেকে শ্বাসনালীতে প্রবেশ করতে পারে না। কিন্তু কোন কারণে (যেমন—তাড়াতাড়ি খাওয়ার সময়) সেই প্রবেশদ্বার বন্ধ হতে যদি বিলম্ব হয়, তাহলে খাদ্যকণা স্বরনালীতে প্রবেশ করে এবং কাশির উদ্রেক হয়, যাকে আমরা 'বিষম খাওয়া' বলি।

(খ) যদি বাইরের কোন কিছু হঠাৎ স্বরনালীতে প্রবেশ করে, তবে তৎক্ষণাৎ তাকে বাইরে পাঠিয়ে দেবার জন্যে শ্বাসনালীতে কাশির উদ্রেক হয়। এভাবে সদাজাগ্রত প্রহরীর মত, বাইরের কিছু যাতে স্বরনালীতে প্রবেশ করে তার ক্ষতি না করতে পারে, তার জন্যে সজাগ থাকে। এই জন্যে স্বরনালীকে প্রহরী কুকুর (Watch dog) বলা হয়।

(2) নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের বায়ুর গতি এবং পরিমাণ নির্ধারণ করে—স্বরনালীর প্রবেশদ্বার এবং গ্লটিস অর্থাৎ দুটি স্বররজ্জুর মধ্যেকার অংশের ছোট ছোট মাংসপেশীর দ্বারা সংকোচন এবং প্রসারণ করা যায়। এর ফলে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের সময় বায়ুর আগমন ও নির্গমন আয়ত্তাধীন রাখা হয়।

(3) উদরের (Abdomen) আভ্যন্তরীণ চাপ বাড়ানো—এই কাজ অদ্ভুত মনে হলেও খুব সহজেই করা হয়। প্রাকৃতিক কতকগুলি শারীরিক কারণে সময়ে সময়ে উদরের আভ্যন্তরীণ চাপ বাড়াবার প্রয়োজন হয়, যেমন—মলত্যাগ, মূত্রত্যাগ কিংবা প্রসবকাল বা কোন ভারী কাজ করবার সময়। তখন স্বরনালীর প্রবেশদ্বার বন্ধ করা হয় এবং তার ফলে শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়। সে জন্যে বক্ষদেশ (Thorax) এবং উদরের মধ্যবর্তী মধ্যচ্ছদা (Diaphragm) স্থির থাকে

এবং তখন উদরের মাংসপেশীর সঙ্কোচনের দ্বারা আভ্যন্তরীণ চাপ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

(4) স্বরনালী এবং শ্বাসনালীর অনেকটা অংশের ভিতরের দেয়াল থেকে শ্লেষ্মা (Mucus) নির্গত হয়। এই শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী (Mucus membrane) শ্বাসনালীকে তপ্ত এবং শুষ্ক বায়ু থেকে কোন ক্ষতির সম্ভাবনা রোধ করে।

(5) শ্বাসক্রিয়ার মাংসপেশীগুলিকে অনেকক্ষণ ধরে ক্রমাগত একটানা কাজ করা থেকে রেহাই দেওয়া। এমন কিছু কাজ আছে যখন শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত এবং একটানা করবার প্রয়োজন হয়; যেমন—গাছে ওঠা, সাঁতারকাটা, পাহাড়ে ওঠা ইত্যাদি। কিন্তু যদি একটানা অনেকক্ষণ শ্বাস-প্রশ্বাসের মাংসপেশীর কাজ করতে হয়, তাহলে সহজেই সেই সব মাংসপেশী পরিশ্রান্ত হয়ে কাজের ব্যাঘাত ঘটাবে। কিন্তু এই মাংসপেশীগুলিকে কিছুক্ষণের জন্যে রেহাই দিয়ে বিশ্রাম নেবার সুযোগ দেওয়া যায়। স্বরনালীর এই ভূমিকা অত্যন্ত সহজ এবং প্রয়োজনীয়। একটানা দ্রুত শ্বাসক্রিয়া চলবার সময় স্বরনালী কিছুক্ষণের জন্যে প্রবেশদ্বার বন্ধ করে। ফলে শ্বাসক্রিয়া বন্ধ হয়, অর্থাৎ ঐ সব মাংসপেশী, যারা শ্বাসক্রিয়া ঘটাবার জন্যে নিয়োজিত, তাদের অব্যাহতি দেওয়া হয়। সুতরাং এই ক্ষণিক বিশ্রাম আবার কাজের শক্তি যোগাবার জন্যে বেশ উপযোগী। এভাবে কিছুক্ষণ পর পর দম বন্ধ করবার ফলে শ্বাসক্রিয়ার মাংসপেশী অনেক বেশী সময় কাজ করতে পারে।

(6) স্বরপ্রকাশ—যদিও নাম স্বরনালী, তবুও স্বরপ্রকাশ যে তার প্রধান কাজ নয়, সেটা সহজেই বোঝা যায়। কারণ প্রথম স্বরনালীর প্রকাশ যে Lung fish-এ, তাদের কোন স্বর নেই বরং ফুস্‌ফুসের প্রবেশদ্বারে থেকে ফুস্‌ফুসে বাতাসের যাতায়াত নিয়ন্ত্রণ করাই প্রধান কাজ। তাছাড়া অন্যান্য প্রাণীদের ক্ষেত্রেও স্বরপ্রকাশের আবির্ভাব থেকে স্তন্যপায়ীদের মধ্যে তার পূর্ণ পরিণতি পর্যন্ত বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, স্বরপ্রকাশের কাজ স্বরনালীতে সংযোজিত হয়েছে ধীরে ধীরে।

সঞ্চয়ন

খাদ্য-সমস্যা সমাধানে ফল ও সব্জী

প্রায় এক যুগ আগে ইডেন গার্ডেনে নিখিল ভারত কলা প্রদর্শনীতে বিধানচন্দ্র রায়ের ভাষণ শোনবার সৌভাগ্য অনেকেরই হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন যে, ভাতের বদলে কলা খেয়েই মানুষ সুন্দর স্বাস্থ্যের অধিকারী হতে পারে। খাদ্য-সমস্যায় জর্জরিত ভারতের পক্ষে কথাটা খুবই মূল্যবান বলে মনে হয়েছিল। অবশ্য অনেকে বলতে পারেন যে, কথাটা দুর্ভিক্ষজর্জরিত ফ্রান্সের রাণীর কথার মত—ওরা রুটির জন্যে চিৎকার করছে কেন, কেক খেলেই তো পারে। অনেকে হয়তো ভাবতে পারেন, যেখানে ভাত খাবার পয়সা নেই, সেখানে ফল খেতে বলা বিলাসিতা মাত্র। অবশ্য কথাটা একটু ঘুরিয়েও বলা যায়; যেমন—যাদের ক্ষমতা আছে, তারা যদি গম অথবা চালের ভাগ কমিয়ে বেশী সব্জি ও ফল খান, তাহলে বেশ খানিকটা খাদ্যশস্য বেঁচে যেতে পারে, যা অন্যের কাজে লাগবে। আর ফল বলতে আমরা বাঙালীরা আপেল, আঙুরের দিকে নজর দিয়ে থাকি, অথচ একটা পেয়ারা বা এক টুকরা পেঁপে যে অনেক সময় আপেল বা

আলুর চেয়েও উপকারী, সে কথাটা আমরা ভুলে যাই।

প্রকৃতির দান হিসেবে ভারতের মাটি এবং আবহাওয়া বৈচিত্র্যময়, যার ফলে নাতিশীতোষ্ণ, উপগ্রীষ্মমণ্ডল এবং গ্রীষ্মমণ্ডলের উপযোগী ফলের চাষ করা যেতে পারে। আমাদের দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আম, জাম, আপেল, আনারস, আঙ্গুর, ন্যাসপাতি প্রভৃতি নানা রকমের ফল জন্মায়।

ভারতে ফলোৎপাদনের জন্যে ভূমির পরিমাণ প্রায় 12 লক্ষ হেক্টর, যা সমস্ত চাষের জমির মাত্র 0·8 ভাগ এবং ফল উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় 7·4 টন। আবার এই মোট উৎপাদনের বেশ কিছুটা অংশ বিক্রয়ের জন্যে বাজারে পৌঁছাবার আগে নানাভাবে নষ্ট হয়। এছাড়া খোসা, আঁটি প্রভৃতি বাদ দিলে খাবার জন্যে মোটামুটি 4 লক্ষ টনের মত ফল পাওয়া যায় এবং এই হিসেবে আমাদের দেশে প্রতিটি লোকের ভাগ্যে মাত্র এক আউন্স ফল জোটে, যেখানে দৈনন্দিন খাদ্যতালিকায় 3 আউন্স ফল থাকবার নির্দেশ আছে। একটি সুসমঞ্জস খাদ্য-তালিকায় একজন লোকের 4 আউন্স শাকজাতীয় সব্জী এবং 3 আউন্স অন্য সব্জী থাকা দরকার। কিন্তু নানা কারণে উৎপাদনের পরিমাণ কম হওয়ায় মাত্র 2 আউন্স সব্জী একজন মানুষের ভাগ্যে জোটে।

এক-একটি বিশেষ ফল বা সব্জী এক-একটি বিশেষ ঋতুতে জন্মায়। কোন কোন সময় এত বেশী পরিমাণে জন্মায় যে, প্রচুর অপচয় হয়ে থাকে। তাছাড়া দেশের সব জায়গায় সব রকম ফল সারা বছর ধরে জন্মায়ও না। কাজেই জ্যাম, জেলী, স্কোয়াশ প্রভৃতি বিভিন্ন জাতীয় ফল এবং সব্জী সংরক্ষণ করতে পারলে অপচয়ও বন্ধ করা যায় এবং সারা বছর ধরে বিভিন্ন রকমের ফল ও সব্জীর আস্বাদ গ্রহণ করা চলে। একটু নজর দিলে গৃহিণীরাও বাড়ীতে অনায়াসে ফল ও সব্জী অতি অল্প সময়ে ও অল্প খরচে সংরক্ষণ করতে পারেন। সুখের বিষয়, অধুনা ভারতের কৃষি মন্ত্রণালয় এই বিষয়ে গৃহিণীদের ব্যবহারিক শিক্ষা দানের জন্যে নানা স্থানে অনেক শিক্ষা-কেন্দ্র স্থাপন করেছেন। সেখান থেকে গৃহিণীরা অতি অল্প সময়ে এই বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেন। ফল এবং সব্জী মানুষের দৈনন্দিন খাদ্য-তালিকায় এক বিশেষ প্রয়োজনীয় অংশ। এতে খাদ্যপ্রাণ এবং শরীরের পক্ষে প্রয়োজনীয় এমন সব খনিজ লবণ আছে, যার অভাব শুধু শস্য এবং আমিষ খাদ্যগ্রহণে পূরণ হয় না। আম, পেঁপে, কাঁঠাল, খেজুর, পিচ, ধনেপাতা, পালং শাক, গাজর, টোম্যাটোর মধ্যে আছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন-এ। আপেল, লেবু, বেগুন, কমলা, পিচ, আনারস, শিম প্রভৃতিতে আছে প্রচুর থিয়ামিন। লেবুজাতীয় সমস্ত ফল, আমলকী, টোম্যাটো, বাঁধাকপি, সজনে, প্রভৃতিতে আছে ভিটামিন-সি। তাছাড়া ফল এবং সব্জীতে প্রচুর পরিমাণে আছে পটাশিয়াম, চুন, গন্ধক, লবণ, ম্যাগ্‌নেশিয়াম, ফস্‌ফরাস, লোহা এবং অন্যান্য খনিজ লবণ, যা শরীর রক্ষার পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন।

কোন খাদ্যের মূল্যায়ন তার ক্যালরি উৎপাদন-ক্ষমতার পরিমাপে হয় এবং খাদ্যশস্যই এর প্রধান উৎস। কিন্তু ক্যালোরি উৎপাদনে সব্জীর ক্ষমতা কত বেশী, তা নীচের তালিকাটি লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে।

ফসলের নাম	প্রতি আউন্সে ক্যালরির পরিমাণ	প্রতি একরে উৎপাদন (টনে)	প্রতি একরে ক্যালরির পরিমাণ
গম	98	0·34	1,034880
কলা	42	10·00	15,052800
পেঁপে	11	48·00	18923520
মিষ্টি আলু	36	3·00	5500000

উপরের তালিকাটি লক্ষ্য করলেই জানা যাবে, ক্যালরি উৎপাদনের ক্ষমতা অনুযায়ী 1 একর গম, 0·45 একর আম এবং ·07 একর কলার সমান। অন্য ভাবে দেখলে প্রতিটি মানুষের প্রতি দিনে প্রয়োজনীয় 2500 ক্যালরি অনুযায়ী এক একর গম এবং এক একর কলা থেকে প্রায় 16 জন মানুষের প্রয়োজনীয় ক্যালরি পাওয়া যায় এবং এথেকেই ফল ও সব্জী চাষের উপযোগিতা কত বেশী, তা বোঝা যায়। বহু জনসংখ্যাপীড়িত ভারতে খাদ্যাভাব অনেক পরিমাণে দূর করা যেতে পারে, যদি ফলমূল উৎপাদনের ব্যবস্থা আরো বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে এগিয়ে যায় এবং শস্য চাষের সঙ্গে সঙ্গে ফল ও সব্জী চাষের দিকে নজর দেওয়া হয়।*

---

* ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদ; (কৃষিভবন, নতুন দিল্লী) কর্তৃক প্রকাশিত।

মঙ্গলগ্রহ

আমরা মঙ্গলগ্রহ সম্পর্কে কি জানি? জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা অনেকদিন থেকেই একথা জানেন যে, এই গ্রহের আয়তন পৃথিবীর আয়তনের এক-দশমাংশের কিছু বেশী। এর দুটি উপগ্রহ আছে। জোনাথন সুইফ্‌ট্‌-এর 'গালিভার্স ট্রাভল্‌স্‌' গ্রন্থে এই দুটি উপগ্রহের উল্লেখ আছে। যাহোক, জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা 1877 সালে এই গ্রহ দুটি আবিষ্কার করেন। মঙ্গলগ্রহের এক বছর পৃথিবীর প্রায় দু-বছরের সমান। ঋতুগুলি প্রায় পৃথিবীর মতই। কিন্তু এক-একটি ঋতুর স্থায়িত্ব পৃথিবীর ঋতুর স্থায়িত্বের প্রায় দ্বিগুণ। মঙ্গলগ্রহের পৃষ্ঠদেশে সাদা এবং কালো দাগ আছে—তা জমি এবং সমুদ্র। অপেক্ষাকৃত ঘন আবহাওয়ায় মেঘও দেখা যায়।

শীতকালে মঙ্গলগ্রহের মাথায় একটা তুষারস্তূপ দেখা যায়। এই তুষারস্তূপ বসন্তকালে ধীরে ধীরে ছোট হয়ে আসে। আর গ্রীষ্মকালে তা পুরাপুরি অদৃশ্য হয়ে যায়। শরৎকালে এই তুষারস্তূপ আবার দেখা যায় এবং শীতেই তার আকার সবচেয়ে বড় হয়ে ওঠে।

বহুদিনের পরিশ্রম ও নিরীক্ষার ফলে এই সব তথ্য জানা গেছে। গ্রহের পৃষ্ঠদেশে কি ঘটছে, তার ছবি নেওয়া সহজ নয়। তাছাড়া পৃথিবীর বাধার জন্যে এবং আবহাওয়া মাঝে মাঝে যথেষ্ট স্বচ্ছ না থাকবার ফলে নিরীক্ষা ব্যাহত হয়।

পৃথিবী এবং মঙ্গলগ্রহের মধ্যে কিছু অবস্থাগত মিল থাকবার ফলে এই গ্রহ সম্পর্কে একটা অস্বাভাবিক আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে। মঙ্গলগ্রহে উদ্ভিদ সম্পর্কে গবেষণার ফল প্রকাশিত হয়েছে। জলপূর্ণ খাল এবং একটি উন্নত সভ্যতার অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হয়েছে।

ষাটের দশকের সুরুতে বর্ণালী-বিশ্লেষণ পদ্ধতি বিকাশলাভ করবার ফলে জানা গেছে যে, মঙ্গলগ্রহের আবহাওয়ার ঘনত্ব পৃথিবীর আবহাওয়ার ঘনত্বের দশ গুণ কম। সে জন্যে সেখানে এর অস্তিত্বের সম্ভাবনা কম। মঙ্গলগ্রহের পৃষ্ঠদেশে গ্যাসের চাপ হলো পৃথিবীর 35 কিলোমিটার উচ্চতাসম্পন্ন স্থানের গ্যাসের চাপের প্রায় কাছাকাছি এবং তা হলো পৃথিবীপৃষ্ঠের গ্যাসের চাপের 0·5 শতাংশ।

সঙ্গে সঙ্গে এটাও জানা গেছে যে, মঙ্গলগ্রহের আবহাওয়ায় প্রধানতঃ কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস

আছে। আগে পৃথিবীর সঙ্গে এই গ্রহের যতটা মিল আছে বলে মনে হয়েছিল, এখন ততটা মিল আছে বলে মনে হচ্ছে না। এরকম আবহাওয়ার অভাব নিয়ে পৃথিবীর সঙ্গে যেমন মঙ্গলগ্রহের মিল আছে, তেমনি চাঁদের সঙ্গেও তার মিল থাকাই আজ স্বাভাবিক বলে মনে হয়। আয়তন এবং ব্যাসের দিক থেকে বিচার করলে দেখা যাবে যে, মঙ্গলগ্রহের স্থান পৃথিবী এবং চাঁদের মাঝামাঝি। মেরিনার-4 যে সব ফটো তুলেছিল, তাতে দেখা গেছে যে, মঙ্গলগ্রহে চাঁদের আগ্নেয়গিরির মুখের অনুরূপ অসংখ্য আগ্নেয়গিরির মুখ রয়েছে।

এটাও দেখা গেছে যে, এই গ্রহের উপরের স্তরের কিছু অংশের অবস্থা এমনই যে, তা কোন-মতেই নিরূপণ করা যায় না। মহাকাশের যন্ত্র-পাতির সাহায্যে মঙ্গলগ্রহের খুব নিকট থেকে যে ছবি তোলা হয়েছে, তাতে কোন খালবিলের অস্তিত্বের চিহ্ন দেখা যায় না। মঙ্গলগ্রহের জমিতে উচ্চতার যে ব্যবধান দেখা গেছে, তা দশ কিলোমিটারের কম নয়—অবশ্য গ্রহের অল্প পরিধির মধ্যেই উচ্চতার ব্যবধান মেপে দেখা হয়েছে।

এই গ্রহের আবহাওয়াও খুব অস্বাভাবিক। আবহাওয়ায় কার্বন ডাই-অক্সাইড থাকে। একটা বিশেষ উচ্চতায় এই গ্যাস তুষারপাতে নষ্ট হয়ে যায় এবং তৈরি হয় শুকনো বরফের স্ফটিক। মেরু অঞ্চলেই এরকম জমাটবাঁধা অবস্থার সৃষ্টি হয়। সেখানে তাপমাত্রা কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস জমানোর তাপমাত্রার নীচে থাকে। মঙ্গলগ্রহের সর্বোচ্চ জলবাষ্পের পরিমাণ নির্ণয়ের যে চেষ্টা করা হয়েছে, তাতে দেখা যায়, তা 0'06 মিলি-মিটার জলস্তরের সমান। অবশ্য একথা মনে রাখতে হবে যে, একটা অঞ্চলের গড় হিসেবেই এই পরিমাণ নির্ণয় করা হয়েছে—যে অঞ্চলের ব্যাস কমপক্ষে কয়েক শত কিলোমিটার। অবশ্য অপেক্ষাকৃত ছোট অঞ্চলে বেশী পরিমাণ জল পাওয়া যেতে পারে।

জ্যোতির্বিজ্ঞানের সাফল্যের সম্ভবতঃ এখানেই পরিসমাপ্তি। মঙ্গলগ্রহের উপরের দিকের আবহাওয়া সেখানকার ভূমির তাপ-বৈশিষ্ট্য এবং তার উপরি-ভাগের ভূমিস্তরের সূক্ষ্ম বিন্যাস সম্পর্কে যে তথ্য পাওয়া গেছে, তা মহাকাশ সম্পর্কে গবেষণার ফল। আর তা শুধু জ্যোতির্বিজ্ঞান সংক্রান্ত তথ্যাদি থেকেই পাওয়া যায় নি, সে জন্যে ভূ-পদার্থ, ভূতত্ত্ব এবং ভূ-রসায়ন-বিজ্ঞান সম্পর্কেও তথ্যাদি সংগ্রহ করতে হয়েছে।

তার মানে এই নয় যে, মঙ্গলগ্রহ সম্পর্কে পরীক্ষা চালাবার কাজে জ্যোতির্বিজ্ঞানের আর কোন ভূমিকা নেই। পৃথিবী থেকে মঙ্গলগ্রহের আবহাওয়া সম্পর্কে গবেষণা চালাবার কাজ এখনও বেশ কিছুদিন অগ্রাধিকার পাবে। পৃথিবীর মানমন্দিরগুলি থেকে মঙ্গলগ্রহ সম্পর্কে গবেষণা চালাবার যে ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে, এগুলি তারই অংশবিশেষ।

তাছাড়া একথা তো স্বীকার করতেই হবে যে, শুধুমাত্র জ্যোতির্বিজ্ঞান নির্দেশিত পদ্ধতিতে গ্রহ-নক্ষত্র সম্পর্কে, বিশেষ করে মঙ্গলগ্রহ সম্পর্কে গবেষণা চালানো যায় না। মহাকাশে প্রযুক্ত কৌশলগুলি গ্রহ-নক্ষত্র সম্পর্কে গবেষণার ক্ষেত্রেও প্রযুক্ত হচ্ছে। চাঁদ এবং শুক্রগ্রহের ক্ষেত্রে তার স্পষ্ট প্রমাণ আছে। সঙ্গে সঙ্গে এমন একটা বিশেষ পদ্ধতিরও বিকাশ ঘটা দরকার, যা জ্যোতি-র্বিজ্ঞানের মত অত সাধারণভাবে গ্রহ-নক্ষত্রের বিচার-বিশ্লেষণ করবে না অথবা ভূতত্ত্ব বা ভূ-পদার্থ-বিজ্ঞানের মত পুঙ্খানুপুঙ্খভাবেও তথ্যাদির বিশ্লেষণ করবে না।

আসলে এই পদ্ধতিই হবে গ্রহতত্ত্বের ভিত্তি। আমাদের চোখের সামনে নতুন এই বিজ্ঞানের জন্ম হচ্ছে।

জিন-এনজাইম প্রক্রিয়া ও মানুষের রোগ

শ্রীঅসিতবরণ দাস-চৌধুরী*

এই প্রবন্ধে মানুষের দেহকোষের দুইটি অ্যামিনো অ্যাসিড, যথা—ফেনাইলঅ্যালানাইন (Phenylalanine) ও টাইরোসিন (Tyrosine) জিন নির্দেশিত এনজাইমের দ্বারা আদিষ্ট হইয়া কিভাবে আমাদের দেহে বিভিন্ন প্রক্রিয়া ঘটায় এবং তাহার ব্যতিক্রমে আমাদের দেহে যে কত বিভিন্ন ধরণের রোগের সৃষ্টি হইতে পারে—তাহা আলোচনা করিব। আমাদের দেহে কুড়িটি অ্যামিনো অ্যাসিড আছে এবং এই অ্যামিনো অ্যাসিডগুলিও সাধারণতঃ জিন-এনজাইম সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রক্রিয়ার পরিশেষে শক্তি উৎপন্ন করে, কিন্তু এই প্রক্রিয়াগুলি চলিবার সময় কোন পর্যায়ে জিন-এনজাইম সম্পর্কের কোন ব্যতিক্রম ঘটিলে আমাদের দেহে রোগের সৃষ্টি হইতে পারে। এইখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এখনও পর্যন্ত সবগুলি অ্যামিনো অ্যাসিডের জিন-এনজাইম সম্পর্কিত বিপাকের পথ সম্পূর্ণরূপে আবিষ্কৃত হয় নাই। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা অবশ্য কর্তব্য যে, জিন-এনজাইমের পারস্পরিক সম্পর্কের ব্যতিক্রমজনিত মানবদেহের রোগগুলি সাধারণতঃ বংশানুক্রমিক। যদিও অনেক ক্ষেত্রে কৃত্রিম উপায়ে দেহে এনজাইম প্রবেশ করাইয়া রোগ নিরাময় করিয়া দেওয়া যায়, তথাপি ঐ এনজাইম সম্পর্কিত জিনের পরিবর্তন দুঃসাধ্য। আজ জৈব রাসায়নিক প্রজনন-বিজ্ঞানে (Biochemical genetics) এই জিনের রহস্য সমাধানকল্পে বিশ্বের বহু বিজ্ঞানী গভীর সাধনায় ব্যাপৃত আছেন, কারণ ইহা জৈব রাসায়নিক প্রজনন-বিজ্ঞানীদের নিকট গুরুতর এক সমস্যা।

জেনেটিক্সকে প্রজননবিদ্যা বলা হয়, তবে বর্তমানকালের জেনেটিক্স বলিতে প্রজননবিদ্যার বাহিরে আরও অনেক কিছু বুঝায়। প্রজননবিদ্যা আধুনিক ক্রমোন্নতিশীল জীব-বিজ্ঞানের এক বিশেষ শাখা। আমরা বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে মেণ্ডেলের বংশসূত্রগুলি হইতেই জানিতে পারিয়াছি যে, জিন জীবের বংশানুগতির এক-একটি একক। বিগত প্রথম চার দশক বৈজ্ঞানিকেরা প্রধানতঃ বিশুদ্ধ জেনেটিক্সে জীবকোষে জিনের অবস্থান, জিনের অনুপাত ইত্যাদি লইয়া গবেষণা করিয়াছেন। কিন্তু জীবদেহে জিনের প্রক্রিয়া কিভাবে চলে, তাহার হদিশ পাইবার জন্য বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য কাজ হয় নাই। দুইজন আমেরিকান বিজ্ঞানী জর্জ বিডল ও ই. এল. টেটাম 1941 সালে Neurospora নামক ছত্রাকের উপর কাজ করিয়া জিন ও এনজাইমের সম্পর্কের বিষয় আলোচনার ফলে জীবদেহে জিনের প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে এক নূতন আলোকপাত করিয়াছেন। এই যুগান্তকারী আবিষ্কারের জন্য 1958 সালে উপরিউক্ত বিজ্ঞানী দুইজন যুগ্মভাবে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। এই প্রসঙ্গে বৃটিশ ডক্টর এ. ই. গ্যারডের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গ্যারড 1909 সালে Inborn Errors of Metabolism নামে একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তিনি এই গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিলেন যে, মানুষের কতকগুলি শারীরিক বৈলক্ষণ্য বংশানুক্রমিক। তিনি এই কথাও স্পষ্টভাবে উল্লেখ করিয়াছেন যে, কতকগুলি নির্দিষ্ট এনজাইমের অভাবে (যেগুলি সুস্থ ব্যক্তির দেহে পরিমাণমত থাকে)

* নৃতত্ত্ব বিভাগ, বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা-19

মানবদেহে ঐ বৈলক্ষণ্যের উৎপত্তি হয়। তিনি আরও বলিলেন যে, একটি জিন একটি বিশেষ এনজাইম প্রস্তুত করে, পরিব্যক্ত (Mutant) জিন সেই নির্দিষ্ট এনজাইম তৈয়ার করিতে পারে না। সুতরাং গ্যারডের আবিষ্কৃত মানবদেহে ব্যাধির কারণগত জিন-এনজাইম সম্পর্ক বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের জেনেটিক্সের এক বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। আশ্চর্যের বিষয়—এই আবিষ্কার তখনকার যুগে বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে নাই বরং অবহেলিত হইয়াই আসিয়াছে। কিন্তু বিডল্ ও টেটামের Neurospora-র উপর অনুরূপ জিন-এনজাইম সম্পর্ক আবিষ্কৃত হওয়ায় বিজ্ঞানীরা গ্যারডকেই জৈব রাসায়নিক প্রজনন-বিজ্ঞানের আবিষ্কর্তা বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন।

আজ এই কথা অনস্বীকার্য যে, Neurospora-র মত মানুষের দেহেও জিনের প্রক্রিয়া এনজাইমের মাধ্যমে হইয়া থাকে। পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, মানুষের দেহে কুড়িটি অ্যামিনো অ্যাসিড আছে, ফেনাইলঅ্যালানাইন উহাদের মধ্যে একটি। দেখা যাক ফেনাইলঅ্যালানাইন এনজাইমের দ্বারা কিভাবে আমাদের দেহে ক্রিয়া করিয়া থাকে। আমরা খাদ্যের মাধ্যমে যে সকল প্রোটিন গ্রহণ করিয়া থাকি, সেইগুলির প্রত্যেকটির মধ্যেই প্রায় এই ফেনাইলঅ্যালানাইন থাকে। খাদ্য হজম করিবার সঙ্গে সঙ্গে প্রোটিন ভাঙিয়া বিভিন্ন-

প্রোটিন
ফেনাইলকেটোনিউরিয়া
ফেনাইলঅ্যালানাইন → (P) → টাইরোসিন
ফেনাইল পাইরুভিক অ্যাসিড
ফেনাইল ল্যাকটিক অ্যাসিড
CO_2 H_2O
প্যারাহাইড্রোক্সি ফেনাইল পাইরুভিক অ্যাসিড
(t) টাইরোসোসিস
ডাইহাইড্রোক্সি ফেনাইল পাইরুভিক অ্যাসিড
হমোজেনটিসিক অ্যাসিড (অ্যালকাপটন)
(h) অ্যালকাপটোনিউরিয়া
CO_2 H_2O
(c) থাইরোক্সিন ট্রাইয়োডোথাইরোক্সিন
ক্রেটিনিজম
অ্যালবিনিজম
(a) ডাইহাইড্রোক্সি ফেনাইলঅ্যালানাইন (ডপা)
মেলানিন

মানবদেহে ফেনাইলঅ্যালানাইন ও টাইরোসিন প্রক্রিয়া।

রকমের অ্যামিনো অ্যাসিডে পরিণত হয়, যাহার মধ্যে ফেনাইলঅ্যালানাইন পাওয়া যাইবে। পাকনালীতে সেই অ্যামিনো অ্যাসিড অন্যান্য দ্রবণীয় বস্তুর সহিত প্রবেশ করে এবং ব্যাপন (Diffusion) ক্রিয়ার মাধ্যমে এক কোষ হইতে অন্য কোষে যাইয়া সমস্ত শরীরে ছড়াইয়া পড়ে। একবার ফেনাইলঅ্যালানাইন দেহকোষে আসিয়া পড়িলে ইহা কোন্ পথে যাইবে, তাহা সম্পূর্ণ নির্ভর করে জিন-নির্দিষ্ট যে এনজাইম ক্রিয়া করিবে, তাহার উপর। ফেনাইলঅ্যালানাইনের ভাগ্য তিনটি পথে প্রবর্তিত হইতে পারে—(1) ইহা দেহকোষে প্রোটিনে পরিবর্তিত হইতে পারে, (2) ইহা অ্যামিনো অ্যাসিড টাইরোসিনে পরিবর্তিত হইতে পারে, (3) ইহা ফেনাইলপাইরুভিক অ্যাসিডে (Phenylpyruvic acid) পরিবর্তিত হইতে পারে। এখন ফেনাইলঅ্যালানাইনকে এই তিনটির মধ্যে যে কোন একটিতে পরিবর্তিত হইতে হইলে পর্যায়ক্রমে অনেকগুলি জিন-নির্দেশিত এনজাইম মাধ্যমিক প্রক্রিয়ায় যাইতে হইবে এবং ইহার যে কোন একটি পর্যায়ে জিন-নির্দেশিত এনজাইমের পরিবর্তন হইলে উদ্দেশ্য সফল হইবে না, পরন্তু নির্দিষ্ট এনজাইমের অভাবে আমাদের দেহে তুমুল কাণ্ডের সৃষ্টি হইবে। দেহকোষের ক্রোমোসোমে (Chromosome) প্রচ্ছন্ন জিন (Recessive gene) p যখন হোমোজাইগাস্ (Homozygous)* অবস্থায় থাকে, তখন ফেনাইলঅ্যালানাইনকে যে নির্দিষ্ট এনজাইম টাইরোসিনে পরিবর্তিত করে তাহার উৎপত্তি হয় না, ফলে ফেনাইলঅ্যালানাইন নির্দিষ্ট এনজাইমের অভাবে উদ্দিষ্ট পথে পরিচালিত হইতে না পারিয়া দেহকোষে বেশী পরিমাণে জমিতে থাকে এবং কিছু-পরিমাণ ফেনাইলঅ্যালানাইন ফেনাইলপাইরুভিক অ্যাসিডেও পরিণত হয়। প্রয়োজনাতিরিক্ত এই দুইটি পদার্থ রক্তে সঞ্চারিত হয় এবং পরিশেষে প্রস্রাবের সহিত দেহ হইতে নির্গত হয়, যাহা অতি সহজেই রাসায়নিক পরীক্ষায় অনুধাবন করা যায়। যে ব্যক্তির প্রস্রাবে এই লক্ষণ দেখা যায়, তাহাকে ফেনাইলকেটোনিউরিয়া রোগী (Phenylketonuria সংক্ষেপে PKU) বলা হয় রোগটির নাম ফেনাইলকেটোনিউরিয়া। ফেনাইলকেটোনিউরিয়া রোগীর আরও অনেক মানসিক ও দৈহিক পরিবর্তন লক্ষণীয়। সাধারণতঃ এই রোগে আক্রান্ত রোগী শৈশবে সহজে সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারে না, কারণ পায়ের গোড়ালীর অস্থির গঠন খুব দুর্বল থাকে। এই রোগীর চুল ফ্যাকাশে রঙের হয় এবং বুদ্ধিও খুব কম থাকে।

আমাদের দেহকোষে ফেনাইলঅ্যালানাইনের মত টাইরোসিন আর একটি অ্যামিনো অ্যাসিড। পূর্বে একবার উল্লেখ করিয়াছি যে, ফেনাইলঅ্যালানাইন হইতে টাইরোসিন উৎপন্ন হইতে পারে অথবা খাদ্যের প্রোটিনের মাধ্যমে আমরা ইহা পাইয়া থাকি। টাইরোসিন বিভিন্ন জিন-নির্দেশিত এনজাইমের মাধ্যমে আমাদের দেহে চারভাবে ক্রিয়া করিতে পারে। প্রথমতঃ টাইরোসিন দেহকোষের প্রোটিনে পরিণত হতে পারে। দ্বিতীয়তঃ টাইরোসিন থাইরয়েড গ্ল্যাণ্ডের আয়োডিনের সহিত মিশিয়া থাইরয়েড হরমোন থাইরক্সিন (Thyroxine) এবং ট্রায়োডোথাইরোনাইন (Triodothyronine) তৈয়ারি করে। আমাদের দেহের বিপাকের (Metabolism) উপর এই দুইটি হরমোনের কর্তৃত্ব খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং সাধারণ দৈহিক ও মানসিক বিকাশে অবশ্য প্রয়োজনীয়। কিন্তু আমাদের দেহকোষের

---

* কোন প্রাণীর ক্রোমোসোমের সঞ্চার পথে (Locus) যদি সমজিন (Alike gene) থাকে, তবে তাহাকে হোমোজাইগাস (Homozygous) বলা হয়। কিন্তু তাহারা যদি বি-সম (Different gene) হয়, তবে তাহাকে হেটেরোজাইগাস (Heterozygous) বলা হয়।

ক্রোমোসোমে যখন একজোড়া প্রচ্ছন্ন জিন cc থাকে, তখন তাহা দেহের প্রয়োজনীয় উপরিউক্ত সাধারণ থাইরয়েড হরমোন তৈয়ার করিতে পারে না, কারণ ঐ জিনগুলি হরমোনের প্রয়োজনীয় এনজাইম তৈয়ার করিবার ক্ষমতা নষ্ট করিয়া দেয়। ফলে Genetic goitrous cretinism রোগের সৃষ্টি হয়। এই রোগীর দৈহিক ও মানসিক অবক্ষেপ দেখা দেয় এবং থাইরয়েড গ্ল্যাণ্ড খুব বড় হইয়া যায়।

তৃতীয়তঃ টাইরোসিন ডাইহাইড্রোক্সিফেনাইলঅ্যালানাইনে (Dihydroxyphenylalanine) পরিণত হইতে পারে এবং উহা পুনরায় অনেকগুলি পর্যায়ে শেষ পর্যন্ত মেলানিনে (Melanin) পরিণত হয়। মেলানিন রংটি আমাদের ত্বক, চুল ও চোখে পাওয়া যায়। একজোড়া প্রচ্ছন্ন জিন aa টাইরোসিনকে ডাইহাইড্রোক্সিফেনাইলঅ্যালানাইনে পরিণত করিবার এনজাইম নষ্ট করিয়া দেয় এবং এই আগন্তকের অনুপস্থিতিতে মেলানিন তৈয়ারি বন্ধ হইয়া যায়। মেলানিন আমাদের দেহের কোষে না থাকিলে আমাদের ত্বক, চুল ও চোখে কোন রং হয় না, ফলে ফ্যাকাশে দেখা যায়। যে ব্যক্তির দেহে এই লক্ষণগুলি দেখা দেয়, তাহাকে আমরা অ্যালবিনো বলি এবং এই রোগকে অ্যালবিনিজম (Albinism) বলা হয়।

চতুর্থতঃ বেশীর ভাগ টাইরোসিন পরিশেষে দেহকোষে শক্তি উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে কার্বন-ডাই-অক্সাইড, জল ও নাইট্রোজেন নির্গমনে পরিণত হয়। কিন্তু টাইরোসিন এই পরিণতি লাভ করে অনেকগুলি এনজাইম মাধ্যমিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে। এই প্রক্রিয়াগুলির প্রথম পর্যায়ের ফল প্যারাহাইড্রোক্সিফেনাইলপাইরুভিক অ্যাসিড (Parahydroxyphenylpyruvic acid) এবং দ্বিতীয় পর্যায় হইতেছে ডাইহাইড্রোক্সিফেনাইলপাইরুভিক অ্যাসিড (Dihydroxyphenylpyruvic acid)। আমাদের দেহকোষে যখন একজোড়া প্রচ্ছন্ন জিন tt থাকে, তখন নির্দিষ্ট এনজাইমের অভাবে ঐ দ্বিতীয় পর্যায়ের ডাইহাইড্রোক্সিফেনাইলপাইরুভিক অ্যাসিড আর পরিবর্তিত হয় না। ফলে দেহকোষে উহা বেশী পরিমাণে জমিতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে কিছু পরিমাণ টাইরোসিনও দেহে জমিবা থাকে। এই দুইটি অতিরিক্ত পদার্থ যে ব্যক্তির প্রস্রাবের সহিত পাওয়া যায়, তাহাকে টাইরোনোসিস (Tyronosis) রোগী বলা হয়। টাইরোনোসিস রোগীর অন্য কিছু বিশেষ বৈলক্ষণ্য দেখা যায় না। এই প্রক্রিয়াসমূহের তৃতীয় পর্যায়ে হোমোজেনটিসিক অ্যাসিড (Homogentisic acid) তৈয়ারি হয়, কিন্তু একজোড়া প্রচ্ছন্ন জিন hh-এর উপস্থিতিতে নির্দিষ্ট এনজাইম তৈয়ারি হয় না। ফলে হোমোজেনটিসিক অ্যাসিড মেলিল্যাকটোঅ্যাসেটিক অ্যাসিডে (Maleylacetoacetic aciJ) পরিবর্তিত হইতে পারে না। সুতরাং এই হোমোজেনটিসিক অ্যাসিড দেহকোষে জমিতে থাকে। এই বেশী পরিমাণ হোমোজেনটিসিক অ্যাসিডকে অ্যালকাপটনও (Alkapton) বলা হয়। বেশী পরিমাণ অ্যালকাপটন যে ব্যক্তির প্রস্রাবে পাওয়া যায়, তাহাকে অ্যালকাপটোনিউরিয়া রোগী বলা হয় এবং এই রোগকে অ্যালকাপটোনিউরিয়া (Alkaptonuria) বলা হইয়া থাকে। অ্যালকাপটোনিউরিয়া রোগীকে চিহ্নিত করা খুবই সহজ ব্যাপার। কারণ যে ব্যক্তি এই রোগে আক্রান্ত হয়, তাহার প্রস্রাবের প্রতি একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে যে, ঐ প্রস্রাবের অ্যালকাপটন বাতাসের সংস্পর্শে আসিবার ফলে অক্সিডাইজড্ হইয়া প্রস্রাবের রং ধীরে ধীরে হলুদ, বাদামী ও পরিশেষে গাঢ় কালো হইয়া যাইতেছে। সাধারণতঃ এই রোগীর অন্য কোন বৈলক্ষণ্য দেখা যায় না, কিন্তু বয়স বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে অ্যালকাপটন শরীরের কার্টিলেজগঠিত জায়গাগুলিতে,

যথা—কান, নাক ইত্যাদিতে জমিয়া যায়; ফলে ধীরে ধীরে ঐ জায়গাগুলি গাঢ় কালো হইতে থাকে। কখনও কখনও এই লক্ষণ ত্বকের Fibrous tissue ও চোখের সাদা অংশে (Sclera) পর্যন্ত দেখা যায়।

উপরিউক্ত আলোচনা হইতে ইহা বুঝা যাইতেছে যে, ছুইটি অ্যামিনো অ্যাসিডের বিপাকের পথ কত জটিল এবং ঐ বিপাকের পথে জিন-নির্দেশিত প্রকৃত এনজাইম প্রক্রিয়াগুলি চলিবার সময় কোন পর্যায়ে বিঘ্ন ঘটিলে আমাদের দেহে যে বিভিন্ন রোগ ও বৈলক্ষণ্য প্রকাশ পায়—তাহা সত্যই বিস্ময়কর। মানুষের দেহের অন্যান্য অ্যামিনো অ্যাসিডগুলির ক্ষেত্রেও অনুরূপ কথাই প্রযোজ্য।

বিজ্ঞান-সংবাদ

সৌরজগতের উৎপত্তি সম্পর্কে নূতন মতবাদ

বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী ডক্টর হ্যারল্ড সি. উরি চাঁদ ও সৌরজগতের উৎপত্তি সম্পর্কে একটি নূতন মতবাদ উপস্থাপিত করেছেন। তাঁর এই মতবাদ প্রমাণিত হলে অ্যাপোলো-15-এর চাঁদের পার্বত্য এলাকায় অভিযান খুবই তাৎপর্য-পূর্ণ হয়ে উঠবে এবং বিজ্ঞানী মহলে আলোড়ন সৃষ্টি করবে।

আমেরিকার চান্দ্র-বিজ্ঞানীদের মধ্যে প্রধান ডক্টর উরি বলেছেন যে, সৌরজগতে যে সকল গ্রহ রয়েছে, আদিতে তারা ছিল চাঁদেরই মত গ্রহ। চাঁদ যে সব উপাদানে গঠিত, সেই সবই ছিল পৃথিবীসহ সকল গ্রহের মূলে। আদি সূর্য থেকে সে দিন যে সকল চাঁদ বেরিয়ে এসেছিল, তাদের মধ্যে আজ ঐ একটি মাত্রই অবশিষ্ট রয়েছে।

ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের নোবেল পুরস্কার-বিজয়ী বিজ্ঞানী ডক্টর উরি জাতীয় বিমান বিজ্ঞান ও মহাকাশ সংস্থার হিউস্টন কেন্দ্রে এক সাক্ষাৎকারে তাঁর নূতন মতবাদ সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করে বলেন। চাঁদ ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্পর্কে প্রচলিত মত—একই সময়ে পৃথিবীর মতই সৌরজগতের অপর অংশে সৃষ্ট হয় চাঁদ, পরে পৃথিবীর আকর্ষণে তারই আওতায় এসে চাঁদ বন্দী হয়ে পড়ে।

কিন্তু ডক্টর উরির মতে, অ্যাপোলো-15-এর অভিযাত্রীরা যে চাঁদে তথ্যসন্ধানী অভিযান চালান, সেই চাঁদ ও পৃথিবী একই সময়ে সৃষ্ট হয় নি; বরং সৃষ্টির উষাকালে সকল গ্রহ ও পৃথিবীর আদি মাতা হিসাবে যে সকল চাঁদের সৃষ্টি হয়েছিল, তাদের মধ্যে অবশিষ্ট ঐ শেষ চন্দ্র গ্রহটিতেই মার্কিন মহাকাশচারীরা আর একবার অবতরণ করেছেন। মহাকাশচারী ডেভিড স্কট ও জেম্‌স্ আরউইন চাঁদের বিশুষ্ক হেড্‌লী নদী ও অ্যাপেনাইন পার্বত্য এলাকায় অবতরণ করেন। এটিই চাঁদের প্রাচীনতম এলাকা—মানুষ এই প্রথম ঐ এলাকা সম্পর্কে কেবলমাত্র প্রত্যক্ষভাবে জ্ঞান সঞ্চয়েই সক্ষম হয় নি, তারা যে সকল তথ্য সংগ্রহ করেছেন, তা সূর্যের চারদিকে যে সকল গ্রহ আবর্তিত হচ্ছে, তাদের সৃষ্টি-রহস্য ও উৎসের উপরও আলোকপাত করবে।

গ্রহমণ্ডলী ও চাঁদের উৎপত্তি নিয়ে ডক্টর উরি বহুকাল ধরে গবেষণা করছেন। আজ এক্ষেত্রে যাঁরা রয়েছেন, তাঁদের মধ্যে ডক্টর উরি অন্যতম বিশিষ্ট বিজ্ঞানী। তাঁর ধারণা, এই মতবাদ বিজ্ঞানী মহলে বিতর্ক সৃষ্টি করবে। তবে তিনি

মনে করেন, গ্রহমণ্ডলীর সৃষ্টি সম্পর্কে এটাই একমাত্র যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা হতে পারে।

ডক্টর উরি বলেন যে, পদার্থ-বিজ্ঞানের নিয়মের সঙ্গে এবং পূর্ববর্তী অ্যাপোলো চন্দ্রাভিযানের সাহায্যে চন্দ্র সম্পর্কে যে সকল তথ্য সংগৃহীত হয়েছে, সেই সকল তথ্যের সঙ্গে এই মতবাদের সামঞ্জস্য রয়েছে।

মোটামুটিভাবে ডক্টর উরি বলতে চেয়েছেন যে, সাড়ে চার-শ' কি পাঁচ-শ কোটি বছর পূর্বে অতি প্রচণ্ড বেগে ঘূর্ণায়মান মহাকাশের আদি সূর্য ঘন গ্যাসে পূর্ণ গোলাকার একটি বিরাট বর্তুলের রূপ ধারণ করে। কোন গতিশীল বস্তুর ভর বা মাস এবং তার গতিবেগের গুণফল হচ্ছে মোমেন্টাম। জ্যোতিঃপদার্থ-বিজ্ঞানের নিয়ম অনুসারে কৌণিক মোমেন্টাম (অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম) সংরক্ষণের জন্যে আদি সূর্যের ভর বা মাস গ্যাস বিপুল পরিমাণে ছাড়তে হয়েছে। এই সকল তেজস্ক্রিয় গ্যাস মহাকাশে ছড়িয়ে পড়ে ও বিভক্ত হয়ে যায়। এরাই চন্দ্রগ্রহের মূল উপাদান। ঐ সকল গ্যাস প্রথম চাঁদের মত গ্রহে এবং পরে ঐ সকল চন্দ্রগ্রহ সৌর-মণ্ডলীর অন্যান্য গ্রহে রূপান্তরিত হয়।

ডক্টর উরি বলেন যে, মহাকাশে যে ধূলিকণা ছিল, তাদের সঙ্গে সূর্য থেকে বিচ্ছুরিত ঐ বাষ্পের সংঘর্ষ ঘটে। ফলে ঐ সকল ধূলি উত্তপ্ত হয় এবং বাষ্পপুঞ্জ ভেঙ্গে ভেঙ্গে খণ্ডিত হয়ে যায়। যে অভিকর্ষ শক্তির ক্ষেত্র তারা প্রস্তুত করেছিল, তারা তারই প্রভাবাধীন হয়ে পড়ে। যদি কোন বস্তু ঐ সকল বাষ্পের মত লক্ষ লক্ষ মাইল জুড়ে বিরাজ করে, তবে তার অভিকর্ষ শক্তি প্রচণ্ড হয়ে ওঠে। কোন একটি স্থানে সাধারণ একটি বস্তুর অভিকর্ষ শক্তি খুব প্রবল হয় না।

সেই উত্তপ্ত বালুকারাশি আশেপাশের আরও ধূলিকণাকে টেনে নেয় এবং চন্দ্রগ্রহের মত গ্রহে পরিণত হয়। ডক্টর উরির মতে, চাঁদ যে অবিকৃত রয়েছে, অন্য গ্রহের সঙ্গে চাঁদের যে কোন রকম সংঘর্ষ হয় নি, তার মূলে রয়েছে কোন আকস্মিক কারণ। তিনি বলেন যে, সৃষ্টির আদিতে যে সকল চাঁদের সৃষ্টি হয়েছিল, তাদের মধ্যে ঐ একটি মাত্রই আজও বেঁচে রয়েছে। ঐ চাঁদেই সৌর-মণ্ডলীর বিভিন্ন গ্রহ গঠনের মূল উপাদান রয়েছে।

ডক্টর উরি বলেন, এই অভিমত একান্তভাবে তাঁরই। তবে বিশ্ববিখ্যাত বৃটিশ জ্যোতির্বিজ্ঞানী ডক্টর জেমস্ জীন্স বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে প্রথম এই আভাস দিয়েছিলেন। তারপর তিনিই এই বিষয়টি নিয়ে গবেষণা করেন।

পশুখাদ্য হিসাবে খবরের কাগজ

ভবিষ্যতে এমন দিন হয়তো আসবে, যখন গবাদি পশু, ভেড়া ও ছাগলকে খাদ্য হিসাবে পরিত্যক্ত খবরের কাগজও দেওয়া হবে। তার ফলে আজ চাষের জমি নিয়ে যে এত কাড়াকাড়ি, তার অনেকখানি সুরাহা হয়ে যাবে। তাছাড়া, পরিত্যক্ত খবরের কাগজ জলবায়ু দূষিতকরণের ক্ষেত্রে যে সমস্যার সৃষ্টি করে, সেই সমস্যারও সমাধান হবে।

আমেরিকার খবরের কাগজের সংখ্যা দিন দিনই বেড়ে যাচ্ছে। পড়া হয়ে যাবার পর এই সকল খবরের কাগজ যে কোথায় ফেলা হবে, কোথায় রাখা হবে, সে একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আমেরিকার মেরিল্যাণ্ডের বেল্টস্‌ভিলের কৃষিগবেষণা কৃত্যকের পশু-বিজ্ঞানী ডক্টর ডেভিড এ. ডিনিয়াস খবরের কাগজ পশুখাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা যায় কিনা, সে বিষয়ে পরীক্ষা করে দেখছেন। তিনি কৃত্রিম উপায়ে শীতকালীন পরিবেশ সৃষ্টি করে অন্যান্য খাদ্যের সঙ্গে খড়ের বদলে খবরের কাগজের গুঁড়া ও গুড় মিশিয়ে গবাদি পশুকে খাইয়েছেন। অন্যান্য খাদ্যবস্তুর মধ্যে ছিল সয়াবীন ও ভুট্টার গুঁড়া, কিছুটা সৈন্ধব লবণ,

টিমোথি ঘাস ও ডিক্যালসিয়াম ফসফেট। শতকরা 8, 16 ও 24 ভাগ—এই হারে খবরের কাগজের গুঁড়া ঐ সকল বস্তুর সঙ্গে মেশানো হয়েছিল।

বলদের বেলায় দেখা গেছে, খবরের কাগজের পরিমাণের তুলনায় গুড়ের পরিমাণ কম থাকলে তারা তা গ্রহণ করে নি। খবরের কাগজের কালি কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে নি। এই খাদ্য গ্রহণের ফলে তাদের দৈহিক ওজনও হ্রাস পায় নি। তারপরে তাদের মাংস, হাড় ইত্যাদি পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। এসব খাদ্যের কোন রকম বিরূপ প্রতিক্রিয়ার প্রমাণ ঐ সকল পশুর দেহের কোন অংশেই পাওয়া যায় নি।

ডক্টর ডিনিয়াস এই প্রসঙ্গে বলেছেন যে, পশুদের খাদ্যের অন্ততঃ 8 শতাংশ খড়ের বদলে খবরের কাগজ দেওয়া যেতে পারে। এতে কোন রকম ক্ষতি হবার আশঙ্কা নেই।

গোলমাল বন্ধ করবার উপায়

যে সকল চিকিৎসক সোভিয়েট ইউনিয়নের চিকিৎসা-বিজ্ঞান আকাডেমির শ্রমজীবী মানুষের রোগ ও স্বাস্থ্যরক্ষা, গোলমাল ও স্পন্দন সংক্রান্ত গবেষণাগারে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন, তাঁরা কোরপোভ পদার্থ-রাসায়নিক ইনস্টিটিউটের গবেষকদের সহযোগে গোলমাল নিয়ন্ত্রণের একটি কার্যকরী যন্ত্র আবিষ্কার করেছেন। তাঁদের উদ্দেশ্য হলো, শিল্পসংস্থার গোলমালের হাত থেকে কানকে রক্ষা করা। নতুন পদ্ধতিটি সোভিয়েট ইউনিয়নের বড় বড় কলকারখানার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে।

শিল্প-সংস্থা এবং অন্যান্য জায়গায় গোলমাল বন্ধ করবার জন্যে চেষ্টা চালানো হচ্ছে, কারণ মানুষের উপর গোলমালের প্রভাব খুবই ক্ষতিকর। এতে শুধু যে কানেরই ক্ষতি হয়, তা নয়। এতে হৃদ্‌যন্ত্র এবং স্নায়ুতন্ত্রেরও ক্ষতি হয়। গবেষণার ফলাফল থেকে জানা যায় যে, অতিরিক্ত মাত্রায় গোলমাল শরীরের পক্ষে বিশেষভাবে ক্ষতিকর।

সাম্প্রতিক কালে এটা দেখা গেছে—যে সকল লোককে অত্যন্ত গোলমালের মধ্যে কাজ করতে হয়, তাঁরা উচ্চ রক্ত চাপ এবং পেটের আলসারে ভোগেন। তাছাড়া গোলমালের জন্যে মনঃসংযোগ নষ্ট হয়, ক্লান্তি বাড়ে, ফলে উৎপাদনক্ষমতা কমে যায়।

শ্রমিকদের রক্ষণ-ব্যবস্থা, বিশেষ করে গোলমালজাত রোগ থেকে তাদের রক্ষা করাই হলো প্রতিষেধক ব্যবস্থার কাজ। প্রতিষেধক ব্যবস্থার প্রধান উদ্দেশ্য হলো, গোলমাল যথাসম্ভব কমিয়ে আনা। যাহোক, আলাদাভাবেও যে কেউ রক্ষণ-ব্যবস্থা করতে পারে। অনেক ক্ষেত্রেই তা সহজে ও সস্তায় করা যায়। তার মধ্যে আছে গোলমাল নিয়ন্ত্রণের জন্যে বিশেষ তুলামিশ্রিত পশমের প্যাড, প্লাগ ও চাকৃতি প্রভৃতি।

বর্তমানে সোভিয়েট ইউনিয়ন গোলমাল কমাবার জন্যে একটি কার্যকরী যন্ত্র প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন করছে। এই যন্ত্রটি পলিমার তন্তু দিয়ে তৈরি। এই তন্তু দেখতে অনেকটা নরম ফ্লানেলের মত। এই বস্তুটি যখন ভাঁজ করে কানে লাগানো হয়, তখন গোলমালের আওয়াজ অনেক কমে যায়। তার ফলে হট্টগোলের জায়গায়ও একজন মানুষ দীর্ঘ সময় ধরে কাজ করতে পারে এবং তাতে তার স্বাস্থ্যের কোন ক্ষতি হয় না।

সমাজ-বিজ্ঞান ও সমাজ-বিজ্ঞানী

মিনতি চক্রবর্তী

কতকগুলি মানুষ নিয়ে গঠিত হয় এক-একটি পরিবার, যাদের মধ্যে থাকে আত্মীয়তার এক নিবিড় বন্ধন। এরকম বহুসংখ্যক পরিবার নিয়ে গঠিত হয় এক-একটি সমাজ আর এই সমাজসম্পর্কিত যে বিজ্ঞান, তার নাম হলো সমাজ-বিজ্ঞান। বর্তমানে আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু হলো এই সমাজ-বিজ্ঞানের প্রকৃত অর্থ ও সমাজ-বিজ্ঞানীর বিভিন্ন ভূমিকা সম্পর্কে।

প্রাণী-জগতের অন্যান্য প্রাণী থেকে মানুষের রীতি-নীতি ও আচার-ব্যবহার সম্পূর্ণ ভিন্ন। মানুষ হলো সামাজিক জীব, সে গোষ্ঠীবদ্ধ জীবন-যাপন করে। মানুষের এই গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনের বিভিন্ন রকমের আকৃতি আছে, সে সামাজিক রীতি-নীতি ও আইন-শৃঙ্খলাকে অনুসরণ করে, সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও তার প্রতিটি কাজের সামাজিক মূল্য ও স্বীকৃতি তৈরি করে। সমাজ-বিজ্ঞান মানুষের এই প্রতিটি কাজকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে অনুসন্ধানের জন্তে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োগ করে।

প্রতিটি মানবগোষ্ঠী অপর মানবগোষ্ঠীর সঙ্গে পারস্পরিক সহযোগিতায় জীবনধারণ করে, অতএব সমাজ-বিজ্ঞানের মুখ্য শিক্ষার কেন্দ্র হলো মানুষের এই গোষ্ঠীবদ্ধ জীবন বা সমাজময়তাকে (Socialness) শিক্ষা করা। এই গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনকে কোনও সূত্রের উপর নির্ভর করে সাধারণ শ্রেণীভুক্ত করতে সমাজ-বিজ্ঞানীরা এই গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপকে পুঙ্খানুপুঙ্খ-ভাবে লক্ষ্য করেন। এক কথায় মানবজাতির সামাজিক জীবনের গঠন-প্রণালীকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে ব্যাখ্যা করা ও অনুশীলন করাকে বলা হয় সমাজ-বিজ্ঞান।

মানুষের সমাজবদ্ধ হয়ে বাস করবার প্রবণতা রয়েছে বলে সে একটি সমাজের সৃষ্টি করে। সেই সমাজের মধ্যে থাকে সংস্থা (Organisation), প্রতিষ্ঠান (Institution), জনসংখ্যা, স্থান ও কালের প্রভাব এবং সর্বোপরি মানবজাতির জীবনধারণের প্রচেষ্টা। জনসংখ্যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয় প্রতিটি মানুষ—স্ত্রী ও পুরুষ। সমাজ-বিজ্ঞানীরা এই সমাজেরই বৈজ্ঞানিক অনুশীলন করেন—কিভাবে একে অপরকে জীবন-ধারণের জন্তে পারস্পরিক সহযোগিতা করছে। সুতরাং সমাজ-বিজ্ঞানকে সংযোগ-সাধনকারী বা শ্রেণীবদ্ধকারী বিজ্ঞান বলা যেতে পারে, যা মানবগোষ্ঠীর বিভিন্ন ধারা ও আকৃতিকে অনুশীলন করে তাথেকে কি সমস্যার উদ্ভব হয়েছে, তা মানবগোষ্ঠীর সামনেই তুলে ধরে এক নতুন মতবাদ ও প্রকল্পের সৃষ্টি করে। সমাজ-বিজ্ঞান সমাজের মত জটিল জিনিষের বিভিন্ন তথ্য লোকসমক্ষে প্রকাশিত করে, যা না করলে সমাজের সংস্কারসাধন সম্ভব নয়। সমাজ-বিজ্ঞানের মতবাদ ও তথ্যের উপর ভিত্তি করেই কাজ করেন সমাজ-সংস্কারক, সমাজসেবী ও কল্যাণব্রতী পরিকল্পক (Welfare-planners)।

সমাজ-বিজ্ঞানের পাঠের যে সব ক্ষেত্র আছে, তা হলো 1) সংবাদ জ্ঞাপন ও জনমত, 2) অপরাধ-বিজ্ঞান, 3) গণ-আকৃতি (Demography), 4) পরিবার, 5) শ্রমশিল্প সংক্রান্ত সমাজবিজ্ঞান, 6) চিকিৎসাবিদ্যা বিষয়ক সমাজ-বিজ্ঞান, 7) সামাজিক অনুসন্ধানের রীতিতত্ত্ব,

8) পেশা সংক্রান্ত সমাজ-বিজ্ঞান, 9) রাজনৈতিক সমাজ-বিজ্ঞান, 10) জাতিগত সম্পর্ক, 11) গ্রামীণ সমাজ-বিজ্ঞান, 12) সামাজিক বিশৃঙ্খলা, 13) সামাজিক মনস্তত্ত্ব, 14) সামাজিক স্তরবিন্যাস, 15) সমাজতাত্ত্বিক মতবাদ, 16) শিল্পকলার সমাজ-বিজ্ঞান, 17) জটিল সংস্থার সমাজ-বিজ্ঞান, 18) শিক্ষার সমাজ-বিজ্ঞান, 19) আইনের সমাজ-বিজ্ঞান, 20) ধর্মের সমাজ-বিজ্ঞান, 21) ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর সমাজ-বিজ্ঞান প্রভৃতি।

উপরিউক্ত অংশগুলিতে যে কেবল সমাজ-বিজ্ঞানের একচেটিয়া অধিকার আছে তাই নয়, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যেও এগুলির কিছু কিছু অন্তর্ভুক্ত হয়। উদাহরণস্বরূপ সংবাদ জ্ঞাপন ও জনমত বিভাগটি মনোবিজ্ঞান, রাষ্ট্র-বিজ্ঞান ও পুলিশ-বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত হয়। তাছাড়া সমাজ-বিজ্ঞানের শিক্ষার ক্ষেত্র মনোবিজ্ঞান ও নৃ-বিজ্ঞানের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত হওয়ায় এদের মধ্যে সীমারেখা টানা খুব কঠিন।

সমাজ-বিজ্ঞানের কাজ কি ?

সামাজিক নিয়ন্ত্রণ এর প্রধান কাজ হিসাবে বিবেচিত। সমাজের কৃত্রিম পরিবর্তনের জন্যে এর দায়িত্ব খুব বেশী। এর অন্যতম প্রধান আর একটি কাজ হলো, বৃহত্তর মানবজাতির কল্যাণ-সাধনের জন্যে সমাজকে রক্ষা করা। সেই জন্যে সমাজে নিয়ত যে পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে, তা অনুশীলন করে—সেই পরিবর্তন কেন হচ্ছে, এবং তার গতিই বা কোন্ দিকে ও তার ফলাফলই বা কি, তা নির্দেশ করা এর অন্যতম প্রধান কর্তব্য। সমাজ-বিজ্ঞান সেই সামাজিক প্রক্রিয়ারই অনুসন্ধান করে, যা কোনও নতুন প্রতিষ্ঠানের জন্ম দেয় বা পুনর্গঠনের সাহায্য করে অথবা সমাজের বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি করে। এই অনুসন্ধানের উপর ভিত্তি করেই সৃষ্টি হয় সামাজিক প্রকল্প বা সামাজিক নীতি। মানবজাতির বাস্তব জীবন সম্পর্কে অনুশীলন করে এবং তার বিভিন্ন সমস্যাবলী সম্পর্কে আলোকপাত করে বলেই এই বিজ্ঞানের নাম বাস্তব-বিজ্ঞান। রসায়ন, পদার্থবিদ্যার অনুশীলনের ক্ষেত্র যেমন পরীক্ষাগার এবং পরীক্ষাগারের যন্ত্রপাতি, সমাজ-বিজ্ঞানের পরীক্ষাগারও সেই রকম মানবসমাজ এবং বিভিন্ন মানবগোষ্ঠী হলো তার বিভিন্ন যন্ত্রপাতি।

বিশুদ্ধ সমাজ-বিজ্ঞান ও ব্যবহারিক সমাজ-বিজ্ঞান

প্রতিটি বিজ্ঞানেরই যেমন দুটি দিক থাকে—একটি বিশুদ্ধ দিক ও অপরটি ব্যবহারিক দিক, সমাজ-বিজ্ঞানেরও সেই রকম দুটি দিক আছে। বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের অর্থ হলো জ্ঞানের অনুসন্ধান। এই জ্ঞানের বাস্তব ব্যবহারের দিকে খুব বেশী নজর দেওয়া হয় না। বাস্তব-বিজ্ঞান হলো মানুষের দৈনন্দিন বা বাস্তব জীবনের ব্যবহারিক সমস্যা দূরীকরণের জন্যে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অনুসন্ধান। একজন সমাজ-বিজ্ঞানী যখন বস্তী-বাসীদের সামাজিক গঠন সম্পর্কে শিক্ষালাভ করেন, তিনি তখন হলেন বিশুদ্ধ সমাজ-বিজ্ঞানী আর যখন তিনি শিক্ষালাভ করেন—কিভাবে বস্তীবাসীদের মধ্যে অপরাধপ্রবণতা দূর করা যায়, তখন তিনি হলেন প্রযুক্তি সমাজ-বিজ্ঞানী।

সমাজ-বিজ্ঞানের মুখ্য উদ্দেশ্য যেহেতু বৃহত্তর মানবগোষ্ঠীর কল্যাণসাধনের উপায় স্থির করা, প্রযুক্তি সমাজ-বিজ্ঞানের দায়িত্ব সেই জন্যে খুব বেশী। প্রযুক্তি সমাজ-বিজ্ঞানের প্রধান কাজ সমাজের পুনর্গঠন।

ব্যবহারিক সমাজ-বিজ্ঞানের কাজের ক্ষেত্র দেশ থেকে দেশে, সমাজ থেকে সমাজে, সংস্কৃতি থেকে সংস্কৃতিতে তফাৎ হয়। কোনও এক দেশের সামাজিক সমস্যা অন্য দেশ থেকে

উদ্ভব হয় বা কোনও একটি বিশেষ সময়ে দেশের সামাজিক সমস্যা অন্য দেশের সেই সময়ের সামাজিক সমস্যা নাও হতে পারে। কিন্তু এর মধ্যে কতকগুলি সামাজিক সমস্যা আছে, যা সমস্ত দেশেই এক; যেমন—যুদ্ধের পরে দেশে দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি হয়ে যে সামাজিক সমস্যার উদ্ভব হয়, তা সমস্ত দেশের ক্ষেত্রেই এক।

প্রযুক্তি সমাজ-বিজ্ঞানে সামাজিক সমস্যাকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়—(1) সামাজিক বিশৃঙ্খলার সমস্যা, (2) সামাজিক পুনর্গঠনের সমস্যা। প্রথম শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত হয় বিপথ-গামীদের সমস্যা, অপরাধপ্রবণতা, অনাথা, মানসিক বিপর্যয়, অন্ধ, বিকৃত মস্তিষ্ক ও পঙ্গু সমস্যা। এইখানে কাজের জন্যে যে পদক্ষেপ নেওয়া উচিত, তা হলো উপশমকারী, আরোগ্য-কারী ও পুনর্বসতিকারী; অর্থাৎ এমন কিছু করতে হবে, যা গরীবকে করবে সাহায্য, পঙ্গু বা অন্ধদের দেবে শিক্ষা, অপরাধীদের করবে মানসিক পুনর্গঠন। সুতরাং এই পদ্ধতিটিতে রক্ষাকারী অপেক্ষা আরোগ্যকারীর ভূমিকা অনেক বেশী।

দ্বিতীয় শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত হয় শিশু, যুবা, নারী ও শ্রমিকের উন্নতিসাধন, গৃহ-সমস্যার সমাধান, শিক্ষা-সমস্যার সমাধান প্রভৃতি। এই সব ক্ষেত্রে রক্ষাকারী ও গঠনকারীর ভূমিকাকে অবলম্বন করা হয় আর এক্ষেত্রে যে সব মানুষের দিকে নজর দেওয়া হয়, তারা সকলেই স্বাভাবিক কিন্তু দুর্বল।

আগে আমাদের দেশে ব্যবহারিক সমাজ-বিজ্ঞানের দিকে খুব বেশী নজর দেওয়া হয় নি। বর্তমানে গত কয়েক বছরের মধ্যে কিছু কিছু সংস্থা এদিকে বিশেষভাবে নজর দিয়েছেন, যথা দিল্লীতে Council for Social Development ও Delhi School of Social Work, বম্বেতে Tata Institute of Social Science, কলিকাতায় ও আমেদাবাদে Indian Institute of Business Management, কলিকাতায় Statistical Institute, হায়দরাবাদে National Institut of Community Development, পাটনাতে Anugraha Narayan Sinha Institute of Social Science, আগ্রাতে Institute of Social Science, মেদিনীপুরে Institute of Social Science & Applied Anthropology প্রভৃতি। এছাড়াও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতাত্ত্বিক নৃতত্ত্ব বিভাগ ও ভারত সরকারের Anthropological Survey of India-র সমাজতাত্ত্বিক নৃতত্ত্ব বিভাগ প্রযুক্তি সমাজ-বিজ্ঞানের দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টিপাত করেছেন।

কিন্তু আমাদের দেশের সাধারণ নাগরিক এখন পর্যন্ত তার সামাজিক সিদ্ধান্তের জন্যে সমাজতাত্ত্বিক জ্ঞানের উপর নির্ভর করেন না বা আশ্রয়গ্রহণ করেন না। যদি উপরিউক্ত সংস্থাসমূহ প্রযুক্তি সমাজ-বিজ্ঞানের দিকে যথেষ্ট দৃষ্টিপাত করেন ও জাতি হিসেবে আমরা আমাদের সামাজিক সমস্যা সমাধানের জন্যে সামাজিক নীতির আশ্রয় গ্রহণ করি, তবে আমাদের অসংখ্য সমস্যাজর্জরিত সমাজকে ভবিষ্যতে আমরা অনেকাংশে সমস্যামুক্ত করতে সক্ষম হবো।

সমাজসেবামূলক কাজ

অনেকে সমাজসেবামূলক কাজকে ও প্রযুক্তি সমাজ-বিজ্ঞানকে এক শ্রেণীভুক্ত করেন। দুটিরই উদ্দেশ্য যদিও এক, পদ্ধতি কিন্তু ভিন্ন। সমাজ সেবার প্রধান লক্ষ্য হলো সামাজিক কাজের সঙ্গে সহযোগিতা করা, তা বিশ্লেষণ করে কোনও নীতি বা পদ্ধতি নির্ধারণ নয়। বরং সমাজসেবীরা তাঁদের কাজের সুবিধার জন্যে সমাজ-বিজ্ঞানের পদ্ধতি বা বিশ্লেষণের সহায়তা নিতে পারেন,

কিন্তু তাঁরা কোন প্রকল্প বা মতবাদ দিতে পারেন না। সমাজসেবাকে সমাজ-বিজ্ঞানের এক অঙ্গ হিসেবে ধরা যেতে পারে।

জনপ্রিয় সমাজ-বিজ্ঞান

আমাদের দেশে যে সব জনপ্রিয় পত্র-পত্রিকা আছে, তাতে অনেক সময় অনেক লেখকের সমাজতাত্ত্বিক বিষয়বস্তু নিয়ে লেখা দেখতে পাওয়া যায়। এই সব রচনার মধ্যে অধিকাংশ রচনাই হলো অপরাধতত্ত্ব, পারিবারিক জীবন, যৌনসংক্রান্ত সমস্যা, শিক্ষাসংক্রান্ত সমস্যা, সামাজিক শ্রেণীবৈষম্য প্রভৃতি বিষয়ে। অনেক-সময় এই সকল রচনা সমাজ-বিজ্ঞানীদের কাছে খুব মূল্যবান হয়ে ওঠে। সেগুলি থেকে তাঁরা বিভিন্ন সামাজিক সংস্থা সম্পর্কে অনেক সূত্রের সন্ধান পান, যা তাঁদের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে বিশেষভাবে সাহায্য করে।

বিভিন্ন ভূমিকায় সমাজ-বিজ্ঞানী

মানবসমাজে বিজ্ঞানীর দায়িত্ব খুব বেশী, সেই-জন্যে ভূমিকাও তাঁর খুব গুরুত্বপূর্ণ। সমাজ-বিজ্ঞানীর ভূমিকা একদিকে যেমন সমাজতত্ত্বের বিজ্ঞানী হিসাবে বা কলাকুশলী ব্যক্তি (Technician) হিসাবে, তেমন নাগরিক হিসাবে তাঁর ভূমিকা হলো সমাজের সভ্য হিসাবে। প্রতিটি ভূমিকাই একে অন্য থেকে সম্পূর্ণ পৃথক হলেও সমাজ-বিজ্ঞানীকে প্রতিটি ভূমিকাই অবলম্বন করতে হবে।

বৈজ্ঞানিক হিসাবে সমাজ-বিজ্ঞানী

বৈজ্ঞানিক হিসাবে সমাজ-বিজ্ঞানীর প্রাথমিক কর্তব্য হলো সমাজ ও মানবমন থেকে অমূলক, অযৌক্তিক ধারণা ও কুসংস্কারের আবর্জনা বুদ্ধিমত্তা দিয়ে পরিষ্কার করা। এই সকল আবর্জনাস্বরূপ চিন্তাধারা আমাদের সামাজিক উন্নতির ব্যাঘাত-স্বরূপ। সমাজ-বিজ্ঞানীরা এই ভাবে আমাদের সাহায্য করতে পারেন—বংশগতি, জাতিগত পার্থক্য প্রভৃতি সম্পর্কে যে অমূলক ধারণা আমাদের মধ্যে আছে, তার কবর দিতে।

সমাজতাত্ত্বিক ভবিষ্যদ্বাণীর মাধ্যমে

বিজ্ঞানী হিসাবে সমাজ-বিজ্ঞানীর অন্যতম আর এক কর্তব্য হলো, সামাজিক নীতি নির্দেশের মাধ্যমে সমাজতাত্ত্বিক ভবিষ্যদ্বাণী তৈরি করা। উন্নয়নশীল দেশসমূহ, বিশেষতঃ পাশ্চাত্যদেশসমূহের বড় বড় কর্মস্থানসমূহ ও আইনসংস্থাসমূহ সমাজ-বিজ্ঞানীর সামাজিক নীতির আশ্রয় গ্রহণ করে। প্রতিটি বড় বড় নীতিরই সমাজের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সংগঠন সম্পর্কে কতকগুলি সিদ্ধান্ত থাকে। উদাহরণস্বরূপ, যখন এক আইন প্রণয়নকারী ব্যবস্থাপক বলেন যে, 'বিদ্যালয়গুলিকে তাদের বর্তমান উপার্জনের অর্থ থেকে কাজ করতে হবে', আইন প্রণয়নকারী তখন এই ধারণা করে নেন যে, বর্তমান বিদ্যালয়গুলির তহবিল যথেষ্ট—শিশুদের সমাজের জন্যে তৈরি করবার পক্ষেও এই তহ-বিলের উপর নির্ভর করেই তাকে আরও পঁচিশ বা তিরিশ বছর জীবন কাটাতে হবে। কিন্তু সেই একই আইন প্রণয়নকারী যখন বলেন যে, 'আমরা আমাদের বিদ্যালয়ের তহবিল যথেষ্ট বাড়াবো' তখন তিনি আগের মন্তব্য থেকে ঠিক বিপরীত মন্তব্যই পেশ করলেন। এই ভাবে প্রতিটি নীতি-নির্দেশযুক্ত রায়ের মধ্যেই এক অনুমিত সিদ্ধান্ত তৈরি করা থাকে, যা ভবিষ্যতের সমাজ সম্পর্কে আলোকপাত করে। শুধু তাই নয়, এই ভবিষ্যদ্বাণী আমাদের সামাজিক যোজনার ধারা সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করে, যার মধ্যে আমাদের পরবর্তী দুই বা তিন বংশকে বসবাস করতে হবে।

সমাজতাত্ত্বিক ভবিষ্যদ্বাণী কোনও বিশেষ নীতির সম্ভাব্য ফলাফল সম্পর্কেও আমাদের আলোকপাত করে। প্রতিটি সামাজিক নীতির

সিদ্ধান্তই হলো এক-একটি ভবিষ্যদ্বাণী। আমাদের সমাজ এখনও সমাজ-বিজ্ঞানীকে সামাজিক নীতি নির্ধারক বিষয়ের কারিগরী বিশেষজ্ঞের পদমর্যাদা দেয় নি, যা দেওয়া হয়েছে পাশ্চাত্য দেশসমূহে। সেখানে কোনও কোনও অঞ্চলে, বিশেষতঃ অপরাধতত্ত্ব ও জাতিগতসম্পর্ক বিষয়ে সমাজ-বিজ্ঞানীর উপসংহারের উপর অনেক কিছু নির্ভর করে। সমাজ-বিজ্ঞানী ও মনোবিজ্ঞানীদের রায়ের উপর নির্ভর করে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ বিচারালয়কে (Supreme Court) নিয়ম করতে হয়েছিল যে, স্বতন্ত্রীকৃত বিদ্যালয়গুলি সহজাতভাবে অসমান (Segregated schools are inherently unequal)। তাছাড়া আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের Desegregation movement-এর বর্তমান রণকৌশল সমাজ-বিজ্ঞানীর ভবিষ্যদ্বাণীর উপর প্রত্যক্ষভাবে নির্ভরশীল এবং সেই আন্দোলন অনেকাংশে সফল হয়েছে।

ব্যক্তি ও নাগরিক হিসাবে সমাজ-বিজ্ঞানী

বিজ্ঞানী হিসাবে সমাজ-বিজ্ঞানীর কর্তব্য সামাজিক নীতি তৈরি করা। ব্যক্তি ও নাগরিক হিসাবে সমাজ-বিজ্ঞানীর কর্তব্য হলো সমাজে তার মূল্য ও স্বীকৃতি দেওয়া এবং সেই নীতি পালন করা ও অপরকে দিয়ে পালন করানো। ব্যক্তি হিসাবে তার প্রাথমিক কর্তব্য হলো এই সব সামাজিক নীতির কর্মক্ষমতা (Workability) ও কাম্যতাকে (Desirability) বাড়িয়ে তোলা ও উদ্দীপিত করা।

নাগরিক হিসাবে সমাজ-বিজ্ঞানীর কর্তব্য হলো সমাজে যে সব কু-জিনিষ ঘটছে, তার কারণ খোঁজবার কাজে পৃষ্ঠপোষকতা করা, সামাজিক সংস্কার ও উন্নতির কাজে সহায়তা করা ও কোনও ভাল কাজের সামাজিক মূল্যকে উপলব্ধি করা।

সমাজ-বিজ্ঞানী যখন বিজ্ঞানীর ভূমিকা অবলম্বন করেন, তখন তিনি বলতে পারবেন না যে, সিনেমা বা থিয়েটারে হিংসাত্মক ছবি শিশুদের পক্ষে ক্ষতিকারক কি না, কিন্তু পিতা হিসাবে তিনি তাঁর নিজস্ব মতামত বলতে পারবেন যে, এই সব ছবি শিশুমনে কি রকম প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করবে। বিজ্ঞানী হিসেবে সমাজ-বিজ্ঞানী হয়তো এমন এক সামাজিক নীতির বিশ্লেষণ করতে পারেন, যা হয়তো বিবাহ-বিচ্ছেদের হারকে কমাতে পারবে বা ঐ সম্পর্কিত অনেক সমস্যা দূরীকরণে সাহায্য করবে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক হিসাবে তিনি কখনই সুপারিশ করতে পারবেন না যে, কোনও এক বিশেষ পাত্র বা পাত্রীকে কি রকম সমাজের পাত্র বা পাত্রী পছন্দ করলে বিবাহ-বিচ্ছেদ সমস্যার উদ্ভব হবে না, যা নাগরিক হিসাবে তার পক্ষে বলা খুব সহজ। বিজ্ঞানী হিসাবে সমাজ-বিজ্ঞানী হয়তো দেখাতে পারেন যে, অতিরিক্ত ওষুধ সেবন ও মদ্যপান সমাজের পক্ষে মঙ্গলজনক নয়। কিন্তু সমাজের নাগরিক ও সভ্য হিসাবে সমাজ-বিজ্ঞানীর কর্তব্য হলো, এই নীতির অর্থ মানব-সমাজে বুঝিয়ে দেওয়া।

এই জন্যে তিনি অর্ধ-জনপ্রিয় প্রবন্ধ বা তথ্য-মূলক চলচ্চিত্র, রেডিও, টেলিভিশন প্রভৃতির আশ্রয় নিতে পারেন। কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রেই সমাজ-বিজ্ঞানীকে এমন ভূমিকা অবলম্বন করতে হবে, যাতে তিনি সামাজিক নীতির মূল্যের ব্যাঘাত না ঘটিয়ে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত সমাজ-বিজ্ঞানী ও উৎসুক নাগরিক হতে পারেন। সমাজ-বিজ্ঞানীর এই উভয় ভূমিকা অবলম্বনের ফলে হয়তো সমাজে এমন দিন আসবে, যখন সমাজের জন্যে সমাজ-বিজ্ঞানী যে সামাজিক নীতিকে সর্বাপেক্ষা ভাল মনে করবেন, সেই সামাজিক নীতিই সমাজের পক্ষে সর্বাধিক শুভ ও মঙ্গলময় বলে বিবেচিত হবে।

কলাকুশলী ব্যক্তি হিসাবে সমাজ-বিজ্ঞানী

সমাজ-বিজ্ঞানীরা যখন কোন দেশের সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে নিযুক্ত থাকেন, তখন

তাঁদের প্রধান ভূমিকা হলো প্রযুক্তি সমাজ-বিজ্ঞানী হিসাবে। এই প্রযুক্তি সমাজ-বিজ্ঞানীর তখন সবচেয়ে বড় কাজ হলো, সামাজিক নীতির মূল্যকে কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগ করা। উদাহরণস্বরূপ, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের যেমন কর্তব্য জ্ঞানানুসন্ধানের মাধ্যমে সত্যানুসন্ধান ও সত্যকে শিক্ষা দেওয়া আর বিশ্ববিদ্যালয়ের কারিগরের কর্তব্য হলো অধ্যাপক বা গবেষকের আগ্রহ ও আদর্শকে মেনে চলা ও সেবা করা। তাঁর বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক বিজ্ঞানের যে তথ্য বা আলো তাঁকে দিয়েছেন, তিনি নিশ্চয়ই তার মূল্যের অপব্যয় করবেন না বরং তার সদ্ব্যবহার করে তার যথার্থ স্বীকৃতি দেবেন। ঠিক সেই রকম সমাজ-বিজ্ঞানী যখন প্রযুক্তি সমাজ-বিজ্ঞানীর ভূমিকা অবলম্বন করবেন, তখন তিনি কলাকুশলী ব্যক্তি, সমাজ-বিজ্ঞানীকৃত সামাজিক নীতি বা প্রকল্পকে হাতে-কলমে কাজে পরিণত করে বিভিন্ন সামাজিক সমস্যার সমাধান করবেন।

আমাদের দেশে এতদিন পর্যন্ত সমাজ-বিজ্ঞানের উপর খুব বেশী গুরুত্ব আরোপ করা হয় নি, যা করা হয়েছে পাশ্চাত্ত্য দেশসমূহে। তবে গত কয়েক বছরের মধ্যে আমাদের দেশে সমাজ-বিজ্ঞানের উন্নতির দিকে নজর দেওয়া হয়েছে ও ভবিষ্যতে হয়তো আরও দেওয়া হবে। সমাজ কোনও দিনই সম্পূর্ণ সমস্যামুক্ত হতে পারে না, সমাজ থাকলেই সমস্যাও থাকবে। তবে আমাদের লক্ষ্য হলো—কম সমস্যাজর্জরিত সমাজ, বা অধিক সংখ্যক সমাজভুক্ত মানুষকে দেবে সুখ, সম্পদ ও শান্তি। আমাদের দেশে সমাজ-বিজ্ঞানের উন্নতির দিকে যে নজর দেওয়া হয়েছে, তা যদি আরও বৃদ্ধি পায়, তা হলে অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশসমূহের মত আমরাও একদিন সমানতালে পা ফেলে উন্নতির পথে এগিয়ে যাব।

"......বিজ্ঞান যাহাতে দেশের সর্বসাধারণের নিকট সুগম হয় সে উপায় অবলম্বন করিতে হইলে একেবারে মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচর্চার গোড়াপত্তন করিয়া দিতে হয়।...... যাহারা বিজ্ঞানের মর্যাদা বোঝে না তাহারা বিজ্ঞানের জন্য টাকা দিবে, এমন অলৌকিক সম্ভাবনার পথ চাহিয়া বসিয়া থাকা নিষ্ফল। আপাতত মাতৃভাষার সাহায্যে সমস্ত বাংলা দেশকে বিজ্ঞানচর্চায় দীক্ষিত করা আবশ্যক। তাহা হইলেই বিজ্ঞান সভা সার্থক হইবে।"

রবীন্দ্রনাথ

ভারতীয় নৃ-বিজ্ঞানের পথিকৃৎ—রায়বাহাদুর শরৎচন্দ্র রায়

রেবতীমোহন সরকার*

ভারতীয় নৃ-বিজ্ঞানের ইতিহাসে শরৎচন্দ্র রায় একটি উল্লেখযোগ্য নাম। নৃ-বিজ্ঞানের সাধনায় ইনি জীবনের শেষদিন পর্যন্ত নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। ভারতীয় নৃ-বিজ্ঞান তাঁর ঐকান্তিক গবেষণা, মনন ও বিশ্লেষণের ফলে নবরূপ লাভে সক্ষম হয়েছিল। দেশ-বিদেশের নৃ-বিজ্ঞানীমহলে শরৎচন্দ্র রায় ছিলেন একজন জ্ঞানতপস্বী। এই বছরই তাঁর জন্ম-শতবার্ষিকী। এই প্রসঙ্গে দেশবন্দিত এই নৃ-বিজ্ঞানীর কর্মজীবন সম্বন্ধে দু-চার কথার অবতারণা করে আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাতে প্রয়াসী হয়েছি।

শরৎচন্দ্র রায়ের জন্ম 1871 খৃষ্টাব্দের 4ঠা নভেম্বর। তাঁর শিক্ষা-দীক্ষা কলকাতায়। সিটি কলেজিয়েট স্কুল থেকে 1888 খৃষ্টাব্দে প্রবেশিকা এবং 1892 খৃষ্টাব্দে তদানীন্তন জেনারেল অ্যাসেম্বলি ইনস্টিটিউট (বর্তমানে স্কটিশ চার্চ কলেজ) থেকে ইংরেজীতে অনার্স নিয়ে বি. এ. পাশ করেন। তারপর ইংরেজীতে এম. এ. ও পরে বি. এল. পাশ করবার পর তিনি আইন ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন। 1897 খৃষ্টাব্দে শরৎচন্দ্র রায় আলিপুরে চব্বিশ পরগণা ডিষ্ট্রিক্ট কোর্টে ওকালতি সুরু করেন, কিন্তু এক বছর পরেই রাঁচির উদ্দেশ্যে পাড়ি দেন এবং ওখানে Judicial Commissioner's Court-এ যোগদান করে অল্প দিনের মধ্যেই নিজেকে আইন ব্যবসায়ে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। শহর হিসেবে তখনকার রাঁচি খুব ছোট ছিল। শহরের চারদিকে ওরাওঁ, মুণ্ডা, বিরহোর প্রভৃতি আদিবাসী সম্প্রদায় ছড়িয়ে ছিল। এই শহরে শরৎচন্দ্র রায় অচিরেই একজন প্রথিতযশা উকিল হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। কিন্তু তিনি যে সব সময়ে কেবল আইনের ব্যাপারেই নিজেকে ব্যস্ত রাখতেন অথবা তাঁর দৃষ্টি আদালত প্রাঙ্গণের চার দেয়ালের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, তা নয়। তাঁর দৃষ্টি ছিল উদার, মানুষের প্রতি, বিশেষ করে নিপীড়িত জনগণের উপর তাঁর ছিল সহৃদয় সমবেদনা। মানুষের প্রতি তাঁর এই অকৃত্রিম ভালবাসা, মায়া-মমতাই তাঁকে নৃ-বিজ্ঞানের প্রতি আকৃষ্ট করেছিল। লব্ধপ্রতিষ্ঠ আইনব্যবসায়ী আস্তে আস্তে হয়ে পড়লেন প্রকৃত নৃ-বিজ্ঞানী। ভারতীয় বিজ্ঞান সাধনার ইতিহাসে এটি নিঃসন্দেহে একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়।

প্রথম থেকেই রাঁচি শহরের সন্নিকটে বসবাসকারী উপজাতি গোষ্ঠীর উপর বহিরাগতদের অত্যাচার ও অনাচারের প্রতি শরৎচন্দ্রের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছিল। তিনি দেখলেন এই সব অবহেলিত মানবগোষ্ঠী ঠিকমত বিচার পায় না এবং তার মুখ্য কারণ শাসন ও বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের উক্ত জনগোষ্ঠীর সামাজিক জীবনযাত্রা ও রীতি-নীতি সম্পর্কে অজ্ঞতা। বিদেশী শাসকগোষ্ঠী স্বাভাবিকভাবেই ভারতীয় উপজাতি সমাজ সম্পর্কে যথাযোগ্য আলোকপ্রাপ্ত হয় নি। ফলে আইনের প্রয়োগ ও বিচার সংক্রান্ত বিষয়ে বহুবিধ সমস্যার উদ্ভব হয়েছিল। অপর দিকে দেশীয় শিক্ষিত সমাজেরও এই সব উপজাতি গোষ্ঠীর প্রকৃত জীবনদর্শনের রহস্য উদ্ঘাটনের প্রতি যথেষ্ট আগ্রহ ছিল না। একমাত্র শরৎচন্দ্র রায়ই আবির্ভূত

---

* নৃতত্ত্ব বিভাগ, বঙ্গবাসী কলেজ, কলিকাতা।

হলেন প্রত্যক্ষ ব্যতিক্রম হিসেবে। ছোটনাগপুর মালভূমির বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে মুণ্ডা উপজাতির সমাজ, ধর্ম, রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার এবং ভাষা প্রভৃতি বিষয়ে প্রত্যক্ষভাবে অনুসন্ধানের জন্যে তিনি আত্মনিয়োগ করেন। মাসের পর মাস, বছরের পর বছর গড়িয়ে চললো, শরৎচন্দ্র একাগ্রচিত্তে সংগ্রহ করে চলেছেন তাঁর বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের উপকরণ। অবশেষে 1912 খৃষ্টাব্দে তাঁর অক্লান্ত কর্মপ্রচেষ্টা রূপলাভ করলো 'The Mundas and their country' নামক পুস্তকে। এটিকে কেবলমাত্র পুস্তক বললে এর যথাযোগ্য মর্যাদা দেওয়া হয় না। এটি হলো তদানীন্তন নৃ-বিজ্ঞান পঠন ও গবেষণার ক্ষেত্রে একটি মূর্তিমান বিপ্লব। শরৎচন্দ্রের পূর্বে খৃষ্টান ধর্মপ্রচারকেরা ছোটনাগপুরের উপজাতিদের জীবনের কোন কোন অংশে আলোকপাত করেছিলেন বটে, কিন্তু শরৎচন্দ্রই প্রথম বিশুদ্ধ নৃ-বিজ্ঞানের ভিত্তিতে বৃহদাকারে উপজাতি জীবন ইতিহাস পর্যালোচনা করেছিলেন। তাই শরৎচন্দ্র রায় ভারতীয় নৃ-বিজ্ঞানের পথ-প্রদর্শক। 1912 খৃষ্টাব্দ থেকে 1937 খৃষ্টাব্দের মধ্যে তাঁর লিখিত ছয়খানি পুস্তক প্রকাশিত হয়। ছোটনাগপুরের মুণ্ডা, বিরহোর, ওরাওঁ, খাড়িয়া এবং উড়িষ্যার পার্বত্য অঞ্চলের ভুঁইয়াদের জীবনযাত্রা প্রণালীর প্রত্যক্ষ বিবরণ এগুলিতে লিপিবদ্ধ হয়।

শরৎচন্দ্র প্রথম থেকেই চেষ্টা করেন, যাতে এই সব উপজাতি সম্প্রদায় শাসকগোষ্ঠীর যথাযোগ্য দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হয়—বিচারের বিধান যেন এদের বিচিত্র জীবনাদর্শের মূলে কুঠারাঘাত না করে।

শরৎচন্দ্র ছিলেন প্রকৃত অনুসন্ধানী। লোকগাথা, গীতিকা, ধর্ম, যাদুবিদ্যা, কুসংস্কার প্রভৃতির বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ কি ভাবে অনুসন্ধানীকে জ্ঞানরাজ্যের মুক্তাঙ্গনে পৌঁছে দেয়—শরৎচন্দ্র তা দেখিয়েছেন। ছোটনাগপুরের মুণ্ডা উপজাতির সৃষ্টিতত্ত্বের বিশ্লেষণ কেমনভাবে তাঁকে সুদূর প্রাগৈতিহাসিক যুগের এক স্তম্ভিত জনজীবনের ধারার উৎসমুখ খুলে দিয়েছিল, সে কথা তিনি তাঁর জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধে প্রকাশ করেছেন। তাঁর দৃষ্টি ছিল সুদূরপ্রসারী। ভারতে নৃতত্ত্বের উজ্জ্বল সম্ভাবনার কথা তিনি বহু পূর্বেই বিদ্বৎসমাজে উপস্থাপিত করেছিলেন। 1920 খৃষ্টাব্দে তিনি পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে শারীরিক নৃ-বিজ্ঞানে বক্তৃতা (Readership lectures) দেবার জন্যে আমন্ত্রিত হন। সেই বক্তৃতামালার শিরোনাম ছিল 'Principles and Methods of Physical Anthropology'। নৃ-বিজ্ঞানের এই বিশেষ শাখাটিরও প্রতি শরৎচন্দ্রের জ্ঞানের পরিধি তদানীন্তন নৃ-বিজ্ঞানীদের চমকিত করেছিল। প্রখ্যাত শারীরিক নৃ-বিজ্ঞানী Sir Arthur Keith বলেছেন—"The lectures form one of the best introductions into the study of anthropology in the English language"। যাহোক শরৎচন্দ্র যেখানেই বক্তৃতাদান করেছেন, সেখানেই নৃ বিজ্ঞানের উজ্জ্বল সম্ভাবনার কথা বলেছেন। সেই সঙ্গে বিজ্ঞানের এই শাখাটির প্রতি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিবর্গের নির্লিপ্ততার কথা উল্লেখ করে দুঃখ প্রকাশ করেছেন। বিভিন্ন উপজাতি গোষ্ঠীর জীবনযাত্রা প্রণালীর বিবরণ ছাড়াও শরৎচন্দ্র লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন বিষয়ে মৌলিক অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। 1921 খৃষ্টাব্দে তিনি 'Man in India' নামে একটি ত্রৈমাসিক ইংরেজী পত্রিকার প্রকাশ সুরু করেন। তাঁর নিজস্ব সম্পাদনায় এটিতে নৃতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব এবং লোকসংস্কৃতির বহুবিধ রচনা প্রকাশিত হতে থাকে। গর্বের বিষয় এই যে, সেই 'Man in India' পত্রিকাটি আজ ভারত এবং ভারতের বাইরে একটি আদর্শ পত্রিকা হিসেবে পরিগণিত হয়ে চলেছে। ভারতীয় লোকসংস্কৃতির প্রতি গভীর অনুরাগ

এবং মূল্যবান অনুসন্ধানের জন্যে লণ্ডনের লোকসংস্কৃতি পরিষদ (Folklore Society of London) শরৎচন্দ্রকে 1920 খৃষ্টাব্দে একজন সম্মানিত সভ্য হিসেবে মনোনীত করে। তখনকার দিনে তিনিই প্রথম ভারতীয়, যিনি এই দুর্লভ সম্মানলাভে সক্ষম হয়েছিলেন। ঐ বছরেই তিনি ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের নৃতত্ত্ব ও প্রত্নতত্ত্ব শাখার বিভাগীয় সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। পরে 1932 ও 1933 খৃষ্টাব্দে তিনি All India Oriental Conference-এর নৃতত্ত্ব ও লোক-সংস্কৃতি বিভাগের সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেছিলেন। সভাপতির ভাষণে তিনি নৃতত্ত্ব ও লোকসংস্কৃতির গবেষকদের মৌলিক গবেষণার প্রতি দৃষ্টিদানে এবং ভারতের সমাজ-জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে, প্রতিটি চিন্তাধারায় নৃতত্ত্ব ও লোকসংস্কৃতির যে রত্নরাজি লুকিয়ে আছে, তার উদ্ধারকার্যে অনুসন্ধানীদের ব্রতী হবার জন্যে আহ্বান করেছিলেন। আজকের নৃতত্ত্ব ও লোকসংস্কৃতির পঠন-পাঠন এবং গবেষণা যথেষ্ট প্রসার লাভ করেছে বললে অত্যুক্তি হয় না এবং দিনে দিনে এর পরিধি বেড়েই চলেছে। শরৎ-চন্দ্রের জীবনকালে কেবলমাত্র একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) নৃতত্ত্বের পঠন-পাঠন সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু আজ ভারতের 16/17টি বিশ্ব-বিদ্যালয়ে নৃতত্ত্বের পঠন-পাঠন প্রসারলাভ করেছে এবং ভারতীয় ভিত্তিভূমির প্রতি নৃ-বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। সুতরাং শরৎচন্দ্রের সেই উদাত্ত আহ্বান উপেক্ষিত হয় নি এবং ভারতীয় ভিত্তি-ভূমির উপর নৃতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের প্রতিষ্ঠার বিষয়টি সাদরেই গৃহীত হয়েছে। শরৎচন্দ্রের দূরদৃষ্টি, জনজীবনের বিভিন্ন আচার-ব্যবহারের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ এবং প্রচুর কর্মক্ষমতা পৃথিবীর বিজ্ঞানী-মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। এরই পরিপ্রেক্ষিতে প্রখ্যাত নৃ-বিজ্ঞানী এবং ভারততত্ত্ববিদ্ জে. এইচ. হাটন শরৎচন্দ্রকে "ভারতীয় মানবজাতি তত্ত্বের জনক" (Father of Indian Ethnology) বলে অভিহিত করেছিলেন। তাছাড়াও শরৎচন্দ্র 'International Congress of the Anthropological and Ethnological Sciences'-এর কার্যকরী সমিতির সভ্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। তাঁর সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক রচনাবলীর জন্যে তদানীন্তন ভারত সরকার তাঁকে 1913 খৃষ্টাব্দে 'কাইজার-ই-হিন্দ' রৌপ্যপদক এবং 1919 খৃষ্টাব্দে 'রায়বাহাদুর' উপাধিতে ভূষিত করেন।

মৃত্যুর আট বছর আগে শরৎচন্দ্র আইন-ব্যবসায় থেকে অবসর গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তাই বলে তিনি তাঁর নৃতাত্ত্বিক গবেষণার ক্ষেত্র থেকে বিদায় নেন নি বরং অবসর জীবনেই তিনি পুরাপুরিভাবে গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তাঁর রাঁচিস্থিত চার্চ রোডের বাড়ীতে 'Man in India' গ্রন্থাগারটি দেশ বিদেশের বিভিন্ন পুস্তক এবং পত্র-পত্রিকায় সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে এবং 'Man in India' পত্রিকাটিও ভারতের জনমানসের জীবন-যাত্রার বিভিন্ন দিকের প্রতি আলোক সম্পাত করে। শরৎচন্দ্র ভারতের মানুষকে প্রত্যক্ষ করে-ছিলেন—ভারতীয় আবহাওয়া, রীতি-নীতি, কর্ম-পদ্ধতিতে গড়ে ওঠা মানুষের অন্তরে তিনি প্রবেশ-লাভে সক্ষম হয়েছিলেন। নিপীড়িত মানুষের হতাশা আর দীর্ঘশ্বাস শরৎচন্দ্রকে বিচলিত করেছিল। অসহায় নিরক্ষর মানুষের প্রতি তদানীন্তন জমিদার এবং মহাজনদের উৎপীড়নের বিরুদ্ধে তিনি সোচ্চার প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন, তাঁর কর্মপদ্ধতির মধ্যে। তাঁর আইন-ব্যবসায়ে প্রধানতম লক্ষ্যই ছিল, দরিদ্র এবং হতভাগ্য মানুষদের যথাসম্ভব সাহায্য করা, তাদের প্রাপ্য অধিকার লাভে তাদের সচেতন করা। তাই শরৎচন্দ্র যে কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিক ছিলেন তাই নয়, তিনি ছিলেন প্রকৃত মানবদরদী। মানুষের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নায় তাঁর অন্তর আলোড়িত হতো গভীরভাবে এবং সেই আলোড়নই তাঁকে

নৃ-বিজ্ঞানীতে পরিণত করেছিল। মানুষের প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসাই তাঁকে করেছিল মানব-বিজ্ঞানী। শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে লণ্ডনের 'Nature' পত্রিকা (28th October, 1939) সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করেছিল—"The dry light of pure science and disintegrated research was kept ablaze (in India) by a small band of devoted ethnologists among whom the veteran anthropologist, Sarat Chandra Roy will ever be held in honour."
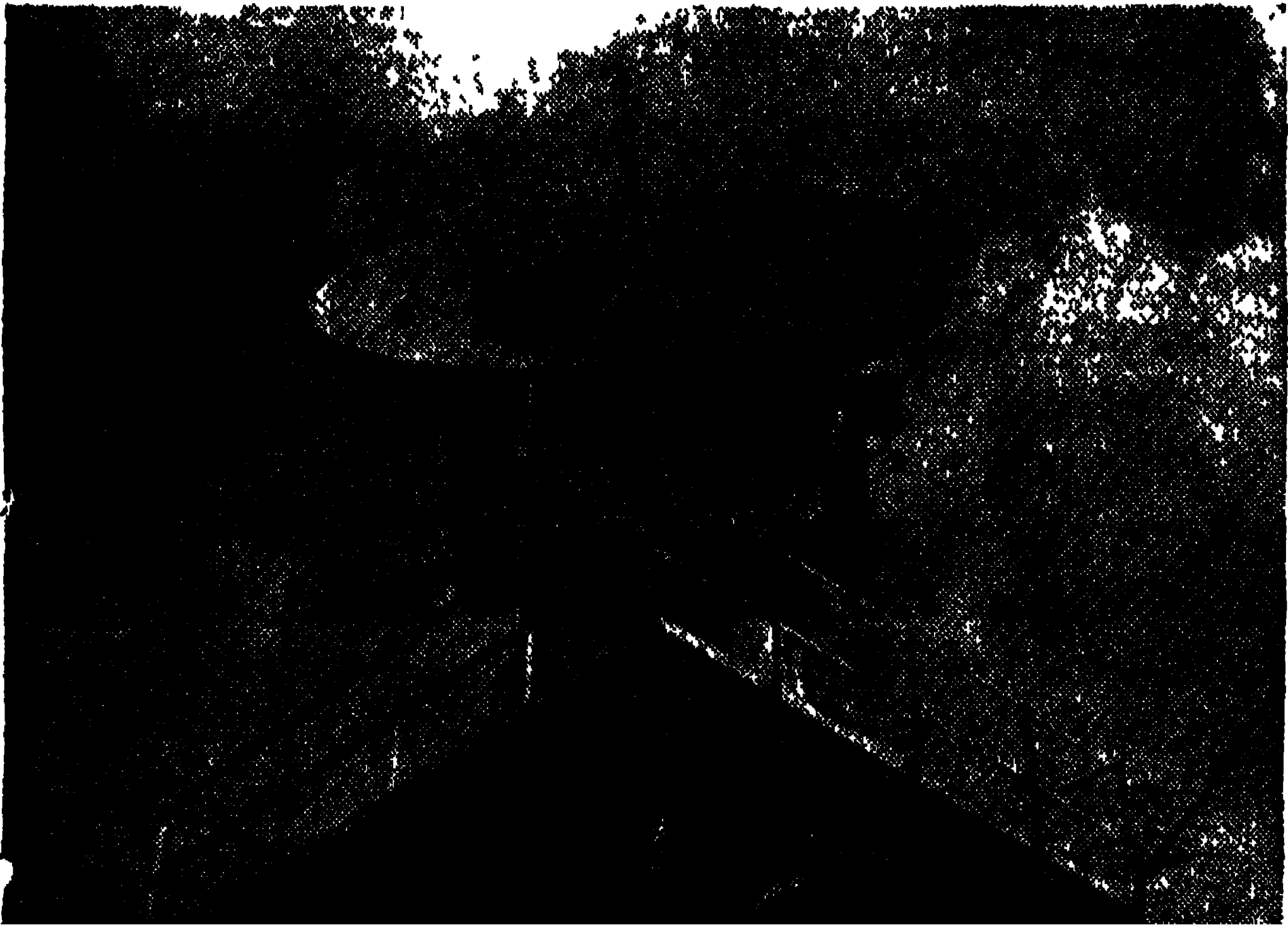
প্লেসি টাইপ আবহ-রেডার

বিশেষ যান্ত্রিক কৌশলে স্থাপিত এই প্লেসি টাইপ আবহ-রেডারে বৃষ্টিবিন্দুর শব্দ প্রতিধ্বনিত হয়ে সংখ্যার আকারে চৌম্বক ফিতার উপর অঙ্কিত হয়ে যায়। ইংল্যাণ্ডে এই রেডারের সাহায্যে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ নির্ধারণ করে জলাধারসমূহ নিয়ন্ত্রণ করবার পরিকল্পনা করা হয়েছে।

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

নভেম্বর — 1971

চতুর্বিংশ বর্ষ — একাদশ সংখ্যা

লর্ড আর্নেস্ট রাদারফোর্ড

জন্ম: 30শে অগাষ্ট, 1871 মৃত্যু: 19শে অক্টোবর, 1937
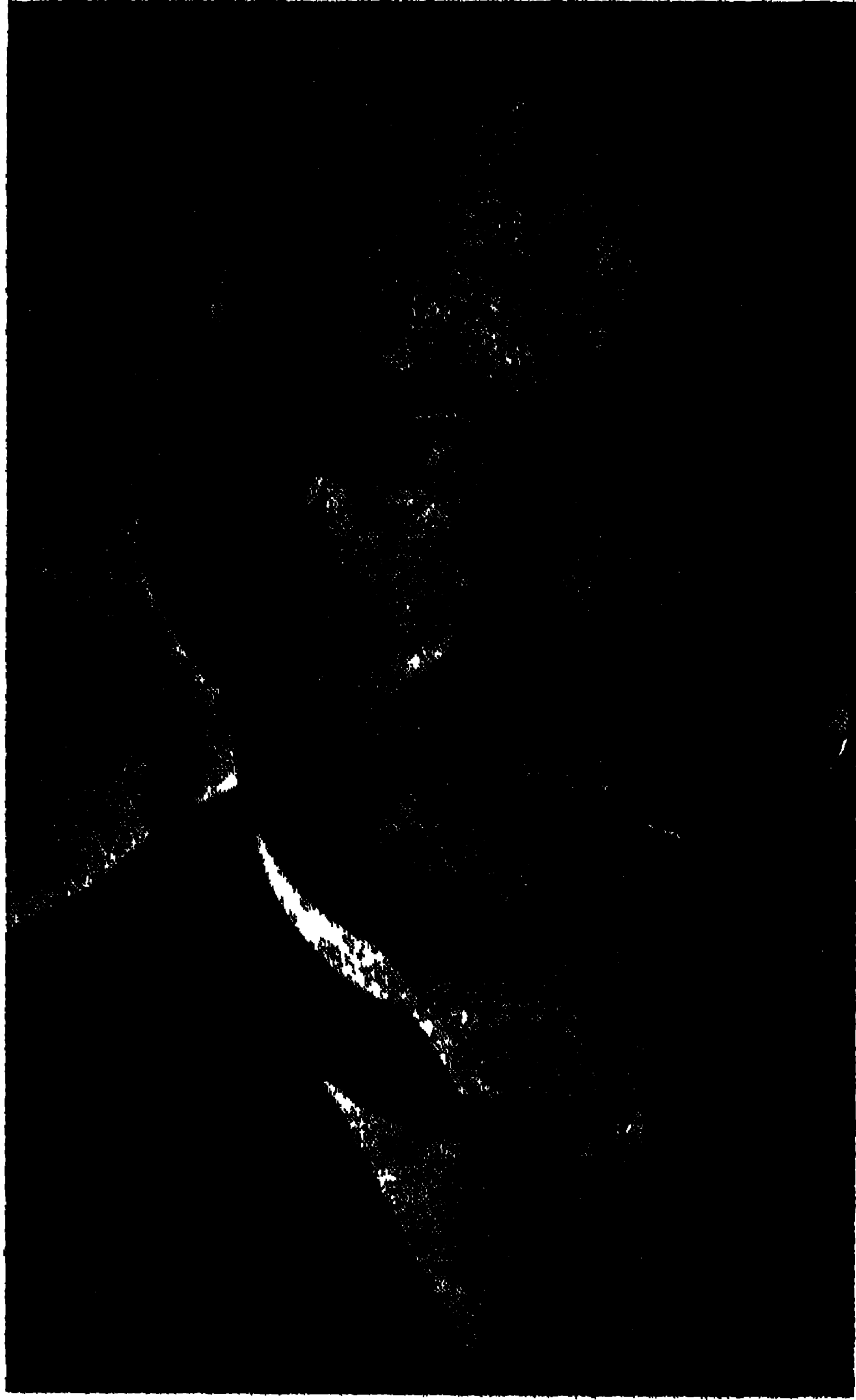
লর্ড আর্নেষ্ট রাদারফোর্ড

1937 সালে ইংল্যাণ্ডে অদ্ভুত শিরোনামের একটি বই প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানী মহলে সাড়া পড়ে যায়। বইটির নাম The Newer Alchemy এবং তার রচয়িতার নাম আর্নেষ্ট রাদারফোর্ড (Ernest Rutherford)। বইটির শিরোনামে স্বভাবতই মনে হতে পারে, বইটি বুঝি মধ্য যুগের কোন অ্যালকেমিষ্টের কাজের আধুনিক প্রতিবেদন। কিন্তু আসলে তা নয়, কারণ বইটি যিনি লিখেছেন তিনি হচ্ছেন আধুনিক বিজ্ঞানের অন্যতম পথিকৃৎ লর্ড আর্নেষ্ট রাদারফোর্ড এবং বইটির প্রতিপাদ্য বিষয় তাঁর নিজেরই কাজ সম্পর্কে। তবে বইটির এই অদ্ভুত শিরোনাম কেন? মধ্যযুগের অ্যালকেমিষ্টদের কাজের সঙ্গে রাদারফোর্ডের নিজস্ব গবেষণার কি কোন সম্পর্ক আছে? অ্যালকেমিষ্টরা তো লোহা, সীসা ও অন্যান্য নিকৃষ্ট ধাতুকে মহামূল্য সোনায় রূপান্তরের স্বপ্ন দেখেছিল ও তার উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা করেছিল এবং তাদের সে চেষ্টা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল। রাদারফোর্ড সে পথে চালিত হন নি, কিন্তু তিনি তাঁর সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ ও নিজস্ব গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার ফলে যে স্বর্ণ-পথের সন্ধান পান, তা হলো স্বয়ং প্রকৃতিই হচ্ছেন সবচেয়ে বড় অ্যালকেমিষ্ট। প্রকৃতির ভাণ্ডারের ইউরেনিয়াম ও থোরিয়াম ধাতু স্বতঃভাঙনের ফলে রূপান্তরিত হয় রেডিয়াম, পলোনিয়াম ইত্যাদি নূতনতর ও লঘুতর মৌলে। এই নতুন তেজস্ক্রিয় মৌলগুলি আবার ধীরে ধীরে আপনা-আপনি ভেঙে গিয়ে ক্রমশঃ আরও লঘুতর মৌলে পরিণত হয় এবং শেষ অবধি সোনার নয়—স্থায়ী সীসায় রূপান্তরিত হয়ে এই স্বতঃভাঙন পালার পরিসমাপ্তি ঘটে।

রাদারফোর্ড যে পথের সন্ধান দিলেন, সে পথ ধরে আধুনিক বিজ্ঞান এক মৌলকে অন্য মৌলে রূপান্তরের চাবিকাঠি খুঁজে পেয়েছে। তাই রাদারফোর্ডের এই বইয়ের নামকরণ সার্থক। এখন রাদারফোর্ড ও তাঁর কাজ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করছি।

আজ থেকে এক-শ' বছর আগে 1871 সালের 30শে অগাষ্ট নিউজিল্যাণ্ডের দক্ষিণ দ্বীপের নেলসন শহরে আর্নেষ্ট রাদারফোর্ডের জন্ম। তিনি ছিলেন এক স্কটিশ কৃষিজীবী পরিবারের দ্বাদশ সন্তান-সন্ততির মধ্যে চতুর্থ। তাঁদের পরিবার নিউজিল্যাণ্ডে সর্বপ্রথম আসেন 1842 সালে। আর্নেস্টের মা-বাবা নিজেরা শিক্ষার বিশেষ সুযোগ না পেলেও বহু আত্মত্যাগ করে তাঁদের এই বুদ্ধিদীপ্ত সন্তানটিকে শিক্ষালাভের সবরকম সুযোগ করে দেন। এই সন্তানটিকে ঘিরে তাঁদের মনে যে উচ্চাশা জেগেছিল, আর্নেস্ট তা পুরোপুরি পূর্ণ করেন। ছাত্রজীবনে প্রথমাবধি তিনি কৃতিত্বের পরিচয় দেন এবং ল্যাটিন, ফরাসী ও ইংরেজি সাহিত্য, ইতিহাস এবং পদার্থবিদ্যা, রসায়ন ও গণিতশাস্ত্রে পারদর্শিতার জন্যে নানা পুরস্কার ও বৃত্তিলাভ করেন। 1889 সালে নেলসন কলেজ

থেকে স্নাতক ডিগ্রী লাভ করে তিনি নিউজিল্যাণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার দ্বিতীয় বর্ষ থেকে পদার্থ-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁর প্রতিভার প্রথম পরিচয় পাওয়া যায়।

নিউজিল্যাণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে শেষ দু-বছরে রাদারফোর্ড হার্ৎজের তড়িৎ-চৌম্বক বা বেতার-তরঙ্গ সংক্রান্ত গবেষণার দিকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। উচ্চ কম্পনাঙ্কের বিদ্যুৎক্ষরণের সাহায্যে লোহার চুম্বকীকরণ সম্পর্কে তিনি প্রথমে কিছু মৌলিক গবেষণা করেন। এই গবেষণার ফলে তিনি বেতার-তরঙ্গ সনাক্তীকরণের একরকম চৌম্বক ডিটেক্টর (Detector) উদ্ভাবন করেন। এই সময় সুদূর ইংল্যাণ্ডে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষানীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের ফলে রাদারফোর্ডের জীবনের মোড় ঘুরে যায়।

1851 সালের প্রদর্শনীর উদ্বৃত্ত অর্থে গঠিত তহবিল থেকে এতদিন বৃটিশ কমনওয়েলথভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের বিশেষ কৃতী ছাত্রদের শিক্ষাবৃত্তি দেওয়া হতো। 1895 সালে তহবিল কমিটি এই নিয়ম পরিবর্তন করে বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রদের কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে দু-বছরকাল পঠন-পাঠনের সুযোগ করে দেন। একই সঙ্গে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিভাবান স্নাতক ছাত্রদের অনুমোদিত গবেষণা সম্পূর্ণ করে ডিগ্রী লাভের পথ সর্বপ্রথম উন্মুক্ত করে দিলেন। যেসব প্রতিভাবান ছাত্র এই সুযোগে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাভেণ্ডিশ বীক্ষণাগারে গবেষণার প্রবেশাধিকার লাভ করেন, রাদারফোর্ড ছিলেন তাঁদের অন্যতম।

ক্যাভেণ্ডিশ বীক্ষণাগারে রাদারফোর্ড প্রথমে তাঁর উদ্ভাবিত বেতার-তরঙ্গ নির্ণায়ক যন্ত্রের পরিধি সম্প্রসারণ সংক্রান্ত গবেষণায় সাফল্য অর্জন করেন। এই সময় অর্থাৎ 1895 সালের শেষদিকে এক্স-রশ্মির আবিষ্কার বিজ্ঞান-জগতে বিশেষ আলোড়নের সৃষ্টি করে। পদার্থ-বিজ্ঞানী সার জে. জে. টমসন (J. J. Thomson) গ্যাসের উপর এক্স-রশ্মির প্রতিক্রিয়া অনুধাবনের জন্যে রাদারফোর্ডকে তাঁর সহযোগী হতে আহ্বান জানালেন। রাদারফোর্ড তাঁর নিজস্ব কাজ ছেড়ে টমসনের সঙ্গে গবেষণায় যোগ দেন। তাঁদের যুগ্ম গবেষণার সার্থক পরিণতি ঘটলো গ্যাসের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ-শক্তি পরিচালন সংক্রান্ত টমসনের গবেষণার সম্পূর্ণতায় এবং 1897 সালে বস্তুর বৈদ্যুতিক গঠনের ঘোষণায়।

মাত্র দু-বছরের মধ্যে রন্টগেন, বেকেরেল এবং টমসনের চমকপ্রদ দ্রুত আবিষ্কারের ফলে নানা নতুন প্রশ্নের উদ্ভব হলো—যার সদুত্তর খুঁজে পাবার জন্যে বহু বিজ্ঞানী গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেন। বেকেরেলের অদ্ভুত ও রহস্যময় বিকিরণকে রাদারফোর্ড তাঁর গবেষণার ক্ষেত্র হিসেবে বেছে নিলেন। তিনি দেখলেন, ইউরেনিয়াম থেকে যে বিকিরণ নির্গত হয়, তা এক্স-রশ্মির মত গ্যাসকে আয়নিত করে। তিনি আরও দেখলেন, গ্যাসের মধ্যে এই রশ্মির ভেদশক্তি গ্যাসের ঘনত্বের ব্যস্তানুপাতিক।

1898 সালে জে. জে. টমসন যখন ক্যানাডার মন্ট্রিলে ম্যাক্‌গিল বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থ-বিজ্ঞানের সম্ভোস্থষ্ট গবেষণা-অধ্যাপকের পদে যোগদানের জন্যে রাদারফোর্ডকে আহ্বান জানালেন, তখন রাদারফোর্ড অনিচ্ছার সঙ্গে ক্যানাডায় গেলেন। কিন্তু নতুন পদ গ্রহণ করবার অল্পকাল পরেই তিনি তাঁর যুগান্তকারী আবিষ্কারের প্রথমটি সম্পাদন করেন। বৈদ্যুতিক ও চৌম্বক শক্তির প্রভাবে বেকেরেল রশ্মির ভেদশক্তি ও আপেক্ষিক বিক্ষেপণ গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে তিনি ঘোষণা করলেন, এই বিকিরণ অন্ততঃ দু-ধরণের রশ্মি দিয়ে গঠিত। এক ধর.ণর রশ্মি, যা মোটা কাগজ ভেদ করে যেতে পারে না, তাদের বলা হলো আল্‌ফা রশ্মি। আর এক ধরণের রশ্মি, যা পাত্‌লা অ্যালুমিনিয়াম পাতের দ্বারা রোধ করা যায়, তাদের বলা হলো বিটা রশ্মি। পরবর্তী কালে দেখা গেল, এই বিটা রশ্মি উচ্চশক্তিসম্পন্ন ইলেকট্রন কণিকা ছাড়া আর কিছুই নয় এবং আল্‌ফা রশ্মি উচ্চশক্তিবিশিষ্ট হিলিয়াম পরমাণু। তেজস্ক্রিয় বিকিরণকালে তৃতীয় আর একটি কণিকারও সন্ধান পাওয়া গেল, যা উচ্চশক্তির এক্স-রশ্মির অনুরূপ এবং তার নামকরণ হলো গামা রশ্মি।

ফ্রেডারিক সডির (Frederick Soddy) সহযোগে দু-বছর ব্যাপক গবেষণার পর রাদারফোর্ড জোরের সঙ্গে ঘোষণা করলেন, বেকেরেল আবিষ্কৃত তেজস্ক্রিয়ার ঘটনাকে স্বতঃভাঙনের ফলে এক রাসায়নিক মৌলের অন্য মৌলে রূপান্তর হিসাবেই শুধু ব্যাখ্যা করা যায়। প্রকৃতির এখানে-সেখানে কোন অস্থায়ী মৌলের লক্ষ পরমাণুর মধ্যে একটি পরমাণু হঠাৎ ভেঙে গিয়ে একটি আল্‌ফা বা বিটা কণিকা নির্গত করে সম্পূর্ণ নতুন এক পরমাণুতে পরিণত হয়।

1907 সালে রাদারফোর্ড ম্যাঞ্চেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করে ইংল্যাণ্ডে ফিরে আসেন এবং সেখানে প্রাকৃতিক তেজস্ক্রিয়া সম্পর্কে তাঁর গবেষণা চালিয়ে যান। 1908 সালে তিনি এবং তাঁর সহযোগী হানস্‌ গাইগার (Hans Geiger) পরমাণুর অভ্যন্তরস্থ কণিকার সনাক্তীকরণ ও পরিমাপের একটি পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। এই সময় রাদারফোর্ডকে তাঁর তেজস্ক্রিয়া সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার জন্যে রসায়নশাস্ত্রে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। যদিও রাদারফোর্ড ছিলেন পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক, তাঁকে রসায়নশাস্ত্রে নোবেল পুরস্কার দেওয়ায় কোন অসঙ্গতি ঘটে নি। কারণ তেজস্ক্রিয়া বিষয়টি পদার্থবিদ্যা ও রসায়নশাস্ত্র উভয় ক্ষেত্রের সঙ্গেই অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত।

জে. জে. টমসনের আর একজন কৃতী ছাত্র সি. টি. আর. উইলসন (C. T. R. Wilson) মেঘ প্রকোষ্ঠ নামে একটি পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন, যার সাহায্যে পরমাণুর অভ্যন্তরস্থ কণিকার পথরেখার আলোকচিত্র গ্রহণ করা যায়। এই পদ্ধতির সাহায্যে রাদারফোর্ড লক্ষ্য করলেন, অতিসূক্ষ্ম সোনার পাতের মধ্য দিয়ে বেশীর ভাগ আল্‌ফা কণিকা বিনা

বিচ্যুতিতে বেরিয়ে আসে। সেই সঙ্গে তিনি আরও লক্ষ্য করলেন যে, দু-একটা আল্‌ফা কণিকা কিন্তু সোনার পাতের মধ্য দিয়ে আসবার সময় বেশ কিছুটা বিচ্যুত হয়।

পরমাণু গঠনের কোন প্রচলিত তত্ত্ব দিয়ে এই ঘটনার ব্যাখ্যা করা গেল না। উচ্চ শক্তিসম্পন্ন আল্‌ফা কণিকার এই আচরণ একমাত্র এভাবে ব্যাখ্যা করা যায় যে, তারা কোন অতিক্ষুদ্র অথচ কঠিন পদার্থকে আঘাত করেছে বা তার কাছাকাছি এসেছে।

1911 সালে রাদারফোর্ড তাঁর পরমাণু-কেন্দ্রীন সংক্রান্ত তত্ত্ব প্রকাশ করেন। তিনি বললেন, পরমাণুর কেন্দ্রে আছে ধনাত্মক বিদ্যুৎ-আধান বিশিষ্ট কণিকা, যার মধ্যে পরমাণুর ভরের প্রায় 99% ভাগ সন্নিবিষ্ট এবং তার চারপাশে আছে সমপরিমাণ বিপরীত বিদ্যুৎ-আধানের পরিবেশ। কেন্দ্রে অবস্থিত ধনাত্মক আধানের এই কণিকার তিনি নামকরণ করলেন প্রোটন। রাদারফোর্ড বললেন, পরমাণুর মধ্যে প্রোটনগুলি একত্রে দল বেঁধে থাকে, একে বলে পরমাণুর কেন্দ্রীন বা নিউক্লিয়াস (Nucleus)। পরমাণু যত ভারী নিউক্লিয়াসও তত ভারী, আল্‌ফা কণিকাকে ধাক্কা দেবার ক্ষমতাও তত বেশী।

আল্‌ফা কণিকার বিক্ষেপণ পরীক্ষা থেকে রাদারফোর্ড সিদ্ধান্ত করলেন, প্রোটন পিণ্ডটি পরমাণুর কেন্দ্রীনে অবস্থিত, বিপরীত বিদ্যুৎ-আধানের কণিকা ইলেকট্রনগুলি এই কেন্দ্রীনের চারপাশে ঘুরে বেড়ায়। সূর্যকে কেন্দ্র করে গ্রহগুলি যেমন ঘুরে বেড়ায়, অনেকটা সেই রকম। পরমাণুর গঠনের এই চিত্র অবলম্বন করে নীলস্ বোর (Niels Bohr) হাইড্রোজেন আলোর বর্ণালীর বিশেষত্ব মীমাংসা করে দিলেন। তখনই হলো বোর-রাদারফোর্ডের কেন্দ্রীন পরমাণু মতবাদের (Theory of nuclear atom) অবিসংবাদী জয়। আধুনিক আবিষ্কারের আলোকে এই মতবাদ আরও সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

1919 সালে রাদারফোর্ড তাঁর যুগান্তকারী আবিষ্কার—পরমাণু-কেন্দ্রীনকে ভাঙবার উপায় উদ্ভাবন করেন। আল্‌ফা কণিকা দিয়ে নাইট্রোজেন গ্যাসকে আঘাত করে তিনি দেখতে পেলেন, জিঙ্ক সালফাইড পর্দার উপর কিছু উজ্জ্বল উদ্ভাসন দেখা যাচ্ছে। যেহেতু নাইট্রোজেন গ্যাস বা আল্‌ফা কণিকা নিজেরা এই উদ্ভাসন সৃষ্টি করতে পারে না, সেহেতু রাদারফোর্ড এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, আল্‌ফা কণিকা দিয়ে নাইট্রোজেন পরমাণুকে আঘাতের ফলে একটি আহিত হাইড্রোজেন পরমাণু বা প্রোটনের সৃষ্টি হয়েছে এবং পর্দার উপর উদ্ভাসন এই প্রোটনজনিত। নাইট্রোজেন ও আল্‌ফা কণিকার সংঘাতের ফলাফল সংক্ষেপে এভাবে লেখা যায়ঃ

$$N^{14}_{7} + He^{4}_{2} \longrightarrow O^{17}_{8} + H^{1}_{1}$$
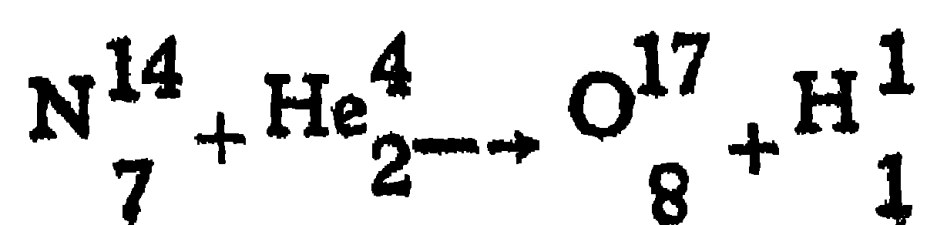
N মানে নাইট্রোজেন পরমাণু। He হলো আল্‌ফা কণিকা, যা হিলিয়াম কেন্দ্রীনের সমান। O মানে অক্সিজেন, আর H হলো হাইড্রোজেন।

আল্‌ফা কণিকা দিয়ে আঘাতের পর অতি সূক্ষ্ম পরিমাণ হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেনের সন্ধান রাদারফোর্ড তাঁর ব্যবহৃত নাইট্রোজেন গ্যাসের মধ্যে পেয়েছিলেন। রাদারফোর্ডের এই পরীক্ষা থেকে প্রমাণিত হলো, মানুষ প্রকৃতিতে পাওয়া এক মৌলকে অন্য এক মৌলে রূপান্তরিত করতে পারে। মৌলান্তরীকরণের চাবিকাঠি রাদারফোর্ড তুলে দিলেন বিজ্ঞানীদের হাতে। আধুনিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হলো।

1919 সালে সার জে. জে. টমসন কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাভেণ্ডিশ লেবরেটরীর অধ্যক্ষের পদ থেকে অবসর গ্রহণ করবার পর রাদারফোর্ড সেই পদে যোগদান করেন। সেখানে বিশেষ কৃতিত্ব ও যোগ্যতার সঙ্গে তিনি গবেষণা পরিচালন করেন। সারা বিশ্ব থেকে বহু প্রতিভাবান ছাত্র এসে তাঁর অধীনে গবেষণা করে খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁদের মধ্যে সোভিয়েট রাশিয়ার পিটার ক্যাপিৎজা (Peter Kapitza) এবং জেমস চ্যাডউইকের (James Chadwick) নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 1932 সালে চ্যাডউইক বিদ্যুৎবিহীন তৃতীয় মৌলিক কণা নিউট্রন আবিষ্কার করেন। চ্যাডউইকের এই আবিষ্কার পরমাণু-কেন্দ্রীন বিজ্ঞানে যুগান্তর এনেছে। রাদারফোর্ড যেমন আল্‌ফা কণিকাকে পরমাণু চূর্ণ করবার অস্ত্ররূপে প্রয়োগ করেছিলেন, বর্তমানে নিউট্রনকে সেইভাবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

দেশ-বিদেশ থেকে নানা সম্মান লাভের পর 1937 সালের 19শে অক্টোবর রাদারফোর্ড আকস্মিকভাবে পরলোকগমন করেন। 1938 সালের গোড়ায় কলকাতা মহানগরীতে আয়োজিত ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের রজত জয়ন্তী অধিবেশনে তাঁর সভাপতিত্ব করবার কথা ছিল, কিন্তু অধিবেশনের আগেই তাঁর তিরোধান ঘটে। আজ রাদারফোর্ডের জন্মশতবার্ষিকীতে বিজ্ঞানে তাঁর অমূল্য অবদানের কথা আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি।

রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়*

---

* দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং ; কলিকাতা-29

পারদর্শিতার পরীক্ষা

নীচে পদার্থবিদ্যা সম্পর্কিত 5টি প্রশ্ন দেওয়া গেল। উত্তর দেবার সময় 5 মিনিট। তোমাদের মধ্যে যে 5টি প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে, পদার্থবিদ্যায় তার জ্ঞান খুবই ভাল। 4, 3, 2 ও 1টি প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলে পদার্থবিদ্যায় জ্ঞান যথাক্রমে ভাল, সাধারণ ভাল, কম ও খুব কম। কেউ যদি একটিও প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারে, তাহলে পদার্থবিদ্যা সম্বন্ধে তার পড়াশুনা করা প্রয়োজন।

1. ধরা যাক, 1000 কিলোগ্র্যাম ওজনের কোন কৃত্রিম উপগ্রহ ভূপৃষ্ঠের ঊর্ধ্বে 1000 কিলোমিটার উপরে থেকে (ভূকেন্দ্র থেকে উপগ্রহের দূরত্ব প্রায় 7400 কি. মি.) বৃত্তাকার পথে পৃথিবীর চতুর্দিকে আবর্তন করছে। তুমি কোন উপায়ে মাত্র 1 মিলিগ্র্যাম ইলেকট্রন সংগ্রহ করে ভূকেন্দ্রে রাখলে এবং অনুরূপ 1 মিলিগ্র্যাম ইলেকট্রন কোনক্রমে কৃত্রিম উপগ্রহে রেখে দেওয়া হলো। একটি ইলেকট্রনের ভর $9{\cdot}1\times10^{-28}$ গ্র্যাম এবং তার আধান $-4{\cdot}8\times10^{-10}$ (ইলেকট্রোস্ট্যাটিক একক)। সম আধানযুক্ত ইলেট্রনসমূহ বিকর্ষণ করবে। ভূকেন্দ্রস্থিত ইলেকট্রনসমূহ সম্মিলিতভাবে কৃত্রিম উপগ্রহস্থিত ইলেকট্রন-সমূহের উপর যে বিকর্ষণ বল প্রয়োগ করবে তার পরিমাণ পৃথিবী এবং কৃত্রিম উপগ্রহের মধ্যে মাধ্যাকর্ষণ বল (এক্ষেত্রে অভিকর্ষজ বল) অপেক্ষা বেশী, না কম? পৃথিবীর ভর $5{\cdot}976\times10^{27}$ গ্র্যাম।

2. সূর্যের আলোকময় বহিরাবরণ বা ফটোস্ফিয়ারের ব্যাস 1,390,000 কিলো-মিটার এবং পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব 150,000,000 কিলোমিটার। চন্দ্রের ব্যাস 3480 কিলোমিটার এবং ভূপৃষ্ঠ থেকে চন্দ্রের দূরত্ব পরিবর্তনশীল। চন্দ্র ভূপৃষ্ঠ থেকে 399,000 কিলোমিটার থেকে 357,000 কিলোমিটারের মধ্যে অবস্থান করে। সূর্যগ্রহণের সময় চন্দ্রের দূরত্ব কিরূপ থাকলে বলয়গ্রাস সূর্যগ্রহণ হওয়া সম্ভব?

3. একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় 16 গ্র্যাম অক্সিজেন গ্যাসের আয়তন V_1 সি. সি. এবং চাপ প্রতি বর্গ সেন্টিমিটার P_1 ডাইন। সেই তাপমাত্রায় 32 গ্র্যাম অক্সিজেন গ্যাসের চাপ $4\ P_1$ ডাইন (প্রতি বর্গ সে. মি. তে) হলে আয়তন কত হবে?

4. একটি লম্বা লোহার রডের একপ্রান্তে কোন শব্দের সৃষ্টি করা হলো। আমরা জানি শব্দ-তরঙ্গ বিভিন্ন মাধ্যম দিয়ে বিভিন্ন গতিতে গমন করে। তুমি যদি লোহার রডের অন্য প্রান্তে কান পেতে থাক, তাহলে তুমি শব্দটি আগে শুনবে, না তোমার পাশে দাঁড়ানো কোন বন্ধু বাতাসের মাধ্যমে শব্দটি আগে শুনবে?

5. 5 কিলোগ্রাম এবং 10 কিলোগ্রাম ভরবিশিষ্ট ছটি গোলক একটি সরল রাবার সুত্রের দ্বারা আবদ্ধ আছে। গোলক দুটিকে দু-দিকে টেনে ছেড়ে দেওয়া হলো। কোন্ গোলকটির উপর অধিক বল ক্রিয়া করবে?

(উত্তর—689 পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ব্রহ্মানন্দ দাশগুপ্ত ও জয়ন্ত বসু*

* সাহা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স; কলিকাতা—9

অপরাধী নির্ণয়ে যান্ত্রিক ব্যবস্থা

সন্দেহভাজন ব্যক্তি প্রকৃতই অপরাধী কিনা, জানবার জন্যে শান্তিরক্ষকেরা নানা-প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করে থাকেন। কিন্তু তাতেই যে সর্বক্ষেত্রে সন্দেহভাজন ব্যক্তির অপরাধ প্রমাণিত হয়—এমন কথা বলা যায় না। কিন্তু প্রকৃতই অপরাধী কিনা অথবা দুষ্কার্য অনুষ্ঠিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই অপরাধীকে ধরে ফেলবার জন্যে আজকাল বিশেষ বিশেষ যান্ত্রিক ও রাসায়নিক কৌশল উদ্ভাবিত হয়েছে। এসব যান্ত্রিক ব্যবস্থা শান্তিরক্ষকদের কাজে বিশেষ সহায়ক হয়েছে বলে জানা গেছে। এই রকমের কয়েকটি ব্যবস্থার কথা এস্থলে আলোচনা করবো।

পলিগ্রাফ বা লাই-ডিটেক্টর—বিদেশে অপরাধ তদন্তের কাজে পুলিশ বিভাগে এটি বহুল ব্যবহৃত হয়। অপরাধ তদন্তের কাজে আমাদের দেশেও এর প্রচলন হয়েছে। সন্দেহভাজন ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে সত্য গোপন করছে কিনা, এই যন্ত্রের সাহায্যে তা বোঝা যায়। এই যন্ত্রটি ছোট্ট একটি সুটকেসের মধ্যে থাকে। এই কাজে শিক্ষাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি যন্ত্রটি পরিচালনা করেন। এই যন্ত্রের সাহায্যে যে কোন ব্যক্তির শ্বাস-প্রশ্বাসের ধরণ, রক্তের চাপ, নাড়ীর গতি এবং সামান্য বিদ্যুৎ প্রবাহের ফলে তার সমগ্র শরীরের প্রতিক্রিয়া সুক্ষ্মভাবে অনুধাবন করা যায়। এর সাহায্যে যে কোনও ব্যক্তির মানসিক বৈলক্ষণ্য বা অনুভূতির তারতম্য লক্ষ্য করা যায়—যাতে বোঝা যায়, সে সজ্ঞানে বা ইচ্ছাকৃতভাবে সত্য গোপন করবার জন্যে কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করবার চেষ্টা করছে কিনা। যন্ত্রে তার সেই মানসিক অস্থিরতা ধরা পড়ে, যন্ত্র-সংলগ্ন একটি সুক্ষ্ম পিনের সাহায্যে কাগজের উপর অঙ্কিত রেখাচিত্রের পর্যালোচনা করে।

প্রক্সিমিটি ডিটেক্টর—এই যন্ত্রের সাহায্যে 6 ফুট নাগালের মধ্যে কোন কিছুর গতিবিধির খবর জানা যায়। কোনও ব্যক্তি বা বস্তু প্রহরাধীন বা সংরক্ষিত এলাকার মধ্যে

এসে পড়লে বৈদ্যুতিক কৌশলে যন্ত্রের পাগলা ঘন্টি বেজে ওঠে। ফলে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সাবধান হবার সুযোগ পাওয়া যায়। যেখানে দুষ্প্রাপ্য বা মূল্যবান দলিলপত্র পাহারা দেবার দরকার, সেখানে এই যন্ত্রের উপযোগিতা অসামান্য।

গোয়েন্দা ঘণ্টি—আজকাল বড় বড় দোকান বা বাজারে খদ্দেরের ভিড়ে বিক্রেতার ব্যস্ততার সুযোগে হাত সাফাই, চুরি বা চোরাই মাল পাচার করা খুবই সাধারণ ব্যাপার—বিশেষ করে পূজা, ঈদ, বড়দিন প্রভৃতি উৎসব উপলক্ষ্যে যখন স্বভাবতঃই লোকের ভিড় ও ব্যস্ততা বেড়ে যায় এবং বিক্রেতা হয়ে পড়ে অন্যমনস্ক।

এই ধরণের দুষ্কার্যকারীদের হাতেনাতে ধরবার জন্যে সম্প্রতি এক প্রকার বৈদ্যুতিক যন্ত্রের (গোয়েন্দা ঘন্টি) প্রচলন হয়েছে।

দুষ্কৃতকারী অথবা তার দলের লোকদের ফাঁদে ফেলবার উদ্দেশ্যে কোন দামী জিনিষ তাদের হাতের নাগালের মধ্যে ইচ্ছা করেই অসাবধানে রেখে দেওয়া হয়, যাতে দুষ্কৃতকারী নিজের হাতে সেটি সরাবার সুযোগ পায়। ফলে, মাল সরাতে গেলেই গোপন গোয়েন্দা ঘন্টি বেজে ওঠে আর চোরও হাতেনাতে ধরা পড়ে যায়।

কিন্তু এই কৌশলের একটা অসুবিধা এই যে, ঘন্টি বাজবার সঙ্গে সঙ্গেই দুষ্কৃতকারীর স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হচ্ছে—বামাল হাত থেকে ফেলে দেওয়া। সে ক্ষেত্রে অন্য বহু নিরাপরাধ খদ্দেরের উপস্থিতিতে প্রকৃত দুষ্কৃতকারীকে গুলিয়ে ফেলাই স্বাভাবিক।

এই অসুবিধা দূর করবার জন্যে টোপ হিসাবে মালের গায়ে মাখিয়ে দেওয়া হয় সিলভার নাইট্রেট। এর পর দরকার শুধু এক বোতল ফটোগ্রাফিক ডেভেলপার ও খানিকটা তুলার। ডেভেলপার প্রয়োগ করা হয় সন্দেহজনক লোকটির হাতে। সেই লোক প্রকৃত অপরাধী হলে তার হাত অবিলম্বে কালো হয়ে যাবে।

সিলভার নাইট্রেটের বদলে এর সহজতর বিকল্প হিসাবে সম্প্রতি ব্যবহৃত হচ্ছে আরেক ধরণের স্বচ্ছ বা অদৃশ্য পাউডার, যার নাম ফেনলপ্থেলিন (Phenolpthaline) পাউডার। এর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—এই পাউডারের সংস্রবে আসা বস্তুমাত্রই জলে ডোবালে জল ও বস্তুটি উভয়ের রং-ই লাল হয়ে যায়। এই সুবিধার জন্যে আজকাল ভদ্রবেশী গোপন দুষ্কৃতকারীর অপরাধের তদন্তে এর প্রচলন হয়েছে। ঘুষের টোপ দিয়ে ফাঁদ পেতে ঘুষ-খাওয়া ব্যক্তিকে হাতেনাতে ধরবার জন্যে গোপন ব্যবস্থামত উৎকোচ আদায়কারীর হাতে অভিযোগকারী বা সাক্ষীর মারফৎ তুলে দেওয়া হয় কারেন্সি নোট, যাতে মাখানো থাকে এই গুঁড়া। ফলে ঘুষের টাকা হাতে নেবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সে হাতেনাতে ধরা পড়ে। প্রমাণটাও অকাট্য—জলে ডোবানো মাত্র নোট ও তার হাত উভয়েই লাল রঙে রঞ্জিত হয়ে যায়।

ম্যাগ্নোমিটার—অধুনা বিশেষ পরিচিত হাইজ্যাকিং, স্কাইজ্যাকিং অর্থাৎ বিমান দস্যুতার প্রতিবিধানে এই যন্ত্রের উপযোগীতা বিশেষভাবে অনুভূত হচ্ছে।

এই যন্ত্রের সাহায্যে কোন সন্দেহজনক ব্যক্তি তার শরীর বা পরিচ্ছদের গোপন অংশে মারাত্মক অস্ত্রাদি লুকিয়ে রেখেছে কিনা, তা বোঝা যায়। বিশেষ করে বিমান ও বিমানযাত্রীদের নিরাপত্তার উদ্দেশ্যে প্রতিটি যাত্রীর দেহ ও মালপত্রের ব্যাপক তল্লাসী দরকার। এই যন্ত্র সে কাজে খুব সাহায্য করতে পারে। কেন না, এই যন্ত্রের ধাতু-চেতনা খুব তীব্র—এর সন্ধানী চোখে সামান্যতম ধাতুর পক্ষেও গোপন থাকা সম্ভব নয়। জেলখানা বা অন্যান্য সংরক্ষিত অঞ্চলে নিরাপত্তার জন্যে অন্তর্ঘাতী ও নাশকতামূলক কার্য নিবারণে এই জাতীয় যন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা প্রমাণিত হয়েছে। কেবলমাত্র বিমান ঘাঁটিই নয়, অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রেও এই ধরণের যন্ত্রের যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হচ্ছে।

জীমূতকান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন 1. : ফটো-ইলেকট্রিক প্রক্রিয়া কি ?

শ্যামল দস্তিদার, পুরুলিয়া
কল্যাণ বসাক, কলিকাতা-6

প্রশ্ন 2. : খশিয়োরকর রোগ সম্পর্কে কিছু বলুন

শ্যামসুন্দর হাজরা, কলিকাতা-6

উত্তর 1. : যে প্রক্রিয়ায় আলো থেকে বৈদ্যুতিক শক্তি পাওয়া যায়, তাকে ফটো-ইলেকট্রিক প্রক্রিয়া বলা হয়। বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষায় দেখা গেছে যে, অনেক পদার্থ আছে, যাদের উপর আলোক রশ্মি আপতিত হলে পদার্থ থেকে ইলেকট্রন নির্গত হয়। নির্গত ইলেকট্রনের সংখ্যা আপতিত আলোকের তীব্রতার উপর নির্ভর করে। বিভিন্ন তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের আলোক রশ্মি ব্যবহার করলে নির্গত ইলেকট্রনের শক্তিও পরিবর্তিত হয়ে থাকে। পরীক্ষায় আরো জানা যায় যে, এই জাতীয় প্রত্যেক পদার্থের বেলায় আপতিত আলোকের কম্পনাঙ্ক একটা নির্দিষ্ট মানের হয়ে থাকে—যাকে বলা হয় প্রারম্ভিক কম্পনাঙ্ক। নির্গত ইলেকট্রনের প্রবাহ পেতে হলে আপতিত আলোকের কম্পনাঙ্ক পদার্থের প্রারম্ভিক কম্পনাঙ্ক অপেক্ষা বেশী হতে হবে।

1905 সালে বিজ্ঞানী আইনষ্টাইন কোয়ান্টাম বলবিদ্যার সাহায্যে এই প্রক্রিয়ার একটা গাণিতিক সূত্র বের করেন, যা বিজ্ঞানী মিলিকান 1912 সালে পরীক্ষার দ্বারা এর

যাথার্থ্যতা প্রমাণ করেন। এই প্রক্রিয়াকে কেন্দ্র করেই তৈরি হয়েছে বিভিন্ন রকমের ফটো-ইলেকট্রিক সেল, যার বহুল প্রয়োগ আজ সুবিদিত।

উত্তর 2. : খর্শিয়োরকর রোগটি প্রধানতঃ শিশুদের মধ্যেই দেখা যায়। শিশুদের দৈহিক পুষ্টি ও বৃদ্ধির ক্ষেত্রে প্রোটিনের প্রয়োজনীয়তা খুবই বেশী। সাধারণতঃ শিশুদের খাদ্যে যদি প্রোটিনের পরিমাণ খুবই কমে যায়, তাহলে এই রোগটি দেখা দেয়। এই রোগে ক্ষুধামান্দ্য, দেহের ওজন হ্রাস, ঝিমিয়ে পড়া, উদরাময় ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়। খর্শিয়োরকর রোগটির গুরুতর আক্রমণে অনেক সময় শিশুর মৃত্যু ঘটে।

সাধারণতঃ মাতার স্তন্যদুগ্ধের উপর নির্ভরতার সময় পেরিয়ে গেলে শিশুদের শস্যের মণ্ড খাওয়ানো হয়। এগুলির মধ্যে রয়েছে ভাতের মণ্ড, সাগুর মণ্ড, কাঁচকলার মণ্ড ইত্যাদি। মোটামুটিভাবে এক বছরের একটি শিশুর ক্ষেত্রে দৈনিক প্রোটিনের প্রয়োজনীয়তা প্রায় 30 গ্র্যামের মত। মায়ের স্তন্যদুগ্ধ ও এই মণ্ড থেকে যে পরিমাণ প্রোটিন পাওয়া যায়, তা শিশুটির পক্ষে যথেষ্ট নয়। প্রোটিনবহুল খাদ্য হিসাবে শিশুটি যদি গরুর দুধ খায়, তবে এই দুধ থেকেই সে প্রয়োজনীয় প্রোটিন পেতে পারে। দুধ ছাড়াও আজকাল শিশুদের বিভিন্ন উদ্ভিজ্জ প্রোটিনের মিশ্রণ খাওয়ানো হয়। এই উদ্ভিজ্জ প্রোটিনের মিশ্রণ এমনভাবে তৈরি করা হয়, যা শিশুরা সহজেই হজম করতে পারে। উপরিউক্ত উদ্ভিজ্জ প্রোটিনগুলির মধ্যে রয়েছে ছোলা, তিলের গুঁড়া, কলার ময়দা, গুড়, ঈষ্ট, চীনাবাদাম ও তুলা বীজের খইল প্রভৃতি। এগুলি ছাড়াও মাখন-তোলা দুধের গুঁড়া নির্দিষ্ট মাত্রায় খাইয়ে খর্শিয়োরকর রোগে বিশেষ উপকার পাওয়া গেছে।

শ্যামসুন্দর দে*

* ইনস্টিটিউট অব রেডিও-ফিজিক্স অ্যাণ্ড ইলেকট্রনিক্স ; বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা-9

উত্তর

(পারদর্শিতার পরীক্ষা)

1. যেহেতু একটি ইলেকট্রনের ভর $9{\cdot}1 \times 10^{-28}$ গ্র্যাম, 1 মিলিগ্র্যাম ($= 10^{-3}$ গ্র্যাম) ইলেকট্রনের মধ্যে $\dfrac{10^{-3}}{9{\cdot}1 \times 10^{-28}}$টি ইলেকট্রন আছে। প্রতিটি ইলেকট্রনের আধান $4{\cdot}8 \times 10^{-10}$ (ইলেকট্রোষ্ট্যাটিক একক বা E. S. U.)। 1 মিলিগ্র্যাম
ইলেকট্রনের আধান $= \dfrac{1}{9{\cdot}1} \times 10^{25} \times 4{\cdot}8 \times 10^{-10} = \dfrac{4{\cdot}8}{9{\cdot}1} \times 10^{15}$ E. S. U.
R সে. মি. দূরত্বের ব্যবধানের 1 মিলিগ্র্যাম ইলেকট্রন রাখলে তাদের বিকর্ষণ বল

$$\frac{\left(\frac{4{\cdot}8}{9{\cdot}1} \times 10^{15}\right)^2}{R^2} \approx \frac{2{\cdot}9 \times 10^{29}}{R^2} \text{ ডাইন।}$$

পৃথিবীর ভর $5{\cdot}97 \times 10^{27}$ গ্র্যাম এবং কৃত্রিম উপগ্রহের ভর 10^6 গ্র্যাম এবং ভূকেন্দ্র থেকে R সে. মি. দূরত্বে কৃত্রিম উপগ্রহ থাকলে তাদের আকর্ষণী বল $= G\,\dfrac{5{\cdot}97 \times 10^{27} \times 10^6}{R^2}$

$$= \frac{6{\cdot}7 \times 10^{-8} \times 5{\cdot}97 \times 10^{33}}{R^2} \text{ ডাইন} \approx \frac{3{\cdot}9 \times 10^{26}}{R^2} \text{ ডাইন।}$$

সুতরাং পূর্বোক্ত বিকর্ষণী বল আকর্ষণী বল অপেক্ষা প্রায় দশ হাজার গুণ জোরালো।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, বৈদ্যুতিক বল মাধ্যাকর্ষণসঞ্জাত বল অপেক্ষা বহুগুণ তীব্র। এক মিলিগ্র্যাম ইলেকট্রন অন্য এক মিলিগ্র্যাম ইলেকট্রনকে যে বলের দ্বারা বিকর্ষণ করে, বিশাল পৃথিবী 1 হাজার কিলোগ্র্যামের বস্তুকেও তত জোরে আকর্ষণ করতে পারে না।

2. পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণের সময় চন্দ্রের ছায়া পৃথিবীতে পৌঁছানো প্রয়োজন এবং চন্দ্রের সর্বাধিক দূরত্ব এমন হওয়া প্রয়োজন, যাতে চন্দ্রের প্রচ্ছায়ার শীর্ষ ভূপৃষ্ঠ স্পর্শ করে। চিত্র থেকে ব্যাপারটা বুঝা যাবে।

সূর্য
চাঁদ
S
M
E
ভূপৃষ্ঠ
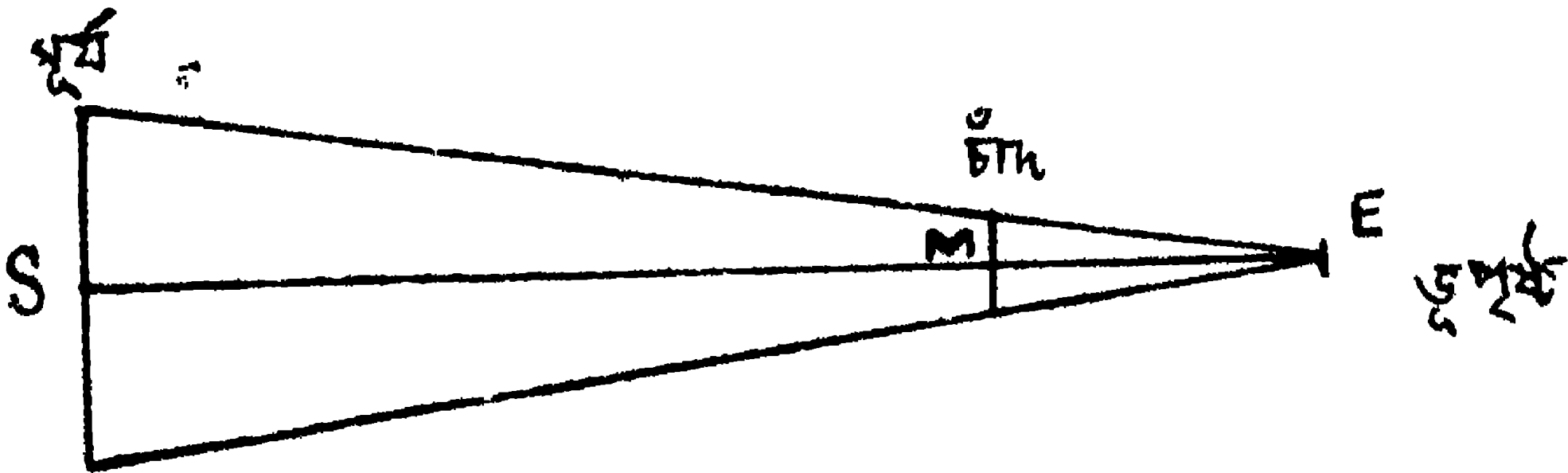
$$\frac{EM}{ES} = \frac{\text{চন্দ্রের ব্যাস}}{\text{সূর্যের ব্যাস}}$$

$\therefore$ $EM = \dfrac{3480}{1,3,90,000} \times 150,000,000 \approx 376,000$ কি. মি.। চন্দ্রের দূরত্ব এর অধিক হলে ভূপৃষ্ঠের E বিন্দু থেকে সূর্যের বলয় গ্রাস দেখা যাবে।

3. আমরা জানি m গ্র্যাম গ্যাসের চাপ P, (ডাইন/বর্গ সে. মি.), আয়তন V সি. সি. ও তাপমাত্রা T°K হয় এবং M যদি আণবিক গুরুত্ব (Molecular weight) হয়, তবে

$PV = \frac{m}{M}RT$, অক্সিজেনের ক্ষেত্রে $M = 32$

∴ 16 গ্র্যাম অক্সিজেনের চাপ P_1 এবং আয়তন V_1 সি. সি. হলে $P_1V_1 = \frac{1}{2}RT$।

32 গ্র্যাম অক্সিজেনের ক্ষেত্রে আয়তন V_2 সি. সি. হলে $4P_1V_2 = RT$।

∴ $\frac{V_1}{V_2} = 2$। ∴ $V_2 = \frac{1}{2}V$।

4. কোন মাধ্যমে শব্দ-তরঙ্গের গতি মাধ্যমের স্থিতিস্থাপকতার উপর নির্ভরশীল। অধিক-স্থিতিস্থাপক মাধ্যমে শব্দ-তরঙ্গের গতি অধিক। লোহায় শব্দ-তরঙ্গে গতি প্রায় 5131 কিলোমিটার প্রতি সেকেণ্ডে। বায়ুতে শব্দের গতি সাধারণ অবস্থায় প্রায় 330 কিলোমিটার প্রতি সেকেণ্ডে। সুতরাং লোহার রডের মধ্য দিয়ে শব্দ আগে শোনা যাবে।

5. রাবারের সুতার মধ্য দিয়ে টান (Tension) দুদিকে সমভাবে থাকবে। অতএব গোলক দুটির উপর সমান বল ক্রিয়াশীল হবে।

শোক-সংবাদ

পরলোকে অধ্যাপক জে. ডি. বার্নাল

প্রখ্যাত বৃটিশ বিজ্ঞানী অধ্যাপক জন ডেসমণ্ড বার্নাল গত 15ই সেপ্টেম্বর (1971) লণ্ডনে পরলোকগমন করেছেন। তিনি 1901 সালের মে মাসে আয়ার্ল্যাণ্ডের নেনাঘে জন্মগ্রহণ করেন। 1922 সালে কেম্ব্রিজ থেকে তিনি এম. এ. ডিগ্রি লাভ করেন।

1938 সালে তিনি পদার্থবিদ্যার অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন এবং 1963 সালে লণ্ডনের বীরবেক কলেজে ক্রিস্ট্যালোগ্রাফীর অধ্যাপকের পদে যোগদান করেন। তিনি জল থেকে শুরু করে কার্বন, ধাতব পদার্থ ও অনেক জটিল ও সরল পদার্থের গঠন-রীতি সম্বন্ধে গবেষণা করেন। তারপর ভিটামিন, হর্মোন, প্রোটিন ও ভাইরাস প্রভৃতি সম্বন্ধে গবেষণায় প্রবৃত্ত হন। সম্প্রতি তিনি তরল পদার্থের গঠন-কৌশলের বিষয় অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হয়েছিলেন।

1934 সালে অধ্যাপক বার্নাল সর্বপ্রথম প্রোটিন কৃস্ট্যালের আভ্যন্তরীণ গঠনের এক্স-রে ছবি গ্রহণে কৃতকার্য হন, যার ফলে অণুর আকৃতি ও আয়তন নির্ধারণ করা সম্ভব হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের উচ্চতম বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টাদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। তিনি ইউনাইটেড ষ্টেটস-এর স্বাধীনতা পদক এবং 1953 সালে লেনিন শান্তি পুরস্কার লাভ করেন।

বিজ্ঞানের সামাজিক কার্যকারিতা সম্পর্কিত যে কোন বিষয়ে বক্তৃতা প্রদানের জন্যে 1969 সালে তিনি 2,000 পাউণ্ড অনুদানে বার্নাল লেকচার ফাণ্ড-এর প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি কৃস্ট্যালো-গ্রাফি এবং আণবিক জীববিদ্যা সম্পর্কে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় বহু সংখ্যক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি 'The Social Function of Science' (1939); The

Physical Basis of Life (1951); Science in History (1954-65), Origin of Life (1967) প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন।

অধ্যাপক জে. ডি. বার্নাল

1957 সালে তিনি মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের অবৈতনিক অধ্যাপক নিযুক্ত হন, 1958 সালে USSR সায়েন্স অ্যাকাডেমি, 1960 সালে চেকোস্লোভাক সায়েন্স অ্যাকাডেমির নিয়মিত সদস্য, 1962 সালে বার্লিনের জার্মেন সায়েন্স অ্যাকাডেমির করেস্পণ্ডিং মেম্বার এবং 1966 সালে নরওয়ের সায়েন্স অ্যাকাডেমির সদস্য হন। 1959 সালে তাঁকে গ্রোটিয়াস পদক দানে সম্মানিত করা হয়।

পরলোকে অধ্যাপক বার্নার্ডো হোসে

গত 22শে সেপ্টেম্বর (1971) অধ্যাপক বার্নার্ডো হোসে পরলোকগমন করেছেন। তিনি 1887 সালে এপ্রিল মাসে জন্মগ্রহণ করেন। বুয়েনস আয়ার্সে তিনি শিক্ষা লাভ করেন এবং 1911 সালে মেডিক্যাল গ্র্যাজুয়েট হবার পর বুয়েনস আয়ার্সের ভেটারিনারী স্কুলে শারীরবিদ্যার অধ্যাপকরূপে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। 1919 সাল পর্যন্ত তিনি এই কাজে নিযুক্ত ছিলেন। তারপর তিনি বুয়েনস আয়ার্সের মেডিক্যাল স্কুলে যোগদান করেন। এখানে তিনি 1943 সাল পর্যন্ত কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। 1948 সালে তিনি ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের হিচকক প্রোফেসার নিযুক্ত হন। 1947 সালে তিনি ভেষজ ও শারীরবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। ঐ বছরেই তাঁকে আমেরিকান ডায়েবেটিস অ্যাসোসিয়েশনের ব্যান্টিং মেডাল এবং আমেরিকান ফার্মাসিউটিক্যাল ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশনের গবেষণা পুরস্কার দানে সম্মানিত করা হয়।

1948 সালে তিনি লণ্ডনের রয়েল কলেজ অব ফিজিসিয়ানস্-এর ব্যালী পদক এবং সিডনির জেমস্ কুক পদক লাভ করেন। এতদ্ব্যতীত অধ্যাপক হোসে প্যারিস, ষ্ট্রাসবার্গ, ব্রুসেলস, লাউভেন, মন্টেভিডো, ড্যুসেলডর্ফ এবং আরও কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিসিনে অনারেরী ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন। অক্সফোর্ড, হার্ভার্ড, সাও পাউ লো, মেক্সিকো, টরন্টো এবং নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে বিজ্ঞানে সম্মানসূচক ডক্টরেট উপাধি দানে সম্মানিত করেন। বুয়েনস আয়ার্সের ন্যাশন্যাল অ্যাকাডেমি অব সায়েন্স এবং আর্জেন্টিনার সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশনের তিনি ভূতপূর্ব সভাপতি ছিলেন। তিনি আর্জেন্টিনার ন্যাশন্যাল রিসার্চ কাউন্সিল এবং আর্জেন্টিনার বায়োলজিক্যাল সোসাইটিরও সভাপতি ছিলেন।

পরলোকে অরুণকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

আকাশবাণীর মগরার উচ্চশক্তি ট্রান্সমিটারের ভারপ্রাপ্ত ডেপুটি চীফ ইঞ্জিনীয়ার বিশিষ্ট বেতার-

বিজ্ঞানী শ্রীঅরুণকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় গত 19শে সেপ্টেম্বর আকস্মিকভাবে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোকগমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র 55 বছর এবং তিনি তাঁর বৃদ্ধ
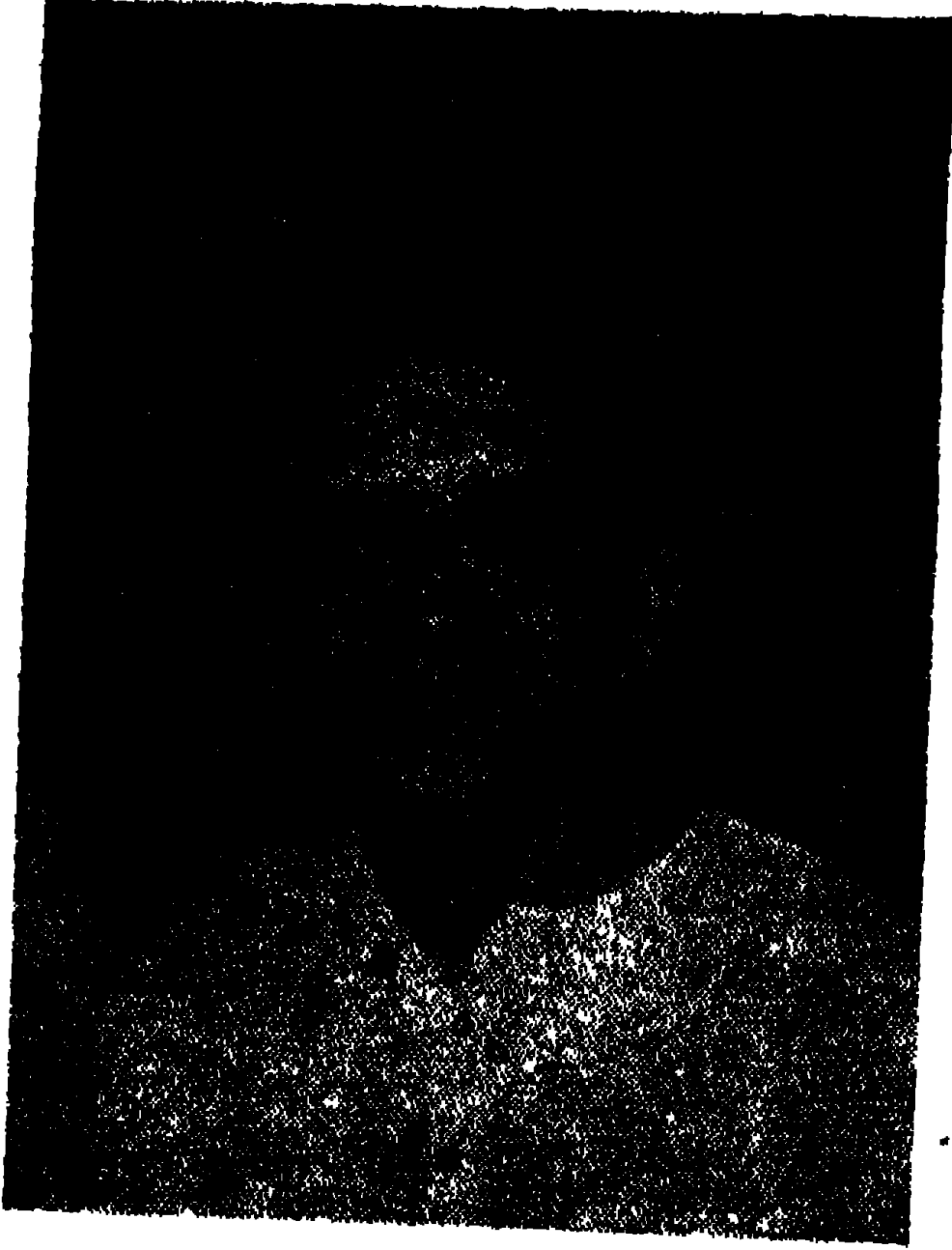
অরুণকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

পিতা, স্ত্রী, এক পুত্র, এক কন্যা ও এক জামাতা, এক ভ্রাতা ('জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক শ্রীরবীন বন্দ্যোপাধ্যায়) এবং চার ভগিনী রেখে গেছেন।

অরুণকৃষ্ণ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতী ছাত্র ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় তিনি প্রথম শ্রেণীর বৃত্তি লাভ করেন এবং 1937 সালে এম. এস-সি পরীক্ষায় বিশুদ্ধ পদার্থ-বিজ্ঞানে শীর্ষস্থান অধিকার করেন ও বেতার বিষয়ে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। এরপর প্রায় দু-বছর কাল তিনি পরলোকগত জাতীয় অধ্যাপক ডক্টর শিশিরকুমার মিত্রের অধীনে উচ্চ আয়নমণ্ডল ও বেতার বিষয়ে গবেষণা করেন এবং কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা-নিবন্ধ প্রকাশ করেন। 1939-40 সালে তিনি আকাশবাণীতে বেতার প্রযুক্তিবিদ্‌ হিসাবে যোগদান করেন এবং কর্মকুশলতার পরিচয় দিয়ে ডেপুটি চীফ ইঞ্জিনীয়ারের পদে উন্নীত হন।

সোভিয়েট রাশিয়ার সহযোগিতায় পশ্চিম বাংলার হুগলী জেলার মগরায় প্রায় 4 কোটি টাকা ব্যয়ে আকাশবাণীর সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী (1000 কিলোওয়াট) ট্রান্সমিটারটি অরুণকৃষ্ণেরই তত্ত্বাবধানে নির্মিত হয় এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি এই বেতার কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। 1969 সালের সেপ্টেম্বর মাসে এই কেন্দ্রটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়।

অরুণকৃষ্ণ আকাশবাণীর দিল্লী কেন্দ্রে প্রযুক্তিবিদ্‌দের শিক্ষণ বিভাগে কিছুকাল অধ্যাপনাও করেন। তিনি বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের প্রাক্তন সদস্য এবং বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান বিষয়ে একজন সুলেখক ছিলেন।

বিবিধ

বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান প্রদর্শনী

কলকাতার স্কটিশ চার্চ কলেজিয়েট স্কুলে 20শে থেকে 22শে সেপ্টেম্বর '71 পর্যন্ত সপ্তম বার্ষিক বিজ্ঞান প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সভাপতি হিসাবে যোগদান করেন সাহা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স-এর ডক্টর জয়ন্ত বসু (বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের কর্ম-সচিব) এবং প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন জুওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া-র ডক্টর কে. কে. তেওয়ারি।

বিজ্ঞান প্রদর্শনীটিতে পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জীববিদ্যা ও গণিতের বিভিন্ন তত্ত্ব ও তথ্যাদির পরীক্ষা-নিরীক্ষা, যন্ত্রপাতি, মডেল, নমুনা, চিত্র প্রভৃতির মাধ্যমে চিত্তাকর্ষকভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে ছাত্রদের নিজেদের তৈরি কয়েকটি যন্ত্র ও মডেল সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে ছাত্রদের প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা এবং সেই ব্যাখ্যার কাজে তাদের অদম্য উৎসাহ প্রদর্শনটিকে বিশেষভাবে প্রাণবন্ত করে তুলেছিল। তবে দু-একটি ক্ষেত্রে বিষয়বস্তু সম্বন্ধে ছাত্রদের ধারণা খুব স্পষ্ট বলে মনে হয় নি। প্রদর্শনীর প্রস্তুতির সময় ছাত্রদের কাছে বিষয়বস্তুর ব্যাখ্যায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ আরো একটু বেশী যত্ন নিলে এই ধরণের প্রদর্শনী পরিপূর্ণভাবে সার্থক হয়ে উঠবে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, বিজ্ঞান প্রদর্শনীর পাশে কলা ও বাণিজ্য বিষয়ক প্রদর্শনীরও ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

পশ্চিম বঙ্গের বর্তমান অবস্থায় তিনদিনব্যাপী প্রদর্শনীর আয়োজন করে এবং তা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করে স্কটিশ চার্চ কলেজিয়েট স্কুলের কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষকবৃন্দ গঠনমূলক কাজে ছাত্রশক্তিকে নিয়োজিত করবার যে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, তার জন্যে তাঁরা নিঃসন্দেহে প্রশংসার যোগ্য।

সর্পোদ্যান

মাদ্রাজ (তামিলনাড়ু) থেকে ইউ. এন. আই. কর্তৃক প্রচারিত খবরে প্রকাশ—২রা অক্টোবর মাদ্রাজে ভারতের প্রথম সর্পোদ্যানটির উদ্বোধন হয়। উদ্বোধন করেন তামিলনাড়ুর অরণ্য দপ্তরের মন্ত্রী ও. পি. রামন। এই উদ্যানে বিভিন্ন শ্রেণীর সাপ ও সরীসৃপজাতীয় প্রাণীর পৃথক পৃথক ঘর থাকবে।

এখানে ভারতীয় সরীসৃপদের স্বভাব-চরিত্র পর্যবেক্ষণ করা হবে এবং ঔষধাদি প্রস্তুতের প্রয়োজনে সাপের বিষ সংগ্রহ করা হবে।

প্রাকৃতিক পরিবেশে আট হেক্টর এলাকা নিয়ে এই উদ্যানটি তৈরি হয়েছে।

1971 সালের শারীরবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার

হর্মোন সম্পর্কে গবেষণার জন্যে যুক্তরাষ্ট্রের নাসভিলের ভাণ্ডারবিল্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর আর্ল উইলবার সাদারল্যাণ্ডকে শারীরবিদ্যা ও ভেষজ-বিজ্ঞানে 1971 সালের নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছে।

হর্মোনের কার্যকারিতার সূত্র আবিষ্কারের জন্যে নোবেল পুরস্কার কমিটি তাঁকে এই পুরস্কার দিয়েছেন।

55 বছর বয়স্ক ক্যান্সাস নিবাসী ডক্টর সাদারল্যাণ্ডকে নিয়ে এপর্যন্ত 40 জন আমেরিকান নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন।

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

পি 23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা-6

ত্রয়োবিংশ বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন, 1971

পরিষদ ভবন

22শে সেপ্টেম্বর '71
বুধবার, 5-30 টা

কার্যবিবরণী ও গৃহীত প্রস্তাবাবলী

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের এই ত্রয়োবিংশ বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনে মোট 31 জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের সভাপতিত্বে সভার কাজ সম্পন্ন হয়।

1. কর্মসচিবের বার্ষিক বিবরণী

পরিষদের কর্মসচিব শ্রীজয়ন্ত বসু মহাশয় এই অধিবেশনে উপস্থিত সভ্যগণকে স্বাগত জানাইয়া গত 1970-71 সালের জন্য পরিষদের বিবিধ কাজ-কর্ম ও আর্থিক অবস্থাদি সম্পর্কে তাঁহার লিখিত বার্ষিক বিবরণী পাঠ করেন। তিনি প্রারম্ভে বলেন যে, গত জুলাই মাসে পরিষদের ত্রয়োবিংশ বার্ষিক প্রতিষ্ঠা দিবস অনুষ্ঠানের সভায় পঠিত কার্যবিবরণীতে আলোচ্য বৎসরে পরিষদের বিভিন্ন কর্মপ্রচেষ্টা ও আর্থিক অবস্থাদির বিষয় বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছিল এবং তাহাই মোটামুটি ভাবে 1970-71 সালের বার্ষিক বিবরণী হিসাবে গণ্য করা যাইতে পারে। (উক্ত কার্যবিবরণী 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার অগাষ্ট'71 সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল)। যাহা হউক, তিনি পরিষদের বিবিধ কাজ-কর্ম ও আর্থিক অবস্থা বিশ্লেষণ করিয়া একটি নাতিদীর্ঘ বিবরণী দান করেন।

এই বিবরণীতে তিনি পরিষদের আদর্শানুযায়ী মাতৃভাষায় বাংলায় বিজ্ঞানের প্রচার ও প্রসার সাধনের উদ্দেশ্যে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' মাসিক পত্রিকা এবং জনপ্রিয় বিজ্ঞান পুস্তক ও বিদ্যালয়ের পাঠ্য-পুস্তক প্রকাশ, বিজ্ঞানবিষয়ক বক্তৃতার ব্যবস্থা গ্রন্থাগার ও পাঠাগার এবং হাতে-কলমে বিভাগ পরিচালনা প্রভৃতি বিভিন্ন কর্মধারা বর্ণনা করেন। এই প্রসঙ্গে পরিষদের কাজ-কর্মের মানোন্নয়নের জন্য যে সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে, তিনি সেইগুলির উল্লেখ করেন। পরিকল্পনা অনুযায়ী বিবিধ কাজের বাস্তব রূপায়ণে যে সব আর্থিক দায়-দায়িত্ব বর্তিয়াছে, তাহার ব্যাখ্যা করিয়া কর্মসচিব মহাশয় সভ্যবৃন্দের সক্রিয় সাহায্য ও সহযোগিতার জন্য আহ্বান জানান।

2. হিসাব বিবরণী ও ব্যয়-বরাদ্দ

গত 1970-71 সালের পরীক্ষিত হিসাব বিবরণী ও উদ্বর্ত-পত্র (ব্যালান্স সিট) পরিষদের কোষাধ্যক্ষ শ্রীপরিমলকান্তি ঘোষ মহাশয় সভায় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপিত করিয়া গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করেন। উপস্থিত সভ্যগণ-কর্তৃক উক্ত হিসাব-বিবরণী ও উদ্বর্ত-পত্র সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত ও গৃহীত হয়।

অতঃপর কোষাধ্যক্ষ মহাশয় পরিষদের বিদায়ী কার্যকরী সমিতি কর্তৃক রচিত ও অনুমোদিত বর্তমান 1971-72 সালের জন্য পরিষদের আনু-

মানিক ব্যয়-বরাদ্দ বা বাজেট পত্র সভ্যগণের অনুমোদনের জন্য সভায় পেশ করেন। যথোচিত আলোচনার পরে উক্ত ব্যয়-বরাদ্দ পত্র উপস্থিত সভ্যগণ কর্তৃক সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত ও গৃহীত হয়।

3. কার্যকরী সমিতি গঠন

1971-72 সালের জন্য পরিষদের নূতন কার্যকরী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ মণ্ডলী ও সাধারণ সদস্যের মনোনয়ন পত্রের চূড়ান্ত তালিকা কর্ম-সচিব মহাশয় সভার অনুমোদনের জন্য উপস্থাপিত করেন এবং সভ্যগণ কর্তৃক তাহা সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়। উক্ত তালিকা অনুযায়ী পরিষদের নূতন কার্যকরী সমিতির বিভিন্ন পদে ও সাধারণ সদস্যরূপে নিম্নলিখিত সভ্যগণ সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত হইলেন বলিয়া সভায় ঘোষিত হয়।

কার্যকরী সমিতি

কর্মাধ্যক্ষমণ্ডলী ঃ

সভাপতি—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু
সহঃ সভাপতি—শ্রীঅজিতকুমার সাহা
শ্রীঅনাদিনাথ দাঁ
শ্রীঅমূল্যধন দেব
শ্রীঅসীমা চট্টোপাধ্যায়
শ্রীআশুতোষ গুহঠাকুরতা
শ্রীবলাইচাঁদ কুণ্ডু
শ্রীমৃণালকুমার দাশগুপ্ত
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মৈত্র
শ্রীসতীশরঞ্জন খাস্তগীর
কোষাধ্যক্ষ—শ্রীজয়ন্ত বসু
কর্মসচিব—শ্রীপরিমলকান্তি ঘোষ
সহযোগী কর্মসচিব—শ্রীরবীন বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীশ্যামসুন্দর দে

সাধারণ সদস্য

1. শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য
2. শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল ভাদুড়ী
3. শ্রীদিলীপকুমার ঘোষ
4. শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস
5. শ্রীব্রহ্মানন্দ দাশগুপ্ত
6. শ্রীমণীন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়
7. শ্রীরমাপ্রসাদ সরকার
8. শ্রীরমেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র
9. শ্রীরাধাকান্ত মণ্ডল
10. শ্রীরুদ্রেন্দ্রকুমার পাল
11. শ্রীশঙ্কর চক্রবর্তী
12. শ্রীসমীরকুমার ঘোষ
13. শ্রীসুনীলকুমার সিংহ
14. শ্রীসূর্যেন্দুবিকাশ কর
15. শ্রীহেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

4. ন্যাসরক্ষক নির্বাচন

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের ন্যাসরক্ষক মণ্ডলীর অন্যতম সভ্য হিসাবে শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল ভাদুড়ীর নাম শ্রীরুদ্রেন্দ্রকুমার পাল কর্তৃক প্রস্তাবিত ও শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মৈত্র কর্তৃক সমর্থিত হয়। উক্ত প্রস্তাব অতঃপর সভায় সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত ও গৃহীত হয়।

5. হিসাব-পরীক্ষক নির্বাচন

পরিষদের বিভিন্ন তহবিলের 1971-72 সালের হিসাব-পত্র পরীক্ষা করিবার জন্য হিসাব পরীক্ষক (অডিটর) রূপে পরিষদের পূর্বতন হিসাব পরীক্ষক মেসার্স মুখার্জী, গুহঠাকুরতা অ্যাণ্ড কোং, চার্টার্ড অ্যাকাউন্টস-এর নাম প্রস্তাবিত হয় এবং তাহা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

6. অনুসঙ্গ স্মারক-পত্র এবং বিধি ও নিয়মাবলী

পশ্চিমবঙ্গ সোসাইটি অ্যাক্ট অনুসারে পরিষদের রেজিস্ট্রীকৃত অনুসঙ্গ স্মারক-পত্র এবং বিধি ও নিয়মাবলীর প্রয়োজনানুরূপ সংশোধনের খসড়া (কার্যকরী সমিতির 25. 8. 71 তারিখের অধিবেশনে প্রস্তাবিত) কর্মসচিব মহাশয় সভায় উপস্থাপিত করেন এবং যথোচিত আলোচনার

পরে উক্ত সংশোধন উপস্থিত সভ্যগণ কর্তৃক সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত ও গৃহীত হয়।

7. অনুমোদক মণ্ডলী নির্বাচন

পরিষদের নিয়মতন্ত্রের বিধান অনুসারে এই বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনের কার্যবিবরণী ও গৃহীত প্রস্তাবলীর অনুলিপি চূড়ান্তভাবে অনুমোদনের জন্ম নিম্নলিখিত সদস্যগণ অনুমোদক হিসাবে সভায় সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত হয়।

1. শ্রীদিলীপকুমার ঘোষ
2. শ্রীব্রহ্মানন্দ দাশগুপ্ত
3. শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল ভাদুড়ী
4. শ্রীরাধাকান্ত মণ্ডল
5. শ্রীরমেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র

নিয়মানুসারে অধিবেশনের সভাপতি ও পরিষদের কর্মসচিব সহ উপরিউক্ত নির্বাচিত পাঁচজন অনুমোদকের দ্বারা এই অধিবেশনের কার্য-বিবরণী ও গৃহীত প্রস্তাবাবলী অনুমোদিত ও স্বাক্ষরিত হইলে—তাহা চূড়ান্তভাবে গৃহীত বলিয়া গণ্য হইবে।

8. সভাপতির ভাষণ

পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় উপস্থিত সভ্যগণকে ও অন্যান্য ব্যক্তিদের পরিষদের প্রতি তাঁহাদের শুভেচ্ছা ও সহযোগিতার জন্ম ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। দেশের বর্তমান অবস্থায় বিজ্ঞান শিক্ষা ও বিজ্ঞান প্রচারের মত গঠনমূলক কাজের সবিশেষ গুরুত্ব সম্পর্কে তিনি বিশদ আলোচনা করেন।

পশ্চিমবঙ্গে বাংলা ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান শিক্ষার জন্ম যে সকল সরকারী উত্যোগ পরিলক্ষিত হইতেছে, সেগুলিকে স্বাগত জানাইয়া তিনি বলেন যে, গত 23 বৎসর যাবৎ বিজ্ঞান পরিষদ অনুরূপ কার্যে নিয়োজিত রহিয়াছে; এবং পরিষদের নিজস্ব ভবন নির্মাণের পর অমরেন্দ্রনাথ বসু স্মৃতি পাঠাগার, হাতে-কলমে বিভাগ, বিজ্ঞানবিষয়ক বক্তৃতা প্রভৃতির মাধ্যমে পরিষদের কার্যাদি ক্রমশঃ ব্যাপক ও বিস্তৃত হইয়া উঠিয়াছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে সরকারী উদ্যোগগুলিতে পরিষদকে তাহার যথাযথ ভূমিকা পালনের দায়িত্ব অর্পণ করা হইবে বলিয়া তিনি আশা প্রকাশ করেন। সর্বস্তরে মূল্য বৃদ্ধির ফলে পরিষদের আর্থিক অনটনের বিষয় উল্লেখ করিয়া তিনি পরিষদের প্রত্যেক সভ্যকে বৎসরান্তে অন্ততঃ একদিনের আয় পরিষদকে দান করিবার জন্ম আহ্বান জানান।

ধন্যবাদ জ্ঞাপন

শ্রীরুদ্রেন্দ্রকুমার পাল পরিষদের সভাপতি, কর্মসচিব ও কোষাধ্যক্ষ এবং কার্যকরী সমিতির অন্যান্য সদস্যগণকে আলোচ্য বছরে পরিষদের কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্ম আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। উপস্থিত সভ্যদিগকেও তাঁহাদের সহযোগিতামূলক মনোভাবের জন্ম তিনি ধন্যবাদ প্রদান করেন।

সত্যেন বোস
সভাপতি
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

জয়ন্ত বসু
কর্মসচিব
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

অনুমোদক মণ্ডলীর স্বাক্ষর

1. দিলীপকুমার ঘোষ 2. ব্রহ্মানন্দ দাশগুপ্ত 3. জ্ঞানেন্দ্রলাল ভাদুড়ী
4. রাধাকান্ত মণ্ডল 5. রমেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র

প্রধান সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য
শ্রীমিহিরকুমার ভট্টাচার্য কর্তৃক পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-6 হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেস 37/7 বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত।

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

চতুর্বিংশ বর্ষ | ডিসেম্বর, 1971 | দ্বাদশ সংখ্যা

[শ্বেতিরোগে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ক্রমশঃই বৃদ্ধির দিকে চলেছে। শরীরের প্রকাশ্য স্থানে শ্বেতিরোগের আক্রমণ হলে রোগী স্বভাবতঃই মানসিক অশান্তির কবলে পড়ে। সময়ে সময়ে এর ফলে গুরুতর মনোবিকারও ঘটে থাকে। এই রোগের উৎপত্তির কারণ ও প্রতিকার সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরা অনেককাল ধরেই অনুসন্ধান চালিয়ে আসছেন। কিন্তু এখনও পর্যন্ত এই রোগোৎপত্তির প্রকৃত রহস্য উদ্ঘাটিত হয় নি। বর্তমান প্রসঙ্গে এই রোগের উৎপত্তির কারণ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক গবেষণার মোটামুটি বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে]

শ্বেতিরোগের উৎস-সন্ধানে

শ্রীসুধাংশুব্রত মণ্ডল ও শ্রীঅজিতকুমার দত্ত*

অবস্থার বিচারে দেহচর্মে আবির্ভূত সকল প্রকার সাদা দাগ বা রোগচিহ্নকেই শ্বেতি বলা যায়। আবার আক্ষরিক অর্থে vitiligo ও lucoderma এই উভয় শব্দের দ্বারাই শ্বেতিকে বোঝানো হয়। সে জন্যে প্রয়োগ-ক্ষেত্র ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে দুই শ্রেণীর শ্বেতিকে পৃথকভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এভাবে চর্মরোগের চিকিৎসাশাস্ত্রে vitiligo শব্দের দ্বারা সেই সাদা

* স্নাতকোত্তর চর্মরোগ বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

দাগকেই শুধুমাত্র নির্দেশ করা হয়, যার কারণ অজ্ঞাত এবং যার আবির্ভাব ঘটে জন্মের পরে। তাছাড়া পুড়ে যাবার ফলে অথবা ছুলি, কালাজ্বর, উপদংশ, কুষ্ঠ প্রভৃতি একাধিক রোগের অনুষঙ্গরূপে কিংবা রবারের চটি, সিঁদুর, লিপষ্টিক, কুমকুম প্রভৃতির সংস্পর্শজনিত রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ার ফলে যে সাদা দাগ বা শ্বেতি সংঘটিত হয়, তাকে secondary lucoderma রূপে চিহ্নিত করা হয় (1নং ও 2নং চিত্র দ্রষ্টব্য)।

কার্যক্ষমতা, বুদ্ধিমত্তা অথবা জীবনকালেরও কোন হেরফের ঘটে না। অথচ যে কোন চর্মরোগ অপেক্ষা এই সব রোগীদের ক্ষেত্রে মনের উপর অত্যধিক প্রতিক্রিয়া দেখা যায়, যার ফলে সময় সময় রোগীর মানসিক বৈকল্যও ঘটতে পারে। বস্তুতঃ সমাজ-জীবনে মানুষের অহেতুক আতঙ্ক ও ঘৃণা থেকেই এই প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। এই দুর্ভাগ্যজনক সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীর জন্যে দায়ী প্রকৃতপক্ষে রোগ সম্বন্ধে বহুকালব্যাপী

1নং চিত্র
শ্বেতিরোগের (Vitiligo) আলোকচিত্র। রোগীর দুই পায়ে রোগচিহ্ন দেখা যায়।

প্রথমোক্ত শ্রেণীর শ্বেতি বা vitiligo এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। এর প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধির ফলে (মোট চর্মরোগের 4·9 শতাংশ) ইদানীং পথেঘাটে প্রায়ই এরূপ শ্বেতিরোগীর সাক্ষাৎ মেলে। বস্তুতঃ এই শ্বেতিরোগ গাত্রচর্মের বর্ণবৈকল্যজনিত সমস্যাদির মধ্যে অন্যতম। নিদানিক বৈশিষ্ট্যের বিচারে শ্বেতিরোগের দ্বারা আক্রান্ত ত্বকের অংশবিশেষে একমাত্র সাদা দাগ ছাড়া অন্য কোন প্রকার পরিবর্তন ঘটে না। এমন কি, অন্যান্য চর্মরোগের মত আনুষঙ্গিক রোগলক্ষণও থাকে না। এই রোগের দ্বারা রোগীর

মানুষের ভ্রান্ত ও বিকৃত ধারণার প্রচার ও প্রসার। আসলে এখনও পর্যন্ত পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে জনসাধারণের মধ্যে শ্বেতিরোগ শ্বেতকুষ্ঠ বা ধবলকুষ্ঠ (White leprosy) নামে পরিচিত। এমন কি, 1400 খৃঃ পূর্বাব্দ পর্যন্ত অথর্ব বেদেও এই রোগ কুষ্ঠরোগ নামে উল্লেখিত আছে। প্রাচীন ত্রয়োদশ শতাব্দীর মিশরীয় ধর্মগ্রন্থাদিতেও শ্বেতিরোগের উল্লেখ পাওয়া যায়।

যেমন রোগীদের কাছে, তেমনিই সারা পৃথিবীব্যাপী রোগ-বিশেষজ্ঞদের কাছেও এই রোগ সমান উদ্বেগের বিষয়। কারণ বহুকাল

ধরে এর উৎস সন্ধানের পরেও আজ অবধি খুব একটা আশাপ্রদ আলোর সংকেত পাওয়া যায় নি। তবুও এর মধ্যে দীর্ঘ প্রসারিত অনুসন্ধানের বিনিময়ে যে সকল তথ্য জানা গেছে, তারই আলোকে এর উৎসঘটিত বৃত্তান্ত বিশ্লেষণের উদ্দেশ্যেই আলোচ্য প্রবন্ধের অবতারণা করা হয়েছে।

শারীরবৃত্তের পরিপ্রেক্ষিতে এই তথ্য সুবিদিত যে, বিভিন্ন মানুষের চর্মের বিভিন্ন বর্ণ প্রকাশের পশ্চাতে melanin, melanoid, haemoglobin ও carotene প্রভৃতি যে সকল জৈব রাসায়নিকের অবদান রয়েছে, তাদের মধ্যে মেলানিনের ভূমিকা প্রধানতম। গায়ের রঙের বিভিন্নতাও মুখ্যতঃ এই মেলানিনের পরিমাণের উপর নির্ভরশীল। তাছাড়াও মেলানিনের অবশ্য ভিন্ন কার্যকারিতা রয়েছে। সারা দেহের চর্মে বিস্তৃত এই মেলানিন ছাতার মত সূর্যাতপ নিয়ন্ত্রণের কাজেও যথেষ্ট সহায়তা করে।

প্রকৃতপক্ষে দেহচর্মের অংশবিশেষে এই মেলানিনের রহস্যজনক অনুপস্থিতিই শ্বেতিরোগের মূল কারণ। সুতরাং মেলানিনের অন্তর্ধানের কারণ অনুসন্ধানের আগে বরং এর স্বাভাবিক উৎপত্তি ও প্রসার সম্পর্কে আলোচনা করা প্রাসঙ্গিক হবে।

2 নং চিত্র

Secondary lucoderma রোগের আলোকচিত্র। দুই পায়ে রোগচিহ্ন দেখা যাচ্ছে। রবারের চটির সংস্পর্শে এই রোগের সৃষ্টি হয়েছে।

মেলানিনের উৎস

ত্বকে উপস্থিত মেলানোসাইট জীবকোষই আসলে মেলানিন (Melanin) উৎপাদনের আধার। চর্মের দুই মূল অংশ—ঊর্ধ্বত্বক (Epidermis) এবং অধস্ত্বক (Dermis) এদের সংযোগ-সীমা চিহ্নিত হয় basement ঝিল্লীর দ্বারা। এই basement ঝিল্লীর উপর বরাবর সুবিন্যস্ত অবস্থায় ত্বকের সর্বাংশে বিস্তৃত রয়েছে ঊর্ধ্বত্বকের সর্বনিম্ন অংশ বা মূলস্তর (Basal layer)। আঁকাবাঁকা ঢেউয়ের আকারে 'বেসাল-জীবকোষ' দিয়ে রচিত এই স্তরের মধ্যেই উপস্থিত রয়েছে মেলানোসাইট

জীবকোষ। 3নং চিত্রে মানুষের দেহচর্মের অংশবিশেষের আণুবীক্ষণিক চিত্ররূপ প্রদর্শিত হয়েছে, যেখানে কেন্দ্রীনবিহীন শূন্যগর্ভ জীবকোষগুলি নির্দেশ করছে মেলানোসাইটের অবস্থান। প্রায় প্রতি 5 থেকে 10টি জীবকোষের ব্যবধানে বেসাল-জীবকোষের মাঝে মাঝে কীলকের মত আঁকড়ে আছে 1টি করে মেলানোসাইট জীবকোষ। একাধিক শুঁড়বিশিষ্ট (Dendrites) এই সকল মেলানোসাইট (4নং চিত্র দ্রষ্টব্য) জীবকোষের মধ্যেই উৎপন্ন হয় মেলানিন নামক জৈব রাসায়নিক পদার্থ। বিভিন্ন গাত্রবর্ণের মানুষের ত্বকে কিন্তু এই জীবকোষের উপস্থিতির মোট সংখ্যার বিশেষ পার্থক্য দেখা যায় না। আসলে এই জীবকোষের মেলানিন উৎপাদনের তারতম্যই হলো মূল কথা। যেমন, কৃষ্ণকায় (নিগ্রো) মানুষের ত্বকে অবস্থিত মেলানোসাইট জীবকোষের মেলানিন উৎপাদনের ক্ষমতা খুবই বেশী। কিন্তু শ্বেতকায়দের ক্ষেত্রে এই ক্ষমতা খুবই সীমিত। সে জন্যেই বর্ণের এই বিভিন্নতা।

3 নং চিত্র
ত্বকের অংশবিশেষের আণুবীক্ষণিক চিত্ররূপ এবং মেলানোসাইট জীবকোষের অবস্থান।

মেলানিন উৎপাদন-প্রক্রিয়া

মেলানোসাইট জীবকোষগুলি ক্ষরণধর্মী (Secretory) শ্রেণীভুক্ত। সূচনায় এই কোষগুলি তাদের অভ্যন্তরে cytoplasm-এর মধ্যে মেলানোসোম নামে একপ্রকার বিশেষ সূক্ষ্ম বস্তুকণার সৃষ্টি করে। আবার এই মেলানোসোম মধ্যেই নিহিত থাকে tyrosinase নামে এক প্রকার অনুঘটক। 4নং চিত্রে মেলানোসাইট ও মেলানোসোমকে পৃথকভাবে চিত্রিত করা হয়েছে। এই tyrosinase অনুঘটকের উপস্থিতিতে ও অক্সিজেনের সহায়তায় দেহের অভ্যন্তরে অবস্থিত tyrpsine নামে যে প্রথম শ্রেণীভুক্ত অ্যামিনো অ্যাসিড রয়েছে, তা বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্য দিয়ে পরিশেষে মেলানিনে রূপান্তরিত হয়। এভাবে উৎপন্ন মেলানিন অতঃপর মেলানোসোমে আশ্রয় নেয়। বিভিন্ন প্রকার উত্তেজনার দ্বারা সংকোচনের ফলে মেলানোসাইটের আভ্যন্তরীণ মেলানিনযুক্ত মেলানোসোম শেষ পর্যন্ত জীবকোষের শুঁড় বা dendron-এর মধ্য দিয়ে বের হয়ে আসে। নির্গত এই সব মেলানোসোম ঊর্ধ্বত্বকের কাছাকাছি নির্দিষ্ট সংখ্যক জীবকোষের মধ্যে প্রবেশ করে। এভাবে ঊর্ধ্বত্বকের বহু সংখ্যক জীবকোষে স্থান নিয়ে বিস্তৃত এই মেলানিনই দেহবর্ণ রক্ষায় প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে।

Tyrosine থেকে মেলানিনের রূপান্তরের

সুনির্দিষ্ট ও পর্যায়ক্রমিক পরিবর্তনের স্তর সম্পর্কে সঠিকভাবে এখনও জানা যায় নি। Mason, Nicolaus, Prota প্রমুখ অভিজ্ঞ গবেষক

কোষের মধ্যে অবস্থিত মেলানোসোম
পৃথকভাবে চিত্রিত মেলানোসোম
(সূক্ষ্ম বিন্দুগুলি উৎপন্ন মেলানিন-এর অবস্থান নির্দেশ করছে)
TYROSINASE
Tyrosine → DOPA → Melanin

4 নং চিত্র
মেলানোসাইট, মেলানোসোম এবং মেলানিন উৎপাদন প্রক্রিয়া।
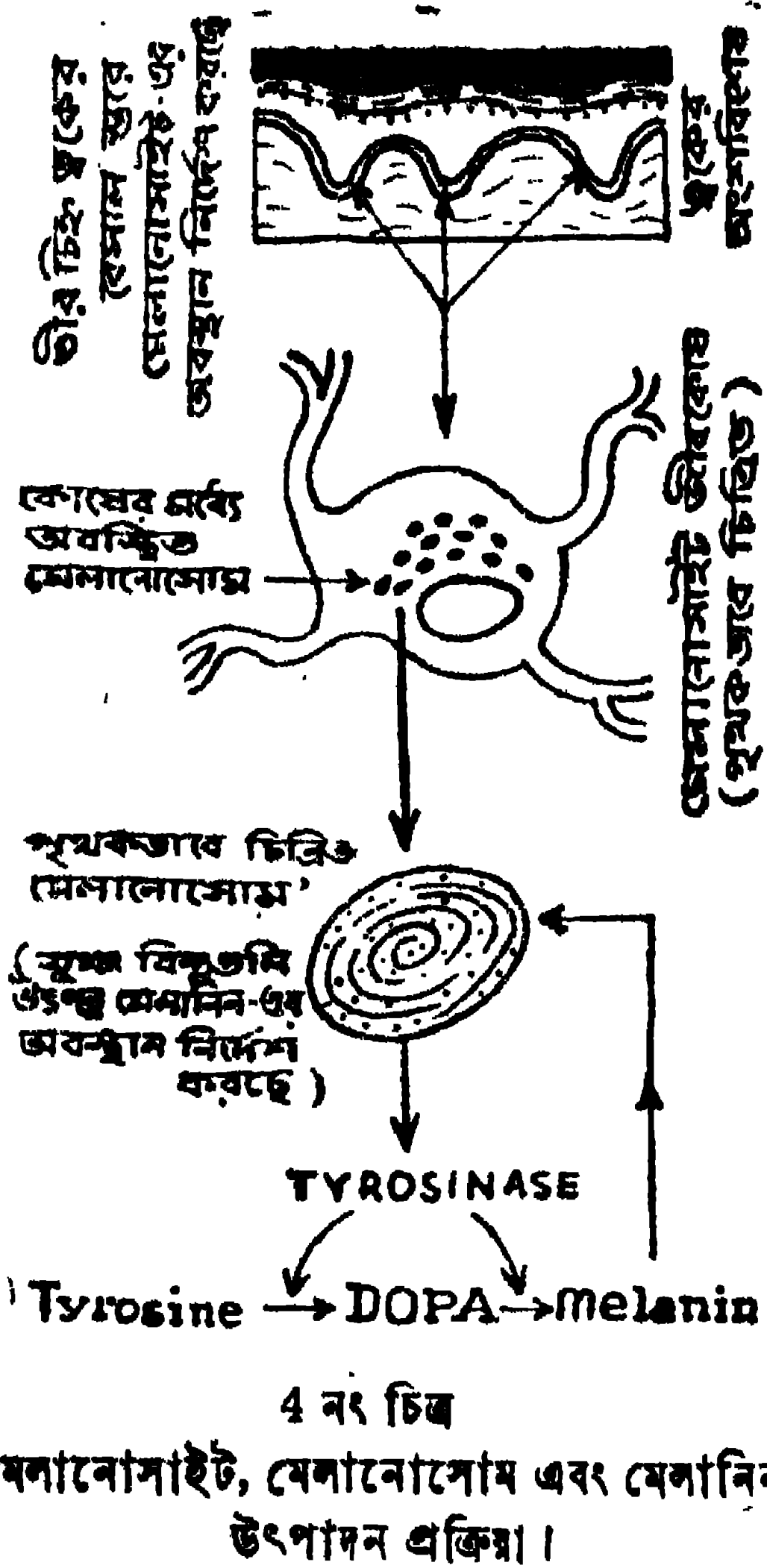
এই বিষয়ে যথেষ্ট আলোকপাত করেছেন। মোটামুটিভাবে স্বীকৃত হয়েছে যে, tyrosine যথাক্রমে DOPA → DOPA-Quinone → DOPA-Chrome → 5, 6 di-hydroxy indole → indole 5, 6-Quinone প্রভৃতি পর্যায়ের মধ্য দিয়ে চূড়ান্ত পর্যায়ে মেলানিনে রূপান্তরিত হয়। কিন্তু অন্তর্বর্তী পর্যায়ে আরো একাধিক যৌগিক পদার্থের আবির্ভাব ঘটে, যেগুলি অস্থায়ী ও যাদের চারিত্রিক ধর্ম ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে প্রামাণ্য তথ্য এখনও জানা সম্ভব হয় নি। আর এই ব্যাপারেই বিশেষ করে গবেষকদের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা যায়।

যাহোক, দেখা যাচ্ছে, মেলানোসোমরূপী সূক্ষ্ম বস্তুকণাগুলি প্রকৃতপক্ষে উৎপন্ন মেলানিনের আধার হিসাবে কাজ করে। এই মেলানোসোমসমূহ melanocyte জীবকোষের অভ্যন্তরে কেন্দ্রীনের উপরিভাগে টুপীর মত একত্রে জমাট বেঁধে থাকে। আগেই বলা হয়েছে যে, উপযুক্ত উত্তেজনার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হলে মেলানিন বহির্মুখী হয়। কোষের অভ্যন্তরে মেলানিন কণাসমূহের একত্রে সমাবেশ ও বহির্গমন—এই দ্বিবিধ বিপরীতমুখী ক্রিয়ার যথাযথ ভারসাম্যের দ্বারাই দেহচর্মে মেলানিনের স্বাভাবিক শারীরবৃত্তিক ক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত হয়। আর কোন কারণে এই ভারসাম্যের ব্যাঘাত ঘটলে দেহচর্মে বর্ণবৈকল্য (অর্থাৎ মেলানিনের অভাবজনিত সাদা রং বা এর আধিক্যজনিত কালো রং) অবশ্যই দেখা দিতে পারে। ব্যাঙের দেহচর্ম পরীক্ষা করে জানা গেছে—α ও β MSH (Melanocyte stimulating hormone), ACTH (Adrenocorticotrophic hormone), Progesterone, Caffeine, Apresolin, Mesantoin, Mersilid ইত্যাদি বস্তুসমূহ এই মেলানিন কণার একত্রে সন্নিবেশের ব্যাপারে অংশ নেয়, আর এদের জীবকোষের বাইরে নির্গত হতে সাহায্য করে—Nor-adrenaline, Adrenaline, Acetylcholine, Serotonin, Melatonin, Tri-iodo-thyroxine প্রভৃতি বস্তুসমূহ। অবশ্য মানুষের দেহে এদের কার্যকারিতা এখনও নির্ধারণ করা সম্ভব হয় নি।

মেলানোসাইট (Melanocyte) জীবকোষ প্রসঙ্গে

Berzelius-এর কার্যকাল 1840 সাল থেকে সুরু করে আজ পর্যন্ত শতাধিক বছরের প্রচেষ্টার পরেও মেলানিন সম্পর্কে জ্ঞাত তথ্য যেমন হতাশাব্যঞ্জক, মেলানোসাইট জীবকোষের উৎস-

মূল সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞানের অভাবও ঠিক সমান দুর্ভাগ্যজনক। কারণ সমস্যাসঙ্কুল এই শ্বেতি বা vitiligo রোগ সৃষ্টির পশ্চাতে মেলানিন তথা মেলানোসাইটের যে নির্দিষ্ট ভূমিকা রয়েছে—এই তথ্য আজ সর্বত্র স্বীকৃত; অর্থাৎ এই মেলানোসাইটের উৎস তাই স্বভাবতঃই অনেক অজানা রহস্যের কিনারা করতে সক্ষম, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ গবেষকবৃন্দ এখনও এই সম্পর্কে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সক্ষম হন নি। এই বিষয়ে গবেষক-বিজ্ঞানীদের মতামত দুই ভাগে বিভক্ত। একদলের মতে, neural crest থেকেই এই মেলানোসাইটের আবির্ভাব ও প্রান্তীয় স্নায়ুর সঙ্গে নির্দিষ্ট স্থান অর্থাৎ চর্মাংশে গমন। দ্বিতীয় দলের বিশ্বাস—ঊর্ধ্বত্বকের নিম্নতম স্তর অর্থাৎ basal layer থেকেই এর জন্ম। প্রথমোক্ত ধারণার সমর্থকদের মধ্যে আছেন Langerhans (1868), Pautrier (1928), Zimerman (1946), Moson (1948), Fitzpatrick (1952), Szabo (1954), Zelickson ও Hartman (1961) প্রভৃতি মনিষীবৃন্দ। তাছাড়া আবার Aaron Lerner-ও 1955 এবং 1959 সালে বিভিন্ন তাত্ত্বিক ও কিছু প্রামাণ্য তথ্যের দ্বারা এই মত সমর্থন তথা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে বেশ জোরালো বক্তব্য উপস্থাপিত করেছেন। কিন্তু অপর মত সমর্থকদের দলে আছেন আবার বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী Arthur Allen, যিনি তাঁর স্বতন্ত্র ধারণা প্রমাণের অনুকূলে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি উপস্থাপিত করছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে এমন অনেক যুক্তি ও তথ্যের অবতারণা করেছেন, যার দ্বারা প্রথমোক্ত মতের নির্ভুলতা সম্পর্কে নানান সংশয় দেখা যায়। তাছাড়াও রয়েছে আর এক তৃতীয় দল, যাঁদের বিশ্বাস ত্বকে অবস্থিত mast cell থেকেই মেলানোসাইট জীবকোষের উৎপত্তি। যাহোক, মতের বিভিন্নতা সত্ত্বেও এখনও পর্যন্ত কিন্তু মোটামুটিভাবে neural crest থেকে মেলানোসাইটের উৎসজনিত তত্ত্বটিই অধিকতর গ্রাহ্য বলে বিবেচিত হয়।

রোগের কারণ প্রসঙ্গে

বহুকাল ধরে বহু গবেষক বিজ্ঞানী এই শ্বেতি-রোগের কারণ অনুসন্ধানে ব্যাপৃত রয়েছেন। রোগের বিভিন্ন নিদানিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে অনুমানসাপেক্ষ নানান সূত্র ধরে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে চূড়ান্ত ফল লাভ হয় নি ঠিকই, তবে আজ অবধি এই তথ্য নিশ্চিতভাবে জানা গেছে যে, শ্বেতিরোগগ্রস্ত অংশের ত্বকে বর্ণবৈকল্যের মূল কারণ হচ্ছে মেলানিনের অভাব। আর এই মেলানিনের অনুপস্থিতি বা অভাবের কারণ কিন্তু মেলানোসাইট জীবকোষের সংখ্যাল্পতা নয়; বরং সম্ভবতঃ এই জীবকোষের অভ্যন্তরে উপস্থিত মেলানোসোমে উৎপন্ন ও সঞ্চিত tyrosinase নামে অনুঘটকের (Enzyme) নিষ্ক্রিয়তা বা কর্মতৎপরতার হ্রাসপ্রাপ্তি। Block অনুসৃত পদ্ধতিতে DOPA-র দ্বারা পরীক্ষার ফল হিসাবে ঋণাত্মক প্রতিক্রিয়া (Negative-reaction) এই ঘটনার সত্যতা সঠিকভাবে প্রমাণ করেছে। সম্ভবতঃ মেলানোসাইট জীবকোষের আকৃতি বা প্রকৃতিগত অস্বাভাবিকতাই এর জন্যে প্রধানতঃ দায়ী। এই অস্বাভাবিকতার দায়িত্ব আবার gene-এর প্রভাবের উপর আরোপিত করবার প্রয়াস লক্ষণীয়—যদিও এর সঠিক প্রকৃতি এখনও সম্পূর্ণ রহস্যাবৃত। তাছাড়া আজ পর্যন্ত অনেক তত্ত্বই উপস্থাপিত হয়েছে, যার মধ্যে অনেকগুলিই শুধু কল্পনাভিত্তিক এবং এগুলির মধ্য দিয়ে মতানৈক্যের বিবিধ ছবিও স্পষ্টভাবেই প্রতীয়মান হতে দেখা যায়। সুতরাং বিস্তৃত বিবরণসাপেক্ষ ও বিতর্কমূলক আলোচনা পরিহার করে শুধুমাত্র প্রাসঙ্গিক কিছু উপস্থাপিত তত্ত্ব ও তথ্যের সারাংশই এখানে উল্লেখ করা বাঞ্ছনীয় হবে, যেগুলি বিশেষ করে এই শ্বেতিরোগের

কারণতাত্ত্বিক ঘটনার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। যেমন—

(1) পুষ্টির গোলযোগ সংক্রান্ত অথবা বিপাকক্রিয়ার বৈকল্য :—কারণস্বরূপ উল্লেখিত হয়েছে খাদ্যে প্রোটিনের ঘাটতি; আন্ত্রিক-গোলযোগ (বিশেষতঃ কৃমিঘটিত, পাকস্থলীতে অম্লের অভাবজনিত কিংবা যকৃতের গোলযোগ ঘটিত) এবং দেহে copper-এর ঘাটতির কথাও এই সঙ্গে উল্লেখিত হয়েছে। মোটামুটিভাবে 1945 সাল থেকে 1965 সাল পর্যন্ত অনেক বিজ্ঞানী-গবেষক এই বিষয়ে পরীক্ষা চালিয়েছেন। কিন্তু খুব সন্তোষজনক ফল লাভ হয় নি।

(2) Endocrine বা অন্তঃস্রাবী গ্রন্থির বৈকল্য :—Addison-এর রোগ, Hyperthyroidsm, বহুমূত্র প্রভৃতি বিবিধ রোগের সঙ্গে শ্বেতিরোগের সহঅবস্থানের ভিত্তিতেই এই ধারণার উৎপত্তি। কিন্তু এই সম্পর্কে প্রামাণ্য তথ্যের ভিত্তি খুবই অকিঞ্চিৎকর।

(3) বিষক্রিয়াঘটিত :—মেলানিন-বিধ্বংসী কোন এক বিষাক্ত রাসায়নিক বা toxin-এর কাল্পনিক অবস্থানের ভিত্তিতেই এই তত্ত্ব উপস্থাপনের চেষ্টা হয়েছে।

(4) জীবাণু-ঘটিত :—প্রধানতঃ ছত্রাক ও ভাইরাসকে শ্বেতিরোগ সৃষ্টিকারী বলে অভিযুক্ত করলেও এর সত্যতা সঠিকভাবে প্রমাণ করা সম্ভব হয় নি।

(5) Autoimmunology সংক্রান্ত :—রক্তে মেলানিন-বিরোধী antibody নির্ধারণের অনুসরণে এই তাত্ত্বিক সূত্র উপস্থাপিত করা হয়েছে।

(6) স্নায়ু-সংক্রান্ত তত্ত্ব :—আপেক্ষিক বিচারে এই স্নায়ু-বৈকল্যজনিত তত্ত্বই এখনও পর্যন্ত সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়। প্রাসঙ্গিক তত্ত্বে রোগের নিদানিক বৈশিষ্ট্যসমূহ ও পরীক্ষামূলক পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে প্রান্তীয় সমবেদী (Peripheral sympathetic) স্নায়ুর ভারসাম্যহীনতার বিষয়কে শ্বেতিরোগের কারণ-রূপে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ আরো বলা হয়েছে, sympathetic hypotonia কিংবা cholinergic nerve-এর বর্ধিত কর্মতৎপরতাই কোন না কোন উপায়ে মেলানিন উৎপাদনের স্বাভাবিক ক্রিয়াকে ব্যাহত করে। সমবেদী স্নায়ুপ্রান্তে অধিকমাত্রায় উৎপন্ন মেলাটোনিন নামে বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ (পূর্বেই যার বিষয় উল্লেখিত হয়েছে) সম্ভবতঃ এই বিঘ্ন সৃষ্টি করে। তাছাড়াও বলা হয়েছে, সম্ভবতঃ কোষের স্তরে MSH (Melanocyte stimulating hormone)-এর ক্রিয়া বন্ধ হবার ফলেও এই মেলানিন উৎপাদন ব্যাহত হতে পারে।

উপসংহার

শ্বেতিরোগের উৎস-সন্ধানের পথে আজ পর্যন্ত যে সকল তাত্ত্বিক সূত্র বা তথ্যাদি উপস্থাপিত হয়েছে, তাদের মধ্যে স্নায়ুতন্ত্র-সংশ্লিষ্ট তত্ত্বটি সর্বাধিক মানুষের মনোযোগ আকর্ষণে সক্ষম হয়েছে। অপেক্ষাকৃত অধিকতর গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হবার ফলে এই তত্ত্বকে সামনে রেখে অনুপ্রাণিত বহু গবেষক এ-পর্যন্ত এই রহস্য সন্ধানের মরুভূমিতে অবতীর্ণ হয়েছেন। তাছাড়া স্নায়ুতন্ত্রকেন্দ্রিক তত্ত্বের ভিত্তিতে অনুসন্ধানের দ্বারা বিভিন্ন গবেষকের প্রতিবেদন থেকে আজ অবধি যে সব তথ্যাদি পাওয়া গেছে, তার ফলাফলও আশাব্যঞ্জক। কিন্তু তবুও চূড়ান্ত ফলাফলের জন্যে আরো সতর্কতার সঙ্গে অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন। ধৈর্য ও সাধনার বিনিময়ে এই সমস্যার সমাধান করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব ও মহান কর্তব্য। কারণ ইতিমধ্যেই আমাদের দেশে এই শ্বেতিরোগের প্রাদুর্ভাব বেড়ে চলেছে। আর এভাবে বহু রোগাক্রান্ত মানুষ সমাজের ঘৃণা ও লাঞ্ছনার মধ্যে দিনাতিপাত করে চলেছে। ক্ষেত্রবিশেষে আবার কোন কোন

রোগী গভীর উদ্বেগের ভারে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে আরো দুর্ভাগ্যজনক পরিণতির দিকে এগিয়ে চলেছে। রোগের সঠিক কারণ অনাবিষ্কৃত থাকবার ফলে স্বভাবতঃই সুষ্ঠু চিকিৎসার পথও রয়েছে অবরুদ্ধ। বর্তমান পটভূমিকায়, পৃথিবীব্যাপী যে চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রচলন আছে, তা প্রায় অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়বারই সামিল। অবশ্য এই চিকিৎসা যে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ, তা নয়। অনেক ক্ষেত্রেই, বিশেষতঃ অভিজ্ঞতায় যারা সুসংস্কৃত চিকিৎসার ফলে বহু ক্ষেত্রেই অত্যাশ্চর্য সুফল পাওয়া যায়। তথাপি এই সুফল প্রাপ্তির পশ্চাতেও যে কলাকৌশল রয়েছে, তাও আমাদের জ্ঞানের সীমানার অন্তরালে রহস্যাবৃত। সেই সব রহস্য সন্ধানের পথে অনেক তথ্যই যেমন জানা গেছে, তেমনি আবার জানাও যায় নি অনেক কিছুই। সেই সব অজানিত রহস্য যত সত্বর উদ্‌ঘাটিত হবে, ততই মানুষের পক্ষে মঙ্গলদায়ক হবে।

নাইলন

শ্রীতুহিনেন্দু সিন্‌হা*

বর্তমান যুগে নাইলনের সঙ্গে প্রায় সকলেরই পরিচয় আছে। দৈনন্দিন জীবনে নাইলনের নানা জিনিষ আমরা ব্যবহার করে থাকি। আমাদের ব্যবহারিক জীবনে যার এত প্রয়োগ, সেই জিনিষটি আসলে কি?

নাইলন সম্বন্ধে কোন কিছু আলোচনা করবার আগে আমাদের দুটি বিষয় সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা থাকা দরকার। প্রথমতঃ এস্টার। যখন কোন জৈব অথবা অজৈব অ্যাসিড অ্যালকোহলের সঙ্গে বিক্রিয়া করে এবং বিক্রিয়ার জলের অণু বিযুক্ত হয়ে যে যৌগ গঠিত হয়, তাই এস্টার। অ্যালকোহল যখন অজৈব অ্যাসিডের সঙ্গে বিক্রিয়া করে, তখন অজৈব এস্টার তৈরি হয়, অনুরূপভাবে জৈব অ্যাসিডের সঙ্গে বিক্রিয়া করে জৈব এস্টার তৈরি করে। উদাহরণস্বরূপ—

$$CH_3CH_2OH + HCl \rightleftharpoons CH_3CH_2Cl + H_2O$$

অজৈব এস্টার
(ইথাইল ক্লোরাইড)

$$CH_3CH_2OH + CH_3COOH \rightleftharpoons CH_3COO\,C_2H_5 + H_2O.$$

জৈব এস্টার
(ইথাইল অ্যাসিটেট)

এবার আমরা পলিমারিজেশন (Polymerisation) এবং পলিমার (Polymer) কি, সেই সম্বন্ধে আলোচনা করবো। কোন কোন জৈব যৌগের মধ্যে অণু সমাবেশের একটি বিশেষ রীতি দেখা যায়। তাপ, চাপ ও অনুঘটকের সাহায্যে যদি কোন যৌগের একাধিক অণু পরস্পর সংযুক্ত হয়ে উচ্চতর আণবিক ওজনের যৌগ গঠন করে এবং সেই উচ্চতর যৌগে যৌগগুলির

*কলেজ অব টেক্সটাইল টেকনোলজি, শ্রীরামপুর, হুগলী

পারস্পরিক সংখ্যার অনুপাত যদি অপরিবর্তিত থাকে, তবে সেই প্রক্রিয়াকে বলা হয় পলিমারিজেশন। এই প্রক্রিয়ায় বর্ধিত আণবিক ওজনের যে উচ্চতর পদার্থটি গঠিত হয়, তাকে বলা হয় পলিমার।

নাইলন সম্বন্ধে বলতে গেলে এক কথায় বলা যেতে পারে, এটা একটা পলিঅ্যামাইড। তবে সব সময় আমাদের মনে রাখতে হবে, নাইলন কোন বিশেষ রাসায়নিক নাম নয়, বিশেষ একরকম প্লাস্টিক জাতীয় পদার্থের ব্যবসায়িক ও ব্যবহারিক নাম মাত্র। স্থানভেদে এর নামও পরিবর্তিত হতে পারে। যাহোক, একটা ডাই-অ্যামাইড ও ডাইঅ্যাসিড এক সঙ্গে মিশিয়ে অ্যামাইড তৈরি করা হয়। সাধারণতঃ ডাই-অ্যামাইড হিসাবে হেক্সামিথিলিন ডাইঅ্যামাইন (Hexamethylene diamine) এবং ডাই-অ্যাসিন হিসাবে অ্যাডিপিক অ্যাসিড ব্যবহার করা হয়। বিক্রিয়া ঘটে এইভাবে—

$$NH_2(CH_2)_6NH_2 + COOH(CH_2)_4COOH \longrightarrow$$

হেক্সামিথিলিন ডাইঅ্যামাইন অ্যাডিপিক অ্যাসিড

$$NH_2(CH_2)_6NHCO(CH_2)_4COOH + H_2O$$
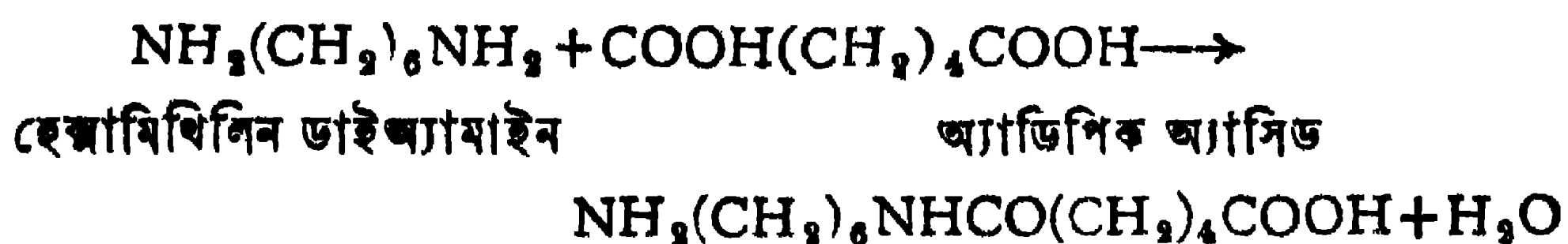
এইবার বিক্রিয়ালব্ধ দুটি অণু এক সঙ্গে যুক্ত হয় এবং তার ফলে তৈরি হয়—

$$NH_2(CH_2)_6NHCO(CH_2)_4CONH(CH_2)_6NHCO(CH_2)_4COOH$$

এখন এই বৃহৎ অণুটি নিজেই নিজের সঙ্গে বিক্রিয়া করে এবং অতি জটিল ও বৃহৎ আণবিক ওজনের পলিমার গঠিত হয়। এই বৃহৎ আণবিক ওজনের পলিমারকেই নাইলন বলা হয়। শিল্পক্ষেত্রে এর প্রস্তুতি সম্পর্কে সংক্ষেপে বলা যেতে পারে, হেক্সামিথিলিন ডাইঅ্যামাইন ও অ্যাডিপিক অ্যাসিডের জলীয় দ্রবণকে কাঠ-কয়লা বা কার্বনের গুঁড়ার সাহায্যে বিশোধিত ও বর্ণহীন করে নিয়ে তাদের পারস্পরিক বিক্রিয়ায় উৎপন্ন পদার্থকে অটোক্লেভের ভিতর রেখে বিশেষ চাপ ও তাপে পলিমারাইজ করা হয়। পলিমারিজেসনের ফলে উৎপন্ন যৌগটি একটি বিশেষ ঘনত্বে এলে বুঝা যায়, নাইলনের দীর্ঘ শৃঙ্খলাকার বৃহৎ অণুর উৎপত্তি ঘটেছে। এইভাবে উৎপন্ন নাইলন অত্যধিক উজ্জ্বল ও চক্চকে হয় বলে এর সুতার তৈরি কাপড় ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়ে। তাই এর চক্চকে ভাব কমাবার জন্যে উৎপাদন কালে টাইটেনিয়াম ডাই-অক্সাইড নামক পদার্থ মেশানো হয়, যার জন্যে নাইলনের চাকচিক্য ভাব কিছুটা কমে। এই ব্যবহারযোগ্য উজ্জ্বলতা-বিশিষ্ট নাইলনকে বলা হয় ম্যাট নাইলন। উত্তপ্ত তরল অবস্থায় পদার্থটিকে যান্ত্রিক কৌশলে চাপের সাহায্যে সূক্ষ্ম ছিদ্রপথে চালালে জিনিষটা শক্ত ও কিছুটা স্থিতিস্থাপক সূত্রাকারে বেরিয়ে আসে। সূত্রগুলি রেশম সূত্রের মত শক্ত ও চক্চকে হয়।

নাইলন অনেক রকমের আছে। যেমন—নাইলন-66, নাইলন-610 প্রভৃতি। তবে সাধারণতঃ নাইলন হিসাবে যা আমরা ব্যবহার করি, তা হলো নাইলন-66। এই নাইলন-66 তৈরি হয় অ্যাডিপিক অ্যাসিড আর হেক্সামিথিলিন ডাইঅ্যামাইন থেকে। এই পর্যন্ত যত রকমের নাইলন আবিষ্কৃত হয়েছে, তাদের মধ্যে নাইলন-66-ই উৎকৃষ্ট। এই নাইলন-66-এর গড় আণবিক ওজন 12000 থেকে 20,000-এর মধ্যে। যদি এই পলিঅ্যামাইডের আণবিক ওজন 6,000-এর কম হয়, তবে তাকে আর নাইলন বলা হয় না—এমন কি, ঐ প্রকার পলিমারকে আদৌ সুতার আকারে প্রস্তুত করা যায় না। আবার যে সমস্ত নাইলনের আণবিক ওজন 6,000 থেকে 10,000-এর মধ্যে হয়, তাদের সুতার আকারে প্রস্তুত করতে পারলেও সেগুলি অত্যন্ত

দুর্বল ও ভঙ্গুর হয়। আবার পলিমারটির আণবিক ওজন যদি 20,000-এর বেশী হয়, তখন তার তরলীকরণ প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে, যার জন্যে একে আর সুতার আকারে প্রস্তুত করা সম্ভব হয় না। অতএব আমাদের ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োজনীয় নাইলনের আণবিক ওজন 12,000 থেকে 20,000-এর মধ্যে রাখা হয়।

নাইলন প্রস্তুত করবার সময় যে কোন অনুপাতে ডাইঅ্যামাইন আর ডাইঅ্যাসিড মিশ্রিত করলে চলবে না। এদের একটি নির্দিষ্ট অনুপাতে মিশিয়ে একটি নির্দিষ্ট আণবিক ওজনের নাইলন তৈরি করা হয়। আমাদের ব্যবহারিক জীবনের প্রয়োজনীয় নাইলন সাধারণতঃ এক অণু ডাইঅ্যামাইন আর 1·02 অণু ডাই-অ্যাসিড (1 : 1·02) মিশিয়ে তৈরি করা হয় এবং এথেকে প্রস্তুত নাইলনের আণবিক ওজন প্রায় 12,000।

সাধারণতঃ নাইলন এভাবে তৈরি করা গেলেও শিল্পক্ষেত্রে কিন্তু এভাবে তৈরি করা হয় না। কারণ এভাবে তৈরি করলে অনেক বেশী খরচ পড়ে, যার জন্যে নাইলনের দাম অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যায়, যা সাধারণ লোকের আয়ত্তের বাইরে। যাহোক, এই পদ্ধতির মূল লক্ষ্য একই, শুধু সরাসরি ডাইঅ্যামাইন অথবা ডাইঅ্যাসিড ব্যবহার করা হয় না। কাঁচামাল হিসাবে ফেনল (Phenol) ব্যবহার করা হয়। তার ফলে সাইক্লোহেক্সানল (Cyclohexanol) প্রস্তুত হয়।

এই সাইক্লোহেক্সানল নাইট্রিক অ্যাসিডের দ্বারা জারিত হয়ে অ্যাডিপিক অ্যাসিড তৈরি করে। জারণকালে বদ্ধ শৃঙ্খলটি ভেঙ্গে যায়।

নাইলন প্রস্তুতের জন্যে প্রয়োজনীয় দুটি যৌগের মধ্যে একটি তৈরি হলো, আর দ্বিতীয় যৌগ হেক্সামিথিলিন ডাইঅ্যামাইন তৈরি করা হয়—উৎপন্ন অ্যাডিপিক অ্যাসিড ও অ্যামোনিয়ার সঙ্গে বিক্রিয়া করে অ্যাডিপ্যামাইড (Adipamide) তৈরি করে।

$$COOH(CH_2)_4COOH + 2NH_3 \longrightarrow CONH_2(CH_2)_4CONH_2 + 2H_2O$$
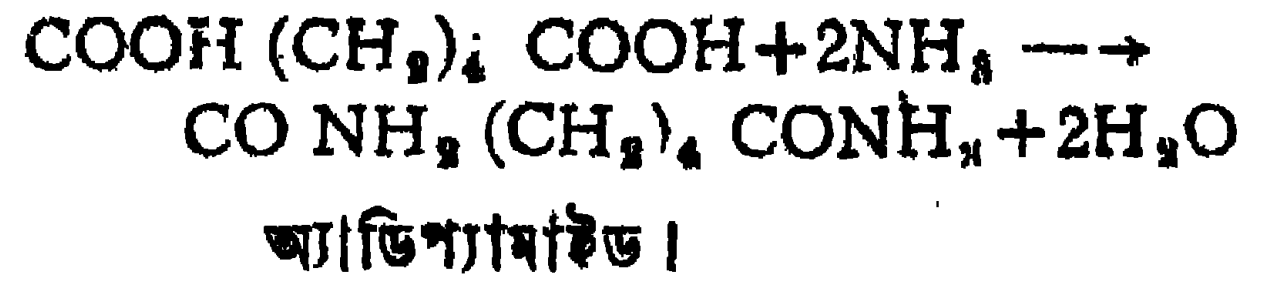
অ্যাডিপ্যামাইড।

এই অ্যাডিপ্যামাইডকে উপযুক্ত অনুঘটকের সাহায্যে বিশুষ্ক করা হয় এবং অ্যাডিপোনাইট্রাইল (Adiponitrile) তৈরি করা হয়।

$$CONH_2(CH_2)_4CONH_2 \longrightarrow CN(CH_2)_4CN + 2H_2O$$
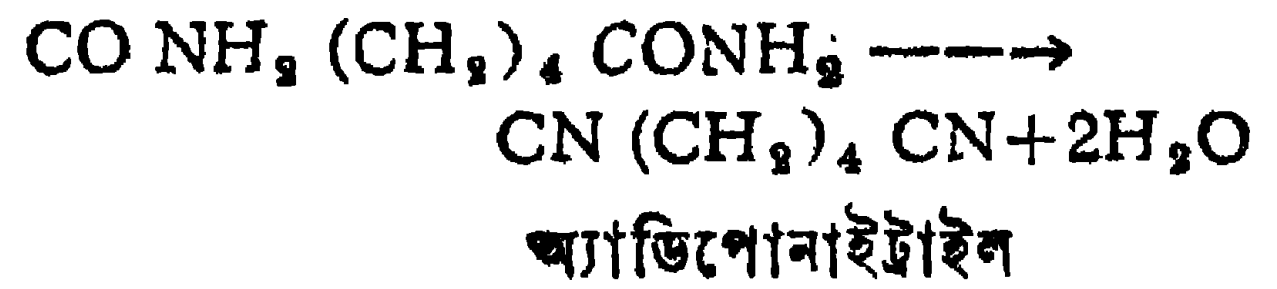
অ্যাডিপোনাইট্রাইল

এই অ্যাডিপোনাইট্রাইল অটোক্লেভের মধ্যে কোবাল্ট নাইট্রেট অথবা নিকেলের উপস্থিতিতে জারিত করা হয়। জারিত হয়ে হেক্সামিথিলিন ডাইঅ্যামাইন তৈরি হয়।

$$CN(CH_2)_4CN + 4H_2 \longrightarrow NH_2CH_2(CH_2)_4CH_2NH_2$$
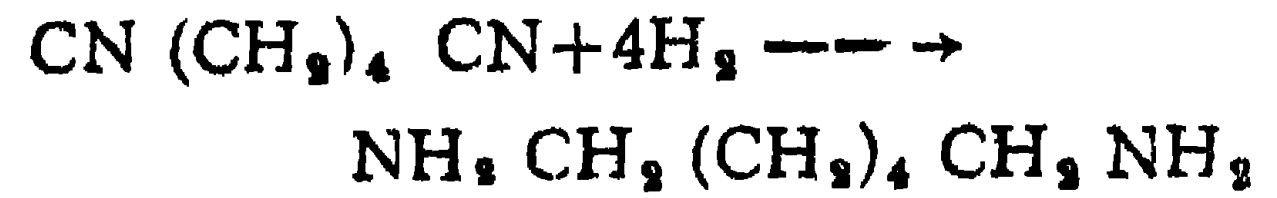
এবার আলাদা আলাদা ভাবে মিথানলের সঙ্গে অ্যাডিপিক অ্যাসিড ও হেক্সামিথিলিন ডাইঅ্যামাইন মিশানো হয় এবং ঐ দ্রবণগুলি এক সঙ্গে মিশিয়ে নাইলন লবণ (Nylon salt) অথবা হেক্সামিথিলিন ডাইঅ্যামোনিয়াম অ্যাডিপেট (Hexamethylene diammonium adipate) তৈরি করা হয়।

$$NH_2(CH_2)_6NH_2\,COOH(CH_2)_4COOH$$
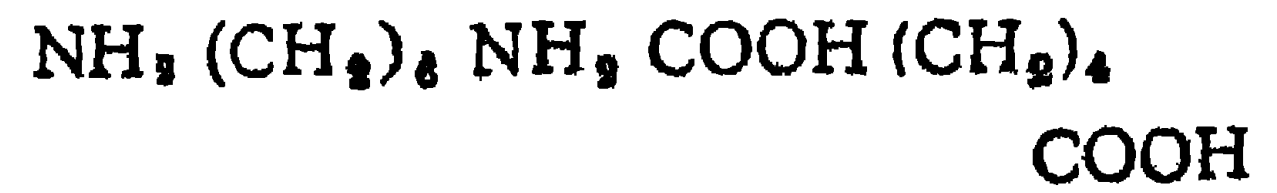
পরে এই নাইলন লবণকে পলিমারাইজ করে নাইলন প্রস্তুত করা হয়।

এখন আমরা নাইলন কি, কি ভাবে প্রস্তুত করা হয়—সে সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা করতে পারলাম। এইবার এর কয়েকটা দোষ-গুণ আলোচনা করা যাক।

নাইলনের বিশেষ কয়েকটি গুণ আছে, যার জন্যে এর এত সমাদর। এর স্থিতিস্থাপকতা গুণ খুব বেশী। নাইলনের সুতা টানলে তার দৈর্ঘ্য

প্রায় পাঁচ গুণ বেড়ে গিয়ে অতি সূক্ষ্ম সূত্রে পরিণত হয়, ছেড়ে দিলে আবার পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসে। এর কারণ, পদার্থটির শৃঙ্খলাকার অণুগুলি দীর্ঘায়ত হয়, আর তার ফলে সুতার টানশক্তি যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। নাইলন সুতার দৃঢ়তা ও টানশক্তি এত বেশী যে, সমওজনের ইস্পাতের তারের চেয়েও তা অধিকতর টান সহ্য করতে পারে। মাত্র আধ ইঞ্চি মোটা নাইলনের দড়িতে তিন টনেরও বেশী ওজনের জিনিষ স্বচ্ছন্দে ঝুলিয়ে রাখা যায়। নাইলনের সুতা দিয়ে তাই প্যারাসুটের কাপড়, দড়ি প্রভৃতি তৈরি করা হয়। নাইলনের আর একটা বিশেষ গুণ হলো, সাধারণ অবস্থায় মাত্র 5% জল শোষণ করতে পারে। কারণ নাইলনের সুতার ভিতরে জল প্রবেশ করতে পারে না। সেজন্যে নাইলনের তৈরি জামাকাপড় শুকাবার জন্যে বেশী সময় লাগে না। এর আঃ গুঃ 1.14 এবং স্থায়িত্ব মোটামুট বেশ ভালই। কারণ লঘু কোন অ্যাসিড এর বিশেষ কিছু ক্ষতি করতে পারে না। কিন্তু ঘন অ্যাসিডে এটি বিয়োজিত হয়ে অ্যাডিপিক অ্যাসিড ও ডাইঅ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্লোরাইড তৈরি হয়। ক্ষারের প্রভাবে নাইলন প্রায় অবিকৃত থাকে। কিন্তু ফরমিক অ্যাসিড, ক্রিসল, ফিনল প্রভৃতির মধ্যে নাইলন একেবারে দ্রবীভূত হয়। নাইলনের মধ্য দিয়ে বৈদ্যুতিক প্রবাহ পরিচালিত হয় না, সে জন্যে ভাল অপরিবাহী হিসাবে এর ব্যবহার দিনে দিনে বেড়ে যাচ্ছে। তবে নাইলনের জামাকাপড় ব্যবহার করবার সময় কয়েকটা বিষয়ে খুব সজাগ থাকতে হবে, বিশেষতঃ ইস্ত্রি করবার সময়। এর গলনাঙ্ক 250°C, তবে ইস্ত্রি করবার সময় যাতে 180°C-এর বেশী তাপ কোনক্রমে না হয়, তার দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে, তা না হলে ইস্ত্রি করবার সময় জামাকাপড় পুড়ে যাবে। আলোর প্রভাবে নাইলনের স্থায়িত্ব নষ্ট হয়। সে জন্যে যতদূর সম্ভব সূর্যের আলো এড়িয়ে চলা ভাল। নাইলনের জামাকাপড় ব্যবহার করবার ফলে কোন প্রকার চর্মরোগ হয় না।

পৃথিবী ও তার আবহাওয়া

মণিকুন্তলা মুখোপাধ্যায়

পৃথিবীর আবহাওয়া বদলাচ্ছে। বৈজ্ঞানিকেরা বলছেন—পৃথিবীর আবহাওয়ার বদল শুধু আজই হচ্ছে না, এই বদল চলছে পৃথিবীর জন্মকাল থেকেই; অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় 5 বিলিয়ন বছর ধরে পৃথিবীর জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটছে। জন্মের পর পৃথিবী ধীরে ধীরে শীতল হয়েছে। তারপর 100 মিলিয়ন বছর ধরে পৃথিবীতে মৃদু জলবায়ু ছিল। এরপর এসেছে তুষার যুগ। ভূতাত্ত্বিকদের পরীক্ষা থেকে জানা যায় যে, এমন একটা সময় ছিল, যখন উত্তর গোলার্ধের এক বৃহৎ অংশ তুষারে আবৃত ছিল। যতদূর জানা গেছে, এই তুষার আবরণ চার বার অগ্রসর হয়েছে এবং চার বার পশ্চাদপসরণ করেছে এবং প্রত্যেক বারেই পৃথিবীর আবহাওয়ার গুরুতর পরিবর্তন ঘটেছে। যখন এই হিমবাহ অগ্রসর হয়েছে, তখন দক্ষিণ গোলার্ধ ঠাণ্ডা এবং স্যাঁতসেঁতে জলবায়ুর সম্মুখীন হয়েছে। আবার যখন উত্তর গোলার্ধের তুষার রাশির পশ্চাদপসরণ ঘটেছে, তখন দক্ষিণের জলবায়ু হয়েছে উষ্ণ ও শুষ্ক। বিগত 8,000 থেকে 12,000 বছরের মধ্যে সর্বশেষ হিমবাহের পশ্চাদ-

পসরণ ঘটেছিল। তাহলে ঐ সময় পৃথিবী ছিল তুষারমুক্ত। তারপর 12,000 বছর ধরে ধীরে ধীরে পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণের মেরু অঞ্চলে তুষার সঞ্চিত হতে সুরু করেছে। বর্তমানে উত্তর মেরুর গ্রীনল্যাণ্ডের 840 হাজার বর্গমাইলের প্রায় 640 হাজার বর্গমাইল পরিমিত অঞ্চলই তুষারে আবৃত। এই তুষারের গভীরতা কোথাও কোথাও বোধ হয় 1 মাইলের মত। দক্ষিণ মেরুর তুষার আবরণের আয়তন কিন্তু আরো অনেক বৃহৎ। দক্ষিণ মেরুর প্রায় 5 মিলিয়ন বর্গমাইল পরিমিত স্থান তুষারাচ্ছন্ন।

তুষার যুগে চারবার হিমবাহের অগ্রগতি ও পশ্চাদপসরণ ঘটেছিল, অর্থাৎ তুষার যুগ চার বার সুরু ও চার বার শেষ হয়েছিল। কিন্তু কেন? তুষার যুগের এই সুরু বা শেষ হবার কারণ কি? বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, বাতাসে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসের হ্রাস বা বৃদ্ধি, অর্থাৎ বাতাসের উত্তাপ হ্রাস বা বৃদ্ধিই তুষার যুগের সুরু বা অবসানের প্রধান কারণ। জলবায়ুর এই দীর্ঘমেয়াদী পরিবর্তনের কারণ দুটি প্রাকৃতিক ক্রিয়ার মধ্যে সীমিত থাকাই সম্ভব।

(1) যদি বেশী পরিমাণে অগ্ন্যুৎপাত হয়ে থাকে, তবে বাতাসের কার্বন ডাই-অক্সাইড বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং পৃথিবী অধিক উত্তপ্ত হয়েছিল। ফলে পৃথিবীর উপরের হিমবাহের গলন সুরু হওয়া স্বাভাবিক। তাহলে হিমবাহের পশ্চাদপসরণ এই ভাবেই সম্ভব হতে পারে।

(2) আবার হয়তো পর্বত সৃষ্টির যুগে, যখন আজকের বড় বড় পাহাড়-পর্বতগুলি সবে তৈরি হতে সুরু করেছে, তখন বহু নতুন এবং বায়ুর সংস্পর্শে না-আসা শিলা বায়ুর সংস্পর্শে এসে বাতাসের কার্বন ডাই-অক্সাইড হ্রাসে সাহায্য করেছিল এবং বায়ুর এই উত্তাপ হ্রাস পাওয়ার ফলে ভূপৃষ্ঠে তুষার সঞ্চিত হতে থাকে, অর্থাৎ তুষার যুগের সূচনা হয়।

গত 5 মিলিয়ন বছর ধরে পৃথিবীর জলবায়ুর যে পরিবর্তন হয়েছে, তার কারণ সম্পূর্ণ প্রাকৃতিকই ছিল, মানুষের তাতে কোন অংশই ছিল না। কিন্তু পৃথিবীর জলবায়ুর আগামী পরিবর্তনের জন্যে মানুষই বোধ হয় সম্পূর্ণরূপে দায়ী হবে। বর্তমান সভ্যতা ও বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ পৃথিবীর জলবায়ুকে এক চরম পরিবর্তনের দিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে।

জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে মানুষ যে বিরাট পরিবর্তনের ঝুঁকি নিচ্ছে, তাতে আগামী 50 বছরের মধ্যে পৃথিবীর আবহাওয়া হয়তো এমন পাল্টে যাবে, যাতে মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা যথেষ্টভাবে বিঘ্নিত হবে।

নানা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও কলকারখানার ময়লা আর পোড়াকয়লা এবং পেট্রোলের ধোঁয়া অহরহ বিপজ্জনকভাবে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলকে দূষিত করছে এবং আবহাওয়াকে পরিবর্তিত করছে। কিন্তু তা ছাড়াও বিচলিত হবার কারণ রয়েছে—পৃথিবীর বুকে যে সব বড় বড় পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হচ্ছে বা নেবার কথা চিন্তা করা হচ্ছে, সেগুলির পরিণতির মধ্যে।

পেট্রোলিয়ামের সন্ধানে এবং খাদ্য ও বাসস্থানের প্রয়োজনে অনেক দেশই এখন সাহারা মরুভূমিকে শ্যামল প্রান্তরে রূপান্তরিত করবার কথা চিন্তা করছেন। কিন্তু সাহারার রূপান্তরের ফলে পৃথিবীর অন্যান্য অংশের আবহাওয়ার যে কি ভীষণ পরিবর্তন হতে পারে, তা কল্পনাতীত। বালুকাময় সাহারা যদি শ্যামল হয়ে ওঠে, তবে বৃটেন এবং পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলি গ্রীনল্যাণ্ডের মত তুষারাচ্ছন্ন হয়ে পড়বে। সোভিয়েট ইউনিয়নের উত্তরবাহী নদীগুলি অর্থাৎ সাইবেরিয়ার নদীগুলিতে (ওব, ইউনেসি ও লেনা) বছরে প্রায় নয় মাস তুষার জমে থাকে। বছরের কোন সময়ই ঠিক নাব্য নয়। সোভিয়েট দেশ যদি এখন নদীগুলিকে নাব্য করে তোলবার উদ্দেশ্যে তাদের

পরিবর্তন করে নতুন পথে প্রবাহিত করে গতিপথ এবং গ্রীনল্যাণ্ডের তুষার গলিয়ে ফেলে তাদের তুষারমুক্ত করে, তবে উত্তর আমেরিকা ও পশ্চিম ইউরোপের পক্ষে তা চরম বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। কারণ, সাইবেরিয়ার জলবায়ুর এই পরিবর্তনের ফলে সমগ্র উত্তর গোলার্ধের জলবায়ুর চরম পরিবর্তন ঘটবে। সমগ্র উত্তর আমেরিকা হয়ে পড়বে আলাস্কার মত হিমশীতল আর পশ্চিম ইউরোপ হবে সম্পূর্ণ শুষ্ক। মানুষের উপকারের জন্যেই বর্তমানে কৃত্রিম উপায়ে জলসেচের সাহায্যে কৃষিকার্যে বহু উন্নতি সাধন করা হয়েছে, কিন্তু এর ফলে মানুষের অপকারও কম হয় নি। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সেচের প্রয়োজনে খাল, বিল কেটে নদীর জল যে ভাবে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে, তাতে আগে যে পরিমাণ জল বাষ্পরূপে বায়ুতে মিশতো, তার চেয়ে অনেক বেশী পরিমাণ জল প্রতিদিন এই সব বিস্তৃত জলাশয় থেকে বাষ্পীভূত হয়ে যাচ্ছে এবং এর ফলে পৃথিবীতে বৃষ্টির পরিমাণ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। শহরের অগুণতি কলকারখানাগুলিও প্রতিদিন বেশ কিছু পরিমাণ কার্বন ডাই-অক্সাইড বাতাসে মেশাচ্ছে এবং বায়ু উত্তাপ বৃদ্ধি করছে। এর ফলে বায়ুর কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ এবং আবহাওয়ার উত্তাপ যে ভাবে বেড়ে যাচ্ছে, তাতে আশঙ্কা করা যাচ্ছে, হয়তো আগামী 50 বছরের মধ্যেই পৃথিবীর আবহমণ্ডলের উত্তাপ প্রায় তিন ডিগ্রীর মত বৃদ্ধি পাবে। এই তিন ডিগ্রী উত্তাপ বৃদ্ধিই হিমবাহের অপসারণের পক্ষে যথেষ্ট। কাজেই এই পরিমাণ উত্তাপ বৃদ্ধি পেলেই কুমেরু ও গ্রীনল্যাণ্ডে বিশাল হিমমুকুট গলে কুমেরু ও গ্রীনল্যাণ্ড উন্মুক্ত শিলায় পরিণত হবে।

ভবিষ্যতে আবহাওয়ার এই পরিবর্তন বিশ্বের বৈজ্ঞানিকদের কাছে একটা বিরাট সমস্যা ও আশঙ্কার কারণ হয়ে উঠবে। তাঁদের ধারণা, পৃথিবীর জীবকুলের উপর এই আবহাওয়ার প্রতিফলন খুব শুভ হবে না।

সমাজ-বিজ্ঞানে গবেষণার বিভিন্ন ধারা

মিনতি চক্রবর্তী

বর্তমান প্রবন্ধে আমাদের আলোচনার বিষয়-বস্তু হলো—কি উপায়ে সমাজ-বিজ্ঞানীরা তাঁদের তথ্য সংগ্রহ করে থাকেন। সমাজ-বিজ্ঞানীর পরীক্ষাগার হলো মানব সমাজ আর বিভিন্ন মানুষ হলো তাঁদের পরীক্ষিত বস্তু বা যন্ত্রপাতি। বিভিন্ন মানুষের প্রকৃতি বিভিন্ন। কেউ বেশী কথা বলে, কেউ বা কম কথা বলে, আবার কেউ মিথ্যা কথা বেশী বলে, কারও মেজাজ সপ্তমে চড়া আবার কেউ বা খুবই ঠাণ্ডা মেজাজের লোক। সুতরাং এই বিভিন্ন যন্ত্রপাতিরূপ মানুষকে নিয়ে কাজ করা খুব ধৈর্য ও সহনশীলতার ব্যাপার। সুতরাং সমাজ-বিজ্ঞানীকে খুব সন্তর্পণে মাথা ঠাণ্ডা রেখে তাঁর কাজে এগিয়ে যেতে হবে, কারণ তার পর্যবেক্ষণ ভুল হলে তাঁর তথ্য গ্রহণ হবে ভুল। আমরা এখনও পর্যন্ত এমন কোন যন্ত্র আবিষ্কার করতে সক্ষম হই নি, যার মধ্যে ধরা পড়বে পরীক্ষাধীন মানুষ ঠিক উত্তর দিচ্ছে, না সত্যকে চাপা দেবার জন্যে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে সমাজ-বিজ্ঞানীকে বিপথে চালিত করছে। সুতরাং সব দিক চিন্তা করে সমাজ-বিজ্ঞানীকে তথ্য গ্রহণ সুরু করতে হবে।

এখন আলোচনা করা যাক, সমাজতত্ত্বের তথ্য গ্রহণের জন্যে কি কি কৌশল অবলম্বন করা হয়।

সুপরিকল্পিত পরীক্ষা

বিজ্ঞানের সব শাখাই এই পদ্ধতি অনুসরণ করে। পরীক্ষাটি খুব সহজ। এই পরীক্ষায় দুটি গোষ্ঠীর প্রয়োজন হয়। একটি পরীক্ষাধীন গোষ্ঠী (Test group) ও অপরটি নিয়ন্ত্রিত গোষ্ঠী (Control gr up)। যাদের উপর পরীক্ষা করা হবে, সেই রকম কয়েকজন মানুষকে রাখা হয় পরীক্ষাধীন গোষ্ঠীর মধ্যে আর অন্য কয়েকজন মানুষকে রাখা হয় নিয়ন্ত্রিত গোষ্ঠীর মধ্যে। এখন দুই গোষ্ঠীর মধ্যে যে পার্থক্য হবে, তা থেকে পরীক্ষার ফলাফল স্থির করা হয়। নীচে পদ্ধতিটি বর্ণনা করা হচ্ছে:—

অপরাধপ্রবণতার সংস্কার সাধনের জন্যে আমরা একটা পরীক্ষা স্থির করলাম। যে অপরাধীদের উপর পরীক্ষার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, তাদের পরীক্ষাধীন গোষ্ঠী এবং যে অপরাধীদের উপর কোনও পরীক্ষার ব্যবস্থা নেওয়া হয় নি, তাদের নিয়ন্ত্রিত গোষ্ঠীর মধ্যে ফেলা হলো। এখন আবার আর এক অপরাধীর দল, যাদের উপর কোন পরীক্ষার ব্যবস্থা আরোপিত হয় নি, তাদেরও নিয়ন্ত্রিত গোষ্ঠীর মধ্যে ফেলা হলো। এভাবে বিভিন্ন দলকে দুই গোষ্ঠীতে পরপর রেখে পরীক্ষার ফলাফল জানা হলো। এভাবে পরীক্ষার জন্যে বিভিন্ন রকমের গোষ্ঠী নির্বাচন করবার ফলে গবেষকের পক্ষে মোটামুট নির্ভুল ফল পাওয়া সম্ভব।

কখনও কখনও গবেষণার পরিস্থিতি অনুযায়ী তৈরি পরীক্ষাধীন ও নিয়ন্ত্রিত গোষ্ঠীর সহায়তা নেওয়া হয়। এই সম্পর্কে এক সুন্দর উদাহরণ এখানে দেওয়া যেতে পারে:—

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় একটা খুব বড় প্রশ্ন দেখা দেয় যে, নিগ্রো ও শ্বেতাঙ্গদের পৃথক শ্রেণীভুক্ত করা হবে কিনা। কিছু পরীক্ষিত একক স্থির করা হলো। কিছু সৈন্যগোষ্ঠীকে রাখা হলো শ্বেতাঙ্গ ও নিগ্রো পৃথক পৃথক করে আর কিছু সৈন্যগোষ্ঠীকে রাখা হলো শ্বেতাঙ্গ ও নিগ্রো মিশ্রিত করে। কিছুদিন পরে এই সব সৈন্যের অধিকর্তাদের জিজ্ঞাসা করা হলো, এরকম মিশ্রণে তাঁদের অভিজ্ঞতা কি? উত্তরে তাঁরা জানিয়েছিলেন যে, যাঁরা পৃথক আছেন, তাঁদের তুলনায় মিশ্রিত দলের সৈন্যেরা অধিকতর কর্মনিপুণ। এই পরীক্ষা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, জোর করে যে সংস্পর্শ ঘটানো যায়, তাতে মানুষের মনোভাবের অনেক পরিবর্তন ঘটে। তাছাড়া তৈরি পরীক্ষিত ও নিয়ন্ত্রিত গোষ্ঠীর সহায়তায় জানা গেল—মিশ্রিত ও অমিশ্রিত গোষ্ঠীর মধ্যে পার্থক্য কি। এই উদাহরণ আরও প্রমাণ করে যে, সমাজ-বিজ্ঞানে সুপরিকল্পিত পরীক্ষা যে জ্ঞানের অনুসন্ধান দেয়, তা বাস্তব সামাজিক নীতি তৈরির পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

সমাজ-বিজ্ঞানে সুপরিকল্পিত পরীক্ষাকে কিছু অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। হাজার লোককে নিয়ে কোনও পরীক্ষা করতে গেলে তা ব্যয়সাপেক্ষ ও অনেক সময়ের প্রয়োজন। লোক যখন বুঝতে পারে তাদের নিয়ে পরীক্ষা করা হবে, তখন তারা পরীক্ষক বা গবেষকের সঙ্গে অসহযোগমূলক আচরণ করতে সুরু করে। এতে পরীক্ষার প্রভূত ক্ষতিসাধিত হয়। মানুষ যখন জানতে পারে না পরীক্ষার আসল উদ্দেশ্যটি কি, তখন তার কাছ থেকে যে ফল পাওয়া যাবে, তা আর কোন কিছুর মাধ্যমেই সম্ভব হয় না। এজন্যে তাকে কৌশলে এমন এক যুক্তি দেওয়া হবে, যাতে সে বুঝতে না পারে, পরীক্ষার আসল লক্ষ্যটি কি এবং পরীক্ষক কি করছে। তবে এই যুক্তিটি এমন হতে হবে যে, তা তার পক্ষে মোটেই ক্ষতিকারক নয়।

পর্যবেক্ষণমূলক পাঠ

এই পরীক্ষা অনেকটা সুপরিকল্পিত পরীক্ষার মত। সুপরিকল্পিত পরীক্ষাকে এমনভাবে সাজানো হয়, যাতে কোন কিছু ঘটে তারপর তা লক্ষ্য করা হয়। কিন্তু পর্যবেক্ষণের পরীক্ষায় যা নিজ থেকে ঘটছে বা ঘটে গেছে, বিজ্ঞানী তা লক্ষ্য করেন, কিন্তু উভয়ই নির্ভরশীল রীতিবদ্ধ পর্যবেক্ষণের উপর নিয়ন্ত্রিত সর্তে। উভয় পদ্ধতি সমস্ত পরীক্ষাতেই ব্যবহৃত হয়, কিন্তু কৌশলের একটু হেরফের হয় বিষয়বস্তুর তারতম্যের উপর।

ধারণাভিত্তিক পাঠ

এই পদ্ধতিটির মূলে হলো অনিয়মিত বর্ণনা ও বিশ্লেষণমূলক সিদ্ধান্ত, যা পর্যবেক্ষণের উপর গঠিত এবং অপেক্ষাকৃত কম নিয়ন্ত্রিত। মনে করা যাক, কোনও এক সমাজ-বিজ্ঞানী পারিবারিক সংগঠনের উপর কাজ করছেন। তিনি রাশিয়া ভ্রমণে গেলেন। তিনি রাশিয়ার মানুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁদের পারিবারিক জীবন সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ করলেন, বিভিন্ন পত্রিকা থেকে পারিবারিক জীবনের ছবি পৃথক করলেন এবং বাড়ী ফিরলেন তিনি রাশিয়ার পারিবারিক জীবন সম্পর্কে এক নির্দিষ্ট ধারণা নিয়ে। কিন্তু এই যে তথ্যগুলি সমাজ-বিজ্ঞানী সংগ্রহ করলেন, তা কোনও নিয়মিত বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের উপর নির্ভর করে নয়, প্রকাশিত সাহিত্য, অনুসন্ধান ও সংবাদদাতার কাছ থেকে প্রাপ্ত ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত তথ্যের উপর নির্ভর করে। এখন বিচক্ষণ, দায়িত্বশীল ও সুকৌশলী গবেষক তাঁর উপসংহার তৈরি করবেন এই তথ্যের সঙ্গে তাঁর ধারণা, অভিজ্ঞতা ও চিন্তাধারাকে মিশ্রিত করে। যখন সংগৃহীত তথ্য পর্যবেক্ষকের ধারণাকে অন্তর্ভুক্ত করে, তখন তাকে ধারণাভিত্তিক পাঠ (Impressionistic study) হিসাবে গণ্য করা হয়।

সমাজ-বিজ্ঞানে এই পাঠের প্রয়োজন একদিকে খুব বেশী। এই পদ্ধতি অনুসন্ধানের তথ্যের উপর অনেক প্রকল্প ও মন্তব্য করতে বিশেষ সাহায্য করে এবং গবেষকের গভীর অন্তর্দৃষ্টির ইঙ্গিত দেয়, যা অন্য পদ্ধতির মাধ্যমে অনেক সময় সম্ভব হয় না।

পরিসংখ্যানগত তুলনামূলক পাঠ

শিক্ষণীয় বিষয়ের প্রতিটি পাঠ, যা কোনও পরীক্ষার মাধ্যমে দেখা হয়েছে বা কোথাও প্রকাশিত হয়েছে, গণবিন্যার মাধ্যমে লিপিবদ্ধ করা থাকে। প্রতিটি সমাজতাত্ত্বিক অনুসন্ধানকেই এই গণবিন্যার উপর নির্ভর করতে হয়। গণবিন্যার এই তথ্য গবেষককে তুলনামূলক আলোচনা করতে ও একনজরে বিভিন্ন তথ্যের ফলাফল দেখতে বিশেষভাবে সাহায্য করে।

কখনও কখনও গবেষককে কোনও এক বিশেষ সমস্যাকে যাচাই করে দেখবার জন্যে সোজাসুজিভাবে গণবিন্যার তথ্যের সাহায্য নিতে হয়। যেমন গবেষককে এক প্রশ্নের উত্তর গণবিন্যার সাহায্যে দেখতে হবে। প্রশ্নটি হলো, কেন কিছু বিবাহ অন্যান্য বিবাহ অপেক্ষা বেশী সুখের হয়? এই প্রশ্নের উত্তরের জন্যে কয়েক শত বিবাহিত দম্পতিকে বিভিন্ন পরিমাপে পৃথক পৃথক শ্রেণীভুক্ত করা হলো। এখন এই পৃথক পৃথক শ্রেণীগুলির একটিকে অপরটির সঙ্গে তুলনা করা হলো ডজনখানেক বিষয়ের উপর ভিত্তি করে। এতে দেখা গেল, কিছু সুখী ও অসুখী বিবাহিত দম্পতি পৃথক শ্রেণীভুক্ত হয় তাদের পশ্চাৎ ঘটনাকে কেন্দ্র করে, আর কিছু হয়তো বা তাদের ব্যক্তিত্বের পার্থক্যের জন্যে। এও লক্ষ্য করা গেল যে, দুই দলের পার্থক্য এত বেশী যে, একটির সঙ্গে অপরটির মিল খুব কম। তুলনামূলক আলোচনার জন্যে গবেষকের কাছে এই পদ্ধতি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্নভিত্তিক ও পারস্পরিক সাক্ষাৎমূলক পাঠ

এই পদ্ধতিতে সংবাদদাতাকে সোজাসুজি

প্রশ্ন করে সেই উত্তরের উপর নির্ভর করে তথ্য সংগৃহীত হয়। পদ্ধতিটি বৈজ্ঞানিক নিয়ন্ত্রণের মধ্যে এক সুসংবদ্ধ পথ। এই পদ্ধতিতে যে প্রশ্নতালিকাগুলি তৈরি হবে, তা সংবাদদাতাকে নিজে পূর্ণ করতে হয় বা তার সামনে প্রশ্ন-কারীকে পূর্ণ করতে হয়। কিন্তু এই পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহে একটি বড় অসুবিধা আছে এবং গবেষকের কর্তব্য সেদিকে বিশেষ নজর রাখা। এই পদ্ধতিতে একদিকে যেমন বাস্তব সংবাদ পাওয়া খুব সহজ, অন্যদিকে তেমন বিভিন্ন মানুষের মনোভাব ও মতের পার্থক্য হওয়ায় তথ্য ভুল হওয়া সম্ভব। সংবাদদাতা অনেক সময় প্রশ্ন নাও বুঝতে পারেন বা তারা অনেক প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে যাবার জন্যে মিথ্যা বলতে পারেন। অনেক সংবাদদাতা বেশী কথা বলার দরুণ আসল উত্তর না দিয়ে তা অনেক রংচং দিয়ে বাড়িয়ে বলতে পারেন। সুতরাং এই পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহ করতে হলে উত্তরদাতার মনস্তত্ত্ব আগে বিশ্লেষণ করে তারপর তার উত্তরের উপর তথ্য সংগ্রহ করা উচিত। সুতরাং গবেষককে এই পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহ করবার সময় খুব বেশী সতর্ক থাকতে হবে—একমাত্র এই পদ্ধতিতে সংগৃহীত তথ্যের উপর নির্ভর করে কোনও মন্তব্য করা উচিত হবে না। তবুও এই পদ্ধতি প্রয়োগের বিশেষ প্রয়োজন আছে। কারণ এই পদ্ধতির মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্য কল্পনা শক্তি অপেক্ষা অনেক বেশী বাস্তব।

অংশগ্রহণকারী পর্যবেক্ষক পাঠ

এই পদ্ধতিতে গবেষককে নিজে তিনি যে বিষয়ের উপর তথ্য সংগ্রহ করবেন, তাতে অংশ গ্রহণ করে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করতে হয়। যদি কোনও গবেষক ইচ্ছা করেন শ্রমিক সমিতি (Labour union) সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে, তখন তিনি শ্রমিক সমিতির একটির মধ্যে নিজে যোগদান করে কারখানার কাজ করবেন। যদি তিনি কোনও ধর্মীয় অনুষ্ঠান, বিবাহ বা কোনও পূজা সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করতে চান, তবে তিনি সেই অনুষ্ঠানগুলিতে যোগদান করে আন্তরিকতার সঙ্গে অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা ও কর্মকর্তাদের সঙ্গে এক হয়ে তথ্য সংগ্রহ করবেন। এই পদ্ধতির মাধ্যমে যে তথ্য সংগ্রহ করা যায়, কোনও বাহ্যিক পর্যবেক্ষণ সেই তথ্য দিতে সক্ষম নয়।

এই পদ্ধতির কিছু অসুবিধার দিক আছে। অংশগ্রহণকারী পর্যবেক্ষক কোনও অনুষ্ঠানে আবেগের প্রভাবে এমনভাবে জড়িয়ে পড়তে পারেন, যা তাঁকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করতে পারে বা এমনও হতে পারে যে, তিনি যে গোষ্ঠী দেখছেন, তা সব গোষ্ঠীর ক্ষেত্রেই এক বলে তাঁর মনে হতে পারে।

আমাদের দেশে এই পদ্ধতির ব্যবহার এখনও পর্যন্ত খুব ব্যাপক নয়। যেমন ধরা যাক, কোনও এক ধর্মীয় বিপ্লবে কি ঘটে থাকে, কি ঘটে এক দাঙ্গায় বা যুদ্ধের পরে যুদ্ধক্ষেত্রে? এই সব ক্ষেত্রে হাতে কলম-পেন্সিল নিয়ে খুব কম সমাজ-বিজ্ঞানীই উপস্থিত থাকেন। এসব স্থানে সাধারণতঃ যাঁরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের চাক্ষুষ বর্ণনার উপর নির্ভর করে তথ্য সংগৃহীত হয়। এই চাক্ষুষ বর্ণনারও মূল্য আছে, যদিও তা অনভিজ্ঞ পর্যবেক্ষকের, কিন্তু সেই ঘটনার পরেই পর্যবেক্ষকের কাছ থেকে যদি তথ্য সংগ্রহ করা যায়, সেই তথ্য তথ্যানুসন্ধানের ক্ষেত্রে এক প্রয়োজনীয় উৎস।

ঘটনাভিত্তিক পাঠ

যখন কোনও ব্যক্তির জীবনবৃত্তান্ত বা কোনও প্রাচীন ঘটনার উপর নির্ভর করে তথ্য সংগ্রহ করা হয়, তখন তাকে বলে ঘটনাভিত্তিক পাঠ (Case-study)। কোন এক বিশেষ ব্যক্তির

ঘটনামূলক ইতিহাস (Case-history) থেকে এক পরিবার, এক গোষ্ঠী, এক সমিতি বা এক ধর্মীয় আন্দোলনের উপর অনেক মন্তব্য করা যেতে পারে। এই পাঠের সর্বাপেক্ষা মূল্যবান জিনিষ হলো কোনও প্রকল্পের উপর মন্তব্য করা। কোনও একটি ঘটনাভিত্তিক পাঠের তথ্যের উপর নির্ভর করে সাধারণ শ্রেণীবিভাগ করা যায় না, সাধারণ শ্রেণীবিভাগ করতে হলে সযত্নে সংগৃহীত প্রচুর ধারাবাহিক তথ্যের (Processed data) প্রয়োজন।

উপরে বর্ণিত পদ্ধতিগুলির মধ্যে পাশ্চাত্য দেশসমূহের মত আমাদের দেশে এখনও সবগুলিকে অবলম্বন করা হয় না। আমাদের দেশে যে পদ্ধতিগুলির মাধ্যমে সাধারণতঃ তথ্য সংগৃহীত হয়ে থাকে, সেগুলি হলো পর্যবেক্ষণমূলক পাঠ, প্রশ্নভিত্তিক ও পারস্পরিক সাক্ষাৎমূলক পাঠ, অংশগ্রহণকারী পর্যবেক্ষক ও ঘটনাভিত্তিক পাঠ।

চোখে আলোর অনুভূতি

যোগেন দেবনাথ*

এক জোড়া চোখ, সূর্যের আলো আর বস্তুজগৎ—এই তিনের অস্তিত্বে বহির্জগতের সঙ্গে মানুষের যোগাযোগ। চাঁদ ঝলসানো রুটি, না অফুরন্ত সৌন্দর্যের কবি-কল্পনা—চোখ বা আলো না থাকলে এর কোনটারই মূল্য নেই। বস্তু থেকে ফিরে আসা আলো চোখে পড়ে বলেই তো বস্তুর হরেক রকম বৈচিত্র্য মানুষের কাছে ধরা পড়ে। তবে আলো নিছক চোখে এসে পড়লেই যে কোন বস্তুর দর্শনের অনুভূতি জাগবে—এমন কথা কেউ হলফ করে বলতে পারেন কি? পারেন না। কেন না, আলো চোখে এসে পড়া এবং অনুভূতি জাগবার মধ্যে যে রহস্যের বেড়াজাল রয়েছে, তার সঠিক সমাধানের উপরই নির্ভর করে কোন বস্তুর অনুভূতির ব্যাপারটা। ক্যামেরার মত চোখের অভ্যন্তরেও রয়েছে আলোকগ্রাহী একটি পর্দা, নাম তার রেটিনা বা অক্ষিপট। এই পর্দায় আলো কোন বস্তুর যে নিয়মমাফিক প্রতিবিম্ব বা ইমেজ সৃষ্টি করে তারও কিন্তু কানাকড়ি দাম নেই, যদি না পর্দায় অবস্থানকারী আলোক গ্রাহক-কোষে আলোর শোষণ ঘটে এবং সেখানে আলোক-শক্তির রূপান্তর ঘটে। আলোক গ্রাহক-কোষ ট্রান্সডুসারের মতই কাজ করে। রেটিনার শোষণকারী আলোক-শক্তিকে তারা তাপ, রাসায়নিক ও তড়িৎ-শক্তিতে রূপান্তরিত করে—সৃষ্টি হয় স্নায়ু-প্রবাহের। এই স্নায়ু-প্রবাহ সুবাহী অপ্টিক স্নায়ুর মধ্য দিয়ে ছড়িয়ে পড়ে মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশে। মস্তিষ্কের মত এমন সুদক্ষ বৈচিত্র্যময় কম্পিউটর মানুষ আজও সৃষ্টি করতে পারে নি। সেখানে স্নায়ু-প্রবাহের হিসাব-নিকাশ ও বিচার-বিশ্লেষণ চলে। গড়ে উঠে বস্তুর রং, রূপ ও বৈচিত্র্যে ভরা নিখুঁৎ ও নির্ভেজাল ইমেজ বা ইমেজের অনুভূতি—যাকে আমরা বলি দেখা। আর একটা জিনিষও লক্ষ্য করা গেছে—চোখে এসে পড়া আলোকে যে পরিমাণ শক্তি থাকে, স্নায়ু-প্রবাহের সঙ্গে জড়িত শক্তি তার চেয়ে অনেক বেশী। কেন এই বৈষম্য? নিশ্চয়ই চোখে আলো শোষণের

* শারীরতত্ত্ব বিভাগ, মেদিনীপুর কলেজ, মেদিনীপুর

পর স্নায়ু-প্রবাহ সুরু হওয়া পর্যন্ত পর পর কতকগুলি অতি অবস্তিক ঘটনা ঘটে, যার ফলে শক্তির এই তারতম্য হয়ে থাকে।

বস্তু থেকে ফিরে আসা কতটুকু আলো চোখে পড়লে বা নিদেনপক্ষে কি পরিমাণ আলোক-শক্তির রূপান্তর ঘটলে কোন বস্তুর শুধুমাত্র অনুভূতি জাগতে পারে? সব তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের আলো সমান শক্তির অধিকারী নয়। শক্তির হেরফের ঘটে তাদের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের কম-বেশীতে। একটা আলোকণায় যে শক্তি নিহিত থাকে, তার পরিমাণ করা চলে শক্তিসূত্র থেকে অর্থাৎ $E=h\upsilon$, যেখানে h-কে বলা হয় প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবক, যার মান আর্গ এককে মাপলে $6{\cdot}62\times10^{-27}$ আর্গ হয় এবং ইলেকট্রন ভোল্টে মাপলে 4·13 ইলেকট্রন ভোল্ট হয়। υ-কে বলা হয় কম্পনাঙ্ক, যা আলোর গতিবেগ ও আলোকণার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের ভগ্নাংশ-বিশেষ অর্থাৎ c/λ। স্পষ্টতঃই দেখা যাচ্ছে, তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য কম হলে আলোকণার মধ্যে নিহিত শক্তির পরিমাণ থাকে বেশী, তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য বেশী হলে ঘটে তার বিপরীত। অবশ্য একটি মাত্র আলোকণাতে আলোক-শক্তির পরিমাণ নিতান্তই সামান্য। তবে দলে ভারী হলে এই প্রশ্ন অবান্তর। আবার সব তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের আলো দর্শনের অনুভূতি জাগাতে সক্ষম নয়। বেগুনী থেকে লাল রঙের যে সাতটা আলো দর্শনের অনুভূতি জাগাতে পারে, তাদের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য 4000Å থেকে 7500Å [এক Å = 10^{-8} সে. মি.] পর্যন্ত সীমিত [1নং ছবি]। এদের তাই দৃশ্য আলোর পর্যায়ে ফেলা হয়। অতিবেগুনী রশ্মি—যাদের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য 4000Å থেকে নীচের দিকে এবং যাদের শক্তির পরিমাণ বেশী, তারাও কিন্তু দর্শনের অনুভূতি জাগাতে পারে না। তেমনি পারে না কম শক্তিসম্পন্ন অবলোহিত রশ্মি, যাদের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য 7500Å থেকে উপরের দিকে। অবশ্য অতিবেগুনী রশ্মিকে সরাসরি রেটিনাতে ফেলে দেখা গেছে, তারা অনুভূতি জাগাতে সক্ষম। সাধারণভাবেই বা তা সম্ভব নয় কেন? কারণ অবশ্য রয়েছে। পৃথিবীর ঠিক উপরিভাগে অতিবেগুনী রশ্মির পরিমাণ খুব কম। দেখা গেছে মাত্র 2950Å তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের আলো অতি কষ্টে পৃথিবীর ঠিক উপরে পৌঁছুতে পারে। অবশ্য পৃথিবী ও সূর্যের দূরত্বের তারতম্যে খানিকটা হেরফেরও ঘটে। এর চেয়ে কম দৈর্ঘ্যের আলোকণা ঠিক পৃথিবীপৃষ্ঠে এসে পৌঁছুতে পারে না। কারণ তাদের প্রতিবন্ধকতা অনেক। পৃথিবীর আবহাওয়ায় এসে পড়বার পরেই

1নং চিত্র

তাদের শোষণ করে গ্যাস, অতি উচ্চে অবস্থানকারী ওজন স্তর (Ozone layer) এবং জলীয় বাষ্প। এমন কি, ধূলিকণাও তাদের ইতস্ততঃ ছড়িয়ে দেয়। বায়ুকণাগুলিও নানাভাবে বাধার সৃষ্টি করে। এর পরেও বাধা আসে। দেখা গেছে 3000Å কম দৈর্ঘ্যের সব আলোকণাকেই চোখের ভিতরকার লেন্স শোষণ করে নেয়। তেমনি 13000Å-এর বেশী তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের সব আলোকে শোষণ করে নেয় চোখের ভিতরকার স্বচ্ছ তরল পদার্থ অ্যাকোয়াস হিউমার ও ভিট্রিয়াস হিউমার (2নং ছবি)। এই দু-রকমের আলো চোখের

2নং চিত্র

আলোক-সুগ্রাহী পর্দা রেটিনাতে গিয়ে পৌঁছুতে পারে না এবং আলোক-গ্রাহক-কোষের দ্বারা শোষিত হতে পারে না। শোষণ না হলে শক্তির রূপান্তর ঘটে না। অতিবেগুনী ও অবলোহিত রশ্মি তাই দর্শনের অনুভূতি জাগাতে পারে না। কিন্তু চোখে এসে-পড়া সব দৃশ্য আলোই কি রেটিনাতে পৌঁছুতে পারে, না অনুভূতি জাগাতে পারে? না, তাও পারে না।

চোখের কর্মকাণ্ডের পদ্ধতি সম্বন্ধে আর একটা কথা জানা প্রয়োজন। সাধারণ আলোতে চোখের কাজকর্মের পদ্ধতি এক রকম, আবছা আলোতে অন্য রকম। প্রথম প্রকারে বেশী পরিমাণ আলো চোখে এসে পড়া চাই। কোন বস্তুকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখা ও তার রং, রূপ ও বৈচিত্র্যকে সুস্পষ্ট ও আলাদা করে বিচার-বিশ্লেষণ করা এবং বোঝবার জন্যে এর প্রয়োজন। অপর পক্ষে আবছা আলোতে শুধুমাত্র আলো-আঁধারের অনুভূতি জাগানোই চোখের কাজ। এই দু-রকম কাজের জন্যে দু-রকম গ্রাহক-কোষ রয়েছে রেটিনাতে। উজ্জ্বল আলোতে যারা সক্রিয়, তাদের বলা হয় কোণ্ (Cone) গ্রাহক-কোষ। আবছা আলোতে এরা নিস্তেজ ও নিষ্ক্রিয়। [1নং তালিকা]। আবছা আলোয় যারা সুদক্ষ ও কর্মচঞ্চল, তাদের নাম রড্ (Rod) গ্রাহক-কোষ। সাধারণ বা স্বাভাবিক আলোতে তারা অকেজো। এই দু-প্রকার গ্রাহক-কোষ কিন্তু রেটিনায় সমভাবে ছড়িয়ে নেই, চোখের পশ্চাৎ মেরুতে

1নং তালিকা

(মিলি ল্যাম্বার্টে আলোক ঔজ্জ্বল্য)

মিলি ল্যাম্বার্টে আলোক ঔজ্জ্বল্য		
0·0000001	চোখ সওয়া অন্ধকারে দর্শনমাত্রা	আব্ছা আলোর দৃষ্টি (রড্)
0·000001, 0·00001, 0·0001	চাঁদহীন অন্ধকার আকাশের নীচে রাখা সাদা বস্তু	
0·001		
0·01, 0·1	চাঁদের আলোয় আলোকিত সাদা বস্তু	পরিবর্তনসূচক অঞ্চল (Zone)
1	কষ্টসাধ্য পত্রিকাপাঠ	
10, 100	সহজ পঠনপাঠন	স্বাভাবিক আলোর দৃষ্টি (কোণ্)
1,000	নিখুঁতভাবে দেখবার পক্ষে যথেষ্ট	
10,000	পূর্ণ সূর্যালোকে সাদা কাগজের দীপন	
100,000		
1,000,000, 10,000,000	অতি উজ্জ্বল ল্যাম্প ফিলামেণ্ট	
100,000,000	কার্বন আর্ক	রেটিনার পক্ষে ক্ষতিকারক
1,000,000,000	সূর্য	
10,000,000,000	প্রথম তিন মি. সে.-এ এ বোমা	

হল্দে রঙের যে গোলাকার বিন্দুটি রয়েছে, যাকে ম্যাকুলা লুটিয়া (Macula lutea) বলে, কোণ্ গ্রাহক-কোষের প্রাধান্য সেখানেই বেশী। রড গ্রাহক-কোষ সেখানে অনুপস্থিত। ম্যাকুলা লুটিয়ার আওতার বাইরে যত এগুনো যায়, রডের সংখ্যা ততই বাড়তে থাকে এবং কোণ্ গ্রাহক-কোষের সংখ্যা তত কমতে থাকে। আলোক অক্ষের 20° থেকে 30° কোণের প্রশস্ত জায়গাটুকু নিয়ে যে বলয়ের সৃষ্টি হয়েছে, দেখা গেছে—তার মধ্যে রডের প্রাধান্য সবচেয়ে বেশী। এই দু-প্রকার গ্রাহক-কোষে রয়েছে দুই রকম রাসায়নিক পদার্থ। আলো এদের মধ্যেই শোষিত হয়। রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় আলোক-শক্তির রূপান্তর ঘটে, পরিশেষে জন্ম নেয় স্নায়ু-প্রবাহ।

আগের কথাতেই আবার ফিরে আসতে হয়। কমপক্ষে কি পরিমাণ আলো চোখে এসে পড়লে দর্শনের অনুভূতি জাগে? মাপকাঠি দিয়ে এই আলোর পরিমাণকে, যা দর্শনের অনুভূতি জাগাতে সক্ষম হয়, বলা হয় নিরপেক্ষ দর্শনমাত্রা (Absolute visual threshold)। এই দর্শন-মাত্রাও অবশেষে ধার্য হয়েছে। জানা গেছে, কি পরিমাণ আলো চোখে এসে পড়া দরকার এবং তার কতটুকুই বা কাজে লাগে, গ্রাহক-কোষে শোষিত হয় এবং অনুভূতি জাগাতে সক্ষম হয়।

হেচ, স্‌ক্লেয়ার ও পাইরেনী এই মাত্রা নির্ধারণ করতে গিয়ে দেখেছেন, এর জন্যে সুরুতেই পর পর কতকগুলি ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন। যে লোকের উপর এই পরীক্ষা চালাতে হবে, তাকে অন্ততঃ পক্ষে মিনিট ত্রিশেক দুর্ভেদ্য অন্ধকারে রাখতেই হবে। এই সময় অতিক্রান্ত না হলে নাকি চোখের নিরপেক্ষ অনুভূতি (Absolute sensitivity) জাগা সম্ভব নয়। এর পরের ব্যবস্থা হলো আলোক সম্পাতের। এমনভাবে তা

কার্যকরী করতে হবে, যাতে আলো রেটিনার সেই অংশে গিয়েই পড়ে, যেখানে রড গ্রাহক-কোষের প্রাচুর্য রয়েছে। এরপর বেছে নিতে হবে সময়ের স্থায়িত্ব ও নির্দিষ্ট তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের আলোককে। দেখা গেছে, 5100Å তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের আলো এবং 0·001 সেকেণ্ড সময়ের স্থায়িত্বে আলোকসম্পাত ঘটলে রড্ গ্রাহক-কোষের অনুভূতির মাত্রা সবচেয়ে বেশী হয়।

হেচ ও তাঁর সহকর্মীরা এই উদ্দেশ্য নিয়ে যে যন্ত্র ব্যবহার করেছেন 3নং ছবিতে তারই নমুনা দেওয়া হয়েছে। আলোর উৎস হলো নির্দিষ্ট তড়িৎ-প্রবাহে চালিত কার্বন ফিলামেন্টের একটি ল্যাম্প (L)। এই আলোর উৎসের বৈশিষ্ট্য হলো, একটা নির্দিষ্ট মাত্রায় তার নিষ্ক্রমণ। এর পর আলোক-রশ্মিকে একটি নিরপেক্ষ ফিল্টার (F) এবং নিরপেক্ষ ঘনত্বের গোঁজ বা ওয়েজের (W) মধ্য দিয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হয়, যাতে পরিমাণগতভাবে আলোর প্রাবল্য কমে যায়। প্রিজম M_1 এবং M_2 গঠন করে এমন একটি যুগ্ম একবর্ণ উৎপাদক (Double monochromator), যা মধ্যস্থিত স্লিটের সাহায্যে শুধুমাত্র 5100Å তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের আলোর জোগান দেয়। এদের মধ্যস্থিত শাটার (S) 0·001 সেকেণ্ড সময়ের স্থায়িত্বের একক আলোকগুচ্ছের নিষ্ক্রমণ ঘটায়।
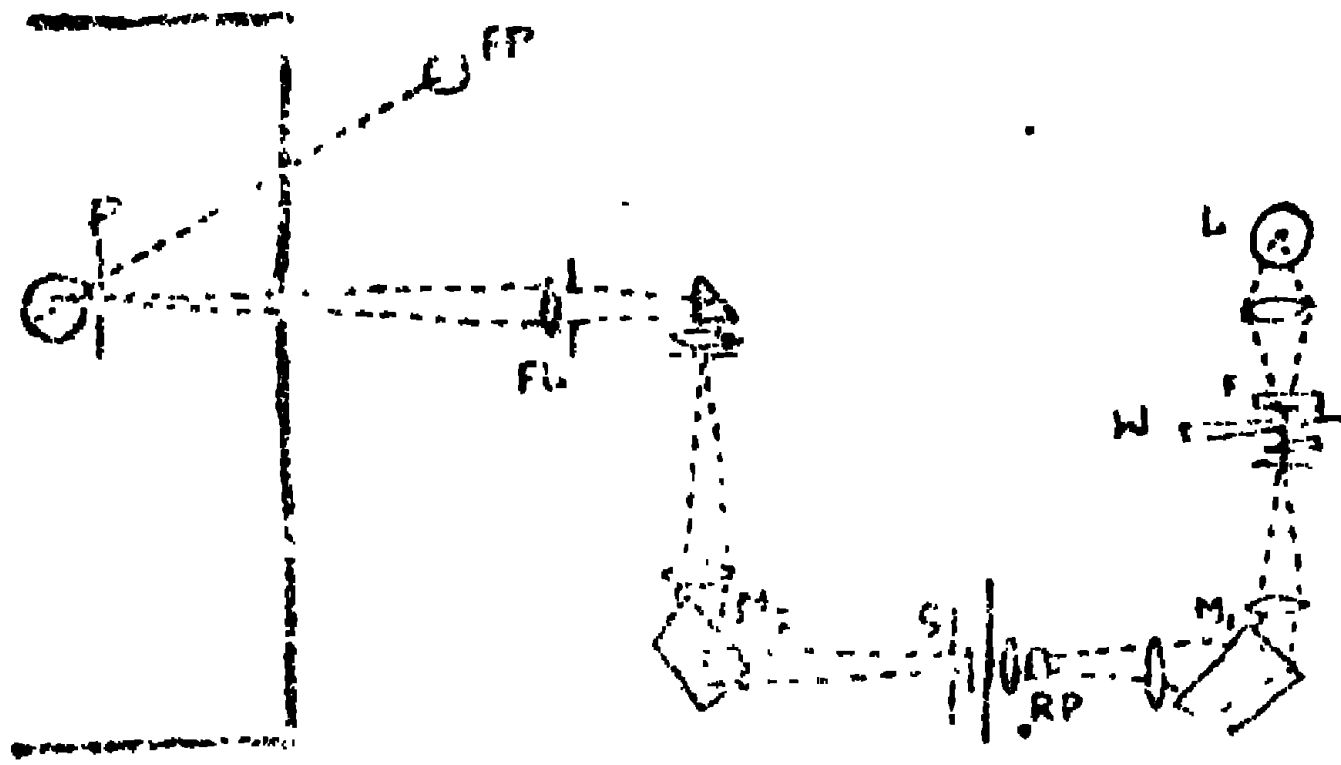
আলোর প্রাবল্যের পরিমাপ করা হয় থার্মোপাইলের সাহায্যে। আপতিত রশ্মিকে তাপে পরিণত করে যে তাপ-তড়িৎ প্রভবের (Thermoeletric potential) সৃষ্টি হয়, তাকে একটা স্থির বর্তনীযুক্ত সুগ্রাহী গ্যাল্ভ্যানোমিটার দিয়ে মেপে নেওয়া হয়।

বিভিন্ন তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের আলো নিয়ে একইভাবে কাজ করেছেন হেচ ও তাঁর সহকর্মীরা। তাঁদের এই পরীক্ষা থেকে যে ফলাফল পাওয়া গেছে, তাথেকে তাঁরা আলোর শক্তি ও তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের মধ্যে একটা সংযোগ স্থাপন করতে পেরেছেন [4নং চিত্র]। তাঁরা দেখতে পেয়েছেন 5100Å তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের নিরপেক্ষ দর্শনমাত্রার প্রক্রিয়ার হলো 2.1×10^{-10} থেকে 5.7×10^{-10} আর্গ; অর্থাৎ শুধুমাত্র যে আলো এসে প্রথমে চোখের কর্নিয়াতে পড়ে, তার শক্তির পরিমাণগত অবস্থাই হলো এটি। তাই বলে এই সবটুকু আলো কখনও রেটিনাতে পৌঁছুতে পারে না বা এর সবটুকুই অনুভূতি জাগাবার জন্যে দায়ী নয়।

3নং চিত্র

5100Å তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের আলোকণার মধ্যে যে শক্তি রয়েছে, শক্তিসূত্র থেকে দেখা যায় তার পরিমাণ হলো 3.84×10^{-12} আর্গ। অতএব 2.1×10^{-10} থেকে 5.7×10^{-10} আর্গ শক্তিতে আলোকণার সংখ্যাগত অবস্থা স্পষ্টতঃই দেখা যাচ্ছে 54 থেকে

148, অর্থাৎ অনুভূতি জাগাবার জন্তে নিদেনপক্ষে 54 থেকে 148টি আলোকণাকে অতি অবশ্য চোখে এসে পড়তে হবে। কিন্তু চোখে এসে পড়া এই সব কয়টি আলোকণাই শেষ পর্যন্ত রেটিনাতে
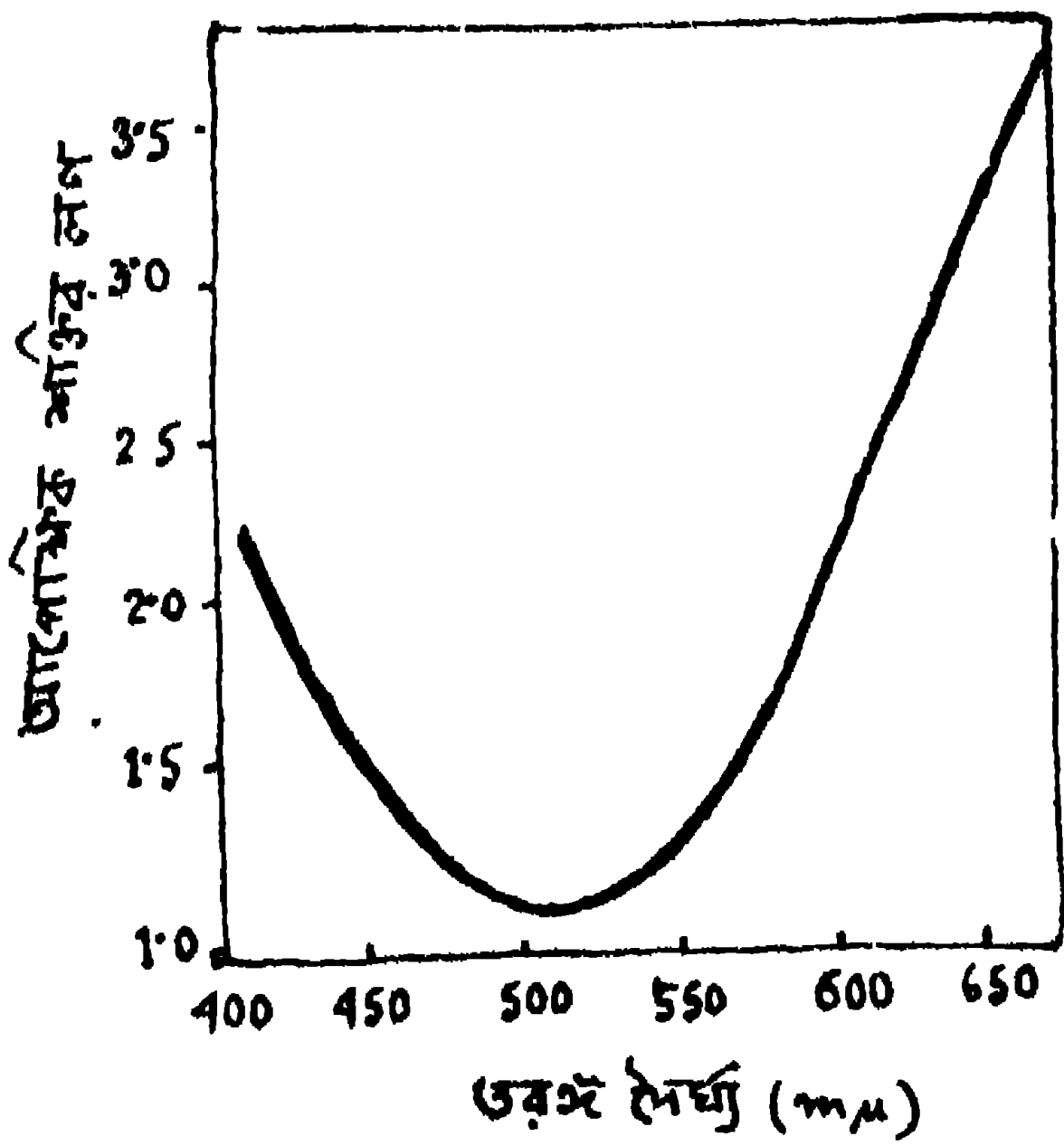
4নং চিত্র

গিয়ে পৌঁছুতে পারে না। কর্নিয়া থেকে রেটিনায় যাবার পথে তাদের অনেকগুলিই হারিয়ে যায়। তাই যথার্থ অনুভূতি জাগাবার জন্তে যতগুলি আলোকণার প্রয়োজন, তাদের সংখ্যা এর চেয়ে আরও কম।

চোখে এসে-পড়া আলোর শতকরা চারভাগ কর্নিয়া থেকে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে যায়। ফিরে যায় আলোক অক্ষের সঙ্গে 20° থেকে 30° কোণে বিচ্যুতি ঘটিয়ে। আবার কর্নিয়া থেকে রেটিনায় যাবার পথে শতকরা পঞ্চাশ ভাগ আলোকণা হারিয়ে যায় লেন্স ও চোখের ভিতরকার তরল পদার্থে (Ocular media), অর্থাৎ চোখের ভিতরকার লেন্স, অ্যাকোয়াস হিউমার ও ভিট্রিয়াস হিউমার পঞ্চাশ ভাগ আলোক শোষণ করে নেয়। বাকী যে আলো-কণাগুলি রেটিনাতে গিয়ে পৌঁছায়, তার সবকয়টিই আবার আলোক গ্রাহক-কোষে শোষিত হতে পারে না। তার একটা অংশ রেটিনাকে ভেদ করে তার ঠিক পিছনকার ব্ল্যাক প্রিন্টিং বা কালোস্তরে (কোরয়েড) গিয়ে শোষিত হয়। ঐ স্তরে না আছে কোন আলোক গ্রাহক-কোষ, না আছে তার কোন প্রকার অনুভূতি জাগাবার ক্ষমতা। শেষ পর্যন্ত হেচ ও তাঁর সঙ্গীরা দেখিয়েছেন, চোখে পড়া 5100 Å তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের আলোর কুড়ি শতাংশ মাত্র গ্রাহক-কোষে শোষিত হয়; অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে মাত্র 5 থেকে 14টি আলোকণা গ্রাহক-কোষের আলোক-সুগ্রাহী পদার্থে শোষিত হয় এবং দর্শনের অনুভূতি জাগায়। তাই প্রকৃত নিরপেক্ষ দর্শনমাত্রা 5 থেকে 14টি আলোকণার মধ্যে সীমিত বলা চলে। অবশ্য এই সংখ্যাও নাকি উর্ধ্বসীমা। প্রকৃত অনুভূতির ব্যাপারটা নাকি আরো কম সংখ্যক আলোকণার দ্বারা সম্পন্ন হতে পারে। আবার এমন ইঙ্গিতও পাওয়া গেছে, একটা আলোকণা নাকি একটিমাত্র গ্রাহক-কোষকে কর্মক্ষম করতে পারে। তাই যদি সত্য হয়, তবে আমরা বলতে পারি, অনুভূতি জাগাবার জন্তে অন্ততঃপক্ষে 5 থেকে 14টি রড্ গ্রাহক-কোষকে সক্রিয় অংশ নিতেই হবে।

রড্ ও কোণ্ গ্রাহক-কোষে আলোক-সুগ্রাহী যে পদার্থ রয়েছে, তা হলো যথাক্রমে রোডপ্সিন (Rhodopsin) ও আয়োডপ্সিন (Iodopsin)। এই আলোক-সুগ্রাহী পদার্থগুলিতে আলো শোষণের ফলে যে রাসায়নিক ক্রিয়া-বিক্রিয়া ঘটে অনেকটা বৃত্তাকার পথে, তারই ফলে জন্ম হয় স্নায়ু-প্রবাহের। এখানে তার বিশদ আলোচনা সম্ভব নয়, তবে এইটুকু বলা চলে যে, এই রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটাবার পথে সাহায্য করে বড় অংশীদার ভিটামিন-এ। ভিটামিন-এ-এর অভাব তাই এই পরিবর্তনকে বাধা দেয়, দেখবার পক্ষে বিঘ্ন ঘটায়, মানুষ রাতকানা হয়। শুধু তাই নয়,

চোখের উপরিভাগকে সিক্ত রাখবার জন্যে সর্বদা যে ল্যাক্রিমাল গ্রন্থি থেকে গ্রন্থিরস নিঃসৃত হয় সেই গ্রন্থিটিও ক্ষয়প্রাপ্ত হতে থাকে, চোখের উপরিভাগ শুকোতে থাকে, রক্তবর্ণ ধারণ করে, চোখে ছানি পড়ে।

স্নায়ু-প্রবাহ অনেকটা তড়িৎ-প্রবাহের মতই। রেটিনার সংস্পর্শে একটা ইলেকট্রোডকে রেখে অন্যটিকে চোখের পিছনে স্থাপন করে আলোক-সম্পাত ঘটিয়ে রেটিনার বিভব পরিবর্তনের পর্যায়-ক্রমিক রেকর্ড করা যায়। এই রেকর্ডকে বলা হয় ERG বা ইলেক্ট্রো রেটিনোগ্রাম [5 নং ছবি]

5 নং চিত্র

এই রেকর্ডের আকৃতি ও প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটে চোখে বিভিন্ন তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের আলোক সম্পাতে এবং পরিবেশ অনুযায়ী চোখের খাপ খাওয়ার অবস্থার পরিবর্তনে।

যে তিনটি রেকর্ড ছবিতে দেখানো হয়েছে, তার প্রথম দুটি (A ও B) নেওয়া হয়েছে চোখকে ঘন্টা-খানেক অন্ধকারে রেখে, চোখসওয়া করে, তৃতীয়টি (c) আলোতে। বড় পজিটিভ b-তরঙ্গটির উৎস সম্ভবতঃ রড্ গ্রাহক-কোষ। কম দীপনে এবং বেগুনী আলো সম্পাতে সবচেয়ে বড় আকার ধারণ করে এই তরঙ্গটি। নিগেটিভ a-তরঙ্গটি, দেখা গেছে আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে আলোকসহা চোখে এবং লাল আলোর উপস্থিতিতে। বলা হয় কোন গ্রাহক-কোষের মধ্যে ক্রিয়া-বিক্রিয়ায় এর জন্ম হয়, কারণ লাল আলোতে কোণ্ গ্রাহক-কোষের অনুভূতির মাত্রা সবচেয়ে বেশী।

অতএব দেখা যাচ্ছে, রেটিনায় অবস্থানকারী এই দু-জাতের গ্রাহক কোষই আলোক-শক্তির রূপান্তর ঘটায় এবং এদের অনুভূতির মাত্রা বিভিন্ন তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের আলোতে বিভিন্ন হয়। আলোক-শক্তির এই রূপান্তর তড়িৎ-শক্তির জন্ম দেয়, যা স্নায়ুর মারফৎ মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশে সঞ্চালিত হয়ে দর্শনের অনুভূতি জাগায়। অতএব বলা চলে— আলো, চোখ ও দর্শনের অনুভূতি জাগাবার মধ্যে যে ব্যবস্থা রয়েছে, তার সুষ্ঠু ক্রিয়া না হলে কোন কিছুই দেখা সম্ভব নয়।

সঞ্চয়ন

খাদ্য ও ধাতব সম্পদের অফুরন্ত ভাণ্ডার

যেদিন মানুষ প্রথম সাগরতীরে এসে দাঁড়িয়েছিল, সেদিন থেকেই সেই অনন্ত অতল জলের তলায় কি রয়েছে, তা জানবার জন্যে সে আকুল হয়েছে, সীমাহীন সমুদ্র তার মনে বিস্ময় সৃষ্টি করেছে।

আজ হাজার হাজার বছর পরেও সেই অবাক-দৃষ্টি নিয়েই সমুদ্রের দিকে সে তাকিয়ে রয়েছে। ঊর্ধ্বাকাশের মহাশূন্যে সে উধাও হয়েছে—চলে গেছে দূর থেকে দূরান্তরে নিঃসীম মহাজগতে। মহাজাগতিক রশ্মির কোন কোন রহস্যেরও সন্ধানও সে করেছে। পৃথিবী থেকে আড়াই লক্ষ মাইল দূরে চাঁদের বুকে সে পায়ে হেঁটে বেড়িয়ে এসেছে। কিন্তু মাত্র সাত মাইল নীচে সমুদ্রের তলদেশ সে আজও স্পর্শ করতে পারে নি—দেখে নি। সেই অতল জলের বাধা আজও মনে হয় যেন দুর্লঙ্ঘ্য।

এই দুর্লঙ্ঘ্য বাধা সত্ত্বেও সমুদ্রবেষ্টিত এই পৃথিবীর মানুষ সমুদ্রকে আজ অনেকখানি জানতে ও বুঝতে পেরেছে। সমুদ্রে সে সন্ধান পেয়েছে অফুরন্ত অমূল্য প্রাকৃতিক সম্পদের। বিজ্ঞানীরাও আজ বলছেন—খাদ্য, ধাতব পদার্থ ও তৈল সম্পদের দিক থেকে সমুদ্রই মানুষের শেষ আশ্রয় ও অবলম্বন। এই সকল সম্পদের অফুরন্ত ভাণ্ডার হচ্ছে সমুদ্র। পৃথিবীর জনসংখ্যা দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে, তেমনি বাড়ছে শিল্প। মানুষের সুখ ও সমৃদ্ধতর জীবনযাপনের আশা-আকাঙ্খা বেড়েছে প্রচুর পরিমাণে। এই পরিস্থিতিই জীবনযাত্রার পক্ষে অপরিহার্য উপকরণের নূতন নূতন ক্ষেত্র সন্ধানে মানুষকে বাধ্য করছে।

বিগত 2000 বছরের মধ্যে মানুষ যে পরিমাণ ধাতব পদার্থ ব্যবহার করে এসেছে, আগামী 30 বছরে তার বহুগুণ বেশী ধাতব পদার্থ প্রয়োজন হবে মানুষের। গত 100 বছরের মধ্যে মানুষ যে পরিমাণে শক্তিকে কাজে লাগিয়েছে, আগামী 20 বছরের মধ্যে শক্তির ব্যবহারও তার তিনগুণ বেড়ে যাবে। তবে যে হারে জনসংখ্যা বাড়ছে, তাতে দুর্ভিক্ষ ও খাদ্যাভাব থেকে বাঁচতে হলে আগামী 20 বছরের মধ্যে পৃথিবীর খাদ্যোৎপাদন শতকরা 50 ভাগ বাড়াতে হবে। এই বিষয়টিই সবচেয়ে চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। উন্নতিশীল রাষ্ট্রসমূহে অপুষ্টিজনিত সমস্যা ও বুভুক্ষা গুরুতর আকারে দেখা দিয়েছে। ভারত, পাকিস্তান এবং দক্ষিণ আমেরিকার কয়েকটি রাষ্ট্রে খাদ্য-উৎপাদন দ্বিগুণ বাড়ানো প্রয়োজন।

এই সকল জরুরী কারণেই মানুষের সম্পদ-সন্ধানী দৃষ্টি ফেরাতে হয়েছে সমুদ্রের দিকে। বিজ্ঞানীরা বলেন, সমুদ্রের উৎপাদন-শক্তি পৃথিবীর শস্যক্ষেত্রের চেয়ে হাজার গুণ বেশী। আলুর উদ্ভাবন খাদ্যজগতে এনেছে বিপ্লব। মানুষের উপযোগী সামুদ্রিক খাদ্যের যে দিন ব্যাপক চাষ সম্ভব হবে, সেদিন ঐ সকলও নিয়ে আসবে নূতন দিনের ইঙ্গিত এবং খাদ্যজগতে আর একটি নূতন বিপ্লব।

সারা বিশ্বের সমুদ্রের জলে মেশানো আছে 60 লক্ষ টন সোনা। এই বিরাট সম্পদ উদ্ধারের পথ আজও উদ্ভাবিত হয় নি। কিন্তু সমুদ্রের তলায় ছড়ানো রয়েছে কোটি কোটি টনের ম্যাঙ্গানিজ, নিকেল, কোবাল্ট, তামা প্রভৃতি ধাতু ও ফসফেটের পিণ্ড। একমাত্র লোহিত সাগরের তলাতেই রয়েছে

1200 কোটি টাকার প্রাকৃতিক সম্পদ। মানুষ বর্তমানে এই সকল সম্পদ সংগ্রহের দিকে দৃষ্টি দিয়েছে।

এই সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা বলেছেন যে, তার আগে সমুদ্রের তলায় ও অপেক্ষাকৃত অল্প গভীরে মহী-সোপান বা কন্টিনেন্টাল শেল্‌ফ এলাকায় সকল খবরাখবর নিতে হবে। ঐ সকল সম্পদ সংগ্রহের জন্যে কারিগরী দিক থেকে যে সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন, সেই সকল ব্যবস্থা উদ্ভাবন ও গ্রহণ করতে হবে।

এই পৃথিবীর মানুষ শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ে বেঁচে থাকে। এই মানুষের পক্ষে বায়ুহীন শূন্যময় মহাকাশে বেঁচে থাকবার মত সমুদ্রের তলায়ও বেঁচে থাকা কঠিন। তার কারণ অনেক। একে তো সমুদ্রের উপরে আছে ভীষণ, ভয়াল সামুদ্রিক ঝড়—তাথেকে রক্ষা পাওয়া মানুষের পক্ষে কঠিন। যখন সে সমুদ্রের গভীরে 300 ফুটেরও নীচে নামে, তখন প্রকৃতপক্ষে কোন কিছুই তার দৃষ্টি-গোচর হয় না, সূর্যের আলো ঐ পর্যন্ত আদৌ পৌঁছুতে পারে না। আর আছে অসহ্য চাপ, প্রচণ্ড শীতলতা। তাহলেও শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণের সাজ-সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতির সাহায্য নিয়ে সে সমুদ্রের গভীরে গিয়েছে। কিন্তু ঐ সকল যন্ত্রপাতির ক্ষমতা সীমিত। তাই সুদীর্ঘকাল সমুদ্রের তলায় থাকা তার পক্ষে সম্ভব হয় নি।

সাম্প্রতিক কালে এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটছে। সকল দেশের সহযোগিতায় মানুষ সমুদ্রজয়ের সঙ্কল্প নিয়েছে। ভারত মহাসাগরে আন্তর্জাতিক তথ্যানুসন্ধানী অভিযান দিয়েই এর সুরু হয়। 1960 সালে পাঁচ বছরের জন্যে এই পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল। তারপর 1970-এর দশকের জন্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সমুদ্র সম্পর্কে একটি দশসালা পরিকল্পনা গ্রহণের প্রস্তাব করে। ঐ দশসালা পরিকল্পনা সংক্রান্ত সকল কাজকর্ম রাষ্ট্রসঙ্ঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থার দীর্ঘমেয়াদী সামুদ্রিক তথ্যানুসন্ধান ও গবেষণা কার্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত হয়।

বিভিন্ন দেশের মিলিত উদ্যোগে ভারত মহা-সাগরে তথ্যানুসন্ধানী অভিযান চালাবার ফলে ঐ সমুদ্রের উপকূলবর্তী এলাকায় বহু স্থানে প্রচুর সম্পদের সন্ধান পাওয়া গেছে। বর্তমানে ভারত মহাসাগর থেকে বিশ লক্ষ টন মৎস্য সংগৃহীত হয়ে থাকে। উল্লিখিত তথ্যানুসন্ধানের ফলে এই সংগ্রহের পরিমাণ দশগুণ বাড়ানো যেতে পারে এবং বর্তমানে মাছ ধরবার যে সকল সাজসরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি রয়েছে, সেগুলির সাহায্যেই ঐ পরিমাণ সামুদ্রিক মৎস্য সংগ্রহ করা সম্ভব। মাছে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন আছে—উন্নতিশীল রাষ্ট্র-সমূহে, বিশেষ করে ভারত প্রভৃতি রাষ্ট্রে এই প্রোটিনের অভাব সামুদ্রিক মৎস্যের সাহায্যে মিটানো যেতে পারে বলে বিজ্ঞানীদের ধারণা।

আমেরিকার ন্যাশন্যাল অ্যাকাডেমী অব সায়েন্স-এর একদল তথ্যানুসন্ধানী বিজ্ঞানী আরব সাগর সম্পর্কে সমীক্ষা গ্রহণ করে বলেছেন, একমাত্র ঐ সাগর থেকে এক কোটি টন মাছ পাওয়া যেতে পারে। তার ফলে ঐ এলাকায় মৎস্যজীবীদের মোট বার্ষিক আয় 750 কোটি টাকায় গিয়ে পৌঁছুতে পারে। ঐ এলাকা ঐ মাছ রপ্তানী করে 500 কোটি টাকারও বেশী বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারে।

সম্প্রতি সমুদ্রসংলগ্ন জলাশয়ে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মৎস্যাদি চাষের যে ব্যবস্থা হয়েছে, তা ইতিমধ্যেই বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এই ব্যবস্থাকে বলা হয় অ্যাকোয়া কালচার। ইন্দো-নেশিয়াতে ঐ সকল জলাশয়ে প্রতি বর্গমাইলে 1300 টন মাছ সংগৃহীত হয়েছে। কিন্তু সমুদ্রো-পকূলবর্তী এলাকায় প্রতি বর্গমাইলে সেই স্থলে সংগৃহীত হয়েছে মাত্র দশ টন। রাষ্ট্রসঙ্ঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা এই প্রসঙ্গে বলেছেন যে, পূর্ব ও দক্ষিণ এশিয়ায় 140000 বর্গমাইলেরও বেশী জমিকে

জলাশয়ে পরিণত করে উল্লিখিত পদ্ধতিতে মাছের চাষ করা যেতে পারে। সমগ্র পৃথিবীর সমুদ্র থেকে যে পরিমাণ মৎস্য সংগৃহীত হয়ে থাকে, তার সমপরিমাণ মৎস্য ঐ সকল জলাশয় থেকে সংগৃহীত হতে পারে।

সমুদ্রে খাদ্যসম্পদের সন্ধান ও সংগ্রহ করতে যে সময় লাগবে, তার চেয়ে অনেক বেশী সময় লাগবে ধাতব পদার্থ সংগ্রহ করতে। তবে সমুদ্র থেকে ধাতব সম্পদ সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা খাদ্য-সম্পদ সংগ্রহ করবার মত জরুরী নয়। পৃথিবীর বহু গবেষণা কেন্দ্রেই সমুদ্র-বিজ্ঞানীরা নতুন নতুন পদ্ধতি ও যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন করছেন। মানুষ যাতে সমুদ্রের দু-হাজার ফুট নীচে গিয়ে সপ্তাহের পর সপ্তাহ এবং মাসের পর মাস থাকতে পারে, তথ্যানুসন্ধানে উদ্যোগী হতে পারে তারই জন্যে এই সকল প্রচেষ্টা। সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ এক ধরণের তথ্যানুসন্ধানী ডুবোজাহাজ বা সাবমেরিনও তৈরি হচ্ছে। এই সকল জাহাজ সমুদ্রের 20000 ফুট নীচে পর্যন্ত যাবে। অধিকাংশ সমুদ্রই এই পরিমাণে গভীর।

সামুদ্রিক সম্পদ সন্ধানের দিক থেকে মানুষ আজ এক নতুন যুগের দ্বারপ্রান্তে এসে পৌঁচেছে। গত দশ বছর সে সমুদ্রের অফুরন্ত সম্পদ সম্পর্কে নানা কল্পনা করে এসেছে, প্রকৃত তথ্যও সংগ্রহ করেছে। সমুদ্রের বিরাট মৎস্য-সম্পদ সংগ্রহ করে বুভুক্ষা ও অনাহার সম্পূর্ণ দূর করবার কথা, সমুদ্র-গর্ভের অফুরন্ত ধাতব সম্পদ সংগ্রহের কথাও সে ভেবেছে। আজ সমুদ্র-বিজ্ঞানী ও তথ্যানুসন্ধানীরা দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার ভিত্তিতে মিলিত উদ্যোগে এই সকল স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করবার জন্যে ব্রতী হয়েছেন।

স্থায়ী ফেরাইট চুম্বক

মলয় সরকার*

চুম্বকের সঙ্গে সভ্য মানুষ বহুদিন ধরে পরিচিত। এর ব্যবহার চলে আসছে প্রায় খৃঃ পূঃ 600 সাল থেকে। এই বস্তুটি পেয়ে মানুষ চুপ করে বসে থাকে নি। অনুসন্ধিৎসু মানুষ এর গুণাগুণ পরীক্ষা করে একে কাজে লাগিয়েছে। তাঁরা জানতো যে, চুম্বক সব সময় উত্তর-দক্ষিণে মুখ করে থাকে। সে জন্যে তখনকার দিনে চুম্বক কেবলমাত্র নৌবিভাগে অর্থাৎ জাহাজেই দিক নির্ণয় করবার কাজে ব্যবহৃত হতো।

সে সময়ে এই কাজে কেবলমাত্র প্রাকৃতিক চুম্বকই ব্যবহৃত হতো। কারণ তখনও কৃত্রিম চুম্বক তৈরির কৌশল মানুষের জানা ছিল না। তখন যে প্রাকৃতিক চুম্বক ব্যবহৃত হতো, তার নাম লোড স্টোন। এটি একটি ফেরাস ফেরাইট যৌগ। লোড স্টোন প্রথম পাওয়া যায় ম্যাগ্‌নেশিয়াতে। তাই দেশের নাম থেকে চুম্বকের নাম হলো ম্যাগ্‌নেট।

সুপ্রাচীন কাল থেকেই মানুষ চুম্বকের সঙ্গে পরিচিত হলেও বহুদিন পর্যন্ত কৃত্রিম চুম্বক তৈরির কোন চেষ্টাই হয় নি। কৃত্রিম উপায়ে স্থায়ী চুম্বক তৈরির প্রথম চেষ্টা করেন উইলিয়াম গিলবার্ট। স্থায়ী চুম্বক সম্বন্ধে তাঁর রচিত পুস্তক De Magnete প্রকাশিত হয় 1600 খৃষ্টাব্দে। 1600 খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত লোড স্টোনই একমাত্র স্থায়ী চুম্বকের উৎস ছিল।

* রসায়ন বিভাগ, ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব টেক্‌নোলজী, খড়্গপুর।

তারপর 150 বছর পরে 1750 খৃষ্টাব্দে বৃটিশ মিউজিয়ামের লাইব্রেরিয়ান, গোইন নাইট (Gowin Knight) অক্সাইড চূর্ণ থেকে স্থায়ী চুম্বক তৈরি করতে সক্ষম হন। সমসাময়িক কালে বৃটেন ছাড়া আর কোন দেশ স্থায়ী চুম্বক তৈরি করতে পারতো না। সে জন্যে চুম্বক বিক্রয় করে বৃটেন প্রচুর অর্থোপার্জন করেছিল।

এর পরে প্রায় দু-শ' বছর এই বিষয়ে উল্লেখযোগ্য কোন আবিষ্কার হয় নি। আবার 1938 সালে জাপানে ক্যাটো (Kato) ও টাকেই (Takei) নামে দু-জন বৈজ্ঞানিক কোবাল্ট ফেরাইট থেকে স্থায়ী চুম্বক প্রস্তুত করেন। 1954 সালে 'A Class of New Parmanent Magnet Materials' নামক পত্রিকায় অ্যানাইসোট্রপিক (Anisotropic) বেরিয়াম ফেরাইট থেকে চুম্বক তৈরির কথা প্রকাশিত হয়। বর্তমানেও এই পদ্ধতিতেই স্থায়ী চুম্বক তৈরি করা হচ্ছে।

স্থায়ী চুম্বকের সাধারণ ফর্মুলা হলো [MO, $6Fe_2O_3$]—M=বেরিয়াম, স্ট্রনশিয়াম, সীসা, অথবা এগুলির মিশ্রণ। এই ফেরাইটের কেলাসের আকৃতি ষড়ভূজের মত। বেরিয়াম ফেরাইট চুম্বক তৈরির উপায় 1নং চিত্রে দেখানো হয়েছে।

এই পদ্ধতিতে বেরিয়াম কার্বনেট ও ফেরিক অক্সাইডের বিক্রিয়া হলো নিম্নরূপ—

$BaCO_3+6Fe_2O_3 \rightleftharpoons BaO+6Fe_2O_3+Co_2$। স্ট্রনশিয়াম অথবা সীসা ফেরাইটগুলি তাপীয় বিশ্লেষণের (Thermal decomposition) দ্বারা প্রস্তুত হয়। এর সঙ্গে সিলিকা, লেড্ সিলিকেট, বোরাক্স, বেক্টোনাইট ইত্যাদি মেশানো হয়। কখনও কখনও লৌহ যৌগের পরিমাণ কম দিলে সুফল পাওয়া যায়। কাঁচা মালের মিশ্রণের জন্যে রিবন ব্লেণ্ডার (Ribbon blender), এজ রানার (Edge runner) বল মিলস (Ball mills) প্রভৃতি ব্যবহার করা হয়।

ফেরাইট তৈরির তাপমাত্রা 100°C থেকে 1300°C হতে পারে। এই সময় একে স্ফটিকীকরণ করা হয়। এর পরে স্ফটিকের আকৃতি

বেরিয়াম কার্বোনেট
লৌহ অক্সাইড
ফেরাইট তৈরির জন্যে উত্তাপ
আকৃতি ক্ষুদ্রকরণ
সিন্টার
ম্যাগনেসাইট

1নং চিত্র

সমান ও ছোট করা হয়। বল মিলস ব্যবহৃত হয়, কারণ প্রচুর পরিমাণে স্ফটিক তৈরির কাজে বল মিলস সাহায্য করে।

আমরা অ্যালনিকো (ALNICO) চুম্বকের কথা জানি। এই চুম্বক অ্যালুমিনিয়াম, নিকেল, ও কোবাল্ট থেকে তৈরি হয়। সে জন্যে তিনটি উপাদানের প্রথম দুটি অক্ষর নিয়ে এই চুম্বককে অ্যালনিকো (AL-NI-CO) বলা হয়। আমরা এই অ্যালনিকো চুম্বকের সঙ্গে ফেরাইটের গুণাগুণ তুলনা করতে পারি। 2নং চিত্রে দুই সর্বোচ্চ পিক্ এনার্জি প্রোডাক্ট (Peak Energy Product) ও দ্বিতীয়টির সর্বোচ্চ প্রতিরোধ ক্ষমতা (Coercive force) আছে। অ্যালনিকো চুম্বকের প্রতিরোধ ক্ষমতা ফেরাইট চুম্বকের অর্ধেক বা তারও কম। ফেরাইট চুম্বকের এই সব গুণাগুণের জন্যে আজকাল নানাভাবে এই চুম্বক ব্যবহৃত হয়।

চুম্বক আমাদের নব সভ্যতার এক বিশিষ্ট উপাদান। এর প্রয়োজনীয়তা অসংখ্য। টেলিভিসন সেট, বৈদ্যুতিক ঘাড়, লাউডস্পীকার, ডায়নামো, ডাইরেক্ট কারেন্ট মোটর (D. C. Motor)
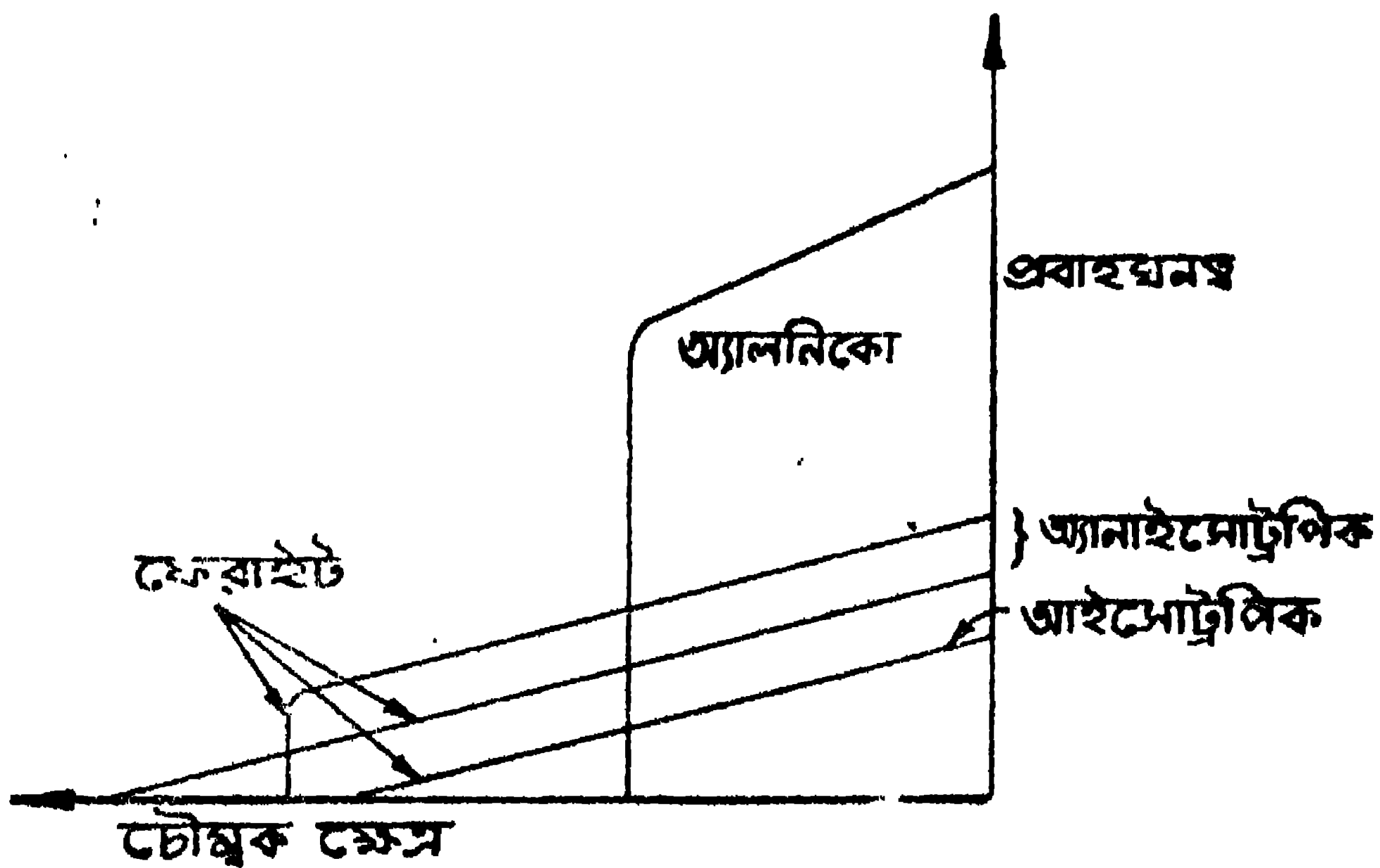
2নং চিত্র

রকমের অ্যানাইসোট্রপিক ফেরাইট ও এক রকমের আইসোট্রপিক ফেরাইট দেখানো হয়েছে। দুটি অ্যানাইসোট্রপিক ফেরাইটের মধ্যে একটির প্রভৃতি নানা কাজে এই চুম্বক ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া ইলেকট্রন অপটিক্সের (Electron optics) কাজেও এই চুম্বক ব্যবহৃত হয়।

বিজ্ঞান-সংবাদ

জীবাণুরও গন্ধ শোঁকবার শক্তি আছে

পশুদের মত জীবাণুদেরও গন্ধ শোঁকবার শক্তি আছে, তারাও কোন্‌টা তাদের খাদ্য, কোন্‌টা অখাদ্য বুঝতে পারে—আমেরিকার হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা এই তথ্য আবিষ্কার করেছেন। ডাঃ স্যামুয়েল কোগেলের নেতৃত্বে এই বিষয়ে গবেষণা চালানো হয়েছিল। তিনি বলেছেন যে, সমুদ্র দূষিত হচ্ছে। সমুদ্রের মলিনতা দূর করবার ব্যাপারে এই আবিষ্কার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। সামুদ্রিক জীবাণু সমুদ্রকে মলিনতা থেকে মুক্ত রাখে এবং সামুদ্রিক জীবজন্তুর বিকাশের পক্ষেও সহায়ক হয়ে থাকে। সমুদ্রের কোন কোন অঞ্চলে মলিনতা বৃদ্ধির যে আশঙ্কা দেখা দিয়েছে—জীবাণুর সাহায্যে সেই আশঙ্কা দূর করা যেতে পারে।

মস্তিষ্কে শল্য-চিকিৎসার নূতন পদ্ধতি

মস্তিষ্ক ও হৃদ্‌যন্ত্রের শল্য-চিকিৎসার সময় রোগীকে যান্ত্রিক হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুসের সাহায্যে বাঁচিয়ে রাখা হয়। আমেরিকার দু-জন শল্য-চিকিৎসক এই যন্ত্রের সাহায্য না নিয়েই দু-জন রোগীর মস্তিষ্কের শল্য-চিকিৎসা করেছেন। এরা দু-জনই ক্যান্সার রোগে ভুগছিলেন। চিকিৎসকগণ রোগীর দেহকে বরফ দিয়ে ঢেকে হৃৎপিণ্ডকে শীতল করেন এবং মস্তিষ্ককে শীতল করেন যথেষ্ট পরিমাণ বরফ-জল দিয়ে। তারপর ঐ স্থানে শল্য-চিকিৎসা চালানো হয়। চিকিৎসকগণ বলেছেন যে, মস্তিষ্কের কোন রকম ক্ষতি না করে ঐ পদ্ধতিতে প্রায় এক ঘণ্টা ধরে শল্য-চিকিৎসা করা সম্ভব হয়েছে, তবে রোগীকে বাঁচানো যায় নি। মস্তিষ্কের রোগদুষ্ট স্থানে রক্ত চলাচল বন্ধ থাকে বলে ঐ স্থানটি শীতল না করে শল্য-চিকিৎসা করা সম্ভব নয়। নতুবা পাঁচ মিনিট পরেই রোগীর অবস্থার অবনতি ঘটে।

ধূমপানের সঙ্গে হৃদ্‌রোগের সম্পর্ক

আমেরিকার টেনেসী বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ টেড পি ম্যাকডোনাল্ড বলেছেন—যারা ধূমপান করে না, তাদের তুলনায় যারা ধূমপান করে, তাদের মৃত্যুর হার যে নয় গুণ বেশী—এই কথা আমরা জানি। কিন্তু কি যে তার কারণ, সেই বিষয়ে অনুসন্ধান খুব কমই হয়েছে। তিনি এই প্রসঙ্গে আরও বলেন যে, রক্তপ্রবাহে অতি ক্ষুদ্র গোলাকার যে অণুচক্রিকা বা প্লেটলেট্‌স্ আছে, তাদের প্রকৃতি আঠালো। প্রাথমিক পরীক্ষায় দেখা গেছে—যারা ধূমপান করে, ধোঁয়ার সংস্পর্শে এসে এই সকল পদার্থ আরও আঠালো হয়ে পড়ে। তারই ফলে রক্ত হয়তো জমাট বেঁধে যায়, ফলে হৃদ্‌রোগের আক্রমণ হয়ে থাকে এবং ঐ রোগেরও উপসর্গ দেখা দেয়।

কুষ্ঠরোগ চিকিৎসায় অগ্রগতি

সুইডেনের ডাক্তার আরমুর হ্যানসেন 1873 সালে কুষ্ঠ ব্যাধির জীবাণুর সন্ধান পেয়েছিলেন, কিন্তু তখন পর্যন্ত গবেষণাগারে কোন কৃত্রিম উপায়ে সেই সকল জীবাণু তৈরি করা সম্ভব হয় নি। এই কথা আমেরিকার লেপ্রোসী ফাউণ্ডেশনের ডাঃ জন এইচ হ্যাংক্স দশ বছর আগে 1961 সালে বলেছিলেন। তাঁর এই কথা আজও খানিকটা সত্য হলেও বিশেষ সীমিত অবস্থার মধ্যে একজন ভারতীয় তরুণ চিকিৎসক

সম্প্রতি কুষ্ঠরোগের জীবাণু কৃত্রিম উপায়ে তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন। এঁর নাম ডাঃ বেথরেজ্জী কাওাখামী। ইনি এই বিষয়ে আমেরিকান লেপ্রোসী ফাউণ্ডেশন জন হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সহযোগিতায় এক বছর ধরে গবেষণা করেছেন।

ডাঃ কাওাখামী সম্প্রতি বালটিমোরে এক সাক্ষাৎকারে তাঁর এই গবেষণা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, কৃত্রিম উপায়ে এই রোগের জীবাণু তৈরি করা সম্ভব হয়েছে বলে এই রোগের প্রতিষেধক টিকা আবিষ্কারের পথও সুগম হলো। এই রোগ স্নায়ু, চোখ, ত্বক এবং মিউকাস মেমব্রেন নষ্ট করে দেয়। পৃথিবীর প্রায় 1 কোটি 10 লক্ষ লোক এই রোগে ভুগছে। ডাঃ কাওাখামী বর্তমানে মাদ্রাজের একটি কুষ্ঠরোগ কেন্দ্রে নিযুক্ত রয়েছেন।

আমেরিকার জন হপকিন্স ইউনির্ভাসিটি স্কুল অব হাইজীন অ্যাণ্ড পাবলিক হেলথে তথ্যানুসন্ধান কালে তিনি প্রাথমিক অবস্থায় এই রোগের লক্ষণ নির্ণয়ের পন্থা নিরূপণ, কোন কোন কুষ্ঠ-ব্যাধি সংক্রামক কিনা, তা নির্ধারণ এবং নূতন ঔষধ আবিষ্কারের জন্যে চেষ্টা করেছেন। এই রোগের প্রাথমিক লক্ষণ—দেহের রোগাক্রান্ত অঞ্চল অসাড় হয়ে পড়ে।

আমেরিকার দক্ষিণাঞ্চলের রাজ্য লুইজিয়ানার প্রখ্যাত কারভিল লেপ্রোসী হাসপাতালে আয়োজিত একটি আলোচনা সভায় ডাঃ কাওাখামী বলেছিলেন যে, আমেরিকায় এই রোগ চিকিৎসার বহু নূতন ঔষধপত্র বের হয়েছে। ভারতের 25 লক্ষ কুষ্ঠ রোগীর চিকিৎসায় এই সকল ঔষধ খুবই কাজে লাগবে এবং এই রোগ দূরীকরণের উদ্যোগে খুবই সহায়ক হবে বলেই তাঁর ধারণা। তিনি এই প্রসঙ্গে আরও বলেন যে, আমেরিকায় সারা বছরে মাত্র 47 জন এই রোগে আক্রান্ত হলেও এই রোগ সম্পর্কে সে দেশে যে পরিমাণে গবেষণা ও শিক্ষাদীক্ষার ব্যবস্থা হয়ে থাকে, তার তুলনা নেই।

ভারত সরকার ভারতের কুষ্ঠরোগীদের সম্পর্কে সমীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করেছেন। জন হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ে এই বিষয়ে উন্নততর পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে। রোগাক্রান্তদের সম্পর্কে সমীক্ষা গ্রহণের উন্নততর পদ্ধতি এই রোগ নিয়ন্ত্রণের পক্ষে খুবই সহায়ক হবে। প্রথম অবস্থায় যাতে এই রোগ ধরা পড়ে ও রোগীদের পৃথক করে রাখা হয়, তার ব্যবস্থা করতে হবে। রোগীরা সম্পূর্ণ অশক্ত ও অবশ হয়ে পড়বার আগেই তাদের পৃথক করে রাখলে এই রোগের সংক্রমণ প্রতিহত করা যেতে পারে।

ভারত সরকার কুষ্ঠরোগ ও রোগীদের সমীক্ষা সম্পর্কে একটি ব্যাপক কার্যসূচী গ্রহণ করেছেন। প্রতিটি বাড়ীতে গিয়ে রোগীদের খোঁজ নেওয়া হচ্ছে, চিকিৎসকদের পাঠানো হচ্ছে এবং রোগীদের নিয়মিত চিকিৎসা যাতে হতে পারে তার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। বর্তমানে আমেরিকায় এই রোগের যে সকল ঔষধপত্র বের হচ্ছে, তাতে এই রোগ সম্পূর্ণ নির্মূল করা সম্ভব হবে। ভারতে এই রোগের চিকিৎসায় সালফোন ব্যবহৃত হয়। এই ঔষধ খুবই কার্যকরী হয়ে থাকে এবং চিকিৎসার খরচও খুবই কম। এই রোগ সম্পর্কে সাধারণ লোকের একটা ভীষণ আতঙ্ক রয়েছে। এই রোগ খুব একটা সংক্রামক নয় এবং এর সম্পূর্ণ নিরাময়ও সম্ভব।

জন হপকিন্স ইউনির্ভাসিটি স্কুল অব হাইজীন অ্যাণ্ড পাবলিক হেলথ আমেরিকার একটি সুবিখ্যাত চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান। বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা ও শিক্ষার জন্যে 1961 সালে জন হপকিন্স ইউ-নির্ভাসিটি সেন্টার ফর মেডিকেল রিসার্চ অ্যাণ্ড

ট্রেনিং নামে কলকাতায়ও এই বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। 1963 সাল থেকে ঐ কেন্দ্রে কলকাতার অল ইণ্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব হাইজীন অ্যাণ্ড পাবলিক হেলথের সহযোগিতায় কুষ্ঠরোগ সম্পর্কে গবেষণা ও তথ্যানুসন্ধানের ব্যবস্থা হয়েছে।

গ্রহদের দূরত্ব বিষয়ে একটি আলোচনা

শ্রীকামিনীকুমার দে

সূর্য হইতে গ্রহদের দূরত্বের মধ্যে একটি সরল সম্বন্ধ পাওয়া যায়। ইহাতে 3—এই সংখ্যার একটি প্রভাব দৃষ্ট হয়। সূর্য হইতে ক্রমবর্ধমান দূরত্ব অনুসারে গ্রহগুলি হইল :—বুধ, শুক্র, পৃথিবী মঙ্গল, (গ্রহাণুপুঞ্জ), বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস, নেপচুন এবং প্লুটো। সূর্য হইতে পৃথিবীর দূরত্বকে 10 ধরা হয়। এখন 3 হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বিগুণোত্তর ছয়টি সংখ্যা নেওয়া হইল—

3 6 12 24 48 96

শুক্র হইতে ইউরেনাস পর্যন্ত গ্রহগুলির দূরত্বের জন্য

পৃথিবীর দূরত্ব = শুক্রের দূরত্ব + 3 অর্থাৎ শুক্রের দূরত্ব = 10−3 = 7

মঙ্গলের দূরত্ব = পৃথিবীর দূরত্ব + 6 = 10 + 6 = 16

গ্রহাণুপুঞ্জের দূরত্ব = মঙ্গলের দূরত্ব + 12 = 16+12 = 28

বৃহস্পতির দূরত্ব = গ্রহাণুপুঞ্জের দূরত্ব + 24 = 28 + 24 = 52

শনির দূরত্ব = বৃহস্পতির দূরত্ব + 48 = 52 + 48 = 100

ইউরেনাসের দূরত্ব = শনির দূরত্ব + 96 = 100 + 96 = 196

কিন্তু প্রথম গ্রহ বুধ এবং শেষ দুইটি গ্রহ নেপচুন ও প্লুটোর দূরত্বের নিকটবর্তী মান পাইতে হইলে

বুধের দূরত্ব + 3 = শুক্রের দূরত্ব অর্থাৎ বুধের দূরত্ব = 7−3 = 4

নেপচুনের দূরত্ব = ইউরেনাসের দূরত্ব + 96 = 196 + 96 = 292

আবার প্লুটোর দূরত্ব = নেপচুনের দূরত্ব + 96 = 292 + 96 = 388

এখানে বুধের জন্য প্রথম সংখ্যা 3 এবং নেপচুন ও প্লুটো প্রত্যেকের জন্য শেষ সংখ্যা 96 প্রয়োগ করা হইয়াছে।

সূর্য হইতে পৃথিবীর দূরত্বকে (পনেরো কোটি কিলোমিটার) গ্রহ-তারার দূরত্ব পরিমাপের একক ধরা হয়; ইহাকে জ্যোতির্বীয় একক বলা হয়।

উপরে যে সমস্ত দূরত্ব সংখ্যা দেওয়া হইয়াছে, তাহাদিগকে 10 দিয়া ভাগ করিলে গ্রহদের দূরত্ব জ্যোতির্বীয় এককে পাওয়া যায়।

নিম্নে প্রথম সারিতে জ্যোতির্বীয় এককে গ্রহদের উক্ত পর্যায়ে প্রাপ্ত দূরত্ব, দ্বিতীয় সারিতে প্রকৃত দূরত্ব, তৃতীয় সারিতে তাহাদের ভর (পৃথিবীর ভরকে একক ধরিয়া) এবং চতুর্থ সারিতে গতিপথে তাহাদের বেগ (প্রতি সেকেণ্ডে মাইলে) দেওয়া হইয়াছে।

গ্রহ	বুধ	শুক্র	পৃথিবী	মঙ্গল	গ্রহাণু-পুঞ্জ	বৃহস্পতি	শনি	ইউরেনাস	নেপচুন	প্লুটো
(প্রাপ্ত) দূরত্ব	·4	·7	1	1·6	(2·8)	5·2	10·0	19·6	29·2	38·8
প্রকৃত দূরত্ব	·387	·72	1	1·52	—	5·2	9·54	19 19	30·07	39·52
ভর	0·05	0·81	1	0·11	—	318	95·2	14·6	17·2	0·1
গতিপথে বেগ (প্রতি সেকেণ্ডে মাইল)	29·7	21·7	18·5	15	—	8·1	6·0	4·2	3·4	3

বুধ হইতে ইউরেনাস পর্যন্ত প্রাপ্ত দূরত্বের সহিত প্রকৃত দূরত্বের বিশেষ পার্থক্য নাই। নেপচুন ও প্লুটোর ক্ষেত্রে পার্থক্যটা কিছু বেশী হইলেও স্থূলভাবে ধরিতে গেলে ইহা গ্রাহ্য নহে। তবে অন্তরতম গ্রহ বুধ এবং বহির্গ্রহ নেপচুন ও প্লুটোর দূরত্ব অন্যান্য গ্রহদের নিয়মে পাওয়া যায় নাই। ইহা একটা সমস্যা বটে।

তৃতীয় সারি হইতে দেখা যায় বুধের ভর শুক্রের ভরের $\frac{1}{16}$। এমনও তো হইতে পারে, বুধ আদিতে শুক্রের উপগ্রহ ছিল (বর্তমানে শুক্রের কোন উপগ্রহ নাই, ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়), কিন্তু শুক্রের আকর্ষণ তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারে নাই, সূর্য তাহাকে নিজের দিকে টানিয়া লইয়াছে। অতঃপর বুধ তাহার বেগ অনুযায়ী দূরত্বে থাকিয়া সূর্য প্রদক্ষিণ করিতে কোন বাধা নাই। (দূরের গ্রহের বেগ কম, কাছের গ্রহের বেগ বেশী, চতুর্থ সারি দ্রষ্টব্য) প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিজ্ঞানী লিটলটনের মতে প্লুটো এক সময়ে নেপচুনের উপগ্রহ ছিল। নেপচুনের ভর প্লুটোর ভরের অন্ততঃ 170 গুণ। প্লুটোর কক্ষের উৎকেন্দ্রিকতা অত্যধিক। সূর্যের নিকটতম অবস্থানে আসিলে ইহা নেপচুনের কক্ষের ভিতরই ঢুকিয়া পড়ে। তখন ইহা সূর্য হইতে 29 একক দূরে আর দূরতম অবস্থানে সূর্য হইতে অন্ততঃ 40 একক দূরে। এই সমস্ত কারণে মনে হয়, প্লুটো নেপচুনের উপগ্রহ ছিল। নেপচুনের আকর্ষণ প্লুটোকে ধরিয়া রাখিতে পারে নাই, কিন্তু ইহা সূর্যের প্রবল আকর্ষণের হাত এড়াইতে পারে নাই, তাই সূর্যের আকর্ষণে বাঁধা পড়িয়া সূর্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে—বুধ যেমন শুক্র হইতে সূর্যের নিকটতর, প্লুটো সে রকম নেপচুন হইতে নিকটতর হইল না কেন? তদুত্তরে বলা যায়, প্লুটো যখন নেপচুনের উপগ্রহ ছিল, তখন ইহা গ্রহকে পূর্ব হইতে পশ্চিমাভিমুখে প্রদক্ষিণ করিত। (সাধারণতঃ উপগ্রহ এবং গ্রহদের গতি পশ্চিম হইতে পূর্বাভিমুখে, কিন্তু নেপচুনের যে দুইটি উপগ্রহ আছে, তাহাদের বড়টি পূর্ব হইতে পশ্চিমাভিমুখে গ্রহ প্রদক্ষিণ করে)। তাহা হইলে প্লুটোর লব্ধি বেগ ইউরেনাসের বেগ অপেক্ষা কম হয় এবং এই কারণে ইহা নেপচুন হইতে দূরবর্তী গ্রহে পরিণত হইয়াছে। তাহা যেন হইল; কিন্তু ইউরেনাসের পরবর্তী গ্রহ নেপচুনের দূরত্বে যে ব্যতিক্রম, তাহার কোন সমাধান আমরা পাই না। উপরে প্রদত্ত তৃতীয় সারিতে দেখা যায়, ইউরেনাস, নেপচুন ও প্লুটোর ভর যথাক্রমে 14·6, 17·2 এবং 0·1; ইহাদের ভরের সমষ্টি 31·9। পূর্ববর্তী গ্রহ শনির ভর 95·2। এই ভরের মধ্যেই হয়তো কোন রহস্য নিহিত আছে। আদিতে এই তিনটি গ্রহই কি 19·6 দূরত্বে এক ছিল? প্রথমে ইউরেনাস ও নেপচুন এবং তাহাদের উপগ্রহের উদ্ভব হয়, তারপর নেপচুনের উপগ্রহ প্লুটো বিচ্ছিন্ন হইয়া গ্রহে পরিণত হয়। ইহাও লক্ষণীয় যে, ইউরেনাস এবং নেপচুনের গঠন-উপাদান একই,' প্রধানতঃ জল, মিথেন এবং অ্যামোনিয়া।

জার্মেনীর বার্লিনে শিক্ষাগ্রহণ করেন। বার্লিনে তিনি বৈদ্যুতিক যন্ত্রবিদ্যায় ডিপ্লোমা ও পরে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি প্রথমে জার্মান রিসার্চ অ্যাসোসিয়েশনে সহকারী গবেষক ও তারপর সীমেন্স অ্যাণ্ড হাল্স্কে-এ গবেষক ইঞ্জিনীয়াররূপে গবেষণা করেন।

সে সময় বার্লিন ছিল তরুণ বিজ্ঞানীদের কাছে তীর্থক্ষেত্রস্বরূপ। গ্যাবর সেখানে আইনষ্টাইন, প্লাঙ্ক, শ্রোয়েডিঙ্গার, ফন লাউয়ে প্রমুখ মহারথীদের বক্তৃতা শোনবার সুযোগ পান। উচ্চ শক্তিসম্পন্ন ক্যাথোড রশ্মির অসিলোগ্রাফ সম্পর্কে গ্যাবর প্রথমে গবেষণা সুরু করেন। তিনি এক্ষেত্রে যে সব নতুন নতুন জিনিষ উদ্ভাবন করেন, তার কয়েকটি বেশ কিছুকাল আদর্শস্থানীয় বলে চলেছিল। সীমেন্স-এ থাকাকালে তিনি গ্যাসের মোক্ষণ সম্পর্কে গবেষণা করেন এবং গ্যাস মোক্ষণের তত্ত্ব ও প্লাজ্মা সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহী হয়ে ওঠেন। 20 বছর পরে ইম্পিরিয়াল কলেজে তিনি কোন কোন প্লাজ্মা অবস্থায় ইলেকট্রনগুলির মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া-বিক্রিয়ার এক ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম হন।

1933 সালে নাৎসীরা ক্ষমতায় আসবার সঙ্গে সঙ্গে ডক্টর গ্যাবর জার্মেনী ছেড়ে হাঙ্গেরীতে চলে আসেন এবং পরের বছর বৃটেনে এসে বৃটিশ টমসন হিউস্টন প্রতিষ্ঠানে গবেষক-ইঞ্জিনীয়ার হিসাবে যোগদান করেন। এখানে তিনি গ্যাস-মোক্ষণ সম্পর্কে গবেষণা চালিয়ে যান এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার পর ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্র সম্পর্কে গবেষণা করবার সময় হোলোগ্রাফীর পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। সে সময় এই পদ্ধতি 'তরঙ্গমুখ পুনর্গঠন' (Wave front reconstruction) [illegible] চিহ্নিত ছিল।

[illegible] সালে ডক্টর গ্যাবর লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের [illegible] ইলেকট্রনিক্সের বিষয়ে রীডার [illegible]8 সালে তিনি ফলিত ইলেকট্রনিক পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক হন এবং 1967 সালে এই পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। বর্তমানে তিনি ইম্পিরিয়াল কলেজের এমেরিটাস অধ্যাপক এবং অন্যতম সিনিয়র রিসার্চ ফেলো।

পদার্থ-বিজ্ঞানে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্যে ডক্টর গ্যাবর দেশ-বিদেশের বহু সম্মান ও পদক লাভ করেছেন। তিনি হাঙ্গেরীর অ্যাকাডেমি অব সায়েন্স-এর সম্মানীয় সদস্য, লণ্ডনের রয়েল সোসাইটির ফেলো এবং সি. বি. ই। তিনি একজন সমাজ-সচেতন সুলেখকও। 'Inventing the future' নামে তাঁর গ্রন্থখানি বিজ্ঞানী মহলে বিশেষ সমাদর লাভ করেছে। এছাড়া 'The Electron microscope' এবং সম্প্রতি (1970) 'Innovation: Scientific, Technological and Social' নামে তাঁর দুখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে এবং প্রায় 100টি গবেষণা-নিবন্ধের তিনি রচয়িতা।

শারীরতত্ত্ব ও ভেষজ বিজ্ঞান

এবছর (1971) শারীরতত্ত্ব ও ভেষজ-বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভ্যাণ্ডারবিল্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের শারীর-বিজ্ঞানী ডক্টর আর্ল উইলবার সাদারল্যাণ্ড (জুনিয়র) [নভেম্বর '71 সংখ্যায় এই সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে]। শারীরতত্ত্বে যে অবদানের স্বীকৃতিতে সাদারল্যাণ্ডকে পুরস্কার দেওয়া হয়েছে, তার উল্লেখ করে স্টকহোমের ক্যারোলিনস্কা মেডিকেল ইনস্টিটিউট বলেছেন—যে প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন হর্মোন দেহের মধ্যে তাদের গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদন করে থাকে, তা এতদিন রহস্যময় ছিল। ডক্টর সাদারল্যাণ্ডের গবেষণার ফলে তাদের অনেকগুলির সাধারণ কার্যপ্রণালী আজ আমরা উপলব্ধি করতে পেরেছি।

25 বছর আগে সাদারল্যাণ্ড যখন এই বিষয়ে গবেষণা সুরু করেন, তখন তিনি কোন রোগ-বিশেষ নিরাময় বা প্রতিরোধ করবার, অথবা স্বাস্থ্য

উন্নতির কোন নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবনের বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ আরম্ভ করেন নি। 1946-47 সালে ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষক হিসাবে কাজ করবার সময় তিনি নিছক কৌতূহলবশে হর্মোন সংক্রান্ত অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হন।

আমরা জানি, হর্মোন বা অন্তঃস্রাবী রস হচ্ছে বিশেষ ধরণের রাসায়নিক পদার্থ। প্রাণিদেহের মধ্যে থাইরয়েড, পিটুইটারি ইত্যাদি অন্তঃস্রাবী

ডক্টর আর্ল ডাব্লিউ সাদারল্যাণ্ড
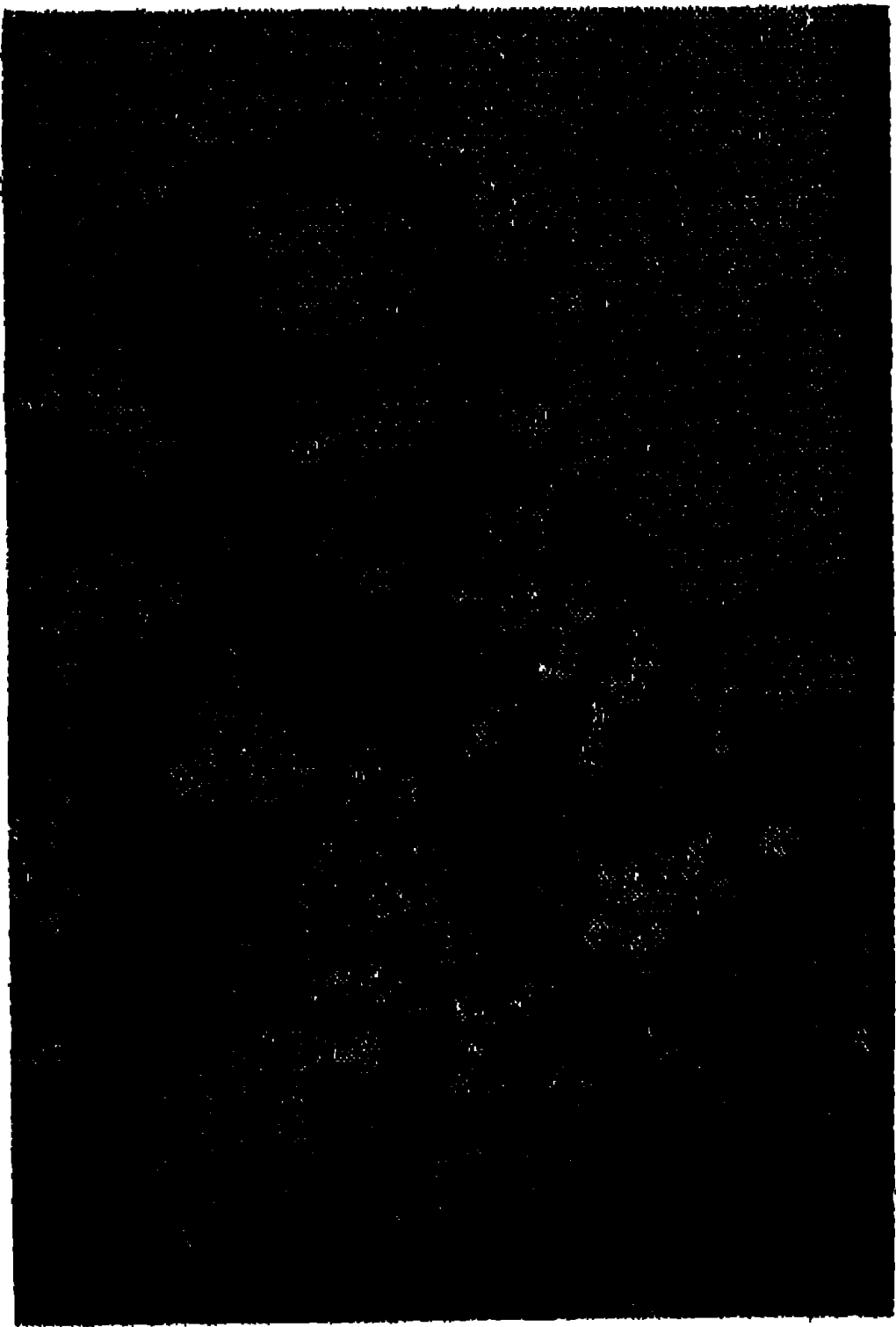
গ্রন্থি থেকে বিশেষ বিশেষ হর্মোন নিঃসৃত হয়ে থাকে। দেহের প্রতিটি কোষের বিপাকীয় কার্যকলাপে বিভিন্ন হর্মোনের প্রভাব অপরিসীম। কোন কোষ কিভাবে কাজ করবে ও কতটা কাজ করবে, তা নিয়ন্ত্রণ করে হর্মোন। বিভিন্ন অন্তঃস্রাবী গ্রন্থি থেকে প্রয়োজন অনুসারে তারা নিঃসৃত হয় ও তারপর রক্তে এসে মেশে। এরপর রক্তের মধ্য দিয়ে শরীরের বিভিন্ন অংশে বাহিত হয় ও সেই সমস্ত অংশের যথাযথ কাজ করবার নিয়ন্ত্রক হিসাবে তারা ভূমিকা গ্রহণ করে।

1956 পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করতেন, প্রয়োজন অনুসারে হর্মোন সরাসরি কোষে গিয়ে উপস্থিত হয় এবং প্রত্যক্ষভাবে তার যাবতীয় রাসায়নিক কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু ঐ বছর সাদারল্যাণ্ড যকৃতের কোষকলায় সম্পূর্ণ নতুন এক ধরণের রাসায়নিক যৌগ আবিষ্কার করেন। তিনি এই যৌগের নাম দেন সাইক্লিক অ্যাডিনো-সাইন মনোফসফেট (Adenosine monophosphate) বা সংক্ষেপে সাইক্লিক এ-এম-পি (Cyclic a m p)। আগে ধারণা ছিল, হর্মোনই প্রত্যক্ষভাবে কোষের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে। সাদারল্যাণ্ড তাঁর ব্যাপক অনুসন্ধানের পর জানালেন, সাইক্লিক এ-এম-পি-ই কোষের যাবতীয় কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ করে। কোষ কখনও তার পরিমাণ বাড়ায়, কখনও বা কমিয়ে দেয়। তিনি পরীক্ষা করে দেখালেন, যখন কেউ উত্তেজিত হয়, তখন তার অ্যাড্রিনাল গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হয় অ্যাড্রিনেলিন হর্মোন এবং তার ফলে সেই লোকটির হৃদ্‌স্পন্দন বেড়ে যায়। পরে আরও দেখা গেল, অ্যাড্রিনেলিন হৃদ্‌পিণ্ডের পেশী কোষে সাইক্লিক এ-এম-পি-র মাত্রা বাড়িয়ে দিয়েছে এবং এই বস্তুটিই পেশীর কাজ করবার ক্ষমতা বাড়িয়েছে।

সাদারল্যাণ্ডের এই আবিষ্কার সম্পর্কে চিকিৎসক সমাজ প্রথমে সংশয় প্রকাশ করে বিরূপ সমালোচনা করেন। এর পরের দশ বছর সাদারল্যাণ্ড এই বিষয়ে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান। 1960 সালের পর পৃথিবীর সর্বত্র সাইক্লিক এ-এম-পি-কে কেন্দ্র করে ব্যাপক অনুসন্ধান চলে এবং সাদারল্যাণ্ডের আবিষ্কারের গুরুত্ব স্বীকৃত হয়। বস্তুতঃ সাদারল্যাণ্ডের আবিষ্কার জীবনের ধারা অনুশীলনে একটি বড় রকমের অগ্রগতি বলে স্বীকৃত হয়েছে। অনুনা

দু-হাজারের মত বিজ্ঞানী এই বিষয়ে গবেষণা চালাচ্ছেন।

ডক্টর সাদারল্যাণ্ডের উদ্ভাবিত তত্ত্ব ভবিষ্যতে নানা সম্ভাবনার পথ খুলে দিতে পারে। এর ফলে বহুমূত্র, কলেরা—এমন কি, ক্যান্সার নিরাময়ে এবং নানা ব্যাধির চিকিৎসায় নতুন ভেষজ তৈরি হতে পারে। ডক্টর সাদারল্যাণ্ড নিজে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন—এই গবেষণার ধারা থেকে উপজাত হিসাবে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের এক নতুন অথবা উন্নত পদ্ধতি গড়ে উঠবে, এমন আশা করা অবাস্তব নয় বলে মনে হয়।

রসায়ন

রসায়ন শাস্ত্রে এবছর (1971) এমন একজন বিজ্ঞানীকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছে, যিনি রসায়ন ও পদার্থ-বিজ্ঞান উভয় ক্ষেত্রকে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার অবদানে সমৃদ্ধ করেছেন। তিনি হচ্ছেন ক্যানাডার জাতীয় গবেষণা সংস্থার (National Researeh Council) ডক্টর গেরহার্ড হার্জবার্গ (Gerhard Herzberg)। অণুসমূহের বিশেষতঃ মুক্ত উপাণুর ইলেকট্রনিক গঠন-বৈশিষ্ট্য ও জ্যামিতি সম্পর্কে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্যে তাঁকে বিজ্ঞান-জগতের সর্বোচ্চ সম্মানে ভূষিত করা হয়েছে। ডক্টর হার্জবার্গ জন্মসূত্রে জার্মান, কিন্তু বর্তমানে ক্যানাডার নাগরিক। ক্যানাডাবাসীদের মধ্যে তিনিই এই সর্বপ্রথম
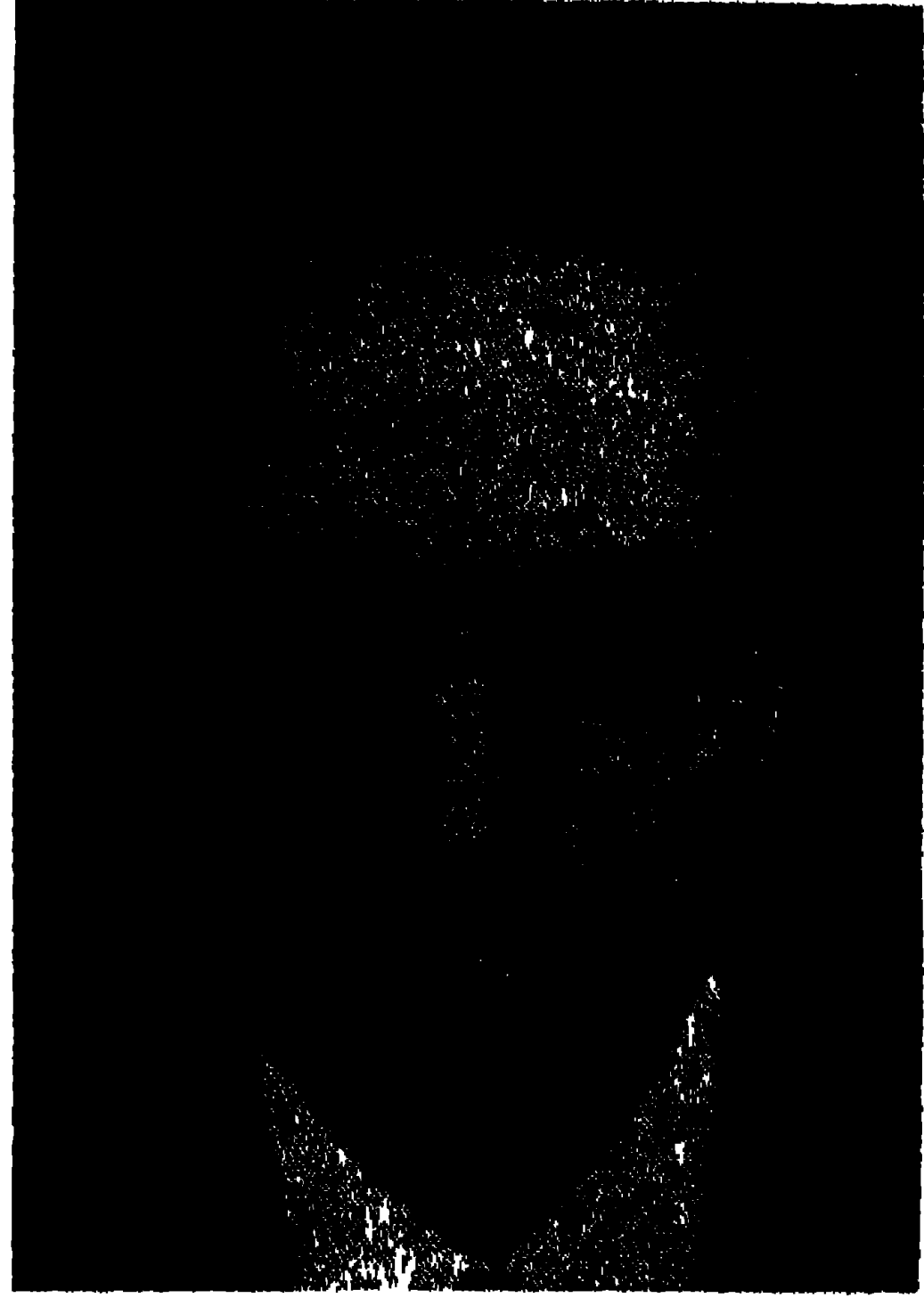
ডক্টর গেরহার্ড হার্জবার্গ

নোবেল পুরস্কার পেলেন। (ডক্টর হার্জবার্গের কাজের বিস্তৃত আলোচনা পরে প্রকাশিত হবে।)

—রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়

কৃষি-সংবাদ

মিষ্টি করলা

করলা বললেই যে তিক্ত সব্জীটির কথা মনে পড়ে, গুজরাটের জুনাগড় জেলায় উৎপন্ন ছোট করলাগুলি কিন্তু তার ব্যতিক্রম। এই জাতের করলার স্বাদ মোটেই তিক্ত নয় বরং অত্যন্ত সুস্বাদু। সাধারণতঃ সেচযুক্ত জমির প্রান্তদেশে এগুলি জন্মানো হয়।

প্রায় সব ধরণের জমিতেই এই জাতের করলার চাষ করা যেতে পারে। তবে বালুকাময় দোআঁশ কিম্বা পলিদোআঁশ মাটিতে এর ফলন খুব বেশী হয়। এর বীজগুলি পাত্‌লা, ছোট আকৃতির ও হলদেটে সাদা রঙের হয়। ফেব্রুয়ারীর শেষের দিকে বীজ পোঁতবার মাস খানেকের মধ্যেই এই করলার কচি লতায় ফুল এসে যায় ও তার আরও পনের দিন পরেই ছোট ছোট করলা ধরতে আরম্ভ করে। লতার বাড় ঠিকমত হবার জন্যে সপ্তাহে দু-বার করে জল দেওয়া ও মাচার ভিতর দিয়ে পর্যাপ্তভাবে হাওয়া চলাচলের ব্যবস্থা রাখা দরকার। গ্রীষ্ম ও বর্ষাকাল এই করলার পক্ষে অনুকূল সময়।

ক্ষুদে করলার লতায় সতেজ ডাঁটাগুলি যখন ছোট ছোট সবুজ পাতা, হলুদ ফুল ও কচি কচি করলায় ভরে ওঠে, তা দেখতে খুব ভাল লাগে। আকারে এই জাতের করলা গোল হয় এবং এগুলির সাদাটে সবুজ রঙের পাত্‌লা খোসার উপরে মাঝে মাঝে সাদা রঙের ছোপ থাকে। করলাগুলির প্রত্যেকটির ওজন সাধারণতঃ আট থেকে দশ গ্র্যাম পর্যন্ত হয়ে থাকে। তরকারীতে সুগন্ধের জন্যে প্রায়ই এগুলির ব্যবহার করা হয়।

অক্টোবর মাস পর্যন্ত এই লতাগাছে নিয়মিত ফল ধরে। কচি ও কোমল থাকা অবস্থায় তিন দিন অন্তর ফল তোলা হয়। পাকা অবস্থায় এগুলির রং সাদাটে সবুজ থেকে হলদেটে জাফরানীতে বদ্‌লে যায়, ডাঁটাগুলি লাল্‌চে হয়ে যায় ও বীজগুলি ক্রমে পরিণত হয়ে ওঠে।

খাদ্যমূল্যের দিক দিয়েও এই করলা বিশেষ সমৃদ্ধ। এগুলিতে প্রচুর পরিমাণে লৌহ এবং এ, বি ও সি ভিটামিন থাকে। মাখনে রান্না করা হলে এর ক্যালোরির পরিমাণও খুব বেড়ে যায়। এছাড়া বহুমূত্র ও বাতরোগের পক্ষে এগুলি বিশেষ উপকারী।

[ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদ, (কৃষি-ভবন), নতুন দিল্লী কর্তৃক প্রকাশিত]

উদ্ভিদের বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করবার নুতন পদ্ধতি

উদ্ভিদের বিকাশ ও বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করবার একটি নূতন পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে। সঙ্কর জাতীয় উদ্ভিদ উৎপাদন ও তার বৃদ্ধিতে বর্তমানে যে সময় লাগে, তার অনেক কম সময়েই এই কৃত্রিম উপায়ে তাদের বৃদ্ধি ও বিকাশ ঘটানো যাবে।

আমেরিকার অ্যারিজোনার কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের জেনিটিসিস্ট রবার্ট জি. ম্যাকড্যানিয়েল এই বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যাপারে মার্কিন কৃষি গবেষণা কৃত্যকের সহযোগিতা করছেন।

তিনি এই প্রসঙ্গে বলেছেন—এই নূতন প্রক্রিয়ার নাম মাইটোকণ্ড্রিয়াল কমপ্লিমেন্টেশন সংক্ষেপে এম. সি.। কয়েক প্রকার উদ্ভিদ বেছে নিয়ে তাদের মধ্যে পরাগ-সংযোগ ঘটিয়ে সঙ্কর জাতীয় উদ্ভিদ সৃষ্টি করবার পর এই সকল নূতন চারা কি রকম শক্ত-সমর্থ হবে, কি রকম ফলনশীল হবে—ইত্যাদি বিষয় এই প্রক্রিয়ায় জানা যাবে।

যথোপযুক্ত পরিমাণে এম. সি. ব্যবহার করে পাঁচ বছরের স্থলে দু-বছরের মধ্যেই ঐ সকল সঙ্কর জাতীয় উদ্ভিদের বিকাশ ও বৃদ্ধি ঘটানো যাবে।

তিনি এই বিষয়টি ব্যাখ্যা করে বলেন যে, গবেষণাগারের মাঠে সাধারণতঃ বিভিন্ন উদ্ভিদের মধ্যে কৃত্রিম উপায়ে বিপরীত পরাগ-সংযোগ ঘটানো হয় অর্থাৎ ক্রস-পলিনেশনের দ্বারা সঙ্কর জাতীয় উদ্ভিদ উৎপাদন করা হয়। ঐ গাছ বড় হবার জন্যে অপেক্ষা করতে হয়, তারপর সেই সঙ্কর জাতীয় গাছে ফল ধরে এবং বীজ হয়। সেই নতুন বীজের চারা আবার রোপণ করা হয়। ঐ সকল নতুন গাছের বৃদ্ধির সময় ফসল উৎপাদনের ক্ষমতা ও অন্যান্য গুণাগুণ পরীক্ষা করে দেখা হয়। বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর সন্তোষজনক বলে বিবেচিত হলে বহু প্রকার সঙ্করজাতীয় গাছের মধ্যে মাত্র কয়েকটি বেছে নেওয়া হয়। এভাবে শক্তিশালী এবং অতি উচ্চ ফলনশীল উদ্ভিদ সৃষ্টি করা সময়সাপেক্ষ ব্যাপার।

নব-উদ্ভাবিত মাইটোকণ্ড্রিয়াল কমপ্লিমেন্টেশন প্রক্রিয়ায় বহু প্রকার সঙ্করজাতীয় উদ্ভিদের মধ্যে ভবিষ্যতে কোন্ কোন্‌টি শক্তিশালী এবং উচ্চ ফলনশীল উদ্ভিদে পরিণত হবে, তা চারা অবস্থায়ই জানা যায়। ফলে সময় সংক্ষেপ হয়। তবে তিনি এই প্রসঙ্গে আরও বলেছেন যে, সকল উদ্ভিদকে জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় পরীক্ষা করে দেখা হয়। তাদের মধ্যে কোন্ কোন্‌টি ভবিষ্যতে উচ্চ ফলনশীল হবে, তার আভাস পাওয়া গেলে তাদের মাঠে রোপণ করে গুণাগুণ পরীক্ষা করে দেখবার প্রয়োজন হয়ে থাকে।

ডক্টর ম্যাকডানিয়েলের ধারণা—কেবল মাত্র ফসল উৎপাদনের ক্ষেত্রেই নয়, পশু-প্রজননের ক্ষেত্রেও এই এম. সি. পরীক্ষা-পদ্ধতি এক নব-দিগন্তের সন্ধান দিবে।

প্রচণ্ড শীত থেকে শাকসব্জী ও ফসল রক্ষার অভিনব উপাদান

প্রচণ্ড শীত থেকে শস্য ও শাকসব্জী রক্ষা করবার একটি অভিনব উপাদান মার্কিন কৃষি-বিজ্ঞানীরা উদ্ভাবন করেছেন। তাঁরা প্রথমে প্রচণ্ড শীতের কবল থেকে শাকসব্জী ও ফসলকে কাপড়, কাগজ অথবা প্লাষ্টিকের আবরণ দিয়ে ঢেকে রক্ষা করবার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু কৃতকার্য হন নি। তারপর টেক্সাসের ওয়েসলাকোর কৃষি-গবেষণা কৃত্যকের বিজ্ঞানীরা এই অভিনব ইনসুলেটিং বা তাপ প্রতি-রোধক উপাদানটি আবিষ্কার করেছেন। চারাগাছের গোড়ায় মাটির সঞ্চিত তাপমাত্রা অক্ষুণ্ণ রাখবার উপায় উদ্ভাবনই ছিল তাঁদের প্রথম লক্ষ্য। তার পর ঐ উপাদানটি যাতে সস্তা হয়, সে দিকেও তাঁরা দৃষ্টি রেখেছেন। রাতে যখন ঠাণ্ডা ও বরফ পড়বে, তখন ঐ উপাদান গাছপালাকে ঢেকে রাখবে এবং সকাল বেলায় সূর্যের আলোয় সেই উপা-দানের আবরণ আর থাকবে না। ঐ বস্তুটি গাছ-পালার উপর ছড়িয়ে দেবার জন্যে স্বহস্তে বহন-যোগ্য সস্তা একটি জেনারেটর অর্থাৎ বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদক যন্ত্রের প্রয়োজন।

মিঃ মার্তিন ডি. হেলম্যান ও জন এফ. বার্থোলিক—এই দু-জন বিজ্ঞানী রেটজোলেট আর 30, ফ্লুরোনিক এফ-68 এবং জিলেটিন ও জল মিশিয়ে এই অভিনব উপাদান তৈরি করেছেন। এটি কোন বিষাক্ত পদার্থ নয়। এতে মাটিরও কোন ক্ষতি হয় না। এই উপাদান গাছপালার উপর ছড়িয়ে দেবার পর দেখা গেছে, এর আবরণের মধ্যের তাপমাত্রা, বাইরের তাপমাত্রার তুলনায় 22 ডিগ্রী ফারেনহাইট বেশী থাকে। গরম জলের সঙ্গে এই সকল পদার্থ মেশালে ফেনা হয়। সেই ফেনাই গাছপালার উপর যন্ত্রের সাহায্যে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। খাল কেটে গাছ লাগিয়ে ব্যবহার করলে ঐ সব উপাদান অনেক কম লাগে।

কীট-পতঙ্গের সাহায্যে আগাছা ধ্বংসের অভিনব পদ্ধতি

খাল-বিল, নদী-নালায় অনেক রকম আগাছা জন্মায়। এই সকল আগাছা নৌকা বা অন্যান্য যান চলাচলের পথে বাধা সৃষ্টি করে, শস্যেরও ক্ষতি করে। ভেষজ দ্রব্যের সাহায্যে এদের নির্মূল করা যায়। কিন্তু তাতে জল দূষিত হয়ে থাকে।

অনেক রকম পোকামাকড় এই সকল আগাছা খেয়ে বেঁচে থাকে। বিজ্ঞানীরা বলছেন যে, এই সকল কীট-পতঙ্গের চাষ করে বিপুল পরিমাণে সেগুলিকে ঐ সকল আগাছার উপর ছেড়ে দিয়ে এদের নির্মূল করা যেতে পারে।

ইউরেশিয়াম মিল ফয়েল নামক এক প্রকার আগাছা আমেরিকায় সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে। প্যারাপোনিক্স নামে এক প্রকার কীটের চাষ করে এই সমস্যা সমাধান করা যায় কি না, সে বিষয়ে আমেরিকার কীট-বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখছেন। তাঁরা জানিয়েছেন যে, যে সকল জলজ গাছপালা মানুষের বিশেষ কাজে লাগে—ঐ কীট যে তাদের কোন ক্ষতি সাধন করে না, তা বিশেষভাবে প্রমাণিত হলেই আগাছা নির্মূল করবার ব্যাপারে এদের সাহায্য নেওয়া হবে।

সঙ্করজাতীয় সূর্যমুখী ফুলের বীজ

সূর্যমুখী ফুলের বীজ থেকে তৈল উৎপাদন করা হয় এবং সয়াবীন তৈলের পরেই সূর্যমুখীর বীজের তৈলের চাহিদা আছে।

আমেরিকায় তিন-চার রকমের সূর্যমুখী ফুলের গাছ আছে। বিভিন্ন জাতীয় ফুলের মধ্যে পরাগ সংযোগ ঘটিয়ে মার্কিন কৃষি গবেষণা কৃত্যকের বিজ্ঞানীরা এক প্রকার বর্ণসঙ্কর সূর্যমুখী গাছ উৎপাদনের চেষ্টা করছেন এবং ডক্টর মুরে এল. কিন্‌স্‌ম্যান এই ব্যাপারে কৃতকার্যও হয়েছেন। তিনি বলেছেন, বর্তমানে ঐ সকল সঙ্করজাতীয় সূর্যমুখীর বীজ ভুট্টা ও সয়গমের মত চাষ করা যাবে এবং প্রচুর সূর্যমুখীর বীজ পাওয়া যাবে।

গবাদি পশুর রোগ 'লেপ্‌টোস্পাইরা'র টিকা আবিষ্কার

লেপ্‌টোস্পাইরা (Leptospira) নামে এক প্রকার রোগ হরিণ, শেয়াল, ইঁদুর, রেকুন প্রভৃতি নানা জাতীয় বন্যজন্তুর মধ্যে দেখা যায়। এই রোগ জল ও খাদ্যবস্তুর মাধ্যমে গৃহপালিত জীবজন্তু, বিশেষ করে গবাদি পশু এবং মানুষের মধ্যেও সংক্রামিত হয়ে থাকে। ঐ সকল জীব-জন্তুর প্রস্রাবের মাধ্যমেই ঐ রোগের জীবাণু বাহিত হয়। অগ্নিমান্দ্য এবং জ্বর এই রোগের প্রধান লক্ষণ। ঐ রোগে আক্রান্ত গবাদি পশুর দুগ্ধ হ্রাস পায় এবং গর্ভস্রাব হয়। তরুণ প্রাণীদের বৃদ্ধি হয় না এবং ঐ রোগ কোন কোন সময়ে মারাত্মক হয়ে থাকে।

আমেরিকার আইওয়া রাজ্যের আমেসের পশু রোগ সংক্রান্ত গবেষণাগারে এই রোগের টিকা আবিষ্কৃত হয়েছে। এই টিকা ব্যবহার করে গবাদি পশু, শূকর প্রভৃতি গৃহপালিত জন্তুর ক্ষেত্রে বিশেষ সুফল পাওয়া গেছে। যে সকল জন্তুদের টিকা দেওয়া হয়েছে, তাদের মূত্রাশয় আক্রান্ত হয় নি এবং অন্যান্য রোগের লক্ষণও দেখা যায় নি।

এই রোগের নিদান ও চিকিৎসা করা খুবই কঠিন। বাইরে থেকে রোগের লক্ষণ দেখা না গেলেও পশুর দেহে ঐ রোগের বীজাণু থাকতে পারে এবং অন্যান্য পশু ঐ রোগের বীজাণুর দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

ডিসেম্বর — 1971

চতুর্বিংশ বর্ষ — দ্বাদশ সংখ্যা
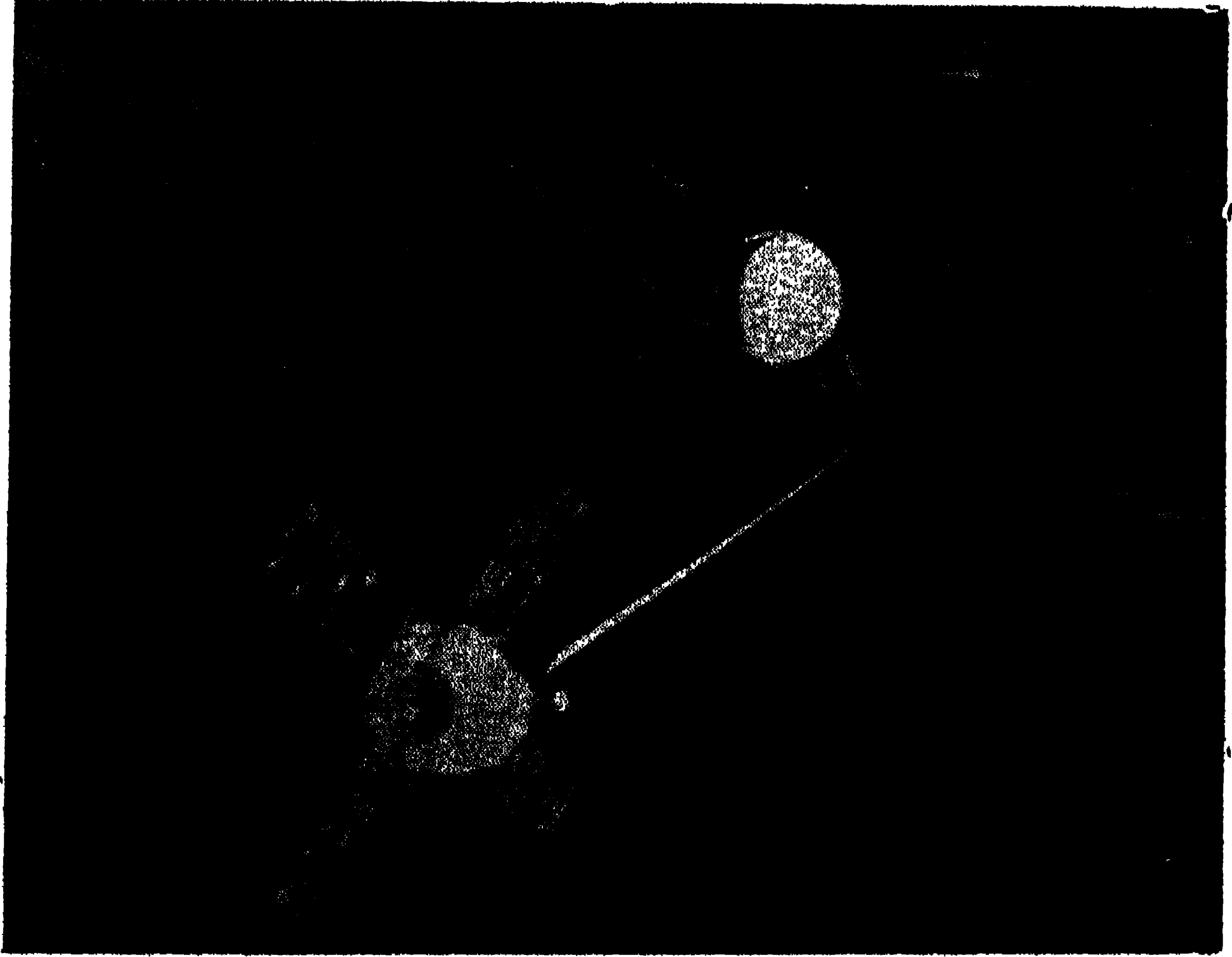
ছবিতে দেখা যাচ্ছে, ইউ. এস. এ-র স্পেসক্র্যাফ্‌ট্ মেরিনার-9 মঙ্গলগ্রহ পরিক্রমার জন্যে তার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। মেরিনার-9 মঙ্গলগ্রহের পৃষ্ঠদেশের 70 শতাংশেরও বেশী জায়গার টেলিভিসন-ছবি তুলবে। তাছাড়া তাপমাত্রা, গঠন-উপাদান ও চতুর্দিকের বায়ুমণ্ডলের চাপ প্রভৃতি বিষয়েও তথ্য সংগৃহীত হবে। ছবিতে ডিমোস (বাইরের বলয়) ও ফোবোস (ছোট বলয়) নামক মঙ্গলগ্রহ-পরিক্রমারত উপগ্রহ দুটিকে দেখা যাচ্ছে। 1971 সালের 30শে মে কেপ কেনেডি থেকে মেরিনার-9 মঙ্গলগ্রহ অভিমুখে উৎক্ষিপ্ত হয়েছে।

বাতাসে ভাসমান অদৃশ্য জীব-জগৎ

এটা খুবই আশ্চর্যের বিষয়—যে বায়ুস্তর পৃথিবী বেষ্টন করে আছে, তার মধ্যে লক্ষ লক্ষ ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবাণু ভেসে বেড়াচ্ছে। খালি চোখে দেখা যায় না বলেই এদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমরা বিশেষ সচেতন নই। জীবাণুগুলি যে পৃথিবীর কাছাকাছি বায়ুস্তরেই রয়েছে তা নয়, পৃথিবী থেকে দূরবর্তী উর্ধ্বাকাশের বায়ুস্তরেও এদের উপস্থিতির প্রমাণ পাওয়া গেছে। সমুদ্রের উপরের বায়ুস্তরেও এদের অস্তিত্ব আছে। সাধারণতঃ নীচের বায়ুস্তর থেকে যতই উপরে ওঠা যায়, জীবাণুর সংখ্যা ততই কমে আসে।

বায়ুমণ্ডলকে কিন্তু জীবাণুর বাসস্থান হিসাবে ধরা যায় না। এরা স্বল্পকালের জন্যে বাতাসে ভাসমান পর্যটক মাত্র। ভাসমান অবস্থায় কিছু কিছু জীবাণুর মৃত্যু ঘটলেও বেশীর ভাগই বেঁচে থাকে এবং উপযুক্ত মাধ্যমে পতিত হলে সেখানে বংশবিস্তার করে।

হল্যাণ্ডের অধিবাসী অ্যান্টনী ভ্যান লেভেনহুক সর্বপ্রথম এই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবাণুগুলিকে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে প্রত্যক্ষ করতে সক্ষম হন। তিনিই প্রথম আবিষ্কার করেন যে, বাতাসে ভাসমান ধূলিকণার সঙ্গে এরা নিয়ত অবস্থান করে। এরপর 1861 খৃষ্টাব্দে প্যারিসে লুই পাস্তুর সর্বপ্রথম দেখালেন যে, বাতাসে ভাসমান জীবাণুগুলিকে উপযুক্ত মাধ্যমের সাহায্যে বাঁচিয়ে রেখে তাদের বংশবৃদ্ধি করানো সম্ভব। তিনি আরও দেখান যে, এই সকল জীবাণুই বিভিন্ন জৈব পদার্থের পচনের মূল কারণ। বিভিন্ন রকম রোগের সঙ্গে এদের কোন সম্পর্ক আছে কিনা, ক্রমশঃ সে বিষয়ে গবেষণা সুরু হয়। 1873 খৃষ্টাব্দে কানিংহাম কলিকাতার আলিপুর জেলের অভ্যন্তরস্থিত বাতাসে বিভিন্ন জীবাণুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে গবেষণা করেন, কিন্তু তিনি রোগের আক্রমণের সঙ্গে এদের কোন রকম সম্পর্ক স্থাপন করতে সক্ষম হন নি। ক্রমশঃ এই বিষয়টি নিয়ে বিভিন্ন দেশে গবেষণা সুরু হয়ে যায় এবং অনেক নতুন তথ্য আবিষ্কৃত হয়।

এই জীবাণুগুলি সাধারণতঃ ব্যাক্টিরিয়া, ঈষ্ট ও অ্যাক্টিনোমাইসিটিস ছত্রাক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। এদের মধ্যে বিভিন্ন উদ্ভিদের পরাগরেণুও একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। এদের মূল উৎস মাটি ও বিভিন্ন ধরণের উদ্ভিদ। ছত্রাক শ্রেণীভুক্ত জীবাণুগুলি সজীব উদ্ভিদের উপর পরগাছার মত অথবা মৃত উদ্ভিজ্জ পদার্থের উপর বংশবৃদ্ধি করে এবং কিছু কিছু সরাসরি বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে। সাধারণতঃ পল্লীগ্রাম অপেক্ষা শহরের বাতাসে ছত্রাকজাতীয় জীবাণু কম থাকে। এর কারণ সম্ভবতঃ মূল উৎস—উদ্ভিদের প্রাচুর্যের অভাব। অন্য দিকে ব্যাক্টিরিয়া গোষ্ঠীভুক্ত জীবাণু শহরের বাতাসে অধিক সংখ্যায় থাকে—সম্ভবতঃ দৈনন্দিন গার্হস্থ্য কাজকর্ম থেকে উদ্ভূত পচনশীল জৈব পদার্থই এর মূল কারণ।

বর্ষাকালে ভিজা জামা, কাপড়, জুতা, পাউরুটি, আচার, ফলমূল প্রভৃতির উপর যে ছাতা পড়ে, তা ছত্রাকজাতীয় জীবাণু ছাড়া আর কিছুই নয়। বায়ুর আর্দ্রতা এবং উষ্ণতা উভয়েরই যথেষ্ট প্রভাব আছে এই জীবাণুগুলির প্রাদুর্ভাবের উপর। অধিক বৃষ্টিপাতের দরুণ বাতাসে ভাসমান জীবাণুগুলি বৃষ্টিপাতের সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে নেমে আসে, ফলে বাতাস অনেকটা জীবাণুমুক্ত থাকে। অন্য দিকে অনাবৃষ্টি বা অল্পবৃষ্টির ফলে উদ্ভূত মৃত উদ্ভিদগুলি জীবাণুদের আবাসভূমি হিসাবে কাজ করে এবং এর ফলে জীবাণুর বংশবৃদ্ধি হয়। এই সকল কারণে বছরের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জীবাণুর সমাবেশ লক্ষ্য করা যায়। এমনও দেখা যায় যে, একই দিনের মধ্যে আবহাওয়ার তারতম্যে বাতাসে ভাসমান এই জীবাণুগুলির সংখ্যা ও প্রকৃতিগত তারতম্য ঘটে থাকে। এই জীবাণুগুলি সম্বন্ধে জানতে হলে প্রথমতঃ এদের বাতাস থেকে নামিয়ে এনে উপযুক্ত মাধ্যমের সাহায্যে বেড়ে উঠতে সাহায্য করা হয় এবং পরে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে এদের প্রকৃতিগত পার্থক্য নির্ণয় করা হয়।

বর্তমানে উদ্ভিদ-রোগ বিশেষজ্ঞদের দ্বারা এই বিষয়টি নিয়ে বিশেষভাবে গবেষণা হচ্ছে—তার প্রধান কারণ এই জীবাণুগুলির একটি বিশেষ অংশ উদ্ভিদের মধ্যে রোগ উৎপত্তির জন্যে দায়ী। চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরাও এই বিষয়ে যথেষ্ট উৎসাহী, কারণ বাতাসে ভাসমান কিছু জীবাণু শ্বাসকার্য চলবার সময় আমাদের দেহের ভিতরে প্রবেশ করে এবং হাঁপানী বা অন্যান্য অ্যালার্জি জাতীয় রোগের সৃষ্টি করে। শিল্পক্ষেত্রে, বিশেষতঃ বস্ত্রশিল্প, চর্মশিল্প, ফল ও অন্যান্য খাদ্যসংরক্ষণশিল্প প্রভৃতির ক্ষেত্রেও এই বিষয়টির উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বাতাসে ভাসমান জীবাণু নিয়ে অনেক গবেষণা সুরু হয়েছে। বিশেষ করে আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড ও আরও অনেক দেশ এই বিষয়ে অনেকটা এগিয়ে গেছে। অবশ্য আমাদের দেশও পিছিয়ে নেই। ভারতবর্ষের অনেক গবেষণাগার ও হাসপাতালে অদৃশ্য এই জীবাণু সম্বন্ধে ব্যাপক গবেষণা সুরু হয়েছে। এই অজানা জগৎ সম্বন্ধে ভবিষ্যতে অনেক নতুন তথ্য আবিষ্কৃত হবার উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে।

রমা চক্রবর্তী*

---

* বসু বিজ্ঞান মন্দির, কলিকাতা-9

পারদর্শিতার পরীক্ষা

রসায়নবিষয়ক 6টি প্রশ্ন নীচে দেওয়া হলো। উত্তর দেবার জন্যে মোট সময় 3 মিনিট। ঐ সময়ের মধ্যে যতগুলি প্রশ্নের উত্তর ঠিক হবে, সেই হিসাবে রসায়নে তোমার পারদর্শিতা সম্বন্ধে একটা ধারণা করা যেতে পারে। সঠিক উত্তরের সংখ্যা 6, 5, 4, 3, 2, 1 বা 0 হলে পারদর্শিতা যথাক্রমে খুব বেশী, বেশী, একটু বেশী, চলনসই, একটু কম, কম বা খুব কম।

1. কোন্ মৌলটি সবচেয়ে সক্রিয় ?
   - (ক) ফ্লোরিন
   - (খ) ক্লোরিন
   - (গ) ব্রোমিন
   - (ঘ) আয়োডিন
2. অ্যামোনিয়ার জলীয় দ্রবণে ফেনল্‌ফ্‌থ্যালিন মেশালে দ্রবণটি কোন্ রঙের হয় ?
   - (ক) লাল
   - (খ) নীল
   - (গ) সবুজ
3. কোন্ ধরণের লোহায় কার্বনের ভাগ সবচেয়ে কম ?
   - (ক) কাঁচা লোহা
   - (খ) পেটা লোহা
   - (গ) ইস্পাত
4. কাঁসার প্রস্তুতিতে কোন্ কোন্ ধাতু ব্যবহৃত হয় ?
   - (ক) টিন ও দস্তা
   - (খ) দস্তা ও তামা
   - (গ) তামা ও টিন
5. কোন্ দুটি অ্যাসিডের মিশ্রণে 'অ্যাকোয়া রিজিয়া' তৈরি হয় ?
   - (ক) সালফিউরিক অ্যাসিড ও হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড
   - (খ) হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ও নাইট্রিক অ্যাসিড
   - (গ) নাইট্রিক অ্যাসিড ও সালফিউরিক অ্যাসিড
6. হাইড্রোজেনের আণবিক ভার কত ?
   - (ক) 1·008
   - (খ) 2·016
   - (গ) 4·032

(উত্তর—746 পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ব্রহ্মানন্দ দাশগুপ্ত ও জয়ন্ত বসু*

* সাহা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, কলিকাতা—9

জিওর্দানো ব্রুনো

আদালত গৃহের মধ্যে দাঁড়িয়ে সেই নির্ভীক জ্ঞানতপস্বী চার্চের বিচারকদের উদ্দেশ্যে বললেন—তোমরা আমার বিচার করছ বটে, অথচ ভয় পেয়ে গেছ দেখছি তোমরাই—এই ঘোষণা ছিল সত্য। তখনকার দিনে ইউরোপের অনেক দার্শনিক এবং বিজ্ঞানীই বিশ্বের চিরসত্য আবিষ্কারের অপরাধে মধ্যযুগীয় চার্চের বলি হয়েছিলেন। কিন্তু সেদিনকার বহু অনাবিষ্কৃত সত্যের রহস্য উদ্ঘাটনে যাঁরা অগ্রসর হয়েছিলেন, তাঁদের মত ছিল অভ্রান্ত ও প্রগতিশীল। কিন্তু মধ্যযুগীয় চার্চের মতবাদ ছিল ক্ষয়িষ্ণু। নতুন নতুন মতবাদ দেখে সেদিনকার চার্চের কর্তাব্যক্তিরা হয়েছিলেন শঙ্কিত এবং ক্রুদ্ধ। বুঝেছিলেন পুরনো কুসংস্কারাচ্ছন্ন মতবাদ দিয়ে মানুষকে আর বেশী দিন ভাওতা দেওয়া যাবে না। তাই ধ্বংস এবং পরাজয় আসন্ন বুঝেই প্রগতির নিশানবাহক সেই সব মনীষীদের হত্যা করে জিততে চেয়েছিলেন চার্চের কর্তারা।

চার্চের ঘৃণ্য চক্রান্তে পড়ে ইউরোপের যে সব বিজ্ঞানী, দার্শনিক মৃত্যুবরণ করেছিলেন, তাঁদের ভিতর জ্যোতির্বিজ্ঞানী জিওর্দানো ব্রুনো ছিলেন অন্যতম।

1547 সালে ইটালীর ভিনিস নগরীর নোলা শহরে জিওর্দানো ব্রুনো জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র পনেরো বছর বয়সেই তিনি ডোমিনিসিয়ার প্রজাতন্ত্রের নাগরিকত্ব লাভ করেন।

ব্রুনো মনেপ্রাণে কোপারনিকাসের মতবাদ গ্রহণ করেছিলেন, যদিও কোপারনিকাসের সঙ্গে ব্রুনোর কোন ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল না। কোপারনিকাস ছিলেন এক প্রতিষ্ঠাবান যাজক আর ব্রুনো ছিলেন এক ভবঘুরে সাধু। তাঁর চরিত্র ছিল সরল, প্রাণে অফুরন্ত উৎসাহ আর উদ্দীপনা থাকায় তিনি দ্বিধা-শঙ্কা বলে কিছু জানতেন না এবং সত্যের প্রতিষ্ঠার জন্যে জীবনকে তুচ্ছ জ্ঞান করতেন। লেখাপড়া শেষ করেই ব্রুনো প্রচলিত বিশ্বাসের বিরুদ্ধে আপন মত প্রচার করতে সুরু করেন। বাইবেলের অবৈজ্ঞানিক ধারণাগুলি আজগুবী বলে ঘোষণা করলেন। তবে এর প্রতিক্রিয়া ঘটতে দেরী হলো না। রোমান ক্যাথলিক ধর্মমতের সম্বন্ধে কেউ অবিশ্বাস পোষণ করলে ইনকুইজিসন নামে এক বিশেষ বিচারালয়ে তাদের বিচার করা হতো। ব্রুনোর বিরুদ্ধেও তারা গ্রেপ্তারী পরয়ানা জারী করলো। তিনি একথা জানতে পেরে ইটালী ত্যাগ করে প্রথমে গেলেন লিয়নস্, তারপর তুঁলো। মন্টপেলিয়ার ও প্যারিস প্রভৃতি ইউরোপের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি অধ্যাপনা করে দিন কাটাতে লাগলেন। শেষে 1583 খৃষ্টাব্দে তিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন এবং এখানেই তিনি তিনখানা বই প্রকাশ করে বিশ্ববাসীকে নিজের মতবাদ জানান। তাঁর

মতে, ঈশ্বর অসীম ও তাঁর সৃষ্ট এই বিশ্বও অসীম। তিনি কেবল একটা পৃথিবী সৃষ্টি করেন নি, বিশ্বে তিনি বহু সৌরজগতের সৃষ্টি করেছেন এবং প্রত্যেকটি সৌরজগতের কেন্দ্রেই আছে সূর্যের মত এক-একটি নক্ষত্র। এর ফলে তিনি সৌরকেন্দ্রিক তত্ত্বকে নাড়া দিলেন। পূর্বমত ছিল সূর্য বিশ্বের কেন্দ্র। জিওর্দানো বললেন—বিশ্ব অসীম, তার কেন্দ্রে বা প্রান্তে কেউ আছে বলা অর্থহীন। ব্রুনোর জ্যোতির্বিদ্যা ও দর্শনের মত ছিল প্রগতিবাদী, ফলে এই মতবাদ বাইবেলীয় ধারণা প্রচারে প্রত্যক্ষভাবে আঘাত হানলো। চার্চের কর্তারা হলেন ভয়ানক ক্রুদ্ধ।

1593 খৃষ্টাব্দে ব্রুনো লুকিয়ে লণ্ডন থেকে ইটালীতে ফিরে এলেন। ইনকুইজিসন পেয়ে গেলেন খবর। অল্প দিনের মধ্যেই গ্রেপ্তার হলেন ব্রুনো। দীর্ঘ সাত বছর ধরে তার উপর চললো নির্যাতন, কিন্তু একচুলও নিজ মত থেকে নড়লেন না তিনি। এবার বিচারের ব্যবস্থা করলো ইনকুইজিসন। বিচার নয় প্রহসন। আসামী নিজেকেই নির্দোষ প্রমাণের চেষ্টা করতো। আসামীর সাক্ষীদেরও নির্যাতিত হতে হতো বলে কেউ সাক্ষ্য দিত না। আসামীরা উকীল নিযুক্ত করবার অধিকার পেলেও ভয়ে কোন উকীল তাদের পক্ষ সমর্থন করতো না। ব্রুনো মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হলেন।

খৃষ্টধর্ম প্রেমের ধর্ম, তাই ব্রুনোকে বিনা রক্তপাতে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেওয়া হলো; অর্থাৎ বিচারকেরা তাঁকে পুড়িয়ে মারবার আদেশ দিলেন। 1604 খৃষ্টাব্দে ব্রুনোকে প্রকাশ্য রাজপথে চিতায় পুড়িয়ে হত্যা করা হলো।

ব্রুনোকে হত্যা করা হলো সত্য, কিন্তু ব্রুনো কর্তৃক প্রবর্তিত সত্যকে কেউ হত্যা করতে পারলো না। রাণী এলিজাবেথের ব্যক্তিগত চিকিৎসক ডক্টর উইলিয়াম গিলবার্ট ব্রুনোর বিশ্বচিত্রকে গ্রহণ করে দেশ-বিদেশে প্রচার করতে লাগলেন।

ব্রুনো আজও অমর সত্যের মধ্যে, বিজ্ঞানের মধ্যে, তাঁর মতবাদের মধ্যে।

অনুপ রায়

হীরকের কথা

হীরক কি এবং প্রকৃতপক্ষে এর মূল উপাদান কি? এই প্রশ্নের উত্তর অষ্টাদশ শতাব্দীর আগে পর্যন্ত বৈজ্ঞানিকদের জানা ছিল না। সর্বপ্রথম বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক সার আইজাক নিউটন বললেন যে, সাধারণ কাঠকয়লার মতই হীরক একটি দাহ্য পদার্থ। তাঁর কথা শুনে সে যুগের লোকেরা কেউ একথা বিশ্বাস করে নি। অবশ্য অবিশ্বাস করবার মত কথাই বটে—মহামূল্য রত্ন হীরক কিনা সাধারণ কাঠকয়লার মতই দাহ্য পদার্থ! অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে প্রখ্যাত রসায়ন-বিজ্ঞানী ল্যাভয়সিঁয়ে (ফ্রান্স) বাস্তব পরীক্ষায় প্রমাণ করে দেখালেন যে, নিউটনের পূর্বোক্ত সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত এবং হীরকের সঙ্গে সাধারণ অঙ্গার বা কার্বনের মৌলিক কোন পার্থক্য নেই। ল্যাভয়সিঁয়ে একখণ্ড হীরককে পুড়িয়ে দেখলেন এবং একমাত্র কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস ছাড়া আর কিছুই পেলেন না। 1814 সালে সার হামফ্রি ডেভি এবং তাঁর ছাত্র মাইকেল ফ্যারাডে ইটালির ফ্লোরেন্স শহরে হীরকখণ্ডের দহনে যে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস ছাড়া আর কিছু পাওয়া যায় না, তা পরীক্ষা করে দেখালেন এবং সমবেত জনসাধারণের সামনে প্রমাণ করলেন যে, হীরক কার্বনের রূপভেদ ছাড়া আর কিছুই নয়। এরপর আর বিশ্বাস করতে অসুবিধা রইলো না যে, কয়লা, গ্র্যাফাইট, হীরক প্রভৃতি একই মৌলিক পদার্থের ভিন্ন ভিন্ন বাহ্যিক রূপ। এখন সাধারণ-ভাবে একটা প্রশ্ন এসে পড়ে। তা হলো—কি কারণে একই মৌলিক পদার্থ সম্পূর্ণ বিভিন্ন বাহ্যিক রূপে প্রকাশিত হয়? এর কারণ হলো কার্বন-পরমাণুর বিভিন্ন সজ্জা মৌলিক পদার্থটিকে বিভিন্ন রূপ দিয়ে থাকে। হীরকে কার্বন-পরমাণুর সজ্জা এমনই যে, হীরক একটি সুন্দর অষ্টতল স্ফটিকরূপে প্রকাশিত, কিন্তু গ্র্যাফাইট বা সাধারণ কয়লায় পরমাণু-সজ্জা অনুরূপ নয়। শুধুমাত্র পরমাণু-সজ্জার বৈচিত্র্যের জন্যেই একটি মহামূল্য রত্ন আর অপরটি সস্তা জ্বালানী।

ভারতবর্ষের গোলকুণ্ডা, ব্রেজিল, রাশিয়ার ইউরাল পর্বতমালা, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে খনিজ পদার্থরূপে হীরক পাওয়া যায়। দক্ষিণ আফ্রিকায় হীরক অন্যান্য পাথরের সঙ্গে মিশ্রিত অবস্থায় থাকে। এই হীরক-মিশ্রিত পাথরগুলিকে বাইরের জল-বাতাসে ফেলে রাখা হয়, ফলে পাথরগুলি ছোট ছোট টুকরায় ভেঙে যায় এবং পরে টুকরাগুলিকে যান্ত্রিক উপায়ে আরো ছোট করা হয়। এর পর টুকরাগুলিতে জল মিশিয়ে একটি চর্বি-মাখানো মসৃণ টেবিলের উপর দিয়ে প্রবাহিত করলে অপেক্ষাকৃত ভারী হীরকখণ্ডগুলি চর্বিতে আটুকে যায়। এভাবে হীরককে খনিজ অবস্থা থেকে নিষ্কাশন করা হয়। আমাদের দেশে কোন

কোন নদীতীরের বালির সঙ্গে হীরক মিশ্রিত থাকে। সেগুলিকেও ঐ উপায়ে নিষ্কাশিত করা হয়।

আগেই বলেছি, বিশুদ্ধ হীরকখণ্ড একটি অষ্টতল স্ফটিক এবং স্বচ্ছ ও বর্ণহীন। হীরকের সঙ্গে অবিশুদ্ধ পদার্থ মিশ্রিত থাকবার ফলেই হীরক বিভিন্ন বর্ণের হয়ে থাকে। এই হীরকের টুক্‌রাগুলিকে সুকৌশলে কেটে মহামূল্য রত্নে পরিণত করা হয়। টুক্‌রাগুলিকে কাটবার উপর এদের ঔজ্জ্বল্য নির্ভর করে। পৃথিবীর মধ্যে শুধু হল্যাণ্ডে হীরক কাটবার ব্যবসায় আছে।

একটি বিশেষ এককের সাহায্যে হীরকের ওজন নির্ণয় করা হয়। এই একক হলো ক্যারেট এবং এক ক্যারেট $\frac{1}{5}$ গ্র্যামের সমান। সবচেয়ে ভারী হীরক হলো কুলিয়ান, এর ওজন 3032 ক্যারেট অর্থাৎ প্রায় 606 গ্র্যাম। এছাড়া কোহিনূর হীরকের ওজন 186 ক্যারেট। হীরক পৃথিবীতে সবচেয়ে কঠিন মৌলিক পদার্থ। বোরার্ট নামে কালো রঙের এক প্রকার হীরক আছে, রত্ন হিসেবে এর কোন মূল্য নেই, কিন্তু কাচ কাটবার কাজে, পাথর কাটবার যন্ত্রে এবং পালিশের কাজে এই হীরক ব্যবহৃত হয়।

এ তো গেল খনিজ হীরকের কথা। হীরকের দুষ্প্রাপ্যতা এবং শিল্প-জগতে এর চাহিদার জন্যে কৃত্রিম উপায়ে হীরক নির্মাণের চেষ্টা সুরু হয়। গত শতাব্দীর শেষের দিকে বহু বৈজ্ঞানিক রসায়নগারে হীরক প্রস্তুতির জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করেন। বৈজ্ঞানিকদের চেষ্টা ছিল, কোন রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় সাধারণ কয়লাকে হীরকের স্ফটিকে রূপান্তরিত করা। তাঁরা স্ফটিকীকরণের সাধারণ রাসায়নিক প্রক্রিয়ার কথা ভেবেছিলেন। কিন্তু সমস্যা হলো, কয়লার দ্রবণ প্রস্তুত করা, কারণ কয়লা জল বা অন্য কোন তরল পদার্থে দ্রবীভূত হয় না। কয়লা অতি উচ্চ চাপ ও উষ্ণতায় এবং সম্পূর্ণ বায়ুশূন্য স্থানে তরলীকৃত লোহায় দ্রবীভূত হয়। এই দ্রবণকে পরে ঠাণ্ডা করলে ছোট ছোট হীরকের স্ফটিক পাওয়া যায়। 1879 সালে বৃটিশ বৈজ্ঞানিক জে. বি. হ্যানয় সর্বপ্রথম অনুরূপ পদ্ধতিতে হীরক সংশ্লেষণে সাফল্য লাভের দাবী করেন। পরবর্তী কালে 1890 সালে ফ্রান্সের রসায়ন-বিজ্ঞানী হেনরী ময়সানও কৃত্রিম উপায়ে হীরক প্রস্তুতে সাফল্য লাভ করেন। হ্যানয় বা ময়সান কর্তৃক প্রদর্শিত প্রক্রিয়ায় সংশ্লেষিত হীরক কিন্তু খনিজ হীরক অপেক্ষা মোটেই সুলভ হলো না—তার সুস্পষ্ট কারণ হলো নির্মাণ-ব্যয়ের প্রাচুর্য। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলবার সময় জার্মেনীর প্রখ্যাত রসায়ন-বিজ্ঞানী গুনটে, গ্যাসেল এবং রেবেন্‌টিস্ক কৃত্রিম উপায়ে হীরক সংশ্লেষণের জন্যে বহু গবেষণা করেও ব্যর্থ হন।

প্রকৃতপক্ষে 1955 সালের ফেব্রুয়ারী মাসে নিউইয়র্কের জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানী সর্বপ্রথম ব্যবসায়িক ভিত্তিতে কৃত্রিম হীরক উৎপাদনের কথা ঘোষণা করেন। উক্ত সংস্থা অঙ্গার-সমন্বিত পদার্থকে প্রতি বর্গইঞ্চিতে দেড় লক্ষ পাউণ্ড চাপ প্রয়োগ করে এবং পাঁচ হাজার ডিগ্রী ফারেনহাইট উষ্ণতায় উত্তপ্ত করে কৃত্রিম হীরকের স্ফটিক প্রস্তুতে সক্ষম হন।

প্রাকৃতিক হীরক অপেক্ষা এসব কৃত্রিম হীরকের মূল্য বেশ কিছুটা কম পড়ে। এখন একটা প্রশ্ন উঠতে পারে—প্রাকৃতিক হীরক এবং কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত হীরকের গুণ বা ধর্মের কোন তারতম্য আছে কি না? তারতম্য যা আছে, তা হলো তাদের আকার, গঠন-প্রকৃতি ও তাদের মধ্যে অন্য অবিশুদ্ধ পদার্থের অবস্থিতিতে। কৃত্রিম সংশ্লেষণ পদ্ধতিতে এখনো খনিজ হীরকের মত অত বড় স্ফটিক পাওয়া সম্ভব হয় নি। কাজেই অলঙ্কারে কৃত্রিম হীরকের মত অত ক্ষুদ্র স্ফটিক ব্যবহৃত হয় না। হীরক কিন্তু শুধুমাত্র অলঙ্কারের শোভা-বর্ধনেই ব্যবহৃত হয় না; শিল্পজগতে, বিশেষ করে যুদ্ধাস্ত্রের উপকরণ নির্মাণে হীরক ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। কৃত্রিম উপায়ে বৃহত্তর হীরকের স্ফটিক প্রস্তুতির জন্যে এখনো ব্যাপক গবেষণা চলছে।

শ্রীজ্যোতির্ময় দুই

উত্তর

(পারদর্শিতার পরীক্ষা)

1. (ক)

2. (ক)

[প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, লাল দ্রবণটি খোলা বাতাসে রেখে দিলে অ্যামোনিয়া উবে যাওয়ায় লাল রং অদৃশ্য হয়। এজন্যে এই লাল রংকে ভ্যানিসিং কালার বা ম্যাজিক রং বলা হয়।]

3. (খ)

[কাঁচা লোহার কার্বন থাকে শতকরা 2·2—4·5 ভাগ, পেটা লোহায় শতকরা 0·12—0·25 ভাগ এবং ইস্পাতে শতকরা 0·25—1·5 ভাগ।]

4. (গ)

[শতকরা 80 ভাগ তামা ও 20 ভাগ টিনের সংমিশ্রণে কাঁসা প্রস্তুত হয়।]

5. (খ)

[তিন বা চার ভাগ হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ও এক ভাগ নাইট্রিক অ্যাসিডের মিশ্রণে 'অ্যাকোয়া রিজিয়া' তৈরি হয়।]

6. (খ)

[হাইড্রোজেন অণুতে দুটি পরমাণু থাকে। ঐ দুটির পারমাণবিক ভারের যোগফল হচ্ছে হাইড্রোজেনের আণবিক ভার।

$$\text{এখন, পারমাণবিক ভার} = \frac{\text{উপাদানের একটি পরমাণুর ভার} \times 16}{\text{অক্সিজেনের একটি পরমাণুর ভার}}$$

এই হিসাবে হাইড্রোজেনের পারমাণবিক ভার হলো 1·008; সুতরাং হাইড্রোজেনের আণবিক ভার = 2 × 1·008 = 2·016]

ভ্রম সংশোধন:—নভেম্বর'71 সংখ্যায় 690 পৃষ্ঠায় 5131 কিলোমিটার ও 330 কিলোমিটারের স্থলে 'মিটার' হবে।

সেলুলোজ

সেলুলোজ হলো এক ধরণের কার্বোহাইড্রেট, যা উদ্ভিদ-কোষের প্রাচীর গঠন করে পেক্‌টিন নামক কিছু জৈব পদার্থের সঙ্গে। এই শক্ত আর মৃত কোষ-প্রাচীর উদ্ভিদ-কোষের মধ্যেকার প্রোটোপ্লাজমকে ধরে রাখে। কার্বোহাইড্রেট হচ্ছে কার্বন, অক্সিজেন আর হাইড্রোজেন মিলিত এক ধরণের যৌগ। কার্বোহাইড্রেটে কার্বনের সঙ্গে অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন সব সময় 2:1 অনুপাতে থাকে। চাল, গম, ভুট্টা, বাঁশ, খড় ইত্যাদির মধ্যে প্রচুর পরিমাণে কার্বোহাইড্রেট পাওয়া যায়।

উদ্ভিদ সূর্যালোকে তার পাতার ক্লোরোফিলের সাহায্যে বায়ুমণ্ডলের কার্বন ডাই-অক্সাইড এবং জলীয় বাষ্প শোষণ করে প্রথমে ফরম্যালডিহাইড এবং ক্রমশঃ শর্করা, ষ্টার্চ এবং সবশেষে সেলুলোজ গঠন করে। সেলুলোজ নিষ্ক্রিয় পদার্থ। তরল ক্ষার বা অ্যাসিড, ক্লোরিন প্রভৃতি পদার্থের সঙ্গে সেলুলোজ কোন বিক্রিয়া করে না বলে ফিল্টার কাগজ তৈরি করতে এই সেলুলোজ প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। সেলুলোজ অ্যাসিড বা ক্ষারে নিষ্ক্রিয় বলে সাধারণ তুলা বা পাটের আঁশ লঘু অ্যাসিড বা ক্ষারে দ্রবীভূত করলে বিশুদ্ধ সেলুলোজ পাওয়া যায়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, তুলার বেশীর ভাগ অংশই হলো সেলুলোজ।

বর্তমানে সেলুলোজ আমাদের যে কত কাজে লাগে, তা বলে শেষ করা যায় না। কাপড়, কাগজ, মারসিরাইজড্ কাপড় বা তুলা, নাইট্রোসেলুলোজ জাতীয় বিস্ফোরক, কৃত্রিম সিল্ক, সেলুলয়েড প্রভৃতি পদার্থে সেলুলোজ প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। যে সব জিনিষের নাম করলাম, তার কয়েকটা সম্বন্ধে আলোচনা করছি।

কাগজ প্রস্তুতি—উদ্ভিদের সেলুলোজ থেকে কাগজ প্রস্তুতির আধুনিক পদ্ধতি প্রথম আবিষ্কৃত হয় চীনে। ঘাস, খড়, কাঠ প্রভৃতি পদার্থ সেলুলোজে পরিপূর্ণ। তাই ঘাস, খড়, কাঠ প্রভৃতি পদার্থকে টুকরা টুকরা করে কেটে কষ্টিক সোডার সঙ্গে মিশিয়ে উত্তপ্ত করলে সেলুলোজের সঙ্গে মিশ্রিত লিগনিন নিষ্কাশিত হয়ে যায় এবং উৎপন্ন বিশুদ্ধ সেলুলোজের তন্তুগুলি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এবারে এই সেলুলোজকে ব্লিচিং পাউডার বা অন্য কোন পদার্থ মিশিয়ে বিরঞ্জিত করা হয়। এই বিরঞ্জিত সেলুলোজ তন্তুর সঙ্গে মেশানো হয় অ্যালাম, সাবান ইত্যাদি সাইজিং পদার্থ। এখন এই বিচ্ছিন্ন সেলুলোজ তন্তুর ছিদ্রগুলি ভরবার জন্যে কিছু পূরক (জিপ্‌সাম বা চীনামাটি) মেশানো হলে যে সেলুলোজের মণ্ড পাওয়া যায়, তা রোলারের সাহায্যে পিষে নিলে অতি উৎকৃষ্ট কাগজ পাওয়া যায়। সাইজিং পদার্থ মেশাবার আগে বিরঞ্জিত মণ্ডকে যদি অর্ধঘন

সাল্‌ফিউরিক অ্যাসিডে ডুবিয়ে রাখা যায়, তবে এক রকম অর্ধস্বচ্ছ কাগজ পাওয়া যায়। ওই কাগজই হলো পার্চমেন্ট পেপার, যা টাকা তৈরি বা দলিল প্রভৃতি লেখবার জন্যে ব্যবহৃত হয়। আবার পূরক না মিশিয়ে যে কাগজ পাওয়া যায়, তা হলো ফিল্টার পেপার।

কৃত্রিম সিল্ক—সেলুলোজ ইথার ও অ্যালকোহলের দ্রবণে মেশালে যে ঘন আঠালো পদার্থ পাওয়া যায়, তা সূক্ষ্ম ছিদ্রের মধ্য দিয়ে বায়ুতে চালালে যে সূক্ষ্ম তন্তু পাওয়া যায়, সেই তন্তুকে অ্যামোনিয়াম হাইড্রোসালফাইডে ভিজিয়ে নিলেই কৃত্রিম সিল্ক বা রেয়ন উৎপন্ন হয়। বর্তমানে বস্ত্রশিল্পে এর চাহিদা খুব বেশী। সূক্ষ্ম ছিদ্রের বিভিন্ন রকম পরিবর্তন করে বিভিন্ন শ্রেণীর রেয়ন প্রস্তুত করা হয়।

মারসিরাইজ্‌ড্‌ কাপড়—ঘন ক্ষারীয় দ্রবণে যদি কোন সূতির কাপড় ভেজানো যায়, তবে সূতার সেলুলোজগুলি ফুলে গোলাকৃতির তন্তুতে পরিণত হয় এবং সূতির কাপড় এক অদ্ভুত দীপ্তি লাভ করে—ঠিক সিল্কের কাপড়ের মত দেখায়। এগুলি সূতির কাপড়ের চেয়ে অনেক টেকসই। জন মার্সার নামে জনৈক রাসায়নিক প্রথম এটি আবিষ্কার করেন বলেই তাঁর নাম অনুযায়ী এই কাপড়ের নাম হয়েছে মারসিরাইজ্‌ড্‌ কাপড়। অনুরূপভাবে তুলাকে (কার্পাস) মারসিরাইজ্‌ড্‌ তুলায় রূপান্তরিত করা যায়।

সেলুলোজের সাহায্যে বিস্ফোরক দ্রব্য তৈরি করা যায়, সে কথা আগেই বলেছি। সেলুলোজকে অ্যাসিড (নাইট্রিক) মিশ্রণে নিম্নতাপে অনেকক্ষণ রাখলে এক বিশেষ ধরণের নাইট্রোসেলুলোজের উৎপত্তি হয়, যার নাম গান-কটন। এই গান-কটন দিয়ে বন্দুকের বারুদ তৈরি হয়। এই জাতীয় নাইট্রোসেলুলোজ নাইট্রোগ্লিসারিনের সঙ্গে মেশালে করডাইট জাতীয় বিস্ফোরক তৈরি হয়।

সেলুলোজকে কর্পূর ও অ্যালকোহলের সঙ্গে উচ্চচাপে মিশ্রিত করলে এক ধরণের প্লাষ্টিক তৈরি হয়, যার নাম সেলুলয়েড। এই সেলুলয়েড ছাঁচে ফেলে ফিল্ম, চিরুনী, ফাউন্টেন পেন ইত্যাদি অনেক জিনিষ তৈরি করা যায়। সেলুলয়েড খুবই দাহ্য পদার্থ।

এভাবে সেলুলোজ দিয়ে আরও অনেক পদার্থ তৈরি করা যায়। তাই সেলুলোজ শুধু উদ্ভিদের কোষ-প্রাচীরেই নয়, পরোক্ষভাবে আমাদের জীবনযাত্রায় অনেক সহায়তা করছে।

শ্রীচন্দন মুখোপাধ্যায়

প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন 1. : ক) বিদ্যুৎ চম্‌কানো কি ? এর অন্তর্নিহিত পদ্ধতি সম্বন্ধে কিছু জানতে চাই।

খ) বিদ্যুৎ চম্‌কানোর পর মেঘের যে ভীষণ গর্জন শোনা যায়, তার কারণ কি ?

দিলীপকুমার গিরি, ঘুশুড়ী, হাওড়া
দীপঙ্কর চক্রবর্তী, আগরতলা

প্রশ্ন 2. : কোঁচকানো জামাকাপড় গরম ইস্ত্রির দ্বারা ঘষলে টান হয়, কিন্তু ঠাণ্ডা ইস্ত্রির দ্বারা ঘষলে হয় না কেন ?

ঊর্মিলা দাশগুপ্ত, চড়কডাঙ্গা, কলিকাতা-10

উত্তর 1. : ক) বিদ্যুৎ চম্‌কানো হচ্ছে মেঘ ও পৃথিবীর মধ্যে অথবা মেঘে মেঘে তড়িৎ-মোক্ষণের ফল। পরস্পর বিপরীত তড়িৎ-ধর্মী মেঘ যখন কাছাকাছি আসে, তখন এদের মধ্যে দূরত্বের যথেষ্ট ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও এরা উচ্চ বিভববিশিষ্ট হবার দরুণ কিছু আধান এদের অন্তর্বর্তী মাধ্যমের ভিতর দিয়ে এক মেঘ থেকে অন্য মেঘে যাতায়াত করে। এর ফলে প্রায় 1 অ্যাম্পিয়ারের মত তড়িৎ-প্রবাহের সৃষ্টি হয়। তখন একই পথে অধিক মাত্রায় আধান প্রবাহিত হতে থাকে। একে বলা হয় লীডার স্ট্রোক। এর ফলে তড়িৎ-প্রবাহের মাত্রা হয় প্রায় 10^3 অ্যাম্পিয়ার। এই লীডার স্ট্রোক অপর মেঘে পৌঁছানোমাত্রই ঐ পথে বিপরীত মুখে অপর মেঘ থেকে সমস্ত আধান প্রথম মেঘের দিকে প্রবাহিত হয়। একে বলা হয় রিটার্ন স্ট্রোক। এই প্রক্রিয়ায় তড়িৎ-প্রবাহের মাত্রা হয় প্রায় 10^4 থেকে 10^5 অ্যাম্পিয়ারের মত। তড়িৎ-মোক্ষণের তীব্রতা রিটার্ন স্ট্রোকেই সবচেয়ে বেশী। এই সময় যে আলোকের উৎপত্তি হয়, পৃথিবী থেকে আমরা তাকেই বিদ্যুৎ চম্‌কানো বলে থাকি। মেঘ ও পৃথিবীর বেলাতেও একই পদ্ধতি কার্যকরী হয়।

খ) তড়িৎ-মোক্ষণের সময় পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে প্রচুর তাপের সৃষ্টি হয়। এই তাপের প্রভাবে বাতাসের মধ্যে হঠাৎ অধিক মাত্রায় সঙ্কোচন ও প্রসারণ সুরু হয়ে যায়। ফলে প্রচণ্ড শব্দের উৎপত্তি হয়, যা আমরা পৃথিবী থেকে শুনি এবং মেঘের গর্জন বলে জানি।

উত্তর 2. : কোঁচকানো জামাকাপড় যখন ঠাণ্ডা ইস্ত্রির দ্বারা ঘষা হয়, তখন জামাকাপড়ের উপর শুধুমাত্র চাপই প্রয়োগ করা হয়। কিন্তু গরম ইস্ত্রি প্রয়োগে জামাকাপড় একই সঙ্গে চাপ ও তাপের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে। কোঁচকানো অবস্থায়

জামাকাপড়ের মধ্যেকার সুতার স্থিতিস্থাপকতা ধর্ম ঠাণ্ডা ইস্ত্রি প্রয়োগে সাধারণতঃ পুরাপুরি নষ্ট হয় না। কিন্তু চাপ এবং তাপের প্রভাবে এই ধর্ম নষ্ট হয়ে যায়, ফলে জামাকাপড় টান হয়। ঠাণ্ডা ইস্ত্রি প্রয়োগের পর সুতার স্থিতিস্থাপকতা বজায় থাকায় জামাকাপড় আবার কুঁচকে যায়।

শ্যামসুন্দর দে*

* ইনস্টিটিউট অব রেডিও-ফিজিক্স অ্যাণ্ড ইলেকট্রনিক্স; বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা-9

বিবিধ

গোখরোর বিষে ক্যান্সার সারতে পারে

নয়াদিল্লী থেকে সম্প্রতি ইউ. এন. আই. কর্তৃক প্রচারিত সংবাদে প্রকাশ—যে গোখরো সাপের কামড়ে মানুষের মৃত্যু হয়, সেই গোখরো সাপের বিষই এখন মানুষের মারাত্মক ব্যাধি ক্যান্সার নিরাময়ে লাগতে পারে।

বোম্বাইয়ের ক্যান্সার রিসার্চ ইনস্টিটিউটে পরীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে যে, কোন কোন জাতের ক্যান্সার নিরাময়ে গোখরো সাপের বিষ ফলপ্রদভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীরা গোখরো সর্পের বিষ থেকে একরকম নির্বিষ (নন-টক্সিক) প্রোটিন পৃথক করতে পেরেছেন, যা কোন কোন ক্যান্সার নিরাময় করতে পারে।

টেস্ট-টিউবে এবং জীবজন্তুর দেহে ক্লিনিক্যাল পরীক্ষায় এই গোখরো-প্রোটিন ব্যবহার করে উৎসাহব্যঞ্জক ফল পাওয়া গেছে বলে তাঁরা জানিয়েছেন।

গোখরোর বিষ থেকে বিষাক্ত প্রোটিন পৃথক করবার পর এই ক্যান্সার নিরাময়-কারী গোখরো-প্রোটিন আবিষ্কৃত হয়েছে। গোখরোর কামড়ে যে মৃত্যু হয়, তা এই বিষাক্ত প্রোটিনের জন্যে। গোখরোর বিষ থেকে প্রাণঘাতী প্রোটিনগুলি দূর করা হলে—অবশিষ্ট অংশে খুব সামান্যই বিষ থাকে। বিষের এই অবশিষ্ট অংশ থেকেই ক্যান্সার নিরাময়কারী নির্বিষ প্রোটিন পৃথক করা হয়।

বোম্বাইয়ের ক্যান্সার রিসার্চ ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীরা দেখেছেন যে, এই নির্বিষ প্রোটিন সাধারণ কোষগুলিকে ছেড়ে দিয়ে কেবল টিউমার সেলগুলি ধ্বংস করে ক্যান্সার নিরাময় করে।

প্রোটিন যখন বেছে বেছে টিউমার-কোষের ঝিল্লীর উপর আক্রমণ চালায়, তখন এই সব কোষ ধ্বংস হয়।

গোখরোর প্রোটিনের এই নির্বিষ আচরণ ক্যান্সার কোষের ঝিল্লীর পরীক্ষার সম্ভাবনাও উন্মুক্ত করে দিয়েছে। ক্যান্সার কোষের ঝিল্লী সাধারণ কোষের ঝিল্লী থেকে স্বতন্ত্র।

প্রধান সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য
শ্রীমিহিরকুমার ভট্টাচার্য কর্তৃক পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা-6 হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ
37/7 বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত।